চতুর্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড	আষাঢ়, ১৩৩৭	প্রথম সংখ্যা

স্ত্রী-স্বাধীনতা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির ঠিক মতো উত্তর দিতে হ'লে অনেক কথা লিখতে হয়। কিন্তু আমার অবকাশ বড়ো সঙ্কীর্ণ। তবু নিরুত্তর থাকতেও প্রবৃত্তি হ'লো না, কেননা তোমার চিঠিতে মননশীল চিত্তের পরিচয় পাওয়া গেল। তোমার দৃষ্টি-প্রসারতার প্রশংসা করি।

স্ত্রী-স্বাধীনতা শব্দ অবলম্বন ক'রে বিস্তর তর্ক চল্‌চে, কিন্তু মনের মধ্যে স্পষ্ট ক'রে এই শব্দের সংজ্ঞা কেউ নির্দ্দেশ ক'রে নিয়েচেন তার পরিচয় পাইনি।

আমরা যখন বালক ছিলুম, তখন স্ত্রী-স্বাধীনতা বল্‌তে বুঝ্‌তুম বাহিরে বিচরণের স্বাধীনতা। এখনো বাংলাদেশে মেয়েদের বাহিরে বিচরণ যে সম্পূর্ণ অবাধ হয়েচে, তা নয়। কিন্তু তবু এ সম্বন্ধে তর্কের জোর আজকাল অনেকটা কমে গেছে। অন্তত যে দলের মধ্যে লেখালেখি বকাবকি চল্‌চে, এ কথাটুকু নিয়ে তাঁরা খুব বেশি উত্তেজিত হবেন না। সেকালের স্ত্রী-স্বাধীনতার তর্কটা সমস্তই দেশজ, আমাদেরই তাৎকালিক অবস্থার মধ্যেই সেটা অবরুদ্ধ। সম্প্রতি যে তর্কটা উঠে পড়েচে সেটাতে দেশী রং নেই, সেটা যুদ্ধের পরবর্ত্তী ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের মতো বিদেশ থেকে এসে পড়েচে।

য়ুরোপে সমাজ-বিপ্লব দেখা দিয়েচে। সেখানকার সমাজের মধ্যেই তার স্বাভাবিক কারণ বর্ত্তমান। সেখানকার স্বভাবের নিয়মেই তার একটা নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু আমাদের ভাষাটার সঙ্গে আমাদের কণ্ঠের প্রাণগত যোগ নেই, প্রতিধ্বনির উপর এর আশ্রয়।

য়ুরোপে যে তর্ক অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে জেগে উঠেচে, সে হচ্চে স্ত্রী-পুরুষের চিরপ্রচলিত সামাজিক সম্বন্ধ-বন্ধনের ধ্রুবত্ব নিয়ে। প্রাকৃতিক সম্বন্ধের বিচ্ছেদ ঘটাবার সাধ্য কারো নেই। বিবাহ দ্বারা সেই প্রাকৃতিক সম্বন্ধকে সমাজস্থিতির অনুকূল ক'রে নিয়মিত করা হয়েচে। বিশেষ কারণ বশত পুরুষের উদ্দামতা সমাজ-স্থিতির পক্ষে তত পীড়াজনক নয়, মেয়েদের স্বেচ্ছাচারিতা যতটা। এই জন্যেই স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক বন্ধনে পুরুষের দিকে সকল দেশেই যথেষ্ট শৈথিল্য ও মেয়েদের দিকেই যথেষ্ট কঠিনতা চ'লে আসচে। যুদ্ধের পূর্ব্বে য়ুরোপে স্ত্রীলোকেরা যে বিদ্রোহ করেছিলেন, তার বুলি ছিল এই যে, পরস্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা মেয়েদের কাছ থেকে যে সংযম দাবী করি, তা একতরফা হওয়া উচিত নয়, পুরুষের কাছ থেকেও সেই সংযম দাবী করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যুদ্ধের পরে যে কথাটা উঠেছে তার তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষের যে স্বাতন্ত্র্য চিরদিন ছিল, মেয়েদেরও সেই স্বাতন্ত্র্যই থাক্‌বে। বলা বাহুল্য এই স্বাতন্ত্র্য যদি দুই পক্ষেই সমান বাধামুক্ত হয়, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থার মূলগত পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হবে, অর্থাৎ সন্তানসন্ততি ও বিষয়সম্পত্তিঘটিত অধিকারের একটা সম্পূর্ণ নূতন বিধানের প্রয়োজন ঘটবে। রুষিয়ায় এই রকম একটা সামাজিক ব্যবস্থা-বিপর্য্যয় দেখা দিয়েচে—পরীক্ষা চল্‌চে। সে সব দেশের মাজ প্রবলভাবে সজীব, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সেখানকার মানুষ জাগ্রতচিত্ত নিয়ে নিজের ভাগ্যকে নিজে চালনা করচে, তাদের জন্যে আমাদের চিন্তা কর্‌বার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আমাদের দেশে য়ুরোপের সামাজিক ঝড়ের যে ল্যাজের ঝাপ্‌টা লাগ্‌চে, এটাতে ঋতু-পরিবর্ত্তনের আভ্যন্তরিক সংবাদ নেই—এটাতে কেবল ধূলো উড়িয়ে অন্তর বাহির ঢেকে দিচ্চে। বাইরে থেকে এসে এ আমাদের দুর্ব্বল প্রবৃত্তিকেই বিক্ষুব্ধ করচে, আমরা যে স্বাতন্ত্র্য কামনা করচি, সে হলো দুর্ব্বল লালসার অসংযম, সে বীর্য্যবানের বন্ধন-অসহিষ্ণুতা নয়। আমাদের দেশে ঘরে ঘরে বিবাহ-সম্বন্ধ নিয়ে স্ত্রীলোকের দুঃসহ অবমাননার অন্ত নেই, প্রতিদিন কত আত্মহত্যা ও ততোধিক দুর্গতির ইতিহাস এখানকার মানুষ অবিচলিত ঔদাসীন্যের সঙ্গে শুনে আস্‌চে। আজ সাহিত্যে ও তর্কক্ষেত্রে যে আলোচনা উঠ্‌লো, সে এইসব অন্যায়ের বেদনা থেকে নয়, সে অপথ্যের প্রতি রুগ্নচিত্তের লোলুপতা থেকে। গঙ্গাপ্রবাহে যে পঙ্ক ভেসে চ'লে যায়, এই তর্ক-প্রবাহে সে পঙ্ক নয়, রুদ্ধ কুণ্ডে যে পঙ্ক পুঞ্জিত হ'য়ে ওঠে, এ সেই পঙ্ক।

দেবতা যে প্রলয় ঘটান্ তার মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব আছে, কিন্তু অপদেবতা যে কাণ্ড করতে বসেন, তার মধ্যে বিনাশ ছাড়া আর কিছু নেই। অপদেবতারা নকল দেবতা, আমাদের সমাজে সেই নকল দেবতার উপসর্গ দেখা দিয়েচে। ইতি ১৩ ডিসেম্বর, ১৯২৯।

(সাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্তা নীলিমা নামকে লিখিত পত্র

শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা

শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়—এম-এ, পি-আর-এস্

বাংলা সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব যেন একটু আকস্মিক। তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সমগ্র বিকাশটুকু যেন আমরা একসঙ্গেই আমাদের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। আমাদের বয়স তখন বেশী হয় নাই, বোধ হয় ইস্কুলের সীমা তখনও অতিক্রম করি নাই—হঠাৎ 'বিন্দুর ছেলে' হাতে আসিয়া পড়িল; পড়িলাম, পড়িয়া সেই বয়সে কাঁদিয়া কাটিয়া আকুল হইয়া গেলাম। তারপর একটির পর একটি করিয়া তাঁহার কত বইই বাহির হইয়া গেল, পড়া হইয়া গেল;—সমস্তই এই এক যুগের মধ্যে। একটি একটি করিয়া সবগুলিরই দিনক্ষণ যেন স্মরণে আনিতে পারি। তাঁহার রসপদ্মের কুঁড়িটি আমরা দেখিলাম না, সে কুঁড়িটি ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সম্মুখে বিকশিত হইল না—সবগুলি দল একসঙ্গে মেলিয়া দিয়া ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ অবাক্ হইয়া গেলাম, হঠাৎ অত্যন্ত খুশী হইয়া গেলাম, নাচানাচি মাতামাতি করিয়া একেবারে তাহার সৌরভে পাগল হইয়া গেলাম; বহুদিন সে নেশা কিছুতেই আর টুটিল না; আজও যে টুটিয়াছে বলিতে পারি না। কিন্তু আজ এক একবার মনে হইতেছে, দিনের পর দিন একটা ফুলকে চোখের সাঁমনে ধীরে ধীরে ফুটিতে দেখিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, যে আনন্দকে ধীরে ধীরে মনের মধ্যে গ্রহণ করা যায়, এবং বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির প্রতি-তন্তুর সঙ্গে জড়াইয়া যে আনন্দ সহজ ও স্বাভাবিক হয়, সে আনন্দ হইতে আমরা, শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙলার পাঠকেরা, বোধ হয় কতকটা বঞ্চিত হইলাম। কিন্তু এ খবর আমরা শরৎচন্দ্রের কৈশোর ও যৌবনের বন্ধুদের নিকট হইতে ইতিমধ্যেই জানিয়াছি যে সেই বয়স হইতেই তিনি ভাগলপুরে তাঁহাদের সেই সাহিত্য-সরস্বতীর পূজা করিতেন এবং দেবদাস, বড়দিদি, এবং অন্যান্য আরো অনেক বইয়েরই রচনা সেইখানেই হইয়াছিল। তবু, এসব কথা জানা সত্ত্বেও, স্বীকার করিতেই হয়, বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎ-প্রতিভার বিকাশ কতকটা আকস্মিক। তাঁহার নীরব সাহিত্য-সাধনা হয় ত বহুদিন হইতেই চলিতেছিল, সে খবর হয় ত ক্রমশঃ আরো পাইব, কিন্তু একথা চিরকালই স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি তাঁহার পূর্ণবিকশিত রসপদ্মটি লইয়া একদিন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সকলকে একেবারে অবাক করিয়া দিয়াছেন। সে প্রতিভার মূল্য যাচাই করিবে ভাবী কাল; কিন্তু একথা সত্য যে বঙ্কিম অথবা রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ তেমন করিয়া হয় নাই; তাঁহাদের আবির্ভাব এমন করিয়া হঠাৎ চমক লাগায় নাই, তাঁহাদের সৌরভ একদিনে হঠাৎ রসচিত্তকে উন্মাদনায় আকুল করে নাই।

শরৎচন্দ্র এখনও জীবিত; কমলবনের সরস্বতী তাঁহাকে সুদীর্ঘ কাল বাঁচাইয়া রাখিয়া আরো সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করুন, এই প্রার্থনা করি। তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি এখনও চলিতেছে—তাঁহার দেবদাস, দত্তা, পল্লীসমাজ, চরিত্রহীনের রস ও হৃদয়াবেগের মধ্যে পাঠকের চিত্ত এখনও ডুবিয়া আছে, ভাবাকুলতা ও হৃদয়াবেগের আন্দোলন এখনও থামে নাই এবং বাঙালীচিত্তের যে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবোন্মত্ততা আছে, শরৎ-সাহিত্যের প্রভাব এখনো তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া বোধ ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই—এত শীঘ্র তাহা হয়ও না। মনের এই অবস্থায় প্রতিভার বিচার ও মূল্যযাচাই চলিতে পারে না। শরৎচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে একটি বিশিষ্ট যুগপ্রভাবের মধ্যে, যে প্রভাব আমাদেরও সমগ্র দেহে মনে তাহার রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে—তাঁহার প্রতিভার বিচার করিতে হইলে সে প্রভাবের কতকটা উর্দ্ধে ওঠা চাই, তার সীমা কতকটা অতিক্রম করা চাই,—অথচ আমরা যাহারা তাঁহার সমসাময়িক

তাহাদের পক্ষে তাহা অসম্ভব না হইলেও কঠিন সন্দেহ নাই ; খুব কম বাঙালী পাঠকের ততখানি শক্তি আছে।

বাঙলাসাহিত্যের একটি পরম শুভক্ষণে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে ; এবং এই হিসাবে শরৎচন্দ্র সৌভাগ্যবান সন্দেহ নাই। তাঁহাকে উষর ভূমি কাটিয়া জল ঢালিয়া ফসল ফলাইতে হয় নাই ; ভূমি তাঁহার জন্ম তৈরি হইয়াই ছিল। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের তখন আর 'চলি চলি পায়, টলি টলি যায়' অবস্থা নয়, সে হাঁটিতে, চলিতে এবং হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে শিখিয়াছে। বঙ্কিম যেমন করিয়া নূতন ভাষা গড়িয়াছেন, নূতন করিয়া বাঙলা-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি বাঙলা-ভাষাকে সাহিত্যের আসনে বসাইয়া বাঙালী পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছেন ; রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া বঙ্কিমের বাঙলাভাষার জড়িমা ঘুচাইয়া তাহাকে সহজ, সরস ও সাবলীল করিয়াছেন, বাঙালী পাঠকের মনে বিচিত্র রসবোধ ও সৌন্দর্য্যানুভূতির সৃষ্টি করিয়াছেন, শরৎচন্দ্রকে তেমন কিছু করিতে হয় নাই। শরৎচন্দ্রের জন্ম বাঙালী পাঠকসমাজ তৈরি হইয়াছিল, কাজেই তিনি যখন আসিলেন, তখন তাঁহাকে কাহারও পরিচয় করাইয়া দিবারও প্রয়োজন হইল না, সহজেই তিনি সকলের মন জুড়িয়া বসিবার সুযোগ পাইলেন। ভাষার জন্মও তাঁহাকে খুব কিছু ভাবিতে বা নতুন কিছু সৃষ্টি করিতে হইল না— বঙ্কিমের পর রবীন্দ্রনাথ বাঙলাভাষার যে রূপ-দান করিয়াছেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতিতুচ্ছ সুখ-দুঃখের কথা ও কাহিনীগুলি সরস করিয়া বলিবার জন্ম ভাষার মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তি তিনি সঞ্চার করিয়াছেন এবং যে সাবলীল ভঙ্গিমার সন্ধান তিনি দিয়াছেন, শরৎচন্দ্র তাহাকেই পরিপূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন এবং সেই ভাষাকেই নিজের নূতন করিয়া গড়িয়া সাজাইয়া সকল নৈবেদ্যের থালায় পরিবেশন করিয়া দিয়াছেন। যে ভাষা রবীন্দ্রনাথের হাতে ছিল কল্পনায় উজ্জ্বল, গাম্ভীর্য্যে দীপ্ত ও বুদ্ধিধারা মার্জ্জিত, সেই ভাষাকেই শরৎচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক হৃদয়াবেগধারা সরস ও অনুভূতির মাধুর্য্যে কমনীয় করিয়া লইয়াছেন। আর সাহিত্যসৃষ্টির বিষয়বস্তুর সন্ধানও নূতন করিয়া তাঁহাকে কিছু করিতে হইল না। বঙ্কিম যেমন করিয়া বিশেষভাবে ইতিহাস কিংবা কোনো প্রাচীন ঘটনার মধ্যেই তাঁহার উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সন্ধান করিয়াছিলেন, কোনো বাস্তব সত্য অথবা ঘটনার উপর তাঁহার বিষয়বস্তুকে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র তাহা করেন নাই এবং করেন নাই যে তাহার প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যত গল্প ও উপন্যাসলেখক তাঁহাদের প্রায় সকলেই ঐ ঐতিহাসিক কোন ভিত্তিভূমির উপর তাঁহাদের সাহিত্য-সৃষ্টিকে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—বিদেশে য়ুরোপীয় সাহিত্যেও তাহাই হইয়াছিল। আমাদের বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম দেখাইলেন যে আমাদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক কর্ম্ম ও চিন্তা, আচার ও ঘটনার মধ্যে গল্প ও উপন্যাসের প্রচুর উপাদান লুকানো আছে, এবং তাহাদের লইয়া খুব সরস সাহিত্য-সৃষ্টি হইতে পারে। শরৎচন্দ্র ভাল করিয়াই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাহার সম্ভাবনা যে আরো কত বড় তাহাও তিনি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্যই শরৎচন্দ্র কোনো ঐতিহাসিক বাস্তবতার মধ্যে তাহার বিষয়বস্তু খুঁজিতে যান নাই, আমাদের জীবনের বাস্তবতার মধ্যেই তাহা খুঁজিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক—কবি নহেন। জীবনের বিচিত্র বাস্তবতা লইয়া উপন্যাস, তাহার ঘটনাপর্য্যায়ের তন্তুজাল বুনিয়া বুনিয়া তবে উপন্যাসের রসসৃষ্টি। সেইজন্য ঔপন্যাসিক যিনি, জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম ও চিন্তার সঙ্গে তাঁহাকে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতেই হইবে, জীবনের সঙ্গে বিচ্যুত হইলে কিছুতেই চলিবে না। শরৎচন্দ্র নিজের উপন্যাস-সৃষ্টিতে কোথাও নিজেকে জীবন হইতে বিচ্যুত করেন নাই, একান্ত ভাবেই তাহাকে মানিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার জীবনে সে সুযোগও যথেষ্ট হইয়াছে। যে চরিত্র-গুলিকে তিনি তাঁহার উপন্যাসে অমরতা দান করিয়াছেন, তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটিয়াছে। কৈশোরের

ইন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রৌঢ় বয়সের জীবানন্দ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার অপরিচিত নয়। চরিত্র ছাড়া, যে সব প্রশ্ন ও সমস্যা তাঁহার বিষয়বস্তুর তন্তু বুনিয়া তুলিয়াছে, তাহারাও তাঁহার একান্ত পরিচিত—জীবনের নানান্ ক্ষেত্রে নানান্ ভাবে তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইয়াছেন। ইহার ফলে লাভ লইয়াছে এই যে তাঁহার প্রায় সব সৃষ্টিই আমাদের বাস্তব জীবনের কাছে অধিকতর সত্য, এবং আমাদের অনুভূতির নিকটতর ও সেই হেতু প্রিয়তর। তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং মনের বিচিত্র তরঙ্গলীলা আমাদের একান্ত পরিচিত; শরৎচন্দ্র এই পরিচিত বাকাকেই সরস ও বিচিত্রভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। সেই-জন্যই তাহারা এত সহজে আমাদের চিত্তকে আন্দোলিত করে এবং সহজেই পাঠক তাহাদের রসবোধে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহাতে একটু ক্ষতিও হইয়াছে। কি তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র, কি তাঁহার প্রশ্ন ও সমস্যা, কি তাঁহার ঘটনাবস্তু ও মানসিক তরঙ্গলীলা সমস্তই তাঁহার, এবং কমবেশী তাঁহার পাঠকের, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কবিসুলভ যে কল্পনার প্রসার ও বৈচিত্র্য, বুদ্ধিলভ্য যে সুতীক্ষ্ণ চিন্তাজাল, প্রতিভার যে সুদূর-বিসর্পী দৃষ্টি ও সুবৃহৎ ভাবের দীপ্তি, শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে তাহার কোনো পরিচয় নাই। সাহিত্যসৃষ্টিতে কল্পনার প্রসারের অভাব শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিকের বাস্তব প্রতিভাকে একটু দুর্ব্বল ও পঙ্গু করিয়াছে; কোনো সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যার তন্তুজাল তাহার তীব্র শক্তি ও দীপ্তিতে তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে নাই, কিংবা কোনো সুবৃহৎ ভাবের তরঙ্গলীলা তাহাকে সমুদ্রের মত সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে নাই। শরৎচন্দ্রের মধ্যে ঔপন্যাসিকের বাস্তব প্রতিভার সঙ্গে কবির ভাব ও কল্পনার প্রতিভা একসঙ্গে মিশিতে পারে নাই। অথচ তাহা না হইলে বর্ত্তমান যুগের উপন্যাসের নিকষে রেখাপাত করা সত্যসত্যই অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কি দেবদাস, পল্লী-সমাজ, কি শ্রীকান্ত, অরক্ষণীয়া, কি দত্তা, চরিত্রহীন সর্ব্বত্রই আমাদের মন ও বুদ্ধির পরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে সরস রসসঞ্চার, অদ্ভুত সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে, কিন্তু কল্পনার সুদূর প্রসার ও ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধির দীপ্তি ও চিন্তার উজ্জ্বলতা, প্রশ্ন ও সমস্যার সূক্ষ্ম জটিলতা ও সর্ব্বোপরি সুবৃহৎ ভাবের তরঙ্গাঘাত তাঁহার কোনো সৃষ্টিকেই তেমন করিয়া সমৃদ্ধ করে নাই। অথচ এই শতাব্দীর বিশ্ব-সাহিত্যের উপন্যাসের খণ্ডজগৎটি যাঁহাদের দানে সমৃদ্ধ হইয়াছে, কি দেশে কি বিদেশে, তাঁহাদের সকলের মধ্যেই দেখি, উপন্যাসের বাস্তব প্রতিভার সঙ্গে মিশিয়াছে অপরূপ কবিপ্রতিভা, অদ্ভুত বুদ্ধির দীপ্তি; প্রমাণ—হার্ডি, বোয়ার, সুডারম্যান্, রোঁলা, রবীন্দ্রনাথ। আরো যাঁহারা আছেন তাঁহাদের নাম আর নাই করিলাম। বিংশশতাব্দীর রসচিত্ত বুঝিয়াছে, উপলব্ধি করিয়াছে, এবং যুগপ্রভাবে আমরা বাঙালী পাঠকেরাও বুঝিয়াছি যে শুধু অনুভূতি ও হৃদয়াবেগের মধ্যে যে রসের সৃষ্টি ও সঞ্চার সে রস বর্ত্তমান মানবমনকে তৃপ্তি দিতে পারে না—বুদ্ধি ও কল্পনার মধ্যে তাহার আসন পাতা হওয়া চাই। শরৎচন্দ্র আমাদের বাস্তব জীবনের প্রতি স্থূল ও সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যকে অপূর্ব্ব অনুভূতি ও হৃদয়াবেগ দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া তাহারাই মধ্যে এমন একান্ত ভাবে ডুবিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি বিংশশতাব্দীর উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনা হইতে খানিকটা বঞ্চিত হইয়াছে। তিনি আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই বন্দী হইয়া পড়িয়াছেন; আমাদের কল্পনাকে প্রসারিত করিয়া রসবোধের বিস্তৃত অবসর তিনি আমাদিগকে দেন নাই, আমাদের বুদ্ধিকে চিন্তার ও চৈতন্যে জাগাইয়া তুলিয়া নিত্য নূতন ভাবে বিচিত্র ভাবদোলায় আন্দোলিত হইতে দিলেন না।

কিন্তু শরৎচন্দ্র যাহা আমাদের দিয়াছেন, সাহিত্যের যে-দিকটা তিনি ফসলগুচ্ছে সাজাইয়াছেন, তাহার রসসমৃদ্ধির তুলনা পাওয়া সত্য সত্যই কঠিন। আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখের মধ্যে যে এত রস, এত মাধুর্য্য তাহা কে কবে জানিত, এমন রসানুভূতির দৃষ্টি লইয়া আমরা কে কবে আমাদের জীবনের দিকে তাকাইয়া-ছিলাম? আমাদের সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে তো আমাদের চিরকালের পরিচয়, তাহার সুখদুঃখ তো আমরা প্রতিদিন ভোগ করি—কিন্তু তাহার মধ্যে এমন নিবিড় রসানুভূতির সঞ্চার যে সম্ভব, সুখ ও দুঃখ মাধুর্য্যের বৈচিত্র্য যে এতো বেশী তাহা কি আমরা ভাল করিয়া জানিতাম, না, আমাদের

মনের অনুভূতির অলিগলি যে এত সূক্ষ্ম ও জটিল সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। আমাদের মনোরাজ্যের অতি সহজ অনুভূতিগুলিকে হৃদয়াবেগের তরঙ্গে এমন করিয়া কেহ উদ্বেলিত করিয়াছে কি, আমাদের চিত্তবৃত্তিকে এমন সহজ ও স্বাভাবিক সুপরিচিত সুখে-দুঃখে এমন বিচিত্র দোলায় কেহ আন্দোলিত করিয়াছে কি? বস্তুতঃ, উপন্যাসের বাস্তব ঘটনাপর্য্যায়ের মধ্যে এমন তীব্র হৃদয়াবেগের সঞ্চার, এমন সুতীক্ষ্ণ অনুভূতির প্রেরণা এবং সর্ব্বোপরি কি চরিত্র কি ঘটনাবস্তু সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ভাবের মোহে ও ভাষার জালে এমন মাদকতার সৃষ্টি শরৎচন্দ্রের আগে বাঙলা উপন্যাসে আমরা কমই দেখিয়াছি। শরৎচন্দ্রই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম না হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি ও সাহসে আমাদের চিত্তের খেয়াল ও সংস্কারকে, হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র লীলাকে সাহিত্যের আসরে টানিয়া নামাইলেন এবং আমাদের জীবনের অনেক গোপন অলি-গলির লজ্জা ও দৈন্য ঘুচাইলেন। এই কারণেই শরৎচন্দ্র এত সহজে বাঙালী পাঠকসমাজের এত প্রিয় ও তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার এতো প্রতিষ্ঠা! বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নানান ছোট গল্পে ও দু' একটি উপন্যাসে ইতিপূর্ব্বেই তাহার পথ দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আমাদের চিত্তবৃত্তির বিচিত্র লীলাকে, আমাদের হৃদয়াবেগকে শরৎচন্দ্রের মত এমন নিবিড় করিয়া এমন তীব্র করিয়া আর কেহ উপন্যাসের তত্ত্বরচনায় নিয়োজিত করেন নাই।

শরৎচন্দ্রের ভাষায় যে একটা মাদকতা এবং কমনীয়তা আছে, সে কথা আগেই বলিয়াছি। তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গীটিও সুন্দর ও মধুর, খুব সহজ (direct), সরল (sincere) ও স্বাভাবিক। তাহার একটা লঘু গতি আছে, কিন্তু তাহা চপল ও চটুল নহে। দু'জনার কথাবার্ত্তা যেখানে, সেখানেও বলিবার ভঙ্গী-বুদ্ধি এবং অনুভূতিতে উজ্জ্বল ও সরস কিন্তু তীব্র ও প্রখর নহে। কাথাবার্ত্তার মধ্যে উচ্ছল হাস্যরসের কিছু প্রাচুর্য্য নেই, কিন্তু সরস রসিকতার লঘু হাসির আনন্দ আছে এবং তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণনার ভঙ্গীটিও খুব অভিনব; এমন ঘরোয়া অথচ এমন সরল ও সরস করিয়া ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনা করিবার শক্তি খুব সহজ শক্তি নয়। এই কথার ভঙ্গী, বর্ণনার ভঙ্গী, ভাষার সহজ লঘুগতি, শব্দের সহজ অনাড়ম্বর সব-কিছু লইয়া তাঁহার যে 'ষ্টাইল,' এ ষ্টাইলের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী সন্দেহ নাই; কিন্তু সে ষ্টাইলকে তিনি এমন করিয়া আত্মসাৎ করিয়া এমন করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন যে ঋণটি যে কোথায় তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার উপায় নাই—এ যেন এক নূতন সৃষ্টি, নূতন রূপ। দুইজনের যেকোনো বই'র যেকোন জায়গা হইতেই একটু উদ্ধৃত করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু এ উদ্ধার সহজ নয়, দুইজনের লেখা হইতে সমান অবস্থার একই প্রকার অনুভূতির কথা ও বর্ণনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তবু, একটা কাজ অথবা ঘটনা অতীত হইয়া গেলে মানুষ যখন চিত্তের সমস্ত রসে ও আবেগে সেইটাকেই ভাবিতে বসে এবং দুঃখসুখের আবর্ত্তে তাহার চিন্তাস্রোত জটিল হইয়া উঠে, এমনি একটি অবস্থার বর্ণনা দু'জনের হাতে কেমন ফুটিয়াছে, তাহা একটু দেখিলেই পার্থক্যের মোটামুটি আভাসটুকু পাওয়া যাইবে।

"নষ্টনীড়ের" অমল চলিয়া গেলে "যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সাংসারিক শূন্যতার পরিমাপ ক্রমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চারু হতবুদ্ধি হইয়া গেছে। নিকুঞ্জবন হইতে বাহির হইয়া সে হঠাৎ এ কোন্ মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—দিনের পর দিন যাইতেছে, মরুপ্রান্তর ক্রমাগতই বাড়িয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। এ মরুভূমির কথা কিছুই সে জানিত না।

"ঘুম থেকে উঠিয়াই হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠে—মনে পড়ে অমল নাই। সকালে যখন সে বারান্দায় পান সাজিতে বসে, ক্ষণে-ক্ষণে কেবলি মনে হয়, অমল পশ্চাৎ হইতে আসিবে না। এক এক সময় অন্যমনস্ক হইয়া বেশী পান সাজিয়া ফেলে, সহসা মনে পড়ে বেশী পান খাইবার লোক নাই। যখনই ভাঁড়ার ঘরে পদার্পণ করে, মনে উদয় হয় অমলের জন্যে জলখাবার দিতে হইবে না। মনের অধৈর্য্যে অন্তঃপুরের সীমান্তে আসিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, অমল কলেজ হইতে আসিবে না। কোনো একটা নূতন বই, নূতন লেখা, নূতন খবর, নূতন কৌতুক প্রত্যাশা করিবার নাই, কাহারো জন্য কোনো সেলাই করিবার, কোনো লেখা লিখিবার, কোনো সৌখীন জিনিস কিনিয়া রাখিবার নাই।

"ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্ব্বের বিষয় হইল—সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব।

"গৃহকার্য্যের অবকাশে একটি সময় সে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই-সময় নির্জ্জনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বলিত—অমল, অমল, অমল! সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত, বৌঠান, কি বৌঠান! চারু সিক্তচক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিত—অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন? আমি তো কোনো দোষ করি নাই! তুমি যদি ভালমুখে বিদায় লইয়া যাইতে, তাহা হইলে আমি বোধ হয় এত দুঃখ পাইতাম না। অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন করিয়া কথা হইত চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত। অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই! একদিনও না, একদণ্ডও না! আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্তই তুমি ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন আমি তোমার পূজা করিব।"

ঠিক এই রকম অবস্থার না হোক, তবু কতকটা এই অবস্থার একটি দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্র'র "শ্রীকান্ত" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"আজ একাকী গিয়া মুদীর কাছে দাঁড়াইলাম। পরিচয় পাইয়া মুদী একটা ছোট ন্যাকড়া বাহির করিয়া গেরো খুলিয়া দু'টি সোনার মাকড়ী ও পাঁচটি টাকা বাহির করিল। টাকা কয়টি আমার হাতে দিয়া কহিল, 'বহু মাকড়ী দুইটি আমাকে একুশ টাকায় বিক্রী করিয়া সাহজীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না।" এই বলিয়া সে কাহার কত ঋণ, মুখে মুখে একটা হিসাব দিয়া কহিল, 'যাবার সময় বহুর হাতে সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা ছিল।' অর্থাৎ বাইশটা মাত্র পয়সা সম্বল করিয়া এই নিরুপায় নিরাশ্রয় রমণী সংসারের সুদুর্গম পথে একাকী যাত্রা করিয়াছেন। পাছে তাঁহার সেই স্নেহাস্পদ বালক দুইটি, তাঁহাকে আশ্রয় দিবার ব্যর্থ-প্রয়াসে উপায়হীন বেদনায় ব্যথিত হয়, এই ভয়ে নিঃশব্দে অলক্ষ্যে বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথাও কাহাকে জানিতে পর্য্যন্ত দেন নাই। না দিন, কিন্তু আমার টাকা পাঁচটি নিলেন না। অথচ নিয়েছেন মনে করিয়া আমি আনন্দে গর্ব্বে কতদিন কত আকাশ-কুসুম সৃষ্টি করিয়াছিলাম—আজ সব আমার শূন্যে মিলাইয়া গেল। অভিমানে চোখ ফাটিয়া জল আসিল।.........

"তারপরে অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি কিন্তু এই দুটো পোড়া চোখে আর কখনও তাঁহার দেখা পাই নাই। না পাই, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেই প্রসন্ন হাসি-মুখখানি চিরদিনই দেখিতে পাই। তাঁহার চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া মাথা নুয়াইয়া প্রণাম করি, তখন এই একটা কথা আমার কেবল মনে হয়, ভগবান এ তোমার কি বিচার!......... আমার এমন দিদির ভাগ্যে এতবড় বিড়ম্বনা নির্দ্দেশ করিয়া গেছ কেন? কিসের জন্য এতবড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে? কি না তুমি তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম্ম নিলে... সমাজ সংসার সম্ভ্রম সমস্তই নিলে। দুঃখ যত দিয়াছ, আমি তো আজো সাক্ষী রহিয়াছি। এতেও দুঃখ করি না জগদীশ্বর!.কিন্তু যাঁর আসন সীতা সাবিত্রী সতীর সঙ্গে, তাঁকে তাঁর বাপ মা আত্মীয়স্বজন শত্রুমিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া! কুলটা বলিয়া! বেশ্যা বলিয়া! ইহাতে তোমারই কি লাভ? সংসারই বা পাইল কী?"

এই দুইটি উদ্ধৃত অংশের ভাষার তফাৎ যে কোথায় তাহা দেখানো মুস্কিল; দুটিরই মোটামুটি রূপ ও গতি প্রায় একই রকম; কিন্তু তবু খানিকটা পার্থক্য একটু মনোযোগী পাঠকের চোখে ধরা না পড়িয়াই পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষা সহজ ও সরল, প্রাঞ্জল ও গতিশীল; শরৎচন্দ্র'র ভাষাও তাহাই। কিন্তু এমন একটা বিচ্ছেদব্যথিত মুহূর্ত্তেও তাঁর ভাষা খুব আবেগকম্পিত নহে, দুঃখভারে তাহা মথিত নহে; দুঃখ কবি নিজে অনুভব করিয়াছেন কিন্তু সে অনুভূতির রসের মধ্যে নিজকে একেবারে ডুবাইয়া দেন নাই, তাঁহার লেখনী যেন তাঁহার ব্যক্তিত্বের মতনই কতকটা নিরাসক্ত। কিন্তু শরৎচন্দ্র মোটেই তাহা নন্—তাঁহার ভাষা একান্তভাবে হৃদয়াবেগ দ্বারা কম্পিত, পরিপ্লুত, দুঃখানুভূতি দ্বারা বিমথিত, এবং সেই জন্যে তাহা অত্যন্ত নিবিড়; তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে সকল সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছেন এবং একান্তভাবে তাহার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া পরিপূর্ণ আসক্তির মোহে লেখনীর মুখে ভাষা ফুটাইয়াছেন। সেই হেতু শরৎচন্দ্রের ভাষার একটা মোহ আছে, খানিকটা মাদকতা আছে এবং সর্ব্বোপরি একটা সুনিবিড় সহানুভূতির মাধুর্য্য আছে। শরৎচন্দ্রের ভাষার এই মাধুর্য্য ও মাদকতা তাঁহার লোকপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ।

এই প্রসঙ্গে শরৎ-প্রতিভার আর একটা দিকের কথা আসিয়া পড়িল; এবং উপরের উদ্ধৃত অংশ হইতেই তাহার পরিচয় লওয়া চলিবে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভার স্বরূপ বুঝিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের কথা একটু না বলিয়া উপায়

নাই। আমি আগেই বলিয়াছি, বাঙলা সাহিত্যের এই দুইটি প্রতিভাই জীবনের বাস্তবতার মধ্যে উপন্যাসের উপাদান খুঁজিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আছে একটা অদ্ভুত idealism—যে idealism পরশমণির মতন যাহাকেই স্পর্শ করে তাহাই সোনা হইয়া যায়। এই idealismএর স্পর্শে পৃথিবীর ধূলোমাটি, আমাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যা-কিছু তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, দুঃখে বেদনায় ব্যথিত, সমস্তই সোনা হইয়া গিয়াছে, অপূর্ব্ব রূপে ও রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই idealsmএর স্পর্শে যে বস্তুকে লইয়া তাঁহার কারবার, সেই বস্তুরই রূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, তাহাকে দেখিলে আর চেনা যায় না; বরং মনে হয় কবি বস্তুর যে রূপ আমাদের দেখাইলেন, সেই রূপই তার সত্য রূপ। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বুঝা যাইবে। "নষ্টনীড়" হইতে উপরে যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার মধ্যেই দেখা যায়, অমলের জন্ত চারুর মনের যে দুঃখ সেই একান্ত স্বাভাবিক দুঃখটিকে কবি নিজের মনেও অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু সেই অনুভূতিকে রবীন্দ্রনাথ চারুরই অনুভূতি হইয়া থাকিতে দেন নাই, চারুর মধ্যে তাহা সুগভীর করিয়া দেখিবারও অবসর আমাদের দেন নাই, তাহাকে তিনি সকলের দুঃখের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন এবং একটা অচঞ্চল অবসানের মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া দিয়াছেন। 'কাবুলীওয়ালা' গল্পের কাবুলীওয়ালা ও 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পের রতনের জীবন ও অন্তরের যে দুঃখ তাহাকেও রবীন্দ্রনাথ তাহাদের জীবনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেন নাই, আপনার ভাবও সুদূরবিসর্পী কল্পনার বলে সমস্ত বিশ্বসংসার অখিল-চরাচরের সঙ্গে সে দুঃখকে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন—তাহাদের দুঃখের সুনিবিড় তিমিরের তলে আমাদের ডুবিয়া যাইতে দিলেন না। তিনি তাঁহার চরিত্র ও ঘটনাবস্তুগুলিকে পৃথিবীর ধূলোমাটির সঙ্গে সৃষ্টির এক-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন, এবং মানুষের দুঃখকে বেদনাকে, সুখকে শান্তিকে সৃষ্টির সকল বস্তুর দুঃখ ও বেদনা সুখ ও শান্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন। 'অতিথি' গল্পটিতে আমার এই কথাটির খুব ভাল প্রমাণ আছে। কিশোর তারাপদ কোথাও স্থির হইয়া থাকে না, কাহারও নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে না—মতিবাবু এবং অন্নপূর্ণা অথবা চারু কাহারও স্নেহপ্রেম-বন্ধুত্বের মধ্যেও সে শেষ পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িল না। তাহার চলিষ্ণু চিত্ত একদিন 'বর্ষার মেঘ-অন্ধকার রাত্রে আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব-পৃথিবীর নিকট' চলিয়া গেল। এই যে চলিয়া যাওয়ার ব্যাপারটির সঙ্গে যে দুঃখ-বেদনা জড়িত হইয়া আছে, যে tragedy'র আভাস আছে তাহাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন না; তাঁহার স্বাভাবিক idialism-বিহারী মন এই চলিয়া যাবার ব্যাপারটিকে সমস্ত বিশ্ব-সংসারের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিল।—

"দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব দিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পুবেবাতাস বেগে বহিতে লাগিল,—মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া উঠিল, নদীর জল খলখল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল;—নদীতীরবর্ত্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল,—সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা. চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে।"

এই সমস্ত চরাচরের মধ্যে কিশোর তারাপদ বা স্থির হইয়া থাকিবে কেন? ইহাই রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, তাঁহার idia-lismএর পরশমণি, যাহার ছোঁয়ায় সকল বস্তু এক অখণ্ড রস-পরিণামের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। বস্তুকে লইয়াই তাঁহার প্রত্যেক সৃষ্টির সূত্রপাত, কিন্তু তাঁহার কল্পনা বস্তুকে ছাড়াইয়া রসের ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়া গিয়া অস্পষ্ট ভাবলোকের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জনই করিয়াছে। ইহাই তাঁহার প্রতিভার মূল কথা—এবং প্রতিভার এই শক্তি আছে বলিয়াই তিনি কবিকুলগুরু।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রতিভা সকল বস্তুর এক অখণ্ড রস-পরিণাম স্বীকার করে না; তাঁহার অনুভূতি কখনও বস্তুকে ছাড়াইয়া রসের ঊর্দ্ধলোকে, ভাবের কল্পজগতে বিচরণ করে না। তাঁহার মনের মধ্যে মানুষের সুখদুঃখের অনুভূতি নির্দ্দিষ্ট বস্তু, ব্যক্তি ও অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ও সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া জাগিয়া থাকে—বস্তুকে অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-

চরাচরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে না। শরৎচন্দ্রের প্রতিভা সেইজন্যে আমাদের জীবনের সীমাবদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে তার একান্ত সত্য সুখদুঃখকেই খুঁজিয়াছে, এবং তাহাকেই একান্ত নিবিড় করিয়া একান্ত আত্মগত করিয়া অনুভব করিয়াছে। পৃথিবীর ধূলোমাটির দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় প্রকৃতির বিচিত্রতার দিকেও হয়—মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে ইহাদের তিনি বাঁধিতে যান নাই, সেদিকে তাঁহার কল্পনা প্রসারিত হয় নাই। তাঁহার কল্পনা একেবারে ভাবগত নহে, একান্তভাবে অনুভব-গত। সহানুভূতি দিয়াই সকলের দুঃখের তিনি পরিমাপ করিতে চাহিয়াছেন, নিজের ভাবের দ্বারা তাহাকে ব্যাপক করিয়া দেখেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ রমা'র কথা, দেবদাসের কথা উল্লেখ করিতেছি। রমা'র দুঃখ তো আমাদের সমাজের অনেক বাল্যবিধবারই দুঃখ; কিন্তু আগাগোড়াই তাহার দুঃখ একান্তভাবে তাহারই মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হইয়া জাগিয়া রহিল—সমস্ত জগৎ জুড়িয়া তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল না কিম্বা ভাবের কোনো শাশ্বত-লোকে তাহা পরিসমাপ্তি লাভ করিল না। এবং করিল না যে, তাহাতে ভালই হইল; রমার দুঃখের নিবিড়ত্বটুকু আমরা বুঝিতে পারিলাম—তাহার দুঃখের বাস্তবমূর্ত্তির রূপটি আমরা ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। দেবদাস-পার্ব্বতীর জীবনেও তাই—তাহাদের tragedy তো আমাদের পরিবারে ও সমাজে কতই ঘটিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুঃখের নিদারুণ মূর্ত্তিটি যেমন করিয়া দেখিলাম, যেমন গভীর করিয়া দেখিলাম তাহা শুধু সম্ভব হইল একান্তভাবে দেবদাস-পার্ব্বতীর মধ্যেই সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া সে দুঃখকে দেখিলাম বলিয়া, এ যেন একান্ত তাহাদেরই দুঃখ। সে দুঃখসৃষ্টির কোনো রহস্যের সঙ্গে বিযুক্ত হইলে আমাদের ভাবকল্পনা তৃপ্তি পাইত বটে, একটি নির্লিপ্ত ভাবলোকের মধ্যে আমাদের দুঃখ বিমুক্তিলাভ করিত বটে, কিন্তু আমাদের চিত্তের মধ্যে দুঃখের অনুভূতি এত সুগভীর হইতে পারিত না।

ঠিক এই কারণেই দেখা যায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজগৎ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। তিনি আমাদের মানুষ-জীবনকে খুব বিস্তৃত ও ব্যাপক করিয়া দেখেন নাই; মানব-জীবনের অসংখ্য বিচিত্র গতি ও সম্ভাবনার দিকে তাঁহার কল্পনা-জগতও আকৃষ্ট হয় নাই। মানুষ হিসাবে মানুষের যে মহিমা যে কাহিনী প্রত্যেক মানব-প্রাণীর জীবনের সত্য ইতিহাস এবং যাহা বিশিষ্ট দেশকাল ও পাত্রের কথা হইয়া ও সকল দেশকাল ও পাত্রকে অতিক্রম করিয়া, শরৎচন্দ্রের কল্পনানুভূতি মানব-জীবনকে এমন সুবৃহৎ ও সুবিস্তীর্ণ করিয়া আলিঙ্গন করে নাই। তিনি জীবনকে দেখিয়াছেন আমাদের পরিবার ও সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া—যে জীবন একই সঙ্গে ত্যাগে উজ্জ্বল ও স্বার্থে পীড়িত, অনুভূতিতে গভীর ও শাসনসংস্কারে ক্লিষ্ট। তিনি দেখিয়াছেন আমাদের পরিবারে ও সমাজে অত্যাচার ও ব্যাভিচারের লীলা, দুঃখ ও দৈন্যের নিকরুণ উৎপীড়ন, বিধি-নিষেধের যুক্তিহীন নির্যাতন, এবং আমাদের ব্যক্তিজীবনে এই নির্য্যাতন, অত্যাচারের ও উৎপীড়নের সীমাহীন দুঃখ ও ক্রন্দন। কিন্তু, যতটুকু তিনি দেখিয়াছেন খুব নিবিড় করিয়া খুব গভীর করিয়াই দেখিয়াছেন—সে দৃষ্টির গভীরতার তুলনা নাই। আমি আগে বলিয়াছি, তাঁহার সৃষ্টি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ—সত্যই তাই, কিন্তু আমাদের এই বাস্তব জীবনের দুঃখ-বেদনার মধ্যেই তাঁহার কল্পনার যত প্রসার। এই দুঃখ-বেদনাকে তিনি নিজের মনের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, অপরিসীম সহানুভূতির সাহায্যে তাহার গভীরতা পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই গভীরতা যেখানে যতটুকু দুঃখ বেদনার পরিমাপ করিতে পারিয়াছে, সেখানে ততটুকু তাঁহার কল্পনা বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। সে কল্পনা বস্তুর রূপকে কোথাও বদলাইয়া দেয় নাই, কোথাও তাঁহার অনুভূতিকে অন্তরের ভাবকল্পনার সৃষ্টির মর্ম্মস্থলের কোনো প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে বিসৃত করিয়া দেয় নাই। কিন্তু তাহাতে যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এ কথা মনে করিতে পারি না। আমাদের যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন একান্তই আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেই জীবনের দুঃখ ও বেদনায়, শাসন ও পীড়নের গভীরতা যে কতখানি তাহার দিকে কখনও দৃষ্টি আমরা প্রেরণ করি নাই, আমাদের কল্পনানুভূতি সে

গভীরতা পরিমাপ করিতেও চেষ্টা করে নাই। বাস্তব জীবনের এই অজ্ঞাত কল্পনানুভূতির সুগভীর জগতটির মধ্যে শরৎচন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, এবং আমাদের সাহনুভূতির মধ্যে তাহার আসন পাতিয়া দিলেন। অপূর্ব রসে ও আবেগে আমাদের সমাজ ও পরিবার-বদ্ধ দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব রূপটি আমাদের চোখের সাম্‌নে ধরিয়া দিলেন। দুঃখে ও বেদনায় তিনি ব্যথিত হইলেন, বিধিনিষেধের উৎপীড়নে পীড়িত হইলেন—তাহাদের লইয়া চিন্তাও হয় ত করিলেন, কিন্তু তাহার মূল অথবা মীমাংসার কিছু খুঁজিতে গেলেন না, তাহাদের লইয়া কিছু বিচার করিতে বসিলেন না। ভালই করিলেন, দুঃখের বিচার অথবা মীমাংসা যে আমরা পাইলাম না, তাহাতেই তো দুঃখের বেদনা আমাদের কাছে গভীর হইয়া উঠিতে পারিল —তিনি দুঃখের স্বরূপটিকে আমাদের কাছে ধরিয়া দিলেন মাত্র। রমেশ যে সমাজ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইল, রমা-রমেশ হৃদয়ের মধ্যে যে প্রেম বহন করিয়া সামাজিক বিধি-নিষেধের বশে প্রেমের সার্থকতা পাইল না—ইহার দুঃখের স্বরূপটিকেই শরৎচন্দ্র আমাদের দেখাইলেন, সামাজিক অনুশাসনের কিছু বিচার তিনি করিলেন না, কিংবা তাহার মীমাংসা করিয়া দু'জনকে একত্র মিলিত করিয়া দিলেন না। সেইজন্যেই আমাদের সহানুভূতির মধ্যে তাহাদের দুঃখ-বেদনা নিবিড় হইয়া উঠিল, তাহারা আমাদের হৃদয়ের নিকটতর হইল—এবং সাহিত্য হিসাবে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি সার্থক হইল। সাবিত্রীকে, অন্নদা দিদিকে তো দেখিলাম—আমাদের সমাজ যে কি করিয়া তাহাদের ললাটে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া দিয়াছে তাহাও দেখিলাম—কিন্তু কোথাও দেখিলাম না তাহারা অথবা শরৎচন্দ্রের লেখনী সমাজের এই নিষ্ঠুর বিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, অথবা তাহার একটা মীমাংসা করিল। কিন্তু তাহাদের চরিত্রের বাস্তব রূপটি এমন করিয়া আবেগে, এমন সহানুভূতিতে আমাদের কাছে চিত্রিত হইল যে তাহাদের সতীত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র রহিল না এবং তাহাদের জীবনের দুঃখ ও উৎপীড়নের উপর দিয়াই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অনন্ত-কালের জন্য তাহারা বাঁচিয়া রহিল।

আমাদের বাস্তব জীবনের বিচিত্র দৈন্য ও অর্থহীন সংস্কারকে সাহিত্যের আসরে রসোজ্জ্বল ও আবেগকম্পিত করিয়া দেখাইবার এবং সেই দৈন্য ও সংস্কার দ্বারা উৎপীড়িত জীবনকে আমাদের হৃদয়ের নিকটতর করিবার অদ্ভুত দুঃসাহস বাঙ্‌লা সাহিত্যে বোধ হয় শরৎচন্দ্রই প্রথম দেখাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য সর্ব্বপ্রথম সামাজিক বহু বিধি-নিষেধের দুইএকটি নিষেধকে সাহিত্যে স্থান দিয়া তাহাকে রসে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন—সমাজ-বিধি-বহির্ভূত প্রেমকে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসন দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; এবং তাহার পরে রবীন্দ্রনাথ-ও তাঁহার গল্পে উপন্যাসে আমাদের অনেক দৈন্য ও সংস্কারকে অপূর্ব রসে ও আলোকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দুই জনেরই এই প্রয়াস, বাস্তব জীবনকে তাহার স্ব-রূপে প্রকাশ করিবার এই চেষ্টা অনেক সময়ই বুদ্ধি ও চিন্তার ক্ষেত্রে অথবা তাঁহাদের কল্পনার অপূর্ব ভাবালোকের মধ্যেই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেই হিসাবেই তাঁহাদের সৃষ্টি অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম কোনো বুদ্ধির বলে নয়, যুক্তির বলে নয়—শুধু হৃদয়াবেগের ও অপূর্ব সহানুভূতির সাহায্যে দৈন্য ও সংস্কারপীড়িত বিধিনিষেধ-নির্য্যাতিত আমাদের বাস্তব জীবনকে আমাদের হৃদয়ের নিকটতর করিয়াছেন। পল্লীসমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া দেনাপাওনা পর্য্যন্ত তাঁহার সব সৃষ্টিতেই আমাদের সমাজের ও পরিবারের নানান্ দুঃখ ও সমস্যার যে বাস্তবরূপ, যে সত্যরূপ তাহাকেই ফুটাইয়াছেন—কোথাও কিছুকে ক্ষমা করেন নাই। রমেশ-রমা'র দুঃখে, দেবদাসের দুঃখে আমরা ব্যথিত হই, সহানুভূতিতে হৃদয়ের কাছে তাহাদেরে টানিয়া লই, কিন্তু যখন ভাবি রমা বিধবা, এবং পার্ব্বতী পরস্ত্রী তখন সংস্কারবদ্ধ সামাজিক চিত্ত আমাদের সংকুচিত হয়। আমাদের রসবোধ তৃপ্ত হয় কিন্তু আমাদের চিরাচরিত সংস্কারবুদ্ধি তার সীমা অতিক্রম করিতে চায় না। এই দুইয়ের সংঘাতে আমাদের সামাজিক মনে একটা সমস্যা একটা কঠোর জিজ্ঞাসা শরৎচন্দ্র জাগাইয়াছেন—তিনি বুদ্ধির মধ্যে জিজ্ঞাসা-মীমাংসার

সুযোগ আমাদের দেন নাই, সেইজন্যই তাঁহার যত আবেদন সমস্তই আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই। রমা-রমেশ, পার্ব্বতী-দেবদাস সতীশ-সাবিত্রী, ষোড়শী-জীবানন্দ—বুদ্ধি দিয়া সকল সময় ইহাদের সমর্থন হয় ত করিতে পারি না ; কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে তাহারা আসন বিছাইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই হৃদয়ের দ্বার দিয়াই শরৎচন্দ্র অপূর্ব দুঃসাহসের বলে বিধবার বুকে প্রেমের পদ্ম ফুটাইয়াছেন. পতিতাকে টানিয়া আনিয়া সমাজের মধ্যে তাহার প্রেমের আসন বিছাইয়া দিয়াছেন, আমরা যাহাকে চরিত্রহীন বলিয়া একপাশে ঠেলিয়া দিয়াছি তাহাকে তিনি আমাদেরই একজন করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, এবং যে-সমস্ত বিধি-নিষেধকে আমরা সত্য ও ধ্রুব বলিয়া একান্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছি সেগুলিকে অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন না করিয়াও তিনি একান্ত তুচ্ছ ও মিথ্যা বলিয়া একপাশে ঠেলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মানস-পুত্রকন্যারা কেহই সেসব বিধি-নিষেধকে অবজ্ঞা বা উল্লঙ্ঘন করে নাই, তাহার নীচে নিজদের বিসর্জ্জনই করিয়াছে, এবং বিসর্জ্জন করিয়াই দেখাইয়াছে, সেসব বিধি-নিষেধ কত ক্রূর, কত নিষ্ঠুর, কত নির্ম্মম এবং কত মিথ্যা।

বলিয়াছি, শরৎচন্দ্র বস্তুর রসকে কোথাও বিকৃত বা রূপান্তরিত করেন নাই। তবে কি শরৎচন্দ্র রিয়্যালিষ্ট, তবে কি শরৎচন্দ্র নব্য বস্তুতন্ত্র-সাহিত্যের গুরু? রসিকমাত্রই স্বীকার করিবেন, শরৎচন্দ্র রিয়্যালিষ্ট নহেন—বাঙলা নব্য বস্তুতন্ত্র-সাহিত্যের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধ অল্পই। রিয়্যালিষ্ট সাহিত্যের স্রষ্টা যাঁহারা, তাঁহারা বস্তুর রূপকে হুবহু তার বাস্তব রূপেই দেখাইয়া থাকেন, সে রূপের সঙ্গে তাঁহাদের আবেগ, অনুভূতি অথবা কল্পনা মিশাইয়া থাকে না। তাঁহারা বাস্তব জীবনের ফটোগ্রাফার—আর্টিষ্ট নহেন। শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবনের অবিকল ছবি আঁকিয়া আমাদের চোখের সম্মুখে ধরেন নাই—সে ছবিকে তিনি হৃদয়ের রক্তে রাঙাইয়াছেন, আবেগে তাহাকে কম্পিত করিয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি তাহাকে কল্পনানুভূতিতে রসপরিপ্লুত করিয়াছেন। গল্প-লেখক বা ঔপন্যাসিক যিনি, বস্তুকে লইয়া তাঁহাকে কারবার করিতেই হয়—এই বস্তুকেই এক একজন এক এক ভাবে রূপে রসে অভিব্যক্তি দান করেন। আমাদের কথা-সাহিত্য যে তিনটি নায়কের দানে সমৃদ্ধ, তাঁহাদের তিনজনই বস্তুকে এক এক বিশিষ্ট রূপে ও রসে ফুটাইতে চাহিয়াছেন। বঙ্কিম বাস্তবকে অবজ্ঞা করেন নাই, কিন্তু তাহাকে কতকটা এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার কল্পনা-লব্ধ একটা আদর্শের মধ্যে সেই বাস্তবকে রূপান্তরিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাস্তবকে কোথাও এড়াইবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার অপরূপ ভাব ও কল্পনার বলে বস্তুকে একটা ভাবলোকের মধ্যে বিস্তৃত করিয়া দিয়া তাহার রূপ একেবারে বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন, রিয়্যাল আর রিয়্যাল থাকে নাই। শরৎচন্দ্র তাঁহার বস্তুকে কোথাও কোনো আদর্শের সেবায় নিয়োজিত করেন নাই, কিম্বা তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া কোনো ভাবলোকের মধ্যে সমাপ্তি দান করেন নাই—তিনি বস্তুকে তাহার সমগ্র রিয়্যাল রূপে তাহার সমস্ত সমস্যার জটিলতার মধ্যেই রূপদান করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত হৃদয়াবেগ বস্তুকে ঠিক তাহার কল্পরূপে দেখিতে দেয় নাই, তাঁহার অপূর্ব্ব সহানুভূতি সকল দুঃখ-বেদনাকে গভীরতর নিবিড়তর করিয়া দেখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে বস্তুকে idealism দ্বারা রূপান্তরিত করিয়াছেন, শরৎচন্দ্র সেই বস্তুকেই তাঁহার emotion দ্বারা করিত পরিপ্লুত করিয়াছেন। তাঁহার উচ্ছ্বাস ও আবেগ এত বেশী যে বস্তুর ক্ষোভ ও জটিলতাকে, দুঃখ ও বেদনাকে আমরা সহজ ও স্বভাবতঃই বেশী করিয়া দেখি, আমাদের আবেগ ও কল্পনানুভূতি-দ্বারা রসাভিষিক্ত করিয়া দেখি। শরৎ-সাহিত্যের এই emotionalismই শরৎচন্দ্রকে Realist হইতে দেয় নাই।

আমি প্রথমেই এই কথা বলিয়াই আরম্ভ করিয়াছি যে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা আমাদের সমাজ ও পরিবারের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঠিক এই কারণেই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির পরিধি অনেকটা সংকীর্ণ। আমাদের সমাজ এবং পরিবারের ও সকল দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই—তিনি কয়েকটি বিশেষ দিকই দেখিয়াছেন। সেইজন্যই

তাঁহার উপন্যাসে ঘটনার আবর্ত্ত প্রায় একই রকমের এবং সৃষ্ট চরিত্রগুলির বৈচিত্র্য খুব কম। আমাদের যে দুঃখ ও বেদনাকে তিনি তার অপূর্ব্ব সহানুভূতি দ্বারা তাহার গভীরতার পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে দুঃখ-বেদনার স্বরূপও প্রায়ই একই। রমেশ-রমার দুঃখের সঙ্গে দেবদাস-পার্ব্বতী অথবা সতীশ-সাবিত্রীর দুঃখের তফাৎ খুব বেশী নয়—তাহাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি এক। তাহা ছাড়া চরিত্রগুলিও তাহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই—রমেশের জায়গায় সতীশকে বসাইয়া দিলে, কিম্বা সতীশের জায়গায় দেবদাসকে টানিয়া আনিলে ঘটনাবস্তুর অথবা রসসঞ্চারের কোনো বাধা বা ক্ষতি হইত না। এমন কি জীবানন্দ'র মধ্যে-ও সতীশ-দেবদাসের ছায়া পড়িয়াছে এবং ষোড়শীর চরিত্রে সাবিত্রীর। একটা বিশিষ্ট 'টাইপ' যেন ইহাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উৎস। জানি, নানান্ কারণে আমাদের বর্ত্তমান বাস্তব জীবন অত্যন্ত সংকীর্ণ, কিন্তু যে অপূর্ব্ব কল্পনা ও প্রতিভার বলে এবং সুতীক্ষ্ণ চিন্তা ও বুদ্ধির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ এই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বাস্তব জীবনের মধ্যে তাঁহার সৃষ্টির বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন, শরৎচন্দ্র এই জীবনের একটা দিককেই হৃদয়াবেগ দ্বারা একান্ত করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যসৃষ্টির অবকাশ পান নাই। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল প্রমাণ আছে তাঁহার সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলিতে। আমাদের সমাজের নারীদের একটা বিশেষ রূপ একটা বিশেষ শক্তিকেই তিনি দেখিয়াছেন —তাহা তাঁহাদের নির্ব্বাক হইয়া দুঃখ সহ্য করিবার অসীম শক্তি এবং সমস্তনিরপেক্ষ হইয়া তাহাদের হৃদয়ের একান্ত প্রেম ও ভালবাসা। নারীজীবনের এই দুইটি রূপই তাঁহাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছে; তিনি তাঁহার অন্নদা দিদির মধ্যেই এই দুইটি রূপ দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু অন্নদা দিদির মধ্যেই নয়, রমা'র মধ্যে, পার্ব্বতীর মধ্যে, সাবিত্রীর মধ্যে, ষোড়শীর মধ্যে, তাঁহার সমস্ত মানসকন্যাদের মধ্যে নারীর এই বিশেষ রূপটিই দেখিয়াছেন, এবং ইহাদের প্রত্যেককে এই বিশেষ রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। সেইজন্যেই শরৎচন্দ্রের মধ্যে সৃষ্টির বৈচিত্র্য আমরা দেখিলাম না, কিন্তু যাহা দেখিলাম যতটুকু দেখিলাম বারবার দেখিলাম এবং প্রত্যেকবারই অত্যন্ত গভীর অত্যন্ত নিবিড় করিয়া দেখিলাম।

আমার দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাস হইতে কোনো দৃষ্টান্তের উল্লেখ আমি করি নাই। তাহা—দত্তা; সকলের সঙ্গে মতে মিলিবে কি না জানি না, কিন্তু আমি মনে করি ইহাই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। শরৎচন্দ্র'র সকল সৃষ্টি হইতে দত্তা একটু পৃথক, বাস্তবা-ভিজ্ঞতায় পৃথক, চরিত্রসৃষ্টিতে পৃথক, ঘটনাসংস্থানে ও সমস্যার নূতনত্বে পৃথক। শুধু পৃথক নয়, অভিনবও বটে। তবু কিন্তু অভিনব হইলেই সার্থক সৃষ্টি না-ও হইতে পারে—কিন্তু 'দত্তা'কে সার্থক সৃষ্টি বলিতে আমার আনন্দ আছে। বিস্তৃত আলোচনা এখন করা সম্ভব নয়, কিন্তু হৃদয়াবেগের সঙ্গে বুদ্ধির, অনুভূতির সঙ্গে কল্পনার এবং বাস্তবের সঙ্গে ভাবের এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ শরৎচন্দ্রের আর একটি উপন্যাসে-ও নাই। চরিত্রগুলি আপনাপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল; বিলাস ও রাসবিহারী, নরেন ও বিজয়া, এমন্ কি দয়ালচন্দ্র পর্য্যন্ত প্রত্যেকে শরৎচন্দ্রের অন্যসকল সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেকেই তাঁহার তুলিকার অদ্ভুত ও অপরূপ রসসম্পাতে অভিষিক্ত। তাহাদের প্রত্যেকের আবেদন আমাদের হৃদয়ের কাছে যতখানি, বুদ্ধির কাছেও ততখানি বাস্তব অভিজ্ঞতায় তাহারা যতখানি সত্য কল্পনার প্রসারের মধ্যেও তাহারা ততখানি সার্থক। এমন logical ও consistent ঘটনাসংস্থানও (plot construction) অন্য কোনো উপন্যাসে নাই। শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় আর একটা দিক এই বইটিতে প্রকাশ পাইয়াছে এবং একমাত্র ইহারই মধ্যে emotional appeal'এর সঙ্গে intellectual appeal এক-সঙ্গে বাঁধা পড়িয়াছে।

শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—শ্রীকান্ত (১ম ও ২য় পর্ব্ব)। সৃষ্টির খুব নূতনত্ব ইহার মধ্যে না থাকিলেও কল্পনার যে ঐশ্বর্য্য ইহার মধ্যে আছে তাহার তুলনা তাঁহার আর কোনো উপন্যাসে নাই। শরৎচন্দ্রের বাস্তব জীবনের অনুভূতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুদূরবিসর্পী কল্পনা এই উপন্যাসটির মধ্যে হাতে হাত মিলাইয়াছে; তাঁহার

হৃদয়াবেগের সঙ্গে এই কল্পনার দীপ্তি মিশিয়া সমগ্র narrativeটির উপর একটি সুন্দর মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। দ্বিতীয় পর্ব্বে সাইক্লোনের বর্ণনায় এবং বিশেষ করিয়া প্রথম পর্ব্বে অন্ধকার রাত্রিতে শ্মশানের বর্ণনায় শরৎচন্দ্রের কল্পনা শরৎচন্দ্রকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে; শ্মশানের বর্ণনাটি তো ভাষায় ও ভঙ্গীতে ভাবে ও কল্পনায় একেবারে classic।

কিন্তু কোনো বইয়েরই বিস্তৃত আলোচনার সময় এখন নয়। আমি অতি সংক্ষেপে শরৎপ্রতিভার স্বরূপটি বুঝিতে চেষ্টা করিলাম মাত্র। তাহাও সকল কথা বলা হইল না—এক প্রবন্ধে তাহা বলা সম্ভবও নয়। তাঁহার সৃষ্টির রূপ ও প্রকৃতিটি শুধু আমি যেমন করিয়া বুঝিয়াছি তাহা আপনাদের কাছে নিবেদন করিলাম। আমার ঈর্ষ্যাপরায়ণা পুরাতত্ত্ব-প্রিয়ার সজাগ-দৃষ্টি হইতে যদি মাঝে মাঝে মুক্তি পাই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আপনাদের কাছে একটি একটি করিয়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির রসবিশ্লেষণ করিবার ইচ্ছা রহিল। *

* প্রেসিডেন্সী কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি'-তে পঠিত।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

সত্যাসত্য

—উপন্যাস—
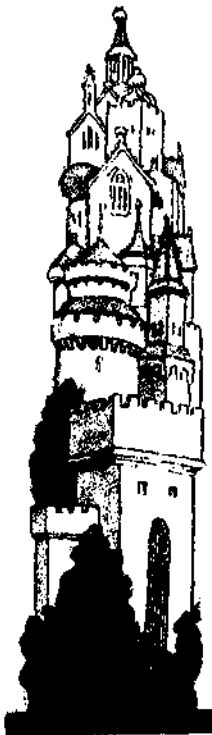
—শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

১৭

বাদলের ঘুম ভাঙিবার আগেই জাহাজ ভিড়িয়াছে। বাদল পোর্ট্‌হোলের ভিতর দিয়া দেখিল জাহাজ-ঘাট। জল ছলছলের বদলে জন-কলরব কানে আসিল। অশ্রুতপূর্ব্ব ফরাসীভাষা। অদৃষ্টপূর্ব্ব জনসঙ্ঘ। কুলি, দোভাষী, গাইড্, "money changer", যাত্রীদের ঘরের লোক বা বন্ধু।

অস্পৃষ্টপূর্ব্ব মাটি।

বাদলের জাহাজের টিকিট সমুদ্রপথে লণ্ডন পর্য্যন্ত। কিন্তু ইউরোপে পৌঁছিয়াও ইউরোপকে ছাড়া? বাদলের মন ধৈর্য্য মানিতেছিল না। চৌদ্দ পনেরো দিন জাহাজে থাকিয়া থাকিয়া তাহার ইচ্ছা করিতেছিল মাটিতে নামিয়া খুব খানিকটা ছুটাছুটি করে। তাহার চরণ যেন শৃঙ্খলের ভারে অবশ হইয়াছিল, মুক্তির সম্ভাবনায় অধীর হইল।

বাদল তৎক্ষণাৎ ঠিক করিয়া ফেলিল জিনিষপত্র সেই জাহাজে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিয়া মার্সেল্‌সে নামিয়া যাইবে। গোটাকয়েক দরকারী জিনিষ হাতব্যাগে পুরিতে তাহার পনেরো মিনিটও লাগিল না। ষ্টুয়ার্ডকে ডাকিয়া একটা পাউণ্ড্ ধরিয়া দিল—বখ্‌শিষ। পাসারের কাছে গিয়া ক্যাবিনট্রাঙ্কের চাবি বুঝাইয়া দিল, লণ্ডনের ঠিকানা লিখিয়া দিল। তারপর পাসপোর্ট দেখাইয়া তর-তর করিয়া নামিয়া যাইতেছে এমন সময় পিছন হইতে ডাক আসিল, "হ্যালো সেন।"

কুবেরভাই তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, "অত তাড়াতাড়ি কিসের? ট্রেন তো সেই সন্ধ্যা ছ'টায়।"

জাহাজে যে দুটি মানুষ এক ক্যাবিনে থাকিয়াও পর হইয়া পড়িয়াছিল মাটিতে তাহাদের ছাড়াছাড়ি আসন্ন বলিয়া বুক দুলিয়া উঠিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো তাহাদের মুখে বন্ধুতার হাসি।

"এসো তোমাকে কাষ্টমসের পরীক্ষা পাস করিয়ে দিই। মাশুল দেবার মতো কিছু আছে? সিগার, সিগ্‌রেট্, মদ, সুগন্ধি দ্রব্য—"

"ওসব নেই। পায়জামা, অন্তর্বাস্, ক্ষুর—"

"ক্ষুর!—বা রে ছেলে! দাড়ী নেই, তার ক্ষুর! দাড়ী কাট্‌বার, না, গলা কাট্‌বার?"

ফরাসী ফাক্‌তর (facteur) আসিয়া ছোঁ মারিয়া হাতব্যাগ লইয়া যাইতে চায়, ভাঙা ইংরেজীতে কী যে বলে! কুবেরভাই ও বাদল অতিকষ্টে তাহার হাত ছাড়াইয়া কাষ্টম্‌স-ঘরে পৌঁছায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, তবু মহাপ্রভুদের দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল না। এদিকে ফাক্‌তরদের সাহায্য যাহারা লইয়াছিল তাহারা পরে আসিয়া আগে বাহির হইয়া গেল। মিথিলেশ-কুমারী ও কিরণলাল বাদলের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না। আর সেই যে ইংরেজ মিসেস্ তাহার দুইটি হাত দুইটি পুরুষের কাঁধে। দেশের নিকটস্থ হইবার আনন্দে সে লাফ দিয়া আগাইয়া যাইতেছে। তাহার টান সাম্‌লাইতে না পারিয়া পুরুষ দুইটি পাল্লা দিতে বাধ্য হইতেছে। একটি বৃদ্ধ পার্শীকে একটি ফরাসী তরুণী অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে—ফরাসী সৌজন্যের রীতি-অনুসারে উহারা পরস্পরকে চুম্বন করিল।

অবশেষে কাষ্টমসের কর্ম্মচারী বাদলদের কাছে আসিয়া দুই একটা প্রশ্ন করিল ও জিনিষের উপর চক-খড়ির দাগ দিল। বাদলরা বাহির হইয়া আসিতেই সম্মুখে ট্যাক্সি। কুবেরভাই বাদলের দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিল। বাদল চাপিয়া বসিল। অগত্যা কুবেরভাইও।

বাদল কহিল, "কুকের দোকানে গিয়ে চেক ভাঙাতে হবে, টিকিট কিনতে হবে, তারি করতে হবে।"

এই ইউরোপ! থাক্, থাক্, রহিয়া-সহিয়া দেখিব,

শেষ করিয়া ফেলিতে চাহি না। বাদল একরকম চোখ বুজিয়াই থাকিল।

এখনো কুকের দোকান খোলে নাই। ব্রেকফাষ্ট খায় নাই বলিয়া বাদলের ক্ষুধাও লাগিয়াছে। বাদল বলিল, "চলো না একটা কাফেতে কিম্বা রেস্তোর্"াঁয়।"

কুবেরভাই খুব সকাল সকাল উঠিয়া জাহাজেই ব্রেকফাষ্ট খাইয়াছিল। সে হিসাবী লোক। বাদলের জন্ম petit dejeuner দিতে বলিয়া নিজে একগ্লাস দুধ লইয়া বসিল।

এই কাফে! এই মার্সেল্‌স্! এমনি কাফেতে La Marseillaise এর প্রথম-সামরব উঠিয়াছে! ফুটপাথের গা ঘেঁসিয়া ছোট ছোট টেবিল ও ছোট ছোট চেয়ার পাতা। মাথার উপর সামিয়ানার মতো। খাইতে খাইতে সমস্ত রাস্তাটার লোকচলাচল নিরীক্ষণ করা যায়। উহারাও তোমায় নিরীক্ষণ করিতে পারে। বাদলের লজ্জা করিতে লাগিল। প্রাইভেসীর নামগন্ধ নাই।

কুকের দোকানে চেক ভাঙানো ও তার করা গেল। ঘুমের সুবিধা হইবে ভাবিয়া বাদল কিনিল ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট। অগত্যা কুবেরভাইকেও তাহাই কিনিতে হইল। কিন্তু আপাতত কী করা যায়? হাতে অগাধ সময়। সাম্‌নে কুকের বাস্ দাঁড়াইয়া। সমুদ্রের কূল ধরিয়া ত্রিশ মাইল দূরে যাইবে ও সন্ধ্যার আগে ফিরিয়া আসিবে। বাদল চড়িয়া বসিল, অগত্যা কুবেরভাইও।

এই প্রোভেন্স্! এই প্রদেশেই ইউরোপের সহজিয়া কবিরা অদেহী প্রেমের গান গাহিয়াছে! কী মধুর হাওয়া! শরৎকালকে বসন্তকালের মতো করিয়াছে। একজন জোয়ান লোক জনকয়েক ছেলের সঙ্গে বাস্কেটবল খেলিতেছে।

বাদলদের বাস একটা হোটেলে থামিল। বাদলরা হাত-মুখ ধুইয়া লাঞ্চ্ খাইতে বসিল। যে-ঘরে বসিল সে ঘরের জানালা দিয়া তালীবন ও তালীবনের ভিতর দিয়া সমুদ্র দেখা যায়। আকাশ সূর্য্য-ভাস্বর, মেঘমালাহীন। সমুদ্র মন্ত্রমুগ্ধ, প্রশান্ত। ঘরের মধ্যে কাঁটা-চামচের ঝঙ্কনা উঠিতেছে, অগণন স্ত্রীপুরুষ মুখচালনা করিতেছেন। আহার ব্যাপারটা বাদলের চোখে বীভৎস ঠেকিল। হাতে ধরা, মুখে পোরা, চর্ব্বণ করা, গ্রাস করা— বাদল ভাবিল, আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যহ এই বর্ব্বরতা করিতেছি, না করিয়া পারি না। কিন্তু আয়নাতে নিজের আহারক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা কী বিশ্রী! এতগুলি মুখ যেন বাদলেরই মুখের আয়না।

কুবেরভাই নিরামিষ ছাড়া খায় না, কাজেই কিছুই খাইল না ফল ছাড়া। একঘর মানুষ তাহাদের দিকে খাওয়ার ফাঁকে আড়-চোখে তাকাইতেছে। বাদলের মুখে খাবার উঠিতেছে না। কিছুক্ষণ এইরূপ অস্বস্তির পর বাদল ও কুবেরভাই উভয়েই হঠাৎ স্থানত্যাগ করিল।

বাহিরে আসিয়া যে মেয়েটির কাছে টুপী রাখিতে দিয়াছিল তাহাকে বখ্‌শিস দিতেছে এমন সময় মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, "How is your country?" উচ্চারণটা ফরাসী-ফরাসী।

কুবেরভাই বলে, "ভালো আছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর নেই।"

"না গো না। H-o-w is your country? জাপান, না, চীন, না, ভারতবর্ষ—"

"ও! আমাদের দেশের নাম? ভারতবর্ষ।"

১৮

মার্সেল্‌সে ফিরিয়া বাদলরা ভাবিল, একটু বেশী করিয়া চা খাওয়া যাক্। এক দোভাষী আসিয়া জুটিল। সে কহিল, "চা খাবেন? আসুন, খুব ভালো জায়গায় নিয়ে যাই।"

অত্যন্ত নোংরা এক রেস্তোর্"াঁ। দুইটি স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসিল। দোভাষীর কথামতো কিছু চা, রুটি, কেক্ ও ফল আনিয়া দিল। বাদলের জন্মে অতিরিক্ত ডিম।

বাদলরা যখন দাম দিবার জন্ম উঠিল তখন দোভাষী কহিল, "ওরা চাইছে নব্বই ফ্রাঁ।"—প্রায় দশটাকা!

বাদলরা গুস্তীভূত। ঠকিবার একটা সীমা আছে। কুবেরভাই গজ-গজ করিতে লাগিল। বাদল খুসীই হইল। না ঠকাইলে মেয়ে দুইটি বাঁচে কেমন করিয়া? ইউরোপকে কিছুতেই দোষ দিবে না, সকল অবস্থায় দরদ দিবে, এই তাহার পণ। ঠকিয়া বাদল খুসী হইল—যেন প্রিয়জনের কাছে ঠকা।

বাদল একখানা একশো ফ্রাঁ নোট বাড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। পথে কুবেরভাই কহিল, "আমরা ঠিক কতখানি ঠকেছি তার একটা হিসাব করছিলুম। কম্‌সে কম পঞ্চাশ ফ্রাঁ।"

বাদল শুধু কহিল, "আমরা নয়, আমি। তোমাকে কিছু দিতে হবে না ভাই।" বাদল তাহার মনের আনন্দ গোপন করিল। প্রিয়জনকে পঞ্চাশ ফ্রাঁ উপহার দিয়াছে—প্রথম দিনেই!

ষ্টেশনে আসিয়া দেখে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। ফার্ষ্ট ক্লাসে প্রত্যেকটি জায়গা রিজার্ভ করা। অনেক খুঁজিয়া দেখা গেল দুইটি জায়গা খালি। জায়গা মানে বসিবার জায়গা। হাত পা ছড়াইয়া শুইবার জো নাই। বাদলের কান্না পাইল। অনিদ্রারোগীর অনিদ্রাকে বড় ভয়।

গাড়ী চলিলে বোঝা গেল বাদলের পাশের জায়গাটির মালিক গাড়ীতে উঠেন নাই। বাদল বিনা-বাক্যব্যয়ে পা ছড়াইয়া দিয়া জায়গাটি দখল করিল। সবটা শরীর আঁটে না—তবু যথালাভ।

অন্ধকার রাত্রি। দিব্য শীত। বাদল ভাবিয়াছিল ট্রেনে কম্বল ভাড়া পাওয়া যাইবে, বালিশও। পাওয়া যায় নাই। কুবেরভাই তাহার অবস্থা অনুমান করিয়া শুধাইল, "আমার কম্বলটা দেবো?"

"তোমার লাগবে না?"

"আমি তো ব'সে ব'সেই ঘুমোবো। ওভারকোটই যথেষ্ট।"

এই বলিয়া নিজের কম্বলটা বাদলের উপর চাপাইয়া দিল। যে কোন দুইটা জায়গার মাঝখানে হাত রাখিবার বেড়া থাকে। বাদলের জায়গা ও তাহার পার্শ্ববর্তিনীর জায়গার মাঝখানে যে গদীমোড়া বেড়াটি ছিল বাদল উহার উপর মাথা রাখিল।

শীতের ভয়ে জানালা-দরজা বন্ধ। অন্ধকার রাত্রিতে দেখাও যায় না দুইধারের দৃশ্য। বাদলের জাহাজের একটি ইংরেজ বাদলের কামরায় যাইতেছে। এতদিন সে বাদলের সঙ্গে কথা কহে নাই। আজ সে গায়ে পড়িয়া এমন আত্মীয়তা আরম্ভ করিয়াছে যে বাদল কুবেরভাইয়ের উপর তাহাকে লেলাইয়া দিয়া চোখ বুজিয়াছে। বাদল শুনিয়াছিল ভারতবর্ষীয় ইংরেজেরা সুয়েজ পার হইলেই ভারতীয়দের ভারি হিতৈষী হইয়া উঠে এবং ইংলণ্ডে পৌঁছিলে তো কতকালের বন্ধু বনিয়া যায়। বাদল ইংলণ্ডে গিয়া ইংলণ্ডকেই সমস্তক্ষণ চিনিতে শুনিতে পায়, ভারতবর্ষকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে চায় না। ঠিক করিয়াছে ভারতীয়দের সঙ্গে যথাসম্ভব মিশিবে না; ভারতবর্ষীয় ইংরেজের সঙ্গেও না।

এমন কি সুধীদা'কেও দূরে রাখিবে। কী করা যায়—কর্ত্তব্য! তা ছাড়া এই কয়েক সপ্তাহ সুধীদা'কে ছাড়িয়া থাকিবার ফলে সুধীদা'র টান শিথিল হইয়া গেছে। একবার মা'কে ছাড়িয়া থাকিলে শিশু মা'কে চিনিতে পারে না। ভাঙা স্নেহ, ভাঙা প্রেম, ভাঙা বন্ধুতা জোড়া লাগে না। বাদল একথা মানিতে চাহিল না, কর্ত্তব্যের দোহাই দিল। কিন্তু সে কেবল মনকে চোখ-ঠারা।

হয় তো ঘুম আসিয়াছিল, হয় তো তন্দ্রা। হঠাৎ একসময় বাদলের মনে হইল কে যেন তাহার মাথার কাছে মাথা রাখিয়াছে। কাহার মাথার চুল যেন তাহার কপাল ছুঁইতেছে। বাদল উঠিয়া বসিয়া দেখিল কামরা অন্ধকার। বারাণ্ডার আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে—কুবেরভাই বুকের উপর দুই বাহু বাঁধিয়া দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে; ভারতবর্ষীয় ইংরেজটি পায়ের উপর পা রাখিয়া তাহার উপর হাত রাখিয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে; আর একটি পুরুষ—সেও ঘুমন্ত। বাদলের পাশের মহিলাটি বাদল যেখানে মাথা রাখিয়াছিল সেইখান ঘেঁষিয়া একটি বালিশ পাতিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রা যাইতেছে।

ফ্রান্সের মধ্যভাগ দিয়া ট্রেন ছুটিতেছে। অন্ধকার নিশীথ। জনপ্রাণীর শব্দ নাই। ঘুমন্ত পুরীতে সেই একা

প্রহরী জাগিয়া, তাহার একান্ত নিকটে নিদ্রিতা নারী। বাদল কিছুক্ষণ ঝিমাইল। তারপরে বালিশের একাংশ বে-দখল করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

পাশাপাশি দুইটি অপরিচিত মাথা কিন্তু উল্টা-পাল্টা।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখে তাহার উঠিবার আগে অন্যেরা উঠিয়াছে। মহিলাটি বালিশ তুলিয়া লন নাই, বাদলকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কুবেরভাই ইংরেজটির সঙ্গে ও মহিলাটি ফরাসীটির সঙ্গে গল্পে মগ্ন। বাদলকে উঠিতে দেখিয়া প্রত্যেকের চোখ তাহার উপর পড়িল।

কুবেরভাই কহিল, "কেমন ঘুম হলো হে?"

"বেশ ঘুম। ধন্যবাদ।"

"এবার মুখ-হাত ধুয়ে এসো। দাড়ী থাকলে সাবধানে কেটো—গাড়ী ভয়ঙ্কর দুলছে। দাড়ী ক'ষে গাল কিম্বা গলা কেটে বোসো না।"

ইংরেজটি বলিল, "প্যারিস এলো বলে। দেরি করবেন না।"

বাদল জানালা খোলা দেখিয়া জানালার ধারে বসিল। ছোট ছোট নদী, বিরলবসতি গ্রাম, পাহাড়ের পিঠেও চাষের জমি, সম্ভবত দ্রাক্ষার আবাদ।

এই ফ্রান্স!

একটু পরেই প্যারিস্ আসিতেছে। প্যারিস্! কত-কালের কল্পনা এতদিনে শরীরী হইবে। পাছে কখন প্যারিস্ আসিয়া পড়ে এই ভাবিয়া বাদল জানালা ছাড়িল না।

কুবেরভাই বলিল, "যাও না কেন, মুখ-হাত ধুয়ে এসো। Gare de Lyonএতে গাড়ী কিছুক্ষণ থামবে, ষ্টেশনে রেস্তো-রাঁতে গিয়ে petit dejeuner খাওয়া দরকার। কাল রাত্রে কিছু খাওয়া হয় নি।"

তাই তো! বাদল চট্ করিয়া গেল ও আসিল। ইতি-মধ্যে প্যারিস্ আসিয়া পলাইয়া যায় নাই। তাহার বুকের ঢিপ-ঢিপানি কমিল।

১৯

Gare de Lyon—প্যারিসের দক্ষিণদুয়ারী ষ্টেশন। কাকতয়দের ছুটোছুটি। সকলের নামিয়া পড়া। অন্যান্য প্লাটফরমে ট্রেনের যাওয়া-আসা, এঞ্জিনের শান্টিং। গাইড, দোভাষী ইত্যাদির উপস্থিতি।

বাদলেরা খবরের কাগজের ষ্টলের কাছ দিয়া রেস্তোরাঁয় যাইবার সময় খানকয়েক ইংরাজী কাগজ কিনিল। বাদল লক্ষ্য করিল, ধনগোপাল মুখার্জির একখানা ইংরেজী বইএর ফরাসী-অনুবাদ রহিয়াছে। কয়েক বছর পরে বাদলচন্দ্র সেনের ইংরেজী বইএর ফরাসী অনুবাদ রহিবে না কি?

পরিবেশকের দেরীর দরুন চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিতে না তুলিতেই গাড়ীর সময় হইয়া গেল। যাহা হাতের কাছে পাইল তাহাই গুলিয়া দিয়া বাদলরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

প্যারিসের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিয়াছে। ইংরেজটি দেখাইয়া দিতেছে:—ঐ Notre dame; ঐ Sacre cœur; ঐ Eiffel Tower। বাদলের বড় আপশোষ থাকিয়া গেল, প্যারিসের ভিতরে আসিয়াও প্যারিসে নামিতে পারিল না।

রেস্তোরাঁ-কারের লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "dejeuner চাই? প্রথম দলে, না, দ্বিতীয়?"

বাদলরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। ক্ষুধা উভয়েরই লাগিয়াছে। উভয়ে একবাক্যে কহিল, "প্রথম দলে।" লোকটি প্রথম দলের প্রবেশ-টিকিট দিয়া গেল।

গাড়ী বায়ুবেগে ছুটিয়াছে। ফ্রান্সের ট্রেন হাল্কা ও ভূমি মোটের উপর সমতল। বাদল দুইধারের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। প্রধানত চাষের জমি। উজ্জ্বল সবুজ ঘাস। ঝর্ণা। ঝোপ। নামমাত্র পাহাড়। মাঝে মাঝে নতুন-গড়া বাড়ী। বিজ্ঞাপনের ফলক।

প্রথমবারের ঘণ্টা বাজিল। বাদলরা বারান্দা দিয়া যাইবার সময় বারবার টলিয়া পড়িতে লাগিল। খাইবার গাড়ীতে পৌঁছিলে একজন লোক তাহাদের একটি ছোট টেবিলের দুই পাশে বসাইয়া দিল। টেবিলটি সর্বক্ষণ কম্পমান। গাড়ী বায়ুবেগে ছুটিয়াছে। ক্যালে না পৌঁছিয়া থামিবে না।

নিরামিষাশীর পদে পদে অসুবিধা। কুবেরভাইয়ের খাইবার মতো কিছু জুটিল না। এক জুটিল আঙুর।

বাদলের পান করিবার মতো কিছু জুটিল না, এক জুটিল mineral water (সোডা)। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা লইয়া দুই বন্ধু কামরায় ফিরিল।

ক্যালে। সমুদ্রকে বাদল ইতিমধ্যেই ভুলিয়াছিল। আবার সমুদ্র দেখা দিতেছে। ট্রেন থামিল ও যাত্রীরা নামিল। ফাকৃতর! ফাকৃতর! বাদলরা এবার ফাকৃতরের কবল হইতে বাঁচিল না। জিনিষগুলি লইয়া ফাকৃতর যে ভিড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল—বাদলরা চিন্তিত হইয়া জাহাজে উঠিল।

জাহাজে উঠিয়া দেখে ডেক্-চেয়ার ভাড়া করিয়া খোলা ডেকের উপর অনেক লোক বসিয়া গেছে। বন্ধ ডেকের বেঞ্চিতে বাদলরা জায়গা করিয়া লইল। কিন্তু কোথায় ফাকৃতর? জাহাজ ছাড়ে-ছাড়ে, এমন সময় ফাকৃতর মশাই একগাল হাসিয়া মাল-সমেত উপস্থিত। "আপনাদের কোথায় না খুঁজেছি? সেকেণ্ড্ ক্লাস্, ফার্ষ্ট ক্লাস্, নীচের ডেক, উপরের ডেক।"—বলিয়া হাত পাতিল।

মজুরি পাইলেও ছাড়িবার পাত্র নয়। বখ্শিষ চায়। রসিক লোক। আশাতিরিক্ত পাইয়া কপালে হাত ঠেকাইল—"বঁ জুর, মেসিয় (Messieurs)।"

"গুড্ মর্ণিং।"

নাঃ! ফরাসী ভাষাটা না শিখিলে নয়। লণ্ডনে পৌঁছিয়াই আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাইবে।—"কি বলো হে কুবেরভাই?"

"কি বলছো, সেন?"

"ফরাসী ভাষাটা জানতে না ব'লে নিরামিষ চাইতে পারলে না—যদিও চাইলেও পেতে না। ফরাসী শিখবে?"

"নাঃ। আমাকে আবার Swahili না কী একটা কাফ্রিভাষা শিখতে হবে পূর্ব্বআফ্রিকার। একসঙ্গে ক'টা ভাষা শেখা যায়?"

"অনেক। আমি তো ভাবছি জার্ম্মানটাও শিখবো, ইটালিয়ানটাও। গ্যেটে আর ডান্টেকে তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় পড়তে হবে।"

"তুমি বুঝি কবি?"

"না, কবি নয়। আমি হ'চ্ছি যাকে বলে Humanist। এজন্যে অবশ্য অক্সফোর্ড যাবার কথা। কিন্তু বাবাকে তাঁর এক ইংরেজ মুরুব্বি ভজিয়েছে—কেম্ব্রিজের মতো জায়গা নেই।"

"তা হ'লে কেম্ব্রিজেই চলেছ?"

"না হে, আমি তো আমার বাবা নই! লণ্ডনেই থেকে যাবো। সবরকম মানুষের সঙ্গে মিশতে চাই, সব আন্দোলনের ভিতরের খবর জানতে চাই, শুধু বই-কাগজ ঘেঁটে বাছা-বাছা যুক্তি মুখস্থ ক'রে সময়ে-অসময়ে উদগার করতে আমার প্রবৃত্তি হবে না। ছাত্রাবস্থাটা তা'ই করেছি,—আর আমার ছাত্র থাকতে মন সরে না। নামমাত্র ছাত্র থাকতে হবে বৈ কি, কিন্তু সেটা কেবল বাবার দুর্ভাবনা দূর করতে।"

ইতিমধ্যে জাহাজ চলিতে সুরু করিয়াছে। মেঘলা দিন। ঠাণ্ডা হাওয়া। বর্ষাও টিপ্ টিপ্ পড়িতেছে। বাদলকে কাঁপিতে দেখিয়া কুবেরভাই তাহার গায়ে আবার নিজের কম্বল জড়াইয়া দিল। বেচারা বাদল! তাহার ছেলেমানুষের মতো চেহারা দেখিয়া তাহার উপর সকলের মায়া হয়। হাসিও পায় তাহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া।

ইংলিশ চ্যানেলটুকু একঘণ্টার পথ। গারট্রুড্ ইডার্ল্ সাঁতরাইয়া পার হইয়াছে। কিন্তু জাহাজে করিয়া পার হইতে গিয়া বাদল যত কষ্ট পাইল গত দুই সপ্তাহের সমুদ্রযাত্রায় তত পায় নাই। সকলের সামনে তাহার বারবার বমি হইয়া গেল,—লজ্জায় মাথা কাটা যায়! তাহার টুপি উড়িয়া গেল, চুল সজারুর মতো হইল, মুখ অপরিষ্কার, পোষাক নোংরা। মুখের নিকট হইতে পেট যাহা কিছু ধার করিয়াছিল কাবুলীর হারে সুদশুদ্ধ ফিরাইয়া দিল। মাথা ভারি, চক্ষু লাল, গা ঝিম-ঝিম।

কুবেরভাইও উপবাসের দরুন দুর্ব্বল। বাদলকে নামাইয়া নীচে লইয়া যাইতে পারে না। বেঞ্চির উপর জায়গা করিয়া শোয়াইয়া দেয়। বলে, "আর দেরি নেই, ইংলণ্ড দেখা যাইতেছে।"

বাদল লাফ দিয়া উঠিয়া বসিতে যায়। "White chalk cliffs of Dover! কই দেখি?"

দূর দিগ্বলয়ে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল—পাহাড় নয়, একরাশ বাড়ী। বাদল মনে মনে ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত করিল। ব্রিটানিয়ার একখানি কর লইয়া করতলে চুম্বন করিল। মনে মনে বলিল, আজি হইতে আমি তোমার অতিথি। আতিথ্যের অসম্মান করিব না।

২০

ফরাসী ফাক্তরদের মতো শুঁকো থেঁকশেয়ালী নয়—। ইংরেজ পোর্টাররা ধন্ডা, গোঁফদাড়ী-কামানো, নীরব-স্বভাব। ডোভারে এত মানুষ নামিল, এত পোর্টার ছুটিল, কিন্তু মার্সেল্‌স্ ও প্যারিসের সিকি-পরিমাণ গোলমাল নাই।

"আপনার জিনিষ নামিয়ে নেবো, স্যর ?"

"নাও।"

ইংরেজ পোর্টার ভারতীয়ের মতো বিনয়ী, অথচ ভারতীয়ের মতো জড়সড় নয়। ইংরেজ পোর্টার সমকক্ষের মতো সম্বোধন করে না, সমকক্ষের মতো সম্বোধন প্রত্যাশা করে না—ফরাসীর সঙ্গে তাহার এইখানে তফাৎ। তাহা সত্ত্বেও তাহার চেহারায় আত্ম-সম্মানের ভাব সুপরিস্ফুট।

পাসপোর্ট ও কাষ্টম্‌সের ঝুঁকি পোহাইয়া বাদলরা বোট-ট্রেণে চড়িয়া বসিল। ফার্ষ্ট ক্লাসে কেহ নাই বলিলেও চলে, কেবল তাহারা দুইটি ভারতীয় মহারাজা! পোর্টারকে দুইটা সুটকেসের জন্য দুইটা শিলিং ফেলিয়া দিতেই সে টুপিটাকে বেশীরকম উঠাইয়া ধন্যবাদ ও শুভ-সন্ধ্যা জানাইয়া গেল।

বাদলের মন উড়ু উড়ু। কখন লণ্ডনে পৌঁছাইবে? সুধীদা লইতে আসিবে কি না? না আসিলে ট্যাক্সি করিতে হইবে। ভিক্টোরিয়া হইতে হেন্‌ডন কতদূর? বেশ একটু ক্ষুধা পাইয়া গেছে! প্ল্যাটফর্মে গিয়া চা খাইয়া আসিলে কেমন হয়?

প্রস্তাব শুনিয়া কুবেরভাই কহিল, "বেশ হয় তবে তোমাকে টাকা বা'র ক'রে দিতে হবে না, খাসো। তুমি আমাকে কতবার খাইয়েছ।"—দুইজনে গিয়া চা ও কেক খাইয়া আসিল হাতে করিয়া আনিল কিছু কলা ও আপেল।

ট্রেন চলিলে দেখা গেল আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেছে। সূর্য্যাস্তের আভা ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে। কুবেরভাই একখানা সান্ধ্য সংবাদপত্রে মন দিল। বাদল মন দিল দুই পার্শ্বের দৃশ্যে।

পর পর অনেকগুলো সুড়ঙ্গ। চকখড়ির পাহাড় সাদা নয়, দিব্য সবুজ। সর্ব্বত্র ঘাসের রাজত্ব; মাঠে ঘাস, পাহাড়ে ঘাস, অসমতল মাটির উপর ঘাসের ঢেউ ভাঙিয়া পড়িতেছে। কোনো দুইহাত জমি সমান উঁচু বা নীচু নয়; সমান উঁচু-নীচু।

কত ছোট ছোট শহরের ছোট ছোট ষ্টেশন ছাড়াইয়া ট্রেন একদৌড়ে ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছিল। তখনও গোধূলির আভা আছে। ইংলণ্ডের গোধূলি দীর্ঘতর।

বাদল জানালা দিয়া মাথা গলাইয়া দুইদিকে চাহিল। অমনি দেখিল—সুধীদা সেকেণ্ড ক্লাসে তাহার খোঁজ করিতেছে।

বাদলের মন উল্লাসে অধৈর্য্য হইল। ভব্যতার মাথা খাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "সুধীদা—আ—।"

সুধী ও তাহার সঙ্গে কে একটি ভারতীয় যুবক পিছু ফিরিয়া দেখিল—বাঁদরটা ফার্ষ্ট ক্লাসে। দুইজনে হাসাহাসি করিতে করিতে বাদলের কামরায় যখন উপস্থিত হইল বাদল তখন কুবেরভাইয়ের সঙ্গে করমর্দ্দন করিতেছে।

চট্ করিয়া নামিয়া পড়িয়া আর-একদফা করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া দিতেই সুধী তাহাকে একরকম বুকের উপর লইয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ দুইজনেরই বাক্‌রোধ। ইতিমধ্যে নূতন ভারতীয়টি বাদলের সুটকেসটি হাতে করিয়া শুধাইতেছে, "এই—না, আর আছে?"

বাদলকে সুধী তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। "ইনিই বাঁদর, আর ইনি কুমারকৃষ্ণ দে সরকার।"

করমর্দ্দন-পর্ব্ব শেষ হইলে প্ল্যাটফর্ম দিয়া চলিতে চলিতে দে সরকার কহিল, "দেখুন, মিষ্টার সেন, আমার এখানে দু'রকম পরিচয় আছে। ইণ্ডিয়ানরা জানে আমি কুমার কে ডি সরকার, নিশ্চয়ই জমিদারের ছেলে। আর

ইংরেজরা জানে আমি মঁসিয় ড সরকার।”—এই বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বাদল হাসিয়া বলিল, “দুটো পরিচয়ই সমান এ্যারিষ্ট-ক্র্যাটিক।”

সুধী বলিল, “এখন সমস্যা হ’চ্ছে ট্যাক্সি করা যাবে, না, টিউবে ক’রে যাওয়া যাবে? হেন্‌ডন অবধি ট্যাক্সি করলে অন্ততঃ দশ শিলিং লাগে। আর বাদল যে-রকম চেহারা নিয়ে এসেছে টিউবে চড়্‌লে মূর্চ্ছা যাবে।”

ট্যাক্সিই করা গেল। দে সরকার কহিল, “আজকের মতো বিদায় হই, ভাই চক্রবর্ত্তী আর সেন।”

বাদল শুধাইল, “কেন, আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন না?”

“আমি? কুমার বাহাদুর থাকবেন Suburbiaয়? এত-বড় অপমান? কেন, Mayfair কি নেই? Belgraviaয় স্থানাভাব?”—সুরটা নামাইয়া কারুণ্যের সহিত কহিল, “আমি ব্লুম্‌সবেরীতে থাকি, ভাই।”

২১

লণ্ডন! গোধূলির পর অন্ধকার নামিতেছে। অসংখ্য আলোকের টুকরা আকাশে ও মাটিতে। রাস্তার পর রাস্তা ডাইনে ও বামে, সম্মুখে ও পিছনে রাখিয়া ট্যাক্সি ছুটিয়াছে। বাদলের সাধ্য কী যে চিনিয়া রাখে। সত্য-সত্যই সে লণ্ডনে পৌঁছিয়াছে—তাহার আবাল্যের অলকা, অমরাবতী লণ্ডন! কোন্ শহরকেই বা এত ভালো করিয়া চেনে! সেই রোমান যুগ, স্যাক্সন যুগ, নর্ম্মান যুগ, ডিক হুইটিংটন, টাওয়ার অব্ লণ্ডন, মারমেড ট্যাভার্ন, নেল গুইন, ডাক্তার জনসন, ক্রাইষ্টস হসপিটাল, Sam Wekes, সোহো ······ক্রমান্বয়ে কত স্মৃতি যে তাহার মনের পর্দ্দার উপর বায়স্কোপের ছবির মতো উদয় হইবামাত্র অস্ত গেল। বাদল ভাবিল—পূর্ব্বজন্ম হয় তো মিথ্যা নয়।

সুধী একটিও কথা কহিতেছিল না। তাহার হৃদয় কানায়-কানায় পূর্ণ। পূর্ণকলসের শব্দ নাই। কেবল ড্রাইভার যখন হেন্‌ডনের কোন্ রাস্তায় যাইবে জিজ্ঞাসা করিল, সুধী বলিল, “টেম্‌পারটন ড্রাইভ।”

ট্যাক্সি থামিতেই বাড়ীর দরজা খুলিয়া গেল। দেখা গেল একটি পাঁচ-ছয় বছর বয়সের মেয়ে একটি ষোলো-সতেরো বছর বয়সের মেয়ের হাত ধরিয়া ও গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ট্যাক্সিকে বিদায় করিয়া সুধী ও বাদল বাগানের গেট বন্ধ করিল এবং বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সুধী কহিল, “কি রে মার্সেল, তুই এখনো ঘুমোতে যাস্‌নি?”

সুজেৎ (Suzette) সলজ্জভাবে কহিল, “আপনার বন্ধুকে দেখবে ব’লে বায়না ধরলে। বিছানায় কিছুতেই থাকতে চাইলে না।”

সুধী ও বাদল পা-পোষে জুতা মুছিয়া হ্যাট ও কোট রাখিবার ষ্ট্যাণ্ডে হ্যাট রাখিল। তখন সুধী কহিল, “পরিচয় করিয়ে দিই। মিষ্টার সেন, ম্যাদমোয়াজেল সুজেৎ—।”

যথারীতি অভিবাদন ইত্যাদি।

“আর ইটি হলো আমাদের ছোট্ট মার্সেল, লক্ষ্মী মার্সেল, Jolie petite Marcelle।”

মার্সেল মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। “না, petite না।”

তখন সুধী হাসিয়া কহিল, “তবে আমার ভুল হ’য়েছে। Jolie Grande Marcelle”—এই বলিয়া মার্সেলকে দুই হাতে তুলিয়া উঁচু করিয়া ধরিল।—“ইস্, আমার চেয়েও লম্বা! সুজেতের চেয়ে, বাদলের চেয়ে, সকলের চেয়ে মার্সেল লম্বা।”

বাদলের মনে খট্‌কা বাধিল—বাধিবার সময় বটে! সুধীর কানে কানে কহিল, “সুধীদা, মার্সেল নামটা মেয়েদেরও হয়?”

“উচ্চারণ একই। বানান আলাদা। স্ত্রীলিঙ্গে দুটো এল, শেষে ই।”

বাদলকে লইয়া সুধী উপরতলায় যাইবার সময় সুজেৎকে কহিল, “তোমার মা’কে বোলো আমরা হাত-মুখ ধুয়ে আসছি। আর মার্সেলকে ঘুম-পাড়াতে দেরী কোরো না।”

বাদলের ঘর। একখানা লোহার খাটে বিছানা তৈরি, একটা পড়িবার টেবিলের উপর ফুলদানী ও ফুল। একটা হাত-মুখ ধুইবার টেবিলের উপর চীনামাটির কুঁজো ও বেসিন,

একটা আয়না-লাগানো আল্‌মারি। অগ্নিস্থালীতে বাদল আসিবে বলিয়া কয়লা জমা হইয়াছে।

সুধী বলিল, "লণ্ডনে শীত এখনো পড়েনি। তবু তোর যদি দরকার হয় সুজেৎ কিম্বা আমি কয়লায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে যাবো। এখন ভাখ্‌, তো গরম জল দরকার হবে কি না।"

বাদল জলে হাত দিয়া কহিল, "ঠাণ্ডা জলেই চল্‌বে।"

তাহার মুখ-হাত ধোয়া হইয়া গেল সুধী তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেল। একই আকারের একই রকম ঘর—কেবল ওয়াল-পেপারের নক্সা আলাদা। এবং পড়িবার টেবিলের উপর পরিপাটি করিয়া সাজানো বই ও পত্রিকা।

দেখি দেখি, কী বই কিনেছ?—ওঃ, Spenglerএর সেই বইখানা। 'Decay of the West'! বাজেকথা, ইউরোপের কখনো বার্দ্ধক্য আস্‌তে পারে?—ইউরো° চিরযৌবন!"

"পাছে বাহিরটা দেখে মোহাবিষ্ট হই, সেই ভয়েই তে এই মোহমুদ্গর আনানো। কিন্তু কিনিনি বাদল, Mudie লাইব্রেরীতে চাঁদা দিয়ে ধার করেছি।"

"ওঃ! হাউ ক্লেভার! আমাকে মেম্বার করিয়ে দেবে সুধীদা?"

"তুই চল্‌। খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হ, বিশ্রাম কর্‌ Mudie তো পালিয়ে যাচ্ছে না, তুই ও কয়েক বছর থাক্‌ছিস।"

বাদল স্পেংলার-খানাকে বগলদাবা করিয়া খাইবার ঘরে চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়
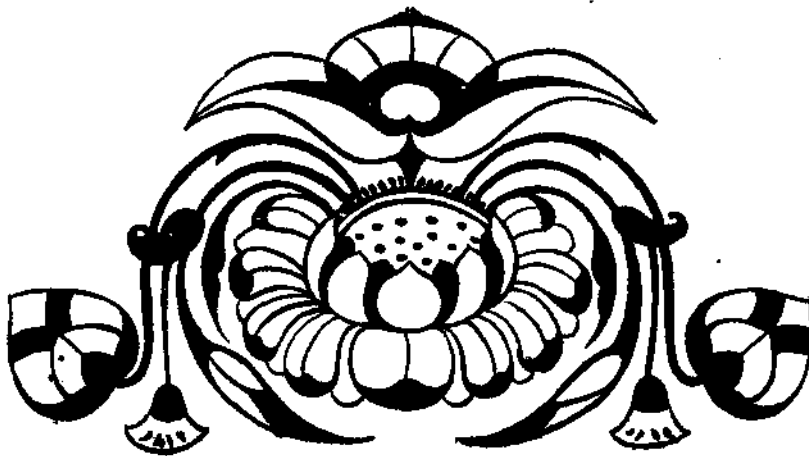
বিলাতে বাঙ্গালী শিল্পী

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নায়কতায় বাঙ্গলাদেশে এক নূতন পর্য্যায়ের নবীন শিল্পীর দল গড়িয়া উঠিয়াছেন, এবং তাঁহারা যে ভারতে শিল্প-জগতে একটি নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলা মাসিকের পাঠকদের অবিদিত নাই। গত দুই চার বৎসরের মধ্যে ঠাকুর মহাশয়ের দুই তিন জন ছাত্র ক্রমে ক্রমে প্রাদেশিক সরকারী আর্ট-স্কুলের অধ্যক্ষের পদে বৃত হওয়ায় একটা নূতন "রাজ-নীতি"র সৃষ্টি হইয়াছে। এই আর্ট-স্কুলের অধ্যক্ষের পদ-গুলি পূর্ব্বে বিলাতে শিক্ষিত ইংরাজী শিক্ষকদের 'একচেটিয়া' ছিল। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের লক্ষ্ণৌ-স্কুলের অধ্যক্ষতায় প্রথম নিয়োগে সরকারী শিক্ষাবিভাগে একটা নূতন নীতি প্রচলিত হইয়াছে সেটি এই,—বিলাতে শিক্ষিত না হইলেও ভারতের শিল্পী এইরূপ শিক্ষকতার কার্য্যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এবং সম্ভবত ভারতে শিক্ষিত প্রতিভাবান ভারতীয় শিল্পী বিলাত হইতে আনীত South Kensingtonএ শিক্ষিত ইংরাজ-শিক্ষক হইতে কোনও অংশে হীন নহে। ইতিমধ্যে Wembleyর প্রদর্শনীতে ভারতীয় নবীন চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনাদির আলোচনায় আর একটা দাবীর সূত্রপাত হইয়াছিল যে, বিলাতের নূতন "ভারত-ভবন" (India House) ও নূতন দিল্লীর ইংরাজী "দেওয়ান-ই-আম" ও "দেওয়ান-ই-খাস" প্রভৃতি সৌধমালার ভূষণ ও অলঙ্কারের ভার সুযোগ্য ভারত-শিল্পীর উপর দেওয়া কর্ত্তব্য। এই কার্য্যের ভার উপযুক্ত ভারত-শিল্পীর হাতে দেবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটী গঠন করিয়া বিলাতের "ভারত-ভবন" ভূষণের জন্য চারজন শিল্পীকে মনোনীত করিয়া সরকারী খরচায় বিলাত পাঠাইয়াছেন। বাঙ্গলার গৌরবের কথা যে, মনোনীত চারটি শিল্পীই বাঙ্গালী। যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন তাঁহাদের এই সর্ত্তে বিলাত পাঠান হইয়াছে যে, তাঁহারা South Kensington Schoolএর Principal, Professor W. Rothenstien সাহেবের শিক্ষকতায় কিছুদিন থাকিবেন, পরে ইতালীতে যাইয়া সেখানকার প্রাচীর চিত্রের (fresco-painting) অনুশীলন করিয়া যোগ্যতা অর্জ্জন করিলে, পরে India Houseএর দেওয়াল চিত্র করিবার ভার পাইবেন। এই সর্ত্তের মূলে অনেকে একটু কূট রাজনীতির গন্ধ পাইয়াছেন সেটি এই যে, ভারতের শিল্পী ভারতে যতই যোগ্যতার খ্যাতিলাভ করুন না কেন, বিলাতে কোনও উচ্চ কার্য্যে হাত লাগাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে খাস বিলাতী গুরুর কাছে কিছুকাল শিষ্যত্ব না করিলে তাঁহার শিল্প সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে একথা স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং Rothenstien সাহেবের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কোনও ভারতীয় শিল্পী 'জাতে' উঠিতে পারেন না।

একাধিক দিক দিয়া কথাটার বিচার করা যায়। প্রথমটা এই যে, সম্ভবত এই যুক্তির মূলে কিছু Imperialistic সাম্রাজ্যবাদী মুরুব্বীয়ানা থাকিতে পারে, যাহার ফলে ভারতের শিল্পী খুব উচ্চ-প্রতিভার পরিচয় দিলেও, শিল্প-জগতেও ভারতের "স্বরাজ্য" স্বীকার করা হইবে না। অর্থাৎ বিলাতী শিক্ষকরা যতক্ষণ certificate না দিতেছেন, ততক্ষণ ভারতের স্বাধীন শিল্প-প্রতিভার কোনও মূল্য নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভারত-শিল্প সম্বন্ধে ইংরাজের বিবেক-শক্তির একটা জাতিগত কু-সংস্কার আছে, যাহার প্রভাবে খাঁটি ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্য্যবোধ ও আস্বাদনের একটা প্রকৃতিগত বাধা আছে। জর্ম্মণী ও ফ্রান্সের মনীষীরা যেরূপ সহজ-বুদ্ধিতে ও সহৃদয়তার অর্ঘ্য লইয়া ভারত-শিল্পের পূজা করিতে পারেন, সাধারণতঃ অনেক উদার-চেতা ইংরাজ রাজনৈতিক বাধা অতিক্রম করিয়াও, তেমন ভাবে ভারত-শিল্পের অন্তঃস্থলে পৌঁছিতে পারেন না। ভারতীয় শিল্পীর মূর্ত্তি-কল্পনায় যে "অদ্ভুত" ও "অমানুষিক" anatomy-র পরিচয় পাওয়া যায়, খাঁটি ইংরাজ

সেটাকে ভারতশিল্পের একটা বিশেষত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন; তাঁহাদের মতে এটি ভারতশিল্পের একটি মারাত্মক দোষ, অপরাধ ও কলঙ্ক। এবং এই দোষ ও ব্যাধির উপযুক্ত চিকিৎসা ইংরাজী শিল্পের স্বাস্থ্যকর ও বলিষ্ঠ সংস্পর্শে সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং শিল্প-শাস্ত্রের এই ব্যাকরণের ভুল ইংরাজী বিদ্যালয়ে সংশোধন না করিয়া লইলে ভারতের নবীন শিল্পী শিল্প-জগতে স্থান পাইতে পারেন না; অর্থাৎ, Rothenstien সাহেবের anatomy classএ না পড়িলে, India Officeএর দেওয়ালে তাঁহারা তুলি চালাইবার অধিকার পাইতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় শিল্পীর শিখিবার বিষয় একটি আছে—সেটি বর্ণ মিশ্রণ ও ব্যবহারের রাসায়নিক বিজ্ঞান (colour-chemistry), বিশেষতঃ fresco-paintingএর ইউরোপে প্রচলিত নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। অবশ্য, ভারতে ইহার একটি প্রাচীন বিজ্ঞান ছিল, এবং স্থানে স্থানে এখনও তাহা প্রচলিত আছে। অজন্টার প্রাচীর-চিত্র পাকা বর্ণ-রাসায়নিকের বিজ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে চিত্রিত বলিয়া দু' হাজার বৎসরের পরে এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে। উড়িষ্যা ও দক্ষিণ দেশে এখনও প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে প্রাচীন বর্ণ বিজ্ঞানের প্রচলিত পদ্ধতিতে চিত্র লেখা হয়। এই চিত্র-বিজ্ঞানের গুহ্যতত্ত্ব ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। বিশ্ব-ভারতীর কলা-ভবনে আচার্য্য নন্দলাল বসু দেশী বিদেশী নানা বিজ্ঞান-সম্মত fresco-painting এর technique লইয়া অনেক প্রকার পরীক্ষা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে নানা নূতন জ্ঞান, ইউরোপে প্রচলিত fresco-paintingএর বৈজ্ঞানিক প্রথা, ভারত-শিল্পীর অবশ্য শিক্ষণীয়। ভারতের নব-পর্য্যায়ের শিল্পীরা যদি ইউরোপের এই বৈজ্ঞানিক বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষার একটা দিক নিশ্চয় সম্পূর্ণ হইবে, এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায়। এই বৈজ্ঞানিক techniqueএর কথা বাদ দিলে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বিলাতে যাইয়া নূতন কিছু শিখিবার অবসর অতি অল্প। অনেকের বিশ্বাস যে, অপরিপক্ক অবস্থায় ভারতের শিল্পী বিলাতে যাইলে তাঁহার শিক্ষা অপেক্ষা কুশিক্ষা হইবার বিপদ বেশী, এবং বিলাতে শিক্ষিত দেশী শিল্পীর চিত্রাদির দ্বারা এই কথার সত্য কতক পরিমাণে প্রমাণ করা যায়।

সম্প্রতি সরকারী কমিটির মনোনীত যে কয়টি শিল্পী বিলাতে India Houseএর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন—তাঁহারা সকলেই ভারতের কৃতী শিল্পী, শিক্ষানবীশ নহেন,—এই কথাটা আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাহস করিয়া দাবী করিতে পারেন নাই। আমাদের 'দাস-মনোভাবে'র ইহা আর একটি প্রমাণ। অনেকে এখনও বিশ্বাস করেন, ভারতের শিল্পী যতই ভারতে খ্যাতিলাভ করুন না কেন, ইংরাজী শিল্পশিক্ষার "শুদ্ধি" লাভ না করিলে তাঁহাদের শিল্প সমাজে স্থান হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বর্ম্মা একজন প্রতিভাশালী ও কৃতী শিল্পী। ত্রিপুরায় তাঁহার জন্ম। বিশ্বভারতীর কলা-ভবনে চিত্র-শিল্প শিখিয়া তিনি যবদ্বীপাদি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শিল্পের বেশ একটু বিশিষ্টতা ও অভিনবত্ব আছে। আশা করা যায়, তিনি নবীন ভারত শিল্পের উপর তাঁহার স্বকীয়তার একটু ছাপ দিতে পারিবেন। India Houseএর কার্য্যে তাঁহাকে পাঠান হইয়াছে। তাঁহার বিলাত যাত্রার সময় ত্রিপুরার 'রবি' পত্রিকা একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন যাহার মর্ম্ম এই যে, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বর্ম্মা এদেশের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চিত্রশিল্পের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। আমি মন্তব্যটি পাঠ করিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলাম, "তোমার সম্বন্ধে 'রবি' পত্রিকায় যে noteটি বেরিয়েছে তাতে সম্পাদক মহাশয় এইরকম আভাস দিয়াছেন যে, তুমি বিলাতে painting শিখতে গেছ। এটা আমাদের ভারতের নবীন শিল্পীদের শক্তি ও ক্ষমতার উপর একটা অপমানের কটাক্ষ ব'লে মনে হয়। আমি পুনঃপুনঃ বলেছি এবং এখনও বলব যে, ভারতের শিল্পীর বিদেশের শিল্প থেকে শিখবার কিছু নাই। ভারতের শিল্পী দিতে এসেছে, নিতে আসে নাই, আশা করি তোমরা ভারতের শিল্পীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে।"

ভারতের চারটি শিল্পীদের লক্ষ্য করিয়া বিলাতের Times পত্রিকা এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—

Four Indian artists (Messers L. M. Sen, D. K. Deb Barma, Sudhangshu Chowdhury

and Ranada Ukil) have arrived in London for training to take part in the decoration of the New India House. Before taking up the work they will undergo a year's training at the Royal College of Art, South Kensington, under Professor W. Rothenstien and spend six months in further study in Italy. (25th September 1929)
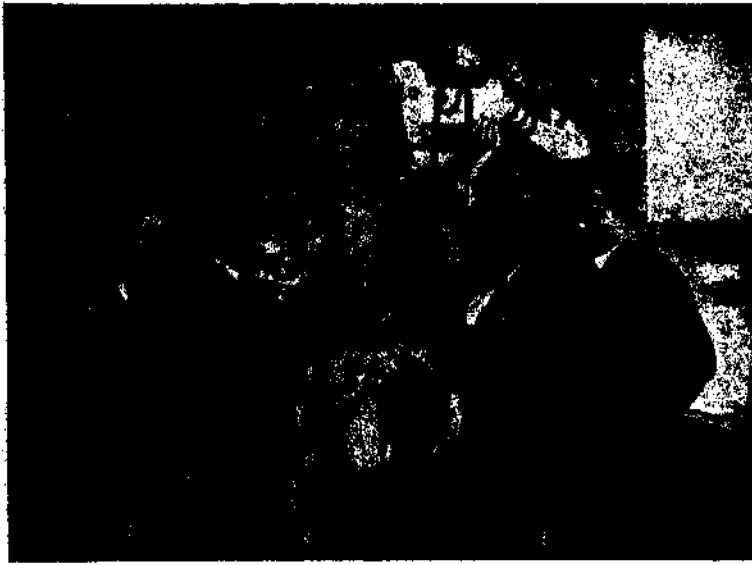
লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে দেওয়ালে আঁকা ছবি এবং তাহার সম্মুখে চারজন বাঙ্গালী চিত্রকর যাঁহারা ইণ্ডিয়া হাউস্ চিত্রিত করিয়াছেন।

বাম হইতে দক্ষিণে (১) শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন (২) শ্রীযুক্ত রণদাচরণ উকিল (৩) শ্রীযুক্ত সুধাংশু চৌধুরী (৪) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বর্ম্মা

Professor Rothenstien এই চারজন ভারতের শিল্পীদের পরিচয় দিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমাকে লিখিত শ্রীযুক্ত সুধাংশু চৌধুরীর পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

21, Cromwell Road
London, 6/10/29

প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং

আমাদের কলেজ গত ২৫শে সেপ্টেম্বর খুলেছে। Rothenstien সাহেব প্রথমদিন আমাদের সমস্ত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পরিচয় ক'রে দিয়ে বললেন, "এই চারজন ভারতের শিল্পী আমাদের কলেজে এসেছেন এবং এঁরা মাত্র একবৎসর এখানে থাকবেন, তারপর India Houseএ কাজ করবেন, আশা করি তোমরা এঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করবে, এবং তোমাদের পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানে Eastern এবং Western Artsর সম্পর্ক আরও গাঢ় হবে। হয় ত ভবিষ্যতে একটা নূতন School of Decoration গ'ড়ে উঠতে পারে এই থেকে"। তারপর আমাদের চার জনকে বললেন যে, তোমরা এখানে *Artist* হিসেবে এসেছ, *Student* ভাবে নয়, তোমাদের কোনও রকম ভয় নাই national tradition নষ্ট হবার। তোমরা এসেছ কেবল technique আয়ত্ত করবার জন্তে, drawing শিখতে নয়, এবং কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের মত তোমাদের কোনও নিয়মকানুন মানতে হবে না। আশা করি আমাদের মাঝে কোনও রকম misunderstanding থাকল না এবং কোনও কিছু অসুবিধা বোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাতে কোনও রকম ইতস্ততঃ করবে না।"

উপস্থিত আমরা decoration classএ ভিজে প্লাষ্টারের উপর tempera-র techniqueটা শিখ্‌ছি।

রূপকৃষ্ণ এখন এখানে এই collegeএ রয়েছে। সে Life class এবং Decoration class-এ দুয়েতেই কাজ করে। Western techniqueটা বেশ চমৎকার আয়ত্ত করেছে, তবে এটাও ঠিক যে, সে কলিকাতায় যা শিখেছিল সে সব ভুলে মেরে দিয়েছে।

আপনি আমার বিজয়ার প্রণাম জানবেন।

আশা করি ভাল আছেন। ইতি—

প্রণত—সুধাংশু

শ্রীযুক্ত সুধাংশু চৌধুরী পত্রের শেষে দেশী ছাত্রের বিলাতী শিক্ষার উপর বেশ একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। এই সূত্রে, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মার সহিত আমার যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল তাহা আলোচনার যোগ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম। আমার একটা বিশ্বাস আছে যে, আমাদের দেশের শিল্পীরা বিদেশে শিল্প-শিক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাদের নিজস্ব প্রতিভা ও বিশিষ্ট ভারতীয় দৃষ্টিটি অতি সহজেই হারাইয়া ফেলিয়া বিলাতী Studioর techniqueএর পায়ে শীঘ্রই আত্মবিক্রয় করেন। সুতরাং বিলাতে যদি যাইতে হয়, আপনার প্রতিভার প্রসার লাভের জন্য, বিস্তৃত অভিজ্ঞতার জন্য, তবে সে অভিযান শিক্ষানবীশি অবস্থায় করা উচিৎ নহে, ভারতে কয়েক বৎসর শিল্পসাধনার পরে যাইলে বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

12/1 Ganguly Lane,
Calcutta.

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার চিঠি পেয়ে বড় আনন্দ হ'ল। হ্যাভেল সাহেবের পত্রের উত্তর এখনও আসে নাই। ৩৬ দিনের পূর্ব্বে বিলাতের চিঠির জবাব আসতে পারে না। সম্ভবতঃ পরের মেলে আসতে পারে।

পশ্চিমের আর্টের প্রভাব সম্বন্ধে আমি যে কথা বলেছিলুম, তা বোধ হয় তুমি একটু ভুল বুঝেছ। আমি দুটি কথা স্বতন্ত্রভাবে বলেছিলুম। পশ্চিমের শিল্পের সংস্পর্শে ও প্রভাবে আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিল্পীরা প্রায় আহত ও অভিভূত হয়ে পড়েন, সেটা ভারতের শিল্পের দুর্ব্বলতা নয়, ভারত-শিল্পের পতাকা যাঁরা আজ বহন কচ্ছেন, তাঁদের ধাতু-দৌর্ব্বল্য, নীতি-দৌর্ব্বল্য, কি স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য,—কি এই রকম আর একটা কিছু দৌর্ব্বল্যই তার কারণ, পশ্চিমের কিম্বা বাহিরের কোনও শিল্পের প্রভাবের দোষ নয়, কিম্বা ভারত-শিল্পের মজ্জাগত কোনও শক্তি-হীনতার পরিচয় নয়। তবে একথা অকাট্য সত্য যে, আধুনিক কালে যে-সকল ভারতের শিল্পীরা বাহিরের শিল্পের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা সকলেই 'নিজস্ব' হারিয়েছেন, আত্ম-সমর্পণ ক'রে বসেছেন, বাহিরের শিল্পধারা অভিভূত হয়ে পড়েছেন, ভারতশিল্পের বিশেষত্বের মর্য্যাদা রাখতে পারেন নাই। এমন কি শ্রীযুক্ত নন্দলাল সম্বন্ধে কেউ কেউ একথা বলতে আরম্ভ করেছেন যে, "পূর্ব্বের 'নন্দলালকে' আর আমরা খুঁজে পাচ্ছি না"। একথাটা নিশ্চয় অত্যুক্তি। কিন্তু একজন French Lady-Artist তিনদিন আগে নন্দলালের "বৃহন্নলার" চিত্রের ফটোগ্রাফ দেখে বল্লেন যে, এতে ভারতীয় রীতি অপেক্ষা চৈনিক রীতির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তিনি বল্লেন, ভারতের শিল্পীদের ছবিতে ভারতীয় রীতির সৌরভ যেরূপ মধুর ও উপভোগ্য অন্য কোনও শিল্পের "ঋণ করা" কোনও গুণই সেরূপ বাঞ্ছনীয় নয়"। ভারতের শিল্পের মধ্যে আজও যে অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে—তাই নাড়া চাড়া ক'রে অন্ততঃ এক শতাব্দী কেটে যেতে পারে, অন্য কোনও বাহিরের শিল্প হ'তে ভারত শিল্পের কার্য্য করবার এখনও আবশ্যকতা আসে নাই। এটা ভারত-শিল্পের দৌর্ব্বল্যের কথা নয়, তার ঐশ্বর্য্যের প্রমাণ। জাপান তার প্রাচীন শিল্পের ধারা ও ঐশ্বর্য্যকে অপমান ক'রে, আধুনিক শিল্পে "বিশ্ব-প্রেমের" দোহাই দিয়ে, পশ্চিমের শিল্পের উৎকট প্রভাবের ঝড় বহিয়ে, এক শ্রেণীর "আধুনিক" (modernist) শিল্পকে যেরূপ ক্লিষ্ট ও ভীষণ ক'রে তুলেছেন, বর্ত্তমান জাপানী শিল্পের সহিত যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা সকলেই একবাক্যে তা স্বীকার করেছেন।

ভারতের নবীন শিল্পকে Hot house plant এর মত কাচের ঘরে বদ্ধ রেখে বাহিরের শিল্পের হাওয়ার প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখবার আমার কোনও ইচ্ছা নাই। বাহিরের শিল্পের প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করবার উপযুক্ত শক্তি তার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে, সে শক্তি যদি না ফুটে থাকে তাহলে তা'কে কাচের ঘরে বদ্ধ ক'রে রাখলে কোনও বিশেষ লাভ নাই। তবে একথা খুব সত্য যে, চারা গাছ যতদিন তার বাল্যলীলায় অর্থাৎ [illegible]

না ক'রে নিজ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রৌঢ়ত্বে না পৌছাঁয়, ততদিন বড় খাপ্‌টা ও ছাগল গরুর আক্রমণ থেকে বাঁশের বেড়া দিয়ে রক্ষা করা সুবুদ্ধির কাজ। অনেক করুণ চারা তার প্রৌঢ়ত্বে পৌছুবার আগে থেকেই বাঁশের বেষ্টনী অতিক্রম করে, বাহিরের প্রতিকূল শক্তির সহিত যুদ্ধ কর্‌বার আস্ফালন করে, তাতে তার অতি-সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, শক্তির ও সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের নবীন শিল্পীরা কে কে বেড়া ডিঙ্গাবার শক্তি ও অধিকার অর্জ্জন করেছেন—তার ব্যক্তিগত আলোচনা আবশ্যক। সকলেরই বেড়া ভাঙ্গা আবশ্যক একথা অতি বড় "পশ্চিমে-বাতিক"-গ্রস্তরাও বল্‌তে প্রস্তুত নহেন। ∘ ∘ ∘ ∘ নন্দলাল ছাড়া আর কে কে এই শক্তি অর্জ্জন করেছেন সে কথা হঠাৎ বলা বড় শক্ত। অনেকের সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, তাঁরা সেই শক্তি অর্জ্জন এখনও করতে পারেন নাই। তোমার দু' চার খানা ছবি আমি দেখেছি। তোমার শিল্পের ধারা ও গতি আমি খুঁটিয়ে বিচার করবার সুযোগ পাই নাই। আমাদের দেশের এই "নীতি" ও "ধাতু"-দোকানোর যুগে, পশ্চিমের প্রভাবে অভিভূত হন নাই এরূপ মহাপুরুষ খুব বিরল। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অরবিন্দ ঘোষ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, পণ্ডিতবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েক জন মাত্র মনীষীর নাম করা যায়। ∘ ∘ ∘ আমাদের দেশে এখন Great Individual আর Poor Averageএর যুগ। হিমালয় বিন্ধ্যাচল দুটা একটা,—আর সমস্তই সমতল ক্ষেত্র।

তোমার শিল্পকে আমি খুব সমাদর করি, তোমার শক্তি আছে ব'লে আমার বিশ্বাস, কিন্তু সে শক্তি এখনও সম্পূর্ণ ফুটে উঠেছে এর প্রমাণ আমি এখনও পাই নাই। ভারতের বর্ত্তমান শিল্পকে একটু বিশিষ্ট দান দেবার তোমার শক্তি ও অধিকার আছে,—কিন্তু সে শক্তি অনেক তপস্যা ও সাধনার দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে হবে। প্রফেসার্ রদেষ্টীন সাহেবের শিক্ষকতায় এবং Royal College of Artএর পরিবেশ ও প্রভাবের মধ্যে সে তপস্যার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হবে ব'লে আমার ধ্রুব বিশ্বাস। একটা কথা তুমি লিখেছ, 'বিলাতী তক্‌মা' না আন্‌তে পারলে তোমার দেশে কেউ তোমার কথা শুনবেন না এবং তোমারও জীবন-যাত্রার পাথেয় সম্পূরণের সমস্যা সম্পূর্ণ হবে না। এটা হতাশের খেদোক্তি, সুতরাং শক্তিহীনতার প্রমাণ। প্রতিকূল শক্তিকে জয় করবার শক্তি তোমার আছে ব'লে আমার বিশ্বাস। তুমি যদি নিজে বিশ্বাস হারাও, তাহলে তুমি নিজেকেই হারাতে প্রস্তুত করবে। যুদ্ধ না ক'রেই হার স্বীকার করা পৌরুষের লক্ষণ নয়। বিদেশে নিজের শিল্পের ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব রক্ষা কর্ত্তে যে প্রতিকূল শক্তির সহিত লড়াই কর্ত্তে হবে, দেশের মাতব্বরদের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার তুলনায় সে শক্তি চতুর্গুণ প্রতিকূল ও দুর্দ্ধর্ষ। তবে যদি "পেটের দায়ে" নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ কর্ত্তে ইচ্ছা করে, আমার বল্‌বার কথা কিছুই নাই। আরও কিছুদিন অপেক্ষা কল্লে সম্ভবত এদেশেই তোমার কাজের ক্ষেত্রের সন্ধান পেতে পারবে। ব্যক্তিগত ভাবে, কোনোও আশা দেবার আমার অধিকার নাই। তবে আমার বিশ্বাস তোমার কাজের সুযোগ এদেশেই শীঘ্র মিলবে। অনেক কথা লিখে ফেলেছি। এবিষয়ে গভীর চিন্তা ও বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ কর্ব্বে। এই পত্র পড়িয়ে রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ কল্লে ভাল হয়। কি ঠিক করলে তা লিখলে, আমাকে যা কর্ত্তে হবে তা বল্লে, আমি যথাসাধ্য সাহায্য কর্ব্ব একথা লেখা বাহুল্য। তোমার শুভানুধ্যায়ী

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিলাতে ভারতীয় শিল্পীদের দায়িত্ব সম্বন্ধে বেশ একটু সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুধাংশু চৌধুরীর ৩রা এপ্রিল তারিখের পত্র হইতে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"সার অতুল আমাদের একদিন চায়ের নিমন্ত্রণ করেন। কতকগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেবার জন্তে। ∘ ∘ ∘ সবাই বিদায় নেবার পর, সার অতুল আমাদের বল্লেন, "প্রফেসর

রদেনহীন্ যাই বলুন্ না কেন, তোমরা যেন নিজেদের ভুলে যেয়ো না। আমি চাই তোমাদের ছবির ভিতর সত্যকার জ্ঞানী ও ধ্যানী ভারতকে দেখতে, যেন তোমরা এখানকার আব-হাওয়ায় প'ড়ে নিজেদের বিপথে চালিওনা,—এই হচ্ছে আমার আন্তরিক অনুরোধ।"

অপরিপক্ক-সাধনার অবস্থায় ভারতীয় শিল্পীর আত্ম-বিক্রয় ও বিপথে যাইবার আশঙ্কার আভাষ স্যার প্রতুলের উপদেশের মধ্যে কিছু আছে। সৌভাগ্যক্রমে সরকারী কমিটির মনোনীত চারজন বাঙ্গালী শিল্পীর কেহই অপরিপক্ক সাধক নহেন, সকলেই কৃতী ও প্রতিভাবান চিত্রকর। শ্রীযুক্ত সুধাংশু চৌধুরীর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে আশা করা যায় যে, তাঁহারা সত্যিকারের ভাল ছবি দিয়ে য়ুরোপের বুকের উপর ভারতের শিল্প-সুষমার জয়ধ্বজা চিরদিনের মত উড়িয়ে দিয়ে আসবেন।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব্বমেঘ

শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

১

সুদূর কান্তার বিরহ-গুরুভার বরষভরা শাপ সহনতরে
দলিতমহিমায় স্খলিতঅধিকার যক্ষ আসি' কোনো বসতি করে
জনকতনয়ার কনককান্তির স্পর্শে পূততোয় পুণ্যধাম,
স্নিগ্ধ তরু দিয়ে ঢাকা সে আশ্রম, পুণ্য রামগিরি তাহার নাম।

২

যক্ষ বক্ষের দয়িতাহারা হ'য়ে নিভৃত অদ্রিতে একেলা হায়—
শীর্ণ হাত হ'তে স্বর্ণবালা খসে, এমনি ক'রে তার দিন যে যায়।
সহসা আষাঢ়ের প্রথম দিবসেতে গিরির সানুদেশ চুমিল মেঘ,
যেন রে ভীম করী দশনে করে ক্রীড়া, রোধিতে পারে না সে হৃদয়াবেগ।

৩

চাহিয়ে মেঘপানে সজল দু'নয়ানে কহিল রাজরাজ-ভৃত্য সেই—
'হৃদয় আজি মোর উধাও ধেয়ে যায় প্রিয়ার বাসরেতে, প্রিয়া যে নেই।'
হেরিলে মেঘ হায় সুখীরও চিত্ত ধায় কণ্ঠালিঙ্গিত প্রেয়সী-কর,
দয়িতা দূরে যার, দুখের সীমা তার কে করে নিরূপণ?—মরণ বর!

৪

শাওন এলে তার লইয়ে জলধার, সে করে মেঘদূতে পাঠাতে আশ,
দিবে সে প্রেমলিপি প্রিয়ার আঁখি-কোণে, হবে না দয়িতার জীবননাশ।
কুটজ-ফুল ল'য়ে অর্ঘ্য বিরচিয়ে যুক্তকরে তাই কহিল তায়—
স্বাগত আজি মেঘ, প্রণতি লহ মোর, তোমায় হেরি' মন প্রণয় চায়।

৫

সলিল-ধূম-বায়ু-আলোককারী মেঘ, প্রণয়দূত কে বা করেছে তায়?
করণপটু যেই পরাণশালী জীব, মানব তাহারেই দৌত্যে চায়।
এসব গণিবার সময় নাহি তার, প্রেমে সে উন্মুখ পাগলপ্রায়,—
চেতন-অচেতন কভু কি কামীজন বিচার করে যবে পরাণ ধায়!

৬

পুষ্করাবর্ত্ত-বংশে তব মেঘ জনম, সুবিদিত তোমার কুল,
জানিগো তুমি সখা মঘবা-অনুচর—ধরিতে পার বেশ ইচ্ছাতুল।
তাই তো তোমারেই করিগো অর্চ্চন, বিধির রোষে আজি কান্তাহীন,
যাচন নিষ্ফল মহতে তবু বরি, ঘৃণায় পরিহরি অধমে ঋণ।

৭

সন্তাপিত জনে শরণ তুমি সখা, এ বাণী ল'য়ে যাও প্রিয়ার পাশ,
কুবের-ক্রোধাহত আমি যে অবনত কেবা সে তুমি ছাড়া পুরায় আশ।
উড়িয়া যাও মেঘ বসতি আছে যেথা যক্ষপতিদের—অলকা নাম,
বাহিরে উপবন-আসীন হরশির-জোৎস্না-ধোওয়া তার শতেক ধাম।

৮

পবন-পদবীতে আরূঢ় হ'লে তুমি সরায়ে কুন্তল ফুল্লমুখে,
পথিকবধূগণ তোমারে নিরীখণ করিবে মিলনের মদির সুখে।
নবীন বরষায় ছাড়ি' কে থাকে হায় বিরহসমাকুল বনিতা জনে?
কেহ না কেহ নয়, কেবল আমি হায়, পরের ক্রীতদাস আমি এ বনে।

৯

পবন-সারথিরে লইয়ে সাথী, কর হাওয়ার পাল তুলি' দিগ্বিজয়—
বামেতে চাতকেরা গর্ব্বে ভরপুর মাঙ্গলিকী গাবে গগনময়।
মিলনক্ষণ স্মরি' নয়নমনোহর মালার সারি দিয়ে বলাকাদল
গগন-পথে পথে চলিবে সাথে সাথে চাতক গাবে মিঠে ফটিকজল।

১০

হেরিবে সাধ্বী সে ভ্রাতৃবধূ তব দিবস গণিতেছে মলিন ক্ষীণ,
পরাণ রাখিয়াছে মিলন-আশা তরে, জপিছে মম নাম রাত্রিদিন।
রমণীহিয়া সখা প্রণয়বিহ্বল, বায়ুরও ভর তার সহে না হায়,
গ্রথিত ফুল সম আশার মালিকারে যতনে রাখে—নাহি টুটিতে দেয়।

১১

শ্রবণমনোহর গরজ ঘন তব রুদ্ধ ধরাবুকে খুলিবে দ্বার—
বন্ধ্যা বসুমতী-বক্ষ নিঙাড়িয়ে পুষ্প বাহিরিবে শিলীন্ধ্রার।
মানস-পথগামী মরালদল তব উড়িবে সাথে সাথে গগনময়—
মৃণাল কিসলয় পাথের ল'য়ে সাথে দেখাবে পথ তব কুবেরালয়।

১২

তুঙ্গ গিরিশিরে আলিঙ্গন দিয়া কুশল শুধাইবে বন্ধু সেই,
বন্দ্য রঘুপতি-পদাঙ্কিত পূত চিত্রকূট-গিরিমেখলাতেই।
প্রাবৃট্‌কালে তব মিলন-উৎসবে স্পর্শি' উঠে হৃদি বারম্বার,
সুচির বিরহের তপ্ত আঁখিনীর মুক্ত কোরো স্নেহে বক্ষে তার।

১৩

পন্থা তব মেঘ প্রয়াণ-অনুরূপ কহিব সবিশেষ শ্রবণ কর,
প্রিয়ার প্রেমলিপি কহিব পিছে তার, শ্রবণযুগলের তৃষ্ণাহর।
চলিতে ক্ষীণ বল হইলে পদ রাখি' করিও বিশ্রাম শিখরী-শিরে,
দরদী সখা ওগো, তৃষ্ণানিবারণ করিও পরিলঘু সরসী-নীরে।

১৪

'অদ্রিশির, মাগো, পবনে উড়াইল'—সিদ্ধবধূ ক'বে হৃদয়ে ত্রাস,
উর্দ্ধে মুখ তুলি' চকিত আঁখিপাতে, দরশ-উৎসাহে বিবশ বাস।
নিচুল-বনময় ত্যজিয়ে ঠাঁই সেই ত্বরিত লঘুগতি বনান্তের—
দিঙ্‌নাগের পথ সুদূরে পরিহরি' উড়িয়ে যেও পথে উত্তরের।

১৫

জানে না ভ্রূবিলাস, শিখেনি ছলকলা, তথাপি চেয়ে র'বে পল্লীবধূ
তোমার মুখপানে,—তুমি যে জলদানে সফল কর ধরা, বিলাও মধু।
নূতন-চষা মাটি গন্ধসমাকুল উচ্চভূমি' পরে চরণ দাও,
করিয়ে আঘ্রাণ সুরভি মনোহর উত্তরের পথে উধাও যাও।

১৬

তোমার ধারাজলে তৃপ্ত হবে বন, শান্ত হবে জ্বালা দাবাগ্নির,
পূজিবে সানুমান্‌ আম্রকূট-গিরি, মুছায়ে নিজকরে শ্রমের নীর।
সদয় উপকারী সুহৃৎ লভি' ঘরে কতই করে পূজা অকিঞ্চন,
সে যে গো উন্নত উদার গিরিরাজ, পাতিয়া দিবে হৃদি-সিংহাসন।

১৭

কাঁপিবে বনরাজি রোমাঞ্চিত নীপে পরশ পেলে তব উত্তরীয়—
স্ফুটিত কন্দলী প্রথম-মুকুলের আবির্ভূত হবে দরশে প্রিয়।
তাহারই সুস্বাদ লভিয়ে মৃগদল আসিবে যেথা তব চরণপাত,
উর্ব্বীসুরভির গন্ধউন্মন চলিবে ছুটি' তারা তোমার সাথে।

১৮

চতুর চাতকের বরষা-বারিপান হেরিবে কুতূহলে সিদ্ধ সবে,
গণিবে প্রসারিয়ে করের অঙ্গুলি বলাকাপাঁতি নভে উড়িবে যবে।
করিয়ে গরজন সিদ্ধবধূদলে প্রণয়ী-ভুজপাশে নিক্ষেপিয়ো,
আলিঙ্গন-সুখী সিদ্ধযুবকের পুরায়ে মনোরথ আশিস নিও।

১৯

পাণ্ডুছায়াঘন বনানী-উপবনে কেতকী মুকুলিবে পরশে তব,
পল্লীপথতরু আকুলি' কলরবে রচিবে নবনীড় বিহগ সব।
পক্কফলশ্যাম জম্বুবনে-ঘেরা দশার্ণার দেশ উঠিবে হাসি',
ভ্রমণ ভুলে' গিয়ে দিবস কতিপয় মরালদল সেথা মিলিবে আসি'।

২০

প্রেমের পিপাসায় প্রথিত বিদিশায় ত্বরিৎ যেও সখা, পুরিবে আশা,
বেত্রবতী তব চাহিবে মুখপানে, কণ্ঠে স্ফুরিবে না হর্ষে ভাষা।
সচল ঊর্মির ভ্রূকুটিভঙ্গিমা জানাবে মুখে তার প্রণয়-ক্ষুধা;
মধুর গর্জ্জনে চুমিও মুখ তার, করিও পান সখা অধরসুধা।

২১

পথের যত ক্লেশ র'বে না তার লেশ নীচৈ গিরিচূড়ে বসিবে যবে—
হরিৎ নীপদল ত্বরিৎ পুলকিবে তোমার গুরু গুরু ডমরু-রবে।
সে গিরি-গুহাতলে প্রণয়ীযুগলের মিলন-বাসরের গন্ধ বয়,
তাহার শিলাতলে মত্তযৌবন কামনা উদ্দাম মিটায়ে লয়।

২২

বনানী-নদীতটে যূথিকাকলিকায় করিও সিঞ্চন নবীন জল,
ফুটায়ো উপবনে শুভ্র হাসি সম মাগধী ব্রততীর কুসুমদল।
তপ্ত কপোলের তাপেতে হ'লে ম্লান তরুণী-কর্ণের পদ্মদল,
সজল ছায়া দিও পুষ্পচয়িকায়, অরুণ কিরণের হরিও বল।

২৩

যদিও বাঁকাপথ উজ্জয়িনী, তবু যাইতে ভুলিও না তাহার পাশ,
সৌধ-অঙ্কের বিলাস অনুপম হেরিও আঁখি ভরি' ক্ষণেক আশ।
যেথায় তরুণীর তড়িৎ-আঁখিশরে যুবকজন-মনে পুলক ছায়—
সে লীলাপাঙ্গেই যদি না দেখে যাও, কিসের তরে তবে লোচন হায়?

২৪

তোমার আগমনে হরষ-উন্মাদ ত্যজিয়ে জল কলহংস-রাশ
নির্বিন্ধ্যার রূপ ফুটাবে অপরূপ, মুগ্ধ সুন্দর স্খলিতবাস।
ব্যাকুল আঁখিপাতে তটিনী-আহ্বান টলাবে মন তব জানিছে সার,
বক্ষ ফাটে তবু কণ্ঠ নাহি ফুটে, নীরবে সঁপে নারী চিত্ত তার।

২৫

অবন্তীরে পথে পাইবে হেরিবারে—ধ্বনিত উদয়ন-কথিকা যায়,
চলিও সেথা হ'তে উজ্জয়িনী-পথে বিশাল শোভা যার স্বপনপ্রায়।
স্বল্পীভূত হ'লে পুণ্যফলরাশি পুণ্যশেষ দিয়ে স্বর্গীজন
স্বর্গ-সুখসুধা করিয়ে আহরণ মর্ত্ত্যে আনিয়াছে সে নন্দন।

২৬

সেথায় উষাকালে শিপ্রাসমীরণ ফুটিত-কমলের গন্ধ বয়—
কূজিত সারসের কণ্ঠমদকল দূরান্তরে দূরে ধ্বনিত হয়।
রাত্রিজাগরণ ক্লান্ত-কান্তার মিলন-অবসাদ নিমেষে যায়—
প্রভাতসমীরণ দয়িতবাণী সম প্রণয়-উন্মেষ পুনঃ জাগায়।

২৭

সেথায় পুরনারী ধূপের ধূঁয়া দিয়ে মাজিলে কেশপাশ সে ধূমরাশ
জালিকাবাতায়ন-রন্ধ্রপথে সখা, আকাশে যাবে মিশে তোমার পাশ।
ভবন-শিখী দেবে নৃত্য উপহার, চুমিও সুরভিত প্রাসাদ-শির,
ললিতবনিতার চরণ-রঞ্জনে করিবে রাঞ্জন নগরী-শ্রীর।

২৮

সাদরে প্রমথেরা করিবে নিরীখণ পিণাকী-কণ্ঠের রঙ্গ তোমার,
যেও হে ত্রিভুবন-গুরুর দেবালয়ে, সকল পুণ্যের শ্রেষ্ঠাধার।
যুবতী-জলকেলি-সুরভি স্রোতজল, অমল কুবলয়-স্নিগ্ধ বাস,
গন্ধবতী হ'তে গন্ধ আহরিয়ে সমীর উপবনে খেলিবে যায়।

২৯

অস্তাচল পথে নামিলে দিবাকর উঠিবে মহাকালে ঘণ্টারব,
সন্ধ্যা আরতির শঙ্খ গম্ভীর ধ্বনিবে, ধূপদীপ জ্বলিবে সব।
জলদ কণ্ঠের গভীর উচ্ছ্বাসে মন্দ্রমন্থর তুলিও তান,
ধন্য হবে তব গরজ সুন্দর, স্তোত্র শম্ভুর করিও গান।

৩০

নাচিবে নটীদল বাজিবে কনকন্ লীলায় তাহাদের কটির হার,
কাঁকন মণিকায় আলোক ঠিকরিয়া রাঙাবে অনুখন চামর তার।
তোমার সলিলের পাইয়ে পরশন নৃত্যক্লান্তার জুড়াবে শোক,
স্থাপিবে তব পানে দীপ্ত সুন্দর কাজলভ্রমরার উজল চোখ্।

৩১

নাচিবে পশুপতি ঊর্দ্ধে বাহু তুলি, বাহুর পরে তাঁর ঘেরিয়ে রয়ো—
সান্ধ্য সূর্য্যের তরুণ জবারক্তে আর্দ্র গজাজিন তুমিই হ'য়ো।
হেরিয়ে শম্ভুর নৃত্যতাণ্ডব ভবানী মুদিবেন সভয়ে চোখ,
ভক্তি দেখি তব তুষ্ট হবে দোঁহে, ভক্তি সার্থক তোমার হোক্।

৩২

অন্ধ তমসায় পন্থা নির্জ্জন করিবে গরজন বাদল বায়—
রমণী একাকিনী চলিবে অভিসারে সরমে শঙ্কায় কাঁপিবে কায়।
দেখায়ো পথ তারে বিজলী উপহারে কনক নিকষের চমকপ্রায়—
ঢেলোনা বারিধার, ক'রো না তর্জ্জন, ভীরু যে অবলার পরাণ হায়!

৩৩

সুপ্ত পারাবত, নিদ্রানির্জ্জন তুঙ্গ সৌধের শিখর পর
তন্বীবিদ্যুৎ-বনিতা সহ মেঘ, করিও বিশ্রাম চিত্তহর।
পূর্ব্বে রক্তিম উঠিবে রবি যবে, যাত্রা ক'রো সখা অন্তর মনে
প্রতিশ্রুতি করি না করি কালনাশ পালন করে তাহা সুহৃৎ জনে।

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

———

বিচিত্রা-চিত্রশালা

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের সৌজন্যে

মাতৃক্রোড়ে মৃত যিশু

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো ২৪ বৎসর বয়সে
এই চিত্রটি অঙ্কিত করেন।

ক্রুশের তলায় বসিয়া মেরী যিশুর মৃতদেহ ধারণ করিয়া আছেন।
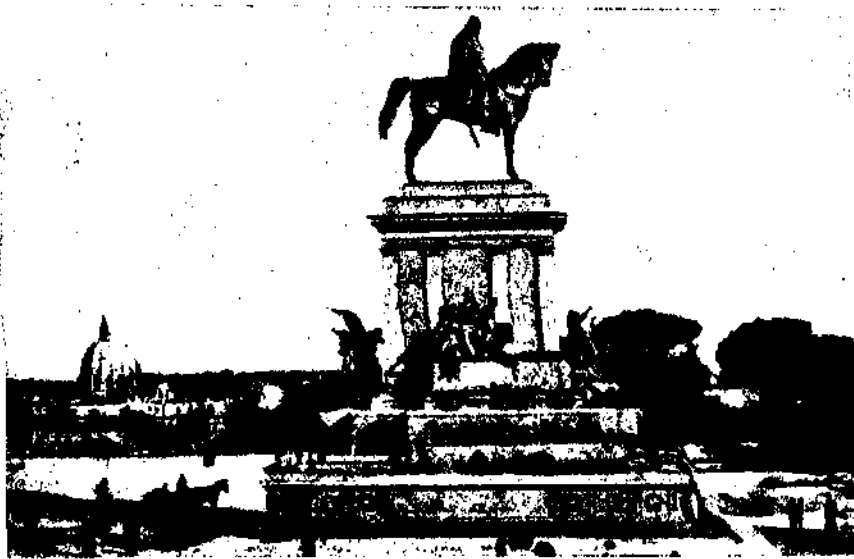
জোসেফ্ গ্যারিবল্ডির স্মৃতিস্তম্ভ—রোম

কলিসিয়ম্—রোম

এই বৃহৎ রঙ্গমঞ্চের মধ্যে ৮৭,০০০ দর্শকের সম্মুখে গ্লাডিয়েটরগণ হিংস্র জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিত। ৮০ খৃঃ অব্দে এই রঙ্গমঞ্চের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়।

সেণ্ট পিটার্স স্কোয়ার—রোম

দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের স্মৃতিসৌধ—রোম

এই সুবৃহৎ স্মৃতিসৌধের পরিকল্পনা স্থপতি Sacconi করেন।
১৮৮৮ সালে আরম্ভ হইয়া ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য ১৯১১ সালে শেষ হয়।
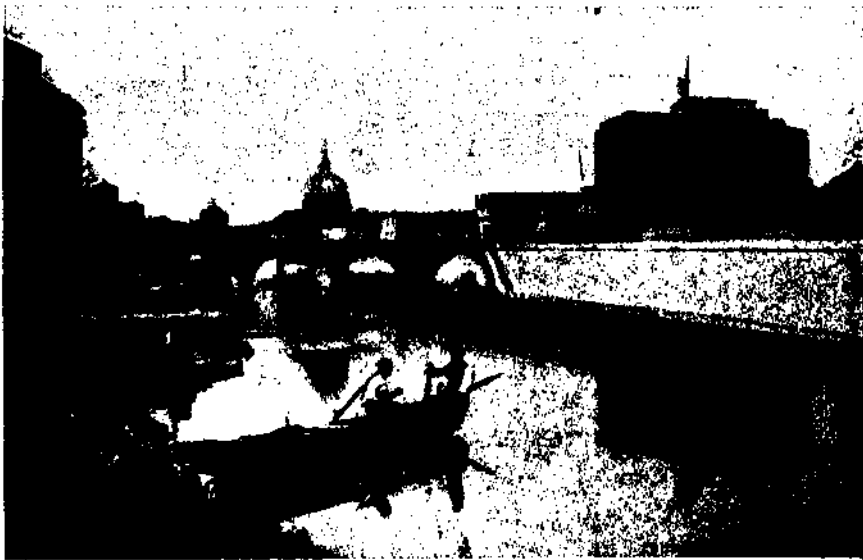
টাইবার নদীতীরে সেণ্ট এঞ্জেলো দুর্গ—রোম
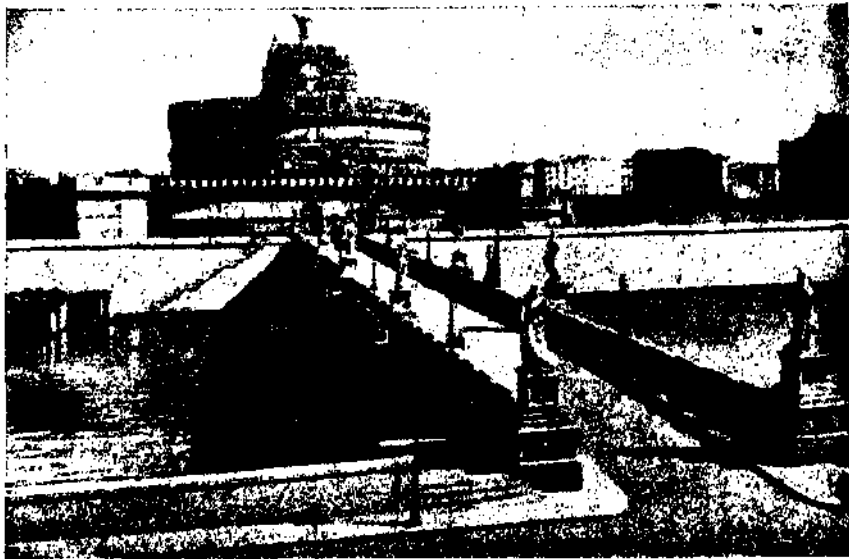
সেণ্ট্ এঞ্জেলো সেতু ও দুর্গ—রোম

সম্রাট আড্রিয়ানো এই দুর্গটি নির্ম্মিত করেন। তাঁহার এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের সমাধিভূমি ইহারই মধ্যে হয়। শ্বেত প্রস্তরে রচিত বহু প্রতিমূর্ত্তির দ্বারা ভূষিত এই সুন্দর সৌধটি অতিশয় অসুন্দর ব্যবহারে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বহু পদস্থ ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করা হয় এবং পরে সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হয়।
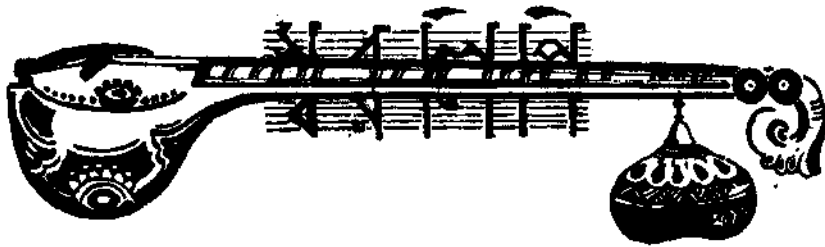
নূতন গান

এসো এসো প্রাণের উৎসবে,—
দক্ষিণ বায়ুর বেণুরবে।
পাখীর প্রভাতী গানে,
এস এস পুণ্যস্নানে,
আলোকের অমৃত নির্ঝরে।
এসো এসো তুমি উদাসীন,
এসো এসো তুমি দিশাহীন।
প্রিয়েরে বরিতে হবে,
বরমাল্য আনো তবে,
দক্ষিণা দক্ষিণ তব করে।
দুঃখ আছে অপেক্ষিয়া দ্বারে
বীর, তুমি বক্ষে লহ তারে।
পথের কণ্টক দলি
এসো চলি এসো চলি
ঝটিকার মেঘমন্দ্র স্বরে।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পা দা I
এ স

II দা -র্ঋা র্সা -র্ঋা । -র্ণর্সা -া -ণা -দা I পা দা ণা -া । পণা -া দা পা I
এ ০ স ০ ০ ০ ০ ০ ০ প্রা ণে র ০ উৎ ০ স বে

I না -া র্সা ঋা । না -া র্সা না I পা -দা ণা পা । ণা -দা পা দা I
দ • ক্ষি ণ বা • য়ু র বে • ণু র বে • এ স

I দা -ঋা ঋর্সা -া । -া -া -া -া I
এ • স • • • • •

I দা দা দা দা । না র্সা ঋর্সা -না I র্সা -জ্ঞা জ্ঞা র্রা । জ্ঞা -র্রা র্মজ্ঞা -া I
পা খী র প্র ভা তী গা • নে • এ স এ • স •

I -া -া -ঋা -র্সা । র্সা -র্গা র্গজ্ঞা -া I ঋা -া র্সা -া । -র্সা -ঋা ণা র্সা I
• • • • পু • ণ্য • স্না • নে • • • এ স

I ণর্সা -ঋর্সা ণা -দা । -া -া -া -া I
এ • • স • • • • •

I দা জ্ঞা ঋা র্সা । ণা র্সা ণা -পা I পণা -া দা পা । -া -া সা ঋা I
আ লো কে র অ মৃ ত • নি র্ ঝ রে • • এ স

I গা -া মা -া । -া -া -া -া I
এ • স • • • • •

I সা ঋা গা গা । গা ঋা গা গা I গমা -া -া -া । -া -া -া -া I
এ স এ স তু মি উ দা সী • • ন্ • • • •

I গা মা পা দা । পণা ণপা ণা দা I পা -া -া -া । -া -া -া -া I
এ স এ স তু মি দি শা হী • • ন্ • • • •

I দা দা দা -া । না না না -দা I না -া র্সা -া । -া -া ঋা র্সা I
প্রি য়ে রে • ব র্ষি তে • হ • বে • • • ব র

I না -র্সা ঋা -া । -ণর্সা -দা না র্সা I
মা • ল্য • • • • ব র

I র্সর্ঋা -া র্সা -া । র্সর্ঋা -া র্সা -র্ঋা I না -া র্সা -া । -া -া -া -া I
মা • না • আ • নো • ত • বে • • • • •

I দা -র্জ্ঞা র্ঋা র্সা । র্ঋা -র্সা ণা ণা I পা ণা ণদা -া । পা -া সা ঋা I
দ • ক্ষি ণা দ • ক্ষি ণ ভ ব ক • রে • এ স

I গা -া মা -া । -া -া -া -া I
এ • স • • • • •

I দা -া দা দা । না -া র্সা -া I র্ঋা -া র্ঋা র্সা । র্সনা -া র্সা -া I
দুঃ • খ আ ছে • অ • পে • ক্ষি য়া দ্বা • রে •

I দা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা । র্জ্ঞা -র্রা র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞা র্মা র্জ্ঞা । র্ঋা -া র্সা -া I
বী র্ তু মি ব • ক্ষে • ল • হ ল ও তা • রে •

I দা দা দা -া । না -া র্সা র্ঋা I না -া র্সা -া । -া -দা না র্সা I
প থে র • ক ন্ ট ক দ • লি • • • এ স

I র্সর্ঋা -া র্সা -র্ঋা । -নর্সা -দা না র্সা I র্সর্ঋা -া র্সা -া । -া -া -া -া I
চ • লি • • • • এ স চ • লি • • • • •

I দা র্জ্ঞা র্ঋা র্সা । ণা র্সা ণা -পা I পণা -া দা পা । -া -া সা ঋা I
ঝ টি কা র মে ঘ ম ন্ দ্র • স্ব রে • • এ স

I গা -া মা -া । -া -া -া -া II II
এ • স • • • • •

এ গানটির বিশেষত্ব এই যে, এ গানে প্রচলিত প্রথা মত আস্থায়ী অন্তরা প্রভৃতির বিভাগ এবং পুনরাবৃত্তির ব্যবস্থা নাই,—আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক-টানা গাহিতে হইবে। বিঃ সঃ

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র

[অষ্টম মৃত্যু-বার্ষিকীতে বন্ধু-বৈঠকে কবির মাতুল—
লেখক কর্ত্তৃক এই নিবন্ধ পঠিত হয়]

১

সর্ব্বংসহা এই বসুন্ধরা। অমৃতের পুত্র যাহারা ধরিত্রীর সন্তানও তাহারা। স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় মানুষ সহে অনেক-কিছুই। নান্যঃ পন্থা :—উপায়ান্তর যে নাই।

রবীন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথ

তরুণ শোকে যে জ্বালা তাহাও একদিন তরল হইয়া যায়। হইলেও স্মৃতির দংশন হইতে পরিত্রাণ কৈ?

এই সেই আষাঢ়ের ১০ই। বর্ষার প্রাক্কালে বর্ষণে বর্ষণে সে-বার নগরপল্লী বারিধারায় প্লাবিত। নীরব বায়স-কপোত-কণ্ঠ, নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তর, সৌরভহারা হতশ্রী যূথী-বেলা-গোলাপ। বাদলের আর্দ্র সমীরণে নবীন ধরণীর মলিন উষালোকে প্রথম চাহনি যে চাহিয়াছিল, ঝঞ্ঝাবৃষ্টির দুর্য্যোগে রাত্রিশেষের ঘনান্ধকারে চিরতরে ঢলিয়া পড়িল তাহারই নিষ্প্রভ আঁখি। এ কি নিদারুণ সামঞ্জস্য!

নববর্ষার দুন্দুভি-নিনাদে বিরহী যক্ষের বিষাদের আলেখ্য সমবেদনায় মূর্ত্ত হয় দরদী-প্রাণে। সেই বর্ষারই অট্টহাসে প্রধূমিত শোকে বেদনা-ব্যথায় মর্ম্মাহত হই আমরা—সত্যেন্দ্রনাথের আত্মীয়-বন্ধু-ভক্তেরা।

অরূপের রূপে, হে প্রাবৃট্‌ সুদূরের যাত্রী করিয়াছ যাহাকে তাঁহারই স্পর্শঘ্রাণ-অনুভূতির আ লালায়িত আজি এই সমবে সুহৃদ্‌-মণ্ডলী—সুদীর্ঘ অষ্ট পরে। বিশ্বরূপ দর্শনান্তে পার্থে আগ্রহাতিশয্যে শ্রীভগবান যেম করিয়া মানুষী-মূর্ত্তি দেখাইলে তেমনই করিয়া স্মিতাস্য মহাপ্রা কবিকে দেখাও দেখি।

২

সত্যেন্দ্রনাথ কবি। জীবিত কালে যাহা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল সেই অমল কবি-খ দিনে দিনে দেশময় ছড়াই পড়িতেছে।

সত্যেন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে নানাদিক দিয়া আলোচনা আবশ্যক।

(ক) সাময়িক প্রসঙ্গ ও ঘটনা লইয়া তিনি উচ্চাঙ্গের কবিতা রচনা করিয়াছেন, বাস্তবে রামধনুর রং ধরাইয়াছেন।

(খ) স্বদেশের এবং মানবজাতি মাত্রেরই ন্যায্য দাবীর এবং নিগৃহীতের প্রতি সহানুভূতি-মন্ত্রের তিনি ঋত্বিক।

(গ) মনুষ্যত্বের বহুধা বিকাশের অভিমুখে তাঁহার হৃদয়-বৃত্তির পরিণতি।

(ঘ) প্রথমশ্রেণীর মৌলিক গীতি-কবিতা-রচনায়, নব নব ছন্দ-সৃষ্টির এবং অনুপম অনুবাদের প্রতিভা। বিশিষ্ট মৌলিক নাটিকা, প্রহসন, উপন্যাস ও ব্যঙ্গকবিতা প্রভৃতি রচনায় কৃতিত্বও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

স্বীয় বৈষয়িক ব্যাপারের প্রতি ঔদাসীন্য, 'মেকি' ও অসুন্দরের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা, মহতের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ও তদ্দারা লোকশিক্ষার প্রচার, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ব্রহ্মচর্য্য, অবাধ দেশপ্রেম ও মাতৃভক্তিমূলক তাঁহার বৈশিষ্ট্য অনেকেরই পরিচিত। এ সম্বন্ধে তাঁহার পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতায়, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় মন্তব্যে, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সত্যেন্দ্র-পরিচয়ে', বর্ত্তমান লেখকের 'সত্যেন্দ্রনাথের কথা' শীর্ষক সন্দর্ভে, 'ভারতী' পত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়ের 'সত্যেন্দ্র-স্মরণে' নিবন্ধে, 'মানসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্রের ও 'নব্যভারতে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোমের প্রবন্ধে অল্পাধিক আলোচনা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতির কবিতায় এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রেও আলোচনা হইয়াছে। বক্তৃতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্যিকগণও সত্যেন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

৩

সাময়িক প্রসঙ্গ সম্পর্কে কবিতারচনায় সত্যেন্দ্রনাথ জীবনের সায়াহ্নে বহুলাংশে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, হিতৈষীরা সেজন্য মৃদু অনুযোগ করেন। তাঁহাকে চিরন্তনের মধ্যে এবং বিশ্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ যে অনেকেরই পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু 'গান্ধীজী', 'চরকা', 'জাতির পাঁতি' ইত্যাদির প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। কাহারও কাহারও মতে উহা সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত। কিন্তু সত্যই কি তাই? লোকানুরাগ কোন্ দিক দিয়া পুষ্পিত ও বর্দ্ধিত হয় তাহার নির্দ্দেশ কে করিবে?

সত্যেন্দ্রনাথ কবি—ভাবপ্রবণ কবি; কর্ম্মী নন। ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের ন্যায় কর্ম্মের ভাবধারা কবিরাই লোকসমাজে বাহিয়া আনেন। অনুকূল বায়ুতাড়িত হইয়া তাহাই একদিন খরস্রোতা তটিনীতে, কখনও বা তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরে পরিণত হয়। ফরাসীবিপ্লব প্রভৃতি এমন অনেক দৃষ্টান্তই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান।

কবির ভাবধারা নিছক আদিরসাশ্রিত বা স্বভাব-বর্ণনা-বহুল নাও হইতে পারে। গত শতাব্দীর বিশ্ব-সাহিত্যে—পদ্যে ও গদ্যে তাহার প্রমাণ ভূরিভূরি। কিন্তু এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে নরনারীর প্রেমাদিঘটিত নব নব ভাবোন্মেষ চিরাচরিত হইলেও তাহাই গত শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কবিকে অমরত্বের ছাপ দিয়া আসিয়াছে—তাহা যে অবিনাশী ও শাশ্বত। পরিচ্ছদের নূতনত্ব ও পারিপাট্যই তাহার ভূষণ। সেকথা সাহিত্যপ্রচেষ্টা মাত্রেই অবশ্য প্রযোজ্য।

সাময়িক প্রসঙ্গে বা মহামানবে যদি চিরন্তনের মূর্ত্তি প্রকটিত হয় এবং বর্ণে ও রেখায় কবির কুহক-তুলিকা যদি তাহাকে জাজ্জ্বল্যমান করিয়া তুলে, বিরহ-মিলন শোক-উল্লাস প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ চিত্রের ন্যায় তাহাও অজর ও অমর। চাই যাদুকরের 'রাফেলী' স্পর্শ, তানসেন-বেঠোভনের স্বর-ঝঙ্কার ও কালিদাস-সেক্সপীয়রের কথার বিন্যাস—যুগে যুগে যাহা রসিকজনের প্রাণে সমভাবে লহর তুলিবে প্রেমের যে-কোন অভিব্যক্তির—শ্রদ্ধা ও ভক্তির, প্রণয়-ভালবাসার,

স্নেহ-বাৎসল্যের, দাস্য-সখ্যের, দেশপ্রেমের, এমন কি দৈনন্দিন প্রয়োজনেরও।

সুতরাং সাময়িক হইলেও যদি তাহাতে অসাধারণত্ব থাকে তাহাও শ্রেষ্ঠ কবিতার বিষয়ীভূত হইতে পারে—'গান্ধীজী' দেশপ্রেমের প্রতীক, 'চরকা' নিরন্নের ও স্বাবলম্বনের প্রতীক, 'স্নেহলতার আত্মবিসর্জ্জন' বা 'নির্জ্জলা একাদশী' সামাজিক অত্যাচারের প্রতিবাদ-নিদর্শন, 'ম্যাক্‌-সুইনীর প্রায়োপবেশন' ও মৃত্যুবরণ রাজরোষের বিরুদ্ধে বিপুল নিষ্ক্রিয় অভিযান।

ফুলের পাপড়ি কেন মেলিল, সন্ধ্যামণি ফুটিল কি না, শুকতারা কখন ডুবিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিহগকূজন মলয়-পবনে ভাসিয়া আসিয়া কখন মুখরিত হইয়া উঠিল—"ফুলের ফসলের" কবি হইলেও সত্যেন্দ্রনাথ কেবল তাহাই দেখিতে ও দেখাইতে, শুনিতে বা শুনাইতে আগ্রহান্বিত ছিলেন না। মহাকবি চণ্ডীদাসের সেই মহাবাণী—

> "সবার উপরে মানুষ সত্য,
> তাহার উপরে নাই"—

সত্যেন্দ্রনাথকে অনুক্ষণ আন্দোলিত করিত। তিনি তারস্বরে গাহিয়াছেন—

> "জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
> সে জাতির নাম মানুষ জাতি।

* * *

> কালো আর ধলো বাহিরে কেবল—
> ভিতরে সবারি সমান রাঙা।"

কৃষক-কবি বার্ণসের এই মহাবাক্য—"Man is man for a' that" তাঁহার প্রাণ বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত। মেথর যে অশুচি নয়—'শুচিতা ফিরিছে পিছনে' এতবড় সম্মানার্হ উক্তি অস্পৃশ্যকে লক্ষ্য করিয়া আর কেহ করিয়াছেন কি না জানি না—বিশেষতঃ আমাদের এই ভারতবর্ষে যেখানে উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাস্নানান্তে রাজপথে লাফাইয়া চলেন পাছে 'শূদ্রের' ছায়া বা 'অশুচির' লেশ তাঁহাদিগকে নিরয়গামী করে! "রাত্রিদিন সর্ব্ব ক্লেদ-গ্লানি ঘুচাইয়া" অস্পৃশ্য মেথর যে শুচিতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে এই কথা বুঝাইয়া কবি 'বন্ধু' সম্বোধনে মেথরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

> "নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ।
> আর তুমি? তুমি তারে করেছ নির্ম্মল।
> এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
> কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।"

অনাচার ও অত্যাচারের উপর সত্যেন্দ্রনাথ খড়্গহস্ত ছিলেন। কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি সামাজিক ক্ষেত্রে যেখানেই অন্যায় বা উৎপীড়ন দেখিয়াছেন অন্তরে দুঃসহ জ্বালা অনুভব করিয়া তীব্রভাষায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। ব্যক্তিগত

সত্যেন্দ্র-জননী—শ্রীমহামায়া দেবী

বা সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতার প্রতিও নিদারুণ কশাঘাত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ব্যক্তিত্বে, কর্ম্মে ও ভাবে যে দিক দিয়াই হউক, মহত্ত্বের প্রকাশ বা প্রচার ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, ব্যক্ত বা গোপন যে ভাবেই থাক্‌ না কেন, তাহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে ও শ্রদ্ধানিবেদনে তিনি সর্ব্বদা জাগ্রত ও মুক্তকণ্ঠ থাকিতেন। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের নির্য্যাতন, দরিদ্র ও অসহায়ের লাঞ্ছনা-বঞ্চনা কোনক্রমেই তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অব্রাহ্মণ-দলন, হিন্দু-বিধবার ও বিবাহ-সূত্রে বালিকা-বধূর নিপীড়নের প্রতি নানা-ভাবে নানাভঙ্গীতে ব্যঙ্গবিদ্রূপে ও খড়্গাঘাতে তিনি তুল্য-রূপে অকুণ্ঠিত ছিলেন। এই সকল স্মরণ করিয়াই কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

"জানি তুমি প্রাণ খুলি'
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম,
করুণ কোমল।"

সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলে এই আলোচনা সুপরিস্ফুট হইবে।

কচি বিধবা মেয়ে একাদশীর উপবাসে 'জল চেয়েছে মা'র কাছে' শুনিয়া 'ধর্ম্ম খ'সে যায় পাছে' এই ত্রাসে আকুল নির্দ্দয় পিতা। এই পিতারই গৃহে আবার বিধবা ভগিনী ও জননীর উপরও একাদশীর নির্জ্জলা উপবাসের উপদ্রব—

"হয় ত রুগ্ন, শরীর ভগ্ন, হয় ত মুহু মূর্চ্ছা যায়,
তবুও মুখে জল দেবে না! ধর্ম্ম যাবে, হায়রে হায়!"

মর্ম্মাহত হইয়া কবি সহৃদয় সংস্কারককে নির্জ্জলা উপবাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতে আহ্বান করিয়াছেন—

কে নেবে এই পুণ্যব্রত? কে হবে মা'র পুত্র গো?
একাদশীর তেপান্তরে খুলবে কে জলসত্র গো?
কে নেবে মন্দারের মালা—মাতৃজাতির আশীর্ব্বাদ,
আশায় আছি দাঁড়িয়ে যে তার কণ্ঠে বিজয়-শঙ্খনাদ।

বরপণের তাণ্ডব-নৃত্যে স্নেহলতা আত্মহত্যা দ্বারা নিজের ও পিতামাতার সকল জ্বালার অবসান করে। 'মৃত্যু-স্বয়ম্বর' আখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ তাহার বর্ণনা করিতেছেন—

"মুলুক জুড়ে' প্রেতের নৃত্য, অর্থপিশাচ হৃদয়হীন
করছে পেষণ, করছে পীড়ন, করছে শোষণ রাত্রিদিন!
ধার করেছেন পুত্রবন্ত, উদ্ধারিবে মেয়ের বাপ,
অকর্ম্মণ্য অহল্যাদের নইলে মোচন হয় কি শাপ!

কন্যা ঘরের আবর্জ্জনা।—পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়,
"পালনীয়া শিক্ষণীয়া"—রক্ষণীয়া মোটেই নয়।
ভদ্র ষাঁড় আছেন দেশে, করেন যাঁরা সত্পতি,
কামড় তাদের অর্দ্ধরাজ্য,—পরের ধনে লাখ-পতি।

হায় অভাগা! বাঙ্‌লা দেশের সমাজবিধির তুল্য নাই,
কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই।
বিয়ে ক'রে কিনবে মাথা,—তা'তেও হবে ঘুষ দিতে,
জামাই যেন জড় পদার্থ,—শ্বশুরকে চাই 'পুশ' দিতে।

*　　*　　*

সত্যিকারের পুরুষ যারা ফিরত নাক' ভিখ্ মাগি,
শিবের ধনুক ভাঙ্‌ত তারা কিশোরীদের প্রেম লাগি'।"

*　　*　　*

অল্পবয়সেই সত্যেন্দ্রনাথ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হন। "হোমশিখা" তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ। উহারই অন্তর্ভুক্ত "সাম্যসামে" তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়—

"মুক্ত রাখ গো মনের দুয়ার, মানুষ এসেছে কাছে,
ঘুচাও বিরোধ, বাধা, ব্যবধান, বিঘ্ন যা-কিছু আছে।

ধরণীর বুকে আছে সঞ্চিত অমের পীযূষ-সুধা,
বলী দুর্ব্বলে ভুঞ্জিবে তাহা, কেহ সহিবে না ক্ষুধা।"

স্বাদেশিকতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার "কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল", "আমরা", "গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি" ইত্যাদি কবিতা দেশপ্রসিদ্ধ। বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্বল্প কথায় তাহার সুসঙ্গত বর্ণনা করিয়াছেন—"জাতি স্বাধীন হয়, সোজা হইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে ইহা তাঁহার হৃদ্‌গত বাসনা ছিল। তাঁহার জীবিতকালে এই ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। কিন্তু তাঁহার কবিতায় যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা দ্বারা তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির সাহায্য হইবে।"

কলিকাতা রেণুয়া ক্লাবে সত্যেন্দ্রনাথের চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহার কিয়দংশ এই—"প্রতিভায় বরপুত্র এই তরুণ কবির অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য এবং বাঙ্গালী জাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ গাহিয়া গিয়াছেন—'বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।' আমার বাঙ্গলা-মায়ের যে বন্দনা-গীতি এই বাঙ্গলার কবি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। সমুদ্র যেমন শত তরঙ্গ-ভঙ্গীতে আমার এই বঙ্গজননীর চরণ-প্রান্তে অশ্রান্ত অনন্ত কলরবে নিরন্তর

বন্দনা-গীতি গাহিতেছেন, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সমুদ্র হইতে এই বন্দনা-গীতিধ্বনি তেমনই আমার কর্ণে বাজিতেছে। আমি বলিতে কিছু মাত্র দ্বিধা করিতেছি না যে এই বন্দনা-গীতি—"কাণের ভিতর দিয়া আমার মরমে" পশিতেছে। জীবনে আমার এমন প্রহর গিয়াছে যখন কবির ঐ বন্দনা-গীতি আমাকে প্রায় পাগল করিয়াছে। আপনারা কি তাহা শুনিবেন ?

"মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে,
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে।

*　　　*　　　*

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।"

সত্যেন্দ্রনাথের পিতা—৺রজনীনাথ দত্ত

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা-দুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পরিণত মনের ভাব তাঁহারি অনুপম ছন্দে বঙ্গসাহিত্যকে উপঢৌকন দিয়া গিয়াছেন।"

নব নব ছন্দসৃষ্টি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের দক্ষতা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এজন্য সত্যেন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিয়াছেন রামমোহন লাইব্রেরীর সভায় কবি-সম্রাট বলেন—"আ কিছুমাত্র বিনয় প্রকাশ না করিয়া স্পষ্টভাবেই বলিতেছি ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গী-গৌরবে সত্যেন্দ্র শুধু যে আমার চে বড় ছিলেন তাহা নহে ; আমার মনে হয় এ পর্য্যন্ত বাঙলা কোন কবিই ছন্দ-বৈচিত্র্যে তাঁহার মত অদ্ভুত কৃতি দেখাইতে পারেন নাই এবং এখনও কেহ পারিতেছেন না।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন—"সকলপ্রকা রস ও সকলপ্রকার ভাবের, চিন্তার ও ঘটনার অনুরূপ ছন্দে সৃষ্টি ও ব্যবহারে এবং শব্দচয়ন ও শব্দবিন্যাসে তাঁহা অসাধারণ দক্ষতা ছিল।"

বস্তুতই বর্ণনীয় বিষয়ের যথাযথ চিত্র মানস-পটে চিরাঙ্কি রাখিতে তাহারই দ্যোতক বহু ছন্দ সত্যেন্দ্রনাথ অবলীল ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন। অনুরূপ শব্দবিন্যাসে সে ব্যঞ্জ অতি হৃদয়গ্রাহী। পাল্কী-বেহারার ছন্দ, পিয়ানোর ছন্দ চরকার ছন্দ—এমন কতই 'নাহি তার ওর'—কোন্‌টা রাখি কোন্‌টার উল্লেখ করিব ? আপনাদের চিত্ত-বিনোদনের জ সামান্য কয়টি উদ্ধৃত করিতেছি—

"ঘোর ঘোর সন্ধ্যায়
ঝাউগাছ দুলছে,
ঢোল-কলমীর ফুল
তন্দ্রায় ঢুলছে।

লক্ লক্ শর-বন
বক্ তায় মগ্ন,
চুপচাপ চারদিক্—
সন্ধ্যার লগ্ন।

চারদিক্ নিঃসাড়,
ঘোর ঘোর রাত্রি,
ছিপ্‌খান্ তিন-দাঁড়,
চারজন যাত্রী।"
—"দূরের পাল্লা" (বিদায়-আরতি)

"বাহুপাশে বাঁধা বাহু গৌরী ও কৃষ্ণা।
কোলাকুলি করে এ কি তৃপ্তি ও তৃষ্ণা!
কালোচুলে পিঙ্গলে এ কি বেণীবন্ধ!
ঘুচে' গেল কালো-গায় গোরা-গায় দ্বন্দ্ব!

সখী-সুখে মুখে মুখে ছুট' নিঃসঙ্গা !
জয় তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !
—'যুক্তবেণী' (বেলাশেষের গান)

"ঝর্ণা ! ঝর্ণা ! সুন্দরী ঝর্ণা !
তরলিত চন্দ্রিকা ! চন্দন-বর্ণা !
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা !
ঝর্ণা !"
—"ঝর্ণা" (বিদায়-আরতি)

"ভোম্‌রার গান গায় চর্‌কায়, শোন্‌, ভাই !
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই !
ঘর-বা'র করবার দর্‌কার্‌ নেই আর,
মন দাও চরকায় আপনার আপনার !
চর্‌কার ঘর্ঘর পড়্‌শীর ঘর-ঘর !
ঘর-ঘর ক্ষীর-সর,—আপনায় নির্ভর !
পড়্‌শীর কণ্ঠে জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !"
—'চরকার গান' (বিদায়-আরতি)

পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিতার অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথের 'তীর্থসলিল', 'মণিমঞ্জুষা' ও 'তীর্থরেণু' এই তিনখানি গ্রন্থের কলেবর পরিপূর্ণ। অতিপ্রাচীন বেদ-বেদাঙ্গ হইতে অতিআধুনিক ব্রিজেস, নোগুচি, ও কাফ্রি-কবি ডানবারের কবিতা পর্য্যন্ত—বিশ্ব-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য যেখানে যাহা-কিছু প্রায় সমস্তই আহরণ করিয়া ছন্দের কারিগর ও ভাষার যাদুকর বঙ্গভারতীর রাতুল চরণে অনুবাদের পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। তাঁহারই ভাষায় শুনুন—

বিশ্ববাণীর বারতা এনেছি বঙ্গের সভাতলে,
ভরেছি আমার সোনার কলস নানা তীর্থের জলে ;
ওগো তোরা আয় আয় !
নিখিল কবির সঙ্গীত ওঠে বঙ্গের বনছায় !
—(তীর্থসলিল)

'তীর্থরেণু'র প্রস্তাবনায়—

তীর্থের ধূলি মুঠি মুঠি তুলি'
করিয়াছি এক ঠাঁই,
বিশ্ব-বীণার তারে তারে তারে
পরশ বুলায়ে যাই।

বিভিন্ন নাটকীয় শিল্পের সহিত বাঙ্গালার পাঠক-পাঠিকার পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটিকার অনুবাদ করেন। তাহাই 'রঙ্গমল্লী' নামে প্রকাশিত হয়। প্রস্তাবনা কি সুন্দর !—

ত্রিভুবন-জোড়া রঙ্গপীঠিকা,
ত্রিকাল-মিলানী গাথা,
উদয়-প্রলয়-নিলয়-রঙ্গে
'রঙ্গমল্লী' গাঁথা।
* * *
মোহন বাঁশির রন্ধ্র ভেদিয়া
উদাসীন শিঙা বাজে,
জনম-মরণ চরণে দলিয়া
নাচেরে নটেশ নাচে।

কবিতা ও কাব্যানুবাদে সত্যেন্দ্রনাথের তুলনা নাই। কবি-প্রতিভা লইয়া যে-সকল ক্ষণজন্মা নরনারী জন্মগ্রহণ করেন, মৌলিক রচনা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ—কল্পনা ও ভাবের সংঘাতে স্বতঃ-উৎসারিত তাঁহাদের সাহিত্য। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বিদেশীয় কবিদের বিশিষ্ট কবিতার অনুবাদে সুর ও লয়, প্রাণ ও ভাষা রক্ষা করা যে কত সাধনার ফল যাঁহারা সে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদগুলি মৌলিক বলিয়াই ভ্রম হয়—ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে মূলের সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্র অব্যাহত। রবীন্দ্রনাথের মতে—"অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তরপ্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহা শিল্পকার্য্য নহে ; ইহা সৃষ্টিকার্য্য।"

সত্যেন্দ্রনাথ যদি মৌলিক কবিতা নাও লিখিতেন, আর্টের চরম বিকাশ হিসাবে শুধুই অনুবাদগুলি তাঁহার নাম সাহিত্য-ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিত। নানা অনুবাদ হইতে নিম্নে সামান্য মাত্র উদ্ধৃত হইল—

'গায়ত্রী' মন্ত্রের অনুবাদ—

"ধেয়াই বরেণ্য সবিতার। রমণীয় দীপ্তি-দেবতার।
আমাদের বুদ্ধি-বিধাতার॥"

মহম্মদের বাণী—

"জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি'
দুটি যদি জোটে তবে অর্দ্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী।
বাজারে বিকায় ফল-তণ্ডুল
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
হৃদয়-প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই তো সুধা।"

কাফ্রি-কবি ডানবারের কবিতা—"জীবন"

"খাবার জন্যে একমুঠা ভাত,
শোবার জন্যে একটি কোণ,
কাঁদবো পুরো একটা বেলা,
হাস্‌তে মোটে একটু ক্ষণ!
আনন্দ সে দু'এক পোয়া,
দুঃখকষ্ট দু'এক মণ,
স্ফূর্ত্তি শত দ্বিগুণ তাহার
মৌন বিষাদ-বিলাপন!
এই জীবন!"

জাপানী কবি নোগুচির—"বরভিক্ষা"

"দাও হেন পতি যাহার মূরতি
হৃদে অহরহ রয়,
জনমের আগে সাথী যে ছিল গো
মরণে যে পর নয়।

জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে
হারায়ে ফেলেছি যায়,
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লী
চেরীফুল মুরছায়।"

সুইনবার্ণের "দ্বিধার জীবনের" কয়েক ছত্র এই—

"কাল! সে বটে সবার প্রভু:—
এড়িয়ে কেহ যায় না কভু;
একটু হাসি-খুসি তবু
ওরি মধ্যে লুটতে হ'বে।
যে ক'টাদিন আছিস্ বেঁচে,
ফিঙের মতন বেড়াস্ নেচে,*
বিশ্ব-ব্যাপার এঁচে এঁচে
মরিস্ নে আর শূন্যে ভাসি'।"

পদ্যানুবাদে যেরূপ গদ্যানুবাদেও সত্যেন্দ্রনাথ তদ্রূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নরোয়ের একখানি বিখ্যাত উপন্যাস "জন্মদুঃখী" নামে তিনি অনুবাদ করেন। অন্যায়-পীড়িত দরিদ্রজীবনের করুণ কাহিনী পাঠে পাষাণ-হৃদয়ও গলিয়া যায়। অনুবাদকের অনুবাদের শক্তির ও মনের গতির সুস্পষ্ট পরিচয়ও উহাতে পাওয়া যায়।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের মতে বাঙ্গালা ভাষা ও ছন্দের উপর সত্যেন্দ্রনাথের যে অসামান্য অধিকার ছিল তাহা আর কাহারও সঙ্গে তুলনীয় নহে। এ সম্বন্ধে বিশ্ব-কবির সহিত

পিতামহ—৺অক্ষয়কুমার দত্ত

যে কাহারও মতদ্বৈধ নাই ইহা অনায়াসে বলা যায়। কিন্তু মৌলিক রচনার ভাব-সম্পদে সত্যেন্দ্রনাথ "খুব বড় ধনী" নহেন, মুষ্টিমেয় কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দের অসামান্য অধিকারে সত্যেন্দ্রনাথ লোক-লোচনের সম্মুখবর্ত্তী সহজেই হন; এই প্রভায় মুগ্ধ ও দৃষ্টি-হারা হইয়া যাঁহারা ভাবের ভাণ্ডার খুঁজিবার অবকাশ পান নাই, মৌলিকতা-রূপী ধনরত্নের সন্ধান তাঁহাদের দৃষ্টির অগোচর থাকিয়া যাইবে, বিচিত্র কি?

প্রকৃতপক্ষে মৌলিক কবিতায়ও সত্যেন্দ্রনাথ যে রসসৃষ্টির ও ভাব-সৌন্দর্য্যের মন্দাকিনী ধারা দেখাইয়াছেন একমাত্র

রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে না। ইহা শুধুই আমাদের কথা নহে ; বিশিষ্ট মনীষীগণের অভিমতও এই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা' ও 'তোড়া' কবিতাদ্বয় ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। বিদেশীয় বিদ্বজ্জন-সমাজে তাহা যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের বহু গীতি-কবিতা যথাযথ অনুবাদিত হইলে যে অনুরূপ সমাদর ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। "বেণু ও বীণা," "হোমশিখা", "কুহু ও কেকা","ফুলের ফসল","অভ্র-আবীর", "তুলির লিখন", "হসন্তিকা", "বেলাশেষের গান" ও "বিদায়-আরতি" এই কয়খানি তাঁহার মৌলিক কাব্যগ্রন্থ। ঝুটা পাথর তাহাতে বিরল ; চুনি-পান্না-মরকতে গ্রন্থগুলি সমুজ্জ্বল। নিম্নে কবির কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল—"গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

"চামেলি তুই বল্
অধরে তোর কোন্ রূপসার
রূপের পরিমল !
কোন্ সে পরী গলার হারে
রেখেছিল কাল তোমারে,
কোন্ প্রমদার সুধার ভারে
টুপটুপে তোর দল !"

—"চামেলির প্রতি" (বিদায়-আরতি)

"স্বপনে স্বপন বাঁধি অঙ্গুলি-স্পর্শে,
আলো ছায়ে হাসি কাঁদি নির্ঝর-বর্ষে।
মোরা পরী অপ্সরী ক্ষিতি অপ তেজ তরি
সঞ্চরি যাই সরি, নব নব হর্ষে।
পবন দুলায়ে যাই শিশুরে ঘুমন্তে
দেয়ালায় হাসে তাই সুখে খোলা দন্তে।
তরুণ আঁখির তায় উঁকি দিই ইসারায়
এ হাসির বিভা হায় কীর্ত্তির পন্থে।"

—"বিদ্যুৎপর্ণা" (তুলির লিখন)

"বসন্তের এই মৌলি মণি আমের মউল পুঞ্জ নে
মৌন আমার মুখর হ'ল মৌমাছিদের গুঞ্জনে !
এই নে আমার আশার স্বপন
এই নে ব্যক্ত এই নে গোপন
এই নে আসল এই নে ফসল এই ফসলের উঞ্ছ নে !
কুন্দফুলের শেষটি নে গো যবের প্রথম শীষটি নে,
সৃষ্টিছাড়ার সৃষ্টি নে এই নে মোর অনাসৃষ্টি নে ;
যা' আছে মোর সম্ভাবনায়
যা' আছে মোর ভয়-ভাবনায়
যা' আছে মোর চিত্তকোণায়—তিক্ত কটু মিষ্টি নে !"

—"অঞ্জলি" (অভ্র-আবীর)

"বিশ্বমহাপদ্ম-লীনা ! চিন্ময়ী ! অয়ি জ্যোতিষ্মতী !
মহীয়সী মহাসরস্বতী !
শক্তির বিভূতি তুমি, তুমি মহাশক্তি সমুদ্ভবা ;
সপ্ত-স্বর্গবিহারিণী ! অন্ধকারে তুমি উষা-প্রভা।
সূর্য্যো- সুপ্ত ভর্গদেব মগ্ন সদা তোমারি স্বপনে ;
সবিতৃ-সম্ভবা দেবী সাবিত্রী সে আনন্দিত মনে
বন্দে ও চরণে।
ছিন্ন-মেঘ অম্বরের নিষ্কল চন্দ্রমা
তুমি নিরুপমা।

মহাসঙ্গীতের রূপে গড়ি' উঠে নিত্য অপরূপ
মানবের পূর্ণ বিশ্বরূপ,—
তোমারি প্রসাদে দেবী ! তুমি যবে হও আবির্ভাব
তখনি তো লক্ষ্যলাভ- তখনি তো মহালক্ষ্মী-লাভ ;
দীপকের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত করি' রুদ্র তালে
জাগো তুমি স্বতন্ত্রা ! রক্ত-রশ্মি রুষ্ট তারা ভালে
যুগ-সন্ধ্যা-কালে ;
কভু ও ললাটে শোভে শুভ্র শুকতারা
পুণ্য-পুঞ্জী-পারা।

—মহাসরস্বতী—(অভ্র ও আবীর)

"মধুর মত মদের মত অধীর-করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো,
অরুণ-অধর, ভ্রমর-আঁখি কালো।
নিশাসখানি পড়্‌লে জোরে হ'তাম গো নিশ্চুপ,—
সে মোহও ফুরালো !
নিবে গেল নিমেষহারা আলো।
মধুর মত মদের মত অধীর-করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো।"

—"তোড়া" (ফুলের ফসল)

মৌলিক কবিতা-রচনায় সত্যেন্দ্রনাথের যেমন অনুপম সৃষ্টিকৌশলের ও ভাবধারায় পরিচয় পাওয়া যায়, গল্পরচনায়, নাটিকায়, আখ্যায়িকায় এবং সাহিত্য-প্রবন্ধেও তাঁহার অপ্রতুল নাই। দুঃখের বিষয়, শেষোক্ত সাহিত্য-চেষ্টার প্রচুর অবসর তাঁহার ঘটিল না। নির্ম্মম কাল অসময়ে তাঁহাকে কর্ম্মজগৎ হইতে অপসারিত করিল। কিন্তু তাঁহার সেই স্বল্প দানেই বঙ্গভারতীর প্রেক্ষাগৃহ সমুজ্জ্বল।

"ধূপের ধোঁয়ায়" ক্ষুদ্র নাটিকা—ক্ষুদ্র হইলেও হীরকখণ্ড। কাষ্ঠহাসি হাসাইবার চেষ্টা উহাতে আদৌ নাই, মামুলি রঙ্গ-রসিকতার লেশও নাই, অথচ হাস্যপরিহাসের অনাবিল ধারার সহিত গল্পাংশ স্বচ্ছ জমাট বাঁধিয়া চলিয়াছে—কল-নাদিনী স্রোতস্বিনী যেমন মন্থরগতিতে নাচিয়া দুলিয়া হাসিয়া ভাসিয়া ছুটে। নিম্নোদ্ধৃত দ্বৈত-সঙ্গীতে পতি-পত্নীর আচরণপার্থক্যের সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—

নকুলিকা॥ তফাৎ করিয়া খাসা ওঁরা দূরে চ'লে যান,
সখীর দল॥ আমরা বসিয়া থাকি আল্‌তো।
নকুলিকা॥ দুনিয়াতে ওঁদেরি যা ফুর্ত্তির প্রাণ সই,
আমরা এসেছি ভেসে ফাল্‌তো।
সখীর দল॥ মিছাই পরেছি পায়ে আলতা,
নকুলিকা॥ মিছাই রেঁধেছি গুড়-চাল্‌তা।
সখীর দল॥ নাল্‌তে ভিজায়ে রাতে
মিছে ছেঁকে দিই প্রাতে,
নকুলিকা॥ পোঁছে নাকো তবু আজকাল তো।
সখীর দল॥ ওরা সব মর্দ্দ—ফুর্ত্তির ফর্দ্দ লম্বা,
নকুলিকা॥ আমাদের বেলা শুধু রম্ভা।
সখীর দল॥ অথচ না হ'লে নারী
দিন চলা হ'ত ভারি,
নকুলিকা॥ হেঁসেলেতে কে উনুন্ আল্‌তো?
সখীর দল॥ অবলা বলিয়া সই সই রে,
এত অপমান জ্বালা সইরে।
নকুলিকা॥ নাহি বাঁচি নাহি মরি,
আঁকড়ে জীবন ধরি,
কি হবে উপায় হায় বল্ তা।
সখীর দল॥ সাথে যেতে কর যদি বায়না,
আরজিটা কানে পৌঁছায় না,
গোড়াতে পারেন পিঠে,
নকুলিকা॥ শেষে কিনা আথ্ থুথু! পল্‌তা।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, শিশু-সাহিত্যে এবং প্রেমে ও অধ্যাত্মবিষয়ক কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের দান কম মূল্যবান নয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত "হসন্তিকা" স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হাসির গানের' সহিত সর্ব্বথা তুলনীয়। শিশুদের জন্য রচিত অতি-সুন্দর কবিতাগুলি এখনও মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত।

'ডঙ্কানিশান' বৌদ্ধযুগের অসমাপ্ত উপন্যাস,—সত্যেন্দ্র-নাথের মৃত্যুর পরে ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। জীবনের সায়ংকালে তিনি এই অভিনব উপন্যাস-রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সমসাময়িক যুগে সামাজিক রীতিনীতির খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত নিপুণ তুলিকায় তিনি রং ফলাইয়াছেন, ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়বৃত্তির পরিস্ফুরণে সেই রঙে নক্সা কাটিয়াছেন অতি পরিপাটি। ঐতিহাসিক জ্ঞানের গরিমায়, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে, ভাষার স্বচ্ছতায় গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ। সম্প্রতি পরলোকগত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক দিক দিয়া বিচারপূর্ব্বক 'প্রবাসী'তে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহার কয়েক পংক্তি এই—"সত্যেন্দ্রনাথের 'ডঙ্কানিশান' সম্পূর্ণ হইলে বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস হইত। নাম, উপাধি, পারি-পার্শ্বিক ঘটনা—সকল বিষয়েই ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। যদি কেহ উপাদেয় ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়িতে চান তবে তিনি যেন এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসখানাই পাঠ করেন। যদি কেহ বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন তাহা হইলে কবি সত্যেন্দ্রনাথের এই উপন্যাসখানি তাঁহার আদর্শ হইবার যোগ্য।"

সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ "ভারতী", "প্রবাসী" প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলিও অতি উপাদেয় রচনা। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীগণ মুক্তকণ্ঠে উহার উচ্চ প্রশংসা করেন।

ছন্দ সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ "ছন্দ-সরস্বতী" নামে সরস গ্রন্থ রচনা করেন। উহা পাঠের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারাই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছেন—এইরূ

ললিত সরস রচনা পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যেই দুর্লভ। ইভাবে একখানি বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়নের সত্যেন্দ্রনাথের অভিলাষ ছিল, সামান্য কিছু মুসাবিদাও হইয়াছিল, এই পর্য্যন্ত! বঙ্গসাহিত্যের একান্তই দুর্ভাগ্য যে কবির কামনা কল্পনার খেয়ালেই নিবদ্ধ রহিয়া গেল!

৫

ষোল বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম কবিতা-পুস্তক 'সবিতা'' গোপনে প্রকাশ করেন। বালকের লেখনী-মুখে বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্রের এবং কবিতার উদ্দাম সুরের সমন্বয় দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। কবির ভবিষ্যৎ যশ সমুজ্জ্বল এই কবিতা-পুস্তকে তাহা সম্যক সূচিত।

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা পিতামহ অক্ষয়-কুমার দত্তের ন্যায় সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানের তৃষ্ণা অদম্য ও অনুশীলন বহুমুখ। কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস, জ্যোতিষ, দর্শন, বিজ্ঞান—এমন কি গুপ্তবিদ্যা অবধি বহু বিষয়েই সত্যেন্দ্রনাথের অধিকার ও জ্ঞান প্রবল ও পর্য্যাপ্ত। সাহিত্য-ক্ষেত্রে লব্ধ জ্ঞানের পূর্ণ পরিচয়দানের যথোচিত অবসর তিনি পান নাই—ভগ্নস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যু তাঁহার অনেক সাধেই বাদ সাধিল।

পঁচিশ হইতে চল্লিশ—মাত্র এই ১৫ বৎসর কালব্যাপী তাঁহার সাহিত্যিক জীবন এবং তাহাও আবার উদর ও চক্ষু-রোগের উৎপীড়নে জর্জ্জরিত। এই স্বল্পকালেই সত্যেন্দ্রনাথ পৃথিবীর নানাদেশের ন্যূনাধিক ৫৪৫টি উৎকৃষ্ট কবিতার অনুপম অনুবাদের মণিহার গ্রথিত করেন এবং ৫ খানি অনুবাদের গ্রন্থ এবং সর্ব্বোপরি ১০ খানি উচ্চ-শ্রেণীর কাব্য-গ্রন্থ ও নাটিকাদি রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন অদ্যাবধি মাসিক পত্রে বিক্ষিপ্ত বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রভৃতিতে বঙ্গসাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সম্যক পরিচয়দান এই স্বল্প-পরিসর সন্দর্ভে সম্ভব নয়। তাঁহার মৃত্যুদিনে তাঁহাকে নিকটে অনুভব করিবার জন্য এই প্রয়াস মাত্র। হয় ত ব্যর্থপ্রয়াস, কে জানে! যে প্রতিভা ১৫ বৎসরে কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, প্রহসনে, ব্যঙ্গে, শিশু-কবিতায় ও প্রবন্ধে —উচ্চ শ্রেণীর রচনা-সম্ভারে বাঙ্গালা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে তাহার বিশ্লেষণ-সমালোচন তাঁহাদেরই হাতে—কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ভাষায়—"আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,

দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীতরূপে আপনারে ক'রে গেলে দান
দূরকালে।"

সত্যেন্দ্রনাথের বাণী—"যৌবনে দাও রাজটীকা।" সেই যৌবনান্তে চল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইতে না হইতে তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি—বর্ষায় তাঁহার উদয় ও বিলয়ের ন্যায় কি ইঙ্গিতপূর্ণ!

* *

চক্ষে রুদ্ধ অশ্রুর বেগ ও বক্ষে তরুণ শোকের সাড়া লইয়া, হে সমবেত বন্ধুগণ, এখন আপনাদের নিকট বিদায় চাহি—পাথেয় শুধুই কবির আশ্বাস-বচন—

"মরণ মরণ নয়
জীবন-শিখায় গোপন আধারে ক্ষয়হীন সঞ্চয়।" *

শ্রীকালীচরণ মিত্র

* এই প্রবন্ধের মুদ্রাঙ্কণ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে কোনো বিশিষ্ট বন্ধু এই মাসের "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের "সত্যেন্দ্র-পরিচয়" শীর্ষক গুণব্যঞ্জক প্রবন্ধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উহাতে কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে।

১। সন ১৩২৮ সালে সত্যেন্দ্রনাথ লোকলীলা সম্বরণ করেন নাই—করিয়াছিলেন ১৩২৯ সালে।

২। সত্যেন্দ্রনাথের ৪ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় নাই—হইয়াছিল ২০ বৎসর বয়সে।

৩। পিতামহ অক্ষয়কুমারের নিকট সত্যেন্দ্রনাথের শিক্ষা-[illegible] নাই। অক্ষয়কুমারের যখন মৃত্যু হয় তখন সত্যেন্দ্রের বয়স ৪ বৎসর মাত্র। দশম বৎসর বয়ঃক্রমের পর হইতে সত্যেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান লেখকের সহিত একত্র বাস করিয়া তাঁহারই তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপরেও বর্ত্তমান লেখকের সংবাদপত্রাদি-সম্পাদন ও সাহিত্যসেবার আবেষ্টনীর মধ্যে কবির প্রথম-জীবন অতিবাহিত হয়।

যথাস্থানে আমরা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, অধুনালুপ্ত 'কল্লোল' এবং অন্যান্য সাহিত্য-পত্রে বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি সুলেখকগণ সত্যেন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে ইদানীং বিশ্লেষণ-মূলক ও [illegible]।

যুগ-সন্ধি

—উপন্যাস— শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি এল, বি-সি-এস্

দ্বিতীয় স্তবক

৩

ক্ষুদ্র সেনার মহাসংগ্রাম

ভেণ্ডিয়ান কৃষক-সৈন্তেরা ডল-এ পৌঁছিয়া কিরূপ এলোমেলো-ভাবে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা পথশ্রমে ক্লান্ত ছিল, আহারাদি সমাপন করিয়া মালা জপ করিতে করিতে বড় রাস্তার যেখানে সেখানে শুইয়া পড়িয়া ঘুম দিল। স্থানটি রক্ষার বন্দোবস্ত মোটের উপর কিছুই হইল না।

নিশাগমের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। কাহারও কাহারও পার্শ্বে তাহাদের স্ত্রীগণ শায়িত ছিল। কৃষকরমণীরা অনেক সময়ে স্বামীদের অনুবর্ত্তী হইত। তাহাদের মধ্যে যাহারা হৃষ্ট ও সবলকায়, তাহারা গোয়েন্দার কার্য্য করিত। জুলাই মাসের স্নিগ্ধমধুর রাত্রি; সুনীল আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি হীরকখণ্ডের মতো জল্ জল্ করিতেছিল। স্থানটা ছাউনির মতো মোটেই দেখাইতেছিল না; মনে হইতেছিল এ যেন পর্য্যটক-যাত্রীগণের বিশ্রামের আড্ডা। সকলেই বিশ্রামসুখে মগ্ন। সহসা রাত্রির অস্পষ্টালোকে তখনো যাহারা জাগ্রত ছিল তাহারা দেখিতে পাইল, বড় রাস্তার প্রবেশপথে তাহাদিগের অভিমুখে তিনটি কামান স্থাপিত হইয়াছে।

গভেনের গোলন্দাজ সৈন্ত ভেণ্ডিয়ান সৈন্তের প্রধান রক্ষীদলকে অতর্কিত আক্রমণে পরাভূত করিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছে—বড় রাস্তার একপ্রান্ত এখন তাহার সেনাদলের অধিকৃত!

একজন কৃষক চমকিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"হুকুমদার?" এবং সেই দিকে বন্দুক ছুঁড়িল। প্রত্যুত্তরে তোপ গর্জ্জিয়া উঠিল। তারপর বন্দুকের পটাপট-শব্দ। তন্দ্রাতুর ভেণ্ডিয়ানগণ চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল। নক্ষত্রোজ্জল শান্ত নীলাকাশের নীচে শুইয়া পড়িয়া সহসা গোলাগুলির কন্দুক-ক্রীড়ার মধ্যে জাগিয়া উঠা—কি দারুণ অবস্থাবিপর্য্যয়! এই আকস্মিক জাগরণের পর কিছুক্ষণের জন্ত ব্যাপার অতি সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল। বজ্রাহত জনগণের ইতস্ততঃ ছুটাছুটির মতো হৃদয়বিদারক ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। তাহারা চীৎকার করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে অনেকেরই পতন ও মৃত্যু হইল। আক্রান্ত কৃষকগণের আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রহিল না; অন্ধকারে নিজেরাই পরস্পরকে গুলি করিয়া মারিতে লাগিল; ভীত, ত্রস্ত নগরবাসীরা উন্মাদের মতো জনতার মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাহাদের আর্ত্তনাদে নৈশাকাশ পূর্ণ হইয়া উঠিল। এলোমেলো, বিশৃঙ্খল ভয়ঙ্কর লড়াই—ইহার মধ্যে স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাও জড়িত; মাথার উপর দিয়া কামানের জলন্ত গোলা সোঁ করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে—আর তাহার আলোকে রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ হইতেছে। চারিদিকে ধূম ও কোলাহল। অশ্বগুলি দুর্ব্বার হইয়া উঠিল। আহতেরা পদদলিত হইতে লাগিল। অশ্বের হ্রেষা, অস্ত্রের ঝন্ঝনা, মুমূর্ষুর চীৎকার—সর্ব্বোপরি কামান-গর্জ্জন।—কি ভীষণ!

গভেন আড়াল হইতে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। বনের মধ্যে কাঠুরিয়ার কুঠারাঘাতে যেমন করিয়া বৃক্ষসকল নিপতিত হইতে থাকে, তেমনই করিয়া এই কৃষককুল গুলি-বিদ্ধ হইয়া একে অন্যের উপর পড়িয়া যাইতে লাগিল।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও তাহাদের সাহসের অভাব ছিল না। ক্রমে তাহারা আত্মরক্ষার একটা উপায় করিয়া লইল। তাহারা পিছু হটিয়া গিয়া বাজারের মধ্যে কতকগুলি স্তম্ভশ্রেণীর পশ্চাতে আশ্রয় লইল। ল্যান্টিনেকের অনুপস্থিতি-জনিত অভাব ইমানুস্ যথাসাধ্য পূরণ করিতে লাগিল। তাহাদের কামান ছিল, কিন্তু গভেনের নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল যে, তাহারা তাহা

ব্যবহার করিতেছে না। ইহার কারণ এই যে, গোলন্দাজগণ ল্যান্টিনেকের সঙ্গে ডল্ পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছিল। কৃষকেরা কামান-পরিচালনে অভ্যস্ত ছিল না। টব, পিপে, পুরানো আসবাব যাহা-কিছু এই বাজারের মধ্যে হাতের কাছে পাওয়া গেল, তাহাই সম্মুখে স্তূপাকারে সজ্জিত করিয়া একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতন তৈরি করা হইল। তাহার পশ্চাৎ হইতে তাহারা গুলি চালাইতে লাগিল।

গভেনের পক্ষে ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। বাজার সহসা অভাবিতরূপে দুর্গে পরিণত হইল। এই দুর্গাভ্যন্তরে অসংখ্য কৃষকসৈন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। গভেনের অতর্কিত আক্রমণ এই পর্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনো পরাজয়ের আশঙ্কা রহিয়াছে। গভেন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার হাতদুইটি বুকের উপর স্থাপিত —একহাতে মুষ্টিবদ্ধ উন্মুক্ত তরবারি মশালের আলোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

তাহার দীর্ঘ দেহের উপর আলোকের আভা নিপতিত হওয়াতে, গভেন অবরোধের পশ্চাদ্বর্তী কৃষকসেনার দৃষ্টি-গোচর হইয়া উঠিল। তাহারা সকলেই তাহার দিকে বন্দুক লক্ষ্য করিল। গভেনের সেদিকে খেয়াল নাই। তাহার চতুষ্পার্শে গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল। গভেন চিন্তাসাগরে মগ্ন—ভ্রূক্ষেপহীন।

কিন্তু তাহার কামান রহিয়াছে। যাহার কামান আছে, তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ে কৃষকসেনার উপরে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব।

সহসা অন্ধকারাচ্ছন্ন বাজারের দিকে বিদ্যুতের মতো একটা দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিল, এবং বজ্র-নির্ঘোষের মতো আওয়াজ হইল। গভেনের মাথার উপর দিয়া একটা গোলা ছুটিয়া গেল। গভেনের তোপধ্বনির প্রত্যুত্তর এখন তোপধ্বনিতেই হইল। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই নূতন কিছু ঘটিয়াছে। কামান এখন আর শুধু একদিকে নয়।

প্রথম গোলার পরেই আর একটি গোলা আসিয়া গভেনের পার্শ্ববর্তী দেওয়ালে প্রোথিত হইল। গোলাতে তাহার হ্যাট উড়াইয়া গেল। বেশ ভারী গোলা —১৬ পাউণ্ড ওজনের।

গোলন্দাজগণ চীৎকার করিয়া উঠিল, "সেনাপতি, উহারা আপনাকে লক্ষ্য ক'রে গোলা ছুঁড়ছে।"

তাহারা মশাল নিবাইয়া দিল। গভেন স্বপ্নমুগ্ধের মতো হ্যাটটি ভূমিতল হইতে তুলিয়া লইল।

বাস্তবিকই গভেনকে লক্ষ্য করিয়া কেহ তোপ দাগিতেছিল। ইনি ল্যান্টিনেক। মার্ক্ইস এইমাত্র বিপরীত দিক হইতে বাজারের অবরোধের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

ইমানুস তাঁহার দিকে দৌড়িয়া গিয়া বলিল, "মনসেইনিয়র, আমরা অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়াছি।"

"কে এই আক্রমণকারী?"

"জানি না।"

"দিনানের পথ কি উন্মুক্ত?"

"আমার তো তাই মনে হয়।"

"তা হ'লে আমাদের এখনই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

"তা আরম্ভ হ'য়েছে। অনেকে ইতিমধ্যেই পালিয়ে গেছে।"

"দৌড়ে পালালে চল্‌বে না। সুশৃঙ্খলভাবে হ'টে যেতে হবে।"

"লোকগুলি হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়েছিল। বিশেষতঃ তাদের নায়কেরা এখানে ছিল না।"

"আমি এসেছি।"

"মনসেইনিয়র, যতদূর পারা গেছে মালামাল, স্ত্রীলোক, এবং যা-কিছু অকেজো—সব আমি ফুজার্সের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি। বাচ্চা-বন্দী তিনটির কি করা যাবে?"

"ওহো,—সেই ছেলেমেয়েগুলি!"

"হাঁ।"

"তারা আমাদের প্রতিভূ। তাদের লাটুর্গ দুর্গে নিয়ে যাও।"

এই বলিয়া মার্ক্ইস অবরোধের মধ্যে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। সেনাপতির আগমনে সৈন্যগণের সাহস আবার ফিরিয়া আসিল। অবরোধের ফাঁকের মধ্যে মার্ক্ইস্

দুইটি কামান স্থাপন করিলেন। কামানের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ফাঁকের ভিতর দিয়া শত্রুর কামানের অবস্থান লক্ষ্য করিতে করিতে মার্ক্ ইস্ গভেনকে দেখিতে পাইলেন।

"সে-ই ত বটে!" তিনি বলিয়া উঠিলেন। তারপর নিজের হাতে কামানে বারুদ পুরিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন।

তিনি তিনবার তোপ দাগিলেন। তিনবারেই তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

"আমি কি আহাম্মক!—" বিড় বিড় করিয়া মার্ক্ ইস মন্তব্য করিলেন। "আর একটু নীচু দিয়া গোলা চালাইলেই আমি তার মাথাটা নিতে পারতাম্।"

এমন সময়ে মশালটা নির্ব্বাপিত হইল, এবং মার্ক্ ইসের সম্মুখে আবার সব অন্ধকার হইয়া গেল।

"তাই হোক্।"—এই বলিয়া মার্ক্ ইস্ কৃষক-গোলন্দাজগণের দিকে ফিরিয়া আদেশ দিলেন, "ওদের দিকে এখন গোলা চালাও।"

এদিকে গভেনও নিশ্চিন্ত ছিল না। ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কে বলিতে পারে, এই কৃষক-সৈন্য, যাহারা এতক্ষণ শুধু আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল, অতঃপর আক্রমণ করিবে না? তাহারা এখন কামান ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হত ও পলায়িতদিগকে বাদ দিলেও তাহার সম্মুখে এখনো অন্যূন পাঁচ হাজার কৃষক-যোদ্ধা রহিয়াছে; অথচ তাহার নিজের আছে মাত্র বারশত কর্ম্মক্ষম সৈন্য। শত্রুগণ তাহাদের এই সংখ্যাল্পতা বুঝিতে পারিলে সাধারণতন্ত্রীদের আর রক্ষা নাই! অবস্থা এখন ঠিক উল্টো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতক্ষণ গভেন ছিল আক্রমণকারী—এখন হয় তো সে-ই হইবে আক্রান্ত। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ!

কি করা যায়? এই অবরোধের পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যদিগকে এখন আর সম্মুখ হইতে আক্রমণ করা যায় না। ইহা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ হইবে। বারশত লোক পাঁচ সহস্র লোককে স্থানচ্যুত করিতে পারে না। তাহাদের উপর গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়া—অসম্ভব, অথচ অপেক্ষা করাও মহাবিপদ। এখনই একটা কিছু উপায় করা চাই।

গভেন এই প্রদেশেরই লোক। সহরটি তাহার পরিচিত। তাহার জানা ছিল, যে বাজারে ভেণ্ডিয়ানরা জমিয়াছে তাহার পশ্চাদ্ভাগে অসংখ্য আঁকা-বাঁকা গলি-ঘুঁজির গোলকধাঁধা। নিজের সহকারীর দিকে ফিরিয়া গভেন বলিল, "গেচাম্প, এখানকার ভার আমি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। যত পার, গোলা চালাও। বাজারের লোকগুলিকে মোটে অবসর দিবে না।"

"বুঝ্‌লাম।"—গেচাম্প উত্তর দিল।

"সমস্ত কামানে বারুদ পুরে' তোমার সব সৈন্যকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত রাখ্‌বে।"

তারপর গভেন গেচাম্পের কানে কানে কয়েকটি কথা বলিয়া পুনরায় প্রকাশ্যে বলিল, "আমাদের ড্রামবাদকেরা সব প্রস্তুত?"

"হাঁ।"

"তারা নয়জন। তুমি দু'জনকে রাখ। আর সাতজনকে আমি চাই।"

সাতজন ড্রামবাদক গভেনের সম্মুখে নীরবে সার দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

তারপর গভেন উচ্চকণ্ঠে বলিল, "লালপল্টনের সৈন্যগণ!"

মূল সেনাদল হইতে দ্বাদশজন বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে একজন সার্জ্জেণ্ট।

গভেন বলিল, "আমি সমগ্র ব্যাটালিয়ান চাই।"

সার্জ্জেণ্ট জবাব দিল, "এই ত' আমরা।"

"তোমরা মোটে বারজন!"

"আমাদের ব্যাটালিয়ানের এইমাত্রই অবশিষ্ট আছে।"

"উত্তম।"

এ হইতেছে সেই কঠোর-প্রকৃতি, ভাল মানুষ—সার্জ্জেণ্ট রাডুব, যে "লালপল্টনের" নামে লা-সাড্রের অরণ্যে প্রাপ্ত ছেলে-মেয়ে তিনটিকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

পাঠকবর্গের মনে থাকিতে পারে—হার্ব-এন-পেলে কেবল অর্দ্ধ-ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিহত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে রাডুব তাহাদের মধ্যে ছিল না।

একটা খড়-বোঝাই গাড়ী নিকটেই ছিল। তাহার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া গভেন বলিল, "সার্জ্জেণ্ট,

তোমার সৈন্যদিগকে খড়ের দড়ি পাকিয়ে তা দিয়ে বন্দুক-গুলি জড়িয়ে নিতে বল, যেন সেগুলির পরস্পর ঠোকা-ঠুকিতে শব্দ না হয়।"

অন্ধকারে নিঃশব্দে এই হুকুম তামিল হইল।

সার্জ্জেন্ট বলিল, "হ'য়েছে।"

গভেন আদেশ দিল, "সৈনিকগণ, তোমাদের জুতা খুলে' ফেল।"

"জুতা আমাদের নাই—" সার্জ্জেন্ট জবাব দিল।

ড্রামবাদকগণ সহ তাহারা উনিশ জন। গভেনকে লইয়া কুড়িজন হইল।

"তোমরা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস—একে একে। আমার পরেই ড্রামবাদকগণ—তারপর ব্যাটালিয়ন। সার্জ্জেন্ট,—তুমি তোমার ব্যাটালিয়নের সেনাপতি।"

দুই পক্ষই যখন গোলাগুলি চালাইতেছিল, তখন এই কুড়িজন লোক ছায়ার মতো সরিয়া গিয়া জনহীন গলি-ঘুঁজির মধ্যে ডুব দিল। সমস্ত সহর যেন মৃত! নগর-বাসীরা স্ব-স্ব গৃহে ভূমিতলের কক্ষে লুক্কায়িত। গৃহদ্বার সব অর্গলিত, জানালাগুলি বন্ধ। আলোকের রেখা-মাত্র কোথাও দেখা যায় না।

এই নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল বড় সড়কটিতেই গোলমাল চলিতেছে। রাজপক্ষের এবং সাধারণতন্ত্রের কামান-গর্জ্জনের বিরাম নাই।

প্রায় বিশ মিনিট কাল আঁকা-বাঁকা গলিঘুঁজিতে কুচ করিয়া গভেন অবশেষে বাজারের অপর পার্শ্বে বড় সড়কের উপর আসিয়া উপনীত হইল। এইদিকে কোন বাধা—অবরোধ নাই। বাজারের পথ মুক্ত—অবারিত। ভেণ্ডিয়ানরা—অবিমৃষ্যকারিতাবশতঃ পশ্চাৎদিক-রক্ষার কোন বন্দোবস্ত করে নাই। সত্য, গভেন এবং তাহার উনিশ জন অনুবর্ত্তীর সম্মুখে এখানেও পাঁচ হাজার ভেণ্ডিয়ান সৈন্য। কিন্তু এখন অবস্থানের পরিবর্ত্তন হইয়াছে—তাহাদের সামনে এখন ভেণ্ডিয়ানদিগের পৃষ্ঠদেশ, মুখ নহে।

গভেন নিম্নস্বরে সার্জ্জেন্টকে কি বলিলেন। সৈন্যগণ তাহাদের বন্দুক হইতে খড়ের দড়িগুলি খুলিয়া ফেলিল। গলির মোড়ের পেছনে বারজন সৈনিক সার দিয়ে দাঁড়াইল; সাতজন ড্রামবাদক উত্তোলিত কাঠি হস্তে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। ওদিকে থাকিয়া থাকিয়া তোপধ্বনি হইতেছিল। সহসা দুই তোপধ্বনির ব্যবধানের মধ্যে গভেন তাহার তরবারি আকাশে আন্দোলিত করিয়া জলদমন্দ্রে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ডাইনে ছ'শ—বাঁয় ছ'শ—বাকী সব মধ্যস্থলে।"

বার'টি বন্দুক হইতে সশব্দে গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; সাতটি ড্রাম একসঙ্গে বিপুল গর্জ্জনে বাজিয়া উঠিল।

গভেন নীলদলের যুদ্ধ-মন্ত্র উচ্চারণ করিল—"সঙ্গীন চালাও!—ঝাঁপিয়ে পড় ওদের উপর!"

ইহার ফল হইল অতি আশ্চর্য্য।

কৃষকগণ মনে করিল তাহারা পশ্চাৎদিক হইতে অপর-এক নূতন সৈন্যদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। ঠিক সেই-সময়ে ড্রামের শব্দ শুনিতে পাইয়া গেচাম্পের সৈন্যগণ অগ্রসর হইল এবং সম্মুখ হইতে কৃষকসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। কৃষকদের মনে হইল, তাহারা বেড়া-আগুনের মধ্যে পড়িয়াছে। আতঙ্ক বিপদকে আরও বাড়াইয়া তোলে; একটি পিস্তলের আওয়াজকে তোপধ্বনি বলিয়া ভ্রম হয়—ভীত কল্পনায় কুকুরের চীৎকারও সিংহগর্জ্জনবৎ মনে হয়। ইহার উপর আবার মনে রাখিতে হইবে যে, খড় যেমন সহজেই জ্বলিয়া উঠে কৃষকেরাও তেমনি সহজেই ভয়াক্রান্ত হয়। খড়ের আগুন অচিরেই প্রচণ্ড দাবদাহে পরিণত হয়; কৃষকদের ভীতিও সেইরূপ অনতিবিলম্বে ছত্রভঙ্গ ঘটায়। তাহাদের মধ্যে বিশৃঙ্খল পলায়ন আরম্ভ হইল।

কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে বাজার খালি হইয়া পড়িল। ভীত গ্রাম্যজনগণ যে যেদিক পারিল দৌড়িতে লাগিল। সৈন্যাধ্যক্ষ-গণ তাহাদিগকে থামাইতে পারিল না। ইমানুস নিরর্থক পলায়নপর দুই-একজনকে বধ করিল। "জান বাঁচাও, জান বাঁচাও," এই কথা ভিন্ন আর কিছু শোনা যায় না। ঝটিকা বাতাসে মেঘ যেমন আকাশের অসীম বিস্তারের মধ্যে নিমেষে ছড়াইয়া পড়ে, এই কৃষকদলও সেইরূপ চতুর্দ্দিকে গ্রামে গ্রামে অবিলম্বে ছড়াইয়া পড়িল।

মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক এই পলায়ন লক্ষ্য করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে, শান্তভাবে সকলের পরে হটিয়া

আসিতে আসিতে তিনি বলিলেন, "নিঃসন্দেহ কৃষক দিয়া চলিবে না ; ইংরাজদিগকে আমাদের চাই।"

"দ্বিতীয় বার"

গন্ডেনের সম্পূর্ণ ই জয় হইল।

লালপল্টনের ব্যাটালিয়নের দিকে ফিরিয়া গন্ডেন বলিল, "তোমরা সংখ্যায় বারোজন কিন্তু বীরত্বে সহস্র সৈনিকের তুল্য।"

তখনকার কালে সেনাপতির প্রশংসাই ছিল সৈন্যগণের একমাত্র সম্মান-পদক।

গন্ডেনের আদেশে গেচাম্প নগর-বাহিরে পলায়নপর ভেণ্ডিয়ানদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অনেককে ধৃত করিল।

মশাল জ্বালিয়া সমস্ত সহর তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল। যাহারা পলাইতে পারে নাই তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। রাস্তাগুলি মৃত ও মুমূর্ষুতে আস্তীর্ণ। কতিপয় দুঃসাহসী মরিয়া হইয়া তখনও এখানে সেখানে যুঝিতেছিল; তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া নিরস্ত্র করা হইল।

গন্ডেন লক্ষ্য করিল, এই উন্মত্ত, বিশৃঙ্খল পলায়নের মধ্যে সুগঠিতদেহ, ক্ষিপ্রকর্ম্মা এক ব্যক্তি অকুতোভয়ে সকলের নির্ব্বিঘ্নে পলায়নের সহায়তা করিতেছিল। কিন্তু নিজকে বাঁচাইবার জন্ত তাহার কোনো চেষ্টাই নাই। এই কৃষকের বন্দুক নল হইতে ক্রমাগত অগ্নি-উদ্গীরণ করিতে করিতে এবং বাঁট দিয়া বিপক্ষগণকে অবিরাম আঘাত করিতে করিতে একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। এখন তাহার এক-হাতে পিস্তল আর একহাতে তলোয়ার। সাহস করিয়া কেহ তাহার নিকট যাইতে পারিতেছিল না। সহসা গন্ডেন দেখিল, লোকটি যেন মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার মতন হইল এবং পথপার্শ্বের একটা স্তম্ভে ভর দিয়া নিজের আসন্ন-পতন নিবারণ করিল। এইমাত্র সে আহত হইয়াছে। কিন্তু তাহার মুষ্টিবদ্ধকরে পিস্তল ও তরবারি তখনও ধৃত। গন্ডেন নিজের তরবারি বাহুনিয়ে স্থাপন করিয়া লোকটির নিকট উপস্থিত হইল, বলিল, "আত্মসমর্পণ কর।"

লোকটি স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ক্ষত হইতে রক্তধারা বস্ত্র সিক্ত করিয়া বহিয়া আসিয়া পাদমূলে ভূমিতল আর্দ্র করিতেছিল।

গন্ডেন বলিল, "তুমি আমার বন্দী ;—কিন্তু তোমার তারিফ্ করচি। তুমি খুব বীর।"—এই বলিয়া গন্ডেন তাহার দিকে হস্ত প্রসারিত করিল।

লোকটি তখন বলিয়া উঠিল, "রাজা দীর্ঘজীবী হৌন।" তারপর সে একবার শেষচেষ্টায় শরীরের অবশিষ্ট শক্তি সংগ্রহ করিয়া হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক গন্ডেনের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িল এবং তাহার মাথায় তরবারি দিয়া আঘাত করিল।

বাঘের মতো ক্ষিপ্রতার সহিত সে এই কার্য্যটি করিয়াছিল। কিন্তু আর-একজনের অধিকতর ক্ষিপ্রতায় তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে একজন অশ্বারোহী অলক্ষিতভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। ভেণ্ডিয়ানকে তাহার তরবারি ও পিস্তল উঠাইতে দেখিয়া এই ব্যক্তি তাহার ও গন্ডেনের মাঝখানে গিয়া ছুটিয়া পড়িল। এরূপ না করিলে সেই মুহূর্ত্তেই গন্ডেনের মৃত্যু হইত। পিস্তলের গুলি অশ্ব-গাত্রে বিদ্ধ হইল, আর তরবারির আঘাত নিপতিত হইল অশ্বারোহীর উপর। উভয়েই পড়িয়া গেল। পলকমধ্যে এই সব সংঘটিত হইল।

ভেণ্ডিয়ানও অবসন্ন হইয়া পাকা সড়কের উপর পড়িয়া গেল।

তরবারির আঘাত আগন্তুকের মুখের উপর লাগিয়াছিল। সে রাস্তায় প্রস্তরের উপর সংজ্ঞাহীনভাবে পড়িয়াছিল। অশ্বটি ইতিপূর্ব্বেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

গন্ডেন তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, "কে এ ?"

সে লোকটিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার সমগ্র বদনমণ্ডল রক্তাপ্লুত। অবয়ব ঠিক ঠাহর করা যায় না। তবে তাহার ধূসর কেশরাশি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

গন্ডেন বলিল, "এই লোকটি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে ; একে কেউ চেনে কি ?"

একজন সৈনিক বলিল, "সেনাপতি, কয়েক মিনিট পূর্ব্বে ইনি পণ্টর্সনের পথে নগরে প্রবেশ করেন। প্রবেশকালে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই।"

প্রধান অস্ত্রচিকিৎসক অস্ত্রাদি লইয়া সত্বর উপস্থিত হইল, এবং লোকটির জখম পরীক্ষা করিয়া বলিল, "এ কিছুই নয়—সহজ কাটা। সেলাই ক'রে দিলে সপ্তাহ-মধ্যে সেরে উঠ্‌বে। তরবারির আঘাতটি হ'য়েছিল কিন্তু খুব চমৎকার।"

মূর্চ্ছিত আগন্তুকের গায়ে লম্বা ওভারকোট, এবং ত্রিবর্ণের বন্ধনীর মধ্যে পিস্তল ও তরবারি নিবদ্ধ। তাহাকে একটা খড়ের বিছানায় শোওয়ান হইল। ডাক্তার তাঁহার মুখমণ্ডল জল দিয়া বেশ করিয়া ধৌত করিয়া দিলেন। গভেন তখন মনোযোগের সহিত তাহার মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহার সঙ্গে কোন কাগজপত্র আছে কি?"

ডাক্তার আগন্তুকের কোটের পকেটে হাত দিয়া তাহার পকেট-বুক বাহির করিয়া গভেনের হাতে দিলেন।

এদিকে আহত আগন্তুক শীতল সলিল-সংস্পর্শে সংজ্ঞালাভ করিয়া ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।

গভেন পকেট-বুকটি পরীক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে চার-ভাঁজ-করা একখণ্ড কাগজ প্রাপ্ত হইল, এবং তাহা খুলিয়া পাঠ করিল—"কমিটি অব পাবলিক-সেফ্‌টি। সিটিজেন সিমুর্দ্যান।"

বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া গভেন বলিয়া উঠিল, "সিমুর্দ্যান!"

এই চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া আহত তাঁহার নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিলেন।

গভেন একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল।

"আপনি, সিমুর্দ্যান! এই দ্বিতীয়বার আপনি আমার জীবন রক্ষা করলেন!"

সিমুর্দ্যান তাঁহার দিকে নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার রক্তস্রাবী বদনমণ্ডল এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

গভেন তাঁহার পার্শ্বে নতজানু হইয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "গুরুদেব!"

স্নেহ-গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে সিমুর্দ্যান উচ্চারণ করিলেন, "বৎস আমার!"

দীপ্তাকাশে কৃষ্ণছায়া

সে আজ কতকাল, যেদিন ছাত্রের শিক্ষা-সমাপনান্তে তাহার ভবন হইতে গৃহশিক্ষক বিদায় লইয়াছিলেন! তারপর আর তাহাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের যোগ সর্ব্বদাই অব্যাহত ছিল। দেখা হইলে বোধ হইল, যেন মাত্র বিগত সন্ধ্যায় তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল।

সহরের টাউনহলে আহতগণের চিকিৎসা ও পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বড় হলে অস্ত্রাস্ত্রের স্থান করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটি ছোট কক্ষে সিমুর্দ্যানের শয্যা রচিত হইল। ডাক্তার তাঁহার ক্ষত সেলাই করিয়া দিলেন।

সিমুর্দ্যানের শয্যাপার্শ্ব পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। সিমুর্দ্যানের পক্ষে এখন সুনিদ্রার প্রয়োজন। তাই ডাক্তার গভেনকে দিলেন। তখনকার মতো উভয়কেই হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে হইল। গভেনের তখন অবসর ছিল না; বিজেতার সহস্র কর্ত্তব্য ও উদ্বেগে সে ব্যতিব্যস্ত। সিমুর্দ্যান একাকী রহিলেন, কিন্তু তাঁহার ঘুম আসিল না। ক্ষতের বেদনা এবং আনন্দের উত্তেজনা—এই উভয়বিধ প্রদাহে তাঁহার শরীর ও মন পুড়িয়া যাইতেছিল।

সিমুর্দ্যানের নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই; কিন্তু নিজেকে জাগ্রত বলিয়াও তাঁহার বোধ হইল না। তাঁহার স্বপ্ন কি বাস্তবিকই সফল হইয়াছে? তাঁহার যে এত সুখ হইতে পারে, এ বিশ্বাস সিমুর্দ্যান বহুপূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছেন; অথচ সেই সুখ আজ সত্যই উপস্থিত। আজ তিনি হারানিধি ফিরিয়া পাইয়াছেন! গভেনকে যখন তিনি ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, তখন সে বালকমাত্র; আজ সে পূর্ণবয়স্ক যুবক—মহৎ, দুর্দ্ধর্ষ, বীর। আজ সে বিজয়ী; সেই বিজয় আবার সাধারণতন্ত্রেরই স্বপক্ষে। ভেন্দি প্রদেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের

একমাত্র সহায় গভেন, আর সাধারণতন্ত্রের এই শক্তিমান্ পুরুষ—ভাবিতে ভাবিতে সিমুর্দ্যানের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—এ তো তাঁহারই দান! এই বিজেতা তাঁহারই শিষ্য! সাধারণতন্ত্রের দেবায়তনে স্থান পাইবার উপযুক্ত এই তরুণ-বদনমণ্ডলে প্রতিভার যে দীপ্তি, এ তো তাঁহার নিজেরই জ্ঞানলোকের প্রতিচ্ছবি। তাঁহার মন্ত্র শিষ্য, তাঁহার আত্মার সন্ততি, আজ একজন বীরপুরুষ,—অচিরেই মাতৃভূমির গৌরব বলিয়া গণ্য হইবে। সিমুর্দ্যানের বোধ হইল এ যেন তাঁহার নিজেরই আত্মা দেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। এই মাত্র তিনি গভেনের রণ-নৈপুণ্য দর্শন করিয়াছেন; এবং দ্রুপদরাজসভায় লক্ষ্যভেদ-কুশলী ছদ্মবেশী অর্জ্জুনের কৃতিত্বে গুরু দ্রোণাচার্য্যের মতোই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছেন।

এই সকল অভাবিত ঘটনাপরম্পরা এবং ক্ষতপ্রদাহ-জনিত নিদ্রাভাব—সবে মিলিয়া সিমুর্দ্যানের মনকে যেন কেমন নেশাগ্রস্ত করিয়া তুলিল। তিনি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইলেন, এই যুবকের অত্যুজ্জ্বল, গৌরবমণ্ডিত ভবিষ্যৎ—কেমন করিয়া তাহার যশঃসূর্য্য পূর্ব্ব দিগন্ত হইতে ক্রমে ক্রমে মধ্যাহ্নিক আকাশে আরোহণ করিতেছে। এই কথা ভাবিয়া তাঁহার আহ্লাদ আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইল যে, এই যুবকের উপর তাঁহার নিজের পূর্ণ প্রভাব। এইমাত্র সিমুর্দ্যান গভেনের যে কৃতকার্য্যতা প্রত্যক্ষ করিলেন, এরূপ আর একটি বিজয় লাভ করিতে পারিলেই সাধারণতন্ত্রের নিকট হইতে গভেনের জন্য পুরোপুরি সেনাপতি-পদ সংগ্রহ করা সিমুর্দ্যানের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। রণজয়ের বিস্ময়ের মত এমন চমকপ্রদ আর কিছুই নাই। সেই যুগে প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো সামরিক খেয়াল ছিল। প্রত্যেকেই ভাবিত অমুককে সেনাপতি করা চাই। ড্যান্টনের মতলব ছিল ওয়েষ্টারম্যান সেনাপতি হয়; ম্যারাটের ইচ্ছা রসিনোল; হেবার্টের ইচ্ছা রুসিন; আর রবসপীয়র ইহাদের কাহাকেও সেনাপতি করিতে নারাজ। সিমুর্দ্যানের মনে হইল, গভেনই বা সেনাপতি না হইবে কেন? তাঁহার কল্পনা ক্রমেই উদ্দাম হইয়া উঠিল। সমস্তই এখন তাঁহার সম্ভব বোধ হইতে লাগিল। বাধাবিঘ্ন তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। সম্ভাবনা হইতে সম্ভাবনান্তরে তাঁহার মন অনায়াসে অগ্রসর হইতে লাগিল। কল্পনার সোপানে একবার পাদক্ষেপ করিলে মনের গতি আর নিবৃত্ত হয় না। এ যে অসীম অনন্ত আরোহণ,—ধূলিমলিন ধরণী হইতে আরম্ভ করিয়া মন অচিরেই নক্ষত্রলোকে উপনীত হয়।

একজন বড় সেনাপতি সৈন্য-পরিচালনা করে মাত্র; কিন্তু একজন বিচক্ষণ কাপ্তেন (নৌসেনাধ্যক্ষ) সঙ্গে সঙ্গে 'আইডিয়া'ও পরিচালনা করে। কল্পনার চক্ষে সিমুর্দ্যান দেখিলেন গভেন একজন সুদক্ষ কাপ্তেন। তারপর দেখিলেন,—আমরা জানি কল্পনা বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হয়—দেখিলেন, গভেন যেন সমুদ্রবক্ষে ইংরাজদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে; রাইন নদীতে জার্ম্মানদের হটাইয়া দিতেছে; পিরেনিজের গিরিশিখরে স্পানিয়ার্ডদিগকে পরাস্ত করিতেছে; আল্পস্ পর্ব্বতের উপর হইতে রোমানদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সঙ্কেত করিতেছে।

সিমুর্দ্যানের মধ্যে দুইটি প্রকৃতি পাশাপাশি কার্য্য করিত—একটি কোমল, একটি কঠোর। গভেনের চরিত্রে মহৎ ও ভীষণ—দুই ভাবেরই যুগপৎ বিকাশ দেখিয়া এই উভয় প্রকৃতিই খুসী হইল। পুনর্গঠনের পূর্ব্বে কত যে ভাঙাচুরা আবশ্যক, সিমুর্দ্যান তাহা ভাবিয়া দেখিলেন, এবং মনে মনে বলিলেন, "বাস্তবিক কোমলতার এখন স্থান নাই। গভেন নিশ্চয়ই আমাদের আদর্শানুরূপ কার্য্য করিতে পারিবে।"

সিমুর্দ্যানের উত্তেজিত কল্পনা তাঁহার মনোনেত্রের সম্মুখে চিত্রের পর চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন—আলোকের বর্ম্মে গভেনের বক্ষ আবৃত, ললাটে তাহার উল্কাদীপ্তি, পুঞ্জীকৃত তিমিররাশি পদাঘাতে দূরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ন্যায়, যুক্তি ও উন্নতির বিশাল পক্ষে ভর দিয়া সে আকাশ-ঊর্দ্ধে উড়িয়া যাইতেছে; হস্তে কিন্তু তাহার তরবারি। সে দেবতা,—কিন্তু সংহারকর্ত্তাও বটে।

এই মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারপথে পার্শ্বের হল-ঘরের কথাবার্ত্তা সিমুর্দ্যানের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। গভেনের কণ্ঠস্বর চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। দীর্ঘ বিচ্ছেদের অনেক সময়েই সেই স্বরঝঙ্কার তাঁহার শ্রুতিমূলে

প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আজ এই যুবকের কণ্ঠেও তাঁহার সেই স্নেহাস্পদ বালকের মধুর স্বরই যেন গুঞ্জরিত হইতেছে। সিমুর্দা ন কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। একজন সৈনিক বলিতেছে,—"কমাণ্ডাণ্ট, আপনাকে যে-লোকটা গুলি করেছিল, এ সেই। গোলমালের মধ্যে তার উপর কারুর নজর ছিল না; সেই সুযোগে সে একটা নীচের কুঠরীতে চ'লে গিয়েছিল।

গভেন এবং বন্দীর মধ্যে এই কথোপকথন সিমুর্দা ন শুনিতে পাইল।

"তুমি আহত?"

"গুলি ক'রে মারার পক্ষে আমার অবস্থা অনুপযুক্ত নয়।"

"লোকটিকে বিছানায় শুইতে দাও। ওর ক্ষতগুলি ধুইয়ে বেঁধে দিতে হবে। শুশ্রূষার কোন ত্রুটি না হয়। একে আরাম করা চাই।"

"আমি মরতে চাই।"

"তোমাকে বাঁচতে হবে। তুমি রাজার নামে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে; আমি সাধারণতন্ত্রের নামে তোমাকে মার্জ্জনা করছি।"

সিমুর্দা নের ললাটের উপর কৃষ্ণছায়া বিস্তীর্ণ হইল। হঠাৎ চমকিয়া লোকের যেমন নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাঁহার অবস্থাও সেইরূপ হইল। অপ্রসন্ন হতাশাব্যঞ্জক স্বরে বিড় বিড় করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ দেখছি, দয়াশীল।"

ব্যথিতা জননী

সিমুর্দা ন অপেক্ষাও অধিকতর সাংঘাতিকরূপে আহত আর একজন অন্য স্থানে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝিতেছিল। সে হইতেছে বন্দুকের গুলিতে আহত সেই রমণী, যাহাকে ফকির টেলিমার্চ্চ হার্ব-এন-পেলের রক্তবন্যার মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছিল।

মিচেল ফ্লেচার্ডের অবস্থা বাস্তবিকই অতি সঙ্কটাপন্ন। টেলিমার্চ্চও প্রথমে এতটা বুঝিতে পারে নাই। গুলি বুকের উপর দিয়া ঢুকিয়া কাঁধের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে তাহার ফুস্‌ফুস্ স্পর্শ করে নাই। সুতরাং বাঁচিবার আশা আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, টেলিমার্চ্চ "ফকির," অর্থাৎ সে কিছু ডাক্তারি, কিছু হেকিমি এবং কিছু তুক্ তাক্ জানিত। সে তাহার বনমধ্যস্থ নিভৃত আবাস-গুহায় রমণীকে লইয়া গিয়া শৈবালশয্যায়—শোওয়াইয়া দিল। এবং লতা, পাতা, গাছের শিকড় প্রভৃতি বনজ ভেষজে যথাসাধ্য তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিল। মিচেল ফ্লেচার্ড এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

ঘাড়ের হাড় জোড়া লাগিল; বুকের ও কাঁধের ঘা বুজিয়া আসিল; কয়েক সপ্তাহ পরে সে অনেকটা সারিয়া উঠিল। একদিন প্রত্যূষে টেলিমার্চ্চের গায়ে ভর দিয়া সে গুহা হইতে বাহির হইল এবং কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে সমর্থ হইল। প্রাতঃসূর্য্যের কিরণোদ্ভাষিত বৃক্ষতলে তাহারা উপবেশন করিল।

টেলিমার্চ্চ এই রমণী সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। বক্ষে ক্ষত ছিল বলিয়া এতদিন কোনো কথাবার্ত্তা হইতে পারে নাই। মৃত্যুযন্ত্রণা ভুগিতে ভুগিতে রমণী বোধ হয় একটি কথাও বলিতে পারে নাই। বলিতে চাহিলে টেলিমার্চ্চ তাহাকে থামাইয়া দিত, কিন্তু তাহার চোখের দিকে চাহিয়াই টেলিমার্চ্চ বুঝিতে পারিত, সে সর্ব্বদাই যেন কি খেয়ালে ভোর হইয়া রহিয়াছে।

এখন সে অনেকটা সবল হইয়াছে, বোধ হয় অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও হাঁটিয়া যাইতে পারিবে; দেখিয়া ফকিরের মনে আহ্লাদ হইল। সদাশয় বৃদ্ধ বাৎসল্যরসে সিক্ত হইয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, "আবার আমরা চলতে পারছি, আর আমাদের কোন ক্ষত নেই।"

"হৃদয়ের ক্ষত ছাড়া"—রমণী বলিল। পরক্ষণেই সে আবার বলিল, "তা হ'লে ওরা যে কোথায় আপনি তার কিছুই জানেন না?"

"ওরা কারা ?"—টেলিমার্চ্চ জিজ্ঞাসা করিল।

"আমার ছেলেরা।"

এই 'তা হ'লে' কথাটি কতই অর্থপূর্ণ! ইহাতে এই বুঝাইল, "আপনি আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন না, এতদিন আমার পাশে থাকিয়াও আপনি একবারও মুখ খুলেন নাই, আমি কথা বলিতে চেষ্টা করিলে আপনি প্রতিবারেই বারণ করিয়াছেন, আমি পাছে কিছু বলি সেইজন্য আপনি সর্ব্বদাই আশঙ্কিত, ইহার একমাত্র কারণ আমাকে আপনার বলিবার কিছু নাই।"

জ্বরের ঘোরে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় তাহার মন যখন উদ্ভ্রান্ত, তখন অনেকবার সে লক্ষ্য করিয়াছে যে, বৃদ্ধ তাহার কথার জবাব দেয় নাই।

আসলে টেলিমার্চ্চ কি জবাব দিবে ঠিক করিতে পারিত না। মাতাকে তাহার সন্তান হারাইয়া গিয়াছে, একথা বলা সহজ নহে। আর তারপর, সে জানেই বা কি? কিছুই না। সে শুধু এইটুকু জানিতে পারিয়াছিল যে, একটি সন্তানবতী রমণীকে গুলি করা হয়, সেই রমণীকে ভূমিতলে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে লইয়া আইসে, তাহার তিনটি সন্তান ছিল, এবং ল্যান্টিনেক মাতাকে গুলি করিয়া সেই বাচ্চাগুলিকে লইয়া গিয়াছে। আর কোন খবর নাই। এই ছেলেদের কি হইয়াছে? তাহারা বাঁচিয়া আছে কি? জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সে আরও এইটুকু জানিতে পারিয়াছিল, উহাদের মধ্যে দুইটি বালক এবং একটি বালিকা—বালিকাটি এখনও বুকের দুধ ছাড়ে নাই। এই হতভাগ্যদের সম্বন্ধে বৃদ্ধের মনে কত প্রশ্নই না উদিত হইত, কিন্তু তাহার একটারও উত্তর যোগাইত না। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা শুধু মাথা নাড়িয়া—চুপ করিয়া থাকিত। মার্কুইস ডি-ল্যান্টিনেক এমন প্রকৃতির লোক যাঁহার সম্বন্ধে জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলোচনা করিতে সাহসী হইত না।

ল্যান্টিনেকের সম্বন্ধে তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলোচনা করিত না; আবার টেলিমার্চ্চের সঙ্গেও তাহারা পারতপক্ষে আলাপ করিত না। কৃষকদের অনেকরকম সন্দেহ সংস্কার থাকে। টেলিমার্চ্চকে তাহারা পছন্দ করিত না। তাহাদের নিকটে এই ফকির এক রহস্যময় জীব! আকাশের দিকে সে সর্ব্বদাই চাহিয়া থাকে কেন? ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া সে কি ভাবে? বাস্তবিক, লোকটা কি অদ্ভুত! দেশে ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছে, চারিদিকে বিপ্লবের লেলিহান অনলশিখা ও আর্ত্ত-কোলাহল, এখন লোকের একমাত্র ব্যবসা ধ্বংসসাধন এবং একমাত্র কাজ হত্যাকরা; যে পারে সেই অপরের বাড়ী-ঘর জ্বালাইয়া দিতেছে, গৃহস্থকে সপরিবারে হত্যা করিতেছে, এবং গ্রাম-জনপদ লুঠ করিতেছে; গুপ্ত আক্রমণে অপরের জীবন-সংহার করার ফন্দীফিকির ভিন্ন এখন আর লোকের অন্য চিন্তা নাই। এমন সময় এই নিঃসঙ্গ লোকটা কিনা জঙ্গলে জঙ্গলে গাছগাছড়া খুঁজিয়া বেড়ায়,—ফুল, পাখী, আকাশের নক্ষত্র লইয়াই ব্যস্ত থাকে, এবং প্রকৃতির বিরাট সৌন্দর্য্য ও অগাধ শান্তির মধ্যে যেন তন্ময় হইয়া ডুবিয়া যায়! সুতরাং সে সাংঘাতিক লোক না হইয়াই পারে না! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, লোকটার মাথা খারাপ, কারণ সে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে লুকাইয়াও থাকে না, কাহারও উপর বন্দুকও ছুড়ে না। এই জন্য সকলেই তাহাকে কেমন ভীতি ও সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিত।

"লোকটা ক্ষ্যাপা"—পথিকেরা মন্তব্য করিত।

টেলিমার্চ্চ যে কেবল নিঃসঙ্গ তাহা নহে, লোকে তাহাকে বর্জ্জন করিয়া চলিত। তাহাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না, তাহার কথারও বড় একটা জবাব দিত না। তাই সে বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। লড়াই এখন অন্যত্র চলিতেছে, সৈন্যেরা দূরে চলিয়া গিয়াছে, সে-অঞ্চলের দিকচক্রবাল হইতে মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেকের মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

"আমার ছেলেরা!"—ব্যথিতা জননীর মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হওয়ার পর টেলিমার্চ্চের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। রমণীও নিজের চিন্তায় আবার বিভোর হইয়া পড়িল। তাহার মনে তখন কি হইতেছিল? সে যেন গভীর সাগর-তল হইতে চাহিয়া দেখিতেছিল। সহসা সে টেলিমার্চ্চের দিকে ফিরিয়া, যেন কতকটা ক্রুদ্ধস্বরে, পুনরায়

বলিয়া উঠিল, "আমার ছেলেরা ?"

টেলিমার্চ্চ অপরাধীর মতো মাথা নত করিল। তাহার মনে হইতেছিল, ল্যান্টিনেকের কথা, যে ল্যান্টিনেক নিশ্চয়ই এখন তাহার কথা ভাবিতেছিল না—যে হয়তো তাহার অস্তিত্বই একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। সে মনে মনে বলিল, "একজন লর্ড যখন বিপদগ্রস্ত হন, তখন তিনি তোমাকে চিনিতে পারেন; কিন্তু বিপন্মুক্ত হ'লে তোমার কথা আর তাঁর স্মরণ থাকে না।"

সে নিজেকে প্রশ্ন করিল, "কিন্তু তা হ'লে আমি এই লর্ডকে বাঁচালাম কেন?" নিজের প্রশ্নের নিজেই জবাব দিল, "কারণ সে একটা মানুষ তো বটে।" তারপর কিছুক্ষণ সে চিন্তামগ্ন রহিল। পুনরায় আত্মপ্রশ্ন হইল, "সে যে মানুষ—তা—ও ঠিক বলা যায় কি ?"

তাহার নিজেরই মর্ম্মভেদী কথাগুলি আবার তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, "যদি আগে বুঝতে পারতাম।"

এই ব্যাপারটায় সে যেন একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। সে যাহা করিয়াছে, তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করা তাহার পক্ষে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। সে বিষম ভাবনায় পড়িয়া গেল। ভাল কাজেরও অনেক-সময় মন্দ ফল হয়। ব্যাঘ্রের প্রাণরক্ষার পরিণাম হয় ত মেষের প্রাণ-বিনাশ। টেলিমার্চ্চ মনে মনে নিজেকে অপরাধী বোধ করিল। তাহার মনে হইল, এই অযৌক্তিক মাতৃ-ক্রোধ অসঙ্গত নহে। মার্কুইসের জীবনরক্ষায় তাহার যে পাপ হইয়াছিল এই রমণীকে বাঁচাইয়া সে তাহার কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহার মন কতকটা সান্ত্বনা পাইল।

কিন্তু ছেলেদের কি হইল? তাহাদের মাতাও ভাবিতেছিল। দুইজনের চিন্তাই পাশাপাশি চলিতেছিল; এবং যদিও তাহারা নীরব ছিল, তবুও এই দুইটি চিন্তার ধারা হয় তো পরস্পরকে স্পর্শ করিতেছিল

রমণী তাহার 'নিশার মত নীরব' বিষণ্ণ চক্ষুদুইটি আবার টেলিমার্চ্চের দিকে ফিরাইল।

"কিন্তু এমন ক'রে ব'সে থাকলে ত চলবে না।"

ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া টেলিমার্চ্চ বলিল, "চুপ!"

রমণী বলিতে লাগিল—"আমাকে বাঁচিয়ে আপনি অন্যায় করেছেন। আপনার উপর আমার রাগ হ'চ্চে সেইজন্য। আমার মরলেই ভাল হ'ত; তা হ'লে নিশ্চয়ই আমি ওদের দেখতে পেতেম,—ওরা কোথায় আছে আমি জানতে পারতাম। তারা হয় তো আমাকে দেখতে পেত না, কিন্তু আমি তো তাদের কাছে কাছে থাকতে পারতাম। মৃতেরা নিশ্চয়ই অন্যদের রক্ষা করতে পারে।"

ফকির স্বীয় হস্তে রমণীর হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল।

"অত অধীর হ'য়ো না; আবার জ্বর আসবে।"

রমণী কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এখান থেকে কবে আমি চ'লে যেতে পারব ?"

"চ'লে যেতে ?"

"হ্যাঁ, হেঁটে যেতে।"

"বেবুঝ হ'লে কখনই না, আর বুঝে' চললে কালই।"

"বুঝে' চলা কাকে বলে ?"

"ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা।"

"ঈশ্বর!—তিনি আমার ছেলেদের কি করেছেন ?"

রমণীর মন উদ্‌ভ্রান্ত, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর কোমল, মধুর।

সে বলিল, "আপনি ত বুঝচেন, এরূপভাবে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে আমি থাকতে পারিনে। আপনার কখনো ছেলে-পিলে হয়নি, আমার হ'য়েচে। এইখানেই প্রভেদ। কোনো একটা জিনিষ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে, ওটার সম্বন্ধে বিচার করা যায় না। আপনার কখনো ছেলেপিলে হয়নি, —নয় ?"

টেলিমার্চ্চ উত্তর দিল, "না।"

"আর আমায়—আমার এই শিশুগুলি ছাড়া সংসারে আর কিছুই নেই। ছেলেদের বাদ দিলে আমার আর থাকে কি ? কেউ কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারে, কেন ওরা আমার কাছে এখন নেই ? ঘটনা ঘটে, দেখতে পাই,—কিন্তু কেন, বুঝতে পারি না। তারা আমার সোয়ামীকে হত্যা করেচে; আমাকেও গুলি করেছিল। এর মানে কি ? বুঝি না।"

টেলিমার্চ্চ বলিল, "থামো ; তোমার আবার জ্বর আস্‌চে। আর কথা ব'লো না।"

রমণী চুপ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিল।

সেইদিন হইতে রমণী আর কথা বলে নাই। একটা প্রাচীন বনস্পতি-মূলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত। এতটা চুপ্ চাপ্ আবার টেলিমার্চ্চেরও ভাল লাগে নাই। নীরবে বসিয়া সন্তান-হারা জননী স্বপ্নের জাল বুনিত। দুঃখের শেষসীমায় যাহারা উপনীত, মৌনাবলম্বনই তাহাদের একমাত্র আশ্রয়। বুঝিবার চেষ্টা রমণী একেবারেই পরিত্যাগ করিল

সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে ফকির তাহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিত। এই সুগভীর মর্ম্মবেদনায় সান্নিধ্যে বৃদ্ধের অন্তরেও নারীসুলভ কোমল চিন্তার উদয় হইত। সে মনে মনে ভাবিত, "তার ওষ্ঠ আর নড়েনা বটে, কিন্তু তার চোখদুটি তো কথা বল্‌চে। স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌চি, তার মনে কেবল একটা কথাই জাগ্‌চে। মা হয়েছিল, কিন্তু এখন আর সে মা নয়! কোন কচি ওষ্ঠপুটের আকর্ষণে তাহার মাতৃবক্ষের স্নেহধারা আর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌বে না! এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পার্‌চে না। সব চেয়ে ছোটটির কথাই তাহার বার বার মনে পড়ে,—ছোট্ট মেয়েটি, যাকে এই কিছুদিন আগেও সে স্তন্যদান কর্‌ছিল। বাস্তবিক, গোলাপকুঁড়ির মতো ছোট্ট একটি মুখ যখন তোমার শরীর থেকে তোমার আত্মাটিকে যেন চুষে নেয়, তোমার জীবনটি টেনে নিয়ে যেন নিজের জীবন তৈরি করে, তখন নিশ্চয়ই সেটা খুব মিষ্টি লাগে।"

এরূপ তন্ময়তার নিকটে বাক্য হার মানে। সুতরাং ফকিরও চুপ করিয়াই থাকিত। মাতৃত্ব এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। ইহা যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। মাতার অন্তর্নিহিত অনুভূতি যুক্তিকে অনেক পশ্চাতে রাখিয়া যায়। তাহাতেই মাতৃত্বকে মহিমামণ্ডিত করিয়া তোলে। জননী আর নারী থাকেনা, সে বন্যজন্তুর মতো অন্ধ কিন্তু অভ্রান্ত সংস্কারে পরিচালিত হয়। ছেলে-মেয়েগুলি তাহার শাবক। এইজন্য মাতার মধ্যে যুক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় প্রবৃত্তিই থাকে। বিশ্বস্রষ্টার রহস্যময় মহতী ইচ্ছা-শক্তি মাতার অন্তরে থাকিয়া তাহাকে পরিচালিত করে তাহার অন্ধতা অতি-প্রাকৃত আলোকে আলোকিত।

টেলিমার্চ্চ এই হতভাগিনীকে কথা বলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। একদিন সে তাহাকে বলিল, "দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বুড়ো হ'য়ে পড়েছি, বড় একটা হাঁটতে পারি না, মিনিট পনেরো চ'লেই হাঁপিয়ে পড়ি, বিশ্রাম কর্‌তে হয়। তা না হ'লে তোমার সঙ্গে আমি যেতেম। আমার মনে হয় হয় তো এটা ভালই হ'য়েচে। "ব্লু"রা আমাকে সন্দেহ করে যে, আমি বুঝি কৃষকদের দলে ; আর কৃষকেরা সন্দেহ করে যে আমি বুঝি একজন যাদুকর। তোমার সহায় না হ'য়ে, চাই কি আমি তোমার বোঝা হ'য়ে উঠতাম।"

সে রমণীর উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। রমণী মোটে চোখ খুলিয়াও চাহিল না। বদ্ধমূল ধারণায় মানুষকে অসাধ্যসাধন করায়, কিম্বা উন্মত্ত করিয়া তোলে। নিঃসহায় কৃষকরমণী আর কি অসাধ্যসাধন করিবে? সে মাতা,—এই পর্য্যন্ত। দিনের পর দিন রমণী চিন্তা-সাগরের গভীর হইতেও গভীরতর তলে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। টেলিমার্চ্চ সেটা লক্ষ্য করিল। রমণীকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে সে তাহাকে স্থঁচ, সুতা প্রভৃতি সেলাইর সরঞ্জাম আনিয়া দিল। অবশেষে ফকির দেখিয়া খুসী হইল যে, রমণী কতকটা সেলাই আরম্ভ করিয়াছে। সে কল্পনা করিত,—কিন্তু কাজও করিত, স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ক্রমে ক্রমে তাহার মানসিক শক্তি যেন একটু একটু করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সে তাহার ছিন্ন পরিধেয় বস্ত্রাদি মেরামত করিল ; কিন্তু চক্ষে তাহার উদাস দৃষ্টি আগের মতোই রহিয়া গেল। সুইয়া সেলাই করিবার সময় গুন্ গুন্ করিয়া সে যেন কি গান করিত ; কি সব নাম অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিত—বোধ হয় ছেলেদের নাম—টেলিমার্চ্চ ঠিক বুঝিতে পারিত না। কখনো কখনো তাহার গান হঠাৎ মাঝখানে থামিয়া পড়িত, এবং সে কান পাতিয়া পাখীদের কূজন শুনিত, বুঝি তাহার মনে হইত এরা কোন খবর আনিয়াছে। মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিত, আকাশের অবস্থা কি রকম। কখনো কখনো

তাহার ওষ্ঠ নড়িতেছে দেখা যাইত—আপন মনে অস্ফুটস্বরে কথা বলিতেছে। একটা থলিয়া সেলাই করিয়া সে তাহা বারুদে ভর্ত্তি করিল। একদিন প্রভাতে টেলিমার্চ্চ দেখিল, রমণী যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে,—দৃষ্টি তাহার সুদূর অরণ্য গর্ভে প্রসারিত।

"কোথায় যাচ্ছ?"—ফকির জিজ্ঞাসা করিল।

রমণী উত্তর দিল, "আমি ওদের সন্ধানে যাচ্ছি।"

ফকির তাহাকে থামাইতে চেষ্টা করিল না।

সত্যের দুই প্রান্ত

ভেণ্ডির সংগ্রাম ক্ষান্ত হইল না; কিন্তু ভেণ্ডিয়ানরা ক্রমেই হারিয়া যাইতে লাগিল। ভল-এ সে রাত্রিতে গভেনের দুঃসাহসিক আক্রমণের ফলে কুজার্স অঞ্চলে বিদ্রোহ একেবারে নির্ব্বাপিত না হইলেও খুব নরম হইয়া পড়িল। পর-পর আরও কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে সাধারণতন্ত্রের প্রভাব এখানে বাড়িয়া গেল।

অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রাজপক্ষের প্রবল পরাক্রমে যেখানে সাধারণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদের সম্ভাবনা হইয়াছিল, এখন সেখানে সাধারণতন্ত্রই জয়যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আবার নূতন এক সমস্যা তাল পাকাইয়া উঠিয়াছে।

এই বিজয়ের আলোকে সাধারণতন্ত্রের দুইটি বিভিন্ন মূর্ত্তি ক্রমে ফুটিয়া উঠিল—একটি করালী, আর একটি করুণাময়ী; একটি খর্পর-করধারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, অপরটি বরাভয়করা; একটি চায় কঠোরতা দ্বারা আপনার অধিকার বিস্তার করিতে আর একটি চায় কোমলতা দ্বারা। ইহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হইবে কোনটির? ইহাই প্রশ্ন।

এই মূর্ত্তিদ্বয়ের পূজার প্রধান ঋত্বিক্ ছিল দুইজন বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। একজন যোদ্ধৃপুরুষ—সৈন্যাধ্যক্ষ, অপরজন শাসন-পরিষদের ক্ষমতা-প্রাপ্ত প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধির অসাধারণ ক্ষমতা—শাসন-পরিষদ তাহার পৃষ্ঠপোষক; প্যারিসের কমিউন সাণ্টারের ব্যাটালিয়নকে যে সাংঘাতিক সঙ্কেতবাক্যে বিদায়াভিনন্দন করে—"দয়া দেখাবেনা, ক্ষমা করবেনা"—তাহাই ইহার কার্য্য-প্রণালীর মূলমন্ত্র; তাহার হস্তে কন্‌ভেনসনের আদেশ-পত্র,—"কোনো বন্দী বিদ্রোহী সর্দ্দারকে যে পলায়নের সহায়তা করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে"; কমিটি-অব-পাবলিক-সেফ্‌টি তাহাকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, এবং সকলে যেন তাহার আদেশ মান্য করে তজ্জন্য রব্‌স্‌পীয়র, ম্যারাট ও ডান্টনের স্বাক্ষরিত অনুজ্ঞাপত্র বাহির হইয়াছে। পক্ষান্তরে সৈনিকপুরুষটির একমাত্র বল—দয়া। তাহার সহায় কেবল তাহার বাহু—যাহা শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে, এবং তাহার হৃদয়—যাহা আমাদিগকে ক্ষমা করিতে চায়। তাহার মনে হইত, সে যখন বিজেতা তখন বিজিতকে ক্ষমা করিবার অধিকার তাহার রহিয়াছে।

এই কারণে এই দুইজনের মধ্যে গোপনে গোপনে গভীর বিরোধের সূত্রপাত হইল। দুইজনের জগৎ স্বতন্ত্র, যদিও উভয়েরই চেষ্টা বিদ্রোহদমন। দুইজনেই বজ্রপাণি। তবে একের বজ্র বিজয়, অপরের বজ্র বিভীষিকা।

সকলেরই মুখে এই দুইজনের কথা। ইহাদের কার্য্য-কলাপে যাহাদের বিস্ময় উদ্রিক্ত হইতেছিল, তাহাদের একটা উদ্বেগের কারণ ছিল যে, বিরুদ্ধমতাবলম্বী এই নেতৃপুরুষদ্বয় পরস্পরের প্রতি অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত অনুরক্ত। এই প্রতিদ্বন্দ্বী-যুগল একে অন্যের বন্ধু—উদার,—গভীর সহানুভূতিতে দুইটি হৃদয় সমবদ্ধ। কঠোরজন কোমলজনের জীবন রক্ষা করিয়াছে,—সেই প্রচেষ্টার ক্ষতচিহ্ন তাহার বদনমণ্ডলে এখনও বর্ত্তমান। ইহাদের একজন জীবনের আর একজন মৃত্যুর মূর্ত্ত বিকাশ; যেন একজন শান্তির, আর একজন সংহারের নৈসর্গিক নিয়ম। অথচ ইহারা পরস্পরকে ভালবাসে, অদ্ভুত সমস্যা!

এই দুইজনের মধ্যে "নির্ম্মম" বলিয়া যাহার খ্যাতি, সে কিন্তু আবার মানব-প্রেমে ভরপুর ছিল। আহতের ক্ষত-বন্ধন, পীড়িতের শুশ্রূষা ও আতুরের পরিচর্য্যায় তাহার দিবস-

রজনী হাসপাতালেই অতিবাহিত হইত। নগ্নপদ বালক-বালিকা দেখিলে তাহার অন্তরের কোমলতম অংশ ব্যথিত হইয়া উঠিত। নিজের যাহা কিছু, তাহার সবই সে দরিদ্র-দিগকে বিলাইয়া দিত। সকল যুদ্ধেই সে উপস্থিত থাকিত; অগ্রগামী সৈন্যদলের পুরোভাগে থাকিয়া সংগ্রাম যেখানে নিবিড়তম হইয়া উঠিয়াছে রণস্থলের সেই অংশেই সে চলিয়া যাইত। তাহাকে সশস্ত্রও বলা যায় নিরস্ত্রও বলা যায়—সশস্ত্র, যেহেতু একটি তরবারি ও দুইটি পিস্তল সর্ব্বদাই তাহার কটিবন্ধে নিবদ্ধ থাকিত; আর নিরস্ত্র, যেহেতু কেহ কোনোদিন তাহাকে এইসকল অস্ত্র স্পর্শ করিতে দেখে নাই। বুক পাতিয়া সে আঘাত গ্রহণ করিত, কিন্তু প্রতি-ঘাতের চেষ্টা সে কখনো করে নাই। শোনা যায়, লোকটি না কি এক সময়ে পাদ্রী ছিল।

ইহাদের একজন গভেন আর একজন সিমুর্দ্যান।

ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব, কিন্তু মতদ্বয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ছিল। এইরূপ গূঢ় অন্তর্যুদ্ধ বেশীদিন গোপন থাকিতে পারে না। আভ্যন্তরিক রুদ্ধ বাষ্প আপনার আবেষ্টন বিদীর্ণ করিয়া একদিন সশব্দে বাহির হইয়া পড়িল এবং দুইজনের মধ্যে প্রকাশ্য সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

সিমুর্দ্যান গভেনকে বলিল, "আমরা এ পর্য্যন্ত কি কর্‌তে পেরেছি?"

প্রত্যুত্তরে গভেন বলিল, "তাত আপনিও জানেন, আমিও জানি। ল্যান্টিনেকের অনুবর্ত্তীদের আমি তাড়িয়ে দিয়েচি। তার অল্প লোকই অবশিষ্ট আছে। তা'কেও ফুজার্সের অরণ্যে হটিয়ে দিয়েচি,—আট দিনের মধ্যে আমরা তাকে ঘিরে ফেল্‌ব।"

"আর পনেরো দিনের মধ্যে?"

"সে ধৃত হবে।"

"তারপর?"

"আপনি আমার ইস্তাহার তো পড়েছেন?"

"হ্যাঁ; তাল!"

"তাকে গুলি ক'রে মারা হবে।"

"আরো অনুকম্পা!—তাকে গিলেটিনে চড়াতে হবে।'

"আমি সামরিক প্রাণদণ্ডের পক্ষে।"

"আর আমি" সিমুর্দ্যান বলিয়া উঠিল, "আমি চাই বৈপ্লবিক প্রাণদণ্ড।"

গভেনের মুখের দিকে চাহিয়া—সিমুর্দ্যান আরও বলিল, "সেণ্ট-মারে-লা-ব্লাঙ্ক মঠের নান্‌দিগকে তুমি ছেড়ে দিলে কেন?"

গভেন জবাব দিল, "আমি স্ত্রীলোকের সঙ্গে লড়াই করি না।"

"ঐ স্ত্রীলোকগুলি জনসাধারণের উপর অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ, আর বিদ্বেষ ব্যাপারে একজন রমণী দশজন পুরুষের সমান। লুভিগ্‌নেতে ধৃত ধর্ম্মোন্মত্ত পাদ্রীগুলিকে বৈপ্লবিক বিচারালয়ে পাঠাতে তুমি অস্বীকৃত হ'লে কেন?"

"আমার যুদ্ধ বৃদ্ধদের সঙ্গে নয়।"

"বৃদ্ধ-পাদ্রী যুবক-পাদ্রী অপেক্ষা বহুগুণ মন্দ। পলিত-কেশ বৃদ্ধ কর্ত্তৃক প্রচারিত হ'লে বিদ্রোহ অধিকতর সাংঘাতিক হ'য়ে উঠে। লোলচর্ম্মের উপর লোকের আস্থা অসাধারণ। গভেন, মিথ্যা দয়া দেখিয়ে ফল নেই। মনে রাখ্‌বে, রাজহন্তারা দেশের মুক্তিদাতা। টেম্পল-টাওয়ারের কারাগারের দিকে যেন দৃষ্টি থাকে।"

"টেম্পল-টাওয়ার! ডফিনকে (যুবরাজকে) আমি সেখান থেকে ছেড়ে দিব। শিশুদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করি না।"

সিমুর্দ্যানের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল।

"গভেন, এটা শেখ, রমণীর সঙ্গেও লড়াই করা আবশ্যক যখন সেই রমণীর নাম মেরী এণ্টয়নেট, বুড়োর সঙ্গেও লড়াই করা আবশ্যক যখন বুড়োর নাম ৬ষ্ঠ পায়াস্ এবং সে পোপ, আর শিশুর সঙ্গেও লড়াই করা আবশ্যক যখন সেই শিশুর নাম লুই ক্যাপেট।"

"প্রভু, আমি রাজনীতিজ্ঞ নই।"

"অনিষ্টকারী হ'য়োনা। কসে আক্রমণ-কালে বিদ্রোহী জিন ট্রেটন পরাস্ত হয়ে সব হারিয়ে যখন একাকী তলোয়ার-হাতে আমাদের সমগ্র সৈন্যদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন তুমি এই ব'লে চেঁচিয়ে উঠেছিলে কেন—'তফাৎ, ওকে যেতে দাও।"

"কারণ একটি লোককে বধ করার জন্ত পনেরো শো লোককে তার উপর লেলিয়ে দেওয়া যায় না।"

"আম্বিলে তোমার সৈন্তেরা যখন আহত ও পলায়নপর ভেণ্ডিয়ান যোসেফ বেজিয়ারকে হত্যা করতে উদ্যত হ'য়েছিল, তুমি তখন ব'লে উঠলে, 'তোমরা এগিয়ে যাও! এ আমার কাজ!' এই ব'লে আকাশে তোমার পিস্তল ছুড়ে দিলে। কেন?"

"কারণ, ভূপতিত শত্রুকে লোকে হত্যা করে না।"

"তুমি অন্যায় করেছিলে। আজ দু'জনেই বিদ্রোহী-সর্দার। এই দু'জনকে বাঁচিয়ে তুমি সাধারণতন্ত্রের দুটি শত্রু বৃদ্ধি করেছ।"

"আমার অবশ্য অভিপ্রায় ছিল, এ দু'জন সাধারণ-তন্ত্রের মিত্রই হয়।"

"লেণ্ডিয়ানের যুদ্ধে বিজয়লাভের পর তিনশো কৃষকবন্দী-দিগকে গুলি ক'রে মারো নাই কেন?"

"বোঁচাম্প সাধারণতন্ত্রের বন্দী সৈন্তদের দয়া দেখিয়েছিল; আমরাও রাজপক্ষীর বন্দী সৈন্তদের দয়া দেখিয়েছি; এইটে লোকে জানুক, এই আমার অভিপ্রায় ছিল।"

"তা হ'লে ল্যান্টিনেককে ধরতে পারলে, তাকেও তুমি ক্ষমা করবে?"

"না।"

"কেন? তিনশো কৃষককে দয়া দেখাতে পারলে, তাকে নয় কেন?"

"কৃষকরা অজ্ঞ, ল্যান্টিনেক তাহার কার্য্যের ফলাফল বোঝে।"

"কিন্তু ল্যান্টিনেক তোমার আত্মীয়।"

"ফ্রান্স আমার নিকটতম আত্মীয়।"

"ল্যান্টিনেক বৃদ্ধ।"

"ল্যান্টিনেক স্বদেশদ্রোহী। ল্যান্টিনেকের বয়সের সীমা নাই। ল্যান্টিনেক দেশের বিরুদ্ধে ইংরাজদিগকে আহ্বান করে। ল্যান্টিনেক মূর্ত্তিমান বৈদেশিক আক্রমণ। তার ও আমার মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান কেবল আমার বা তার মৃত্যুতে হ'তে পারে।"

"গভেন, এই সঙ্কল্প যেন মনে থাকে।"

"এ আমার শপথ।"

উভয়েই চুপ করিয়া পরস্পরেরর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

গভেন কিছুক্ষণ পরে বলিল, "এই তিরনব্বই সালটা দেখছি ভারী সাংঘাতিক।"

"সাবধান গভেন!"—সিমুর্দ্যান বলিয়া উঠিল। "কঠোর কর্ত্তব্য সম্মুখে। যার দোষ নেই তার উপর কেন দোষারোপ করচ? বৎসরটাকে বৃথা নিমিত্তের ভাগী ক'রো না। রোগ কি চিকিৎসকের দোষে হয়? তবে এটা ঠিক যে, এই ভয়ঙ্কর বর্ষের বিশেষত্ব হ'চ্চে ইহার নির্ম্মমতা। কারণ, তিরনব্বই সাল এই মহা-বিপ্লবেরই অভিব্যক্তি। প্রাচীন জগৎ এই মহা-বিপ্লবের শত্রু; তাই প্রাচীন জগতের উপর ইহার কিছুমাত্র অনুকম্পা নেই। পচনশীল ক্ষত অস্ত্র-চিকিৎসকের দয়ালাভ করতে পারে কি? রাজগণের প্রভুত্ব, সম্ভ্রান্তবংশীয়দের আভিজাত্য-গর্ব্ব, সৈনিকের যথেচ্ছাচার, যাজক-সম্প্রদায়ের কুসংস্কার, বিচারকের বর্ব্বরতা—এক-কথায় জগতের যত কিছু অত্যাচার তার উচ্ছেদসাধনই রাষ্ট্রবিপ্লবের কার্য্য। এই অস্ত্রোপচার খুব আশঙ্কাজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লব তা অকম্পিত হস্তে সমাধা করচে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি তাজা মাংসও কাটা পড়চে, কিন্তু তাতে কি? ফোড়া কাটতে গেলে রক্তপাত অনিবার্য্য। বিপুল অগ্নিদাহ থামাতে আগুনের মতোই উদ্দাম প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না কি? একমাত্র এরূপ নিদারুণ অনুষ্ঠান দ্বারাই কৃতকার্য্যতা লাভ সম্ভব। অস্ত্র-চিকিৎসক অনেকটা কসাইর মতো—আরোগ্যকারী হ'লেও আপাত-দৃষ্টিতে জল্লাদের মতো নিষ্ঠুর। রাষ্ট্রবিপ্লব তার মারাত্মক কার্য্য করিবেই। এ ভাঙে, কিন্তু রক্ষাও করে। কি!—তুমি সংক্রামক বিষবীজকে দয়া দেখাতে বল? রাষ্ট্র-বিপ্লব এরূপ আবদার শুনবে না—ওকে একেবারেই ধ্বংস করবে। বিপ্লবের ছুরী সভ্যতার গাত্রে গভীর ক্ষত করচে বটে, কিন্তু তার থেকেই মানব জাতির স্বাস্থ্য-লাভ হবে। তোমরা বেদনা বোধ করচ? তা ত করবেই। কিন্তু কতক্ষণ? অপারেশনটি হ'তে যতক্ষণ লাগবে। তারপর? —তারপর দেখবে যে, রক্ষা পেয়ে গেলে। রাষ্ট্রবিপ্লব

জগতের বিষদুষ্ট অঙ্গ ছেদন করচে—তাতেই এই নিদারুণ রক্তস্রাব—এই ভীষণ তিয়ানব্বই সাল।"

গভেন বলিল, "অস্ত্র-চিকিৎসক সমাহিতচিত্তে—শান্ত ভাবে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করে; কিন্তু বিপ্লববাদীরা উত্তেজনাশীল, অধীর, বলপ্রয়োগ-প্রবণ।"

সিমুর্ধান প্রত্যুত্তরে বলিল, "বৈপ্লবিক কার্য্যের জন্য নিষ্ঠুর লোকেরই আবশ্যক। যাদের হাত কাঁপে তাদের এ সরিয়ে দেয়; মায়া-মমতা-করুণায় যাদের হৃদয় অণুমাত্রও বিচলিত হয় না, কেবল তারাই ইহার একমাত্র নির্ভর। ড্যাণ্টন ভীষণ; রবসপীয়র অনমনীয়; সেন্টজাষ্ট অটল; ম্যারাট নির্ম্মম। এই সকল লোকের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এরা এক একজন এক এক রণবাহিনীর তুল্য। এরা ইউরোপকে আতঙ্কিত ক'রে তুলবে।"

"এবং হয় ত ভবিষ্যৎকেও—" গভেন বলিল তারপর একটু আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিতে লাগিল,—"আপনি ভুল বুঝচেন, প্রভু, আমি কারও উপর দোষারোপ করচি না। আমি বলচি কি, এই রাষ্ট্রবিপ্লবটা সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন। কেউ দোষী নয়, কেউ নির্দ্দোষীও নয়। ষোড়শ লুই সিংহের মুখে নিক্ষিপ্ত মেষ; সে পালাতে চায়, আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, পারলে দু, একটা কামড় দিতেও ছাড়ে না। এই ক্রুদ্ধ মেষ দাঁত খিঁচয়, আর অমনি সিংহের দল চেঁচিয়ে উঠে, 'বিশ্বাসঘাতক!' তারপর তাকে ভক্ষণ ক'রে এখন নিজেরা নিজেরা লড়াই করচে।"

"মেষ—পশু মাত্র।"

"আর সিংহেরা, তারা কি?"

এই পাল্টা জবাবে সিমুর্ধান একটু ভাবিতে লাগিল। তারপর মাথা তুলিয়া বলিল, "এই সিংহেরা বিবেক, এরাই 'আইডিয়া,' এরা নীতির মূলসূত্র।"

"তারা 'বিভীষিকার রাজত্ব' এনেচে।"

'এমন দিন আসবে যখন এই বিভীষিকার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে, লোকে রাষ্ট্রবিপ্লবের মহত্ত্ব উপলব্ধি করবে।"

"দেখবেন, শেষটায় এই বিভীষিকা না বিপ্লবের কলঙ্ক হ'য়ে দাঁড়ায়।"

গভেন বলিতে লাগিল, "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা! এ সব তো শান্তি ও সামঞ্জস্যের মন্ত্র। এগুলিকে একটা ভয়ঙ্কর মুখস পরিয়ে দিয়ে কি লাভ হ'চ্চে? আমরা কি চাই? সমগ্র জনমণ্ডলীকে এক উদার বিশ্বজনীন সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা—এই তো আমাদের উদ্দেশ্য। তা হ'লে আমরা তাদের ভয় পাইয়ে দিচ্চি কেন? ভয় পেলে কি লোক আকৃষ্ট হয়? ভাল করবার মতলবে মন্দ করাটা সমীচীন নয়। ফাঁসী-কাষ্ঠই যদি দণ্ডায়মান রইল তবে রাজসিংহাসন উলটে ফেলে লাভ হ'ল কি? রাজাদের মেরে জাতিসমূহকে বাঁচাতে হবে!—তা কেন? মুকুট দূর কর, কিন্তু মাথাটা বাঁচাও। রাষ্ট্রবিপ্লবের উদ্দেশ্য মৈত্রী, বিভীষিকা নহে। উদার মহত্ত্বাবের প্রতিষ্ঠা নিষ্ঠুর লোকের কর্ম্ম? মানুষের ভাষায় "মার্জ্জনা"র মতো সুন্দর কথা তো আমি আর একটি দেখি না। রক্তপাত করতে পারি কেবল সেইখানে, যেখানে আমার নিজেরও রক্তপাত হ'চ্চে। আমি সৈনিক মাত্র—আমি শুধু যুদ্ধই বুঝি। যদি ক্ষমা করার অধিকার না থাকে তবে এত কাণ্ড ক'রে বিজয়লাভের ফল কি? যুদ্ধের সময় আমরা শত্রুদের শত্রু, কিন্তু বিজয় লাভের পর তারা আমাদের ভাই।"

সিমুর্ধান তৃতীয় বার গভেনকে সতর্ক করিয়া বলিল, "গভেন, তুমি আমার পুত্রাধিক, আবার বলচি, সাবধান!" তারপর একটু চিন্তিতভাবে বলিল, "মনে রাখবে, আমাদের এই যুগে দয়া হয় তো বিদ্রোহের আকার ধারণ কর্ত্তে পারে"।

এ যেন তরবারি ও কুঠারের মধ্যে কথোপকথন।

শাবকের সন্ধানে

এদিকে মাতা তাহার কচি শিশুগুলির সন্ধানে চলিয়াছে সোজা সুমুখ পানে। কিরূপে সে জীবন ধারণ করিতেছিল, বলা শক্ত। সে নিজেও তাহা জানে না। দিন-রাত্রি সে হাঁটিয়া চলিয়াছে। কখনও ভিক্ষালব্ধ আহার্য্যে, কখনও বা বন্য ফলমূলে সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত; ঝোপঝাড়ের পার্শ্বে,

মুক্ত আকাশের নীচে, ভূমিতলে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িত—মাথার উপরে কখনও নির্নিমেষ তারাগুলি চাহিয়া থাকিত, কখনও বা ঝড়বৃষ্টি উদ্দাম হইয়া উঠিত।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে রমণী উহাদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরিধেয়-বস্ত্র শতচ্ছিন্ন। মাঝে মাঝে কৃষকের কুটীরদ্বারে গিয়া সে থামে,—কেহ দয়া করিয়া কিছুকালের জন্ত আশ্রয় দেয়, কেহ বা দুর্ দুর্ করিয়া তাড়াইয়া দেয়। লোকালয়ে স্থান না মিলিলে সে বনের ভিতর চলিয়া যাইত।

এ অঞ্চলে কেহ তাহাকে চিনিত না। আজের প্যারিশ এবং সিস্কয়নার্ডের গোলাবাড়ী ভিন্ন সেও আর কিছুই জানিত না। কোন্ পথে যাইতে হইবে সে সম্বন্ধে তাহার কোনোই জ্ঞান ছিল না। চলিতে চলিতে আবার সে ফিরিয়া আসিত; একই পথে একাধিকবার যাতায়াত করিত; এইরূপে কত পর্য্যটন তাহার নিরর্থক হইয়াছে। কখনও রাজপথ ধরিয়া চলিত; কখনও হয় তো গরুর গাড়ীর চাকার দাগ দেখিয়া তাহারই অনুসরণ করিত, আবার কখনও বা বনের পথে অগ্রসর হইত। এই লক্ষ্যহীন অবিরাম পর্য্যটনে তাহার যৎসামান্ত পরিচ্ছদ জীর্ণ হইয়া পড়িল। প্রথমে তাহার পায়ে জুতা ছিল, তারপর সে খালি পায়ে হাঁটিতে লাগিল, ক্রমে তাহার পদযুগল ক্ষতবিক্ষত, রক্তাপ্লুত হইয়া উঠিল। গোলাবর্ষণ গ্রাহ্য না করিয়া কত যুদ্ধক্ষেত্র সে অতিক্রম করিয়া গেল। কোনোদিকে তাহার দৃষ্টি নাই, কোনো শব্দে তাহার কান নাই। তাহার মনে কেবল এক চিন্তা—সন্তানের খোঁজ। চারিদিকে বিদ্রোহ;—পুলিস-মেয়র, শাসনকর্ত্তা এ সকলের আর অস্তিত্ব নাই; কেবল পথিকের সঙ্গেই তাহার কারবার।

তাহাদিগকে সে জিজ্ঞাসা করিত, "তোমরা কি কোথাও তিনটি ছোট ছেলেপিলে দেখেচ?"

তাহার কথা শুনিয়া পথিকেরা তাহার দিকে তাকাইত। তখন সে বলিত,—"দুইটি ছেলে একটি মেয়ে।" তারপর সে তাহাদের নাম বলিতে থাকিত:—"রেনিজিন, গ্রোস অ্যালেন, জর্জেটি। তোমরা ওদের দেখ নাই?" বিড়-বিড় করিয়া সে বলিয়া যাইত:—"সকলের বড়টি সাড়ে-চার বছরের, আর ছোট্টটি এই কুড়ি মাসের।"

তারপর আবার বলিয়া উঠিত, "তোমরা কি জান, তারা কোথায়? আমার কাছ থেকে ওদের কেড়ে নিয়েচে!"

শ্রোতারা তাহার দিকে ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিত; এই পর্য্যন্ত।

যখন সে দেখিত লোকেরা তাহার কথা বুঝিতে পারে নাই, তখন সে বলিত,—"ওরা আমার কি না,—তাই।"

পথিকেরা চলিয়া যাইত। তখন সে দাঁড়াইয়া আর কোনো কথা না বলিয়া বুক চাপড়াইতে থাকিত। একদিন জনৈক কৃষক মনোযোগ দিয়া তাহার কথাগুলি শুনিল। একটু ভাবিয়া সে বলিল, "দাঁড়াও। তিনটি ছেলেপিলে বল্লে না?"

"হাঁ।"

"দুইটি ছেলে?—"

"আর একটি মেয়ে।"

"তুমি তাদের খুঁজে বেড়াচ্চ?"

"হাঁ।"

"আমি শুনেচি, একজন লর্ড তিনটি ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেচেন।"

"এই লোকটি কোথায়? তারাই বা কোথায়?" রমণী জিজ্ঞাসা করিল।

কৃষক বলিল, "লা-টুর্গে।"

"সেখানে গেলে আমার ছেলেদের পাব?"

"আমার তো তা'ই মনে হয়।"

"কি নাম বল্লে?"

"লা-টুর্গ।"

"ওটা কি?"

"ওটা একটা জায়গা।"

"ওটা কি গ্রাম—না কেল্লা—না গোলাবাড়ী?"

"আমি কখনো সেখানে যাই নি।"

"সেটা কি অনেক দূর?"

"বড় কাছে নয়।"

"কোন দিকে ?"

"কুভার্সের দিকে।"

"কোন্ পথে আমি যাব ?"

কৃষক বলিল, "এই জায়গাটার নাম হ'চ্চে ভটর্টেস্। তুমি আপি বাঁয়ে আর ককুসেল্ ডাইনে রেখে, লর্চাম্প ছাড়িয়ে লীরো নদী পেরিয়ে চ'লে যাবে।" আঙুল দিয়া পশ্চিম দিক দেখাইয়া কৃষক বলিল, "বরাবর সুমুখ পানে—যেদিকে সূর্য্যি ডুবে' যায় সেই দিকে তোমাকে যেতে হবে।"

কৃষক তাহার হাত নামাইবার পূর্ব্বেই রমণী ছুটিয়া চলিল। কৃষক চেঁচাইয়া বলিল, "কিন্তু সাবধান—ওখানে লড়াই হ'চ্চে।"

রমণী জবাব দিল না—একবার ফিরিয়াও চাহিল না। সোজা সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

চন্দ্রময়ী

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল

সব সাধ-আহ্লাদ ঘুচে যায়—তখন তের বছরের মেয়ে। বিয়ের তিন দিন না যেতেই স্বামী হ'ল দেশত্যাগী। কপালের সিঁদুরের চিহ্নটুকু রইল কিন্তু হাট গেল ভেঙে। সে ভাঙা-হাটে আসর আর জম্‌লো না। সধবা, বিধবা এবং কুমারীর একত্র সমাবেশে চন্দ্রময়ী হ'য়ে রইল সকলের চোখে একেবারে অপূর্ব্ব!

সংযম এবং সতীত্বের পরীক্ষা চলল বছরের পর বছর। চন্দ্রময়ীর হৃদয়াবেগ ছিল না, ব্যর্থতার বেদনা ছিল না, সুতরাং পথ চল্‌তে গিয়ে পা তার এতটুকু টলেনি। হেসে-খেলে, ভালমন্দ খেয়ে, ঝগড়া-ঝাটি ক'রে, পরের সেবা ক'রে, তীর্থে তীর্থে ঘুরে, রামায়ণ মহাভারত প'ড়ে দিব্যি বয়েসটা গেল কেটে।

যেটুকু চঞ্চলতা ছিল থেমে গেল, আগুন যেটুকু ছিল ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে গেল ছাই হ'য়ে। রক্তের মধ্যে জল মিশে পাতলা হ'য়ে গেল, বুদ্ধিবৃত্তিটাকে আচ্ছন্ন করল আসন্ন-বার্দ্ধক্যের একটি অস্পষ্ট ছায়া!

চন্দ্রময়ীর বয়স এই সবেমাত্র চল্লিশ পার হ'য়েছে। জীবনে তার একটিও প্রেম হ'য়েছিল কি না কে জানে! হ'য়েও থাকতে পারে! স্ত্রীর মত ক'রে একজনও কেউ ভাল বাসেনি—বয়স্থা কোনো মহিলার পক্ষে এ কথা যে অতিরিক্ত সম্মানহানিকর! ভালবাসিনি এ কথা অনেক মেয়েই বলতে পারে, কিন্তু ভালবাসা পাইনি এ কথা বলতে মেয়েদের মুখে কেমন যেন আটকায়।

এই হ'ল গল্পের একটি আব্‌ছায়া পট-ভূমিকা।

বাড়ীটি নিতান্ত ছোট নয়। কিন্তু কে যে কর্ত্তা এবং কে কে যে বাস করে তা আজও পর্য্যন্ত জানা যায়নি। তিনটি তলায় সবশুদ্ধ অনেকগুলি বারান্দা এবং দালান। ধর্ম্মশালা ব'লে ভুল হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়; আতিথ্য নেবার এমন অবাধ সুবিধাও সহজে মেলে না। মাঝের তলায় যে ঘরখানি এতদিন খালিই পড়েছিল, সেদিন দেখা গেল একটি স্বামী ও স্ত্রী এসে সেখানি দখল ক'রে বসেছে।

বউটি ছেলেমানুষ। নিজেই রাঁধে-বাড়ে, নিজেই সব কাজকর্ম্ম করে; এবং স্বামীর অনুপস্থিতে দেখা যায় ঘরের মধ্যে খিল এঁটে দিয়ে নিঃসাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। যে পুরুষমানুষের ভিড় চারিদিকে!—লোকজনের যাতায়াত একদণ্ডও কামাই নেই!

তেতলা থেকে চন্দ্রময়ী একদিন নেমে এল, দরজার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে বউটি দরজা খুলে দিল, চন্দ্রময়ী একটুখানি হেসে জিজ্ঞেস করল—নাম?

এমন আকস্মিক ভঙ্গীর সঙ্গে বউটির পরিচয় ছিল না। আস্তে আস্তে বলল—নিরুপমা।

নিরুপমা? বেশ নাম। আচ্ছা নিরু ব'লেই ডাক্‌বো। —ওকি, অবেলায় মাথার চুল এলো কেন? চুল তোমার একেবারে মেঘের মতন বাছা! ব'সো বেঁধে দিয়ে যাই।

নিরুপমা আর প্রতিবাদ করতে পারল না। কাঁটা, চিরুণী, ফিতে বা'র ক'রে আনল। চন্দ্রময়ী ভেতরে ঢুকে তাকে কোলের কাছে নিয়ে চুল বাঁধতে ব'সে গেল।

—কি করেন তোমার বর, বৌমা?

—দোকান আছে।

—ও,—তা ছেলেপুলে?

—না, এই ত সবে দু' বছর হ'ল বিয়ে হ'য়েছে।

চুল বাঁধতে বাঁধতে চন্দ্রময়ী এদিক ওদিক তাকায়। বদ্‌ অভ্যাস একটি তার ছিল বৈ কি! ভ্রূ-কুঞ্চিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার বিশেষ সৌন্দর্য্যগ্রাহিতা ছিল না।

ও-ছবিটি কার বৌমা? ওই যে জান্‌লার পাশে?

উনি আমার মেসোমশাই।

ও, সেলাইয়ের কাজ রয়েছে দেখছি ; সেলাই কর ?

হুঁ।

আচ্ছা, বাসিফুল অতগুলো জমিয়ে রেখেছ কেন ? তোমার স্বামী বুঝি এনে রেখেছেন ?

হুঁ।

তা বেশ বেশ, বলি হ্যাঁ মা ঘরটা ঝাঁট দাওনি ?

বউটি বল্‌ল—দেবো এইবার।

চুলের মধ্যে কাঁটা গুঁজে দিয়ে চন্দ্রময়ী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। পরে বল্‌ল—তোমরা বুঝি কলাইয়ের বাসন ব্যাভার কর বৌমা ?

আজ্ঞে হাঁ।

ওগুলো কিসের কৌটা ? মসলা পাতি থাকে বুঝি ?

হুঁ।

প্রশ্নের পর প্রশ্নে নিরুপমা ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে উঠেছিল। চন্দ্রময়ী বুঝতে পারল কি না কে জানে! উঠে যাবার আগে বল্‌ল—দেখি বৌমা, একবার এদিকে ফেরো ত!

নিরুপমা ঘুরে বসতেই তার মুখখানি ধ'রে চিবুকটি নেড়ে আদর ক'রে চন্দ্রময়ী বল্‌ল—বেশ বৌ, খুব পছন্দসই। তারপর উঠে চ'লে যাবার সময় ব'লে গেল—তুমি আমার মেয়ের বয়সী! আচ্ছা মা, আবার আসব'খন।

নিরুপমা অবাক হ'য়ে তার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। তাড়াতাড়ি সে তেতলায় নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে খুব হাসতে লাগল। এ হাসির মধ্যে নারীর অন্তর-মাধুর্য্যের চেয়ে তীব্র তীক্ষ্ণতাই ছিল পরিমাণে কিছু বেশী। এ হাসি দেখলে জয়ের উল্লাসকেই শুধু মনে পড়ে।

চন্দ্রময়ীর জীবন-যাত্রার যে কোনো শৃঙ্খলা নেই তা বেশ বোঝা যায় তার অগোছালো ঘরখানির চারিদিকে তাকালে। কাপড়ের কুটি, ভাঙা টিন, ছেঁড়া বিছানা, পুরোনো হাঁড়ি, ফুটো থালা-বাসন প্রভৃতিতে ঘরখানি একেবারে বোঝাই। আমকাঠের একটা খোলা মাঝারি সিন্দুকের মধ্যে আরশোলা গিজ্‌গিজ্‌ করছে, পায়া-ভাঙা একখানা জল-চৌকী চিৎ ক'রে তার ওপর রাজ্যের জঞ্জাল জড়ো করা, কাঁচকড়ার একটা তোবড়ানো পুতুল মাথা-কাটা অবস্থায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। চন্দ্রময়ীর এসব কোনদিন খেয়ালেই আসে না। সে যে রান্নাবান্না ক'রে, খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে বেঁচে থাকে কেমন ক'রে এটি ভাববার কথা।

সারাদিন চন্দ্রময়ীর কাজ ফুরোত' না, অবসর ছিল না তার এতটুকু। কিন্তু কী যে সে কাজ, সমস্তক্ষণ ঘুরে ঘুরে কেন যে সে শশব্যস্ত থাকত,—বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ না করলে তার হদিস পাওয়া যেত না। সকলের সঙ্গে একটু-আধটু জড়িয়ে থাকলেও তার কোনো স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব নেই; সকলের মাঝখানে থেকেও সকল মানুষের থেকে দূরে ছিল তার স্থান। রাসভারীও ছিল না তার, হাঁটলে বা ছুটলে তার পায়ের শব্দও হ'ত না! চোরের মত কতকগুলি বিশ্রী গতি-ভঙ্গীতে সে ছিল অতিরিক্ত অভ্যস্ত।

নীচের তলার ঘরগুলি বিশেষ বাসযোগ্য ছিল না, দু'-তিনখানি নোংরা অন্ধকার ঘর এই সেদিন পর্য্যন্ত খালিই প'ড়ে ছিল। অনেকদিন অনেক সময় এই ঘরগুলি থেকে চন্দ্রময়ীকে চট্‌ ক'রে বেরিয়ে চ'লে যেতে দেখা গেছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলত—এমনি, যদি কেউ আসে...ঘর-দোর পরিষ্কার থাকলে ভাল দেখায়!

অনুমান তার মিথ্যে নয়, লোকজন এল। গুটি তিন-চার যুবক ছুটিতে পশ্চিমে হাওয়া খেতে এসেছে। থাকবে কিছুদিন।

চন্দ্রময়ী তার একটা ফুটো-সারানো বাল্‌তি নিয়ে ওপর থেকে নেমে এল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—কুলোবে ত বাবা, দুখানি ঘরে তোমাদের চল্‌বে ? কাশীর বাড়ী সব এমনিই বাবা, সব জায়গাতেই অন্ধকার!

একটি ছেলে বল্‌ল—তা চ'লে যাবে কোনরকমে। এটা ত আপনারই বাড়ী, নয় ?

আর বাবা, আমার জিনিস কি আর বলা চলে ? এসব তোমাদেরই, আমি শুধু আগ্‌লে দরোয়ানের মতন ব'সে আছি। তোমার নাম কি ?

ভূপতি। আর এই আমার বন্ধু সদানন্দ, আর উনি নিখিল।

চন্দ্রময়ী গিয়ে কল্‌ থেকে এক বাল্‌তি জল এনে রাখলে, পরে জলের ওপর ঢাকা দিয়ে ঝাঁটা এনে ঘর ঝাঁট দিতে সুরু

ক'রে দিল। ছেলেরা নির্বাকদৃষ্টিতে তারদিকে একবার তাকালো, পরে বল্‌ল—কি করছেন? এ কি ভাল হ'চ্ছে? এত করলে আমাদের এখানে থাকতে লজ্জা হবে যে!

চন্দ্রময়ী একটুখানি হাসল শুধু। এবং সে হাসি এমনিই যে একাজে যেন আর কারো অধিকারই নেই; এ শুধু তারই একার!

এমনি ক'রেই হ'ল আত্মীয়তা, এমনি মুখ-থাবা দিয়েই নিল চন্দ্রময়ী পরের ওপর অধিকার! অনাত্মীয়ের সেবার এই যে অনাহূত আতিশয্য—এর টান্ ছিল চন্দ্রময়ীর ভয়ানক বেশী।

দোতলায় যিনি থাকেন তিনি একজন প্রবীণ ডাক্তার। বয়স আন্দাজ বছর-পঞ্চাশ। কাঁচা-পাকা চুল। বিপত্নীক। একটি তরুণী প্রমুখ কয়েকটি ছেলেপুলে নিয়ে তিনি বেশ শান্তিতেই বসবাস করেন।

মেয়েটির বিবাহের কথা চলছিল। তা বয়স হ'য়েছে বৈ কি! চন্দ্রময়ী একদিন তাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল,—কলঘরের মধ্যে। একহাতে গলাটা জড়িয়ে আর একহাতে চিবুকটি ধ'রে বল্‌ল—বিয়ে হবে, হ্যাঁ রে বিনীতা?

বিনীতা লেখাপড়া-জানা মেয়ে, সুতরাং তার একটি গাম্ভীর্য্যের ছায়া আছে। বল্‌ল—তা এমন আড়ালে ডেকে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস কচ্ছেন কেন? হ'লে ত আর লুকিয়ে হবে না!

না, তাই বলছি—চুপি চুপি চন্দ্রময়ী বল্‌ল—সত্যি হবে?

তা, মেয়েরা আর কবে চিরকাল আইবুড়ো থাকে, মাসিমা?—বিনীতা গরগর করতে করতে ওপরে উঠে এল।

কোনো মানুষের অবজ্ঞা চন্দ্রময়ীকে আহত করে না।

ভূপতি এবং তার বন্ধুরা বাড়ী ছিল না, চন্দ্রময়ী একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরের কাছে এসে উঁকি মেরে দেখল। কি তার উদ্দেশ্য তা শুধু সে-ই জানে! ফিরে এসে ওপরের সিঁড়িতে পা দিতেই তার নজর পড়ল কতকগুলি এঁটো বাসনের ওপর। বাসনগুলি ভূপতিদের। চন্দ্রময়ী নেমে এসে সেগুলো কলতলায় নিয়ে গিয়ে মাজতে ব'সে গেল। বামুনের মেয়ে—কিন্তু জাতিভেদের সংস্কার তার তখন মনেই এল না।

কাজ হ'য়ে গেলে ধোয়া বাসনগুলি এনে দরজার কাছে গুছিয়ে রেখে তৃপ্ত মনে সে ওপরে উঠে এল। হঠাৎ সুমুখে ডাক্তার বাবুকে দেখেই লজ্জায় ও সম্ভ্রমে মাথার কাপড় আর একটু টেনে দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে সে আবার তেতালায় উঠে গেল। ডাক্তার বাবুকে দেখলে তার বুকের রক্ত বুকের মধ্যেই দাপাদাপি করে!

নিজের ঘরে এসে সে হাঁপাতে লাগল। উত্তেজনায় মুখখানায় তার রোমাঞ্চ হ'য়ে এসেছিল। ডাক্তার বাবু কি তার মুখের চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন?

রূপ? চন্দ্রময়ীকে দেখলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে। বিরল-কেশ, দাঁত উঁচু, সাপের চোখের মতো দুটো ছোট ছোট চোখ, হাত-পাগুলি কদাকার, চির-উপবাসীর মত একখানি শীর্ণ দেহ,—চন্দ্রময়ী যেন বিধাতার সৃষ্টির ব্যর্থতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

অপরাহ্ণের আলো ম্লান হ'য়ে এসেছে। চন্দ্রময়ী আবার আস্তে আস্তে নেমে এল। দোতলার সিঁড়ির কাছে দরজাটায় একটু ধাক্কা দিল, দরজা গেল খুলে। নিরুপমা নীচে তখন কাপড় কাচ্‌তে গেছে।

ঘরে ঢুকে চন্দ্রময়ী দেখল দু' তিনখানি ধুতি ও সাড়ী মেঝের লুটোপুটি খাচ্ছে, সেগুলি সে গুছিয়ে রাখল। বিছানা-গুলো এক-জায়গায় জড়ো করা ছিল, সেগুলি অতি যত্নে বিন্যাস ক'রে মেঝের ওপর ছড়াতে লাগল। আগে মাদুর, তার ওপর সতরঞ্চি, সতরঞ্চির ওপর তোষক, তার ওপর পরিষ্কার একখানি ধবধবে চাদর। চাদরখানি পেতে পাশ-বালিশ গুছিয়ে মাথার দুটি বালিশ পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ফিরতেই একেবারে নিরুপমার সঙ্গে মুখোমুখি। নিরুপমার মুখখানি তখন বিছানার দিকে তাকিয়ে রাঙা হ'য়ে উঠেছে।

—এই যে বৌমা, এই মাত্র বাছা তোমার ঘর-দোর…

তুমি একা আর কত পারবে মা ?

নিরুপমা বলল—রোজই ত করি।

চন্দ্রময়ী একটু হাসল। বলল—ইচ্ছে হ'ল, ক'রে দিয়ে গেলাম! আমার ত আর হাতে কোনো কাজ নেই মা! দাঁড়াও বাছা, রাতের জন্যে জল তুলে এনে দিচ্ছি।

না না, থাক্—কেন এত কষ্ট করবেন আপনি ?

দরজার বাইরে এসে চন্দ্রময়ী কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল, তারপর নীচে নেমে এসে যাবার সময় তার সেই কদাকার মুখে একটুখানি হেসে বলল—তা হোক বৌমা, দয়া ক'রে একটু-আধটু কিছু আমাকে করতে দিও। এতে ত তোমারই লাভ মা ?

চন্দ্রময়ী সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। নীচের ঘরে তখন আলো জ্বলছে। ভূপতিরা ঘরের মধ্যে ব'সে ব'সে গল্প করছিল। রান্নাঘরের ভেতর ব'সে একটি হিন্দুস্থানী ছেলে রাতের খাবার তৈরি করছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে চুপি চুপি বলল—এই ?

ছেলেটা মুখ তুলে তাকালো। চন্দ্রময়ী বলল—চেঁচামেচি করিসনে। তোর মসলা পিষে দেবার দরকার আছে ত ?

ঘাড় নেড়ে ছেলেটা জানালো আছে। বাস্ তখন, আর কি, চন্দ্রময়ী ভেতরে ঢুকে' কোমরে কাপড় জড়িয়ে ব'সে গেল বাটনা বাটতে। অতি যত্নে, অতি সাবধানে এবং অতি গোপনে সে একে-একে লঙ্কা, হলুদ, ধনে-জিরা-মরিচ চমৎকার মিহি ক'রে বেটে দিতে লাগল। মনে হ'চ্ছিল তার হৃদয়ের সমস্ত দাক্ষিণ্য, মমতা, মায়া—যত কিছু হৃদয়-বৃত্তি তার গুপ্ত হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে ছিল, সেগুলি একে-একে জেগে উঠে এইসব ছোট-ছোট কাজের মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে যাচ্ছিল।

—কে তোকে ডেকে আনল রে ?

ছেলেটা বলল—ভূপতিবাবু।

চন্দ্রময়ী বলল—মাইনেটা একটু কম ক'রে নিস্ বাছা। ভূপতির এখন অনেক খরচ।

ছেলেটা চুপ ক'রে রইল। চন্দ্রময়ী পুনরায় বলল—শরীরটা আমার ভাল নেই কি না, তাই তোকে রাখতে হ'ল! বাবুকে একটু যত্ন-আত্তি করিস, মাহিনে বাড়িয়ে দেবো।

বাইরের ঘরে তখন কি একটা কথার হাসির ধুম প'ড়ে গেছে। ছেলেগুলি ঠিক শিশুর মত উজ্জ্বল, চঞ্চল,—প্রাণের প্রাচুর্য্যে তারা যেন টলমল করছে। চন্দ্রময়ীর কান-দুটো সেইদিকে খাড়া হ'য়ে ছিল। বলল—যে বয়সের যা, বাইরের লোকে কি আর এসব বুঝবে ? এটুকু হাসি-তামাসা না করলে শরীর ভাল থাকবে কেন ?

ছেলেটা এবার বলল—বাবু ত এখানে শকরে এসেছে!

তুই থাম্! তুই ত সবই জানিস্। কলকাতাতেই বাবুর সব কাজ, এখানে তাই জন্যে সব সময় থাকা চলে না। বলি ও কি হ'চ্ছে? অমনি ক'রে কি মাছ সাঁতলায়? মাছগুলো ত পুড়িয়েই ফেললি! নে, স'রে বস্।

হলুদ-মাখা হাত দু'খানা ধুয়ে এসে চন্দ্রময়ী ছেলেটাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে রাঁধতে ব'সে গেল। বলল—দু'একদিন দেখিয়ে শুনিয়ে না দিলে পারবিনে দেখতে পাচ্ছি। দাঁড়া দাঁড়া যাসনে এখনও কোথাও, শোন্ বলি।

ছেলেটা ফিরে দাঁড়াল। চন্দ্রময়ী উঠে গিয়ে বাজার-থেকে-আনা একটি মিষ্টি তার হাতে দিয়ে বলল—থালে দিয়ে এইখানে ব'সে জল খা, যাসনে কোথাও—বুঝলি ?

ছেলেটা তাকে বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী বিবেচনা ক'রে নির্ব্বিচারে তার এই আদেশ মেনে নিয়ে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

ও ঘর থেকে আওয়াজ এল—এই গিরধারী, বেটা ভাত চড়িয়ে দে না,—পেট যে চুঁই-চুঁই করছে!

গিরধারী উঠে দাঁড়াল। চন্দ্রময়ী চঞ্চল হ'য়ে উঠে বলল—এইখান থেকে উত্তর দে, বল্—'ভাত চড়ানো হ'য়েছে বাবুজি!'

খুন্তিটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে সে একবার বাইরে এসে উঁকি মারল, তারপর বলল—দেখিস্ আমি এখানে আছি একথা ভূপতি শোনে না যেন। আমার অসুখ হ'য়েছে কি না তাই নীচে নামতে বারণ ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু তার এই চৌর্য্যবৃত্তি গিরধারীর ভাল লাগছিল না। সে ভারি অস্বস্তি বোধ করছিল।

আত্মগোপন করবার শক্তি যার অনেকখানি, মানুষের মনের কথা জানবার একটি বিস্ময়কর ক্ষমতা তার আছে। চন্দ্রময়ী একবার বাইরের দিকে তাকালো। রাত্রি অন্ধকার কি না কে জানে, হয় ত চন্দ্রোদয় হ'য়ে থাকতে পারে, কিন্তু নীচেটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলো নেই, হাওয়া নেই, আকাশ নেই, অবকাশ নেই, —নিরুদ্ধ নিশ্বাসের মধ্যে মানুষের গলার আওয়াজ ছেঁড়া তবলার মত চ্যাব্ চ্যাব্ করে। চন্দ্রময়ী ঘাড় ফিরিয়ে গিরধারীর মুখের দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে বল্ল—ভূপতি যে আমার ছেলে রে, তুই তা জান্‌বি কি ক'রে; সবে এসেছিস বৈ ত নয়! বত্রিশনাড়ি ছেঁড়া যে ছেলে, সে তার মায়ের শরীর দেখবে না?

গিরধারী একথা আগেই বুঝেছিল।

ভাত নামিয়ে খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে চন্দ্রময়ী লুকিয়ে চ'লে গেল। ছেলেরা যখন খেতে এসে বসল, সে তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে চোরের মত তাদের দিকে তাকাতে লাগল। গিরিধারীর পরিবেশনের মধ্যে কতটুকু যত্ন আছে তাও তার নজর এড়ালো না। নিজের হাতে সে যদি ভূপতিদের খাইয়ে দিতে পারত তা হ'লেই হ'ত ভাল!

চন্দ্রময়ী নেমে এসে পা টিপে তাদের ঘরে গেল। বিছানাগুলি ঝেড়ে-ঝুড়ে অতি যত্ন ক'রে পেতে দিল। ঘরের মধ্যে সিগারেট ও দেশলাইয়ের কতকগুলি কুচি ছড়ানো ছিল, সেগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে জানলার বাইরে ফেলে দিল। পাছে ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট্ দিলে শব্দ হয়, এজন্যে আঁচল দিয়ে সমস্ত ঘরের মেঝেটা সে পরিষ্কার করল।

পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে সে যখন নিঃশব্দে ওপরের সিঁড়িতে উঠে গেল, ছেলেরা তখন সোৎসাহে আহার সাঙ্গ ক'রে উঠেছে। উল্লাসে চন্দ্রময়ীর সর্বাঙ্গ একবার রোমাঞ্চ হ'য়ে এল। সন্তানের ভোজন-তৃপ্ত মন মাকে কি আনন্দিত করে না?

ঘরের মধ্যে স্বামীকে খেতে বসিয়ে নিরুপমা এসে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। চন্দ্রময়ীকে এমনি অলীতে আসতে দেখে বল্ল—অন্ধকারে এতবার যাতায়াত করছেন, একটা আলো হাতে রাখুন না!

আর মা, আলো!—চন্দ্রময়ী বল্ল—সময় কই? ছেলে হ'লে মায়ের যে কত জ্বালা, তা ত' আর তুমি এখনও জানলে না!—ব'লে সে তেতলায় চ'লে গেল।

কথাটা ঘরের মধ্যে খেতে খেতে স্বামীর কানে গিয়েছিল। তিনি ভ্রূ কুঁচ্‌কে নাক সিঁটিয়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—মাগীটা কেন কথা কয় যখন-তখন তোমার সঙ্গে? বদ্‌মাইস্—'আগ্‌লি'!

নিরুপমা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবার দৃষ্টি নত ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। জীবনকে মানুষ কি ঠিক এমনি ক'রেই বিচার করবে?

ওপরে উঠে চন্দ্রময়ী ঘরে ঢুকে' ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ল। ভূপতির রান্না করতে পেয়ে আজ যেন সে ধন্য হ'য়ে গেছে। আজ এই রাত্রিটিতে দুঃখের একবিন্দু চিহ্নও যেন তার মধ্যে নেই! চোখে আজ তার হয় ত ঘুম আসবে না, দেহের অবসাদ আসবে না, মনের নিত্য-নিয়মিত ক্লান্তি আসবে না—সমস্ত রাত আনন্দের উগ্র উত্তেজনায় আজ হয় ত তাকে ছাদের ওপর ঘুরে ঘুরেই বেড়াতে হবে!

জানলা-দরজাগুলো খোলাই রইল, বিছানা হ'ল না, না হ'ল ঘর পরিষ্কার,—আলোই বা সে কি জন্যে জ্বাল্‌বে!

কিন্তু তার সমস্ত মন এই বিশৃঙ্খল, জীর্ণ ও মলিন গৃহসজ্জাগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অপরিসীম আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভ'রে উঠতে লাগল। আজ তার সমস্ত দৈন্য সার্থক ক'রে দীপশিখা জ্ব'লে উঠেছে!

সারাদিনের পরিশ্রমের পর তার চোখ বুজে এল। কিন্তু চোখ বুজে সাধারণ মেয়ের মত আপনার ব্যর্থতার রূপটি সে দেখতে পেল না, সে দেখল শিশু-ভূপতিকে। ফুটফুটে দু' বছরের ছেলে, অশান্ত, পাথরের কুচির মত কঠিন, ক্ষুধা-পিপাসায় শিশু-ব্যাঘ্রের মত সে যেন চন্দ্রময়ীর বক্ষস্থল প্রথম দাঁতের আঘাতে জর্জর করেছে!

ভাবতে ভাবতে চন্দ্রময়ীর গা ভোল হ'য়ে এল।

মাছুরের ওপর ব'সে নিরুপমা কি একখানা মাসিকের পাতা ওল্‌টাচ্ছিল ; চন্দ্রময়ী ঘরে এসে ঢুক্‌লো।

—এসে যে দুদণ্ড বসবো বৌমা, তার আর সময়ই পাইনে। তোমার সেই যে সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ ছিল, শেষ হ'য়ে গেছে বুঝি ?

হাঁা, সে সামান্যই !

সেলাইটাও যদি শিখতাম ! —চন্দ্রময়ী বল্‌ল—কোনো কাজই হাতে থাকে না কি না, তাই কোনো কাজের সময়ও করতে পারিনে। চির কালটা ভূতে পেয়েই রইলাম মা !

কণ্ঠস্বরের মধ্যে তোষামোদের যে ঈষৎ একটুখানি আভাস ছিল, তা নিরুপমার লক্ষ্য এড়ালো না। কিন্তু সে ব্যথিত দৃষ্টিতেই চন্দ্রময়ীর দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—ভগবানের রাজ্যে এমন যে কেন হয় বোঝাই যায় না।

চন্দ্রময়ী বল্‌ল—সেই প্রথম দিনটি থেকে তোমাকে আমার ভাল লেগেছে বৌমা ! মনে মনে তোমাকে নিয়ে অনেক কথা ভেবেছি।

একটুখানি ম্লান হাসি হেসে নিরুপমা বল্‌ল—কি রকম ?

চন্দ্রময়ী বল্‌ল—না তা নয়, এই ধর পেটের মেয়ের মত তোমাকে আমি ভাবতে পারিনে বৌমা ! যদি তোমাকে আমি এ জন্মেই ছেলের বউ ক'রে পেতাম!

ও কথা ব'লে আর লাভ কি বলুন ? ইচ্ছে মানুষের অনেক রকমই থাকে। ভেবে ভেবে শুধু দুঃখই বাড়ানো !

তাই বলছি।—মেঝের উপর আঙুল দিয়ে দাগ টান্‌তে টান্‌তে চন্দ্রময়ী বল্‌ল—ভাগ্যবতী নৈলে ভূপতির মতন ছেলে পেটে ধরা যায় না। যেমন রূপ, তেমনি গুণ ! তিনটে পাশ করেছে, কলকাতায় কারবার—দেশে জমিদার। বালকের মতন সরল, বিনয়ী—বাছা আমার দুঃখের ধন বৌমা !

পরের ছেলের প্রতি এমন একান্ত মমতা, এবং তাই নিয়ে এমন মনোহর স্বপ্নজাল রচনা করা,—নিরুপমা একটুখানি অবাক হ'য়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

চন্দ্রময়ী বল্‌ল—অনেক জিনিস ঘটে না বৌমা যা ঘটলে ভাল হ'তো। স্বামী নিয়ে তুমি ঘর করছো অথচ ভূপতি আজও বিয়ে করল না, একথা কি কেউ ভেবেছিল ? সংসারে অনেক জিনিসেরই আমরা হদিস পাইনে মা।

অর্থাৎ —?

নিরুপমা ঘাড় ফিরিয়ে তার প্রতি তাকালো। কোথাকার কে ভূপতি বিয়ে করেনি সে আলোচনা তার কাছে কেন ? ভূপতির বিয়ে না করার সঙ্গে তার স্বামী নিয়ে ঘর করার সম্বন্ধ কি ?

চন্দ্রময়ী বল্‌ল—তা ধর মা, ভূপতি আমাদের কিছু অপছন্দর নয়। ভূপতির হাঁড়িতে চাল দিলে কোনো মেয়েই কি অসুখী হবে তুমি মনে কর মা ?

আপনার কাছে কি কোনো পাত্রী আছে ?—নিরুপমা বল্‌ল।

সে কথা বলছিনে বৌমা—একটু হেসে চন্দ্রময়ী বল্‌ল—পাত্রী কোথা পাবো ? আমার হাত দিয়ে ত কেউ মেয়ে পার করতে চাইবে না। বলছি মা তোমার কথা···তোমাকে দেখে অবধিই আমি এই কথা ভাবছি।

নিরুপমা বড় বড় চোখে তাকালো।

হাঁা, তোমার কথাই বলছি মা···তোমার যে স্বামী আছে বৌমা, একথা আমি ভাবতেই পারিনে! তুমি ত কুমারী মেয়ে! আচ্ছা, চুপি চুপি বল ত বৌমা সত্যি ক'রে ···আমাকে মা পাগল মনে করো না...বল ত' ভূপতিকে তোমার পছন্দ হয় না ? সত্যি বলছি মা, ভূপতি তোমার স্বামী হ'লে বুঝতে যে—

আহত ক্রুদ্ধ সর্পের মত নিরুপমা উঠে দাঁড়াল। নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাসে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌ল—চ'লে যান্—যান্ শীগ্‌গির বলছি···এক মিনিটও আর এ ঘরে বসবেন না !

তার মুখের চেহারা দেখে চন্দ্রময়ী আর বসতে পারল না, উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাল্ ক্যাল্ ক'রে তাকিয়ে ঢোক গিলে বল্‌ল—অন্যায় হ'য়েছে বৌমা ?

বৌমা তার উত্তরে বল্‌ল—কই এখনও বেরোলেন না ঘর থেকে ? উনি যা বলেন মিথ্যে নয়, উনি মানুষ চেনেন। খবরদার আমাকে আর বৌমা বলে' ডাকবেন না ! আপনার কি ধর্মভয় নেই ? যান্ এ-ঘর থেকে। আপনার বাড়ীতে ভাড়া ক'রে আছি ব'লে অপমান করেন কোন্ সাহসে ?

মাথা হেঁট ক'রে চন্দ্রময়ী বেরিয়ে চ'লে গেল।

গেল বটে কিন্তু একটুকু আঁচ তার গায়ে লাগল না। ওপরের ঘরে গিয়ে সে যখন আবার প্রতিদিনের কাজকর্মে মন দিল, মনে হ'লো, অপমানিত হওয়ার অভিজ্ঞতা তার নতুন নয়। মানসিক অত্যাচার ক'রেও সে লজ্জিত হ'ল না, আঘাত পেয়ে আহত হ'ল না, সামাজিক নীতিকে পদদলিত করতে সে কুণ্ঠিত হ'ল না—স্বচ্ছন্দে নির্বিকারচিত্তে সে ঘরের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল।

নিরুপমার ঘরের পাশ দিয়ে আনাগোনা করে কিন্তু কথা বলতে আর সাহস করে না। এ ঘরটি চিরকালের জন্য তার মুখের ওপর বন্ধ হ'য়ে গেছে।

দোতলায় নেমে ডাক্তার বাবুর ছেলে-মেয়েগুলির সঙ্গে সে হেসে হেসে কথাবার্তা কয়। একটু আধটু খেলাও করে। ছেলেমেয়েগুলি তার বড় প্রিয়। বিনীতা প্রায়ই লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে,—এই কদাকার স্ত্রীলোকটার গতিবিধির প্রতি নজর দেবার প্রয়োজন সে মনেই করে না।

চন্দ্রময়ী যে লুকোচুরিও খেলতে পারে একথা ছোট ছেলেমেয়েগুলির জানা ছিল না। সুতরাং এই পরম স্নেহময়ী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে মিলে-মিশে তারা চমৎকার আমোদ পায়। হুড়োহুড়ি ক'রে সারাদিন বেড়াতে পারলে তারা আর কিছু চায় না!

এক একবার একটু থেমে কোনো একটা ছেলে কিম্বা মেয়েকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে চন্দ্রময়ী অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করে।

—তোর বাবা খুব হো হো ক'রে হাসেন, না রে মণ্টু?

মণ্টু বলে—হুঁ, খুব। খুব হাসে মাসিমা, হা হা ক'রে।

বাবা তোর কি খেতে ভালবাসেন রে?

মেজ মেয়েটা ব'লে উঠল—পুঁই শাক মাসিমা, ইলিশ মাছ দিয়ে। ইলিশ আর পুঁই—চচ্চড়ি!

ও,—চন্দ্রময়ী খানিকক্ষণ উদাসীন হ'য়ে রইল। পরে বলল—রাত্তিরে কি খান্?

রাত্তিরে? লুচি।

ডাক্তার বাবু তোদের খুব ভালবাসেন, না রে?

হুঁ—আমাকে সব চেয়ে বেশী!

বাস, অমনি গোলমাল সুরু হ'ল। সবাই চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল—আমাকে বাবা সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসে মাসিমা, আমাকে!

চন্দ্রময়ী বলল—আচ্ছা লটারি ক'রে দেখি দাঁড়া।

লটারি হ'ল,—উঠল কিন্তু খোকা! চন্দ্রময়ী বলল—থাক্ লটারি—যাক্ গে! আচ্ছা, রাত্তিরে ডাক্তার বাবুর কাছে কে শোয়?

মণ্টু তখন বীরের মত এগিয়ে এল। বলল—আমি!

চন্দ্রময়ী তাকে ভুলিয়ে কোলে তুলে' নিয়ে ওপরে চ'লে গেল। ওপরে গিয়ে তার হাতে সন্দেশ দিল, ঠাকুরের প্রসাদী কিস্‌মিস্ দিল। কোলের মধ্যে বসিয়ে তাকে আদর করল, আষ্টেপৃষ্ঠে চুম্বন করল। তারপর তাকে তুলে এনে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বলল—লাট্টু কিনবি মণ্টু! কত দাম বল্ দিচ্ছি।

মণ্টু বলল—চার পয়সা।

আচ্ছা দেবো, আগে আমি যা বলব শুনবি?

হুঁ, শুনবো।

উত্তেজনায় উল্লাসে চন্দ্রময়ী থর-থর ক'রে কাঁপছিল—রক্তের তরঙ্গ প্রচণ্ড আকারে উদ্দাম হ'য়ে তার বুকের মধ্যে মাতামাতি করছিল। বলল—ডাক্তার বাবু তোর কে হয়?

বাবা।

আমি তোর কে হই?

মাসিমা।

চুপ!—ব'লে সে মণ্টুর মুখটা হাত দিয়া টিপে ধরল। বলল—খুন করবো এখুনি। বল্—'তুমি আমার মা হও!' বল লক্ষ্মীটি, এখুনি লাট্টু কিন্‌তে দেবো—বল?

মণ্টু সাত বছরের ছেলে। মা মরেছে ত এই বছর দুই হ'ল,—বেশ মনে আছে। তবু ভয়ে ভয়ে বলল—মা!

আঁচল খুলে চারটি পয়সা তার হাতে দিয়ে চন্দ্রময়ী বলল—যা, পালা এইবার! এবার থেকে হাতের মধ্যে পয়সা টিপে দিলেই কিন্তু চুপি চুপি ওই ব'লে ডেকে যাবি—কেমন?

মণ্টু ঘাড় নেড়ে নীচে নেমে গেল।

চন্দ্রময়ী একবার চুপ ক'রে দাঁড়াল। এ তাঁর কোন্ পথ? অন্যের সন্তান তাকে মা বলবে—নারীর সম্ভ্রমের প্রতি এতবড় অপমান সে ভিক্ষা ক'রে নিল? নীতি, ধর্ম্ম, সংস্কার সমস্তই সে বিসর্জ্জন দিল?

কিন্তু এই ক্লেদাক্ত জঘন্য কৌশল, বিকৃত চিন্তাধারার এই কুৎসিত প্রকাশ—এর মধ্যে তার যে ক্ষুধাই প্রকাশ পাক্—আপনার আনন্দে আপনি বিহ্বল হ'য়ে এই মনোবিলাসিনী নারীটি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ, সন্তান-সন্ততি থাকার আনন্দ যে কেমন—ঠিক এই রকমটি কি না—চন্দ্রময়ী হাসতে হাসতে কেবল এই কথাটাই বারে বারে ভাবতে লাগল।

গভীর রাত পর্য্যন্ত ডাক্তার বাবু লেখা পড়া করছিলেন। বারান্দার সুমুখেই খোলা জান্লার ধারে একটি টেবিল—চারিদিকে কাগজ-পত্র ছড়ানো—মাঝখানে একটি উগ্র উজ্জ্বল আলো জ্বল্‌ছে। গভীর মনোনিবেশ সহকারে ডাক্তার বাবু চোখে চশমা লাগিয়ে বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আলো পার হ'য়ে বাইরে তাঁর নজর আসার উপায় নেই, বাইরেটা সমস্তই অন্ধকার দেখায়।

রাত বোধ করি অনেক। ছেলেমেয়েরা সবাই তখন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। নীচে ভূপতিদের আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই,—নিরুপমার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। নিস্তব্ধ রাত্রে দূরে কোথায় কোন্ একটা মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ তখনও ভেসে ভেসে আসছিল।

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে!

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে বিনীতা এসে দাঁড়াল। চন্দ্রময়ী থতমত খেয়ে বল্‌ল—বিনীতা? ঘুমোওনি এখনো?

ন্যাকামিকে প্রশ্রয় দিতে বিনীতা ভালবাসে না। বল্‌ল—না, বেশ সাদা চোখেই আমি জেগে ছিলাম। আলোর সাম্‌নে ছায়া পড়ছে দেখে……জান্‌লার ভেতরে চেয়ে কি দেখছিলেন শুনি? রোজ রাত অবধি বাবাকে কাজ করতে হয়, এখানে এসে দাঁড়িয়ে আপনার কি লাভ?

ভেতর থেকে ডাক্তার বাবু সাড়া দিয়ে বললেন—কি হ'ল রে বিনু?

কিছু না বাবা, আপনি কাজ করুন। বিনীতা বল্‌ল।

মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে একটুখানি স'রে এসে অপরাধীর মত চন্দ্রময়ী বল্‌ল—আলো নিবে গেছে মা, তাই একটা দেশ'লাইয়ের জন্যে—

দেশলাই আমার কাছে চাইলেই ত হ'ত? লুকিয়ে বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেই কি দেশলাই পাবেন?—হাতড়ে হাতড়ে একটি দেশলাই বা'র ক'রে ঠক ক'রে ফেলে দিয়ে বিনীতা বল্‌ল—যান্, যদি কিছু দরকার হয় ত দিনের বেলা সকলের সুমুখে আমাদের কাছে চাইবেন, দেবো। নৈলে অমন চোরের মতন রাতের বেলা—ছিঃ!

হাতে ক'রে দেশলাইটা নিয়ে চন্দ্রমুখী আবার ওপরে উঠে গেল। ঘরে আলো জ্বল্‌ছে। এঁটো-কাটা, আহারের সামগ্রী চারিদিকে ছড়ানো। আঁচলের ভেতর থেকে একবাটি তরকারী সে মেজের ওপর নামিয়ে রাখল,—ইলিশ মাছ এবং পুঁইশাকের তরকারী!

ব'সে প'ড়ে সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। মনে হ'ল, বহু কষ্টে ও বহু যত্নে নিতান্তই আগ্রহে সারাদিন ধ'রে সে আজ রান্নাবান্না করেছে। এই বাড়ীর সমস্ত নরনারীগুলিকে আজ সযত্নে খাওয়াতে পারলে নিতান্ত মন্দ হ'ত না!

অনেকক্ষণ অনেক রকম ক'রে সে ভাবল। মনে হ'ল, তার সে চিন্তার কূল নেই, কিনারা নেই, অতীত নেই, বর্ত্তমান নেই!—আজকের এই সামান্য ব্যর্থতায় মনে হ'ল তার জীবনের পরিপূর্ণ স্পষ্ট ছবিটি ফুটে উঠেছে! এ চিন্তায় রাতই হয় ত শেষ হ'য়ে যাবে।

আলোটা সরিয়ে এনে সারাদিনের পর ভাত বেড়ে সে যখন ইলিশ মাছ ও পুঁইশাকের তরকারী দিয়ে গ্রাসের পর গ্রাস মুখে তুলতে লাগল, তখন তার ছোট-ছোট তীক্ষ্ণ চোখদুটো দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল নেমে এসেছে!

বিনীতা কিন্তু এ চৌর্য্যবৃত্তিকে ক্ষমা করতে পারল না।—

পরদিন চন্দ্রময়ীর সম্বন্ধে একটি অস্ফুট গুঞ্জন অগ্নির মত ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করল। বেলা তখন অবেলা।

নিরুপমার স্বামী খগেন হঠাৎ এমন একটি মন্তব্য ক'রে বসল, ডাক্তার বাবু যার প্রতিবাদ না ক'রে পারলেন না। বিনীতা আগুন হ'য়ে উঠেছিল, নীচে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় ভদ্রভাষায় রীতিমত চন্দ্রময়ীকে সে অপমান করতে সুরু ক'রে দিল।

খগেন তার উত্তরে ঘৃণিতকণ্ঠে বলল—ঠিক বলেছেন······ভদ্রঘরের মেয়ে হোক, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, মাগীটা যে-কোনো অন্যায় অনায়াসে করতে পারে। ওকে দেখলে শুধু গা ঘিন্ ঘিন্ করে না, গা ছম্ ছম্ও করে। 'ফেরোসাস্ উয়োম্যান্'!

চন্দ্রময়ী নেমে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্তই সে নিঃশব্দে শুনেছে। নির্ব্বিচার অপমান তাকে এতটুকু আহত করে না!

নিরুপমার উদাসীন মুখখানির দিকে তাকিয়ে বিনীতা বলল—এতটুকু ওকে আমি বিশ্বাস করিনে, বুঝলেন বৌদি? কাশী হ'চ্ছে এইসব মেয়েমানুষদের উপযুক্ত জায়গা—মাকড়সার মত এরা এক জায়গায় জাল বেঁধে ব'সে থাকে। মেয়েমানুষ হ'য়ে মেয়েমানুষের কাছে নিজের কথা লুকিয়ে রাখবে—এত বড় ওর সাহস!

নীচে ভূপতি এবং তার বন্ধুরাও এবার সোরগোল ক'রে উঠল। খগেন উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। নীচে থেকে ভূপতি বলল—এই বাড়ীওলির কথা বলছেন ত? আমরাও বলব মনে করেছিলাম। মাগীটা ইতরের একশেষ! দিন নেই, রাত নেই, আমাদের আশে পাশে কি মতলবে যে ঘুরে বেড়ায়—ভাবতে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে আসে। বুড়ো মাগী, চুরি ক'রে খায়; তা ছাড়াও অনেক গুণ—বুঝলেন না?

খগেন বলল—'ফার্ষ্ট্ ক্লাস ককেট্'!—আমরা মেয়ে-ছেলে নিয়ে ঘর করি ভূপতি বাবু,—এ ছেড়ে দোবো।

বিনীতা বললে—বাবাকে দিয়ে আজ সকালেই আমি বাড়ী ঠিক করিয়েছি, কালই আমরা চ'লে যাব।

ভূপতি বলল—আমাদেরও কন্‌শেসন্ টিকিটের সময় হ'য়ে এসেছে, শীগ্‌গিরই কল্‌কাতায় রওনা হ'চ্ছি!

চন্দ্রময়ী একে একে সমস্তই শুনল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাবার সময় একটুখানি ম্লান হেসে ব'লে গেল—কি আর বলব মা, উঠে যাবে···তা যেও, ধ'রে ত আর রাখতে পারব না। তা ব'লে বাড়ীও কখনও খালি প'ড়ে থাকবে না···ছেলেপুলের মেয়ে-পুরুষে আবার ভর্ত্তি হ'য়ে যাবে! পরকে নিয়েই ত আমার ঘরকন্না!···কত মানুষ এখানে এল, কত মানুষই চ'লে গেল! বাড়ী আমার ধর্ম্মশালা।

অবসন্ন দিনের পাণ্ডুর আলোকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিরুপমার চোখে যেন জল চক্ চক্ ক'রে উঠেছে। নিরুপমা মানুষের হৃদয়ের বিচার করে।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

সঙ্গীত ও বিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায়

(প্রতিবাদ)

গত অগ্রহায়ণ মাসের বিচিত্রায় ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র "সঙ্গীত ও বিজ্ঞান" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমার বলবার আছে।

বাংলা দেশে আজকাল উচ্চশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত লোকে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা কর্চ্ছেন এটি খুবই সুখের বিষয়। ডাঃ মিত্রের মত বিদ্বান ও পণ্ডিত লোকে ইচ্ছে কর্লে সঙ্গীত শাস্ত্রের যথেষ্ট উপকার কর্ত্তে পারেন সন্দেহ নেই।

ডাঃ মিত্র তাঁর প্রবন্ধে Musical sound, Noise, Intensity, Timbu ইত্যাদি বিষয় অতি সুন্দর সহজ-সরল ভাবে বুঝিয়েছেন। কর্ণযন্ত্রের অনেক রহস্যই তাঁর প্রবন্ধ থেকে জানা যায় কিন্তু তিনি কণ্ঠযন্ত্রের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। তিনি লিখেছেন, "শব্দের প্রেরক আমার জিহ্বা" এবং জিহ্বা দ্বারা বায়ুতে কম্পন দ্বারা শব্দ পাঠান হয়। জিহ্বা অর্থে যদি তিনি কণ্ঠযন্ত্র বুঝিয়ে থাকেন তা হ'লে সেটি স্পষ্ট ক'রে লিখলে ভাল হোত, বিশেষতঃ যখন ডাঃ মিত্রের কথা অনেকের নজীর হিসেবে দেখবার সম্ভাবনা।

কিন্তু এসব সামান্য বিষয়ে কথার খুঁত ধরা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। প্রবন্ধের প্রথম প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'চ্ছে সঙ্গীত-পারিজাতের স্কেল বা ঠাট।

সঙ্গীত-পারিজাতের শ্লোক অনুসারে সা, মধ্যম, পঞ্চম, গান্ধার ও ধৈবতের স্থান সম্বন্ধে মতভেদ হবার কোনও কারণ নেই, এগুলির স্থান স্পষ্টই বোঝা যায়। ডাঃ মিত্র যে গান্ধার কোমল পেয়েছেন সেটি সঙ্গীত-পারিজাতের শুদ্ধ ঠাটের গান্ধার। আমাদের এখনকার শুদ্ধ ঠাট (যাকে বিলাবল ঠাট বলা হয়) বেশীদিন থেকে প্রচলিত নয়। এমন কি এখনও সমস্ত ভারতবর্ষে বিলাবল ঠাট শুদ্ধ ঠাট হিসাবে ব্যবহৃত হয় না; দৃষ্টান্ত, দক্ষিণ কর্ণাটকী সঙ্গীতে শুদ্ধ স্কেল "মুখারী" (আর এক নাম কনকাদী)। সেটি আমাদের ঠাটে ফেল্‌লে এই রকম হয় সা, রি (কোমল), রি (শুদ্ধ), ম, প, ধ (কোমল), ধ (শুদ্ধ), র্সা। কিন্তু এগুলিকে দক্ষিণে 'স রি গ ম প ধ নি' ও বলা হয় অর্থাৎ শুদ্ধ রি-কে গ, ও শুদ্ধ ধ-কে নি বলা হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে পারিজাতের স্কেলে গ (কোমল) শুদ্ধ স্বর হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া কোনও মারাত্মক ভুল নয়। তখন কোমল গান্ধার (এখনকার) শুদ্ধ ঠাটে শুদ্ধ স্বর হিসেবে ব্যবহৃত হোত।

ডাঃ মিত্রের সঙ্গে মতভেদ হ'চ্ছে "নি" সম্বন্ধে। তিনি যে নি পেয়েছেন তা আমাদের বর্ত্তমান তীব্র নিখাদ থেকে একটু চড়া। তাঁর গণনার পদ্ধতি দেওয়া না থাকলেও চিত্রে উক্ত ভগ্নাংশ দেখে বোঝা যায় যে তিনি ধ থেকে র্সা দৈর্ঘ্যকে তিন ভাগে ভাগ ক'রে তার থেকে দুই অংশ বাদ দিয়ে নি বসিয়েছেন। কিন্তু পারিজাতের শ্লোকে বলা হয়েছে যে—

স-পয়োর্ম্মধ্যদেশেতু ধৈবতঃ স্বরমাচরেৎ
তত্রাংশদ্বয় সংত্যাগান্নিষাদস্য স্থিতির্ভবেৎ ॥

এইশ্লোকে ধ থেকে র্সা দৈর্ঘ্যের কোনও উল্লেখ নেই— কিন্তু প থেকে র্সা দৈর্ঘ্যের উল্লেখ আছে এবং "তত্র" অর্থে "সেখানে", "সেখান থেকে" নয়। অতএব প থেকে র্সা এই অংশকে তিন ভাগ ক'রে তার থেকে দুই অংশ বাদ দিয়ে "নি"র স্থান নির্ণয় করাই সঙ্গত মনে হয়। এই ভাবে "নি"র স্থান নির্ণয় কর্লে বর্ত্তমান কোমল নি পাওয়া যায়— কম্পন-সংখ্যা ৪৩২। অপরপক্ষে ধৈবতের দুই অংশ ত্যাগ করার কোনও অর্থ হয় না।

অনেকের মনে সঙ্গীত-পারিজাতের "নি" সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হ'তে পারে। ডাঃ মিত্র যে স্কেল পেয়েছেন সেটি

এইরূপ স রি গ্ ম প ধ নি (নীচে দাগ দেওয়া স্বর কোমল)। সঙ্গীত-পারিজাত একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং এর থেকে প্রমাণ হিসেবে অনেকে নজীরও দিয়ে থাকেন। সুতরাং অনুমান করা যায় যে পারিজাতের স্কেল অন্ততঃ-পক্ষে সামান্য মাত্রাতেও প্রচলিত ছিল। স্কেল প্রচলিত থাকলে সেই স্কেলে রাগের প্রচলন থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা সঙ্গীত-চর্চা ক'রে থাকেন তাঁরা জানেন যে স রি গ ম প ধ নি এই ঠাটে কোনও প্রচলিত রাগ নেই। কোমল নি দিলে (কারণ শ্লোক অনুসারে কোমল নি পাওয়াই সঙ্গত) বর্ত্তমান কাফী ঠাট পাওয়া যায়। এই ঠাটে প্রচলিত রাগ যথেষ্টই আছে সুতরাং এই স্কেলএর অস্তিত্বও নতুন নয়।

"রি" সম্বন্ধেও সংশয় আছে। শ্লোকে লেখা আছে, "স-পেয়াঃ পূর্ব্বভাগে স্থাপনীয়োঃ হয় রি-স্বর।" ইতিপূর্ব্বে সা-প-কে সা-প ও গ-প এই দুই ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। সুতরাং শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে "রি" সগ এই অংশে থাকবে। এই অংশের কোথায় রি-স্বর থাকবে বা অত্যন্ত অস্পষ্ট। ডাঃ মিত্র সা-গ দৈর্ঘ্যকে তিন ভাগ ক'রে তার প্রথম ভাগে রি বসিয়েছেন। এইরকম ক'রে রি-২৭০ পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সা-গ অংশকে তিন ভাগ করার উল্লেখ নেই। রি-কে স-গ এর ঠিক মধ্যে যদি রাখা যায় তা হ'লেও অসঙ্গত হয় না। এই উপায়ে রি-২৬২ পাওয়া যায়। এই "রি"র এখন প্রচলন একথা ঠিক কিন্তু কর্ণাটকী সঙ্গীতে ত্রি-শ্রুতি "রি"-র প্রচলন ছিল। এবং সা-রি (২৪০—২৭০) কে চার শ্রুতিতে ভাগ কর্লে ত্রি শ্রুতি "রি"র স্থান ২৬২-র কাছাকাছি হয়। কিন্তু রি ২৭০ পেলেও আপত্তির কোনও কারণ নেই। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে শ্লোক অনুসারে তারকে ভাগ কর্লে পারিজাতের স্কেলকে বর্ত্তমান কাফী স্কেল বল্লে ভুল বলা হয় না।

এই স্কেল-এ যে ধৈবত পাওয়া যায় তা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ব্যবহৃত ধৈবতের থেকে খুব পৃথক নয়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ব্যবহৃত ধ সাধারণতঃ চড়া, বিশেষ বাগেশ্রী প্রভৃতি কাফী-ঠাটের কয়েকটি রাগে। পশ্চিমের কোনও ভাল গায়কের গান শুনলেই এটা বোঝা যায়।

বাদী-সম্বাদী সম্বন্ধে ডাঃ মিত্র যে কথা বলেছেন তা খুব অসঙ্গত মনে হয় না। আমাদের রাগের জন্য যে স্কেলগুলি নির্ব্বাচিত হ'য়েছে—তাদের স্বরগুলির পরস্পরের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহজ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু ডাঃ মিত্র যে উদাহরণগুলি দিয়েছেন তার সবগুলিই বাদী-সম্বাদী শুদ্ধ ঠাটের স্বরের মধ্যে পড়ে। তিনি বিকৃত স্বর যে ক্ষেত্রে বাদী সে ক্ষেত্রে অনুপাত কি রকম হয় তা বলেন নি। এ সরল অনুপাতের ব্যতিক্রম হয় বিকৃত স্বর-বিশিষ্ট রাগের ক্ষেত্রে।

মারবা রাগে বাদী কোমল রি সংবাদী শুদ্ধ ধ
কালিংড়া " " ধ (কোমল) " শুদ্ধ গ

শ্রীরাগের উদাহরণ এর সঙ্গে দেওয়া যেত কারণ এ অঞ্চলে শ্রীরাগে কোমল রি বাদী ও পঞ্চম সংবাদী। কিন্তু ডাঃ মিত্র শ্রীরাগের বাদী গ ও সংবাদী পঞ্চম বলেছেন। শ্রীরাগে আরোহণে গান্ধার বর্জ্জিত সুতরাং গ বাদী হওয়া সঙ্গত নয়। আমার বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে আরোহণে কিম্বা অবরোহণে বর্জ্জিত স্বর বাদী হ'তেই পারে না ; বলার উদ্দেশ্য এই যে এরূপ স্বরকে বাদী ক'রে দেখান কঠিন ও এই স্বরের প্রয়োগ দুর্ব্বল হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বাদী-সংবাদী সম্বন্ধে মতভেদ আছে এবং তার পরিবর্ত্তন করা না করা সুগায়কের ইচ্ছা ও কুশলতার ওপর নির্ভর করে।

প্রবন্ধের আর একজায়গায় দেখলাম যে সম্পূর্ণ রাগের বিবাদী স্বর নেই। যে কোনও ঠাটের ৭টি স্বর আরোহণে ও অবরোহণে লাগলে রাগকে "সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ" বলা হয়। এই ৭টি স্বর ছাড়া আরও পাঁচটি স্বর আছে যা রাগে লাগানো যায় এবং এ রকম যে-কোনও স্বরকে বিবাদী স্বর বলা যায়। এ-রকম অনেক সম্পূর্ণ রাগ আছে যাতে ৭টির বেশী স্বর লাগে। এই বেশী স্বরগুলি অর্থাৎ যেগুলি ঠাটের বাইরে সেগুলিকে বিবাদী স্বর বলা হয়। ইমন, কাফী, খাম্বাজ, পূর্ব্বী, বসন্ত ইত্যাদি রাগে ৭টির বেশী স্বর লাগে—এ-রকম রাগ অনেক আছে।

তারপরে ডাঃ মিত্র লিখেছেন গানের অন্তরা রাগের বাদী কিম্বা সম্বাদী থেকে আরম্ভ হয় একথা ভিত্তিহীন।

তিনি যে উদাহরণগুলি দিয়েছেন তাতে অনেক ক্ষেত্রে বাদী-সম্বাদীর মধ্যে ম কিম্বা প পড়ে। সাধারণভাবে এই কথা বলা যায় যে যেসব রাগের আরোহণে ম (শুদ্ধ) বা ৭ লাগে তার অন্তরা সাধারণতঃ ম কিম্বা ৭ থেকে আরম্ভ হয়। অন্তরার উদ্দেশ্য এই যে মধ্য-সপ্তকের উত্তর ভাগে (ম - র্স কিম্বা ৭ - র্সা একে উত্তর ভাগ বলা হয়) ও তার সপ্তকে রাগের রূপ দেখান। এই সব রাগে ম কিম্বা প থেকে অন্তরার আরম্ভ হয় এই জন্যে যে ম ও ৭ কতকটা উত্তর ভাগের Tunic হিসাবে ব্যবহার হয়। এমন অনেক রাগ আছে যার বাদী-সংবাদীর কোনটিই প নয় অথচ অন্তরার আরম্ভ প থেকে। নীচে কতকগুলি প্রসিদ্ধ রাগের উদাহরণ দেওয়া গেল যার বাদী-সম্বাদীর সঙ্গে অন্তরার আরম্ভ মেলে না।

রাগ	বাদী	ও সংবাদী	- অন্তরার প্রথম স্বর
বিলাবল	ধ	গ	প
দেশাকার	ধ	গ	প
খমাজ	গ	নি (কোমল)	ম, প, ধ, নি (শুদ্ধ)
ভীমপলাশী	ম	সা	প (কখনও নি)
জৌনপুরী	ধ	গ	প
তোড়ী	ধ	গ	ম, ও প
ভৈরব	ধ	রি	প কখনও গ
মারবা	রি	ধ	গ, ম
পূর্বী	গ	নি	ম

এই উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যায় না যে বাদী-সংবাদীর সঙ্গে অন্তরার আরম্ভের কোনও নির্ভুল সম্বন্ধ আছে। ডাঃ মিত্র বাগেশ্রীর উদাহরণ দিয়েছেন। বাগেশ্রীর অন্তরা অনেক সময় কোমল গ থেকে আরম্ভ হয়, এমন কি বেশীর ভাগ সময়েই হয়।

আগেকার দিনে গ্রহ, ন্যাস ইত্যাদির জন্য বিশেষ বিশেষ স্বর ছিল। আজকাল তার কোনও অস্তিত্বও বড় নেই; রাগের প্রত্যেক গানের অন্তরা যদি একই স্বর থেকে আরম্ভ হোত তা হ'লে গানের বৈচিত্র্য বড়ই ক'মে যেত। ভাগ্যক্রমে ভাগ-চাগের গানে এর অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই সব ব্যতিক্রমের জন্য খেয়ালীদের খেয়ালই দায়ী।

ডাঃ মিত্রের প্রবন্ধের যে কয়েকটি কথা আমার যুক্তিযুক্ত মনে হয় নি সেগুলির প্রতিবাদ এই প্রবন্ধে করলাম। তাঁর প্রবন্ধে জানবার বিষয় অনেক আছে; তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সঙ্গীতকে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতেও দেখা দরকার, তাই আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এদিকে মন দিলে সঙ্গীতশাস্ত্রের যথেষ্ট উপকার হবে। সঙ্গীত সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা হওয়া শক্ত, তবে যতটুকু সম্ভব ততটুকুও হয় না। অতীত গৌরব ও লুপ্ত তথ্যের উদ্ধার-চেষ্টায় আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় আলোচনা এত ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে যে নতুন নিয়ম ও শৃঙ্খলার পথে সঙ্গীতকে নিয়ে যাবার উদ্যমের আমাদের একান্ত অভাব ঘটে। সেইজন্যে এই অনুশীলনে শিল্পীর মন ও বৈজ্ঞানিকের যুক্তির একত্র প্রয়োগ প্রয়োজন।

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

বস্তিজীবন

শ্রীযুক্ত সুবোধ দাশগুপ্ত

[একটি অপরিসর ঘর ; ওপরের ছাউনি খড় বা খোলার ঘরের ভেতর থেকে তা বুঝবার উপায় নাই। ঘরের দেওয়াল-গুলোর চুণকাম স্থানে স্থানে খ'সে পড়েছে। আসবাবপত্রও ঘরে বিশেষ কিছু নেই—কয়েকখানা ভাঙ্গা চেয়ার এদিক-সেদিক প'ড়ে আছে। ঘরের এক কোণে একটা ছেঁড়া মাদুর অর্দ্ধেক বিছানো রয়েছে, তারই একদিকে একটি ভাঙ্গা ট্রাঙ্ক—তালাচাবির বালাই নেই। দরজাটির ঠিক উল্টো দিকে একটি ছোট জানলা—সেই জানলা দিয়ে রাস্তার মিউনিসিপ্যালিটির আলো এসে ঘরে পড়ছে। ঘরে আর কোন আলো নেই। ঘরটিতে পরিচ্ছন্নতার একটি আভাস পাওয়া গেলেও দারিদ্র্যের চিহ্ন আরো স্পষ্ট।

জানলা থেকে কিছুদূরে ঘরের আর এক কোণে একটা ভাঙ্গা চৌকি। একটা ছেঁড়া তোষকের ওপর একটি ছোট মেয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে—আধময়লা একখানা কাঁথা দিয়ে তার পা থেকে গলা অবধি ঢাকা, শুধু মাথা আর একরাশ কোঁকড়ানো চুল দেখা যাচ্ছে। তারই পাশে ব'সে আছে তার মা—কুমুদিনী। তার বয়স খুব বেশী না হ'লেও মুখে গাম্ভীর্য্যের ছায়া এসে পড়েছে—বর্ণও মলিন ফ্যাকাসে হ'য়ে উঠেছে ; তবু সে যে একসময়ে বেশ সুন্দরী ছিল তা অনুমান করা যায়।

দরজাটা ঠেলে নিতাই এসে ঘরে ঢুকল। লম্বা ছিপছিপে চেহারা—দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের লোক ব'লে মনে হয়। পোষাকপরিচ্ছদও তদনুরূপ। পায়ে জুতা নেই। খাকি রঙের সার্টটার কনুইয়ের কাছে বিশ্রীভাবে অনেকখানি ছেঁড়া। গলার কাছে দুটো বোতাম নেই—তা ছাড়া স্থানে-স্থানে কালি প'ড়ে এবং সার্টটি ময়লা হ'য়ে আরো বিশ্রী দেখাচ্ছে। তবু লোকটির দিকে চেয়ে মনে হয় উপযুক্ত আহার এবং পোষাক পেলে সে বেশ সুশ্রী যুবক ব'লেই জন-সাধারণের কাছে পরিচিত হ'তে পারে।

খুকী ঠিক ঘুমুচ্ছে কি না একবার ভাল ক'রে দেখে কুমুদিনী উঠে স্বামীর দিকে দু' পা এগিয়ে গেল।]

কুমুদিনী। আজকেও কিছু হ'ল না ?

নিতাই। না কিছু না—একটা পয়সা পর্য্যন্ত না।

(মুখ ঘুরিয়ে ক্লান্ত অবশ দেহটাকে একটু সতেজ ক'রে নেবার চেষ্টা করল)

নিতাই। কিছুই হ'ল না। কালকেও কিছু হয় নি। আজ তার চাইতেও খারাপ—কাল তবু দুটো পয়সা আনতে পেরেছিলাম।

কুমুদিনী। একটি মহিলা খুকীকে আজ কিছু খেতে দিয়েছিলেন—

নিতাই। আর তোমায় ?

কুমুদিনী। খুকী রুটির খানিকটা আমার জন্য রেখে দিয়েছিল।

নিতাই। তোমাকে কিছু দেয় নি তা হ'লে ?

কুমুদিনী। হাঁ দিয়েছেন, কিছু বক্তৃতা—এই কন-কনে ঠাণ্ডার দিনে খুকীকে নিয়ে বের হবার জন্য।

নিতাই। (একটা ভাঙ্গা চেয়ারের ওপর ব'সে) সব-সময়েই এইরকম বক্তৃতাগুলো মানুষের জিবে আজকাল আসা হ'য়ে থাকে। আমরাও ওরকম দু' চারটে বক্তৃতা দিতে পারি—কিন্তু শুধু বক্তৃতায় পেট ভরে না।

কুমুদিনী। (নিতাইয়ের গায়ে হাত দিয়ে) তোমার কাপড়-জামা যে একেবারে ভিজে গেছে !

নিতাই। হাঁ, বৃষ্টি পড়ছিল, কি করি—আমার ভাগ্যই খারাপ বুঝলে ? কোনরকমে একটা আগুন জ্বালতে পার না—বড় ঠাণ্ডা লাগছে !

কুমুদিনী। কিন্তু আগুন জ্বালবো কি দিয়ে ?

নিতাই। (খানিকক্ষণ চারদিকে চেয়ে দেখল, তারপর হঠাৎ ভাঙ্গা চেয়ারগুলির একটাকে ধ'রে প্রচণ্ড এক আছাড়

দিল) এই, এই দিয়ে। কি চমৎকার চেয়ারগুলিই ওরা দিয়েছিল। শালারা—easy instalment system—কি চমৎকার—প্রতি মাসে অল্প অল্প ক'রে দিলেই চলে—কিন্তু চারগুণ দাম আদায় ক'রে নিয়েছে।

(চেয়ারটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে ফেল্‌ল)

নিতাই। পুরোনো কাগজ কিছু দিতে পার ?

কুমুদিনী। (ভাঙা ট্রাঙ্কটা থেকে কয়েকখানা পুরোনো খবরের কাগজ বের ক'রে) এই নাও।

নিতাই। এতেই চলবে। (কাটগুলো সাজাতে সাজাতে) সব শালারাই উপদেশ দিতে পারে। দিক না একটা চাকরী—কেরাণীগিরি—তা হ'লে কি আর পথে পথে ফ্যা ফ্যা ক'রে বেড়াই। ভারতবর্ষ আবার স্বাধীন হবে! কত মিটিং হ'চ্ছে কংগ্রেস হ'চ্ছে,—দিক না কংগ্রেসেরই একটা কাজ, আজীবন দেশের সেবাই করব—দেশটা আমারো কিছু নয় ? নাও, একটা দেশলাই দাও দিকি।

কুমুদিনী। এই নাও, (দেশলাইটা দিয়ে) মাত্র দুটো কাঠি আছে।

নিতাই। যাক্, ওতেই হয়ে যাবে; একটা বিড়িও ধরিয়ে নেবো। কোনো ব্যাটা ভদ্রলোক একটা পয়সা দিয়েও মুখ তুলে চাইলে না। অথচ ওপাড়ার বিড়িওয়ালা আমাকে গোটা-দুই বিড়ি দিয়ে দিল। একবারের বেশী বলতে হ'ল না। কি চমৎকার লোক বল ত—ভদ্রলোকদের চাইতে ঢের ভালো! (পকেট থেকে একটা বিড়ি বের ক'রে সাবধানে ধরিয়ে সেই জলন্ত কাঠিটা দিয়েই কাগজগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিল—তারপর কাঠের গাদার ভেতর কাগজগুলো গুঁজে দিল। দেখতে দেখতে বেশ আগুন জলে উঠল।) যাক—শরীরটা তবু গরম হবে। একে শীতকাল, তার ওপর আবার বৃষ্টি—হাড়ের ভেতর শুদ্ধ কাঁপুনি ধ'রে গেছে! নাও, এই আগুনের দিকে স'রে বোস।

কুমুদিনী। কি আর করবে বল', চেষ্টার তো কোন ত্রুটি হ'চ্ছে না।

নিতাই। চেষ্টার ত্রুটি হবে কেন—আমি তো এখনো ম'রে যাই নি। সারাটা দিনই তো পথে পথে ঘুরলাম—কত লোকের কাছেই না হাত পাতলাম। কিন্তু কেউ কোন কথায় কান দিল না। রাস্তায় একটুকরো রুটি কুড়িয়ে পাওয়া গেল—তা'ই সই। কলেও জলের অভাব নেই! তারপর দর্জ্জিপাড়ার এক বিয়েবাড়ীর লুচির গন্ধ খেয়েই রাতের খাওয়া শেষ হ'ল। ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনম্—চমৎকার জীবনযাত্রা!

কুমুদিনী। দেবতা আমাদের ওপর বিরূপ······

নিতাই। একশো বার। ভগবান শয়তানের চেয়েও খারাপ। আজ পর্য্যন্ত কেউ বলতে পারবে না যে আমি কোনদিন কোন অন্যায় কাজ করেছি। আমাদের অফিস দেউলে হ'য়ে গেল সেটা আমার দোষ নয়—আর আমি আজ পর্য্যন্ত যে কাজ পাচ্ছি না সেটাও আমার দোষ নয়। আমি নিজেও একদিন ভদ্রলোকই ছিলাম—মানসম্ভ্রম সবই ছিল, তবু······

কুমুদিনী। তারপর আমার অসুখ করল—তাতেই তো তোমার সমস্ত পুঁজি শেষ হ'য়ে গেল। আমার মৃত্যু হ'ল না কেন! তা হ'লে······

নিতাই। বাজে যা-তা বল'! যেন তোমার মৃত্যুই আমি কামনা করছি—আর ওরকম কথা বোলো না। ভাল কথা,—বাড়ীওয়ালা কি ভাড়ার জন্য খুব তাগাদা করছে ?

কুমুদিনী। আজকেও ছেলেটাকে পাঠিয়েছিল। ওদেরই বা আর দোষ কি—চার-পাঁচ মাসের ভাড়া তো পাওনা হ'ল—তবু কোনদিন উঠে যেতে বলে নি, এমন কি একটা কড়া কথা পর্য্যন্ত শোনায় নি। ওদের মেয়েরা না কি মোজা সেলাই করছে, তাতে বেশ চার-পাঁচ আনা দিন রোজগার করা যায়; তাই ভাবছি ওদের দিয়ে যদি মোজার ফ্যাক্টরীতে খবর দেওয়াতে পারি।

নিতাই। চার-পাঁচ আনা দিন ? বল কি ? এ যে স্বরাজ পাওয়ার চাইতেও বেশী হ'য়ে গেল! তা হ'লে আমিও ওই কাজে লেগে যাব। আজ সকাল বেলা আবার করপোরেশনের অফিসে গিয়েছিলাম। শুনলাম, আমি আসবার আগেই না কি তিরিশজনের নাম লেখা হ'য়ে গেছে। কুলীগিরি করব ভেবেছিলাম—কিন্তু তারও শক্তি নেই—ওই কাসিটা বড় বিশ্রী হ'য়ে উঠেছে, বুকের ভেতরটা

পর্যন্ত টন্ টন্ ক'রে ওঠে। ওঃ, চার-পাঁচ আনা দিন হ'লে দু'জনে মিলে দিন দশআনা রোজগার করতে পারবো —তাকে রীতিমত রোজগার বলা যেতে পারে!

কুমুদিনী। তা কতকটা ঠিক—তবে সূঁচ-সুতো এসব আমাদেরই খরচ করতে হবে—তা ছাড়া শিখতেও কয়েক দিন লেগে যাবে—তারপর অবশ্য কিছু রোজগার হবে।

নিতাই। হুঁ, তা বটে। (হঠাৎ সোজা দাঁড়িয়ে) বাঙালী-ঘরে ভদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রে আজ আমার এই দশা! ইংরেজী লেখাপড়া জানি, সর্টহ্যাণ্ড, বুককিপিংএর ভাল সার্টিফিকেট আছে, টাইপ করতেও যে জানি না তা নয়—তবু আজ আমাকে বেকার হ'য়ে উপোষ দিয়ে দিন কাটাতে হ'চ্ছে। হিন্দুরা না কি আবার সভ্য—

কুমুদিনী। ওগো চুপ কর!

নিতাই। কেন কি হয়েছে?

কুমুদিনী। না, কিছু না। আমরা তো আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—কি বল'?

নিতাই। তা করিনি? পৃথিবীতে কি এমন কোন কাজ আছে যা আমরা করবো না বলেছি—মুচি, মেথর, ঝাড়ুদার সকলের কাজই চেষ্টা করেছি।

কুমুদিনী। (হঠাৎ বিচলিত হ'য়ে নিজের কাপড়ের ভেতর থেকে কি একটা জিনিষ মুঠো ক'রে বের ক'রে নিতাই এর পিঠে হাত রাখল) ওগো……

নিতাই। হ্যাঁ—কি? তোমার হাতে ও জিনিষটা কি? (কুমুদিনী মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল)—কি, কথা বলছো না কেন?

কুমুদিনী। (সহসা হাতের মুঠো খুলে ব'লে উঠল) এই, এই দেখ! (সে কাঁপতে কাঁপতে মাদুরের ওপর গিয়ে ব'সে পড়ল।)

নিতাই। এ্যাঁ, মনিব্যাগ!

কুমুদিনী। (ঘাড় নেড়ে) হ্যাঁ।

নিতাই। তুমি—

কুমুদিনী। পেয়েছি।

নিতাই। পেয়েছ?

কুমুদিনী। হ্যাঁ, পেয়েছি-ই বলতে হবে।

নিতাই। কেমন ক'রে পেলে? কোথায় পেলে?

কুমুদিনী। বলছি। তখন বৃষ্টি পড়ছিল—আমি ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। বইএর দোকানটার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুকীকে ছবি দেখাচ্ছিলাম। সেইখানেই একটি ফিটফিটে বাবু একটা মাসিকপত্রিকা অনেকক্ষণ উল্টে-পাল্টে দেখে পকেট থেকে মনিব্যাগ বের ক'রে তার দাম দিয়ে দিল। তারপর আরো দু' চারখানা বই উল্টে-পাল্টে দেখে চ'লে গেল। ব্যাগটা ভুলে ফেলে গেল। আমি সেটা হাতে নিয়ে তার পিছন পিছন গিয়ে দিয়ে দেব ঠিক করলাম, কিন্তু লোকের ভিড়ের ভেতর সে যে কোথায় চ'লে গেল টেরই পেলাম না। আমি অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম—কিন্তু……

নিতাই। —আর ব্যাগটা তোমার হাতেই রইল?

কুমুদিনী। হ্যাঁ; তারপর বাড়ী চ'লে এলাম।

নিতাই। কেউ তোমার পিছু নিল না?

কুমুদিনী। না।

নিতাই। কিন্তু কেন এমন কাজ করলে? বইএর দোকানদারকেও তো দিয়ে দিতে পারতে।

কুমুদিনী। পারতাম। কিন্তু আমি জানি না-কেন দিতে পারলাম না……

নিতাই। কত আছে ওর ভেতর?

কুমুদিনী। জানি না—আমি খুলে দেখিনি।

নিতাই। দেখনি?

কুমুদিনী। না—আমার ভয় হ'চ্ছিল।

নিতাই। (দুঃখিত অন্তঃকরণে) আমি ভাবিনি কুমু, যে শেষ পর্যন্ত আমাদের এই পরিণতি হবে!

কুমুদিনী। (উত্তেজিত হ'য়ে) কিন্তু আমাদের কিছু করতে হবে তো! অফিসে অফিসে উমেদারী ক'রে বেড়ালে আর যেখানে সেখানে বক্তৃতা শুনলে পেট ভরে না। এ-রকম ভাবেই বা আর কতদিন কাটানো যায়? ওই ব্যাগটার ভেতর টাকাকড়ি কিছু থাকলে তা দিয়ে এখন তুমি ভাল জামা-কাপড় কিনে নিতে পারবে—কয়েক-দিনের খোরাকও স্বচ্ছন্দে চ'লে যাবে। আর ভালো জামা-কাপড় পরা দেখলে ভদ্রলোকেরাও তোমাকে চাকরী দিতে

আর ইতস্ততঃ করবে না। যার এ ব্যাগটা হারিয়েছে সে মস্ত বড়লোকের ছেলে—তার জামা-কাপড় দেখে তা-ই মনে হ'ল—সে হয় ত খোঁজই করবে না। তা ছাড়া খোঁজ করলেই বা—। একটা টাকা থেকে আর একটা টাকা চিনে নিতে কেউ পারে না। ব্যাগটাও বেশ ভারী······

নিতাই। (ব্যাগটা হাতে নিয়ে তার ওজন বুঝবার চেষ্টা ক'রে) হাঁা, বেশ ভারী ব'লেই মনে হচ্ছে।

কুমুদিনী। খুলেই দেখ না তা হ'লে।

নিতাই। তুমি খোলনি?

কুমুদিনী। না, পারিনি, ভয় করছিল। তা ছাড়া ভাবছিলাম হয় ত···

নিতাই। কি ভাবছিলে? হয় ত কি?···

কুমুদিনী। হয় ত তুমি একটা চাকরী পেয়ে যাবে··· না হয় এমনও হ'তে পারে যে কোন দয়ালু ব্যক্তি তোমার দুর্দ্দশা দেখে তোমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারে··· তা হ'লে আর আমাদের এটা নেবার কোনই দরকার থাকবে না।

নিতাই। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ।

কুমুদিনী। তা ছাড়া চিরটাকাল আমরাও এ-রকম ভাবে কাটাতে পারি না। তুমিই ভেবে দেখ! তোমার যদি জামা-কাপড়টা অন্ততঃ ভদ্রলোকের মত হ'ত তা হ'লে তুমি একটা চাকরী পেলেও পেতে পারতে। তা ছাড়া তোমার ভাল ওষুধ খাওয়া দরকার। কাল সারারাত কেসেছ, আজও ফের ঘুমুতে পারবে না।···তোমার কাপড়-জামা বিশ্রী নোংরা, তাই তো ওরা চাকরী দিতে চায় না তোমাকে।

নিতাই। ওরা আমাকে দেখে হাসে, ঠাট্টা করে।

কুমুদিনী। আর রোজ রাস্তায় ভিক্ষা করতে বের হ'তে আমারই কি লজ্জা করে না!

নিতাই। তা ছাড়া খুকী রয়েছে···আমি তো সবই বুঝতে পারছি। খুকী ঘুমুচ্ছে?

কুমুদিনী। হ্যাঁ—ওকে আবার জাগিয়ে তুলো না যেন।

নিতাই। কি হবে আর রাতে—দিব্বি আগুন জলছে

কুমুদিনী। জাগলেই ও খেতে চাইবে।

নিতাই। ওকে না কে খেতে দিয়েছিল?

কুমুদিনী। সে তো তিনটের সময়; কখন সেসব হজম ক'রে ফেলেছে! ওকে এখন বার বার খাওয়ানো দরকার, কিন্তু রাতের পর রাত ওকে অনাহারে কাটাতে হ'চ্ছে। এই সব কারণেই ব্যাগটা নিয়েছিলাম।

নিতাই। (ব্যাগটাকে তখনো সেই ভাবেই ধ'রে) হাঁা, নেবোই বা না কেন?

কুমুদিনী। তা হ'লে খুকীর জন্য কিছু গরম জামা-কাপড়, দুধ এসব কেনা যেতে পারে।

নিতাই। (আপন মনে) চোরের মেয়ে তস্করদুহিতা। (দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেললে)

কুমুদিনী। ওগো শুনছো, ওগো!···

নিতাই। শুনেই বা কি করব। উপায়ই বা কি! আমাদের জন্য কেউ ভাববে না, চিন্তাও করবে না।···কে কার খবর রাখে! দেখাই যাক কি আছে এর ভেতর?

কুমুদিনী। (ব্যগ্র হ'য়ে) হাঁা, হাঁা, তাই দেখ।

নিতাই। (হঠাৎ রাস্তার দিকের জানলাটার দিকে চেয়ে) পুলিশটা যাচ্ছে।

কুমুদিনী। তাতে আর কি হয়েছে, ও তো রোজই যায়।

নিতাই। কিন্তু জীবনে এই প্রথম দিন যে পুলিশের নাম করতেই আমি ভয় পেলাম।

(নিতাই ব্যাগটা খুলতে খুলতে হঠাৎ থেমে গেল। তারপর হঠাৎ একলাফে দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল। কুমুদিনী আকুল উচ্ছ্বাসে মাদুরটার ওপর ব'সে পড়ল।)

কুমুদিনী। ওগো শোনো···ওগো···

(কিছুক্ষণ পরে নিতাই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল)

কুমুদিনী। কেন এমন করলে?

নিতাই। জানি না, পারছিলাম না থাকতে।

কুমুদিনী। তুমি পুলিশটাকে দিয়ে এলে?

নিতাই। হ্যাঁ।

কুমুদিনী। কি বল্লে?

নিতাই। বল্লাম আমার স্ত্রী এটা কুড়িয়ে পেয়েছে।

কুমুদিনী। ও হয় ত নিজেই ওটা আত্মসাৎ করবে।

নিতাই। বোধ হয়।

কুমুদিনী। উঃ, কি নিষ্ঠুর তুমি! কি পাষণ্ড! আমি বলি ভণ্ডামী—ভণ্ডামী, ভাল হওয়াটা একটা মস্ত ভণ্ডামী! পৃথিবীর লোক আমাদের এমন কি করেছে যে আমরা ভাল হ'তে যাব!

নিতাই। (মাথা নীচু ক'রে) কিন্তু ওকে লোকে বলবে চোরের মেয়ে—তাই বা সহ্য করব কেমন ক'রে।

কুমুদিনী। না—না—তুমি বোঝ না, অনাহারে মৃত্যুই বুঝি ভাল তা হ'লে?

নিতাই। (কোনো জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বললে) তুমি আমাকে ক্ষমা কর ব্যাগটা ফিরিয়ে দেবার জন্য।

কুমুদিনী (কোমল হ'য়ে) না,না, তুমি ঠিকই করেছো। চুরি করা সত্যি আমাদের অন্যায় হ'য়েছে।

নিতাই। (উত্তেজিত হ'য়ে) কিছু অন্যায় হয় নি,—আমি বলছি কিছু অন্যায় হয় নি। একশো বার চুরি করব। ওর কতগুলো টাকা মুঠোর ভেতর পেয়েছিলাম—আমি কাপুরুষ, আমি নিষ্ঠুর! সাধু হবার আমার কি অধিকার আছে? স্ত্রী অনাহারে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, তিন বছরের মেয়েটা অনাহারে দিন কাটাবে, আর আমি সাধু হ'য়ে হাতের টাকা ছেড়ে দোব? আমি কাপুরুষ কুমু, আমি কাপুরুষ!

কুমুদিনী। ঠাণ্ডা হও। তুমি ঠিকই করেছো—দেখো, গোলমাল ক'রে খুকীকে জাগিয়ে তুলো না।

নিতাই। (কর্ণপাত না ক'রে) এই তোমায় ব'লে রাখছি কুমু—কালই আমি চুরি করতে বের হব—চুরি করবই—ভাল হবার আমার কোনই অধিকার নেই।

কুমুদিনী। তুমি বড় অধীর হ'য়ে উঠছো। দিন-দুই সবুর ক'রেই দেখ না—হয় ত কিছু সুফল ফলবে। তুমি পুলিশটাকে আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দিয়েছো তো—হয় ত...

নিতাই। আর সুফল ফলবে—সারারাত কেসে কেসে যেদিন পঞ্চত্ব পাব সেইদিনই সুফল ফলবে—তার আগে নয়।

কুমুদিনী। সে-ই ভাল।

নিতাই। কি ভাল? মৃত্যু?

কুমুদিনী। পৃথিবীতে থাকবার আমাদের কি দরকার?

নিতাই। (সভয়ে) না-না—এতদিন কাটাতে পারলাম, আরো দুটো দিন কি পারবো না!

কুমুদিনী। দুটো দিনই বা কাটবে কেমন ক'রে? লাভই বা কি!

নিতাই। আমি আজ পর্য্যন্ত কোন অন্যায় কাজ করিনি—কোনদিন মদ খাইনি, জুয়া খেলিনি। আমার স্ত্রী আছে, একটি কন্যা আছে, পৃথিবীর আরসকল লোকের মত আমিও একজন মানুষ—আমি শুধু বাঁচতে চাই!

কুমুদিনী। আর নয়—বাঁচবার পালা আমাদের শেষ হ'য়ে এসেছে। আর এভাবে জীবন কাটানো যায় না।

(হঠাৎ খুকি কেঁদে উঠল। নিতাই চৌকিটার দিকে এগিয়ে গেল। কুমুদিনী তার পাশে ব'সে মাথায় থাবড়া মারতে মারতে বললে)

কুমুদিনী। ঘুমিয়ে পড় লক্ষী মেয়ে,—এখনো সকাল হয়নি, এখনো খাবার সময় হয়নি। তুমি আজ অনেক খাবার খেয়েছ, তোমার খিদে এখন পায়নি,—লক্ষী মেয়ে, চুপটি ক'রে ঘুমিয়ে পড়।

(খুকী আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল)

নিতাই। ভগবান, ভগবান—আমাদের খেতে দাও! আমাদের বেঁচে থাকতে দাও! আমাদের ভালো হ'তে দাও!*

যবনিকা

শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত

* মার্কিন লেখক Alfred Sutro লিখিত The Man in the Kerb অবলম্বনে।

সনাতন বাবু

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন বি-এ

তিন বছর পরে গ্রে ষ্ট্রীটে তাঁর সঙ্গে দেখা। মাথার চুলে তাঁর বহুদিন চিরুনী পড়ে নাই। সামনের দাঁতগুলি অতিরিক্ত পান-দোক্তা খাওয়ার ফলে কাল হইয়া গিয়াছে। গায় একটা ফরিদপুরী ছিটের কোট—উপরের দুটি বোতাম না থাকায় বুক একেবারেই খোলা। পায়ে একজোড়া ছেঁড়া এলবার্ট স্লিপার,—পরনে হাঁটু পর্য্যন্ত উঠানো নূতন ময়লা কাপড়, বগলে একটি বাঁশের বাঁটের সাদা ঘেরা-টোপ দেওয়া ছাতা।

সনাতন বাবু আমাদের দেশের লোক। নমস্কার করিয়া তাঁকে বলিলাম—"এই যে দাদা—অনেকদিন দেখা নেই। অথচ শুনি কলিকাতায়ই আছেন।" বছর তিনেক আগে তিনি আমার বাড়ীতেই থাকিতেন।

সনাতন বাবু হাসিমুখে উত্তর করিলেন—"সর্ব্বদাই তোমাদের মঙ্গলকামনা করি। দু'দিন গিছলুমও তোমার বাড়ীতে, দেখা হয়নি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি কর্চ্ছেন এখন?"

"ব্যবসা কর্চ্ছি; চাকুরী আর করব না। বামুনের ছেলে হ'য়ে পরের গোলামী আর ভাল লাগে না!"

"তা বেশ। ব্যবসায় সুবিধে হ'চ্ছে ত?"

"সংসার চ'লে যাচ্ছে সচ্ছল ভাবেই। ঘরভাড়া, হোটেল-খরচা বাদ মাসে গোটা পঞ্চাশেক টাকা থাকে।"

"তার মানে তিন মাসে শ'খানেক টাকা। বৌদিকে আনেন না কেন?"

"পৈত্রিক ভিটাটাও বজায় রাখতে হবে ত? বাপ-পিতাম'র ঘরে সন্ধ্যের সময় একটু বাতি দেবার জন্য তাকে দেশে রেখেছি। আর তিনকুলে কেউ নেই।"

বৌদি যখন কলিকাতায় থাকিতেন তখন কার উপর এই বাতি দেওয়ার ভার ছিল জানি না। যাহা হউক জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিসের ব্যবসা কর্চ্ছেন?"

"দালালি কর্চ্ছি।—'ছগনলাল গিরিধারী লালবালতী-ওয়ালা জুট মিল'—বজ্‌বজে নূতন খোলা হ'য়েছে। সে এক বিরাট ব্যাপার...রাজসূয়-যজ্ঞ বিশেষ। ছগনলালের অগাধ পয়সা আর গিরিধারীলালের নাম ত নিশ্চয়ই শুনেছ—রায় বাহাদুর গিরিধারীলাল।"

আরও দু'চারটি কথার পর পরস্পর বিদায় লইলাম।

* * *

তিন-চারি দিন পরে খেলার মাঠ হইতে ফিরিয়া দেখিলাম —সনাতন বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। মুখে সেই স্বাভাবিক প্রফুল্ল ভাব।

আমি আসার পর হাতমুখ ধুইয়া বৈঠকখানার ফরাসে বসিয়াই তিনি সান্ধ্যকৃত্য সারিয়া ফেলিলেন। চোখ বুজিয়া ডানদিকের নাক বন্ধ করিয়া বাঁ দিকের নাক দিয়া শ্বাস-গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আবার বাঁ দিকের নাক বন্ধ করিয়া ডান দিকের নাক দিয়া শ্বাস-ত্যাগ। এই প্রক্রিয়ার সময় অদ্ভুত একপ্রকার শব্দ বাহির হইতে লাগিল। আমার ছেলেমেয়েরা ত হাসিয়াই খুন! বন্ধু সুধীন মুখে রুমাল চাপা দিল।

যোগ শেষ হইলে সনাতন বাবু সুধীনকে বলিলেন—"এটা হ'চ্ছে প্রাণায়াম। এতে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। তবে আপনারা হয় ত আধ্যাত্মিক উন্নতি মানেনই না। কিন্তু শরীরের উপরও এর একটা সুফল আছে—বৈজ্ঞানিকরা একথা বলেছেন।"

সুধীন বলিল—"কে বলেছেন?"

সনাতন বাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—"নাম এখন মনে পড়ছে না—তবে প্রমাণ আছে, চীফ্ জাষ্টিস্ সার লরেন্স জেঙ্কিন্স্ নিরামিষ খেতেন—জজ সার উড্রফ্ তন্ত্রের বই লিখে গেছেন। হীরেন দত্ত একজন থিওসফিষ্ট।"

"এর দ্বারাও কিছু প্রমাণ হ'ল না।"

"প্রমাণ হ'চ্ছে যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যোগ ও তন্ত্রের প্রশংসা না করলে এই সব সাহেব ও ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীরা নিরামিষ খাওয়া, বেদান্তচর্চ্চা এসবের ধারই ধারতেন না—"

"বুঝলাম আপনার যুক্তি। কিন্তু আপনার যেরূপ কষ্ট হ'চ্ছিল তাতে মনে হয় শ্বাসের দ্বারা যোগের অপেক্ষা বিয়োগের আশঙ্কাই বেশী!"

সনাতন বাবু হাসিয়া বলিলেন—"সেটা ঠিক, শ্বাসের ফলে অনেকের হৃদরোগ হ'য়েছে। তবে আমার কথা ছেড়ে দিন। গঙ্গার জলের ভিতর ব'সে সমস্ত রাত্রি যোগ ক'রে কাটিয়ে দিয়েছি—"

"স্বাস্থ্য হয় ত তারি ফলে খারাপ হ'য়েছে।"

সনাতন বাবুর মুখ একটু বিষণ্ণ হইল, তিনি বলিলেন—"Poverty problem মশাই Poverty problem।"

সুধীন চুপ করিল।

তামাক খাইতে খাইতে সনাতন বাবু আমার বড়-ছেলেকে একটা equation-এর অঙ্ক কষিতে দিলেন; মেয়েটিকে বলিলেন—"বল ত রুক্মিণী বানান কি?" মেয়েটি উত্তর করিল—"ভুলে গেছি।" সনাতন বাবু বলিলেন—"বেশ ভাল ক'রে পড়াশুনা ক'রো, তা না হ'লে ভাল বর জুটবে না—।" ইহা শুনিয়া মেয়েটি পলাইয়া গেল।

সনাতনবাবু তখন ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের কাছে তিনি যান না। নূতন কোম্পানী—ফেল পড়িলে মুখ দেখাইতে লজ্জা করিবে। তবে ভগবানের অনুগ্রহে ভাল ভাল ক্লায়েণ্ট জুটিয়াছে—মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, নাখোদা ইত্যাদি। তবে ডাক্তারদের মধ্যেই কাজ ভাল হইতেছে। তাঁর কারবঙ্কল্ হওয়ায় তিনি ডক্টর ঘোষের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। ডক্টর ঘোষ অনেক ভাল ভাল ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। তাঁরা অনেকেই কথা দিয়াছেন যে সেয়ার কিনিবেন। সুধীন একটু হাসিল। সনাতন বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"Rome was not built in a day."

তাঁর কথা শুনিতে শুনিতে আমি টেবিলের উপর ছড়ানো চগনলাল মিলের কাগজ পড়িতেছিলাম। দেখিলাম দু'খানা রসিদ বই। একখানায় আমাদের গ্রামের নরেনের নামে আট টাকার একখানা রসিদ লেখা। সে চারখানা সেয়ার কিনিয়াছে। আর একটি খাতায় সনাতন বাবু নিজের নামে এক রসিদ কাটিয়াছেন, পাঁচটি সেয়ারের allotment বাবদ দশ টাকার রসিদ। দুইখানা খাতারই অন্য সব পাতা সাদা।

সনাতনবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডক্টর ঘোষের নাম শুনেছেন বোধহয়···ডক্টর পরমার্থ ঘোষ, ভাটিয়া হাসপাতালের হাউস্ সার্জ্জেন?"

আমি অন্যমনস্কভাবে বলিলাম—"হুঁ।"

এই সময় সুধীন উঠিয়া গেল। সনাতন বাবু যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। আরও দু'একটা অবান্তর বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি বলিলেন—"একটা চাকরী আছে ঢাকায়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি চাকরী?"

"দিলনগরের ম্যানেজারি। দিলনগরের বাবুদের পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা আয়।"

"কার জন্য?"

"আমিই করব মনে করছি। এ বিষয়ে তোমার কি মত?"

"মাস গেলে একটা স্থির আয় থাকাই ভাল। দালালিতে বড্ড খাটতে হয়।"

"ঠিক বলেছ! অত খাটা পোষায় না। পঞ্চাশের উপর বয়স হ'য়ে গেল। এখন ত বনং ব্রজেৎ-এরই সময়। তবে অবশ্য ব্যবসায় লেগে থাকতে পারলে prospect ছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দিলনগরে মাইনে কত?"

"শুনছি ত পঞ্চাশ টাকা।"

"আর উপরি আছে?"

"তাও মাস গেলে দশ-পনেরো টাকা হবে।"

আমি বলিলাম—"পঞ্চাশ হাজার টাকার এষ্টেটে ম্যানেজারের মোটে দশ টাকা উপরি-আয়? জমিদারী ষ্টেটে শুনেছি তহরি প্রভৃতি উপরি-আয় অনেক।"

সনাতন বাবু বলিলেন—"তহবিল বেশীর ভাগ নায়েবরাই পায়। ম্যানেজারের চাকরী—High official, দশ-পনেরো টাকার জন্য ত ছ্যাঁচড়ামো করতে পারা যায় না।"

আমি বলিলাম—"এ চাকরী পেলে মন্দ হয় না।"

"মন্দ হয় না কি বলছ ভায়া! পেলে বেঁচে যাই। এরনাম Bread problem···অন্ন-সমস্যা। ব্যবসার কথা আর ব'লোনা। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীর দিন নেই। যেখানে যাই—বামুন ব'লে খাতির করে···তোমার দাদার ব্যক্তিত্বের জন্যও বোধ হয়খানিকটা শ্রদ্ধা দেখায়। কিন্তু সেয়ার কেনার কথা বললেই বলে—দেশী-কোম্পানী ঠকাবে না তার বিশ্বাস কি? এরূপ মনোবৃত্তি হ'চ্ছে পরাধীনতার অভিশাপ!"

আমি বলিলাম—"তা বটে।"

তিনি আবার আরম্ভ করিলেন—"এই ক'মাসে নরেনের কাছে ছাড়া একখানাও সেয়ার বিক্রী করতে পারিনি। অবশ্য কথা দিয়েছেন অনেকে।"

"চাকরীরই চেষ্টা করুন।"

"তা-ই করবো। আমি ত অভিজ্ঞ লোক। জমিদারের ছেলে—High family, আমার দরখাস্ত ছুড়ে ফেলতে ত পারবে না!"

দেশে তাঁর বার্ষিক দেড়শো টাকা আয়ের জমিজমা ছিল। আমি বলিলাম—"আমার ত বিশ্বাস, আপনার হ'য়ে যেতে পারে। গভর্ণমেণ্টের চাকরীতে আপনার অভিজ্ঞতা আছে।"

সনাতন বাবু বলিলেন—"যদি না হয় তবে তোমার বড়লোক বন্ধু-বান্ধবদের কাছে কিছু সেয়ার বিক্রী করিয়ে দিতে হবে···আর তোমাকেও নিতে হবে দু'চারখানা।

আমি বলিলাম—"তা দেখা যাবে।"

আজ আট বৎসর হইল ঘুষ খাওয়ার অপরাধে সনাতন বাবুর চাকুরী গিয়াছে। অতিকষ্টে সেবার তিনি জেল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। সে চাকুরী বজায় রাখিতে পারিলে আজ ৭০৲।৮০৲ টাকা পেন্সন হইত। চাকুরী যাওয়ার পর হইতে কতরকম চাকুরীর চেষ্টা, ব্যবসায় ও বৈজ্ঞানিক রিসার্চ্চ যা তিনি করিয়াছেন তাহার ঠিক নাই। আমাকে অনেক কথাই তিনি বলিতেন।—একবার তান্ত্রিক মতে পারাকে সোনায় পরিণত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিছুদিন শিয়ালদহে পাইকারীদরে মাছ কিনিয়া ছাতুবাবুর বাজারে বিক্রয় করিতেন। একবার তাঁর সখ হইল যাত্রার দল খোলার। আমি তখন বাধা দিয়াছিলাম। এখনও মনে পড়ে আমাকে তিনি কত 'পাঠ' আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। দানী-বাবুর অনুকরণে বীরের অভিনয়, মিহিগলায় স্ত্রীলোকের ভূমিকার আবৃত্তি, গান, আরও কত কি! মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেন—"চলবে বোধ হয়···কি বল ভায়া?"

রাত সাড়ে নয়টা হইয়া গেল। সনাতন বাবু বলিলেন—"এবার বিদায়-কল্পেটা হ'য়ে যাক।"

এমন সময় আমার কন্যা আসিয়া বলিল—"মা বলেছেন জ্যেঠা-বাবুকে খেয়ে যেতে।"

আমি বললাম—"দাদা, আপনার বৌমার প্রার্থনা শুনেছেন ত?"

একগাল হাসিয়া তিনি উত্তর করিলেন—"বৌমা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!"

আমি বলিলাম—"তা খুব টের পাচ্ছি বটে।"

"তার মানে? লক্ষ্মী হাতে পেলে তার মূল্য মানুষ বোঝে না।"

আমি বলিলাম—"তা যাক্। আপনাকে কিন্তু খেয়ে যেতে হবে।"

সনাতন বাবু বলিলেন—"আজও শরীর ভাল নেই, আর একদিন হবে।"

"না দাদা, সে কি হয়?"

"ভায়া, এত নিজেরই ঘর-বাড়ী, খেলেই হ'ল!"—বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

আমার অনুরোধ-উপরোধ ব্যর্থ হইল কিন্তু তাঁর মুখের ভাব দেখিয়া আমার কেমন মনে হইয়াছিল, দাদার সে-রাত্রি হরিবাসরে কাটিবে। অসুখটা তাঁর একটা ওজর মাত্র।

যাওয়ার সময় তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন, রবিবার দুপুরে আমার বাটীতে আহার করিবেন। তারপর অনেক রবিবার কাটিয়া গিয়াছে—আর তাঁর দেখা নাই।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

নারীশিক্ষা *

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ

একটু সঙ্কোচের সহিত-ই আজ আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের আসন গ্রহণ করেছি। প্রায় দু'মাস পূর্ব্বে যখন এই হিন্দু-কুমারী শিক্ষামন্দিরের পক্ষ হ'তে সভাপতি মহাশয় আমাকে একজন্য বলতে যান তখনই সেটা মনে হ'য়েছিল।

এই পল্লীনিবাসী আমার একটি বিশিষ্ট বন্ধু আমাদের চন্দননগরের নারী-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমাকে একদিন ঠিক এই কথাটি বলেছিল, "ভাই হরিহর, জীবনে একটি ভুল করলে।" কথাটায় তেমন আস্থা স্থাপন না করলেও ভুলে যেতেও পাচ্ছিনা। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া যে একটা মস্ত ভুল, উহা যে একটা অনিষ্টের মূল এ সংশয় এখন এসব দেশে আর বেশী লোকের মধ্যে না থাকলেও একটা শ্রেণীর মধ্য হ'তে আজও যে ইহা একেবারে তিরোহিত হয় নাই একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। শিক্ষা— যে পবিত্র সামগ্রী মানুষ মাত্রেরই লাভ করা দরকার, যার অভাবে মানুষের মনুষ্যত্বই পূর্ণতা পায় না, সেই শিক্ষার প্রতি একটা বিরূপভাব আজও যে দেখা যায় ইহা বিস্ময়ের কথা। মেয়েদের শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা বা আশঙ্কা সম্পর্কেই আমি এখানে সামান্য কিছু বলব।

মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা যাঁরা চান না তাঁরা সকলেই যে শিক্ষার উপকারিতা স্বীকার করেন না ব'লেই চান না আমার ত এরূপ মনে হয় না। তবে কেন এরূপ বিরুদ্ধভাব তাঁরা হৃদয়ে পোষণ করেন? তার কি কোন কারণ নাই? এর কারণ অবশ্যই আছে, কিন্তু অনেক সময় তার মধ্যে একটু ভুলও থাকে। তাঁদের আশঙ্কা, শিক্ষা পেলে মেয়েরা বিলাসী হবে, পুরুষভাবাপন্ন হবে, বাবু বা বিবি ব'নে যাবে, মেয়েদের আর লাগাম ধ'রে রাখা যাবে না, তারা আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাবে, পুরুষদের মানবে না।

মেয়েদের, ভগবৎদত্ত বিশিষ্টতা হারিয়ে যদি শিক্ষাই তাঁদের বিপথ আশ্রয়ের কারণ হয়, তা হ'লে সত্যই তা সমর্থন করবার নয়। যদি বিদ্যালয়ে পাঠানর ফলে এই সবই লাভ হয়, তবে সেটা যে বাঞ্ছনীয় নয় একথাও অস্বীকার করবার নয়। কিন্তু এর মধ্যে শুধু ভাববার কথা এইটুকু, প্রকৃত শিক্ষায় মানুষ কি এই-সকলেরই অধিকারী হয়? নিঃসন্দেহ, প্রকৃত শিক্ষার কাজ এ নয়। যাতে ক'রে আমাদের জীবনের মধ্যে বিপর্যয় আনতে পারে প্রকৃত শিক্ষা তা নয়। উহা শিক্ষার নামে কুশিক্ষা। এই কুশিক্ষাকে ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তাই ব'লে কাকেও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখাই কি কর্ত্তব্য? বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চউপাধিধারী যুবকদের মধ্যেও কি কাহাকেও কাহাকেও শিক্ষার বিরোধী গুণসম্পন্ন দেখা যায় না? এম-এ, বি-এ পাশ ক'রে অনেক ছাত্র অনেক বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হ'চ্চে তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষিতের কাছ থেকে যা-কিছু আশা করা যায় উক্ত সব যুবকদের কাছ থেকেই কি তা পাওয়া যাচ্ছে? অপরের কথা না হয় ছেড়ে দি, সেইসব যুবকদের পিতা-মাতাই কি তাদের আচরণে সব সময় পরিতৃপ্ত?

তা যদি না হয়, একথার মধ্যে যদি সংশয় করবার না থাকে, তবে মেয়েদের জন্য যে কথা হয় ছেলেদের শিক্ষা-সম্পর্কে সে কথা উঠে না কেন? ছেলেরা মূর্খ হ'য়ে থাকলে অনেক দোষ একথা কে না বলবেন, কিন্তু অর্থোপার্জ্জন ছাড়া কি পুরুষের আর কোন দিক নেই? তাদের কি ভবিষ্যতে গৃহকর্ত্তার কর্ত্তব্যপালন করতে হবে না? তাদের কি সমাজের সংসারের ভিতরে থেকে তার রক্ষক ও পালক হ'তে হবে না? না, দেশমাতৃকার সেবাই তাদের কাজের বাইরে? অন্য কথা ছেড়ে দি, এই যে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, এর তীব্রতাও ত কম নয়। বিদ্যার স্বাভাবিক ফল অহঙ্কার নয়—বিনয়। সুশিক্ষিত অনেক পুরুষদের

---

* কলকাতা হিন্দু-কুমারী শিক্ষামন্দিরের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব সভায় সভাপতির অভিভাষণ। ১৪ই বৈশাখ ১৩৩৭।

মধ্যেও যেমন এই অহঙ্কার দেখা যায়, তেমনই মেয়েদের মধ্যেও অনেকস্থলে ইহা ঘটা বিচিত্র নয়। কিন্তু তাই ব'লেই বিদ্যার সব গুণ বিস্মৃত হ'য়ে কি একেবারে মেয়েদের জন্যে শিক্ষাকে পরিবর্জ্জন করতে হবে? এই যে শতশত লোক দৈবদুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে মরে, অহিফেন-আর্শেনিকে কত হতভাগ্যের প্রাণবিয়োগ ঘটে, জাহাজ-নৌকা ডুবে-বা রেল-মোটরে বা বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় কত লোকে জীবন দেয়, তা ব'লে কি আগুন আফিং আর্শেনিক বা জাহাজ নৌকা রেল মোটর ও বৈদ্যুতিক শক্তিকে জগৎ থেকে নির্ব্বাসিত করতে হবে? কাঁটার অস্তিত্ব সত্ত্বেও যখন গোলাপকে ত্যাগ করা চলে না, তখন শিক্ষাকে ত্যাগ করা যায় কি প্রকারে? শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার দোষে শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে দোষ হয়,—সে দোষ শিক্ষার নয়। বিদ্বান লোকের চরিত্রিক দোষ থাকলে তা যে বিদ্যা হ'তেই উদ্ভূত এ কথা মনে করা ভুল।

নারীর শিক্ষার আবশ্যকতা অতি প্রাচীন যুগেও ছিল, এখনও আছে। তাঁদের উপার্জ্জনক্ষম ক'রে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার উদ্দেশ্যে বা অন্য স্বার্থসিদ্ধির কামনায় তখন শিক্ষা দেওয়া হ'ত না। শিক্ষার দ্বারা নারীজীবনের উৎকর্ষসাধন, সংসার ও সমাজে লক্ষ্মীশ্রী-বিধানের জন্যেই তখন হিন্দুনারীর যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

যে জাতির যা স্বাভাবিক প্রবণতা তাকে অগ্রাহ্য ক'রে, তার বিশিষ্টতাকে দলিত ক'রে সে কখনও উঠতে পারে না। ভারতের বৈশিষ্ট্যকে চেপে রেখে, পশ্চিমের সভ্যতা, সেখানকার বিশিষ্টতা আমাদের ধাতুতে সইবে না। এদেশের মানুষ শৌর্য্যে-বীর্য্যে-পরাক্রমে বলীয়ান হ'তে ভাত-ডাল-রুটিকে ছেড়ে হ'তে পারে না। এদেশে পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান-লাভের জন্য ঋষির আশ্রম—পর্ণকুটীর কোনদিন অক্ষম হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গৌরবকে আভিজাত্যের গরিমা কোনদিন ম্লান করতে পারে নি। ভারত-নারীর বৈশিষ্ট্য—তাঁর আভ্যন্তরীন সৌন্দর্য্য জগতে দুর্লভ। যে শিক্ষাদীক্ষায় তাঁদের সে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলত, সে সৌন্দর্য্য বিকশিত হ'ত সেটা লাভ করবার জন্যে পূর্ব্বকালে স্কুল-কলেজের আবশ্যকতা ছিল না।

কিন্তু একথাও সত্য যে, যুগপ্রভাব অতিক্রম করা । সে প্রভাবকে অবহেলা অগ্রাহ্য ক'রে জগতের সঙ্গে চলতে গেলে পেছনেই প'ড়ে থাকতে হবে। এজন্য সময়ের সঙ্গে যেতেই হবে। পূর্ব্বকালে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হ'ত, এখনও দিতে হবে। তখন সে শিক্ষার স্থান ছিল পরিজনপরিবৃত গৃহ, না হয় গুরুগৃহ; এখন সে স্থান অধিকার করেছে মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষালয়- । বিদ্যালয়ের সাধারণ পুঁথিগত বিদ্যালাভে কি নারী কি পুরুষ কারো শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না এ কথা সত্য, কিন্তু তা হ'লেও সেখান হ'তে তাঁদের জন্য উপযোগী শিক্ষা যতটা পাওয়া যায় নিতে হবে।

স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া এযুগে বাদ দেওয়া চলবে না। অবস্থাবিপর্য্যয়ে যাতে নিজের বা নিজের ছোট ছেলে-মেয়েদের ভার নিজেরাই নিতে পারে, পরের কৃপার পাত্রী না হ'য়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবার সামর্থ্য হয়, এমন সহজসাধ্য প্রয়োজনীয় উটজশিল্পও কিছু কিছু শিক্ষা দিতে হবে। স্থানান্তরে যেতে পুরুষের সঙ্গচ্যুত হ'য়ে পড়লে যাতে বিপদগ্রস্ত না হ'তে হয়, কোন দৈব-বিপদের সম্মুখীন হ'লে যাতে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হ'তে পারে এমন সব শিক্ষারও প্রয়োজন। কিন্তু তা ব'লে একথাও ভুললে চলবে না যে, নারীর নারীত্ব যাতে লুপ্ত হবার সম্ভাবনা আছে সে বিদ্যার মধ্যে যত মোহই থাক না কেন তা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

নারীর মহত্ত্ব, নারীর গৌরব, নারীর শ্রেষ্ঠত্ব নারীত্বের মধ্যেই পর্য্যবসিত আছে। সেই নারীত্বকে অপসারিত বা ম্লান ক'রে নারীকে যে শিক্ষাই দেওয়া যাক তাতে তাকে উন্নত করতে পারবে না, তাতে তার প্রকৃতিগত আদর্শ খর্ব্বই হবে। তাঁদের শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের জন্য পাঠ্যাদি-ব্যবস্থার কালে একথা ভুললে চলবে না যে, তাঁদের বিশিষ্টতা নষ্ট করবার জন্য শিক্ষা নয়, তাকে উজ্জ্বল ও মার্জ্জিত করবার উদ্দেশ্যেই তাঁদের শিক্ষা। এখনকার এই কর্ম্মের যুগে সকলেরই একটা বিশিষ্ট কর্ম্মধারায় চলা আবশ্যক। সমাজগঠন ও পরিচালনের মধ্যে নারীর জন্য যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে তা উপেক্ষার বিষয় নয়।

নারীর সেবা, সংসারে শৃঙ্খলাবিধান, তাঁর ত্যাগশীলতা প্রভৃতির মধ্যে অসীম সংগঠনী-শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। আর সমাজগঠনের জাতিগঠনের মূলে নারীশক্তির কার্য্যকারিতাকে অস্বীকার কে করবে?

আজ কাল বিদুষী নারীদের মধ্যে অনেকের ধারণা, যে-সকল মহিলা তাঁদের প্রচলিত গণ্ডীর বাইরে এসে পুরুষেরই মত রাজনৈতিক, নগর-পরিচালননৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে যোগ দিচ্ছেন, পুরুষেরই মত বিবিধ বিষয়ে অধিকারসংগ্রহে সক্ষম হ'চ্চেন তাঁরাই উন্নত। যাঁরা এসকল কাজে যোগ দিচ্চেন,—উকিল, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, কাউন্সিলের সদস্য প্রভৃতি রূপে তাঁরা নিজেদের যথোচিত কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও এর আমাদের দেশের কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হ'চ্চে তা ভেবে দেখ্‌বার কথা। তাঁদের দ্বারা এই-সকল কাজ সুসম্পন্ন হ'চ্চে না, এ ভাবের কোন-কিছু মনে ক'রে আমি কিছু বলচিনে। কিন্তু এসব কাজে তাঁরা লিপ্ত হ'লে তাঁদের যেসব অতি-প্রয়োজনীয় কাজ আছে তাতে ত্রুটি হবে না কি? আর তার চেয়েও বেশী ক্ষতির সম্ভাবনা, যে ক্ষেত্র তাঁদের ঠিক উপযোগী নয়, অর্থাৎ ধাতুগত নয়, তার মধ্যে গিয়ে পড়লে সেখানকার ঘনকর্দ্দমের আবিলতা তাঁদের স্পর্শ করবেই এবং তা হ'তে ক্রমশঃ তাঁদের নারী-ধর্ম্ম আহত হ'তে থাকবে। তাঁরা হয় ত শ্রেষ্ঠা রাজনীতিজ্ঞ হ'তে পারবেন কিন্তু শ্রেষ্ঠা নারী বলতে যা বুঝায় তখন তা আর থাকবেন কি না সন্দেহ।

বর্ত্তমান ভারতের মহীয়সী নারী আমাদের এই বাংলার কন্যা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ভারতের নারী-গৌরবের কথা বলতে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যাঁরা নদীর তীরে কলসী-কাঁকে জল আনতে যান, যাঁরা তালপাতার ঘরের মধ্যে রান্না করছেন, যাঁরা হাজার হাজার বৎসর ধ'রে সন্তানপালনের কার্য্যে নিযুক্তা আছেন, যাঁরা শস্যক্ষেত্রে হাড়ভাঙ্গা শ্রম করেন, যাঁরা শত দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তিনি বলেন—তিনি তাঁদেরই একজন এই গৌরবে তাঁর মন ধন্য হয়, প্রাণ শীতল হয়। তাঁর কথা, ভারতের গৌরবময় সভ্যতার মূল, প্রাচীন মহিলাদের আদর্শ—প্রেম, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও বিচক্ষণতা।

শ্রীমতী নাইডুর ন্যায় একাধারে বহু-গুণসম্পন্না নারী সুলভ নয়। তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করলেও, রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি নিজেকে বিশেষভাবে উৎসর্গত করলেও, ভারতের আদর্শ ভুলতে পারেন নি; শুধু তাই নয়, সেই আদর্শকেই বড় ক'রে দেখেছেন। সেই ভারতীয় গ্রাম্যভাবময়ী ভারতনারীর অন্যতমা মনে ক'রে নিজেকে গৌরবান্বিতা বোধ করেন। তাঁর মত প্রতিভা-শালিনী মহাশক্তিসম্পন্না নারীত্বের আদর্শ—দুর্ল্লভ। সে আদর্শে নিজেকে গ'ড়ে তুলবার শক্তি-সৌভাগ্য ক'জনের হয়!

ভারতের নারীর ত্যাগ, তাঁদের সেবা, সহিষ্ণুতা জগতে দুর্ল্লভ। রাষ্ট্রজগতে নারীর কর্ম্মের ইতিহাস ভাল ক'রে আমার জানা নাই। হয় ত এদিকে তাঁদের কর্ম্মকুশলতার পরিচয়ের অভাব নেই। প্রয়োজনস্থলে যেমন অনেক নিয়মেরই কিছু পরিবর্ত্তন না করলে চলে না, তেমনই দেশের কাজে রাষ্ট্রের সঙ্কিক্ষণে সৌকর্য্যসাধনার্থ নারীর শক্তি-প্রয়োগের ইতিহাস হয় ত দুর্ল্লভ নয়। কিন্তু তা ব'লে, একাজ তাঁদের জন্য অভিপ্রেত নয় এই কথাই মনে করি।

ছেলেদের লেখাপড়া শিখার মধ্যে একটা বিশেষ স্বার্থ আছে যার আকর্ষণ উপেক্ষণীয় ত নয়ই বরং দেখা যায় অধুনা সেইটাই প্রবল। সেটা নিজেকে উপার্জ্জনক্ষম ক'রে তোলা। তার জন্য যেসব বিদ্যা আয়ত্ত করা দরকার তা ক'রে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাড়-পত্র নিয়ে বা'র হওয়াই এখন তাদের কার্য্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব্বেই বলেছি, মেয়েরা স্বাবলম্বন শিখে আবশ্যক হ'লে নিজ পরিশ্রমে গ্রাসাচ্ছাদন বা সন্তানের ভরণ-পোষণের উপযোগিতা লাভে সক্ষম হন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ভুলে' যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে প্রধানতঃ এখন যুবকদের শিক্ষা দেওয়া হয় সেসব উদ্দেশ্য, সে স্বার্থচিন্তা মেয়েদের সম্পর্কে পরিত্যাজ্য। তার দ্বারা ধর্ম্ম ও ভারতীয়-ভাববর্জ্জিত শিক্ষায় পুরুষের যা দুর্দ্দশা হ'য়েছে মেয়েদেরও তাই হবে এতে সন্দেহ নেই। তাতে নিজস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হ'তে হবে। তার দ্বারা গৃহধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা তাঁদের বহির্ম্মুখী-ভাবে অভিভূত করবে। তেমনই শিক্ষার প্রভাবে আজ কোন কোন তথাকথিত শিক্ষিতা নারীকে তাঁদের অন্তঃপুরকে ভুলতে দেখা

যাচ্ছে। তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না হিন্দুঅন্তঃপুরের পরিসর কত বড়। পুরুষশাসিত বহির্জগতের মোহে আজ তাঁরা আচ্ছন্ন। তাঁরা অন্তঃপুরের যে সুমহান পবিত্র রাজ্যের একচ্ছত্রা অধিশ্বরী তা বিস্মৃত হ'য়েছেন। তাঁদের অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত আত্মদান, তাঁদের বিরাট সাধনা, কল্পনার অনধিগম্য সেই মনুষ্যত্বের সর্ব্ববিধ সুমহান উপদানে সন্তানের দেহমনকে গঠিত করতে হ'লে যে কতবড় শক্তির অধিকারিণী হ'তে হয়, কতবড় শিল্পীর নিপুণতা আবশ্যক, একথা ভাববার অবসর তাঁদের নেই। এই স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন সংসারধর্ম্মে, দাম্পত্যের পবিত্র সম্বন্ধে, নারীর অপূর্ব্ব প্রেম ও বাৎসল্যের সোহাগে, তাঁদের সেবা ও ত্যাগের স্পর্শে পুরুষের নিজেকে বড় মনে ক'রে গর্ব্ব করবার অথবা নারীর নিজেকে ছোট মনে ক'রে নিয়ে ক্ষুণ্ণ হবার কিছু নেই। ঈপ্সিতের কাছে উৎসর্গিত মন-প্রাণের তৃপ্তি স্বেচ্ছাচারিতার চেয়ে কত বড়, ত্যাগের আনন্দ ভোগের সুখের অপেক্ষা কত বেশী, কৃত্রিমতার আনন্দ নিষ্ঠার তৃপ্তির কাছে কত হীন, একথা বুঝবার সামর্থ্যও তাঁদের চ'লে যেতে বসেছে। নিজ স্বার্থের বশবর্ত্তী হ'য়ে ছোট-বড় মনে ক'রে নরনারীর সম্পর্ক রেখে চলা এদেশের নয়। অনুক্ষণ মনে রাখতে হবে—নরনারীকে নিয়েই জগৎসংসার। একের ইষ্টে অপরের ইষ্ট, একের অনিষ্টে অপরের অনিষ্ট। উভয়ে অভিন্ন থেকে নিজ-নিজ বিভিন্ন কর্ম্মে আত্মনিয়োগব্যতিরেকে কাহারও সুবিধা নেই।

হিন্দুনারীকে হিন্দুচরিত্র নিয়েই উঠতে হবে। যেখানে নারীশিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে এসব চিন্তার অবসর নেই সে-ক্ষেত্রে শিক্ষা না দেওরাই শ্রেয়। শিক্ষার অভাবে যে ক্ষতি, কুশিক্ষার প্রভাবে ক্ষতি তার অপেক্ষা বেশী একথা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু সংস্কারব্যতিরেকে যেমন হীরক-খণ্ডও নিষ্প্রভ জ্যোতিহীন থাকে, শিক্ষারূপ সংস্কারের অভাবে অতি প্রতিভাসম্পন্ন মনুষ্যত্বও অপূর্ণ থেকে যায়। সুতরাং শিক্ষা মানুষমাত্রেরই দরকার এবং যাঁদের জন্য যেমনটি দরকার তেমনটির ব্যবস্থা করাই সমীচীন। মেয়েদের শিক্ষা-বিষয়ে পরিমাণের অপেক্ষা বিষয় ও রীতির দিকে লক্ষ্য রাখাই বেশী দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ করাই মেয়েদের শিক্ষার চরম মনে করা মস্ত ভুল। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা আমূল সংস্কার ক'রে একটা স্বতন্ত্র বিধিপদ্ধতি প্রণয়ন করা আবশ্যক। বর্ত্তমানে তাঁদের শিক্ষার বিস্তার-কল্পে মনোযোগী হওয়া যেমন দরকার সংস্কারের দিকে যত্নবান হওয়া তার চেয়ে কম দরকার নয়।

একথা বলা হ'য়েছে নারীর কর্ম্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র, সুতরাং পুরুষ যা কিছু করছে নারীর তা না করলে বড় হওয়া যায় না এ ধারণাটা একেবারেই ভ্রমাত্মক। পুরুষের অনুকরণে নারী সর্ব্বৈব সাফল্য লাভ করলেও উভয়ে উভয়ের স্বতন্ত্র কর্ম্মের ভার নিয়ে একে অপরের সহায়তায় যত্নশীল না হ'লে সমাজের মঙ্গল নেই। নারীর কর্ম্মক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে যে এক নয় তা ভগবানের সৃষ্টিলীলা হ'তেই বুঝা যায়। সুতরাং পরানুকরণে কোন লাভ হবে না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রতীচ্যে যে বিষময় ফল এনেছে তাতে সেখানেই আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। নীতি ও ধর্ম্মগত বন্ধন-সকল সেখানে দিনের পর দিন শিথিল হ'চ্ছে। ইহা অধঃপতনেরই লক্ষণ। নৈতিক উৎকর্ষসাধন ভিন্ন এ অধঃপতন হ'তে রক্ষা পাবার অন্য উপায় নেই। মানসিক ও চরিত্রগত উৎকর্ষসাধন-বিষয়ে পুরুষ ও নারীর পথ একই। সে পথ শিক্ষালাভ, সুতরাং বিদ্যার্জ্জন। এই বিদ্যালাভের জন্য যখন এযুগে সাধারণ শিক্ষালয়ের আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন অপর উপায় নাই, তখন ভারতনারীর প্রয়োজন ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে যে বিধিপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা উচিত, তাঁদের শিক্ষা-মন্দিরে সেই মত ব্যবস্থাই করতে হবে। ১৯২৫ সালের শিক্ষাবিবরণী হ'তে জানা যায়, প্রতি ছয় জন পুরুষে প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে মাত্র একজন নারী, আর উচ্চশিক্ষা পাচ্ছে প্রতি আঠার জনে একজন। দেশে নারীদের প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক, কিন্তু উচ্চশিক্ষা-ব্যতিরেকে স্বাধীনতার চর্চ্চা হয় না; সুতরাং সে ব্যবস্থাও করতে হবে।

আরও এককথা, যুগপ্রভাব অনতিক্রম্য। নারীদের মধ্যেও যে একটা জাগরণের সাড়া এসেছে এর প্রয়োজনীয়তা আছে কি না সে আলোচনার এখানে আবশ্যকতা দেখি না, তবে তা যে অপহৃত হবার নয় এ ধ্রুব। সুতরাং সে বিষয়ে

সুফল প্রত্যাশা করলে স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশীলতার সঙ্গে শিক্ষাতেও নারীদের উন্নত হ'তে হবে। সুতরাং শিক্ষা চাই-ই। যাঁদের হাতে এই শিক্ষার ভার ন্যস্ত আছে তাঁদের দায়িত্ব অসীম। প্রবন্ধের পৃষ্ঠায় বা বক্তৃতার মুখে শিক্ষার বিধিপদ্ধতির কথা বলা সহজ, কিন্তু স্বল্পদিন এই কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত থেকে বুঝেছি যে তা কার্য্যে পরিণত করা বড় কঠিন। পনের-বিশ বৎসর পূর্ব্বে এখানকার মত স্থানে মিশনারীদের হাতে ভিন্ন নারীশিক্ষার ব্যবস্থা প্রায় ছিল না, কিন্তু আবশ্যকের অনুরূপ না হ'লেও সুখের বিষয় সে তুলনায় এখন অনেক ব্যবস্থা হ'য়েছে বলতে হবে। কিন্তু তবুও উদ্যোক্তাগণ ও দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে বেশ তৃপ্তি পাচ্ছেন না তার কারণ অভাব। সে অভাব,—প্রথম জনসাধারণের সহানুভূতি, দ্বিতীয় ভাল শিক্ষয়িত্রী, তৃতীয় অর্থ।

শ্রীহরিহর শেঠ

অভিশপ্তা

—গল্প— —শ্রীযুক্ত ভূধরনাথ মুখোপাধ্যায় কাব্যরত্ন বি-এ

১

এ শুধু আমার মর্ম্মকাহিনী নয় ; আমারই মত শত শত ব্যর্থজীবন জানি না কার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কচ্ছে ! সহস্রের অন্তর্যাতনা—ভাষায় যা উক্ত হয় না, শুধু নীরস মুখ ও শূন্য চোখের জলভরা উদাস দৃষ্টি যা নীরবে ব্যক্ত ক'রে থাকে, তাই আজ আমি লিখতে বসেছি। এই কয়খানি পাতায় যে কাহিনীটি লেখা হ'লো তা কল্পনাপ্রসূত অলীক রচনা মাত্র নয়, নিদারুণ বাস্তব। এই কাহিনীর প্রতি ছত্র অশ্রুমালা—এর প্রত্যেক অক্ষর থেকে টস্ টস্ ক'রে রক্ত ঝর্‌ছে।

দূর পাড়াগাঁয়ের একপাশে ছোট্ট নদীর তীরে আমাদের ছোট্ট বাড়ীখানি ছবির মত শোভা পেত। সেই বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন আমার মা। লালপেড়ে সাড়ী প'রে, সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়ে মা যখন আমার গলবস্ত্র হ'য়ে তুলসীতলায় প্রণাম কর্ত্তেন, তখন সেই মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীপ্রতিমা দেখে আমার ছোট্ট মাথাটাও লুটিয়ে পড়তো—প্রণাম কর্‌তুম তুলসীতলায়, সামনে দেখতুম আমার মাকে।

বাবার কোনদিকেই নজর ছিল না। নিজেকে নিয়েই তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত হ'য়ে থাকতেন। বড়ই তোষামোদপ্রিয় ছিলেন তিনি। বড় হবার—অন্ততঃ বড় ব'লে পরিচিত হবার একটা দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা তাঁকে ভূতের মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় ক'রে ব্রাহ্মণভোজনাদি করিয়ে বাহবা নিতে গিয়ে তিনি নিজেকে অনেকবার বিপন্ন করেছেন। বাড়ীতে দুটো লোকের নিমন্ত্রণ হ'লেও, বাবার ব্যবহারে মনে হ'তো বুঝি দু'শো লোক নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছে। স্ত্রীলোককে তিনি রক্তমাংসের সৃষ্টি ব'লে মনে কর্‌তেন না ; যেন সে একটা যন্ত্র—যন্ত্রের মত কাজ তার কাছ থেকে না পেলে তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠ্‌তেন—তখন তাঁর কাণ্ডজ্ঞান থাক্‌তো না। মা'র আমার ঐ ছিল একটা বড় অশান্তি। অনেক সময়ে দেখেছি ব'সে ব'সে সল্‌তে পাকাতে পাকাতে মা'র চক্ষু জলে ভ'রে আস্‌তো। গলা জড়িয়ে ধ'রে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তুম—"কি হ'য়েছে, মা তোমার ?" মুখে চুমু খেয়ে মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে মা বল্‌তেন—"কই ? কিছু নয় তো মা—চোখে কি পড়েছে।" ছোট্ট বুকের ভেতর ছোট্ট মনটি আমার কেমন একটু ঝট্‌পট্ ক'রে উঠ্‌তো !

আজ মনে পড়ে, বাড়ীর পাশের ফুলবাগানে সঙ্গীদের সঙ্গে ছেলে-খেলা। অতীতের দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরালে তা লুকিয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু আমার দৃষ্টি সে যবনিকা ভেদ ক'রে স্পষ্টতা দেখ্‌তে পায়। সুন্দরী ব'লে আমার খ্যাতি ছিল। সকলেই মুক্তকণ্ঠে বল্‌তো—'এমন রূপ কারো নজরে পড়ে না।' পাড়ার বুড়ীরা মাকে বল্‌তো—"বড়বউ, তোমার মালতী রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।" সমবয়সীরা ফুলবাগানে এসে ফুলের মালা গেঁথে আমার গায়ে মাথায় পরিয়ে দিয়ে বল্‌তো—"মালতী আমাদের ফুলের রাণী !" নদীর বুকে ছোট ছোট ঢেউ তুলে', ফুলের মুখে হাসি ফুটিয়ে ফুর্‌ফুরে বাতাস বইতো, আমার নীলাম্বরীর আঁচলখানি দিগ্বিজয়ীর পতাকার মত উড়্‌তো—লোকের চোখে আমার রূপ ষোলকলার চাঁদের মত ফুটে উঠ্‌তো—আর ভাগ্যদেবতা বোধ হয় সকলের অলক্ষ্যে মুখ টিপে টিপে হাস্‌তেন !

মা বল্লেন—"ওগো, মেয়ে বড় হ'য়েছে যে। পাত্তর-টাত্তর দেখ্‌ছ ?"

গড়গড়ায় জোরে টান দিয়ে, হিসাবের খাতা থেকে চোখ না তুলেই বাবা বল্লেন—"কিন্তু একটা আধ্‌লা মিলছে না।"

মা বল্লেন—"সে কি ? খরচ করবে না কিছু ?"

বাবার যেন চমক্ ভাঙ্লো। ভারি আওয়াজে গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"খরচ, খরচ—খালি খরচ। গিন্নি, তোমার খরচের জ্বালায় আমি অস্থির! কিসের খরচ আবার এলো? এদিকে একটা আধ্লা কিছুতেই মেলাতে পারছি না—দু'ঘণ্টা চেষ্টা করছি, কিছুতে না!"

মা বল্লেন—"ও—তাই বল! আমি মেয়ের বিয়ের কথা বল্ছিলুম। পাত্তর-টাত্তর দেখ্তে হবে না?"

বাবা হেসে বল্লেন—"এই কথা? গিন্নি, আমার মেয়ে কি আমি যাকে তাকে ধ'রে দেব? আমার রাজকন্যার জন্যে আমি মনের মতন রাজপুত্তুর জোগাড় ক'রে আন্বো। ভাবনা কি? কি জান গিন্নী—আগে দেখ্তে হবে টাকা—"

বাধা দিয়ে মা বল্লেন—"ও কি কথা? আগে দেখ্তে হবে ছেলেটি কেমন—রূপবান, গুণবান্, বয়েস কম—"

একটু বিরক্ত হ'য়ে বাবা বল্লেন—"মেয়েমানুষের বুদ্ধি কি না! টাকা না থাক্লে রূপগুণবয়েস নিয়ে মেয়ে ধুয়ে খাবে, না? আচ্ছা সে দেখা যাবে তখন। কুরূপ আমি আন্বো না; নিশ্চিন্ত থাক। এখন আধ্লাটা খুঁজি,—তুমি যাও।"

এর পর আর কথা চলবার উপায় রইলো না। বাবা তন্ময় হ'য়ে আধ্লা খুঁজ্তে লাগ্লেন—কিছুক্ষণ ব'সে থেকে মা উঠে গেলেন, একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।—কেন?

আড়াল থেকে আমি কথাবার্ত্তা সব শুনেছিলুম; বাবার কথাটা মনে মনে তোলাপাড়া কর্তে লাগ্লুম—কি চাই আমি? বড় বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া, দাস-দাসী, হীরে-জহরৎ, মণি-মুক্তা আর একটি বুড়ো,—না কার্ত্তিকের মত রূপবান্ গুণবান্ স্বামী, কিন্তু কুঁড়েঘর, কড়ের শাঁখা, জীর্ণমলিন বস্ত্র? কি চাই? ঠিক্ কি কর্লুম, তা আমি এখন বল্বো না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—আস্তে লাগ্লো, আবার চ'লে যেতে লাগলো। আমি রোজ ফুলবাগানে যেতুম, আর নিরালায় ব'সে, কল্পনায় আমার রাজপুত্র-বরের মোহ মূর্ত্তি আঁক্তুম। কোন কোন দিন বা গোলাপীর গলা জড়িয়ে ধ'রে কানে কানে বল্তুম—"বুঝলি ভাই, আমার রাজপুত্তুর বর আসবে!" গোলাপী অবাক্ হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্তো।

২

ফাগুন মাস। ফুরফুরে দখিনে বাতাস বইছিল। আকাশে আলোর অপূর্ব্ব সমারোহ—পূর্ণিমার চাঁদ অজস্রধারে সুধাবৃষ্টি কর্চ্ছিল। উলু ও শঙ্খধ্বনিতে আমাদের বাড়ীখানি মুখরিত হ'য়ে উঠেছে—চারিদিকে কোলাহল—আনন্দ—হাসি!

একখানি ঘরের মধ্যে লাল-চেলি-পরা আমি পিঁড়ির উপর স্থির হ'য়ে ব'সে, আমার কল্পনায় গড়া রাজপুত্রের ধ্যান কর্চ্ছিলুম। শরীর আমার স্থির বটে, কিন্তু মনটি আমার নূতন-ধরা খাঁচায় পোরা পাখীর মত চঞ্চল। কেমন একটা অদম্য ঔৎসুক্য আমার সমস্ত হৃদয়টাকে উন্মুখ ক'রে রেখেছিল।

ঐ ঘন-ঘন শঙ্খ ও উলুধ্বনি—ঐ—ঐ আমার কল্পনা মূর্ত্তিধারণ ক'রে দেখা দিলে বুঝি ঐ!

"বাঃ—বাঃ—যোগেশ কি বরই এনেছে! দেখ্লে চক্ষু জুড়োয়!"

মনটা হেসে উঠ্লো—মাতালের মত টল্তে লাগ্লো! চক্ষুদুটো কিসের আবেশে যেন একটু ভারি হ'য়ে এলো—কানদুটো নির্লজ্জের মত প্রত্যেকের কথা গিল্তে লাগ্লো—

"একটু বয়েস হ'য়েছে, তা হোক্—হরগৌরীরও বয়েসের তফাৎ ছিল—"

সে কি! মূর্খ মানুষ—হরগৌরীর বয়সের তফাৎ? হর যদি বৃদ্ধ হন—গৌরীও তো বৃদ্ধা—জগৎ-পিতা, জগন্মাতা! মহাকালের কাছে কাল চিরকালই পরাজিত—তাঁর জরা কোথায়? জগন্মাতা যেমন চিরনবীনা—হরও তেমনি চির-নবীন।

মনটা একটু দ'মে গেল। যাক্, নিজের চক্ষে দেখ্বো তো—আশায় উদ্গ্রীব হ'য়ে রইলুম।

বর এসে ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়েছেন। আমাকে নিয়ে চল্লো সাতপাক দিতে—আমার 'রাজপুত্তুর'কে সাতপাকে বাঁধ্‌তে।

এক, দুই, তিন, চার,—আর তিন পাক—আঃ সতীশদাদা বড় আস্তে চলে!—পাঁচ—ছয়—সাত—তারা থাম্‌লো!

আর এক মুহূর্ত্ত! এই এক মুহূর্ত্তে সহস্র যুগের সঞ্চিত ঝঞ্ঝা আমার হৃদয়টাকে আলোড়িত ক'রে তুললে। থাক্—দেখে কাজ নেই; যদি আমার কল্পনা আমায় ঠকিয়ে থাকে—যদি ততদূর গিয়ে না পৌঁছোয়?

"চেয়ে দেখ্ মালতী, বেশ ক'রে সাম্‌নে চেয়ে দেখ্!"

ধীরে ধীরে চক্ষুদুটো উঠ্‌লো। হায় হায়,—আমার মাথাটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌লো। নাপিতের ছড়া ভ্রমর-গুঞ্জনের মত আমার কানে এসে বাজ্‌ছিল—'আমার হাতের মতন হাত হবে, ভাতার পুতের মাথা খাবে—"

নিজের অজ্ঞাতসারে চোখদুটো নেমে পড়েছিল—শত-লোকের সহস্র অনুরোধ-অনুযোগেও সেদুটো আর উঠ্‌তে চাইলে না। কল্পনা—কল্পনা—মিথ্যামরি! তোমার মিথ্যার দান ফিরিয়ে নাও; বাস্তবের কঠিন প্রহারে আমি আজ জর্জ্জরিত, ক্ষতবিক্ষত, মুমূর্ষু! এই স্বামী—এই আমার এতদিনের মানসগঠিত রাজপুত্র—এই আমার ইহজীবনের সম্বল—পরজীবনের পাথেয়। সুগম্ভীর প্রৌঢ়-মূর্ত্তি! প্রশান্ত বটে—কিন্তু তাতো আমি চাইনি! লোকে বলছে 'সুন্দর'—কিন্তু লোকের চোখে তো আমি দেখ্‌লুম না! নবীনতা-সম্পর্কশূন্য স্থূল দেহে কেমন একটা অস্বস্তিকর জড়তার অস্তিত্ব যেন আমি অনুভব করতে লাগলুম—স্থির গভীর চক্ষুতে যেন কেমন একটা পিতৃত্বের ছায়া পড়েছে ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌লো! ভক্তি আসা সম্ভব—কিন্তু ভালবাসতে পারবো কি? হায় এই আমার স্বামী—ইনি আমার—আমি এঁর! আজ নয় কাল নয়, একদিন নয় একমাস নয় এক বৎসর নয়—আজীবন এই বাঁধনে আমায় বাঁধা থাকতে হবে!

তারপর উৎসাহশূন্যভাবে, নির্জ্জীবের মত সমস্ত ব্যাপারটা শেষ করলুম। সে যেন স্বপ্ন-বিচরণ—স্বপ্নদর্শন! বাসর শেষ হোলো—কেবল হাসি কেবল গানে; আমার মনের মধ্যে—কেন জানি না—কেবল রুদ্ধ আর্ত্তনাদ গুমরে গুমরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

স্বামী পায়ে হাত দিয়ে দাসখত লিখতে এলেন; সমস্ত প্রাণটা কেমন সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠলো! ছি ছি—তের আর তেতাল্লিশ? পা টেনে নিলুম। লীলাদিদি টানাটানি করলে, দু'একটা অন্তরটিপুনিও দিলে, কিন্তু আমি শক্ত হ'য়ে ব'সে রইলুম—কিছুতেই পা বার করলুম না।

সকালে গাড়ী এসে দাঁড়াল। যেতে হবে—যেতে হবে! আমার আবাল্যের এই স্নেহের নীড় পরিত্যাগ ক'রে, একজন অজানার সঙ্গে অজানা জগতে শুধু অজানাদের মধ্যে গিয়ে আমায় বাস করতে হবে। চোখের জলে চেলির সাম্‌নেটা ভিজে উঠ্‌লো। মা কাছে এলেন—চোখে জল, মুখে হাসি। গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্লুম—"আমায় কোথায় পাঠাচ্ছ, মা!"

"তোমার চিরকালের আপনার ঘরে, মা। কেঁদ না, মা আমার! আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও—তোমার হাতের নোয়া সিঁতের সিঁদুর অক্ষয় হোক্!"—মা কেঁদে ফেল্লেন।

গাড়ীতে উঠ্‌তে পা বেধে যেতে লাগ্‌লো—প্রাণটা হাহাকার ক'রে উঠ্‌লো। তবু উঠ্‌তে হ'লো।

গাড়ী চল্লো আমায় নিয়ে—আমার সকল থেকে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে গাড়ী চল্লো। ঐ সেই ষষ্ঠীতলা—ঐ না সরলা ব'সে রয়েছে? ঐ যে বাবাঠাকুরতলা—সেই বড় বটগাছটা! পাখীগুলো সেই রকম ক'রে ডাকবে, রাঙা রাঙা বটফলগুলো টুপ্‌টাপ ক'রে ঝ'রে পড়বে, গোলাপী মেনী সাবিত্রী শঙ্করী সরস্বতী সকলে কুড়োবে, থাকবো না শুধু আমি! আমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে বটগাছটার কষ্ট হ'বে না কি? প্রাণের মধ্যে হু হু ক'রে উঠ্‌লো—চোখে বান ডাক্‌লো! আমার অন্তরটাকে কে যেন মুচ্‌ড়ে ধরলে—সেটা টন্ টন্ ক'রে উঠ্‌লো, আর আমি দারুণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লুম—"মা গো!"

পাশে প্রশান্তআকৃতি যোগীবর—নিষ্প্রাণ পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্থির, নিস্পন্দ। এমন দৃশ্যে তিনি অভ্যস্ত। আরও

একবার এই রকম ক'রেই একটা ছোট্ট মেয়েকে তিনি ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন ; কাজেই আমার কান্না তাঁর চিত্তের প্রশান্তিকে কোন রকমেই টলাতে পারলে না।

অনেকক্ষণ পরে কি ভেবে তিনি বল্লেন—"ছিঃ! ছেলেমানুষের মতন কাঁদে ?"

"ছেলেমানুষের মতন"—আমি ওঁর চোখে ছেলেমানুষ নই। তের বৎসর তো বার্দ্ধক্য! হায় হায়—

৩

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না—সহসা চম্‌কে উঠ্‌লুম। ও কি ?—ও কি ? ও কার আর্ত্তস্বর দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলছে ?—"আমার ঘরের লক্ষ্মীকে বিদেয় দিয়ে, কাকে—কোন্ হতভাগীকে ঘরে নিয়ে এলিরে, গুণেশ ? মালতী আমার, আর মা—এসে দেখ্ কে তোর আপনার সব পর ক'রে দিচ্ছে !"

বুঝলুম শাশুড়ী কাঁদ্‌ছেন—কিন্তু কেন ? হতভাগী কে—আমি ? আমার অপরাধ ? তোমরা আমায় নিয়ে এসেছ, যেচে তো আসিনি আমি তোমাদের সংসারে অশান্তির ঝঞ্ঝা তুলতে! আবার চোখে বান ডাক্‌লো—দুধেআল্‌তায় দাঁড়িয়ে চারিদিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল ক'রে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। বাহবা রে বিয়ে! এ যে মিলনের ষাঁড়াষাঁড়ির বান—এ তো সৃষ্টি নয়, এ যে ধ্বংস! সব ভেসে যাক্ এই বানে,—সব চূর্ণ হোক্, ধ্বংস হোক্! আর সবার আগে এই অভাগীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাও, দয়াময়!

পাড়া-সম্পর্কে এক পিস্‌শাশুড়ী এসে আমার রক্ষা করলেন। আমার হাত ধ'রে উপরে একখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন—"বস বউমা' এই তোমার ঘর।" যেন কার চাপাহাসির শব্দ আমার কানে গেল—হাসে কে ? দেখ্‌লুম স্বামীর মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গিয়েছে।

আমার শ্বশুরঘর আরম্ভ হ'লো। কারণে অকারণে নিত্যনৈমিত্তিক পেষণের মধ্য দিয়ে আমার দুর্ব্বহ জীবনটাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে যেতে লাগ্‌লুম। কখনো দুমুঠো পাই, কখনো মাথায় একটু তেল পড়ে কখনো পড়ে না, কখনো একটু ঘুমুতে পাই কখনো বা বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহিত করতে হয়। স্বামী আমার মাতৃভক্ত—মুখে কথাটি ফোটে না। মায়ের প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য আছে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর তো কোন কর্ত্তব্য নেই! স্ত্রী ? সে তো আমৃত্যু ক্রীতদাসী—যেমন রাখ্‌বে তাকে তেমনি সে থাক্‌তে বাধ্য, যা খেতে দেবে তাই তাকে খেতে হবে, যা পরতে দেবে তাই তাকে বিনাআপত্তিতে পরতে হবে, খেতে-পরতে না দিলেই বা কি হয় ? সে তবু ক্রীতদাসী—হুকুম তামিল করা, মন যোগানই তার কাজ! হায় দুর্ভাগ্য নারীজাতি!

একদিন একটা বড়ই দুষ্কার্য্য ক'রে ফেলেছিলুম। আগের দিন সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নি, মশারির অভাবে মশায় ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছিল। দুপুরবেলা খাটের উপর শুয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ একটা কর্কশ ঝন্‌ঝনে আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়ে আমি একেবারে উঠে বস্‌লুম। শুনলুম শাশুড়ী বলছেন—"নেমে শোও, নেমে শোও—ও তোমার বাবার খাট নয়। আক্কেল দেখ একবার! মেঝেতে কাপড় বিছিয়ে শো—যেমন নচ্ছার মিন্‌সে, তার তেমনি নচ্ছার মেয়ে। বাবার ঘরে খাট বুঝি দুশো-পাঁচশো আছে ?"

কখন তিনি চ'লে গেছেন জানি না। চোখ মেলে দেখি,—আমি মেঝেতেই প'ড়ে আছি, আর আমার কপাল কেটে খানিকটা রক্ত প'ড়ে জমাট বেঁধে গেছে! বড় অভিমানে, যেমন ছিলুম অমনি শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। দয়াময়, শেষ কর—এই দুঃসহ জীবনের ভার আর যে বইতে পারিনে প্রভু—এ দারুণ অন্তর্দ্দাহের অবসান কর, দেবতা!

স্বামী অফিস থেকে ফিরে এলেন। আমাকে সেই অবস্থায় প'ড়ে থাক্‌তে দেখে বোধ হয় একটু করুণার সঞ্চার হোলো। আমার কাছে এসে ব'সে, আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বল্লেন—"কাঁদছ কেন, মালতী ?"

আমি কোন উত্তর দিলুম না। আমার মুখখানা তিনি হাতে ক'রে তুলে ধর্‌লেন, খানিকটা রক্ত হাতে লাগ্‌লো,

তা'তেও কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বামী আমার বিচলিত হ'লেন না। বল্লেন—"কি করবে বল' ? চুপ্ ক'রে থাক—সহ্য কর। মা আর ক'দিন ? তারপর তোমার সুখের অবধি থাকবে না।"

মুখের দিকে চাইতেও আমার ঘৃণাবোধ হ'তে লাগ্‌লো—এ লোকটা মানুষ না পশু ? এ কি বিবেচনা-শক্তিযুক্ত রক্তমাংসের জীব, না বিবেকহীন উন্মাদ ?

"শুভেশ !"

"যাই মা—" ব'লে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে চ'লে গেলেন, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। সহস্র প্রকার উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে প্রায় ছয়মাস অতীত হ'য়ে গেল।

এইবার আর একটা বিকট পরিবর্ত্তনের পালা এসে উপস্থিত হ'লো। বাবা আমার সব-আগে দেখেছিলেন 'টাকা'। সেইদিকে নজর রাখতে গিয়ে আসল জিনিষটার মধ্যে যে গলদটুকু তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল মেদবৃদ্ধি-হেতু তাঁর মনোনীত রাজপুত্রের যে হৃদ্‌রোগের সৃষ্টি হ'য়েছে, এবং তার মাথাটাও যে ততটা প্রকৃতিস্থ নয়, তা তিনি জানতে পারেন নি—জানবার চেষ্টাও করেন নি। তার সঙ্গে মস্তিকে জলসঞ্চয় হওয়ায় কঠিন ব্যাধির সূচনা হ'লো। কয়েক সপ্তাহ শয্যাশায়ী থাকার পর হঠাৎ একদিন আমার উপর চরম অনুগ্রহ দেখিয়ে তিনি ইহলোক হ'তে বিদায়-গ্রহণ করলেন। আমার হাতের নোয়া খুলে ফেলতে হ'ল—সিঁতের সিঁদুর মুছে ফেলতে হ'ল।

দিনের চাকা ঠিক্ ঘোরে। দিনের পর রাত্রি আসে, আবার দিন হয়। আমারও দিনগুলোর চাকা ঘুরেই চল্লো। আগে একটা দাবী ছিল, দশজনের একজন ব'লে পরিচিত হ'বার অধিকার ছিল। এখন আর আমার সে অধিকার নেই। এখন আমি দাসীরও অধম—খাটতে পারি তো দুমুঠো পাব, না পারি তো পাব না।

আমি এখন এ সংসারের একটা অভিশাপ! শুধু এ সংসারের কেন ?—এই সমাজের, এই জগতের। একদিনের একটা ঘটনা কাঁটার মত আমার হৃদয়ের মধ্যে ফুটে রয়েছে—যখনই সেই কাঁটায় ঘা লাগে তখনি সেখান থেকে রক্ত ঝরে! আমার এক ননদের বিয়ে। সকলেই আনন্দে মত্ত—শুধু আমাকেই ঘর থেকে বেরুতে নিষেধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। শুভকার্য্যে আমার দৃষ্টি নাকি সদ্যোজাত গণেশের মস্তকের উপর শনির দৃষ্টির মত কাজ করবে। আমার আনন্দে যোগ দিতে নেই, হাসির ভাগ নিতে নেই, আলোর চেয়ে দেখতে নেই। ভীরু সমাজ! লাঞ্ছিতাকে তোমার এত ভয় ? হবে না ভয় ? এই যে বালবিধবা—এও একদিন বুকভরা আশা নিয়ে তোমার দ্বারে অতিথি হ'য়ে এসেছিল, তোমার হাতে অকম্পিত বিশ্বস্তচিত্তে তার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছিল। যখন অকালে তার আশার ফুলটি বৃন্তচ্যুত হ'ল, তা'র সব ফুরুল—এই বিপুল বিশ্বের আনন্দসমারোহ যখন তার সম্মুখে অস্পৃষ্ট সুধাপাত্রের মত অনাস্বাদিত র'য়ে গেল—তখন তুমি তার হাত-পা বেঁধে তাকে একটা অন্ধকার কারাকূপে নিক্ষেপ করলে! আজীবন তাকে সেইখানে থাকতে হবে, পচতে হবে! অপমানিত লাঞ্ছিত প্রতারিত নারীত্ব, ক্ষুব্ধ পদাহত প্রপীড়িত মাতৃত্ব দারুণ হাহাকারে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত কর্চ্চে—কোন্ লজ্জায়, কোন্ সাহসে তুমি তার অশ্রুকাতর দীন চক্ষুর সম্মুখে শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করবে ? তাই তাকে চোখ-রাঙিয়ে শাসিয়ে রাখ,—তাই তার চক্ষে সাতপুরু কাপড় জড়িয়ে দিয়ে তাকে দূরে রেখে দিতে চাও। হায় তোমার মূঢ়তার কি অন্ত নাই ? তোমার একদেশদর্শিতার, তোমার অবিচার-অত্যাচারের কি শেষ নাই—বিচারক অন্ধ-মূক-বধির, না সুপ্ত ?

উৎপীড়নে, অনাহারে, অনিদ্রায় আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়লুম। শরীর আমার ভাঙছিল—এখন একেবারে ভেঙে পড়লো।

একদিন ঘরের মেঝে ধরছি, এমন সময় আমার এক জা' এসে বল্লেন—"বড়দি, একটা কথা বলবো ?"

"কি, ভাই ?"

"রোজই বলবো বলবো মনে করি—বলতে পারি না। আজ তাই একেবারেই ব'লে ফেল্লুম। কি আশায় আর এখানে প'ড়ে আছ বোন্ ? তোমার বাপ-ভাই আছেন, তাঁদের চিঠি লিখে তুমি স'রে যাও। এখানে থাকলে তুমি মারা যাবে। আমার উপদেশ শোন—অন্যথা

কোরো না। আমি চল্লুম—শুনলে আর আমায় আস্ত রাখ্‌বে না। পেটভাতা ঝী সরিয়ে দিচ্চি জানলে আমায় জ্যান্ত পুতে ফেল্‌বে!" তিনি চ'লে গেলেন।

ভাব্‌তে লাগ্‌লুম—"তাই তো! কি আনায় আছি? এর চেয়ে যে ভিক্ষা ভাল। অহোরাত্র তিক্ত ভর্ৎসনা, তীব্র কটূক্তি, মর্ম্মন্তুদ নিপীড়ন। এ জীবনভার বাস্তবিকই দুর্ব্বহ। 'পেটভাতা ঝী'? সত্যই তো তা ছাড়া আমি আর কি? ঝীয়েরও একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে—আমার তা কোথায়? আমার জীবন তো এই পরিবার-ভুক্ত ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিটির পর্য্যন্ত পরিচর্য্যায় নিয়োজিত! আমার ব্যক্তিত্ব কই?"

বাবাকে চিঠি লিখ্‌লুম। আমার সেই জা' অনুগ্রহ ক'রে তা পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করলেন। আমি চ'লে এলুম!

লোকে বল্লে—"আমার কপাল পুড়েছে।" কখন পুড়্‌লো—কি রকমে পুড়লো সেইটুকুই আমি শুধু বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। অর্থলোলুপ পিতার ইচ্ছায় নিজের অজ্ঞাত-সারে এক পঙ্কিল জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হ'য়েছিলুম—জলের চেয়ে তাতে পাঁক বেশী।

এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে ভগবান্!—এ কি আমার সেই পরিচিত জগৎ, যেখানে হাসির বন্যা ব'য়ে যেত, রাশি-রাশি সদ্যফোটা ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াত, আলোর সমুদ্রে সংখ্যাতীত তরঙ্গ উঠ্‌তো? এ কি সেই সংসার, যেখানে আমার মুখের দিকে চাইলেই লোকের চক্ষুতে আনন্দের রশ্মি ফুটে উঠ্‌তো, যেখানে আমার চপলতা শোভন বই অশোভন ব'লে কখনও মনে হ'ত না, যেখানে আমার গরিমাময় রূপ—সবিস্ময় প্রশংসার কারণ ভিন্ন সবিষাদ তিরস্কারের হেতু ব'লে কখনও বিবেচিত হ'ত না?

সকলে আমার দিকে চেয়ে থাকে—সে দৃষ্টি কি স্নিগ্ধ, কি করুণ, কি অনুকম্পাময়! পাড়ার মেয়েরা আঙুল দিয়ে আমায় পরস্পরকে দেখায়, মাঝে মাঝে কানে আসে 'আহা!' মুখের দিকে চাইলে মায়ের চক্ষু জলে ভ'রে আসে, বাবা মুখ ফিরিয়ে নেন, দাদারা চোখ নীচু করেন। গোলাপী আসে—পাসে ব'সে দু'একটা কথা অতি সঙ্কোচের সহিত বলে, তারপর কিছুক্ষণ চুপ্ ক'রে ব'সে আমায় অন্যমনস্ক দেখে চ'লে যায়। পাড়ার গিন্নীরা বলেন—"আহা, কোন লক্ষণ নেই তো, এমনটা হোলো কেন? কি কপালই ক'রে এসেছিল ছুঁড়ি!"

সব সহ্য হয়—এই অনুকম্পা অসহ্য। সংসারের উপর সকলের দাবী আছে, তার সুখদুঃখের অংশভাগী হবার অধিকার সকলের আছে,—কোন্ অপরাধে, কার অপরাধে, কেবল আমি তা হ'তে বঞ্চিত? বিশাল বিশ্বে সুধা-সমুদ্রের ঢেউ ব'য়ে যাচ্চে, আর আমি দূরে দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌ছি—দেখ্‌বো; আস্বাদ গ্রহণ করা দূরে থাক্ তা'কে স্পর্শ কর্‌বারও আমারও অধিকার নেই! হাসির রাজ্যে আমি হাহাকারের মত গিয়ে পড়ি, আলোর সমুদ্রে আমি অন্ধকারের বান ডাকাই, সৃষ্টির সঙ্গীতের মাঝখানে আমি প্রলয়-কল্লোলের সূচনা করি। এ দুর্ব্বহ জীবনভার আর কতদিন বইতে হবে নারায়ণ!

পিছনে চেয়ে দেখি—দূরে একটা হাসির রাজ্য। সেখানে কেবল হাসি,—আকাশে হাসি, বাতাসে হাসি, ফুলবাগানে হাসির মেলা। সেখানকার অধিবাসীরা কেবল হাসে, হাসি ছাড়া তারা আর কিছুই জানে না। কিছুদিন আগে আমিও ঐ রাজ্যের অধিবাসী ছিলুম—কি জানি কোন্ নিষ্ঠুর দেবতার অভিশাপে, কোন্ মায়াবীর ছলনায় আমি আজ ঐ অসীম সৌন্দর্য্যরাজ্য থেকে চিরনির্ব্বাসিত? তারপর একটা কুয়াসাচ্ছন্ন অস্পষ্ট ছায়াজগৎ আমার চক্ষে পড়ে। দারুণ দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে রাত্রি অতিবাহিত করার মত, ভীষণ অন্তর্যাতনার মধ্য দিয়ে আমি ঐ জগৎ অতিক্রম ক'রে এসেছি। ঐ আমার বিবাহিত জীবন—অস্পষ্ট, নিরানন্দ, কুহেলিসমাচ্ছন্ন!

সম্মুখে চেয়ে দেখি—এক উষর প্রান্তর, এক শুষ্ক মরুভূমি—জল নেই, ছায়া নেই, কেবল বালির একটা অসীম সমুদ্র, আর দূরে, অতিদূরে, দিক্‌চক্রবালে উদার আকাশ ও সেই বালুকাসমুদ্রের গাঢ় আলিঙ্গন! এইমাত্র

তো জীবনের যাত্রা আমার সুরু হ'য়েছে, মাত্র ঐটুকু পথ তো আমি অতিক্রম ক'রে এসেছি। সামনে এতবড় বিরাট মরুভূমি পার হব কি ক'রে, কতদিনে?

আগেকার মত এখনও সেই ফুলবাগানে গিয়ে বসি, ফুলও হাসে; কিন্তু সে হাসি কেমন একটু ম্লান, স্ফূর্ত্তি-বর্জ্জিত—যেন কান্নার রূপান্তর। সেখানেও যেন অনুকম্পা ছলছল-চোখে আমার পানে চেয়ে আছে!

সকলের দিন কাটে, আমারও কাটতে লাগলো। এইরকমে কয়েক বৎসর অতীত হ'য়ে গেল। অভাবটা আমার যেন ক্রমশঃ একটু একটু বেশী ব'লে বোধ হ'তে লাগলো। চারিদিকে মিলনের ছবি, মিলনের গান—আমার প্রাণের মধ্যে শুধু অতলস্পর্শ হাহাকার! মা বলেন—"মালতী, ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণ কর্।" বাবা বলেন—"মা, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর।" দাদারা বউদি'রা চুলগুলো ছোট ক'রে ছেঁটে ফেলতে পরামর্শ দেন। কিন্তু হায় এই বিলাসের কুঞ্জবনের মধ্যে যোগিনীর আসন পাতবো কেমন ক'রে—কোথায়? প্রস্ফুট যৌবনের মাদকতায় আমার প্রচ্ছন্ন অর্দ্ধসুপ্ত নারীত্ব বিহ্বল হ'য়ে পড়ে—হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ হাহাকার প্রবল হ'তে প্রবলতর হ'তে থাকে! কে যেন চীৎকার ক'রে বলতে থাকে—"সকলে যা না চেয়ে পায়, আমি তা চেয়েও পাই না; সকলের সব আছে, আমার কিছুই নেই; সকলের অস্তিত্ব না থাকলেও আছে, আমার অস্তিত্ব থেকেও নেই!"

একদিন—সেদিন পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় উঠোনে ব'সে আমি মা'র কাছে সাবিত্রীর কথা শুনছিলুম। 'সাবিত্রী মনের মত পাত্রের সন্ধানে চললেন'—এই পর্য্যন্ত শোনবার পর আমি যেন পথ হারিয়ে কোথায় চ'লে গেলুম। মা'র কথার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে আমি সাবিত্রীর সঙ্গে বনে ঢুকে পড়লুম। সাবিত্রী মনের মত রাজপুত্র বর পেলে—অল্লায়ু স্বামীর মৃত্যুতে অল্পদিনের মধ্যেই সাবিত্রী বিধবা হোলো। আমার সঙ্গে মেলে সব—গরমিল হয় শুধু এক জায়গায়। সাবিত্রী ইচ্ছামত স্বামী পছন্দ ক'রে নিয়েছিল, রূপে গুণে সমান স্বামী তার তদ্গতপ্রাণ ছিল—আর আমার? হ্যাঁ, বৈধব্য তারও বটে আমারও বটে—সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে যমালয়ের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়েছিল। না যাবে কেন? তেমন স্বামী হারিয়ে নারী কি নিয়ে পৃথিবীতে থাকবে? তাকে জোর ক'রে বিধবার আচার পালন করাবার দরকারও হয় না, অবসরও আসে না। আর আমার বৈধব্য? কবে সধবা হ'লুম জানি না—পরের ইচ্ছায় কাকে বরণ করলুম জানি না—আজ তার মৃত্যুতে শোক করবার জন্য বাধ্য হ'য়ে আমাকে ব্রহ্মচারিণী সাজতে হবে। পরকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমার এই তুষানলের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। তিলে তিলে আমায় দগ্ধ হ'তে হবে, সাপের মুখে ব্যাঙের মত একটু একটু ক'রে আমাকে মৃত্যুর কবলে প্রবেশ করতে হবে—এই নাকি শাস্ত্রের বিধান—এই নাকি দেশাচার!

সহসা দরজার কাছ থেকে কে ডাকল—"খুড়ীমা!"

মা চমকে উঠলেন—"কে।"

উত্তর হোলো—"আমি ধীরেশ।"

একজন সুবেশ যুবা এগিয়ে এসে মাকে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা করল—"কেমন আছেন খুড়ীমা?"

"আর বাবা—থাকাথাকি আর কিসের? এখন যেতে পারলেই হয়। তা কবে এলি? তোরা সকলেই—এসেছিস, না তুই একা? সব খবর ভাল?"

"হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে সকলে ভাল আছি। আমরা সকলেই এসেছি। বিদেশে আত্মীয়স্বজন ছেড়ে থাকা কি কষ্ট খুড়ীমা?"

মা একটু চুপ্ ক'রে থেকে বল্লেন—"বিয়ে-থা' করেছিস্?"

"বিয়ে? না—এখনও করিনি। আমার নিজের জন্যেই তা হয়নি।"

"করবি না?"

"কি জানি? বোধ হয় না।" এই সময় আমার দিকে চোখ পড়াতে জিজ্ঞাসা করল—"ও কে?"

"ও মালতী—চিন্তে পারলি না ধীরেশ? মালতী ধীরেশকে প্রণাম কর্।"

ধীরেশ বাবার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর ছেলে। আমার চেয়ে বছর ছয়-সাতের বড়। আমি পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে

নমস্কার করলুম ; পায়ের ধুলো নিতে গেলেই সে পিছিয়ে গিয়ে ব'ল্লে' "থাক্ হ'য়েছে।...অনেকদিন এখানে ছিলুম না —কতদিন হবে? বছরদশেক বোধ হয়। এসেই মনে হোলো আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে আসি।"

"কি কচ্ছিস্ এখন?"

"এম্-এ পাশ ক'রে একটা কলেজে প্রফেসারি কচ্ছি। ইচ্ছা আছে ল-টা দেব। ভাল কথা—মালতীর বিয়ে হ'য়েছে?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বল্লেন—"তা হবে না? মালতীর বিয়েও হ'য়েছে, আবার দুঃখিনী মা আমার—"

বাধা দিয়ে সে ব'লে উঠ্লো—"থাক্—বুঝেছি।"

এই সময়, কেন জানি না, আমি তার মুখের দিকে চাইলুম। কি দেখ্লুম? সমবেদনায় ভরা দুটি গভীর কাল চোখ আমার মুখের উপর সংলগ্ন হ'য়ে আছে!

চাঁদের আলো যেন আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা পুলক-শিহরণ জেগে উঠ্লো—এই তো আমার সেই কল্পনার রাজপুত্র! এ চোখে তো কখনও ধীরেশকে দেখিনি—আজ কার চোখ দিয়ে দেখলুম?

চোখ অনেকক্ষণ নীচু হ'য়ে গিয়েছিল; আবার যখন চেয়ে দেখলুম, তখন সে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মা বল্লেন—"এতদিন কোথায় ছিলি ধীরেশ? আর কিছুদিন আগে এসে আমার চোখের সাম্‌নে দাঁড়ালিনি কেন বাবা?"

"তা হ'লে কি হোতো খুড়ীমা? আমার বাবা যে গরীব ছিলেন!"

বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠ্লো। মনে পড়্লো সে দিনের কথা, যেদিন মনে মনে প্রশ্ন করেছিলুম—"আমি কি চাই?" গরীব? তুমি যদি গরীব, তবে ধনবান্ কে? আমার চক্ষে তুমি যে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য যে তোমার পদনখের কাছে নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়! মনে পড়্লো আর একদিনের কথা। সে দিনও এম্‌নি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নীল আকাশের তলে এই স্থানেই একবার দৃষ্টি-বিনিময় হ'য়েছিল—সেই একদিন, আর এই একদিন!

"তা হ'লে এখন আসি, খুড়ীমা!"

"এখুনি যাবি?"

"হাঁ, খুড়ীমা। রাত্তির হ'য়ে যাচ্চে—অনেকদূর যেতে হবে।"

"তবে আয়। মাঝে মাঝে আসিস্, বাবা। তোর সঙ্গে দুটো কথা কইলেও প্রাণে শান্তি পাব।"

প্রণাম ক'রে সে চ'লে গেল। দু'জনেই আমরা চুপ ক'রে রইলুম; তবে চিন্তাটা বোধ হয় দু'জনের অভিন্ন ছিল। কিছুক্ষণ পরে চেয়ে দেখি মা কখন উঠে গেছেন, আমি একা। প্রাণের মধ্যে যাকিছু ছিল সব জ'মে হিম, কঠিন, অসাড় হ'য়ে গিয়েছিল,—জানি না সহসা কোন্ শুভবসন্ত-সমাগমে সে কঠিনতা দূর হোলো—সে অসাড় অবসন্ন ভাবের অবসান হোলো। হৃদয়ের মধ্যে কেমন একটা উষ্ণতা অনুভূত হ'তে লাগ্‌লো—সে উষ্ণতা বড় মধুর, বড় মনোরম—তাতে যন্ত্রণা নেই, দাহ নেই।

সুনীল আকাশ রূপালি রাগে রঞ্জিত ক'রে চাঁদ হাস্‌ছে। চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে কত রাত্রি হ'য়ে গেল, কিন্তু আমার চাঁদ-দেখা আর শেষ হোলো না। চাঁদের বুকে আমি আর একখানা মুখের ছবি দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম। আহা, ঐ যে শুভ্র ললাট, সুঠাম, সুন্দর—ওর তুলনা কোথায়? ওযে ঐশ্বর্য্যের সিংহাসন, ঔদার্য্যের লীলাভূমি, গরিমার পদ্মাসন! ঐ যে নয়ন আয়ত, আকর্ণ বিশ্রান্ত, কৃষ্ণপক্ষ্মরাজিশোভিত—স্থির, প্রশান্ত, ভাস্বর—ওযে প্রতিভার জন্মভূমি, প্রমোদের সুখকুঞ্জ, প্রেমের প্রস্রবণ!

তুলসীতলায় লুটিয়ে প'ড়ে বল্লুম—"নারায়ণ, নারায়ণ! এ কি করলে ভগবান্? প্রাণের মধ্যে এমন করে কেন? কেন এ তরঙ্গ তুললে প্রভু? তোমার বিশ্বদর্শী শীতল দৃষ্টির ছায়াতলে এ কোন্ অপূর্ব্ব রহস্যময় মিলনের অভিনয় সম্পাদিত হোলো একমুহূর্ত্তে আমার যথাসর্ব্বস্ব কার চরণতলে ঢেলে দিতে আদেশ করলে প্রভু? আর তুমি—কে তুমি ঐন্দ্রজালিক, তোমার কোমল স্বরের যাদুদণ্ডস্পর্শে আমার হৃদয়ের নিভৃততম কক্ষের দ্বার উদার-উন্মুক্ত হ'য়ে গেল, তোমার কনক-চরণ-ক্ষেপে আমার অন্তরের অর্দ্ধশুষ্ক লতা-কিশলয় আবার সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্লো, তোমার সহানুভূতিপূর্ণ কথার ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়বীণার মৌন মলিন তারগুলো সানে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠলো! এলে যদি,

তবে এমন অসময়ে এলে কেন দেবতা? একদিন ছিল—সেদিন জন্মের মত চ'লে গেছে—যেদিন পাখীর মত মুক্ত-পক্ষে ঐ সুনীল অম্বরতলে উড়ে বেড়াতে পারতুম—ইচ্ছা ছিল, শক্তি ছিল। আজ পাখা গুটিয়ে নীচে ব'সে আকাশের দিকে করুণদৃষ্টিতে চেয়ে আছি—পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত পঙ্গু, শক্তিহীন আমি—আজ আমাকে ও সপ্তমস্বর্গের সীমা দেখিয়ে লুব্ধ করতে এলে কেন প্রভু? আজ আমার বক্ষে প্রলয়ের ঝঞ্ঝা, চক্ষে অশ্রুর প্রস্রবণ, আর সেই প্রস্রবণের প্রত্যেক জলকণার সঙ্গে তোমার স্মৃতির চূর্ণ-রেণু জড়িত। এইতো চ'লে গেলে তুমি—তবু যেন মনে হ'চ্চে কত যুগ-যুগান্তরের অদর্শনে পীড়িত, কাতর, বুভুক্ষু হৃদয় আমার! তুমি অর্দ্ধবিস্মৃত পরিচয়ের ধ্বংসাবশেষ হ'য়েও আমার নিকট চিরপরিচিত, অযাচিত অতিথি হ'য়েও আমার চিরবাঞ্ছিত, আমার অন্তরের বাইরে চিরকাল বাস ক'রেও তুমি আমার চিত-সঞ্চিত! তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার, হে আমার তন্দ্রাপীড়িত আঁখিপাতের শান্তিময় নিদ্রাবেশ, আমার কল্পনাকুঞ্জের পিকবর, আমার সুষুপ্তির সুখজাগরণ—স্বামী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার!"

"মালতী!"

"মা!"

"কাঁদ্‌ছিস্?"

"না, মা—কাঁদ্‌বো কেন?"

শ্রীভূধরনাথ মুখোপাধ্যায়

কাজলী

শ্রীমতী উমা দেবী

১৯

কাজলের বোর্ডিং-এর জীবন সুরু হোল,—তার এক-ঘেয়ে জীবনের মধ্যে ভারী একটা নূতনত্ব এল!—যদিও সমবয়সী কারো সঙ্গে ও মিশ্‌তে পারেনা,—কেউ বলে অহঙ্কারী, কেউ বলে খেয়ালী, কেউবা বলে ভাবুক,—তবু ছোট মেয়েরা ওকে ভারী ভালবাসে! ওকে কাজলদি ব'লে যখন জড়িয়ে ধরে কেউ—ও তাকে আদর ক'রে গল্প ব'লে ছোট্ট বোনের মত স্নেহ করতে চায়! তাদেরি মধ্যে রাণুর সঙ্গে ওর ভারী ভাব হোল। সে এত ছেলেমানুষ, এত কচি যে, কাজলের সাথীহারা মন ওর মধুর সঙ্গটি ভারী উপভোগ করে। সে গলা জড়িয়ে বলে, "কাজলদি গল্প বল"—কাজল তাকে ছেলেমানুষের মত বাঘের গল্প শোনায়। কখনো ওরা দুজনে খেলা করে, নয় ত গান করে, নয় ত চুপচাপ ব'সে থাকে! রাণু যে বড় বড় কথা জানে না—ওর ভেতরে এতটুকু কৃত্রিমতা যে এখনও ঢোকেনি এইটেই কাজলের ভাল লাগে।

মেঘনাদ আর তাঁর দিদি বালীগঞ্জের অতবড় বাড়ীর এককোণে আশ্রয় নিলেন। মেঘনাদের দিন কাট্‌তো নিজের আফিসের কাজে, পড়াশুনোয়, নয় তো বিজলীর বাড়ীতে নতুন ছোট্ট নাতীটিকে আদর ক'রে।

আর তাঁর দিদির দিন কাটে, মেঘনাদের অবিবেচনায় রাগ ক'রে, শূন্য বাড়ীতে কাজলের জন্যে চোখের জল ফেলে, আর জপতপ পুজোঅর্চ্চনা নিয়ে।

ছুটিতে কাজল মাঝে মাঝে বাড়ীতে এসে বিজলীর খোকাকে আনিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে আদর ক'রে অস্থির ক'রে তোলে—নয় ত নীরবে বাপের কাছে ব'সে থাকে!—কখনো যদি বলেছে, "বাবা তোমায় যদি কষ্ট হয়—আমি চ'লে আসি"—তিনি ব্যস্ত হোয়ে বলেছেন, "না মা, তোর কষ্ট হোলেই আসিস্—আমার নিজের কোনো কষ্টই গায়ে লাগে না।"

কাজলের পরীক্ষা এসে পড়েছে, এখন তাই ঘন ঘন বাড়ী আস্‌তে পারে না। এমন সময়, এল তার বহুদিনের পুরনো বন্ধু প্রদীপের বোন মালবীর এক চিঠি। সে লিখেছে—

কাজল ভাই,

অনেকদিন তোকে চিঠি লেখা হ'য়ে ওঠেনি, রাগ করিসনে! তুই বোধ হয় জানিস, দাদা বেনারসে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গেছে বাবাকে খুসী করবার জন্যে—আর নিজেকে খুসী করবার জন্যে দেদার কবিতা লিখ্‌ছে। যাবার আগে তার বিশেষ অনুরোধে আমি এই চিঠি তোকে লিখ্‌ছি। সে তোকে ভালবাসে—কত যে ভালবাসে তা মুখে বলা যায় না কাজল—সে তোর জন্যে পাগল! তুই কি তার ভালবাসা গ্রহণ করবি নে কাজল? যদি করিস্ আমায় চুপিচুপি লিখিস ভাই, আমি সব ব্যবস্থা করব। উত্তরের আশায় রইলাম।

তোর মালবী।

চিঠিখানি কাজল অনেকবার পড়লে। নিজের মনের নিভৃত প্রদেশ খুঁজেও প্রদীপের ভালবাসা গ্রহণ করবার কোনো বাসনা খুঁজে পেলেনা—ভাব্‌তে লাগ্‌লো। রাণু এসে বল্‌লে "কি ভাবছ কাজল দি?—"

"কি ভাব্‌ছি জানিস্? যা ইচ্ছে করে না তা কি করা উচিত?—"

"ক্‌কখনো না; আমি আজ অঙ্ক করিনি—"

"তার জন্যে যদি বকুনি খাস্, সবাই মন্দ বলে?—"

"তা হ'লে ইংরিজী পড়া ভাল ক'রে করব—হেমাদি বকতে পাবে না।"

ঠিক বলেছিস্—একটা কাজ যদি ইচ্ছে না করে—সেটা ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা কাজ ভাল ক'রে করব—।"

কাজলী মালবীকে উত্তর লিখে দিলে—

ভাই মালবী,

আমার রূঢ়তার অপরাধ ক্ষমা কোর'। তোমার দাদার ভালবাসা গ্রহণ করবার শক্তিও নেই, সময়ও নেই,—উপস্থিত অন্য কাজে ব্যস্ত আছি।—

পরীক্ষার পর কাজল বাড়ী গেল না,—বাবাকে লিখ্‌লে, "এই লম্বা ছুটিতে কুঁড়েমি ক'রে কি করব? শান্তিনিকেতনে গিয়ে ছবি আঁকা ও গান শেখবার ইচ্ছে। বাবা, তোমার কি মত জানিয়ো।"

বাবা লিখলেন—

"বুড়ী, যা খুসী তাই করিস্, আমি দিদিকে নিয়ে তীর্থ-ভ্রমণে চল্লুম।"

বছর-তিনেক পরের কথা। সুবোধ হঠাৎ দিল্লীতে বদ্‌লি হোয়ে বিজলীদের নিয়ে চ'লে গেল। বিজলীর আবার সন্তানসম্ভাবনা ব'লে পিসিমাও ওদের সঙ্গে গেলেন।—কালীকিঙ্করের মৃত্যু হোয়েচে। সুবর্ণলতা ছোট-মেয়ে কুন্দকে নিয়ে কোলকাতার বাড়ীতে থাকেন, কোথাও যেতে চান না।

কাজল আই-এ পরীক্ষা শেষ ক'রে আর পড়ব না ব'লে হঠাৎ বাড়ী চ'লে এল। তার প্রধান কারণ—বড়দিনের ছুটির পর রাণু বোর্ডিং-এ ফিরে আসেনি—। কাজলী তাকে এতই ভালবেসেছিল যে, তার অভাবে কিছুতেই কোনো কাজে মন দিতে পারছিল না,—তাই ওকে শীগ্‌গির ক'রে ফিরে আসবার জন্যে চিঠি লিখ্‌লে। কিন্তু রাণুর হাতের গোটা গোটা অক্ষরে 'কাজলদি ভাই' ব'লে কোনো উত্তরই এল না; ওর মা লিখলেন "আমার রাণু তার মার কোল খালি ক'রে চিরদিনের মত চ'লে গেছে।—"

এ খবর যেমন অকস্মাৎ, তেমনি মর্ম্মান্তিক। কাজলের মন ভেঙে দিলে। সে কোনো রকমে পরীক্ষা শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে এল।

বহুদিন পরে বাপ আর মেয়ের মিলন হোল। মেঘনাদ দেখ্‌লেন কাজল হঠাৎ বড় হোয়ে গিয়েছে—ওর চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি এখন উজ্জ্বল ও প্রশান্ত হোয়ে উঠেছে। সে আর বাবার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে না,—সন্ধ্যেবেলা তাঁর কাছে ব'সে অনর্গল গল্প করে গান করে, আর বলে রাণুর কথা।—তার ছোট্ট বন্ধুটি যে তার জীবনে কতখানি স্থান পূর্ণ করেছিল একথা ব'লে ব'লেও শেষ করতে পারে না!—

মেঘনাদ এতদিনের শূন্য জীবনের পর কাজলের সঙ্গ পেয়ে ভারী খুসী হোয়ে উঠ্‌লেন। ছোট ছেলের মত ওর কাছে আবদার করেন, ঝগড়া করেন—। বলেন, "তুই আমায় এমন ক'রে মায়ায় বাঁধিস না কাজল!"

ভুবনবাবুরা বহুদিন পাশের বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেছেন,—প্রদীপের কোনো খবরই সে রাখে না। বুলটু আর যখন-তখন এসে আবদার করে না। মালবীর বিয়ে হোয়ে গিয়ে সম্প্রতি একটি খুকুও হোয়েছে খবর পেয়েছে।—

এক বাবা ছাড়া কাজলের আর দ্বিতীয় সঙ্গী নেই।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা কাজলী বাবার আফিস থেকে ফেরার অপেক্ষায় জানলায় দাঁড়িয়েছিল, বুড়ী-নাম্নী দাসী খবর দিলে, "হল-ঘরে একজন বাবু অনেকক্ষণ ব'সে আছেন।"

বাবার কোনো বন্ধু মনে ক'রে পর্দার ফাঁক দিয়ে কাজল যাকে দেখলে খুব পরিচিত মুখ হোলেও কিছুতেই মনে করতে পারলে না। ঘরে ঢুকে বললে, "একটু বসুন, বাবার আস্‌তে দেরী হবে না।" আগন্তুক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কাজল, তুমি এত বড় হোয়েচ!—"

গলার স্বর কাজলের মনে পড়লো, ভূমিষ্ঠ হোয়ে প্রণাম ক'রে বল্‌লে, "মিহিরদা, তোমায় প্রথমটা চিন্‌তে পারিনি।"

মিহির কাজলের মাথায় হাত রাখ্‌লে। কতটুকু ছিল সে—দীর্ঘ দশবছরে কত পরিবর্ত্তন,—না জানি আরো একজন কেমন আছে—কত বদ্‌লেছে!

কাজল বললে, "কেন এতদিন আসোনি? তোমার বাবা নেই, কিন্তু আমরা তো তোমায় কত ভালবাসি।"

মিহির বল্‌লে, "দেশে ফিরেছি মাস-ছয়েক হোল; জমিদারীতে ছিলুম। কোলকাতায় আর ফিরতে ইচ্ছে করে না।"

কাজল বললে, "একা ছিলে—না বিয়ে করেছ?"

"না বিয়ে আর কোথায় হোল? বাবা যে মেয়েটিকে আমার বউ ঠিক ক'রে গিয়েছিলেন, তোমার দিদির কাছে শুনেছ বোধ হয়?"

কাজল ঘাড় নাড়লে, "না।"

"তার বিয়ে হোয়ে গেছে।"

কাজল দুঃখিতস্বরে বললে, "আহা! তোমার নিশ্চয় খুব কষ্ট হোয়েছে।"

মিহির হাসলে—"কষ্ট? নিষ্কৃতি বল! কিন্তু অপরাধটা সম্পূর্ণ আমার নয়,—মেয়ের বাপ মনে করলেন হয় আমি দেশে ফিরব না, নয় ত ম'রেই গেছি। তাই সুপাত্র পেয়ে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এবার তোমাদের খবর বল শুনি।"

কাজল অপলকদৃষ্টিতে মিহিরের শান্তসুন্দর মুখের দিকে চেয়ে ছিল। ছোটবেলায় সে মিহিরদাকে বড় ভালবাসতো, আজও সেই ভালবাসা ওর বুকে অক্ষয় হোয়ে আছে তা নতুন ক'রে অনুভব করলে। বললে, "খবর আর কি? দিন কেটে যাচ্ছে। বাবা আর পড়তে দেবেন না, আমারও তাঁকে ছেড়ে থাকতে ইচ্ছে করে না।"

মিহির উৎসুক হোয়ে বললে, "আর বিজলী? সে কেমন আছে?"

"ভাল আছে। ওরা এখন দিল্লীতে। দিদির একটি খোকা আর সম্প্রতি একটি খুকু হোয়েচে!"

"সত্যি? খুব সুন্দর নিশ্চয়?"

"খুকুকে দেখিনি; খোকা তার বাবার মত হোয়েচে।"

মিহির চুপ ক'রে ভাবতে লাগল—"সেই বিজলী খোকা-খুকু সংসার নিয়ে আজো কি তাকে মনে করে?—"

কাজল বললে "মিহির দা তুমি কোথায় আছ?"

"সম্প্রতি ট্রেন থেকে নেমেই তোমাদের বাড়ী আছি,—এবার একটা আস্তানা খুঁজে নেব।"

"ছি, ছি, এখানে থাকতে পারো না বুঝি? আমরা কি এতই পর!"

মিহির ভাবলে—সেই ছোট্ট কাজল সে এত কথা শিখলো কবে? ওর মনটা একটি অতীতের মধুর ভাবনায় ভ'রে গেল—দুইচোখে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো।

"কি, চুপ ক'রে রইল যে? থাকতেই হবে এখানে। বাবা আসুন, আমি বলছি। সত্যি মিহির দা, তোমায় দেখে ভারী ভাল লাগছে। মনে হ'চ্ছে আমাদের একঘেয়ে জীবনে একটা নূতনত্ব এল!"

মিহির ওর পিঠে হাত বুলিয়ে ভাবলে—কত সুন্দর হোয়েচে কাজল! ওর দিদির সৌন্দর্য্যে জ্বালা ছিল, সে জ্বালা তার হৃদয়ে যে দাহ উৎপন্ন করেছে এতকাল ধ'রে তার ক্ষত আজো মেলায়নি। কিন্তু কি স্নিগ্ধ কাজলের রূপ,—কি মধুর চাহনি, কি কোমল ব্যবহার। ইচ্ছে করে, এই সংসারের রৌদ্রে উত্তাপে তপ্ত ললাটে ওর স্নেহের পরশখানি বুলিয়ে নিতে।

মেঘনাদ এলেন। মিহিরকে পেয়ে যেন ওঁর যৌবন ফিরে এল—যেন শশাঙ্ককে কাছে পেলেন। সমস্ত সন্ধ্যা তিনি শিশুর মত উল্লাস করলেন।

"বাবা, তুমি এখানে থাকো, আমার কাছে থাকো। এ তো তোমারই ঘর।"

মিহির বললে, "কিন্তু আমি যে শীগ্‌গির আবার আমেরিকায় যাব ভাবছি।"

"আচ্ছা সে যেয়ো'খন—যতদিন না যাও এখানে থাকো।"

আত্মীয়বন্ধুহীন মিহির এ স্নেহের ডাক প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না—সম্মতি দিলে। মেঘনাদ ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, "তোমার জিনিষপত্র কই?"—পাছে বিলম্ব করলে মত বদলে যায়।

মিহির বললে, "ষ্টেশনে।"

মেঘনাদ তক্ষুণি লোক পাঠাতে ছুটলেন।

২১

কাজল সমস্ত প্রাণ দিয়ে মিহিরের সেবা করতে চায়, যেন ওর ভালবাসা দিয়ে ভক্তি দিয়ে মিহিরের সকল অভাব মোচন করবে। কিন্তু ভাবে, কেন উনি কিছু চান না—কেন ওঁর উদাসীনতা দূর হয় না, মুখে হাসি ফোটে না।

কাজল নিজের ওপর রাগ করে—নিজের অক্ষমতায় লজ্জিত হোয়ে ভাবে দিদি, থাকলে এমনটি হোত না—সে খুসী করতে পারতো।

মিহির বোঝে কাজল ওকে সুখী দেখতে চায় তবু সহজ হোতে পারেনা, হাসিমুখে সেবা গ্রহণ করে না—মাঝখানে যেন বিজলীর দীপ্ত আঁখি শাণিত ছুরিকার মত হাসির ব্যবধান তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

কাজল ভোরবেলা মিহিরের ঘরে চা দিয়ে এসে বেলা দশটায় স্নানের তাগিদ দিতে গিয়ে দেখ্‌লে অভুক্ত খাবারে পিঁপড়ে ধরেছে, ঠাণ্ডা চায়ের রং ঘোলা হোয়ে উঠেছে।—মিহির সেই কালো মোটা বইটা তখনো তন্ময় হোয়ে পড়ছে।

অভিমানে তার চোখে জল এল; "মিহিরদা, খাওনি কেন?"

"ওঃ বড় ভুল হোয়ে গেছে তো!"—মিহির বহুযত্নে সাজানো খাবারের রেকাবিটির দিকে চেয়ে রইল।

ভুল? কেন ভুল হয়?—কি এত চিন্তায় মিহির মগ্ন থাকে? কাজলের ইচ্ছে করে তার মনের ভেতরটা খুলে দেখে!

মিহির বল্‌লে, "রাগ ক'রোনা কাজল, এখুনি সব খাবার-গুলো শেষ করে ফেলছি।"

সান্ত্বনার বচনে হঠাৎ কোথা থেকে মনের মধ্যে একটা প্রবল অভিমান এসে উপস্থিত হ'ল; বল্‌লে, "না, না, তোমায় খেতে হবে না, দাও আমার হাতে।" ঝর-ঝর ক'রে চোখ দিয়ে জল ঝ'রে পড়লো। মিহির স্তব্ধ হোয়ে মুখের পানে চেয়ে রইল—একটি কথাও তার মুখে এল না।

কাজল দুঃখিত হোয়েচে মনে ক'রে অবিলম্বে স্নানের ব্যাপার সেরে মিহির খাবার ঘরে গেল। কিন্তু কাজলের আসন শূন্য! সে প্রতিদিন মিহিরকে কাছে ব'সে খাওয়ায়—নইলে এ অন্যমনস্ক মানুষটির পেট ভরবে না তা জানে।—চাকরকে প্রশ্ন ক'রে মিহির জান্‌লে—"দিদির অসুখ করেছে।"

মিহির মনে মনে ব্যস্ত হোয়ে উঠ্‌লো। অসুখ? কি অসুখ করলো আবার? খোঁজ নিতে হবে তো।

তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে গিয়ে বই খুলে বস্‌লো,—কোনো কথাই মনে রইল না। পড়তে পড়তে কোন্ এক নায়িকার ব্যথায় যখন মনটা আকুল হোয়ে উঠেছে, মনে পড়লো বিজলীর কথা। বিজলী কেমন আছে! আচ্ছা বিজলী সুন্দর, না কাজল সুন্দর? বোধ হয় বিজলীই সুন্দর!—হঠাৎ বিজলীর সমস্ত সৌন্দর্য্য ছাপিয়ে অশ্রুভরা দুটি কালো চোখ মনে পড়লো। আজ সকালে কাজল এখানে দাঁড়িয়ে কেঁদে গেছে!

সমস্ত দুপুরটা একটি মধুর আলস্যে কেটে গেল,—কাজলের খবর নেব নেব ক'রেও নেওয়া হোল না। বিকেলে যখন কাজলের বদলে লক্ষ্মীবুড়ী চা নিয়ে এল তখন ওর খেয়াল হোল; বললে, "কাজল কেমন আছে? ওকে একবার ডেকে দেবে লক্ষ্মী?"

বহুক্ষণ কেটে গেল—কাজল এল না। কাজল আসবে না মনে ক'রে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হোতে যাবে এমন সময় ঘরে ঢুক্‌লো কাজল। মিহির দেখ্‌লে আজ বিশেষ ক'রে সে সেজে এসেছে!—পরনের বাসন্তী রং-এর সাড়ী, খোপায় গোঁজা শ্বেতকরবীর গুচ্ছ এই গোধূলির আলোতে তাকে অপরূপ ক'রে তুলেছে!

অভিমানের সুরে কাজল বল্‌লে, "কেন ডেকেছ?"

মিহিরের ইচ্ছে হোল সেই ছোটবেলার মত কাজলকে বুকের কাছে টেনে নেয়;—বল্‌লে, "অসুখ করেছে?"

"সে খোঁজ তোমার দরকার কি?"

"কিছুই না—তবু আমি তোমার অতিথি, খোঁজ নিলে দেখায় ভাল।"

"ওঃ অতিথি"—কাজল উঠে যাবার চেষ্টা করলে!

"বোস না একটু কাজল, যদি ইচ্ছে করে, যদি কোনো কাজ না থাকে!"

কাজল অশ্রুনদীতে শক্ত ক'রে বাঁধ দিয়ে এসেছিল যেন ভেতরের জল বাইরে এসে না পড়ে,—কিন্তু আর বাধা মান্‌লো না—অঝোরে ঝ'রে পড়লো!

"কেন কাঁদছ কাজল? কি তোমার কষ্ট আমায় বল।"

কাজল মিহিরের কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কেঁদে উঠ্‌লো,—মাটি যখন নরম তখন সামান্ত ভরটুকুও সয় না।

"আমি কি তোমার জন্তে কিছু করতে পারিনে কাজল ?—"

কান্নায় গলার স্বর বুজে আছে তবু কাজল বল্‌লে, "সে তুমি বুঝ্‌বে না মিহিরদা ?"

মিহির কি বোঝেনি ? তবু ধরা দিতে ভয় পায় !—তার সন্ন্যাস-জীবনে দশবছর পূর্ব্বের এক বন্ধনের বেদনা আজো টন্ টন্ করে,—সেটুকু দূর করতে পারলেই সে মুক্ত হয়—তার স্বাধীন মন নিয়ে জীবনের অসমাপ্ত কাজ শেষ ক'রে ফেলে। তাই এ নতুন আহ্বানে সে সাড়া দিতে চায় না—সাড়া দেবার শক্তিও বুঝি নেই।

বহুক্ষণ কেঁদে কাজল শান্ত হোল। মিহির ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বল্‌লে, "হয় তো বুঝ্‌তে পারিনি, হয় তো পেরেছি,—কিন্তু সত্যিই আমি বুঝ্‌তে চাইনে কাজল, আমি তার যোগ্য নই।"

কাজল ভাব্‌লে মিহির তার বাগদত্তা বধূকে ভুলতে পারে নি তাই কাজলের ভালবাসা গ্রহণ করলে না। উঃ ! কি নিষ্ঠুর সংসার—কি কঠিন মানুষের মন !

২২

দিনতিনেক পরে মেঘনাদ এক টেলিগ্রাম-হাতে অস্থির হোয়ে ছুটে এলেন—"কাজল সর্ব্বনাশ হোয়েছে, দিদির খুব অসুখ !"

কাজল টেলিগ্রামটি প'ড়ে দেখলে—পিসিমার কঠিন অসুখ, সুবোধ মফঃস্বলে, বিজলী অবিলম্বে ওদের যেতে বলেছে !

কাজল জানতো মেঘনাদের হার্ট দুর্ব্বল, কোনো রকম উত্তেজনা ওঁর পক্ষে অনিষ্টকর, শান্তভাবে বললে, "দিদি একা, তাই ভয় পেয়ে গেছে বাবা। বেশ তো, আমরা আজই রওনা হব।"

মেঘনাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মিহিরকেও যেতে রাজী হোতে হোল,—তা ছাড়া তার মনের নিভৃত প্রদেশে বিজলীকে দেখবার যে একটি আকুল বাসনা দমন করা ছিল—সুযোগ পেয়ে সে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌লো।

সেই দিনই তিনজনে রওনা হোল। বড়মার জন্তে কাজলের মনে উদ্বেগের অন্ত ছিল না—কিন্তু পাছে মেঘনাদ ব্যস্ত হন, তাই শত আশ্বাসবাণী দিয়ে মা যেমন ছেলেকে ভোলায় তেমনি ক'রে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে। মেঘনাদও গাড়ীর দোলানিতে শান্ত শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়লেন।

কাজল উঠে ওধারের বেঞ্চে মিহিরের পাশে গিয়ে বস্‌লো। কামরার বাতি নেবানো ছিল—চাঁদের আলোও যথেষ্ট নয়, সেই অস্পষ্ট আলোকের নিবিড়তায় কাজলকে অপূর্ব্ব রহস্তময়ী ক'রে তুলেছিল,—মিহির দুইচোখে সবিস্ময়ে ওকে দেখছিল।

আজকাল কাজলের বেদনা মিহিরের মন স্পর্শ করে, কিন্তু তবু সে সান্ত্বনার বাণী খুঁজে পায় না। নীরবে মেঘনাদ কাজলের একটি হাত ধরলে, কাজল বাধা দিলে না। বহুক্ষণ কেটে গেল—কখন এক সময় মিহির কাজলের হাতখানি নিজের অধরে ছুঁইয়ে দিলে।

সচকিত হোয়ে কাজল হাত ছাড়িয়ে বল্‌লে, "আমি জোর ক'রে কিছুই চাইনে মিহিরদা।"

২৩

বিজলী মিহিরকে দেখে যেমন আশ্চর্য্য হোল তেমনি স্বস্তিও বোধ করলে।

মিহির দেখ্‌লে বিজলী অনেকটা মোটা হোয়ে গেছে, সে এখন সংসারভারে অবনত একটি ছোটখাটো গিন্নি,—খোকা-খুকুর মা—ওর ভেতরে দশবছর আগেকার মানসীটিকে খুঁজে পাওয়া শক্ত ?

রোগীর অবস্থা দেখে সকলেই চিন্তিত হোলেন—কাজল দুইহাতে পিসিকে জড়িয়ে বল্‌লে, "বড় মা দেখ, আমি এসেছি।"

পিসি একবার ক্ষণকালের জন্তে চোখ খুলে কাজলকে ও শিয়রে বসা মেঘনাদকে দেখলেন, তারপর আবার জ্ঞান হারালেন, কথা বলবার শক্তি রইল না।

সন্ধ্যাবেলা বিজলী মিহিরকে তার ঘরে ডাকলে;—বললে, "তুমি তো আমার ছেলে মেয়েকে দেখনি মিহির?" ঘুমন্ত খুকুকে চুমু খেয়ে বিজলী বিছানায় শুইয়ে দিলে। "কী মিষ্টি ক'রে ঘুমচ্ছে একবার দেখ মিহির!—"

মিহির শুধু বললে, "খুব সুন্দর।" আর কিছুই মনে এল না।

"ওদের যে কি ভালবাসি জানো না মিহির, সন্তান যে মায়ের কি জিনিষ সে তোমরা বুঝবে না! তোমাকে হারিয়ে মনে হোয়েছিল সংসার আমার কাছে শূন্য হোয়ে গেছে, এ জীবনে এই অনন্ত বেদনাই বুঝি সম্বল,—শান্তি যে এত সামনে ছিল তখন ভাবতেই পারিনি। তুমি আমার চোখ খুলে দিলে! তুমি দুঃখ দিয়েছিলে ব'লে—আজ সুখের গভীরতা যে কতখানি তা বুঝেছি।"

মিহির চুপ ক'রে শুনলে। এই তার সেই দশবছর আগেকার প্রিয়া! যার ব্যথাভরা মুখ মনে ক'রে সে দীর্ঘকাল অসহ্য অশান্তি ভোগ করেছে, যাকে নিজের হৃদয়ে স্বর্ণপ্রতিমার মত রেখে পূজো করেছে, সে আজ স্বামী-পুত্র-সংসার নিয়ে তাকে একেবারেই ভুলে নিশ্চিন্ত! কিন্তু তাই তো মিহির চেয়েছিল—সেদিন তার সর্বান্তঃকরণ তো এই কামনাই করেছিল!

বিজলী বললে, "থাক পুরনো কথা, ওসব এখন ন্যাকামি ব'লে বোধ হয়। কেমন বউ হোয়েচে?"

যা ছিল একদিন আবেগময় উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম, তা হোয়েচে আজ ন্যাকামি! মিহির বললে, "চমৎকার বউ।—"

"সুখী হোয়েছ?"

"খুব—"

"আমায় ভুলে যেতে পেরেছ ত?"

"চেষ্টা করেছি।—"

"কিন্তু আমার কিছুই চেষ্টা করতে হয়নি মিহির! বিয়ের পরেও তোমার চিন্তা আমায় অস্থির করতো; তারপর খোকন কোলে এল—কখন কোন্ ফাঁকে দেখলাম তোমার কথা আমার মনের কোণেও জাগে না!—এম্নি মায়ের মন!"

ঘুমন্ত মেয়েকে আবার আদর করলে, তারপর গলার স্বর নামিয়ে বিজলী বললে, "কাজলের জন্যেই আমার ভাবনা, কারো কথা শোনে না—নিজের যা খুসী তাই করে, দুটোতিনটে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিলে। প্রদীপকে মনে আছে? ভুবনকাকার ছেলে—সে তো ওর জন্যে ঘরছাড়া সন্ন্যাসী! আমি জানি কাজলও তাকে পছন্দ করত—কিন্তু বিয়ের কথা বলতেই একেবারে আগুন হ'য়ে উঠলো। বাবার আদরেই এমন হোয়েচে—"

মিহির বাধা দিয়ে বললে, "এত কথা আমায় বলছ কেন?"

"তুমি ওর দাদার মত—যদি পারো প্রদীপের সঙ্গে যাতে বিয়েটি হয় তার চেষ্টা কোর'।—"

মিহির কথার মোড় ফিরিয়ে দিলে—"চল বড়মার ঘরে যাই—কাকা অনেকক্ষণ ব'সে আছেন।"

এ ঘর থেকে ছাড়া পেলে যেন ও বাঁচে—এখানকার হাওয়া যেন ওর নিশ্বাস বন্ধ ক'রে দিয়েছে। বিজলী শান্তি পাক্ সুখে থাকুক এই তো ওর চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা,—কিন্তু যখন সে নিজের মুখে শান্তির কথা আনন্দের কথা স্বীকার করলে ওর সমস্ত মন বিরূপ হোয়ে উঠলো। মনে মনে ভাবতে লাগল, আমি মিথ্যে নিয়ে খেলেছি, ওকে আমি কোনোদিনই ভালবাসিনি—ওর ভালবাসা দেখে, দুঃখ দেখে—কেবলমাত্র মনে করুণা জেগেছিল—সেটুকুই আজো অবশিষ্ট আছে।

২৪

রাত্রিজাগরণের ভার নিলে মিহির আর কাজল। ওরা দুজনে পালা ক'রে জাগবে। মেঘনাদ অসুস্থ, বিজলীর কোলে ছোট খুকু—কেউই এ কাজের যোগ্য নয়। কাজল বরফের ব্যাগ নিয়ে অর্দ্ধরাত্রির মত প্রস্তুত হোয়ে পিসিমার মাথার কাছে বসলো। মিহির দূরে একটা বড় চেয়ারে শুয়ে ঘুমোবার ভাণ ক'রে সেবানিরতা কাজলের শান্ত মূর্ত্তিখানি দেখতে লাগলো। আজ সমস্ত প্রাণ দিয়েও কাজলের ভালবাসা গ্রহণ করতে চায়—তার এতকালের

বুভুক্ষিত অন্তরে কি এক অনাস্বাদিত মধু-র সন্ধান যেন পেয়েছে,—আজ বিজলীর কোন স্মৃতি সেখানে বাধা তুলে নেই।—

রাত্রি গভীর হোল—মিহির চোখ বুজে ভাবছিল, ঘুম আসেনি। কাজল ওকে ঘুমন্ত মনে ক'রে একটা চাদর এনে পায়ের ওপর ঢেকে দিলে; মিহির চোখ বুজে কাজলের এই নীরব সেবাটুকু অনুভব ক'রে সুখী হোল। হঠাৎ পিসিমা চোখ মেলে চাইলেন—কাজল ঝুঁকে প'ড়ে ওঁকে দেখছিল। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "কাজল!"

মিহিরের তন্দ্রা ভেঙে গিয়েছিল, সাম্‌নে এগিয়ে এল—মুখে একটু ফলের রস দিয়ে দিলে। পিসিমা আবার বল্‌লেন, "কাজল!"—এবার গলার স্বর অনেকটা পরিষ্কার।

"কি বড় মা? কিছু বল্‌বে?"

"বল্‌ব মা বল্‌ব—সেই বলার শক্তিটুকু তোরা দে আমায়।—"

"কিছুক্ষণ পরে বলো বড় মা,—একটু সাম্‌লে নাও।"

"সময় ফুরিয়ে এসেছে মা,—অপেক্ষা করলে চল্‌বে না! অশান্তি আমার তোর জন্তেই হ'চ্ছে; তুই প্রদীপকে বিয়ে করতে অমত করিস্‌নে মা, সে তোর জন্তে বাড়ী ছেড়ে মা-বাপকে ফেলে রাজদ্রোহীদের দলে মিশেছে—দু'বছর তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি—হয় তো বা জেলেই গেছে। তুই কি মনে করিস—এ অপরাধ তোর নয় কাজল?—"

অনেক কথাই কাজলের মুখে এসেছিল কিন্তু কিছুই বল্‌তে পারলে না—পিসিমাও শ্রান্ত হোয়ে চোখ বুজে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার সচেতন হোয়ে মিহিরকে কাছে ডাকলেন। "বাবা মিহির, কাজলের মা নেই—ছোটবেলা থেকে সে অবুঝ—আমরা তাকে কিছুই শেখাইনি। তুমি ওকে এ অন্যায় থেকে রক্ষে কর। প্রদীপকে খুঁজে বের ক'রে ওর হাতে কাজলকে দিও, নইলে আমার ম'রেও শান্তি নেই।—"

মিহির কাজলের মুখের দিকে চাইল।

কাজল স্থিরদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকেই চেয়ে ছিল—সে চাহনিতে মিহিরের শান্ত অন্তরে যেন কালবৈশাখীর উদ্দাম নৃত্য উঠলো—। বললে, "পিসিমা, আপনি স্থির হোন—কাজল যাতে সুখী হয় আমরা সকলেই তার চেষ্টা করব।"

পিসিমা শান্ত হোয়ে চোখ বুজলেন।

শেষরাত্রে তাঁর শ্বাসকষ্ট বাড়লো—বাড়ীর সকলেই উঠে এসে ওঁর চারিদিকে ঘিরে বসলো—সুবোধও টেলিগ্রাম পেয়ে এসে পৌঁছেছিল। ডাক্তার বাবু শঙ্কিত হোয়ে ঘরের বাইরে চ'লে গেলেন।

মিহির হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সব জানলাগুলো খুলে দেখে মৃদুস্বরে বললে, "সব শেষ!"

বিজলী ও কাজল কেঁদে উঠলো,—মেঘনাদ আকুল হোয়ে দিদির প্রাণহীন দেহ জড়িয়ে ধরলেন।

তখন ভোরের পাখী ডাকতে সুরু করেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমা দেবী

ট্যাণ্টালাস

-গল্প—

—শ্রীযুক্ত আশীষ গুপ্ত

এক ব্রাহ্মণ,—কুলীন,—গলার পৈতাটা আধ-আঙুল পুরু হইয়া উঠিয়াছে তেলচিটা পড়িয়া। সেইটা বাহির করিয়া, ডানহাত দিয়া অভিশাপ দেওয়ার ভঙ্গীতে ব্রাহ্মণ বলে, "এখনও ব্রহ্মশাপ ব'লে জিনিষ কলিযুগে আছে,—কিছু বলিনে ব'লে তাই—"

রূপকথার ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ঝগড়া করিত,—ব্রাহ্মণ হইত বোকা, নিরীহ,—ব্রাহ্মণী হইত উগ্রচণ্ডা, ঝাঁটাগাছটা হাতে থাকিত। সকালে বিকালে ঝাঁটা খাইয়া ব্রাহ্মণ বাড়ীর বাহির হইয়া যাইত,—কাতর মুখ করিয়া রাজসভায় গিয়া হাজির—বোকা ব্রাহ্মণ হয় ত কথাই বলিল না—কিন্তু সভাসদেরা প্রমাণ করিয়া দিল, এমন বুদ্ধিমান রাজ্যে আর নাই। ব্রাহ্মণ কিছু পাইল,—পিঠা খাওয়ার সরঞ্জাম জোগাড় করিয়া লইয়া আসিল ;—ব্রাহ্মণী আবার ঝাঁটাপেটা করিল,—জিনিষপত্রগুলো কিন্তু হাত হইতে গ্রহণ করিতে ভুলিল না,—সেগুলো যথাস্থানে রাখিয়া ঝাঁটাগাছটা তুলিয়া লইল, ব্রাহ্মণ আবার পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে বিলম্ব করিল না।

সেসব দিন আর নাই,—পিঠাখাওয়ার জিনিষও অনায়াসে মেলা শক্ত। —কিন্তু ঝাঁটার দাম বেশী নয় ; কমপয়সায় পাওয়া যায় বলিয়া দুইগাছা একসঙ্গে কেনা চলে,—হরিনারায়ণের হাতে থাকে একগাছা, তাহার ব্রাহ্মণীর হাতে থাকে আর একটা। লাগে ঝাঁটাযুদ্ধ,—ভীম-দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ নয়, কিন্তু তাহার তুলনায় কোন অংশে তুচ্ছও নয়। রূপকথার আমলের একতরফা লড়াই আর চলে না। তখনকার দিনে শতমুখীর মূল্য ছিল বোধ হয় অধিক—একটার বেশী কেনা চলিত না, এবং সবল পক্ষই সেটা দখল করিয়া থাকিত। আজ চলে সমানে সমানে, সবলের সহিত দুর্ব্বলের নহে,—বুনো ওল এবং বাঘা তেঁতুলে।

হরিনারায়ণ দালালী করে, বলে, "টাকার বাজার বড্ড টাইট, ব্যবসার বাজার বড্ড মন্দা—"

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "কি রকম হয়—?"

হরিনারায়ণ উত্তর করে, "কখনও মাসে হাজার, কখনও তিরিশ, কখনও কিছু নয়—" একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলে, "হাজারই বেশী—"

একটা বাড়ীতে হয় ত দশঘর ভাড়াটে থাকে,—তাহার মধ্যে থাকে হরিনারায়ণ—ভিখারীর ঝুলির রকম-বেরকমের চালের ভিতরকার মোটা নিকৃষ্টতম দানাটি।—একহাত চওড়া গামছা পরিয়া হরিনারায়ণ চৌবাচ্চা ধোয়, কাপড় কাচে,—ছেলেমেয়ে কোলে করিয়া বাজার যায়। আধহাত লম্বা একটা হার্ম্মোনিয়াম বাহির করিয়া সজোরে বেলো করিতে করিতে বীভৎস গলায় গান গায়। একদিন অন্যান্য ভাড়াটেরা প্রতিবাদ করিল,—হরিনারায়ণ ঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি কি তোদের কাছ থেকে গান গাওয়ার জন্যে বায়না নিয়েছি যে, ভালো ক'রেই গাইতে হবে?—যেমন আমার প্রাণ চায় তেমনিতরই গাইব!"

অপর ভাড়াটেদের সঙ্গে বিবাদ বাধে,—ব্রাহ্মণী ছুটাছুটি করিয়া হাতমুখ নাড়িয়া, গলার স্বর চড়ায় ও খাদে উঠাইয়া-নামাইয়া বলে, "এত বাড়ীতে থেকে এনু, কেউ আমাদের মন্দ বললে না, আর আজ কি না আমরা হ'নু ঝগ্‌ড়াটে, খাণ্ডার!—জানে আমাদের কল্‌কেত্তা সহরের লোকেরা, বলে, মাটির মানুষ,—এমন ভাড়াটে আর হবে না।"

হরিনারায়ণ ও ক্ষেমঙ্করী সে বাড়ীর পাট উঠাইয়া অন্য বাড়ীতে যায়,—সেখানে গিয়া আবার বলে, "এত বাড়ীতে থেকে এনু, লোকে বলে, মাটির মানুষ, আর আজ কি না,—হে ভগবান, হে নারায়ণ, তুমি বিচার কোরো, এখনও চন্দ্র-সূর্য্যি উঠ্‌ছে—"

ময়লা পৈতাটা বাহির করিয়া, জগৎ-সংসারকে ভস্ম করিবার ভঙ্গীতে হরিনারায়ণ বলে, "এখনও ব্রহ্মশাপ ব'লে জিনিষ কলিযুগে আছে,— কিছু বলিনে ব'লে তাই—"

প্রথম দিকের তিন কন্যার বিবাহ হইয়া গেছে,—এক জামাই সুর্‌কীর গোলায় কাজ করে, আর একজন বিড়ির দোকানে, আর একজন বায়স্কোপের দরজায় দাঁড়াইয়া সস্তাদামে সমস্ত টিকিট কিনিয়া লইয়া চড়াদামে বিক্রি করে।

—চতুর্থ-কন্যা শিবানী।

হরিনারায়ণ যখনই বাড়ী ফেরে তখনই বলে, "আমার মতন এমন বুদ্ধিমান আর নেই,—আমার মতন এমন ভালো ভালো জিনিষ রাজারাজ্‌ড়ারাও খায় না,—এমন ভালো কাপড়-চোপড় কোন নবাবেও পরে না—" বলিয়া একহাত চওড়া গামছাখানি পরিয়া লয়।

ব্রাহ্মণী মুখ ঘুরাইয়া বলে, "মরণ!—চং দেখে আর বাঁচিনে!—কলুদের ঠান্‌দি আজ বল্‌ছিল, 'বামুন ঠাক্‌রুণ, তোমার মতন বুদ্ধিমান আর দেখিনি—"

হরিনারায়ণ নাক সিঁটকাইয়া বলে, "কক্ষণ' বলেনি, মিথ্যেবাদী কোথাকার,—তাও আবার ব্যাকরণ ভুল,—পুরুষ মানুষরা হয় বুদ্ধিমান—"

হরিনারায়ণ মাইনার স্কুলে একবার দিনকয়েকের জন্য পড়িয়াছিল, বহুবর্ষ আগে,— ব্যাকরণজ্ঞান তাই টন্‌টনে!

ক্ষেমঙ্করী কহিল, "আমি পুরুষ মানুষের চাইতে কিসে কম—?"

সেদিন ব্রাহ্মণী বলিতেছিল, "নাপিতদের বৌটো বলছিল, 'মাঠাক্‌রুণ, তোমার মতন দয়ার শরীর কারও দেখিনি'—"

গামছা পরিয়া হেঁট হইয়া ঘর-ঝাঁট দিতে দিতে, কথাটা শুনিয়া হরিনারায়ণ সোজা হইয়া উঠিয়া কহিল, "কক্ষণ' বলেনি, মিথ্যেবাদী—

ক্ষেমঙ্করী কহিল, "আমায় মিথ্যেবাদী বল',—মুখে পোকা পড়্‌বে না!—"

হরিনারায়ণ ঘরঝাঁট দিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণী বলিল, "কায়েতদের মেয়েটা কাল বল্‌লে, 'বামুন পিসী, তোমার মতন এমন ঠাণ্ডা পের্‌কিতি আর কারও দেখিনি'—"

বলিয়া সে একটু থামিল, কিন্তু হরিনারায়ণ আর এবার কোন-কিছু বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল না।

হরিনারায়ণের তিন কন্যার বিবাহে, তাহাকে কিছু-কিছু খরচ করিতে হইয়াছে।—তাহারই সূত্র ধরিয়া ব্রাহ্মণী কহিল, "কায়েতদের মেয়েটা বলে, 'শিবাণীকে ইস্কুলে দাও বামুনপিসী,—মেয়ে তোমার লেখাপড়া শিখ্‌লে আর তার বিয়ের জন্যে ভাব্‌তে হবে না,—তোমাদের এমন উচ্চ বংশ'—"

হরিনারায়ণ কহিল, "যদুনারায়ণ বাঁড়ুয্যের বংশ, আদি-কুলীন, খাঁটি—"

ক্ষেমঙ্করী বলিল, "আমার বাপের বাড়ী তার চাইতে বড়,—মুখুটি—"

হরিনারায়ণ লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "মিথ্যুক—"

—শিবাণী একদিন স্কুলে গেল।

স্কুলের জীবন,—পরিষ্কার কাপড়জামা পরিয়া মেয়েরা আসে,—ছোট মেয়েরা মাথায় বেণী দোলায়, বড়রা একরূপ এলো-খোঁপা বাঁধে।—নানারকম ভঙ্গীতে পরা শাড়ী,—কেহ কুঁচাইয়া পরে, কেহ আঁচলটা কাঁধের উপর দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া ব্রূচ আঁটিয়া দেয়,—চলার ভঙ্গী বিভিন্ন, কথা বলার ধরণ আলাদা,—তবুও যেন মনে হয়, প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের একটি প্রকৃতিগত কুটুম্বিতা আছে। কাহারও পায়ে মখমলের চটি, কাহারও কাহারও নাগ্‌রা, কাহারও মাদ্রাজী স্লিপার,—শিবাণী চাহিয়া চাহিয়া দেখে। কেহ

হয় ত জুতা পায়ে দেয় না, তাহার দিকে চাহিয়া শিবাণীর মনে হয়, জুতা পরিলে ইহাকে ভালো দেখাইত না, বিনা-জুতাতেই কি চমৎকার মানাইয়াছে! যাহার পায়ে জুতা আছে, তাহাকে দেখিয়া শিবাণী মনে করে, জুতা ছাড়া ইহাকে শোভা পাইত না।—হাতে হাল্কা প্যাটার্নের চুড়ি, গলায় চেনহার ভুইবার ঘুরাইয়া গলায় দেওয়া,—কানে দুল।

শিবাণী তাহার তেল-চটচটে মাথায় নিজের হাতটা রাখে, সস্তাদামের নারিকেল তেলের দুর্গন্ধে মাথাটা ভর্ত্তি! কায়দা করিয়া চলিতে চায়,—কিন্তু কলুবাড়ীর, নাপিত-বাড়ীর কথাই মনে পড়ে

স্কুলের বাহিরে বৃহত্তর জগৎ,—তাহারই বার্ত্তা বহিয়া আনে তাহার সহপাঠিনীর দল,—দেশবিদেশের কথা, রাজনীতির কথা, বড় বড় জীবনের বিচিত্র কাহিনী। শিবাণী বিস্মিত হয়, জগৎসভায় আনন্দযজ্ঞের নিমন্ত্রণে শুধু তাহারই স্থান নাই!

লীলা তাহার বাপ-মা'র কথা বলে।—

লতিকা তাহার ভাইবোনদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।—

রেখা তাহার মামাবাড়ীর গল্প করে, বলে, "আমার মামা 'এম্-এ'তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট; মামিমা আই-এ পাশ, এত ভালো মেয়ে, তোমরা যদি দেখতে—"

সত্যবতী বলে, "আমার কাকিমা আমায় ফাউণ্টেন পেন্‌টা দিয়েছেন আমার জন্মদিনে—"

শিবাণীর মনে হয়, এ তাহারা কোথাকার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিল,—হাস্যকোলাহল মুখরিত পৃথিবী, আত্মীয় স্বজনের স্নেহে, প্রিয়জনের শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় সমুজ্জ্বল!

অতসী বলে, "ঝণ্টু আজ বলছিল, দিদি, বড় হ'লে তুমি হবে ডাক্তার, আমি হব ইঞ্জিনিয়ার; আমি একটা মস্ত বাড়ী বানাব, এম্‌নি বড় বড় দরজা, এম্‌নি বড় বড় জানালা—দরোয়ান পাহারা দেবে, অনেক পাখী পুষবো,—আর তুমি সব লোকের অসুখ সারিয়ে সারিয়ে বেড়াবে,—বেশ মজা! না?

শিবাণীর ছোট ভাইয়েরা তাহাকে বলে, "মুখে লাথি মেরে মুখ ভেঙ্গে দেব—"

শিবাণী স্কুলে যাইত, বাড়ী আসিত;—এর কাছে, ওর কাছে চাহিয়া-চিন্তিয়া খানকয়েক বই যোগাড় করিল। সন্ধ্যাবেলা পড়িতে বসিলে, চুলের মুঠি ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া মাতা বলিতেন, "উনি লেখাপড়া শিখে পাঁচটা পাশ দেবেন,—আর আমি ওঁর পিণ্ডি সেদ্ধ ক'রে ক'রে মরব—"

তাহার খাতার পাতা ছিঁড়িয়া মাতা সাও জাল দিতেন, বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া কলুদের ঠানদির কাছে পোস্ত ধার চাহিয়া পাঠাইতেন, পেন্‌সিলের ডগা দিয়া কাচ জুড়িবার আঠা ঘাঁটিতেন,—কলমের গোড়ায় ন্যাকড়া জড়াইয়া কেরোসিন তৈল ঢালিয়া মশালের মতন করিয়া জ্বালাইয়া লইয়া দেয়ালের ফাটালে ছারপোকার বাসা পোড়াইতেন।

শিবাণী ভদ্রভাবে আপত্তি করিয়া বলিত, "এগুলো অন্য মেয়ের জিনিষ মা,—আবার ফিরিয়ে দিতে হবে।"

কিন্তু উচ্চ কোলাহলের বাজারে, তাহার ভদ্রতা যে কোথায় ডুবিয়া যাইত, তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইত না। ক্ষেমঙ্করীর কোন কাজ—তা সে যতই ঘৃণিত হউক না কেন—করিতে আপত্তি ছিলনা, তাহার কাছে সভ্যতা এবং সুরুচির কোন মূল্যই ছিল না,—অতএব তাহার কাছে ভদ্রতা ছিল দুর্ব্বলতার নামান্তর মাত্র। তাহার চীৎকারের প্রত্যুত্তরে শিবাণী যদি গলা নামাইয়া সংযতভাবে কিছু বলিত, তবে সে মনে করিত, কন্যা ভয় পাইয়াছে!

শিবাণী ভয়ে ভয়ে স্কুলে যায়,—সচকিতা হরিণীর সন্ত্রস্ত দৃষ্টি তাহার মুখচোখ আশ্রয় করিয়া থাকে। সে ভাবে, 'আজ হয় ত ইহারা তাহার বাপমা'র কথা টের পাইয়াছে'! বইয়ের খোলা পাতার দিকে চোখ রাখিয়া শিবাণী ঘামিয়া ওঠে। পড়া কোনদিনই ভালো হয় না—স্কুলে বসিয়া, টিফিনের সময়, ছুটির পরে অন্য মেয়ের বই লইয়া পড়া মুখস্থ করিবার চেষ্টা করে,—কোনদিন হয়, কোনদিন হয় না।—বাড়ীতে বই লইয়া যাইতে আর সাহস করে না।

বাসে আসিতে আসিতে গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম,—বড় বড় বাড়ী চোখে পড়ে। কতলোক নিজের নিজের কাজে

চলিয়াছে; একটি মেয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রাস্তা দিয়া হাঁটিতেছে,—ছোট ছোট হাতদু'খানি জিনিষে ভর্ত্তি, এক হাতে একটা বড় জামার বাক্স, অন্যহাতে একটা মোমের পুতুল। শিবাণী মনে মনে ইহাদের জগৎটার সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করে,—কেমন করিয়া খায়, কেমন করিয়া হাঁটে, কেমন করিয়া কথা কয়,—মা তাহাদের কি বলেন, বাবা তাহাদের কি করেন, ভাইবোনেরা তাহাদের কোন্ খেলা খেলে। উহাদের পৃথিবী রূপে রসে পূর্ণ—সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কেমন করিয়া উহারা কাটায়, বড় জানিতে ইচ্ছা করে,—বড় কৌতূহল হয়।

মেয়েদের কথার মাঝখানে সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে,—মাতা তাহাদের কি বলিয়া আদর করেন, পিতা তাহাদের কেমন করিয়া সকল দুঃখ সকল অভাব হইতে আড়াল করিয়া রাখেন, ভাইবোনেরা কি সুনিবিড় প্রীতিতে তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে!—শিবাণী দুইকান ভরিয়া তাহাদের কথা শোনে,—শুনিতে শুনিতে কানদুটো জ্বালা করে,—সে না পারে উঠিয়া যাইতে, না পারে বসিয়া থাকিতে।

পরজন্মে সে উহাদেরই কাহারও ঘরে জন্মিবে,—হরিনারায়ণ সেখানে তাহার ব্রাহ্মণীর সহিত ঝগড়া করিবে না,—ক্ষেমঙ্করী বলিবে না, "তোমার চিতের আগুন রোজ-রোজ জ্বেলে তোমার পিণ্ডি আমি সেদ্ধ করতে পারব না—।"

—আঁটসাঁট করিয়া চুলবাঁধা তেল-চপ্‌চপে মাথাটা,—কানের পাশ দিয়া বাড়্‌তি তেলটুকু কাঁধের কাছে নামিয়া আসে,—শিবাণী বলে, "অত বেশী তেল দেব না, মা,—" মাতা বলেন, "ওই ত রূপের ধুচুনি, উনি আবার মেমসাহেব হবেন!—"

হরিনারায়ণের পাশের বাড়ীর মালিক তাহার দোতলার উপরে তেতলা তুলিতেছিল। গলিটার অর্দ্ধেক স্থান জুড়িয়া, বাড়ীটার গায়ে থাকে উঁচু করিয়া ইট সাজান,—এক পাশে সুরকী ও বালি ঢালা। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই, বাঁদিকআর বাহিরের ঘরে সিমেণ্টের বস্তা, চূণের স্তূপ।—হরিনারায়ণের রাত্রির নিদ্রা চিরকালই অল্প ছিল, এখন আরও কমিয়া গেল,—ব্রাহ্মণী ঘাঁটি আগ্‌লাইবার ভার লইল।

ঘরের জানালার পাশে এবং তাকের উপরে ইট সাজান দেখিয়া, সেদিন স্কুল থেকে আসিয়া শিবাণী মা'কে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ইট কোত্থেকে এল, মা?"

ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে ক্ষেমঙ্করী কহিল, "যাই হ'ক, মাথা গুঁজবার ঠাঁই একটা করতে হবে ত, তারই—"

শিবাণীর ছোট ভাই ভূতো লাফাইতে লাফাইতে ঘরে ঢুকিল, ডানহাতে একটা কাগজের ঠোঙা উঁচু করিয়া দেখাইয়া বলিল, "এটার ভেতরে কি আছে, বল্‌তে পার, মা?"

ব্রাহ্মণী কহিল, "বাতাসা বুঝি এনেছিস্‌,—কিন্তু ওরা টের পায়নি ত?"

আত্মশক্তিতে অচল বিশ্বাসের সহিত ভূতো কহিল, "হুঁ, টের অমনি পেলেই হ'ল!—ওদের বাড়ীর তাকের ওপর ছিল, আমি আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে এলুম।" বলিয়া ঠোঙার ভিতর হইতে গোটা দু'তিন বাতাসা বাহির করিয়া লইয়া মুখে দিয়া ভূতো কহিল, "একটা পয়সা দাও না, মা,—আধপয়সার দই, আর আধপয়সার বরফ নিয়ে আসি, বেশ সরবৎ হবে'খন,—ঘোলের সরবৎ খাবি দিদি?" শিবাণী মাথা নাড়িয়া জানাইল, "না"—তাহার গলার ভিতরে যেন কি একটা আটকাইয়া গেল, বুকের মধ্যে কান্না যেন আর চাপা থাকিতেছিল না।

ভূতো কহিল, "ওদের বাড়ীতে টেবিলের ওপর অনেক-সময় বেশ ভালো ভালো জিনিষ ফেলা থাকে, মা,—সেদিন দেখ্‌লুম, সোনার চশ্‌মা, সোনার চিরুণী, সোনার বোতাম!—এক এক ক'রে তোমাকে এনে দেব,—আর কিছুদিন অভ্যেস ক'রে নিই, নইলে ধ'রে ফেলবে।"

ক্ষেমঙ্করী কহিল, "সাবধানে আনিস ভূতো, আর বেশী লোভ করিসনি, মা-কালীর নাম ক'রে সব কাজ করিস্‌, কেউ তোকে কিছু বল্‌তে পার্‌বে না—"

পিতামাতার গৃহনির্ম্মাণের জন্য ইট, চুণ, সুরকীর সঞ্চয় পুরাদমে চলিতে লাগিল।—

শিবাণী সেদিন গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছিল,—মানুষের জীবন যেন জীবনান্তরে পা বাড়াইয়া চলে। শিবাণী যেন মৃত্যুর পরে আর এক জীবনের দরজায় দাঁড়াইয়া ভিতরে প্রবেশের নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। সে-জীবনশেষে আর এক জীবন—শিবাণী খুব ভালো মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছে, যেখানে দুঃখ, যেখানে ব্যথা সেখানে শিবাণী,—যাহা কিছু ভালো তাহাই করে শিবাণী। দেশের লোক ধন্য ধন্য করে, বলে ধন্য মেয়ে ধন্য দেশ!—তাহার পরের জীবন—শিবাণী এবার সর্বত্যাগিনী,—সে তাহার জগতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিল,—জীবনশেষে আর এক জীবনের দ্বারে দাঁড়াইয়া আঘাত করিতেছে,—দরজা খুলিয়া দ্বারী বলিল, স্বাগত!—তাহার সুরে স্বর মিলাইয়া বৈতালিক বলিল, তথাস্তু। শিবাণী যেন লজ্জা পায়, সবার চোখের আড়ালে নিজেকে রাখিয়া, সবার জন্য নিজের সর্বস্ব দান করিতে চায়। জীবন হইতে জীবনান্তরে যাত্রা—ইহার যেন শেষ নাই,—কত বিচিত্র ইহার লীলা, কত বিচিত্র ইহার রূপ!—নিজেকে প্রকাশ করিবার আড়ম্বর তাহার থাকিবে না,—সঙ্গীতের বাহিরের সুর, মীড়, গমকের সহিত যেন তাহার জীবনের তুলনা চলে না,—মনের ভিতরকার অখণ্ড সহানুভূতি, অবিশ্রাম আনন্দ যেন শিবাণী।

পুর্ণিমার রাত্রির চন্দ্র কি সেদিনকার স্বপ্নের কথা জানিত? সেদিনের দক্ষিণবাতাস কি তাহার মনের কামনা টের পাইল?—পাড়ার ছাদ, দু'তলা, তিনতলা, চারতলা বাড়ীর উঁচু মাথা ডিঙাইয়া, সহরের গলির দুর্গন্ধ এবং ভ্রূকুটি এড়াইয়া আসিল পুর্ণচন্দ্রের একঝলক আলো। জ্যোৎস্নাভরা কলস-কাঁখে চলিতে চলিতে আকাশবধূ তাহার অতিরিক্ত কিরণটুকু শিবাণীর মাথার কাছে ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল।—ফাল্গুনের বাতাস গলির মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করে, দরজা-জানালার ছিদ্র দিয়া ঘরের মধ্যে দুর্গজয়ীর বেশে আসিয়া শিবাণীর কানে কানে বলে, "তোমার যাত্রাপথের বাহন রহিলাম আমি,—ডাকিতে হইবে না, নিজেই আসিব।"—শিবাণী হাসে, ঘুম যখন ভাঙিবে, তখন আর হাসিবে না। ফাল্গুনের করুণ হাওয়ায়, পুর্ণিমারজনীর অরূপণ আলোয় মনের ভিতরে যে জিনিষ সত্য হইয়া উঠিল, জীবনে তাহা সত্য হয় না। কেন, তাহা কে জানে!—

নিটোল চন্দ্রের উদার আলো সাক্ষী হইয়াছিল, বসন্তের হাওয়া মাতামাতি করিতেছিল,—ব্রাহ্মণ চারখানা থান্-ইট বহিয়া আনিয়া ব্রাহ্মণীর হাতে দিয়া বলিল, "আমার হাত ব্যথা হ'য়ে গেছে, আমি আর পারব না।"—ব্রাহ্মণী গেল ইট বহিতে, আঁচলে করিয়া চুণ, সুরকী, সিমেন্ট আনিতে,—হরিনারায়ণ সেগুলা ঘরে যথাস্থানে রাখিবার কাজে নিযুক্ত রহিল।

—শিবাণী তখন স্বপ্ন দেখিতেছে,—দ্বারী বলিল, "স্বাগত", —বৈতালিক বলিল, "তথাস্তু"।—

ক্লাশের মেয়ে সুমিত্রা,—পড়াশুনায় ভালো, এবং ব্যবহারেও। শিবাণী লেখাপড়ায় ভালো নয়,—কোনও পরীক্ষায় হয় ত পাস্ করে, এবং বেশীর ভাগ পরীক্ষায়ই করে না। ব্যবহারে সে অত্যন্ত ভীরু ও লাজুক। কাজেই নিজের কোণ্‌টিতে বসিয়া কোন রকমে চোখ-কান বুজিয়া সে কাটাইয়া দেয়। পড়া যখন বলিতে পারে না, তখনও মাথা নীচু করিয়া থাকে, এবং যখন পারে, তখনও মাথা তোলে না।

অত্যন্ত গ্রাম্যধরণের কাপড়-চোপড়-পরা, এবং অতিশয় পাড়াগেঁয়ে চালচলনের এই মেয়েটির প্রতি খাস সহরে বড় ঘরের মেয়ে সুমিত্রার যেন প্রীতির অন্ত ছিল না। শনিবার তাহার ভাইয়ের জন্মদিন,—শুক্রবার ক্লাশসুদ্ধ সকল মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া সুমিত্রা কহিল, "যেয়ো কিন্তু ভাই তোমরা সবাই,—আজ থেকে গেলেই ভালো হয়,—কে কে যাবে আজ? গাড়ী পাঠিয়ে দেব,—বল, কে কে যাবে?"

মেয়েদের অনুরোধ করিয়া সুমিত্রা কহিল, "মা'র হুকুম, তোমাদের সবাইকে যেতে বলেছেন,—কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না,—আজ যদি না যাও, কাল সকালে গাড়ী নিয়ে নিজে গিয়ে বাড়ী বাড়ী হাজির হব,—তোমাদের সবাইকে সমস্তদিন থাকতে হবে কিন্তু,—ছাড়্‌ছিনে কাউকে—"

শিবাণীকে ডাকিয়া সুমিত্রা কহিল, 'তোমায় কিন্তু আজই যেতে হবে বাণী,—মা বলেছেন—"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শিবাণী কহিল, "বাড়ীতে না ব'লে ত যেতে পারব না, সুমিত্রা,—আর বল্‌লেও বোধ হয় যেতে দেবেন না—"

সুমিত্রা বলিল, "সে হ'চ্ছে না, আমি গিয়ে তোমার মা'র কাছে বল্‌ব,—আমি বল্‌লে নিশ্চয়ই তিনি আপত্তি কর্‌বেন না—"

সুমিত্রা তাহাদের বাড়ী যাইবে, এ কল্পনা করিতে শিবাণী শিহরিয়া উঠিল,—ভবিষ্যৎচিন্তা না করিয়াই সে বলিয়া ফেলিল, "তার আর দরকার হবে না, সুমিত্রা,—তুমি বরঞ্চ সন্ধ্যের সময় তোমার গাড়ী পাঠিয়ে দিয়ো, যদি মা'কে রাজী করাতে পারি ত যাব—"

শিবাণী সেদিন বাড়ী ফিরিয়া অবধি ক্ষেমঙ্করীর সঙ্গে-সঙ্গে ফিরিতে লাগিল,—অসংখ্যরকমের প্রতিজ্ঞা করিল, কোনপ্রকার কাকুতিমিনতি করিতেই বাকী রাখিল না,—বলিল, "সুমিত্রারা খুব ভালো লোক, মা,—সুমিত্রার মা আমি না গেলে বড্ড দুঃখিত হবেন—"

জিভ্ দিয়া "টকাস্" করিয়া একটা অদ্ভুত শব্দ করিয়া ব্রাহ্মণী কহিল, ইঃ লো, আমার সাতপুরুষের কুটুম, বাহান্ন পুরুষের জাতির বাড়ী বিবি মেয়ে আমার নেমন্তন্ন খেতে যাবেন—"

শিবাণী কহিল, "তোমার সংসারের কাজ তুমি সব আমার জন্যে ফেলে রেখো মা, আমি কাল এসে ক'রে দেব—"

ক্ষেমঙ্করী কহিল, "তোমার ঘাগ্‌রা জুতো বা'র ক'রে দিই, প'রে তুমি একটু ইঞ্জিরী বল—ক্যাটর্-ক্যাটর্, ভ্যাট্-ভ্যাট্, তবে না নেমন্তন্ন খেতে যাবে—"

শিবাণী কথা কহিল না। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "যাব মা?—গাড়ী হয় ত এক্ষুণি এসে পড়্‌বে—"

মাতা কহিল, "কতবার বল্‌ব তোমায়, না বাপু, না?—ইস্কুলে গিয়ে তুমি যেন আমাদের মাথা কিনে নিয়েছ,—ওখান থেকে তোমাকে না ছাড়িয়ে নিয়ে এলে, তুমি সায়েস্তা হ'বে না।"

একটা গাড়ী চলিতে পারে এম্‌নিতর গলি। বড় একখানা মোটর আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল,—গাড়ীর হর্ণ্‌টা বাজিয়া উঠিতেই, সুমিত্রা নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। হর্ণের শব্দ কানে যাইবামাত্র শিবাণী ভীত হইয়া উঠিল। ঘরের বাহির হইতেই প্রশান্ত হাস্যে সুমিত্রা কহিল, "পাছে কোন ওজর ক'রে না যাও, সেই ভয়ে নিজেই এলাম বাণী!"

ম্লানমুখে শিবাণী কহিল, "আমি যেতে পার্‌ব না, সুমিত্রা—"

সুমিত্রা কহিল, "সে আমি শুনছিনে, তোমাকে নিয়ে যাবই এই আমার পণ,—তোমার মা কোথায়? চল, তাঁকে আমি বল্‌ছি।"

শিবাণীর বুকের ভিতরটা আশঙ্কায় থর্ থর্ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণী নিজেই বাহির হইয়া আসিল, পরিধানে ছোট একখানি ছাপাপেড়ে শাড়ী,—সুমিত্রাকে দেখিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, তোমারই নাম সুমিত্রা বুঝি? একহাতে ঝাঁটা, আর একহাতে একগাদা ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া; ছোট কাপড়খানির আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে, দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া সুমিত্রার গাড়ীখানি দেখিল, একগাল হাসিয়া সুমিত্রাকে বলিল, "হাওয়া-গাড়ীখানা কি বাছা তোমাদেরই? তা হবে, হাজার ট্যাকা দাম হবে—"

শিবাণীর চোখে জল টলটল করিতে লাগিল। সুমিত্রার অসাধারণ রূপের দিকে চাহিয়া ব্রাহ্মণী কহিল, "শিবুকে নিয়ে যাবে?—তা যাও না, নিজের মেয়ে ব'লে দেমাক কর্‌ছিনে, তোমরা পাঁচজনে ত দেখ্‌ছ,—মেয়ে আমার তার মায়ের মতই হ'য়েছে!—ওরে ও শিবু, তোর দু'খানা খাতা মাটিতে পেতে দে না, সুমিত্রা বসুক,"—বলিয়াই নিজের

ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়া কহিল, "তাকের ওপর থেকে একখানা কাঁথাই না হয় পাড়্ না।"

সুমিত্রা কহিল, "আমি আর বস্‌ব না,—বাণীকে নিয়ে যাই তা হ'লে?"

ক্ষেমঙ্করী কহিল, "তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে, তাতে আবার আমায় শুধোন! শিবু একখানা ভালো কাপড় বা'র ক'রে পর্—"

সুমিত্রা বলিল, "এই কাপড়ই ত বেশ আছে,—চল্ বাণী"—বলিয়া শিবাণীর হাত ধরিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে, ব্রাহ্মণী কহিল, "তোমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন খাওয়ানর সময় চেক্ আস্‌বে ত? আস্‌বে বৈ কি, হাওয়াগাড়ী যখন আছে—"

বুঝিতে না পারিয়া সুমিত্রা—শিবাণীর দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। মাথা নীচু করিয়া, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে শিবাণী বলিল, "কেক—"

ক্ষেমঙ্করী কহিল, "ওই হ'ল,—সে দু'খানা পাঠিয়ে দিয়ো না বাছা, শিবুর সঙ্গে,—একবার খেয়ে দেখ্‌বো—"

গম্ভীরমুখে সুমিত্রা বলিল, "আচ্ছা—"

ব্রাহ্মণী হাসিতে লাগিল।—

রাস্তায় পা ফেলিতেই, যে দৃশ্য চোখে পড়িল, তাহাতে অনভ্যস্ত সুমিত্রা বিস্মিত হইয়া গেল।

আট দশটা ছেলেমেয়ে মিলিয়া বেচারা ড্রাইভারটাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে।—বাড়ী ভিতর হইতেই ঘনঘন হর্ণের শব্দ শোনা যাইতেছিল,—কারণটা এইবার বুঝা গেল। একজন একদিক হইতে আসিয়া হর্ণ টিপিয়া সরিয়া পড়ে,—আর কয়েকজন গাড়ীর ভিতরে বসিয়া গিয়ার ধরিয়া টানে, এ্যাক্‌সিলারেটার চাপিয়া ধরে, ষ্টিয়ারীং হুইল ঘুরাইবার চেষ্টা করে, হেড্‌লাইট জ্বালাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, ড্রাইভারের কোলে চড়ে, তাহার টুপি ধরিয়া টানে,—সে একটা হৈ-রৈ ব্যাপার! শিবাণীর ভাইবোনের দলই এসব ব্যাপারে অগ্রণী!

শিবাণীকে লইয়া সুমিত্রা গাড়ীতে উঠিতেই, স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া ড্রাইভার গাড়ী ছাড়িল। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে কিন্তু পাদানির উপরে দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শিবাণীর ভাই-বোনেরা কলরব করিতে লাগিল, "তুই বড়লোকের বাড়ী গিয়ে পেট ঠুসে ভালো ভালো জিনিষ খাবি, ভোঁক্-ভোঁক্ মটরগাড়ী চড়বি, আর আমরা—"

সুমিত্রা ড্রাইভারকে কহিল, "ওদের বড় রাস্তায় গিয়ে নামিয়ে দিলেই হবে"—বলিয়া তাহাদের ভিতরে টানিয়া লইল।

—ব্রাহ্মণী অন্যান্য ভাড়াটেদের বলিলেন, "বড় হাওয়াগাড়ী এসেছিল, দেখনি?—বাড়ীর ভেতরে ছিলে বুঝি?—আচ্ছা ডাকছি কায়েতদের নন্তু, কন্তুকে,—ওরা দেখেছে। এ পাড়ার সব ছেলেমেয়েগুলোই যে ছিল,—শিবানীকে নিতে এসেছিল,—আমার ভাশুরের মেয়ে—লাখোট্যাকা আয় ওদের—কি গাড়ী! কি রূপ!—"

গাড়ীর ভিতরে বসিয়া শিবাণী কাঁদিয়া ফেলিল,—সে কান্না আর থামে না। সুমিত্রা বুঝিল,—পরিপূর্ণ দুঃখে, শান্ত সহানুভূতিতে নিজে দুই চোখ জলে ভরাইয়া সে বলিল, "আমি কিছু মনে করিনি বাণী, আমি কিছু মনে করিনি—"

শিবাণীর হাত ধরিয়া, ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সুমিত্রা কহিল, "মা, বাণী এসেছে—"

তাহার কণ্ঠস্বরে হেলস্থা ছিল না, তাচ্ছিল্য ছিল না,—নিজের বন্ধুকে আপনার গৃহে আপন করিয়া পাইবার সহজ আনন্দ ছাড়া, সে কণ্ঠস্বরে আর কিছু প্রকাশ পাইল না।

সুমিত্রার প্রতি কৃতজ্ঞতায় শিবাণীর মন ভরিয়া গেল,—মুখ তুলিয়া সুমিত্রার দিকে চাহিয়া সে বিষণ্ণভাবে হাসিল,—হাসির উত্তরে সুমিত্রাও হাসিল,—স্নিগ্ধ, করুণ।

—এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহারা দুইজনে যে, পরস্পরের কাছে কত বেশী প্রিয় হইয়া উঠিল, তাহা কেহ জানে না

মহাশ্বেতা বাহির হইয়া আসিলেন,—কোন কথা না বলিয়া, শিবাণীকে নিজের কাছে টানিয়া নিলেন, মাথাটা

বুকের উপরে রাখিয়া, মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "সুমি রোজ তোমার কথা বলে, মা,—বড় খুশী হ'য়েছি তোমায় পেয়ে,—তুমি না এলে, আজকের আনন্দ আমার অসম্পূর্ণ থাকৃত।"

এ জগতের সন্ধান শিবাণী পায় নাই,—ইহা হয় ত পূর্ণিমা-রজনীর স্বপ্ন হইতে পারে,—গলির বন্ধন, হরিনারায়ণের শাসন প্রভৃতি লঙ্ঘন করিয়া, হয় ত একমুঠো বসন্তের হাওয়া মধ্যরাত্রে রঙীন কথা শুনাইয়া গেল। শিবাণীর নিশ্বাস ফেলিতে সাহস হয় না,—চোখ মেলিতে ভরসা পায় না,—ভাবে, চোখ চাহিলে হয় ত দেখিবে, ভূতো নৃত্য করিতেছে,—কিন্তু তবু বলে, "আমার মাথার তেলে আপনার কাপড় নষ্ট হ'য়ে যাবে, মা—" মহাশ্বেতাকে মা ছাড়া আর কিছু ডাকিবার কথা শিবাণীর মনে একবারের জন্যও উদিত হইল না; তাহার মায়ের সহিত তুলনা করিয়া নহে,—সে-কল্পনা সে করে নাই। মহাশ্বেতাকে কোনরকমে ছোট করিতেছে, এ ধারণা তাহার মনে প্রবেশ করিলে সে তাহা সহ্য করিতে পারিত না। মহাশ্বেতা তাহার মা,—যে মা'র কোলে আসিয়া সে ভবিষ্যৎজীবনে জন্মগ্রহণ করিবে,—জীবন হইতে জীবনান্তরে যাত্রা করিবে যাঁহার ঘরে জন্মিয়া, তিনি তাহার সেই কল্পলোকের, কাব্যজগতের, স্বপ্ন-পৃথিবীর মা!

মহাশ্বেতা নীরবে তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন,—জবাব দিলেন না।

সুমিত্রা এইবার খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিল; বলিল, "এ কিন্তু বেশ মজা,—আমি ধ'রে নিয়ে এলাম বাণীকে, আর আমাকে তোমরা কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌ছো না!"

কিছু না বলিয়া, সুমিত্রার পানে চাহিয়া শিবাণী অত্যন্ত মৃদু হাসিল,—কতখানি কৃতজ্ঞতা, কতখানি ভালবাসা যে সে হাসির মধ্যে প্রকাশ পাইল, তাহা সুমিত্রার অগোচর রহিল না। সে কহিল, "এ কিন্তু দস্তুরমতন ডাকাতি,—আমার মাকে পাঁচমিনিটের মধ্যে এমন ক'রে দখল ক'রে ফেলা, দিনে ডাকাতি ছাড়া আর কিছু নয়!"

বুকের উপরে শিবাণীর মাথাটা গভীর স্নেহভরে চাপিয়া ধরিয়া মহাশ্বেতা সস্মিতমুখে কহিলেন, "তোরা দু'জনে এখন এখানে ব'সে একটু গল্প কর, বাণী,—আমি ছাতের কাজটুকু সেরে আসি—"

মহাশ্বেতা শিবাণীকে সাজাইতে বসিলেন। শুক্‌নো তোয়ালে দিয়া মাথা মুছাইয়া মাথা পরিষ্কার করিয়া দিলেন, সাবান দিয়া গা ধোয়াইয়া, ময়দা ও দুধের সর দিয়া হাত মুখ পরিচ্ছন্ন করিয়া দিলেন, বলিলেন, "কাল সকালে স্নান করবার সময় ভালো ক'রে মাথা ঘ'ষে গা, হাত-পা পরিষ্কার ক'রে দেব'খন, বাণী,—গায়ে যা ময়লা পড়েছে, একটু চোখ তুলেও কি দেখিস্‌নে, মা? নিজের শরীরের, স্বাস্থ্যের যত্ন নিজে একটু করতে শেখ,—'

শিবাণী এই বাড়ীতে মাত্র দুইঘণ্টা হইল আসিয়াছে, একথা কে বলিবে?—তাহার মনে হইল, যেন কতকাল ধরিয়া ইহাদের সহিত তাহার পরিচয়,—এই বাড়ীর দরজা-জানালা-চৌকাট গুলো হইতে আরম্ভ করিয়া দেয়ালের ক্ষুদ্র পেরেকটি পর্য্যন্ত যেন তাহার কত প্রিয়, কত চেনা। ইহাদের সকলকে দেখিয়াই যেন মৃদু হাসিয়া বলা চলে, "এই যে"—আর সেটা কিছুমাত্র অশোভনও হয় না—

সাদা সিল্কের ব্লাউজ, সাদা সিল্কের চওড়া লালপাড় শাড়ী—বেশী জবড়জঙ্গ কিছু নয়। পায়ে ঘাসের চটি, কানে দুল, গলায় সাদা মুক্তার মালা, হাতে ব্রেস্‌লেট। মাথার চুল লম্বা বেণী করিয়া ঝোলান, শেষে একটা লালফিতা ফাঁস্ দিয়া বাঁধা।

সাজান শেষ করিয়া, মহাশ্বেতা বারবার ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া শিবাণীকে দেখিলেন—শিল্পী যেমন করিয়া তাহার নিজহাতে গড়া সৃষ্টিকে দেখে, সমালোচকের দৃষ্টিতে নয়, আত্মপ্রসাদের ভঙ্গীতে,—মহাশ্বেতাও তেমনই করিয়া দেখিলেন।—শিবাণী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই, গভীর স্নেহে তাহার কপালে চুমা খাইয়া মনে-মনে কত কি যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা সকলের অগোচর রহিয়া গেল।

সেই পাড়াগেঁয়ে, বেঞ্চির শেষে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া থাকা মেয়েটিকে দেখিয়া এখন আর চেনা যায় না। সেই শ্যামবর্ণ মেয়েটি যে অকস্মাৎ এমনিতর রূপসী হইয়া

উঠিবে, একথা কি কেহ আন্দাজ করিতে পারিত? রূপ-কথার পরী যেন ডাইনীবুড়ীর ছদ্মবেশে আসিয়াছিল,—ছদ্মবেশটা ফেলিয়া দিয়া সহসা পরী সাজিয়া বসিয়াছে!

কাল কত আত্মীয়স্বজন, বড়লোক কুটুম আসিবেন,—তাঁহারা সকলেই কিছু পীর-পয়গম্বর নহেন,—দরিদ্র অতিথির দিকে চাহিয়া নাক সিট্‌কাইবার, তাহাকে লইয়া রঙ্গ করিবার এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিবার প্রবৃত্তি অনেকেরই আছে,—মহাশ্বেতা তাই আগে হইতেই শিবাণীকে তাঁহার সকল আত্মীয়ের সহিত সমান করিয়া দিলেন। কোনদিক দিয়া কাহারও কোন কথায় অথবা কাজে এই স্বল্পভাষী মেয়েটি যাহাতে না কিছুমাত্র আহত হয়, সেদিকে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি রহিল। শিবাণীকে মাতা এমন করিয়া কাছে টানিয়া লইলেন দেখিয়া, সুমিত্রার আনন্দের সীমা রহিল না।

সেদিন রাত্রে দুই বন্ধুতে ছাদের উপরে বসিয়া আলাপ চলিল। চাঁদের আলোর পানে চাহিয়া, আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকাইয়া, অন্ধকার বাড়ীগুলার কালো মাথার উপর দৃষ্টি রাখিয়া, দুই সখীতে কত কথাই না হইল।—শিবাণী আজ মাথা তুলিয়া কথা কহিল, সঙ্কোচশূন্য, জড়তাশূন্য স্বরে কত কি বলিয়া গেল,—কত আশা, কত স্বপ্ন, কত যুগযুগান্তের, জন্ম-জন্মান্তরের কথা অশ্রান্তভাবে বলা হইয়া গেল। আজ যেন সুমিত্রা ও সে সমান সমান।—আজিকার এই চাঁদের আলোয়, মহাশ্বেতার স্নেহ, সুমিত্রার ভালবাসা,—ইহাই যেন সত্য, এবং এই সম্বল লইয়াই যেন সে স্বচ্ছন্দে বিশ্বসাগর পাড়ি দিতে পারিবে! ইহা যে কেহ কাড়িয়া লইবে,—কাল বাদে পরশু যে অন্ধ কোথায়ও গিয়া মাথা গুঁজিতে হইবে,—সে সব কথা তাহার একবারও মনে হয় না। ইহার আগে যেন তাহার জীবন ছিল না, ইহার পরে যেন তাহার জীবন নাই,—মাঝখানের এই সর্ব্বদুঃখহর দিনটিই যেন তাহার জীবনে পরমতম সত্য।

তাহাদের হাস্যপরিহাস আর শেষ হয় না।—

রাতদুপুরের চন্দ্রের উপর তখন মেঘের টুক্‌রাগুলো সাদা পর্দ্দা ফেলিয়া আড়াল করে।—সুমিত্রা এবং শিবাণী নামিয়া আসিল।

পরদিন। তপন ঘুম থেকে উঠিয়া, পিতামাতা এবং অন্যান্য গুরুজনদিগকে প্রণাম করিল,—সুমিত্রা এবং শিবাণীর পায়ের ধুলো মাথায় লইল। শিবাণী তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ উজাড় করিয়া তপনকে আশীর্ব্বাদ করিল।—স্কুলের মেয়েরা আসিল,—শিবাণীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল! তাহার কথাবার্ত্তায়, চালচলনে একটা নবজন্মের পরিচয় পাওয়া যায়,—ঘুমন্ত রাজকন্যাকে সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া যেন কে জাগাইয়া দিয়া গেছে!

শিবাণী মহাশ্বেতার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়,—তাঁহার সমস্ত কাজে সে তাঁহার সঙ্গী থাকিতে চায়।—কাল আর তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না,—আর কোনদিন তাঁহাকে পাওয়া যাইবে কি না কে জানে! তাঁহার যতটুকু স্মৃতি সে সংগ্রহ করিতে পারে, মন ভরিয়া লইয়া যাইতে চায়।—

বিকালবেলা,—শিবাণীর যাওয়ার সময় হইল,—মহাশ্বেতার মনে হইল, একদিনে এই মেয়েটি তাঁহার এতটা আপন হইয়া উঠিল কি করিয়া? সমস্তদিনটা যে বালিকা তাঁহার পায়ে পায়ে ঘুরিল,—দিনশেষে যখন তাহার নিজের ঘরে যাওয়ার সময় আসে, তখন কষ্ট হয় কেন? শিবাণীকে তিনি কত কি দিতে চাহিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই কিছু লইল না,—চোখের জল সাম্‌লাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বারবারই কহিল, "আমাদের বাড়ীর ব্যাপার আপনি কিছু জানেন না মা, তাই—"

কতকগুলো কেক সঙ্গে করিয়া সুমিত্রা শিবাণীকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া গেল।—

ব্রাহ্মণী কহিল, "দাঁত খুলে' ফেলে দোব—"

হরিনারায়ণ কহিল, "খবরদার, ঘুম আসলে—"

এবার ব্রাহ্মণী হরিনারায়ণের পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির অত্যন্ত নিন্দা করিল।—

হরিনারায়ণও ক্ষেমঙ্করীর আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল, এবং তাহার সে সব উক্তি প্রশংসাসূচক নহে।

ছেলেমেয়েগুলো ভূতোর নেতৃত্বাধীনে ঘরের মাঝখানে লাফাইতে লাফাইতে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে উত্তেজিত করিয়া সুর ভাঁজিতেছিল,

"লাগ্ বাবাজী, লাগ্ বাবাজী
ঠ্যাংটি তুলে' খা ডিগবাজী—"

হরিনারায়ণ হঠাৎ বলিল, "একটা পয়সা দেখি, দোক্তা আনতে হ'বে—"

ব্রাহ্মণী একটা পয়সা বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হাতে দিতেই, সে কহিল, "ভূতো, একপয়সার দোক্তা নিয়ে আয় ত—" ভূতো দোক্তা আনিতে গেল,—যাইবার সময় তাহার ভাইবোনদের বলিয়া গেল, "তোরা সব লাগ্ বাবাজী, লাগ্ বাবাজী কর্, থামিসনে যেন, আমি ছুটে আসছি—"

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দুইজনেই একটু দম লইতে লাগিল।

একটু পরে ক্ষেমঙ্করী বলিল, "শাঁখারীদের গিন্নী আজ সকালে বলছিল, বামুন-বৌ, তোমার মুখে কোনদিন উঁচু কথাটি শুনিনি—"

হরিনারায়ণ উত্তর করিল না, শুধু কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

রাস্তা হইতে কে একজন ডাকিল, "হরিনারায়ণ বাবু আছেন?—"

ইটের গবাক্ষপথে চোখ রাখিয়া হরিনারায়ণ অত্যন্ত ইতরভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল, বলিল, সে দক্ষিণ দেশের পেকে, তাহার সহিত চালাকি করিতে আসা চাট্টিখানি কথা নয়!—হারামজাদা চাল দিয়াছিল মোটা, কাঁকরভর্ত্তি,—ডাল দিয়াছিল রদ্দি, ফোটে না,—তেল দিয়াছিল, ওয়াক্ থুঃ,—আবার দাম চাহিতে আসিতেছে!—হরিনারায়ণ সেই গবাক্ষপথে মুখ রাখিয়া ঘুসি পাকাইয়া দাঁত খিঁচাইয়া দেখাইল,—ঘরের মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া দৌড়ঝাঁপ করিতে লাগিল। দক্ষিণদেশের লোকের সহিত চালাকি করিতে আসা যে সহজ কথা নহে সেকথা আর একবার বলিতে ভুলিল না।

বাহিরের লোকটা বলিল, সে পশ্চিমবাংলার লোক, ঘাস খায় না,—পশ্চিমবাংলার লোকের সহিত ধূর্ত্তামি করিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ পার পায় নাই।

ব্রাহ্মণী কহিল, "বামুনদের নদেরচাঁদ,—তার চাকরী হ'য়েছে,—বিয়ের বাজনদারদের দলে,—বাজনা বাজায় না, মালকোঁচা মেরে, কোট গায়ে দিয়ে, রাংতামোড়া গদার মত হাতে ক'রে আগে আগে যায়। পনেরো টাকা মাসে মাইনে, আরও বাড়বে! দোজবরে,—তা কাঁচা বয়েস আছে, শিবুর সঙ্গে খাসা মানাবে—"

হরিনারায়ণ বলিল, "হুঁ—"

ব্রাহ্মণী কহিল, "নদেরচাঁদের মা আজ বলছিল, 'বামুনদিদি, তোমার মতন শাউড়ী পাওয়া নদেরচাঁদের পরমভাগ্যি,—এমন স্নেহ, যত্ন আত্তি'—"

হরিনারায়ণ চোখ পাকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "মিথ্যাবাদী জানোয়ার—"

ব্রাহ্মণী মুখ বিকৃত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "খবরদার—"

শিবাণীর চোখদিয়া বন্ধনহীন ধারা নামে, শিবের জটা বাহিয়া গঙ্গার স্রোত নামে যেন,—ক্লান্তিহীন, বিরামহীন। পৃথিবীর আলো হাতছানি দিয়াই লুকাইয়া পড়িল, স্বপ্ন শেষ হইয়া গেল একদিনে। আবহোসেনী ব্যাপারের শেষে ঘুমের কথা মনে করিয়া শিবাণী বসিয়া থাকে। বসন্তের হাওয়া হয় ত নাচিয়া বেড়াইবে, দেয়ালের ফুটোটা দিয়া হয় ত পূর্ণিমারাত্রের চন্দ্র মুচ্‌কি হাসিয়া যাইবে!—শিবাণী ভাবে, উহাদের দিকে চোখ রাখিয়া, দেয়ালের গায়ে কান পাতিয়া বসিয়া থাকিব,—আবার যদি স্বপ্ন দেখি!—দৃষ্টি বাধে দেয়ালে দেয়ালে, করুণআঁখি আঘাত খাইয়া ফেরে,—ভূতো নৃত্য করে, হরিনারায়ণ তাণ্ডবের তালে লাফায়, ব্রাহ্মণী বলে, "মরণ—!"

শ্রীআশীষ গুপ্ত

বর্ষায় চণ্ডীদাস

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

মিথিলার কবি বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের তুলনা-মূলক সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে, "চণ্ডীদাস মনোরাজ্যের পরিদর্শক, বিদ্যাপতি বহির্জগতের চিত্রকর, একজন ভাবুক, অপর দার্শনিক। একজন সোজা কথায় সরল ভাষায় সাধারণের মন মাতাইয়াছেন, অন্য ব্যক্তি রচনা-চাতুর্য্যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও শব্দবিন্যায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য দেখাইয়া পণ্ডিতের সুখ্যাতিভাজন হইয়াছেন।"

বিদ্যাপতির কাব্যপ্রতিভা তাঁহার জ্ঞান-সাধনার ফল (acquired), সেইজন্য তাঁহার সমগ্র কাব্য প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে আপনার মৌলিকতা বিসর্জ্জন দিয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদাস "অপরের অনুকরণ করিতে পারেন নাই, যাহা-কিছু রচনা করিয়াছেন তাহাই তাঁহার নৈসর্গিক-শক্তি-সম্ভূত।" বিদ্যাপতি প্রাকৃতিক বর্ণনায় চণ্ডীদাস অপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে চণ্ডীদাসের সহজ রচনার সম্মুখে বিদ্যাপতির মৌলিকতাহীন রচনা নিষ্প্রভ বলিয়াই মনে হয়।

বিদ্যাপতিতে অনাবশ্যক বাক্যাড়ম্বর আছে, কিন্তু চণ্ডীদাস "একছত্র নিজে লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দিয়া লেখাইয়া লন।" প্রাকৃতিক বর্ণনাতেও চণ্ডীদাসকে আমরা এই নিয়মের অনুসরণ করিতে দেখি।

চির-বিরহিণী হৃদয়-রাধিকার মনের আকাশে যে নিবিড় নিষ্ফল বর্ষা চিরদিন ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা বিদ্যাপতির ভাষার তুলিকায় এইরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

গগনে অবঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত নিঠুর কান্ত না আবই॥

কিন্তু চণ্ডীদাস তাহা আরও সহজভাবে ফুটাইয়াছেন :—

জেঠ মাস গেল আষাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর নান্দের নন্দন।

এই সহজ ভাষা ও সহজভাবের গুণে "চণ্ডীদাস প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি।" আমরা দেখিব তাঁহার অনাড়ম্বর সহজ রচনায় বর্ষার ঘন-আড়ম্বরময় প্রকৃতিও কত নিখুঁত চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভাদ্রের দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতির বিভীষিকা কংসের কারাগারে শৃঙ্খলিত বাসুদেব ও দৈবকীর বুকে আরো বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া তুলিল। কিন্তু সেই রুদ্ধ কারাগারের কোন অদৃশ্য বাতায়ন-পথে মুক্তির আলোক-রেখা জ্বলিয়া উঠিল :—

বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে।
নিশি আন্ধকার ঘন বাবি বরিষে॥
হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরি।
শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গধরী।
রোহিণী আষ্টমী তিথিন।
জরম লভিল কন্সাগ্রি॥

সম্মুখে উন্মাদিনী যমুনা, উর্দ্ধে ঘন-অন্ধকারময় আকাশের বুকে বিদ্যুতের চঞ্চল-নৃত্য, কিন্তু :—

কাহ্নু দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল।
পার হঞাঁ বসুল নান্দের ঘরে গেল॥

জন্মদিবসের এই দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতি বাল-গোপালের দেহচ্ছবিতে যেন আপনার রং চিরতরে প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছে :—

নীল জলদঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ॥
মাণিকরচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।
সজল জলদরুচি জিনি দেহকান্তি॥

আর এইদিকে রাধিকার :—

নীল জলদসম কুন্তলভারা
বেকত বিজুলী শোভে চম্পকমালা।

—কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ মেঘসদৃশ, তাহাতে চম্পকমালা যেন বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের দেহচ্ছবি কালো আর বর্ষার প্রকৃতিও কালো, এই উভয় কালোতে মিশিয়া কবির কল্পনার চোখে যেন কালো অঞ্জন আঁকিয়া দিয়াছে :—

কাল আখরেঁ তিন ভুবন বিচার।
কাল মেঘের জলে জীএ সংসার॥
কাল চিকুর শোভে মাথার উপরে।
কাল ভুরুহী শোভে বদনকমলে॥
কাল মেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ।
এহা বুঝী না কর রাধা তোঁ মন মন্দ॥

কিন্তু এই কালোতেই রাধিকার সর্বনাশ হইল। তাই কবি সকলকে তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে বলিতেছেন :—

কাল মেঘের ছায়া নাহিঁ জাওঁ।
কালিনী রাতি মোঁ প্রদীপ জালিআঁ গোহাওঁ॥

—কালো মেঘের ছায়াতলে কখনো বিশ্রাম করিতে বসিও না, মেঘাবৃত কিম্বা কৃষ্ণপক্ষের সমগ্র রজনী প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়া প্রভাত করিবে নতুবা রাধিকার মত এই কালোতে আপনাকে হারাইয়া বসিবে।

কিন্তু এদিকে রাধিকার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়াও এই কালো বর্ষার ছবি কবির হৃদয় হইতে মুছিল না :—

মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহ্ন বিজুলী
বদন সংপুন্ন চান্দ সম তোর দেখী॥

মেঘের বুকে ভুবন-উজ্জ্বলকারী বিদ্যুতের চঞ্চল বিকাশের ন্যায় রাধিকার দেহলতা আর বদন পূর্ণচন্দ্রের মত শোভাকর।

শ্রাবণের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। অভিসারিকা রাধার চঞ্চল চিত্ত গোপনে প্রিয়ের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। কবি কহিলেন :—

তেজহ সুন্দরী রাধা মুখর মঞ্জীর।
সত্বরেঁ চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির॥

কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে।
শোভে মেঘ মালে যেহেন তড়িতে॥

হে সুন্দরী রাধা, পায়ের মুখর নূপুর খুলিয়া রাখিয়া এই ঘনতিমিরের আবরণে সত্বর কুঞ্জে চল। কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা মেঘের বুকে বিদ্যুতের মত শোভা পায়।

কিন্তু মিলনের এই সুখ রাধিকার অদৃষ্টে আর বেশী-দিন ঘটিয়া উঠিল না। বিরহের ব্যর্থ-জীবনে কত নিষ্ফল বর্ষা আসিয়া আসিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল, আর রাধিকার :—

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পাণী।

বাহিরে শ্রাবণের অশান্ত মূর্তি তাহার অন্তরের আকাশে রং ফলাইয়া গেল :—

মেঘ ঝরে আষাঢ় শ্রাবণে।
ঝরে তার পাণী নয়নে গো॥
কান্দিআঁ মলিন কৈল মুখে।
কত তার দেখিব দুখে গো॥

বর্ষার বিনিদ্র-রজনী দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া আসিতে লাগিল। শ্রাবণের বর্ষণের শব্দে কাহার যেন নূপুর-ধ্বনি কানে আসিয়া বাজিল। রাধা ভাবিলেন :—

এ ঘোর রজনী মেঘের ছটা,
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
ভাবিয়া পরাণ ফাটে॥

চঞ্চল-চিত্তে রাধা গৃহ হইতে প্রিয়-সন্ধানে বাহির হইলেন :—

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥

আজিকার বর্ষা-নিশীথে শ্রীরাধার অভিসার ব্যর্থ হইল। তিনি তাহার রূপ-যৌবন লইয়া নিষ্ফলে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিলেন:

নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী॥

মথুরার পথ চাহিয়া চাহিয়া বর্ষপরে আবার বর্ষা ঘুরিয়া আসিল, আর বিরহিনীর প্রাণমূলে একই ব্যথা এইবার দ্বিগুণ বেদনায় সঞ্চার করিল:

জেঠ মাস গেল আষাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ॥
ফুটিল কদম ফুল ভরে নোআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল॥

বিরহিনী শ্রীরাধার পক্ষে এই বারের বর্ষা-যাপন অসম্ভব। তিনি ভাবিলেন যদি পাখী জাতি হইতাম তবে প্রিয়ের নিকট উড়িয়া গিয়া অন্ততঃ এই বর্ষার চারিটা মাস যাপন করিয়া আসিতাম:

পাখী জাতী নহোঁ বাড়য়ি উড়ী জাও তথাঁ।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথা॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারিমাষ।
এভর যৌবন কাহ্ন করিলে নিরাস॥

আর এ'দিকে:

আষাঢ় মাসে নবমেঘ গরজএ।
মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ॥
শ্রাবন মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে॥
ভাদর মাঁসে অহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলে ফুটিবেক শশী॥
তবে কাহ্ন বিনী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

স্বভাব-কবি চণ্ডীদাসের সহজ দৃষ্টিতে বর্ষার প্রকৃতি যে মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল তাহাই তিনি ভাষার তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন মাত্র। তাহাতে ভাষার আড়ম্বরে কিম্বা রচনার কৌশলে কোন অংশে প্রকৃত ছবিতে কৃত্রিমতা স্থানলাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। সে'জন্যই চণ্ডীদাসের প্রকৃতি-বর্ণনা ভাষার পারিপাট্যহীন কিম্বা ছন্দের মাধুর্য্য হইতে বঞ্চিত হইলেও কবির সহজ অনুভূতির একখানি সুন্দর ও স্বাভাবিক চিত্র বলিয়া ইহা আমাদের নিকট এত আদরণীয় হওয়ার যোগ্য।

বর্ষার চারিমাস কি করিয়া যাপন করিবেন এই ভাবিয়া বিরহিনী রাধা চিন্তিত হইলেন কিন্তু কবি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন:

চতুরে চতুরো মাসান্ রাধে মুদির মেদুরান্।
গময় ত্বং গতৌ শক্তিরত্র মে নাস্তি কাচ ন॥

চতুরে রাধে, মেঘ-মেদুর মাসচতুষ্টয় কোনমতে যাপন কর; কেন না, এ বিষয়ে আমার কোন শক্তি নাই।

বৈষ্ণব-কবিগণের প্রধান বর্ণনাস্থল বৃন্দাবন। রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি এই বৃন্দাবনকে ভক্ত বৈষ্ণবেরা একদিন ষড়ঋতুর কেলিভূমিরূপে কল্পনা করিয়া ইহাতে চিরসৌন্দর্য্যের ছাপ লাগাইয়া রাখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের মতে বৃন্দাবন চিরসুন্দর, ত্রিভুবনে তাহার তুলনা নাই:

তীন ভুবন মাঝেঁ কথাঁহো না দেখিলেঁ
দৈব নিয়োজন হেন থানে।

গ্রীষ্ম যেমন তাহার কঠোর সৌন্দর্য্য লইয়া তাহার অঙ্গে ফুটিয়া উঠে তেমনি বর্ষাও তাহার স্নিগ্ধমূর্ত্তি লইয়া বৃন্দাবনের অঙ্গে অঙ্গে যথাসময়ে আসিয়া দেখা দেয়:

আম্লই আসারিআ ভূমিচম্পক চম্পক
গন্ধ গর বনমাহলী।
নাগেশর কেশর তিনিশ শিরিষ আর
বহুল মহুল সেআলী॥
কুব্জা কুটুজ কদম্ব বাসক কেন্দু কুন্দ
ধুথুর মথুর সিন্ধুবারে।

রবি লোধ ছাতীঅন ভাণ্টি দুধিগাকন
কসাল পিআল ডগরে ॥

বর্ষা-বিলাসী পুষ্পরাজি বৃন্দাবনের দিক অঙ্গ-সুষমা সহস্রগুণ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল।

অন্তর্জগতের যে সূক্ষ্ম অংশটুকু লইয়া চণ্ডীদাস ঘাটাঘাটি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বহির্জগতের বিষয় আলোচনার অবকাশ দেয় নাই। অন্যান্য বৈষ্ণব কবির সঙ্গে চণ্ডীদাসের এই স্থলেই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাসই সর্ব্বপ্রথম আদর্শবাদের (idealism) ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্যই চণ্ডীদাসের প্রাকৃতিক বর্ণনার বাস্তবতার অন্তরালেও অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম আদর্শবাদের অস্তিত্ব রহিয়াছে। Idealism ও Realismএর আলোচনায় চণ্ডীদাস এক বিচিত্র কল্পনার খেলা খেলিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাপতি প্রমুখ অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণ এই উভয়ের একত্র সংমিশ্রণ করিতে পারেন নাই। চণ্ডীদাস দুঃখের কবি, তাই চাতকের চির-আকাঙ্ক্ষিত বর্ষা আসিয়াও তাহা হইতে বজ্র নিক্ষেপ করিলেন :

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।

আর এই মেঘের তলে লুকাইয়া রাধিকার জন্য বিরহের অনন্ত বেদনা আনিয়া দিলেন।

নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি' জীউ নিকসয়ে মোর।

কিন্তু বিদ্যাপতি রাধিকার জন্য বর্ষার সঙ্গে অভিসারের আনন্দও আনিয়া দিলেন :

গগন সঘন মহী পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা ॥
দশদিশ ঘন আন্ধিয়ারা।
চকইতে খলই লখই নাহি পারা ॥
বিহি পায়ে করি পরিহার।
ভাবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার ॥

বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসও রাধিকাকে বর্ষায় এই অভিসারের তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত করিলেন না :

মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার ॥
ঝলকত দামিনী দশদিশ আপি।
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি ॥
বরিখত ঝর ঝর খরতর মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেত গেহ ॥

গোবিন্দদাসও অভিসারিকার এই বর্ষা নিষ্ফল করিলেন

অম্বরে ডম্বরু ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ ॥
অব জানি সজনি করহ বিচার।
শুভক্ষণে ভেল বাদল অভিসার ॥

কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধিকা চিরদুঃখিনী; মিলনেও তাঁহার আনন্দ নাই :

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন এই প্রেমের তুলনা নাই :

ভানু কমল বলি, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে ॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নাহলে সে না দেয় এক কণা ॥
কি ছার চকোর চাঁদ, দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে ॥

চণ্ডীদাসের রাধা আজন্ম কাঁদিয়াছেন; বর্ষা-নিশীথের অভিসার তাঁহার ব্যর্থ হইয়াছে, বসন্ত-যামিনীর মধুৎসবের আশা তাঁহার নিষ্ফল হইয়াছে। চণ্ডীদাস তাই বর্ষার মেঘের বুকে প্রলয়ঙ্কর বজ্রের অস্তিত্ব খুঁজিয়াছেন, শ্রাবণের অশান্ত-বর্ষণে বিরহিনীর অশ্রুপাত কল্পনা করিয়াছেন। দুঃখবাদী কবি অন্তর্জগতের দুঃখ বাড়াইবার জন্যই বহির্জগতের সৌন্দর্য্য কল্পনা করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মধ্যে তাঁহার কল্পিত দুঃখবাদের সূক্ষ্ম দর্শন আসিয়া স্থান লইয়াছে। সেই-জন্য বাংলা-সাহিত্যে বর্ষাকাব্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে

চণ্ডীদাসের স্থান নাই। চণ্ডীদাস তাঁহার রচনাদ্বারা বর্ষা-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করেন নাই, শুধু মনস্তত্ত্বের উপর বর্ষার যতদূর প্রভাব হইতে পারে ততদূর তাহা আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। বর্ষাকাব্যে চণ্ডীদাসকে এ পর্য্যন্ত কেহই অনুসরণ করেন নাই। বিদ্যাপতির পর হইতে সমস্ত বৈষ্ণব কবি এবং তাহার পরবর্ত্তী কালে বাংলার কবিগণও বর্ষাকাব্যে একমাত্র প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য কিংবা বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের রবীন্দ্রনাথও বর্ষাকাব্যে সংস্কৃত-কাব্য ও বিদ্যাপতির যথেষ্ট অনুকরণ করিয়াছেন। ব্রজবুলিতে রচিত তাঁহার ভানুসিংহের পদাবলীতে বিদ্যাপতির যথেষ্ট অনুকরণ দেখিতে পাই এবং তাঁহার অন্যান্য বর্ষাসম্বন্ধীয় কবিতাতেও সংস্কৃতকাব্য ঋতুসংহার কিংবা মেঘদূতের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

চণ্ডীদাস আপনার অসামান্য প্রতিভাবলে আপনার মৌলিকতা আপনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ষা-কাব্যের সৃষ্টিও সম্পূর্ণ মৌলিক কিন্তু সূক্ষ্ম দর্শনের আবরণে তাহার পূর্ণ সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে।

বাঙ্গলা বর্ষাকাব্যের জন্ম সংস্কৃত সাহিত্যে। তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাপতি মৈথিলী-ভাষায় একসুন্দর কাব্য সৃষ্টি করেন। যে সমস্ত বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতিকে অনুকরণ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বর্ষাকাব্য-খানিও ধার করিয়া লইয়া আরও কতকদূর অগ্রসর করাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

বর্ষাকাব্যের এই ক্রমবিকাশের ধারায় চণ্ডীদাস একপার্শে পড়িয়া রহিয়াছেন। তিনি বিদ্যাপতির মত বর্ষাকাব্য বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই সৃষ্টি করিলেন না, শুধু তাঁহার নিজস্ব আলোচ্য বিষয়ের সীমানায় এই বর্ষা যতদূর আসিয়া পড়িয়াছে ততদূর তিনি তাহার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিশ্ববিরহিণী বর্ষার ধারায় যুগ যুগ ধরিয়া অশ্রুমোচন করিতেছে, চিরতৃষিত চাতক জলদান্তবর্ত্তী বজ্রানলে পুড়িয়া মরিতেছে; এই জলদে জীবনদান করেনা, শুধু বিদ্যুতের অনলই লুকাইয়া রাখে, নবমেঘের ঘনশ্যামকান্তি বিরহিণী রাধিকার অন্তরে কৃষ্ণের কথা স্মরণ করাইয়া কেবল ব্যথাতেই জর্জ্জরিত করিয়া দেয়। জীবনের অভিসার মরণেও সফল হয় না। চণ্ডীদাসের বর্ষা রাধিকার জন্য অভিসারের তৃপ্তি না আনিয়া বিরহের জ্বালা দ্বিগুণ জ্বালাইয়া আনিয়াছে, তৃষিত-চাতকের জন্য তৃষ্ণা-বারি না আনিয়া বুকে করিয়া বজ্রানল আনিয়াছে।

এই কল্পনা চণ্ডীদাসের নিজস্ব। তিনি নিরক্ষর ছিলেন বলিয়াই তাঁহার স্বাধীন চিন্তাধারা অন্যের সঙ্ঘাতে আসিয়া আবর্ত্তের সৃষ্টি করে নাই; ইহা সহজ গতিতে পূর্ণতায় পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। বস্তুর (matter) বিনাশ আছে কিন্তু আদর্শের (idea) বিনাশ নাই। কল্পনা কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে এই নশ্বর জগতে বস্তুর ধ্বংসের সহিত সেই কল্পনাও ধ্বসিয়া পড়ে কিন্তু কল্পনা-যদি নিরাকার আদর্শের আশ্রয় মাগে তবে তাহার কোন কালেই ধ্বংস নাই। চণ্ডীদাস সেই আদর্শবাদের স্রষ্টা। তাই তাঁহার সৃষ্টি চিরন্তনের সামগ্রী, চিরসুন্দর ও চিরনূতন। চণ্ডীদাস যে আদর্শে বর্ষাকে গড়িয়াছেন তাহা যুগ যুগ ধরিয়া একতিলও টলিবে না, কিন্তু বিদ্যাপতির বাস্তব কল্পনার ধ্বংস আছে, কারণ সৃষ্টির নিয়মে পুরাতন বস্তু একদিন অনাদর পাইয়া চলিয়া যায়।

চণ্ডীদাসের বর্ষাকাব্য হিসাবে বিদ্যাপতির তুলনায় অতি নগণ্য, কিন্তু ইহা যে উচ্চ আদর্শের সন্ধান দিয়াছে তাহার তুলনা নাই।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

Passion Playর একটি দৃশ্য

যিশুখৃষ্ট ও মেরী

ওবার-আমারগাউ (Ober-Ammergau) জার্মানীর একটি পুরাতন গ্রাম। ১৬৩৩ খৃঃ অব্দে চতুর্দ্দিকে প্লেগের ভীষণ প্রকোপকালে গ্রামবাসিগণ তাহাদের গ্রামখানি মহামারী হইতে বাঁচাইবার জন্য যিশুখৃষ্টের জীবনলীলা অভিনয় করিয়া ঈশ্বরের কৃপাভিক্ষা করেন। গ্রামখানি প্লেগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। তাহারই কৃতজ্ঞতায় প্রতি দশ বৎসর অন্তর গ্রামবাসীরা যিশুখৃষ্টের জীবনলীলা অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের নাম Passion Play। সমস্ত গ্রামটি এই অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়। সাত শত গ্রামবাসী ও গ্রামবাসিনী অভিনেতা-অভিনেত্রীরূপে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত এই অভিনয় করেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে করেন ইহার দ্বারা তাঁহারা পুণ্যার্জ্জন করিতেছেন। বর্ত্তমান ১৯৩০ সালে এই অভিনয়ের পালা পড়িয়াছে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য দর্শক এই অভিনয় দেখিতে আসেন।

এই সম্পর্কে গত বৈশাখ-মাসের বিচিত্রার ৬৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Passion Playর অপর একটি দৃশ্য
যিশু ক্রুশের ভার বহন করিয়া বধ্যভূমির অভিমুখে চলিয়াছেন।
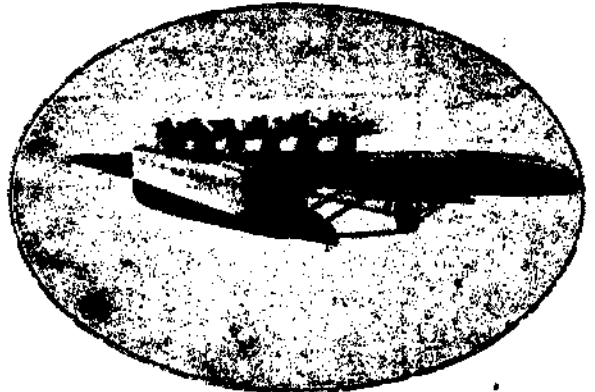
একটি বিস্ময়জনক দ্বিতল উড়োজাহাজ ; ইহাতে একশতজন যাত্রীর শয্যার ব্যবস্থা, ড্রয়িং রুম, ভোজনাগার ইত্যাদি জল-জাহাজের মতই আছে। ইহার গতি ঘণ্টায় ১২৫ মাইল। প্রয়োজন হইলে এই উড়ো জাহাজটি জলেও ভাসিয়া চলিতে পারে।

আমেরিকার একটি ষ্টেট্ ব্যাঙ্কে স্বর্ণ আনিবার ও পাঠাইবার ব্যবস্থা। কঠিন ইস্পাত নির্ম্মিত একটি সুদৃঢ় মোটর-কারে সোনা যাতায়াত করে। গাড়িতে সোনা উঠাইবার ও নামাইবার কালে পুলিসেরা পথের চতুর্দ্দিকের জনতা আটকাইয়া রাখে।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্-এর একখানি এরোপ্লেনবাহী যুদ্ধ-জাহাজ পানামা খালের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। ইহাতে প্রায় একশতটি এরোপ্লেন্ থাকে।

মা চিন্নো নামক পেকিনের একজন চীনাম্যান-ইঁহার দৈর্ঘ্য ৮ফুট্ ২ ইঞ্চি।

ট্রান্স জর্ডানে চাষারা উট দিয়া লাঙ্গল টানায়

সাহারা মরুভূমির উপর দিয়া Tougourt-
Biskra Express ট্রেণ মরুবক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়াছে।

মরুঝঞ্ঝার পর ট্রেণের অবস্থা
চাকাগুলি বালুরাশির মধ্যে অদৃশ্য
হইয়াছে।

‘সিগ্‌ন্যাল্’

(রুশ লেখক ‘গার্‌শিন্’-এর ‘The Signal’ নামক গল্পের মর্ম্মানুবাদ)

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায়

সেমেন্ আইভ্যানভ্ ছিল একটা রেল্‌লাইনের ওয়াচ্‌ম্যান্। তার ছোট্ট ঘরখানি—ষ্টেশন্ থেকে মাইল দশেক দূরে; সেখান থেকে দেখা যেত—দূরে—বহুদূরে—কালো কালো বনগুলির মাথার ওপর একটা ধূমাঙ্কিত কারখানার চিম্‌নী। তারই মত' ওয়াচ্‌ম্যান্‌দের কয়েকখানি কুটির ছাড়া নিকটে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না।

সেমেন্ আইভ্যানভ্ রোগজীর্ণ,—সংসারের দুঃখের চাপে ভেঙে-পড়া মানুষ। ন' বছর পূর্ব্বে সে ছিল সমর-বিভাগের একজন কর্ম্মচারীর খানসামা। কতদিন তা'কে সেই কর্ম্মচারীর সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌তে হয়েছে,—যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলির ভেতর দিয়ে প্রভুর জন্য খাবার নিয়ে যেতে হয়েছে! যখন গোলাগুলি পাশ দিয়ে ছুটে যেত,' তখন তার বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠ্‌ত। তার উপর ভগবানের নিশ্চয়ই অসীম দয়া ছিল, কারণ সে যখন দেশে ফিরে এল, তখন দেখা গেল যে তার গায়ে একটা আঁচড় পর্য্যন্ত লাগেনি। কিন্তু দেশে ফিরে আসা অবধি তার দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হ'লো। বাড়ি আসার পর তার বাপ ও চার বছরের ছেলেটি মারা গেল। বাকী রইল কেবল সে ও তার স্ত্রী। তার জমির কাজের অবনতি হ'তে লাগ্‌ল। আর, না হয়েই বা করে কি? তার শিথিল হাত-পায়ে আর হাল চাষ করবার সামর্থ্য ছিলনা। ক্রমে তাদের গ্রামে বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো, তাই একদিন তা'রা বেরিয়ে প'ড়্‌ল—সুখের সন্ধানে। অনেক কষ্টে তার স্ত্রীর একটা চাক্‌রী জুট্‌লো, কিন্তু সেমেন্ দেশে-দেশেই ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। একদিন সে একটা রেলে যাচ্ছিল,—একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌তেই সে জান্‌লা দিয়ে মুখ বের করে' দেখ্‌তে লাগ্‌ল। ষ্টেশন্ মাষ্টারকে দেখে তার যেন পরিচিত বলে' বোধ হ'ল। তা'রা উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। উভয়েই চিন্‌তে পার্‌লে। সেমেনের মনে পড়্‌ল,—ষ্টেশন্ মাষ্টার ভদ্রলোকটি ছিলেন তাদের সৈন্যদলের একটি কর্ম্মচারী।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি আইভ্যানভ্?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তুমি কি করে' এখানে এলে?"

সেমেন্ সমস্ত খুলে বল্‌ল।

—"এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

—"আজ্ঞে, আমি তা নিজেই জানিনা।"

—"পাগল! তুমি জাননা—মানে?"

—"আজ্ঞে, আমি ঠিক্‌ই বল্‌ছি। পৃথিবীতে যাবার জায়গা আমার নেই। আমি একটা চাক্‌রীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

ষ্টেশন্ মাষ্টারটি তার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কি ভাব্‌লেন। তারপর বল্‌লেন—"শোন। কিছুকাল এই ষ্টেশনে থাকো। তুমি নিশ্চয়ই বিবাহিত?—তোমার স্ত্রী কোথায়?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার অনুমান সত্য। আমার স্ত্রী কার্স্কে এক সওদাগরের অফিসে কাজ করে।"

—"ভালো, তোমার স্ত্রীকে এখানে চলে' আস্‌তে লিখে দাও। শীঘ্রই একটা ওয়াচম্যানের চাক্‌রী খালি হবে। আমি তোমার জন্য বলে' দেখ্‌ব!"

সেমেন্ বল্‌লো—"আপনার এই অসীম দয়ার জন্য আমি চির-কৃতজ্ঞ।"

তারপর সে ষ্টেশনেই রয়ে গেল; ষ্টেশন মাষ্টারের রান্নার কাজে সাহায্য করত ও রেলষ্টেশনের প্লাট্‌ফরম্ ঝাঁট দিত। এক সপ্তাহের ভেতর তার স্ত্রী এসে পৌঁছল। তারপর একদিন সে ওয়াচম্যান্‌দের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরগুলির একটিতে চলে' গেল। বাড়িটা তার বেশ ভালো লাগ্‌ল। বাড়ির সাম্‌নে একটা বাগান ছিল,—সেখানে সে ফল

ফুলের গাছ লাগাবেই ঠিক্ ক'রল ; একটা ঘোড়া ও একটা গরু কেনবারও সংকল্প করে' ফেল্‌ল।'

তার দরকারী সমস্ত জিনিষই তাকে দেওয়া হয়েছিল—দুটো লাল ও সবুজ নিশান, একটা লণ্ঠন, একটি বাঁশী, একটা হাতুড়ী, লাইনে স্ক্রু আঁটবার জন্যে একটা সাঁড়াশী ইত্যাদি। তাকে দুখানা বইও দেওয়া হয়েছিল—একখানি 'টাইমটেবল্', আর একখানি 'রুল্-বুক'। যদিও তার বানান্ করে' করে' পড়তে হ'ত, তা'হলেও সে বিপুল উদ্যমে 'রুল্'গুলি (আইন) মুখস্থ করতে আরম্ভ করে' দিল। গাড়ীর শব্দ শুনলেই সে দৌড়ে যেত তার 'ডিউটি'-তে।

সে সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল, কাজকর্মের খুব বেশী চাপ ছিল না। দিনে দু'চারখানার বেশী গাড়ী নেই, সেমেন্ তার হাতুড়ী ও সাঁড়াশী নিয়ে দিনে দু'বার লাইনে কাজ করতে বেরিয়ে পড়ত; লাইনের জোড়া ও কাঠ পরীক্ষা করে' দেখ্‌ত, যেখানে মেরামত দরকার, সেখানে মেরামত্ করত। তারপর ঘরে ফিরে এসে তার বাগানের কাজে লেগে যেত। কিন্তু তার বাগানের কাজে একটা বাধা ছিল। যখনি কিছু লাগাতে ইচ্ছে হ'ত, তখনি লাইনের অফিসারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হ'ত। তার ফল হ'ত এই যে—আবেদন মঞ্জুর হবার পূর্ব্বেই জিনিষ লাগাবার সময় চ'লে যেত। সেমেন্ ও তার স্ত্রীকে ভারী নিঃসঙ্গ ভাবে থাকতে হত।

*　　　*

দুটো মাস কেটে গেল। সেমেন্ তার নিকটবর্ত্তী ওয়াচ্‌ম্যান্‌দের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে সুরু করে দিল। একটি লোক ছিল বেজায় বুড়ো, তার স্ত্রীই তার হয়ে লাইনের কাজ-কর্ম্ম করত। আর একটি ওয়াচ্‌ম্যান্ থাকত ষ্টেশনের নিকট,—সে দীর্ঘকায় সবল যুবা। সেমেনের সঙ্গে তার প্রথম দিন দেখা হয়—যেখানটায় দু'টো লাইনের জংশন্ (সংযোগস্থল)। সেমেন্ টুপি খুলে তাকে অভিবাদন করে' বল্‌ল, "কি ভাই, ভালো ত ?"

সে বক্রদৃষ্টিতে সেমেনের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল,—"হাঁ, তুমি কেমন আছ ?"—তারপর আপন মনে চলে' গেল।

কিছুদিন পর তাদের দু'জনার স্ত্রীর পরিচয় হ'ল। সেমেনের স্ত্রী এরিণা তার প্রতিবেশীর স্ত্রীকে সানন্দে সম্ভাষণ করল। সেও কয়েকটি কথা বলে' চলে' গেল।

একমাসের ভিতরই তাদের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সেমেন্ ও ভেসেলি প্রায় রেল-লাইনের ধারে বসে' তাদের পাইপ্ ধর্‌তো, আর সংসারের কথাবার্ত্তা চলত। ভেসিলি প্রায় নীরব থাক্‌ত। কিন্তু সেমেন্ ক্রমাগত তার গ্রামের কথা আর যুদ্ধের কথা বলত।

একদিন ভেসিলি বল্‌ল, "দেখ ভাই, রেলের ওই বিশ্রী ঘরগুলো তোমার আমার মত হতভাগ্যদের জন্যেই তৈরী হয়েছিল।"

"কেন, ও ঘরগুলো খারাপ কিসে ? ওঘরে বাস করতে ত' কোন অসুবিধা হয় না।

—"ও ঘরগুলো খুব ভালো ? বল কি ? তুমি অবিশ্যি অনেকদিন ধ'রেই পৃথিবীতে রয়েছে, কিন্তু তোমার বুঝ্‌বার ক্ষমতা খুব অল্প। তুমি অনেক-কিছু দেখেছ সত্য, কিন্তু কিছুই চেনোনি। ওয়াচ্‌ম্যান্‌দের তাদের ঘরগুলোতে বাস ক'রে যত কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে হয়, সম্ভবতঃ আর কোথাও তেমন হয় না। ওই রক্তপিপাসু রেল্‌ওয়ের কর্ম্মচারীরা তোমাকে আস্ত গিলে খাবে, তোমার দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত তারা শুষে' নেবে, তারপর যখন বার্দ্ধক্যের চাপে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়্‌বে, তখন তোমাকে একটা সামান্য কুকুরের মত' দূর ক'রে দেবে।—আচ্ছা, তুমি কত পাও।"

—"বারো টাকা।"

—"আমি পাই তেরো। কোম্পানীর আইন-অনুসারে আমাদের সকলেরই সমান বেতন পাওয়া উচিত। ওরা যদি আমাদের সকলের প্রতি সমান ব্যবহার কর্‌ত, তা'হ'লে আক্ষেপের বিশেষ-কিছু ছিলনা। কিন্তু তাদের অবিচার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই মনে করেছি, যেদিকে আমার দু'চোখ্ যায়—বেরিয়ে পড়্‌ব।"

—"তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছ ভাই ? এখানে তবু তোমার একখানি ঘর আছে, কিছু জমি আছে,—সেখানে ইচ্ছেমত তুমি কাজ কর্‌তে পার।"

—"জমি? আমার জমি? বেশ্ বলেছ! গতবছর শরৎকালে আমি ক'টা কপির চারা পুঁতেছিলাম। একদিন লাইনের কর্ত্তা এসে বল্লেন—'এটা কি হচ্ছে? তুমি আমার কাছে অনুমতি চেয়েছিলে? দূর হও!'—বলে' সেগুলো তুলে' নিয়ে গেলেন।"

এই বলে' ভেসিলি কিছুক্ষণ ধ'রে তার পাইপ্ টান্‌তে লাগ্‌ল। তারপর বললে,—"রোস, আর কিছুদিন যাক্, আমি মেরে ওর হাড়গুঁড়ো ক'রে দেবো।"

—"থাক্ ভাই, ওসবে আর কাজ নেই। তোমার মাথা আজ মোটেই ঠাণ্ডা নেই।"

—"আমার মাথা মোটেই গরম নয়। আমি যা বলি, ভেবেচিন্তে খাঁটি কথাই বলি। দেখে নিও, ওর আর আমার হাতে রক্ষে নেই।—আমি এই লাইনের বড়কর্ম্মচারীর কাছে নালিশ করব।"

সে নালিশ করল।

লাইনের বড় কর্ম্মচারী পরিদর্শন করতে এলেন। ওয়াচ্‌ম্যান্‌রা তাঁর আস্‌বার কথা শুনে যে যার কাজে উঠে প'ড়ে লেগে গেল। সেই বুড়ো ওয়াচ্‌ম্যানের স্ত্রী তাকে পাঠিয়ে দিল জঙ্গল পরিষ্কার করতে। সেমেন্ ও ভেসিলি দু'জনেই খুব খেটে কাজ করতে লাগ্‌ল। লাইনের বড় কর্ম্মচারী একটা ঠেলা গাড়ীতে ক'রে এলেন। এসে—সেমেনের দরজায় খা দিলেন। সেমেন্ তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এলো। তার কাজকর্ম্মে কিছুই ত্রুটি ছিলনা।

অফিসার বললেন—"তুমি এখানে কতদিন রয়েছ?"

—"আজ্ঞে, গত ২রা জুন থেকে।"

—"আচ্ছা বেশ্। ১৬৪ নং ঘরে কে আছে?"

লাইনের কর্ত্তাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বল্লেন—"ভেসিলি স্পিরিডোনভ্।"

—"স্পিরিডোনভ্,......স্পিরিডোনভ্......হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। যে গত বছর তোমার নামে নালিশ করেছিল,—সেই ত'?"

—"আজ্ঞে হাঁ, সেই লোকটাই।"

—"আচ্ছা, চল, দেখ্‌ছি।"

গাড়ীটা আস্তে আস্তে চ'লে গেল। সেমেন্ একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে রইল, আর ভাবতে লাগ্‌ল—আমার বন্ধুর কপালে আজ না-জানি কত লাঞ্ছনাই আছে!

দু'ঘণ্টা পরে সে কাজে বেরিয়ে পড়্‌ল। কিছুক্ষণ পর সে দেখ্‌তে পেলো—মাথায় শাদা-কাপড়-বাঁধা একটি লোক লাইন্ বেয়ে আস্‌ছে। সেমেন্ উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল লোকটি কাছে এলে দেখ্‌লে,—সে আর-কেউ নয়, ভেসিলি। তার হাতে একটা লাঠি, কাঁধে একটা পোঁট্‌লা, আর গাল-দুটো রুমাল দিয়ে বাঁধা।

সেমেন্ তার দিকে তাকিয়ে বলল,—"ভাই কোথায়

ভেসিলি আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে এলো। তার মুখখানা ক্ষতবিক্ষত ও ফ্যাকাসে, তার ওপর বাঁধা রয়েছে একটা রুমাল। সে কথা বলতে গেল, প্রথমে গলা দিয়ে স্বর বেরুল না।

—"আমি মস্কো শহরে শাসনকর্ত্তাদের কাছে যাচ্ছি।"

—"শাসনকর্ত্তাদের কাছে? কেন? নালিশ করতে বুঝি? ভাই ভেসিলি, দোহাই তোমার, ও-সংকল্প ত্যাগ কর।"

—"না ভাই, মাপ করো, আমি তা পারব না। আজ সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ—তারা আমার মুখের উপর আঘাত ক'রে রক্ত বের করে' দিয়েছে। যতদিন আমি বাঁচবো, এ অত্যাচারের কাহিনী কোনদিন ভুলতে পারব না।"

সেমেন্ ধীরে ধীরে তার হাতখানি তুলে' নিল।

—"ভেসিলি, ভাই, তুমি আর এ নিয়ে গণ্ডগোল ক'রোনা।"

—"গণ্ডগোল করবনা? জানি—তুমি ভাগ্যের ওপর সব দোষ চাপিয়ে দেবে। কিন্তু আমি তোমার মত অত বোকা নই যে অত্যাচারের প্রতিবাদ করব না। দেখে নেব—ভাগ্যের জোর কতখানি।"

—"ভাই, কি হয়েছে খুলে' বল।"

—"কি হয়েছে? সে আমার ওখানে যেয়ে সব দেখ্‌ল। আমি সবই ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। সে যখন চ'লে যাচ্ছিল, তখন আমি নালিশ করলাম। সে আমার দিকে

কটমট ক'রে তাকিয়ে ব'ল্‌ল, 'আমি এসেছি সরকারী কাজের জন্ত, তুই তোর সামান্ত বাগানের কথা নিয়ে আমাকে কেন বিরক্ত করতে এসেছিস্?' তখন আমার সহ্য হ'লনা। মুখদিয়ে গোটাছই ঝাঁঝালো কথা বেরিয়ে গেল, কিন্তু তা এমন মারাত্মক কিছু নয়। তাইতে রেগে আমার গালের উপর কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। আমি কোন কথা বলিনি তারা চ'লে গেলে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়েছি।"

—"তোমার কাজের কি হবে?"

—"আমার স্ত্রী রইল, সেই সব দেখ্‌বে। বিদায়!-জানিনা সুবিচার পাব কিনা।"

—"তুমি হেঁটে যাচ্ছনা নিশ্চয়ই।"

—"দেখি, যদি একটা মালগাড়ীতে যেতে পারি। তাহ'লে কালকেই মস্কো পৌছতে পারব।" তারপর তারা দু'জনে তুজনার কাছে বিদায় নিল।

অনেকদিন চ'লে গেছে। সে আর ফিরে' আসেনি। তার স্ত্রী-ই তার হয়ে কাজ করে। দিনে রাতে তার চোখে আর ঘুম নেই। প্রতিদিনই সে তার স্বামীর প্রতীক্ষায় ব'সে থাকে, তন্ন তন্ন ক'রে প্রত্যেক গাড়ীটি খোঁজে,—কিন্তু 'ভেসিলি'-কে পায়না। 'সেমেন্' একদিন তাকে দেখ্‌তে পেয়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌ল—"কি, তোমার স্বামী ফিরে এসেছে?" সে উত্তর দিতে পারল না। তার বেদনা-কাতর চোখ্ দু'টি দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়্‌তে লাগল।

* * *

সেমেন্ 'উইলো' গাছের ডালপালা দিয়ে বেশ ভালো বাঁশী বানাতে পারত। অবসর সময়ে ব'সে ব'সে বাঁশী বানাত, আর বাজারে বিক্রী ক'রে দু'চার পয়সা রোজগার কর্‌ত। একদিন বিকেল-বেলায় বাঁশী বাজাবার জন্তে ভালো-ভালো 'উইলো' গাছের ডাল কেটে আন্‌তে একখানা ছুরি নিয়ে বনে গেল। যেখানে তার পরিচিত রেলওয়ে লাইনটা বেঁকে গিয়েছে, সেখান থেকে একটা সরু রাস্তা বেয়ে সে বনের ভেতর ঢুকে পড়্‌ল। অনেক ঘুরে ঘুরে তার মনের মত কতকগুলি সরু সরু 'উইলো' গাছের ডাল কেটে আঁটি বাঁধল। তারপর সেটা কাঁধের ওপর ফেলে সে ধীরে ধীরে বাড়ীর পথে ফির্‌ল। তখন সূর্যাদেব অস্তমিতপ্রায়। বনের ভিতর গভীর নিস্তব্ধতা। পাখীর ডাক, আর শুকনো পাতার খস্‌খস্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। সেমেন্ প্রায় লাইনের ধারে এসে পড়েছে, এমন সময় তার মনে হ'ল, কে যেন দু'টো —লোহার জিনিষ নিয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দ করছে। সেমেন্ জোরে হাঁটতে লাগ্‌ল। তখন লাইনের অংশে মেরামত কর্‌বার কোনও দরকার ছিলনা। সে সেই শব্দটা কি হতে পারে ভাব্‌তে ভাব্‌তে পথ চল্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে সে বন ছাড়িয়ে এলো—তার সাম্‌নে সেই রেলওয়ে লাইনটা বেঁকে চ'লে গিয়েছে। একটা লোক লাইনের ওপর ব'সে কি-যেন করছিল। সেমেন্ ভাব্‌ল—নিশ্চয়ই কেউ রেলের স্ক্রু চুরি করতে এসেছে। সেমেন্ তারদিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা উঠে দাঁড়ালো। তার হাতে একটা বড় লোহার ডাণ্ডা, তাই দিয়ে সে লাইনের ওপরে পেটাচ্ছিল। সেমেনের চোখে সব ধোঁয়া ধোঁয়া লাগ্‌ছিল; সে চীৎকার করতে চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু পারলনা; দৌড়ে গিয়ে দেখ্‌ল—লোকটা আর কেউ নয়, ভেসিলি; সে লাইনের একটা জোড়া খুলে' দিয়েছিল। ভেসিলি এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না ক'রে দৌড়ে চ'লে গেল।

সেমেন্ চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ভেসিলি, ভাই, আমাকে ডাণ্ডাটা দাও। আমি লাইনটা জোড়া লাগিয়ে দিই। কেউ জান্‌তে পার্‌বেনা ভাই। ফিরে এসো—পাপের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাও।"

ভেসিলি ফিরে না এসে বনের ভিতর চ'লে গেল।

সেমেন্ সেই ভগ্ন রেল লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে রইল,—তার হাত থেকে 'উইলো' ডালের আঁটিটা প'ড়ে গেল। শীঘ্রই একটা প্যাসেঞ্জার-ট্রেন্ আস্‌বার কথা। তার কাছে কোনও নিশান ছিলনা—যা দিয়ে গাড়ী থামাতে পারে। সেমেন্ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, যা ক'রেই হোক্ গাড়ী থামাতেই হবে। অম্‌নি সে ছুটে চল্‌ল, তার বাড়ীর পথের দিকে; প্রতিপদেই তার ভয় হচ্ছিল—বুঝিবা প'ড়ে যায়। তার বাড়ী আর ১০০ গজ দূরে।—এমন-সময়

ঢং ঢং ক'রে ছ'টা বেজে উঠ্‌ল। আর ছ'মিনিট পরেই গাড়ি আস্‌বার কথা।—"হা ভগবান্‌, নিরীহ প্রাণীদের বাঁচাও!"—সেমেনের চোখের সাম্‌নে সেই নিষ্ঠুর বীভৎস ধ্বংসের ছবিখানি ফুটে উঠ্‌ল।—"গাড়িখানি যখন বাঁক ঘু'রে আস্‌বে, তখন পর্য্যন্ত আরোহীরা জান্‌তে পার্‌বেনা, আজ তাদের জন্য কি ভীষণ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা কর্‌ছে!" হায় প্রভু, আমায় ব'লে দাও—আমি কি করব।—তার মনে হ'ল, তার প্রাণের ভেতর থেকে কে যেন বল্‌ছে—"আর বাড়ী যাবার সময় নেই। যাও, সেই ধ্বংসস্থলে ছুটে যাও!"

সেমেন্‌ ভূতগ্রস্তের মত ছুটে চল্‌ল। সে বুঝ্‌তে পারছিল না—কি করবে। সেই ভগ্ন রেল্‌ লাইনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে তা'র উইলো-ডালের আঁটিটা প'ড়ে ছিল। সে একটা ডাল তু'লে নিল—নিজেই জানে না কেন। গাড়ীর শব্দ শোনা যাচ্ছিল;—ভীষণ শব্দ ক'রে, বাঁশী বাজিয়ে বিরাট্‌ দৈত্যের মত গাড়ি ছুটে আস্‌ছিল। সেমেনের আর চল্‌বার শক্তি ছিলনা। সে সেই ধ্বংসস্থলের দু'শো গজ দূরে দাঁড়িয়ে প'ড়্‌ল। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সে তার টুপির ভেতর থেকে একখানা রুমাল টেনে বের করল, কোমর থেকে ছুরিটা খুলে' নিল। তার পরে দুই হাত একত্র ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—"হে ঈশ্বর! আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।"

সে তার ছুরি দিয়ে কনুইয়ের কাছ থেকে চিরে ফেল্‌ল। ফিন্‌কি দিয়ে গরম রক্ত ছুটে বেরুতে লাগ্‌ল। সেই রক্তে সে তার রুমালটাকে রাঙিয়ে নিলে; তারপর সেইটেকে লাঠির ডগায় বেঁধে উঁচু ক'রে ধর্‌ল,—ঐ হ'ল তা'র লাল নিশান।

সে সেইখানে দাঁড়িয়ে তা'র নিশানটাকে নাড়াতে লাগ্‌ল। ট্রেণ চ'লে এসেছে। এঞ্জিন-চালক তাকে দেখ্‌তে পেলনা,—ট্রেণ ক্রমেই এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

ক্রমেই তার হাত দিয়ে বেশী রক্ত বেরুতে লাগ্‌ল। সেমেন্‌ সেই রক্ত থামাবার জন্যে গায়ের সঙ্গে ক্ষতস্থলটাকে শক্ত ক'রে চেপে রাখ্‌ল। কিন্তু রক্ত থাম্‌বার নয়, ক্ষতটা হয়েছিল বেজায় গুরুতর। তার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগ্‌ল,...চোখের সাম্‌নে যেন অসংখ্য পোকা উড়্‌তে লাগ্‌ল ...সে চারদিক্‌ অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌ল। গাড়ির শব্দ আর তার কানে আস্‌ছিল না। তা'র কেবল একটি কথা মনে হচ্ছিল—"আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পার্‌বনা,—আমি প'ড়ে যাব—নিশানটা আমার হাত থেকে প'ড়ে যাবে—গাড়িটা আমার ওপর দিয়ে চ'লে যাবে—হে ঈশ্বর, আমায় বাঁচাও,—সকলকে বাঁচাও......"

তার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে এলো,—শিথিল হাত থেকে নিশানটা প'ড়ে গেল। কিন্তু নিশানটা মাটিতে পড়্‌লনা, কে যেন সেটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে চলন্ত ট্রেণের দিকে উঁচু ক'রে ধ'র্‌ল। গাড়ির চালক দেখ্‌তে পেলো, ব্রেক্‌ কষ্‌লো,—গাড়িটা থেমে গেল। আরোহীরা তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়্‌ল। তা'রা দেখ্‌তে পেলো—লাইনের ওপর একটা লোক রক্তাপ্লুত দেহে অচেতন হয়ে পড়ে' রয়েছে—আর তারই পাশে আর একটা লোক রক্ত-নিশান হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ভেসিলি চারদিকে তাকিয়ে মাথা নীচু ক'র্‌ল, তারপর ধীরে ধীরে ব'লল,—"আমিই লাইনের জোড়া খু'লে দিয়েছিলাম। আমাকে বেঁধে নাও।"

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়

অন্তরাগ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩৭

কলিকাতায় আসিয়া বিনয় ক্যালকাটা হোটেলে তাহার নিজের রুমে উঠিয়াছিল। কলিকাতা ত্যাগ করিবার সময়ে তাহার ঘরটি সে ছাড়িয়া দিয়া যায় নাই, বরাবরই তাহার অধিকারে রাখিয়াছিল। কলিকাতায় পৌঁছিয়া সেইদিনই সে আহারাদির পর অপরাহ্ণের দিকে কন্টিনেন্টাল হোটেলে তাহার পরিচিত বন্ধু ফরাসী আর্টিষ্টের সহিত দেখা করে এবং বিশেষ অনুরোধ উপরোধের দ্বারা তাহাকে ক্যালকাটা হোটেলে নিজের রুমে লইয়া আসে। কয়েকদিন বিনয়ের অতিথি রূপে ক্যালকাটা হোটেলে বাস করিয়া দিন পাঁচেক হইল সে দার্জ্জিলিং গিয়াছে।

যে কয়েকদিন ঘরে অতিথি ছিল বিনয় তাহার ছবি আঁকার কাজে হাত দিতে পারে নাই, সে চলিয়া যাওয়ার পর হইতে কয়েকদিন অবিরত ছবি আঁকিয়াছে অন্য কোনো কাজ করে নাই, এমনি কি কমলার দ্বিতীয় পত্রের দুইদিন হইতে উত্তর দেওয়া পর্য্যন্ত পড়িয়া ছিল। আজ সমস্ত অপরাহ্ণ কমলাকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া খামে মুড়িয়া ঠিকানা লিখিয়া টিকিট আঁটিয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছে এমন সময়ে বাহিরে বারান্দায় তাহার ঘরের সম্মুখে পদশব্দ থামিল। হোটেলের ভৃত্য বাহির হইতে বলিল, "হুজুর, একটি লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

"ঘরে আস্‌তে বল।"

পর্দা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া নত হইয়া সেলাম করিল মহবুব—দ্বিজনাথের খোকার।

মহবুবকে দেখিয়া বিনয়ের চক্ষু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। "কি মহবুব, কবে এলে তুমি ?"

"আজ সকালে হুজুর।"

"তুমি একা এসেছ, না সকলেই এসেছেন ?"

"না হুজুর, সকলেই এসেছেন। নীচে গাড়ীতে সাহেব আর দিদিমণি রয়েছেন।"

"চল, আমি এক্ষুনি আসছি।" বলিয়া তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন সারিয়া লইয়া বিনয় নীচে নামিয়া আসিল।

হোটেলের দিকে দ্বিজনাথ বসিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার আড়ালে বসিয়া ছিল কমলা। তথাপি দ্বিজনাথের উৎফুল্ল দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়াও বিনয়ের দৃষ্টি প্রথমেই নিমেষের জন্য পড়িল কমলার দৃষ্টির উপর। কমলা চক্ষু নত করিল, বিনয় তাড়াতাড়ি গাড়ির পাশে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দ্বিজনাথের পদস্পর্শ করিয়া বলিল, "আপনারা এত শীঘ্র চ'লে এলেন যে ? আরো মাসখানেক থাকবার কথা ছিল ত।"

দ্বিজনাথ সহাস্যমুখে বলিলেন, "তুমি হঠাৎ চ'লে এলে তারপর আমাদের আর কেমন ভাল লাগ্‌ল না, তাই চ'লে এলাম। তা ছাড়া, এবার হঠাৎ কোনোদিন কমলার মার সীলোন থেকে রওনা হবার তার এসে পড়বে—তার আগে চ'লে আসাই ভাল।"

বিনয় বলিল, "তা ভালই করেছেন। চলুন, আমার ঘরে গিয়ে একটু বস্‌বেন চলুন।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "তা না হয় চল একটু বসছি, কিন্তু আমরা কেন এসেছি জান ?—তোমাকে নিয়ে যেতে এখন থেকে তুমি আমাদের বাড়িতে থাক্‌বে।"

বারম্বার দ্বিজনাথের বহুবচনের ব্যবহারে কমলা বিব্রত হইয়া উঠিল। বিনয় চলিয়া আসিলে জলিভি তাহারও ভাল লাগিত না এ হয়ত সত্য কথা, এবং বিনয়কে তাহাদের বাড়ি লইয়া যাওয়ার ব্যাপারে তাহারও ইচ্ছা আছে সে কথাও হয়ত মিথ্যা নয়, কিন্তু তাই বলিয়া সে কথাগুলো এভাবে বিনয়ের কানে ওঠে কেন?

বিনয় কিন্তু তখন ঠিক সে কথা ভাবিতেছিল না, মৃদু হাসিয়া বলিল, "চলুন, ওপরে গিয়ে সে কথা হবে এখন।"

"চল" বলিয়া দ্বিজনাথ গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়া কমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কমল, এস।"

কমলা বলিল, "আমি গাড়িতেই থাকিনে বাবা!"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "গাড়িতে থাকবে কি? তা হ'লে ত' বাড়িতেও থাকতে পারতে। "এস, নেমে এস।"

একথায় কমলার মুখ লাল হইয়া উঠিল, যেন সে নিজেরই চেষ্টায় এবং আগ্রহে বাড়ি হইতে আসিয়াছে; অথচ ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত, দ্বিজনাথের সহিত বিনয়ের হোটেলে আসিতে সে বিশেষভাবে আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু দ্বিজনাথ তাহার সে আপত্তি শুনেন নাই।

কমলার সলজ্জ দ্বিধা দেখিয়া বিনয় মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; বলিল, "ওপরে যেতে আপত্তির কি থাকতে পারে?"

কমলা আর কোনো কথা না বলিয়া নামিয়া পড়িল।

বিনয়ের ঘরে প্রবেশ করিলে বিনয় দুইখানি চেয়ার দ্বিজনাথ ও কমলার জন্য আগাইয়া দিল, তাহার পর নিজে একখানি টানিয়া লইয়া বসিল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "তোমার ঘরখানি ত' বেশ সুন্দর বিনয়।"

বিনয় হাসিমুখে বলিল, "ঘরখানি নিতান্ত মন্দ নয় কিন্তু ঘরের অবস্থা শোচনীয়।" বলিয়া কমলার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

কমলার মুখে সম্মতির নীরব হাস্য ফুটিয়া উঠিল; সে ঘরখানি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এক কোণে ইজেলের উপর একটি অর্দ্ধ-সমাপ্ত পুরুষের চিত্র, বাঙালীর নয়, সম্ভবতঃ কোনো ইংরাজের; পাশের টেবিলের উপর রঙ, তুলি প্রভৃতি এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। ঘরের আর এক কোণে কাঠের আন্‌লা, তাহাতে বিলাতি সুট এবং দেশি ধুতি ঘাড়াঘাড়ি করিয়া রাখা। তাহার পর কমলার দৃষ্টি পড়িল তাহার বাঁ দিকে লিখিবার টেবিলের উপর,—একরাশ বই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, প্রয়োজন কালে তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করা হইয়াছে কিন্তু প্রয়োজনান্তে আর তাহাদের কথা মনে পড়ে নাই; একটা খোলা ফাউন্টেন্ পেন্, তাহার নিকটেই একটা নীলাভ খাম, উপরে বাঙলায় লেখা শ্রীমতী কমলা দেবী, তাহার নীচে ইংরাজিতে জলিভির ঠিকানা। দেখিয়া কমলার মুখ লাল হইয়া উঠিল। একবার মনে করিল আস্তে আস্তে তুলিয়া লইয়া লুকাইয়া ফেলে, কিন্তু পাছে দ্বিজনাথ দেখিয়া ফেলেন সেই ভয়ে তাহা না করিয়া টেবিল হইতে একখানা বই তুলিয়া লইয়া দু'চার বার পাতা উল্টাইয়া সেটা চিঠিটার উপর স্থাপিত করিল,—চিঠি অদৃশ্য হইল।

কাজটা করিয়াই সে অপরাধীর মত তাড়াতাড়ি চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিয়াছে কি-না; দেখিল বিনয় তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, মুখে তাহার কৌতুকের নীরব হাস্য। ধরা পড়িয়া গিয়া কমলারও মুখে মৃদু হাস্যের ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল

দ্বিজনাথ বলিলেন, "ভুল করলে কমল, বইখানা তুলে সরিয়ে রাখ। চিঠিটা বোধহয় পোষ্ট করতে হবে, চাপা প'ড়ে গেল।"

কি বিপদ! দ্বিজনাথেরও দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই!—আরক্ত মুখে কমলা তাড়াতাড়ি বইখানা তুলিয়া লইয়া সরাইয়া রাখিল। পূর্ব্বে না পড়িলেও এবার পাছে দ্বিজনাথ চিঠির উপর তাহার নাম পড়িয়া ফেলেন এই আশঙ্কায় সে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

ঘটনার কৌতুকাবহতায় বিনয় অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, এবং চিঠিটা দ্বিজনাথের দৃষ্টির অন্তরালবর্ত্তী করিবার জন্য কমলা একটু নড়িয়া চড়িয়া সরিয়া বসিল। কিন্তু দ্বিজনাথের সে দিকে আর কোনো চেষ্টা অথবা আগ্রহ ছিল না; তিনি তাঁহার প্রস্তাব পুনর্ব্বার

তুলিয়া বলিলেন, "আমি আমার সরকার সতীশকে সঙ্গে এনেছি—খুব সাবধানী আর বিশ্বাসী লোক। সে তোমার সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে প্যাক্ ক'রে একটা লরীতে নিয়ে যাবে—তোমায় কিছুই দেখতে শুনতে হবে না। তুমি আমাদের সঙ্গে চল।"

বিনয় বলিল, "এখন কিছুদিন এখান থেকে গেলে আমার কাজ কর্ম্মের অতিশয় অসুবিধা হবে। বন্ধু, বান্ধব, কুটুম্ব সকলেই এখানে সর্ব্বদা আসচেন।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "তাঁরা এখন থেকে সেখানে যাবেন। তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে সেখানে তোমার একটা স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা অতি সহজেই হ'তে পারবে,—আর এখানে আমাদের বাড়ির ঠিকানা রেখে দিলেই চল্বে।"

বিনয় কিন্তু সেইদিনই যাইতে কিছুতেই রাজি হইল না; বলিল, "এখন কিছুদিন থাক্—পরে গেলেই হবে।"

খানসামা একটা বড় ট্রে করিয়া চায়ের সরঞ্জাম এবং খাবার লইয়া আসিল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "আবার এ-সব হাঙ্গামা কেন করলে? আমরা ত' চা খেয়েই বেরিয়েচি। তা ছাড়া, চা আমার পক্ষে বেশি খাওয়া ভাল নয়।"

যত্নাশ্রিত কণ্ঠে পরম আগ্রহের সহিত বিনয় বলিল, "তা হ'লে একটা সরবৎ আনিয়ে দোবো বাবা?—লাইমজুস্ কর্ডিয়াল কিম্বা লেমন স্কোয়াশ্?"

অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় দ্বিজনাথ মনে মনে একটু অভিমান-পীড়িত হইয়াছিলেন, বিনয়ের এই আত্মীয়তার সম্বোধনে সে অভিমানটুকু নিমেষে অন্তর্হিত হইল, তাহার আতিথ্যকে প্রত্যাখ্যান করিতে প্রবৃত্তি হইল না; বলিলেন, "তা না হয় একটা আনাও।"

বিনয়ের আদেশ পাইয়া খানসামা ছুটিল।

চা খাওয়া হইয়া গেলে দ্বিজনাথ বলিলেন, "আজ নিতান্ত বাসা তুলে না যাও, আজ আমাদের সঙ্গে চল, খাওয়া-দাওয়া ক'রে আস্বে।"

এ প্রস্তাবে বিনয়ের আপত্তি ছিল না—সে উঠিয়া টেবিল হইতে কমলাকে লিখিত চিঠিখানা লইয়া পকেটে পুরিল, তাহার পর একটা ছড়ি লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়ে দ্বিজনাথ যাইতেছিলেন সর্ব্বাগ্রে, তাঁহার পশ্চাতে যাইতেছিল কমলা এবং তৎপশ্চাতে বিনয়। সুযোগ বুঝিয়া বিনয় চিঠিখানা কমলার দক্ষিণ হস্তে ঢুকাইয়া দিল। আপত্তি করিলে পাছে দ্বিজনাথের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় সেই ভয়ে কমলা চিঠিখানা লইয়া বস্ত্রান্তরালে লুকাইয়া ফেলিল। চিঠিটার উপর তাহার লোভ এবং আগ্রহও অল্প ছিল না।

গাড়িতে উঠিয়া দ্বিজনাথ সোফারকে বলিলেন, "সার্কুলার রোড দিয়ে বাড়ি চল।" তাহার পর শিয়ালদহ পোষ্টাফিসের নিকট গাড়ি উপস্থিত হইলে বলিলেন, "বাঁয়ে একটু রাখ।" গাড়ি থামিলে বলিলেন, "সতীশ, একটা চিঠি ডাক বাক্সে ফেলে দিয়ে এস।" বলিয়া বিনয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার চিঠিটা দাও বিনয়, পোষ্ট ক'রে দিয়ে আসুক।"

বিনয়ের চক্ষু স্থির হইল। চিঠি কমলার নিকট, এবং কমলা দ্বিজনাথের অপর পার্শ্বে। সেখান হইতে অলক্ষিতে চিঠি লইবার কোনো উপায় নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া একবার অকারণ পকেটে হাত পুরিয়া বিনয় বলিল, "থাক্—তাড়াতাড়ি নেই।"

"না হে, আমি ভুক্তভোগী—চিঠি পকেটে বেশিক্ষণ রাখতে নেই,—তা হ'লে নজরে পড়বে একেবারে কাপড় কাচ্তে দেবার দিন। এইটুকু রাস্তা পার হ'য়ে দিয়ে আস্বে তাতে আর কষ্টটা কি?"

সম্মুখের সীট হইতে সতীশ নামিয়া পড়িয়া বিনয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল;—বলিল, "দিন্ না, আমি ফেলে দিয়ে আসি!"

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই চিঠি লইয়া কমলার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া বিনয় মুখ ফিরাইয়া হাসিয়াছিল তাহা কমলা দেখিয়াছিল, এখন সেই চিঠি লইয়াই বিনয়ের অধিকতর বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া তাহা হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইল। সে পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া রহিল।

বিনয় বলিল, "আপনি উঠে পড়ুন সতীশবাবু, চিঠিটা একটু ইয়ে আছে—

চিঠিখানার উপর কমলার বই রাখা স্মরণ করিয়া বুদ্ধিমান দ্বিজনাথের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, চিঠিখানায় রহস্য জড়িত আছে ; বলিলেন, "আচ্ছা তা হ'লে থাক্—বাড়ি চল।"

বালিগঞ্জে দ্বিজনাথের বৃহৎ অট্টালিকা—চতুর্দ্দিকে কম্পাউণ্ড—কেয়ারীকরা ফুলের গাছ—পিছন দিকে পুষ্করিণী।

দ্বিতলে উঠিয়া দ্বিজনাথ বিনয়কে তাহার বাসের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন দেখাইলেন। একটা শয়নকক্ষ, একটা বসিবার ঘর, একটা ড্রেসিং-রুম,—তা ছাড়া স্বতন্ত্র বাথরুম। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম আস্‌বাব পত্রের কোথাও কোনো অভাব নাই।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "দিন দুই হ'ল সতীশকে লিখেছিলাম, সে সব ক'রে রেখেছে। এর মধ্যে একটি জিনিসও ব্যবহার করা নয়—সব নতুন।"

জিনিস বড় কম নয়, খাট পালং, চেয়ার টেবিল, আলমারি ড্রেসিং টেবল হইতে আরম্ভ করিয়া পর্দ্দা, ধুতি, বিছানা-পত্র, তোয়ালে-রুমাল পর্য্যন্ত সমস্ত।

সবিস্ময়ে বিনয় বলিল, "দু' দিনে এই সমস্ত করেচেন? —খুব কাজের লোক ত?"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, তা খুব।"

কমলাকে একান্তে পাইয়া বিনয় বলিল, "কমলা, চিঠি পোষ্ট করা নিয়ে কি বিপদেই পড়া গেছল। তুমি কিন্তু খুব যা হ'ক! আমার বিপন্ন দেখে মুখ ফিরিয়ে হাসছিলে?"

কমলা সহাস্যে বলিল, "আর আমাকে যখন বাবা বই তুলতে ব'লেছিলেন তখন তুমি মুখ ফিরিয়ে কি করছিলে—শুনি?"

বিনয় বলিল, "সত্যি! পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে এমন হাতে হাতে করতে হবে তা কে জান্‌ত? চিঠিটা পড়েছ?"

কমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল ; বলিল, "পড়েছি।"

"উত্তর চাই কিন্তু।"

বিনয়ের দক্ষিণ হাতখানা নিজ হস্তের মধ্যে টেনে নিয়ে কমলা বললে, "আমাদের বাড়ি থাকতে রাজি হ'লে না কেন?"

"এখনো বর হলুম না—এরি মধ্যে ঘর-জামাই করতে চাও না—কি?"

"সেইজন্যে?"

বিনয় কমলার মুখের ভাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল ; বলিল, "একটুও সে জন্যে নয়। কমলাকে হাতের মধ্যে পাবার আগে মনের মধ্যে কিছুদিন পেতে চাই। মনে মনে তপস্যা ক'রে তোমাকে পেতে চাই কমলা!"

কমলা মুখ নত করিল।

রাত এগারটায় মোটর করিয়া বিনয় ক্যালকাটা হোটেলে ফিরিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকৃতি

শ্রীমমতা মিত্র

স্বপ্ন দেখ্‌লেম যেন আমি মাটির নীচে এক প্রকাণ্ড মন্দিরে এসেছি, খিলান-করা খুব উঁচু তার ছাদ। উজ্জ্বল আলোয় মন্দির আলোকিত।

তা'র ঠিক মাঝখানে ব'সে এক মহিমময়ী নারী ; পরণে তাঁর সবুজ রংয়ের শাড়ি। হাতের উপর মাথা রেখে তিনি ব'সে ; দেখে বোধ হ'ল গভীর চিন্তায় নিমগ্না

তখনই চিন্‌লেম ইনি স্বয়ং প্রকৃতি দেবী। ভক্তিমিশ্রিত ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ল।

উপবিষ্টা দেবীর সাম্‌নে গেলেম। প্রণাম ক'রে বল্‌লেম, "জননি, কি ভাবনা তোমার? মানুষের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের কথা চিন্তা করছ, না কি ক'রে শ্রেষ্ঠ সুখ ও সম্পূর্ণতা তারা পাবে তাই ভাব্‌ছ?"

ধীরে ধীরে মহিলা তাঁর নিবিড়কৃষ্ণ ভ্রূকুটি-কুটিল চোখ আমার দিকে ফেরালেন। তাঁর ঠোঁট ন'ড়ে উঠ্‌ল। লোহার ঝনঝন্ শব্দের মত কণ্ঠস্বর কানে এল।

"ভাবছি কি ক'রে মাছির পায়ের মাংসপেশীতে বেশী শক্তি দেওয়া যায়, যাতে শত্রুর কবল হ'তে সহজে সে পরিত্রাণ পেতে পারে। আক্রমণ ও আত্ম-রক্ষার সামঞ্জস্য গেছে ভেঙে, আবার তা' প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হ'বে।"

"কি? আমি জড়িয়ে জড়িয়ে উত্তর দিলেম, "এ কি ভাবনা ভাব্‌ছ তুমি? আম্‌রা,—মানুষেরা তোমার প্রিয়-সন্তান নই কি?"

মহিলা ঈষৎ ভ্রূকুটি ক'রলেন। সব জীবই আমার সন্তান। সকলেরই প্রতি আমার সমান টান, আবার সকলকে একই ভাবে ধ্বংস করি"—তিনি উত্তর দিলেন।

আবার জড়িয়ে জড়িয়ে বল্‌লেম, "কিন্তু অধিকার···যুক্তি···ন্যায়বিচার···?"

কঠিন স্বর শুনতে পেলেম,—"এসব কথা মানুষেরই রচা। ন্যায় অন্যায় আমি জানিনে। যুক্তি আমার কাছে আইন নয় ন্যায়বিচার কি? জীবন দিয়াছি তোমায়, ফিরিয়ে নিয়ে দেব অপরকে—মানুষকে হোক্, কীটকে হোক্। তা'তে কিছু এসে যায় না। নিজের কাজে মন দাও, আমায় বাধা দিও না।"

আমি উত্তর দিতেম···কিন্তু পৃথিবী আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠায় শিউরে উঠ্‌লেম। ঘুম ভেঙে গেল। *

শ্রীমমতা মিত্র

টুর্গেনিভ

সান্ত্বনা

শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত

এপারের খেলা সাঙ্গ এবার
বিদায়ের বেলা ঘনায়ে আসে,
এপারের যারা ছিলে আনন্দ
তারা কেহ আর নাহি ত পাশে!
বিদায় লগন যত আগুয়ান
ব্যথায় ততই ভ'রে ওঠে প্রাণ,
যারা গেছ দূরে তাহাদেরই তরে
নয়নের জলে নয়ন ভাসে!

এ জীবনে আর হবে নাকো দেখা,
এ জীবনে দেখা যেন না হয়;
তোমাদের রূপ অমৃত স্বরূপ,
এ জীবনে তার হ'বে না ক্ষয়!
যতদিন আরো বাঁচিয়া রহিব
সে সুধার স্মৃতি হৃদয়ে বহিব
তোমাদের স্মৃতি এ দেহের সাথে
এ জীবনে, জেনো, পাবেনা লয়!

জনমান্তরে জ্যোতির ভুবনে
তোমাদের স্মৃতি পাথেয় হবে,
ভুবনে ভুবনে ভ্রমিব যখন
ভুবন-সেতুরে আলোকি' রবে!
ক্লান্ত এ দেহ লভিবে শ্মশান,
শান্তি-স্বরগে আমি পাব স্থান;
সেথায় পরম পুলকে হেরিব
তোমরা আসিয়া জুটেছ সবে!

মনে মনে আমি জেনেছি এ ধ্রুব
ভালবাসা কভু পায়না লয়;
বিচ্ছেদে তার হয় না মৃত্যু,
মৃত্যুতে তার হয়না ক্ষয়!
মরণ-সেতুর ওপারে যখন
চৌদিকে মোর মেলিব নয়ন,
হেরিব, যাদের বেসেছিনু ভালো
তারা চারিদিকে সবাই রয়!

বীণা

শ্রীমতী অমিয়া দত্ত

নব-বিবাহিত দম্পতী তারা। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ভাবনাই নেই। শুধুই পরস্পরকে ভালবেসে পরম আনন্দে তাদের দিন কাট্‌ছিল। ছেলেবেলা থেকে উভয়ের মধ্যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিণতি প্রগাঢ় প্রেমে। কিন্তু যুবক সমীরের অবস্থা অসচ্ছল। কাজেই এতদিন সে তার হৃদগত কামনা পূর্ণ ক'রতে পারেনি।

বিবাহের পর স্বহস্তে সাজানো ছোট বাড়ীখানিতে দু'জনে এখন খুব সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। সঙ্গীতের উপর উভয়েরই গভীর অনুরাগ। রোজ সন্ধ্যায় কাজকর্ম্ম সেরে সমীর বস্‌তো তার বাঁশী নিয়ে, আর যূথিকা তার বীণা নিয়ে। বাজাতে বাজাতে এক একদিন রাত বেশী হ'য়ে যেত, কিন্তু সেদিকে তাদের কোন খেয়ালই থাক্‌ত না।

একদিন সন্ধ্যায় খানিকটা সঙ্গীতের পর যূথিকা বল্‌লে যে তার খুব মাথা ধ'রেছে। সেদিন সকাল থেকেই তার শরীর খারাপ বোধ হ'য়েছিল; পাছে সমীর ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে এই ভয়ে সে তাকে কিছু বলেনি। কিন্তু বিকেলে জ্বর এল, সঙ্গে সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা বাড়লো। তখন আর স্বামীর কাছ থেকে অসুখের কথা চেপে রাখ্‌তে পারলে না। সমীর উদ্বিগ্ন হয়ে তখনি ডাক্তার নিয়ে এল। ডাক্তার দেখে শুনে বল্‌লেন যে বিশেষ কিছুই হয় নি, সকালে সেরে যাবে, উদ্বেগের কারণ নেই।

সারারাত যূথিকা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগ্‌লো। মাঝে মাঝে প্রলাপ বক্‌ছিলো। সকালে ডাক্তার দেখে বল্‌লেন যে রোগ কঠিন—ভীষণ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য।

ডাক্তারের সমস্ত যত্ন চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল—যূথিকার অবস্থা দিন দিন খারাপ হ'তে লাগ্‌লো। দুর্ভাবনায় সমীরও যেন শুকিয়ে উঠ্‌লো। ন' দিনের দিন যূথিকা নিজেই বুঝতে পারলে যে তা'র কালপূর্ণ হ'য়ে এসেছে; তখন সে শান্তভাবে শেষের জন্ম প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌লো। সমীরকে ডাক্তার ইতিপূর্ব্বেই তার স্ত্রীর নিদারুণ অবস্থার কথা জানিয়ে ছিলেন। অতি কৃশ দুইহাতে স্বামীকে জড়িয়ে ধ'রে ক্ষীণ স্বরে যূথিকা বল্‌লে, "এই যে সুন্দরী ধরণী—যেখানে আমরা দু'জনে এত সুখে ছিলুম, তাকে এবং প্রিয়তম, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার যে কি মর্ম্মান্তিক কষ্ট হ'চ্ছে তা' প্রকাশ করবার মত ভাষা আমার নেই। তবে তোমার কাছে আমি থাক্‌তে পা'ব না বটে, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো যে আমার ভালবাসা এইখানে—তোমার চারদিকে, ঘিরে থাক্‌বে। দুঃখ ক'রোনা। এ বিচ্ছেদ বেশীদিনের জন্ম নয়, শীঘ্রই আবার পরপারে আমাদের মিলন হবে।"

ঐ তার শেষ কথা। সেই রাত্রেই—ঠিক্‌ নয়টার সময় তার মৃত্যু হ'ল।

শোকে সমীরের শরীর ও মন একেবারে ভেঙ্গে প'ড়লো। কেউ তাকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারলে না। কোথায় সেই যৌবনের উদ্যম ও উৎসাহ? অবসাদে দেহ মন ভ'রে গেল। সে যেন অতীতের স্মৃতির মধ্যেই বাস ক'রতে লাগ্‌লো।

যূথিকার শয়ন-কক্ষে কোন পরিবর্ত্তনই সাধিত হয় নি। এখনো টেবিলের উপরে তার সেই সেলাইয়ের বাক্স, এক-কোণে তার বীণাটি সযত্নে স্থাপিত। তাদের ভালবাসা-ভরা এই ঘরটিতে সমীর রোজ সন্ধ্যায় একবার ক'রে যায়, আর বাঁশীখানি হাতে নিয়ে জান্‌লার ধারে ব'সে স্বপ্নের মধ্যে ডুবে থাকে।

সেদিন পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক প্লাবিত। যূথিকার ঘর থেকে সমীর শুনলে নয়টার তোপ। আর সেই মুহূর্ত্তেই যেন কোন অদৃশ্য হস্তের অঙ্গুলি স্পর্শে যূথিকার বীণার তার বেজে উঠ্‌লো। সচকিত ও বিস্মিত হ'য়ে সমীর বাঁশী বাজানো বন্ধ করলে; সঙ্গে সঙ্গে বীণাও থেমে গেল। চিত্রার্পিতের মত তখন সে যূথিকার প্রিয় একটি রাগিণী বাজাতে আরম্ভ ক'রলে এবং আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে দেখ্‌লে

যে বীণা তার সঙ্গে সঙ্গত করছে। আনন্দের শিহরণ তার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে ব'য়ে গেল। সে মেঝের উপর ব'সে তার অদৃশ্য প্রিয়তমার দিকে দুইহাত বাড়িয়ে দিলে। তখন একটা ঈষদুষ্ণ বাতাস ও উজ্জ্বল আলো তার উপর দিয়ে যেন চ'লে গেল। আনন্দের আতিশয্যে সমীর ব'লে উঠল, "তুমি! তুমি আমার যূথিকা! তুমি ব'লেছিলে যে তোমার ভালবাসা দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখ্‌বে, তুমি তোমার কথা রেখেছ। তোমার উপস্থিতি আর আমার অঙ্গে তোমার চুম্বন আমি স্পষ্ট অনুভব করছি

আবার সে বাঁশী হাতে নিলে। সঙ্গে সঙ্গে বীণাও মৃদু মৃদু বাজতে লাগ্‌লো এবং ধীরে ধীরে শেষ সুর বাতাসে মিলিয়ে গেল।

সেই সন্ধ্যার পর থেকে সমীরের শরীর আরো খারাপ হ'ল। রাত্রে সে ভাল ক'রে ঘুমোতে পারে না, যা অল্প স্বল্প ঘুম আস্‌তো তা'ও স্বপ্নজড়িত। কেবলি মনে হ'ত যে বীণা যেন তাকে ডাক্‌ছে। সে চম্‌কে তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠে বস্‌তো। কিন্তু কোথাও কোন সাড়া না পেয়ে হতাশভাবে আস্তে আস্তে আবার শুয়ে প'ড়ত। রাত্রের অনিদ্রার জন্য সকালে উঠ্‌তে রোজই দেরী হ'য়ে যেত এবং সমস্ত দিনেও শরীরের ক্লান্তি ছাড়তে চাইত না।

কখন সন্ধ্যা হবে এই আশায় আজকাল সে তৃষিত হ'য়ে থাকে, কেননা তখন যে সে যূথিকার ঘরে গিয়ে বাঁশী বাজাবে। ঘড়িতে যেই নয়টা বাজ্‌তো, তার শেষ শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই বীণা বেজে উঠ্‌তো; কিন্তু সমীরের বাঁশী বাজানো থাম্‌লেই অদৃশ্য সঙ্গীতও বন্ধ হ'য়ে যেত। যখন উজ্জ্বল আলো তার উপর দিয়ে চ'লে যেত, তখন সে মৃদু মৃদু বল্‌তো "যূথিকা! যূথিকা! আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও।" বীণার সুর মৃদু হ'তে মৃদুতর হ'য়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেত।

সমীরের পুরাণো চাকর তার চেহারা দেখে এমন ভয় পেয়ে গেল যে মনিবের আদেশের বিরুদ্ধে জোর করেই সে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল। ডাক্তার সমীরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি যখন এলেন তখন সমীরের খুব জ্বর। যূথিকার শেষ অসুখের সময় যে যে লক্ষণ দেখা গিছ্‌লো ওরও সেইগুলো হ'য়েছে। রাত্রে জ্বর আরো বাড়লো ও বিকারের ঘোরে সে যূথিকা এবং তার বীণার কথাই ক্রমাগত বল্‌তে লাগ্‌লো।

সকালে ডাক্তার তার অবস্থা একটু আরোগ্যের দিকে গেছে দেখে খুসি হ'লেন। সমীর নিজে কিন্তু অনুভব করলে ও বল্‌লে যে তা'র শেষ সময় সন্নিকট। ডাক্তার অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। তিনি তাকে বললেন যে তার রোগ কঠিন হ'লেও ভয়ের কারণ নেই, তবে সারতে কিছুদিন সময় লাগ্‌বে। তখন রোগী তার বন্ধু ডাক্তারের কাছে গত কয়েক রাত্রির ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করলে এবং এই বিচক্ষণ ডাক্তারের কোন যুক্তিই তার নিজের মত থেকে তাকে টলাতে পারলে না।

সন্ধ্যাবেলা সে তাকে যূথিকার ঘরে নিয়ে যাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করলে। তার একান্ত আগ্রহে অনিচ্ছা সত্বেও ডাক্তার বাধ্য হ'য়ে সম্মতি দিলেন। যূথিকার ঘরে গিয়ে সে প্রশান্তভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লে, অশ্রুপ্লাবিত চোখে তার বিবাহিত জীবনের সুখময় ঘটনা বর্ণনা করতে লাগ্‌লো ও সে যে সেই রাত্রেই নয়টার সময় মারা যাবে, সে সম্বন্ধে তার দৃঢ়বিশ্বাস ডাক্তারকে জানালে।

ক্রমে সেই চরম মুহূর্ত্ত কাছে এল। শেষ বিদায় নিয়ে সে সকলকেই ঘর হ'তে চ'লে যাবার জন্য অনুরোধ করলে। কেবল ডাক্তার কিছুতেই যেতে রাজী হ'লেন না। তিনি তার কাছেই রইলেন।

ঠিক নয়টায় তোপের আওয়াজ হ'ল; আর সমীরের পাণ্ডুর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। "যূথিকা! যূথিকা, এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার আগে আমাকে অনুভব করতে দাও যে তুমি আমার কাছেই আছ। তোমার ভালবাসায় আমার মৃত্যুভয় ভেঙ্গে দাও।" এই কথা বলা মাত্রই বীণার তারে একটি সুন্দর রাগিণী বেজে উঠ্‌লো ও পূর্ব্বের উজ্জ্বল আলো মৃত্যুশয্যাশায়ী সমীরের উপর প'ড়ে তাকে যেন জড়িয়ে ধ'রে রইল।

সমীর চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লো, "আমি যাচ্ছি!" ধীরে ধীরে তার শেষ নিশ্বাস ধরিত্রীর বাতাস স্পর্শ ক'রলে।

সঙ্গে সঙ্গে বীণার তার সশব্দে ছিঁড়ে গিয়ে অদৃশ্য হস্তের বীণাবাদনও বন্ধ হ'য়ে গেল।

ডাক্তার এতক্ষণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখ্‌ছিলেন। তিনি কম্পিত হস্তে সস্নেহে সমীরের চোখের পাতা বন্ধ ক'রে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পালঙ্কের উপর শায়িত সমীরকে দেখে মনে হ'চ্ছিল সে যেন শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। মুখে হাসির আভা। যূথিকার মৃত্যুর পর তার এমন প্রশান্ত মুখ কেউ দেখেনি।*

শ্রীঅমিয়া দত্ত

* জার্ম্মাণ লেখক Theodor Korner-এর গল্প হইতে।

মেঘমুক্তি *

শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবী বাংলা-সাহিত্য ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিতা ও যশস্বিনী লেখিকা। 'ভারতবর্ষ' 'বসুমতী' "প্রবাসী" প্রভৃতি মাসিকপত্রে তাঁর গল্প ও উপন্যাস প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থখানিও প্রথমে মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক প্রকাশ হ'য়েছিল। পরে, লেখিকা সেই বইখানিকে আর একবার সংশোধন করে পুস্তকাকারে ছাপিয়েছেন।

"মেঘমুক্তি" প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে একখানি সামাজিক উপন্যাস, কিন্তু এইটুকুই এর সমস্ত পরিচয় নয়। বাঙালীর উচ্চশিক্ষিত সমাজের নরনারীর জটিল মনস্তত্ব, তাদের যৌন-জীবন সমস্যা, বিবাহ ও দাম্পত্য-নীতি, এদেশের মেয়েদের একান্ত দুঃস্থ অসহায় নিরুপায় অবস্থা, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের অস্বাস্থ্যকর পরিণাম, দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের দুঃখ, দৈন্য ও দুর্দ্দশা প্রভৃতি নানা দুরূহ দিকের দুর্ব্বিষহ দৃশ্য তিনি তাঁর এই সুলিখিত গ্রন্থখানিতে দক্ষ শিল্পীর মতো এঁকে দেখিয়েছেন। এদেশের একটি অন্তঃপুরচারিণী মহিলা যে এতো জটিল বিষয় নিয়ে এমন গভীরভাবে চিন্তা ক'রেছেন, যুগ-যুগ সঞ্চিত কুসংস্কারের বাধা মুক্ত হ'য়ে অন্ধ বিশ্বাসের ঠুলি খুলে ফেলে তিনি যে সত্য-দৃষ্টিলাভ করেছেন এবং সাহসের সঙ্গে দৃঢ় অসংশয় চিত্তে সে কথা লিপিবদ্ধ করেছেন এ দেখে আনন্দ হয়। কালের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলতে না পারলে যে মহাকালের রথচক্র-তলে আমাদের অচিরে নিষ্পিষ্ট হয়ে ম'রতে হবে একথা তিনি বেশ স্পষ্ট করেই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীমতী সরোজ কুমারী তাঁর গ্রন্থে শুধু আমাদের জীবনযাত্রার ও সমাজবন্ধনের নানাবিধ কঠিন সমস্যা উত্থাপন ক'রেই ক্ষান্ত হননি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেগুলি সমাধানেরও ইঙ্গিত দিয়াছেন।

মেয়েদের মুক্তির জন্য মেয়েরা নিজেরা যদি না সচেষ্ট হয় তাহ'লে তাদের উদ্ধার যে সুদূর পরাহত একথা বেশ জোর ক'রেই তিনি বলেছেন।

দু'টিমাত্র পুরুষ আর তিনটি মেয়েকে নিয়ে যে গল্পটি গ'ড়ে উঠেছে সেটি খুবই একটি সাধারণ কাহিনী কিন্তু লেখিকার বলবার ভঙ্গীতে তাঁর ভাষার সুষমায় ও রচনা কৌশলের গুণে সেই সাধারণ গল্পের সামান্য ঘটনা গুলিই যেন অসাধারণ ও অসামান্য বলে মনে হয়।

নরেশবাবু একজন সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি উচ্চ শিক্ষিত। জ্ঞানার্জ্জন পিপাসায় দু'বছর য়ুরোপের নানাস্থান ঘুরে জানবার বোঝবার ও শেখবার তাঁর একটা অসীম আগ্রহ ও উৎসাহ আছে। তাঁর মূল্যবান গ্রন্থশালাটিই ছিল তাঁর অবসরযাপনের য়ুরোপের আনন্দনিকেতন। নব যুগের চিন্তাশীল পণ্ডিত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক; ঋষি মনীষীদের মতামতের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। যেটাকে তিনি সত্য বলে বুঝতেন জীবনেও সেটাকে সহজ ভাবেই স্বীকার করে নিতেন। গ্রহণ ও বর্জ্জনের সাহস

* শ্রীসরোজকুমারী দেবী প্রণীত; প্রকাশক—এস্, সি, সরকার এণ্ড সন্স্; ভালো এন্টিক্ কাগজে ছাপা; ২৩২ পৃষ্ঠার বই, সুদৃশ্য চেক্‌কাপড়ে বাঁধা, সোনালী অভিজ্ঞান—দাম ১৸০

শক্তি দুইই তাঁর আছে। এই উদার জ্ঞানী সকলসংস্কার মুক্ত সত্যাশ্রয়ী পুরুষকে এদেশের অনাগত যুগের আদর্শ মানুষ বলা যেতে পারে।

নরেশবাবুর স্ত্রী মনীষা—পতিগতপ্রাণা সাধ্বী মহিলা। তিনি বি, এ, পাশ করেছিলেন বটে কিন্তু, নারীর জন্মগত কতকগুলি কুসংস্কার থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেননি। তারই ফলে নিদারুণ মনোকষ্টে তিলে তিলে ক্ষয় হ'য়ে মরতে ব'সেছিলেন। তিনি স্নেহময়ী, মমতাময়ী, দয়াবতী, অশেষ ধৈর্যশীলা ও সুনীতি পরায়ণা, কঠোর আত্মমর্যাদা সম্পন্না ও নিদারুণ অভিমানিনী নারী। যাকে বলে—A Divine woman!—নরেশ বাবুর স্ত্রী মনীষা দেবী ঠিক তাই।

ঊষা—মনীষা দেবীর ছোট বোন। অসামান্যাসুন্দরী সে, এবং উচ্চশিক্ষিতা বিদুষী ও কলাবতী নারী। ধীর স্থির শান্ত মধুর গম্ভীর তার প্রকৃতি। কলেজ ছাড়বার পর থেকে সে গান বাজনার চর্চা নিয়েই থাকে। পিতৃবন্ধুর পুত্র মোহিতের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হ'য়ে আছে। তার পিতা মৃত্যুর পূর্বে এই ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। পিতার মৃত্যুর পর থেকে ঊষা তার দিদির কাছেই থাকে। মোহিত আছে বিলাতে। ফিরে এলে তাদের বিবাহ হবে। ঊষা প্রতি 'মেলে' মোহিতের চিঠি পায়।

অমিয়া—মনীষাদের সহপাঠিনী ও বাল্যবন্ধু। পাশের বাড়ীতেই থাকে। আনন্দময়ী সে। হাওয়ার মতো লঘু—ঝড়ের মতো উদ্দাম—নদীর মতো কলস্বনা—তরঙ্গের মতো উচ্ছ্বাসময়ী- চঞ্চল অস্থির অবাধ তার প্রকৃতি। জ্যোৎস্নালোকিত পূর্ণিমার মতো সে স্বচ্ছ নির্মল স্ফূর্ত ও উৎফুল্ল। গানে গল্পে হাস্যে পরিহাসে তার প্রাণের প্রাচুর্য্য ঝরণার মতো ঝ'রে পড়ে—ফোয়ারার মতো উৎসারিত হ'য়ে ওঠে। বিহগ কলকাকলির মতো তার সুকণ্ঠের সঙ্গীত সুরে গৃহখানিকে সে মুখর ক'রে তোলে। সবার প্রাণেই পুলকোচ্ছ্বাসের বন্যা নিয়ে আসে যেন তার মনের অফুরন্ত মাধুরী।

অজিত অনূঢ় যুবক। স্বচ্ছ-কান্তি সুদর্শন পুরুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিল সে। উচ্চ সম্মানের সঙ্গে ডাক্তারী পাশ ক'রে সবেমাত্র চিকিৎসা সুরু করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দুর্বোধ্য জটিল তত্ত্ব আলোচনা, সে সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করে, নূতন নূতন আবিষ্কার ক'রে অভিনব জ্ঞান সঞ্চয় করা ও জগতের কল্যাণে তার সেই অভিজ্ঞতা নিয়োজিত করাই ছিল তার জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা। এই কঠোর সাধনার ভিতর দিয়েই এবারকার মতো জীবনটা সে কাটিয়ে দেবে ব'লে দৃঢ় সঙ্কল্প করেছিল। কিন্তু, অকস্মাৎ একদিন ঊষার সঙ্গে পরিচিত হবার পর তার সব কিছু ওলোট-পালোট হ'য়ে গেল! সে বুঝতে পারলে যে তার নির্ব্বাচিত পথ ছাড়াও জীবনে আনন্দের একটা পরম সুন্দর দিক পড়ে আছে!

অজিত জানতো না যে 'ঊষা' একজনের বাগদত্তা! সে তার সমস্ত প্রাণ দিয়েই ঊষাকে ভালোবেসে ছিল। ভবিষ্যৎ জীবনের কত সুখময় চিত্র কল্পনা ক'রে,—তার নিঃসঙ্গ গৃহহীন জীবন ঊষার মধুর সংস্পর্শে সুখে ও গৌরবে সার্থক হ'য়ে উঠবে ভেবে,—তার রিক্ত শূন্য ঘর কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর আগমনে সমস্ত দৈন্য ও মলিনতা মুছে ফেলে অপূর্ব শ্রী ও সুষমায় পূর্ণ হ'য়ে উঠবে আশা ক'রে সে গেল যেদিন ঊষার পাণিপ্রার্থী হ'তে, সেদিন মনীষার মুখে ঊষা অপরের জেনে বজ্রাহত হ'য়ে ফিরে এলো এবং তার পরদিনই একটা সুযোগ পেয়ে দেশত্যাগ ক'রে চলে গেলো।

কিন্তু ঊষা এদিকে অন্যের বাগদত্তা হ'লে কি হয়—মোহিতের সঙ্গে তার প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়নি তখনো। ভালোবাসা কাকে বলে সে জানতো না। অজিতের সংস্পর্শে এসে তার মন যেন দিন দিন নবভাবে পূর্ণ হ'য়ে—নবীন উচ্ছ্বাসে চঞ্চল ও আকুল হ'য়ে উঠছিল। সূর্য্যোদয়ের প্রথম রশ্মিপাতে মুদিত কমল কোরক যেমন তার মুকুলিত দলগুলি একে একে মেলে ধ'রে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে, তেমনিই অজিতের অন্তরের সুগভীর অনুরাগের ছোঁয়া লেগে তার এতদিনের সুপ্ত যৌবন-মুগ্ধ নারীত্ব যেন স্তরে স্তরে বিকশিত হ'য়ে উঠতে লাগলো।

ঊষার জীবনে প্রেমের এই প্রথম অনুভূতি। যেদিন সে নিজের অবস্থা বুঝতে পারলে—আনন্দের সেই পরম আবেগে সে চমকিত ও ভীত হ'য়ে উঠলো! তার মনে

পড়্‌লো অজিতকে ভালোবাসবার তার অধিকার নেই। তখন তীব্র বেদনায় তার অন্তর ভেঙ্গে পড়্‌লো।

এদিকে মূর্ত্তিমতী আনন্দ-স্বরূপিণী কল-হাস্যময়ী অমিয়ার প্রতি নরেশের একান্ত স্নেহের পক্ষপাত দেখে মনীষা অন্তরে অন্তরে প্রতিপল দগ্ধ হ'য়ে তিলে তিলে মরণের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। অবশেষে আর সহ্য ক'রতে না পেরে ঊষাকে নিয়ে তিনি কাশী চলে গেলেন। ঊষার অবস্থা তখন আরও শোচনীয়! কারণ যার প্রতি বাগ্‌দত্তা পত্নীর কর্ত্তব্য স্মরণ ক'রে ঊষা প্রাণপণে তার অন্তরের নব আনন্দানুভূতির কণ্ঠরোধ ক'রে অজিতের নিকট হ'তে নিজেকে দূরে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা ক'রছিল, খবর এলো সেই মোহিতই বিলাতে এক শ্বেতাঙ্গ তরুণীর পাণীগ্রহণ করেছে!

এই যে কটি নরনারীর জীবন আকাশে জটিলতার কালো মেঘ এসে তাদের সকল আনন্দের আলোক আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ছে, এ মেঘ কেমন ক'রে ধীরে ধীরে অপসারিত হ'লো-"মেঘমুক্তি" তারই চিত্তাকর্ষক কাহিনী। শক্তিশালিনী সুলেখিকা শ্রীমতী সরোজ কুমারী তাঁর সুন্দর সুললিত ভাষায় একান্ত মনোমদ ক'রে এ গল্পটি আমাদের শুনিয়েছেন।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

নানা কথা

৺মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন

বিগত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল এবং পবিত্র আদর্শ জীবনযাপনের দ্বারা ইনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। প্রবাসী মাসিকপত্রে ইঁহার দার্শনিক প্রবন্ধ সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইত, সত্যের অনুধাবনে ইঁহার কিরূপ নিষ্ঠা এবং আগ্রহ ছিল সেই প্রবন্ধগুলির মধ্যে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

তিনি অকৃতদার ছিলেন; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬২ বৎসর হইয়াছিল। বেদান্তরত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালা ভাষার একদিকে যে ক্ষতি হইল তাহার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

৺ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালে রাখালদাসের মাত্র ৪৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের যে গভীর ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। এখনো দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিয়া পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই,—তথাপি বহু তথ্য আবিষ্কারের মধ্যে এক মহেঞ্জো-দারোর আবিষ্কার রাখালদাসকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। মহেঞ্জো-দারোর ভগ্ন স্তূপ খননের দ্বারা যে সকল অস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লোহের কোনো সংস্রব নাই, সকলগুলিই কঠিন চকমকি পাথরে অথবা তাম্রে প্রস্তুত। এই হিসাবে হিন্দুসভ্যতার প্রাচীনত্বকে রাখাল দাস খৃষ্টপূর্ব্ব তিনসহস্রাব্দে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন।

রাখালদাসের শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়বর্গকে আমরা আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইণ্ডিয়া হাউসের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ৮ই জুলাই লণ্ডনের অল্ড্‌উইচ্‌ অঞ্চলে নবনির্ম্মিত ইণ্ডিয়া হাউসের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই ইণ্ডিয়া হাউস চিত্রিত করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে চারজন বাঙ্গালী চিত্র-শিল্পী বিলাতে গিয়াছিলেন সে সংবাদ 'বিচিত্রায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সংখ্যাতেও শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ আছে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সম্রাট্‌ এবং

সম্রাজ্ঞী ইণ্ডিয়া হাউসে উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের হাই-কমিশনার স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা অভ্যর্থিত হন, তৎপরে ইণ্ডিয়া হাউসের স্থপতি স্যার হার্বার্ট বেকার দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য সম্রাটকে একটি সোনার চাবি প্রদান করেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে অভিভাষণের মধ্যে সম্রাট্ বলিয়াছেন, ভারত ইতিহাসের এই সঙ্কটকালে ইণ্ডিয়া হাউসের প্রতিষ্ঠানকে তিনি একযুগের অবসান এবং নবযুগের প্রারম্ভের নিদর্শন বলিয়া মনে করেন।

জার্ম্মাণীতে রবীন্দ্রনাথ—

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিবার্ট লেকচার' দানের পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ফরাসী দেশে চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে লণ্ডনে আসেন। সম্প্রতি সেখান হইতে বার্লিন যাত্রা করিয়াছেন। রাজধানী বার্লিনে এবং মিউনিক, ফ্রাঙ্কফোর্ট ও জার্ম্মাণীর অন্যান্য নগরে তিনি বক্তৃতা দান করিবেন। ঐ দেশের নরনারীরা সেবার বিশ্ববরেণ্য কবিকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। এবারেও তাঁহারা দলে দলে আসিয়া বক্তৃতা সুধাপানে পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। নানাস্থানে বক্তৃতার ব্যবস্থা ব্যতীত বার্লিন সহরে কবির অঙ্কিত চিত্র-প্রদর্শনীও খুলিবার বিশেষ আয়োজন হইয়াছে। ১৭ই জুলাই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইবার কথা।

পরলোকগত কোনান ডইল—

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-ঔপন্যাসিক স্যর কোনান ডইল আর নাই। গত ৭ই জুলাই তারিখে ৭২ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গলোক যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'Sherlock Holmes' ডিটেক্‌টিভ কথা-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করে। তাহাতেই তাঁহার খ্যাতি পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়। আরও অনেকগুলি সুখপাঠ্য উপন্যাস নাটিকা প্রভৃতি রচনা করিয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সুযশ অক্ষুণ্ণ রাখেন। প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস-রচয়িতা না হইলেও ইংরাজী কথা-সাহিত্যে তাঁহার স্থান উচ্চস্তরে।

শেষ বয়সে প্রেততত্ত্বের আলোচনায় স্যর কোনান অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অনেকগুলি গবেষণামূলক পুস্তকও রচনা করেন পরলোকের রহস্য-জড়িত বার্ত্তা কি পরিমাণে ও কি ভাবে তিনি এই ধূলিক্লেদযুক্ত মর্ত্ত্য-জগতকে উপহার দেন তাহা আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি। শব সমাধিকালে লেডি ডইল মৃতের প্রতি পরিবারস্থ সকলের মনোভাব কি তাহা এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"মৃত্যু আমরা স্বীকার করি না, জীবন অন্তহীন। আমাদের সহিত সংস্রব রাখিয়া তিনি বরাবর চলিবেন, ইহা নিশ্চিত। আমরা তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে না পাইতে পারি, কিন্তু যাহাদের তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে তাহারা তাঁহার অবয়ব সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে।"

নিবেদন

তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র আগামী শ্রাবণের বিচিত্রার সঙ্গে যাইবে

Printed at the Susil Printing Works Ltd. 48, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.

চতুর্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড শ্রাবণ, ১৩৩৭ দ্বিতীয় সংখ্যা

পিতা নোঽসি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নমঃ শিবায়
নমঃ সম্ভবায় চ, ময়োভবায়চ,
নমঃ শঙ্করায় চ, ময়স্করায় চ।

তুমি সুখকর, তোমাকে নমস্কার, তুমি কল্যাণকর তোমাকে নমস্কার। তুমি সুখের আকর তোমাকে নমস্কার, তুমি কল্যাণের আকর তোমাকে নমস্কার।

আমাদের নমস্কার দুই ভাগ হয়ে গেছে—একদিকে সুখ একদিকে কল্যাণ। দুইয়ের মধ্যে ভেদ হয়েচে তাই মানুষের সাধনা এত কঠিন; তাই মানুষকে প্রার্থনা করতে হয় "যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব"—যা ভালো তাই আমাদের দাও।

এই সুখকে এই কল্যাণকে বাইরে দেখ্‌তে গেলে তাদের মধ্যে ভেদ দেখি, কিন্তু পূর্ণতার মধ্যে যখন তার সামঞ্জস্য দেখা যায় তখন আনন্দ এবং কল্যাণ এক হয়ে দেখা দেয় এবং তখনি আমাদের নমস্কারের দুই ধারা এক সমুদ্রে এসে মেলে, আমরা বলি,

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

এই নমস্কারটিই চরম। বিচিত্র দানকে যখন বাইরে থেকে দেখি তখন তার মধ্যে নানা শ্রেণীভেদ চোখে ঠেকে কিন্তু দানের মধ্যে দিয়ে যখন এক দাতাকেই দেখি তখন সমস্তই একে এসে মেলে। তখন বলি নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ—নমস্কার তোমাকেই; তোমার সুখের অংশকে না, তোমার কল্যাণের অংশকে না, কিন্তু যে পরমশিবের মধ্যে সুখ দুঃখ প্রেমে অখণ্ড হয়ে আছে সেই তোমাকে নমস্কার।

এই কথাটাই আরেক ভাষায় বলা হয়েচে—পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু। জীবনটাকে সুখ দুঃখের বিরুদ্ধতার মধ্যে বিভক্ত দেখি কখন্? যখন আমাদের জগতের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে মিলনের মূলে প্রেমস্বরূপকে না দেখি। তখন ঘটনাগুলি বস্তুগুলি আপনাতেই চরম; তখন তাদের কোনোটাকে ভাল লাগে কোনোটাকে ভাল লাগে না, এই নিয়েই তাদের মূল্য। এই মূল্য অনুসারে তাদের নিয়ে আমরা কাড়াকাড়ি মারামারি করি, আমাদের মধ্যে লড়াই আর কিছুতেই মিটতে চায় না।

কিন্তু যখন বলি "পিতা নোঽসি," পিতা, তুমি আছ, জগতের সকল সত্যের মূলে পরম সত্যরূপে যে-তুমি বিরাজ করচ সেই-তোমার সঙ্গে আমার পরমাত্মীয় সম্বন্ধ, তখন জগতের সমস্ত ঘটনাকে জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখকে আর চরম ব'লে মানতে পারিনে। তখন আমাদের এই প্রার্থনা হয় "পিতা নো বোধি"; সকল অবস্থায় পিতাকে যেন বোধের মধ্যে পাই, প্রেম যেন জাগে,—তাহলেই এর আগে যে জগৎকে হাট ব'লে মনে করেছিলুম সেই জগৎকে গৃহ ব'লে বুঝতে পারি।

হাটের ধন হচ্চে পণ্য দ্রব্য, গৃহের ধন হচ্চে আপনার মানুষ। পণ্যকে যখন প্রধান ব'লে জানি তখন সিকি পয়সা আধ পয়সার দরদস্তুর নিয়ে ঝগড়া বেধে যায়, তখন ওজনে দামে পরস্পরকে ঠকাবার জন্যে জেদ চ'ড়ে ওঠে। কিন্তু যেখানে আপনার মানুষ প্রধান সেখানে ত আর ব্যবসাদারী চলে না—সেখানে যদি কাউকে ঠকাই তাহলে আপনাকেই ঠকানো হয়। তাই "পিতা নোঽসি" মন্ত্রকে অন্তরে স্বীকার করামাত্র, জগৎকে দ্রব্যের জগৎ না জেনে আত্মীয়ের জগৎ জানবামাত্রই সেই মুহূর্ত্তে এই মূল্যের সংসার অমূল্য হয়ে ওঠে।

এইখানেই আমাদের সমস্যার একমাত্র সমাধান। মানুষ যতক্ষণ বাইরের শক্তিকে বাইরের সামগ্রীকে বড় ক'রে দেখ্‌বে ততক্ষণ কোন ব্যবস্থায় কোনো বিধানে তার বিরোধ মিটবে না। জগৎ যতক্ষণ আমাদের কাছে শক্তির জগৎ দ্রব্যের জগৎ ততক্ষণ স্বভাবতই সে আমাদের স্বার্থের জগৎ; এই স্বার্থকে শুধুমাত্র শান্তির দোহাই দিয়ে কিম্বা শাসনের ভয় দেখিয়ে চিরদিন সংযত রাখা অসম্ভব। একদিকে তার বাঁধ বাঁধ্‌লে আর একদিকে তার ধারা বইবেই। কিন্তু পিতার বোধ যখন জাগে তখন স্বার্থের জগৎ আপনিই পরমার্থের জগৎ হয়ে ওঠে। তখনি চরম সত্য পাই ব'লেই সহজে সকলের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সত্য হয়। এই

পিতা হচ্চে সমস্ত সম্বন্ধের মূল সত্য। পিতার মধ্যে দিয়ে জগৎকে পাওয়া মানে হচ্চে প্রাণের মধ্য দিয়ে প্রেমের মধ্য দিয়ে সত্যের মধ্য দিয়ে আত্মার মধ্য দিয়ে জগৎকে পাওয়া।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে শক্তির লোভ স্বার্থের টান আছে, তাতেই সে কাড়ে, মারে, ঠেলাঠেলি করে; কিন্তু মানুষের প্রকৃতির সব চেয়ে বড় সত্য হচ্চে প্রেম, তাতেই সে আপনাকে ত্যাগ করে, মৃত্যুর উপরে ক্ষতির উপরে জয়ী হয়। জগতে যতক্ষণ শক্তির রূপকেই স্বার্থের রূপকেই একান্ত ক'রে দেখি, তার চেয়ে বড় আর কিছুকে দেখ্‌তে পাইনে, ততক্ষণ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্য যে প্রেম, বিশ্বনিয়মের মধ্যে তার কোনই আশ্রয় পাইনে; মানুষের মনের মধ্যে সে একটা খাপছাড়া জিনিষ হয়ে থাকে। তাই সে অবস্থায় আমাদের ব্যবহারে তার প্রভাব ক্ষীণ হয়।

জীববিজ্ঞান কিছুদিন আগে এই কথাই বলেছিল যে, শক্তিই হচ্চে জগতের মূল নীতি, স্বার্থের সংঘাতই হচ্চে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের পদ্ধতি। যার জোর আছে সেই জিৎবে সেই টিঁক্‌বে। এই সত্যই বিশ্বের সত্য একথা মানুষ যেদিন স্থির করলে সেদিন থেকে আপনার প্রকৃতির পরম সত্য যে প্রেম তাকে ভিতরে ভিতরে অশ্রদ্ধা করতে লাগল। তখন থেকে য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতাপ নিষ্ঠুর হয়ে সমস্ত পৃথিবীকে পীড়িত করচে।

এই পীড়া যখন স্বয়ং য়ুরোপকে আজ স্পর্শ করেচে তখন সে আপনাকে প্রশ্ন করতে প্রবৃত্ত হয়েচে কি করলে এই পীড়া দূর হয়। প্রশ্নের উত্তরে নানা কৌশলের কথা তার মনে উদয় হচ্চে। একটা কথা এখনো সে সম্পূর্ণ বুঝচে না যে, সত্যের উপলব্ধি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে ততক্ষণ দুঃখ দেওয়া এবং দুঃখ পাওয়া থেকে কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। যতক্ষণ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে শক্তিকেই প্রধান ক'রে দেখ্‌ব ততক্ষণ স্বার্থকেই আশ্রয় ব'লে আঁকড়ে ধরব। অবশেষে "স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।"

মানব প্রকৃতির সব চেয়ে বড় সত্য যে প্রেম সে যদি একটা সৃষ্টিছাড়া পদার্থ না হয়, বিশ্ববিধানে সেও যদি সবচেয়ে বড় সত্য হয় তবে এই প্রেমের আশ্রয় ও উৎস বিশ্বের মূলে কেউ আছেন। কেন না প্রেম-পদার্থ ব্যক্তিগত। ব্যক্তির সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ ছাড়া প্রেমের আর কোনো অর্থ থাক্‌তে পারে না। শক্তির উর্দ্ধে সেই ব্যক্তিকে সেই পরমপুরুষকে যদি দেখ্‌তে পাই তাহলেই আমাদের প্রকৃতির পরম সত্য আপন চরম পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে। সেই পরিতৃপ্তি স্বার্থকে ত্যাগের দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করে। এই পরিতৃপ্তিতেই কল্যাণ।

এই কথাটাই নিহিত আছে এই মন্ত্রে, এই প্রার্থনায়, পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু। এই প্রার্থনা যতই পূর্ণ হবে ততই মানুষের অন্য প্রার্থনাটিও পূর্ণ হতে থাকবে—মামা হিংসী:—আঘাত হতে

আমাদের বাঁচাও। যেখানে পিতার বোধ নেই সেইখানেই মানুষ মানুষকে হিংসা করচে, সেই হিংসা সব চেয়ে নিদারুণ। যেখানে পিতার বোধ নেই সেখানে মানুষ মানুষের যে সহায়তা করচে সে সহায়তা কলের জিনিষ, সে সহায়তায় মানুষের প্রাণশক্তি অতৃপ্ত থাকে ; পিতার বোধ যেখানে নেই সেখানে মানুষ মানুষকে যে কৃপার দান করচে সে দানের মত অপমান তার আর নেই, কেননা সে দান আকস্মিক, সে দানে তার অন্তরের দাবী নেই।

মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে অশিব কি ? বিশ্বকে জড়শক্তির ক্রিয়া ব'লে জানা। কেননা, তাতে ক'রে সমস্ত জগতের সঙ্গে মানুষের একেবারে গোড়ায় তফাৎ ঘটে। সেই ভয়ঙ্কর অসামঞ্জস্যে মনুষ্যত্বটা একটা মূলহীন পদার্থ হয়ে দেখা দেয় ; কাজেই ধর্ম্মকে একটা বানানো জিনিষ মনে করায় তার দাম ক'মে যায়, ত্যাগমাত্রকে নিতান্ত ফাঁকি ব'লে মনে হয়। মানুষের একটি ব্যক্তিত্ব আছে অথচ যে জগতে তার জন্ম, যেখানে তার স্থিতি, সেখানে সর্ব্বত্র বস্তু অসীম, শক্তি অমর, তথাপি সেখানকার আদি অন্তে ব্যক্তিত্বের লেশ নেই, এই কথা যদি মনে করি,—অর্থাৎ যে আত্মাকে নিজের মধ্যে একান্ত উপলব্ধি করচি, যে আত্মা কেবল যে আপনাকে জানে তা নয় আপনার স্বরূপে স্বভাবে যার আনন্দ, এবং সেই আনন্দে যে আপনাকে নানা কর্ম্মে ও নানাসম্বন্ধে দান করে সেই আমার আত্মার সঙ্গে বিরাট বিশ্বে কোথাও আত্মিক সম্বন্ধের কোনো আশ্রয় নেই, এই কথাটা যদি স্বীকার করি তবে তার মত এমন ভয়ঙ্কর অকল্যাণ মানুষের পক্ষে আর কিছু হ'তে পারে না। আমাদের যা কিছু পাপ, পরস্পরের প্রতি যা কিছু অন্যায় সমস্তেরই মূল এইখানে। আধ্যাত্মিক সত্যকে জগতে জীবনে যে পরিমাণে কম উপলব্ধি করচি সেই পরিমাণেই বেশি ক'রে নিজের ও অপরের পক্ষে দুঃখের কারণ হয়ে উঠচি। মানবসমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ কোনো অসীম ব্যক্তিগত মূল সম্বন্ধের দ্বারাই সত্যবান হয়নি এইরূপ মত মানবের পক্ষে নিদারুণ, এবং সকল অকল্যাণের আকর।

সেইজন্যেই যখন মানুষ কল্যাণ চায় তখন কোনো কলের কাছে সেই প্রার্থনা জানালে চলবে না, কোনো বিধিব্যবস্থার প্রতি নির্ভর করলে চলবে না। তখন হাত জোড় ক'রে বলতেই হবে, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু—তুমি যে আমাদের পিতা এই সত্যকেই বিশ্বের চরম সত্য ব'লে তোমার কাছে আমার সমস্তকে যেন নত ক'রে সমর্পণ করতে পারি। তখন বলতেই হবে "নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।" কোনো যন্ত্রে কল্যাণ নেই, কোনো আইনে কল্যাণ নেই, তুমিই কল্যাণ তুমিই পরমকল্যাণ তোমাকে নমস্কার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্"

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[অপ্রকাশিত রচনা]

কাব্য-কোকিল ডাক্‌লে পরেই শাস্ত্র শিকেয় উঠ্‌বে,
তালি-দেওয়া কাঁথার কদর ফাগুন এলেই টুট্‌বে ;
কবি হ'য়ে জন্মেছে যে হৃদয়-রীতির ভক্ত,
শাস্ত্র মানা কানার মত একটুকু তার শক্ত।
সত্যিকারের কবি কবে শাস্ত্র মেনে চল্‌ছে ?
"কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্" শাস্ত্রই এ বল্‌ছে।
আসল কবির নাই কোনোদিন শাস্ত্র-জুজুর শঙ্কা,
শাস্ত্র চেয়ে প্রশস্ত যা' বাজায় তারি ডঙ্কা।
নকল কবি শাস্ত্র বুলির চিবিয়ে ম'ল চোক্‌লা
পুরুত সে নয়, প্রসাদ লোভে বয় পুরুতের পোঁট্‌লা।

* * *

পশু হ'তে মানুষ হ'বার হয় না বাঁধা রাস্তা,
শাস্ত্র চেয়ে মানুষেতেই কবির বেশী আস্থা ;
মরা শাস্ত্র বাঁচিয়ে চলা ভূত-নাচানো কর্ম্ম,
তাল-বেতালের যোগ্য ওযে নয় তো কবির ধর্ম্ম।
শাস্ত্র বাঁচুক কিম্বা পচুক ভাব্‌না কিছুই নাইকো,
মানুষ বাঁচুক,—বাঁচুক হৃদয়, আমরা ইহাই চাই গো।
কাব্য-কথা কইলে, জানি, শাস্ত্র জ্ব'লে মর্‌বেই,
ফাগুন এলে শুক্‌নো পাতা ঝরবে ওযে ঝর্‌বেই।

সত্যাসত্য

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

২২

দুই পক্ষের মাঝখানে দুইমাসের ব্যবধান। মনের কথা জমিয়া গেছে দুইশত বৎসরের। কোনখান থেকে কে আরম্ভ করিবে স্থির করিতে পারিল না। অগত্যা ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়া রাখিল।

পরদিন রবিবার। সেদিন মধ্যাহ্নে দে সরকারকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ভোজনের পরে তাহাকে লইয়া কোথাও বেড়াইতে যাওয়া যাইবে।

"এই দে সরকার ভদ্রলোকটি কে, সুধীদা? ব্লুমস্‌বেরীতে থাকেন—বোহিমিয়ান নাকি?"

"স্কুল অব্ ইকনমিক্সে পড়েন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে আলাপ।"

"বাই জোভ্! এর মধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়মে ভর্তি হয়েছো? আমি কবে হবো?"

"অনেক নিয়ম কানুন থাকে। একটু বেগ পেতে হবে।"

ব্রেক্‌ফাষ্টের পর লাউঞ্জে আসিয়া দুইজনে বসিল। রবিবারে সুধীর জন্য "অব্‌জার্ভার" ও বাড়ীর লোকের জন্য "নিউজ্ অব্ দি ওয়ার্ল্ড" লওয়া হয়। বাদল সমান আগ্রহের সঙ্গে উভয় কাগজ আগুলিয়া বসিল। কোনোখানা হাতছাড়া করিতে চায় না।

মার্সেলের সঙ্গে খেলা ও পড়া করা সুধীর নিত্যকর্ম হইয়া গেছে। মার্সেল আসিয়া নীরবে তার একপাশে দাঁড়াইল। সুধী কহিল, "আয়! তোর ছবির বই কোথায়"?

মার্সেল তার শতচ্ছিন্ন ছবির বই ও ছবিওয়ালা ছোটদের কাগজগুলি হাতে করিয়া আনিয়াছিল। ঐ কয়টিই তাহার সম্বল। প্রথম প্রথম সুধী অনুযোগ করিয়া বলিত, "মার্সেল্‌কে নতুন বই কাগজ দাও না কেন?" সুজেৎ উত্তর দিত, "দু'দিনেই ছিঁড়ে ফেলে। দস্যি মেয়ে।" ক্রমশ সুধী বুঝিতে পারিল ইহাদের অবস্থা ভালো নয় এবং মার্সেল অতি শান্ত মেয়ে, এত শান্ত ও এত গম্ভীর যে তাহার বয়সের মেয়ের পক্ষে ওটা অস্বাভাবিক এবং অবাঞ্ছনীয়। তারপরে একটু একটু করিয়া সুধী জানিল, মার্সেল সুজেতের আপন বোন নয়। এমন কি দূর সম্পর্কের কেহ নয়।

মার্সেলরা ফরাসী, সুজেতরা বেল্‌জিয়ান। যুদ্ধের সময় সুজেতের মা বাবা তাহাকে লইয়া ইংলণ্ডে পলাইয়া আসে, তখন হইতে ইংলণ্ডেই তাহারা আছে। সুজেতরা শ্রমিক-শ্রেণীর লোক, যুদ্ধের পরে যখন নামমাত্র মূল্যে বাড়ী পাওয়া যায় তখন এই বাড়ীখানা কেনে। বাপ মিস্ত্রী, মা ঘর-সংসার বোঝে। সুজেৎ সবে স্কুলের পড়া শেষ করিয়া কোন একটা দোকানে কাজ পাইয়াছে। পেয়িং গেষ্ট্ না লইলে তাহাদের চলে না, ট্যাক্স্ যে অনেক।

কয়েক বছর আগে তাহাদের পরিচিত একটি ফরাসী কুমারী লণ্ডনের কোন এক সাধারণ সূতিকাগার হইতে বাহির হইয়া নবজাত কন্যাটিকে তাহাদের জিম্মা দেয় এবং মাসে মাসে কন্যাটির জন্য নিজের রোজগারের অংশ পাঠাইতে থাকে। কন্যাটির পিতাও খবর পাইয়া কন্যাটিকে দেখিয়া যায় এবং মাসে মাসে নিজের রোজগারের অংশ পাঠায়। কিন্তু মার্সেল জানেনা উহারা তার কে। মার্সেল জানে মাদাম তাহার মা, মসিয় তাহার বাবা, সুজেৎ তাহার দিদি। ইহারা তাহাকে খুবই ভালোবাসে, কিন্তু তাহার প্রকৃত পিতা-মাতার কাছ থেকে যাহা পায় তাহাতে প্রয়োজন মতো ছবির বই ও খেলার পুতুল কিনিয়া দেওয়া চলে না। এবং নিজেদের ক্ষমতাও অল্প। বুড়ীর বয়স বাড়িতেছে, বুড়ার চাকরি কোনদিন যায়, সুজেতের বিবাহের যৌতুক সঞ্চয় করিতে হয়।

সুধী বলে, "মার্সেলকে আমার হাতে দিন। আমি তাকে নিজের খরচে মানুষ করবো। তার বিয়ের যৌতুক আমি দেবো।"

মাদাম বলে, "তা হ'লে ওর বাবাটি মারা যাবে বুড়ো মানুষ,—মার্সেলকে ছেড়ে থাকতে পারে না ব'লে রোজ সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরে।"

সুজেৎ বলে, "কিরে মার্সেল, এঁর সঙ্গে এঁর দেশে যাবি?"

মার্সেল যেমন নিঃশব্দ, তেমনি নিস্পন্দ। পাথরের মতো অচঞ্চল। পাথরে গড়ামূর্ত্তির মতো ওজনে ভারি।

মেয়েটি অত্যন্ত প্রিয়দর্শন। তাহাকে না ভালোবাসিয়া থাকা যায় না। তাহার প্রতি করুণা তো হয়ই।

সুধী তাহাকে আরো কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, "তোর জন্যে নতুন বই কিনে আনবো রোজই ভেবে যাই, রোজই মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে দেখি দোকানগুলো বন্ধ হ'য়ে গেছে। আচ্ছা, এইবার তোর নতুন দাদা কিনে আনবেন।"

তারপর সুধী ও মার্সেল একই বই সুর করিয়া পড়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে।

"Jack and Jill
Went up a hill"

তারা কেমন করিয়া পাহাড়ে উঠিল, পাহাড় কত উঁচু—এসব মার্সেল হাতে কলমে শিখিতে ভালোবাসে। সুধী যেমন করিয়া যা করে সে-ও তেমনি করিয়া তাই করে। জ্যাক্ ও জিল্ সাজিয়া দু'জনে সোফার উপর হইতে আছাড় খায়। উহার নাম পাহাড় হইতে পড়া।

টাইমপিস্ ঘড়ির আড়ালে মুখ রাখিয়া সুধী বলে,

"Dickory dickory dock
It is both-time, says the clock."

মার্সেল ভাবে সত্যই যেন ঘড়িটা তার সঙ্গে কথা কহিতেছে। সেও বলে, "ডিকরি ডিকরি ডক্ ..." কিন্তু বাকীটা বলিতে না পারিয়া থামিয়া যায়।

রোজ একঘন্টা ধরিয়া এমনি কত খেলা ও পড়া। মেয়েটি অত্যন্ত হতভাগিনী বলিয়া সুধী তাহাকে সুখী করিয়া সুখ পায়। ইহাতে তাহার ভাইবোনগুলির জন্যে মন-কেমন-করা কমে।

২৩

বেল্ বাজিতেছে শুনিয়া সুধী দরজা খুলিয়া দিতে উঠিয়া গেল। রান্নাঘর থেকে মাদামও ছুটিয়া আসিয়াছে।

দে সরকার টুপি উঠাইয়া অভিবাদন করিল। "আরে, আসুন আসুন। বাড়ী খুঁজে পেলেন কি ক'রে?"

"কোন মুলুকে বাড়ী করেছেন, মশাই। দেড়ঘন্টা ধ'রে খুঁজ্‌ছি। গাইডে খুঁজে পাইনে, যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে এদিক দিয়ে ওদিকে যাও, তারপরে তিনটে রাস্তা ছাড়িয়ে ডাইনে যাও, তারপরে চারটে ল্যাম্প্ পোষ্ট্ পেরিয়ে বাঁয়ে তাকাও...ওঃ! মাফ করবেন। আপনাকে দেখতে পাইনি।"

"তাতে কী! আপনি কি মঁসিয় দ্য সারকার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কি মাদাম—?"

দে সরকারকে দেখিয়া বাদল বই ফেলিয়া উঠিল। করমর্দ্দনের পর দে সরকার কহিল, "তারপর কী খবর! বাড়ী পছন্দ হয়েছে?"

বাদল বলিল, "বেশ্। তবে ইংলণ্ডে এসে কণ্টিনেণ্টাল্‌দের সঙ্গে থাকতে উৎসাহ বোধ করছিনে।"

"তা যদি বলেন, নেটিব্ পরিবারে বড্ড খরচ, মিষ্টার সেন।"

নেটিব্ কথাটার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বাদল কহিল, "বিজ্ঞাপন দিলে ভালো ইংরেজ পরিবারে জায়গা পাইনে?"

"কেমন ক'রে পাবেন? যাদের দু'পয়সা আছে তারা পেয়িং গেষ্ট্ নেবে কেন? ওতে তাদের প্রাইভেসি নষ্ট হয়। পরের মন যোগানোর হাঙ্গামও আছে।"

"ধরুন যদি কোনো পরিবারে বন্ধুতা হয়ে যায়?"

"হলেও সুবিধে নেই। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ফ্ল্যাটে কিম্বা আধখানা বাড়ীতে বাস করেন। সাময়িক অতিথির জন্ত অতিরিক্ত ঘর রাখতে এত খরচ যে কদাচিৎ কেউ রাখেন।"

বাদল ভাবিয়াছিল রোম্যাণ্টিকভাবে কত পরিবারে প্রবেশ পাইবে, কত ঘরে ঘরের একজন হইবে। তাহার কল্পনায় ঘা লাগিল। সে কহিল, "তবু এমনো হ'তে পারে যে আমারি জন্মে তাঁরা ফ্ল্যাট্ বদ্‌লাবেন, ছোট ফ্ল্যাট্ থেকে বড় ফ্ল্যাটে যাবেন।"

দে সরকার খুব একচোট হাসিয়া লইল। বলিল, "আপনি মশাই, বিদেশে এসেছেন না শ্বশুর বাড়ী এসেছেন? ভুল ভাঙ্‌তে বেশী দেরি হবে না কিন্তু।"

সুধী মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। বাদলের জন্মে তাহার দুঃখ হইতেছিল। কল্পনায় ও বাস্তবে অনেক গরমিল।

সুজেৎ আসিয়া সলজ্জভাবে দাঁড়াইল। বলিতে চায়, খাবার দেওয়া হইয়াছে। সুধী বুঝিতে পারিল। কহিল, "আসুন খেতে যাই মিষ্টার দে সরকার, ম্যাদ-মোয়াজেল সুজেৎ।"

টেবিলে খাইতে বসিয়া দে সরকার বাদলের কানে কানে কহিল, "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। এইখানেই থেকে যাও না, সেন?"

বাদল কহিল, "কোথাও তিনমাসের বেশী থাকবো না, ভাই দে সরকার। লণ্ডনের সব ক'টা পাড়া দেখ্‌তে চাই।"

"তা হলে সবরকম লোকের সঙ্গে থাকতে প্রস্তুত হও। সব পাড়াতেই ভদ্র নেটিব্ শ্বশুরবাড়ী অতি বড় ভাগ্যবানও আশা করতে পারে না। এমন কি নেটিব্‌রাও আশা করে না।" এই বলিয়া দে সরকার অতিকষ্টে হাসি চাপিল। ইংরেজদের দেশে তাহার দুই বৎসর কাটিয়াছে। সে ভারতবর্ষে বসিয়া বসিয়া বিলাতী নভেল পড়ে নাই।

আহার শেষ হইলে লাউঞ্জে বসিয়া দে সরকার কফি ও সিগ্রেট প্রচুর ধ্বংস করিল। লোকটি আলাপ জমাইতে অসাধারণ পটু। মঁসিয় এবং মাদাম তাহাকে ছাড়িতেই চায় না। তাহার কাছে যত রাজ্যের খোস-গল্প শুনিয়া মুগ্ধ। চালও তাহার রাজারাজড়ার মতো। তাহাকে সিগ্রেট্ দিতে আসিবার আগেই সে তাহার হাতিদাঁতের সিগ্রেট্ কেস্ খুলিয়া মঁসিয়কে সিগ্রেট্ দিতে উঠিয়া গেছে। মাদাম সিগ্রেট্ খায় না বলিয়া মাদামের সঙ্গে করিয়াছে মধুর রসিকতা। সুজেৎ তাহাকে gallantryর সুযোগ না দিয়া রান্নাঘরে বাসন ধুইতেছে বলিয়া তাহার যে আক্ষেপ। এমন কি ছোট্ট মার্সেলকেও সে উপেক্ষা করে নাই। পকেট হইতে একগাদা টফি বাহির করিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়াছে।

পরণে তাহার ছাইরঙের সুট্, নিখুঁত কাট্। তাহার লম্বা গড়ন ও ফর্সা রঙের সঙ্গে এত ভালো মানায় যে একমাত্র ঐ পোষাকই যেন তাহার জন্মগত গাত্রাবরণ—ময়ূরের যেমন পেখম কিম্বা মেষের যেমন পশম। চার্লি চ্যাপলিনের যেমন গোঁফ এবং পেণ্টলুন, হ্যারল্ড্ লয়েডের যেমন চশমা, দে সরকারের তেমনি ছাইরঙের সুট্।

কফির পেয়ালায় সিগ্রেটের ছাই ফেলিতে ফেলিতে দে সরকার বলিতেছিল, "হাঁ। কী বল্‌ছিলুম, মঁসিয়। আমি যখন Marble Archএর কাছে সার্ভিস্ ফ্ল্যাট্ নিয়ে একা থাকতুম তখন একদিন এক বেল্‌জিয়ান যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায়। দেশে ফের্‌বার সময় সে আমাকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতেই বা বাকী রেখেছিল। এতদূর বন্ধুতা! নিমন্ত্রণ পত্র যে কতবার লিখেছে, এই সেদিনও একখানা পেয়েছি। যাই বলুন, বেল্‌জিয়ানদের মতো মিশুক জাত আমি আজো দেখ্‌লুম না।"—এই বলিয়া দে সরকার সিলিঙের দিকে মুখ তুলিয়া একরাশ ধোঁয়া ছাড়িল।

অতঃপর অবশ্য মাদাম চায়ে থাকিতে আব্দার ধরিল এবং মঁসিয় চলিল আর একবাক্স সিগ্রেট্ আনিতে। দে সরকার কিন্তু কিছুতেই থাকিতে পারে না, অন্যত্র তাহার চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। আগামী সপ্তাহে আসিতে পারিবে কি? না, মনে করিয়া দেখে, আগামী সপ্তাহটায় সবটাই তাহার আগে থেকে বিলি-ব্যবস্থা-করা। আচ্ছা, সে টেলিফোন করিয়া জানাইবে দু' একদিন পরে—অকস্মাৎ যদি কোনো এন্‌গেজ্‌মেণ্ট পিছাইয়া যায়।

সুধী ও বাদলকে লইয়া দে সরকার রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

২৪

দে সরকার লণ্ডনের ঘুঘু। কোথায় ছুইগিনি দামে চলনসই সুট পাওয়া যায় এবং কোথায় সাতগিনি দা'ম,

কোন্ দোকানের ওভারকোট কিনিতে হয় এবং কোন্ দোকানের ড্রেসিং গাউন—লণ্ডনের চাঁদনি এবং চৌরঙ্গী দুই তাহার নখদর্পণে। বাদলকে একদিন টিউবে চড়াইয়া, 'বাসে' বসাইয়া, পায়ে হাঁটাইয়া ক্যালিডোনিয়ান রোডের ওধারে কোন এক অজ্ঞাতকুলশীল হাটে লইয়া গেল, সেখানে সস্তার চূড়ান্ত। কুৎসিত্ পোষাক পরা কুৎসিত্ চেহারার যৌবনে-স্থবির কতকগুলো স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়া জিনিষের নাম ও দাম হাঁকিতেছে। বাদল ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে দেখিয়া দে-সরকার কহিল, "এই বুঝি তোমার লণ্ডন দেখার সঙ্কল্প! এসো, এসো, ক' নম্বরের মোজা চাই, এঁকে বলো।"

একমাসের মধ্যে দে-সরকারের তৎপরতায় বাদল শীতের জন্য যা-কিছু দরকার সবই কিনিয়া ফেলিল। তাহার নূতন সুট, নূতন জুতা, নূতন হ্যাট। দে-সরকার পই-পই করিয়া বলিয়া দিয়াছে কোন্ টাইয়ের সঙ্গে কোন্ মোজা ও কোন্ রুমাল মানায়। ওভারকোট কিনিয়া দিয়াছে সুটের সঙ্গে ও হ্যাটের সঙ্গে মিলাইয়া। পকেটে এক সেট্ আয়না-চিরুণী সবসময় রাখিতে শিখাইয়াছে। দে-সরকার না থাকিলে বাদল কেমন করিয়া জেন্‌টুল্‌ম্যান হইত? সুধীদা এ বিষয়ে অকর্ম্মণ্য। বড় জোর জানে—কোথায় নিরামিষ রেস্তোরাঁ ও Mudie-র লাইব্রেরী। তাহার পোষাক বলিতে দেশে তৈরি মোটা খদ্দরের গলাবন্ধ, কোট ও প্যান্টলুন, দেশী রেশমের পাগড়ী। ফরমাস দিয়া একটা দেশী পশমের গলাবন্ধ, ওভারকোট করাইয়া আনিয়াছে। টাই, মাফ্‌লার ইত্যাদির বালাই নাই তাহার। সুধীদা লণ্ডনের ফ্যাসানের ধার ধারে না, সুধীদা পুরাদস্তুর বিদেশী। বাদল সুধীদার সঙ্গে ঘর করিল বটে কিন্তু দে-সরকারের সঙ্গে বাহিরে ঘুরিল।

দে-সরকার বলে, "চাল দেওয়া জিনিষটাকে নেটিব্‌রা একটা আর্ট ক'রে তুলেছে, সেন। পরো পাঁচগিনির সুট, কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা করলে অম্লানবদনে বোলো আট-গিনির। থাকো সপ্তাহে দু' গিনি খরচ ক'রে, কিন্তু চাল থেকে যেন সকলে বোঝে সাউথ কেনসিংটন কিম্বা সেন্ট্ জনস্ উডের বাসিন্দে। না, না, মিথ্যা কথা বলতে বলছিনে। কিন্তু snob-কে যে-সমাজে উঁচু আসন দিয়েছে সে সমাজে একটু-আধটু অত্যুক্তি করলে বিবেকে বাধে না।"

বাদল বলে, "তুমিও খুব অত্যুক্তি করো বুঝি?"

"সকলের কাছে নয়। আমি এবিষয়ে একান্ত সায়েন্টিফিক্। যে-রকম লোকের কাছে যে-রকম advertise করলে ম্যাক্‌সিমাম্ ফল পাওয়া যায় সে-রকম লোকের কাছে সে-রকম চাল দিই। বেঁচে থাকলে একদিন লর্ড নর্থক্লিফ কিম্বা গর্ডন্ সেল্‌ফরিজ্ হবো।"

"আমি কিন্তু বেঁচে থাকলে একদিন বাদলচন্দ্র সেন হবো।"

দে-সরকার বলে, "আর দেখো, কাউকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কোরো না। যখন কারো সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে তখন তাকে চা খাওয়াতে চাও তো টী-রুম্‌সে নিয়ে যেয়ো, লাঞ্চ্ খাওয়াতে চাও তো রেস্তোরাঁতে দেখা করতে বোলো। কিন্তু বাড়ীতে ডেকে দারিদ্র্য দেখিয়ো না।"

বাদল বলে, "তা হ'লে তোমার ঘাড়ে ভূত হ'য়ে চাপ্‌তে হ'চ্ছে আজ। তোমার বাড়ীর ঠিকানা এতদিন দাওনি কেন, তার কারণ বুঝতে পেরেছি। চলো, ঐখানে চা খাবো।"

দে-সরকার সন্ত্রস্ত হইয়া বলে, "সে কেমন ক'রে হবে! আমার যে ক্লাস থাকে সমস্ত বিকাল। সেইজন্যে চা খেয়ে থাকি স্কুল অব ইকনমিক্‌সে।"

"তা হ'লে লাঞ্চ্ খাওয়াও কাল দুপুরে।"

"লাঞ্চ্! লাঞ্চ্ কি কেউ বাড়ীতে খায়?"

"তবে রবিবারে ডিনার খেতে ডাকো।"

"রবিবারে! তুমি হাসালে, সেন! সারাসপ্তাহ খেটে রবিবারটা ছুটি পাই। সেদিন কি বাড়ীতে থাকা পোষায়? একটু বেড়াতে বেরোবো না?"

ব্যাপারটা বাদলের চক্ষে রহস্যকর হইয়া উঠিল। কেন দে-সরকার কিছুতেই তাকে বাসায় যাইতে দিবে না? দারিদ্র্য? দে-সরকার কখনো দরিদ্র হইতে পারে? কতবার সে বাদলকে রেস্তোরাঁয় খাওয়াইয়াছে।

বাদল অভদ্রের মতো পীড়াপীড়ি করিল না। সে জানিত যে কোনো দুইজন ইংরেজ বন্ধু পরস্পর সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করাটাকে বন্ধুত্বের প্রত্যবায় জ্ঞান করে। এমনি

তো দে-সরকারকে বারংবার অনুরোধ করাটাই তার অন্যায় হইয়াছে।

দে-সরকার বলে, "কেম্‌ব্রিজে তো জায়গা এ বছর পেলে না। এ বছরটা অপেক্ষা করবে, না এখানকার কোনো কলেজে ভর্তি হবে? বি-কম্ পড়' তো আমি পড়বার সাথী পাই।"

বাদল বলে, "ব্যবসা আমার মাথায় ঢোকে না ভাই দে-সরকার, যদিও খুব ইণ্টারেষ্টিং। এক একটা 'ডিপার্টমেন্ট্ ষ্টোর' কেমন ক'রে চালায়, জান্‌তে এত ইচ্ছা করে! সেদিন যখন সেল্‌ফ্রিজের দোকানে নিয়ে গেলে, আমি ভাব্‌ছিলুম আমাদের পাটনা সেক্রেটারিয়েট তার তুলনায় কী! এককালে আমার খেয়াল ছিল, লর্ড সিংহের শূন্য সিংহাসনটা পূর্ণ করবো। এখন মনে হ'চ্ছে কি ক্ষুদ্র অভিলাষ!"

"লাটগিরিও চোখে লাগে না, সেল্‌ফ্রিজ্-গিরিও তোমার ধাতে সয় না। অথচ সেন-গিরি যে কী তাও আমাদের বলোনি!"

"আমি নিজেই জানিনে, ভাই। আমার মনে হয়, আমি যেন একটা নেবুলা। হ'তে হ'তে কী যে হ'য়ে উঠ্‌বো! আমাকে ভাব্‌তে সময় দাও।"

বাস্তবিক বাদল ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইতেছিল না। লণ্ডনের বি-এ ডিগ্রির জন্য আবার সেইসব পুরানো বইয়ের পাতা উল্টাইতে ও পরীক্ষা দিয়া মরিতে তাহার বিশ্রী লাগিতেছিল। পি-এইচ্-ডি'র থিসিস্ লিখিবার অনুমতি পাইবে কিনা সন্দেহ। পাইলেও মিউজিয়মের লাইব্রেরীতে গ্রন্থকীট হইয়া নূতন দেশের দৃশ্যরাশিকে উপেক্ষা করা তাহার বিবেচনায় অপরাধ। অথচ সুধীদা দিনের পর দিন তাই করিয়া যাইতেছে। সুধীদা যদি ডিগ্রীর জন্য পড়িত তাহা হইলে বাদলও পড়িবার উৎসাহ পাইত, কিন্তু সুধীদা বিদেশী ডিগ্রীর মর্য্যাদা মানে না। সে যদি চাকুরী করে তো দেশী ডিগ্রীর জোরেই করিবে। তাহার অভাব অল্প; আয় অধিক না হইলেও চলে।

বাদল বলে, "আমার মন চায় মনে-প্রাণে ইংরেজ হ'তে, ইংরেজের সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখ করতে, ইংরেজ যে-যে সমস্যার সমাধান খুঁজ্‌ছে সেই-সেই সমস্যার সমাধান খুঁজ্‌তে। কলেজে প'ড়ে আমি কতটুকু ইংরেজ হ'তে পারি বলো? সমগ্র ইংলণ্ডটাই আমার কলেজ হবে, ইংলণ্ডের সব অঞ্চল দেখ্‌বো, সবরকম মানুষের সঙ্গে মিশ্‌বো, সব প্রচেষ্টাতে যুক্ত থাক্‌বো—এই আমার মনস্কামনা।"

দে-সরকার এমন পাগল দেখে নাই। বিলেতে এত ছেলে যায়-আসে, কেউ ব্যারিষ্টার হয়, কেউ আই-সি-এস্, কেউ চার্টার্ড্ এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্, কেউ এঞ্জিনিয়ার। সকলেরই একটা-না-একটা লক্ষ্য আছে। এমন কি যাহারা স্ফূর্ত্তি করিতে আসে তাহাদেরও একটা উপলক্ষ্য থাকে, তাহারা পড়ুক নাই পড়ুক পড়ার ফী-টা দেয় এবং পরীক্ষায় অলিখিত খাতা দাখিল করে। সকলেই ঘোরতর ন্যাশনালিষ্ট্, কেহ কেহ কমিউনিষ্ট্। সকলেই নিখুঁত ইংরেজী বলিতে চেষ্টা করে, নিখুঁত ইংরেজী পোষাক পরিতে চায়, ইংরেজ বন্ধু পাইলে কৃতার্থ হয়। কিন্তু কেহ কি এই পাগ্‌লাটার মতো মনে-প্রাণে ইংরেজ হইতে চায়?

দে-সরকার বলে, "দেশ যাদের পদানত হ'য়ে থাকতে ঘৃণা বোধ করছে তুমি তাদেরি একজন হবে?—দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তোমাকে দোলা দেয় না?"

বাদল বিরক্ত হইয়া বলে, "নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বে ও-দেশে জন্মেছি ব'লেই যে আমি ও-দেশের লোক এমন কথা বলো যা, determinist হওয়াও তাই। আমি free willএ আস্থাবান। আমি জগতের মধ্যে এই দেশকেই নিজের ব'লে বেছে নিয়েছি।"

দে-সরকার ক্রোধ দমন করিল, কিন্তু কথা কহিল না। মনে মনে বলিল, "Black Sheep"; "নীলবর্ণ শৃগাল।"

দে-সরকার বাদলকে বয়কট্ করিল।

২৫

বাদল পৌঁছিয়া অবধি বাড়ীতে কিম্বা শ্বশুরবাড়ীতে চিঠি লেখে নাই, কেবল দুইটা Cable করিয়া দিয়াছিল। সে যে কোনোদিন ভারতবর্ষে ছিল এ ধারণাকে তাহার ইংলণ্ডগত মন একদণ্ডও স্বীকার করিতেছিল না। বর্ত্তমানকে ভোগ করিতে হইলে অতীতকে ভুলিয়া থাকা

দরকার। অতীতের স্মৃতির একটি কণাও যদি বর্ত্তমানের চেতনায় লাগিয়া থাকে তবে সেইটুকু উচ্ছিষ্ট সমস্তটা ভোক্তাকে অপবিত্র করিয়া দিতে পারে।

জাগ্রত অবস্থায় না হয় ভারতবর্ষকে ভুলিয়া থাকা যায়, কিন্তু স্বপ্নে তো মনে হয় ভারতবর্ষেই আছি—সেই কতকাল পূর্ব্বের দিদিকে দেখিতেছি, তিনি যেন হঠাৎ উজ্জয়িনী হইয়া গেলেন, উজ্জয়িনী বাদলদের কলিকাতার বাড়ীর ছাদে বড়ী দিতেছে।

এইরূপ স্বপ্ন বাদলকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। এত কষ্ট করিয়া এত সহস্র ক্রোশ দূরে আসিলাম, তবু এদেশের স্বপ্ন না দেখিয়া সেই কোন্ পূর্ব্বজন্মের স্বপ্ন দেখিতেছি! বাদল স্থির করিল দিনের বেলা কোনো ভারতীয়ের সংস্রবে আসিবে না, কোনো ভারতীয় বই বা চিঠি পড়িবে না, বাসা বদলাইয়া সুধীদাকে এড়াইবে এবং প্রতি-সপ্তাহে দেশের চিঠি আসিলে সুধাদাকে দিয়া পড়াইবে ও উত্তর লিখাইবে।

শনিবার রাত্রে দেশের ডাক আসিলে অন্যান্যবার সে পড়িয়া তুলিয়া রাখিত. উত্তর দিবে দিবে করিয়া দিবার সময় পাইত না। সেবার যখন ডাক আসিল বাদল সুধীকে কহিল, "সুধীদা, কাল তো রবিবার। আমার চিঠিগুলো প'ড়ে জবাব লিখে দিতে পারো?"

সুধী কহিল, "সে কি রে! আমার জবাব ওঁরা চাইবেন কেন? উজ্জয়িনীরা তো আমার নামও শোনেননি বোধ করি।"

"শুনেছেন হে শুনেছেন। পোর্ট সৈয়দ থেকে তুমি কী একটা বিয়ের উপহার পাঠিয়েছিলে। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, কে একথা না জানে!"

"তা ব'লে আমি তোর প্রাইভেট্ চিঠির জবাব দিতে যাবো?—ছি! ছি! ছি!"

"প্রাইভেট্ চিঠি কাকে বল্‌ছো? মিস্ গুপ্তের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তোমারও ধর্‌তে গেলে তাই। Mere acquainvance! সাতদিনে সাতঘণ্টাও আলাপ হয় নি।"

সুধী সস্নেহভাবে বলিল, "পাগ্‌লা!"

কিন্তু সত্য সত্যই বাদল চিঠি খুলিল না, তুলিয়া রাখিল না, সুধীর ঘরে ফেলিয়া রাখিয়া ভুলিয়া গেল। বৃহস্পতিবার ভারতবর্ষে ডাক যাইবার সময় অতিক্রান্ত হইলেও যখন জবাব দিল না তখন সুধী ভীত হইয়া কহিল, "বাদল, মেসোমশাই অত্যন্ত ভাব্‌বেন। কাজটা ভালো করিস্‌নি।"

বাদল কহিল, "চিঠির জবাবের কথা বল্‌ছো? তুমি দাওনি? বা রে! এই নিয়ে চারসপ্তাহের চিঠি জম্‌লো।"

"চা-র স-প্তা-হে-র! করেছিস্ কী! আমার আজ-কাল দেখাশুনা করবার সময় হয় না ব'লে তুই অমানুষ হ'য়ে গেছিস্? কাল সকালেই একটা cable ক'রে দিতে হবে। মেসোমশাই বড্ড ভাবেন।"

"ভালো কথা সুধীদা, তোমার মাদামকে সাতদিনের নোটিস্ দিলে চল্‌বে, না আরো বেশি দিনের? আমি Putneyতে উঠে যাচ্ছি।"

সুধী কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি ও হতবাক হইয়া রহিল। কহিল, "হেণ্ডন্ থেকে পাট্‌নী লণ্ডনের একপ্রান্ত থেকে আরেক-প্রান্ত, তা জানিস্?"

"ম্যাপে দেখেছি।"

"তবে তোর সঙ্গে রবিবারেও দেখা হবে না—শুধু যেতে আস্‌তেই চারটি ঘণ্টা লাগে।"

"ধ'রে নিয়ো আমি কেম্‌ব্রিজে আছি।"

"হুঁ। এদিকে যে কলেজগুলো খুলে গেল; ভর্ত্তি হবিনে?"

"নাঃ। ভেবে দেখ্‌লুম, আইন পড়্‌বো। তার মানে বার-ডিনার খাবো এবং টো-টো ক'রে বেড়াবো। Called যদি হই তো English Bar-এই প্র্যাক্‌টিস্ কর্‌বো। ইণ্ডিয়ায় আমি ফির্‌ছিনে, ভাই সুধীদা!"

সুধীর প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। যেন বাদল চিরকালের মতো পর হইয়া যাইতেছে! এতদিন তাহাকে পক্ষীমাতার মতো পক্ষপুটে রাখিয়াছিল; এখন সে বড় হইয়াছে, উড়িতে চাহিতেছে।

সুধী কহিল, "সম্ভব হ'লে আমিও Putneyতে উঠে যেতুম। কিন্তু মার্সেলকে নিয়ে একটা নতুন শিক্ষা-

পদ্ধতির এক্সপেরিমেন্ট্ করছি। সেও আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে না।

বাদল কহিল, "সেই বেশ। আমি যে-পরিবারে থাক্‌বো তাতে একজনের বেশি বাইরের লোক নেবে না। তাদের জায়গা নেই, তারা এর আগে বাইরের লোক নেয়ওনি। কেমন ক'রে তাদের আবিষ্কার করলুম, জানো সুধীদা?"

"বল্।"

"অক্সফোর্ড্ স্ট্রীটে একটা এজেন্সি আছে, তারা ভদ্র-পরিবারে স্থান করিয়ে দেয়। আমি যেই ঢুকেছি আমাকে বল্লে, ইণ্ডিয়ান তো? আমি বল্লুম, হাঁ। মেয়েটি বল্লে, দুঃখিত হ'লুম। 'Mother India' প'ড়ে কেউ ইণ্ডিয়ানদের ঘরে নিতে রাজি নয়। আমি মুখ শুকিয়ে ফিরে আসছিলুম। মেয়েটি পিছু ডেকে বল্লে, দেখুন, বেশি দূরে ও বেশি দরে থাক্‌তে প্রস্তুত আছেন? আমি বল্লুম, যদি আমাকে নেয়। মেয়েটি ফোন করলে, মিসেস্ উইল্‌স্ বাড়ী আছেন?...আছেন? আমি হার্ভে এণ্ড্ হার্ভে থেকে কথা কইছি। আপনারা একটি ইণ্ডিয়ান যুবককে নিতে রাজি আছেন?...রাজি আছেন! তাঁকে আপনার ঠিকানা দেবো?...ধন্যবাদ! তারপর আমি ডাকঘরে গিয়ে নিজেই একবার ফোন করলুম। ভারি মোলায়েম গলা। বল্লেন, আমরা এই প্রথম বাইরের লোক নিচ্ছি ব'লে কিন্তু একটি সর্ত্ত করেছি। আমি বল্লুম, কী সর্ত্ত? তিনি বল্লেন, সেটি এই যে আমাদের যদি আপনাকে ভালো না লাগে আমরা আপনাকে একমাসের বেশি রাখ্‌বো না। সর্ত্তটা দু'তরফা। আপনার যদি আমাদিগকে ভালো না লাগে আপনিও একমাসের বেশি থাক্‌তে বাধ্য নন্। আমি বল্লুম, সেই ভালো।"

"বাড়ী না দেখেই কথা দিয়ে ফেল্লি?"

"একমাসের জন্যে একটা অভিজ্ঞতা হ'য়েই যাক্ না? অন্ততঃ লণ্ডনের আরেকটা পাড়া দেখা হবে।"

২৬

বাদল চলিয়া গেলে পরে বাদলের পিতাকে লিখিবার ভার সুধী বিনাদ্বিধায় লইল। মেসোমশাই তারই হাতে বাদলকে সঁপিয়া দিয়াছেন; তাহার চিঠির উপর তাঁহার যতটা আস্থা বাদলের চিঠির উপর ততটা নাই। তিনি ভালোই জানিতেন যে বাদল সংসারিক বিষয়ে অমনোযোগী ও অজ্ঞ। সরকারী টেলিগ্রামকেও সে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দিয়া থাকে, রেজেষ্ট্রী করিয়া রসিদ লইতে ভুলিয়া যায়, বাজার করিতে পাঠাইলে দোকানদার যে দর হাঁকে সেই দর দিয়া আসে—ওসব কথা দূরে থাক্, ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিতে জানে না। কোনো-বার বাদল যদি বা ট্রেনে উঠে তাহার জিনিষ উঠে না। কোনো-বার তাহার জিনিষ যদি বা ট্রেনে উঠে বাদল উঠে না। প্রায়ই তাহার চশ্‌মা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বলে, "সুধীদা, তুমি দেখেছ?" সুধী তাহার কান দুটো মলিয়া কান হইতে চশমাটাকে টানিয়া বাহির করে। তখন বাদল বলে, "How funny! চশমাটা সারাক্ষণ চোখেই ছিল, তা নইলে সেটাকে খুঁজে বেড়াবার মতো দৃষ্টিশক্তি যে থাক্‌তো না।"

এই অসহায় ছেলে বিরাট লণ্ডন শহরে অপরিচিতদের সহিত একাকী থাকিবে! দে-সরকারকে যতক্ষণ সঙ্গে লইয়া ঘুরিত ততক্ষণ মোটর-চাপা পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন নিষ্কর্ম্মার মতো টো-টো করিয়া বেড়াইবে—আইন পড়া তো তিনমাসে ছয়দিন ডিনার খাইয়া আসা?

সৌভাগ্যক্রমে সুধী ও বাদল উভয়েরই বাড়ীতে টেলিফোন ছিল। সুধী প্রত্যহ একবার করিয়া রাত্রে ফোন করিয়া খবর লয়। "দিনটা কেমন ক'রে কাট্‌ল?"—"বেশ, চমৎকার! আজ গেছ্‌লুম Gray's Inn-এ ভর্ত্তি হ'তে। কিছুতেই নিতে চায় না; ইণ্ডিয়ান কম নিয়ে থাকে। বল্লুম, আপনিও যেমন ব্রিটিশ আমিও তেমনি ব্রিটিশ। এই দেখুন পাস্‌পোর্ট্। এই Innএর উপর আমার জন্মগত অধিকার। পাস্‌পোর্ট্ নাড়াচাড়া ক'রে বল্লে, আপনার বাবা ম্যাজিষ্ট্রেট্? তবে তো আইনের চর্চ্চা আপনার বংশগত। তারপর ভর্ত্তি হবার অনুমতি পেলুম। চেক লিখে দিয়েছি।"

"দিনটা কেমন কাট্‌ল?"—"খুব ভালো, ধন্যবাদ। মিসেস্ উইল্‌সের সঙ্গে সারাদিন গল্প ক'রে কাটিয়েছি। Devonshire—Glorious Devon—সেইখানে তাঁর স্বামীর

ও তাঁর জন্ম ও বিবাহ। সে আজ কতকালের কথা। তারপর এঁরা লণ্ডনে এসে স্থায়ী হন্। কতরকম অবস্থা-বিপর্য্যয়! ওঃ, সে অনেক কথা! আজ আমাকে এক্স্‌কিউজ্ করো। গুড্ নাইট্।"

ইতিমধ্যেই কথায় কথায় 'ধন্তবাদ' ও 'এক্স্‌কিউজ্ করো'—এই তাহার আত্মীয়তম বাদল! সুধী নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হইতেছিল। তাহার নিজের দিক হইতে বাদলের প্রতি স্নেহ কমে নাই তো? বাদল যে বড় অভিমানী ভাইটি। একবার সুধী তাহাকে না দেখাইয়া মাসিকপত্রে লেখা ছাপাইয়াছিল বলিয়া বাদল একরকম প্রায়োপবেশন করিয়াছিল বলিলে চলে।

সুধী একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, আমার উপর রাগ করিস্ নি তো?"—"না রাগ করবো কেন? এতদিন তোমার সঙ্গে দেখা করিনি ব'লে, বলছ? রোসো, আগে মিউজিয়মে ভর্ত্তি হই, সেইখানেই মাঝে মাঝে দেখা হবে। রবিবারে আসতে চাইছ? অনেক দূর,—অনেকগুলো চেঞ্জ্। কাজ কী এত কষ্ট ক'রে?"

এরপরে সুধী বাদলকে ফোন করা কমাইয়া দিল। মেসোমশাইকে চিঠি লিখিবার সময় আসিলে জিজ্ঞাসা করে, "তোর কিছু বল্‌বার আছে?"—"কিছুই বল্‌বার নেই; ধন্তবাদ।"

উজ্জয়িনীর চিঠি লইয়া সুধী মুস্কিলে পড়িল বাদল চলিয়া যাবার পরেও সুধী উজ্জয়িনীর চিঠি খুলিতে সঙ্কোচ বোধ করিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে যখন কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল তখন সুধী ভাবিল, উজ্জয়িনীর ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার করা হইতেছে। সুধী দ্বিধার সহিত চিঠিখানা খুলিল।

বেশি নয়, ছোট্ট একটুকরা কাগজ। তাহাতে আছে:—গুড্ মর্ণিং মিষ্টার সেন, বিলেতে গিয়ে আমাদের ভুলে গেছেন বোধ করি। কেমন লাগ্‌ছে? কার কার সঙ্গে আলাপ হ'লো? শুনেছি ওখানে একটা ভাল চিড়িয়াখানা আছে। আমি আপনার দেওয়া বইগুলি প'ড়ে ভালো বুঝতে পারিনে। অলিভ্ শ্রাইনারের Lyndalকে আমার বড় হৃদয়হীন মনে হয়। ইব্‌সেন থেকে কী উপদেশ পাওয়া যায়? আমরা ভালো আছি। আজ আসি। ইতি। বিনীতা শ্রীউজ্জয়িনী দেবী।

পুনশ্চঃ

ওখানে কি বড়ো শীত? বরফ পড়্‌ছে বুঝি? বেশি বাইরে বেরোবেন না। ঠাণ্ডা লাগ্‌লে সময়মতো প্রতিকার না করলে নিমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে। কিছু ফরাসী ডাকটিকিট পাঠাবেন? বাবার আশীর্ব্বাদ জানবেন।

বিবাহ সম্বন্ধে বাদল কিছু বলে নাই, সুধীও জিজ্ঞাসা করে নাই। সুধী জানিত ব্যাপারটা যদি সুখের হইত তবে বাদল আপনা হইতেই বলিত। উজ্জয়িনীর বয়স কত, সে কতদূর পড়িয়াছে, তাকে দেখিতে কেমন—সুধীকে বাদল আভাসটুকুও দেয় নাই। মনে মনে তাহার একটি প্রতিমা গড়িবার পক্ষে মালমসলা তাহার চিঠি। সুধী কল্পনা করিল উজ্জয়িনী ছোট একটি মেয়ে, বয়স তেরো-চোদ্দ, দেখিতে কিছু গম্ভীর। বেশ লক্ষ্মী মেয়েটি, সরল, শিষ্ট। 'সুজেতের' মতো লজ্জায় মাটিতে মিশাইয়া যাইতেছে না, সপ্রতিভ। অল্পবয়সীর মতো চিড়িয়াখানার কৌতূহলী, অথচ বয়সের অনুপাতে চিন্তাশীল।

কিন্তু কী লিখিবে? উজ্জয়িনীকে চিঠি লেখা Sigrid Undsetকে চিঠি লেখা হইতে কঠিন। দুইজনেই অপরিচিতা, কিন্তু একজন খ্যাতিসম্পন্না। খ্যাতিতে দূরত্ব হ্রাস করে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের যত নিকট চণ্ডীচরণ দত্ত কিম্বা ভুজঙ্গভূষণ লাহা তত নিকট নন্।

সুধী লিখিল:—

মাননীয়াসু,

কল্যাণীয়াসু লিখিলেই যথার্থ হইত আমি বাদলের জ্যেষ্ঠ—অতএব আপনারও। বাদল নানা কাজে ব্যস্ত। তাহার চিঠিপত্র আমাকেই পড়িতে ও লিখিতে হয়। আমি তাহার কেবল অগ্রজ নই, সচীব ও সখা। উপরন্তু সেক্রেটারী সেই অধিকারে এই পত্র লিখিতেছি। এটি আপনার পত্রের উত্তর।

বাদল শারীরিক ভালো আছে। সে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিমে, আমি উত্তর-পশ্চিমে। সম্প্রতি কিছুকাল দেখা হয় নাই, কিন্তু প্রায়ই ফোনযোগে কথাবার্তা হয়।

চিড়িয়াখানা এখনো দেখিতে যাই নাই। আমার বোন 'মার্সেল' টিউবে কিংবা বাসে চড়িলে অসুস্থ হইয়া পড়ে, জানিনা তাহার কী অসুখ আছে। তাহাকে না লইয়া একা গেলে সে মনে কষ্ট পাইবে। ভাবিয়াছি একদিন তাকে ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাইব। কিন্তু লণ্ডনে ঘোড়ার গাড়ী বড় একটা দেখিতে পাই না।

ফরাসী ডাকটিকিট কাছে নাই, আনাইয়া দিব। উপস্থিত বেলজিয়ান ডাকটিকিট পাঠাইতেছি।

আমার পত্র যদি আপনার পছন্দ হয় তো ভবিষ্যতে যে-পত্র লিখিব তাহাতে সাহিত্যের কথা থাকিবে। আপনার পিতাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইয়া আপনি আমার প্রীতি-নমস্কার জানিবেন। ইতি নিবেদক

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (বাদলের সুধীদা)

চিঠিখানা ডাকে দিয়া সুধী ভাবিল, যাক্, দেড়মাসের মতো নিশ্চিন্ত হইলাম। উজ্জয়িনী এ চিঠি পাইবেন প্রায় তিনসপ্তাহ পরে। যদি সেবারকার মতো উত্তর না দেন তবে তো কথাই নাই; যদি দেন তবে আরো তিনসপ্তাহ উত্তীর্ণ হইবে। উজ্জয়িনীকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সুধী তাহার পড়াতে ও পড়ানোতে মন দিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

বসন্তসেনা

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী

ওগো আজিকার গোধূলি-আঁধারে বীথিকার পথ ছায়াতে মিশায়—

যায় না চেনা !

তরুশিরে পড়ি' মৃত রবিকর চিকণ ধূলিরে স্বপন শোনায়—

সে আসিবে না !

বারে বারে তাই চমকি' চমকি' উঠিছে কারা ?

আসিবে সে বলি' জেগেছিল যারা স্বপনহারা—

নিবিড় লতায়-পাতায় বাঁধনে বাতাসের সনে শ্বসিয়া জানায়

'জাগো গো সেনা !'

জাগো ওগো জাগো—ছোট ছোট পাতা—মাঝারে তাহার গোপন কোণায়

কুটিল হেনা !

তিমির-দুকূলা রজনীর রূপ তারার আড়ালে ফুটিছে যেমন,

তেমনি ক'রে

সৌরভিনী সে হেনার মাধুরী আঁধার-কারায় রবে না মগন

পাপ্‌ড়ি-ঘরে !

বসন্তসেনা, তাই তোমা' লাগি' রয়েছি বসি'

ক্ষীণ রোহিণীর পাশে যে ভাসিছে সোনার শশী,

ছায়াঘন ধীর বন-বিটপীর শাখায় শাখায় তাই ত গোপন

তিমির সরে—

দূর রাজপথে রুণু-ঝুণু-ঝুণু শুনিব নূপুর—উনমন্ মন

কেমন করে !

হৃদয় আমার মানিবে না বাধা— আজিকার রাতি হবে না বিফল

জেনেছি মনে !

থামে কোলাহল ; নিবে যায় দীপ—নয়নে আমার কে দিল কাজল

এ নিরজনে !

কাঁপে পল্লব, নাচে লতা যেন বনের মেয়ে—

প্রেমিক পথিক দূরে চ'লে যায় কি গান গেয়ে !

ধীরে ভেসে আসে শীতল বাতাস—মেঘে মেঘে বাজে বাদল-মাদল
তমাল-বনে !
সেনা ওগো সেনা ! এখনো আসে না—থামে নগরীর গীত-কোলাহল
সে বরষণে !

ঝর-ঝর ধারা—দোলে তরুশির ; বরষা সে যেন বাজায় সেতার
সকল তারে !
দূর বহুদূর প্রাসাদ-চূড়ায় তরু-মরমরে ধ্বনিটি কেকার
প্রাণের দ্বারে !
বসন্তসেনা, এখনো রজনী রয়েছি জাগি',
কোমল শয়নে তুমি ত ঘুমাও—বুঝিবে তা' কি ?
ঘুমের পরী যে বরষা-নিশীথে পালক বুলায় নয়নে তোমার—
রজনী বাড়ে !
সার্শিতে যেন জলের ঝালর—ঘুমায়ে হেরিছ স্বপন কাহার ?
ভাবিছ কারে ?

সেনা ওগো সেনা, ফুটে' গেল হেনা—বাতাসের বেগে মুকুল ধূলায় ;—
আসিবে কবে ?
টুপ্ টাপ্ ঝরে শ্রান্ত ধারারা ; ঝিঁঝিরা আমারে সহজে ভুলায়
নূপুর-রবে !
মধ্যরজনী ঘনঘোর হ'ল ; বিজলী ঝলে ;
সুমুখে আমার বিজলীর মত এসো গো চ'লে !
আজ শিথিল ক্ষীণ তনুখানি নমিয়া পড়িবে বুকের কূলায়
আসিবে যবে—
সেনা ওগো সেনা, ঝ'রে যায় হেনা,—বাতাসের বেগে মুকুল ধূলায় ;
চপলা নড়ে ।

কেশভার বেয়ে ঝরে বারিধার—মিশিয়া গিয়াছে তনুতে বসন ;—
সে তনু-লতা !
ঘুমঘোর যেন আঁখিতে জড়ায়ে—ছোট বারিকণা জড়ায়ে নয়ন
কহিছে কথা ।

ছিঁড়ে গেছে হার, খ'সে গেছে তার মধ্যমণি ;
কণ্ঠ বেড়িয়া আছে সে তেমনি,—পড়ে নি খসি' !
পথ-বারি-স্রোতে আল্‌তার রেখা—হায় রে হৃদয় হেরিছে স্বপন ;
তন্দ্রা-রতা
ঘন কালো কেশ এলায়ে কোথায় বসন্তসেনা মুদিল নয়ন
সরম-নতা ?

পথ-ধূলা' পরে মণি যদি পাও, বেঁধে নাও তারে আঁচলে তোমার
সেনা গো সেনা !
হাজারো চটুল নয়নের মাঝে দুইটি নয়নে থেকে উঠে তার
পরম চেনা ।
বসন্তসেনা, আজো আছ, তাই তোমারে স্মরি'
সঙ্গীতে মোর শিখা জেলে দেয় এ বিভাবরী—
তাহারি আলোকে হেরি বুকে তব ঝলমল্ করে প্রেম-মণি-হার
সে টুটিবে না !
পথ-ধূলা' পরে মণি যদি পাও, বেঁধে নাও তারে আঁচলে তোমার
সেনা গো সেনা !

ধীরে খুলি' দ্বার, পুর-বীথিকার হে অভিসারিণী, প্রদীপ নিবাও
আপন-করে !
আঁধারে ভাসিছে ঘন সৌরভ, ঝিকিমিকি আলো, তবু পথে ধাও
বাদল ঝরে !
খুলিবে নূপুর, ছিঁড়ে যাবে হার, সেনা গো সেনা,
নব বারিধারে ভিজিবে বসন, ফুটিবে ফেনা—
শীতল অধর, শীত পয়োধর, চন্দনবনে ব'হে যায় বাও
গন্ধভরে—
তন্দ্রাবিহীন আজো নিশি জাগি, হে অভিসারিণী, প্রদীপ নিবাও
আপন-করে !

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

বিচিত্রা-চিত্রশালা

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের সৌজন্যে

সেণ্ট পিটার গির্জ্জায় মোজেসের মূর্ত্তি—রোম

জেরুজেলামের কারাগারে সেণ্ট্ পিটারকে যে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখা হয় সেই শৃঙ্খল রক্ষণার্থে সম্রাজ্ঞী ইউডোসিয়া সেণ্ট্ পিটার গির্জ্জা নির্ম্মিত করান। তাহারই ভাবদেশে প্রসিদ্ধ ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলো কৃত মোজেসের প্রতিমূর্ত্তি।
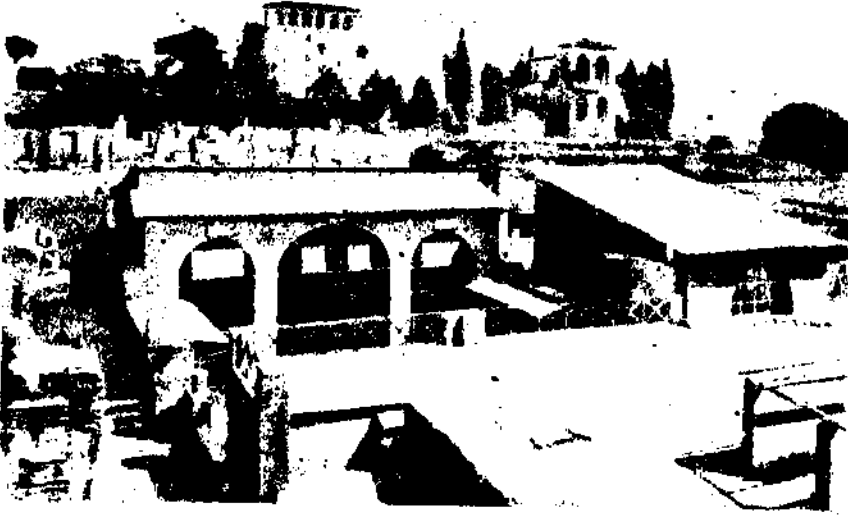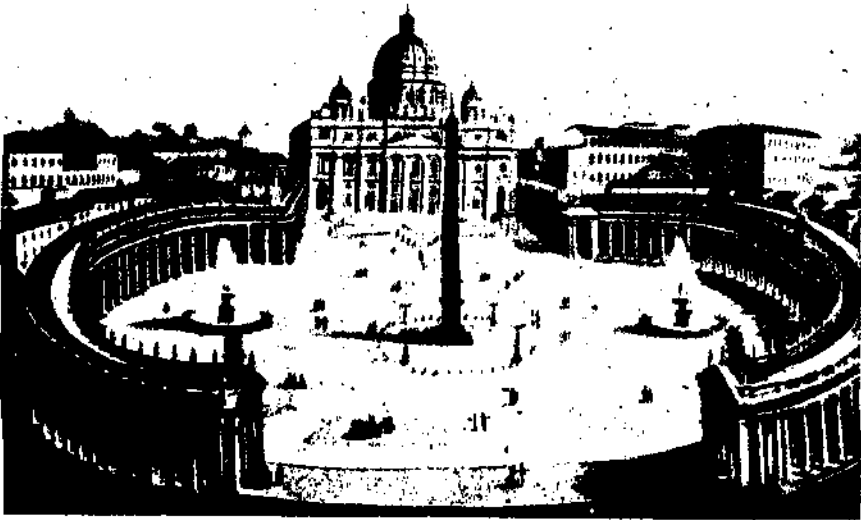
লিভিয়া সৌধ—রোম

সেণ্ট্ পিটার্ গির্জ্জা এবং স্কোয়ার—রোম

সেণ্ট্ পিটারের সমাধিভূমির উপর সম্রাট্ কন্‌ষ্টান্টিনো কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই গির্জ্জাটি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৌধ বলিয়া খ্যাত।

মণ্টির ধর্ম্মমন্দির—রোম

১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট্ অষ্টম চার্লস্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
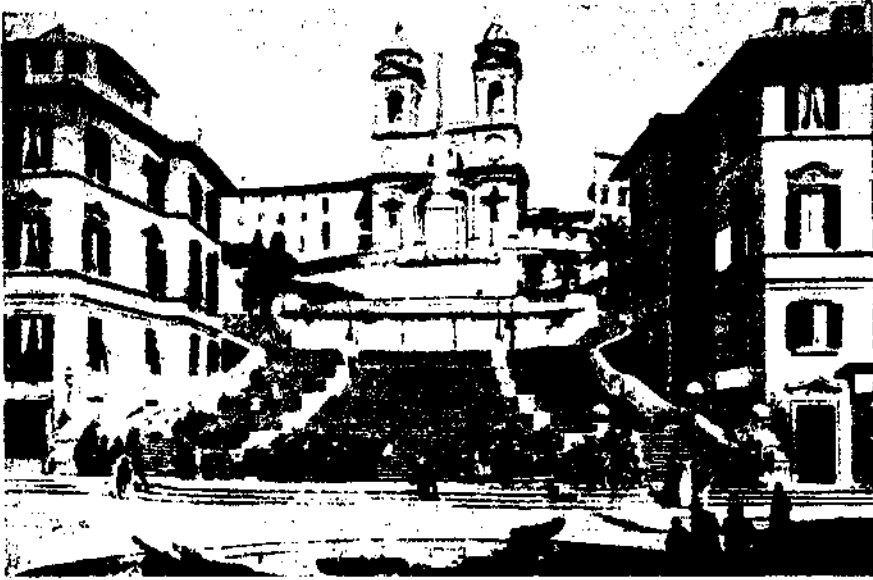
ভ্যাটিক্যান গ্রন্থাগার—রোম

১৪৫০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। "Salone" নামক প্রথম কক্ষের দেওয়ালগুলি নানাবিধ চিত্রে অলঙ্কৃত। এই গ্রন্থাগারে প্রায় চারলক্ষ পুস্তক ও মূল্যবান হস্তলিখিত পুঁথি আছে।

বিচারালয়—রোম

সেণ্ট: সিবাষ্টিয়ান্ গেট—রোম

এই সুপ্রসিদ্ধ তোরণটি মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার দুই দিকের দুইটি বুরুজ ৯০ ফুট উচ্চ।

অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম-এ

আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, আমার ডেস্কে কতকগুলি ছোটো খাটো লেখা প'ড়ে আছে। সেগুলি যে কবে লিখেছিলুম ও কেন লিখেছিলুম মনে নেই। তবে অনুমান করছি যে, সেগুলির বয়েস দশ বৎসরের বেশি নয় পাঁচ বৎসরের কম নয়। সম্ভবতঃ সে সবই কোন-না-কোন অসম্পূর্ণ প্রবন্ধের ভগ্নাংশ মাত্র। এই সব অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করতে সাহসী হচ্ছি এই কারণে, সম্পূর্ণ প্রবন্ধ বলে কোন জিনিষ নেই। আমি এমন কোনও প্রবন্ধ জানিনে, লেখক ইচ্ছে করলে যাকে বাড়াতে কিম্বা কমাতে পারতেন না। নাটক শুনতে পাই, হয় মিলনান্ত নয় বিয়োগান্ত হওয়া চাই-ই চাই। কিন্তু প্রবন্ধকার যে কোথায় দাঁড়ি টানবেন তার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যতক্ষণ খুসী ততক্ষণ আমরা ব'কে যেতে পারি—শুধু কতক্ষণ লোকে তা শুনতে পারে সেই হিসেব থেকেই আমাদের বকুনি নিয়মিত করতে আমরা বাধ্য। সুতরাং প্রবন্ধ-নাটকের জাত নয়, নভেলের জাত,—ওর কোনও মাপ নেই। আর এক কথা,—যাঁরা আমার বড় প্রবন্ধ পড়তে পারেন, তাঁরা আশাকরি আমার সে প্রবন্ধ পড়তে পারবেন যা কোন কারণে বেড়ে ওঠেনি। এই ভরসায় এই টুকরাগুলিকে ছাপার অক্ষরে প্রমোশান দিতে সাহসী হয়েছি। এগুলি সব আমার লেখা নয়, কারণ কোন কোনটির ভিতর থেকে বীরবলের হাত বেরিয়ে পড়ছে। সেগুলির নীচে বীরবলের সই থাকবে। ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আদিরস

অনেক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মতে যৌবনের মুখেই প্রকৃতির গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিখ্যাত জর্ম্মান দার্শনিক Schopenhauer বলেন যে, প্রকৃতির মূলরস হচ্ছে আদি রস। সৃষ্টির জন্য সৃষ্টি করবার বাসনা চাই এবং শক্তি চাই। এবং যা সৃষ্টির কারণ তাই হচ্ছে স্থিতি অর্থাৎ সৃষ্টি রক্ষারও কারণ,—সুতরাং নূতন প্রাণের সৃষ্টি করবার প্রবৃত্তি হচ্ছে মানবের আদিম ও সর্ব্বপ্রধান প্রবৃত্তি। প্রাণের মূলে এই মধুর রস আবিষ্কার করবার দরুণ বোধহয় জীবনের স্বাদটা Schopenhauerএর মুখে অত তিত লেগেছিল। সে যাই হোক, সমস্ত জগৎ না হোক, প্রাণী জগতের সম্বন্ধে যে একথা ঠিক সে বিষয় সন্দেহ নেই। জীবন-প্রবাহ শুধু নিতানব সৃষ্টির দ্বারা মৃত্যুর হাত এড়িয়ে চলে। যদি কেউ বলেন যে, এ সত্য দর্শন বিজ্ঞানের

অধিকারভুক্ত হলেও কাব্যে তার স্থান নেই, তাহলে তার উত্তরে আমি বলি যে, যেখানে আনন্দ আছে সেইখানেই কাব্যের অধিকার। এ পৃথিবীতে বোধ হয় এমন কোনও স্ত্রী কিম্বা পুরুষ নেই, দেহ মনের যৌবন ধর্ম্মের প্রসাদে যার কাছে অন্ততঃ একদিনের জন্যও এই মাটির পৃথিবী স্বর্গ হয়ে ওঠেনি, এই অনাত্ম জগৎ আত্মীয় হয়ে ওঠেনি। যে মোহিনী শক্তির দ্বারা মানবের অন্তর বাহিরের এই রূপান্তর ঘটে তা মানবের চিরপুরাতন হলেও চিরনবীন আনন্দের সামগ্রী এবং সেই কারণেই তা কাব্যের উপাদান। এই কারণেই আমি সংস্কৃত কবিদের রুচির নিন্দা করতে প্রস্তুত নই।—পুরাকালে লোকের বিশ্বাস ছিল এই যে, সকল সত্যই বক্তব্য এবং তাঁদের মতে সুরুচি ও কুরুচির ভেদ শুধু বলবার রীতির উপর নির্ভর করত। সে কালে সুরুচির পরিচয় ছিল কথা ভাল ক'রে বলায়, একালে ও গুণের পরিচয় চুপ ক'রে থাকায়। আমি সাহিত্যিক, অর্থাৎ কথা বলাই আমার কাজ, সুতরাং নীরবতাকে সুরুচি ব'লে আমি মান্য করতে পারিনে। সংস্কৃত কবিরা সহজ সত্য সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সেই স্পষ্টবাদিতার গুণে তাঁদের কাব্য অমর হয়েছে।

নূতন মত

কোনও নূতন মত পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে বিনা আপত্তিতে গ্রাহ্য হয় নি। এর কারণও অতি স্পষ্ট। মানুষ তার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি থেকেই কি জীবনে কি মনে নতুন পথে চল্‌তে চায় না। পৈতৃক সম্পত্তি যে পৈতৃক প্রাণ রক্ষার একটা মস্ত সহায় এ কথা কে না জানে। তারপর আমরা যাকে পুরাতন মত পুরাতন প্রথা বলি, সে-সবই ত মানুষের উত্তরাধিকারী সত্ত্বে লব্ধ সম্পত্তি। দ্বিতীয়তঃ—যা পুরাতন তা পরীক্ষিত—তার দ্বারা যে কাজ চ'লে যায় তার প্রমাণ প্রত্যক্ষ এবং যথেষ্ট। অপর পক্ষে নূতনকে বুদ্ধির দ্বারা যাচাই ক'রে নিতে হয়, কেন না ব্যবহারিক জীবনের সকল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে সে আমাদের কাছে উমেদারি করতে আসে না। অথচ এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির উপরই সব চাইতে কম ভরসা রাখে। জীবনের প্রধান দায় হচ্ছে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা এবং পদে পদে বিচার ক'রে চল্‌তে হলে মানুষের পক্ষে চলা জিনিষটে অসম্ভব হয়ে পড়ে। যিনি কেবলমাত্র বুদ্ধিমান, তাঁর মতে জীবনটাকে অচল ক'রে তোলাটাই যে পরম পুরুষার্থ, এর প্রমাণ নানাদেশের নানা যুগের নানা দর্শনে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকে দর্শনকে ছুঁতে ভয় পায়, তার কারণ তাদের ধারণা যে ও বস্তু স্পর্শ করবামাত্র তাদের হাত পা সব আড়ষ্ট হয়ে যাবে। এবং এ ভয় মোটেই অকারণ নয়। দর্শন-সাগর সাঁতরে পার হবার মত আত্মশক্তি খুব কম লোকেরই আছে। সুতরাং যে বস্তুকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে যাচাই ক'রে নিতে হয় সে বস্তুকে বিনা পরীক্ষায় বিদায় দেওয়া আমাদের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক তেমনি সঙ্গত। তারপর, যে মত যুদ্ধে জয়ী না হতে পারে সে মতের কোনই মর্য্যাদা নেই। সুতরাং যাঁরা কোনও নূতন মত প্রচার করতে উদ্যত হন, তাঁদের একহাতে সপ্তরথীর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত হওয়া উচিত—শুধু তাই নয়, বিপক্ষের কূটযুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হওয়া উচিত।

একদিকে নূতন মতকে ধ্বংস করবার প্রবৃত্তি অধিকাংশ লোকের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক ও সঙ্গত,—আর একদিকে দু'চারজনের পক্ষে সে মতের প্রতিষ্ঠা করবার প্রবৃত্তিও তেমনি স্বাভাবিক ও সঙ্গত। স্বাভাবিক এই কারণে যে, যদি কেউ মনে করে যে সে কোনও সত্যের সন্ধান কিম্বা সাক্ষাৎ লাভ করেছে—তাহলে সে সে-সত্যকে গোপন করতে

পারে না। মানুষের মনের উপর সত্যের প্রভুত্ব বড় কম নয়—এবং তার হুকুমে মানুষকে চল্‌তে হয়; কেন না, এই ভাবে চলার ভিতর রয়েছে তার আনন্দ ও তার জীবনের চরিতার্থতা।

আর সঙ্গত এই কারণে যে, যদিও অনেক নূতন মত মোটেই সত্য নয়, তথাচ অনেক নূতন মত সম্পূর্ণ সত্য। সে মত সত্য কি মিথ্যা—তা ধরা পড়ে বুদ্ধির বিচারে ও জীবনের পরীক্ষায়। সুতরাং সে বিচার সে পরীক্ষা থেকে পিছপাও হওয়াটা শুধু কাপুরুষতা নয়—মানব-সমাজের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা। কেন না ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে ব'লে দিচ্ছে যে, যা আমরা আজকের দিনে সনাতন ব'লে মান্ত করি—তা একদিন অতি নূতন ছিল এবং সমাজের পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেই তা জয়ী হয়েছে এবং জনসাধারণের মনের উপর আধিপত্য করছে। সুতরাং পুরাতনের সঙ্গে লড়াইটে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়—পুরাতনের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। পুরাতনের বিরুদ্ধে নূতনের বিদ্রোহের ফলেই মানুষ জীবনে ও মনে তার ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে। সমাজ ও সাহিত্য ভাঙেনি, গ'ড়ে উঠেছে। যাকে আমরা সনাতন মত বলি সে হচ্ছে একমত। কোনও সমাজ একমতাবলম্বী হলেই বোঝা যায় যে, সে সমাজ মন নামক বস্তুটিকে অচল করেছে।

আত্মজ্ঞান

"নিজের আয়নায় নিজের মুখ দেখা" এই ব্যাপারটা আমরা এক অর্থে বুঝি ইউরোপ আর এক অর্থে বোঝে। এবিষয়ে পূর্ব্ব পশ্চিমের মধ্যে শাখা ভেদ আছে। আমরা চাই নিরুপাধিক আত্মার সাক্ষাৎকার করতে, ইউরোপবাসীরা চায় আত্মার পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি দেখ্‌তে। তাই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের দর্শনের স্পষ্ট মিল নেই বরং হঠাৎ দেখ্‌তে মনে হয় যে, সত্যের অন্বেষণে আমরা যখন চাই উড়তে ওরা চায় চলতে। আত্মদর্শনের জন্যে এ উভয়ের মধ্যে কোন উপায়টি শ্রেষ্ঠ তা বিচার ক'রে নির্ণয় করবার আমার শক্তিও নেই ইচ্ছাও নেই। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, পরমাত্মাই হোক কি জীবাত্মাই হোক এ দুয়ের একটিকেও ঠিক ভাবে জানা অর্থাৎ ধরা কেবলমাত্র দু-চারিটি ক্ষণজন্মা লোকেরই সাধ্য। আমাদের পক্ষে সোঽহং জ্ঞান লাভ করা যেমন অসম্ভব অহং জ্ঞান লাভ করাও তার চাইতে কিছু কম অসম্ভব নয়।

ইউরোপে লোকে যেমন আত্মার পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি দেখ্‌তে চায়, তেমনি যুগে যুগে তাদের মধ্যে কেউ কেউ সে মূর্ত্তি দেখ্‌তেও পায়। এই কারণে সে দেশে গুণীর পক্ষে শিল্পীর পক্ষে নিজ হাতে নিজের ছবি আঁকা একটি সনাতন প্রথা। যিনি চিত্রকর তিনি রং এবং তুলি দিয়ে কাচের দর্পণে নিজের যে আকৃতি দেখেন, তারই প্রতিকৃতি পটস্থ ক'রে যান। আর যিনি লেখক তিনি কালি এবং কলম দিয়ে মনের আয়নায় নিজের যে রূপ দেখেন, তাই লিপিবদ্ধ ক'রে যান। সময়ে সময়ে এমনও ঘটে যে, লেখকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখা এবং চিত্রকরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র এই অহং অবলম্বনেই রচিত হয়েছে, যেমন Rembrandt-এর আত্মচিত্র এবং Rousseau-র Confessions। কারণ মানুষের মধ্যে এঁরা বিশেষ ক'রে নিজেকেই চিনতেন। এখানে একটি কথা ব'লে রাখা আবশ্যক। নিজেকে ভালবাসা এবং নিজেকে চেনা এই দুই ব্যাপারের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই ভেদজ্ঞানটুকু যদি সকলের থাকৃত তাহলে শিল্পজগতে "আত্মজীবনের" এত অপমৃত্যু ঘটত না।

আর একটি কথা। চিত্রকর এবং কবি, যদি চ উভয়েই শিল্পী তথাপি উভয়েই এক জাতি নন্। এঁদের পরস্পরের ব্যবসা স্বতন্ত্র। একের কারবার ইন্দ্রিয়গোচর

বহির্জগৎ নিয়ে, অপরের কারবার মানসগোচর অন্তর্জগৎ নিয়ে। এ দুই জগৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, উভয়ের মধ্যে দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট নানারূপ যোগসূত্র বর্ত্তমান, সে বন্ধন আমরা কেহই খুলতে পারিনে। মন না থাকলে আঁকা হয় না এবং চোখ না থাকলেও লেখা হয় না। কিন্তু বিচ্ছিন্ন না হ'লেও শরীর ও মন উভয়ে পৃথক। তবে চিত্রকর যে জগতের বাইরের দিক দেখেন, এবং কবি যে তার ভিতরের দিক দেখেন, এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই। এই কারণেই ছবি আঁকা এক জিনিষ এবং মন আঁকা আরেক জিনিষ। উভয়ের ভিতর মিল এইখানে যে, উভয়ের হাতেই কি বাহির কি ভিতর সাকার হ'য়ে ওঠে অর্থাৎ রূপ লাভ করে। মানুষ যে বিদ্যার বলে নিরাকারকে সাকার করে তারই নাম আর্ট।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

তরুণ-কবি

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত জুড়নজীবন মুখোপাধ্যায়

শরদিন্দু বড়লোকের ছেলে। এক সুদূর পল্লীতে তাহাদের বাটী; তাহারা সেখানকার জমিদার। সে কলিকাতায় থাকিয়া বি-এ পড়ে। কলেজের মধ্যে তাহার খ্যাতি যেমন প্রচুর, ছাত্রমহলে তাহার সদ্ভাব ও আলাপ তেমনিই বিস্তৃত। কেননা এই সুদর্শন যুবক তাহার সৌম্যমূর্ত্তি ও মিষ্টভাষায় সকলেরই মনোরঞ্জন করিত আর ছাত্রমহলের সমস্ত উদ্যমে সে একজন অগ্রণী কর্ম্মী ছিল। এমন উদারতার সহিত চাঁদার খাতায় সই করিতে ও পূর্ণপরিমাণে সেই টাকা নিয়মিত ভাবে আদায় দিতে বোধহয় তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। কাজেই যে সমিতিতে বা সমবেত উদ্যমে শরদিন্দু নাই সেখানে চন্দ্রতারাহীন রাত্রির মত রৌপ্যোজ্জ্বল আলোকের প্রভা তমসাবৃত।

কলেজের খেলাধূলা প্রভৃতি সমস্ত উদ্যোগের মধ্যে তাহার বিশেষ যোগ ছিল সাহিত্য-শাখার সহিত। তাহারই উদ্যমে কলেজে একখানি মাসিক পত্রিকা চলিতেছে, একজন প্রফেসরকে তাহার সম্পাদক করিয়া সে সহকারী হইয়া কাজ করিতেছে। তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল কাব্যের উপর—সে অনুরাগ এতই প্রবল যে তাহার সমস্ত আকারে ও প্রকারে কাব্যের তথা সৌন্দর্য্যরসের অনুপ্রাণিত মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইত। তাহার মুখমণ্ডল ক্ষৌরকার্য্যের প্রভাবে নিষ্কণ্টক সুন্দর। বাস্তবিক 'গোঁফদাড়ি' লইয়া যে চারুশিল্প হয় না তাহা শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চিত্রময় কল্পনা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিবেন। চিত্রের মধ্যে শুধু নারীর লীলায়িত অঙ্গভঙ্গিমাই যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদৃত ইহা কি সত্য নয়? মাথার চুলগুলি পর্য্যন্ত তাহার কাব্যছন্দে সজ্জিত। ছন্দের গতির মতই তাহার দীর্ঘকেশের উপর লহরের স্বচ্ছন্দ গতি স্কন্ধমূল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। বেশভূষা অনুরূপ কাব্যময়। তাহার একজন অনুপন্থীও ছিল। ইহারা সকলেই সাহিত্য-আসরের সভ্য।

অপরদিকে গণপতি নামে একটি যুবক যৌবনের কাব্যোন্মেষের বিদ্রোহরূপেই যেন বিরাজ করিতেছিল। সে-ও কলেজের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ছাত্র। তবে তাহার বৈশিষ্ট্য শরদিন্দুর দলের প্রতিদিকস্থ, দৈহিক শক্তির অনুশীলন ছিল তাহার প্রধান কার্য্য এবং শরদিন্দুদের উপহাস করা ছিল তাহার একমাত্র শিল্প-সাধনা। এই লইয়া শরদিন্দুর সহিত তাহার একদিন ঘোরতর আলোচনা হয়। শরদিন্দু বলিয়াছিল "তোর ঐ গুণ্ডামো ও গুণ্ডাগিই যদি শ্রেষ্ঠ হয় তাহ'লে গাঁড়াতলার প্রসিদ্ধ মহাপুরুষেরা ত প্রাতঃস্মরণীয়। ভদ্রসমাজের শিক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ মনুষ্যত্বের, চিত্তের ও সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষসাধন দ্বারা।"

গণপতি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিয়াছিল, "ভাই হে, আমিও উক্ত সাধনা ক'রে থাকি। হাস্য এবং উপহাস্য, কাব্য ও ব্যঙ্গকাব্য দুইই শ্রেণীগতভাবে কি এক নয়? আমি দলবিশেষকে উপহাস ক'রে সাহিত্যচর্চ্চা ক'রে থাকি। তদ্দ্বারা আমার চিত্তের উৎকর্ষ আনন্দসম্ভারের সমৃদ্ধ হয়।"

আশ্চর্য্যের বিষয় গণপতি ও শরদিন্দু দুইজনে পরম বন্ধু। শরদিন্দু বলিয়াছিল, "দ্যাখ্ গণা, তোর ঐ পশু-শক্তির মধ্যে একটু মাধুর্য্যের প্রেরণা দিতে হবে। তুই সাহিত্য-অধিবেশনে নিয়মিত আস্‌বি।"

"আমি যে ভাই অসভ্য।"

"অসভ্যতা ত্যাগ ক'র্ত্তে হবে।"

"না, না—আমি বলছি যে আমি ত সাহিত্য-শাখার সভ্য নই যে তোমাদের অধিবেশনে নিয়মিত যাব।"

শরদিন্দু হাসিয়া কহিল, "অসভ্যকে সুসভ্য কর্ব্ব এই আমাদের mission—লক্ষ্য। সভ্য ব্যক্তি মাত্রেই এই লক্ষ্য নিয়ে জগতে চ'লে থাকে।"

"সে ত বটেই, কিন্তু তোমার সভ্যদের এই সাধু-নীতি যে অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে ত সে গন্ধও নেই।"

"আছে আছে, অর্থ না হোক্ স্বার্থ আছে এবং সেটা দলবৃদ্ধি।"

"কিন্তু আমার স্বার্থ কি? তোমাদের সাহিত্য-আসরে যোগ দিলে আমার লেখা তোমাদের পত্রিকাতে ছাপ্‌বে? এই প্রতিশ্রুতি দাও ত একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পারি।"

"আচ্ছা বেশ—তা হবে। তুমি অবশ্য একটু চেষ্টা ক'রে লিখো-টিখো।"—শরদিন্দু এইদলে গণপতিকে টানিতে পারার আশায় খুব উৎফুল্ল হইয়া পড়িল।

তরুণদের শ্লেষ করার অপরাধে গণপতির চল্‌তি নাম হইয়াছিল "ঠাকুরদা"। বস্তুতঃ নামটা খুব অন্যায়ও হয় নাই, তাহার চুলগুলি ছোট ছোট ও সমান করিয়া ছাঁটা, মাথায় একটু ছোট শিখা। গায়ের জামা প্রায় নবাবি আমলের মত। ব্যঙ্গ, রসিকতা ও প্রবীণতায় সে একান্তই পরিপক্ক 'ঠাকুরদা'।

এহেন গণপতি সাহিত্য-আসরের সভ্য হওয়ার পরে একান্ত নবীন শরদিন্দুর রীতিমত ছাত্রত্ব স্বীকার করিল। একদিন সে চিত্রাঙ্কণের সমস্ত সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া আনিয়া শরদিন্দুকে কহিল, "দেখ শরৎ, আমি চিত্রবিদ্যা অভ্যাস ক'র্ব্ব। আমার ছবি যদি বেশ আধুনিক হয় তবে তোমাদের পত্রিকাতে ছাপ্‌বে ত?"

"কি বিপদ, তুমি আমাদের পত্রিকাতে বেরুবে কি না এই উদ্দেশ্য নিয়ে কি শিক্ষা কর্ত্তে চাও না কি? Culture হ'ল মনের জিনিষ, তার স্বার্থ শুধু তাকে নিয়েই।"

"বটে বটে! তা আমাকে বেশ successful art-এর অর্থাৎ 'সার্থক কলা'র দু'একটা ধারণা (idea) দিয়ে দাও ত।"

"আমি ত আর অঙ্কনবিদ্যায় পারদর্শী নই।"

"না না আমি আঁকবার technique—কি না প্রণালী শিখ্‌তে ত তোমার কাছে চাইছি না। তুমি কবি-মানুষ, বুঝ্‌তে অবশ্যই পারছ। ছবি কি রকম হ'লে সেটাকে আদর্শ ছবি বলা যেতে পারে বা উচ্চ-অঙ্গের শিল্প ব'লে স্বকৃত হ'তে পারে সেই সম্বন্ধে মোটামুটি আধুনিক সংস্কার কিরূপ সেইটেই আমি জান্‌তে চাই।"

"সেটা এককথায় এই যে, চিত্রের পাত্র, বিষয় বা অঙ্কিত বস্তুকে ডুবিয়ে দিয়ে যে ভাব তার উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সেই ভাবই হ'ল চিত্রের কাব্য। সেই কাব্য যত প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট হবে সে চিত্র ততই সার্থক।"

"বুঝেছি অর্থাৎ যেমন হাতের লেখা বাঁদরে-আঁচড়ান হ'লেও তার ভিতরের ভাব ও ভাষাই তার মূল্য ও গুণ নিরূপণ করে। এই দেখ আমার কাছে একখানা নর্ত্তকীর চিত্র রয়েছে, এর সৌন্দর্য্য আমি অতিকষ্টে যা বুঝিছি তা বলছি; দেখ দিকি ঠিক হয় কি না?"

"আচ্ছা বল" বলিয়া শরদিন্দু ছবিখানা পূর্ণমনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল।

খুব গম্ভীরভাবে ঠাকুরদা বলিল, "দেখ শরৎ, নৃত্যের দেবতা হ'চ্ছেন শিব—নটরাজ তিনি। এই নর্ত্তকী সেই মহাদেবেরই শিষ্যা—তাই তার কটিদেশকে অঙ্কিত করা হ'য়েছে শিবের ডমরুর মত, গণিতশাস্ত্রের Hyperbola আর কি। তার হাতদুটি যেন ফণা ধ'রে র'য়েছে মহাদেবের ভুজঙ্গের মত। অস্থিবিশিষ্ট হাত এমনভাবে ত বক্রাকার হ'তে পারে না। চোখদুটি যেন ভাঙে বিভোলা। নর্ত্তকীর ইষ্টদেবের বহিরাবরণের প্রতীকরূপে সে নৃত্যের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছে। তার নৃত্যের সাধনা পূর্ণ ও সফল।"

শরদিন্দু এমন অর্থ কখনও কল্পনা করে নাই তাই সে প্রত্যুত্তরে কহিল, "ভাই হে, ছবির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যে সে লোকের ক্ষমতা নয়।"

কমল তাহাদের ক্লাসেরই ছাত্র। সে কিছু পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়া 'ঠাকুরদা'র ব্যাখ্যাটা একমনে শুনিতেছিল। সে এইবার কহিল, "আচ্ছা ঠাকুরদা, এই রকম চেহারার মানুষ বাস্তবজগতে যদি সম্ভব হয়, তুমি কি তাহ'লে তাঁকে আমাদের ঠান্‌দি ব'লে গ্রহণ ক'র্ত্তে রাজী আছ।"

"অরে মূর্খ, শিল্প—শিল্প, আর বস্তু—বস্তু। শিল্পের ভাব ত বস্তু নয়, সে বস্তুকেও যেমন প্রকাশ করে তেমনি বাস্তবের সীমায় বাহিরে কল্পনার সুন্দরকেও প্রকাশ করে। এসব কল্পনার সৌন্দর্য্য।"

শরদিন্দু গম্ভীরভাবে কহিল, "আমি মনে মনে বরাবরই জানি গণপতির কাব্যজ্ঞান অতি সুচারু ও সূক্ষ্ম।"

কমল এই কথা অনুমোদন করিয়া কহিল, "তা হবে না? নামে যে গণপতি,—সোজা কথা! আচ্ছা ঠাকুরদা, গণপতির মাথাটা হাতীর মাথা হ'ল কেন?"

গণপতি প্রবীণ গাম্ভীর্য্যে উত্তর দিল, "অরে মূর্খ, তার কারণ গণপতির মাথা অর্থাৎ প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধি বিপুলতম হস্তীমুণ্ডের জড়পরিমাণেরই অনুরূপ।"

পরদিন সন্ধ্যার সময় শরদিন্দুর বাসায় ঠাকুরদা আসিয়া উপস্থিত। "ওহে শরৎ, আমার আঁকা একখানি ছবি তোমায় দেখাবো ব'লে নিয়ে এসেছি। ছবিটাকে অতিক্রম ক'রে এর ভিতরের একটা অর্থ আছে। তার মর্ম্ম যতই ছোট হোক্, তার সেই ক্ষুদ্রতা নিয়েও সে সার্থক—অন্ধকার রাত্রে ক্ষুদ্র একটা খদ্যোতের মত, একটা শিশিরবিন্দুর মত, একটি হীরকের কণার মত।" "দেখি, দেখি" বলিয়া শরদিন্দু সোৎসাহে দেখিতে লাগিল। ছবিখানি কিছুই নয়, একটি বকের মূর্ত্তি, তার মাথার উপর একটি সাপের ফণা ও বকের সম্মুখে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন। শরদিন্দুর মুখ দেখিয়া মনে হইল সে বিশেষ কিছু অর্থ উদ্ঘাটন করিতে পারিতেছে না। তখন ঈষৎ হাসিয়া গণপতি কহিল, "বুঝতে পারছ না? এই নাও, এই কাগজখানাতে চিত্র-পরিচয় বিবৃত ক'রে দেওয়া আছে।"

শরদিন্দু কাগজখানি খুলিয়া পড়িল,

বক্ দেখেছ,—ফোঁস!
দেখ্‌তে সাধু, অন্তরেতে
আছে সকল দোষ।
বিষভরা সে সাপের মুখ,
শান্ত সুধীর বাইরে কত,
বাহির দেখে মূঢ়ের মত
মুগ্ধ কেন হোস্?
শক্ত ভারি মানুষ চেনা,—
ভবের হাটের বেচাকেনা!
বন্ধুর উপদেশটা নে-না
করিসনেকো রোষ।

শরদিন্দু কহিল, "Capital ঠাকুরদা, হাতে হাত দাও। চমৎকার হ'য়েছে! এমন একটা সরল সত্য অথচ সংসারের মস্তবড় সতর্কতার উপদেশ, অত্যন্ত চলিত একটা প্রবাদ-বাক্য আশ্রয় ক'রে চিত্র ও ছন্দের ভাষায় যে প্রকাশ করা হ'য়েছে তা যথার্থই সুন্দর। এ কাগজে ছাপ্‌তে হবে।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, সেইজন্যই ত কষ্ট ক'রে লিখ্‌লুম দাদা!"

কলেজের প্রবন্ধ-কমিটীর অধিবেশনে শরদিন্দু তাহার নির্ব্বাচনগুলি পেশ করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বলিল, "কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীত এ তিনের শক্তি সকলকেই পরাভব ক'র্ত্তে পারে। শত্রুকেও মিত্র ক'র্ত্তে পারে। সর্পও সঙ্গীতের তালে তার খলপ্রকৃতি পরিত্যাগ ক'রে মুগ্ধআনন্দে বিভোর হয়। তাই আমাদের দুর্দ্দান্ত প্রতিপক্ষ গণপতি আজ সাহিত্যের মন্দিরে ভক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে লাভ করা আমাদের একটা প্রকাণ্ড বিজয়বিভব। তার হাস্য-কবিতা ও চিত্র আমাদের সাহিত্যভোজে অতি সুমিষ্ট খাদ্য পরিবেশন করেছে।"

ওদিকে গণপতি ও কমল খেলার পরে বাড়ী ফিরিতেছিল। কমল কহিল, "আজ তোমাদের সাহিত্য-শাখার meeting ছিল, গেলে না ঠাকুরদা?"

"খেলাটা বাদ দিয়ে যেতে হবে না কি!"

ক্ষণেক মৌন থাকার পর কমল কহিল, "তবে ও-দলে ভিড়্‌লে কেন?"

"কেন?—ঐ অপোগণ্ড অপদার্থগুলোকে মানুষ ক'রে তুলতে হবে ব'লে। শরদিন্দুটা গোল্লায় যেতে বসেছে—সঙ্গে একদল ছেলে নিয়ে। বিশেষ ক'রে ঐটের উপর আমার একটু টান আছে।"

"গোল্লায় যাচ্ছে কি রকম?"

"তা ছাড়া আর কি? ছাত্রজীবনে যারা অত বিলাসিতা ও কৃত্রিমতা আশ্রয় করে তারা ত এক-একটি ভণ্ড তৈরী হ'চ্ছে। আর অত কাব্যই বা কেন হ্যা? সব কাজেরই একটা অধিকার-বিধি আছে। ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমের মধ্যে যে ছাত্রজীবন গ'ড়ে ওঠা উচিত, যে সময়ের মূলমন্ত্র কর্ম্মের অক্লান্ত সাধনা, সে সময় কোনও অলস কাব্য ভাল নয়।"

কমল কহিল, "তাহ'লে পাঠ্যপুস্তক থেকে কাব্য বাদ দেওয়া উচিত।"

"দূর মূর্খ, কাব্যেরও প্রকারভেদ আছে। তা ছাড়া পাঠ্যপুস্তকের কাব্য অধ্যয়ন এক কথা আর কাব্যে রসচর্চ্চা আর এক কথা। থাক্‌ না মজা, ওদের দলের প্রচণ্ড ভক্ত হ'য়ে কি গোলটাই বাধিয়ে দেই!"

গোল বাধাইতে বিশেষ বেগও পাইতে হইল না। দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান প্লাবিত হইল। স্বেচ্ছাসেবক চাই, স্বেচ্ছাসেবক চাই। এইবার গণপতির দুর্দ্দম উৎসাহ প্রতিরোধ করে কে? ছাত্রদের মিলনীতে গণপতি চীৎকার করিল, "প্রস্তুত হও, জল্পনা-কল্পনার সময় নাই। আমি দেখ্‌তে চাই এই পরম সেবার কার্য্যে কে বীর আছে আর্ত্ত-উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আস্‌তে পার।"

শরদিন্দুদের দল পাংশুমুখে পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় করিতে লাগিল। গণপতির স্বর উচ্চে উঠিল।—"এ সংসারে ভীরু যে, শক্তিহীন যে তার কোনও কর্ম্মই নাই। কর্ম্মহীন মানুষ কেবল মানুষের অবয়ব মাত্র।"

শরদিন্দু কহিল, "বন্ধুগণ, গণপতি যা বলেচেন তা সমস্তই সমীচীন। আমাদের এখনি প্রস্তুত হ'তে হবে। তবে তার পূর্ব্বে সামান্য চিন্তার প্রয়োজন আছে। এই স্বেচ্ছা-সেবকের দলে যাঁরা কর্ম্মস্থলে যেতে চান তাঁদের সকলেরই সন্তরণপটু হওয়া দরকার। যাঁরা সাঁতার জানেন না তাঁরা এখানে থেকেই কাজ ক'র্ত্তে পার্ব্বেন, যেমন চাঁদা আদায় প্রভৃতি।"

গণপতি দেখিল শরদিন্দুদের দলটি বেশ বাঁচিয়া গেল। প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের নামাইতে পারা গেল না। থাক, দিন আছে আবার দেখা যাইবে।

জল-প্লাবনের ব্যাপার চুকিয়া যাইলে কিছুদিন পরে গণপতি এক জনসেবা-সমিতি গড়িয়া তুলিল। তার বিশেষ উদ্দেশ্য পল্লীতে পল্লীতে ম্যালেরিয়া-নিবারণ। কাগজে পত্রে ম্যালেরিয়া-নিবারণকল্পে তখন চারিদিক হইতে যাঁহার যাহা কিছু বলিবার বা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার আছে, করিয়া ফেলিতেছেন। এই নূতন প্রেরণা গণপতিকে বিশেষ করিয়া পাইয়া বসিল। কর্ম্ম করিবার প্রণালীর মধ্যে তাহারা স্থির করিল, "পল্লীগ্রামের অজ্ঞ সমাজে ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধের উপায়গুলি জানাইয়া দেওয়া ও কুইনাইন প্রভৃতি বিনামূল্যে বিতরণ করা। সম্ভব ও প্রয়োজন হইলে কোনও কোনও স্থলে পানীয়জলের ব্যবস্থা করা। তাহাদের সভ্যশ্রেণীর মধ্যে বন্ধু-মহল হইতে দুই-একজন নূতন ডাক্তারকেও লওয়া হইল, এবং মাঝে মাঝে তাহারা পল্লীগ্রামাভিমুখে অভিযান করিয়া সমিতিস্থাপন প্রভৃতির উদ্যোগ করিতে লাগিল। গণপতিই কোনও স্থলে প্রথমে যাইয়া কর্ম্ম করিবার একটা কেন্দ্র নির্ব্বাচন করিয়া আসে, পরে সদলবলে একদিন সেখানে অভিযান করে। কেন না তাহাতে সহজেই পাঁচজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ও তাহাদের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মের বার্ত্তা বিস্তারলাভ করিয়া নিষ্ক্রিয় পল্লীসমাজে একটা প্রেরণা প্রমাণ করিতে পারে।

এইরূপ একটা ছুটির-দিনের অভিযানে গণপতি শরদিন্দুকে কহিল, "ওহে সেক্রেটারী মশাই, এবার তোমাকেও যেতে হবে। তুমি যে কল্‌কাতায় ব'সে শুধু সৈন্যচালনা ক'র্ব্বে তা হবে না। কর্ম্মক্ষেত্রে চল, অভিজ্ঞতা লাভ কর। কাজের উপর আরও দরদ বেড়ে যাবে।" শরদিন্দুকেই গণপতি এই অনুষ্ঠানের সম্পাদক করিয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ তাহার অর্থ, দ্বিতীয় উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য।

অতি প্রত্যূষের গাড়ীতেই গণপতি সকলের পূর্ব্বে তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া পৌঁছিল, বাকী দল একটু পরেই যাত্রা করিবে। কেন না এই গোঁয়ার-গোবিন্দ গণপতির উৎসাহ বাতুলতারই নামান্তর। অত প্রত্যূষে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিবার জন্য সকলের যদি 'মাথা-ব্যথা' না হয় তাহাতে মাথার মালিকদের অপরাধই বা কি দেওয়া যায়। সে গিয়া প্রাথমিক আয়োজন সব করিতে লাগিল, গ্রামের

মধ্যে বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া সকলকে মধ্যাহ্নের পর ষষ্ঠীতলায় সমবেত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে যেসব বড় বড় বাবু ও ডাক্তার আসিতেছেন তাঁহাদের একটা বর্ণনাও সে জ্ঞাপন করিল। দুই-পাঁচজনের সহিত সে আলাপও বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে। গ্রামের মধ্যে এই সকল কার্য্য সারিয়া সে পুনরায় যখন ষষ্ঠীতলায় প্রত্যাগমন করিল তখন দেখিল তাহাদের দলবল আসিয়া পড়িয়াছে, ষষ্ঠীতলার মণ্ডপটি পরিষ্কার করিয়া তাহাদের জিনিষপত্র রাখিয়াছে। একজন চা করিবার জন্ম ষ্টোভ জ্বালাইয়া ফেলিয়াছে। একটি সোডা-লেমনেডের কেসও আনা হইয়াছে। ষষ্ঠীতলায় বটগাছের ডালে প্রকাণ্ড একটা মশারি টানাইয়া দেশ-সেবাব্রতী শরদিন্দুদের দল পল্লীজনের সসম্ভ্রম কৌতূহলের মধ্যে বসিয়া আছে।

নিকটে আসিয়া তাহাদের তদবস্থা দেখিয়া গণপতির হাসিও আসিল, সঙ্গে সঙ্গে গা-ও জ্বলিয়া গেল। তাহার উদ্যমও কমিয়া আসিল। সে এ কাহাদের সহিত কোন্ কার্য্যে নিজের প্রাণক্ষয় করিতেছে।

নিকটে আসিয়া কহিল, "কি হে শরদিন্দু, তোমাদের বাড়াবাড়ি দেখে যে মূর্চ্ছা যাই! মশারি টানিয়ে ব'সে আছ? এত ম্যালেরিয়ার ভয়!"

শরদিন্দু উপদেশ দেওয়ার স্বরে বলিল, "যারা নিজেকে রক্ষা করার অভ্যাস রাখে না বা তার রীতি জানে না, তাদের অজ্ঞতা দিয়ে পরকে তারা কি ক'রে বাঁচাবে।"

মশারির মধ্য হইতে আর একজন বলিল, "শত উপদেশের থেকে একটা দৃষ্টান্ত অনেক বড় ও কার্য্যকর।"

"Practical Demonstration—মশারি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এর থেকে আর কি ক'রে উত্তমরূপে বোঝান যেতে পারত?"

গণপতি কহিল, "মানলুম ভাই। গ্রামবাসী তোমাদের এই হিত-উপদেশের জন্ম' চিরকাল ঋণী থাকবে, এইবার তাদের সামনে গোটাকয়েক ক'রে কুইনাইনের বড়ী খেয়ে দেখিয়ে দেও কেমন ক'রে ম্যালেরিয়া দূরে রাখতে হয়।"

শরদিন্দু কহিল—"তাও বোধ হয় উচিত।"

গণপতি মনে মনে সে কথার যে উত্তর দিল মুখে তাহা বলিলে একটা গোলযোগ বাধিত।

৩

শরদিন্দুদের বাটীতে সন্ধ্যায় বন্ধুদের আসর বসিয়াছিল। সেখানে নব নব রসের ভাবুকগণ চা'য়ের উত্তাপে ভাবে 'তা' দিতে বসিয়া গিয়াছেন। সাজসজ্জা ও আকৃতির মধ্যেই বা কত বিভিন্ন ভাবের ব্যঞ্জনা। কাহারও Oriental জুলপি (ধাঙ্গড়ে জুলপি—ধাঙ্গড়েরা এইরূপ জুলপির ফ্যাসান বজায় রাখিয়াছে) গালের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত নামিয়া ক্ষৌরকার্য্যের পরিশ্রমকে স্বল্প করিয়া দিয়াছে। কাহারও সদ্য-উদগত গুম্ফ নাসিকার দ্বারে আসিয়া যেন ধ্বংসের মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গিয়াছে। কাহারও চাল-চলন বা একেবারে সামরিক বিভাগীয়। সকলেই যেন শরীরটার উপর নানারূপ ফ্যাসানের প্রয়োগ-গবেষণা সুরু করিয়া দিয়াছে।

একজন তাহার কুঞ্চিত দীর্ঘকেশ ও মস্তক দোলাইয়া এবং চশমাবদ্ধ চোখদুটি ভাব-ভঙ্গীতে লীলায়িত করিয়া হারমোনিয়ম-সহযোগে রমণীকণ্ঠে গাহিতেছিল—

সুন্দরি, তোর ডালিম-ভাঙা লালিমগালে তিল কালো,
ইন্দ্রধনু ভ্রূয়ের নীচে আঁখির তূণে তীর আলো।
কুঞ্চিত তোর কুন্তলেতে গন্ধভরা ফুলমালা,
দুলছে কানে মুক্তা-লহর শুভ্র তোমার রূপ-ঢালা।
কণ্ঠ তব ভঙ্গীলীলায় তরঙ্গিত জমকালো,
উচ্ছ্বসিত অন্তরে মোর রক্তনাচা দীপ জ্বালো!

গণপতি দূর হইতেই গানটা শুনিতে পাইয়াছিল। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—আহা হা—রক্তনাচা দীপ!—তোরা যে সব তরুণবংশের প্রদীপ!

ওরে মায়ের কোমল করুণ বাছা!
দ্বিপদ-দ্বিভুজ, সামলে চ'লে
প্রাণটা তোদের বাঁচা!
রক্ত চা'য়ের নেশায় মাতাল জোরে
সবার কাছে জয়ী মুখের জোরে,
ব্যাপার কিন্তু বিকল বুঝলে পরে—
ধুমসুড়িয়ে ছুটে পালাও চাচা!

দলের মধ্য হইতে ঋষি বলিল, "ওহে শরদিন্দু, সেই মশারির ঠাট্টাটা হ'চ্ছে, বুঝেছ ত?"

ঈষৎ হাসিয়া শরদিন্দু উত্তর দিল, "তা বুঝেছি, কিন্তু ভাই, পদ্যটা করেছে নেহাৎ মন্দ না।"

কমল মন্তব্য করিল, "শরৎকে যদি কেউ পদ্য ক'রে গালাগালিও দেয় তা হ'লেও বোধ হয় ও রাগ করে না।"

শরৎ কহিল, "বাস্তবিক, আমার কাব্য-আসক্তি একটা ব্যাধিবিশেষ হ'য়ে পড়েছে।

গণপতি নীচুগলায় কহিল, "রোগ তোমার তাড়াচ্ছি—বিষস্য বিষমৌষধম্।" পরে কহিল, "দেব গালাগালি?—

ইষ্টুপিড্ ড্যাম্ গাধা,
পাজী ইডিয়ট্ হাঁদা,
ছাড়িয়ে দেবো তোদের এবার
অলস কাব্য সাধা।

কমল বলিল, "হুঁ হুঁ দাদা, ওরা ত এখুনি আবার গীত-কাব্য সাধ্‌তে চল্‌লো—সারস্বতমন্দিরে।"

সেদিন উক্ত স্থানে সুললিত সঙ্গীতে ভূমিকাসহ একটা বক্তৃতা ছিল, এ সমস্ত অনুষ্ঠানে শরদিন্দুর যোগ ছিল অনিবার্য। তাই সে বলিয়া উঠিল, "কমল, reminderটা দিয়ে ভাল কাজই করেছে। ওহে উঠে পড় সব, আজ আবার মিস্ রমা প্রভৃতির আবৃত্তি ও সঙ্গীত।" বলিবামাত্র তাহাদের দলটি উঠিবার জন্য উদ্যত হইল। গণপতির এ সমস্ত বালাই ছিল না। তাই শরদিন্দু বিশেষ করিয়া তাহাকে একটু ঠোকা দিয়া কহিল, "গণপতি ত যাবে না—ভাল ছেলে!"

গণপতি উত্তর দিল, "গান আমিও শুনতে ভালবাসি, আর এমন কোনও স্থানে আজও শুন্‌তে যাচ্ছি যা তোমরা কখনও শুন্‌তে আশা ক'র্ত্তে পার না। জোর ক'রে বল্‌তে পারি যে কিশোরী-কণ্ঠে এত মাধুর্য্য থাক্‌তে পারে তা এর আগে জানতুম না। সে অপূর্ব্ব, অশ্রুত, অচিন্ত্যপূর্ব্ব।"

শরদিন্দু কহিল, "বল কিহে, আমায় একদিন শোনাতে নিয়ে যাবে না! নারীকণ্ঠের সঙ্গীতে যে তোমার ভয়ানক বিরাগ ছিল, আর এখন একেবারে তার কল্পনামাত্রেই উন্মত্ত?"

"বেশ ত একদিন চলনা, তোমাকেও না হয় শুনিয়ে আনি।"

দলের আরও সকলে আব্দার ধরিল, "আমরা কি বাদ পড়্‌বো ভাই!"

গম্ভীরভাবে গণপতি উত্তর দিল, "সকলকে সব জায়গাতে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য আমার ত নেই। তা ছাড়া তোমরাই বা অসভ্যের মত আগ্রহ দেখাচ্ছ কি আক্কেলে? শুন্‌লে না—কিশোরী-কণ্ঠ। ভদ্রলোকের বাটী, সেখানে ত মেয়েরা গানের ব্যবসা ক'র্ত্তে বসেনি যে রাস্তার পাঁচজন ভ্যাগাবণ্ডদের গান শুনিয়ে দেবে?"

সভ্যভাবাপন্ন দলটি নৈরাশ্যে ও লজ্জায় একেবারে মূক হইয়া গেল।

শরদিন্দুর কৌতূহল ইহাতে দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। রোমান্সের বায়ু দুর্ল্লভ বস্তুর প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হয়। গণপতিও ঠিক ইহাই আশা করিয়াছিল।

শরদিন্দু সহসা কোনো কাজের অজুহাতে গণপতিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অন্যান্য বন্ধুদের বিদায় করিয়া দিল। কহিল, "তোমরা অগ্রসর হও, আমি একটু পরেই উপস্থিত হ'চ্ছি। একটা বিশেষ দরকারি কাজ হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল।"

সকলে চলিয়া গেলে শরদিন্দু অর্থসূচক হাস্যে গণপতির দিকে চাহিয়া কহিল, "ঠাকুরদা, যদি গান শুন্‌ছো, কোথায় বল ত? আবার কিশোরীকণ্ঠ! ব্যাপার কি?"

গণপতি সহজকণ্ঠে উত্তর দিল, "ব্যাপার কিছুই নয়, দূর থেকে একটু গান শোনা। বাড়ীটার পাশ দিয়ে একদিন আসছিলুম, হঠাৎ অদ্ভুত মিষ্টি গান শুনে দাঁড়িয়ে পড়লুম। স্বরটা বাস্তবিকই বড় মিষ্টি। তারপর গানের মালিককেও দেখলুম। তার গান থেকে সে আরও সুন্দর। সুরের একটা ঝঙ্কারের মতই তার রূপখানি পথিক-চিত্তকে আবিষ্ট করে।"

শরদিন্দু কৌতূহলের সহিত কহিল, "গণপতি, তুই নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছিস্!"

"প্রেমে আবার পড়ে কি ক'রে? প্রেম কি নদী, না পুকুর যে তাতে প'ড়ে যাব!"

"প্রেম নদী, প্রেম সমুদ্র,—তরঙ্গভঙ্গে উদ্বেল।"

"কিন্তু দাদা আমি যে সাঁতার জানি, তোমাদের মত হাবুডুবু খাবার ভয় নেই।"

"তা যা'ই বল, আমাকে একদিন শোনাতে নিয়ে যেতে হবে, কবে যাবে বল ?"

"আজই যেতে পার। রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুনতে হবে কিন্তু। লুকিয়ে, চুরি ক'রে। এই ত তার গান গাইবার সময়।"

"লুকিয়ে, চুরি ক'রে ? তাতে ক্ষতি কি ? দুর্লভ বস্তুকে কি সহজে লাভ করা যায়! চল, এখনি বেরিয়ে পড়ি।"

"কিন্তু তোমার যে আজ আবার মিস্ রমা—"

সগর্জ্জনে শরদিন্দু বলিল, "রেখে দাও তোমার মিস্ রমা—!"

গণপতি শরদিন্দুকে একটি গলির মধ্যের বাটীর সম্মুখে একটি রকে লইয়া গিয়া বসাইল। সম্মুখে উপরের ঘরে হারমোনিয়ম বাজিতেছিল। বাজের সুরের সহিত তখনি কণ্ঠস্বর মিলিল। সে স্বর অনাড়ম্বর মাধুর্য্যে শ্রোতাকে পুলকিত ও মোহিত করে। দুই-তিনখানি গান উভয়ে আবিষ্টের মত শুনিতে লাগিল। পরে তরুণী জানালার নিকট আসিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া যেন বাহিরে নিজের স্বরলহরীর সুদূর যাত্রাপথ একবার দৃষ্টি দ্বারা অনুসরণ করিয়া লইলেন।

শরদিন্দু দেখিয়া চমকিত হইল। কি সুন্দর মুখ, কি অপরূপ চাহনি, কি কোমল তনুলতা। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ মিলিল না। ক্ষণেকেই সে সৌন্দর্য্যছবি জানালা হইতে অপসৃত হইল।

তখন উভয়ে উঠিয়া শরদিন্দুদের গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিল। কাহারও মুখে কথা নাই। দুইজনেই যেন অভিভূতের মত চলিয়াছে।

শরদিন্দু কহিল, "গণপতি, আবার কাল এসো ভাই! কাল আবার শুনতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ।"

পরদিন গণপতি আসিল না। শরদিন্দু তাহার অপেক্ষার প্রতিমুহূর্ত্ত গণিয়া অবশেষে নিরাশ হইয়া পড়িল। তৎপরদিন গণপতি যথাসময়ে আসিয়া পূর্ব্বদিবসের অনুপস্থিতির কারণ নিবেদন করিল ও পরে শরদিন্দুকে লইয়া সেইখানে গিয়া বসিল। একটি গান হইবার পরেই কোনও স্ত্রী-কণ্ঠের তাড়নার আওয়াজ শোনা গেল, "অনি, নীচে এসে রুটী সেঁকে দে, গান গাওয়ার সময় পেলেন না!"

অনিলা "যাই মা" বলিয়া প্রস্থান করিল। কাজেই গানও হইল না এবং অনিলার রূপচ্ছটার একটি বিন্দুও শরদিন্দুর তৃষিত চক্ষুকে শীতল করিল না।

পর-পর দুইদিন স্বল্পালোকিত গবাক্ষপথে তরুণীর অর্দ্ধ-স্পষ্ট অবতারণ শুধু শরদিন্দুর দেখিবার আকাঙ্ক্ষাকেই বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। এইরূপে পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া দেখা ও না-দেখা, আশা ও নিরাশা, শুধু অতৃপ্তিতেই শরদিন্দুর হৃদয়কে ভরাইয়া দিল।

গণপতি যাহা আশা করিয়াছিল তাহাই ঘটিল। শরদিন্দু সময়ে অসময়ে দিনে রাত্রে সেই বাটীর নিকট দিয়া যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিল—যদি সেই মানসীমূর্ত্তি একবার তাহার নয়নমনকে দেখা দিয়া সার্থক করে। সে একদিন দেখিল, জানালার উপরে অনিলা বসিয়া রাস্তার দিকে আনমনে চাহিয়া একখণ্ড রুমালে করিয়া বরফ ভাঙিতেছে ও টুকরাগুলি খাইতেছে, চুলগুলি ইতস্ততঃ মুখের চারিদিকে অসজ্জিতভাবে বিক্ষিপ্ত। সহসা তাহার চক্ষু বিভ্রান্তদৃষ্টি শরদিন্দুর উপর পড়িতেই সে চকিতে সলজ্জভাবে পলায়ন করিল।

শরদিন্দু দেখিল তরুণীর চাহনি ও গতি চকিতা বন-হরিণীর মত। সে তাহাকে দেখিয়া অমন করিয়া চলিয়া গেল কেন? রাস্তায় ত কত লোকই যাতায়াত করিতেছে। কাহাকেও সে ত ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না, তবে কি তাহার অন্তরের প্রেম তাহার চক্ষুতে প্রতিফলিত হইয়া তরুণীর অন্তরকেও স্পর্শ করিতে পারিয়াছে! অসম্ভব নয়। তাহার এই 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' পরস্পরের অশরীরী আত্মার অগোচর থাকিতে পারে না।

তাহার পর প্রায় সাতদিনের মধ্যে একদিনও সেই দর্শন বা কণ্ঠস্বরের আভাষ পাওয়া গেল না। নিরাশা ও

উদ্বেগে পীড়িত হইয়া শরদিন্দু একদিন গণপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরদা, অনিলা কেমন আছে বল্‌তে পার?"

প্রশ্নটা বিস্ময়ের সহিত গ্রহণ করিয়া গণপতি উত্তর দিল, "কি ক'রে বলবো ভায়া! থাক্‌বে আর কেমন, ভালই আছে।"

"না, ক'দিন আর তার দেখা পেলুম না। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি একা একাই কয়দিন তার উদ্দেশ্যে গিয়ে বিফল হ'য়ে ফিরে এসেছি। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

গণপতি হাসিয়া গান ধরিল, "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!"

"কৌতুক কর আপত্তি নেই, যদি তার খবরটাও এনে দাও।"

"লাভ, বন্ধু লাভ?"

"তোমার নেই, আমার হয়ত' আছে।"

গণপতি সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, "তোমার কিন্তু অধিকার নেই শরৎ ছি,—সে তোমার কে? একটু-আধটু প্রেমের অভিনয় ক'র্ত্তে পার। কিন্তু সত্য সত্যই তাকে ভালবাস্‌তে যাওয়া, তোমার ভাবী-পত্নীর প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া, তোমার ভবিষ্যতের ভালবাসার একাগ্রতা ও নিষ্ঠাকে হত্যা করা।"

ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে শরদিন্দু উত্তর দিল, "কিন্তু সে ত কুমারী, সে ত আমার সবই হ'তে পারে ঠাকুরদা!"

"তারই বা স্থিরতা কি? সামাজিক বাধাবিঘ্ন যদি না থাকে, উভয় পক্ষের যদি মনোনয়ন হয়, তবেই ত?"

"ঠাকুরদা, ও সব সেকেলে কথা তোমার মত একেলে ঠাকুরদার মুখে শোভা পায় না। যদি আমার বন্ধু হও, তবে আমায় এ ঘোর বিপদে সাহায্য কর।"

"অবাক্ করলি শরৎ! এ রকম ক'রে যদি মানুষের প্রেম হয় তাহ'লে কল্‌কাতার রাস্তায় বেরুলেই ত জানলার ফাঁকে ফাঁকে, ইস্কুলের গাড়ীর খড়খড়ির ভিতরে ভিতরে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে মরবি!"

"তা হয় না ঠাকুরদা, সর্ব্বস্ব যদি এক জায়গাতেই দিয়ে ফেলি, তবে অন্যকে দেওয়ার জন্ত আর কি অবশিষ্ট থাকে!"

"আহা ক্ষণিকের তরে দেখা,
সরমে হইল লেখা সে চারু নয়ন।
এ কি ব্যাপার ভীষণ!"

"গণপতি, ভাই, আমি sincerely বলছি, upon God বলছি, আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ, সব নির্ভর করছে সেই অপরিচিতা কিশোরীকে লাভ করার উপর। আমার সমস্ত প্রাণ তাকে ব্যাকুল আগ্রহে অভিনন্দন করছে, 'এস, তুমি এস।'

"তা বেশ, তুমি যখন সটান Godএর উপরে বলছ তখন আমি না হয় বিশ্বাসই কর্‌লু'ম যে তোমার real love হ'য়েছে। কিন্তু কি করতে পারি আমি?"

"কি ক'র্ত্তে পার? তোমার সমস্ত উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রখর বুদ্ধি নিয়ে যা ভাল বুঝ্‌বে তাই ক'র্ত্তে পার। রোগী ডাক্তারকে তার অবস্থাই না হয় বল্‌তে পারে কিন্তু ঔষধ ও ব্যবস্থা ডাক্তারকেই ঠিক ক'র্ত্তে হবে।"

"আচ্ছা বেশ, তাহ'লে আমি খবর নিই ওরা কি জাতি, কি রকম লোক।"

"আমি জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ সব ত্যাগ ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছি সেই তরুণীর জন্য গণপতি!—আমি পাগল হ'য়ে গেছি ভাই!"

"তা ত বেশই বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর সকলে ত পাগল হয় নি সেই জন্যেই একটু যা ভাবনার কথা হ'য়ে পড়েছে। তবে ধৈর্য্য ধর, আমি চেষ্টা করতে ক্রটি করব না।"

নিরাশার পর আশার একটু ইঙ্গিত এমনিভাবে দিয়া গণপতি শরদিন্দুর উত্তেজনাকে সমভাবে রাখিয়া দিল।

শরদিন্দু ক্ষণেক মৌন থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা ভাই গণপতি, মেয়েটি কোনও ইস্কুল-টিস্কুলে পড়ে বোধ হয়? দেখ্‌লে মনে হয় ওরা খুব আধুনিক।"

"অসম্ভব না হ'তেও পারে।"

গণপতি এমনভাবে উত্তর দেয় যে শরদিন্দু না পায় উৎসাহ, না পায় তৃপ্তি। উদাসভাবে সে কহিল, "ভাই গণপতি, আমার মনের অনুভূতি দিয়ে আমার অবস্থাকে

যদি না উপলব্ধি কর, তা'হ'লে আমার প্রতি তোমার সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রবৃত্তি আসবে না।"

তখন গণপতি উত্তর দিল, "শরৎ, কিছু ভেবো না, ঠাকুরদার কেরামতি এবার তোমাকে দেখিয়ে দেবো। তখনি ভেবেছিলুম, তোমার মত কবি-মানুষকে অমন লোভনীয় মাধুর্য্যের সংস্পর্শে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়।"

শরদিন্দু গণপতির কথায় স্পষ্টই বুঝিল যে এ তরুণী একান্তই কাম্য। এ যে সাধনার সামগ্রী তাহা গণপতির মত ঠাকুরদা-প্রকৃতির লোকও স্বীকার করিতেছে। তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ তখনি যেন আরও খানিকটা বাড়িয়া গেল। কয়েকদিন পরে একদিন গণপতি আসিয়া কহিল,

"নাতি হে, তোমার স্বর্গে বাতি,—
আমি ঘটক সাজিয়া গেছিনু সেথায়
মাথায় ধরিয়া ছাতি।"

ঠাকুরদার আনন্দোচ্ছ্বাস শুভসংবাদসূচক মনে করিয়া শরদিন্দু ব্যগ্রভাবে কহিল, "যাও, যাও, গান রাখ ঠাকুরদা, খবর কি বল—"

"তার পিতৃসকাশ করিনু তলাস,
আপনারা কোন্ জাতি ?
কহে কেনগো মশায় কেন খোঁজ তায় ?—
সূত্রপাত হাতাহাতি।"

শরদিন্দু কহিল, "কি আপদ, সোজাসুজি বল্বে না ? কাজ সব পণ্ড ক'রে এসেছ তাই বল ?"

তাহার কৌতূহলের মাত্রা দেখিয়া গণপতি অতিশয় কৌতুক অনুভব করিল ও তেমনি সুর করিয়া গাহিল,

"কহিনু বিনয়ে সুজন ক্ষম হে
আমি প্রজাপতি-সাথী,
করি বিবাহ-সূচনা কোষ্ঠী-গণনা
ঘটক নামেতে ভাতি।"

শরদিন্দু এইবার হাসিয়া কহিল, "থাক্, হাতাহাতিটা তাহ'লে হ'ল না ? তোমার কিন্তু ঐ কাজটাতেই বেশী আনন্দ !"

"হস্তের কার্য্যে আমার বিশেষ আনন্দ, অবশ্য দক্ষিণ-হস্তের।"

* * *

গণপতির দৌত্যকার্য্যে দক্ষিণহস্তের আয়োজন পাকিয়া উঠিল।

শরদিন্দু বাসরঘরে বিরাজ করিতেছে। অনৈকা গুরুজন-স্থানীয়া বরকন্যার প্রণাম গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, "চিরায়ুষ্মতী হও, স্বামীর সঙ্গে সুখে ঘর কর। সোনার চাঁদ স্বামী হ'য়েছে;—স্ত্রীলোকের সমস্ত অলঙ্কারই স্বামী।"

বর্ষীয়সী মেজদি কহিলেন, "তা বৈকি, স্বামী ছাড়া স্ত্রীলোকের অন্য অলঙ্কার নেই।"

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "অন্য বাহনও নেই, স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র বাহন।"

বাসরঘরে কলহাস্যের মধ্যে শরদিন্দু চাহিয়া দেখিল খালিগায়ে গামছাকাঁধে যিনি দাঁড়াইয়া এই সমস্ত দার্শনিক-তথ্য প্রচার করিতেছেন তিনি আর কেহ নন, গণপতি। শরদিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরদা, তুমি এখানে এ ভাবে ?"

"কি ক'রব ভাই, আমার ভাগ্নীর মেয়েকে যখন তুমি নেহাৎই বিয়ে ক'রে ফেল্লে—তখন ঠাকুরদা হ'য়ে যুগল-মিলনটা না দেখ্‌তে এসে থাকি কি ক'রে ?"

একজন কিশোরী কহিল, "ও রাঙাদা, তুমি একটা গান ক'রে যাও—আনন্দসঙ্গীত।"

"কি আর গাইব দিদি, এ যুগলমিলন দেখে পুলকে আমার গাত্রে রোমাঞ্চ হ'চ্ছে আর মস্তকের টিকি খাড়া হ'য়ে টিকিঞ্চ হ'চ্ছে।"

তরুণীকণ্ঠের কলহাস্যে ঘর ভরিয়া গেল।

উপসংহারে একটা কথা বলিয়া রাখি। এই কন্যাটিকে বিবাহ করিবার জন্য গণপতি শরদিন্দুকে অনেক করিয়াই সাধিয়াছিল। সে তাহাতে রাজী হয় নাই। তারপর ব্যবস্থা যাহা হইয়াছিল তাহা ত শুনিলেন।

শ্রীভুবনজীবন মুখোপাধ্যায়

বিপথে

—উপন্যাস—

শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বয়স্যেরা হেমচন্দ্রকে বিদ্রূপ উপহাস করিত, বিজ্ঞজনে হেয়জ্ঞান করিত, বিবাহযোগ্য পুত্রের জননীরা দুশ্চিন্তায় দিশাহারা হইয়া কেবল গালি পাড়িত, আর যুবতীরা মনে মনে গোপনে কি করিত, কে জানে—বুঝিবা পূজা করিত, পূজা করিতে গিয়া নিজ নিজ দুরদৃষ্ট ভাবিয়া সুহাসিনীর হিংসায় হয়ত বা শুধুই ফাটিয়া মরিত।

এত রোষ, এত আক্রোশ হেমচন্দ্রের উপর কেন? হেমচন্দ্রের অপরাধ যে অতি গুরুতর—সুহাসিনীকে লইয়া সে পাগল, হয়ত সুখী। কি বিষম অন্যায়! এ দুঃখের সংসারে আবার সুখী হইতে আছে!

পাগল,—সুহাসিনীকে লইয়া হেমচন্দ্র ঘোরতর পাগল। তেমন পাগল মানুষ নাকি কেবল পরস্ত্রীর জন্যই হয়—অথবা হইলে সাজে!

কেন?—ব্যাখ্যা কঠিন। গাছের ফুল—বিধাতার সৃষ্টি, সৌন্দর্য্যে অতুল—তাহাতে কিন্তু মন উঠে না; আন্তরিক বিস্ময় উৎপাদন করে তাহারই অনুকরণে—কৃত্রিম ফুলে!—কেন?

নদীর কূলে বাস যাহার কল্লোলিনীর স্বাভাবিক তরঙ্গভঙ্গ সে দেখে না—দেখিতে চাহে না, দেখিয়া বিন্দুমাত্র বিস্মিত বিচলিত হয় না; তাহাই দেখিতে ছুটে অথচ রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটে—দেখিয়া মোহিত আনন্দাপ্লুত হয়!—কেন?

সৌন্দর্য্যের ললামভূতা গৃহিণী—তাহাতে মন মজে না। মন মাতে—বিশ্বের আর সব ললনায়!—ঐ একই কারণে।

কে জানে কি অশুভক্ষণে কি উপাদানে বিধাতা মানব অন্তঃকরণ গড়িয়াছেন। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ অপেক্ষা লুকোচুরির মোহ বুঝি তাহাতে প্রবলতর, অযাচিত সুখের মাধুরী অপেক্ষা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুল বাসনার মত্ততা বুঝি তাহাতে অধিকতর। শান্তির সুবিমল জ্যোতি অপেক্ষা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার বিপদসংকুলতা তাই বুঝি এত মধুর—ঘরের কোহিনুর অপেক্ষা পরের ঝুটা পাথরও এত বাঞ্ছিত! স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া নায়িকার প্রতি তাই বুঝি বিশ্বব্যাপিনী আসক্তি ও লালসা।
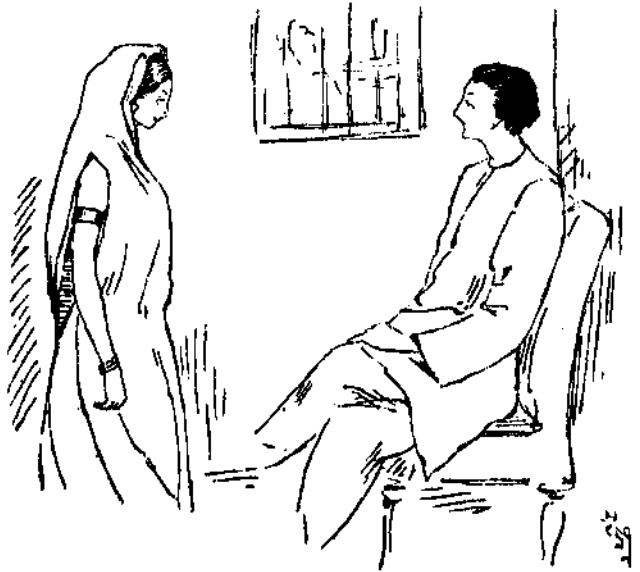
সুহাসিনী তাহার অতুল রূপরাশি লইয়া হেমচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্যভিচার সুতরাং মানুষ সহিতে পারে, পত্নীপ্রেমের আধিক্য মার্জ্জনা করে না। সাধারণের অভিধানে তাই হেমচন্দ্র বাতুল, উন্মাদ, বিকারগ্রস্ত!

হেমচন্দ্র কিন্তু লোকের এই বিদ্রূপ উপহাসে ব্যথিত হইত না, নিন্দা অপবাদ ভ্রূক্ষেপ করিত না। ভাবিত—প্রণয়ে পরিপ্লাবিত হৃদয়, এ হৃদয়ে লোকানুরাগের স্থান কৈ?—ছার কুৎসা-বিদ্রূপ!—তাহাতে কিবা আসে যায়!

তাহার পর সুহাসিনী যখন অতুল রূপরাশি লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, সরল সৌন্দর্য্যে ও উচ্ছ্বসিত লাবণ্যে ধরায় স্বর্গের সুষমা বিস্তার করিত, হেমচন্দ্র তখন যেন এক স্বর্গরাজ্যে গিয়া পড়িত, বিশ্ব-প্রেমের আলোকরশ্মি হৃদয়ে ওতঃপ্রোত হইয়া উঠিত, ক্ষুদ্রপ্রাণ মহাপ্রাণে পরিণত হইত। হেমচন্দ্র ধরা শত্রুহীন দেখিত, দ্বেষ হিংসা নিন্দা বিদ্রূপ—কুৎসিৎ কদাকার সংসারের যাহা কিছু কবিকল্পনার পর্য্যায় পড়িত।

কে বলে, প্রেম অন্ধ? যে প্রেমবিহ্বলতায় মানুষ সহিষ্ণুতায় ধরণী, মার্জ্জনায় জননী, আত্মবিসর্জ্জনে জায়া, উদারতায় দেবতা হয়, সে কি অন্ধতা? এমন অন্ধতায় বসুন্ধরা অম্বুপ্লাবিতা না হয় কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তারায় তারা মিলে। তরঙ্গে তরঙ্গ খেলে। প্রাণে প্রাণ মিলিবে না কেন?

হেমচন্দ্রে প্রিয়নাথে মিলিয়াছিল। মিলন হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

মিলিয়াছিল প্রাণে প্রাণে। হৃদয়ের মিলন ভাসিয়া বেড়ায় না—ডুবিয়া থাকে।

সে কিন্তু শৈশবে—জীবন-প্রভাতে। হাসিতে তখন মাণিক ঝরিত, অশ্রুতে মুক্তা গড়াইত। যে পারিত সে কুড়াইয়া লইত। উভয়ে মনের সাধে কুড়াইয়াছিল।

পাশাপাশি বাড়ী, সম অবস্থাপন্ন, তাহার উপর একত্র আহার বিহার শয়ন অধ্যয়ন—উভয়ে কাজেই একই ভাবে ভোর, একই স্বপ্নে মাতোয়ারা। ঘনিষ্ঠতার এমনই আবেশে নিরীহ নিষ্কলঙ্ক সংসারনিভিজ্ঞ দুটি শিশুপ্রাণ না মিলিবে ত মিলিবে কে—কবে?—বয়সে? বয়সের মিলন সেত কেবল বিনিময়,আদান প্রদান, শুধু কাষ্ঠ হাসি আর কপট সহানুভূতি।

প্রিয়নাথ কিন্তু মাঝে মাঝে হাঁফ ছাড়িতে চাহিত। বনে মাঠে নদীর তীরে হেমচন্দ্রের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে এক একবার ছুটিয়া গিয়া রাম-শ্যাম-নবীন-গোবর্দ্ধনের সঙ্গে খানিকটা মল্লযুদ্ধ করিত, বগলা-ব্রজবালা-নৃত্যকালীর মাথায় দু'চারটা চড় চাপড় মারিয়া আসিত।

বয়োবৃদ্ধির সহিত এ ভাব আরও ফুটিতে লাগিল। অল্প অল্প করিয়া প্রিয়নাথ ক্রমশঃ দূরে দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে বেলা বাড়িলে জীবন-মধ্যাহ্নে যখন হৃদয়ে প্রেমের ঊর্ম্মী সৃষ্ট হইল, প্রিয়নাথ তখন এক-প্রকার নিরুদ্দেশ—সুরূপা বালিকা-বধূই তখন তাহার ধ্যান জ্ঞান জীবন-সর্ব্বস্ব। হেমচন্দ্র তখন কেবল বাল্য-সৌহার্দ্দ্যের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু বুকে লইয়া।

তা ভাঙ্গে, বাল্য-বন্ধুত্বের মহাসৌধ এমন অনেকই ভাঙ্গে—ঘূর্ণী বায়ুর তাড়নায়। ভাঙ্গিলে যে আবার গড়িয়া তুলিতে পারে সে বড় কারিগর। হেমচন্দ্রও কি তাই?

সুহাসিনীকে ঘরে আনিয়া হেমচন্দ্র ভাবিত—স্বর্গ কি কেহ জানে না, কেহ দেখে নাই, দেখিবার আশাও রাখে না, বুঝি এই—এই কুসুম-সুকোমল রমণী-হৃদয়, আর তাহার বাহ্য-বিকাশ এই লাবণ্য-কিশলয়।

প্রিয়নাথ ভাবিত—রূপই যদি সর্ব্বস্ব হয় মাকাল ফলই ত তবে পৃথিবীর সাররত্ন, কোহিনুর। রূপের ধারা ক্ষয় ও লয়; এই ক্ষয়মূল রূপে—শুধু পুরাতনে যদি প্রাণ ভরে, পৃথিবীতে ত আর জন্মমৃত্যুর কোনই প্রয়োজন থাকে না।

রূপের নেশা ছুটিলে অবসাদে হৃদয় বেড়িয়া ফেলে। প্রিয়নাথ রূপের সেবা প্রচুর পাইয়াছিল—অযাচিত ভাবে, বিনা চেষ্টায়, বিনা কষ্টে—শুধু পরিণয়-সূত্রে। না চাহিতেই মানুষ যাহা পায় তাহার মর্য্যাদা বুঝে না, প্রিয়নাথও বুঝিল না। রূপ-ঘোর না ছুটিতেই অবসাদের প্রাণহীন করতলে আত্মসমর্পণ করিল।

শুধু তাহাই নহে।

নয়নের ক্ষুধা মিটিয়াছিল, কিন্তু প্রাণের ক্ষুধা মিটে নাই। প্রিয়নাথ অতৃপ্তি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল

এই অতৃপ্তির উপর সেতু বাঁধিয়া প্রিয়নাথ ভাঙা প্রাণ জোড়া দিল। বাল্যস্মৃতি পুরাতনের হাত ধরিয়া তুলিল।

প্রিয়নাথ আবার জ্বালা জুড়াইবার স্থান পাইল—একটি দিনের কথোপকথনে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন আকাশ-ঘেরা মেঘ—দাম্ভিক কাপুরুষের মত বর্ষণ নাই, কেবল গর্জ্জন। বেড়াইতে গিয়া হেমচন্দ্র দেখিল, দূরে নদীতীরে কে বসিয়া। ভাবিল, না জানি কোন্ নীরব কবি। নিকটে গিয়া চিনিল,—কে। বাল্যের সেই মধুর স্বরেই ডাকিল,—"প্রিয়!"

স্বর শুনিয়া প্রিয়নাথ যেন আকাশ হইতে পড়িল, ফিরিয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল। তখনই অশান্ত হৃদয়ে অনুতাপের একটা দাগ বসিল, আর মস্তক অবনত হইল।

"অত বিমর্ষ কেন, প্রিয়?"

প্রিয়নাথ এবারও প্রত্যুত্তর দিতে পারিল না, চেষ্টা করিয়াও হার মানিল। নয়নদ্বয় শুধু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

হেমচন্দ্র বুঝিল, অন্তরে প্রবল বাত্যা উঠিয়াছে তাই এই দুর্য্যোগে নদীতীরে একা। বুঝিল, সে বাত্যার সহিত তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, গতি রোধ করিবার শক্তিও হয়ত নাই। বলিল, "বলিতে কষ্ট হয়, থাক্—"

প্রিয়। কষ্ট? না! শুনিয়াছি, মনের দুঃখ ব্যক্ত করিলে বুকের ব্যথা নাকি কমিয়া যায়।

হেম। সকল সময় নয়। দুঃখ কোমল তরল হইয়া অশ্রুজলে মিশিয়া অনেক-স্থলে আপনি ভাসিয়া যায়।

প্রিয়। কাঁদিবার প্রাণ থাকিলে ত! হৃদয় যদি পাষাণ হয়?

হেম। তাহাই তখন সান্ত্বনা। কিন্তু কিসের এই মর্ম্মান্তিক কষ্ট, প্রিয়? কি চাও তুমি?—অর্থ?

প্রিয়নাথ ক্ষীণ হাসি হাসিল। হাসিয়া বলিল, "অর্থ!—সে ত কেবল আবর্জ্জনা! যত জমে দুর্গন্ধে ভিতর-বাহিরের বায়ু দূষিত করে। ঘরে আনে দস্তু-দুষ্ক্রিয়ার হাওয়া, বাহিরে ছড়ায় দ্বেষহিংসার মোহিনী মায়া।

হেম। তবে কি যশ চাও?

"উদ্ভট লোকের উৎকট কল্পনা যশ! যশ খুঁজি আমি!" প্রিয়নাথ হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে আবার বলিল "উর্ব্বশী-মেনকার মধুকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত যশ; এই সুর-

প্রিয়। কেন, আত্মপ্রসাদ!

হেম। তবে ভালবাসিয়াও ঐ লাভ—আত্মপ্রসাদ।

সঙ্গীতই আবার মুহূর্ত্তাবসানে রাসভ-ধ্বনি। আজ স্বর্গে, কাল রসাতলে—যশের দর্শনবিজ্ঞান ত এই!"

"তবে কি চাও, প্রিয়?—ভালবাসা? অপ্রতুল ত নাই।"

"প্রমাণ ?"

"প্রমাণ ?"—হেমচন্দ্র বলিতে যাইতেছিল, বিবাহাবধি বাল্যবন্ধুর সংসর্গত্যাগই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু জিহ্বা সংযত করিল। ভাবিল, মানসিক দুর্দশায় অপ্রিয় সত্যে প্রাণে বড় ব্যথা বাজিবে। বলিল "প্রমাণ ? সকল কথার কি প্রমাণ আছে না হয় ?"

প্রিয়নাথ আর বুঝিতে পারিল না, হেমচন্দ্রের গলা জড়াইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "বড় অসুখী আমি, হেম। দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে প্রাণটা যেন শুকাইয়া যাইতেছে। দেখিতে জানত দেখ, হৃদয়ের ভিতর কি বিশাল মরুভূমি ধু ধু করিতেছে। কঠিন সংসারের কঠোরতা হইতে ছুটিয়া পলাইয়া ভালবাসার কোলে মুখ লুকাইয়াছিলাম—সুধা-বৃষ্টির প্রত্যাশায়। সুধা কৈ, কেবল অগ্নিবৃষ্টি! ভালবাসা কি, বলিতে পার ?"

হেম। ভালবাসা আকাশের তারা, সাগরের মুক্তা, পৃথিবীর সর্বস্ব। শীতল ছায়াতলে যে আসে সে ধন্য হয়, অপরকেও—

প্রিয়। সেই একই কথা। সবাই ঐ বলে। আমার বুঝি তবে অদৃষ্টেরই দোষ। নহিলে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল না, আরও শুকাইল কেন ? বর্ষণ হইল না, হলকর্ষণই সার হইল কেন ? আলবালে জলসেচন পণ্ডশ্রম হইল, ফুল ফুটিল না কেন ? সাধনা ব্যর্থ হইল, সিদ্ধিলাভ ঘটিল না কেন ? অতৃপ্তি-অশান্তির গুরুভারে জীবন ভাঙ্গিয়া পড়িল কেন ?

হেম। একটা কথা, প্রিয়। কিছু মনে করিও না। সত্যই কি ভালবাসিয়াছিলে ?

প্রিয়। ভালবাসিয়াছিলাম—কোন্ মুখে বলিব ?

হেম। না, তা নয়। জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, ভালবাসিয়াছিলে, না রূপের সেবায় মাতিয়াছিলে ?

প্রিয়। লোকে বলে প্রাণের চেয়ে বড় কিছু নাই। যদি তাই হয় আর প্রাণেরও অধিক ভালবাসা সম্ভব হয় তবে প্রাণের অধিকই ভালবাসিয়াছিলাম ; কিন্তু নিরর্থক!

হেম। নিরর্থক! ভুল, ভুল! সকল কাজের অর্থ থাকে না। লোকে লুকাইয়া দান করে—অর্থ কি ?

প্রিয়। কেন, আত্মপ্রসাদ!

হেম। তবে ভালবাসিয়াও ঐ লাভ—আত্মপ্রসাদ।

"আত্মপ্রসাদ"—প্রিয়নাথ ধীরে ধীরে অক্ষর কয়টি উচ্চারণ করিল। বোধ হইল যেন নূতন রাজ্যের নূতন ভাবকণা। কিন্তু তলাইয়া বুঝিতে পারিল না—এমন আত্মপ্রসাদ ভালবাসায় কেমন করিয়া হয়, তেমন ভালবাসা লইয়া মানুষ কেমন করিয়া বাঁচে। বলিল, "ভালবাসিয়াছিলাম, প্রাণ ভরিয়া 'আপনা' বিকাইয়া ভালবাসিয়াছিলাম, তেমন ভালবাসা মানুষে বুঝি মানুষকে বাসে না। ভালবাসিয়াছিলাম, কিন্তু ভালবাসা পাই নাই, হৃদয় দান করিয়াছিলাম, প্রতিদান পাই নাই। তাই প্রাণে এত অশান্তি, এত অতৃপ্তি।"

হেম। ভালবাসিয়াছিলে! তবে কি আর বাস না ?

প্রিয়। না।

হেম। মিথ্যা কথা! এখনও বাস, নয়ত কখনও বাস নাই। যে একবার ভালবাসে সে কি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে ? সে ত ভালবাসা নয়—ভালবাসার ভাণ।

প্রিয়। সমুদ্র মন্থন করিলাম, অমৃত উঠিল না। সুখের আশায় মজিলাম, সুখ কোন্ অদৃশ্যপুরে ছুটিয়া পলাইল। ভালবাসার বাঁধ ভাঙ্গিবে, আশ্চর্য কি, হেম ?

হেম। কিন্তু সুখ কিসে, প্রিয় ? ভালবাসিয়াই নহে কি ?

প্রিয়। হাঁ, ভালবাসা সুখের বটে ; প্রতিদান আরও সুখের।

হেম। অপ্রেমিকের—ইন্দ্রিয়দাসের কথা। সুখ গ্রহণে নয়, সুখ দানে ; সুখ নিজে মজিয়া, পরকে মজাইয়া নয়। যে মজাইতে চায় সে ত তামাসা দেখে, যে 'আপনা' হারায় সেই ভালবাসে।

প্রিয়। কিন্তু হৃদয় যে প্রতিদান চায়, প্রাণ প্রতিপ্রাণ খুঁজে।

হেম। খুঁজিবে না কেন ? আদুরে ছেলে, আদর সোহাগের আতিশয্যে মাথা খাইয়াছ, আবদার ত করিবেই। কথা এই, প্রাণেরও শিক্ষা প্রয়োজন।

প্রিয়। কিন্তু শিক্ষা যদি গ্রহণ না করে ? শুধু প্রবৃত্তি নয়, শিক্ষা-গ্রহণের শক্তিও যদি না থাকে ?

হেম। না থাকিবার কারণ নাই। অপত্য-স্নেহে কি স্বার্থ? পিতা শিশুপুত্রকে ভালবাসেন কিসের প্রত্যাশায়? তবে ভালবাসিবে বলিয়া নারীকে ভালবাস কেন?

প্রিয়। কারণ বলিতে পারি না। মন লোকটা কিছু খাম-খেয়ালি, হিতকথাও ঠেলিয়া ফেলে।

হেম। মনের উপর ততটুকু শাসন না থাকে, প্রাণের ব্যবসায় কর, ভালবাসা বেচাকেনা দোকানদারির সামিল কর।

প্রিয়। কিন্তু তৃপ্তি?

হেম। তৃপ্তি?—লাভক্ষতি গননায় সম্ভবে কি? ব্যবসাদারকে কোনকালে সন্তুষ্ট দেখিয়াছ?

প্রিয়। তবে তৃপ্তি কোথায়?—কোন্ স্বপ্নরাজ্যে, কোন্ সুরপুরে?

হেম। তৃপ্তি তন্ময়ত্বে। ভালবাসায় তন্ময় হও, দেখিবে তৃপ্তি তোমার দাসী, শান্তি সহচরী। এই তন্ময়ত্ব আবার সসীমতার কারাগার অতিক্রম করিলে মানুষ দেবতা, বিপুল বিশ্বই তখন প্রেমাধার।

প্রিয়। দেবতার কথা অনধিকার চর্চ্চা, মানুষের কথাই ভাল।

হেম। পূজায় দেবতারাও তুষ্ট হন, মানুষ না হইবে কেন? ভালবাস, সর্ব্বস্ব দিয়া প্রাণ ঢালিয়া ভালবাস, দেখিবে যাহাকে ভালবাস সেও ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। ভালবাসায় বনের পশুও বশ হয়, মানুষ হইবে না—বাতুলের প্রলাপোক্তি!

প্রিয়। রাগ করিও না, হেম। মনুষ্য-চরিত্র তুমি অতি অল্পই বুঝিয়াছ। মানুষ পশু অপেক্ষাও হিংস্রপ্রকৃতি তা জান?

হেম। পুঁথিগত বিদ্যার কথা ছাড়িয়া দাও। হৃদয় যাহার পাষাণ কালোয়াতি আঘাতে সে পাষাণও ভেদ হয়। তেমন ওস্তাদ সংসারে বিরল এই যা দুঃখ।

প্রিয়। মনোমিলনে যে সুখ সে সুখের অংশভাগী স্ত্রীপুরুষ উভয়েই। তবে একজন ভালবাসিয়া স্তূপাকার দীর্ঘশ্বাস হাহুতাশ বহিয়া বেড়াইবে, আর একজন তাহা লইয়া ছেলেখেলা করিবে, ইহারই নাম কি ভালবাসা?

হেম। ভালবাসার অত্যাচার এইটুকু। সুখের প্রত্যাশা করিলে অত্যাচারও অল্পবিস্তর সহিতে হয় বৈ কি। বিনা অত্যাচার ভোগে সংসারের কোন্ সুখটা মিলে?

প্রিয়। সহিতে হয় দুইজনেই না সহিবে কেন?
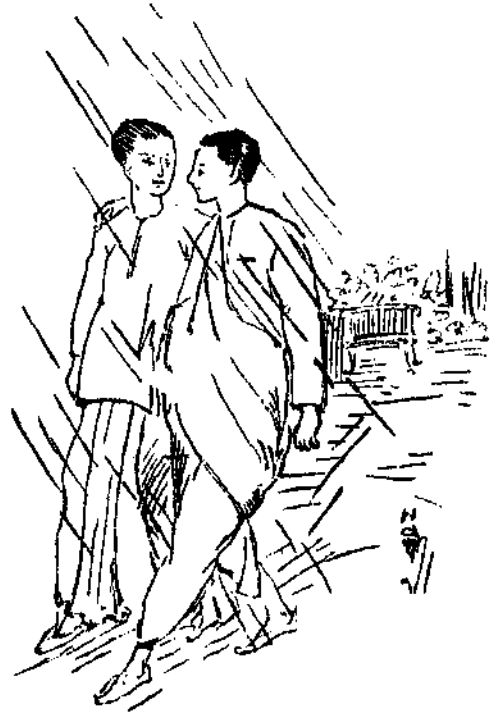
হেমচন্দ্র ও প্রিয়নাথ ক্ষিপ্রপদে গৃহাভিমুখে চলিল।

হেম। অবশ্য সহিবে, তবে সময়ে। তুমি আজ সহিলে, অপরে সহিবে না হয় দশদিন পরে। পার্থক্য এইটুকু। কিন্তু সহিতে প্রত্যেককেই হইবে। ঋষিরা কঠোর তপস্যায় বৈকুণ্ঠ লাভ করিতেন। সংসারের বৈকুণ্ঠপুরী—ঐ ভালবাসা। বৈকুণ্ঠের পথ কি কণ্টকহীন হইতে পারে, না হওয়া উচিত? হইলে যে অর্দ্ধেক মাধুরী ঝরিয়া পড়িবে!

প্রিয়নাথের মনের ভিতর কি একটা তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ নিরুত্তরেই রহিল। নিরুত্তর দেখিয়া হেমচন্দ্র আবার বলিল, "সহিতে বলিতেছি

শুধু পত্নীকে সুখী করিবার জন্ত নহে, নিজ স্বার্থের জন্য, নিজে সুখী হইবে বলিয়া। তুষ্ট করিবে নিজে তুষ্ট হইবে বলিয়া।

'তুষ্ট করিবে নিজে তুষ্ট হইবার জন্ত'—কথাটা প্রিয়নাথের লাগিল ভাল, তাই একবার আবৃত্তি করিয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "বেশ কথা, আরও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। কিন্তু এবারও যদি প্রতিদান না পাই ?"

হেম। এবারও না পাও! পাও নাই যে, কিসে বুঝিলে? প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্কা অল্পশিক্ষিতা বালিকা দুইদিনে যদি সমানভাবে চলিতে না পারে সে কি প্রতিদানের অভাব ?

প্রিয়নাথ কি উত্তর দিতে গেল, কথা জুটিল না।

হেম। নীরবতাকেও অনেক সময় আমরা অভাব মনে করি। কিন্তু যাহার প্রাণে যত বেশী প্রেম সেই ত তত বেশী নীরব। শব্দ শূন্ত-কুম্ভের, পূর্ণ-কলসের নহে।

বহু চেষ্টায় প্রিয়নাথ এইবার বলিল—"তবে কি ভাষার প্রয়োজন নাই? ভাষাই কি মনোমিলনের দ্বার নয়? এ দ্বার রুদ্ধ থাকিলে, উভয়ের মনের কথা প্রাণের ব্যথা পরস্পর পরিচিত না হইলে, মনোমিলন সম্ভবে কি? 'তুমি সে শ্যামের সরবস ধন, শ্যাম সে তোমার প্রাণ'—নির্বাক ভাষাহীন দুই প্রাণ এমন করিয়া কখন কি এক হয়?"

হেমচন্দ্র উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিল "নিশ্চয়ই হয়। মুখে প্রকাশ না করিলে পরস্পরের মনোভাব দম্পতীর অগোচর থাকে, কে বলিল! মূক যে, সে কি তবে ভালবাসিতে পারে না? মুখ অপেক্ষা চোখের ভাষারই বল অধিক। যাহার চক্ষু নাই, থাকিয়াও নাই, চশমার সাহায্য ব্যতীত যে দেখিতে না জানে সে তাহা বুঝিতে না পারে; বুঝিতে পারে না বলিয়া অবিশ্বাস করিবার অধিকার তাহার নাই।"

প্রবল বেগে বৃষ্টি আসিল। উভয়ে ক্ষিপ্রপদে গৃহাভিমুখে চলিল। হেমচন্দ্র চলিল হারানিধি ফিরাইয়া পাইলে যে সুখ সেই সুখে বিভোর হইয়া। প্রিয়নাথ চলিল সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুখ-স্বপ্ন-সফলতার সন্দেহ-সংশয়েও যে আনন্দ সেই আনন্দ বুকে লইয়া।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ মিত্র

যুগ-সন্ধি

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল, বি-সি-এস্

তৃতীয় স্তবক

১

লা-টুর্গ্

লাটুর্গ, লা—টুর—গভেন (অর্থাৎ গভেনদিগের দুর্গ) কথার গ্রাম্য অপভ্রংশ। ইহাকে গভেন-বংশীয় জমিদারগণের প্রাচীন ব্যাষ্টিল বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। শ্লেট-পাথরের এক প্রকাণ্ড টিলার উপর নির্ম্মিত ছয়তলা উঁচু কারাদুর্গ (টাওয়ার)—এখানে-সেখানে গবাক্ষ, প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য একটি মাত্র লৌহদ্বার।

দুর্গের পশ্চাতে অরণ্য, সম্মুখে সংকীর্ণ খাদের অপর তীরে বিস্তৃত মালভূমি। এই খাদ শীতকালে ত্বরিৎ-গতি পার্ব্বত্য সরিৎ, বসন্তে ক্ষুদ্রকায়া নদী এবং গ্রীষ্মে পাষাণ-মণ্ডিত পরিখা। খাদের উপরে খিলানকরা সেতু এবং তদগ্রে টানা-সেতু—দুর্গ ও মালভূমিকে সংযুক্ত করিয়াছে।

আজ লাটুর্গ ছায়ামাত্র। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগেও ইহার ধ্বংসাবশেষ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এই সুরক্ষিত দুর্গ কুজার্স-অরণ্যের প্রবেশপথে প্রহরীস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল। কতকগুলি সু-উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভের উপরে সেতুটি অবস্থিত এবং তদুপরি বাসোপযোগী করিয়া নির্ম্মিত এক অট্টালিকা। আধুনিক-কালের আবাসগৃহের সুখ-সুবিধা অবশ্য সেকালে অপরিজ্ঞাত ছিল; তদানীন্তন জমিদারবর্গও অন্ধকূপ-তুল্য কক্ষে বাস করিতেই অভ্যস্ত ছিল। সেতুর অব্যবহিত উপরেই যে কক্ষটি তাহা একটি সুপ্রশস্ত হল—তদ্বারা তোরণের উদ্দেশ্য সাধিত হইত। সশস্ত্র রক্ষীগণ এইখানে পাহারা দিত এবং তজ্জন্য ইহা 'গার্ড-হল' নামে অভিহিত হইত। এই হলের উপরে গ্রন্থপরিপূর্ণ লাইব্রেরী, এবং লাইব্রেরীর উপরে গোলাঘর—ফসলের বস্তায় বোঝাই। সবগুদ্ধ গ্রামারকমের হইলেও এই অট্টালিকাটি একটু জমকালো। যেন ইহাকে উপেক্ষা করিয়া পার্শ্বদেশে বিষণ্ণ—গম্ভীর—সমুন্নতশীর্ষ টাওয়ার দণ্ডায়মান।

সামরিক সুবিধার দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই সেতু টাওয়ারের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। দুর্গের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতে যাইয়া ইহা তাহার শক্তির হানি ঘটাইয়াছিল। অরণ্যের দিকে যদিচ এটি দুর্গ ছিল, সমতলক্ষেত্রের দিকে সেরূপ আর রহিল না। একবার মালভূমিতে আসিয়া সন্নিবিষ্ট হইতে পারিলে শত্রুর পক্ষে সেতু অধিকার সহজ সাধ্য হইয়া উঠিবে। লাইব্রেরী ও গোলাঘর শত্রুর উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল এবং দুর্গরক্ষার প্রতিকূল হইবে। পুস্তকাগার ও শস্যাগার একবিষয়ে পরস্পর সদৃশ—উভয়েই দহনশীল। আগ্নেয়াস্ত্র-ব্যবহার-পটু আক্রমণকারীর পক্ষে হোমারের মহাকাব্য এবং তৃণস্তূপ সমান সহায়ক—প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেই হইল। ফরাসীরা হেইডেলবার্গের লাইব্রেরী ভস্মীভূত করিয়া জার্ম্মানদিগের নিকটে ইহা সপ্রমাণ করিয়াছিল। আর জার্ম্মানরা ফরাসীদের নিকটে ইহা সপ্রমাণ করে ষ্ট্রাস্‌বার্গের লাইব্রেরী জ্বালাইয়া দিয়া। রণনীতির হিসাবে এই সেতু প্রাসাদ যে মস্ত একটা ভুল, তাহা অস্বীকার করার যো নাই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে গভেন-বংশীয় জমিদারগণ আক্রমণের আশঙ্কা করিত না। তবু নির্ম্মাতাগণ কোনো কোনো বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। প্রথমত, অগ্নিদাহের সম্ভাবনা অনুমান করিয়া তাহারা প্রথম দুই তলের সমান উচ্চ একটা মজবুত মই অট্টালিকাগাত্রে আড়া-আড়ি ভাবে লোহার আংটাতে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, একটা নীচু ভারী লৌহদ্বার সেতু ও প্রাসাদের পথকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। একটা প্রকাণ্ড কুলুপে এই লৌহদ্বার বন্ধ থাকিত; তাহার সুবৃহৎ চাবি কোথায় লুক্কায়িত থাকিত একমাত্র দুর্গস্বামী ভিন্ন আর কেহ তাহা জানিত না। কামানের গোলাতেও

এই লৌহ-কপাট ভগ্ন হইবার বড় একটা সম্ভাবনা ছিল না,—অন্য আঘাতের তো কথাই নাই। টানাসেতু অতিক্রম করিয়া এই দ্বারের কাছে আসিতে হইত; আবার দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশের পথ ছিল এই দ্বারেরই ভিতর দিয়া; অন্য পথ ছিল না।

মালভূমিটি এত উচ্চ যে উহা সেতু ও প্রাসাদের লাইব্রেরী ঘরের সমসূত্রে অবস্থিত ছিল। অধিকতর সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে লৌহদ্বারটি, যে তলে লাইব্রেরী অবস্থিত সেই তলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। উহার একদিকে লাইব্রেরী, অপরদিকে কারাদুর্গের ত্রিতলস্থ কক্ষ।

লাইব্রেরীর প্রাচীরগাত্রে মেঝে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত কাষ্ঠ ও কাচনির্ম্মিত পুস্তকাগার সজ্জিত—সপ্তদশ শতাব্দীর সুন্দর কাষ্ঠশিল্পের নিদর্শন। এক-একদিকে তিনটি করিয়া দুইদিকে ছয়টি বাতায়ন। ইহাদের ভিতর দিয়া মালভূমি হইতে লাইব্রেরী-কক্ষের অভ্যন্তর দৃষ্ট হইত; বাতায়নগুলির অবকাশস্থলে ছয়টি মর্ম্মরপ্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি কারুকার্য্যমণ্ডিত ওক-কাষ্ঠের পাদপীঠের উপর স্থাপিত। নানাপ্রকারের গ্রন্থে পুস্তকাগার পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থ ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সেটি একটি বহুচিত্র-সমন্বিত ধূলস্কেপ সাইজের বই। উহার নাম "সেণ্ট বার্থোলোমিয়ো।" বড় বড় অক্ষরে নামটি মুদ্রিত। এরূপ বই নাকি আর ছিল না। এই অদ্বিতীয় গ্রন্থটি কক্ষের মধ্যস্থলে একটি টেবিলের উপর রক্ষিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহুলোক একটি আশ্চর্য্য দ্রব্যের মতন এই পুস্তকটি দেখিতে আসিত।

লাইব্রেরীর উপরের গোলাঘর লাইব্রেরীরই মতো আয়তাকৃতি। উহা কাঠের ছাদের নিম্নবর্ত্তী স্থলটুকুমাত্র কাজে লাগানো হইয়াছে; ঘরটা বেশ বড়ই—খড় ও শুষ্ক ঘাসে ভর্ত্তি। আলোক-প্রবেশের জন্য ছয়টি গবাক্ষ রহিয়াছে। কবাট-গাত্রে খোদিত সেণ্ট বার্থোলোমিয়োর প্রতিকৃতি ভিন্ন অন্য গৃহ-সজ্জা নাই।

লৌহদ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া লাইব্রেরীর অপরদিকে টাওয়ারের ত্রিতলে একটি গোলাকৃতি খিলানওয়ালা কক্ষে উপনীত হওয়া যাইত। প্রাচীরগাত্রে নির্ম্মিত ঘুরানো-সিঁড়ি দিয়া এই কক্ষে উঠিতে হয়। দশহাত পুরু দেওয়ালে এরূপ সিঁড়ি তৈরি করা কঠিন ছিল না। এই গোল-হলটির নিম্নে তদনুরূপ দুইটি কক্ষ ছিল, আর তাহার উপরে ছিল তিনটি। উপর্য্যুপরি স্থাপিত এই ছয়তলার উপরে একটি প্লাটফরম বা মঞ্চ। একতল হইতে অপর তলে পূর্ব্বোক্তরূপ ঘুরানো-সিঁড়ি দিয়াই উঠিতে হইত। দোরগুলি সবই নীচু—মাথা নত না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করা যাইত না। আর সংগ্রামকালে মাথা নীচু করা মানেই মাথাটি দেওয়া,—কারণ, প্রতি দ্বারের পাশেই অবরুদ্ধ দুর্গবাসীগণ অস্ত্রহস্তে তাহাদের আক্রমণকারী শত্রুর প্রতীক্ষায় লুক্কায়িত থাকিত।

মধ্যযুগে একটি নগর অধিকার করিতে হইলে তাহার রাস্তা পৃথক পৃথক ভাবে দখল করিতে হইত; একটি রাস্তা অধিকার করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক গৃহ স্বতন্ত্রভাবে আক্রমণ করিয়া অধিকার করিতে হইত এবং একটি গৃহ দখল করিতে হইলে তাহার প্রতি কক্ষের জন্য যুঝিতে হইত। কারণ তৎকালে প্রতি কক্ষ, প্রতি ভবন, প্রতি রাস্তা আক্রমণ ও অবরোধ-সহ করিয়া নির্ম্মিত হইত। সেই হিসাবে লাটুর্গ—খুবই সুরক্ষিত এবং দুর্ভেদ্য ছিল।

লৌহদ্বারটি টাওয়ারের সেতুর দিককার পুরু প্রাচীর-গাত্রে প্রোথিত ছিল।

লাইব্রেরীতে যাইতে হইলে আক্রমণকারীদিগের পক্ষে গার্ড-হল অতিক্রম করিয়া নিম্ন দুইতলের ঘুরানো-সিঁড়ি ভাঙিয়া লৌহদ্বারের নিকট পৌছানো এবং তারপর উক্ত দ্বার ভগ্ন করা আবশ্যক হইত।

টাওয়ারের উপরকার কক্ষগুলির প্রাচীরগাত্রে গুপ্ত-দরজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি ওদঞ্চলে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত ছিল। উপরে ও নীচে স্ক্রু-নিবদ্ধ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড-সকল স্প্রীংএর জোরে ঘুরিয়া যাইত এবং তাহাতে দেওয়ালে ফাঁক হইয়া পড়িত। আবার বন্ধ করিয়া দিলে সেগুলি প্রাচীরের সঙ্গে এমন বেমালুম মিশ খাইয়া যাইত যে তাহার চিহ্নমাত্র আবিষ্কার করা লোকের পক্ষে সম্ভব হইত না। এই স্থাপত্যকৌশল ক্রুশেড সমর হইতে প্রত্যাবৃত্ত যোদ্ধৃগণ প্রাচ্যদেশ হইতে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিল।

২

প্রতিভূ

জুলাই মাস অতীত হইল, আগষ্ট আসিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের উপর দিয়া যেন একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। তাহার রাজনৈতিক গগন হইতে দুইটি ধূমকেতু এইমাত্র অপসারিত হইয়াছে—ছুরিকাবিদ্ধ-বক্ষ ম্যারাট এবং ছিন্নশির শার্লট্ কর্দা।

ব্যাপার সর্ব্বত্রই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। বৃহৎ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ভেণ্ডি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লড়াইয়ে রত হইয়াছে এবং তাহাতেই উহা সাধারণতন্ত্রের পক্ষে অধিকতর দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ভেণ্ডিয়ানরা এখানে-সেখানে হটিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু ওদিকে গার্নসির সমুদ্রবক্ষে জেনারেল ক্রেগ-পরিচালিত ইংরাজের রণতরী ফরাসী-নৌবিভাগের কতিপয় সুদক্ষ অফিসারের নেতৃত্বে বহুসংখ্যক ইংরাজসৈন্যকে ফ্রান্সের উপকূলে নামাইয়া দিবার জন্য ল্যান্টিনেকের ইঙ্গিতমাত্র অপেক্ষা করিতেছে। ইহাদের অবতরণ রাজ-পক্ষীয় বিদ্রোহকে আবার জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে পারে।

আগষ্ট মাসে লাটুর্গ অবরুদ্ধ হইল।

সন্ধ্যাকাল—বিষম গুমট করিয়াছে। কাননের একটি পত্র, কিম্বা প্রান্তরের একগাছি তৃণও কম্পিত হইতেছে না। প্রদোষের স্তিমিতালোকে আকাশের গায়ে একটি একটি করিয়া নক্ষত্র নীরবে ফুটিয়া উঠিতেছে। অবসন্ন প্রকৃতি নৈশ-নীরবতার ক্রোড়ে ক্রমে ঢলিয়া পড়িতেছে। এমন-সময়ে চারিদিক ধ্বনিত করিয়া কারাদুর্গের উপর হইতে একটি শিঙা বাজিয়া উঠিল।

নীচে হইতে বিউগল্-ধ্বনিতে শিঙার আওয়াজের প্রত্যুত্তর আসিল। টাওয়ারের উচ্চতম শীর্ষে জনৈক সশস্ত্র পুরুষ দণ্ডায়মান্; আর পদমূলে সান্ধ্য-অন্ধকারে শত্রু-সৈন্যের অসংখ্য ছাউনি।

সাধারণতন্ত্রের সেনাদল দুর্গটিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। টাওয়ারের আওতায় অগণিত চলিষ্ণু কালো সৈন্যের সারি দেখা যাইতেছিল। সেতুর দিকে প্রান্তর হইতে খাদ পর্য্যন্ত এবং কারাদুর্গের দিকে বন হইতে টিলার পার্শ্ব পর্য্যন্ত ছাউনি পড়িয়াছে। অরণ্যের বৃক্ষনিম্নে এবং মাল-ভূমির ঝোপঝাড়ের অন্তরালে কোথাও কোথাও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। এই আলোকবিন্দু-বিদ্ধ নৈশতিমিরে ধরণীকেও আকাশের ন্যায় নক্ষত্রমালিনী বলিয়া বোধ হইতেছিল।

শিঙা দ্বিতীয়বার বাজিয়া উঠিল এবং বিউগল দ্বিতীয়বার জবাব দিল। ইহার অর্থ, দুর্গবাসীগণ অবরোধকারী সেনাদলকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা তোমাদের সহিত কথা বলিতে পারি কি ?" এবং শেষোক্তগণ প্রত্যুত্তরে তাহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

কন্‌ভেন্‌সন্ ভেণ্ডিয়ানদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু বলিয়া স্বীকার করিত না, পরন্তু তাহাদিগকে বিদ্রোহী দস্যু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধকালে আবশ্যক হইলে সাদা নিশান দেখাইয়া কিছুকালের জন্য লড়াই স্থগিত রাখার যে প্রচলিত রীতি আছে, তাহা ভেণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদ কার্য্যনির্ব্বাহের কোনো না কোনো উপায় বাহির করিবে। মিলিটারি বিউগল এবং কৃষকের শিঙার মধ্যেও একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছিল। প্রথম আওয়াজ কেবল মনোযোগ-আকর্ষণের জন্য; দ্বিতীয়টিতে প্রশ্ন করা হয়, "শুনবে কি ?" এই দ্বিতীয়-বারের আওয়াজের পর যদি বিউগল চুপ করিয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে 'প্রত্যাখ্যান,' আর জবাব দিলে বুঝিতে হইবে 'সম্মতি।'

বিউগল দ্বিতীয়বার সাড়া দেওয়াতে টাওয়ারের উপরিস্থিত লোকটি বলিতে লাগিল, "শোনো, আমার নাম গুভ—ল্যা—ত্র্যাণ্ট। আমি তোমাদের অনেককে বধ করেছি, সেজন্য আমাকে লোকে 'নীলে-মার' * বলে। যা করেচি তার চেয়ে আরো ঢের বেশী লোককে হত্যা করার মতলব রাখি, তাইতে 'ইমানুস' নামটাও আমার রটেছে। গ্রেনভিলের লড়াইয়ে আমার আঙুল কাটা যায়; লাভেলে আমার বাপ, মা ও আঠারো বছরের বোনকে তোমরা গিলোটিনে হত্যা কর; সেই লোক আমি।

* নীল—Blue—সাধারণতন্ত্রের দল।

"আমার প্রভু মার্ক্‌ইস গভেন ডি ল্যান্টিনেক, ভাই-কাউণ্ট ডি ফন্টেনয়, বৃটন প্রিন্স, সপ্তারণ্যের অধিস্বামী—তাঁরই নামে আমি তোমাদিগকে বলচি।

"শোন, আমার প্রভু এই দুর্গে আশ্রয় নেবার পূর্ব্বে ছয়জন সর্দ্দারকে তাঁর কাজ ভাগ ক'রে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ে এসেচেন। সুতরাং তোমরা যদিও লাটুর্গ অবরোধ করেছ, মনে ক'রোনা—এই দুর্গজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাবে। এমন কি মন্‌সেইনিয়রও যদি মারা যান, তবুও বিধাতার বরে এবং রাজার আশীর্ব্বাদে ভেণ্ডি বেঁচেই থাক্‌বে।

"এখন যা বলচি, তোমাদের সতর্ক করার জন্তে। চুপ ক'রে মন দিয়ে শোনো—। মন্‌সেইনিয়র আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। তাঁরই কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুচ্চে।

"মনে রেখো, তোমরা নিতান্ত অন্যায় ক'রে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করচ। আমরা আমাদের নিজ দেশে থেকে, শুধু আত্মরক্ষার জন্ত যুদ্ধ কর্‌চি। আমরা সরল, পবিত্র, ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত। সাধারণতন্ত্র আমাদের দেশে এসে আমাদিগকে আক্রমণ করেচে; আমাদের শান্তিপূর্ণ কৃষি-ক্ষেত্রে অশান্তির বীজ ছড়িয়ে দিচ্চে; আমাদের বাড়ীঘর, ক্ষেত-খামার পুড়িয়ে ছারখার করচে; আমাদের গৃহহারা বালকবালিকা-স্ত্রীগণকে দারুণ শীতে নগ্নপদে আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে বাধ্য করেচে।

"তোমরা আমাদের ঘিরে ফেলেচ, এই দুর্গ অবরোধ করেচ। তোমাদের কামান আছে, আহার্য্য ও বারুদের সংস্থান আছে। তোমরা সংখ্যায় সাড়ে চার হাজার,—আমরা মাত্র উনিশজন, আত্মরক্ষার চেষ্টা কর্‌চি।"

. "তোমরা ইতিমধ্যেই আমাদের দুর্গপ্রাচীরের একাংশ ভগ্ন ক'রে ফেলেচ। এই ভাঙনের ভেতর দিয়ে তোমরা দুর্গে প্রবেশ কর্‌তে পার; তোমরা এক্ষণে আক্রমণ করার জন্ত প্রস্তুত হ'চ্চ।

"আর আমরা,—হে দুর্গপাদমূলস্থিত জনগণ,—আমাদের কথা শোনো, আমাদের সকলের একই কথা।

"আমাদের হাতে তিনটি বন্দী আছে—তিনটি শিশু। তোমাদেরই কোনো এক পল্টন এদের পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছিল; এরা তোমাদেরই আমরা এই শিশুদের ফিরিয়ে দিতে রাজি আছি।

"এক সর্ত্তে।

"তা এই,—আমাদিগকে বিনা বাধায় চ'লে যেতে দিতে হবে।

"যদি তোমরা এতে রাজী না হও, তবে—ভাল ক'রে শোনো—আমাদিগকে আক্রমণ করার তোমাদের দুইটি উপায় আছে:—এক অরণ্যের দিকে—ভাঙনের ভেতর দিয়ে, অপর মালভূমির দিকে সেতুর উপর দিয়ে। সেতুর উপর তিনতলা। সর্ব্বনিম্নতলে আমি ইমানুস ও পিপে আলকাতরা এবং একশ' বোঝা শুষ্ক তৃণ রেখেচি; সকলের উপরের তলায়ও খড় বোঝাই; আর মধ্যতলে বই ও কাগজপত্র। টাওয়ার ও লাইব্রেরীর মধ্যস্থ লৌহদ্বার অর্গলিত ও কুলুপ-বন্ধ। চাবি মন্‌সেইনিয়রের নিকটে। দোরের নীচে ছিদ্র ক'রে একটা গন্ধকমাখানো পল্‌তে রাখা হ'য়েচে। তার এক প্রান্ত আলকাতরায় ডুবানো, অপর প্রান্ত টাওয়ারে আমার হাতে। যখন খুসি, আমি জ্বালিয়ে দিতে পারি। যদি আমাদের চ'লে যেতে না দাও, তা হ'লে ছেলেদের আমরা সেতু-প্রাসাদের মাঝের তলে রেখে আগুন ধরিয়ে দিব। যদি সেতুর দিক দিয়ে তোমরা আক্রমণ কর, তবে তোমাদের গোলাগুলিতেই ঐ অট্টালিকায় আগুন ধ'রে উঠ্‌বে; আর যদি ভাঙনের দিক দিয়ে আক্রমণ কর, তবে আগুন ধরিয়ে দিব আমরা। দুদিক দিয়ে একসঙ্গে আক্রমণ কর্‌লে, আগুনও দুদিক দিয়েই যুগপৎ জ্ব'লে উঠ্‌বে। যা-ই হোক্‌, ছেলেদের গৃহদাহে মৃত্যু অনিবার্য্য।

"এখন বল, রাজি কি না?

"রাজি হ'লে আমরা বেরিয়ে আস্‌ছি।

"রাজি না হ'লে ছেলেরা মারা পড়্‌বে।

"আমার বক্তব্য শেষ হ'য়েচে।"

নীচ হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আমরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর্‌চি।" স্বর কঠোর ও দম্ভপূর্ণ। দৃঢ় কিন্তু অপেক্ষাকৃত মোলায়েমস্বরে আর একজন বলিল, "বিনা-সর্ত্তে আত্মসমর্পণের জন্ত তোমাদিগকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্চি।"

কিছুকাল চুপ্‌চাপ্‌। তারপর সেই স্বর আবার বলিল, "আগামীকল্য ঠিক এই সময়ের মধ্যে তোমরা যদি আত্ম-সমর্পণ না কর, তবে আমরা আক্রমণ আরম্ভ কর্‌ব।"

প্রথমোক্ত ব্যক্তি পুনরায় বলিল, "তখন আর কোন দয়া দেখানো হবে না।"

টাওয়ারের উপর হইতে আর একজন এই পরুষকণ্ঠের প্রত্যুত্তর দিল। একটি উন্নতকায় লোক ঝুঁকিয়া নিম্নের অন্ধকারের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া কাহাকে যেন খুঁজিতে লাগিল,—নক্ষত্রালোকে মার্কুইস্ ডি ল্যাণ্টিনেকের কঠোর বদনমণ্ডল প্রকটিত হইল। তিনি বলিলেন—"দাঁড়াও দেখি, এ যে তুমি পাদ্রী।"

"হাঁ, দেশদ্রোহী! আমিই বটি।"

কোমল ও কঠিন

সেই বজ্রকঠোর স্বর সিমুর্দ্যানের। আর অপেক্ষাকৃত কম-স্পর্দ্ধিত কোমল কণ্ঠ গভেনের।

মার্কুইস ডি ল্যাণ্টিনেক সিমুর্দ্যানকে ঠিকই চিনিতে পারিয়াছিলেন।

রক্তপাত-ক্লিন্ন অন্তর্বিপ্লব কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সিমুর্দ্যানকে এতদঞ্চলে ভীষণরূপে খ্যাতিমান করিয়া তুলিয়াছিল। লোকে বলাবলি করিত—প্যারিসে ম্যারাট, লিয়োঁতে চালিয়ার, আর ভেণ্ডিতে সিমুর্দ্যান। পাদ্রী বলিয়া সিমুর্দ্যানের যে সম্মান তাহা আর রহিল না। একজন ধর্ম্মযাজক তাহার নিজকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব ব্যাপারে লিপ্ত হইলে তাহার ফল এইরূপই দাঁড়ায়। সিমুর্দ্যানের নামে লোকের আতঙ্ক হইত। কঠোরপ্রকৃতি লোকদিগের এটা একটা দুর্ভাগ্য। তাহাদের কার্য্য দেখিয়া লোকে তাহাদিগকে নিন্দা করে, কিন্তু জনসাধারণ যদি তাহাদের অন্তর দেখিতে পাইত, তবে হয়তো তাহাদিগকে এতটা দোষী করিত না।

বিদ্বেষের তুলাদণ্ডে মার্কুইস ডি ল্যাণ্টিনেক এবং আবে সিমুর্দ্যান দুই-পাল্লাই সমান ভারী করিয়া রাখিয়াছিল। এই দুই ব্যক্তির প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিপক্ষগণের নিকটে রাক্ষসবৎ হিংস্র বলিয়া গণ্য হইত। মার্সের প্রিউর যখন ল্যাণ্টিনেকের মস্তকের মূল্য ঘোষণা করে, নয়েরমুটিয়রে চ্যারেটও তখন সিমুর্দ্যানের মস্তকের মূল্য ঘোষণা করে।

একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, এই মার্কুইস এবং এই পাদ্রী কতকদূর পর্য্যন্ত একই প্রকৃতির লোক। অন্তর্বিপ্লবের লৌহমুখসে দুইটা মুখ—একটা অতীতের দিকে এবং আর একটা ভবিষ্যতের দিকে ফিরানো, কিন্তু দুইটাই সমান ট্র্যাজিক। প্রথমটি হ'চ্চে ল্যাণ্টিনেক, দ্বিতীয়টি সিমুর্দ্যান। তবে ল্যাণ্টিনেকের অবজ্ঞাপূর্ণ বদনমণ্ডল ঘনতমসাচ্ছন্ন, আর সিমুর্দ্যানের সাংঘাতিক ললাটে প্রাতঃসূর্য্যের অরুণ লেখার ঈষদাভাস—এইমাত্র প্রভেদ।

অবরুদ্ধ দুর্গবাসীগণ একটু অবসর পাইল। গভেনের অনুগ্রহে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আক্রমণ স্থগিত হইয়াছে।

ইমান্নুস সঠিক সংবাদই পাইয়াছিল। সিমুর্দ্যানের চেষ্টায়, গভেনের অধীনে এখন সাড়ে চারিহাজার সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে গভেন ল্যাণ্টিনেককে লাটুর্গের দুর্গমধ্যে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। দ্বাদশটি তোপ দুর্গের অভিমুখে লক্ষ্য করিয়া সাজানো হইয়াছে—অরণ্যের প্রান্তে টাওয়ারের দিকে ছয়টি, এবং মালভূমির উপরে সেতুর দিকে ছয়টি।

বারুদের সাহায্যে দুর্গপাদমূলে খানিকটা জায়গা ভাঙিয়া ফেলিতে গভেন সক্ষম হইয়াছে।

চব্বিশ ঘণ্টার সন্ধিকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আক্রমণ আরম্ভ হইবে।

অরণ্যে ও মালভূমিতে সাড়ে-চারিহাজার সৈন্য।

টাওয়ারে উনিশ জন।

ইতিহাসে এই উনিশ জনের নাম আইনের আশ্রয়-বর্জ্জিতদের তালিকায় পাওয়া যাইতে পারে।

সিমুর্দ্যানের ইচ্ছা ছিল, এই সার্দ্ধ চতুঃসহস্র সৈন্যের নেতা গভেন এডজুট্যাণ্ট-জেনারেলের পদমর্য্যাদা গ্রহণ করে। কিন্তু গভেন তাহাতে সম্মত হইল না। সে বলিল, "যখন ল্যাণ্টিনেক ধরা পড়বে, তখন দেখা যাবে। এখন পর্য্যন্ত তেমন যোগ্যতা আমি কিছু অর্জ্জন করি নাই

'টাওয়ার গভেন'এর ভাগ্যদেবতা এই দুর্গটি লইয়া কি অদ্ভুত খেলাই খেলিতেছিলেন! একজন গভেনবংশীয় ইহাকে আক্রমণ করিয়াছে, এবং আর একজন গভেনবংশীয় সে আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছে। এই আক্রমণে যে কতকটা কুণ্ঠা, কতকটা সঙ্কোচ, কতকটা অনিচ্ছা প্রকাশ পাইতেছিল, তাহার মূলও ঐখানে।

আক্রমণ প্রতিরোধ-চেষ্টায় কিন্তু সে সঙ্কোচ ছিল না। ল্যাটিনেক কিছুই গ্রাহ্য করিত না, বিশেষত সে অধিকাংশ সময়েই ভার্সেলেসে বাস করিত বলিয়া লাটুর্গের সহিত তাহার হৃদয়ের কোনো যোগ ছিল না। সে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল কেবল অন্য আশ্রয় ছিল না বলিয়া, কোনো অন্তরের আকর্ষণবশত নহে। আবশ্যক হইলে উক্ত দুর্গ ভূমিসাৎ করিতে তাহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হইত না। পক্ষান্তরে স্থানটির উপর গভেনের শ্রদ্ধা ছিল খুবই প্রগাঢ়। সেতুর দিকে হইতেই আক্রমণের সুবিধা। কিন্তু সেতুর উপরকার লাইব্রেরীতে জমিদারবংশের মূল্যবান প্রাচীন ও ঐতিহাসিক কাগজপত্র সংরক্ষিত ছিল। সেদিক দিয়া আক্রমণ করিলে লাইব্রেরী-দাহ অনিবার্য। ঐসকল কাগজপত্র অগ্নিসাৎ করা স্বীয় পিতৃপুরুষগণের চিতাগ্নি প্রজ্বলিত করার মতোই একটা করুণ ও শোকাবহ ব্যাপার হইবে বলিয়া গভেনের মনে হইল। পিতামহগণের অধ্যুষিত এই সুপ্রাচীন আবাসভবন তাহার নিজের শৈশবের শত সুখস্মৃতিতে পূর্ণ। ইহারই প্রাচীরবেষ্টনের মধ্যে সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল— আর কি দারুণ অদৃষ্টবিপর্যয়! —আজ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সে বাল্যের আশ্রয়স্থল এই পবিত্র মন্দিরকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছে! কোন্ প্রাণে সে ইহাকে ভস্মীভূত করার পাপে নিজকে কলঙ্কিত করিবে? হয়তো লাইব্রেরীর উপরিস্থ গোলাঘরে তাহারই শৈশবের দোলনাটি রক্ষিত আছে। এইসব ভাবনায় গভেনের চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই লাইব্রেরীর দিক দিয়া সে আক্রমণ করে নাই। ওদিক দিয়া কেহ পলায়ন করিতে না পারে শুধু সেই ব্যবস্থা করিয়াই সে ক্ষান্ত হইয়াছিল।

সিমুর্দ্দান ইহাতে আপত্তি করে নাই। করে নাই বলিয়া কিন্তু সে নিজেকে মনে মনে ভর্ৎসনা করিত। এইসব বর্ব্বর-যুগের স্মৃতিচিহ্ন-দর্শনে তাহার কঠোর প্রকৃতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। মানবের প্রতি করুণায় যাহার হৃদয় বিচলিত হইত না, ইট-কাঠ-পাথরের অট্টালিকার উপর তাহার যে কৃপালেশও থাকিবে না তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ। একটা দুর্গধ্বংসে দ্বিধা—দয়ালুতারই পরিচায়ক। আর দয়ালুতাই গভেনের দৌর্ব্বল্য। সিমুর্দ্দানের চক্ষে এটা একটা বিশেষ ত্রুটি। সেইজন্য সে সর্ব্বদাই গভেনের কার্য্যকলাপের উপর খরদৃষ্টি রাখিয়াছিল এবং তাহার এই ত্রুটি সারিয়া লইতে চেষ্টা করিত। তবুও লাটুর্গ দেখিয়া সিমুর্দ্দানও যে তাহার হৃদয়-নিভৃতে একটু চাঞ্চল্য অনুভব করিয়াছে, একথা মনে-মনে সে স্বীকার না করিয়া পারিল না। তাহাতেই তাহার আরও ক্রোধ জন্মিল। পাঠাগারটি দেখিয়া তাহার অন্তর কোমল হইয়া আসিল—যে সকল গ্রন্থ হইতে সে গভেনকে প্রথম পাঠ শিখাইয়াছিল সেইগুলি এখনও সেখানে রহিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী প্যারিগ্নে গ্রামের সে যাজক ছিল। এই সেতু-প্রাসাদের ছাদের নিম্নস্থ কুঠারিতেই সিমুর্দ্দান বাস করিত। এই লাইব্রেরীঘরে বালক গভেনকে জানুর উপর বসাইয়া সে তাহাকে বর্ণমালার উচ্চারণ শিক্ষা দিত। এই প্রাচীন প্রাচীরচতুষ্টয়ের মধ্যেই সে তাহার প্রিয়তম শিষ্য—তাহার মানসপুত্রকে দৈহিক ও মানসিক সম্পদে ভূষিত হইয়া বাড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছে। এই লাইব্রেরী, এই ক্ষুদ্র সেতু-প্রাসাদ, শিশুর প্রতি তাহার অশেষ আশীর্ব্বাদে পবিত্রীকৃত এই প্রাচীর—সে কি ঐই সকলকেই পুড়াইয়া ছারখার এবং ভাঙিয়া চুরমার করিতে উদ্যত হইয়াছে? তাহাদের প্রতি সে কতকটা দয়া না দেখাইয়া পারিল না, যদিও তজ্জন্য সে নিজেকে মনে মনে অপরাধী বোধ করিল।

গভেনের অভিপ্রায়—বিপরীত দিক হইতে দুর্গাক্রমণ করে। সিমুর্দ্দান তাহাতে অমত করিল না। লাটুর্গের একটা ছিল বর্ব্বর দিক—সেটা টাওয়ার; আর একটা সভ্য দিক—সেটা লাইব্রেরী। সিমুর্দ্দান গভেনকে সেই বর্ব্বর দিকটাই ভগ্ন করিতে দিল।

উদ্ধারের উদ্যোগ

সারারাত উভয় পক্ষের যুদ্ধায়োজন চলিল।

পূর্ব্বোক্ত কথোপকথন শেষ হওয়া মাত্র গভেন তাহার সহকারী গেচাম্পকে আহ্বান করিল।

গেচাম্পের মধ্যে কোনোরকম অসাধারণত্ব ছিল না। সে সৎ, সাহসী, উত্তম সৈনিক, কিন্তু নেতৃত্বের অনুপযুক্ত; কোমলতাবর্জ্জিত; উৎকোচের বশীভূত হইয়া বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করা, কিম্বা দয়ার বশীভূত হইয়া ন্যায়ের তৌলে একচুল এদিক-ওদিক করা—দুইই তাহার পক্ষে সমান অসম্ভব ছিল। বুদ্ধিমান, কিন্তু বুঝা যেখানে তাহার কর্ত্তব্য নহে সেখানে সে বুঝিবার চেষ্টা করিত না। শকটবাহী অশ্ব যেমন অক্ষিদ্বয়ের চর্ম্মনির্ম্মিত পার্শ্বাবরণের মধ্য দিয়া দেখিয়া সেই দিকেই অগ্রসর হয়, গেচাম্পও তেমনি আদেশ এবং নিয়মানুগত্যের মধ্য দিয়া অবিকম্পিতপদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইত। তাহার পথ সোজা ছিল বটে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ। গেচাম্প একজন নির্ভরযোগ্য লোক—আদেশ-দানে যেমন দ্বিধাহীন, যথাযথ আদেশপালনেও তেমন পারগ।

গভেনের সহিত তাহার নিম্নলিখিতরূপ দ্রুত কথোপকথন হইল।

"গেচাম্প, একটা মই চাই।"

"সেনাপতি, মই তো আমাদের নেই।"

"একটা যোগাড় করতেই হবে।"

"দেওয়াল টপ্‌কাবার জন্যে?"

"না, উদ্ধারের জন্যে।"

গেচাম্প একমুহূর্ত্ত ভাবিয়া বলিল, "বুঝ্‌লাম। কিন্তু তা হ'লে তো খুব উঁচু মইএর দরকার।"

"অন্তত তেতলার সমান।"

হ্যাঁ, উঁচু ততখানিই হবে।"

"মইটা কিন্তু তার চেয়েও জেয়াদা উঁচু হওয়া চাই। সফলতা সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত হ'তে হবে।"

"তা তো বটেই।"

"তোমাদের মই নেই, ওটা কেমন কথা?"

"সেনাপতি, মালভূমির দিক দিয়ে লাটুর্গ অবরোধ করা আপনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি; সেতুর দিকে আক্রমণ না ক'রে টাওয়ারের দিকে আক্রমণ করাই সাব্যস্ত হ'ল। আমরাও পাহাড় উড়িয়ে দেওয়া, দেওয়াল ভাঙা এ সবের বন্দোবস্ত করতেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়লুম। প্রাচীর-উল্লঙ্ঘনের মতলব আর আমাদের মোটেই রইল না।—মই তাই আমাদের নেই।"

"এক্ষুণি একটি তৈরী ক'রে নাও।"

"তেতলার সমান উঁচু মই আগে থেকে যোগাড় না থাক্‌লে হঠাৎ তৈরী করা সম্ভব নয়।"

"কতগুলি ছোট ছোট মই একসঙ্গে জুড়ে' নাও না কেন?"

"ছোট মই থাক্‌লে তো তা করা সম্ভব?"

"খুঁজে-পেতে নাও।"

"মই কোথাও নেই। এ অঞ্চলে কৃষকেরা যেমন তাদের গাড়ী ও পুল ভেঙে দেয়, তেমনি তা'রা মইগুলিও নষ্ট করে ফেলে।"

"সত্য; তারা সাধারণতন্ত্রকে অচল ক'রে দিতে চায়।"

"তারা চায়, আমরা যেন মালামাল স্থানান্তরিত করতে, কি নদী পার হ'তে, কি দেওয়াল টপ্‌কাতে না পারি।"

"তবুও মই আমার চাই-ই।"

"সেনাপতি, আমার মনে পড়্‌চে, ফুজার্সের কাছে জাভেনেতে একটা বড় ছুতুরের কারখানা আছে। সেখানে মই থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে।"

"একমিনিট সময়ও নষ্ট হ'লে চল্‌বে না কিন্তু।"

"মইটা আপনার চাই কখন?"

"অন্তত আগামীকল্য এই সময়ে।"

"আমি এখনই লোক রওয়ানা ক'রে দিচ্ছি। ঘোড়া ছুটিয়ে যাবে। জাভেনেতে আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যদলের এক ঘাটি আছে। সেখান থেকে সঙ্গী নিতে পারে। কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে মই এখানে পৌঁছে যাবে।"

"উত্তম", গভেন বলিল, "তাতেই হবে। শীগ্‌গির—যাও।"

দশমিনিট পরে গেচাম্প আসিয়া গভেনকে জানাইল, ঘোড়সওয়ার জাভেনেতে রওয়ানা হইয়া গিয়াছে।

গডেন চতুর্দ্দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া পলায়নের পথ যাহাতে সম্পূর্ণ বারিত হয়, তাহারই বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। পাহারা আরও কড়াকড় এবং সৈন্যবেষ্টনী আরও ঘন-সন্নিবিষ্ট করা হইল, যেন ভিতর দিয়া কিছুই চলিয়া না যাইতে পারে। গডেন এবং সিমুর্দ্যান দুর্গাক্রমণের কাজ আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল—গডেন অরণ্যের দিকে এবং সিমুর্দ্যান মালভূমির দিকে থাকিবে; গডেন গেচাম্পকে নিয়া টাওয়ার আক্রমণ করিবে, আর সেতু ও খাদের দিকে থাকিবে সিমুর্দ্যান।

৫

মার্কুইসের কর্ম্ম তৎপরতা

বাহিরে যখন আক্রমণের সর্বপ্রকার উদ্যোগ চলিতেছিল, ভিতরে তখন তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা ক্ষান্ত ছিল না।

কামানের গোলার আঘাতে টাওয়ারের সর্বনিম্নতলের প্রাচীর ফাটিয়া একস্থলে ছেঁদা হইয়া গিয়াছিল। আক্রমণ-কারীগণ ক্রমাগত গোলাবর্ষণে ফাঁকটাকে বড় করিয়া তাহাদের মতলবসিদ্ধির সহায় করিয়া তুলিয়াছিল। এই ভাঙন দিয়া প্রবেশ করিলেই একটা প্রকাণ্ড গোলাকার হল; তাহার কেন্দ্রস্থলে একটি মাত্র স্তম্ভের উপর খিলান করা ছাদ। এই সুবৃহৎ কক্ষের ব্যাস ৪০ ফিটের কম হইবে না। টাওয়ারের প্রত্যেক তল এইরূপ এক একটি কক্ষ লইয়া। তবে উপরের তলগুলি তাহাদের নিম্নতল হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। সর্বনিম্নতলে গবাক্ষ কিম্বা বায়ুপ্রবেশের কোনোপ্রকার পথ ছিল না। কক্ষটি শূন্য—কবরের মতোই আলো-বাতাসের সম্পর্কহীন।

এই হলে একটি দ্বার ছিল, যদ্দ্বারা অন্ধকার কক্ষগুলিতে প্রবেশ করা যাইত; আর একটি দ্বার ছিল, উপরতলায় যাইবার সিঁড়ির পথে। এই সিঁড়িগুলি দেওয়াল কাটিয়া ঘুরাইয়া তৈরী করা হইয়াছে।

আক্রমণকারীগণ ভাঙনের ভিতর দিয়া এই হলে প্রবেশ করিতে পারে। টাওয়ার দখল করা তাহার পরেও বাকী থাকিবে।

এই হলে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। চব্বিশঘণ্টার বেশী সেখানে থাকিলে দম আটকাইয়া মরিয়া যাইবার কথা। ভাঙনের ভিতর দিয়া বাতাস আসাতে এখন সেখানে তিষ্ঠানো অসম্ভব হইয়াছে।

আক্রান্তগণ এই জন্যই উক্ত ভাঙন পুনরায় বন্ধ করিয়া দেয় নাই। আর বন্ধ করিয়াও কোনো ফল হইত না। কামানের গোলা আবার তাহা ভাঙিয়া দিত।

দেওয়ালের মধ্যে একটা মশাল-আধার পুঁতিয়া তাহারা তাহাতে একটা মশাল ভূমিতলস্থ কক্ষ তদ্দ্বারা আলোকিত হইল।

এখন কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হইবে?

ভাঙন বন্ধ করিয়া ফল নাই, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহারা কেন্দ্রস্তম্ভ হইতে ভাঙনের দুইধারে দুর্গপ্রাচীর পর্যন্ত দুইটা দেওয়াল গাঁথিয়া তাহার পশ্চাৎ হইতে প্রবেশকারী শত্রুগণের গতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করিল। এই দেওয়াল-দুইটিতে মাঝে মাঝে ছিদ্র রাখা হইল—যেন বন্দুকের নাল তাহাতে স্থাপন করিয়া শত্রুর উপর গুলি চালানো যাইতে পারে।

মার্কুইসের আদেশেই সমুদয় বন্দোবস্ত হইতেছিল। তিনিই পরামর্শ ও সাহস দাতা, তিনিই পরিচালক, তিনিই কর্ত্তা—অদম্য অমিততেজ পুরুষ-সিংহ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধেরাও অনেক নগর রক্ষা করিয়াছে। ল্যান্টিনেক ছিল সেই শ্রেণীর যোদ্ধা।

"ভয় কি, বন্ধুগণ," উৎসাহপূর্ণ স্বরে মার্কুইস বলিতেছিলেন, "সাহস অবলম্বন কর। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে, ১৭১৩ সালে, দ্বাদশ চার্লস তিনশত মাত্র সুইডেনদেশীয় সৈন্য লইয়া বিশহাজার তুর্কীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

যুবকের ন্যায় পূর্ণ-উদ্যমে মার্কুইস প্রত্যেক কার্য্যে যোগদান করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। তিনি কখনও প্রস্তর, কখনও বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড-সকল বহিয়া আনিতেছিলেন; সহাস্য আননে ভ্রাতৃভাবে দুর্গবাসী লোককয়টির সঙ্গে মিলিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও পরিচালিত করিতেছিলেন। তবুও অপর সাধারণ হইতে তাঁহার অভিজাতসুলভ একটা গর্ব্বিত পার্থক্য বুঝিতে বিলম্ব হইত না।

তাঁহার আদেশে কাহারও দ্বিরুক্তি করা সম্ভব ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "যদি তোমাদের অর্দ্ধেক বিদ্রোহী হও, তবে অপর অর্দ্ধেকের সাহায্যে আমি তাদের গুলি ক'রে মারবো, এবং বাকী লোক নিয়ে এই দুর্গরক্ষার জন্য লড়্‌ব।"

৬

ইমানুস্ কি করিতেছিল

মার্কুইস্ যখন দুর্গরক্ষার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত, ইমানুস্ তখন সেতুরক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছিল। অবরোধের প্রারম্ভেই ইমানুসের আদেশে দ্বিতীয়তলের জানলার নিম্নে তির্য্যকভাবে লম্বিত মইটি অপসারিত হইয়া লাইব্রেরী-ঘরে রক্ষিত হইয়াছিল। এই মই-এর অভাব পূরণ করার জন্যই বোধ হয় গভেন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গার্ডরুমের প্রত্যেক জানলায় তিনটি করিয়া লোহার গরাদে পুঁতিয়া আগমনির্গমের পথ বন্ধ করা হইল। লাইব্রেরীর জানলায় এরূপ লোহার গরাদে দেওয়া ছিল না, কিন্তু সেগুলি খুব উঁচু।

নিজেরই মতন আরো তিনজন অটল ও নির্ভীক লোক সঙ্গে লইয়া ইমানুস লৌহকবাট উন্মুক্ত করিয়া চোরা-লণ্ঠন হস্তে সতর্কভাবে সেতুর তিনটি তল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিল। উপরতলে শুষ্ক তৃণ ও খড় বোঝাই; নিম্নতলে আলকাতরা ও বিস্ফোরক পদার্থ সজ্জিত; ইমানুস পরীক্ষা করিয়া দেখিল গন্ধক-মাখানো পলিতা যথাযথ স্থাপিত আছে কিনা। তারপর মধ্যতলে লাইব্রেরী-কক্ষে তিনটি দোলা আনিয়া রাখা হইল—একটিতে রেনি-জিন, একটিতে গ্রোস-এলেন এবং একটিতে জর্জেট সুষুপ্ত। দোলাগুলি খুব সতর্কতার সহিত আস্তে আস্তে আনা হইল, যেন ছেলেরা না জাগিয়া উঠে

এগুলি সাধারণ গ্রাম্য দোলা—ঘরের মেঝের উপর স্থাপিত, যেন শিশুরা সহজেই বিনা-সাহায্যেই তাহা হইতে উঠা-নামা করিতে পারে। প্রত্যেক দোলার নিকটে ইমানুস এক-এক বাটি সুপ ও একটি করিয়া কাঠের চামচ রাখিয়া দিল। সেই বড় মইটা এই মেঝের উপর দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখা হইয়াছে। দোলা তিনটি মইএর সম্মুখে পাশাপাশি স্থাপিত হইল। যথেষ্ট বাতাসের আবশ্যক হইতে পারে মনে করিয়া সে জানালা ছয়টি খুলিয়া দিল। নিদাঘ-নিশীথ ঈষদুষ্ণ ও নক্ষত্র খচিত। সর্ব্বনিম্ন এবং সর্ব্বোচ্চ তলের জানালাগুলিও উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য ইমানুস একজন সঙ্গীকে প্রেরণ করিল। অট্টালিকার পূর্ব্বদিকে একটা প্রকাণ্ড শুষ্ক প্রাচীন আইভিলতা সেতুর একটা দিক উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া তিন তলেরই জানালা-গুলিকে ফ্রেমের মতো বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল। এটা রহিয়া গেল। চারিদিকে আর একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইমানুস সঙ্গীত্রয়-সমভিব্যাহারে উক্ত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কারাদুর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিপুল লৌহদ্বার অর্গলিত করিয়া তাহাতে ডবল তালা লাগাইল। অর্গলাদি সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। দ্বার-নিম্নস্থ ছিদ্র-পথে গন্ধকপলিতা যথাযথ বিন্যস্ত আছে, দেখিয়া সে সন্তোষ-জ্ঞাপক মস্তকান্দোলন করিল। এই পলিতা গোল-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া লৌহকবাটের নিম্ন দিয়া খিলানের নীচে আসিয়াছে এবং ঘুরানো সিঁড়ি দিয়া সাপের মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া সেতু-প্রাসাদের নিম্নতলের মেঝের উপর দিয়া বিস্তৃত হইয়া আলকাতরার উপর সজ্জিত শুষ্ক তৃণ-স্তূপের ভিতরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইমানুস হিসাব করিয়া দেখিল যে, টাওয়ারের ভিতরে পলিতার যে প্রান্ত রহিয়াছে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে লাইব্রেরীর অভ্যন্তরস্থ দাহ্য পদার্থ সকল জ্বলিয়া উঠিতে মিনিট পনেরো সময় লাগিবে।

এই সকল বন্দোবস্ত সমাধা করিয়া এবং প্রত্যেকটি কার্য্য বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়া ইমানুস লৌহদ্বারের চাবি লইয়া গিয়া মার্কুইসকে দিল। তিনি উহা তাঁহার পকেটে রাখিয়া দিলেন।

আক্রমণকারীগণের যাবতীয় গতিবিধি অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সেইজন্য ইমানুস তাহার রাখালি শিঙা লইয়া টাওয়ারের শীর্ষদেশে সর্ব্বোপরি যাইয়া উপবিষ্ট হইল। এবং এক চক্ষু অরণ্যের দিকে এবং অপর চক্ষু মালভূমির দিকে স্তব্ধ রাখিয়া সে বসিয়া বসিয়া কার্ত্তুজ তৈরী করিতে লাগিল। তাহার পার্শ্বে একটা শৃঙ্গনির্ম্মিত আধারে বারুদ,

একটা থলেতে গুলি এবং কতকগুলো পুরানো খবরের কাগজ,—সেগুলি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া সে কাজে লাগাইতেছিল।

প্রাতঃসূর্য্যের কনককিরণে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে দেখা গেল, অরণ্যে আট ব্যাটালিয়ান সৈন্য আক্রমণার্থে সুসজ্জিত—তাহাদের কটিদেশে তরবারি, পৃষ্ঠে কার্ত্তুজাধার, হস্তে সঙ্গিনশীর্ষ বন্দুক; মালভূমিতে কামান-শ্রেণী ও বারুদভরা গোলা; দুর্গাভ্যন্তরে উনিশজন লোক অনেকগুলি বন্দুক ও পিস্তলে গুলি-বারুদ পুরিতেছে;—আর তিনটি শিশু তাহাদের দোলনা-শয্যায় নিদ্রিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

মৃত্যুর মোহানায়

শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ চন্দ

জীবন-সন্ধ্যায়

ধরণীর ধূলি'পরে সবাকার অগোচরে প'ড়ে আছি শয্যায়!
দিবসের ক্ষীণালোকটুকু মুছে যায় ওই মূক মহুয়ার বনে,
আজিকে এ সন্ধ্যায় কী লিপি পড়িনু হায় নীলিমার নত-নয়নে—
স্বপ্ন কখনো দেখিনি জীবনে তবু আজ মনে কেন পেনু পরশন?
হে মোর বিদ্যুৎ-বন্ধু, নভোনীলা, কল্প-লোকী কামনার ধন!
যত অশ্রু ফেলেছিনু, যত গান গেয়েছিনু—তারা আজ মৃত্যু-লোকে;
মনেরে আমার মেরেছে তোমার বেয়াদব্ বিধাতা, দুঃখে ও শোকে!
আঁখি তব করিয়োনা ছলছল—
যারে তুমি জানিলে না তারি লাগি কেন হেন অহেতুকী অশ্রু-জল?
এই বাতায়ন-তলে চলে দলে দলে লক্ষ লোক নিতি নিতি;
তাহাদেরই মত আশাহত আমারো ছিল বুঝি বন্ধন, বসতি!
মনে হাসি পায় আমারো জীবন চায় মিলিতে ওদের সাথে—
দুঃখের জীবন মম এমনি কাটুক, নিরুপম—সন্ধ্যায়-প্রাতে।
এই ধরণীর ধূলিগুলি আর খেলি নাম-হীন এই নদীকূলে,
যে আলো নিভেছে সে আলো নিভুক্—তাহারে চাহিনা ফাল্গুনী-ফুলে!

মৃত্যুর মোহনায়

মরা মন মোর করে শুধু হায় হায় না-পাওয়ার বেদনা।

মনীষী-মন্দিরে

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত বি-এ

একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বাংলার বুকের উপর দিয়া রুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য কত বিচিত্র ছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিধাতার বরহস্ত এখনো নবনির্ম্মাণে সৃষ্টিমুখর হইয়া উঠিল কৈ? অমারজনীর অন্ধকার উদ্ভিন্ন করিয়া উষার নবারুণচ্ছটা অখণ্ড বাঙ্গালীত্বরূপ শবসাধকের কানে কানে বাঞ্ছিত সিদ্ধির বার্ত্তা বহিয়া আনিল কৈ?

তাই মনে হয়, একটি বৎসর পূর্ব্বে বাংলার একজন মনীষীর (চট্টগ্রাম-বিভাগীয় ভূতপূর্ব্ব স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টার খাঁ সাহেব আবুল হাসেম চৌধুরী) সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম ও সমাজগত ঐক্যানুভূতির যে একটা অখণ্ড উদার ভাবচিত্র মনোভূমিতে প্রত্যক্ষ করিয়া আশার জ্যোতির্ম্মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছিলাম এবং পাঠকের সমক্ষে তাহার একটুখানি ছক (বাংলার বাণী—২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) আঁকিয়া ধরিবারও ভরসা পাইয়াছিলাম, আজ মহাকালের কঠোর পরীক্ষায় সে স্বর্ণচূড় মিলন-সৌধের ভিত্তিভূমি বুঝি বা টলিয়া পড়ে।

দেখিয়াছি যখনই আমার চিত্ত কোন মুসলমান-প্রতিভার মধ্যে এমন কিছুর পরিচয় পায় যাহা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যানুভূতিরই পরিপোষক, যাহা যুগের আলো-অনুসরণকারী, অতীতের জীর্ণ খোলস বর্জ্জন করিয়া নিত্য নবকলেবর-ধারণে সদা-উন্মুখ, তখনই সে অনুভূতির স্পন্দন বিকশিত মোপ্রেম-মনের উপর ক্রিয়াশীল দেখিতে মন আমার আনন্দ-চঞ্চল হইয়া উঠে।

সেদিন আমি যখন খাঁ-সাহেবের চট্টগ্রামস্থ বাসভবনে তাঁহার সহিত ভাব-বিনিময়-মানসে উপস্থিত হই, তখন তিনি "শিক্ষিতা পতিতার আত্মকাহিনী" নামক বইখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছিলেন। বইখানির কথা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম মাত্র, পড়ি নাই। তাই কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বইখানি কি worth reading?' তিনি বলিলেন, 'বেশ ভাল বই তো।' আরো বলিলেন, 'বইখানির বহুল প্রচারে সমাজের লাভ বই ক্ষতি তো দেখি না। এই সংস্কারের যুগে সমাজের অন্তঃস্তরের গ্লানিগুলিকে চাপা দিয়ে রেখে লাভ কি?' ক্ষণকালপরে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় কবি ইকবাল সম্বন্ধে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের বাক্তব্য বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আলোচনা আরম্ভ করিলাম। তখনো "পতিতার আত্মকাহিনী"র কথায় তাঁহার মনটা বোধ করি কিছু ভারাক্রান্ত ছিল। ইকবাল সম্বন্ধে কথার প্রারম্ভেই তিনি বলিয়া ফেলিলেন, 'দেখুন, আজকাল লোকের যা মনোভাব, একগ্লাস মদ খেয়ে ধর্ম্মবক্তৃতা দেওয়া সে তো অতি সাধারণ ব্যাপার!' বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'আজকাল মানুষের কাম্য হ'য়েছে সমাজে প্রতিপত্তি, রাজনীতিতে নাম-যশ, অর্থনীতিতে টাকা-পয়সা আর উপাসনায় ধর্ম্মলাভ। সমাজ, রাজনীতি, দেশ, ধর্ম্ম সবগুলি যে একই অখণ্ড ভাগবত-চেতনার বিচিত্র প্রকাশ সে কথা মানুষ ভুলে গেছে; অন্ততঃ practical fieldএ তার অনুরূপ আচরণ তো দেখা যাচ্ছে না। আমরা westernerদের নিন্দা করি ওরা materialistic ব'লে; কিন্তু আমার তো মনে হয়, ওরা যেমন factoryতে যায় পয়সার জন্য, আমরাও মন্দির-মস্‌জিদে যাই ছেলের কল্যাণ বা নিজের বৈষয়িক উন্নতি প্রার্থনা করতে। পার্থক্যটা রইল কোথায় তা হ'লে?'

তাঁহার কথাটার মূল সুরটার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এখানে মৌনী থাকাই শ্রেয় মনে করিলাম।

সম্প্রতি আমি পাঞ্জাবের আহমদীয়া কিতাবগড় হইতে প্রকাশিত Muhammad and His Teachings নামক মহম্মদের একখানা ক্ষুদ্র জীবনচরিত পড়িয়াছিলাম। বইখানির মধ্যে একটি কথায় আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কথাটি হইতেছে, মহম্মদ বলিতেছেন, "Muslims should never be the first to attack." বলিলাম, যদি কথাটা এদেশের মুসলমান-সমাজ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার অনেকটা সমাধান হইত বলিয়া মনে

হয়। কথাটার উপর তাঁহার মতামত শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছি বুঝিতে পারিয়া তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে বলিলেন, "Oh, no hope! They have ceased to love Muhammad."

আমি উক্ত পুস্তিকাখানি আগাগোড়া পড়িয়াছি বুঝিতে পারিয়া তিনি খুব খুসী হইলেন। আগ্রহভরে বলিয়া গেলেন, "মুসলমান-ধর্ম্মের বিশেষত্ব হ'চ্ছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসমূহের মধ্যে আধুনিকতম ব'লে এর একটা sure historical foundation আছে। যখন আমরা অতীতের কোনও একটা মানুষকে কালপ্রবাহের মধ্য দিয়ে আরোপিত লোক-শ্রুতি প্রভৃতি হ'তে মুক্ত অবস্থায় পাই তখন আমাদের জীবনে তাঁহার জীবনযাত্রার ভঙ্গীটি অনুকরণ করতে সত্য-সত্যই একটা প্রেরণা পেয়ে থাকি, যা সন্দেহ, অবিশ্বাস প্রভৃতি হ'তে একেবারে মুক্ত।" বলিলাম, "ধর্ম্ম হ'তে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদের বাদ দিয়ে চিরন্তন সত্যগুলি নিলেই তো আমাদের চলে?" উত্তরে বলিলেন, "মানুষ শুধু abstract ideas নিয়ে থাকতে পারে না। তারা সেই সমস্ত তত্ত্বের মূর্ত্ত প্রতীকস্বরূপ রক্ত-মাংসের একটা আধারকে ভালবাসতে চায়।" একটু থামিয়া বলিলেন, "মহম্মদের জীবন-কথা এখনো কিংবদন্তীর সঙ্গে মিলেমিশে যায় নি। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নিখুঁতভাবে আমরা এখনো পাচ্ছি। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাক নারীজাতির প্রতি আমাদের আদর্শ আচরণ সম্বন্ধে মহম্মদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা। এ সম্বন্ধে তিনি নিজ দাম্পত্য জীবনে যা দেখিয়ে গেছেন তা কি তাঁর উপদেশ বা সংহিতার চাইতে ঢের বেশী মূল্যবান এবং appealing নয়?

কথায় কথায় তাঁহার অতি প্রিয়প্রসঙ্গ অবতারবাদ আসিয়া পড়িল। আমাদের কাহারো স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ হইল না যে একই সময়ে ভগবানের প্রয়োজন-অনুযায়ী বহু God-personalityর আবির্ভাব পৃথিবীতে সম্ভব হইতে পারে। তিনি বলিলেন, পাঞ্জাবের আহমদ্ এই-রকম একজন God-personality বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

জিজ্ঞাসা করিলাম—'Universal Religionএর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আপনার কি opinion?

তিনি। 'Universal' বলতে কি বুঝেন? ছেলেকে সব দেশেই বাবা-মা কাপড় পরতে ব'লে থাকে; এখানে universal জিনিষটা হ'ল nakedness ঢাকা—mode of coveringটা নয়।

আমি। একটা আদর্শে নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু আছে মনে করেন?

তিনি। আদর্শে নিষ্ঠা মন্দ নয়। কিন্তু রাম বা মহম্মদের ভক্ত কি কৃষ্ণকে অস্বীকার কর্বে? এখানে রামের রামত্ব দশরথের ছেলে ব'লে তো নয়—spirit নিয়েই। আমাদের চাই loyalty with spirit, formএর সঙ্গে নয়। সত্য দেশকালপাত্র-ভেদে আবদ্ধ থাকে না। up-to-date যাঁরা সত্যের আলো নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন সবাইকে আমাদের মানতে হবে এবং ভবিষ্যতে যাঁরা আসছেন তাঁদেরও নিতে হবে। দেখুন, আগে লোকে মনে করত যে এ জগতের মূল উপাদান-স্বরূপ আছে মাত্র পাঁচটি elements। কিন্তু পরপর বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় যে সমস্ত নূতন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হ'ল ওগুলি আমরা বাদ দিতে পারি কি? ভবিষ্যতেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের সীমারেখা যখন বিস্তৃততর হ'তে থাকবে তখনো কি আমরা ওগুলিকে বরণ ক'রে নেব না?...তারপর মূল প্রসঙ্গে আসিয়া বলিলেন, 'ধর্ম্মের বাহ্য দিকটার দিকেই শতকরা ৯৫ জন লোকের ঝোঁক। কারণ, তারা essenceটুকু নিতে বা নিলেও মানতে পারে না। এইজন্য সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ধর্ম্মের গোঁড়ামি নিয়ে এত যুদ্ধ, এত রক্তারক্তি চিরকাল হ'য়ে এসেছে এবং এখনো হ'চ্ছে। বুঝতে পারে না যে Language is more important than grammar। সব ধর্ম্মের মূল বক্তব্য বিষয়টা কি এক নয়? তবে grammarএরও যেমন একটা সার্থকতা আছে তেমনি মনু-রঘুনন্দন বেদ-কোরাণের আইন-কানুনেরও একটা সার্থকতা রয়েছে। তবে grammarএ যেমন যুগে যুগে অনেক change আসে, আসতে বাধ্য, তেমনি যুগের প্রয়োজনে সামাজিক, ধর্ম্মনীতিক বিধি-ব্যবস্থাও গড়তে-ভাঙ্‌তে হয়।'

বিদায়-মুহূর্ত্তে তিনি বলিলেন, 'এখন তো দেশে অনেকেই একটা না একটা ভাবের পাগল। ভারতের প্রধান তীর্থ-স্থানগুলিতে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের একটা মূর্ত্ত আদর্শ স্থাপন

করবার চেষ্টা যদি হ'ত, দেশের, সর্ব্বসম্প্রদায়ের জন্ম মুক্তদ্বার যদি তীর্থস্থানগুলি হ'ত তা হ'লে দেশে কাজের মত একটা কাজ হ'ত ব'লে মনে হয়।' কথাটা শুনিয়া অন্তরে একটা শ্রদ্ধার উদয় হইল। আর কোন কথা কহিলাম না। প্রসন্নচিত্তে তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া আলোচিত বিষয়গুলিই পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলাম। কারণ জানি, সদ্‌গ্রন্থের ন্যায় সদ্‌আলাপও "সুচিন্তিতমপি প্রতি-চিন্তনীয়ম্।"

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত

আমিনা

শ্রীমমতা মিত্র

বহুকাল আগে বাস করতুম কাশী—সারনাথে। একা গাড়ি ভাড়া ক'রে বেড়াতে যেতুম গাড়োয়ানের সঙ্গে গল্প করতে করতে।

বিশেষ ক'রে ভাল লাগ্‌ত রাত্রের চালকদের সঙ্গে কথা কইতে। গ্রামের গরীব চাষা তারা, সহরের দিকে আসত তাদের ছোট গাড়ি ও ঘোড়া নিয়ে—নিজেদের খাবার ও মনিবের ভাড়া জোগাড়ের আশায়।

একদিন রাত্রে একখানা রঙচঙে গাড়ি ভাড়া করেছিলুম। চালকের বয়স হবে বছর কুড়ি, লম্বা সুগঠিত দেহ। তার ডাগর চোখ দুটি কালো, গাল ফ্যাকাশে। ছেঁড়া, তালি দেওয়া ছোট টুপী চোখের উপর পর্য্যন্ত টানা; তার নীচে থেকে দেখা যাচ্ছিল কোঁকড়ানো চুল।

কিন্তু তার সুন্দর শ্মশ্রুহীন মুখ দেখাচ্ছিল শোকার্ত্তের মত।

তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলুম। তার কণ্ঠস্বর দুঃখে ভরা।

জিজ্ঞেস করলুম—"একি! তুমি এত কাতর কেন? কিসের কষ্ট তোমার?"

এক মুহূর্ত্ত সে চুপ ক'রে রইল। পরে বললে, "হুজুর, সে ব্যথা এমন মর্ম্মান্তিক যে তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হ'তে পারে না। আমার স্ত্রী মারা গেছে।"

"তুমি কি খুব ভালবাসতে তাকে···তোমার স্ত্রীকে?"

সে আমার দিকে ফিরলে না; শুধু মাথা একটু নীচু করলে।

"হাঁ, হুজুর। আজ আট মাস হ'ল...কিন্তু ভুলতে পারছি না তাকে। আমার মন ভেঙে গেছে। কেন, কেন সে মরে গেল? ছেলেমানুষ! জোয়ান!···একদিনে 'কলেরা' তাকে কেড়ে নিলে।"

"তোমার উপর তার টান ছিল?"

"কি আর বোল্‌বো, হুজুর!"—বেচারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে,—"কী সুখেই ছিলুম আমরা! আমি ঘরে ছিলুম না যখন সে স্বর্গে গেল! ফিরে এসে শুনলুম, লোকে তাকে কবর দিয়েছে। রাত তখন শেষ হ'য়ে এসেছে। কবরের কাছে গিয়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালুম, আস্তে আস্তে ডাকলুম, "আমিনা! ও আমিনা!" উত্তর নেই; শুধুই শুনলুম ঝিঁঝিঁর ডাক। কাঁদতে কাঁদতে হাত দিয়ে মাটিতে ঘা মারতে লাগ্‌লুম। বললুম, "রাক্ষুসী মা! তাকে তুমি গিলে খেয়েছ···আমাকেও খাও!"

হঠাৎ ক্ষীণ স্বরে সে ব'লে উঠল, 'আমিনা।' চেয়ে দেখি—লাগাম তার হাতের মধ্যেই, জামার হাতায় সে চোখের জল মুছ্‌ছে। তারপর শুধুই ঘাড় নাড়লে, আর একটিও কথা বললে না।

গাড়ি হ'তে নাম্‌বার সময় তার ভাড়ার উপর আরো কিছু বেশী দিলুম। চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে সে সেলাম করলে আমায়। নির্জ্জন জনশূন্য পথ—মাঘ মাসের ধূসর কুয়াসায় আচ্ছন্ন, শিশিরসিক্ত। তার উপর দিয়ে সে চ'লে গেল গাড়ি চালিয়ে ধীর মন্থর গতিতে।*

শ্রীমমতা মিত্র

* টুর্গেনিভ

রাঁচি—প্রাচীন ও আধুনিক

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-ইডি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

উরাঁও, মুণ্ডা প্রভৃতি অনার্য্যেরা যখন ঝাড়খণ্ডে আসে তখন তাহারা যে নিতান্ত অসভ্য ছিল না, বরং অনেক বিষয়ে আর্য্যদিগের সমকক্ষ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু এ অঞ্চলে আসিবার পূর্ব্বে তাহারা কোথায় কিরূপভাবে ও কি নামে বাস করিত, তখন তাহাদের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। তবে প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থাদিতে এবং তাহাদের জাতীয়-কাহিনী ও কিংবদন্তী হইতে, অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যাহা জানা যায়, এ স্থানে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

ইহাদের মধ্যে মুণ্ডা, সাবর, অসুর, হো, সাঁওতাল প্রভৃতি প্রথমে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে আসে। কিন্তু প্রাচীনকালে এই সকল জাতি হয় ত বিভিন্নশাখায় বিভক্ত ছিল না—একই নামে অভিহিত হইত। উরাঁও জাতির নাম কুরুখ ছিল। ছোটনাগপুরে আসিবার পর যদিও উপরোক্ত সমস্ত জাতির ভাগ্যস্রোত একই দিকে প্রবাহিত হইয়াছে—যদিও একের উপরের অত্যাচার সকলকে উৎপীড়িত করিয়াছে—একের উন্নতিতে সকলে উন্নতিলাভ করিয়াছে—তথাপি পূর্ব্বের ইতিহাস মুণ্ডা প্রভৃতি কোলজাতির এবং উরাঁও প্রভৃতি দ্রাবিড়জাতির এক ছিল না। এই জন্য এই উভয় জাতির ছোটনাগপুর আসিবার পূর্ব্বের অবস্থা পৃথক পৃথক বর্ণনা করাই উচিত মনে করি।

যদিও আজ এই হতভাগ্য জাতি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাতে জর্জ্জরিত, যদিও আজ, সমস্ত দিন ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমের পরও উদর পূর্ণ করিয়া আহার করা ইহাদের ভাগ্যে ঘটে না—বিলাসের কথা দূরে থাকুক পরিধানের বস্ত্রের পর্য্যন্তও ইহাদের অভাব,—তবুও একথা সত্য যে চিরদিন ইহাদের এ দুর্দ্দিন ছিল না এবং চিরদিন থাকিবেও না। ইহাদের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের প্রধান কারণ ইহাদের সরলতা ও অন্ধ-বিশ্বাস। আর্য্য-অত্যাচারের পীড়নে ইহাদের বক্ষনিঃসৃত রক্তে ইহাদের ইতিহাস যতই রাঙা হইয়াছে, আর্য্য-ইতিহাস ততই কলঙ্ককালিমায় মসীকৃষ্ণ হইয়াছে।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিয়ায় যদিও মুণ্ডাদিগকে দ্রাবিড়-শ্রেণীর মধ্যে ফেলা হইয়াছে—মুণ্ডারা যে দ্রাবিড় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই। বরং ইহারা যে দ্রাবিড় নয়—হো, সাবর, সাঁওতাল প্রভৃতির মত কোল-শ্রেণীর সেই কথাই অধিকতর বিশ্বাস্য। ইতিহাসকারগণ ভারতীয় অনার্য্যদিগকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—কোল ও দ্রাবিড়।

Peter Schmidt যে সকল ভাষাকে Austric নামক এক বিরাট শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন—তাঁহার মতে তাহার দুইটি প্রধান শাখা আছে। প্রথম, Austronesian—Indonesian, Melanesian, Polynesian প্রভৃতি ভাষা যাহার অন্তর্গত; দ্বিতীয়, Austro Asiatic—Mankhmer, Wa, Palaung Nicolearese, Khasi প্রভৃতি যাহার অন্তর্গত। মুণ্ডা, হো, অসুর প্রভৃতির ভাষার সহিত শেষোক্ত ভাষার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে—কিন্তু তামিল, তেলেগু, কুরুখ প্রভৃতি দ্রাবিড়-শ্রেণীর ভাষার সহিত এই ভাষা (Austro Asiatic) বা অন্য কোন মৌলিক-শ্রেণীর ভাষার সৌসাদৃশ্য নাই। 'উরাঁও' ও 'মুণ্ডা' দিগের ভাষার মধ্যেও কোনও সৌসাদৃশ্য নাই, যদিও আকৃতিগত সাদৃশ্যের অভাব নাই।

এই আকৃতিগত বৈষম্যের অভাবের এই কারণ মনে হয়, যে, অসংখ্য বৎসর ধরিয়া একই স্থানে একই পারি-পার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করিয়া এবং বিবাহাদিরও হয় ত আদান-প্রদান হওয়ায় জাতিগত আকৃতির পার্থক্য

ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। ভাষা এক হইয়া যাইবার বা এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার বহুসংখ্যক কথা চলিয়া আসিবার কারণ সভ্যতায় একজাতির শ্রেষ্ঠতা বা এক জাতির অপর জাতির উপর আধিপত্য। দ্রাবিড় ও কোল জাতি হয় ত সভ্যতা হিসাবে একটি অন্যের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না।

দ্রাবিড়-শ্রেণীর ভাষার সহিত বেলুচিস্থানএর নিকটবর্ত্তী ব্রাহুই জাতির ভাষার ঐক্য দেখিয়া এবং উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের মঙ্গোল-শ্রেণীর কোনও কোনও জাতির ভাষার সহিত কোল-শ্রেণীর ভাষার ঐক্য দেখিয়া অনেকে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে দ্রাবিড়েরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া এবং কোলেরা উত্তর-পূর্ব্ব দিক দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। Keane প্রমুখ আধুনিক ইতিহাসকারগণেরও মত—এটা তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ ও কারণ যাহাই হউক—ভারতের বাহিরে দ্রাবিড়জাতির সমশ্রেণীর ভাষা আজও বিশেষ আবিষ্কার হয় নাই। তাহাদের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির সহিত বাহিরের কোনও জাতির রীতিনীতি প্রভৃতির এতটা ঐক্য পাওয়া যায় নাই যে নিশ্চয় করা যায়, ইহাদের সমান-শ্রেণীর লোক ভারতের বাহিরে বর্ত্তমান এবং ভারতের বাহির হইতে ইহারা ভারতে আসিয়াছে। বরং দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বত ও আরণ্য অঞ্চলে মানবের আদিম আবাসের যে সমস্ত চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে দাক্ষিণাত্যই এই দ্রাবিড়জাতির আদি বাসস্থান। এই দ্রাবিড়জাতি ভারতের বিভিন্ন অংশে অভিযানের সময় একদল উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাস আরম্ভ করে ইহা মনে করাও অন্যায় হয় না।

আবার মঙ্গোল-শ্রেণীর জাতিগুলির সহিত মুণ্ডা প্রভৃতি কোল শ্রেণীর জাতির ঐক্য অপেক্ষা বৈষম্য এতই অধিক যে ইহারা যে মঙ্গোলদের জাতি, একথা সম্ভব মনে করা যায় না।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ভারতবর্ষ বহু প্রাচীনকালে উত্তর-এশিয়া হইতে সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। এদিকে পশ্চিম-দক্ষিণে মাদাগাস্কার ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে মালয়, ফিলিপাইন্‌ ও অষ্ট্রেলিয়ান দ্বীপসমূহের সহিত স্থলরাশি দ্বারাই সংযুক্ত ছিল। আবার মুণ্ডা প্রভৃতি কোল জাতিগুলির সহিত ফিলিপাইন, মালয় প্রভৃতি স্থানের আদিম জাতিগুলির শুধু যে ভাষারই ঐক্য আছে তাহা নহে, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতিতেও ঐক্য পাওয়া যায়।

মুণ্ডা, অসুর প্রভৃতির কিংবদন্তী হিসাবে তাহাদের আদি বাসস্থান কোন বনসমাকীর্ণ বৃহৎ পর্ব্বতমালার নিম্নে ছিল। আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে বিন্ধ্য ও কাইমুর পর্ব্বতশ্রেণী দিয়া বর্ত্তমান সরগুজা পর্য্যন্ত যে সকল অরণ্যসমাকীর্ণ স্থান বিস্তৃত তাহাতে মানবগণের প্রাচীনতম চিহ্ন এবং স্থানে স্থানে কোল শ্রেণীর লোকের বাস আজও পাওয়া যায়। যদি নিকোবার, ফিলিপাইন প্রভৃতি স্থানের আদিম জাতির ও মুণ্ডা প্রভৃতির আদিম পূর্ব্ব-পুরুষ একই হয় তাহা হইলে ইহা মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়, যে, এই আদিম জাতি আরাবল্লী হইতে সরগুজা পর্য্যন্ত স্থানসমূহে বাস করিত। পরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, অথবা অন্য যে কারণে হউক, এই জাতির ভিন্ন-ভিন্ন দল বিভিন্ন সময়ে ভিন্নদিকে যাত্রা করে এবং এই অভিযানের মধ্যে ঐসকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং পরে মঙ্গোলজাতির সহিত সংমিশ্রণ হয়।

এইরূপ অনুমানের আরও একটি কারণ এই, যে, কোলদের কিংবদন্তী হিসাবে তাহারা প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগে আজিমগড় অঞ্চলে থাকিত। আজিমগড় জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশের আরণ্যপ্রদেশে চেরো, সেওরি, কোল, খারওয়ার প্রভৃতি কোলজাতির বাস আজও পাওয়া যায়।

যাহা হউক, এই কোলজাতির আদিম আবাসভূমি সম্বন্ধে স্থিরনির্ণয় কিছু করা যায় না। যাহা কিছু বলা যায়, সমস্তই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া। এমন কি, ভারতবর্ষেরই বিভিন্ন স্থানে অভিযান সম্বন্ধেও সঠিক কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে যদিও প্রাচীনকালে তাহাদের ভাগ্যবিপর্য্যয়, সুখদুঃখ ইত্যাদির কাহিনী কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত, তথাপি একথা বোধ হয় সত্য, যে, আর্য্যদিগের ভারতবর্ষ-আগমনের পূর্ব্বে এই-জাতিরই পূর্ব্বপুরুষেরা এ দেশে অপ্রতিহত প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিল। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া ইহাদের সহিত

যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং ইহাদেরই অধিকৃত দেশ জয় করিয়া আপনাদের রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

মুণ্ডাদিগের জাতীয় কাহিনীতে ইহারা বলে যে প্রথমে তাহারা "একাশী বিদি তিরাশী বাদি" নামক স্থানে বাস করিত। (ক) এইস্থানের সঠিক নির্ণয় না হইলেও (অনেকের অনুমান এইস্থান রাঁচি জেলারই "আকাশী" নামক গ্রাম) একাশী ও তিরাশী এই দুই শব্দ হইতে মনে হয় যে, এই গল্পটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, কারণ এই শব্দেরই উৎপত্তি সংস্কৃত হইতে—সুতরাং এই গল্প ইহাদের আর্য্য-সংস্পর্শে আসিবার অনেক পরে রচিত হইয়াছে। অন্য একটি গল্পে "সিয়া সান্দিবির" এর বিস্তৃত অরণ্যসমাকুল অঞ্চলে তাহাদের প্রথম বাসস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। আরও একটি গল্পে তাহারা বলে যে আজিমগড় বা আজম-গড় নামক স্থান সৃষ্টির প্রারম্ভে সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হয়, এবং এইস্থানে ইহাদের প্রধান দেবতা 'সিঙ্গবোঙ্গা' (খ) এই জাতির প্রথম জনক-জননীকে সৃষ্টি করেন। এ গল্পও মনে হয় আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আগমনের পর রচিত হয়।

তবে "একাশী বিদি তিরাশী বাদি" "সিয়া সিন্দিবির" প্রভৃতি এবং "আজিমগড়" প্রভৃতির উল্লেখ হইতে আরাবল্লী ও বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণীর অধিত্যকায় বহু প্রাচীনকালে হয় ত ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান ছিল, এই মতের সমর্থন করা যায়। এখনও গাজিপুর, মির্জ্জাপুর, আজিমগড় এবং গঙ্গানদীর দক্ষিণভাগের উপত্যকার প্রায় সর্ব্বত্রই প্রস্তর-যুগের চিহ্ন বর্ত্তমান। Mr. Cockburn বলেন—All along the Gangetic valley in the wilder alluvian fringing the Vindhyas and Kymores and as far south of these hills, as I have seen, in Sargooja and Rewa, the soil teems with fragmentary remains of ancient stone-weapons. (গ)

এই সমস্ত কারণে এবং এই সকল অস্ত্রশস্ত্রাদির সহিত যে-সকল প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র 'অসুর', 'মুণ্ডা', "সাঁওতাল" প্রভৃতি জাতির কাহারও কাহারও বাটীতে পাওয়া যায় তাহাদের তুলনা করিলে মনে হয়, যে, উপরোক্ত অঞ্চলই ইহাদের আদিম বাসস্থান না হইলেও অতিপ্রাচীন আবাসভূমি। এইস্থান হইতেই তাহাদের দল উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তর-ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল। পরে যখন আর্য্যেরা এখানে আসিতে আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও তাঁহাদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ইহারা পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে বাধ্য হয়।

আর্য্যদিগের সহিত সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহাদির কথা প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে ও ইহাদের কিংবদন্তীতে পাওয়া যায়। আর্য্যেরা এখানে আসিবার পূর্ব্বে যে ইহারা এখানে ছিল এবং আর্য্যেরা এখানে আসিবার পরও যে ইহাদের বিশাল রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যসম্ভার ছিল, তাহার প্রমাণও পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে বর্ত্তমান। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে যে কৃষ্ণকায় অসুরেরা দেবতাদিগের জন্মের পূর্ব্বে ব্রহ্মার উরুদেশ হইতে জন্মগ্রহণ করে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে যে অসুরেরা দেবতাদিগের অগ্রজ। Muir প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, উপনিষদে উল্লিখিত আছে, যে, যখন দেবতাদের অধিকৃত রাজ্য সামান্যমাত্র ছিল (বসিয়া থাকিলে চতুর্দ্দিকে যতটা দৃষ্টি যায় ততখানি), তখন অসুরদের রাজত্ব পৃথিবীব্যাপী ছিল; এবং ইহার অর্থ এই যে প্রথমে ভারতবর্ষ কৃষ্ণকায় অনার্য্যদিগের অধিকারে ছিল এবং আর্য্যেরা ভারতবর্ষের কিয়দংশমাত্র অধিকার করিলেও অধিকাংশ অনার্য্যদিগের অধিকারে ছিল। জার্ম্মান পণ্ডিত Weber বলেন যে প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থের দেবতা ও অসুর অর্থে আর্য্য ও অনার্য্য-জাতি। এখনও রাঁচিতে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত এক জাতি বাস করে যাহাদের নাম অসুর। এবং ইহারা মুণ্ডাদিগেরই জ্ঞাতি।

বস্তুতঃ, প্রাচীন আর্য্যেরা যে সমস্ত জাতিকে দস্যু, রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন তাহারা কৃষ্ণকায় কোলজাতীয় অনার্য্য ব্যতীত আর কেহই নহে। ঋগ্বেদের "ত্বচম্‌কৃষ্ণম্‌" "ঘোর চাক্ষস"

(ক) "একাশী বিদি তিরাশী বাদি"র অর্থ—একাশী মালভূমি ও তিরাশী ধান্যক্ষেত্র-যুক্ত স্থান।

(খ) "সিঙ্গবোঙ্গা" অর্থে—সূর্য্য-মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল প্রভৃতি কোলজাতির ঈশ্বর বা প্রাচীন দেবতা।

(গ) Journal of Asiatic society of Bengal.

"বিসিপ্র" "বৃদ্ধ্বচ্" প্রভৃতি বিশেষণে এই জাতিরই পূর্ব্বপুরুষেরা অভিহিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ের সংস্কৃত-গ্রন্থেও (যথা রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি) অনার্য্য-জাতিকে রাক্ষস, বানর, ঋক্ষ প্রভৃতি ঘৃণাসূচক আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে।

ভাগবত-পুরাণে, কোলজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—যখন রাজা বেনের পাপের পরিমাণ সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল, তখন ঋষিরা তাঁহাকে পাপমার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য সৎবুদ্ধি দিতে আসিলে তিনি ঋষিদিগকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দেন। তাহাতে অঙ্গিরা ঋষি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া তাঁহার উভয় হস্ত মন্থনদণ্ডে পরিণত করেন। দক্ষিণ হস্ত হইতে খর্ব্বকায় কৃষ্ণবর্ণ নিষাদের এবং বাম হাত হইতে 'ভুবহস্তার,' "কোল্ল" ও "ভিল্ল" নামক তিনজনের জন্ম হয়। ইহারাই অনার্য্যদিগের প্রথম পূর্ব্বপুরুষ—

প্রথমো ভুবহস্তারং দ্বিতীয়কোল্লমেবচ
তৃতীয়ো ভিল্ল সংখ্যাত মিতোতে উদাহৃতাঃ। (ক)

যদিও এইসকল আখ্যানের ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ কিছুই নাই তথাপি ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে আর্য্যেরা ইহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না বরং ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন এবং ইহাদের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধাদি ও হয়।

যদিও কালক্রমে অসুর বা অনার্য্যজাতিরা আর্য্যগণ-কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া অরণ্য ও পর্ব্বতসমাকুল স্থানসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, ইহাদের পরাক্রম ও অস্ত্রের সম্মুখে আর্য্য-শৌর্য্যকেও অনেক সময় স্তিমিত ও ম্লান হইতে হইয়াছিল। ইহাদের হস্তে আর্য্যগণের লাঞ্ছনাও মাঝে-মাঝে হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের "কোলাবিধ্বংসিনাঃ" (খ) অর্থাৎ এই শূকরখাদকগণের হস্তে রাজা সুরথের পরাজয় ও লাঞ্ছনা,—মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে বর্ণিত অসুরগণের সহিত দেবতাদিগের সংগ্রামে দেবতাদিগের পরাজয় ও অপমান,—ঋগ্বেদ কথিত দেবাসুর-সংগ্রামে দেবতাদিগের বার বার পরাজয়,—বলীর হস্তে ইন্দ্রের নির্য্যাতন, এই সমস্ত হইতে বুঝা যায় যে আর্য্যদিগকেও বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিতে হয় এবং অনার্য্যদিগকে জয় করিতে হয়।

মুণ্ডাদিগের ও অসুরদিগের জাতীয় কাহিনী হইতে জানা যায় যে বহু প্রাচীনকালে ইহাদের সহিত আর্য্যদিগের পরুনদের তীরে এক ভীষণ সংগ্রাম হয়। ঋগ্বেদ-সংহিতাতেও আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে অনেক যুদ্ধবিগ্রহাদির উল্লেখ আছে। অনার্য্য যোদ্ধা-দিগের যে-সকল নামের তাহাতে উল্লেখ আছে সেই-সকল নামের সহিত এখনকার মুণ্ডাদিগের অনেক নামের এত সাদৃশ্য আছে, যে মনে হয়, যে বেদ পুরাণের অসুরেরা ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ। (গ)

মহাভারতের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধেও মুণ্ডারা বোধ হয় যোগদান করিয়াছিল। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কৌরব-বাহিনীর বর্ণনায় বলিতেছেন যে, বৃহদ্বলের ব্যূহের মধ্যে মুণ্ডা, করুষ, বিকুঞ্জ প্রভৃতি সৈন্যদল বামপার্শ্বে অবস্থিত। আবার ভীষ্মপর্ব্বে পাণ্ডবসেনাপতি সাত্যকি বলিতেছেন—

মুণ্ডানেতান্ হনিষ্যামি দানবানিব বাসবঃ।

অর্থাৎ ইন্দ্র যেরূপ দানবদলকে বধ করিয়াছেন সেইরূপ এই মুণ্ডাগণকে আমি বধ করিব। এই মুণ্ডারা যে আমাদের সময়কার এই মুণ্ডাদিগের পূর্ব্বপুরুষ নয় সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

এইসমস্ত গল্পের মধ্যে যতটুকুই সত্য থাকুক না কেন, একথা মানিয়া লইতে পারা যায় যে আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার সময়ে এই সকল মুণ্ডা, অসুর প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বাস করিত এবং আর্য্যগণকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে বাধ্য হয়।

(ক) Vide Rai Bahadur Sarat Chandra Roy's "Mundas and their Country, 84-35.

(খ) কোলাবিধ্বংসিনা—শূকর-বধকারী, অর্থাৎ যাহারা শূকর খায়। Herr Jelinghausএর মতে ইহারা কোলজাতীয়।

(গ) ঋগ্বেদ-সংহিতার সম্বর, কুশক, অহিস্থর, বলী প্রভৃতির সহিত মুণ্ডাদিগের মুন্ধার, কুয়ার, আসিবা, বলিয়া প্রভৃতি নামের সাদৃশ্য দ্রষ্টব্য।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

খুঁজে দেখা পাইনি যাহার, পরাণ তবু আছে বলে।
করুণ সুরের মালাখানি পরিয়ে দেব তারি গলে।
কে আমারে জোছনা রাতে,
জাগালো গো ফুলের সাথে,
কার সাথে মোর প্রাণের কথা হ'ল নীরব আঁখিজলে।
সুখে দুখে আমার বুকে শুনি কাহার চরণধ্বনি,
জীবন ভ'রে আকুল করে কেগো আমার দিনরজনী,—
শিহর-লাগা অনুরাগে
কার লাগি' মোর হৃদয় জাগে,
তার সাথে মোর হবে মিলন চিররাতের তিমির তলে॥

কথা—শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ সুর ও স্বরলিপি—
শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত সুরসাগর

মিশ্র বেহাগ-খাম্বাজ-পাহাড়ী—দাদ্‌রা

```
   +                       ২                                                   ।
I {-া  -া  র্সা   ।   র্সা  র্সা  র্সর্রা  I   র্সধা  -র্সা  ণধা   ।   ধপা  পা  -া   I
  { ০   ০   খুঁ        জে   দে   খা ০        পা    ই    নি ০        যা ০  হা   র

[ পধা  গপা  -ধর্সা  ।  -ণধা  পা  মা  I  গা  মগা  গরা   ।   রসা  -া  -া  I
  প ০  রা ০  ০ ০      ০ ণ্   ত   বু     আ   ছে ০  ব ০        লে   ০   ০

  সরা  -গপা  গা  ।  গরা  রসা  -া }  I  { -া  -া  সা   ।   রা  রমা  মা  I
  আ ০  ০ ০   ছে     ব ০   লে   ০ }     {  ০   ০   ক        রুণ্  সু ০  রের্
```

I মপা পা ণধা । পঞ্জা -পা -া I (রমা রমা -পধা । পমা মরা -সা) } I
মা • লা খা • নি • • • মা • লা • • • খা নি •

I -া -া মমা । পা পনা ধনা I নর্সা ধনর্সা র্সা । নর্সরা -র্সনর্সা I
• • পরি রে দে ব তা • রি • • গ লে • • • • • •

I -া -া পপা । ধা র্সা র্রা I র্সরা র্সর্রগা র্গা । র্সণা -া -ধপা I
• • পরি রে দে ব তা • রি • • গ লে • • •

I পধা গপা -ধর্সা । -ণধা পা মা I গা মগা গরা । রসা -া -া I
প • রা • • • • প্ ত বু আ ছে • ব • লে • •

I { সরা -গপা গা । গরা রসা -া I (সরা -গপা -ধপা । -গমা -গরা -সা) } II
আ • • • ছে ব • লে • আ • • • • • • • • • •

\+ ২
II { -া -া গা । মা পনা ধনা I না না না । না -পা না I
• • কে আ মা • রে জো ছ না রা • তে

I -া -া পনা । না নর্সা র্সা I র্সা র্সা র্গরা । র্রর্সা র্সা -া I
• • কে • আ মা • রে জো ছ না • রা • তে •

I (র্সনা -পনা -র্সরা । -র্সনা -ধপা -ঞ্জপা I -গমা -নধা -পঞ্জা । -গমা -গরা -সা) } I
আ •

I -া -া না । না না র্সা I না র্সনা -ধপা । ধা পা -া :
• • জা গা লো গো ফু লে • • র্ সা থে •

I (গমা -পধা -নমা । -ধর্সা -নধা -পধা I -গমা -পধা -নমা । -ধর্সা -নধা -পা) :
এ •

I -া -া পা । ধপা মগা মা I ধা ধা -া । ধণা পধা র্সণা I
॰ ॰ কার্ সা ॰ থে মোর্ প্রা ণে র্ ক ॰ থা ॰ ॰ ॰

I -ধা -ণা ধপা । ধপা মগা মা I পা পা -া । ণধা পক্ষা -পা I
॰ ॰ কার্ সা ॰ থে মোর্ প্রা ণে র্ ক ॰ থা ॰ ॰

I -া -া পা । পধা ধর্সা র্সা I র্সরা র্রগা র্গা । র্সণা -া ধপা I
॰ ॰ হো ল নী রব্ আঁ ॰ খি ॰ জ লে ॰ ॰ ॰

I পধা গপা -ধর্সা । -ণধা পা মা I গা মগা গরা । রসা -া -া I
প ॰ রা ॰ ॰ ॰ ॰ ণ্ ত বু আ ছে ॰ ব ॰ লে ॰ ॰

I { সরা -গপা গা । গরা রসা -া I (সরা -মপা -ধণা । -ধপা -মগা -রসা) } II
আ ॰ ॰ ॰ ছে ব ॰ লে ॰ আ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

\+ ২
II { -া -া পা । পা পা পা I -ক্ষা ধপা ক্ষগা । গমা গা -া I
॰ ॰ সু খে দু খে আ মা ॰ ॰ র্ বু কে ॰

I -া -া সা । সধা সা সরা I গা সরা -গপা । পক্ষা ধপা -ক্ষপা } I
॰ ॰ শু নি কা কার্ চ র ॰ ॰ ণ্ ধ্ব ॰ নি ॰ ॰ ॰

I -া -া সা । সা গা মা I পা পনা -া । না ধর্সা -নধা I
॰ ॰ জী বন্ ভ রে আ কু ল্ ক রে ॰ ॰ ॰

I পা -া পা । পা ক্ষা পা I ধপা -ক্ষগা গা । গমা গা -া I
॰ ॰ কে গো আ মার্ দি ॰ ॰ ন্ র জ নী ॰

I (গপা -মপা -গমা । -গরা -সা -া I -সরা -গগা -রগা । -পা -া -া) I
ই ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I { -া -া গা । মা পনা ধনা I না না না । -ণা না -া I
॰ ॰ শি হর্ লা ॰ গা অ ঙ্গ রা ॰ গে ॰

I -া -া -পা । পনা নর্সা র্সা I র্সা র্সা র্গা । র্রর্সা র্সা -া I
০ ০ শি হর্ না ০ গা অ মু ০ রা ০ গে ০

I (নর্সা -নধা -পা । -মা -া -া I -গমা -পধা -নর্সা । -ধর্সা -নধা -পধা I
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -ধর্সা -া -া । -পধা -র্সর্রা -র্গর্গা I -র্রর্গা -র্গর্রা -র্সনা । -র্সা -া -া)} I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া না । না না র্সা I না র্সনা -ধপা । ধা পা -া I
০ ০ কার্ লা গি মোর্ হৃ দ ০ ০ য়্ জা গে ০

I -া -া -ণধা । -পা -া -া I -া -া পা । ধপা মগা মা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তার্ সা ০ থে মোর্

I ধা ধা -া । ধণা পধা -র্সণা I -ধা -ণা ধপা । ধপা মগা মা I
হ বে ০ মি ০ ল ০ ০ ০ ০ ন্ তার্ সা ০ থে মোর্

I পা পা -া । ণধা পর্সা পা I -া -া পা । পধা ধর্সা র্সা I
হ বে ০ মি ০ ল ০ ন্ ০ ০ চি র ০ রা তের্

I র্সর্রা র্রর্গা র্গা । র্সণা -া -ধপা I পধা গপা -ধর্সা । -ণধা পা মা I
তি ০ মির্ ত লে ০ ০ ০ প ০ রা ০ ০ ০ ০ ণ্ ডঁ বু

I গা মগা গরা । সা -া -া I I {সরা -গপা গা । গরা সা -া I
আ ছে ০ ব ০ লে ০ ০ আ ০ ০ ০ ছে ব ০ লে ০}

I (সরা -গপা -ধর্সা । -র্রর্গা -র্রর্সা -ধপা I -ধণা -ধপা -মপা । -ধপা -মগা -রসা)} II II
আ ০

[এই গানটির সুর রচনা বিষয়ে হিমাংশুবাবু উচ্চ কলা-রুচির পরিচয় দিয়াছেন। সঙ্গীত-প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ এই গানটির সুমধুর সুরে বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। এ গানটির স্বরলিপির মধ্যে তানগুলি ব্র্যাকেট দিয়া পৃথক দেখান আছে। নূতন শিক্ষার্থীগণের পক্ষে গানটি উদ্ধার করিবার সময়ে প্রথমে তানগুলি বাদ দিলে গানটি আয়ত্ত করা সহজ হইবে। বিঃ সঃ]

যবনিকা

—গল্প— —শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

— এক —

কাটাকুটিতে আমার 'নার্ভ' দেখে সহযোগীরা তারিফ করে। কোমল অঙ্গের কোমলতম স্থানে নির্ম্মমভাবে ছুরি চালাতে অন্যের যখন বাধে আমি তখন এগুই। কোন অবস্থাতেই শিথিল কুণ্ঠা মনের মধ্যে আশ্রয় পায় না। জাহাজ যেমন কোরে সুমুখের জলরাশিকে দুভাগ ক'রে কেটে চ'লে যায় তেমনি ক'রে আমার ধারালো ছুরি যখন দেহের মাংসের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলে তখন একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-শিহরণ অনুভব করি।

বন্ধুদের বিস্মিত দৃষ্টিকে মথিত ক'রে বলি—জীবনে এই নিষ্ঠুরতাই সত্যি! দয়া-ধর্ম্ম, প্রেম-স্নেহ, মায়া-মমতা—মিথ্যা, 'মিরাজ'!

বাসী বিকলাঙ্গ শবদেহ, সার্জ্জারির সরঞ্জাম আর ডাক্তারি কেতাব—চব্বিশঘণ্টার ভিতর খাওয়া আর ঘুমটুকু ছাড়া সব সময়টুকু এদের সঙ্গেই কাটে।

অতীত, ভবিষ্যৎ আর ঈশ্বর—কারুকেই কোনদিন ভাবি না, বিশ্বাসও করি না। প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানের বুকের উপর দিয়েই আমার জীবনের রথ চালাই।

বন্ধুরা আমাকে নির্ম্মম 'রিয়ালিষ্ট' ব'লে বিদ্রূপ করে। আমি গর্ব্ব অনুভব করি।

সেদিন ছিলাম—accident wardএ। বছর দশেকের হিন্দুস্থানী ছেলেটার পিঠের ওপর দিয়ে কোন বড়লোকের "আর—আর"-এর একখানা চাকা চ'লে গেছে, আর-একখানা হাঁটুর ওপর দিয়ে।

যে attend করছিল সে বল্লে—operation করলে বাঁচতে পারে; হাঁটুর চোট্-টা তত নয়।

ছেলেটার মা বাইরে থেকে করুণ-কণ্ঠে বলছিল—ওগো, এর ওপর আর ওকে কাটাকুটি কোরো না গো; আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও···।

একজন দরোয়ান তাকে আটকে রেখেছিল—পাছে ঘরে ঢুকে পড়ে।

দরওয়ানকে বল্লাম—আওরাৎকো বাহার লে যাও। Assistantকে বল্লাম—ব্যাগটা।

ছেলেটা অজ্ঞান হ'য়েই ছিল; chloroformএর প্রয়োজন হ'ল না।

অপারেশান সাক্‌সেসফুল হ'লো কিন্তু তার জ্ঞান আর ফিরল না।

বল্লাম—বডিটা ডিসেক্‌শান-রুম-এ পাঠিয়ে দাও, আর প্যাথলজিকাল ডিপার্টমেন্ট-এর আর্টিষ্ট সুশীল ভট্‌চায্‌কে খবর দাও—spinal cord-এর টুইষ্টেড অবস্থাটার একটা ছবি নিতে হবে।

বাইরে মাঠের ওপর প'ড়ে হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটা তখনও কাতরাচ্ছিল—ওগো আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও গো, ফিরিয়ে দাও······।

তার কাছে গিয়ে বল্লাম—তোর ছেলে আর ফিরবে না। যা, ঘরে যা; কেঁদে কি হবে।

আমাকে দেখেই সে একেবারে আমার পায়ের ওপর এসে পড়ল—ডাক্তার বাবু, আমার ছেলে···।

বল্লাম—তার পা কাট্‌তে গিয়ে সে ম'রে গেছে। ঘরে যা; কাঁদিস নি। এই নে।

নোট-শুদ্ধ আমার হাতখানাকে সরিয়ে দিয়ে সে বল্লে—কে কাটলে তাকে? আমি যে মানা করেছিলুম!

হেসে বল্লাম—আমি কেটেছিলাম। কাল এসে তার দেহ নিয়ে যাস্।

রমণী এবার একেবারে ক্ষেপে উঠল; অকথ্য ভাষায় আমায় গালাগালি দিতে লাগল; তারপর কাঁদতে কাঁদতে কি বল্লে—বুঝ্‌তে পারলাম না।

আমার ইঙ্গিতে দরওয়ান তাকে ফটকের বাইরে রেখে আসলে তাকে জিজ্ঞেস করলাম—স্ত্রীলোকটা শেষকালে আমাকে কি বল্লে ?

দরওয়ান নির্ভেজাল হিন্দুস্থানীতে আমায় বুঝিয়ে দিলে—ও আমায় এই ব'লে অভিশাপ দিলে যে, আমি আজ তার প্রিয়জনের অঙ্গে ছুরি চালিয়ে তাকে মেরে ফেললাম ; কিন্তু একদিন আসবে যেদিন আমার প্রিয়জনের অসুখের সময় আমি তার অঙ্গে প্রয়োজনসত্ত্বেও ছুরি চালাতে পারবো না এবং তার ফলে সে মরবে।

হুঃ !

—দুই—

একটা বড় 'কল্' পেয়ে কলকাতা ছেড়ে পল্লীগ্রামের জমিদার-বাড়ি এসেছি।

রাত্রে, একলা ছোট্ট বাড়িটার নিরালা ঘরে শুয়ে আছি। নিশুতি রাত ; জনমানবের সাড়া নেই।

বাইরে, ঘন অন্ধকারের বুকে চোখ মেলে তারাগুলো পৃথিবীর দিকে করুণনয়নে চেয়ে আছে। অশ্রান্ত ঝঙ্কারে অশুন্তি ঝিঁঝিঁ তাদের জীবনের কথাই হয় ত স্তব্ধ নিশীথিনীর কানে শুনিয়ে যাচ্ছে। দিগন্তব্যাপী নিরন্ধ্র মৌনতা যেন সুদূর অতীতের কথায় মুখর হ'য়ে উঠেছে !

কিছুতেই ঘুম এলো না। বাইরে ইজি-চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে বসলাম।

ঝিল্লির অবিরাম গুঞ্জনের মত নিজের অন্তরের মধ্যে বিগের অস্পষ্ট ধ্বনি শুনতে পেতে লাগলাম।...জীবনের অতীত কাহিনীগুলো যেন রুদ্ধনিঃশ্বাসে গুন্‌গুনিয়ে চলেছে ; কান পেতে শুনতে লাগ্‌লাম।

মাত্র বছর-দশেক পার হ'য়েছে ;—সময়ের এইটুকু ব্যবধানেই তখনকার জীবন গাঙ্গুলীকে আজ আর চিন্‌তেই পারা যায় না। আজকের সঙ্গে তুলনায় তাকে যেন নিজের আদিম পুরুষ ব'লে মনে হয়। কলকাতার শ্রেষ্ঠ সার্জ্জন ডক্টর গ্যাঙ্গুলীর সঙ্গে অশিক্ষিত গ্রাম্যযুবকের আজ আর কোন সাদৃশ্যই নেই।

সহসা আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাব্‌লাম—শিক্ষার সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে জীবনের অনেক উন্নতিসাধন করেছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে-জিনিষটি হারিয়েছি তারও মূল্য তো বড় অল্প নয়।

যে অমলিন শুভ্র অন্তর যৌবনের প্রারম্ভে একদিন এই পৃথিবীকে এবং তারও চেয়ে এই মাটির মেয়ে জয়ন্তীকে ভালবেসেছিল, সেই নির্ম্মল অন্তর আজ সংসারের কুটিলতার ছলনায় নির্ম্মম, কুৎসিত্‌! জগতে সুন্দরের অস্তিত্ব সে মানে না—সে আজ ছাব্বিশোত্ত 'সিনিক্'।

ধীরে ধীরে পিছনের স্বচ্ছ পরদাখানা স'রে যায়—দর্শকের সম্মুখে সাজানো দৃশ্য সামনে প্রসারিত হ'য়ে নামে।

জমিদারের আদরের কন্যা—জয়ন্তী। হরিণীর মত চঞ্চল, কপোতীর মত খেয়ালী। তারই সঙ্গে নিজের জীবনটা কেমন ক'রে জড়িয়ে গিয়েছিল।

তাদের বাড়ির পিছনে বাগানের মালীদের শূন্য ঘরখানিতে ব'সে সুমুখের পেয়ারাগাছকে সাক্ষী রেখে প্রতিদিন দুজনে প্রতিজ্ঞা করতাম—জীবনে কোনদিন পৃথক থাকবো না ; এই বাগান সংস্কার ক'রে তাকে ফলে-ফুলে সজ্জিত ক'রে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন জীবন এইখানেই যাপন করব।

এমনি কোরেই জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্ক শেষ হ'ল।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমেই যে ব্যক্তি প্রবেশ করল, তার নাম—নরেন। কলকাতার নামজাদা লোকের ছেলে। জয়ন্তীর বাপ আর তার বাপ—পরম বন্ধু। নরেন কখনো পল্লীগ্রাম দেখেনি, তাই বেড়াতে এসেছে। কিন্তু নিছক সেইজন্যেই কি ?

প্রথম থেকেই সে জয়ন্তীর অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠ্‌ল ; নানা বিচিত্র গল্পে তাকে সকল সময় আকৃষ্ট ক'রে রাখতো। বাগানের ঘরখানিতে ব'সে স্তব্ধ দ্বিপ্রহর একাই যাপন

করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে সারা মর্ম্মস্থল কান্নায় উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌ত। সময় সময় নিরালায় পেয়ে জয়ন্তীকে তার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিতাম ; কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌তাম, প্রতিজ্ঞাপালন সম্বন্ধে পূর্ব্বেকার যে দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক নীরব অভিব্যক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে।

তারপর আমার জীবনের চরম দুর্দ্দিন এল—যেদিন নরেনের 'টু-সিটার'খানায় দুজনকে একসঙ্গে দেখ্‌লাম। জয়ন্তীর মুখের কমনীয় দীপ্তি আমায় যেন বজ্রাহত ক'রে দিলে।

যখন তাদের গাড়ীখানা কাদা ছিটিয়ে আমার গা ঘেঁসে চ'লে গেল তখন জয়ন্তীর মুখে গর্ব্ব-মিশ্রিত করুণার যে ছবি ফুটে উঠেছিল—তা কোনদিন ভুলতে পারিনি।

বাবাকে ব'লে, কলকাতায় চ'লে আসবার ব্যবস্থা করলাম।

আগের দিন সহসা জয়ন্তী এসে আমায় আড়ালে ডেকে বল্লে—আজ বিকেলে একবার দেখা করবে? বড্ড দরকার ; এসো লক্ষ্মীটি···!

সারা মন সঙ্গীত-মুখর হ'য়ে উঠ্‌ল ; ও তো হ'লে আজও আমায় তেমনিই—। আনন্দের আবেগে সমস্ত দিন কি যে করব—ভেবে পেলাম না।

বিকেল হ'তে না হ'তেই বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের মিলনের একমাত্র স্থান—সেই শূন্য কুটীরখানি মাসাবধি অবিশ্রান্ত বর্ষার জলে যেন একটি ছোট্ট দ্বীপের মত দেখাচ্ছে। তারই ওপর জয়ন্তী দাঁড়িয়ে—রূপকথার মায়া-কন্যার মত, অপূর্ব্ব-সুন্দর!

কাছাকাছি গিয়ে দেখ্‌লাম—ঘরে যাবার জন্যে জলের ওপর দিয়ে একখানা লম্বা তক্তা পাতা রয়েছে।

তক্তার ওপর দিয়ে দু-চার পা এগিয়েছি, সহসা এক-টানে সে-খানা স'রে গেল ;—নিমেষের মধ্যে আমি সেই কর্দ্দমাক্ত জলের মধ্যে ছিটকে পড়লাম। নিস্তব্ধ বাগান অট্টহাস্যে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

উঠে দেখ্‌লাম—চালার ওপর জয়ন্তী আর নরেন দাঁড়িয়ে। ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম—একটা লোক আমার দুর্দ্দশা দেখে মুখ বিকৃত ক'রে হাসছে ; তার হাতের দড়িটার সঙ্গে তক্তাখানা বাঁধা। জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে উন্মাদের মত চীৎকার ক'রে কি যেন ব'লে উঠ্‌লাম।

ছবিটা মনে হ'লে আজও আমার দেহের শিরা-উপশিরায় রক্ত-স্রোত উত্তাল হ'য়ে ওঠে—মনকে বিকল ক'রে দেয়।

—তিন—

দিনকয়েক পরের কথা।

সেদিন সকালে তিন বন্ধুতে ব'সে গল্প করছিলাম। একজন লোক সহসা ব্যস্তভাবে ঘরে এসে ঢুকল।

—আপনারই নাম······?

বল্লাম—হাঁ, তাই।

—আপনাকে এখুনি একবার আসতে হবে আমার সঙ্গে। মোটর তৈরী ; বড্ড সিরিয়াস কেস।

বল্লাম—আমায় এখুনি একজন সাহেবের সঙ্গে কন্‌সাল্‌টেশনে যেতে হবে। নরেশ, তুই যা।

লোকটা বল্লে—আজ্ঞে না, বাবু আপনাকেই······।

—অসুখ কি তাঁর নিজের?

—না, তাঁর স্ত্রীর অসুখ।

নরেশ প্রশ্ন করলে—অসুখটা কি বলতে পারেন?

—তা ঠিক জানি না। তবে গলার ভেতরকার শির সব ফুলে উঠেছে ; কিছু খেতে পার্চ্ছেন না ; আজ দুদিন কথা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

গম্ভীরভাবে বল্লাম—বুঝেছি ; "Celebral tumours with strangulated ganglia"।

লোকটা বুঝতে পারলে না, কিন্তু নরেশ হেসে ফেল্লে। ভাব-প্রবণ বিকাশ তাড়া দিয়ে উঠ্‌ল—Don't be silly, Jib ; case serious ; বোধ হয় অপারেশান করতে হবে। হারি আপ্‌!

প্রকাণ্ড বাড়িখানার ফটকের মধ্যে যখন গাড়ি এসে ঢুক্‌লো তখন রোগীর সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকলেও যে মোটা ফি-টার চুক্তি ক'রে গাড়িতে পা দিয়েছিলাম তার আদায় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত রইলাম।

হলটা পার হ'তেই গৃহস্বামী ওধারের পরদা ঠেলে বেরিয়ে এলেন।

চোখোচোখি হ'তে দু'জনেরই গতি রুদ্ধ হ'য়ে গেল। মনের ভাব মুখে ফুটে উঠেছিল কিনা বলতে পারি না; কিন্তু নিমেষ মাত্র······

তারপরই তিনি মুখে খানিকটা হাসির আভাস ফুটিয়ে তুলে বল্লেন—আপনি! আমি কিন্তু কতকটা কতকটা আন্দাজ করেছিলাম 'আপনার নাম শুনে'।

আমিও মুখটা হাসবার মত ক'রে বল্লাম—আপনার নাম আগে তো শুনিনি, কাজেই I am surprised...।

কর-মর্দ্দনের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ-যুগ-সঞ্চিত শত্রুতার গ্লানি তিনি আপোষে মিটিয়ে নিতে চাইলেন।

প্রশ্ন করলাম—জয়ন্তীর অসুখ?

—হাঁ।

—কতদিন?

উত্তরে জানলাম—অল্প-বিস্তর অসুখ বিবাহের পর থেকেই; এটা হ'য়েছে দিন-পনেরো! ডাক্তার রায় বলেছেন—অপারেশান করলে বাঁচতে পারে!

রুগীর ঘরের দরজায় পা দিয়ে বুকটা কেঁপে উঠেছিল—মুহূর্ত্তের জন্ম!

জয়ন্তীর শীর্ণ দেহ বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে; চোখদুটি মুদ্রিত—বোধ করি এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। অনাবৃত মুখের ওপর রোগ-যন্ত্রণার নিবিড় অবসাদ—যেন একগোছা পুষ্পিত রজনীগন্ধা মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের নিষ্ঠুর উত্তাপে শীর্ণ শুষ্ক হ'য়ে গেছে!

নরেন তার মাথার শিয়রে ব'সে ডাকলে—জয়ন্তী, ডাক্তার বাবু এসেছেন।

জয়ন্তীর মুখের ওপর বিরক্তির কুঞ্চিত আভাস ফুটে উঠ্‌ল; ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলে।

তারপরেই অতর্কিত বিস্ময়ে তার চোখের বিহ্বল দৃষ্টি যেন নিস্পন্দ হ'য়ে গেল; পাণ্ডুর মুখের ওপর দিয়ে ক্ষণেকের জন্য একটা প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস ব'য়ে গেল; ঠোঁটদুটি বারেকের জন্য ন'ড়ে ওঠে কি যেন বলতে চাইলে; কথা বা'র হ'ল না; শুধু শ্রান্ত চোখদুটিতে ক্ষমাপ্রার্থনার একখানি করুণ মিনতি ভেসে বেড়াতে লাগলো।

শেষ পর্য্যন্ত অপারেশান করতে পারিনি। যতবারই ছুরি ধরতে গেছি ততবারই হাত কেঁপেছে। ছুরিখানার প্রতি জয়ন্তীর দুইচোখের ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি আমার কঠিন অন্তরকে বারবার বিফল ক'রে দিয়েছে।

ডাক্তার রায় শেষ পর্য্যন্ত বলেছিলেন—অপারেশান করলে রোগী বাঁচতে পারে।

আমারও তাই বিশ্বাস—আজও পর্য্যন্ত! কিন্তু তবুও ছুরি ধরতে পারিনি সেদিন। মৃত্যু-মুহূর্ত্তে জয়ন্তীর অনিমেষ দৃষ্টি-টুকু আমার ওপরই নিবদ্ধ ছিল।

প্রিয়তমের প্রতি মরণাহত হরিণীর শেষ-বিদায়-বাণী-ভরা করুণ মৌন দৃষ্টিখানির মত সে নীরব চাহনি আজও মাঝে মাঝে আমাকে দুর্ব্বল ক'রে তোলে।

অস্ত্র-চিকিৎসা ছেড়ে দিইছি।······

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কাজলী

শ্রীমতী উমা দেবী

২৫

পিসিমার মৃত্যুর পরে পনেরো দিন কেটে গেল। মেঘনাদ এই বৃদ্ধবয়সে মাতৃস্থানীয়া দিদির শোক কিছুতেই সাম্‌লে উঠতে পারলেন না, অসুস্থ হোয়ে তাঁকে কিছুদিন দিল্লীতেই আশ্রয় নিতে হোল। কাজলী কখনো মায়ের স্নেহ পায়নি, শিশুকাল থেকে সে পিসির কাছে মায়ের অধিক আদর-ভালবাসা পেয়েছে, আজ তিনি নেই—এই গভীর আঘাত কাজলের কোমল হৃদয় ভেঙে দিলে,—সে কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হোতে পারছিল না।

কোলকাতায় ফিরে আবার নিজের নীড়টির ভেতরও যদি শান্তি পায় ভেবে মেঘনাদ ফেরবার জন্তে অস্থির হোয়ে উঠেছিলেন। মিহিরও যাই যাই ক'রে যেতে পারছিল না,—সুবোধও বিজলীর অনুরোধে ওকে শেষ পর্য্যন্ত মেঘনাদের সঙ্গেই ফিরতে রাজী হোতে হোল।

ক্রমে যাবার দিন এসে পড়লো। বিজলী মিহিরকে বল্‌লে, "কালই তো তোমরা চ'লে যাচ্ছ,—কাজলটার এখানে এসেও কিছুই দেখা হোল না—ওঁর সময় নেই—বাবার অসুখ, আমি তো খুকিকে নিয়ে নড়তে পারিনে—গাড়ীটা তো পড়েই আছে, ওকে অন্ততঃ কুতুবটা দেখিয়ে আনবে মিহির ?"

মিহির আপত্তি করলে না—কিন্তু কাজলকে বাড়ী থেকে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হোল। অবশেষে মিহিরের কাতর দৃষ্টিতে, মেঘনাদের অনুরোধে সম্মতি দিলে।

সন্ধ্যার কিছু আগে তারা কুতুবে পৌঁছলো। দর্শকরা তখন সকলেই বাড়ী ফিরে গেছে—স্থানটা জনশূন্য—কুতুবের সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে পাশাপাশি দু'জনে সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠ্‌লো।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। উদ্দাম হাওয়া কাজলের আঁচল ও চুলের গুচ্ছ উড়িয়ে দিয়ে তাকে অস্থির ক'রে তুললো। কাজলের মনে হোল তার ভিতরেও এক তাণ্ডব সুরু হোয়েচে ;—বল্‌লে, "এমন ভাল লাগ্‌ছে—মনে হ'চ্ছে তুমি যদি—" কি বলতে গিয়ে কাজল সাম্‌লে গেল।

মিহির অন্যদিনের মত আজ নির্ব্বিকার হোয়ে থাকতে পারলে না ; বল্‌লে, "আমারও ভারী ভাল লাগ্‌ছে কাজল, আমারও মনে হ'চ্ছে তুমি যদি—" ব'লে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

কাজল বল্‌লে, "মিহিরদা, আমি কিন্তু জানি তুমি দিদিকে ভালবাস্‌তে ; হয় তো এখনো বাসো। আমি দিদির পুরনো ডায়েরী-খাতা থেকে সে খবর আবিষ্কার করেছি।"

"সত্যিই ভালবাস্‌তুম কাজল। আমার প্রথম যৌবনে সে এসেছিল তার বুকভরা ভালবাসা নিয়ে,—সেদিন ওকে দিয়েছিলুম উপেক্ষা আর বেদনা—ভালবাসা গ্রহণ করিনি বাগদত্ত ছিলুম ব'লে ; কিন্তু গ্রহণ করিনি ব'লেই অতৃপ্তিতে আমার মন ভ'রে ছিল,—ওর বেদনা আমার বুকে কাঁটার মত বিঁধেছিল। কিন্তু আজ আর তার কিছুই অবশিষ্ট নেই,—সে আমায় অনেকদিন ভুলে গেছে, স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখী হোয়েছে। নিজের পানে তাকিয়ে দেখি, আমারও তাতে ক্ষোভ নেই, অশান্তিও নেই—। তোমার ভালবাসারই জয় হোল কাজল !—তুমি আমাকে এমন ক'রে টান্‌লে যে আমার ব'লে আর কিছুই রইল না।"

কাজলের সমস্ত শিরা-উপশিরা শিথিল হোয়ে, বুকের রক্ত চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌লো। কি করবে, কি বলবে যেন ভেবে পেলে না,—আনন্দে অধীর হোয়ে মনে করলে,

আকণ্ঠ সুধায় পূর্ণ হোয়ে গেছে, তাই বুঝি বাণীরও ঠাঁই নেই!

মিহির কাজলীর নত মুখখানা দুইহাতে তুলে ধরলে,—আদর ক'রে কাছে টেনে এনে তার কোমল ওষ্ঠ নিজের তৃষিত অধর স্পর্শ করলে। তারপর দু'জনে হাত-ধরাধরি ক'রে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

২৬

কোলকাতা ফিরে মেঘনাদ মিহিরকে বললেন, "বাবা, ভুবনবাবুর চিঠি পেয়েছি; তিনি একটি দুরূহ ভার আমায় দিয়েছেন। প্রদীপকে খুঁজে বের করতে হবে।"

নিজের আনন্দে মত্ত হোয়ে মিহির প্রদীপের কথা ভুলে গিয়েছিল ভেবে লজ্জিত হোল। যে কাজলকে এত অল্পদিন ভালবেসে সে এত তৃপ্ত এত মুগ্ধ হোয়েছে, সেই কাজলকে যে শিশুকাল থেকে ভালবাসে তার দাবীও বড় কম নয় সেটা বুঝলে;—বললে, "কয়েকটা অসহযোগীদের মেস আমার জানা আছে কাকা, সেখানে খোঁজ করব—"

"হ্যাঁ বাবা তাই কর, তারপর একদিন শুভক্ষণে প্রদীপের হাতে কাজলকে সমর্পণ করতে পারলেই আমার সমস্ত কাজ শেষ হয়,—শৈলর কাছে যাবার ছুটি পাই।"

মিহির নিজের ভালবাসা স্বীকার করবার পর কাজলের মনটি এমন সহজ তৃপ্তিতে ভ'রে গেল যে তাই নিয়ে আপন অন্তরে একটি কল্পজগৎ সৃষ্টি ক'রে সে আনন্দে বিভোর হোয়ে থাকৃত। পাছে বেশী ব্যক্ত হোলে তার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, সেই ভয়ে সে দূরে দূরে থাকতো, সহজে মিহিরের কাছে আসতো না।

মিহিরের তাতে দুঃখ ছিল না, সমস্ত দিনের মধ্যে কাজলের নীরব সেবা অনুভব করত সে। ঘরের কাছে চুড়ির কিম্বা চাবির মৃদুশব্দে সচকিত হোয়ে দেখত—কাজল একটি দুষ্টু চাহনি একটু মিষ্টি হাসি দিয়ে পালাচ্ছে, তখন তার মনের বীণা নানা সুরে বেজে উঠতো।

কাজল প্রতিদিন কোন্ ফাঁকে এসে তার ঘরটি আপন হাতে পরিষ্কার ক'রে ফুল দিয়ে সাজিয়ে যেত মিহির টের পেতনা, কিন্তু ফুলের সৌরভে তার সারাটি মন আচ্ছন্ন হোয়ে থাকৃত।

মেঘনাদের সঙ্গে কথা হওয়ার পর সে কাজলকে ডেকে পাঠালে। কাজল নববধূর লজ্জা নিয়ে ওর ঘরে এল। মিহির বললে, "প্রদীপের কোনো ছবি কি তোমার কাছে আছে কাজল?" কাজল অবাক হোয়ে বললে, "কেন?" "তার চেহারাটা ভাল মনে পড়ছেনা—তাকে খুঁজে বের করতে হবে।" মিহিরের উদারতায় কাজলের সমস্ত মন শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠলো; বললে, "ছবি এলবামে থাকৃতে পারে, ছোটবেলার চেহারা।

মিহির বললে, "তাতেই চলবে।"

"আহা, খুঁজে যেন পাও! আমরা দু'জনে তাকে ভালবাসবো—তাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করবো—তার জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয়।" মিহির হাসলে। "প্রদীপ এসে যদি তোমায় কেড়ে নেয় কি করব বলত কাজল? ডুয়েল লড়তে রাজী আছি, কিন্তু তুমি রাজী হবে ত?—না প্রদীপকেই পছন্দ ক'রে নেবে?

'ইস্' ব'লে কাজল চ'লে গেল। এতবড় অঘটন সে কল্পনাও করতে পারেনা তাই মনে কোনো আশঙ্কাও নেই। কিন্তু মিহিরের মন অত নিশ্চিন্ত নয়—প্রদীপকে খুঁজে বের করা তার কর্ত্তব্য তা' সে বোঝে, সঙ্গে সঙ্গে কাজলকে হারাবার ভয়ও প্রতি মুহূর্ত্তে তার মনে জেগে ওঠে। বুঝতে পারে না, কাজল তার জীবনে আনন্দের প্রেরণা—না প্রলয়ের পূর্ব্ব সূচনা।

মিহির অনেক খুঁজেও প্রদীকে বের করতে পারলে না। কোলকাতার মত বড় সহরে যে ইচ্ছা ক'রে লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

এদিকে মেঘনাদ ক্রমশঃই দুর্ব্বল ও অশক্ত হোয়ে পড়ছেন—শেষে শয্যা নেবার অবস্থা প্রায় হোল।—জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে বোঝেন, তাই কাজলের কথা ভেবে আরও অস্থির হোয়ে ওঠেন।

কাজল একদিন মিহিরকে বল্‌লে "বাবার শরীর ক্রমেই বেশী খারাপ হ'চ্ছে, আমার চিন্তা আরো ওঁকে ব্যস্ত করছে। তুমি যে আমায় গ্রহণ করেছ সে কথা ওঁকে বলনা এবার।"

মিহির বল্‌লে, "কিন্তু প্রদীপ? তার জন্যে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করলে হয় না?"

"কেন তার জন্যে কি আটকাচ্ছে? তুমি কি আমায় তার হাতে দেবে নাকি?—"

রাগ ক'রে কাজল চ'লে গেল।

মিহির বুঝ্‌লে আর দেরী করা ঠিক নয়,—নিজের মনের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে সে মেঘনাদের ঘরে উপস্থিত হোল।

তার মুখে সংক্ষেপে সমস্ত কথা শুনে আনন্দের উত্তেজনায় মেঘনাদ উঠে বস্‌লেন, তাঁর চোখে জল এল। এতবড় সৌভাগ্য যে তাঁর এত নিকটেই ছিল আগে তার সন্ধান পাননি ব'লে নিজেকে ধিক্কার দিলেন। কাজলকে ডাকিয়ে এনে তিনি উচ্ছ্বসিতমনে উভয়কে আশীর্ব্বাদ করলেন।

২৭

হাওয়ার মত হাল্‌কা মন নিয়ে মিহির বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, সেদিনের আনন্দ তাকে ঘরের মধ্যে স্থির থাক্‌তে কিছুতেই দিলে না। সারাদিন কত পথে কত বিপথে যে লক্ষ্যহীন ভাবে চল্‌লো তার ঠিক নেই,—অবশেষে শিবপুর বাগানে যখন এসে পৌছলো বেলা তখন শেষ হোয়েছে।

ক্লান্ত শরীরে একটা বেঞ্চের ওপর ব'সে প'ড়ে অন্যমনস্ক-চোখে অনতিদূরে একটি ছেলের দিকে চেয়ে রইল। তার মুখটা ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছিল না, সে ঘাসের ওপর বুকে ভর দিয়ে শুয়ে একটা খাতায় কি লিখ্‌ছিল। এমনই তন্ময় হোয়ে সে লেখায় মগ্ন যে, মিহিরের আগমন টেরই পেলে না।

দিন শেষ হোল,—সূর্য্য পশ্চিমে হেলে পড়লো, ছেলেটি লেখা বন্ধ ক'রে অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চেয়ে কার উদ্দেশে নীরবে প্রণাম ক'রে উঠে দাড়ালো। ছেলেটির মুখ চোখে পড়তেই মিহিরের অনেকদিনের দেখা একখানি কিশোরসুষমার মুখ মনে প'ড়ে গেল,—ভাল চিন্‌তে পারলো না। কিন্তু ছেলেটি এগিয়ে এল;—বল্‌লে, "আপনি মিহিরবাবু না? আমি প্রদীপ।"

মিহির চম্‌কে উঠলো! এই প্রদীপ? যাকে সে এতদিন কোলকাতার অলিতে-গলিতে খুঁজে বেড়িয়েছে—সে এসে আজ নিজে ধরা দিলে! বল্‌লে, "কোথায় ছিলে প্রদীপ? এ কি চেহারা হোয়েচে তোমার?" রক্তশূন্য ফ্যাকাসে কপালের ওপর থেকে রুক্ষ চুলগুলো শীর্ণ হাতে সরিয়ে প্রদীপ বল্‌লে, "কিছুকাল থেকে জ্বরে ভুগ্‌ছি। জ্বর যখন চেপে আসে বিছানায় প'ড়ে ছট্‌ফট্ করি,—জ্বর ছেড়ে গেলে একটু ফাঁকা জায়গায় এসে বসি। সমস্ত জীবনে এত ক্লান্ত হোয়েছি তবু ছুটি মঞ্জুর হোল না—"

"কেন এমন ক'রে শরীরকে কষ্ট দিচ্ছ প্রদীপ? তোমার মা-বাবা কত দুঃখ করেন,—কাজল কত দুঃখ করে।"

"কাজলী?—তার খবর তুমি জান?"

"জানি বই কি—সে তোমায় কত খুঁজেছে।"

"না, না, মিহিরবাবু, তুমি মিথ্যে বল্‌ছ,—সে আমায় চায় না:—সে স্পষ্ট জানিয়েছে আমায় ভালবাসে না,—তাই তো আমি এমন সর্ব্বহারা হোয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।—"

মিহির স্নেহের স্বরে বল্‌লে, "যদি জানো চায় না—তবে কেন তুমি তার আশা ছেড়ে দাও না?"

"আশা ছাড়বো? তুমি বল কি মিহিরবাবু, তাকে কি আজ থেকে চাইছি? সেই ছোটবেলায় যখন থেকে জ্ঞান হোয়েছে, যখন থেকে ভালবাস্‌তে শিখেছি, তখন থেকে তাকে চাই। যদি বেঁচে থাকি এখনো যে চাইতে পারছি এই আনন্দে বেঁচে থাকবো;— যদি ম'রে যাই—মৃত্যুর পরেও চাইবো। এই যে খাতা দেখছো—এতে কেবল তারি কথা কবিতায় গেঁথেছি। সে আমার সন্ধ্যামণি—তাকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারিনে মিহিরবাবু।"

মিহির চুপ ক'রে শুন্‌লে—এতো রোগীর প্রলাপ নয়—এযে সমস্ত প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে বল্‌ছে! মিহির অনেক কথাই বলবার চেষ্টা করলে কিন্তু কিছুই পারলে না;—শুধু বল্‌লে, "চল প্রদীপ, আমি তোমায় কাজলের কাছে নিয়ে যাই।"

প্রদীপ শিশুর মত খুসী হোয়ে উঠ্‌লো। "সত্যি আমায় নিয়ে যেতে পারো মিহির বাবু? তা হ'লে চল!"

২৮

সন্ধ্যা হোয়ে গিয়েছে, মিহির তখনো বাড়ী ফেরেনি। তার সকালের অভুক্ত আহার প'ড়ে আছে,—সেই যে মনের খুসীতে বেরিয়ে গেল, এখনো আসেনি। অধীর প্রতীক্ষায় কাজল ব'সে আছে—রাস্তায় প্রত্যেকটি পথিকের পায়ের শব্দে চম্‌কে উঠ্‌ছে। এমন সময় মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলে। "কাজু, দেখে যা মিহির কাকে ধ'রে এনেছে।"

কম্পিত হৃদয়ে কাজল নীচে গিয়ে দেখ্‌লে রুক্ষকেশ, মলিনবসন, অস্থিচর্ম্মসার প্রদীপ মিহিরের হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে। কাজলকে দেখেই অস্ফুট স্বরে কি বল্‌তে গিয়ে মিহিরের কাঁধে মাথাটা চ'লে পড়্‌লো।

মিহির গম্ভীর স্বরে বল্‌লে, "কাজল, চল একে শুইয়ে দিই।—প্রদীপ অজ্ঞান হোয়ে গেছে।"

কাজল একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে মনে শক্তিসঞ্চয় ক'রে নিলে—তারপর মিহিরের সাহায্যে প্রদীপকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

বিছানায় শুইয়ে মাথায় বরফ-জল দিয়ে পাখা খুলে বহু পরিচর্য্যার পর যখন প্রদীপের জ্ঞান ফিরে এল তার আগেই মিহির ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

প্রদীপ চোখ মেলেই বল্‌লে, "কাজলী!"—আদরে, অভিমানে সে কতদিন পরে কাজলকে ডাক্‌লে,—করুণায় কাজলের মন পূর্ণ হোয়ে গেল। সেই প্রদীপ—কতকালের বন্ধু,—শিশুদিনের খেলার সাথী প্রদীপ! মনে পড়্‌লো, একটি সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথ, টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, অন্ধকার রাত্রি—তারি ভিতরে প্রদীপের হাত ধ'রে সে চলেছে একান্ত নির্ভয়ে শিশুহৃদয়ের সমস্ত বিশ্বাস নিয়ে। প্রদীপের কপালে হাত বুলিয়ে বল্‌লে, "প্রদীপ, নিজেকে এমন ক'রে কষ্ট দিতে আছে ভাই?"

প্রদীপের চোখের কোলে কোলে জল ভ'রে এল;—বল্‌লে, "আমি বেশীদিন বাঁচব না কাজলী,—তুমি আমায় এই ক'টাদিন ভালবাসো।"

কী মিনতি তার কণ্ঠস্বরে—কাজলের বুকেও ব্যথা গুমরে উঠ্‌লো! বল্‌লে, "তোমায় তো আমি ভালবাসি,—ভগবান জানেন তোমায় কত স্নেহ করি, কত বিশ্বাস করি। তুমি স্থির হোয়ে থাক—বড় দুর্ব্বল হোয়েচ, আর কথা বোল না, এসো আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।"

প্রদীপ পরম আনন্দে অসীম তৃপ্তিতে চোখ বুজলে। সে ঘুমুবে, কাজলী মাথার কাছে ব'সে থাক্‌বে; এ তার সমস্ত যৌবনের সুমধুর স্বপ্ন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়্‌লো। নীচে মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"লক্ষ্মী, দুধ গরম হোয়েচে—এখুনি একপেয়ালা প্রদীপের জন্যে দিয়ে এসো।"

কাজল দেখ্‌লে একটি কালো খাতা প্রদীপের হাতের তলে চাপা রয়েছে,—অজ্ঞান অবস্থাতেও হাত থেকে সেটি খ'সে পড়েনি। কৌতূহলবশে খুলে দেখ্‌লে, কবিতা—অসংখ্য কবিতা—সন্ধ্যামণিকে উৎসর্গ করেছে।—প্রত্যেকটি কবিতা ব্যথার অশ্রুজলে বুকের রক্ত দিয়ে লেখা। ভালবাসায় যে কী অপরিমিত বেদনা সে মিহিরকে ভালবেসে বুঝেছিল, তাই প্রদীপের দুঃখ তার মনের দুয়ারে ঘা দিল,—সমস্ত মন ব্যথায় কোমল হোয়ে উঠ্‌লো।

কিন্তু মিহির কই?—কাজল তো তাকে বহুক্ষণ দেখেনি—সে কি বিশ্রাম করছে? আহা আজ সারাদিন সে কত ক্লান্ত! লক্ষ্মী আস্‌তেই তাকে প্রদীপের কাছে বসিয়ে সে মিহিরের সন্ধানে গেল।

ঘর শূন্য—বাতি জ্বালানো রয়েছে,—বাগানের দিকের দরজাটি খোলা, দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে হু-হু ক'রে বাতাস এসে বিছানার কাপড়, টেবিলের কাগজপত্র উড়িয়ে নিচ্ছে!

কাজল দরজা বন্ধ ক'রে টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখ্‌তে গেল। দেখ্‌লে, তার নিজের নাম লেখা এক চিঠি মিহিরের হস্তাক্ষরে লেখা।—ওর মনটা চম্‌কে উঠ্‌লো—মিহির কি লিখেছে? কেন লিখেছে? অধীরহৃদয়ে চিঠিটা খুলে পড়্‌লে।

কল্যাণীয়াসু

তোমায় যে কত ভালবাসি, তা' আজ তোমায় ছেড়ে যাবার সময় আরো ভাল ক'রে বুঝলুম। তোমায় ভালবাসা

আমার মাথার মণি—তবু সে আমার নয়—তাই নিয়ে প'ড়ে থাকলে চলবে না। প্রদীপের কথা ভাবতে হবে। সে মরতে বসেছে কেবল তোমারই জন্যে। তার কবিতার খাতাটি দেখলে বুঝবে, কত গভীরভাবে সে তোমাকে ভালবাসে। আমি আমার নিজের মন দিয়ে জানি সত্যিকারের ভালবাসার গভীরতা কতখানি;—তার বেদনা অসীম।

তোমাকে ছেড়ে যেতে কি কষ্ট হ'চ্ছে না? তুমি জানো কাজল, আজ সকালেই কি অতুল্য সুখের অধিকারী হোয়েছিলাম। আমার মা নেই বাবা নেই ভাই নেই বন্ধু নেই,—এ সারা দুনিয়ায় তুমি ছাড়া কেউ নেই। তুমি আমার শূন্য গৃহে লক্ষ্মী হোয়ে আসবে—আমার কল্পনায় নয়, স্বপ্নে নয়—সত্য জীবনে আজ সেই আনন্দের বারতা এসে পৌঁছেছিল। মনে ক'রেছিলুম জীবনের বাকি কটাদিন তোমার অঞ্চলের ছায়ায় শান্তির আশ্রয়ে কাটিয়ে দেব—কিন্তু বিধাতার বিধি অন্যরকম—আমায় চ'লে যেতে হবে। প্রদীপের দাবী আমার চেয়ে অনেক বেশী—সে শিশুকাল থেকে তোমাকে ভালবাসে। সে তোমার ভালবাসা পেলে বাঁচবে। তার তরুণ জীবন দলিতফুলের মত শুকিয়ে যাচ্ছে, তুমি তাকে ভালবাসা দিয়ে আবার ফুটিয়ে তোল। সেই হবে আমার পুরস্কার।

বড় কঠিন পরীক্ষায় তোমায় ফেলে চলেছি কাজল,—তবু জানি তুমি পারবে, হয় তো একদিন তোমার দিদির মতই সুখী হবে। আমার জন্যে ভেব না—আমার কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত—আমেরিকায় অসমাপ্ত কাজ রেখে এসেছি তাই নিয়ে আমার দিন কেটে যাবে—আনন্দে না হোক্—দুঃখেও নয়। উপস্থিত জমিদারীতে যাচ্ছি। যতদিন না মন প্রস্তুত হয় তুমি আমায় ডেকনা কাজল, দেখা দিতে বোলনা।—জেনো, আমি দূরে থাকলেও তোমায় ভুলে থাকব না—তোমার ভালবাসা যা' পেয়েছি তা' আমার বাকি জীবনের পাথেয়। আমার ভালবাসা আমার শুভকামনা তোমায় চিরজীবন ঘিরে থাকুক্।

মিহির।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে কাজল চিঠিখানি পড়লে, তারপর মিহিরের পরিত্যক্ত বিছানায় লুটিয়ে প'ড়ে কেঁদে উঠলো,—এ কি শাস্তি আমায় দিলে!—এ আমি পারব না—আমার বুক ভেঙে যাবে তবু পারব না!

সকালবেলা নিজের হাতে যে মালাটি গেঁথে মিহিরের ছবিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল—হাওয়ায় সেটি খ'সে পড়লো তার মাথায়, মিহিরের সান্ত্বনার মত।

২৯

একমাস অক্লান্ত নিষ্ঠায় কাজল প্রদীপের সেবা ক'রে তাকে বাঁচবার পথে টেনে আনলে।

মিহির চ'লে যেতে মেঘনাদ একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। কাজল বলেছিল, "তিনি আমায় প্রদীপের হাতে সঁপে গেছেন বাবা।"

মেঘনাদ উত্তেজিত হোয়ে বলেছিলেন, "সে কেমন ক'রে হবে? আমি জানি সে তোকে নিজের জীবনের চেয়ে ভালবাসতো"

শান্ত স্বরে কাজল বলেছিল, "প্রদীপও তো আমায় কম ভালবাসে না বাবা!"

মেঘনাদ হতাশ হোয়ে ভেবেছিলেন—এমন ক'রে বিপদ ঘনিয়ে আসে কেন? মেয়েটাকে দু'টুকরো ক'রে ভাগ করে দিতে ত পারিনে!—

প্রদীপ ভুবনবাবুকে তার অসুখের সংবাদ জানাতে দেয়নি; বলেছিল, "আমাকে দয়া ক'রে একটা হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিন—যদি বেঁচে উঠি তবেই আবার বাবা-মার কাছে মুখ দেখাব। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি সে আজ অনেকদিন—তাঁদের কাছে তো মৃত হোয়েই আছি—আর নতুন ক'রে দুঃখ দিই কেন?—"

ডাক্তার কাজলকে নিভৃতে ডেকে বলেছিলেন,—"আপনি যখন সেবার ভার নিয়েছেন তখন খুলে বলি, রোগীর প্রফুল্লতাই একমাত্র ওষুধ। অতিরিক্ত মানসিক অবসাদে এ-রকম অবস্থা হোয়েছে, সেটি যদি দূর করা যায়—তবে ওষুধের চেয়ে ভাল ফল হবে।"

শিউরে উঠে কাজল ভেবেছিল, আমার হাতেই কি তার বাঁচবার উপায়—? বিধাতা আমায় এমন ক'রে পরীক্ষা করছেন কেন!

প্রতিদিন ভোরবেলা সে মিহিরের ছবির কাছে নত হোয়ে প্রণাম ক'রে বল্‌তো—"তোমার কাছে এ জীবনে আর কিছুই চাইবার নেই, কেবল আশীর্বাদ ছাড়া—। তুমি আমার শক্তি দাও—এ দুর্বল মন আর পেরে উঠ্‌চে না!"

দীর্ঘ একমাস পরে প্রদীপ যেদিন অজ্ঞান অবস্থা থেকে সহজ অবস্থায় এল—সেদিন সকালে কাজল তার মুখ মুছিয়ে রুক্ষ চুল ঠিক ক'রে সাজিয়ে জানলাটা খুলে দিয়ে পাশে এসে বস্‌লো। শরতের সকালবেলার সোনালি আলোয়—বহুরাত্রি জাগরণে ক্লান্ত, সেবা-নিরতা কাজলের মূর্ত্তিখানি প্রদীপ নতুনভাবে দেখ্‌লে। এ রূপ যেন তার চির-পরিচিত কাজলের নয়—এ যেন কোন তপঃক্লিষ্টা তপস্বিনী ধ্যানে নিমগ্ন হোয়ে আছে।—প্রদীপ দুইচোখ ভ'রে কাজলকে দেখ্‌তে লাগ্‌লো!—

স্নেহের সুরে কাজল বল্‌লে, "এখন কেমন আছ প্রদীপ?—"

"খুব ভাল আছি; কিন্তু কেন তুমি আমায় বাঁচালে কাজলী?—আবার তো সেই দুঃখ, সেই তোমায় না পাওয়ার দুঃখ—! আমার নিঃসঙ্গ একা জীবন—"

কাজল বল্‌লে, "সত্যি কি তোমার আর কোনো আশা নেই আকাঙ্ক্ষা নেই—কেবল আমাকেই চাও?"

"তাই চাই কাজলী! যদি তোমায় পাই আবার মানুষ হব—আবার আশা জাগ্‌বে আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌বে—তোমার হাত ধ'রে জীবনের পথে গান করতে করতে চল্‌ব।—"

"একি তুমি বলছ—না তোমার কবি-মন বল্‌ছে?—প্রদীপ, আমার ভয় করে, তুমি কাব্যজগতের মানুষ—কল্পনা নিয়ে তোমার কারবার—আমাকে ভালবাসা তোমার একটা সৃষ্টি নয় ত—একটা ক্ষণকালের খেয়াল?"

"না কাজলী, এ জন্ম-মৃত্যুর মত সত্য, সূর্য্যের উদয়-অস্তের মত। আমার জীবনে এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই।"

খোলা জান্‌লা দিয়ে এক দম্‌কা শেফালি-সুগন্ধি হাওয়া ভেসে এল—কাজলের রুক্ষ চুল উড়ে উড়ে মুখে এসে পড়লো।—সে চুপ ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। তার মনের আকাশে যে একটি করুণ দৃষ্টি সন্ধ্যাতারার মত ফুটেছিল—আজ এই শরতের আলোয় যেন ঝাপ্‌সা হোয়ে এল। বহুক্ষণ পরে কাজল বল্‌লে, "তোমার ভালবাসা দিয়ে আমায় তোমার যোগ্য ক'রে নিও প্রদীপ! আমার মনটা একটা পোড়ো বাড়ীর মত হোয়ে আছে, তাকে কাল ফিরিয়ে রং লাগিয়ে নিতে সময় লাগ্‌বে।"

প্রদীপ কাজলের হাতটা নিজের বুকের উপর চেপে ধ'রে বল্‌লে—"আমার সন্ধ্যামণি!"

ভুবনবাবু এলেন। তাঁর ছেলেকে ফিরে পাওয়ার সমস্ত সাধনাই যে এই সন্ন্যাসিনী মেয়েটি করেছে তা' বুঝ্‌লেন। কাজলকে বুকের কাছে টেনে বল্‌লেন, "মা, আমার প্রদীপের জন্যেই তোমার সৃষ্টি। বুঝি আলোকের পরপারে—অন্ধকারের গর্ভে যখন তোমাদের জন্মরহস্য লুকানো ছিল তখন থেকে ও তোমায় ভালবাসে।"

৩০

বিজলী কোলকাতায় এল। কাজলের এবার মনের মত বর হোয়েছে—এ আনন্দ তাকে স্থির থাকতে দিলে না। তার আর দেরী সয় না।—কোনমতে দুইহাত এক হোয়ে গেলে হয়।—মেঘনাদকে বল্‌লে, "বাবা, এই অঘ্রাণেই বিয়ে দিয়ে দাও—আর দেরী কোরনা, মাঘমাস অবধি অপেক্ষা করতে গেলে আবার কি বাধা এসে পড়বে। একেই তো আমার ছোট ননদের বিয়ে সে সময়—খুকুর বিয়েটায় ভাল ক'রে মজা না করলে চল্‌বে কেন?—"

মেঘনাদ বল্‌লেন, "কাজল যদি প্রস্তুত হোয়ে থাকে, আমার আপত্তি কি মা?—"

বিজু ছুট্‌লো কাজলের কাছে। "কি লো, ফুল ফুট্‌লো—? খুব যা হোক্ প্রদীপকে পরীক্ষা ক'রে নিলি ভাই!"

ম্লান হাসি হেসে কাজল বল্‌লে, "তবু ত আমার পরীক্ষায় শেষ হোল না দিদি—"

বিজলী কাজলের গলার সুরে চম্‌কে উঠ্‌লো।

"ওকি কথা কাজল? তবে কি এ বিয়েতে তোর মত নেই?"

"আমার যিনি দেবতা তাঁর এ আদেশ,—এ বজ্রের চেয়ে কঠিন হোক্ তবু পালন করব।"

"তোর আবার দেবতা কে ?"

"তাঁকে চোখে দেখ্তে পাইনে।"

"কোথায় থাকেন ?"

"আমার অন্তরে।"

এবার বিজু হেসে ফেল্লে। "বাপ্রে বাপ্, এই এক কবি মেয়ে—তার জুটবে এক মাথাপাগ্লা কবি বর। এরা দু'জনে করবে কি ? হাঁরে কাজল, তোর বাড়ীতে হাঁড়ি চড়বে তো ? না কাব্যি ক'রেই কাটাবি ?"

কাজল হাস্লে,—জমাট মেঘভেদ ক'রে হঠাৎ একটু সূর্য্যকিরণ বেরিয়ে পড়লে যেমন দেখায় এ তেম্নি হাসি।

বিজলীর খুকুকে কোলে ক'রে সে আদর করতে লাগ্লো।—

বিয়ের দিন এল। একা বিজুর উৎসাহ সব অভাব মিটিয়ে রাখ্লো। সানাই বাজ্লো, অধিবাস এলো—উৎসবের কোনো অঙ্গ বাকি রইল না।

মেঘনাদের বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে ভুবনবাবু বল্লেন, "আপনার মেয়েটিকে কেবল একমাসের জন্যে নিয়ে যাব বেয়াই,—তারপর সে আপনারই কাছে থাক্বে। প্রদীপকেও এখানে একটা ব্যবসায় ঢুকিয়ে দেবেন।"

শ্বশুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় কাজলের মন ভ'রে উঠ্লো;—নইলে বাবাকে জন্মের মত ছেড়ে যাওয়া, তার আরো একটা বিষম পরীক্ষা বাকি ছিল।

রাত্রি নটায় লগ্ন। দুপুরের দিকে বিজলী কাজলের শুক্নো মুখের পানে তাকিয়ে বল্লে, "যা না কাজু, একটু শুয়ে থাক্, এর পর তো অনেকক্ষণ ব'সে থাক্তে হবে।"

কাজল তো তাই চায়—সকলের দৃষ্টির অন্তরালে সে একটু একা থাক্তে চায়। তার বাইরেটা যতই কঠিন হোক—তার ভিতরের কান্না যে এখনো থামেনি।

সে মিহিরের ব্যবহার-করা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। রোদের তেজ ছিল না—বাগানের দিকের খোলা দরজা দিয়ে মাঝে মাঝে একটা দম্কা হাওয়া আসছিল—সে চুপ ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

ক্রমে চোখের পাতা ভিজে উঠ্লো—বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝ'রে পড়লো—বহুদিন পরে কাজল মন খুলে কাঁদতে পারলে।—

হঠাৎ দরজার মৃদু শব্দে কাজল চেয়ে দেখ্লে—ঘরে এসে ঢুক্চে মিহির!

সে তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে ক্ষণকাল সভয়ে মিহিরের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল, তারপর অস্ফুটস্বরে বল্লে, "কেন এলে ? কেন তুমি আবার এলে ?"

মিহির বল্লে, বিজলী আমায় খবর দিয়েছিল—"

কাজল আবার বল্লে, "কিন্তু আমার মন তো এখনো প্রস্তুত হয় নি !"

মিহির কাজলের পাশে বস্লো—কতদিন পরে আবার তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বল্লে, "আমি তা জানি, তবু এসেছি কাজল,—কাল আমি আমেরিকা চ'লে যাচ্ছি।—যাবার আগে তোমায় একবারটি দেখ্তে এলুম।"

রুদ্ধস্বরে কাজল বল্লে, "কাল ?—এত শীগ্‌গির ?"

"তাই ত ভাল কাজল, তাই ত ভাল। তুমি সুখী হবে—আমার সর্ব্বান্তঃকরণ বল্‌ছে তুমি সুখী হবে।" মিহির উঠে দাঁড়াল।

কাজল ব্যস্ত হ'য়ে শয্যা থেকে নেমে ভূমিষ্ঠ হোয়ে মিহিরকে প্রণাম করলে। মিহির তার মাথায় হাত রাখ্লে—তাকে নিজের খুব কাছে টেনে নিয়ে কিসের আশায় মুখ নত করলে, তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।—উৎসব-বাড়ীতে কেউ তাকে আর দেখ্তে পায় নি।

সমাপ্ত

শ্রীউমা দেবী

বাঙ্‌লার পল্লীগান সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ

'বাঙ্‌লার পল্লীগান' নাম দিয়া শ্রীযুক্ত মহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব গত জৈষ্ঠমাসের 'বিচিত্রা'য় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে অনেক তথ্য বিবৃত হইয়াছে। পল্লী-গান সংগ্রহের জন্য তাঁর চেষ্টা ও পরিশ্রম বাঙালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতার বিষয়। এই সকল গানের ভিতর দিয়া নানাভাবে কেবল বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য নয় পরন্তু বাঙালী জাতির ইতিহাস, আচার ব্যবহার-আদি সম্পর্কেও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। তবে মালমসলা ঘাঁটিয়া তাহা হইতে তত্ত্ব উদ্ধার অপেক্ষাকৃত শক্ত কাজ। নিছক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনেই তাহা হইতে পারে; শুধু উৎসাহ মাত্র সম্বল করিয়া চলিয়া উহাতে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা কম। মনসুরউদ্দীন সাহেবের প্রবন্ধটিতে স্থানে-স্থানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি লঙ্ঘিত হইতে দেখিয়া আমরা একটু নিরাশ হইয়াছি। ইহা যে তাঁহার অজ্ঞতার জন্য ঘটিয়াছে তাহা বলা আমাদের অভিপ্রায় নয়। ক্ষুদ্র প্রবন্ধের ভিতর অনেক কথা বলিতে গেলে যে অসুবিধায় পড়িতে হয় লেখক তাহা এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু এসকল ক্ষেত্রে বক্তব্য বিষয়কে অঙ্গহীন করার চেয়ে একাধিক প্রবন্ধের দ্বারা বক্তব্যকে বিশদ করিয়া তোলাই অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত। নচেৎ সত্যের অপলাপ ঘটে।

লেখক বাউল ও ফকির সম্বন্ধে যে চিত্র দিয়াছেন তাহা আমাদের চক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। ইহাদিগকে উদার তত্ত্বান্বেষী বলিয়া আমাদের জানা ছিল। সাধারণজগতেও যে ইহারা গুরুদের 'গুরুত্ব' লইয়া অহিংস লড়াই করে তাহা ইতিপূর্ব্বে কখনো শুনি নাই। লেখক যদি কয়েকটি গানের নমুনা দিতেন তবে বিষয়টা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইত। এমনও হইতে পারে যে তিনি গানগুলির রহস্যার্থ (esoteric meaning) ধরিতে না পারিয়া ভ্রান্তসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের 'বাউল' প্রবন্ধটি লেখক এই সম্পর্কে পড়িতে পারেন।

'ভাসান' গানকে লেখক যত দুর্লভ মনে করিয়াছেন তত দুর্লভ ইহা নয়। নদীয়া ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে ইহা এখনো শুনিতে পাওয়া যায়। 'বিয়া' গানের সঙ্গে 'ভাসান' গানের সাদৃশ্য কোন্ হিসাবে, তাহা ভাল করিয়া বোঝা গেল না। আশা করি প্রবন্ধলেখক বারান্তরে তাহার আলোচনা করিবেন।

'কবি' গান সম্বন্ধে মনসুরউদ্দীন সাহেব যে 'থিয়োরী' করিয়াছেন তাহার কোন গ্রহণযোগ্য ভিত্তি আছে কিনা সন্দেহ। তিনি নিজে 'কবি' গান শোনেন নাই, আর 'মুশায়ারা' জিনিষটা বাঙ্‌লা দেশে দুর্লভ। এমন অবস্থায় তিনি যে কিরূপে উভয়ের জ্ঞাতিত্ব কল্পনা করিলেন তাহা বুঝিলাম না। কোন প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট উত্তর-ভারতে প্রচলিত 'মুশায়ারা'র বিবরণ শুনিয়াছি। উহা হিন্দি ও উর্দ্দু কবিগণের সামাজিক সম্মিলন বা বৈঠক। উহাতে কবিগণ উপস্থিত মত (extempore) কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেন। গানের কোন প্রসঙ্গ হয় বলিয়া শুনি নাই। কবিগানে শুধু দুইদলের মধ্যে ছড়া ও গানের উত্তরপ্রত্যুত্তর হয় কিন্তু এই সকল ছড়া ও গানে কবিত্ব অপেক্ষা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেরই পরীক্ষা বেশী এবং স্থানে স্থানে নগ্ন গ্রাম্যতাও (Vulgarity) আত্মপ্রকাশ করে। কবি-গানের শ্রোতা সর্ব্বসাধারণ, আর 'মুশায়ারা' শুধু কবি ও কাব্য-রসিকগণের মিলনস্থান। কবিগানের লোপের জন্য মনসুরউদ্দীন সাহেব বৃথাই কীর্ত্তনকে দায়ী করিয়াছেন। এই অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই। অনেক কারণে কবিগান অচল হইতেছে; তাহার মধ্যে থিয়েটার এবং থিয়েটারি ঢংএর যাত্রাই কবিগান লোপ হওয়ার প্রধান কারণ।

'গ্রাম্য মেয়েলি গান হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিলেই চলে' এই যে একটি কথা মনসুরউদ্দীন সাহেব বলিয়াছেন

তাহা নির্ভুল নহে। ত্রিপুরা নোয়াখালি ময়মনসিং শিলেট প্রভৃতি জেলায় হিন্দু-মুসলমানগণ বিস্তর মেয়েলি গান বিবাহাদি উৎসবে গাহিয়া থাকেন। মুসলমানধর্ম্ম ত নৃত্য-গীত-বাদ্যের বিরোধী। এ অবস্থায় মুসলমান-মেয়েদের ভিতর যে এখনো গান রহিয়াছে কেন, তাহা লেখক ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? উঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ এককালে হিন্দু ছিল, ইহাই তার প্রমাণ। ধর্ম্মনিষ্ঠতার শাসন এড়াইয়া আজও ইঁহাদের সঙ্গীতপ্রিয়তা বাঁচিয়া আছে। মনসুরউদ্দীন সাহেব যদি সমস্ত বাঙলাদেশের মুসলমান-মেয়েদের ভিতর প্রচলিত গান ও অপরাপর উৎসবের অঙ্গগুলির পূর্ণ (exhaustive) বিবরণ বাহির করেন তবে তাঁহার দান বঙ্গবাসী কদাপি ভুলিবে না।

মালদহের গম্ভীরার নাচ আছে কিনা এ-খবর মনসুর-উদ্দীন সাহেব একটু খোঁজ করিলেই জানিতে পারিতেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত লিখিত মালদহ জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্-প্রকাশিত 'আদ্যের গম্ভীরা' নামক পুস্তকখানি পড়িলেই গম্ভীরার নৃত্য-গীত ও অন্যান্য উৎসবাঙ্গের বৃত্তান্ত জানা যাইত। যাঁহারা পল্লীগান ও উৎসবাদির বিবরণ খোঁজ করিবেন বইখানি তাঁহাদের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক অন্যান্য দেশের পল্লীগান সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনার আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছেন। য়ুরোপীয় বিবিধ ভাষায় সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। উহার কিয়দংশও যদি তিনি বাঙলায় প্রকাশ করেন তবে দেশীয় পাঠকের সৌভাগ্য; কিন্তু তৎপূর্ব্বে বাঙলার লুপ্তপ্রায় পল্লী-গানগুলি ও উৎসবসমূহের যথাযথ বিবরণী সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। নূতন জগতের শিক্ষা ও সভ্যতা-সংস্পর্শে ঐ সকল জিনিষ দ্রুত লোপ পাইতেছে। লেখক যদি সমগ্র বাঙালীসমাজের পল্লীগানগুলি সংগ্রহ করিতে না পারেন অন্ততঃ মুসলমানসমাজে প্রচলিত পল্লীগান এবং উৎসবাদিরও একটি পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি তাঁহার যত্নে সংগৃহীত হইলে দেশের একটি স্থায়ী উপকার হয়। এ কাজের জন্য যথেষ্ট ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। মনসুরউদ্দীন সাহেবের মত শিক্ষিত সাহিত্যানুরাগী ভদ্রলোকের কাছে দেশ কি সে দাবী করিতে পারে না?

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

শেষ-দেখা

শ্রীমতী অমিয়া দত্ত

বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ উভয়েই। তাদের বয়স যে কত, তাও তারা ভুলে গেছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তারা দু'জনে এই ছোট্ট একতলা বাড়ীটিতে কাটিয়েছে। এমন কি, কেউ যদি তাদের বলে যে, তারা আজন্মই বিবাহিত ছিল না, তাহ'লে তারা অবাক হ'য়ে যায়। কোনদিন যে পৃথক ছিল, একথা তারা এখন কল্পনাও করতে পারে না। এরূপ গভীরভাবে মনে-প্রাণে তারা পরস্পরকে জড়িয়েছিল যে, গ্রামের লোকে ভাবতো দু'জনের একজন যদি মারা যায়, তাহ'লে অপরে তাকে বেশী দিন ছেড়ে থাকতে পারবে না।

শীতকালটাই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার অত্যন্ত কষ্টের সময়। রাতে তাদের উত্থান-শক্তি প্রায় রহিত হ'য়ে যায়। প্রায়ই ঠাণ্ডা লেগে জ্বর আসে। মনে হয়, বেঁচে থাকাটাই বিড়ম্বনা।

একদিন সকালে বাড়ীর সামনে রোয়াকের ওপর বৃদ্ধ ব'সে আছে; তার স্ত্রী পাশের প্রতিবেশিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। অনেকদিন ধ'রে তারা একবার যাবার জন্ম অনুরোধ করছে, কিন্তু যাওয়া আর ঘটে ওঠে না। বৃদ্ধ শান্ত বালকের মত যেখানে ব'সে ছিল, সেখান থেকে স্ত্রীকে দেখ্‌বার চেষ্টা করলে। কিন্তু দৃষ্টিক্ষীণতা-বশতঃ চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসায় ভালো দেখ্‌তে পেলে না। কেবল তার পায়ের শব্দ কাণে এলো। ভালো ক'রে শোন্‌বার জন্ম সে চোখ বুজে রইলো।

এদিকে বৃদ্ধা দু' এক পদ অগ্রসর হবার পর হঠাৎ মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে গেল, কোন শব্দ পর্য্যন্ত না ক'রে। মিনিট-পাঁচেক পরে দু'জন লোক সেই পথে যাবার সময় তাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাড়াতাড়ি কাছে এসে দেখে যে বৃদ্ধার মৃত্যু হ'য়েছে।

সংবাদটা রাষ্ট্র হবার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে অনেক লোক এসে সেখানে জড়ো হ'ল। বৃদ্ধাকে একটা গাছের ছায়ায় শুইয়ে রেখে একজন বললে, "বুড়োকে একটা খবর দেওয়া দরকার।"

জনকতক লোক ব'লে উঠ্‌লো, "না, না, তাকে নয়। প্রথমে তার পুত্রবধূকেই খবর দেওয়া ভালো। এই যে সে এদিকেই আস্‌ছে। এসো সুশীলা—"

সুশীলা ধীরপদে শাশুড়ীর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। চোখে তার জল টল্‌টল্ করছে। অস্ফুটস্বরে বললে, "আহা, বুড়ো মানুষ!" একটু পরে সে চোখ মুছে সকলকেই অনুরোধ করলে যে তাঁরা কেউ যেন তার বৃদ্ধ শ্বশুরকে এ খবর না দেন, সে নিজেই তাঁকে জানাবে।

শাশুড়ীর সৎকারের বন্দোবস্ত ক'রে ঘণ্টাকয়েক পরে সুশীলা শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করলে। এই বিধবা পুত্রবধূ ছাড়া সংসারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আর কেউ নেই।

বৃদ্ধ তার বিছানার ওপর শুয়েছিল; পদ শব্দে চম্‌কে উঠে বসলো। জিজ্ঞাসা করলে—"কে?"

সুশীলা বললে, "আমি, বাবা। খাবার সময় হ'য়েছে, খাবেন আসুন।"

বৃদ্ধ ব'লে উঠ্‌লো, "মা, আমি যে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না। হঠাৎ একি হ'লো! চোখদুটি একেবারেই গেছে।"

এ খবরে সুশীলা দুঃখিত না হ'য়ে বরং একটু আশ্বস্ত হ'লো। চিরকালের সঙ্গিনীর শেষ বিদায়মুহূর্ত্তেই যে বৃদ্ধের অন্ধতা এসেছে, এ তার ওপর ভগবানের বিশেষ দয়া বলতে হবে। সে সেখানেই খাবার নিয়ে এসে মায়ের মত যত্নে বৃদ্ধকে খাইয়ে দিলে। সমস্ত সময়টা চোখের জন্ম শোক ও দুঃখ করা ছাড়া বৃদ্ধ আর কোন কথাই বল্‌লে না।

খাওয়ার পর বৃদ্ধ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার শাশুড়ী কোথায়? এতক্ষণ কি করছেন? এখনো ফেরেননি!"

সুশীলা কি বলবে ভাব্‌ছে, ইতিমধ্যে বৃদ্ধ পুনরায় চোখের জন্ম আক্ষেপ করতে আরম্ভ করলে।

দু' চারজন প্রতিবেশী বৃদ্ধের খবর নিতে বাড়ীতে এলো, কেউ কেউ জানলা দিয়ে উঁকি মেরে গেলো। কিন্তু কেউই সাহস ক'রে বৃদ্ধকে তার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ দিতে পারলে না।

সুশীলা মাঝেমাঝে বৃদ্ধকে দেখে যেতে লাগলো। সমস্তক্ষণ ব'সে থাকবার তার অবসর কোথায়?

ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। সুশীলা ঘরে প্রদীপ জেলে শ্বশুরের কাছে এসে বসলো। এইবার তাঁকে জানাতে হবে যে, যে কোনদিন তাঁকে ছেড়ে থাকেনি তাঁর সেই সঙ্গিনী চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছে। অতিকষ্টে অনেকক্ষণ পরে সাহস সঞ্চয় ক'রে সুশীলা মৃদুস্বরে বললে, "মা আর ফিরবেন না, বাবা,—তিনি আমাদের মায়া ত্যাগ ক'রে স্বর্গে গেছেন।"

বৃদ্ধের কোন সাড়া পাওয়া গেলনা। সুশীলা তাঁর দিকে চাইলে ও দেখলে যে বৃদ্ধ ঘুমিয়ে পড়েছে। সে তখন আস্তে-আস্তে উঠে ঘরের চারদিক গোছাতে লাগলো। একটু পরেই বৃদ্ধের ঘুম ভেঙে গেল। সুশীলাকে ডাকলেন। সেও তাঁর খুব কাছে এসে দাঁড়াল।

বৃদ্ধ বললেন, "শোন মা, কাছে এসে শোনো। তোমার শাশুড়ী এইমাত্র ফিরে এসেছেন। তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, ঐখানে এইমাত্র তাঁকে দেখলুম। আমি ঘুমিয়েছিলুম, কিন্তু হঠাৎ আমার মনে হ'লো যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরের জিনিষগুলো গুছিয়ে একটু আগে বেরিয়ে গেলেন। আমি ইচ্ছা ক'রেই কোন শব্দও করিনি, কথাও বলিনি। আমার ইচ্ছা নয় যে আমার অন্ধ হওয়ার খবর তিনি জানতে পারেন। এ খবরে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাবেন। সে আমি কোনমতেই সইতে পারবো না। আমি ভালো না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। ওঁর ভাইপো তো তার মেয়ের বিয়ের জন্য ওঁকে দিন কয়েক সেখানে গিয়ে থাকবার জন্য অনুরোধ ক'রে গেছে। একবার যেতে ক্ষতি কি? অনেকদিন তো যাননি। বুঝিয়ে পাঠিয়ে দাও। তাঁকে গিয়ে বল।"

"আচ্ছা বাবা, সে আমি কোন রকমে ব্যবস্থা করবো। আপনি ভাববেন না। আমি শপথ ক'রে বলছি যে মা একথা কিছুতেই জানতে পারবেন না। আপনি শান্ত হোন।"

বধূর শপথে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বৃদ্ধ বললেন, "তুমি মা বড় ভালো মেয়ে। আমার দুর্ভাগ্য যে তোমাকে সুখী করতে পারলুম না।"

পরের দিন সকালে সুশীলা বৃদ্ধকে জানালে যে তার শাশুড়ী রাত্রে তাঁর ভায়ের বাড়ী গেছেন। তিনি ঘুমুচ্ছিলেন বোলে তাঁকে জাগানো হয়নি। বৃদ্ধ ছোট্ট ছেলের মত সবিস্ময়ে খবরটা শুনলেন। বধূর কথা শেষ হ'লে ব'লে উঠলেন, "কিন্তু তিনি তাহ'লে আবার ফিরে এসেছেন। কাল রাত্রে যখন ঘুমুচ্ছিলুম, তখন তাঁর পায়ের শব্দ পেয়েছি।"

সুশীলা কোন উত্তর দিলে না।

দুদিন কেটে গেলো। তৃতীয় দিন ডাক্তার বৃদ্ধের চোখ ভাল ক'রে পরীক্ষা করার পর বললেন, "অসুখ সেরে এসেছে, অবস্থা বেশ ভালো। খুব সম্ভব, কাল থেকে দেখতে পাবেন—।"

সুশীলা ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। সে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। কেউ আশা করেনি যে এতবয়সে বৃদ্ধ আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। সে অস্ফুটস্বরে আপনমনে বলতে লাগলো—"কাল—কাল—"

বৃদ্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে বটে, কিন্তু সে চক্ষে জীবন-সঙ্গিনীকে আর দেখতে পাবেন না। এর চেয়ে চির অন্ধকারই তার ছিল ভালো!*

শ্রীঅমিয়া দত্ত

---

* Henri Barbusse হইতে।

কুণাল

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে

অসিত

প্রথম দৃশ্য

অন্তঃপুরের রাজোদ্যানে রাণী তিষ্যরক্ষিতা ও সখী সাগরিকা। উভয়ে পুষ্করিণীতীরে প্রস্তরের বেদিকায় ব'সে বীণা বাজাচ্ছেন।

তিস্যরক্ষিতা

(বীণাবাদন শেষ ক'রে বীণাটি পাশে রেখে) সাগরি, তোর দ্বারা দেখ্‌চি কোনো কাজ হবে না।

সাগরিকা

তা, কি করি বল? তোমার ছেলে, তুমি তাকে বশে আনতে পারচ না, আমি কি করি বাপু?

তিস্যরক্ষিতা

না সত্যি, সতীন অসন্ধিমিত্রার গর্ভজাত এই কুণাল ছেলেটা আমার দু'চক্ষের বিষ।

সাগরিকা

হ্যাঁলা, হাঁ, তা' জানি; তাইত তার দিদি চারুমতিকেও জন্মের মত দেশ ছাড়তে হ'ল!

তিস্যরক্ষিতা

তা ঠিক্। কিন্তু এখন তুমি এই ছেলেটিকে বশে এনে ওর সর্ব্বনাশসাধন যতক্ষণ না করবে ততক্ষণ আর তিষ্য তিষ্ঠবে না জেনো।

সাগরিকা

হাঁলা সই, রাণী কুরুবকীর ছেলেদের উপর তো তোমার কোনো রাগ দেখি না?

তিস্যরক্ষিতা

কেন জানি না, ঐ কুণালের বাঁশীর স্বর বা তার পদ্মপলাশ-চোখদুটো দেখলেই আমার সর্ব্বঅঙ্গে যেন অগ্নিসঞ্চার করে।

সাগরিকা

তা' দেখ, তুমি যখন ওকে বশে আনতে পারচ না তখন নাহয় এক কাজ কর না?

তিস্যরক্ষিতা

কি বল?

সাগরিকা

কেন, রাজাতো তোমার রূপ-যৌবন-মুগ্ধ হ'য়ে আছেন—তোমারি কথায় ওঠেন বসেন। তাঁকে ব'লে কুণালকে পাটলিপুত্র থেকে কোথাও সরিয়ে দাও না?

তিস্যরক্ষিতা

হ্যাঁলা হ্যাঁ, পোড়ামুখি! তা আর কি আমি চেষ্টা করিনি? কিন্তু কুণাল বলতে ওঁর মুখ দিয়ে নাল পড়ে—এমন ছেলেকে নাকি তিনি একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারবেন না।

সাগরিকা

না ভাই, তুমি মনে করলে ওকে কোনো রাজকাজের অছিলা ক'রে নিশ্চয় সরিয়ে দেওয়া যায়।

তিস্যরক্ষিতা

হ্যাঁ, তা' বড় মন্দ কথা নয় সাগরি, তারই চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্।

সাগরিকা

ঐরে! ওদিকে মহাদেবী কুরুবকী আসচেন। ততক্ষণ এস আমরা বীণা বাজাই।

উভয়ে বীণাবাদন

রাণী কুরুবকীর প্রবেশ

কুরুবকী

এই যে! উদ্যানে দুই সখীতে তোমরা বেশ জমিয়ে তুলেচ দেখ্‌চি?

সাগরিকা

হাঁগো দিদি, এবার মহা-থের মহাকালার্জ্জুনের দরুন স্তূপারাম বৃহৎ যজ্ঞ-উৎসবে কে কি-কি ভার নেবেন আমাদের তারই এতক্ষণ গবেষণা হ'চ্ছিল।

কুরুবকী

হাঁগো, শুনেচিস্ বোন? তাতপুত্র আমাদের দেবর মহেন্দ্রদেব শ্রমণধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে সহস্র শ্রমণ ও অর্হৎ নিয়ে অর্ণবপোতে সমুদ্রযাত্রা করচেন।

তিস্যরক্ষিতা

(বিদ্রূপের হাসি হেসে) কেন? তাঁর আবার হ'ল কি? তাঁর ত কুণালগত প্রাণ! তাকে ছেড়ে তিনি যে বড় চ'লে যাচ্ছেন?

কুরুবকী

তাইতো, শুনচি বড়রাণী অসন্ধিমিত্রার বড় মেয়ে চারুমতীও ললিতপত্তনের দক্ষিণে দেবপত্তন স্থাপনা ক'রে শ্রমণসঙ্ঘ নিয়ে যেতে আছেন—দেশে আর ফিরবেন না। এদিকে আবার ছেলেদের খুড়োও নৌ-অভিযানে চল্লেন।

তিস্যরক্ষিতা

(সখীর প্রতি ক্রূর কটাক্ষপাত ক'রে) তাইত', হ'ল কি!

সাগরিকা

তাই,—তা' রাজন ধর্ম্মাশোক যে রকম দয়া-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ নিয়ে মেতে গেছেন, আর সমগ্র ভারতে শত-সহস্র পাথরের ঢিবি, স্তূপ আর স্তম্ভ রচনা করাচ্ছেন, তাতে আর সামাজিক ও সাংসারিক বাঁধন থাকে কি ক'রে?

কুরুবকী

কলিঙ্গের যুদ্ধ-অবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই রাজর্ষির রাজ কার্য্যে আর মন নেই। তাঁর সেই যুদ্ধের কঠোর হত্যা বিভীষিকায় এক বিশেষ চেতনা মনে জেগে উঠেচে,—তাই তিনি আর—

সাগরিকা

হাঁ, কিন্তু তাঁর এই ত্যাগভাবের সঙ্গে-সঙ্গে কুণাল ছেলেটির প্রতি এত মায়া বেড়ে উঠলো কেন বলত'?

তিস্যরক্ষিতা

তা' উঠেচে বইকি, নইলে আমার এত অনুরোধসত্বেও তাকে কোনো বড় রাজকাজের ভার দিয়ে প্রবাসে পাঠান না কেন?

কুরুবকী

তা' কী করবেন বল? ও হ'ল স্বর্গীয়া বড়রাণীর বড় ছেলে।

তিস্যরক্ষিতা

তা' ত বটে। কিন্তু আমিই কি ওকে কম ভালবাসি? আমি ওর ভবিষ্যতের ভালর জন্যেই রাজনের নিকট এই প্রস্তাব করেছিলুম।

কুরুবকী

তা' তুমি নাহয় ছেলেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাও না?

তিস্যরক্ষিতা

ছেলে আমার কি কথা শোনে, না আমাকে মানে!

কুরুবকী

তা' নাহয় সাগরিকাকে দিয়ে তাকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে দেখই না একবার।

তিস্যরক্ষিতা

আচ্ছা তা' দেখবো, কিন্তু তুমিও ভাই, ওকে একটু বোঝাবার চেষ্টা কোরো।

সাগরিকা

(কুরুবকীর প্রতি) হাঁ, ও তোমার কথা শোনে বাছা। তোমার কাছে মা বোলে ও নিজেই যায়। তোমার ছেলেদুটিকে যথার্থই সে ভায়ের মত দেখে।

কুরুবকী

ঐ যে! তিবর ও আলাউক আস্‌চে। ওদের দিয়েই কুণালকে ডাকিয়ে পাঠাও না?

তিবর ও আলাউকের প্রবেশ

তিবর

(রাণী কুরুবকীর গলা জড়িয়ে ধ'রে) মা, মা, আজ আমাদের অসিশিক্ষা ও ধনুর্বিদ্যা পরিদর্শন ক'রে রাজা কুণালকে স্বর্ণ-অসি ও স্বর্ণ-ধনু উপহার দিয়েচেন।

জ্বালাউক

হ্যাঁ মা, কুণাল সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হওয়ায় সে ঐ উপহার পেয়েচে।

তিস্যরক্ষিতা

না, তা' নয় রে, তা' নয়। ওর চোখের সামনে দাঁড়ালে ওরই জিত যে হবেই হ'বে তা' জানা কথা।

তিবর

না ছোট মা, আমাদের শব্দ-ভেদী-বাণ-সন্ধান পরীক্ষায় আর সংযত-অসি-সঞ্চালন-দ্বন্দ্ব পরীক্ষায় কুণালই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল।

জ্বালাউক

হ্যাঁ মা, আমাদের গুরু পুলিন্দকদেব বল্লেন, এ বয়সে এত অস্ত্র-কৌশল নাকি দেখাই যায় না।

তিস্যরক্ষিতা

যাও, বাচালতা রাখ। কুণালের জয়গান শুনে শুনে কান ক্ষ'য়ে গেল।

(পুত্রদের প্রতি) এখন যাও বাছারা, আমি যাচ্চি।

কুমারত্রয়ের প্রস্থান

তিস্যরক্ষিতা

ভাইত', কুণাল যখন এতই বীর হ'য়ে উঠেচেন, তখন রাজন্ তাঁকে তাঁর নিজের কাছে আটকে রাখ্‌চেন কেন?

সাগরিকা

হ্যাঁ, তার শিক্ষা ব্যবহারিক জগতে যাতে কাজে লাগে তারই চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

তিস্যরক্ষিতা

হ্যাঁ, ওকে সুদূর প্রবাসে কোনো বড় রাজকাজের ভার দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থাই করা হোক।

সাগরিকা

হ্যাঁ, আমরাও তাই বলি।

তিস্যরক্ষিতা

মহারাজ যখন বোধিদ্রুমের নীচে সন্ধ্যাদীপ জেলে পূজা শেষ ক'রে ফিরবেন, তখন এ বিষয় তাঁর সঙ্গে আমি আলোচনা করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজোদ্যানে রাজকুমার কুণাল, জ্বালাউক ও তিবর

কুণাল

ভাই জ্বালাউক! মহা-থের উপগুপ্তের মুখে শুনলুম যে, রাজর্ষি ধর্ম্মাশোক নাকি বৌদ্ধ-তীর্থ-পরিক্রমা শেষ ক'রে ললিতপত্তন থেকেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন!

জ্বালাউক

না ভাই, আমি তো শুনেচি যে, রাজকুমারী চারুমতি দিদিই নাকি সেখানে তাঁর স্বর্গীয় স্বামীর নামে একটি সঙ্ঘ পত্তন ক'রে সেখানেই বাস করবেন।

কুণাল

কেন? তিনি কি পিতা ধর্ম্মাশোকের সঙ্গে তীর্থপর্য্যটন শেষ ক'রে আর পাটলিপুত্রে ফিরবেন না?

তিবর

কেন ভাই জ্বালাউক! দিদি কি ছোটমার কথায় রাগ ক'রে—

জ্বালাউক

আরে চুপ্ চুপ্ বোকা, কে আবার কোথা থেকে শুনতে পাবে। জানিস তো ছোটমার—

কুণাল

না ভাই, কাজ নেই ওসব কথায়। তবে শোন্ বাঁশী বাজাই।

কুণালের প্রভাতী-সুরে বংশীবাদন

তিবর

ভাই কুণাল, তোমার চেয়ে উদয়নের রাজপুত্র 'পৌষ্প-মিত্রের বাঁশীর খ্যাতি এত বেশী কেন?

জ্বালাউক

ভাই, তা' হবে না কেন? সে সবজায়গাতেই নিজের বিদ্যার প্রচার ক'রে বেড়ায়। কুণাল বেচারি তো—

কুণাল

যাঃ ভাই জ্বালাউক! কি যে বকচিস্!—ওদিকে শুনেচিস্ রাজন তাঁর সাম্রাজ্যে জীবহিংসা একেবারেই তুলে দিলেন? আর ভারতের নানাস্থানে—তক্ষশিলার উত্তর-পশ্চিমে, নগরহার থেকে সুরু ক'রে সৌরাষ্ট্রে, চম্পায়, রূপনাথে ও সিদ্ধপুর প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে ধর্ম্মধর্ম্মের বাণী পর্ব্বতগাত্রে ও তাম্রফলকে উৎকীর্ণ ক'রে প্রচার করেচেন?

তিবর

তাতে কি দেশের হিন্দুরা প্রাচীনপদ্ধতি-অনুসারে দেবতার উদ্দেশ্যে জীববলি একেবারে ছেড়ে দেবে?

কুণাল

কেন? রাজন্ তো কোনোদিন কোনো ধর্ম্মবিশেষের উপর কখনো অশ্রদ্ধা দেখাননি। দেখ না, তিনি নাগার্জুনী পর্ব্বতে নগ্ন আজিবক সাধুদের পর্য্যন্ত পাহাড়ের গায়ে প্রাসাদ-রচনা ক'রে দিয়েচেন।

জ্বালাউক

কিন্তু ভাই, যদি রাজকুমারী চারুমতি দিদি সত্যিই ললিতপত্তন থেকে দেশে আর না ফেরেন তো—

তিবর

হাঁ ভাই, তাহ'লে আমাদের চেয়ে বেচারি কুণালেরি বেশী বিপদ। তিনি তাকে ডানার নীচে পাখীর ছানা যেমন ক'রে রাখে তেমনি সকল বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন।

সহসা শশব্যস্ত হ'য়ে সাগরিকার প্রবেশ

সাগরিকা

বাছারা, বেলা হ'য়ে গেল যে—নাইবার খাবার সময় হ'ল।

সকলে

যাই আইমা। যাই—

সাগরিকা

কুণাল, তোদের জন্যে তোর ছোটমা সোনার বাটিতে পায়েস রেঁধে রেখেচেন—চান ক'রে গিয়ে খেয়ে আয় সব্বাই।

কুণালের বাঁশী বাজাতে বাজাতে প্রস্থান

সাগরিকা

দেখ্‌লি? দেখ্‌লি তোরা! ছোট রাণীমা কি সাধে চটে ওর উপর? তোদেরও তিনি বিমাতা তো বটেন, কিন্তু—

জ্বালাউক

তা' বল্লে কি হয়? কুণাল যেচক্ষে তাঁকে দেখেচে, আর কুণালকেও তিনি যেচক্ষে দেখেন তারই উপর সব নির্ভর করে।

তিবর

তা' যা'ই বল ভাই, কুণালেরও একটু বেশী বাড়াবাড়ি আছে। এই ত' পায়েসটা খেয়ে এলেই ত' হ'ত? এত ছল কেনরে বাপু?

সাগরিকা

হ্যাঁ, বাছা! তা' তোরা একটু ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখ্‌না?—জানিস ত ছোট রাণীমার প্রকোপ—

উভয় ভ্রাতা

না, তা আর বলতে হবে না। কিন্তু ও কি বুঝবে?

সাগরিকা

একটু তোরা বাছা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করিস।

সাগরিকার প্রস্থান

তিবর

ঐ দেখ ভাই! দলে দলে সারি সারি শ্রমণেরা স্তূপারামের দিকে যাচ্চে; বোধ হয় আজ বোধিদ্রুমের উৎসব হবে।

জ্বালাউক

ঐ দেখ্, শ্রমণেরা এইদিকেই আসচেন।

(একদল পীতবসন-পরিহিত শ্রমণের দীপ-হাতে প্রবেশ ও ধীরে ধীরে মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে প্রস্থান।)

শ্রমণদের মন্ত্র

ঘন সারগ্ন দীপেন তম ধ্বংসিনা

তিলোক দীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোনুদম্।

তিবর

আয় ভাই, আমরাও এঁদের সঙ্গে উৎসবে যাই।

জ্বালাউক

না ভাই তিবর, আগে ছোট রাণীমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসিগে চ'।

তিবর

না ভাই, আমার কিন্তু অন্তঃপুরে যাবারই আর স্পৃহা হয় না।

জ্বালাউক

কেন রে? তোরও কি কুণালের ছোঁয়াচ লাগল নাকি?

তিবর

না ভাই, কেন জানিনা, রাজমাতা তিস্যরক্ষিতার দৃষ্টি আমার যেন অসহ্য বোধ হয়।

জ্বালাউক

হ্যাঁ ভাই তিবর, দেখনা, তাঁরই ক্রূর-দৃষ্টির আঁচে প'ড়ে কতলোক রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হ'ল; এমন কি বোধিদ্রুমটি পর্য্যন্ত তিন-তিনবার আগুনে পুড়লো।

তিবর

না ভাই, এখন এর বিহিত কী করা যায় তাই বল। তা' একবার খুল্লতাত মহেন্দ্রদেবের কাছে এ বিষয় পরামর্শ নিলে হয় না?

জ্বালাউক

দেখ ভাই, তিনি রাজভ্রাতা হ'য়েও এ রাজ্যে টি'কতে পারচেন না। তিনি শুনচি সহস্র অর্হৎ ও শ্রমণ নিয়ে শীঘ্রই তাম্রলিপ্তি থেকে তাম্রপর্ণি সিংহলে সমুদ্রাভিযান করবেন।

তিবর

তাই তো, আমাদেরও কি তাহ'লে খুল্লতাতের পথ অনুসরণ করতে হবে নাকি?

জ্বালাউক

তাহ'লেও কি রক্ষা আছে রে? নকুলের নিঃশ্বাসের কাছে সাপের যা' দশা, তাই আমাদের। যেখানেই থাক্‌না কেন তার কুফল ফলবেই ফলবে।

তিবর

তা' কি করা যায় বল?

জ্বালাউক

ভাই, এখন বিলম্ব না ক'রে ছোটমার কাছে যাই চ'।

কুণালের প্রবেশ

কুণাল

আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এলুম।

তিবর

সে কি? বিদায় কেন?

কুণাল

এইমাত্র রাজাদেশ পেলুম তক্ষশিলার শাসনভার নেবার জন্যে।

জ্বালাউক

তা'ত খুবই আনন্দের কথা। এতে তুমি অত কাতর কেন?

তিবর

তোমার ত ভাই, ছেলেবেলা থেকেই এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল—পিতা ধর্ম্মাশোকের মত যৌবনে তক্ষশিলার বা উজ্জয়িনের শাসনকর্ত্তা হবার?

কুণাল

হাঁ, কিন্তু আমার সে আকাঙ্ক্ষা শেষ হ'য়ে গেছে, আমার মা অসন্ধিমিত্রা দেবীর অকালমৃত্যুতে আর চারুমতি দিদির সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে।

জ্বালাউক

তাই ত। তাহ'লে তুমি কি করবে?

কুণাল

কি আর করব? রাজাদেশ পালন ছাড়া এক্ষেত্রে আর কি করতে পারি ভাই!

তৃতীয় দৃশ্য

তক্ষশিলার রাজপথ—কয়েকজন লোক বিচিত্র পোষাক প'রে

১ম পথিক

না ভাই, তক্ষশিলার উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা কুণাল বটেন। কিন্তু—

২য় পথিক

আবার 'কিন্তু' কেন রে? তোর আর দেখচি মনের মত কেউ কখনো জোটে না। 'কিন্তু' একটা লেগেই আছে!

১ম পথিক

তা ভাই, যে-রকম যবনভূমি উদয়নের ব্যাপার চলচে, তাতে আর আমার কোনো ভরসাই হয়না যে, রাজকুমার কুণাল সামলাতে পারবেন।

২য় পথিক

কেন রে? নগরহারের সামন্তরাজ বিবস্তুের অধীনে যবনপ্রজা-শাসন কি অসম্ভব হ'য়ে উঠেচে নাকি?

১ম পথিক

হাঁ ভাই, নগরহারের উত্তর-পশ্চিমের বড় বড় শহর-গুলিতে বিদ্রোহ দেখা দিয়েচে শুনচি।

২য় পথিক

কিন্তু শুনচি এ নাকি পাটলিপুত্রের কোনো কুচক্রীর চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

১ম পথিক

তুই কি বলতে চাস্ এই সুদূর যবনভূমিতেও পাটলিপুত্র থেকে তিষ্যরাণীর চর এসে পৌঁছেচে?

২য় পথিক

আরে চুপ্! চুপ্! ওনাম মুখে আনিসনে!

১ম পথিক

হাঁ ভাই, চাষাভুষো লোক আমরা, আদার পণ্যব্যবসায়ী অর্ণবপোতের খবর কি জানবো বল?

২য় পথিক

ঐ দেখ, রাজকুমার বেরিয়েচেন আজ শহর-প্রদক্ষিণ করতে। তাঁর সঙ্গে প্রাচীন অমাত্যসচীব জীববর্ম্মণও আছেন দেখ্‌চি।

১ম পথিক

হাঁ, দেখ্ দেখ্ আবার সেই কলিঙ্গদেশের অজিবক সঙ্ঘটাও আজ শোভাযাত্রায় জুটেচে!

২য় পথিক

হাঁ রে! আজ পুরো অভিযান দেখচি!—রাস্তার দু'ধারে রঙিন পতাকা, রঙিন সাজে শহর সেজেচে আজ।

১ম পথিক

ঐ রে! সবশুদ্ধু ঘাড়ের উপর এসে পড়ল বুঝি—স'রে পড়্ রে, স'রে পড়্।

পথিকদ্বয় সরতে-না-সরতেই কুণাল অমাত্যসচীব ও অন্যান্য অমাত্যবর্গেরা শোভাযাত্রায় সমাসীন

কুণাল

জীববর্ম্মণ, আমি আজ মাসাবধিকাল পিতার মঙ্গললিপি পাচ্ছি না কেন?

জীববর্ম্মণ

কুমারদেব! হয়ত ধর্ম্মরাজ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের নানান প্রচারকার্য্যে ব্যস্ত আছেন।

কুণাল

না, আমার মন বড়ই চঞ্চল হ'য়ে উঠেচে তাঁর সংবাদ পাবার জন্যে।

জীববর্ম্মণ

কুমারদেব! আমার অপরাধ যদি না নেন ত—

কুণাল

বল, বল, জীববর্ম্মণ! পাটলিপুত্রের কি কোনো সংবাদই পাওয়া যায়নি এতদিন?

জীববর্ম্মণ

হাঁ, পাওয়া গেছে।

কুণাল

তবে আমায় জানানো হয়নি কেন ?

জীববর্ম্মণ

এ সংবাদ জানানো সম্ভব নয় ব'লে।

কুণাল

সে কি ? এমন কি সংবাদ হ'তে পারে যে শাসনকর্ত্তার নিকট অমাত্যসচীব গোপন রাখতে পারেন ?

জীববর্ম্মণ

হাঁ, তা' এক্ষেত্রে সম্ভব। কিন্তু আর গোপন রাখার কোনো উপায় নেই, নিবেদন করতেই হবে আমায়। আপনার ভ্রাতা কুমার তিবরদেব আসচেন তক্ষশিলার শাসনভার আপনার কাছ থেকে নিতে।

কুণাল

সে কি ?

জীববর্ম্মণ

হাঁ কুমারদেব ! তার উপর রাজসঙ্কেত-সম্বলিত যা' অনুজ্ঞালিপি পাওয়া গেছে তাতেতো আর—

কুণাল

কৈ—? তুমিত এই অনুজ্ঞালিপির কথা আমায় কিছুই জানাওনি .

জীববর্ম্মণ

না, জানানো আবশ্যক বিবেচনা করিনি।

কুণাল

কতদিন হ'ল এই রাজনির্দ্দেশ পাওয়া গেছে ?

জীববর্ম্মণ

প্রায় মাসাধিককাল হ'ল।

কুণাল

কোন্ দিনে ?

জীববর্ম্মণ

অমাবস্যার প্রারম্ভে।

কুণাল

রাজাদেশ লিপিখানি কি একবার দেখ্‌তে পারি ?

হাঁ, এই দেখুন, কিন্তু—

কোমরবন্ধের ভিতর থেকে চিঠিখানি বার ক'রে কুণালের হাতে দিলেন। কুণাল চিঠিখানি প'ড়ে তাঁকে সেটি ফিরিয়ে দিয়ে মাটিতে ব'সে পড়লেন এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অমাত্যরাও ব'সে পড়লেন।

জীববর্ম্মণ

অরিন্দ, রাজকুমারের রাজানুশাসনের পুরোপুরিটা মানবার ত কোনো প্রয়োজন দেখি না ?

অরিন্দ

হাঁ জীববর্ম্মণ ! আমার তো মনে হয় ওঁর উৎপলের মত চক্ষুদুটিকে উৎপাটন করার কথা বড়ই কঠোর। তবে নির্ব্বাসনদণ্ডটা—

জীববর্ম্মণ

না না তা' বলচিনে। নির্ব্বাসন ত অবশ্যম্ভাবী।

কুণাল

না অমাত্যসচীব ! রাজাদেশকে আমি বিধি-আজ্ঞা ব'লে মনে করি। রাজাদেশ ও বিধি-আজ্ঞা যা' তাই হোক্।

জীববর্ম্মণ

সে কি কুমারদেব ! নির্ব্বাসনক্লেশের উপর অন্ধত্বলাভ—এ নিষ্ঠুর কঠোর শাসন কখনই—ধর্ম্মাশোকের দেওয়া নয়।

অরিন্দ

হাঁ, আমার মনে হয় এ নিশ্চয় কোনো দুষ্টুলোকের ষড়যন্ত্র।

কুণাল

তা' জানিনা, যখন লিপিখানিতে রাজসঙ্কেত জাজ্বল্যমান রয়েছে তখন সন্দেহ করাও পাপ।

জীববর্ম্মণ

তাহ'লে—!

হাঁ, আজই আমার যা' বা, কর্ত্তব্য সব চুকিয়ে ফেলা ভাল।

কুণাল

কিন্তু, তক্ষশিলায় নূতন শাসনকর্ত্তা না-পৌঁছান পর্য্যন্ত —

কুণাল

না, আমার কাজের ভার প্রবীণ অমাত্যসচীব জীববর্ম্মণ ততদিন গ্রহণ করবেন।

অরিন্দ

না, তা' হয় না যুবরাজ!

জীববর্ম্মণ

কুমার তিবরদেবও পৌঁছে গেছেন। কিন্তু আমিই তাঁকে আমার গৃহে গোপনে রেখেছিলুম এই ক্রূর ভাগা-পরিহাসের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাবার ইচ্ছায়।

কুণাল

না জীববর্ম্মণ! আমি এই ভাগ্যলিপিকে এড়াতে চাই না। একে বরণ ক'রে নিতে চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

পাহাড়ের নীচে বনের মধ্যে একটি কুটীর—ঋতা ও সংযুক্তা

ঋতা

আচ্ছা মা, আমার সেই স্বপ্ন কি কখনো সফল হবে?

সংযুক্তা

হাঁ ঋতা, আমি তো বলেচি হবে!

ঋতা

কৈ, সেই ছদ্মবেশী রাজপুত্রের বাঁশীর স্বর তো আজও শুনতে পেলুম না?

সংযুক্তা

আরে পাগলী! তা কি আর যখন-তখন শোনা যায়?

ঋতা

তবে কখন শুনবো মা?

সংযুক্তা

যখন ঠিক্ সময় হবে মা তখন!

ঋতা

সেই দিনই—কি মা, সত্যি সত্যি আমাদের মুক্তি?

সংযুক্তা

হাঁ ঋতা, যেদিন তোর স্বপ্ন সফল হবে, আমরাও সেই-দিনই মুক্তি পাব।

ঋতা

আমি তো প্রতিদিন প্রতিরাত্রি সেই পদ্ম-পলাশ-লোচন রাজপুত্রের বাঁশীর প্রতীক্ষায় এই দুয়ারের প্রান্তটিতে পাহাড়-তলীর নীচে ব'সে আছি।—সে কেন আসচে না?

সংযুক্তা

আসবে রে, আসবে—নিশ্চয়ই আসবে।

ঋতা

পাহাড়ী ঝরণার জল নুড়িগুলি বেয়ে পড়তে পড়তে যে সুর দেয় তারই ভিতর যেন সেই স্বপ্নে দেখা অরূপের রূপ আমার এক-এক সময় চোখে পড়ে।

কুঠারহস্তে মধুদত্ত বণিকের প্রবেশ

মধুদত্ত

আরে এই মেয়েটা "বাঁশী শুনবো" "বাঁশী শুনবো" ব'লে আচ্ছা ক্ষেপে গেল দেখচি! এদিকে রাঁধবার কাঠের যোগাড় নেই,—আচমনের জল নেই—

সংযুক্তা

তা' তোমার মেয়ের স্বপ্ন সফল হয় তো মঙ্গলই হবে।

মধুদত্ত

হাঁ রেখে দাও! রাজা ওদিকে দয়াধর্ম্মের শিলাগুস্ত-স্তূপ খাড়া করাচ্ছেন, এদিকে রাজরাণীর প্রকোপে দেশের লোক দেশছাড়া হ'ল।

ঋতা

পিতা, সত্যি সত্যিই কি তুমি আর দেশে ফিরে যেতে পাবে না?

মধুদত্ত

হ্যাঁ রে হাঁ, লক্ষীছাড়া কুণালটাকে আমি বাণিজ্যের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে বাণিজ্যপোত সমেত জলে ডুবিয়ে মারতে পারিনি ব'লেইত এই সাজা।

ঋতা

বল কি পিতা ? ধর্ম্মাশোকের রাজ্যে এত বড় অবিচার ?

মধুদত্ত

হাঁ ঋতা, হাঁ। (দূরে দ্বারের বাইরে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ ক'রে) আরে মোলো যা, লোকটা সোমরস-টোমরস পান করেচে নাকি ? একবার পাহাড়ের রাস্তায় হোঁচ্‌ট খেয়ে পড়চে—আবার উঠে টল্‌তে টল্‌তে চলেচে—

ঋতা

কৈ ? দেখি দেখি পিতা, কৈ ?—

মধুদত্ত

কৈ না, আর দেখা যাচ্চেনা। ওড়াখালির পাহাড়ের গায়ে ঝরণার পথ ধ'রে বেঁকে চ'লে গেল।

ঋতা

তা' যাই বল, আমার আর এই পাহাড়তলী ছেড়ে কোনো শহরে বা লোকালয়ে যেতে ইচ্ছে হয় না বাবা !

মধুদত্ত

হ্যা, তোর এই এক কথা, পাহাড়-পর্ব্বতে থেকে কি করবি ?

এমন সময় দূরে বংশীধ্বনি

সংযুক্তা

ঐ দেখ্ মা ঋতা, তোর স্বপ্ন বুঝি আজ সফল হ'ল ! দেখ্ ! দেখ্ ! কি মিষ্টি বাঁশীর সুর শোনা যাচ্চে !

ঋতা

হাঁ মা, আমারও মন যেন বলচে যে, সেই স্বপ্নেশোনা বাঁশীই বাজচে।

সংযুক্তা

বাঁশীর সুর যেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসচে ; আর সামনের ঐ গগনভেদী চৌমুখনাথ পাহাড়ের চূড়ার উপর তার কেমন মধুর প্রতিধ্বনি হ'চ্চে !

ঋতা

মা, কেন জানি না, আমার চোখে যেন কে ঘুমের আঁজন পরিয়ে দিলে ! আমার বড় ঘুম পাচ্চে—

ঋতা মাটিতে লুটিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল

সংযুক্তা

ওমা, মেয়েটা যে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল !

মধুদত্ত

(ঋতার নিকট এসে দেখে) তাঁ তাইত ? এদিকে পথিকও যে প্রায় আমাদের সামনে এসে পড়ল। তাকে এখন বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্চে।

সংযুক্তা

কৈ ? তার বাঁশী ত আর শোনা যাচ্চে না ? ঐ যে ! কে যেন নিকটেই কোথাও সজোরে পাহাড়ের গা বেয়ে প'ড়ে গেল !—যাও যাও, শীঘ্র বাইরে যাও—ধ'রে তোলো ওকে !

মধুদত্ত খানিক পরেই কুণালকে কাঁধে ক'রে নিয়ে এলেন। কুণাল অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বাঁশী হাতে।

মধুদত্ত

সংযুক্তা ! সংযুক্তা ! দাও দাও, এঁর মুখে শীঘ্র জল দাও ! বেচারীর সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে ! আলো আন।

সংযুক্তা

(আলো আর জল এনে) একি ? এযে রাজপুত্রের মত চেহারা ! পদ্মপলাশ-চোখদুটি বাছার একেবারে কোটরে ঢুকে গেছে ! (চোখে মুখে জল দেওন ও বাতাস করণ)

মধুদত্ত

(আলো দিয়ে ভাল ক'রে দেখে) একি ? এযে একেবারে অন্ধ ! হাতে বাঁশের একটি বাঁশী। বাঁশীর গঠন ও কাজ দেখলে মনে হয় কোনো নিপুণ শিল্পীর তৈরী।

ঋতা

(ঘুম থেকে উঠে) একি ? আমি কি এখনো স্বপ্ন দেখচি ? সামনেই বা ইনি কে শুয়ে আছেন ? সত্যিই কি সেই স্বপ্নপুরীর রাজপুত্র এসেচেন ?

মধুদত্ত

আঃ, ভারি বিপদ করলে দেখছি ! এখন মেয়ের পাহাড়ী-স্বপ্নের কথা না ভেবে, এই যুবককে বাঁচাবার ভাবনাই ভাব আগে।

কুণাল

(উঠে ব'সে) না, আমার ভাবনা আপনারা ভাববেন না। আমি অতি হতভাগা ! ঐ তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হ'চ্ছে—ওঁরই পরিচর্য্যার প্রয়োজন বেশী।

ঋতা

বাবা, আমি এঁর সেবা করব, তোমরা কিছু ভেবো না।

মধুদত্ত

তা' এঁর ভার তাহ'লে তুইই নে ঋতা, আমরা ভিনগাঁয়ের ভীলসর্দ্দারের বাড়ীতে এই ক'টা জিনিষ দিয়ে দু'মণি ধান কিনে আনিগে।

ঋতা

তা' বেশ, তোমরা যাও।

মধুদত্ত ও সংযুক্তার প্রস্থান

ঋতা

(কুণালের কাছে এসে) তুমি কি সত্যি সত্যি রাজপুত্র ?

কুণাল

কেন ? তা' জেনে তোমার লাভ কি ?

ঋতা

না, আমার স্বপ্নের সঙ্গে সব মেলে কি না তাই ভাবছি।

কুণাল

হাঁা, তবে এখন আমি তোমার একজন অতিথি মাত্র

ঋতা

তুমি একলা কেন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্চ ?

কুণাল

সে অনেক কথা, তোমায় আর কি বলব ?

ঋতা

না, আমায় বলতেই হবে।

কুণাল

দেখ, ব'লে কোনো লাভ নেই। তাছাড়া আমি অন্ধ, আমার আর কখনো পিতৃরাজ্যে ফেরবার কোনো আশা নেই। তবে—

ঋতা

কেন ? তুমি পিতৃরাজ্যে নেই বা ফিরে' গেলে, তবু কি তুমি এই—

কুণাল

হাঁা, এই কুটীরের মধ্যে আমি আজ যে আনন্দলাভ করেছি, আজ সাত বৎসর বনবাসের মধ্যে এমন সৌভাগ্য একদিনও ঘটেনি। আজকের এই আনন্দকেই পাথেয় ক'রে নিয়ে আমি তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করতে চাই।

ঋতা

সে কি ? মা-বাবা ফিরে আসা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করবে না ?

কুণাল

না। তবে আমার প্রতীক স্বরূপ আমি এই লিপিফলক তোমায় দিয়ে যাচ্ছি। হয়ত কখনো এর প্রয়োজন হ'লেও হ'তে পারে। আমার নাম এই তাম্রফলকটিতেই পাবে ; তুমি সময় হ'লে দেখো—এখন কাউকেই দেখাবার বা জানাবার প্রয়োজন নেই।

ঋতা

তবে যে আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম যে বাঁশীহাতে রাজপুত্র এসে আমাদের এই বনবাসের দুঃখ ঘোচাবেন, সেটা কি তাহ'লে সবই অলীক স্বপ্ন মাত্র ?

কুণাল

না, তা' নাও হ'তে পারে। আমায় বিদায় দাও এখন।

ঋতা

বেশ, কিন্তু পিতামাতার অনুজ্ঞা না নিয়েই বা আমি তোমায় কি ক'রে বিদায় দি বল ?

কুণাল

তুমি তাঁরা ফিরে এলে বোলো যে, বিদায় না নিয়ে আপনিই সে চ'লে গেছে।

ঋতা

বেশ। কিন্তু তুমি পথ দেখে যাবে কি ক'রে?

কুণাল

আমার বাঁশীর সুর পথের সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে—পথ আপনা থেকেই পেয়ে যাই।

ঋতা

না চল, তোমায় ভিন্‌গাঁয়ের পথ পার ক'রে ওড়াথালির পাহাড়ের ঝরণা পর্য্যন্ত পথ দেখিয়ে দিয়ে আসিগে'। সেখান থেকে পথ এঁকে বেঁকে অনেক পাহাড়-পর্ব্বত পার হ'য়ে তরাইয়ের দিকে নেমে গেছে।

কুণাল

বেশ চল, আমায় নিয়ে চল।

ঋতা আগে আগে পথ দেখিয়ে অগ্রসর হ'ল আর কুণাল বাঁশী বাজাতে বাজাতে তার সঙ্গে চললেন।

পঞ্চম দৃশ্য

পাটলিপুত্রের দুর্গের অন্তর্গত প্রাসাদকক্ষে মহারাজ ধর্ম্মাশোক ও রাণী কুরুবকী সমাসীন। রাজা পদ্মাঙ্কিত স্বর্ণপালঙ্কে ব'সে আছেন, আর রাণী সামনে উচ্চ বেদিকায়।

অশোক

একি! দুর্গপরিখার প্রান্ত থেকে এ কার বাঁশীর শব্দ শোনা যাচ্চে?

কুরুবকী

কৈ রাজন্! আমি শুনতে পাচ্চি না?

অশোক

শুনচোনা? এই রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে একটি বাঁশীর করুণ সুর যেন কতদূর থেকে ভেসে আসচে—শুনতে পাচ্চ না কি?

কুরুবকী

(ভাল ক'রে শুনে এবং চম্‌কে উঠে) হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্চি ব'লে মনে হ'চ্চে বটে।

অশোক

দেখ, আমার অনেকক্ষণ ধ'রে এই বাঁশী শুনে কেমন যেন মনে হ'চ্চে যে এ কুণালেরই বাঁশী। আমার মন কিন্তু বলে যে, সে মরেনি।

কুরুবকী

কেন? তার মৃত্যু-সংবাদ ত সাতবৎসর পূর্ব্বে তক্ষশিলা থেকে পেয়েছিলে তুমি?

অশোক

না কুরুবকী, ভাল ক'রে শুনে দেখ। এ বাঁশীর সুর কুণালের না হ'য়েই যায় না। প্রহরী—

প্রহরী আসিল

প্রহরী

(করযোড়ে) পরম-ভট্টারক!

অশোক

যাও, ঐ দূরে বাঁশীর শব্দ যেদিক থেকে আসচে যাও; আর সেই বংশীধরকে ডেকে নিয়ে এস।

প্রহরী

যথা আজ্ঞা!

প্রহরীর প্রস্থান

কুরুবকী

কেন মিছে একজন গরীব পথিককে কষ্ট দেবে নাথ!

অশোক

যদি সে কুণাল না হয় ত এখুনি তাকে মুক্তি দেব।

কুরুবকী

পথিক মনের আনন্দে বাঁশী বাজাচ্চে—কেনই বা তাকে কষ্ট দেওয়া?

অশোক

হ্যাঁ, এই দারুণ শীতের রাত্রে দুর্গপরিখার বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলে বাঁশী বাজাচ্ছিল—না হয় রাজসমীপে প্রাসাদের মধ্যেই বাজাবে।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী (নমস্কার ক'রে)

রাজন্, একটি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ অন্ধ যুবক বাঁশী বাজাচ্ছিলেন, অনুমতি হয় ত তাঁকে রাজসমীপে নিয়ে আসি।

অশোক

আন তাকে।

রাণী কুরুবকীর কুণালকে দেখেই মূর্চ্ছা

অশোক

একি? এ যে কুণাল! (কুণালের গলা জড়িয়ে ধ'রে) বৎস! একি! তোমার এ দশা করলে কে বল?

কুণাল

আপনি—আমার জনক। আপনার আদেশে এই অধম বিধিলিপির ফলভোগ করেচে মাত্র।

অশোক

না বৎস! তুমি আমায় বল, এ দশা তোমার কে করলে?

কুণাল

আমি নিজে কিছুই বলতে পারব না। তবে রাজ-গোচরে কোনো বিষয়ই গোপন থাকবে না।

কুরুবকী

(মূর্চ্ছাভঙ্গের পর) বাছা কুণাল! তুমি তোমার মা'র মৃত্যুর পর আমারই কোলে তিষর ও জালাউকের সঙ্গে একসঙ্গে মানুষ হ'য়েছিলে। আমাকে বল কে তোমার এ দশা করলে?

কুণাল

আমি আর কিছুই জানি না। রাজচিহ্ন-অঙ্কিত লিপিখানিতে রাজাদেশ যা' সাতবৎসর পূর্ব্বে পেয়েছিলুম, সেইমত তিষরের হাতে তক্ষশিলার ভার দিয়ে, ছুটিচক্ষু উৎসর্গ ক'রে, বনবাসক্লেশ ভোগ ক'রে নানাস্থান পর্য্যটন করতে করতে দৈবক্রমে রাজধানী পাটলিপুত্রে আজ এসে পড়েচি।

অশোক

সেকি কথা? আমার ত কোনো অনুজ্ঞালিপি তোমার কাছে তক্ষশিলায় পাঠাবার কথা মনেই পড়চে না? তা'-হ'লে এতে কোনো দুষ্টলোকের চক্রান্ত আছে নিশ্চয়।

কুরুবকী

হাঁ মহারাজ! তা' আমি কিছু-কিছু জানি, কিন্তু এই সন্তানের সামনে আমি এখন নিবেদন করতে চাই না।

অশোক

বৎস কুণাল, তুমি বল, আমি কী প্রায়শ্চিত্ত করলে তোমার কাছে পাপ মুক্ত হব?

কুণাল

পিতা, আমি আপন দোষেই কষ্ট পাচ্ছি। এখন আমার একমাত্র নিবেদন—

অশোক

বল বৎস, বল?—

কুণাল

ওড়াপালি পর্ব্বতের কোলে নির্ব্বাসন-ক্লিষ্ট বণিক মধুদত্ত-পরিবারকে মুক্তির আদেশ দেওয়া হোক।

অশোক

কৈ তাতো জানি না? মধুদত্তের কাছে যে আমি অশেষপ্রকারে ঋণী! তাঁরই সহযোগিতায় রাজ্যের নানাস্থানে কত স্তূপ, কত সত্র, কত চিকিৎসালয়, জলাশয় প্রভৃতি জনসাধারণের কাজ করেচি তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর এই নির্ব্বাসনক্লেশের কথা তো কৈ কখনো শুনিনি?

কুণাল

কেন? শুনলুম, তাঁকে সপরিবারে নির্ব্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়েচে পাটলিপুত্র থেকে?

অশোক

এঁ্যা? আমি—ঘুণাক্ষরেও এবিষয় অবগত নই!

কুরুবকী

আমি ত জানি, রাজাদেশমত মধুদত্ত কুণালকে নিয়ে বাণিজ্য-পোতে প্রবাসে গিয়েছিলেন।

অশোক

কৈ আমি ত এবিষয় কিছুই জানি না?

কুণাল

উদ্ধার পেলে তাঁর বিষয় তিনি নিজেই রাজসমীপে নিবেদন করবেন। আমি আর কি জানাবো।

রাণী তিস্যরক্ষিতার প্রদীপ-হাতে প্রবেশ

তিস্যরক্ষিতা

হ্যাঁলা কুরুবকী! এখনো রাজকক্ষে যে—(কুণালকে লক্ষ্য ক'রে) এ্যাঁ? একি! এ যে তুমি—কুণাল! (হাত থেকে দীপ প'ড়ে গেল)

কুণাল

হাঁ, মহাদেবী! আমি আপনার সেই অধমপুত্র।

তিস্যরক্ষিতা

অন্ধ তুমি, পথ চিনে তক্ষশিলা থেকে এলে কি ক'রে? আর আমায়ই বা এখন না দেখে চিনলে কি ক'রে?

কুণাল

এখানে দৈবাৎ পথ ভুলে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েচি। আপনার কণ্ঠস্বর শোনবার বেশী সৌভাগ্য আমার হয়নি ব'লেই যেটুকু শুনেছিলুম তাই এতদিন সাদরে সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলুম। রাজন্, আমার আবেদন-মত মধুদত্তর উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হোক।

তিস্যরক্ষিতা

এ্যাঁ, এতবড় স্পর্দ্ধা! তুমি নিজে নির্ব্বাসিত, তুমি আবার অপর নির্ব্বাসিতের মুক্তি দিতে চাও?

অশোক

আমি কালই ভোরে লোক পাঠাচ্চি তাদের মুক্তির ছাড়পত্র দিয়ে।

তিস্যরক্ষিতা

কি? আমার অপমান! আমার অপমান!! এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর সামনে আমার অপমান!!! (চুল ছিঁড়ে গয়না খুলে ফেলে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে ফোঁপাতে লাগলেন)

অশোক

অপমান নয় রাজ্ঞি! আজ থেকে তোমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'ল।

তিস্যরক্ষিতা

শিশুকাল থেকে কালসাপ দুধ দিয়ে পুষেচি—এই কুণালই হ'ল আমার কাল।

অশোক

কুরুবকী! কুণালকে তুমি হাত ধ'রে নিয়ে যাও। ওর যত্নের ত্রুটি যেন না হয়।

কুরুবকী

(জনান্তিকে) আমি বুঝেচি! রাণী তিস্যরক্ষিতার হাত থেকে যখন দীপ পায়ে লুটিয়েচে তখন একটা-না-একটা কিছু অমঙ্গল তার হবেই হবে।

কুণালকে নিয়ে প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

পাটলিপুত্রের রাজপথের ধারে বোধিদ্রুম ও তার চারপাশে পদ্মাঙ্কিত পাথরের বেড়া। কয়েকজন সাধারণ লোক।

১ম ব্যক্তি

ওরে ভাই ভোলা, এযে শহর, রাজার প্রাসাদ সব থম্‌থমে হ'য়ে উঠ্‌লো? কারু মুখে যে আর রা নেই রে!

২য় ব্যক্তি

যেন ঠিক্ কুঁকো জালার মধ্যে সবাই সরা এঁটে ব'সে আছে!

১ম ব্যক্তি

তাইত রে! ঐ বোধিদ্রুমের নীচে কারা সব দেখ্ জমা হ'চ্চে হল্‌দে হল্‌দে পোষাক পরা।

২য় ব্যক্তি

আরে মোলো ম্যাধা, তুই তুই শ্রমণদের এখনো চিনলিনে?

১ম ব্যক্তি

কেন? ওরা আবার এখানে কি অভিনয় করবে রে?

২য় ব্যক্তি

কি আশ্চর্য্য বোকা—পাষণ্ড-ষণ্ড-লণ্ডভণ্ড-লঙ্কাকাণ্ড কোথাকার! তুই জানিস না, আজ যুবরাজ কুণালের মঙ্গল রাজা এক যজ্ঞ করচেন?

১ম ব্যক্তি

ওঃ, তাই বল্। তিষ্যরাণীকে দেখচি আর এরা কেউ তিষ্ঠতে দিলে না!—কুণালেরি জয় হ'ল।

২য় ব্যক্তি

আরে বোকা, রাণী তিষ্যকে রাজাদেশ-মত বনবাসে দিয়ে মহারাবণ আজ তিনদিন হ'ল ফিরে এসেচে।

১ম ব্যক্তি

আহা! এমন রূপ!—বনে গিয়েও বোধ করি বন আলো করেচেন?

২য় ব্যক্তি

দেখ্, তুই হ'লি যমের অরুচি—তোর আর সৌন্দর্য্য-রুচির পরিচয় দিতে হবে না।

১ম ব্যক্তি

কেন রে?

২য় ব্যক্তি

হাঁ, নইলে তোর মত অমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাতড়ে এক তেলো হাঁড়ির মত ঘর-আঁধার-করা ঘরের-লোক কি কেউ কখন বাছতে পারত?

১ম ব্যক্তি

না ভাই—তা' সত্যি! কিন্তু একি হ'ল বল ত?

২য় ব্যক্তি

কেন রে?

১ম ব্যক্তি

আমরা ত নিশ্চিন্ত ছিলুম তিষ্যরাণী 'গুণ' করেচে রাজাকে ব'লে—কিন্তু এযে দেখচি উল্টো ছিরি হ'ল রে!

জনৈক রাজকর্ম্মচারীর আবির্ভাব

রাজকর্ম্মচারী

(বোধিদ্রুমের নিকটে গম্ভীর আঁচড় টেনে) নাগরিক-সাধারণ এই বৃত্তাসনের উত্তরাবর্ত্তের বাইরে বসবেন, দক্ষিণা-বর্ত্তের পুরোভাগে পুরবাসিনীরা, আর পশ্চাতে বসবেন রাজকর্ম্মচারী

এদিকে ক্রমশঃ জনতাবৃদ্ধি। ধীরে ধীরে লোকের দল গণ্ডী-অঙ্কিত চিহ্নের মধ্যে যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে বোধিদ্রুমটি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে ব'সে গেল। এমন সময় ধর্ম্মাশোক অন্ধ কুণালের হাত ধ'রে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন। সভার জনতা উঠে দাঁড়িয়ে "জয়তি জয় জয় পরম-ভট্টারক পরম-সৌগত দেবপ্রিয় ধর্ম্মাশোকের জয়!" ব'লে সম্মান দেখালে। রাজার পিছনে পিছনে মহা-থের ধর্ম্মপাল অশ্বঘোষ এসে ঠিক মাঝখানে বোধিদ্রুমের নীচে উচ্চমঞ্চের উপর বসলেন।

মহা-থের

রাজন্! আজ এই যজ্ঞেবুদ্ধদেবের দয়া-ধর্ম্মের বাণী পঠিত হবে।

অশোক

এই যজ্ঞ সর্ব্বসাধারণের সমবেদ-প্রচেষ্টায়, সমবেদনায় ও সহানুভূতিতে উজ্জ্বল হোক। বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের জয় হোক্!

মহা-থের

তথাগতের করুণ বাণী শুনতে শুনতে করুণায় হৃদয় বিগলিত হ'য়ে যে অশ্রুবিন্দুপাত হবে, আপনারা সেগুলি সযত্নে নিজ নিজ পাত্রে সংগ্রহ করুন। আর বাণী ঘোষণা শেষ হ'লে আমার সামনে রাখা এই ভিক্ষা-পাত্রে সেগুলি জড় করবেন।

অশোক

প্রভু! আজ এ যজ্ঞের কি এই নির্দ্দেশই স্থির হ'ল?

মহা-থের

হাঁ মহারাজ! এটি তথাগতের করুণবাণী-ঘোষণার যজ্ঞ। এর অনুষ্ঠান আজ এইভাবেই সম্পাদিত হবে। নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত তথাগত বুদ্ধ যে স্থৈর্য্যের সঙ্গে ধ্যানধারণার ফলে অমৃতবাণী প্রচার করেছিলেন আমাদেরও ঠিক সেইরূপ স্থৈর্য্যের আজ প্রয়োজন তা' শোনবার জন্যে।

১ম ব্যক্তি

(জনান্তিকে) আঃ মোলো যা, আবার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে! স্থির হ'য়ে বসনারে বাপু!

২য় ব্যক্তি

আরে চুপ! চুপ! শোন্না, মহা-থের ধর্ম্মপাল অশ্বঘোষ আজ কি বাণী প্রচার করবেন একবার মন দিয়ে শোন্ই না বাপু!

১ম ব্যক্তি

আরে ভাই, আমি ওসব নিব্বান-টিব্বান বুঝিনে—বেঁচে থাকতে মরার বাড়া গাল নেইরে!

৩য় ব্যক্তি

আরে এরা কারা? কি বক্‌বক্ কর্‌চিস তোরা? থাম্‌না!

১ম ব্যক্তি

হাঁ ভাই, মহাথের-এর মুখে যেন এক দিব্যজ্যোতি ফুটে উঠেচে!

২য় ব্যক্তি

আহা! যুবরাজ কুণাল কেমন মাথা হেঁট ক'রে দুটি হাতের উপর ভর দিয়ে মহারাজ ধর্ম্মাশোকের পাশে চুপ ক'রে ব'সে আছেন দেখ্!

৪র্থ ব্যক্তি

হায়! হায়! এমন ছেলেরও চোখ নষ্ট করে গো বাছা!

প্রহরী

স্থির হও! বাণীপ্রচার আরম্ভ হবে।

মহা-থের

বুদ্ধের বাণী আমি আজ প্রাচীন গ্রন্থ থেকে পাঠ করব এবং তার ব্যাখ্যা করব। অবধান কর।

মহা-থের-এর পুঁথি খুলে বাণীপাঠ ও ব্যাখ্যান। শ্রমণদের হাতে একটি ক'রে পাত্র। বাণী যতই গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হ'তে লাগল ততই চোখের জলে পাত্র ভ'রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বাণীপাঠ ও ব্যাখ্যান সমাপ্ত হ'তেই সবাই করযোড়ে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে ব'লে উঠলেন "বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি!" "ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি!" "সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি!" "শান্তি!" "শান্তি!" "শান্তি!"

মহা-থের

এখন তোমাদের করুণাবিগলিত অশ্রুবারি আমার এই ভিক্ষাপাত্রে ভ'রে দাও।

"যথা আজ্ঞা" ব'লে সকলে উঠে গিয়ে একে একে প্রণাম ক'রে সেই পাত্রে তাদের সঞ্চিত চোখের জল ঢেলে দিলেন। মহা-থের তখন মনে মনে মন্ত্র আবৃত্তি ক'রে কুণালের চোখদুটি সেই জলে ধুয়ে দিতেই তার চোখদুটি ধীরে ধীরে খুলে গেল। কুণাল সামনে পিতাকে দেখ্‌তে পেয়ে প্রণাম ও আলিঙ্গন করলেন। জনতা থেকে পুষ্পবৃষ্টি, লাজবর্ষণ এবং নানাবিধ আনন্দের উচ্ছ্বাস হ'তে লাগল কুণালের উদ্দেশ্যে।—এমন সময় জনতা ঠেলে মধুদত্ত বণিক তাঁর কন্যা ঋতা ও সংযুক্তাকে নিয়ে কুণাল ও অশোকের সামনে উপস্থিত হ'লেন।

অশোক

এই যে মধুদত্ত যে! আর এঁরা সেই তোমার রূপসী ও বিদুষী কন্যা ঋতা, আর সহধর্ম্মিনী সংযুক্তা?

মধুদত্ত

(প্রণাম ক'রে) আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু! আপনারই দাসী এঁরা।

অশোক

কুণাল! এঁদেরই কথা তুমি আমায় বলেছিলে? এঁদেরই মুক্তি তুমি সর্ব্বাগ্রে আমার কাছে প্রার্থনা করেছিলে?

কুণাল

হ্যাঁ পিতা, এঁদেরই কথা বলেছিলুম—যদিও এঁদের এখন চাক্ষুষ দেখে চেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঋতা

(কুণালের পাশে ব'সে) কুণাল! তুমি কি আমায় চিনতে পারচ না?

কুণাল

চিনবো কি ক'রে? চোখে দেখিনি ত তোমায়? তবে কণ্ঠস্বর শুনে অনুমান করতে পারচি।

ঋতা

(কুণালপ্রদত্ত প্রতীকটি আঁচল থেকে বার ক'রে) এটা কি তুমি চিনতে পারচ না?

কুণাল

হ্যাঁ, তা' চিনতে পারচি।

অশোক

গুরু! কুণাল আজ চক্ষুলাভ ক'রে যার প্রতি প্রথম শুভদৃষ্টিপাত করলেন, আমার ইচ্ছা সেই ঋতাকেই তিনি সহধর্ম্মিণীরূপে বরণ করুন!

মহা-থের

তথাস্তু। তা'ই আজ এই সভায় স্থির হ'ল। এও ভগবান বুদ্ধের ইচ্ছা জানবে

"জয় প্রিয়দর্শী ধর্ম্মাশোকের জয়" "জয় মহা-থের ধর্ম্মপাল অশ-ঘোষের জয়" "জয় যুবরাজ কুণালের জয়"—"সাধু" "সাধু" "সাধু" রবে মহাকোলাহলের সঙ্গে সভা-ভঙ্গ।

নিবেদন

এই বইখানিও আমার অন্যান্য নাটিকার মত একাঙ্ক নাটিকা, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনয়ের উপযোগী ক'রে লেখা। কুণালের বিষয় প্রচলিত প্রাচীন কিম্বদন্তী অবলম্বন ক'রে লেখা হ'য়েছে। ঘটনা ও নাম প্রভৃতি যথাসম্ভব ঐতিহাসিক রাখা গেছে।

ইতি—

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

চিন্তা-কণা

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র বি-এ

কলা মাত্রেই অব্যক্তের অভিব্যক্তি। তাহাকে মূর্ত্ত করাই আর্টের চরম সাধনা।—অস্কার ওয়াইল্ড

* *

বর্ত্তমান আর্টের লক্ষ্য ব্যাপকতা নয়; আসল লক্ষ্য প্রগাঢ়তা। আদর্শ-সৃষ্টির কাল আর নাই; অরূপকে রূপ দেওয়াই বর্ত্তমান আর্টের কাজ।—অস্কার ওয়াইল্ড

* *

নব্য কবিরা কালিতে অনেকখানি জল মিশাইয়া দেন।—গোটে

* *

উপন্যাস ব্যক্তিত্বের মহাকাব্য; ইহাতে লেখক নিজের বিচারবুদ্ধি-মত দুনিয়াকে লইয়া নাড়াচাড়া করিবার স্বাধীনতা পাইয়া থাকেন। তাই লেখকের বিচার-বুদ্ধি আছে কি না তাহার বিবেচনা আবশ্যক।—গোটে

* *

জগৎকে সর্ব্বাঙ্গীণ উপলব্ধির অভাবই আমাদের দুর্ভাগ্যের চরম। নিবিড় অনুভবেই জীবনের পরিপূর্ণতা ঘটে।—অস্কার ওয়াইল্ড

ভাবিবার মত যাহাকিছু সেই বিষয়গুলি কেহ না কেহ পূর্ব্বেই ভাবিয়াছেন। পুনরায় ভাবিয়া তাহাকে নব-নব রূপ দেওয়াই আমাদের কাজ।—গোটে

* *

অধিকাংশ লোকেই যাহা তাহারা নয় তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করে। স্বাধীন চিন্তার শক্তির অভাব, তাই তাহারা অপরের মতামতের পুনরাবৃত্তি করে ঠিক সংয়ের মত। ইহাদের হৃদয়ের রাগ-অনুরাগ পর্য্যন্ত অপরের নকল।—অস্কার ওয়াইল্ড

* *

প্রত্যেককেই স্বীয় উদ্ভাবিত পন্থানুসারে চিন্তা করিতে দেওয়াই মনুষ্যসমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। নিজের পথেই সত্যের সন্ধান মানুষে নিশ্চয় পাইবে, কিম্বা এমন কিছুও পাইতে পারে যাহা সারাজীবন তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।—গোটে

* *

সমাজ লোকের উপর গুরুদণ্ড দিবার ভার লয়; অথচ সেই সমাজই সহানুভূতির একান্ত অভাবে অপরাধী।

তাহার নিজের অত্যাচার কি বিষম এবং কত প্রকারের তাহা তাহার ধারণার অতীত। দণ্ডের কাল পূর্ণ হইলে দণ্ডিতকে সমাজ একেবারে একা অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া থাকে।—অস্কার ওয়াইল্ড

* *

সহজে কেহ কাহাকেও বুঝিয়া উঠিতে পারে না, যথেষ্ট স্নেহ-ভালবাসা দিয়াও নয়। ক্রমশঃ ভুল বুঝা সুরু হয়, পরিণামে বিচ্ছেদ ঘটে।—গোটে

* *

আদর্শই মানবমনের গিরি-শিখর। দেবতা স্বয়ং এইখানে নামিয়া আসেন, আর মানুষ ধাপে ধাপে উপরে চড়িতে থাকে।—ভিক্টর হুগো

* *

নাটক আর্টের সুবৃহৎ ভাণ্ডার। ইহাতে দেবতা ও শয়তান উভয়েরই যথেষ্ট স্থান আছে।—ভিক্টর হুগো

* *

উপন্যাস 'ব্রোঞ্জে'র মত; ইহা গীতিকাব্য, মহাকাব্য ও নাটকের সংমিশ্রণ।—ভিক্টোর হুগো

* *

ঘরের লোক যাহাকে বুঝিয়া উঠিতে না পারে, তাহার মত দুঃখ ও বিড়ম্বনার জীবন আর কাহার?—আমিয়েল

* *

ছোটখাট জিনিসই মানুষকে বিহ্বল করে, আবার ছোটখাট জিনিসই স্বর্গসুখ আনয়ন করে।—প্যাসকেল

* *

অনুভব করিতে যদি না হয়, দুঃখের অস্তিত্বই থাকে না। পোড়ো বাড়ীতে কিসের বিভীষিকা?—বিভীষিকা শুধু মনে।—প্যাস্‌কেল

* *

মানুষের মহত্ত্ব তার ধী-শক্তিতে। হস্তপদবিহীন অথবা ছিন্নশির মানুষ কল্পনা করা যায় কিন্তু মস্তিষ্করহিত নিশ্চিন্ত মানুষ ধারণার অতীত; সে হয় জড়পদার্থ নয় জানোয়ার।—প্যাস্‌কেল

* *

লোকে জন-স্রোতের পিছনে ছুটে কেন? এদের বিবেচনাশক্তি কি বেশী?—না; জন-মত যে অধিক বলবান।—প্যাসকেল

* *

একদিকে এই পৃথিবী এবং অপর পার্শ্বে স্বর্গ বা নরক—মধ্যস্থলে কেবল আমাদের জীবন। সৃষ্ট সকল বস্তু হইতে তাহা ক্ষীণ—ভঙ্গুর ও নশ্বর ত বটেই।—প্যাসকেল

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র
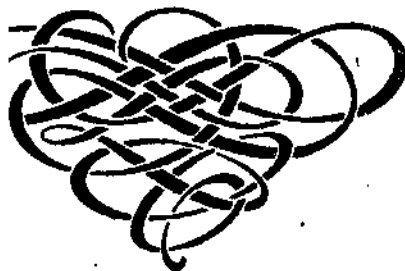
দিক্-বিদিক

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় বি-এল্

দুই-কামরা-বিশিষ্ট পৈত্রিক ভিটাখানির বাহিরের দেয়ালে দুর্গাদাস সাইনবোর্ড ঝুলাইল—'ডাক্তার দুর্গাদাস চক্রবর্তী, হোমিওপ্যাথ্।' পাড়া-প্রতিবেশীর তাহার উপর কৃপাই হইল। আহা! কি করিবে? কিছু করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই ত হোমিওপ্যাথি-ডাক্তার হইয়াছে।

কিন্তু, যে মতের বদল নাই সে মত মরজগতের নয়। এ মতও বদ্‌লাইল।

কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল সব। পথে, ঘাটে, দোকানে, বাজারে দুর্গাদাস শিশু, স্ত্রীলোক, চাষী-মজুর-দিগের কাছেও 'হিটরলজি' 'বেলেরলজি' প্রভৃতি চিকিৎসা বিষয়ে তাহার অশেষ জ্ঞান দেখায়। ইংরাজিতে কলেজে তাহাকে বক্তৃতা দিয়া শিক্ষা দিতে হয়, বলে। যদি বা কখনও সর্দ্দি-কাসি হইলে পাড়ার কেহ একটু ঔষধ চাহে, সে বলে—প্রায় বত্রিশ-তেত্রিশটা ক্রনিক্-কেসের ওষুধ ঠিক করতে হবে, সর্দ্দি-কাসির ওষুধ দেবার সময়ই হবেনা, মশাই!

পাড়ার মাথারা বলিলেন—মুখ্যুর গ্রোট হ'য়েছে ডাক্তার—তার আবার দেমাক! ভুলেও কেউ ওকে ডাকবে না।

পাড়ার ছেলেরা তাহার সহিত কথা বন্ধ করিল।

মানুষ ত সামাজিক জীব। এরূপ নিঃসঙ্গ জীবন দুর্গাদাসের অসহ্য হইয়া উঠিল—হঠাৎ সেদিন চারুকে সে ডাকিয়া ফেলিল।

কি কথা বলে?—চিবুকের উপর আঙুল ঘষিতে ঘষিতে ব্রণের উপর চুণের হাত লাগিতেই সে কহিল—"ভাই পরশু বুঝেছিস, হ'য়ে গিছ্‌ল! নেহাৎ পাঁচজন রুগী রয়েছে হাতে, আমার অভাবে তারাও যায়, এতেই বোধ হয় ভগবান নিলে না, বুঝলি চারু?—"

চোখদুইটি সবিস্তৃত করিয়া চারু কহিল—"ও!"

দুর্গা বলিয়া চলিল—"এই থেকে গলা-টলা ফুলে দম বন্ধ হয় আর কি! মাথার কি ঠিক আছে তখন যে ওষুধ দেখ্‌ব! আর বড়ডাক্তার সবাই ত রীতিমত খাতির করে—চ'লে গেলুম সেই রাত্তির একটার সময়ই ইউনিয়নের কাছে।—"

রুমালে মুখটা একটু ঘষিয়া চারু প্রশ্ন করিল—"তার-পর?"

দুর্গা কহিল,—"তারপর, সেখানে গিয়ে মনে পড়ল, রাত্তিরবেলা—এত রাত্তিরে ইউনিয়ন ত ঘর থেকে বাইরেই আসে না। ফিরে আসব? ওষুধ না হ'লে প্রাণ যায়! বেয়ারা ডেকে বললুম, বল্ চক্রবর্ত্তী মশাই এসেছে।"

চারু উচ্চারিত করিল আর একটি ছোট্ট—'ও!'

দুর্গা বলিল—"সে রাত্তিরে যন্ত্রণায় প্রাণ বেরুয়।—কিন্তু এত আনন্দ হ'ল! দেখলুম যে 'ইউনিয়ন'ও অসম্ভব খাতির করে আমায়। একমিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এসে, হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে বসালে।—"

"হ্যাঁ?"

"শুধু এই! বললে, একটা ফোন্ ক'রে দিলেন না কেন? আমি যেতুম। অসুস্থ শরীরে এলেন!—"

"খাতির তা'হ'লে রীতিমত ডাক্তার মহলে, দুর্গাদা, এঁ্যা? আমাদের ত একদিনও এসব কথা বলেন নি!—"

"কি—একেবারে কথা! আর নিজে মুখে বলাটা আমার দ্বারা হয় না।

'তা' দুর্গাদা, আমাদের একটু কমেসমে দেখবেন, কেমন ত?-

"বরাবরই পাড়ার ওপর আমার টান ত। কিন্তু, পাড়ার ব'লে আমি যেখানে একটাকা নিতুম, সেখানে নীলমণি হাতুড়েকে চারটাকায় নিয়ে আসে।"

"সত্যি, দুর্গাদা, এটা কিন্তু—"

"মানে কি জানিস ভাই? ছেলে বয়েস থেকে দেখ্‌ছে, বিশ্বাস হ'তে একটু সময় দরকার; বাইরের লোকের ওপর সেটা সহজে হয়।"

"হ'লেও, নীলমণির এ পাড়া বন্ধ করবই আমি।—"

"তোদের ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসি চারু!—উঃ! ব্রণটার কি ব্যথা এখনও!—খবর নিস ভাই মাঝে মাঝে।—"

দুষ্টামিতে পাড়ার তরুণদলে চারুর সমকক্ষ একটাও ছিল না।

সেই অবধি সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর, রাত্রি—দিনে কুড়িবার সে ডাকিয়া যাইত—"দুর্গাদা, আছেন?"

দুর্গা উত্তর দিবে কতবার? উত্তর দিত না,—রাগ করিত। কিন্তু নিজেই যে খবর লইতে বলিয়াছিল।—

দুর্গার জ্বর হইয়াছিল তিন-চারিদিন।

সকাল হইতে চারু ডাকিয়াছে অন্ততঃ দশ-বার' বার।

সন্ধ্যায় ডাকিল—"দুর্গাদা আছেন?"

দুর্গার স্ত্রী বিরক্ত হইয়া স্বামীকে আস্তে আস্তে কহিল—"কে গা? কি অলুক্ষণে ডাক,—দিনরাত!"

সকালে পথ দিয়া যাইতে যাইতে চারু হাঁকিল—"দুর্গাদা আছেন?"

গস্ গস্ করিতে করিতে দুর্গা দোর খুলিয়া বাহির হইল।

'তো-তো' করিয়া বলিল—"হ্যাঁ, এ্যাঁ-এ্যাঁ আছি। কোওথায় যাবো? তুই এ-এ রকম করবি জানলে কি আর—"

চারু অপ্রস্তুত হইবে? সে তাড়াতাড়ি বলিল—"কেন? চটছেন কেন? ব্রণটার কথা শুনে সেদিন ভয় হ'য়েছিল,—অথচ সবসময় রুগী দেখে বেড়ান, দেখতে পাইনা একবার, তাই ডাকি। তা'—"

দুর্গার কথা কহিবার আর পথ রহিল না। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে বলিল—"না-না, জ্বর হ'য়েছে—'আছেন, আছেন?'—শোনায় যে খারাপ।"

চারু কথা কহিল না, নমস্কার করিয়া নীরবে চলিয়া গেল।—

* * *

বেশ গুছাইয়া বসা,—দুর্গার আর হইল না।

এপাড়া-ওপাড়ার কেহ ডাক্তার বলিয়াই তাহাকে মনে করে না। রোগী নাই, উপার্জ্জন নাই—একটি মেয়েও হইল।

বর্ত্তমান জগতে অর্থ না থাকিলে মানুষ মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, ইহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল।—

একদিন জ্ঞানবাবু ডাকিয়া বলিলেন—"সতীশের ছেলে বাবা তুই,—বলি শোন্। গলিঘুঁজির মধ্যে ঘুপ্‌টি ঘরের কোণে কি আর পশার হয়!—"

কয়েক মাসের মধ্যেই ধারকর্জ্জ করিয়া, চুণ-সুরকি-ইটের দোকানে বাকি রাখিয়া বড় রাস্তার উপর দুর্গা বেশ একটি ডিস্‌পেন্‌সারির ঘর তুলিল।

নবীনমামা বলিলেন—"সাজাও বেশ ক'রে,—বড় সাইনবোর্ড টাঙাও। হবে বৈকি,—হতেই হবে।"

দুর্গা তাহাই করিল। কিন্তু কৈ?

কালে ভদ্রে একটি অচেনা রোগী যদিই বা আসিল, তাহাতে কি সংসার চলে?

পিতা সামান্য কেরাণী ছিলেন, কিছু ত রাখিয়া যান নাই।

সে ভাবিত, পিতার অত চেষ্টা সত্ত্বেও লেখাপড়া শিখে নাই কেন? অভাব-অনটন যে দিন দিন বাড়িতেছে।

কিন্তু ভাবিলে ত আর পাওনাদার ছাড়িবে না। টাকা নিয়মিত না পাওয়ায়, তাহারা কয়েকজন নালিশ করিল, ডিক্রিও পাইল। জিনিষপত্র, বাড়ীঘর ক্রোক্ হইয়া যাইবে?

স্ত্রী আসিয়া করুণকণ্ঠে বলিল—"দাদার কাছে গিয়ে বললে একটা উপায় হয় না?—"

দুর্গা কোটপ্যাণ্ট, নূতন টুপি পরিয়া, হাতে 'ষ্টেথিস্‌কোপ' লইয়া বাহির হইল। স্ত্রীর ভাইয়ের কাছে একেবারে যা-তা হইলে ত চলে না!

ট্রাম হইতে আহিরিটোলা ষ্ট্রীটের মধ্যে ঢুকিতেই, কয়েকটি তরুণ বেশ হাসাহাসি আরম্ভ করিল। দুর্গার নজর এড়াইল না।

ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিয়া ফেলিল—"ভদ্রলোকের ছেলে ভাই তোমরা, তোমাদের এ কিরকম!—ডাক্তারি ক'রতে গেলে কোটপ্যাণ্ট ত চাই। ছিট্ ত সবই দিশী।—"

আর-একটি দল, তাহারাও হাসে।

সে যে গরীব, তাহার বিরুদ্ধে ক্রোকের হুকুম জারি হইবে এ খবর ইহারা জানিয়াছে না-কি?

সামনের রকের উপর তাহার শ্যালক বসিয়াছিল।

সেও হাসিয়া কহিল—"কি হে, গুডীপ! মাথাও খেলে না-কি?"

বিশেষ রাগিয়া দুর্গা উত্তর দিল—"তো-ওমার কি? সব যাচ্ছে আমার যাচ্ছে! ডাক্তারি ক'রে করেছিলুম, যায়—আবার করব। তোমার কাছে একদিন চেয়েছি?—"

"একেবারে যে অগ্নিশর্ম্মা! টুপিটার 'sale' ছিঁড়তে পার নি?—"

দুর্গার মুখ লজ্জায় কালি হইয়া গেল। আশা করিয়া যাওয়াই তাহার সার হইল। এরূপ কথাবার্ত্তা বলিবার পর সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা কি সম্ভব?—

ফিরিবার সময় ট্রামে দুর্গা ভাবিতে লাগিল,—কাবুলীর কাছে পাওয়া যায় না টাকা? না হয় সুদ বেশীই নেবে।

ট্রাম হইতে নামিয়া সে কাবুলীদের পাড়ার ভিতর দিয়া ঘুরিয়া আসিতেছিল—যদি সুবিধা করিতে পারে।

একজন কাবুলী তাহাকে ডাকিল—"এ বাবু!"

দুর্গার প্রাণটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—কাড়িয়া-কুড়িয়া যাহাকিছু আছে লইবে না ত?

সে কাছে যাইতে কাবুলী তাহার মুখের দিকে বেশ করিয়া তাকাইয়া বলিল—"একঠো আসামী কর দেওগে, বাবু?"

আশাতীত সৌভাগ্য! আর কাহাকে করিয়া দিবে? একআনা সুদে দুর্গা টাকা লইবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল।

পাওনাদারদিগের ক্রোক হইতে বাড়ীঘর রক্ষা হইল বটে, কিন্তু এবার যে নূতন পাওনাদার হইল তাহার হাঁকাহাঁকির ভয় দুর্গার মনে কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিল।—

ডিস্‌পেনসারিতে বসিয়া সে ভাবিতেছিল—আকাশ, পাতাল।

কাবুলীওয়ালার দেনা—আসল ও সুদ; সংসারখরচ, তাহাও কি কম? ইহার পর মেয়ে বড় হইতেছে—এখন হইতে তাহার বিবাহের ব্যবস্থা ও ত করিতে হইবে।

ভাবিলে ভাবনা বাড়িয়াই যায়, উপায় ত হয় না।

একটি রোগীর দেখা নাই। দুর্গা জানালা দিতেছিল, ডিস্‌পেন্‌সারি বন্ধ করিবে। এমন সময় একজন ঢুকিয়া জোড়হস্তে নমস্কার করিল। একখানি চেয়ার টানিয়া বসিতে বসিতে বলিল—"হুজুর কি বেরিয়ে যাচ্ছেন?"

লোকটিকে দেখিয়া ডাক্তার বুঝিল, বেশ অসুস্থ।—চুলে বোধহয় মাসাবধি তেল পড়ে নাই। বয়স কত? পঁয়ত্রিশ।—কিন্তু কপালে গভীর চিন্তারেখা, হাত-পায়ের চামড়া কোঁকড়ান,—চোখ রক্তবর্ণ, বেশ ঢুকিয়া গিয়াছে। বোধহয় গরীব—কাপড়-জামা ছেঁড়া, ময়লা।

কিন্তু, কথাবার্ত্তা নাই, অসভ্যের মত চেয়ার টানিয়া বসায় তাহার উপর সহানুভূতি হইল না

দুর্গা বলিল—"হাঁ, তিন্‌টে কল্ আছে। বড় দেরী হ'য়ে গেছে।—ওঠ, অন্যসময়ে এস।—"

ডাক্তারের পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া আগন্তুক কহিল,—"বড় কষ্ট পাচ্ছি, বাবু। একটা ব্যবস্থা করুন, ম'রে যাবো বাবা।—"

চেয়ারে বসিয়া দুর্গা বলিল, "কি হ'য়েছে?"

"মেজাজটা,—আজ্ঞে। ঠিক করে দিতে পারেন, হুজুর?"

দুর্গা বুঝিল, লোকটির মাথা খারাপ।

তাহার আপাদ-মস্তক আর একবার ভালভাবে দেখিয়া ডাক্তার বলিল—"হ্যাঁ, তা' হবে। তোমার কষ্ট সব কি, বল।"

"হুজুর, ঐ।—ঐ এক কষ্ট। সন্ধ্যার সময় মেজাজটা বিগ্‌ড়ে যায়। পয়সা-কড়ি নেই কি না—"

দুর্গা ভাবিল, যদি বা জুটিল একজন, সেও এমন যে পয়সা-কড়ি নাই।

সে বলিল—"ও।—তা' এক ডোজেই সেরে যাবে।—"

আগন্তুক কহিল "গোলাম হ'য়ে থাকব, বাবা।—একা নয়, দলকে দল।—হাতযশ ছিল, হুজুর, কিন্তু মেজাজ না

থাকলে ত সাহস আসে না, হাত খোলে না, বুদ্ধি জোগায় না—"

শেষের কয়েকটি কথা বলিবার সময় লোকটি জামার হাতা গুটাইয়া লইল। হাত ত রোগা নয়!

ডাক্তার অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাতে ও দাগটা কিসের ?"—

"ও-বাড়িতে কিছুদিন ছিলুম, হুজুর।"

"কোন্ বাড়িতে ?"

"রাজবাড়ি, আজ্ঞে।"

"ও। হাত-যশ কি বলছিলে না ?"

"তাহ'লে হাত কেটে ফেলতুম, কর্ত্তা। তা' নয়।—বুড়ো এক বামুন পেছনে লেগেছিল বড্ড। গঙ্গায় নাইছিল, দিয়েছিলুম জাল-চাপা। জামিনে ছাড়লে না, নইলে—"

ডাক্তার হাসিল,—এরূপ বহুদিন হাসে নাই।

তারপর কহিল—"বাঃ! বাঃ!—তোমার এর চেয়েও বড় হাতযশ আছে নাকি আরো ?—"

"আপনার আশীর্ব্বাদে আছে বৈকি, হুজুর। নতুন জাহাজ এলেই, সাহেবদের কাছে সোনার ব'লে গিল্‌টী গয়না বিক্রি করেছি। চিরেতার জলে নেবু আর সোডা মিশিয়ে দামী বিয়ার ক'রে চালিয়েছি। এইরকম সব।—কিন্তু মেজাজ না থাকলে ত হয় না। পয়সা নেই বাবু,—জেল থেকে বেরিয়ে ফকির হ'য়ে গেছি। ফের কিছু ক'রে নেবারও কি উপায় আছে ? দু'বছরের খত্ লিখে এসেছি, লক্ষীটি হ'য়ে থাকব।—"

এইরূপ একজন কম্‌পাউণ্ডার হইলে ডাক্তারের পশার জমিবে না ?

খুব উৎসাহের সহিত ডাক্তার বলিল—"তা' বেশ! মেজাজ ঠিক করবে রোজ আমার কাছে। এখানেই থাকো, কেমন ?"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া লোকটি পুনরায় পদধূলি লইল।

ডাক্তার প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁ, তোমার নাম বললে না ত ?"

"ধা ~~বাবুজী~~—রোহিণী বা বটব্যাল্।—"

দুইআনা পয়সা হাতে দিয়া দুর্গা কহিল—"এতে মেজাজ হবে না ?"

"খুব—দেবতা!"

* * *

দুর্গাদাসের সংসারে লোক বাড়িল—রোহিণী।

তাহার জন্য সংসারের খরচ বাড়িয়াছিল কি না বোঝা না গেলেও, তাহার সন্ধ্যার মেজাজের খরচটা যে বাড়তি ইহা উপলব্ধি হইত বেশ।

খরচ বাড়ুক, কাজে লাগিল সে আশাতীত। একাধারে সে হইল দুর্গার কম্পাউণ্ডার, দালাল, এ্যাসিষ্টাণ্ট,—ঔষধ তৈয়ারী করিত, রোগী ধরিত, পরামর্শ দিত।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল—রোগী আসিতেছে।

এযাবৎ শ্বশুর, নবীনমামা, জ্ঞানবাবু ঔষধ লইতেছিলেন সপ্তাহে দুই-তিনবার। অথচ একেবারে আত্মীয়, মূল্য চাহিবার উপায় নাই।

রোহিণী একদিন বলিল—"হুজুর, দাম না দিতে হ'লে বেশী ওষুধ খেতেই ইচ্ছে হয়। এ দলের লোকের প্রেসক্রিপ্‌শনে একটু লিখবেন 'হোয়াইটীশ্'—ব্যস্!-

"কেন ?"

"একেবারে হোয়াইট জল দোব।"

দুর্গা না হাসিয়া পারিল না।—

দিন দুই-তিন পরে রোগী আসিতে দেখিয়া ডাক্তার সবিশেষ আনন্দিত হইল।

একজন বৃদ্ধ, আর একটি যুবা—দেশ দখিন, জাতি মুসলমান।

রোহিণী কহিল—"আসুন,—বসুন!"

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল।

জোড়হাতে প্রণাম করিয়া বৃদ্ধ বলিল—"মস্ত ফোড়া হয়েসে এই ছাবালের, এই গো মুরুব্বির পো। ওষুধ-টষুধ কত দেছিলুম ত সে ফাটেনে। যাতনায় ছট্‌ফট্ করছে, বাবু দেখো দেখিনি একটু চিরে দেবে নাকি ?—"

দুর্গা একটু হতাশই হইল।

অস্ত্র-ব্যবহার ত হোমিওপ্যাথের নিয়ম নয়। বিশেষতঃ তাহার মত গৃহ-চিকিৎসার উপরই যাহাদের নির্ভর তাহাদের

ত নয়ই।—কিন্তু, দুই-তিন দিন পরে এই একটি রোগী, তাহাও হাতছাড়া হইয়া যাইবে?

কিছুক্ষণ দেখিয়া, শুনিয়া দুর্গা কহিল—"দেখো এ ফোড়া ঠিক নয়, শক্ত রোগ। একে বলে 'এ্যাব্‌সিস্কেক্‌সিজ্‌',—কাটালে রুগী অনেক সময় বাঁচে না। এর চমৎকার ওষুধ আমি দিচ্ছি। দু' দাগ—ব্যস্‌।"

বৃদ্ধ বলিল—"এই একটি ছাবাল, বাবু।"

রোহিণী গম্ভীরস্বরে বলিল—"ওঃ! ভীষণ রোগ!"

গৃহ-চিকিৎসার কয়েকখানি পাতা উলটাইয়া, দুর্গা একটি শিশিতে জল পুরিল। দুই-ফোঁটা ঔষধ দিয়া কহিল—"তিনঘণ্টা অন্তর দেবে। কাল বেলা একটা থেকে দুটোর মধ্যে ফেটে যাবে।—"

কথা শেষ করিতে না দিয়া বৃদ্ধ বলিল—"এতে হবেনি। কুঁক্‌ড়াক মন্তরতন্তর ক'রে বড় বড় ওঝা কিছু করতে পারলেনে। এ জলপড়ায় হবেনি।—"

রোগীর সামনে প্রকাশ করিয়া বলিতে না পারিয়া রোহিণী বলিল—"এ্যালাপাথিকং গৌজিতম্‌।" মাথা নাড়িতে নাড়িতে দুর্গা কহিল—"জলপড়া কোথায় দেখ্‌লে? আর যা ওষুধ আছে বিষ, সাহেব-ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে না হ'লে দেওয়া যায় না—"

রোহিণী বলিল—"টাকা খরচা, তা না হ'লে সাহেব ডাক্তারকে দেখান কিন্তু খুব ভাল।—শক্ত রোগ।—"

বৃদ্ধ কহিল—"এইগো মুরুব্বির পো, আমার একটা ছাবাল,—চেরাকের পলতে। টাকা হাতের ধূলা, যা' লাগে দিবোঅনে।"

রোহিণী ডাক্তারের দিকে একবার চাহিয়া বলিল—"বেশ, তবে বিকেলে চারটেয় এসো। বাবু থাকবে এখন,—বাবুর আট্‌টাকার তুমি চারটে টাকাই দাও।"

টাকা চারটি দিয়া বৃদ্ধ কহিল—"তবে আসি, বাবু। সাড়ে তিনটায় আসবঅনে।"

তাহারা চলিয়া গেলে, মুখে রুমাল গুঁজিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে দুর্গা রোহিণীর পিঠ চাপড়াইতে লাগিল।

সে বলিল—"দেখুন দিকি হুজুর, সব মাটি হ'য়েছিল আর কি! ক'দিন আপনাকে বললুম গোটাকতক বোতলে রঙগোলা জল পুরে রাখতে, আর আলমারির মধ্যে গোটাকয়েক ছুরি-কাঁচি টানিয়ে রাখতে!"

"দূর পাগল! হোমিওপাথি ডাক্তার—গালাগাল দেবে লোকে যে!—"

"কেন? এখানের যারা আপনাকে চেনে তারা ত চেনেই, বাইরের দুই-একটা এ-রকম রোগী এলে একটু বিশ্বাস করে: কল্‌কেতায় অমন্‌ মিকশ্চার-হোমিওপ্যাথি-ডাক্তার কত গণ্ডা রয়েছে, দেখ্‌তা!"

"বেশ গো, তাই হবে।—আজ সাক্‌সেস হ'লে তোমার মেজাজ পুরোপুরি, আর কন্‌কনে দশটি, রোহিণ্‌। ইউনিয়নের কাছে যথেষ্ট খাতির, তা হ'লেও অন্য কারুর কাছে নিয়ে যেতে পারলে—"

দুর্গার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া রোহিণী বলিল—শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদ থাকলে অমন্‌ সাক্‌শেশ!—চাডিড় মুখে দিয়ে যাই ঠিক করে আসি।"

দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল—"কি ঠিক ক'রে আসবে? কোনো সাহেবের সঙ্গে চেনা আছে?"

"বায়স্কোপে মেরেছিলুম—এক সাহেবকে। মার খেয়ে খুব বন্ধু হ'য়ে গেছে সে আমার! আপনার হাতে বুকদেখা-যন্তর ত একবার দেখে গেছে ওরা; আপনার কাছে না থাক্‌লে চলবে, আপনার ওটাই তার কাছে দিয়ে আসব। সেজে-গুজে সে থাকবে এখন।"

ডাক্তার পুনরায় তাহার পিঠ চাপড়াইয়া হাসিল।

কথামত বৃদ্ধ ছেলেকে লইয়া বিকালে আসিল। দুর্গা ও রোহিণী তাহাদের সাহেব ডাক্তারের কাছে লইয়া গেল।

সাহেব ফোড়ার চারিদিক ষ্টেথিস্‌কোপ দিয়া পরীক্ষা করিল। দুপুরবেলা রোহিণী তাহাকে এক শিশি কি দিয়া আসিয়াছিল। সাহেব আলমারী হইতে সেই শিশিটা বাহির করিয়া বলিল "একটু ঘিউ লাগাবে, তার উপর এইটা।"

বৃদ্ধের কানে রোহিণী কহিল, "আমরা আসতেই সাহেব চৌষট্টি টাকা লাগবে বলেছে, শুনেছ ত? আমার হাতে পঞ্চাশটা টাকা দাও, আমি ব'লে ক'য়ে দিই।—"

তাহার হাতে টাকা দিয়া রোগীরা উঠিল।

সাহেবের হাতে চারিটি টাকা দিয়া, ষ্টেথিসকোপটি পকেটে পুরিয়া, দুর্গার পিছনে রোহিণীও বাহির হইল।

পথে বৃদ্ধ ছেলেকে কহিল, "কত মেহনৎ কোরে সকলটা দেখাশুনা করলো ক'দিনি ?"

বাড়ী ফিরিয়া রোহিণী বলিল, "হুজুর, জল ওষুধ ছেড়ে এ্যালোপাথি যদি ধরেন ত একবার হাতযশটা আমার—"

দুর্গাদাস হাসিয়া বলিল, "কেন !—সেটা হোমিওপ্যাথিতেই হোক্ না ?"

—"হুজুর, হোমিওপ্যাথি ওষুধের যে দাম কম বেজায় !"

—"এ্যালোপ্যাথি ওষুধ তৈরী করবে না কি ?"

—"ঠিক ধরেছেন !—নাক সিঁট্‌কোচ্ছেন ?—ধর্ম্মপথে পয়সা করে কটা লোকে, ধর্ম্মাবতার ?"

—"না,—আচ্ছা, কি ওষুধ করবে শুনি ?"

"আজ্ঞে, ধরুন এ্যারিষ্টোচিন্। শুনছিলুম ওষুধটার বাজার খুব চ'ড়ে গেছে—"

—"কি ক'রে করবে ? মালমসলা ?"

—"খাঁটি খড়িগুঁড়ো—শ্রেফ। আর কতকগুলো এ্যারিষ্টোচিনের শিশি, খানিকটা মোম,— পাচমেন্ট-কাগজ, এই আর কি।"

মাথা নাড়িয়া দুর্গা বলিল, "রামঃ !—রোগী মেরে নরকে স্থান হবে না—"

দাঁড়াইয়া উঠিয়া রোহিণী কহিল, "একমণ খড়ি খেলে কিছু হবে না, হুজুর !—বলেন ত একবার—"

"মাথা খারাপ ! এ্যালোপ্যাথি করতে গেলে, লোকে পুলিশে দেবে যে !"

"না—না, ডাক্তারি করবেন কেন ? ওষুধের ব্যবসা।"

"তারপর, ওষুধ ধরা প'ড়ে শেষটায় জেলে—"

ডাক্তারের পদধূলি মাথায় দিয়া রোহিণী বলিল—শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদ থাকলে হাওয়ায় জানতে পারবেনা, হুজুর।—এক-এক শিশি পনের টাকা,—তাহ'লে হাতযশটা কি একবার—"

একশিশি পনের টাকা—দুর্গাদাসের মত ত টলিবেই। সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—"করবে কর—, কিন্তু—"

"কোনো কিন্তু নেই, দেব্‌তা।"

রোহিণীর পিঠ্ চাপ্‌ড়াইয়া দুর্গা কহিল—"লাগাও—কি কি চাই, ঠিক ক'রে বল।"

"আর কিছুই নয়। ঐ যা' বললুম—সের-আড়াই খড়ি উপস্থিত এনে গুঁড়িয়ে দি-ফাইন্ ক'রে ছাঁকা, তারপর লেবেল-মারা শিশি কতকগুলো।"

খড়ি আনিয়া ডাক্তার স্ত্রীকে গুঁড়াইতে দিল। বলিল—"একেবারে মিহি গুঁড়োনো চাই,—দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই।"

নন্দরাণী বলিল—"তা' এই এককাঁড়িই চাই ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাড়াতাড়ি।"

"বাবাঃ ! কেন ? কি হবে ?"

"ওষুধ।"

"এঁ্যা !—তাই পদার হয়না ? খড়ি-গুঁড়ো ওষুধ !"

"কি গণ্ডগোল !—চেঁচাও কেন ? হবে এ্যালোপ্যাথি ওষুধ।

"সে ওষুধ তুমি কি করবে ? তুমি ত হোমিও—"

"আরে মুস্কিল ! ডাক্তার ডাক্তারি—সব প্যাথিই এক। অত হিসেবে কাজ নেই, যা' ব'ললুম করো। খুব ফাইন্ চাই।"

খড়ি-গুঁড়া হইতে সবই সুন্দর হইল—শিশিতে কাগজ-জড়ানটি পর্য্যন্ত। একশত চোদ্দশিশি এ্যারিষ্টোচিন লইয়া রোহিণী ও দুর্গা ট্যাক্সিতে উঠিল। বড় বাজারে একটি লেনের কাছে আসিয়া দুর্গা গাড়ী থামাইয়া বলিল, "রোহিণ্, আমি ব'সে রইলুম, তুমিই যাও। চট্ ক'রে আস্‌বে।"

ডাক্তার ভয় পাইতেছে বুঝিয়া রোহিণী সুটকেশটি লইয়া নামিল। দুর্গার চরণ-ধূলি লইয়া নবকৃষ্ণ লাহার দোকানে গিয়া উঠিল।

সাম্‌নের কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কি চাই ?"

নমস্কার করিয়া রোহিণী কহিল—"ম্যানেজার মশাই কোথায় ?"

আঙুল-নির্দ্দেশে কর্ম্মচারী বলিল—"দোতলায়, মাঝের টেবিলে।

ম্যানেজারের কাছে আসিয়া রোহিণী নমস্কার করিয়া বলিল—"এ্যারিষ্টোচিন্ রাখবেন, মশায় ? চড়াদামে এক-গ্রোস্ বড় ফাইল আনিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম আরও বাড়বে। কিন্তু এখন অনেকগুলো শিশি জ'মে গেছে।—না হয় আপনাকে দু'একটাকা ছেড়ে দিয়েই দোব। মানে কথা হ'চ্ছে ইন্‌ভয়েস্ আর একটা ওষুধের এসেছে, টাকা নইলে নিতে পারব না।—"

ম্যানেজার চশমা আঁটিয়া বলিল, "আপনার কোন্ দোকান ?"

বড় একটি ডাক্তারখানার নাম বলা দরকার। রোহিণী গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, শর্ম্মা ফারমাসি।—"

এরূপ অবস্থায় দুর্গা যে প্রকাণ্ড গণ্ডগোল বাধাইত তাহাতে সন্দেহ কি ? মোটরে বসিয়াই জল-ছাড়া মাছের মত তাহার হৃদয় অস্থিরভাবে লাফাইতে লাগিল। এত দেরী কেন ? রোহিণীকে ধরিল না কি ?

মোটর-চালককে দুর্গা বলিল, "অনেক জায়গায় যেতে হবে হে, মোড় ঘুড়িয়ে রেখো, বাবু এলে আর দেরী করতে না হয়।—"

রোহিণী কিন্তু ঘাবড়াইবার নয়। ম্যানেজারের প্রশ্নের উত্তর সে অতি সহজভাবেই দিয়াছিল।

ম্যানেজার প্রশ্ন করিল, "কত শিশি আছে ?"

"আছে অনেক, আপনি ক' শিশি নেবেন ? কত দামেই বা নিতে পারেন ?"

একটু ভাবিয়া ম্যানেজার উত্তর দিল—"এই ডজন খানেক। চৌদ্দটাকা বারো আনা দর, আপনি কতয় ছাড়তে চান ?"

"বারো আনাটা না হয় ছেড়ে দোব,—মুস্কিলে পড়েছি বুঝছেন ত ?"—কথা বলিতে বলিতে রোহিণী সুটকেশ খুলিয়া বারটি শিশি বাহির করিল।

ম্যানেজার কহিলেন—"না মশায়, তা'হলে আর নিয়ে সুবিধে কি হবে ? টাকা তারো ক'রে হ'লে দিয়ে যান্।"

শিশি কয়টি সুটকেশে তুলিতে তুলিতে রোহিণী বলিল, "তাহ'লে গলায় ফাঁস্ পড়ে মশায়—মারা যাই। সাড়ে তারো ক'রে দিই, নিন্।"

"নাঃ, তাহলে আর অত শিশি কি করব !"

"আচ্ছা, পারলুম না। নমস্কার"—বলিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

ম্যানেজার ডাকিল না দেখিয়া পুনরায় গিয়া কহিল—"নিন দাদা। এমনিও মরেছি, নয় ওম্‌নিই মরব।—"

শিশুগুলি এক-একটি করিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে ম্যানেজার বলিল, "বেশী পুরোনো হবে না ত মশায় ?"

একটু হাসিয়া রোহিণী বলিল, "একেবারে টাট্‌কা, দেখতেই ত পাচ্ছেন।" দাম লইয়া নমস্কার করিয়া সে বাহির হইল।

মোটরের কাছে আসিয়া রোহিণী হাসিয়া ফেলিল। দুর্গা চুপ করিয়া এককোণে বসিয়া দরদর্ করিয়া ঘামিতেছিল। রোহিণী ভিতরে আসিতে কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল ?"

তাহার পায়ের ধুলো মাথায় দিয়া রোহিণী বলিল, "বারোটা।"

ডাক্তার ড্রাইভারকে বলিল—"ক্লাইভ ষ্ট্রীট।"

তাহার প্রাণে আনন্দের বান বহিয়াছিল। ইচ্ছা হইতেছিল রোহিণীর হাতযশের প্রশংসার কথার ফোয়ারা ছুটাইয়া দেয়। কিন্তু ড্রাইভার কিছু জানিয়া ফেলে এই ভয় হইল।

আবেগের আধিক্যে রোহিণীকে সে প্রাণপণে জড়াইয়া কেবল বলিল "বহুত্ খুব !-

সমস্ত শহর ঘুরিয়া ঘুরিয়া খিদিরপুরের প্রায় সকল বড় ডাক্তারখানায় রোহিণী এ্যারিষ্টোচিন বিক্রী করিল। কোনখানে কিছু টাকা বাকিও রাখিতে হইল। দাম অবশ্য আশানুরূপ সকল জায়গায় জুটে নাই। একটি ডিস্‌পেন্‌সারিতে একশিশি ছয় টাকাতেও বিক্রী করিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় গোড়িয়া হাট রোডের মোড়ে দুর্গা মোটর ছাড়িয়া দিল। হাঁটিয়া আসিয়া ডিস্‌পেন্‌সারিতে ঢুকিয়া ডাক্তার বলিল, "দরজা দাও।" রোহিণী দরজা দিবার পর ডাক্তার স্যুটকেশ খুলিয়া গুণিল—একহাজার ষোল টাকা। কিছুক্ষণের জন্য তাহার ধাঁ-ধাঁ লাগিল—স্বপ্ন নাকি?

রোহিণীকে জড়াইয়া ধরিয়া সে কহিল, "রোহিণ্, হাত-যশ্ একখানা! কেল্লা মাৎ—! যত বোতল ইচ্ছে আজ তোমার—এই নাও।"

ডাক্তার তাহাকে পঞ্চাশটি টাকা দিল। রোহিণী মেজাজ ঠিক করিতে বাহির হইল।

ডাক্তারখানা বন্ধ করিয়া দুর্গা বাড়ী আসিল। লাফাইতে লাফাইতে ঢুকিয়া দেখিল, নন্দরাণী মুখে হাত দিয়া জানালায় বসিয়া আছে।

যে অস্বাভাবিক আনন্দ-উচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে প্রকাশের জন্য হাঁপাইতেছিল তাহা বিশেষ বাধা পাইল। ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে সে বলিল—"হাঁগা!—ওগো!—কি হ'য়েছে?" মুখ আরও একটু কালি করিয়া নন্দ উত্তর দিল—"জান না!—রকম কি বলত'? সকালবেলা বেরিয়েছ—খাওয়া নেই, নাওয়া নেই! ভেবে মরছি!—"

বিকট চীৎকারের সহিত এক লাফ্ দিয়া দুর্গা—"আরে তা'ই বল!—খাবো নাইবো, নাইবো খাবো। লাগাও কাবাব, কোর্মা, কোপ্তা, পোলাও, মাম্‌লেট্, মুরগীর ডিম্—"

মুখ ঘুরাইয়া লইয়া নন্দ বলিল, "খাও!—"

"খুড়ি—হাঁসির ডিম!"

হাসিয়া ফেলিয়া নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "পেয়েছ বুঝি কিছু?"

হাতের উপর হাত চাপ্‌ড়াইয়া দুর্গা বলিল—"কিছু নয় গো, গড়ের মাঠ! মার দে কেল্লা গড়ের মাঠ!"

"কত?—কত?"

"আচ্ছা বলো দিকিনি কত? পার যদি পাঁচ টাকা।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া নন্দ কহিল, "দশ—"

হাততালি দিতে দিতে দুর্গা বলিল—"হোলো না! কাছাকাছি—ঠিক হয়নি!"

হাসিয়া নন্দ কহিল, "পনের টাকা?"

"দূর পাগলি! দশটাকা—পনের টাকা?—দশশো—এই দেখো।"

মেজের উপর রাশীকৃত নোট ও টাকা দেখিয়া নন্দ তাড়াতাড়ি আঁচল চাপা দিল। বলিল—"যাও—সব আমার! কতদিন থেকে বলছ গয়না দেবো—"

দুর্গা কহিল—"আচ্ছা গো, নাও। সাড়ে চারশ টাকা দাও, কাবুলীওলার টাকা দিয়ে দিই।"

—"দোব। দু'মিনিটের মধ্যে নেয়ে নাও। আমি ভাত বেড়ে আনি—"

নন্দ রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল।

ডাক্তার বলিল—"না, আর খাবো না, দোকানে ভীষণ খেয়েছি। তুমি খেয়ে নাও। কাল সত্যি মাংস আর পোলাও খাওয়াতে হবে।"

পরদিন রাত্রে একটি বড় ভোজের আয়োজন হইল। বহুদিন সেরূপ হয় নাই। নয়টা, দশটা—এগারটাও বাজিল,—রোহিণী ত আসিল না! সন্ধ্যার মেজাজ তৈয়ারী করিতে সে ত রোজই যায়। হাতে কতকগুলি টাকা একসঙ্গে দেওয়াই কি অন্যায় হইল?

দুর্গা ভাবিতেছিল। ক্ষুধাও পাইয়াছিল খুব। ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিল। অথচ আজ রোহিণীকে সঙ্গে লইয়া না খাইলে তাহার তৃপ্তি হইবে না। বারটা বাজিয়া গেল।

নন্দ আসিয়া বলিল, "ক'টা বাজল কানে গেছে? ভাল হ'চ্ছে না, কিন্তু—!"

"আহা! আর একটু দেখি,—রোহিণীটা—"

"রোজ যেমন আলাদা খায়, খাবে এখন।"

"না—না—না, তা' কি হয়। আর একটু লক্ষীটি!"

ডাক্তার বসিয়া রহিল।

সাড়ে-বারটা বাজিতে নন্দ আসিয়া কহিল, "তাহ'লে খাবে না?"

দুর্গা উত্তর দিল, "নাঃ! ওর হাতে অত টাকা দিয়ে ভুল করেছি। আজ আর এলো না।"

রাত্রে গুরুভোজন হইয়াছিল। সকালে দুর্গার শরীর বাঁচল না, ডিস্‌পেন্‌সারিতে যাওয়া বন্ধ রাখিল। বিশেষতঃ রোহিণী আসে নাই, মন তাহার ভাল ছিল না।

নন্দরাণীরও রান্নাঘরে যাওয়ার বিশেষ আগ্রহ ছিল না, রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল।

থিয়েটারের ঝি আসিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন-পত্র দিয়া গেল।

অন্যদিন ফেলিয়া রাখিত, সেদিন কিন্তু নন্দ উৎসাহের সহিত পড়িল। হাসিতে হাসিতে স্বামীর কাছে আসিয়া বলিল —"নিয়ে যাবে?"

ডাক্তার কহিল, "কোথায়? আজ্ঞে হ'লেই যাবো?"

—"আচ্ছা,—যাবে না!"

—"কোথায় বল?"

—"তোমার পায়ে পড়ি, দু'টো ভাল বই আছে—সীতা, ষোড়শী। লক্ষ্মীটি!"

—"আহা-হা! পায়ে পড়বে কেন? যো হুকুম!"

—"সত্যি, বল?"

—"সত্যি—সত্যি—এই চড়টা যেমন সত্যি।"

—"উঃ! লাগেনা?—যাবই কিন্তু, হঁ্যা!—"

দুর্গা আবার রোহিণীর কথা ভাবিতে লাগিল।—আজও ত-সে আসিল না। সে কি তবে ছাড়িয়া চলিয়া গেল?

বেলা দুইটার সময় হইতে নন্দ তাগিদ্‌ দিতে লাগিল।—'গাড়ী আনো'!

তিনটা বাজিল। ডাক্তার জামাটা পরিয়া গাড়ী আনিতে বাহির হইল।—

গাড়ীর আড্ডায় মাত্র দুইটি গাড়ী। দুর্গা বুঝিল, ভাড়া খুব বেশী চাহিবে। নিকটে গিয়া সে দেখিল, কোনটিরই গাড়োয়ান নাই।

এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কিছুদূরে একটি ঘরের সাম্‌নে অনেক লোক জমিয়াছে।

"এ কোচ্‌ম্যান্‌!"—বলিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে ডাক্তার জনতার কাছে আসিল। দেখিল, একটি প্রৌঢ়াকে কোলে লইয়া একজন লোক অতিযত্নে তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছে। পাশে বছর-দশেকের একটি মেয়ে বসিয়া আছে।

ঘরের মধ্যেও কয়েকটি লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল।

দুর্গার চোখে পড়িল, তাহাদের ভিতর একজন গাড়োয়ান। সে জিজ্ঞাসা করিল—"হঁ্যারে! ভাড়া যাবি?"

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করায় বিরক্ত হইয়া সেবায় নিযুক্ত লোকটি কি বলিবার জন্য মুখ তুলিল।

ডাক্তার অবাক হইয়া বলিল, "রোহিণ্‌! তুমি!"

হাত দিয়া রোহিণী চুপ করিতে বলিল।

স্ত্রীলোকটির মাথা আস্তে নামাইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, "হুজুর!"

—"কি মজার লোক তুমি!—কাল মাংস-টাংস সব নষ্ট হ'ল। সাড়ে-বারটা পর্য্যন্ত না খেয়ে ব'সে ছিলুম।"

ডাক্তারের চরণ ধূলি লইয়া রোহিণী বলিল, "অপরাধ হয়েছে, বাবু।"

দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল, "তা' আজও গেলে না কেন? এ সব কা'রা?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রোহিণী মৃদুস্বরে কহিল, "পারিনি হুজুর!—এরা আমার মা আর বোন।—"

তাহার চোখদুটি জলে ভরিয়া উঠিল।

ডাক্তার বলিল, "সে কি হে, আমার কাছে তা'হ'লে ওটা হাতযশ করেছিলে,—কি বল?"

—"কোন্‌টা বাবু? কোন গরীব ভাই-বোনকে ত কখন ঠকিয়েছি ব'লে—"

—"আহা!—মুখযশই হ'ল। আমায় বলেছিলে না, তোমার কেউ নেই—মা-বোনও গেছে?"

—"ঠিক, সবই ঠিক। আমার—" রোহিণী কথা কহিতে পারিল না। চোখ হইতে জল ঝরিতে লাগিল।

চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া সে পুনরায় বলিল, "কাল রাত্রে রিক্‌শ কোরে বাড়ীতেই ফিরছিলুম। এখানে এসে দেখি মা আমার ফুটপাথে প'ড়ে রয়েছে, বাচ্ছা বোন্‌টা মাড়োয়ারী, সাহেব, বাঙালী—সকলের কাছে ভিক্ষে চাইছে। পেটে ধরেছিল যে মা তার কথা মনে প'ড়ে গেল। এমনি ক'রেই

সে ত আমায় ছেড়ে গেছে। পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ী-বাড়ী যাচ্‌ঞা করেছে। গেরস্থরা যদি বা একমুঠো মাঝে মাঝে দিত,—বড় যারা, ধনী যারা, তারা তাড়িয়ে দিয়েছে দূর দূর ক'রে।—খিদের তাড়নায় সেদিন ছোট বোনটা এক সাহেবের পায়ে হাত দিয়ে কিছু চেয়েছিল। এত রাগ বা ঘেন্না হ'য়েছিল সাহেবের, যে, এক বুটের ঘায়ে বোনটাকে ছিট্‌কে ফেলে দিয়েছিল। হয় ত সেই বুটের চোটেই বোনটা মরল,—মা'ও পিছু পিছু গেল তার কাছে, না খেতে পেয়ে, আর কেঁদে কেঁদে—"

সকলে চুপ করিয়া শুনিতেছিল।

ডাক্তারের চোখের কোণে জল জমিয়াছিল। সে বলিল —"ছি! ছি!—তুমি থাকতে তাদের—"

—"হুজুর, আমি থাকলে কি আর! এক দাঙ্গা ক'রে জেলে গিয়েছিলুম। ফিরে শুনলুম, একেবারে কাঙাল হ'য়েছি।—সেই থেকেই ত জুচ্চুরি-জালিয়াতি ক'রে বড়-লোকের মত পেরেছি—"

ডাক্তার কহিল, "রোহিণ্, পকেটে এই দশ টাকা আছে, —আর তোমার কাছে যদি কিছু থাকে ত এদের দিয়ে চলো যাই। কাল না হয় হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করা যাবে?—"

দুর্গার পদ-ধুলি মাথায় ছোঁয়াইয়া রোহিণী বলিল, "না, হুজুর। মা-বোনের করতে পারিনি, এ সুযোগ আর ছাড়ব না। মাকে যদি সারিয়ে তুলতে পারি তাহ'লে প্রাণের হাহাকার খানিকটা হয় ত কমবে। তারপর—"

ছোট মেয়েটি ডাকিতে রোহিণী তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া ঢুকিল।—

দুর্গা বা'ড়ী ফিরিল। মন তার ব্যথায় ভারী হইয়া উঠিয়াছিল।

নন্দ ঝঙ্কারের সহিত বলিল, "তিন ঘণ্টা কাটিয়ে ত ফিরলে! গাড়ী কই?"

"কাল ত রবিবার। কালই যাবো।"

"আহা-হা! দুপুর থেকে সেজেগুজে ব'সে রয়েছি!—আজ না গেলে ভাল হবে না কিন্তু!"

"যা দেখে এলুম, চোখে দেখলে তুমি কেঁদে ফেলবে নন্দ! সবাই ঠাকুর-দেবতার মতন দেখছে। আজ চলো তাই দেখিয়ে আনি।"

—"ওঃ! সে কি, দেখে একেবারে—"

—"কি? রোহিণ্ গো, একটি ভিখিরীর কি সেবাটাই করছে!"

—"আ কপাল! একেবারে স্বর্গে যাবো!"

নন্দর কাঁধে হাত রাখিয়া দুর্গা কহিল, "রাণী! তুমি না মেয়ে-মানুষ? বাঙলার মেয়ে না? পরের দুঃখে তোমাদের মতন আর কেউ কাঁদতে পারে না—"

নন্দ মাথা নীচু করিয়া বলিল, "তা' চলো, দেখে আসি।"

শ্রীঅমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

বিবিধ সংগ্রহ

আরিজোনা মরুভূমির পর্ব্বতগাত্রে প্রাচীন ছবি

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ

পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়াছেন যে অতীতকালের অতিকায় সরীসৃপবংশ লুপ্ত হইয়া যাওয়ার অনেক পরে পৃথিবীতে মনুষ্যের অবির্ভাব হয়। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের আরিজোনা ষ্টেটের অন্তর্গত মরুভূমিতে, পাহাড়ের গায়ে

হাভো স্থপাই প্রপাত

- পাহাড়ের ফাটল দিয়া একটি ভূগর্ভস্থ নদী নির্গত হইয়া নীচে পড়িতেছে

খোদাই-করা অনেকগুলি পশুপক্ষীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার সবগুলিই অধুনালুপ্ত সরীসৃপ ও অন্যান্য প্রাণীর। ছবিগুলি যেভাবে আঁকা, তাহাতে মনে হয় এ এমন এক সময়ের দৈনন্দিন ইতিহাসের কাহিনী, যে সময়ে অতিকায় হস্তী, ডাইনোসর ও অন্যান্য অধুনালুপ্ত প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সদাসর্ব্বদা বিবিধ প্রয়োজনে দেখাসাক্ষাৎ হইত, শিকার বা আত্মরক্ষার কার্য্যে মানুষকে তাহাদের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইত।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে এডওয়ার্ড ডোহানি নামক একজন তরুণ যুবক আরিজোনা প্রদেশে তৈলের খনির সন্ধান করিতে করিতে একস্থানে পর্ব্বতগাত্রে প্রাচীনযুগের আঁকা কতকগুলি রঙীন্ ছবি ও খোদাই-করা মূর্ত্তি দেখিতে পান। ছবিগুলি সেসময় তাঁহাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করে ও তিনি বিশেষজ্ঞ না হইলেও বুঝিতে পারেন যে এগুলি বহু-প্রাচীন কালের আদিম অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত। মিঃ ডোহানি বর্ত্তমানকালে আমেরিকায় একজন ধনকুবের, গত ১৯২৪ সালের শেষে তিনি নিজের অর্থে একদল বিশেষজ্ঞকে আরিজোনা প্রদেশের নির্জ্জন পর্ব্বতগাত্রে অঙ্কিত এই ছবি-গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রেরণ করেন। একবৎসর ধরিয়া এই বিশেষজ্ঞদলটি সেখানে অবস্থান করেন ও বহু কৌতূহলপ্রদ তথ্যের আবিষ্কার করেন—তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক সিদ্ধান্ত এই যে, ডাইনোসর ও অন্যান্য সরীসৃপবংশ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যাওয়ার পূর্ব্বেই মানুষ পৃথিবীতে আসে।

আরিজোনার যে-অঞ্চলে এইসকল ছবি আছে, তাহা অতি দুর্গম মরুভূমির অন্তর্গত, এখনও তাহার সকল অংশ আবিষ্কৃত হয় নাই, খুব কম লোকেই সেসব স্থানে

যায়। Doheny Expeditionএর দলপতি ছিলেন মিঃ হবার্ড, ইনি ওকল্যাণ্ড মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের

গিরি-গাত্রে ক্ষোদিত ডাইনোসরের মূর্ত্তি

মানুষ যে জীবিত অবস্থায় ডাইনোসর দেখিয়াছিল ইহাই তাহার প্রথম নিদর্শন।

অধ্যক্ষ। ইঁহারা শুধু একস্থানে নয়, এই দুর্গম মরুপ্রদেশের নানাস্থানে একবৎসর ধরিয়া বেড়াইয়া বহুস্থানের পর্ব্বতগাত্রে এরূপ অনেক ছবি ও খোদাই-কাজ আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর আর কোথাও এইসব অতিকায় সরীসৃপদিগের ছবি নাই, কি ইউরোপ, কি এশিয়া। একই সময়ে যে মানুষ ও ডাইনোসর পৃথিবীতে ছিল, আমেরিকার মরুদেশের এই বিস্ময়কর ছবিগুলি হইতে তাহা অনুমিত হয়। শুধু ছবি নয়, কলোরেডো নদীর পর্ব্বতময় তীরভূমিতে একস্থানে ইঁহারা ডাইনোসর ও অতিকায়-হস্তীর প্রস্তরীভূত পদচিহ্নও আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই ছবি কে বা কাহারা আঁকিয়াছে বা সে লুপ্ত জাতির ইতিহাস কি, Doheny Expedition সে সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। ঐস্থানে বা নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে যে-সকল আদিম অধিবাসী বর্ত্তমানে বাস করে, তাহারা Hava-Supai রেড্-ইণ্ডিয়ানদের শাখা। ইহারা নিতান্ত অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিজেদের অতীত-ইতিহাসের কথা কিছুই জানে না, কোনপ্রকার প্রাচীন গাথা ও কাহিনীও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। বস্তুতঃ ইহাদের বুদ্ধি এত কম যে মনে হয়, পর্ব্বত-গাত্রের এ সকল অদ্ভুত ছবি এই জাতির অঙ্কিত নহে। বড়জোর হাজার বৎসর হইল ইহারা এ প্রদেশে বাস করিতেছে কিন্তু যে জাতি কর্ত্তৃক ছবিগুলি অঙ্কিত হইয়াছে তাহারা লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে এখানে বাস করিত।

অনুমান করা যায় যে প্রাচীনকালের এই জাতি যখন এখানে বাস করিত তখন এ অঞ্চলে জল এত দুষ্প্রাপ্য ছিল না। পাষাণময় নদী-খাতগুলি দেখিলে মনে হয় এক সময়ে এখানে বড় বড় নদী ছিল, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত ভূতত্ত্ব-সংক্রান্ত কারণে সেগুলি অন্তর্হিত হইয়া যায়, খুব সম্ভবতঃ নদী শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চল হইতে মানুষের বাস উঠিয়া যায়।

এই অঞ্চলের পাহাড়গুলি লাল বেলে পাথরের। পাথরের সঙ্গে বহুল পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত আছে। বৃষ্টির জল চুয়াইয়া পাহাড়ের ভিতর দিয়া পড়ার দরুণ এই
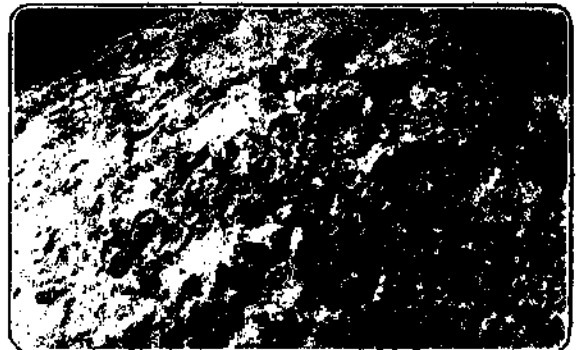
গিরিপৃষ্ঠে পশুপদ-চিহ্ন*

* কেহ কেহ মনে করেন এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন

লৌহের গুঁড়া জলের সহিত মিশিয়া তরল অবস্থায় পাহাড়ের গা বাহিয়া পড়িয়া থাকে, এবং বহুকাল ধরিয়া এরূপ পড়ায় পাথরের উপর কালক্রমে লৌহরসের একটা কঠিন সর পড়িয়া গিয়াছে। এই লৌহ-রসের সর থাকার জন্যই

প্রাচীনকালের শিল্পীদিগের এই প্রকারের ছবি আঁকা সম্ভব হইয়াছে।

একখণ্ড পাথর বা ধারালো চকমকির টুকরা লইয়া এই লৌহ-রসের সরের উপর আঁচড় কাটিলে পাহাড়ের আসল লাল রংটা বাহির হইয়া পড়ে—চারিপাশের লৌহ-রসের রং থাকে কালো, আর আঁচড়টার রং হয় লাল। তুলি ও রং দ্বারা ছবি আঁকার অপেক্ষা এ-উপায়ে অনেক সুবিধা, কারণ প্রথমতঃ ইহাতে ছবি হয় লাল বেলে পাথরের স্বাভাবিক রংএর, চারিপাশে থাকে লৌহ-সরের কালো রং—তাহা ছাড়া ঝড়-বৃষ্টি, শিশির, তুষারপাত প্রভৃতি কোনো প্রাকৃতিক উপদ্রবেই এ ছবি মুছিয়া যায় না। ছবি নষ্ট হইতে পারে একমাত্র একটি কারণে, যদি পাথরগুলা গুঁড়া হইয়া ঝরিয়া পড়ে তাহা হইলে। কিন্তু সেরূপভাবে পাথর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেও লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিয়া যায়।

হাভা সুপাইয়ের লাল বেলে পাথরের উপর ক্ষোদিত মনুষ্য-আক্রমণকারী হস্তী মূর্তি।

এই স্থানটির নির্জ্জন পাহাড়ের ফাটলে বহু র‍্যাট্‌ল্-সর্পের বাস। মানুষ বড় এদিকে একটা আসে না বলিয়া এই সর্পকুল সম্পূর্ণ শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে এখানে বংশ-বৃদ্ধির সুযোগ পাইয়াছে। Doheny Expedition-এর লোকজনকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইয়াছিল; এত সাবধানতা সত্ত্বেও একটি কুলীবালক সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপরপক্ষে আবার এই র‍্যাট্‌ল্ সর্পগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে ও মারিয়া ফেলিতে গিয়াও পাহাড়ের নানা নিভৃত অংশে বহু ছবি বাহির হইয়া পড়ে।

এই পর্ব্বত হইতে কিছুদূরে মরুভূমির মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ ডাইনোসরের প্রস্তরীভূত পদচিহ্ন দেখিতে পান। ইঁহারা অনুমান করেন, মরুভূমির বালুরাশি সরাইয়া ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে এই-জাতীয় সরীসৃপের ডিম পাওয়াও খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ২নং ছবিটি দেখিলে বোঝা যাইবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সকল শিল্পীর সহিত ডাইনোসর-জাতীয় সরীসৃপের কিরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই ছবিটিতে সেই বিরাটকায় জানোয়ার পিছনের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ইহা আঁকা হইয়াছে। ডাইনোসর যে এরূপ ভঙ্গীতে উঠিয়া দাঁড়ায়, শিল্পী নিশ্চয়ই ইহা দেখিয়াছিলেন, নতুবা তাহাকে এরূপভাবে আঁকিবার অন্য কি কারণ থাকিতে পারে?

মানুষেরা বন্য ছাগ এবং হরিণ তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে তাহার চিত্র

ছবিটির উচ্চতা, ১১·২ ইঞ্চি; বিস্তৃতি, ৭ ইঞ্চি; পায়ের দৈর্ঘ্য, ৩·৪ ইঞ্চি; লেজের দৈর্ঘ্য, ৯·১ ইঞ্চি। একখণ্ড পাথর বা চকমকির সাহায্যে এরূপ একটা ছবিকে কঠিন লৌহের সর কাটিয়া তৈয়ারী করিতে শিল্পীর বহুদিন সময় লাগিয়াছিল এবিষয়ে কোনো ভুল নাই।

নানা প্রশ্ন এখানে স্বভাবতঃই মনে উদয় হয়। মানুষ

কত প্রাচীন? সরীসৃপ-যুগ বর্ত্তমান সময় হইতে এককোটি বৎসরের পূর্ব্বের কথা; তখন মানুষ পৃথিবীতে ছিল? না মানুষের আবির্ভাবের পরও অতিকায় সরীসৃপের দু'একটা উপজাতি এখানে-ওখানে নির্জ্জন মরুভূমির মধ্যে আত্মগোপন করিয়া বাস করিত?

গিরি-গাত্রে অপেক্ষাকৃত আধুনিক 'ভারতীয়' চিত্রাবলী। এগুলি দুই হাজার বৎসরের অধিক পুরাতন হইবে না।

কে এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দিবে। Doheny Expedition অন্ততঃ এ-সকল প্রশ্নের কোনো সমাধান করেন নাই।

মেচিওরা নামক স্থানে পর্ব্বতের উপর কতকগুলি প্রাচীনকালের মঠ আছে, পৃথিবীর মধ্যে সেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। এগুলিতে উঠিবার কোনো রাস্তা বা সিঁড়ি নাই। দড়ি বা জীর্ণ মই ঝোলানো আছে, তাহাই ধরিয়া উঠিতে হয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাস্কর ড্যানিয়েল ফ্রেঞ্চ

শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সরকার বি-এ

আমেরিকার নাম করতেই আমাদের মনে সব চাইতে আগে জাগে তার ধনগৌরব ও যন্ত্রসাধনা। সে দেশের গগনস্পর্শী স্কাইস্ক্রেপার, যোজনব্যাপী মোটরের কারখানা, ওয়াল ষ্ট্রীটের কোটি কোটি ডলারের কারবার, ব্রডওয়ের অগণিত মোটর—এই সবই যেন সে দেশের কৃত্রিম কর্ম্মময় জীবনকে নাগপাশে বেঁধে রেখেছে। যন্ত্রবহুল প্রকাণ্ড কারখানার পাশে ফুল ও পাতায় ছাওয়া ছোট একখানি বাগান ক্লান্ত মন ও চোখকে যেমন তৃপ্ত করে, তেমনি আমেরিকার দৃপ্ত ঐশ্বর্য্যের নিষ্করুণতাকে কিছু কোমল করেছে হুইটিয়ার, হুইটম্যানের কবিতাবলী,—ব্রেট্ হার্ট ও হথর্ণের গল্প-সাহিত্য এবং আর্টেমাস ওয়ার্ড ও মার্ক টোয়েনের রস-রচনা। শিল্পী ও ভাস্কর আছে সেখানে অগণিত; শিল্পবস্তুর গ্রাহক ও সংগ্রাহক বোধকরি সেই দেশে সব-চাইতে বেশী কিন্তু জাতির বাণিজ্যলিপ্ত জীবনে শিল্পীর প্রভাবের বিপুলতা অতি অল্প।

প্রায় ষাট বছর আগে আমেরিকায় গাজরের ক্ষেতে ফসল তুলতে তুলতে একটি আঠার বছরের ছেলের মন সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। ক্ষেতের সব চাইতে বড় গাজরটি নিয়ে সে ছুরি দিয়ে একটি ব্যাঙ খোদাই করে। আমেরিকার বিখ্যাত ভাস্কর ড্যানিয়েল ফ্রেঞ্চের ভাস্কর-জীবনের সুরু এমনি ক'রেই হ'য়েছিল। এমনি অদ্ভুতভাবে সহসা প্রেরণা জাগ্‌লে শিল্পী তার শিল্পপ্রকাশের ভঙ্গীতে ব্যক্তিত্বের সুগভীর ছাপ দিতে সক্ষম হয়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রদেশের একজিটার্ শহরে ড্যানিয়েল জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা হেন্‌রি ফ্লাগ্ ফ্রেঞ্চ ছিলেন একজন প্রাদেশিক বিচারপতি, কিন্তু ম্যাসাচুসেটের কৃষিকলেজের সভাপতি হিসাবেই তিনি অধিক খ্যাত ছিলেন। পরে তিনি প্রাদেশিক সহকারী কোষাধ্যক্ষও হ'য়েছিলেন। ছেলেবেলায় ড্যানিয়েল শিল্পী হবার বিশেষ প্রবণতা দেখাননি, যদিও ফ্রেঞ্চ পরিবারের

প্রায় সকল ছেলেমেয়ে সাধারণ 'ড্রয়িং' করত। কিন্তু ড্যানিয়েলের বড় ভাই বিলিয়াম রেখাচিত্র আঁকতে পারত চমৎকার। ছেলেবেলা থেকেই তার শিল্পী ব'লে নাম হ'য়েছিল; কালে সে সিকাগো আর্ট ইনষ্টিট্যুটের অধ্যক্ষ হয়।

"দি মাইনিউট্ ম্যান্"

আঠার বছর বয়সে ড্যানিয়েল খেয়ালের বশে নানারকম ছোটখাটো জিনিষের অনুচিত্র খোদাই করত, যেমন অল্প-বয়সের ছেলেরা খেলার ছলে ক'রে থাকে। একদিন গাজরে খোদাই ব্যাঙ ও কাঠে খোদাই ছুটো প্যাঁচার মূর্ত্তিতে সজীবতা দেখে সহসা তাঁর পিতার মনে হ'ল যে ছেলের ভাস্কর হবার শক্তি আছে, তাকে ভাস্কর হবার সুযোগ দিলে হয়। এই মনে ক'রে তিনি আমেরিকার অন্যতম শিল্পী মে অল্‌কট্‌কে ছেলের প্রতিভার কথা জানান। মে অল্‌কট্ সাগ্রহে নিজের সাজসরঞ্জাম হ'তে ড্যানিয়েলকে কিছু দিলেন। সেই থেকেই ড্যানিয়েলের ভবিষ্যৎ জীবন স্থির হ'য়ে গেল। তাঁর জীবনে শিল্পী হবার আর কোনও বাধাই রইল না। সৌন্দর্য্য-রসপিপাসু পিতার অবাধ সাহায্য ও সহানুভূতি তিনি পেলেন—খুব কম শিল্পীর জীবনারম্ভে এরূপ যোগাযোগ ঘটে। সে সময়ে বষ্টন শহরে ডাঃ রিমারের কলা-বিদ্যালয় ছাড়া আর কোনও শিল্পশিক্ষার দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না। আর সে কলা-বিদ্যালয়ে সকলেই ছিল ছাত্রী, কারণ তখন সকলে মনে করত যে কলাবিদ্যাটা অবলা নারীর যোগ্যতম কাজ—সবল পুরুষের নয়।

ডাঃ রিমারের বিদ্যালয়ে দু'বছর শিক্ষার পর যখন কংকর্ড শহরবাসীরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কংকর্ডের মুক্তিবিপ্লবকে স্মরণীয় করবার জন্যে একটি স্মৃতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন তখন ফ্রেঞ্চ তার জন্তে একটি 'মডেল' গ'ড়ে পাঠান। সেটা

এমার্স'ন

অনেকের মনোনীত হ'ল না কিন্তু সকলকেই স্বীকার করতে হ'ল যে এ শিল্পী অসামান্ত প্রতিভাবান। তাঁর কাজে এমনি একটা জোরাল ছাপ দেখে আর একটা নতুন 'মডেল' গ'ড়ে দেবার জন্য তিনি আহূত হলেন। এবার মডেলটি মনোনীত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেঞ্চের খ্যাতিও প্রসারলাভ

করল। তখন তাঁর বয়স মোটে একুশ। কিন্তু এই অখ্যাত তরুণ শিল্পীর প্রথম রূপরচনা—"দি মাইনিউট্ ম্যান অব্ কংকর্ড"—আজও সৌন্দর্য্য-পিপাসু দর্শকের মনকে আনন্দদান করে। যে-সকল শিল্পী জগতে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের সকলের জীবনেই দেখা যায় যে শিল্প-জীবনের আরম্ভে হয় ত তাঁরা এমন একটা রূপসৃষ্টি করেছেন যার সম্পূর্ণতার বিকাশ অনেকের পক্ষেই বহুবৎসরের কঠোর সাধনার ফল। বিশিষ্ট প্রতিভাবান রূপস্রষ্টা

এমার্সন

সাধনার অপেক্ষা রাখে না; ফ্রেঞ্চের "দি মাইনিউট্ ম্যান্ অব্ কংকর্ড" দেখে এই কথাটিই মনে হয়।

মাইনিউট্ ম্যান এম্নি সমাদর লাভ করবার পর ফ্রেঞ্চ গেলেন ফ্লোরেন্সে। সেখানে তাঁর শিক্ষা দেড় বছরের বেশী হয় নি। যদিও হিরাম্ পাবার্স ও টমাস্ বলের ষ্টুডিওতে তিনি কাজ করেছিলেন কিছুদিন, তাহ'লেও বিশেষ-রকমের নতুন কিছুই তাঁর শেখা হয় নি। ওয়ার্ডের শিক্ষাধীনে যে দুইমাস তিনি ছিলেন তা'তে তাঁর অনেক নতুন জিনিষ শেখা হয়েছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ফ্লোরেন্সের মুাজিয়াম্ দেখে তাঁর বিশেষ লাভ হয়নি কারণ মর্ম্মর শিল্পের সব কিছু পদ্ধতি ভাল করে জানবার সুযোগ তাঁর তখনও হয় নি। 'ক্যানোভা'র পদ্ধতি নিয়ে তখন সব শিল্পীই ব্যস্ত। তাঁর যা' কিছু বিকাশ তা' তাঁর আত্মসাধনা থেকে।

ফ্রেঞ্চের নাম আরও ছড়িয়ে প'ড়ল এমার্সনের মর্ম্মর মূর্ত্তি গ'ড়ে। কংকর্ড শহরে সে-সময়ে আদর্শ মানুষের সীমা রচনা করেছিলেন এমার্সন এবং তিনিই সে সীমা পূর্ণ করেছিলেন। অকপট ব্যবহারে, জীবনের সারল্যে, সুগভীর চিন্তাশীলতায় ও অমিতজ্ঞানে তিনি কংকর্ডবাসীদের পূজার পাত্র হয়েছিলেন। সকলে তাঁকে 'কংকর্ড' শহরের 'দান্তে' ব'লে মনে করত, ফ্রেঞ্চ তাঁর রচিত মর্ম্মর মূর্ত্তিতে এমার্সনের এই বিশেষ রূপটি দিতে সফল হয়েছিলেন। এই সুযোগে এমার্সনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তারপর থেকে ফ্রেঞ্চের শিল্পরচনার আর বিরাম ছিল না এবং তার মধ্যে ভাবময় মূর্ত্তির সংখ্যাই বেশী। এইসব মূর্ত্তিগুলির বেশীরভাগ মেট্রোপলিটন্ মুাজিয়মে ও করকোরান্ গ্যালারিতে আছে।

ভাবময় মূর্ত্তিগুলির মধ্যে "মেমারী" বা স্মৃতি নামে অনাবৃত মূর্ত্তি একটি; এতে প্রকৃতির সহজ সুরটি গ্রীক্ ভাস্কর্য্য-পদ্ধতির সঙ্গে অতি শোভনভাবে সামঞ্জস্য ঘটিয়েছে। এই মূর্ত্তিটিতে ফ্রেঞ্চের পরিকল্পনার এবং রচনার ব্যাপকতার কিছু আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এর মনোহারিত্বকেও ছাপিয়ে গেছে আর একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি—নাম তার "দেবকুমার ও মানবকুমারী" (The sons of God beheld the daughters of men that they were fair)। এত কোমলতা এত প্রাণ যে পাথরের গায়ে কুঁদে' ফোটান যায় তা' তিনি অসামান্যভাবে দেখিয়েছেন। একটি দেবকুমার অতি কোমলভাবে একটি নারীমূর্ত্তিকে প্রেমালিঙ্গন-পাশে বেঁধেছে, দেখে যেন মনে হয় রোঁছার গড়া অনন্তকালের প্রণয়ীযুগল। এর পরিবেষ্টনও এত কোমলতাব্যঞ্জক যে দর্শককে ভুলিয়ে দেয় যে এটা পাথরের মূর্ত্তি—প্রাণবান প্রেমিকযুগল নয়। এই মূর্ত্তিটির জন্মবৃত্তান্ত বড় আশ্চর্য্যের।—একখানা সাময়িক পত্রিকাতে ফ্রেঞ্চ 'ইয়েলো-ষ্টোন্ পার্কে'র 'ওল্ড ফেত্‌ফুল' নামে জগৎপ্রসিদ্ধ উষ্ণপ্রস্রবণের আলোক-চিত্র দেখেন। ধূসর-কালো আকাশের গায়ে প্রস্রবণের ধূমায়মান বাষ্প রূপদক্ষ শিল্পীর প্রাণে প্রেরণা জাগিয়ে দিল;

ধূমায়মান বাষ্পে তাঁর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির নিকট ধরা দিল অতি মৃদুরেখায় লীলায়িত আলিঙ্গনে-বদ্ধ দু'টি সুকুমার মূর্ত্তিরূপে। ছায়াচ্ছন্ন আকাশে শিল্পী দেখলেন রূপ, তাতে আপন প্রাণের রস সঞ্চার করলেন, অপরূপের সৃষ্টি হ'ল। মর্ম্মরের অন্তরে সেই অপরূপের প্রতিষ্ঠা হ'ল। খেয়ালী প্রকৃতির রসের গতিকে এমন ভাবে রূপ দিতে খুব কম শিল্পীই সক্ষম হ'য়েছেন।

"ক্লাণ্ডারের রণক্ষেত্রে" নামে প্রস্তরমূর্ত্তিটি ম্যাসাচুসেট প্রদেশের রণ-স্মৃতি স্বরূপ মিলটন্ শহরে প্রতিষ্ঠিত আছে। "রিপাব্লিক"এর বিরাট মূর্ত্তি যদিও 'প্লাস্টার অব্ প্যারী' দিয়ে অস্থায়ীভাবে গড়া তবুও 'সিকাগো এক্‌সপোজিশনে' এটা প্রধান দ্রষ্টব্যের মধ্যে একটা। কিন্তু ফ্রেঞ্চের সব চাইতে বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি হ'চ্ছে ওয়াসিংটন শহরের স্মৃতি-সৌধে প্রতিষ্ঠিত আব্রাহাম লিন্‌কনের মর্ম্মরপ্রতিমূর্ত্তি। আমেরিকার এটা সব চাইতে বড় প্রতিমূর্ত্তি। এটা ৩০ ফিট্ উঁচু এবং ২৭০ টন ওজনের। কেবল মাথার অংশটাই চার ফিটের বেশী উঁচু। এত-বড় বিরাট ব্যাপারকে একটা প্রকাণ্ড পাথর থেকে কুঁদে এবং যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে বসানো বড় সহজসাধ্য নয়; রূপণের দিক থেকেও কিছু ব্যাঘাত হয়ত হয়। কাজেই পাঁচ টন্ থেকে বিয়াল্লিশ টন্ ওজনের নানা-আকারের পাথর দিয়ে এটাকে গড়া হ'য়েছে। এই প্রতিমূর্ত্তিটির জন্য ফ্রেঞ্চ প্রথমে একটি আড়াই ফিট্ 'মডেল' করেন, সেটাকে বাড়িয়ে পাঁচ ফিট্ আর-একটা 'মডেল' ক'রে আমেরিকার সুবিখ্যাত পিকিরিলি-ভ্রাতাদের শিল্পাগারে পাঠিয়ে দেন সেটাকে ব্যবস্থামত আকারের গড়বার জন্য। এই প্রসঙ্গে পিকিরিলি-ভ্রাতাদের সম্বন্ধে কিছু বললে বোধহয় অবান্তর হবে না। পিকিরিলিরা ছয় ভাই। তাদের প্রত্যেকেই শক্তিমান শিল্পী এবং ভাস্কর। তাদের শিল্পাগারে খুব বড় আয়তনের ও অস্বাভাবিক প্রকারের পাথরের মূর্ত্তি, নানাপ্রকারের পাথরের কাজ সমবেত ও সুসংবদ্ধভাবে খোদাই হয়, যা' অন্য কোনও ছোট বা বড় শিল্পাগারে সম্ভব নয়। তাদের শিল্পাগারে কারখানার দ্রুতগতি ও শিল্পীর সৃষ্টিনৈপুণ্যের অপূর্ব্ব সংযোজনা হ'য়েছে। পিকিরিলি-

শিল্পীর পথরোধ

তারপরই উল্লেখযোগ্য তাঁর "শিল্পীর পথরোধ," "রিপাব্লিক" এবং "ক্লাণ্ডারের রণক্ষেত্রে"। "শিল্পীর পথরোধে"র ভাববস্তু বড় করুণ। শিল্পী (ভাস্কর) যে পরিপূর্ণ পরিণতির জন্য কতদিন ধ'রে সাধনা করছিল, আচম্বিতে অজ্ঞাত মরণ এসে তার গতি চিরকালের জন্যে বন্ধ ক'রে দিল। ফ্রেঞ্চ এখানে তাঁর অননুকরণীয় কোমল রেখায় বিশিষ্টতা রক্ষা করেছেন। মৃত্যুকে অন্ধ করেছেন বটে কিন্তু অসুন্দর বা ক্রুর ক'রে দেখাননি;—মরণ তার সমস্ত করুণা দিয়ে অতি সন্তর্পণে শিল্পীকে নিরস্ত করেছে। অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর আবির্ভাবে তরুণ শিল্পীর মুখে তখনও চমক্ লেগে রয়েছে,—সবলের উপরে ফুটে উঠেছে তার অন্তহীন নৈরাশ্য।

শিল্পাগারে একবছর পরিশ্রমের পর খোদাই শেষ হ'ল, তারপর বিভিন্ন অংশগুলি যথাস্থানে সংযুক্ত হবার পর পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তির উপর ফ্রেঞ্চ তাঁর সমাপ্তি-স্পর্শ দান করলেন। এখন প্রতিমূর্ত্তিটি দেখলে মনে হয় একটা গোটা পাথর থেকে এটা তৈরী। এত বড় মূর্ত্তিটিতে কোথাও অসমতা বা অসামঞ্জস্যের আভাসমাত্র নাই। লিন্কনের জীবন্ত মহত্ব এই বৃহৎ মূর্ত্তিটিতে পরিপূর্ণ-ভাবে আশ্রয় ক'রে আছে।

তাঁর ভাস্কর্য্যের রীতি, সম্পূর্ণ না হ'লেও কতকটা, গতানুগতিক বলা যেতে পারে, কিন্তু আধুনিক শিল্পীদের রীতি ও কাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে যথেষ্ট। অতি-আধুনিক পন্থা, যা কতদিনের চেষ্টার পর পুরান অপ্রশস্ত গণ্ডীর ভেতর থেকে শিল্পীর মনকে টেনে এনে মুক্তি দিয়েছে, তাতে কল্যাণ আছে। শিল্পীর খেয়ালী মনকে আর রীতি-লঙ্ঘনের ভীতি বাধা দিতে পারে না।

ফ্লাণ্ডারের রণক্ষেত্রে

ওয়াশিংটনে প্রতিষ্ঠিত আব্রাহাম লিন্কনের প্রতিমূর্ত্তি
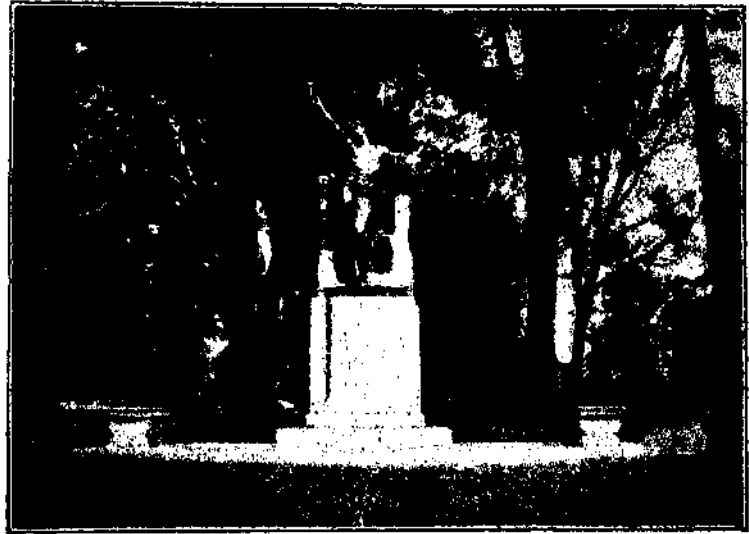
আধুনিক ভাস্কর্য্যের রীতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কতকটা এই রকম। তিনি যে য়ুরোপের কোনও কলা-বিদ্যালয়ে রীতিমত শিল্পের অনুশীলন করতে পারেননি সেজন্য তিনি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। ডিউয়িং, চেজ্ লো, অলিন্ ওয়ার্নর্, ডুভেনেক্ প্রমুখ 'আমেরিকার শিল্পীসঙ্ঘের' অনেকেই য়ুরোপে শিক্ষালাভ করেছেন কেবল তিনি ছাড়া। সময় সময় সে ক্ষোভ তাঁকে অকারণ পীড়া দিয়েছে কারণ ভাস্কর-হিসাবে তিনি তাদের অনেককেই ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর ভাস্কর্য্য তাঁকে 'ভাবাত্মক ভাস্কর' ব'লে পরিচিত করেছে।

জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে ফ্রেঞ্চ ইচ্ছা করলে সগর্ব্বে বলতে পারেন যে এত সফলতা, এত খ্যাতি জগতে অতি অল্প ভাস্করের ভাগ্যে ঘটেছে,—আজ সকল দিক দিয়ে আমার শিল্পী-জীবন পরিপূর্ণ। এ কথাগুলোর একটাও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু তাঁর আন্তরিক বিনয়, শিশুর মত মৃদু ভীরুতা—আপনাকে জগতের সম্মুখ থেকে সযত্নে লুকিয়ে রাখবার প্রয়াস বোধহয় তাঁর হৃদয়ে নিমেষের জন্যও সে কথা উদয় হ'তে দেয়নি।

শ্রীঅমিয়নাথ সরকার

রঙের খেলায় ক্ষর

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

আধারভেদে আলোর বৈচিত্র্য কত! যে বিদ্যুৎ শারাল সুশুভ্রতায় নয়নের দৃষ্টিকে ঝলসাইয়া দিতেছে একটি নীল কাচের খাপে তাহাকে কেমন একটুকরা স্নিগ্ধদর্শন নীলকান্ত মণির ন্যায় দেখিতে হয়। আধারের গুণ এমনি। যে সূর্য্যকিরণ জগতে স্বর্ণাগ্নির দীপ্ত-শিখা ছড়াইয়া যায়, তাহারই চন্দ্রমণ্ডলান্তর্গত রূপ যেন দিকে দিকে স্নিগ্ধ রৌপ্যবৃষ্টি। সূর্য্যের গলিতহিরণ চন্দ্রলোকে ঠেকিয়া রজতবরণে শেফালির ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছে। তাই কবি কহিতেছেন,—

তোমারি সূর্য্য স্বর্ণতারে কিরণবীণায় দিবস ভরে,

তোমারি চন্দ্রতন্ত্রী জুড়ে' যামিনী রহে পূর্ণ-যৌবনা।

আধারের বিভিন্নতায় সূর্য্যের সোনা চন্দ্রে রূপা হইয়া যাইতেছে। চন্দ্রের আলো-কে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করিব? ইহা ত কখনো original light নহে, কারণ ইহা ধার-করা রশ্মি। সুতরাং সূর্য্য হইতেছেন আসল আলো আর চন্দ্র হইতেছেন medium light. সূর্য্য ও চন্দ্রে এক-ই আলো বটে কিন্তু আধারের বৈষম্যে আলোকের পার্থক্য ঘটিয়াছে। চন্দ্রমণ্ডল জলময় শীতলতাসিক্ত—তাই চন্দ্ররশ্মি যেন জল-লবের ন্যায় তাপনিবারক। চন্দ্রের নিকট সূর্য্য আসল আলো হইতে পারে কিন্তু সূর্য্য কি স্বয়ম্প্রভ? সূর্য্যকেও আসল আলো বলা যাইতে পারে না, যেহেতু সূর্য্যের মণ্ডল রহিয়াছে। সৌরমণ্ডলের উপাদানও চন্দ্রবৎ জড়, জড়পিণ্ডের অন্তর হইতে যে এ-আলোর প্রস্রবণ ছুটিয়া বাহির হইতেছে এমন নহে। আলোকপ্রসূ শক্তি কখনো জড়ে থাকিতে পারে না। শ্রুতি এ আলোকের মূলাধারের সন্ধান কত সুন্দরই না পরিস্ফুট করিয়াছেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং।

তৎ ত্বং পূষণ্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

এখানে সৌরমণ্ডলকে সোনার থালার সহিত তুলনা করা হইয়াছে, এই ঢাকনিটি দ্বারা ব্রহ্ম তাঁহার আনন ঢাকিয়া রাখিয়াছেন যেন তাঁহাকে স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিতে দেখা না যাইতে পারে। সুতরাং নিত্য প্রভাতে যেখানে অরুণোদয় ঘটিতেছে সেখানে সত্য সত্যই তিনি বিরাজমান কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতেছিনা, দেখিতেছি তাঁর আবৃত রূপ—medium light। ঋষিকণ্ঠে এই প্রার্থনা ধ্বনিতেছে—হে সনাতন, তোমার সত্যমূর্ত্তি (original light) আবরণ সরাইয়া উন্মোচন কর, আমি নয়ন ভরিয়া সেরূপ দেখি কেননা তোমার আপন আলোর সহিত আমার একাত্মতা, তুমি ও আমি এক—

যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।

যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।

সোঽহম্-সম্বন্ধ ঋষি যাঁহার সহিত পাতাইতে ইচ্ছুক, তিনিই প্রকৃত original light এবং সূর্য্য স্বয়ং medium-light. গিরিনিস্যন্দী জল-প্রপাত যেরূপ ক্রম-বিভাগে নানাদেশের মাটিতে গড়াইতে গড়াইতে নদনদীর রূপ ধরিয়া ছুটে, ব্রহ্মনিঃসারী আলোকপ্রপাতও তেমনি নানামণ্ডলচারী হইয়া কখনো রৌদ্ররূপে কখনো বা জ্যোৎস্নার কমণীয় হাস্যে নিখিলভুবনে ছড়াইয়া পড়িতেছে। রূপের এই বৈচিত্র্য আধার-ভেদে,—কিন্তু নিরাবরণ ব্রহ্মজ্যোতিরই এ সমুদায় আবৃত আকার। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"

"যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ"

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।"

চন্দ্রবৎ সূর্য্যও ধারকরা আলো, এখানে তাহা সম্যক সুস্পষ্ট। পুরুষোত্তমের প্রসঙ্গে এ প্রস্তাব আমরা করিব ভরসা করি, এখানে ইহার একটু আভাস জাগাইয়া রাখিয়া বর্ত্তমান বক্তব্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে চাই। ঋষিকণ্ঠের অমর-ধ্বনি আমরা এইমাত্র শুনিয়া আসিয়াছি—তিনি দেহস্থ হইয়াও নিরাধার নির্লেপ জ্যোতিষ্মান ব্রহ্মকে 'সোঽহম্'

সৌখ্যে সম্বোধন করিতেছেন। তিনি ব্রহ্মকে অভিন্নত্বের আহ্বান শুনাইতেছেন, অপরে সেরূপ করিতে পারে কি? না, সাধারণ জীবের পক্ষে ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। কেন সম্ভবপর নয় তাহা আমরা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অধ্যায়ে পাইয়াছি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মায়া বা প্রকৃতি জীবদেহান্তর্গতা থাকিবে ততক্ষণ দেহাভ্যন্তরে অক্ষর পুরুষের দর্শন অসম্ভব। অক্ষর-পুরুষ অদর্শন থাকিলে আদিত্যেরও যিনি উদ্ভাসক সেই শাশ্বত ভাস্কর কখনো প্রত্যক্ষীভূত হইবার নয়, সুতরাং সোঽহমন্ত্রের সম্বন্ধনির্ণয়েরও কোন প্রশ্ন জাগিবার ক্ষেত্র ইহা কখনই নহে।

দেহ-মধ্যে অক্ষর পুরুষ আসল আলোর উৎসরূপে বিরাজমান থাকিয়া শ্রবণে মননে দর্শনে প্রাণনে সূর্য্যরশ্মির স্তায় আপন রশ্মি বিকিরণ করিতেছেন কিন্তু মায়ামণ্ডল অন্তর্বর্ত্তী হইয়া original lightকে নিরোধ করিয়া আপন আধারের রঙে লেপিয়া ইহাকে medium lightএ পরিণত করিতেছে। সুতরাং ক্ষরজীব অক্ষর-আত্মনেরই আবৃতরূপ। এ-আবৃতরূপের প্রথম ও প্রধান নিদর্শনই সূর্য্য। ব্রহ্মের নির্লেপ আলো সৌরমণ্ডলপ্রবিষ্ট হইতেই মণ্ডলের নিজস্ব রঙ্‌টি তাহাতে ছুঁয়া লাগিল আর অমনি সাতরঙে-আঁকা তপনদেব চোখ মেলিয়া চাহিলেন। রঙবাহার সূর্য্যের সাতটি রঙ্‌ আসিল কোথা হইতে? নির্লেপ ব্রহ্ম হইতে নহে, কারণ তিনি হইতেছেন নিরঞ্জন, অঞ্জন তাহাতে খোঁজা চলিবে না। রঙের তুলি তাঁহার উপরে বুলায় এমন স্পর্দ্ধা কোন্ চিত্রকর পোষণ করিতে পারে? সংরঙের কৌটা প্রত্যুত সৌরমণ্ডলের গর্ভে রক্ষিত ছিল, তাহাতে বর্ণহীন নির্লেপ আলো ঠুকর খাইতেই খুলিয়া গেল রঙের কৌটাটি,—আর রঙ্‌গুলি নিরঞ্জনকে একেবারে আবীরগোলা করিয়া লেপিয়া দিল। সেই হইতে অরুণদেব সাতরঙের মুকুট পরিয়া ভুবন ভরিয়া রঙ্‌ বৃষ্টি করিতেছেন।

ইহা কবিকল্পনার স্তায় ঠেকিতে পারে তাই ইহার পার্শ্বে উপনিষদের উক্তি বসাইতেছি। ছান্দোগ্য কহিতেছেন—

যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাৎ আদিত্যাৎ আদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং।

আদিত্যের যে লোহিত বর্ণ ইহা আসিতেছে তেজ হইতে, সেইরূপ শুক্লবর্ণ জল হইতে এবং কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা হইতে। হিরণ্ময় ভাণ্ডখানা ব্রহ্মের মুখাচ্ছাদনের উল্লেখ প্রারম্ভে পাইয়াছি, ইহা যে সৌরমণ্ডল তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ইহার উপাদানও পঞ্চভূতাত্মক। সৃষ্টিপ্রকরণে দেখান হইয়াছে ব্রহ্ম কিরূপে একে-একে পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিলেন—ইহাদের সংহতি যেমন সূর্য্যমণ্ডল, তেমনি চন্দ্রমণ্ডল ও আমাদের পৃথিবী। সুতরাং সৌরমণ্ডলে ক্ষিতি অপ্‌ তেজ থাকিবেই থাকিবে এবং ইহাদের এবং প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বর্ণ প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং "হিরণ্ময়েন পাত্রেন"র মধ্যে রঙের কৌটা লুক্কায়িত রহিয়াছে, যখনই ব্রহ্ম তাঁহার নিরঞ্জন আননকে এই সোনার পাত্রে আবৃত করিতেছেন তখনই রঙের কৌটা খুলিয়া গিয়া তাঁহার রঙীন মুখছবি জাগিতেছে। ঋষি এই জড়ের ছাপমাখা রূপের পেছনে যে অ-জড় বর্ণবিহীন নীরূপ রহিয়াছেন তাঁহাকেই প্রাণের আহ্বান জানাইতেছেন।

এখানে সূর্য্যের তিনটি বর্ণের দিকেই শ্রুতি দৃষ্টি দিতেছেন—সেই তিনবর্ণের সহিত সূর্য্য যেরূপ অভিন্নাত্মক তদ্রূপ জীবের মধ্যেও তিনটি বর্ণের সংস্থান সতত আমরা শুনিতে পাই।

দেবী হি এষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

জীবের দেহান্তর্গতা মায়ার সহিত গুণগুলি নিতান্তই অপৃথকভূত; গুণত্রয়ের বর্ণ কিরূপ? শ্বেতাশ্বতরে পাইতেছি—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং

আদিত্যের যেরূপ তিনটি বর্ণ মায়ারও ঠিক-ঠিক সেই তিনটি বর্ণ—লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ। আমরা জানি আদিত্য-মণ্ডলের স্তায় মায়ামণ্ডলও আমাদের অন্তরস্থ হইয়া যাবৎ-সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে। মায়ার তথ্যানুসন্ধানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে ইহা প্রত্যুত জড়দেহেরই সূক্ষ্ম-বস্থা। 'মায়ী অক্ষরে' ইহার উপাদান নাড়াচাড়া করিয়া দেখা গিয়াছে ইহা পঞ্চভূতেরই সূক্ষ্মাংশগুলির সমাবেশ এবং এগুলি স্থূলদেহজ কর্ম্মেরই পরিণতি মাত্র। মায়া পঞ্চভূতে গড়া হইলে ইহাতেও তেজের অংশ থাকিবে,

জলের অংশ থাকিবে এবং মৃত্তিকার অংশ থাকিবে,—সুতরাং মায়ামণ্ডলোত্থিত হইয়া যখন অক্ষর-আত্মনের নির্লেপ আলো দেহ-বাতায়নে আসিবে তখনি লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণে উহা অনুরঞ্জিত হইবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? এগুলিকে ছাড়িয়া মায়া তিষ্ঠিতে পারে না যেমন আদিত্যেরও তাহার তিনরঙ, ছাড়িয়া তিষ্ঠান অসম্ভব। সুতরাং গড়াইতেছে এই, আদিত্য ব্রহ্মের আবৃতরূপ ভুবন ভরিয়া ছড়াইতেছে আর মায়াও অক্ষর-আত্মনের আবৃতরূপ (medium light) জীব-চৈতন্যে নিশিদিন অনুক্ষণ ছড়াইতেছে। সূর্য্যের আলোক, কিরণ; মায়ার কিরণ, ত্রিগুণ। সূর্য্য নিখিলবিশ্ব কিরণের বঙ্কিমচ্ছটায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে, আর মায়া তাহার গুণচ্ছটায় জীবের চিত্তক্ষেত্র অধিকৃত রাখিয়াছে। সূর্য্যের আলো খেলিতেছে নভপটে, মায়ার আলো খেলিতেছে মন-গগনে; কাজেই ক্ষেত্রের পার্থক্য অনেক। জীব বহির্জগৎ দেখিতেছে আদিত্যের অনুকম্পায়, আর মনোজগৎ দেখিতেছে মায়ার গুণপনায়। জীব যেন একখানি তিনরঙা কাচ তাহার মনশ্চক্ষুর উপর ধরিয়া চিন্তাজগতে বিচরণ করিতেছে। কাজেই সকলি আবৃত-আলোয় everything looks yellow in a jaundiced eye গোছের হইয়া পড়িতেছে। রঙীন কাচের ভিতর দিয়া আমরা যেমন ঠিক্ ঠিক্ জিনিষ দেখিতে পারি না, ত্রিগুণাধিকৃত মন দ্বারাও আমরা তেমনি আসল তথ্যের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। যতক্ষণ রঙীন কাচ চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখিব ততক্ষণ আসলরূপ উন্মোচিত হইবে না, রঙীন কাচ ফেলিয়া দিলে তবে ঠিক্ ঠিক্ দেখিতে পারি। এমনিভাবে ত্রিগুণ-কাচখানিকে মনের উপর হইতে না সরাইলে আমরা আসল বিষয়ের স্বাদ কখনো পাইব না। কিন্তু সূর্য্য যতক্ষণ আছে ততক্ষণ যেমন তাহার লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ রূপের বিলোপ হইবে না তেমনি মায়া যতকাল ভিতরে টিকিয়া থাকিবে তৎকাল ত্রিগুণকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়া চলিবে না, কেন না সূর্য্যকিরণ-বৎ ইহারা মায়ার সহিত অপৃথক্‌ভূত। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—গুণময়ী মম মায়া। মায়া তাহার ত্রিগুণ-রশ্মি ফেলিয়া মনটিকে একেবারে ত্রিগুণাত্মক করিয়া ফেলিয়াছে, তাই মন অক্ষরের প্রতিহারী হইয়াও নির্গুণ অক্ষর-আত্মনের বিষয় 'ন মজতে ন সঙ্কল্পয়তি।'

ত্রিগুণ বুঝাইবার জন্যে medium lightএর আশ্রয় লইতে হইয়াছে এবং সূর্য্যের সহিত মায়ার উপমা পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে ঢের তফাৎ—সূর্য্য হইতেছে জ্ঞানালোকের দীপ, আর ত্রিগুণ হইতেছে মায়া-মোহের প্রদীপ। সূর্য্যের আলোকে বিশ্বজগতে যত অধিক না সাগ্রহে গ্রহণ করা হইয়াছে, তত অধিক ত্রিগুণরশ্মিকে মনোজগতের সীমানা হইতে বহিষ্করণের মন্ত্রপাঠ চলিতেছে। এতদুভয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্যের ভিতর দিয়া আমরা এইটুকু অনুধাবনা করিতে পারিয়াছি যে ত্রিগুণ সূর্য্যরশ্মির ন্যায় concrete জিনিষ, একটা ভুয়ো কল্পনা ইহার ভিত্তি নয়। যদি ইহারা তিন-তিনটা abstract idea মাত্র হইত, যথা সত্ত্ব—ধর্ম্মপ্রাণতা, রজ—কর্ম্মপ্রাণতা, তম—কামুকতা, তবে যে-মুহূর্ত্তে মানুষের মন এ তিনটিকে অতিক্রম করিয়া ক্ষণিকের জন্য অজ্ঞেয় আনন্দের আস্বাদ পাইবে সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে 'নির্গুণ' বলিতে হইবে এবং পর-মুহূর্ত্তেই যখন তাহার মনে আবার বিকার জাগিবে তখনি তাহাকে ত্রিগুণ বলিতে হইবে। এই ভাবে মানুষ কখনো হইবে নির্গুণ কখনো হইবে ত্রিগুণ। কিন্তু গীতার "দৈবীহি এষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" বচনটি ভালরূপে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে 'দুরত্যয়া' শব্দটি শুধু শুধুই প্রযুক্ত হয় নাই, ত্রিগুণ ছাড়াইয়া উঠা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। সাংখ্যের সেই 'অত্যন্ত পুরুষার্থ' দ্বারা মায়ার উচ্ছেদসাধন হয়, মৃদু বৈরাগ্য বা ভাব-প্রবণতায় ইহা হইবার নহে,—ত্রিগুণ আবার মায়ার সহিত অপৃথক্‌ভূত। সুতরাং ত্রিগুণ এড়ান যা মায়াকে এড়ানও তাই, অতএব ক্ষণিকের চিত্তবৃত্তিনিরোধেই ত্রিগুণাতীত হওয়া যায় না। যদি ইহারা idea মাত্র হইত তবে যেমুহূর্ত্তে ইহারা মনে ছাপ খাইবে না সে-মুহূর্ত্তে মনকে নির্লেপ নির্গুণ বলিয়া ঘোষণা করা চলিত। অনেক সময় দেখা যায় অতিমাত্রায় কলুষিত ব্যক্তির মনেও চারিদিকে ছড়ান পাপের মধ্যে বিদ্যুৎঝিলিকের

ন্যায় বিবেকের চকমকি জলিয়া উঠে—যদি ত্রিগুণ abstract idea হইত তবে সেই-মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে নির্গুণ বলিয়া জানিতে হইবে। ক্ষণিক অবস্থান্তরের দিকে চক্ষু রাখিয়া শাস্ত্রের শব্দ বসান হয় নাই। সুতরাং দাঁড়াইতেছে এই সূর্য্য যেরূপ রূপসম্পন্ন পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ, মায়াও ঠিক তেমনি পঞ্চভূতের সার; সূর্য্যের তিনরশ্মি যেমন তিনভূতের বিচ্ছুরিত রূপ, মায়ার ত্রিগুণও তেমনি তিন সূক্ষ্মভূতের আভ্যন্তরীণ প্রকাশ। সূর্য্যরশ্মি বহির্বিশ্ব রাঙাইতেছে আর মায়ারশ্মি অন্তর্লোক রাঙাইতেছে। আমাদের অন্তর্লোক মনের মধ্যে—মনোবীণায় এই তিনতন্ত্রী জুড়িয়া দিয়া মায়া অশ্রান্ত মোহিনী রাগিণী বর্ষণ করিতেছে। বিশ্বজগৎকে সূর্য্যরশ্মি হইতে মুক্ত করিতে চাহিলে সৌরমণ্ডল ধ্বংস করা প্রয়োজন, তবে সূর্য্যালোক আর আসিতে পাইবে না,—তেমনি মনোজগৎকে গুণবিমুক্ত করিতে হইলে মায়ামণ্ডল বিধ্বংস করা দরকার—'মুক্তিরন্তরায় ধ্বস্তের্ণপরঃ।' সাংখ্য ৬-২০) অক্ষর-আত্মনকে অন্তর্হিত করিয়া মায়া দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ইহার বিধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গেই mediumএর সম্যক্ উচ্ছেদ হইবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে original lightএ মনোজগৎ উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে। সুতরাং আচ্ছাদনরহিত আত্মার পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ পাওয়ার নামই মুক্তি—মুক্তি বলিয়া অন্য একটি স্বতন্ত্র বস্তু নাই।

গীতার 'গুণত্রয়বিভাগ-যোগ' অধ্যায়টিতে ত্রিগুণের জন্ম-কর্ম্ম-তিরোধানের ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে—

> সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ
>
> নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥

ত্রিগুণের অস্তিত্ব দেহে শুধু মন দিয়া উপলব্ধি করিবে তৎপর অপরাপর ইন্দ্রিয়েরা সচীবের অনুসরণ করিবে। ত্রিগুণ দেহীর' মনটিকে একেবারে পাশবদ্ধ করিয়া বন্দীরূপে যেন কয়েদখানায় রাখিয়া দিয়াছে,—কারারক্ষীর বিনা-হুকুমে এপাশ-ওপাশ ফিরিতে পারিবে না। সূর্য্যকিরণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিকীর্ণ হইতেছে প্রকৃতিমণ্ডল হইতেও গুণরশ্মি তেমনি প্রসৃত হইতেছে।* সত্ত্বরশ্মি 'সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চ', রজোরশ্মি 'রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ নিবধ্নাতি কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্', আর তমোগুণ 'অজ্ঞানজং......জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তি।' ত্রিগুণে মনটিকে ত্রিবেণী বানাইয়াছে, এই ত্রিধারায় মন ত্রিভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাদের কোনটিই আসল মননশক্তি নহে, মনের উপর তিনরঙা কাচখানি না থাকিলে মন যে ত্রিগুণাতীত চিন্তা অনায়াসে করিতে পারিত, tricolourএর কাচখানি মনশ্চক্ষুতে বসাইয়া সেই ত্রিগুণাতীতকে কি উপায়ে চিন্তা করিবে? নীল গগন চক্ষুতে আঁটিয়া কে কবে সূর্য্যকে 'হিরণ্ময়বপু জবাকুসুমসঙ্কাশং' দেখিতে পারে?

মনের উপর এই তিনরঙের focus আসিয়া পড়িতেছে, মানুষের মনে যখন 'লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ স্পৃহা'—লোভলিপ্সা প্রবল হইয়া উঠিতেছে তখন সত্ত্বের লোহিতবর্ণটি বিশীর্ণ হইয়া রজের শুক্লরঙটি মনের আঙিনা জুড়িয়া বিরাজ করিতে থাকে, আবার যখন মনে কেবলি কামান্ধতার ইচ্ছা প্রবল হইতেছে তখনি তমের কৃষ্ণান্ধকার লোহিত-শুক্লকে একেবারে ম্রিয়মান অবস্থায় রাখিয়া মনের আঙিনাটিকে গভীর অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত করিতেছে। এ যেন সন্ধ্যাকালের একটি চিত্র ফুটিতেছে,—সূর্য্যের আলো টকটকে লাল ছিল, ধূসর হইল, পরে মুঠো-মুঠো গভীর অন্ধকার এ সকলকে কালো করিয়া ফেলিল।

> তমঃ, সত্ত্বং রজশ্চ অভিভূয় ভবতি।

আবার ঊষালোকে আলোকের জয় ঘটিতে লাগিল, তিমির বিদূরিত হইতে লাগিল। এ যেন সত্ত্বের উন্মেষে তমের পরাভব।

> সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
>
> জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥

যখন আলোকের আভাসে দিকে দিকে নিশার অন্ধকার মিলাইয়া যাইতে থাকে তখন ঊষার রক্তিমচ্ছটা যেমন গগনের রাজটিকা আঁকিয়া দেয়, ঠিক তেমনি মানসলোকে যখন বিলোল কামলালসা নিরস্ত হইয়া জ্ঞানস্পৃহা ছাপিয়া উঠে তখনি বুঝিতে হইবে তমের পরাজয়, সত্ত্বের জয়। তখন মনের পট-পরিবর্ত্তন হইল, তখন বলিতে হইবে—

রজঃ তমশ্চ অভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।

প্রভাত হইতে নিশাগম পর্য্যন্ত যেন সত্ত্বরজতমের খেলা চলিল, লাল-সাদা-কালো পৃথিবীটিকে মুড়িয়া রহিল। যখন যেটির প্রভাব তখন সেটি উদীয়মান, বাকিগুলি মর-মর। কিন্তু একটি না একটি থাকিবেই থাকিবে, ইহাদের হাত হইতে অব্যাহতি নাই; ঠিক তেমনি মনকে এ তিনটি ঘিরিয়া রহিয়াছে—একটি না একটি বৰ্দ্ধিষ্ণু থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু মূল প্রকৃতিতে 'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা,'—জীবের মধ্যে ইহারা সাম্যভাবে থাকিতে পারে না। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম দ্বারা একটি না একটি বৰ্দ্ধিষ্ণু থাকিবেই থাকিবে। মানুষ যে-গুণটিকে নিজের বলিয়া বরণ করিয়া তাহারই সাহায্যে আত্মপ্রকাশ খুঁজিবে, সেই গুণটিই হইবে তাহার মনের আসল রূপ। যদি কেহ মনকে সত্ত্বের লোহিতাভায় লেপিয়া জ্ঞানতৃষ্ণায় লোকান্তরিত হয় তবে তাহার জ্ঞানোপযোগী উজ্জ্বল-লোক লাভ হইবে—

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।

তদা উত্তমবিদাম্ লোকান্মলান্ প্রতিপদ্যতে॥

আবার যদি রজোগুণে মনটিকে অভিভূত করিয়া কাহারও মৃত্যু ঘটে তবে গুণোপযোগী-লোক লাভ হইবে।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।

রজোগুণে কর্ম্মময়-লোক লাভ ঘটিবে, তেমনি তমোগুণাচ্ছন্ন জনের অবশ্যম্ভাবী জন্ম নিম্নস্তরে।

তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।

কিন্তু সত্ত্বরজস্তমের অবস্থান্তর চিরকালের জন্য নহে কারণ সত্ত্বসমুদ্ভাসিত মনে অপর দুইটি গুণের অপ্রধান ভাবে স্থিতি রহিয়াছে, এইরূপ ব্যতিহারত্ব প্রত্যেকের পক্ষেই খাটে। তাই সত্ত্বপ্রধান মনও তমসায় মলিন হইয়া নীচ-গতি লাভ করিতে পারে, এবং তমোগুণাক্রান্ত মনও নীচস্তর হইতে সত্ত্বমার্গে উন্নীত হইতে পারে। সংযুক্ত নিকায়ের চতুঃশ্রেণীর লোকের যে বিবৃতি বুদ্ধদেবের মুখে পাওয়া যায় তাহাতে নিম্ন হইতে উচ্চে এবং উচ্চ হইতে নীচে গতায়াতের সমুজ্জ্বল ইতিহাস পাওয়া যায়। (সংযুক্ত নিকায়—কোশল-খণ্ড) সাংখ্যের সূত্রটি বড়ই সুন্দর (3. 48.)—

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা, তমোবিশালা মূলতঃ, মধ্যে রজোবিশালা।

কিন্তু গুণমার্গে বিচরণকারীদের উচ্চাবস্থার কোনই স্থিরতা নাই, গুণযুক্ত থাকিলেই বহু উচ্চে উঠিয়াও পতনের আশঙ্কায় ম্রিয়মান থাকিতে হয়।

আবৃত্তিস্তত্রাপি উত্তরোত্তরযোনিযোগাদ্ধেয়ঃ। 3. 57.

যত ঊর্দ্ধেই জন্মলাভ হউক না কেন সেখানে তিষ্ঠিবার সম্ভাবনা কই? সেখান হইতে নামিতে হইবে। ইহার কারণ কি? কারণ সৃষ্টিবৈচিত্র্যের পশ্চাতে একই formula রহিয়াছে—ইহা যেখানে থাকিবে না সেখানে সৃষ্ট নাম-রূপও থাকিবে না, সৃষ্টি সেখানে স্থগিত রহিবে। তাই সাংখ্য সূত্র গড়িয়াছেন—সৃষ্টিবৈচিত্র্যং কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ (৬. ২৪)—'কর্ম্ম'ই সেই formula; কর্ম্ম, সৃষ্টির নব-নব রূপাবলীর পেছনে শিকড় ছড়াইয়া বসিয়া আছে। এখানে যেমন কর্ম্মকে সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতুভূত করা হইয়াছে, গীতায় তেমনি প্রকৃতিকে ঠেস দিয়া ভূর্লোক ভুবর্লোকাদি দাঁড়াইয়া আছে—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥ (18.40.)

ভূর্লোকে বা স্বর্লোকে দেবগণের মধ্যেও এমন কোন জীব নাই যিনি প্রকৃতিসম্ভূত এই তিনগুণের অধিকার এড়াইয়াছেন।

ইহার কারণ কি? কর্ম্ম না থাকিলে কাহারও জন্ম সম্ভব-পর নহে। ছান্দোগ্যের 'তদ্ যথা ইহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতোলোকঃ ক্ষীয়তে'—মন্ত্রে এইটুকু প্রতীতি হয় পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা ঊর্দ্ধলোকপ্রাপ্তি ঘটে—সত্ত্বগুণাবলম্বনে জীব পুণ্যকার্য্য দ্বারা দেবলোকে দেবতারূপে জন্মিতে পারে কিন্তু সে দেবত্বও নিয়মিত-কালমাত্র স্থায়ী। তারপরে অবস্থান্তর ঘটিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, দেবলোকের সৃষ্টি-formulaও কর্ম্ম। তবেই দাঁড়াইতেছে এই, কর্ম্ম ও প্রকৃতি একার্থক, দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস হইলে ইহাদের অদল-বদল চলিতনা, সর্ব্বত্রই হয় কর্ম্ম নতুবা প্রকৃতিকে সৃষ্টির একমাত্র formula রূপে পাইতাম কিন্তু দুইটির উল্লেখ থাকিত না।

ত্রিগুণের উৎপত্তি কিরূপে ঘটিল গীতায় তাহার আলেখ্য রহিয়াছে, সেইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 'রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্' (14. 7.)। রজোগুণ আসিল কোথা হইতে? তৃষ্ণা ও আসঙ্গলিপ্সা হইতে রজোগুণ জাত হইল—কামবুভুক্ষা যখন দোহোপভোগে পরিণত হইল তখনি

রজোগুণের জন্ম। তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল, গুণসৃষ্টি জীবসৃষ্টির পরে। ব্রহ্ম যখন প্রথম দেহ সৃষ্টি করিয়া ইহাতে 'জীবেন আত্মনা' রূপে জীব হইয়া অনুপ্রবিষ্ট হইলেন তখন গুণের সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু জীব যখন দেহের অন্তর্ভাব রূপরসাদির সংস্পর্শে আসিল তখন এইসব পঞ্চতন্মাত্র একত্র গুলিয়া 'কাম' হইয়া গেল। কাম, রূপরসের পানপাত্র জীবের মুখে তুলিয়া ধরিতে চাহিল, জীব তখনো অ-ক্ষরের সহিত যুক্ত কিন্তু বারে বারে কামের প্রস্তাবে তাহার মন নরম হইয়া গেল—ক্রমে তৃষ্ণা জাগিল, শেষে চুমুক দিয়া ফেলিল। এই প্রথম 'কর্ম্ম' কৃত হইল, ইহার ফলে Pardise lost হইল—জীবের বিভুস্বভাব তিরোহিত হইল। তৃষ্ণাসঙ্গ-লোলুপতার ফলে রজোগুণের জন্ম হইল। এখন বিবেচনা করিতে হইতে রজোগুণ যখন কর্ম্ম হইতে জাত, তখন এটিকে কি বলিতে হইবে? ইহাত কর্ম্মেরই ফলস্বরূপ। বৃক্ষে ও বৃক্ষের ফলে যে একত্ব, এই কর্ম্মটির সহিত তাহার ফলস্বরূপ রজোগুণেরও সেই একত্ব। সুতরাং রজোগুণও কর্ম্মবিশেষ। কামোন্মাদনায় যখন ব্রহ্মজ্ঞান লোপ পাইয়া জীবের মনে অজ্ঞানান্ধকার ছাইয়া গেল, তখন তমোগুণের জন্ম হইল—'তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম,' রজোগুণের জন্মে মনের বিকার ঘটিয়াছিল সত্য কিন্তু উহাতে জ্ঞানালোক লোপ পায় নাই। কামকজ্জলে যখন সে ক্রমেই আচ্ছন্ন হইয়া একেবারে আলোকের অভাবে অন্ধকারে ডুবিয়া গেল তখন সেই অজ্ঞান অবস্থা হইতে তমোগুণের জন্ম হইল। ইহার উদয়ে মনের উপর তমসার রেখাপাত ঘনীভূত হইল। তমোগুণ হইল রিরংসার ফল, সুতরাং ইহার প্রভাবে মন আচ্ছন্ন হওয়া মাত্র দেহ-ক্ষুধা জীবকে একেবারে মোহিত করিয়া শুধু ইহারই চরিতার্থতায় তাহাকে ডুবাইয়া রাখে। তাই তমঃ 'সর্ব্বদেহিনাম্ মোহনং'। কাজেই রজোগুণের ন্যায় ইহাও একটি কর্ম্ম। আর সত্ব? ইহার উল্লেখ যদিচ আমরা পরে করিতেছি কিন্তু ইহার ব্যঞ্জনা আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। যখন রূপরসগন্ধের কামদৌত্য জীবকে প্রথম একটু আকৃষ্ট করিয়া এদিকে টানিয়া লইল—তাহার মনের গোপন কোণে তৃষ্ণার সঞ্চার ঘটিল অথচ তাহাকে জ্ঞানালোক হইতে ছিনাইয়া লইতে পারিল না, এই যে দোটানা সংগ্রাম, ইহাতেই জীবের ব্রহ্মসমুজ্জ্বল মন দোমনা হইয়া গেল। যেখানে অক্ষর-আলোক অনাবিল স্রোতে খেলিত, সেখানে ক্ষর-দেহের আবিলতা স্পর্শ করিল—যে-মনের চিন্তন ছিল অদ্বৈত, সে-মনের দ্বিধাবিভাগে ইহা হইয়া পড়িল দ্বৈত। নির্ব্বিকারে বিকার আসন পাতিয়া বসিল। সেই হইতেই সত্বের জন্ম। সত্বের এক অর্থ আমরা দেখিয়াছি 'জীব',—যে দেহ-বুদ্ধির অভিঘাতে তাহার বিভুস্বভাব বিদূরিত হইয়া জীবভাব প্রগাঢ় হইল উহাই প্রত্যুত সত্ব (জীব)-কারক কর্ম্ম, তাই ইহা সত্বগুণ। ইহার দ্বারা ক্ষর-জীবত্বের প্রথম সূত্রপাত ঘটিল—অক্ষর-আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি সত্ব বা জীবের সত্তা প্রতিষ্ঠিত হইল। গীতায় উক্ত হইয়াছে—'সত্বং...... বধ্নাতি সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ'—কাহাকে?—'দেহিনম অব্যয়ম্', নির্ব্বিকার যে জীবাত্মা—তাহাকে! গুণ শব্দের অর্থ 'পাশ'ও হয়—এখানে সেই অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'বধ্নাতি' ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং যে-বন্ধনে আবৃত-চক্ষু হইয়া জীবত্ব জাত হয় উহাই সত্বগুণ। গুণগুলি যেন জীবত্বের পাশস্বরূপ—ইহারা জীবত্বকে ভূমা হইতে পৃথক রাখিবেই রাখিবে, যেন জীবত্ব ভূমার দর্শন পাইয়া ভাঙিয়া না যায়! তবেই শেষে দাঁড়াইল এই সত্বগুণও একটি বিশিষ্ট কর্ম্ম।

ত্রিগুণের জন্মবিচার একরূপ পাইলাম। জন্মবিচার দ্বারা ইহাই প্রতীত হইল—ইহারা সকলই কর্ম্মবিশেষ। ক্ষেত্রের শস্য কাটিয়া আনিয়া গৃহাঙ্গনে স্তূপ করা—যেমন দেহরূপ ক্ষেত্রে কর্ম্মের চাষ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে উহাদের ফসলে গোলা সাজান, কি একই কথা নয়? এখানে একটি প্রশ্ন আসিতেছে, ত্রিগুণকে আমরা কর্ম্মস্তূপের ন্যায় অন্তরে সঞ্চিত দেখিলাম, কিন্তু ত্রিগুণ ত কখনো স্বয়ংসমাপ্ত নহে। সূর্য্যরশ্মি যেমন আপনাতে আপনি শেষ না হইয়া সূর্য্যে সমাহিত হয় তদ্রূপ গুণরশ্মিও প্রকৃতিতে মিশিয়া আপনাকে সমাপ্ত করিয়া দেয়। প্রকৃতি ও গুণ তেমনি অভিন্নাত্মক—যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মি। সুতরাং গুণগুলি যদি জীবের কর্ম্মপ্রবাহের ফল হইয়া থাকে তবে প্রকৃতি যে কর্ম্মফলের ভাণ্ডারশালা সে বিষয়ে আর কি সন্দেহ? অগণিত কাল হইতে জীবসৃষ্টি চলিয়াছে, সুতরাং জীবের কর্ম্মরাশির ভাণ্ডারশালা হইয়া প্রকৃতিও অগণিত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

ধানের গোলা যেরূপ অনাগত বর্ষের বীজ রক্ষা করিয়া নিঃশব্দে কাল গুণিতে থাকে এবং ঠিক-ঠিক সময়ে নূতন ধান্তের উদ্গমে আপনার গোপন সঞ্চয়কে বাহিরে ফুটাইয়া তোলে, প্রকৃতিও তেমনি অনাগত জন্মের কর্ম্ম-বীজ লুক্কায়িতভাবে বহন করিয়া নূতন জন্ম-সংগঠনে উহার কিয়দংশ নিয়োজিত করিতেছে। নূতন ধানের চাষ করিতে গোলার বীজধান্ত কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইলেও ফসল কাটিয়া আনিলে সে ক্ষতিপূরণ ত হয়ই বরং নূতন আমদানী হয় ঢের ঢের, তেমনি প্রকৃতির গোলা হইতে যে-টুকু কর্ম্মের অপচয় দ্বারা নূতন জন্মের বনিয়াদ গড়া হইল সেই ক্ষতিটুকু সুদে-আসলে ঐ জন্মের নব-উপার্জ্জিত কর্ম্মের দ্বারা পরিশোধ করা হয়। কাজেই প্রকৃতিতে ভাটা ধরান যে-সে ব্যাপার নহে।

সূর্য্যমণ্ডল হইতে সূর্য্যালোক প্রভাতে লোহিত, দ্বিপ্রহরে শুক্ল, সন্ধ্যায় তমসাচ্ছন্ন রূপে বিশ্বজগতকে যুগে-যুগে সৃষ্টির আদি হইতে ঘিরিয়া রহিয়াছে, অন্তরের মায়া-মণ্ডল হইতেও লাল-সাদা-কালো রঙের কাচখানি জীবের মনকে সৃষ্টির সেই আদিদিন হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এ তিনরঙের খেলা বাহিরে-ভিতরে চলিতেছে, বাহিরকে জানিতেছি ভিতরকে এড়াইয়া চলিতেছি। ভিতরে এ রঙের খেলা ঘুচাইয়া মনকে নীরঙ্ করিতে না পারিলে নীরূপ ব্রহ্মের খোঁজ মিলিবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি।

ভিতরে রঙীন কাচখানি মনের দৃষ্টিকে রাঙাইয়া উহাকে লালসা-র সংসারে ক্রীড়াপুতুল বানাইয়া রাখিয়াছে—পরাধীন করিয়া ইহাকে দাসখৎ লিখাইয়া যেমন ইচ্ছা চালাইতেছে, এই গুণ-চাতুরী যে বুঝিতে পারে এবং ত্রিগুণাতীত অক্ষর-আত্মনকে জানিতে পারে তাহার মধ্যে স্বাধিকার-সাধনা জাগিয়া উঠিল। গুণগুলি হইল মায়ার পাশ—পাশবদ্ধ জীব যদি বুঝিতে পারে, গুণময়ী প্রবৃত্তি আমার স্বাধীন মনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমি ইহাদিগের শৃঙ্খল হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? এক পন্থা আছে—যদি ইহাদের অনুসৃত পথে না চলি—ত্রিগুণের অসহযোগই সেই শ্রেয় পন্থা।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥

স্বাধিকার-সাধনার প্রথম সোপানই হইতেছে গুণক্রিয়ার প্রতি ঔদাসীন্য। গুণক্রিয়ার প্রতি একেবারে উদাসীন হওয়া চাই, তাই যোগদর্শনে আমরা পাইতেছি যোগশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ। যখন মনের উপর গুণনির্দ্দেশে 'কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ' জাগিয়া উঠিবে তখন মনে করিতে হইবে 'ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং' এবং চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া ইহাদিগকে অস্বীকার করিতে হইবে। ইহার ফলে

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।

যখন ক্রমোন্নয়নে গুণের প্রভা ক্ষীণ হয় তখন নির্গুণের আভাস মনে জাগিয়া উঠে। কিন্তু মনকে ত্রিগুণের পাশমুক্তি করা যে-সে কর্ম্ম নহে—ইহা সাংখ্যের 'অত্যন্ত পুরুষার্থের' দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে,: 'দৈবী হি এষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া' মন্ত্রের আলোচনায় ইহা দেখিয়া আসিয়াছি, উহার পুনরাবৃত্তি করিয়া ফল নাই। কিন্তু জীব যখন তাহার মনকে গুণমুক্ত করিতে পারিবে তৎসঙ্গে-সঙ্গেই সে 'জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্ত হইবে'। ইহার অর্থ কি? তাহার মধ্যে জীবসৃষ্টির formula—কর্ম্মের ফোয়ারা একেবারে শুকাইয়া যাইতে হইবে। নতুবা অনাগত অসংখ্য ভবিষ্যজ্জন্ম ও তৎসহগামী মৃত্যু-জরা-দুঃখ একদা বিলোপ পাইবার কি কারণ থাকিতে পারে? ত্রিগুণের সহিত যদি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গননাতীত জন্মান্তরীন কর্ম্মের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ না থাকে তবে 'গুণান্ এতান্ অতীত্য' হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই কেন রাশি রাশি কর্ম্মের ভাণ্ডার ফাঁকা হইয়া যাইবে? কর্ম্মের সমূহ-নিঃশেষ দরকার, কেননা স্বল্পাবশেষ থাকিলেও উহা পুনর্জ্জন্মকারক হইবে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে গুণের অতিক্রমণ অর্থ খুব সহজ নহে। গুণের অতিক্রম অর্থ যদি এইরূপ করা যায় যে গুণগুলিকে নিস্ক্রিয় অবস্থায় ফেলিয়া রাখা তাহাদের উচ্ছেদ নহে—তবে প্রকৃতিকেও ভিতরে অক্ষত-অবস্থায় জিয়াইয়া রাখিতে হইবে, প্রকৃতি টিকিয়া থাকিলে সৃষ্টির formula কাজ করিবেই করিবে। তবেই দাঁড়াইতেছে এই,

গুণ শেষ হওয়া অর্থ মায়া শেষ হওয়া, মায়া শেষ হওয়ার অর্থই কর্ম্ম শেষ হওয়া। ইহাদের যে-কোন একটির শেষ হইলেই অপরগুলির শেষ, কারণ ইহারা একেরই নামান্তর। গুণ শেষ হইতেই ভিতরে রঙের খেলা চুকিয়া গেল, নীরঙ্‌ মনে নীরূপ অক্ষরের দীপ জলিয়া উঠিল।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ফুলের ব্যথা

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস এম-এ

কাঁটায়-কাঁটা পাতায় ঘেরা
আধ-ফোটা ঐ গোলাপ ফুলে,
কোন্ ব্যথা আজ উথ্‌লে ওঠে
ওর ঐ কচি বুকের কূলে?
আজ্‌কে সাঁঝে ফুটতে গিয়ে
কোন্ বেদনা উচ্ছ্বসিয়ে
যৌবনেরি বিভিষিকায়
বুকের তলায় উঠ্‌ছে দুলে!
যৌবনে কি এতই গরল,
রূপের ঝিলক্ এতই তরল,—
তাই বুঝি আজ ভাব্‌তে গিয়ে
ওর, চোখের কপাট যায়গো খুলে?

আধ-খসা ওর ঘোমটা ফাঁকে
কতই করুণ বেদন আঁকে,
তাই, পাপড়িগুলি একে একে
এলিয়ে পড়ে—পড়ে ঝুলে!
অশ্রু-চাপা হাসি হেনে
গোলাপ কহে ঘোমটা টেনে,—
"রূপ ভিখারীর ক্ষুধার তরে
আমরা হাসি—পড়ি ঢলে।
আমরা গোলাপ ঘোমটা টুটি,
হাস্‌তে হবে—তাইত ফুটি!"
—ব্যথিত বুকের কানে কানে
গোলাপ কহে ঘোম্‌টা তুলে!

অন্তরাগ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩৮

দিন পনেরো পরে বেলা দশটা আন্দাজ বিনয় তাহার ঘরে বসিয়া নিবিষ্ট মনে একখানি ছবি আঁকিতেছিল এমন সময়ে বাহিরে দ্বারের নিকট কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, "বিনয় আছ ?"

"আছি, আসুন।" বলিয়া তুলি রাখিয়া বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

পর্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন দ্বিজনাথ, মুখে সানন্দ উত্তেজনার দীপ্তি।

"শুনেছ বিনয় ?"

বিনয় বলিল, "না।"

অসঙ্গত প্রশ্ন,—কারণ শুনিবার পূর্ব্বে কোনো কথা শোনা সম্ভব নহে। পকেট হইতে একখানা টেলিগ্রামের খাম বাহির করিয়া বিনয়ের হাতে দিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "প'ড়ে দেখ।"

টেলিগ্রামখানা খুলিয়া বিনয় পড়িল, Arriving Howrah Wednesday Madras Mail with mejdidi. Rest break journey Cuttack. Sudhansu.

টেলিগ্রামখানা দ্বিজনাথের হাতে ফিরাইয়া দিয়া বিনয় বলিল, "মা আসচেন কাল ?"

"কাল।"

"ক'টার সময় ম্যাড্রাস্ মেল হাওড়ায় পৌঁছোয় ?"

"সকাল দশটা চল্লিশ মিনিট ষ্ট্যানডার্ড টাইম্, ক্যাল্‌কাটা টাইম্ এগারটা চার।"

প্রৌঢ় বিরহীর আকৃতি এবং আচরণে আসন্ন মিলনের সুস্পষ্ট হর্ষোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়া বিনয় খুসী হইল। Madras Mail-এর সময় বলিতে গিয়া চব্বিশের হিসাবের দ্বারা বিড়ম্বিত অনর্থক দুই রকমের সময় বলা যে সেই হুর্দমা পুলকেরই প্রকাশ তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। যে প্রেম তাহার নিজের অন্তরে মহিমময় আসন অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতেছিল অপরের মধ্যে সেই প্রেমের অভিব্যক্তি তাহার মনে সুমিষ্ট শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিল। উৎফুল্ল মুখে বিনয় বলিল, "সুসংবাদ !"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "সুসংবাদ ত বটে, কিন্তু তোমাকে এখনি যেতে হবে বিনয়,—সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে।"

বিনয় স্মিতমুখে বলিল, "এখন আমার তাড়াতাড়ি গিয়ে কি হবে,—কাল মাকে রিসীভ্ করবার জন্যে ঠিক সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হব।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া নিমেষের মধ্যে দ্বিজনাথের মুখ হইতে সমস্ত উৎসাহের চিহ্ন অপসৃত হইল। বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "বিমলার আস্‌বার খবর পাওয়ার পরও যে তুমি এমন ক'রে আপত্তি করবে তা আমি একবারও মনে করিনি বিনয়! তোমার এ রকম অনাত্মীয় আচরণে বাস্তবিকই আমি দুঃখিত হচ্ছি।"

দ্বিজনাথের মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিয়া তদ্বিষয়ে বিনয়ের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, যদিও বিমলার আগমনের সংবাদের সহিত দ্বিজনাথের গৃহে তাহার যাওয়ার অনতিক্রমণীয় যুক্তি কোথায়, তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। শেষ পর্য্যন্ত পরাভূত তাহাকেই হইতে হইবে দ্বিজনাথের আচরণের সূচনা হইতে তাহা অনুমান করিয়া বিনয় আর বেশি আপত্তি করিল না; বলিল, "তা হ'লে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে ও-বেলা গেলেই হবে।"

দ্বিজনাথের মুখমণ্ডল হইতে অসন্তোষের মেঘ অপসৃত হইল। প্রসন্নমুখে বলিলেন, "গুছোনো-গাছানো ত' সেখানে।—এখান থেকে জিনিসগুলো কেবল যত্ন ক'রে নিয়ে যাওয়া,—সে জন্যে সতীশকে নিয়ে এসেছি।"

কোনো দিক্ দিয়াই কোনো উপায় নাই বুঝিয়া বিনয় টেবিলের উপর তাহার টাইম্‌পীসের প্রতি হতাশ ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "দশটা প্রায় বাজে—তা হ'লে না হয়—"

বিনয়কে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তোমার খাবার এখানে তৈরি হচ্চে সেই কথা বলছ ত? দেশে দরিদ্র লোকের অভাব নেই—তোমার খাবারটি আজ পথের কোনো ক্ষুধিত ভিখারীকে দেবার ব্যবস্থা ক'রে যাও—পুণ্য হবে। এখন শীঘ্র চল, অনেক পরামর্শ আছে।"

দ্বিজনাথের আহ্বানে সতীশ আসিয়া জিনিস-পত্র বাঁধা-বাঁধির কার্য্যে লাগিয়া গেল। বিশেষ দরকারি কয়েকটি জিনিস নিজে তাড়াতাড়ি সুটকেস্ ও ট্রাঙ্কে ভরিয়া লইয়া চাবি দিয়া বিনয় হোটেল-ম্যানেজারের কাছে উপস্থিত হইয়া তাহার সমস্ত দেয় চুকাইয়া দিল।

বিনয়ের মত একজন ভদ্র এবং নির্ব্বিবাদ বোর্ডারকে হারাইয়া ম্যানেজারের মন প্রসন্ন ছিল না,—তিনি দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "মিষ্টার রায়, আপনি আপনার আত্মীয়ের বাড়ি উঠে যাচ্ছেন তা'তে আমার আর বলবার কি আছে। কিন্তু যদি কখনো কলকাতায় কোনো হোটেলের আশ্রয় নেবার দরকার হয় তা হ'লে ক্যালকাটা হোটেলকে ভুলবেন না, এই আমার অনুরোধ রইল।"

বিনয় বলিল, "সে 'কখনো' শীঘ্র হবে কি-না বা কখনো হবে কি না তা বলতে পারিনে, কিন্তু যদি কখনো হয় তা হ'লে ক্যালকাটা হোটেলকে ভুলবার কোনো কারণ হবে না, এ আপনাকে কথা দিয়ে গেলুম।"

যাহারা তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য হোটেলে আসিবে তাহাদের জন্য নূতন ঠিকানা ম্যানেজারকে লিখাইয়া দিয়া বিনয় প্রসন্ন লঘু চিত্তে দ্বিজনাথের সহিত মোটরে আসিয়া বসিল। বিমলার আগমনের সংবাদের সহিত যে শুভদিনের আগমনের কথা জড়িত তাহা মনে করিয়া হিল্লোলিত আনন্দে তাহার মনখানি দুলিতেছিল।

গৃহে পৌঁছিয়া বিনয় দেখিল বিমলার জন্য যত না হউক তাহারই অভ্যর্থনার জন্য সমস্ত বাড়িতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহার ব্যবহারের ঘরগুলি পরিচ্ছন্নভাবে ধোয়া পোঁছা হইয়াছে, বসিবার ঘরে টেবিলের উপর ফুলদানীতে সদ্য-সজ্জিত ফুলের গুচ্ছ, দেওয়ালের গাত্রে উচ্চে তাহার আঁকা কমলার ছবিখানি বাঁধাইয়া এমন স্থানে টাঙানো হইয়াছে যে চেয়ারে বসিলে ঠিক সামনে পড়ে, ড্রেসিং রুমে নূতন কাপড় চোপড়, শয়ন কক্ষে নূতন ভাবে শয্যা রচিত। খানসামা ব্রাহ্মণের ব্যস্ততা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল যে, বাবুর্চ্চিখানা এবং রোসুইঘর উভয় স্থানেই আজ একটু বিশেষ আয়োজনের পালা পড়িয়াছে।

সমস্ত দিন ধরিয়া বিস্তর গল্প-গুজব কথাবার্ত্তা হইল, কিন্তু যে পরামর্শ করিবার ওজুহাতে দ্বিজনাথ বিনয়কে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহার সন্ধান তন্মধ্যে বিনয় খুঁজিয়া পাইল না। পরামর্শ করিবার কথাটা যে কেবল ছলনা তাহা সেই সময়েই বিনয় বুঝিয়াছিল—তাই তাহারও সে বিষয়ে কোনো আগ্রহ ছিল না।

সন্ধ্যার পর মোটার করিয়া খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া দ্বিজনাথ, বিনয় ও কমলা বিনয়ের বসিবার ঘরে বসিল। ঘরের এক কোণে একটা ফুলদানীতে মালী একঝাড় কামিনী ফুল রাখিয়া গিয়াছিল—তাহার মৃদু সৌরভে সমস্ত ঘরটা ভরিয়া ছিল।

দশ পনেরো মিনিট কথাবার্ত্তার পর কমলা বলিল, "বাবা, আমি তা হ'লে এখন উঠি? খাবার ব্যবস্থা কি করচে না করচে একটু গিয়ে দেখি।"

দ্বিজনাথ বুঝিলেন খাবার ব্যবস্থার কথা কোনো কথাই নহে—এ শুধু সঙ্কোচ হইতে কমলার পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা। বলিলেন, "আচ্ছা তুমি না হয় একটু পরে যেয়ো—বিনয়ের সঙ্গে ততক্ষণ একটু কথাবার্ত্তা কর—আমি দশ পনেরো মিনিটে ঘুরে আসচি।" বলিয়া নিজ কক্ষের দিকে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিজনাথ চলিয়া গেলে সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "পুরুষের ভাগ্য বড় প্রবল জিনিস কমলা। ভাগ্য যখন প্রসন্ন হ'তে আরম্ভ করে তখন তাকে ব্যাঘাত দিতে কেউ পারে না।"

কৌতূহল সহকারে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তুমি পালাবার চেষ্টা করছিলে, ফলে তোমাকে পেলাম আরো বেশি ক'রে।"

এ কথার কোনো উত্তর কমলার মুখে আসিল না,—সে মৃদু হাসিয়া একবার বিনয়ের দিকে চাহিল।

বিনয় বলিল, "অথচ এ সৌভাগ্যকে আমার সব সময়ে ঠিক বিশ্বাস হয় না! একদিন হঠাৎ ছবি আঁকবার চেষ্টায় তোমাদের বাড়ি গেলাম, তোমাকে দেখে মনে হ'ল আমার অন্তরের মানসী মূর্তির রূপ ধারণ ক'রে তুমি এসে দাঁড়ালে, তোমারই ছবি আঁক্‌বার আদেশ পেলাম,—তারপর তোমার ছবি আঁক্‌তে আঁক্‌তে ধীরে ধীরে তোমাকে অধিকার করলাম—আর মাস খানেক পরে তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী হবে কমলা,—এ যেন মনে হয় সত্যি নয়। ভয় হয় কোন্ দিন ঘুম ভেঙে দেখ্‌ব এতদিন যা দেখেচি সব স্বপ্ন! এ তো সৌভাগ্য নয়, এ সৌভাগ্যের বাড়া জিনিস—তাই ধারণা করতে মনে সাহস হয় না!"

বিনয়ের সুগভীর প্রণয়-নিবেদনে সমস্ত ঘরটা থম্‌থম্ করিতে লাগিল। আনন্দে, আশঙ্কায়, উত্তেজনায় কমলার চোখ ভরিয়া জল আসিল। বিনয়ের অলক্ষিতে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া সে মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "অত ভয় করো না—এমন কিছু জিনিস পাওনি।"

বিনয় মৃদু হাসিয়া বলিল, "ভয় আমি করিনে কমলা, কারণ জীবনের পাথেয় আমি সংগ্রহ করেছি—আর বেশি কিছু না জুটলেও তাই ভাঙিয়েই সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারব। ভয় হয় তোমার জন্যে। মনে মনে কি ঠিক করেছি জান?"

সভয়ে কমলা বলিল, "কি?"

বসিবার ঘরের আলোকে পাশের শয়নকক্ষের আসবাব-পত্র অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল। বিনয় সেইদিকে হাত দেখাইয়া বলিল, "পাশের ঘরে তোমরা আমার শোবার ব্যবস্থা করেছ,—কিন্তু যতদিন না ও-ঘরে তোমাকে গ্রহণ করবার অধিকার পাচ্ছি ততদিন ও-ঘরে আমি শোব না।"

"কেন?"

"ও ঘরের খাট একজনের চেয়ে ঢের বেশি চওড়া, ও ঘরের বিছানা একজনের চেয়ে অনেক পরিমাণে বেশি। তোমার কথা ভেবে নিয়ে ও ঘরের ব্যবস্থা করা হ'য়েচে, তোমার অভাবে ও ঘর অসম্পূর্ণ মনে করি। তুমি যতদিন ও ঘরে প্রবেশ করবার অধিকার না পাচ্ছ, ততদিন আমি ও ঘরে শুচ্চিনে।"

সবিস্ময়ে কমলা বলিল, "তবে কোথায় শোবে?"

বসিবার ঘরে দেওয়ালের পাশে বিশ্রামের জন্য একটা সোফা ছিল, সেইটা হাত দিয়া দেখাইয়া বিনয় বলিল, "ওই সোফায় শুলে তোমার ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘুমিয়ে পড়ব,—তারপর ঘুম ভেঙে দেখ্‌ব তোমার ছবি।"

আরক্ত মুখে কমলা বলিল, "কি খেয়াল গো তোমার!"

মৃদু হাস্যের সহিত বিনয় বলিল, "তা মন্দ খেয়াল কি? এতদিন তোমাকে মনের মধ্যে পেয়েছিলাম—এবার কিছুদিন ছবির মধ্যে পাব, তারপর পাব সংসারের পদ্মাসনে কমলার রূপে।" বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "খুব কাব্য ক'রে কথাগুলো বলচি। না?"

কমলা কিছু বলিল না—শুধু তাহার মুখে মৃদু হাস্যের ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল। তাহার অর্থ—একটু বলছ বটে।

বিনয় বলিল, "আমার আর একটা খেয়ালের কথা শুনবে কমলা?"

কমলা বলিল, "বল, শুনি।" কিন্তু বলিবার সময় হইল না—দূরে দ্বিজনাথের কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

আহারের পর বারান্দায় একটু বসিয়া ঘরে আসিয়া বিনয় দেখিল বসিবার ঘরে সোফার উপর একটি পরিচ্ছন্ন চাদর পাতা, তাহার এক প্রান্তে একটি ধপ্‌ধপে মাথার বালিস। কোন্ ফাঁকে কমলা আসিয়া এইটুকু যত্নের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে ভাবিয়া তাহার অন্তর একটি স্নিগ্ধ আনন্দের রসে ভরিয়া উঠিল। কমলার ছবিখানি দেখিতে দেখিতে বিনয়ের চক্ষু যখন তন্দ্রালসে মুদিয়া আসিল রাত্রি তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে সুইচ্‌ টিপিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল।

৩৯

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া বিনয় দেখিল তাহারই উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে, গৃহের আর সকলেই উঠিয়াছে। চোখ খুলিয়া প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল কমলার ছবির উপর। প্রত্যুষের অনুগ্র আলোকে ছবিখানি বিষয় শোভায় অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। ক্ষণকাল বিনয় সবিস্ময় পুলকে নিজের সৃষ্টির দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল, তাহার পর শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

বেলা তখন সাড়ে ছটার বেশি হইবে না, কিন্তু দ্বিজনাথের ব্যস্ততা দেখিয়া মনে হইতেছিল Madras Mail হাওড়া ষ্টেশনে প্রায় আসিয়া পড়িল। দুই রকম সময়ের কোনোটাই বিনয়ের ঠিক মনে ছিল না, কিন্তু সে যাহাই হউক না কেন, এখনো যে তাহার অন্ততঃ ঘণ্টা চারেক বিলম্ব আছে এ আন্দাজ তাহার মনে মনে ছিল। নীচে দ্বিজনাথের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল, গাড়িতে পেট্রোল কয় গ্যালন্ আছে এবং মোবিলয়েল কতদিন দেওয়া হইয়াছে মহবুবের সহিত তাহারই আলোচনা হইতেছিল।

ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিতেই বিনয়ের দেখা হইল কমলার সহিত। একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়া সে একখানা চক্‌চকে বাঁধানো বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল—সম্ভবতঃ বিনয়েরই প্রত্যাশায়। বিনয়কে দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কমলা একটু হাসিল, তাহার পর পিছন দিকে একবার দেখিয়া লইয়া বলিল, "রাত্রে ঘুম হয়েছিল ?"

বিনয় বলিল, "হয়েছিল বৈকি।"

"ঘাড়ে ব্যথা হয় নি ত ?"

"কেন ?"

"এক পাশে শুয়ে ?"

কমলার প্রচ্ছন্ন পরিহাসটুকু বুঝিতে পারিয়া বিনয় হাসিয়া বলিল, "আমি যে বরাবর ডান পাশেই শুয়ে ছিলাম, মাথার বালিস উল্টো দিকে ক'রে নিয়ে বাঁ পাশে শুইনি তা তোমাকে কে বললে ?"

মাথার বালিস অপরদিকে করিয়া বাঁ পাশে শুইলে তাহার ছবির হিসাবে বিনয়ের চক্ষু কোন্ দিকে পড়ে মনে মনে তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়া কমলা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "উঃ তুমি কি চালাক লোক! কোনো রকমেই তোমার সঙ্গে পারবার যো নেই!"

বিনয় স্মিতমুখে বলিল, "না, ডান পাশেও না, বাঁ পাশেও না। বালিস উল্টে যে ব্যক্তি পাশ ফেরে তার সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত।"

"সত্যি।" বলিয়া কমলা হাসিতে লাগিল।

সিঁড়িতে দ্বিজনাথের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। "চল্লুম" বলিয়া কমলা পাশের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। কমলার পরিত্যক্ত বইখানা তুলিয়া লইয়া বিনয় দেখিল সেখানি হুইট্‌ম্যানের একটি কাব্যগ্রন্থ।

ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনয়কে দেখিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "এই যে বিনয়, কখন উঠ্‌লে ? রাত্রে ঘুম হ'য়েছিল ত ? কোনো অসুবিধা হয়নি ?"

এতগুলি প্রশ্নের মধ্যে বিনয় শেষ প্রশ্নটির উত্তর দিল; বলিল, "না, হয়নি।"

"মুখ ধুয়েছ ?"

"না।"

"যাও, শিগ্‌গির সেরে এস—চা এসে পড়ল ব'লে। তোমার বাথ্‌রুমে সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। ষ্টেশনে যেতে হবে মনে আছে ত ?—খুব বেশি সময় নেই।"

কোনো প্রকারে হাস্য দমন করিয়া বিনয় বলিল, "তবু এখনো বোধ হয় ঘণ্টা চারেক সময় আছে বাবা ?"

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া হাতের রিষ্ট্‌ ওয়াচ্‌ দেখিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "ক্যালকাটা টাইম্ এগারোটা চার মিনিট—চার ঘণ্টা ঠিক নেই, তবে ঘণ্টা তিনেক আছে বটে। সে সময়টুকু এই সবেতেই খেয়ে যাবে।"

চা খাওয়া ছাড়া আর এমন কি-সব থাকিতে পারে যাহাতে তিন ঘণ্টা সময় লাগিবে তাহা কিছুতেই অনুমান করিতে না পারিয়া বিনয় প্রফুল্ল মনে প্রস্থান করিল।

সাড়ে নয়টার সময়ে গাড়ি-বারান্দায় মোটর আসিয়া লাগিল। দ্বিজনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন; বলিলেন, "একটু সময় হাতে রেখে যাওয়া ভাল, অফিস টাইম, মোড়ে মোড়ে আট্‌কাবে—তা ছাড়া হাওড়ার পোলে traffic jam প্রায়ই থাকে।"

"চলুন।" বলিয়া বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ির নিকটে আসিয়া দ্বিজনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কই, কমলা কই? কমল! কমল!"

কমলা নিকটেই ছিল, সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আমি ষ্টেশনে যাব না বাবা,—আমি মার জন্যে বাড়িতেই অপেক্ষা করব।"

উদ্বিগ্ন মুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "সে কি! তোমাকে ষ্টেশনে না দেখতে পেলে তোমার মা যে ভারি দুঃখিত হবেন।"

কমলা বলিল, "ষ্টেশন থেকে বাড়ি আর কতটুকু সময়ের কথা বাবা? তা ছাড়া, পর্দাঠাকুমা পর্য্যন্ত নেই, বাড়িতে মাকে একজন ত রিসীভ করা চাই?"

কমলার কথা শুনিয়া দ্বিজনাথ হাসিলেন; বলিলেন, "ও-সব কোনো কাজের কথা নয়—আসল কথা হচ্চে—যাক্,—এর মীমাংসা করতে গেলে এখন আর চল্‌বে না। তা হ'লে আমরা দুজনেই চলি।"

'আসল কথার' অর্থে দ্বিজনাথ যে কি বলিতে যাইতে-ছিলেন তাহা বুঝিতে কারো বাকি ছিল না। বিনয় হাসিয়া বলিল, "আমি না হয় বাড়ি থাকি বাবা, মা'কে এখানে রিসীভ করবার জন্যে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তুমিও বাড়িতে থাকবে?"

অপ্রতিভ হইয়া বিনয় বলিল, "আমিও নয়—আমি একা।"

মাথা নাড়িয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "না, তা হয় না, তোমার যাওয়া চাই-ই।"

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দ্বিজনাথ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—সময় আর কাটিতে চায় না—তখনো ট্রেণের প্রায় পঞ্চাশ মিনিট দেরি। খানিক গল্প করিয়া, খানিক পায়চালি করিয়া, খানিকক্ষণ খবরের কাগজ পড়িয়া অতিকষ্টে কোনো প্রকারে সময়টা কাটিল,—অদূরে দেখা গেল সরীসৃপ-গতিতে Madras Mail প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

বিমলা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ছিলেন,—তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দ্বিজনাথ চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "বিমলা!"

দ্বিজনাথকে দেখিতে পাইয়া বিমলার মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না, কিন্তু আনন্দে মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গাড়ি খানিকটা আগাইয়া গিয়া থামিল। বিনয় ও দ্বিজনাথ দ্রুতপদে যখন বিমলার কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তখন বিমলা প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নামিয়া পড়িয়াছেন।

বিমলার পদধূলি গ্রহণ করিয়া স্মিতমুখে বিনয় বলিল, "মা, আমি বিনয়।"

প্রসন্ন মুখে বিনয়ের মাথায় দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া বিমলা বলিলেন, "তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। বেঁচে থাকো বাবা।"

স্বামীর আগ্রহে এবং যুক্তি তর্কের অনুরোধে বিনয়ের সহিত কমলার বিবাহ-প্রস্তাবে বিমলা সম্মতি দিয়াছিলেন, কিন্তু মনে মনে এ ব্যাপার তাঁর ঠিক মনঃপূত ছিল না। কমলার বিবাহ স্থির ছিল সন্তোষের সহিত,—সন্তোষ কলিকাতার বনেদী বংশের ছেলে, বিলাত হইতে বি-এ এবং ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়াছে, কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছে, দেখিতে সুপুরুষ, স্বভাবে চরিত্রবান, অমায়িক—হঠাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এক অজ্ঞাত-কুলশীল চিত্রকর—ভারতবর্ষের মত দেশে তার এমনই কি উপার্জ্জন এবং সম্ভ্রম প্রত্যাশা করা যাইতে পারে—তাহার সহিত বিবাহের স্থিরতা অবিবেচনা-প্রসূত বলিয়া বিমলার মনে হইয়াছিল। জশিডিতে তিনি উপস্থিত থাকিলে ছবি আঁকার মধ্য দিয়া এমন একটা বিপর্য্যয় ঘটিবার সুবিধা পাইত না, সে বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বিষয়জ্ঞানবর্জ্জিত স্বামী এবং হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কন্যা পরস্পরের সহায়তায় এই অবস্থাটি ঘটাইয়াছে মনে করিয়া বিমলার মনে উভয়েরই প্রতি সবিরক্তি অভিমান ছিল। কিন্তু বিনয়ের সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া বিমলা প্রসন্ন হইলেন, ফুলের রূপ দেখিয়া ফলের রসের বিষয়ে আস্থা জন্মাইল।

বিমলার সম্মতির মধ্যে যে অসম্মতির অতি ক্ষীণ মালিন্য মিশ্রিত ছিল তাহা দ্বিজনাথ বিমলার চিঠিগুলি হইতে বুঝিতে পারিতেন। তাই প্রথম দর্শনে বিমলা বিনয়কে কি ভাবে

গ্রহণ করেন তদ্বিষয়ে দ্বিজনাথের মনে আগ্রহের অন্ত ছিল না,—বিমলার আচরণে অনেকটা সাহস পাইয়া দ্বিজনাথ নিম্নকণ্ঠে বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? পছন্দ হয়েচে ত?"

বিমলা মুখে কোনো উত্তর না দিয়া ভ্রূভঙ্গের দ্বারা উপস্থিত এ প্রসঙ্গ হইতে স্বামীকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

বিনয় দ্বিজনাথের প্রশ্নও শুনিয়াছিল এবং বিমলার অনুত্তরও লক্ষ্য করিয়াছিল; বলিল, "পছন্দ হয়েচে বল্‌লে কোনো ক্ষতি ছিল না মা, কারণ যে জিনিসকে গ্রহণ করতেই হবে সে জিনিসকে পছন্দ ক'রে নেওয়াই ভাল।"

বিনয়ের কথায় একটা কলহাস্য উঠিল। বিমলা বলিলেন, "তা নয় বিনয়, গ্রহণ যখন করা হচ্ছে তখন তোমাকে পছন্দ হয়েছে এ নিশ্চয় জেনো।"

সুধাংশু দ্বিজনাথদের সহিত যাইতে রাজি হইল না—একটা ট্যাক্সি লইয়া সে বাড়ি চলিয়া গেল। জিনিস-পত্র সতীশের জিম্মায় দিয়া বিমলা ও বিনকে লইয়া দ্বিজনাথ গাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

মহবুব্ তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া নত হইয়া প্রভুপত্নীকে দীর্ঘ সেলাম করিল।

বিমলা বলিলেন, "কেমন আছ মহবুব্? ভাল ত?"

মহবুব্ বলিল, "আপনার দোয়ায় ভাল আছি মা!"

গাড়িতে উঠিয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমলা ভাল আছে ত? সে ষ্টেশনে এলনা যে?"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "অনেক পীড়াপিড়ি করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই আসতে রাজি হ'ল না; বল্‌লে বাড়িতে সে তোমাকে রিসীভ্ করবে। আসল কথা, বিনয়ের সঙ্গে আসতে লজ্জা বোধ করলে।"

মুখে বিমলা বলিলেন, "কি ছেলে মানুষ!" কিন্তু মনে মনে খুসী হইলেন। কন্যার মনে লজ্জাশীলতার পরিচয় পাইয়া খুসী না হয় এমন জননী বিরল। লজ্জা যে স্ত্রীলোকের কেবলমাত্র ভূষণই নয়, অম্লান জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু, বিমলা তাহা মনে মনে বিশ্বাস করিতেন।

বিনয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিমলা বলিলেন, "দেখ বিনয়, তোমাকে দেখে পর্য্যন্ত আমার মনে হচ্চে তোমাকে যেন আগে দেখেচি। তোমার মনে পড়ে আমাকে কোথাও দেখেচ?—কোনো নিমন্ত্রণ সভায়, বা কোনো সভা-সমিতিতে?"

বিমলার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বিনয় বলিল, "ও-টা নিশ্চয়ই আপনার ভুল হচ্চে মা। আমার জন্যে আপনার স্নেহ উন্মুখ হয়েছিল ব'লে মনে হচ্চে আমাকে আগে দেখেচেন। আমি ত ইউরোপ থেকে বেশিদিন ফিরিনি; তা ছাড়া, সভা সমিতি বা নিমন্ত্রণ-সভায় আমার যাওয়া-আসা খুবই কম।

বিনয় অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "তা হবে, তোমার মত হয় ত' আর কাউকে দেখেচি।"

"তাই হবে।"

গাড়ি-বারান্দার সম্মুখে কমলা দাঁড়াইয়া ছিল। মুখে তাহার সুমিষ্ট হাস্য, সে হাস্যের মধ্যে আনন্দ ও লজ্জার অপূর্ব্ব সমাবেশ। বিমলা বিমুগ্ধ নেত্রে কন্যার কমনীয় মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন; মনে মনে বলিলেন, এই ত আমার মেয়ে! চিত্রকর ত চিত্রকর, পুলিসের দারোগাও তার সামনে এলে বিপদে প'ড়ে যায়। বিনয় বেচারার আর দোষ কি?

গাড়ি হইতে নামিয়া পদতলনতা কমলার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "কি রে কম্‌লি, ভাল আছিস ত?"

কমলা সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আছি। তুমি ভাল আছ মা?"

ততক্ষণে বিনয় অপর দিকের দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িয়া প্রস্থান করিয়াছিল। একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বিনয়কে নিকটে দেখিতে না পাইয়া বিমলা বলিলেন, "কেমন আছি চেহারা দেখেই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্। একটি কালো হয়ে এসেচি।" তারপর স্বামীর প্রতি একবার চকিত-মধুর দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "তোর বাবা এখনি হয়ত কত বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার ক'রে বসবেন।"

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া পড়িয়া দ্বিজনাথ সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বৈজ্ঞানিক তথ্য বলত?"

বিমলা হাসিয়া বলিলেন, "তাই ত! আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিই, আর তুমি আমাকে ক্ষেপিয়ে মার।"

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই কথাটা দ্বিজনাথের মনে পড়িয়া গেল। বিমলা সীলোন যাইবার পূর্ব্বে সেই প্রসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কৌতুক-পরিহাস হইয়াছিল তাহারই কথা। দ্বিজনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "দেখ, যা বলেছিলাম সত্যি কি-না!"

বিমলা স্মিতমুখে বলিলেন, "আচ্ছা থাক, সে কথা পরে হবে অখন।"

কথাটা কি জানিবার জন্ত কৌতূহল হইলেও তাহার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত কোনো রহস্ত জড়িত আছে মনে করিয়া কমলা সে বিষয়ে কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না।

দ্বিজনাথের ইচ্ছা ছিল পত্নী ও কন্যার উপস্থিতিতে বিনয়ের সহিত একত্রে আহার করেন। কিন্তু তাহা হইল না, বেলা একটা হইতে বিনয়ের একজন ইংরাজ মহিলার ছবি আঁকিবার কথা স্থির ছিল। সে তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া আঁকিবার সরঞ্জাম লইয়া বাহির হইয়া গেল।

যাইবার সময় দ্বিজনাথ বলিলেন, "সন্ধ্যার আগে নিশ্চয় ফিরো বিনয়।"

বিনয় বলিল, "সন্ধ্যার সময়ে ডক্টর সেনের বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ আছে, ফিরতে রাত্রি আটটা হবে।"

সমস্ত দিনটা কাটিল সীলোনের গল্পে এবং বিনয়ের কথায়। দ্বিজনাথ বলিলেন, "তুমি সীলোন থেকে মুক্ত এনেছ বিমল, এখানে তোমার জন্যে আমি কিন্তু একটি হীরে ঠিক্‌ ক'রে রেখেছি। সত্যিই বলছি তোমাকে বিনয় একটি বেদাগ কমল হীরের টুক্‌রো। ক্রমশই বুঝ্‌তে পারবে তাকে।"

বিমলা বলিল, "আমি ত অস্বীকার করছিনে। সত্যি ছেলেটি ভারি চমৎকার—মুখখানি ত মায়া-মাখানো। কিন্তু দেখ, আশ্চর্য্য! আমার কেবলি মনে হচ্চে—বিনয়কে আগে কোথাও দেখেছি—ও মুখ আমার খুব জানা।"

দ্বিজনাথ হাসিয়া বলিলেন, "অসম্ভব কি? আমাদের দৃষ্টি ত' এ জীবনের বাইরে সহজে যায় না, তোমার হয়ত' অন্য কোনো জীবনেরই কথা মনে পড়চে।"

বিমলা বলিলেন, "অত দূরদৃষ্টি আমার নেই,—এই জীবনেই আমি বিনয়কে দেখেছি।"

কমলার ছবি দেখিতে দেখিতে বিমলার বিস্ময় এবং আনন্দের সীমা রহিল না। বলিলেন, "কমলের চেয়ে কমলের ছবি দেখ্‌তেই বেশি আগ্রহ হচ্চে যে গো!"

দ্বিজনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "একি শুধু কমলার দেহের ছবি?—এ হচ্চে কমলার spiritএর ছবি। এর মধ্যে তুমিও আছ, আমিও আছি, বিনয়ও আছে।"

বিনয়ের প্রতি দ্বিজনাথের অসীম প্রীতি দেখিয়া বিমলা কিছু বলিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

বিনয়ের ফিরিতে রাত্রি আটটারও বেশি হইয়া গেল। সেদিন আর বেশি কথাবার্ত্তা হইবার সময় হইল না,—সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া সকলে নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে খাবার ঘরে কমলা, বিমলা এবং দ্বিজনাথ বসিয়া গল্প করিতেছেন বিনয়ের অপেক্ষায়। খানসামারা বিবিধ প্রকার দেশী ও বিদেশী খাবার রাখিয়া গিয়াছে—বিনয় আসিলে চা দিয়া যাইবে।

মিনিট দশেক পরে বিনয় আসিয়া তাহার বিলম্বের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহার সগুধৌত মার্জ্জিত মুখে বালার্কের বর্ণ, অধরে সুমিষ্ট হাস্ত। একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলে দ্বিজনাথ বলিলেন, "আজ ত তোমার ছবি আঁকা-টাকা নেই বিনয়?"

বিনয় হাসিমুখে বলিল, "না।"

"তা হ'লে আজকে একেবারে প্রোগ্রাম বেঁধে সমস্ত দিনের ব্যবস্থা করা। চা খাওয়ার পর সোজা একেবারে বোটানিকাল গার্ডেন্‌। কি বল বিমল?" বলিয়া বিমলার দিকে চাহিয়া দ্বিজনাথ ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন! বিমলার কঠিন দৃষ্টি বিনয়ের উপর নিবদ্ধ, নিঃশ্বাস নিরুদ্ধ, ওষ্ঠাধর স্ফুরিত, চক্ষু চকিত।

ভীত-কণ্ঠে দ্বিজনাথ বলিলেন, "কি হ'ল তোমার!—অমন ক'রে কি দেখ্‌চ?"

"রোসো!" বলিয়া ত্বরিত পদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বিমলা বলিলেন, "তোমার বাঁ হাতটা একবার খোল ত বিনয়!"

"কেন বলুন দেখি?" বলিয়া বিনয় তাহার বাম হস্তের আস্তিন তুলিয়া ধরিল। ঐকান্তিক ঔৎসুক্যে সকলে চাহিয়া দেখিল বিনয়ের বাম বাহুতে একটি সুদীর্ঘ অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন।

দ্বিজনাথের দিকে মুখ ফিরাইয়া আর্ত্ত অস্বাভাবিক কণ্ঠে বিমলা চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো, তোমার নিজের ছেলেকে চিনতে পারোনি!" তারপর "ওরে খোকা! খোকা আমার!" বলিয়া বিনয়কে জড়াইয়া ধরিলেন।

"সে কি!" বলিয়া দ্বিজনাথ দ্রুতপদে বিনয় ও বিমলার দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন বিমলার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু মুদিত, দেহ অবসন্ন; পড়িয়া যাইতেছিলেন,—বিনয় কোনো রকমে ধরিয়া ফেলিল।

দ্বিজনাথ ভয়ার্ত্ত-কণ্ঠে "বিমল, বিমল!" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। চাকরদের ছুটাছুটি পড়িয়া গেল,—কেহ জল আনে, কেহ বরফ আনিতে দৌড়ায়, কেহ ডাক্তারকে ফোন করিতে যায়।

টেবিলের একদিকে খানিকটা জায়গা খালি ছিল, দ্বিজনাথের সাহায্যে বিনয় বিমলার মূর্চ্ছিত দেহ ধীরে ধীরে সেখানে স্থাপিত করিল।

এই অচিন্তিত আকস্মিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে একবার মুহূর্ত্তের জন্য বিনয় এবং কমলার দৃষ্টি পরস্পরের সহিত মিলিত হইল। সে দৃষ্টির মধ্যে কি ব্যক্ত হইল—সুগভীর বেদনা, না অন্তহীন নৈরাশ্য, না সাধারণ মানুষের অনুপলব্ধ নূতন কোনো ভাব, তাহা অন্তর্যামিই বলিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বেদন-বেহাগ

এ, জেড্, নূর আহমদ

(দিওয়ানে আবুল আতাহিয়া)

একদা ভ্রমিতে যবে বন্ধুর কবরের পাশ্,
প্রণাম করিনু তারে বুকভরা ফেলি দীর্ঘশ্বাস,
মর্ম্মান্ত বেদনাঘাতে প্রাণ মোর ভরি গেলো হায়,
তথাপি অতীত সখা প্রত্যুত্তর নাহি দিল তায়।
ক্ষণেক ভাবিয়া শেষে বুঝিলাম খেদ করি ফের
জবাবের শক্তি যদি থাকিত গো ও চাঁদ্ মুখের,
বলিত মিনতি-স্বরে, "হে সুহৃদ, পরাণের মণি,
নিষ্করুণ মৃত্যু মোর নাশিয়াছে রাঙা দেহখানি।"

পুস্তক সমালোচনা

বুকের ভাষা

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "বুকের ভাষা নামক গল্পের বইখানি পড়িলাম। ইহাতে 'নারীর অভিমান', 'প্রভাতের স্বপ্ন' 'বুকের ভাষা', প্রভৃতি ১৭টি গল্প আছে। আধুনিক সময়ের প্রচলিত গল্পগুলির মত এই গল্প-পুস্তক তেমন মামুলী ছন্দের নহে। ইহাদের কোন কোনটি নিছক কবিতা, গদ্যে লিখিত হইলেও তাহাদের ছত্রে ছত্রে বাণীর চরণ নুপুরের রুনুঝুনু বাজিয়া উঠিয়াছে। কবিরা এক সময়ে মিত্রাক্ষরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ ধরিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা আর ততটুকু ছন্দের বাধাও যেন মানিতে চাহেন না—তাঁহারা গদ্যে গীতি রচনা করিতে সুরু করিয়া দিয়াছেন,—রাধাচরণ বাবুর কোন কোন গল্প ঠিক গীতি-কবিতার সুরে লেখা। এই সকল রচনার স্থায়িত্ব কতটা তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ইহা সুখপাঠ্য ও সুলিখিত। দখিনা হাওয়ার স্পর্শ খুবই ভাল লাগে, কিন্তু তাহা আপনাকে নিঃশেষে দান করিয়া যায়—কিছু রাখিয়া যায় না। শিউলী ও কামিনী ফুলের গাছের নীচে দাঁড়াইলে তাহাদের অজস্র দান পাওয়া যায়, কিন্তু একটি অরুণ-স্নাত প্রভাতের দান সেগুলি। সূর্য্যদেব আকাশের খানিকটা দূর উঠিতে উঠিতেই তাহারা বাসি হইয়া যায়। এই গল্পগুলি সেই শিউলী ও কামিনী ফুল জাতীয়।

আমাদের দেশের সাহিত্যে স্বল্পস্থায়ী অথচ মধুর, সংক্ষিপ্ত অথচ রূপ-রসে ভরপুর একটা কবিতার যুগ আসিয়াছে। এই যুগের অনেক লেখকেরই কপালে ভারতীর দেওয়া চন্দন-লেখ,—ইঁহাদের শক্তি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবিরা বাণীর প্রসাদে মনোরঞ্জন করিবার শক্তি পাইয়াছেন। রাধাচরণ বাবুর লেখায় আমরা সেই শক্তির প্রচুর নিদর্শন পাইতেছি। কিন্তু আকাশের গায় যেরূপ কোন দৈব চিত্রকর অজস্র উট, মঠ, মন্দির আঁকিয়া মুছিয়া ফেলিতেছেন এবং পুনরায় তরু, পশু ও কুঞ্জ আঁকিয়া তাহাদের স্থল ভর্ত্তি করিতেছেন, এই লেখকরাও তদ্রূপ স্বল্প-স্থায়ী ছায়াচিত্র দেখাইতে ব্যস্ত—তাঁহারা কোন স্থায়িকীর্ত্তি রচনা করিবার প্রবৃত্তি রাখেন না। অথচ মনে হয় যাঁহাদের হাতে চারুকলানৈপুণ্য এরূপ সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারেন।

পাঠকেরা এখন কি চান্, আমরা ঠিক তাহা বুঝিতে পারি না—সাহিত্যের পথে কি সাধনা এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে? সেই ধ্যানলোকের পথ কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন কি রেলের কামরায় বসিয়া অল্প সময় মদির আনন্দে অতিবাহিত করিবার জন্যই গল্প ও কবিতার দরকার? নানারূপ ব্যস্ততা ও কর্ম্মক্লান্তির মধ্যে খানিকটা সময় শ্রান্তি অপনোদনের জন্যই কি কবিতা ও উপন্যাসের প্রয়োজন? এখন কি ভিক্টর হিউগো ও কাউণ্ট টলষ্টয়ের মত সাধনার সামগ্রী জগতে দেওয়ার দিন অতীত হইয়া গিয়াছে?

এ সকল অবান্তর কথা এখানে তুলিবার প্রয়োজন কি? আমরা বাঙ্গলায় এমন বহু লেখকের গল্প ও কবিতায় প্রচেষ্টার নমুনা পাইতেছি, ইঁহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে বিশিষ্ট ক্ষমতার নিদর্শন দেখা যাইতেছে—ইঁহারা ইচ্ছা করিলে সাহিত্যের আজীবন সাধনায় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যশস্বী হইতে পারেন—কল্পতরু রচনার শক্তি ইঁহাদের আছে, অথচ ক্ষুদ্র একটি গন্ধপুষ্প দিয়া আমাদিগকে ইঁহারা ফাঁকি দিতেছেন কেন?

রাধাচরণ বাবুর এই সংগ্রহের মধ্যে "নারীর অভিমান" গল্পটি পড়িয়া মনে হইল, ইনি যতই কবিত্বের নিবিড় কুহেলিকা রচনা করুন না কেন, মানব চরিত্রের প্রতি ইঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি আছে—ঘটনাগুলিকে আয়ত্ত করিয়া আখ্যান

বুকের ভাষা—মূল্য এক টাকা। ৪১।১।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস্ হইতে শ্রীরমেশচন্দ্র পাল বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বস্তু চিত্তাকর্ষক ও উপাদেয় করিবার শক্তি ইঁহার নাট্যকারদেরই মত। একটি ক্ষুদ্র বালিকার অবাধ আবদার কিরূপ অভাবনীয় ভাবে পরিণতি পাইয়াছিল—এই গল্পটিতে তৎসংক্রান্ত মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ খুব উপাদেয় হইয়াছে। তাঁহার "বাড়ীর বউ" গল্পটিতে কয়েকটি ক্ষুদ্র রেখার টানে বিধবা কুলবধূর যে ছবিটি অঙ্কিত হইয়াছে—আনাড়ী লেখক বহু পৃষ্ঠায়ও সেরূপ কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিতেন না। এই গল্পের বিশেষ কয়েকটি ছত্র বধূর হৃদয়ের অন্তঃপুরের দ্বার ঈষৎ মুক্ত করিয়া যে বিষাদময়ীর রূপটি আভাসে দেখাইয়াছে তাহাতে মনে হয় 'বাড়ীর বৌ' শুধু কর্ত্তব্যের প্রতীক,—গৃহ কর্ম্মের যন্ত্র ও পরসেবানন্দময় উদাসীন চিত্র নহেন; সমস্ত কর্ম্মপ্রেরণা ও গৃহস্থালীর মধ্যে তিনি তাঁহার নারী হৃদয়ের ব্যথাটি লুকাইয়া রাখিয়াছেন—একটি কথা, একটি নিঃশ্বাস একটা শাঁকের শব্দে সেই ব্যথা উদ্বেল হইয়া উঠে—এবং মৃণ্ময়ী প্রতিমা চিণ্ময়ী রূপে ধরা দেন। এই গল্পের শেষ কয়েকটি ছত্রে রাধাচরণ বাবু যে সূক্ষ্ম কৌশল দেখাইয়াছেন, তাহা পরিণত শিল্পীর যোগ্য।

আমরা পাঠকবর্গকে এই গল্পের বইখানি পাঠ করিবার অনুরোধ করিতেছি এবং তৎসঙ্গে রাধাচরণ বাবুকে এই অভিপ্রায় জানাইতেছি যে, তিনি তাঁহার লিপিশক্তি ক্ষুদ্র ও স্বল্পস্থায়ী স্বপ্ন-লোকের কথায় অজস্র ব্যয় করিয়া যেন রিক্তহস্ত ও নিঃস্ব না হইয়া পড়েন। সঞ্চয়ী গৃহস্থের মত বাণীর প্রসাদ রক্ষা করিয়া যাহাতে পরিণামে তাঁহার স্থায়ী সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন—তজ্জন্য প্রস্তুত হউন। তাঁহার লেখায় শক্তির পরিচয় পাইয়াছি বলিয়াই আমরা এতগুলি কথা লিখিলাম।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

বাঙ্গলার কথা

শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ

ভূমিকা

ভূমিকাতেই বলিয়া রাখা ভাল যে ইহা ভৌগোলিক রচনা নহে, তবে ভূগোলের কথাও স্থানে স্থানে থাকা বিচিত্র নয়। ইংরাজিতে the বলিয়া একটা শব্দ আছে, যেটা ইংরাজি শব্দের আগে বসিয়া ভাষাকে একেবারে জাতে পরিণত করিয়া দেয়। আমাদের বাঙ্গলায় সে উপদ্রব নাই, ঐ এক কথাতেই আমরা দেশটাকেও চিনিতে পারি, আবার ভাষাও সাহিত্য বলিয়াও বুঝিতে পারি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আমাদের "বাঙ্গলার কথা" শুনাইয়াছেন—কিন্তু সেটা দেশের কথা, তাঁর সুরের উপর তান ধরা আমাদের অসাধ্য; তাই বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে কিছু নৈবেদ্য আজ আপনাদের নিবেদন করিব। তবে এই দু'টা "কথা"র একস্থানে অন্তত খানিকটা মিল আছে, সে কথাতে যেমন দেশ মাতৃকার দুঃখকাহিনী প্রতিফলিত হইয়াছে, একথাতেও তেমনই ভাষামাতৃকার "বাণী-বিলাপ" কিছু কিছু প্রতিধ্বনিত হইবে। অবশ্য ভাষাজননীর দুঃখকাহিনীও অনেকে অনেক রকমে আমাদের বলিয়াছেন, কিন্তু পুরোহিত ঠাকুর যেমন একই আসনাঙ্গুরীয় একটু গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া সাত বাড়ির দেবতাকে নিবেদন করেন, আমাদের এ "কথা"ও তেমনই একটু রকম ফের করিয়া আপনাদের শুনান হইতেছে।

বর্ণমালার আকৃতি

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের এক অধিবেশনে ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ বিদ্যারত্ন মহাশয় বর্ণমালার পক্ষ হইতে এক "অভিযোগ" উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সেরূপ গুরুতর প্রশ্ন এখন অনাবশ্যক, কিন্তু তাহা অপেক্ষা লঘুতর অভিযোগও যে বর্ণমালার আছে, সে বিষয়ে বিবেচনা করিবার আজ সময় আসিয়াছে। বর্ণমালার আকৃতিতেই গোলযোগ হইয়া বসিয়া আছে। এ চেহারায়

যে বর্ণগণ সন্তুষ্ট নহে, তাহার আভাষ তাহারা কোন সম্মিলনে না তুলিয়া একেবারে সরাসরি হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছিল। জজ সারদা মিত্র আপোষে নিষ্পত্তি করিবার ইচ্ছায় যথেষ্ট চেষ্টা চরিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ভারতের অধিকাংশ জাতিরই যেমন এক বর্ণমালা, তেমনই একই হরফ (লিপি বা script) হইলে, সামাজিক জাতীয়তার পক্ষে খুবই সুবিধা; বিশেষত কালে নানা কারণ দেখাইয়া বাঙ্গলাকেই ভারতের জাতীয় ভাষায় পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, সে পরিবর্ত্তন আর হইল না—কারণ কোন কোন পাণ্ডিতের ধারণা যে বর্ণোদ্ধার "তন্ত্রে" মহেশ্বর বর্ণমালার যে ধ্যান বলিয়া গিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা বর্ণমালারই অনুরূপ—অথচ এই মতটি প্রতিষ্ঠা করিয়া, সারা ভারতব্যাপী একটা আন্দোলন তুলিয়া সংস্কৃত পুঁথিগুলিকে নাগরীর দাড়া হইতে উদ্ধার করিবারও আমাদের কোন চেষ্টা নাই।

অথচ হিন্দিসাহিত্যসেবকগণ যে আমাদের বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্যের সমস্ত পুঁথিগুলিকেই বর্ণানুবাদ (transliteration) করিতে লাগিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন সংবাদই আমাদের অনেকে রাখেন না। আর হিন্দি সাহিত্যের গৌরব মহাত্মা তুলসীদাসের "রামচরিতমানসের" বর্ণানুবাদ দূর হউক, ভাষানুবাদও (translation) বাঙ্গলায় দুর্লভ; অথচ এই রামায়ণের একাধিক ইউরোপীয় সংস্করণ রহিয়াছে।

বর্ণমালা

তারপর ঐ চোদ্দটা স্বরবর্ণ আর ছত্রিশটা ব্যঞ্জন বর্ণের জ্বালাতেও বর্ণমালা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কবে কোন যুগে বাঙ্গলার দিদিমা সংস্কৃতের আমলের লোকেরা কণ্ঠের কালোয়াতি দেখাইয়া তিনটা "শ" দুইটা "ন" আর দুইটা করিয়া "ই, উ" উচ্চারণ করিতে পারিতেন বলিয়া আজও যে বাঙ্গলা বর্ণগুলিকে তার জের টানিতে হইবে, এমন কোন লেখা পড়া ত নাই। একথাও একবার সাহিত্য-সম্মিলনে উঠিয়াছিল, কিন্তু সকলেই তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, (অবশ্য কথাটা বক্তা হাসি তামাসার মধ্যেই তুলিয়াছিলেন); কিন্তু কেন যে এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল, তাহারও কোন কৈফিয়ত নাই।

বর্ণ বিন্যাস প্রকরণ প্রসঙ্গে তর্ক উঠিতে পারে যে, বাঙ্গলা শব্দের অধিকাংশই সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, সুতরাং বানান সমস্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণই অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু এটা অত্যাচার নহে কি? আমি আপনার কাছে টাকা ধার লইয়াছি বলিয়া কি নিজ ইচ্ছামত খরচ করিতেও পাইব না? তাহাতেও আপনার "প্রত্যয়, আদেশ" পালন করিতে হইবে? অথচ ইংরাজি ভাষার দিকে চাহিয়া দেখুন, উহার অনেক শব্দই Greek, Latin প্রভৃতি হইতে আসিয়াছে, কিন্তু Englandএ আসিয়াই তাহারা প্রায় সকলেই ইংরাজি পোষাক পরিয়াছে। ইংরাজি শব্দের বর্ণ বিন্যাস উচ্চারণানুগ করিতে England-এর শৈথিল্য দেখিয়া America যে বিদ্রোহ করিয়া বসিয়াছে, তাহার প্রমাণ আমেরিকার অভিধানগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পালিতে বর্ণের বালাই নাই, আর প্রাকৃত সংস্কৃতের বিদ্রোহী সন্তান। এই স্থলে প্রসঙ্গত নবীন তুর্কিস্থানের উদাহরণও দেওয়া যাইতে পারে—তাহারা এক কথায় রাতারাতি নিজেদের অতি প্রাচীন লিপিও বদলাইয়া ফেলিল। তাই যেখানে শ্মশানের "শব" সকলের "সবে" গুলাইয়া সব শব হইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই, সেখানে একজনকেই বাহাল করুন।

যুক্তাক্ষর

তারপর ঐ দ্বিতীয় ভাগের যুক্তাক্ষরগুলিও বড় কম অত্যাচারী নহে; ঐ গুলি মাঝে থাকায় কত বিদেশীর পূজা হইতে যে আমাদের ভাষাজননী বঞ্চিতা হইতেছেন, তাহার হিসাব আমরা কয়জনে রাখি? এ বিষয়েও অধ্যাপক যোগেশবাবু যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। এখন তাঁর লেখা ছাপিবার ভয়ে ছাপাখানার মালিককে প্রেস তুলিয়া দিতে হয়, আর মুদ্রাকরকে এক ঠাট বিশবার ভাঙ্গিতে হয়। অথচ নগরীতে যুক্তাক্ষরের তিরোভাব এবং হসন্তের আবির্ভাব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই যুক্তাক্ষরের অত্যাচারে আজঃ পর্য্যন্ত কলে-লেখা যন্ত্রের (type-writer-এর) উন্নতি সাধন হইতে পারিল না।

কি মানব শরীর আর কি ভাষার অঙ্গ, ধাতুপুষ্ট না হইলে কোনটাই যে শক্তিশালী হয় না, এটা আমরা অবশ্যই

স্বীকার করি, অথচ ধাতুসংখ্যা বাড়াইবার আগ্রহ নাই।

ধাতু

মধুসূদন কতকগুলি ধাতু সৃষ্টি করিয়া গেলেন, বিবেকানন্দ সেগুলিকে সাহিত্যে ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন, কিন্তু এই অতিরক্ষণশীল দেশে সে বিষয়ে কোনই আগ্রহ নাই।

বাঙ্গলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ত লজ্জায় মাথা নত হইয়া পড়ে। আমরা অবশ্য ইচ্ছা করিলে এই লইয়া গর্ব্ব করিতে পারি, কারণ সন্তানের কাছে "জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের"। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে—পাশ্চাত্যের ইংরাজি বা ফরাসী ভাষার সহিত, অথবা প্রাচ্যের সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে, বুঝিতে পারা যায় আমাদের ভাষাজননী কত দরিদ্রা।

ব্যাকরণ যে ভাষার ভিত্তি, আমরা সেটা বুঝিয়াও সে দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। ভাগ্যে খৃষ্টান পাদরীরা এদেশে আসিয়াছিল, তাই অতদিন হইতে বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা

ব্যাকরণ

আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার উপর এক পোঁচড়া চুণ বালিও কেহ ধরায় নাই। অধ্যাপক ললিতবাবু পরিহাসের ছলে ব্যাকরণে "বিভীষিকা" ভাঙ্গিয়াছেন বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যাকরণ রচনা আর কাহারও দ্বারা হইল না, সমস্তই সংস্কৃতের তরজমা। অথচ যেটাকে আমরা মৃত ভাষা বলিয়া থাকি, সেই সংস্কৃতের কম করিয়া পনেরখানা ব্যাকরণ টোলের পণ্ডিতরা রীতিমত আলোচনা করিতেছেন, যাহার একখানা আয়ত্ত করিতে অন্তত বার বৎসর সময় আবশ্যক হয়। ইংরাজিতে প্রায় প্রতিবৎসরেই ব্যাকরণের নূতন সংস্কার হইতেছে।

অলঙ্কার ও ছন্দের বই বাঙ্গালায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ছন্দ বিষয়ে আছে বালক-পাঠ্য দুই একখানা পুস্তকের একটু কোণে আর মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত

অলঙ্কার ও ছন্দ

দুই একটা প্রবন্ধে। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির "কাব্য-নির্ণয়ের" আমরা যথেষ্টই গর্ব্ব করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার কি সংস্কারের আবশ্যকতা নাই? কবি সত্যেন্দ্রনাথ বা কাজি নজরুল ইসলামের আবিষ্কৃত ছন্দগুলি তিনি কোন পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন? অলঙ্কার বিষয়ে আছে সিতিকণ্ঠ পণ্ডিত মহাশয়ের "সাহিত্য-দর্পণের" দশম পরিচ্ছেদে আংশিক অনুবাদ। বরং জগবন্ধু তাঁর শিশুপাঠ্য ব্যাকরণে রস, গুণ, দোষ, অলঙ্কার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। অথচ ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় ঐ শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ বিদ্যমান।

সমালোচনা গ্রন্থ বাঙ্গালায় দুষ্প্রাপ্য নহে—অপ্রাপ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করে একটা মল্লিনাথ বা একটা ভরত মল্লিক, একটা Raleigh বা একটা Stopford Brook

সমালোচনা

যে আজ পর্য্যন্ত জন্মায় নাই, একথা বলিলে আমাদের অভিমানে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু মিথ্যা কথা হয় না। অবশ্য তর্ক উঠিতে পারে, আমাদের মধ্যেই বা কয়টা কালিদাস, কয়টা ভর্তৃহরি, কতকগুলা Shakespeare বা Milton আজ পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে? কিন্তু এটাও ত আমাদের ভোলা উচিত নয় যে, "তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ, জননীর কাছে সেই কসিত কাঞ্চন"। আর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মত কবি কোন দেশেই বা

সমালোচনা

কটা জন্মিয়াছে? রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের টীকাকার বিশেষ আবশ্যক, কারণ সাধারণ পাঠকের পক্ষে টীকাটিপ্পনিবিহীন রবীন্দ্রনাথ দুর্বোধ্য, আর শরৎচন্দ্র দুষ্পাচ্য। বঙ্কিমবাবুর সৌভাগ্য যে, অধ্যাপক ললিতবাবু এবং পণ্ডিত রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রীর মত দু'জন বড় বড় বন্দী পাইয়াছিলেন, কিন্তু বন্দী অপেক্ষা স্বাধীন মুক্ত লেখকই এই ক্ষেত্রে আবশ্যক। মাইকেল-সমালোচক যোগীন্দ্র বসুর মত নিন্দা ও স্তুতি বিজড়িত নিরপেক্ষ আলোচনাই বাঞ্ছনীয় (আলঙ্কারিকের ভাষায় দোষ ও অলঙ্কার চিহ্নিত)।

তারপর দর্শন বিজ্ঞানের কথা। সাহিত্যের এ দুইটি

দর্শন ও বিজ্ঞান

শাখার বিষয় কোন মতামত প্রকাশ আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু যাঁহারা রথী মহারথী হইয়া ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন, আমি আজ তাঁহাদের কাছে দরবার করিতেছি যে, দর্শন বিজ্ঞানের কথাগুলি কি সাধারণ পাঠককে উপহার দেওয়া যায় না? একদিন বাঙ্গলা নব্যন্যায়ের জন্য জগৎবিখ্যাত ছিল, আর আজ বাঙ্গলায় একখানা ন্যায়ের পুঁথি পাওয়া

যায় না। অবশ্য রাজেন্দ্র ঘোষ আর রাজেন্দ্র শাস্ত্রী ন্যায়ের দুইখানা বিভিন্ন টীকা গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কালীবরের প্রাচ্যদর্শন সম্বন্ধীয় অনুবাদগুলি সাধারণে সমধিক সুপরিচিত। সতীশ বিদ্যাভূষণ অতবড় একখানা ন্যায়ের পুঁথি লিখিলেন, কিন্তু বাঙ্গলায় নহে ইংরাজিতে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এই সেদিন সাহিত্য-সম্মিলনে যথেষ্টই আন্তরিকতা প্রকাশ করিয়া পৌরোহিত্য করিয়া আসিলেন। কিন্তু কাজে তিনি করিলেন কি? কেন, তাঁর "ইতিহাস"খানি কি বাঙ্গলায় লিখিলে অশুদ্ধ হইত? অতবড় "বিশ্বকোষ" ত পোকায় কাটে নাই, আর তার এতই চাহিদা যে হিন্দি সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। আর ইংরাজেরা যখন বাঙ্গলা উপন্যাসও বর্ণানুবাদ পর্য্যন্ত করিতেছেন, তখন তাহা অপেক্ষা অনেক মূল্যবান ঐ বইখানা নিশ্চয়ই অনুবাদ করিয়া লইতেন। প্রফুল্লচন্দ্রও বাঙ্গলা সাহিত্যের যথেষ্টই পক্ষপাতী, সম্মিলনেও সভাপতিত্ব করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার "রসায়নের-ইতিহাস"খানা লিখিত হইল ইংরাজিতে। এ যেন সেই সেকালের বাঙ্গালী পণ্ডিতের সংস্কৃতে পুঁথি রচনা।

বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শন যে কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় "বিশ্বকোষ" ব্যতীত আর কোন বাঙ্গলা বইয়ে পাইবার সম্ভাবনা নাই। অথচ জারম্যান্ ইংরাজি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষায় প্রাচ্য দর্শনমূলক অসংখ্য প্রবন্ধ নিবন্ধ বর্ত্তমান। সুখের বিষয় এইবার অধ্যাপক ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় এ ক্ষেত্রে কলম ধরিয়াছেন।

পাশ্চাত্য Logic ও Psychologyর খান দুই বাঙ্গলা অনুবাদ আছে বটে, কিন্তু বিলাতি দুর্গন্ধে ভরপুর। তাছাড়া তত্ত্ববিজ্ঞান (Metaphysics) সমাজবিজ্ঞান (Sociology) প্রভৃতিরও কি ভাবানুবাদ বাঞ্ছনীয় নহে? প্রশ্ন উঠিতে পারে, "আছে কি ইউরোপের দর্শনে?" তা'র কৈফিয়ৎ—যাহারা মূল বা ইংরাজি অনুবাদ পড়িতে পায় না, তাহাদের দেখাও আছে কি Socrates plato বা Comte-এর মতবাদে।

আজকাল এক আধটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ মাসিকে মাঝে মাঝে প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এমনই তাদের ভাষার গাঁথুনি যে সাধারণের পক্ষে উহা অপাঠ্য—বিশেষতঃ যাহারা অক্ষয়দত্ত বা রামেন্দ্র সুন্দরের কথা শুনিয়াছে। সুখের বিষয় জগদীশ বসু "অব্যক্ত"কে ব্যক্ত করিতে কলম ধরিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে বসিয়া জগদানন্দও "গ্রহনক্ষত্রের" সংবাদ প্রচার করিতেছেন। তবে ক্ষেত্রে কাজ করিবার এখনও অনেক সেবক আবশ্যক। কারণ Robert Hudson লিখিত—"Two Princes of Science" বা দার্শনিক পণ্ডিত Sir Oliver Lodge-এর Pioneers of Science এর মত ভাষায় বৈজ্ঞানিকের জীবনী অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি গল্প করিয়া শুনাইলে সকলে মন দিয়া শুনিবে, আর সেই সঙ্গে সাহিত্যেরও সম্পদ বৃদ্ধি হইবে।

ভূগোলত সমস্তই গোল। শিশুপাঠ্য প.ন কয়েক "পাঠ" আছে বটে, কিন্তু এমনই লেখা চমৎকার যে, ছেলেরা ইংরাজি পুস্তক মুখস্ত করিতে বেশী পছন্দ করে।

বাঙ্গলার ভৌম ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস অনেকগুলি আছে, মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণও ঐতিহাসিক প্রবন্ধের যথেষ্টই সমাদর করেন। কিন্তুদুঃখ করিয়া বলিবারও আমাদের কম কথা নাই। অধ্যাপক স্যার যদুনাথ সরকার বাঙ্গলা সাহিত্যের যথেষ্টই আলোচনা করিয়া থাকেন। সম্মিলনের সভাপতিরূপে নবীন ঐতিহাসিকগণকে একবার তিনি অনেক মূল্যবান কথাই শুনাইয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যত বিদেশী "সখারাম" বাঙ্গালায় তাঁর দেশের সংবাদ দিলেন, আর সরকার মহাশয় ইংরাজিতে শিবাজী ও আরঙ্গজেবের জীবনী লিখিয়া বসিলেন। এখন কথা উঠিতে পারে, বাঙ্গলায় লিখিলে কি তাঁর—তথা বাঙ্গালী জাতির এমন জগৎজোড়া খ্যাতি হইতে পারিত? কিন্তু সেবার ভাব মনে জাগিলে যুক্তি বিচার অপেক্ষা করে না। মধুসূদন রমেশচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্র যদি কেবল ইংরাজিই লিখিতেন তাহা হইলে তখন তাঁহাদের বড় কম নাম হইত না—কিন্তু ভাষাজননীকে সমৃদ্ধ করিব এই ছিল তাঁহাদের সঙ্কল্প।

ভূগোল ও ইতিহাস

প্রসঙ্গক্রমে ভাষা-বিজ্ঞানের কথাও এই স্থানে বলা আবশ্যক। অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় যে বাঙ্গলা ভাষা-বিজ্ঞানের বইখানি লিখিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই চিরকাল

অমর হইয়া থাকিবে, কিন্তু সেটা লেখা হইল ইংরাজিতে—না হইলে কিনিবার খরিদ্দার নাই, পড়িবার ছাত্র নাই—এ কি কম দুঃখের কথা। কিন্তু তাহা হইতে মালমসলা লইয়া বাঙ্গালায় ভাষা-বিজ্ঞানের বই লেখা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়?

এইবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গলদ দেখাইয়া আমার দুঃখের কথার ইতি করি। সার আশুতোষ বাঙ্গালায় M.A. ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় যথেষ্টই গৌরব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পুস্তক-তালিকা প্রশ্নপত্র বা

বিশ্ববিদ্যালয়

তাহার উত্তর আপনারা অনেকেই দেখিয়াছেন। আটখানা পত্রের মধ্যে—কি প্রশ্নে, আর কি উত্তরে বা পাঠ্য পুস্তকে—পাঁচখানার ভিতর বাঙ্গালার নাম গন্ধ নাই, আর তিনখানা দোআঁসলা—ইংরাজি বাঙ্গালা মিশ্রিত। এ কোনদেশী ব্যবস্থা? বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা বিভাগের কর্ণধার ডাঃ দীনেশ সেন গত সাহিত্য সম্মিলনে যজ্ঞেশ্বর ছিলেন, তিনি কি ইহার একটা বিহিত করিতে পারেন না? বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্‌ও একটা আন্দোলন তুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কলঙ্কটা দূর করিতে চেষ্টা করিতে পারেন।

শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায়

শায়ক

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধর

ছোট্ট সোয়েনো নগরীর বুকে একদিন গুজব রটে গেল যে 'ফার্দ্দিংটন' আর তার থিয়েটার চালাতে পারছে না। ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুটির পর্য্যন্ত যখন এ গুজব অতিরঞ্জিত হয়ে প্রচার হচ্ছিল সেই সময়ে থিয়েটারের পক্ষ থেকে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল যে, আগামী সপ্তাহ থেকে অসিযুদ্ধে পারদর্শী দুই ভাই ফার্দ্দিংটনের থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে দুইটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যথারীতি অভিনয় করবে......

ফার্দ্দিংটনের থিয়েটারে একটা আসনও আর খালি থাকে না। টিকিট ঘরের সামনে দর্শকেরা বহুপূর্ব্ব হ'তেই ঝুলতে থাকে। লোকের মুখে মুখে ছোট্ট সোয়েনো নগরী অসি-যোদ্ধা দুই ভায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠল আর সমসাময়িক পত্রিকাগুলোও অসিযোদ্ধা দুই ভায়ের আলোচনা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠল।......

সোয়েনো নগরীতে শ্রেষ্ঠা রূপসী বলে কাউন্টেসের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। কিন্তু পুরুষকে ভালবাসার মত হৃদয় তার নেই—একথা তার বান্ধবীরা প্রচার করতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না। কাউন্টেসের অন্তরে নারীসুলভ চপলতার অভাব কিন্তু মোটেই নেই

অসিযোদ্ধা দুই ভায়ের অভিনয়-খ্যাতি কাউন্টেসের কাছেও পৌঁছিল তার বান্ধবীদের মুখে মুখে।......

সেদিন রাত্রে এক বান্ধবীকে কাউন্টেস্ জিজ্ঞাসা করল—ফার্দ্দিংটন আবার তার থিয়েটার জমিয়ে তুলেছে, শুনছি—সত্যি ?

বান্ধবী উত্তর দিল—সত্যিই! অসিযোদ্ধা দুই ভায়ের অভিনয় দেখবার মত।

—তা' হ'লে একদিন দেখতে যাব নাকি ?

—নিশ্চয়ই, কেননা এ সুযোগ বেশীদিন তো আর পাওয়া যাবে না।

পরদিন সন্ধ্যায় আশ্‌মানী রংয়ের গাউন পরণে মুক্তার মালা গলায় কাউন্টেসকে বান্ধবীর সাথে রঙ্গমঞ্চের সামনের বক্সে দেখা গেল। প্রতি অঙ্কের শেষেই তিনি আনন্দিত ভাবে করতালি দিচ্ছিলেন।

অভিনয় শেষে কাউন্টেস তার বান্ধবীর কাছে অভিনেতাদ্বয়ের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—ঝরণা-ধারার মত তার প্রশংসার উৎস......

সেদিন ছোট ভাই একখানা চিঠি পেল। নাটকের দু'অঙ্ক তখন শেষ হয়ে গেছে। চিঠি খুলে ছোট ভাই পড়ল, মাত্র দু'ছত্র লেখা—

ওগো প্রিয়তম,

একখানা ব্রুহামে তোমার অজানা-

বিরহিনী অভিনয় শেষে তোমার প্রতীক্ষা করবে—

তোমার অপরিচিতা পূজারিণী।

অভিনয় শেষে ছোট ভাই বাহিরে এসে দেখল ব্রুহামের মধ্যে এক তরুণী বসে আছে, মুখে বহুমূল্য রেশমী বস্ত্রের ঘোমটা—তন্বীর রূপশিখা তা'তে মলিন হয়নি...

ছোট ভাই বলল—হে সুন্দরী, তুমি পূজারিণী নও—আমিই তোমার রূপের পূজারী

এমনি ক'রেই তাদের আলাপ জমে উঠল...

কাউন্টেসের পরিচয় জেনে ছোট ভাই নিজকে ভাগ্যবান বলে মনে করল

অমনি এক পত্র পেয়ে বড় ভাই কাউন্টেসের ব্রুহামের কাছে এসে দাঁড়াল, অমনি ভাবে তাদেরও আলাপ জমে উঠল।...

দু'ভাই পরস্পরে কেউই জানে না যে তা'রা দুজনে একই ভাবে রূপসী কাউন্টেসের রূপবহ্নির কাছে পতঙ্গের মত ছুটে চলেছে।

কিন্তু বেশীদিন একথা গোপন রইল না......দুই ভাইই

বুঝতে পারল যে, তা'রা দু'-জনেই কাউণ্টেসকে আপনার করে পেতে চায় নিভৃতে হৃদয়ের শূন্য আসনে।…

সেদিন রাত্রে ফার্দ্দিংটনের থিয়েটারে নূতন নাটকের অভিনয় হচ্ছে, দুই ভাই দুটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভূমিকায় নেমেছে অভিনয় করতে—

অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরাও আনন্দে উদ্দীপিত হয়ে উঠল। ক্রমে সেই রণক্ষেত্রের দৃশ্য এল যেখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যুদ্ধ করতে করতে রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়াল। দর্শকেরা উল্লাসে করতালি দিয়ে দুই ভাইকে অভিনন্দন করল। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বেহালা ঐক্যতানে বাজতে লাগল।

……সহসা বেহালার তন্ত্রীগুলো বেদনার অস্ফুট মূর্চ্ছনা ত্যাগ করে শিউরে উঠল—রঙ্গমঞ্চের উপর একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই সারা রঙ্গগৃহ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে দেখলে বড় ভায়ের তীক্ষ্ণধার তরবারি ছোট ভায়ের বক্ষে বিদ্ধ হয়েছে, অভিনয়—সত্যই……

কাউণ্টেস বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা করল—ফার্দ্দিংটনের রঙ্গমঞ্চে যে দুর্ঘটনার কথা শুনলাম তা'কি সত্যি?

বান্ধবী বলল—সত্যি!

কাউণ্টেস বলল—এ জন্যই আমি অভিনয়ের পক্ষপাতী নই।

কাউণ্টেস আবার তার পিয়ানোর কর্ডে মন দিলেন।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

"গীতো মোপাসাঁ"র "The countess" নামক গল্পের অনুবাদ।

বরষা-বধূ

শ্রীনীলিমা দাস

হাসিমুখে নাহি এলে—
নয়নে বারি!
আমোদিনি! সেজেছ কি
বিষাদ নারী?

মুখখানি ভারি-ভারি,
একি গো প্রথা!
আশ্‌মানী শাড়িখানি
রাখিলে কোথা?

আজি একি পরিয়াছ
ধূসর শাড়ী!
অধোমুখি! আঁখিজলে
ভিজিছে মাটি।

ভ্রমরী কবরীরাশি
দিয়াছ খুলে',
কোকিলের কুহুধ্বনি
গেছ কি ভুলে' ?

কাজল আঁচল খানি
আকাশে লোটে,
কদম কেতকী, সখি !
তাই কি ফোটে ?

একি সাজে এলে আজ
বরষা-বধূ !
আননে আনোনি কেন
হরষ-মধু ?

কুশ-কাশ ভূষা করি
এলে কী রূপে !
ভিজা মাটি ভরিল যে
গন্ধ-ধূপে !

খোলো খোলো আবরণ
হে যাদুকরি !
অশোক-ফোটানো দু'টি
চরণে ধরি ।

অভিমান ভোলো, মোছো
নয়নজলে ।
হাসিতে রাঙায়ে তোলো
মুখ-কমলে !

পাঁয়জোর জোড়া তব
রাখগো খুলে,
নৃত্য থমকি যাক্
ছন্দ ভুলে !

শ্রীনীলিমা দাস

———

নানা কথা

সত্যেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা

স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কতকগুলি রচনা এখনও অপ্রকাশিত আছে—কবিতা, নাটিকা প্রভৃতি। উহা তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্রের নিকট সংরক্ষিত রহিয়াছে। কবিবরের পরলোক গমনের পর খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে সুধীর বাবু কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা 'ভারতী' পত্রিকায় এবং "ডঙ্কানিশান" নামক অসমাপ্ত উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিতে দেন। এ সম্বন্ধে গত সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধে যথোচিত উল্লেখ করিয়াছেন।

সুধীর বাবু আমাদিগকে সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা 'বিচিত্রায়' প্রকাশার্থ দিয়াছেন এবং আরও দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই সৌজন্যের জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। রচনাগুলি বিভিন্ন বয়সের লেখা —উহার কতকাংশ পরিবর্তনাদি করিয়া প্রকাশ করিবার কবির বাসনা ছিল, ইহাও সুধীর বাবু জানাইয়াছেন। কবির অকাল-মৃত্যু সে পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। দিলেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের 'হাতের ছাপে' রচনাগুলি সমুজ্জ্বল। আমরা ক্রমশঃ উহা 'বিচিত্রার' পাঠকপাঠিকা-গণকে উপহার দিব। এই সংখ্যায় একটি কবিতা প্রকাশিত হইল।

নূতন 'মমি' আবিষ্কার

মিসরের প্রাচীন অধিবাসীরা মোম ও মসলাদি সংযোগে নানা কৌশলে মৃতদেহ সংরক্ষিত করিতেন। উহাকে 'মমি' বলে। সম্প্রতি মিশরে—স্ফিঙ্ক্‌সের সন্নিকটে বিস্তর 'মমি' আবিষ্কৃত হইয়াছে। এত অধিক 'মমি' একই স্থানে ভূগর্ভে প্রোথিত, এই প্রথম দৃষ্টিগোচর হইল। কইরো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সলেম হাসেন খনন কার্য্যের পরিদর্শনে ব্যাপৃত আছেন। তিনি সম্প্রতি লণ্ডনে পৌছিয়া বলিয়াছেন যে, অধুনা খনন-কার্য্য বন্ধ রাখা হইয়াছে, বন্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে চারিটি স্তরে সুরক্ষিত বহু 'মমি' পাওয়া গিয়াছে এবং সে যে সংখ্যায় কত তাহার আনুমানিক নির্ণয় বর্ত্তমানে সম্ভব নয়, তবে উহা প্রচুর এবং অন্যূন ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে নিখাত। আরও বলেন, একটি মাত্র স্তর পরীক্ষায় বুঝিয়াছেন যে, মমিগুলি অতি সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত ব্যক্তি-গণের—উহার বক্ষঃস্থলে সোণার পাতা এবং অবয়ব জীবজন্তু প্রভৃতির চিত্রাঙ্করে সুশোভিত। একটি অতি প্রকাণ্ড মন্দিরও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অতীত যুগের মন্দিরে বহু ধনরত্ন ও পুরাকালের নানা চিত্তাকর্ষক তথ্যের সন্ধান মিলিবে, ইহাও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

মিশরের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কবর রা-আউয়ারের। 'রা আউয়ার' শব্দের অর্থ সুমহান সূর্য্য। উত্তর ও দক্ষিণ মিসরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নেখেবের ইনি প্রধান পুরোহিত ছিলেন এবং সম্রাট নেফেরিকারার সর্ব্বদাই দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। সম্রাট নেফেরিকারা ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা।

আইনষ্টিনের নূতন মত

আমাদের প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানীরা আকাশেরই প্রাধান্য দিয়াছেন, ব্যোমই ব্রহ্ম বলিয়াছেন—"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ পণ্ডিত আইনষ্টাইন বক্তৃতায় সম্প্রতি ঐ কথাই প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। তাঁহার স্থূল বক্তব্য এই যে, আকাশই একমাত্র সত্য, জড়ের স্থান গৌণ—জড় কবি-কল্পনা বা স্বপ্নের পর্য্যায়ভুক্ত বলিলেও চলে। এই মন্তব্যে পাশ্চাত্য মনীষী-মণ্ডলে নানা বাদানুবাদ চলিতেছে। তিনি আরও বলেন যে, এ যাবৎ দুইটা জড়পিণ্ডের আলোচনা করিতে হইলে তাহাদের আয়তন লইয়া বিশেষ করিয়া বিচার করিয়া আসিয়াছি; এখন বিচারকালে আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকি, অর্থাৎ কোন্ অভিমুখে তাহার গতি

তাহাই বুঝিতে চাই। এই মতের প্রচার ও আলোচনার ফলে কি অভিনব তত্ত্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা সাগ্রহ প্রতীক্ষার যোগ্য।

মহামানব-বংশ সৃষ্টি

মনুষ্য-দেহে বানর প্রভৃতির গ্রন্থি সংযোগ করিয়া মহা-মানব-বংশ সৃষ্টি করা সম্ভাবনার সীমার মধ্যে আসিয়াছে। সুবিখ্যাত ডাঃ সার্জ্জি ভোরোনোফ্ জাপানের টোকিও নগরে বক্তৃতাকালে এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। তরুণ পুং-পশুর শরীরে তৃতীয় গ্রন্থি জুড়িয়া দিয়া তিনি সুফল পাইয়াছেন। ছয় সপ্তাহের ছাগ-শিশুর দেহে তৃতীয় গ্রন্থি সংযোগ করিয়া দেখিয়াছেন যে, ছয় মাস পরে উহার দৈর্ঘ্য ও শারীরিক শক্তি সমবয়স্ক সাধারণ ছাগ অপেক্ষা অনেক অধিক এবং তাহার গাত্রে পশমও অনেক বেশী। শূকর-শাবকের প্রতি পরীক্ষা করিয়াও ঐরূপ সুফল পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ডাক্তারের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, নর-দেহেও অনুরূপ ও আশ্চর্য্যজনক ফল ফলিবে। সাধারণ জীবের দুইটা করিয়া গ্রন্থি বর্ত্তমান। কৃত্রিম উপায়ে সংযুক্ত তৃতীয় গ্রন্থি-বিশিষ্ট হইলে মানব বহু পরিমাণে দীর্ঘাকার হইবে। তাহার শারীরিক ও মানসিক বল—সহিষ্ণুতা প্রভৃতি অধিকতর হইবে। ফলে আয়ুষ্কালও বর্দ্ধিত হইবে। তৃতীয় গ্রন্থিযুক্ত মানবের অধঃস্তন তৃতীয় পুরুষেই ধারণাতীত শক্তি-সম্পদের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে। বারো বৎসর বয়স্ক বালকের দেহে তৃতীয় গ্রন্থি সংযুক্ত করিয়া দিলে সে মহা-মানবে পরিণত হইবেই—ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, কারণ উহা দ্বারা সে ব্যয়িত শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, তাহার স্মৃতিশক্তি প্রখরতর হইবে, গভীর চিন্তার ক্ষমতা এবং যে সকল কার্য্যে উহা অত্যাবশ্যক তাহার সম্পাদন সহজ ও সুলভ হইবে। তাঁহার মতে জাপানীদের ন্যায় খর্ব্বাকার জাতির দৈর্ঘ্য ও দৈহিক বল কত বাড়িতে পারে তাহা চাক্ষুস দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইয়া যাইবে।

নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

গত তিন মাস হইতে কলিকাতায় উক্ত শিক্ষালয়টি খোলা হইয়াছে। শ্রীমতী সুষমা সেনগুপ্ত এম-এ এবং শ্রীমতী তটিনী দাস এম-এ ইহার অনুষ্ঠাত্রী। অনুষ্ঠান-পত্রে প্রকাশ সাধারণ শিক্ষাবিভাগে আপাততঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। যে সকল ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার অভিলাষিণী হইবেন তাঁহাদিগকে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-তালিকা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হইবে—কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব শিক্ষাদর্শকে পরীক্ষার বাঁধাবাঁধি শিক্ষা-প্রণালীর অনুরোধে ক্ষুণ্ণ করা হইবে না।

এই শিক্ষালয়টির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, অল্পবয়স্কা বালিকাগণের প্রাথমিক শিক্ষাবিভাগের সহিত প্রাপ্তবয়স্কা নারীগণের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বিভাগে বালিকা এবং মহিলাগণের পাঠ্য-তালিকা প্রধানতঃ একই হইবে—শুধু মহিলাগণকে তাঁহাদের বয়সের উপযোগী দুই একটি বেশী বিষয়ে (যথা শিশু-পরিচর্য্যা, শিশু-মনস্তত্ত্ব) শিক্ষা দেওয়া হইবে।

সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন এবং অপরাপর শিল্প বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

শ্রীমতী তটিনী দাস, শ্রীমতী সুষমা সেনগুপ্ত প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণের যত্নে ও পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি অবিলম্বে দেশের একটি হিতকর প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইবে তাহা আমরা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি; এবং কামনা করি এই নবজাত শিক্ষামন্দিরটি সাধারণের সহানুভূতি লাভ করিয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হউক।

এই শিক্ষালয়টির বিষয়ে সংবাদাদি জানিতে হইলে ৫২বি, রিচি রোড, বালিগঞ্জে শ্রীমতী সুষমা সেনগুপ্ত এম-এ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকার (Secretary) নিকট অনুসন্ধান করিতে হইবে।

Printed at the Susil Printing Works Ltd. 48, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.

সচিত্র মাসিক পত্র

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩৩৬—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা,

৪৮, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্

বার্ষিক মূল্য— ৬৷৹ টাকা

বিষয়-সূচী

(পৌষ, ১৩৩৬—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭)

ষাণ্মাসিক সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

চতুর্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৩৭ | তৃতীয় সংখ্যা

মানুষের পরিচয়

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছুটির সময়ে আমরা সবাই সংসারে ছড়িয়ে পড়েছিলুম। ছুটির শেষে আবার আশ্রমে একত্র হয়েচি। এই যে বারে বারে আমাদের টেনে নিয়ে এক করচে কোন্ শক্তিতে সেটা আমাদের ভাল ক'রে ভেবে দেখতে হবে। কেন না সেইটে ঠিক ক'রে বুঝলে পর মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটা ঠিক হয়।

ছুটির পর কাজের ক্ষেত্রে মানুষ একত্র এসে মেলে। সেখানে কাজ তাদের একত্র করে। কিন্তু যে-কাজ মানুষকে একত্র মেলায় সেই কাজই মানুষের এমন সকল প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে যাতে বিরোধ, যাতে সংঘাত বাধে। পরস্পর প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ কেবলি মথিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু কাজের তাড়ায় যে ঈর্ষা-বিদ্বেষের ঠেলাঠেলি মারামারি জেগে ওঠে, সে যদি অবাধে চল্‌তে থাকে তাহলে সেই কাজই নষ্ট হয়। তাই কাজের খাতিরেই মানুষ আপনাকে সংযত ক'রে নেয়, পরস্পর আপোষ ক'রে প্রয়োজন সাধন করতে থাকে। তাতে কিন্তু ঐ রিপুগুলো মনের ভিতরে পোষাই থেকে যায় এবং সেগুলো নানা ভদ্র নাম ধ'রে ভদ্র বেশ প'রে কাজের ভিতরে ভিতরে দেখা দিতে থাকে এবং সংসারের হাওয়া বিষাক্ত ক'রে তোলে।

তাতে কি ফল হয়? মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য সম্বন্ধ হয় না। এই সত্য সম্বন্ধ না হ'লে মানুষ নিজের সত্য পরিচয় পায় না। একলা নিজের মধ্যে মানুষের নিজের পরিচয় হ'তে পারে না। অন্য সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের দ্বারাই মানুষের পরিচয়। সেই সম্বন্ধ যদি ঈর্ষা বিদ্বেষ কলহ বিবাদেরই সম্বন্ধ হয়, তাহলে নিজের কাছে মানুষের আত্ম-পরিচয় খাটো হয়ে যায়। তার মানে মানুষ নিজেকে সত্য ক'রে পায় না। এমন ক'রে কতলোক আমরণ কাল সংসারে নিজেকে ছোট ক'রেই জেনে গেছে এবং জানিয়ে গেছে। এ'তে সে যে কেবল নিজে দুর্ব্বল হ'য়েছে তা নয়, অন্যকে দুর্ব্বল করেচে।

কেননা কাজের ডাক হচ্চে প্রধানত ক্ষুধা-তৃষ্ণার ডাক, অভাবের ডাক, লোভের ডাক। এই ডাকে আমাদের মধ্যে যে-মানুষটা জেগে ওঠে, সে হচ্চে হাটের মানুষ, সে ঝগ্‌ড়াটে। তার গলার জোর খুব, তার গায়ের জোরও কম নয়। তার চাঞ্চল্যে সে সর্ব্বদাই চোখে পড়ে। এই মানুষটা নিয়ে যখন আমরা কারবার করি তখন এ'কেই অত্যন্ত প্রধান ব্যক্তি ব'লে মনে হয়, এবং একে খুসি করা আর এর প্রয়োজন সাধন করাটাকেই পৃথিবীতে সব চেয়ে প্রধান ব্যাপার ব'লে গণ্য করি।

শুধু ব্যক্তি বিশেষ কেন, জাতি বিশেষ সম্বন্ধেও একথা খাটে। তাই দেখ্‌তে পাচ্চি, আজকের দিনে যে-সব জাত ঘোরতর উৎসাহে ব্যবসা করচে, জগৎ জুড়ে হাট বসিয়েচে, তারা নিজেদের লোভী মানুষটাকে ঝগড়াটে মানুষটাকেই সব চেয়ে প্রকাণ্ড ক'রে দেখ্‌চে। শুধু তাই নয়, তাকে ভক্তি করচে, তার পায়ে অর্ঘ্য দিচ্চে, বিদ্যালয়ে শিক্ষার মধ্যেও তারি স্তব-গানটিকে বালক-বালিকাদের মনে চিরস্মরণীয় ক'রে রেখে দিচ্চে। যারা বেশী নৈপুণ্যে বেশী লোককে হত্যা করচে, বেশী মানুষকে পদানত করচে, পৃথিবীকে বেশী ক'রে লুঠ করতে পেরেচে তাদেরই নামের পূজা ইতিহাসে সাহিত্যে সব চেয়ে বড় স্থান নিচ্চে। মানুষ নিজের এই পরিচয়ে লজ্জা না পেয়ে গৌরব বোধ করেচে।

কিন্তু তবু জোর ক'রেই বল্‌তে হবে এইটে মানুষের সত্য পরিচয় নয়। এই কথাটাকেই আমরা আমাদের আশ্রমের ভিতর দিয়ে সত্য ক'রে তুলতে চাই যখন আমরা বলি পিতা নোঽসি—তুমিই আমাদের পিতা। অর্থাৎ আমরা এখানে একত্র হ'তে চাই পিতার ডাকে, কাজের ডাকে নয়। আমরা এখানে ইস্কুলে আসিনি; সেই পিতার ভবনে এসেচি যিনি সকল মানুষের পিতা। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধ ঘটিয়েচেন তিনি, সেইটেই হচ্চে সত্য সম্বন্ধ। সেটা অভাবের সম্বন্ধ নয়, ভাবের সম্বন্ধ; প্রতিযোগিতার সম্বন্ধ নয়, সহযোগিতার সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ যখনি স্বীকার করি তখনি বিরোধ যায়, তখনি শান্তি আসে, তখনি ত্যাগ সহজ হয়, তখন ক্ষতিকেও ভয় করিনে—তখন আমরা আপনাকে আপনি সত্য ক'রে জানি। এই সত্য জানাটাই হচ্চে সকল জানার চেয়ে বড়।

সেই জন্যে আজ আমরা ছুটির পরে কাজ আরম্ভ করবার পূর্ব্বেই কণ্ঠ মিলিয়ে ডেকে নিই, ওঁ পিতা নোঽসি—তুমি পিতা, তুমি আছ—আমরা যে আছি সে তোমার সেই থাকারই মধ্যে। তুমি যে পিতা এই বোধে আমাদের অন্তর বাহিরের সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ হোক্‌। আশ্রমের আলো তোমার আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে আসুক, আশ্রমের হাওয়া তোমার স্পর্শে নিবিড় হোক্‌, আশ্রমের সকল কর্ম্মে তোমার ইচ্ছা আপনাকে প্রকাশ করুক এবং তোমাকে প্রণামের দ্বারা আমাদের প্রতিদিন ফলভারনত তরুর মত বিনম্র হোক্‌।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুঞ্জামালা

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(অপ্রকাশিত রচনা)

নগর-জনারণ্যে আমার মন নিরালা
গুঞ্জনেরি গেঁথেছে এই গুঞ্জামালা ;
আমি শুধু এনেছি তায় হিয়ায় বেঁধে,
দুঃখে সুখে অনেক হেসে অনেক কেঁদে।

গুঞ্জাফলে মিট্‌বে না গো কারোই ক্ষুধা,
গুঞ্জনে মোর নাই স্বরগের নাই গো সুধা।
নাই ভ্রমরের ছন্দে গভীর তত্ত্বকথা,
গুঞ্জনে রয় কিছু যদি—সে মত্ততা।

গুঞ্জাকে ফল বলিস্ নে কেউ—মিথ্যে কথা ;
বরং ওরে বল্ রে তোরা নিষ্ফলতা।
গুঞ্জালতা রাখ্‌ব আমার কুঞ্জে তবু,
গুঞ্জনেরও রবে না মোর বিরাম কভু।

গানের নেশা পায় যারে তার শাস্তি ভারি ;
ভুল্‌ব ভেবে ভুল করি, হায়, ভুল্‌তে নারি।
সকাল বেলার প্রতিজ্ঞা সে সাঁঝ না হ'তে
যায় ভেসে কোন্ গুঞ্জনেরি নূতন স্রোতে !

গুঞ্জাফলের খানিক রাঙা খানিক কালো,—
গুঞ্জনে মোর মিশিয়ে আছে মন্দ ভালো ;
একলা লোকারণ্যে আমার মানস-বালা
গুঞ্জনেরি হার গেঁথেছে—গুঞ্জামালা।

অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম-এ

আত্মকথা

যৌবন হ'চ্ছে সমাজযন্ত্রের এঞ্জিন, আর বার্দ্ধক্য তার ব্রেক। এ অবস্থায় এঞ্জিন যদি ব্রেককে ডেকে বলে, "তোমার হ'ল সুরু, আমার হল সারা", আর তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ব্রেক যদি বলে যে,—"আমার হ'ল সুরু, তোমার হল সারা";—তাহ'লে সমাজ-যন্ত্রটা কি রকম হয় বলুন ত? আর এদেশে এখন হয়েছে তাই। বেদান্ত এসেছে আগে আর বেদ পড়েছে পিছনে।

যুবকরা আজ যদি যুবক হ'তে সাহস পান, ত কালই বৃদ্ধরা সব যথার্থ বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবেন। যুবকরা সমাজের এঞ্জিন-ড্রাইভার হ'লে, বৃদ্ধরা তার গার্ড হ'তে বাধ্য; তাহ'লেই সোনায় সোহাগা হবে।

এখন যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি আছি এ দু'দলের কোন্ দলে, তাহ'লে বলি এর কোন দলেই নেই, কেননা দু'দলেই আছি। আমি প্রথম বয়সেও একেবারে কাঁচা ছেলে ছিলুম না, অতএব শেষ বয়সেও পাকা বুড়ো হব না।

বহুকাল পূর্ব্বে আমি আবিষ্কার করেছি যে, আমার অন্তরে যুবক ও বৃদ্ধ দুজনে একত্রে বাস করছে, একরকম ভাবে-সাবেই। আমার মনের ঘরে এরা দুজন লড়াই করে না, কারণ এরা দুজনেই জানে যে, এদের মধ্যে কেউ কাউকে ল'ড়ে পরাভূত করতে পারবে না।—লোকের বিশ্বাস আমি অপরকে উপহাস করি, কিন্তু ঘটনা তা মোটেই নয়। আমার অন্তরে যে দুটি বিপরীত প্রকৃতির ব্যক্তি আছে তারাই শুধু পরস্পরকে হাসিমুখে ঠাট্টা করে।

মনে করবেন না যে, এটা আমার একটা বিশেষত্ব। মানুষ মাত্রেরই ভিতরে এ দুই ব্যক্তি আছেই আছে, আর মানুষ মাত্রেই তা জানে; কেননা মনের অগোচর পাপ নেই। মানুষে মানুষে তফাৎ এই যে, কেউ বা তার অন্তরের বৃদ্ধটিকে লুকিয়ে রাখে, কেউ বা যুবকটিকে। আমি চেষ্টা করলেও তা পারি নে—কেননা আমার মনের ঘরের ও-দুটি মানুষ কেউ কারও চাইতে কম নন। মনের এই দো-টানায় পড়েছি বলে, আমার প্রকৃতিতে balance আছে কিন্তু শক্তি নেই।

এই হ'চ্ছে বীরবলের রহস্য। ভাল কথা। এটা কখনো ভেবে দেখেছেন যে, প্রতি নারীর অন্তরে একটি পুরুষ আছে আর প্রতি পুরুষের অন্তরে একটি নারী আছে। আমরা যাকে নারীবিদ্রোহ বলি সে ব্যাপারটা আসলে স্ত্রীজাতির অন্তরস্থ পুরুষটির স্ত্রীজাতির অন্তরস্থ নারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আমরা যাকে অহিংস ধর্ম্ম বলি সে ব্যাপারটা আসলে পুরুষের অন্তরস্থ নারীর পুরুষের অন্তরস্থ পুরুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ দু'দলেরই অন্তরের এক অর্দ্ধাঙ্গ আর এক অর্দ্ধাঙ্গকে ডেকে ও হেঁকে বলছেন—

"আমার হ'ল সুরু তোমার হল সারা।"

এ অবস্থায় অবশ্য আমার অন্তরের যুবকটি নিশ্চয় বলবেন, "নারদ, নারদ"; কিন্তু আমার অন্তরের বৃদ্ধটি হেসে বলবেন,—"এ লড়াইয়ের ফল কি দাঁড়াবে তা জানি। শেষ কালে দুই অর্দ্ধাঙ্গ 'জুড়ি'তে গাইবে—

"তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা।"

১৪।৩।২৩

বীরবল

আমি নাকি বৈনাশিক

আমার লেখার বিরুদ্ধে বঙ্গসাহিত্যের ফৌজদারী আদালতে যে সকল অভিযোগ পুনঃপুনঃ আনা হয়, আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে সকলের জবাব দিয়েছেন। এর জন্য আমি আপনার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আপনার ও ওকালতিতে কোন ফল হবে না। দু'দিন পরেই দেখতে পাবেন যে, ঐ সব অভিযোগ আবার ফিরে ফিরতি আনা হ'চ্ছে। সুতরাং আমার পক্ষে ওকালতি করতে হ'লে তা বারোমাস করতে হবে।—তা করবার মজুরি কারও পোষাবে না, এমন কি স্বয়ং বীরবলেরও নয়।

তা ছাড়া আপনি আমার হ'য়ে কি কৈফিয়ৎ দেবেন? সাহিত্যের Penal Code-এর প্রায় সকল অপরাধ আমার ঘাড়ে চাপান হ'য়েছে, এমন কি চুরি পর্য্যন্ত। বছর কতক আগে আমার একটি লেখা সম্বন্ধে কোন মাসিক পত্র উক্ত অভিযোগ আনেন। যতদূর স্মরণ হয় উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্য এই ছিল—

"আমরা ফরাসী ভাষা জানি না, ফরাসী সাহিত্যের সহিতও আমাদের পরিচয় নাই তথাপি আমরা ঠিক জানি যে, এ লেখা ফরাসী হইতে চুরি। কোন ফরাসী লেখকের গ্রন্থ হইতে ইহা চুরি করা হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, তবে আমাদের বিশ্বাস যে সে লেখক হইতেছেন Anatole France"। এখন জিজ্ঞাসা করি এ অভিযোগের কি কোনও জবাব আছে?—

আমার বিরুদ্ধে অধিকাংশ অভিযোগের ঐ হ'চ্ছে খাঁটি নমুনা। "আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না,—কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ জানি যে,—বীরবলের কথা ভুল মিথ্যা অনিষ্টকর, কেননা বীরবল হ'চ্ছে একাধারে সাহিত্যদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, নীতিদ্রোহী।" আমার বিরুদ্ধে, সাহিত্য সমাজ ধর্ম্ম ও নীতির রক্ষক ও শাসন কর্ত্তারা অদ্যাবধি যত প্রকার অভিযোগ এনেছেন, সে সবই উপরোক্ত মন্তব্যের রকমফের মাত্র। এককথায় আমি নাকি ভারতবর্ষের অতীতের ধ্বংসকারী।

এদানিক আমার বিরুদ্ধে চার্জ্জটা উল্টে গিয়েছে। দু'দিন আগে আমার কলমের কাজ ছিল অতীত ধ্বংস করা, এখন হ'য়েছে ভবিষ্যৎ ধ্বংস করা। যাঁরা এদেশের ভবিষ্যৎ গড়ছেন তাঁদের সেই বিরাট Constructive work-এর উপর আমি নাকি উপহাসের বাণ নিক্ষেপ করছি, অতএব আমার লেখা বৈনাশিক।

এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, এই বিশ্বকর্ম্মার দল কি মাল-মসলা দিয়ে তাঁদের স্বধর্মমন্দির গড়েছেন যে, সে এমারত হাসির স্পর্শে ভেঙে পড়ে! সে মালমসলা কি মনের ধোঁয়া আর মুখের বাষ্প? আলোর স্পর্শে কুয়াসা যে দেহত্যাগ করে এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। ভৌতিক আলো ভৌতিক কুয়াসা ধ্বংস করে, আর হাসির অর্থাৎ মানসিক আলো মনের কুয়াসার পক্ষেই মারাত্মক। সুতরাং আমার লেখাকে বৈনাশিক বলায় প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয় যে, তাঁরা যাকে Constructive work বলেন সে শুধু মনের আকাশে মেঘের সৃষ্টি।

একথা কি সমালোচকরা জানেন না যে, অতীতকে কেউ মারতে পারে না, কারণ সে কাল ম'রেই অতীত হ'য়েছে, আর ভবিষ্যতের গায়ে কেউ হাত লাগাতে পারে না, কারণ সে এখনও জন্মায় নি।

বীরবল

সত্যাসত্য

—উপন্যাস

—শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

২৭

বাদল চলিয়া যাইবার পর মাদাম কহিল, 'এবার আরেকটি অতিথি সংগ্রহ ক'রে দিন না, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী?"

সুধী কহিল, "আমিই যদি আরেকটি অতিথি হই তবে কত দিতে হয়?"

লণ্ডনের শহরতলীতে শুধু ঘর পনেরো শিলিং হইলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু মাদাম খাবারের বাবদ অনেক লাভ করিত। সেইটা যোগ দিয়া কহিল, "পচিশ শিলিং।"—সপ্তাহে পচিশ শিলিং।

সুধী কহিল, "আমি স্থায়ী বাসিন্দে। আমাকে দিলে ঘর বার-বার খালি প'ড়ে থাকবে না, বিজ্ঞাপন খরচা বাঁচবে। আমি পনেরো শিলিঙের বেশী দিতে পারবো না, মাদাম।"

মাদাম প্রথমটা ক্ষেপিয়া গেল। তারপরে ফুঁপাইতে লাগিল। কিন্তু সুধী এককথার মানুষ। যেমন দরদী, তেমনি হিসাবী। বলিল, "কোনো ইংরেজ পঁয়ত্রিশ শিলিঙের বেশী দিত না, মাদাম। আমি চল্লিশ শিলিং দিয়ে থাকি। তার কারণ আমি নিরামিষাশী ব'লে তোমাকে অতিরিক্ত কষ্ট করতে হয়।"

মাদাম মনে মনে হাসিল। সেই দুইজন ইংরেজ তরুণী পঁয়ত্রিশ শিলিং করিয়াও দিত না। আর নিরামিষ রান্না তো চাল সিদ্ধ আলু সিদ্ধ কপি সিদ্ধ এবং মাঝে মাঝে Cheese সহযোগে প্রস্তুত Welsh Rarebit! সুধী নিয়ম করিয়া Salad খায় বটে, কিন্তু ইহাতে কষ্টের বা বায়াধিক্যের কী আছে! সুধী সকালবেলা কণ্টিনেণ্টাল ব্রেকফাষ্ট্ অর্থাৎ Roll (রুটি), মাখন ও দুধ খাইয়া মিউজিয়ামে যায় ও সন্ধ্যায় ফিরিয়া সাপার খায়। এই তো খাওয়া! হাঁ, কষ্ট হইত যদি দুপুরে লাঞ্চ ও রাত্রে ডিনার খাইত এবং নিরামিষ না খাইয়া মাংস খাইত।

মাদাম মনে মনে হাসিল। কান্নার ভাণ করিয়া কহিল, "আপনারই ঘর, আপনারই সংসার। যা উচিত বোধ করেন তাই দিন, স্যর।" সুধীর অর্থ-সঙ্গতির নূতন পরিমাণ জানিয়া তাহার প্রতি মাদামের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। মাদাম তাহাকে "স্যর" বলিয়া সম্বোধন করিল। লোকটা নেহাৎ যে-সে নয়। সপ্তাহে পঞ্চান্ন শিলিং দিতে প্রস্তুত।

সুধী দুইটা ঘর কেন লইল? কারণ এ বাড়ীতে অন্য কোনো অতিথি আসে এটা সে পছন্দ করিত না। আসিলে এক বাদল আসিবে, নতুবা অন্য কেহ না।

মার্সেলকে যাহার-তাহার সঙ্গে মিশিতে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া একই বাড়ীতে দুইজন বিশিষ্ট অতিথি থাকিলে সামাজিকতা করিতে গিয়া সময় নষ্ট হইবে।

মার্সেলের সঙ্গী হইবে বলিয়া সুধী কঠিন ত্যাগ-স্বীকার করিল। সপ্তাহে পনেরো শিলিং অতিরিক্ত দিবার মতো সঙ্গতি সত্যই তাহার ছিল না। কুলাইয়া উঠিবার জন্য বাহিরে যে লাঞ্চ্ খাইত তাহা বাদ দিল ও তাহার এক-তৃতীয়াংশ খরচ করিয়া মধু ও হরলিক্স্ অভ্যাস করিল। ইহাতে তাহার শিলিং পাঁচেক বাঁচিল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল ওজন কমিল না। ইংলণ্ডের আবহাওয়ার গুণে ইংলণ্ডে দেশের মতো ক্ষুধা পায় না। অল্প খাইলেও শরীর থাকে।

সুধী থিয়েটারেও যায় না, সিনেমাতেও না।

কলেজে পড়ে না বলিয়া কলেজ-ফীও দিতে হয় না। মিউজিয়ামের পাঠাগারে চাঁদা লাগে না। ত্রৈমাসিক টিকিট করায় টিউব খরচা কম পড়ে। নিজের জন্য বই ও মার্সেলের জন্য খেলনা কেনাই তাহার যাহা-কিছু বাজে খরচ। মাঝে মাঝে কিছু মামাতো ভাই-বোনগুলিকে পাঠাইতে হয়। সুধী তাহাদিগকে ভুলে নাই। তাহারাও চাঁদা করিয়া 'অম্নিবাস'-চিঠি লেখে। বড়দাকে কি তাহারা তাহাদের ছোট ছোট সুখ-দুঃখগুলি না জানাইয়া থাকিতে পারে? ইতিমধ্যেই তাহারা বায়না ধরিয়াছে বিলাত আসিবে। প্রস্তাবটা শুনিয়া তাহাদের বাবা বলিয়াছেন, "সুধী তোদের নিয়ে মুস্কিলে পড়্‌বে। ট্যাক্‌সিতে তোদের আঁটবে না। একটা আস্ত Charabanc ভাড়া কর্‌তে হবে।"

সুধী এ বাড়ীতে আসিবার আগে দুইটি ঘরে দুইজন ইংরেজ তরুণী বাস করিত। তাহারা দুইজনে মিলিয়া একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে উঠিয়া যায়—হাসিয়া বলে, "Bachelor flat!" তখন মাদাম পাড়ার কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। সে বিজ্ঞাপন সুধীর চোখে পড়িবার কারণ থাকিত না, যদি না সুধী ভুল টিউবে চড়িয়া হেন্‌ডন্ সেণ্ট্রাল্ ষ্টেশনে উপনীত হইত। সাধারণতঃ মাটির তল দিয়া টিউব্ চলে। কিন্তু হেন্‌ডন্ সেণ্ট্রালের কিছু পূর্ব্ব হইতে মাটির উপর দিয়া। ট্রেন হইতে প্রচুরতর সূর্য্যালোক ও বিরলতর বসতি দেখিয়া সুধীর মন বলিল, থাকিতে হয় তো এইখানে থাকিতে হয়। সুধী ট্রেন হইতে নামিল ও অতিরিক্ত ভাড়া চুকাইয়া দিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিল। একটা ষ্টলে দেখিল পাড়ার সংবাদপত্রের নাম বড় হরফে ঘোষিত হইতেছে। কিনিল। বাড়ী-ভাড়ার বিজ্ঞাপন পড়িয়া দুই-তিনটা বাড়ীতে বেল্ টিপিল। দ্বার খুলিয়া কেহ বলিল, "দুঃখিত হ'লুম, আজ সকালেই ভাড়াটে নেওয়া হয়েছে।" কেহ সোজা ভাষায় বলে, "আমরা কালো মানুষ নিইনে।" কেহ বলে, "আসুন,এই ঘরটা খালি আছে। পছন্দ হ'লো না?" বাড়ী খুঁজিয়া পাইবার জন্য পথচারীদের সাহায্য লইতে লইতে সুধীর বিরক্তি ধরিয়া গেল। মাদামের বাড়ীতে পৌছিয়া দরজার গায়ে দরজার Knocker-টাকে ঠকাঠক ঠুকিল।

দরজা খুলিয়া দিয়া সলজ্জমুখে দাঁড়াইল সুজেৎ। সুধী লজ্জিতভাবে কহিল, "মাফ কর্‌বেন, এ বাড়ীতে কি ঘর খালি আছে?" সুজেৎ ছুটিয়া গিয়া তাহার মাকে ডাকিয়া আনিল। মা উচ্ছ্বাসের সহিত সুধীকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। বলিল, "যতদিন না অন্য লোক আস্‌ছে ততদিন অন্য ঘরখানিকেও আপনি ব্যবহার কর্‌তে পারেন—আপনার পড়ার ঘর। Alors, কী বলে ইংরেজীতে···আপনি কি···আপনি কি étudiant?" ফরাসী জাহাজে আসিবার সময় সুধী দুটা-একটা ফরাসী কথা শিখিয়াছিল। বলিল, "Oui, Madame."

মাদাম যেন নিজের দেশের লোককে বিদেশে আবিষ্কার করিল। উৎসাহের সহিত অনর্গল ফরাসী বকিয়া চলিল। তাহার উৎসাহ এক ফুঁ-তে নিবিয়া গেল সুধী যখন ইংরেজীতে কহিল, "আমি ফরাসী নতুন শিখ্‌ছি, মাদাম।" মাদাম অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তাতে কী! আমরা আপনাকে দু'দিনে শিখিয়ে লায়েক ক'রে দেবো।"

গাওয়ার ষ্ট্রীটের বোর্ডিংহাউস্ ছাড়িয়া সুধী টেম্পারটন ড্রাইভে গৃহী হইল। তারপরে অনেক সপ্তাহ কাটিয়াছে, সপ্তাহে সপ্তাহে মাদাম হক্ পাওনা গুণিয়া লইয়াছে, আর্থিক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াও যতটা আত্মিক সম্বন্ধ সম্ভব ততটা এই পরিবারের সঙ্গে সুধী'র হইয়াছে। সুধী যেন এই পরিবারেরই একজন আত্মীয়। সুজেৎ যেমন তাহার উপার্জ্জন মা'কে বুঝাইয়া দেয়, সুধীও তেমনি তাহার। তবু বেশ বোধ করিত—মাদাম কিছু অর্থগৃধ্নু। পাওনার পাই পয়সা ছাড়ে না, কিন্তু কর্ত্তব্যের বেলা নানা ছুতা করিয়া ঢিল দেয়।

২৮

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইতে শীতপ্রধান দেশে গেলে গরম পোষাক পরিতে হয়, গরম ঘরে থাকিতে হয়, যে খাদ্য হইতে প্রচুর তাপ পাওয়া যায় তেমন খাদ্য খাইতে

হয়। এক কথায় নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে দেহের একটা বনিবনা ঘটাইতে হয়। ওটুকু বাধ্যতামূলক।

সুধী ভাবিতেছিল, শুধু তাই? এক দেশ ছাড়িয়া আরেক দেশে আসিলাম। এ দেশের জল-স্থল-অন্তরীক্ষ পশু-পক্ষী-ওষধি-বনস্পতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে না? শকুন্তলা আশ্রমতরু ও আশ্রমমৃগদের কাছে বিদায় লইয়াছিল, আমি আগমন-সংবাদ জানাইব। তোমরা ছিলে, আমি আসিলাম, তোমরা আমাকে স্বীকার করো, আমি তোমাদিগকে স্বীকার করি।

সুধীর পড়ার ঘরের জানালা খুলিলে দৃষ্টিপথে পড়ে বহুদূরবিস্তৃত মাঠ। উহার উপর উজ্জ্বল সবুজ ঘাস। ইংলণ্ডের সকল মাঠের মতো এটিও অসমতল। কিছুদূরে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপত্যকা। একটি সেতু। Asphalt-পিহিত রাজপথের দ্বারা যেন মাঠের কোমল দেহ ছড়িয়া গেছে।

সুধী মনে মনে বলে, তোমরা প্রতিদিন একটু একটু করিয়া আমার অঙ্গ হইবে, আমি প্রতিদিন একটু একটু করিয়া তোমাদের অঙ্গ হইব। আমি যখন ইংলণ্ড ছাড়িয়া চলিয়া যাইব তখন যাইব অথচ যাইব না। যেইখানেই যাই তোমরা আমার সঙ্গে চলিবে।

দেশের পলিটিক্যাল দুরবস্থা বিশেষ করিয়া তাহার মনকে পীড়া দিতেছিল। সাইমন কমিশনকে ভারত-বাসী বয়কট করিবে স্থির করিয়াছে। উহারা নিজেরা কিছু গড়িবে না, অপরে যাহা গড়িয়াছে তাহার কোথায় কী পরিবর্তন দরকার বিবেচনা করিতে গেলে উহারা অভিমানিনীর মতো মুখ ফিরাইয়া রহিবে। এই মেয়েলী পলিটিক্স সুধীকে নিজের দেশ সম্বন্ধে লজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। সোজাসুজি উদাসীন থাকিলেই তো হয়। বলিলে হয়, তোমাদিগকে বয়কট করিবার সময় আমাদের নাই, অভ্যর্থনা করিবার প্রবৃত্তিও আমাদের নাই, আমরা নিজেদের ঘরের কাজে ব্যাপৃত, আমরা অন্যমনস্ক।—কিম্বা কিছু না বলিলেও হয়।

কয়েকদিন হইতে অনবরত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে। রবিবার। বাহির হইবার তাড়া নাই, বাহির হইয়া সুখ নাই। সুধীর ঘরে কয়লার আগুন জ্বলিতেছিল, সুধী চেয়ারটাকে আর একটু টানিয়া লইয়া আগুনের উপর হাত রাখিল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা। হাত জমিয়া গেছে। কলম ধরিয়া লিখিতে বসিলে কলম চলে না।

কাল রাত্রে উজ্জয়িনীর আর একখানি চিঠি আসিয়াছে। উজ্জয়িনী উত্তরের জন্য দেড়মাস অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নয়; উত্তর তো যথাকালে পাইবেই—এই ভরসায় সে যখন লিখিতে ভালো লাগে তখন লিখিবার অনুমতি চায়। অবশ্য বাদলের কাছে।

আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা সুধীকে অভিভূত করিয়াছিল। তর বিদ্যা যন্ন দীয়তে। সুধী প্রতিদিন যাহা আহরণ করিতেছে তাহাকে মনের রসায়নে নিজস্ব করিয়া কাহারো কাছে ধরিয়া দিবার তাড়না অনুভব করিতেছিল। আগে ছিল বাদল; বাদলের সঙ্গে মৌখিক আলোচনায় তাহার চিন্তা তাহার কাছে স্পষ্ট হইত। মুখ কী বলে কান তাহা শুনিবার জন্য লালায়িত। হাত কী লেখে চোখ তাহা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। নিজের ভিতরে কেমন মৌচাক বাঁধা হইতেছে মন সে বিষয়ে কৌতূহলী।

উজ্জয়িনীকে লিখিবার দ্বারা ডায়েরি লিখিবার অপ্রীতিকর দায় এড়ানো যায়। ডায়েরিতে মাত্র একটি মন আপনাকে মন্থন করিয়া অবসন্ন হয়। চিঠিপত্র দুইটি মনের ঘাত-প্রতিঘাত। তোমার ভাবের করাঘাতে আমার ভাবের ঘুম ভাঙিবে; আমার ভাবনার ঢিল লাগিয়া তোমার ভাবনার মৌচাক হইতে মধু ক্ষরিবে।

সুধী কিছুক্ষণের জন্য নীচে নামিয়া গেল। বলিল, "মাদাম, মার্সেলকে সুজেৎ পিয়ানো বাজাতে শেখাচ্ছে, ভালোই। যেন উপরে উঠ্‌তে দেয় না। আমার এখন অন্য কাজ।"

উজ্জয়িনীর চিঠিখানা আর একবার পড়িল। সাদা কাগজের উপর পেন্‌সিল দিয়া রুল্ টানা। হাতের

লেখাটি ঝরঝরে। অক্ষরগুলি যেন মুক্তার পাতি।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মাঝে মাঝে চিঠি লিখিবার সংকল্প জানাইয়া উজ্জয়িনী লিখিয়াছে :—

নরেশের বইগুলো গোড়া থেকেই বেহাত হ'য়েছে। দিদিরা পড়্তে নিয়ে ফেরৎ দেয় নি। মেজদি নাকি মাকে জিগেছে, নরেশের বই খুকীর হাতে দেওয়া যায় না। তার বদলে ওকে আমি Fairy Tales কিনে দেবো।—ইস্! তবু যদি আমার বয়স ষোলো হ'তো! আচ্ছা, বলুন দেখি কেন ওরা আমাকে খুকী ব'লে ক্ষেপায়? কেউ কেউ বলে, পাগ্‌লী। আমি বাবাকে ব'লে দিই। বাবা বলেন, "যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস্‌নে কিছু।" আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় আমি পাগ্‌লী? বাবা বলেন, "আমার তা মনে হয় না।"

এতগুলো নভেল-নাটক দেখে বাবার চক্ষুস্থির। বল্লুম, "বাবা, বুঝিয়ে দাও।" বাবা বল্লেন, "সময়ের অপব্যয় = আয়ুক্ষয়। এবং নাটক-নভেল পড়া = সময়ের অপব্যয়।" তখন তিনি স্লেট্-পেনসিল নিয়ে অঙ্ক কষ্‌ছিলেন। তাঁর অন্যমনস্ক গাম্ভীর্য্য আমাকে ভয় পাইয়ে দিলে। ভাব্‌লুম, এখুনি বল্‌বেন, "খুকী বোস্, সেদিন যে বল্‌ছিলুম একটা সাদা মোরগের সঙ্গে একটা কোলো মুরগীর যদি বিয়ে হয় আর যদি আটটা ছানা হয় তবে কখন ছানাটার রং কেমন হবে? সেই ধাঁধার জবাব দে।"

কাজ নেই বাবা মুরগীর রং হিসেব ক'রে। বায়োলজী আলোচনা কর্‌বার প্রবৃত্তি তখন আমার ছিল না। পড়্‌ছিলুম ইব্‌সেনের "A Doll's House"। পালিয়ে এসে বাগানে ব'সে শেষ করা গেল। কিন্তু অর্থ?—

উজ্জয়িনী আরো কিছু লিখিয়া চিঠিখানা যথাবিধি ইতি করিয়াছিল।

২৯

সুধী লিখিল :—

কল্যাণীয়াসু,

মিউজিয়ামে সেদিন বাদলের সহিত দেখা। কখন আসিয়া আমার কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলাম, "কথা আছে, মিউজিয়ামের বাইরে চল্।" তাহার সঙ্গে একটি ভারতীয় যুবক ছিল; বাদল বলিল, "এঁর নাম আলী। ইনি খবর এনেছেন এঁর ও আমার বন্ধু মিথিলেশ-কুমারীর অসুখ। দেখ্‌তে যাচ্ছি। তুমি আমাকে টিউব্ অবধি এগিয়ে দিতে পারো?"

পথে চলিতে চলিতে জনান্তিকে কহিলাম, "বাদল, উজ্জয়িনী তোরই চিঠি চান্, আমার চিঠি না। তোর কি সত্যিই সময় নেই?" বাদল কহিল, "সত্যিই সময় নেই। মিসেস্ উইল্‌সের সঙ্গ তর্ক করা, বাজার করা, নিমন্ত্রণ রক্ষা করা। মাঝে মাঝে ট্রেনে ও বাসে ক'রে শহরে আস্‌তে কয়েক ঘণ্টা অপব্যয় করা। এরপরে যেটুকু সময় থাকে সেটুকুতে বই-কাগজ ঘাঁটা।" আমি বলিলাম, "সাতদিনে একখানা চিঠি লেখা—সত্যিই সময় নেই?" বাদল বলিল, "বা রে! আজ Poppy Day তোমার গা'য় Poppy কই?" একটি মেয়ের বাক্সে ছ'পেনী ফেলিয়া বাদল বলিল, "এঁর কোটের বাটন্‌হোল্-এ একটি পপি পরিয়ে দিন্।" মেয়েটি সেই শ্রেণীর মেয়ে যাহারা বিদেশী পথিক দেখিলে তাহার ইংরেজী-জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতে আগাইয়া আসে, "বল্‌তে পারেন, ক'টা বেজেছে?" বাদলের মুখে ইংরেজী শুনিয়া বাদলকে পরীক্ষায় পাস্ নম্বর দিল। আমার পাগ্‌ড়িটি দেখিয়া আমার ইংরেজী জ্ঞান সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ দৃঢ় হইল। বলিল, "আপনার কোটে বাটন্‌হোল্ নেই"—এইখানে বলিয়া রাখি আমার ওভারকোট খাস বিলাতী নয়—আমি বলিলাম, "তবে পপিটি আমি আপনাকেই উপহার দিলুম।"

টটন্‌হ্যাম কোর্ট্‌ রোড টিউব-ষ্টেশনে বাদলকে পৌছাইয়া দিয়া আমি মিউজিয়ামে ফিরিলাম। আর বাদলের সঙ্গে দেখা হয় নাই। কাল আপনার দ্বিতীয় পত্র আসিল।

দেশ ছাড়িবার পূর্ব্বে যদি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিতাম তবে আপনার পত্রের যেখানে-যেখানে পারিবারিক প্রসঙ্গ আছে সেখানে-সেখানে মনের পর্দ্দার উপর ছবি জ্বলিয়া উঠিত। দেখিতে পারিতাম, ইনি আপনার মেজ্‌দি, ইনি আপনার মা, ইনি আপনার বাবা। পত্রের উত্তর লিখিবার সময় আঁধারে ঢিল ছুঁড়িবার মতো মনে হইত না।

তবে আপনাকে আমি চিনি—পত্রের বাতায়ন-পথে দেখিয়াছি, কল্পনায় বাকীটুকু বানাইয়া লইয়াছি। প্রতি পত্রে আপনি স্পষ্টতর হইতেছেন। যেন একটি চেনা মানুষ দূর হইতে নিকটে আসিতেছেন!

ইব্‌সেনের ডল্‌স্‌ হাউসের অর্থ কী? আমি যত-দূর বুঝি, ঘর ছিল স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ঘর, বাহির ছিল স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই বাহির। তাঁতী তাহার বাড়ীতে বসিয়া কাপড় বুনিত, তাঁতিনীর সাহায্য লইত। এখন তাঁতী যায় কারখানায় মজুর হইয়া, তাঁতিনী কুটীরে পড়িয়া থাকে। সমাজ দাঁড়াইয়াছিল গৃহের উপর। গৃহের দুইটি চরণ—গৃহস্থ ও গৃহিণী। এক সময় দেখা গেল যে গৃহস্থ গৃহের ত্রিসীমানায় নাই, গৃহিণী গৃহ আগুলিয়া পড়িয়া আছে। পুরুষ আফিসে-আদালতে পার্লামেণ্টে-মিউনিসিপ্যালিটীতে স্ত্রীকে অর্দ্ধাসন দেয় না—ইহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্ত্তভঙ্গ হয়। স্ত্রী দাবী করিতেছে নূতন সামঞ্জস্য, নূতন সহধর্ম্মিতার আদর্শ। নতুবা সে যেন একটি পুতুল। যে ঘরে তাহাকে রাখা হইয়াছে তাহা যেন একটি খেলাঘর। সেখানে পুরুষ একটু আমোদ করিবার জন্য, ক্লান্তি দূর করিবার জন্য, সেবালাভ করিবার জন্য আসে; স্ত্রীকে নিজের ভাবনার ভাগ দেয় না স্ত্রীর ভাবনার ভাগ লইতে বলিলে 'আপিস থেকে জুড়োবার জন্যে বাড়ী এলুম, বাড়ীতেও জ্বালাতন" বলিয়া বাহির হইয়া যায়।

নারীর বিদ্রোহ মূলতঃ এই লইয়া। নারী সর্ব্বত্র পুরুষের সঙ্গিনী হইবে—পুরুষশূন্য গৃহে গৃহিণী হইয়া তাহার সার্থকতা নাই। আমার বিশ্বাস ইহাই হইতেছে ইব্‌সেন প্রমুখ একশ্রেণীর মনের কথা। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

নিজের লেখা চিঠি পড়িয়া সুধীর মনে হইল, উজ্জয়িনী কি বুঝতে পারিবেন? ষোল বছর তাঁহার বয়স; সুজেতের বয়সী। সমস্তটা নাই বা বুঝিলেন, কিছু বুঝিবেন নিশ্চয়। বুঝিতে না পারিলে বুঝিতে চেষ্টা করিবেন—চেষ্টা করাটা লোকসান নয়। কতটা বুঝিবেন ও কতটা বুঝিবেন না ইহা জানিবার উপায় নাই যখন, তখন যাহা বলিবার তাহা প্রাণ খুলিয়া বলাই ভালো; কিছু হাতে রাখিয়া বাকীটা বলা নিজের প্রকাশাকুলতার উপর অত্যাচার ও অপরের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অবমাননা। মানুষের দেহের বয়স ও মনের বয়স তো এক নয়। প্রৌঢ় ইব্‌সেনের লেখা যদি সুধী বুঝিয়া থাকে তবে যুবক সুধীর লেখা বালিকা উজ্জয়িনী বুঝিবেন, ভরসা করা যায়।

দরজায় দুইটি টুক টুক টোকা মারার শব্দ শুনিয়া সুধীর ধ্যানভঙ্গ হইল। সুধী কহিল, "আয়।" কিন্তু মার্সেল দরজা খুলিবা মাত্র যে ঘরে ঢুকিল সে মার্সেলের কুকুর "জ্যাকী"। দুই পায়ে দাঁড়াইয়া জ্যাকী সুধীর কাঁধে দুটি পা রাখিল। তাহার জিহ্বা লক্‌ লক্‌ করিতেছে, চোখদুইটি একবার সুধীর মুখে একবার টেবিলের উপর রাখা চিঠিতে কী যেন অন্বেষণ করিতেছে। মার্সেল ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে নামাইবার ব্যর্থপ্রয়াসে লিপ্ত হইল। বলিল, "যা, যা-আ, যা।" বিরক্তিতে তাহার কান্না পাইতে লাগিল। কুকুরটা তাহার বিনা-হুকুমে নীচে হইতে তাহার সঙ্গে উঠিয়া আসিয়াছে, তাহার বিনা-হুকুমে ঘরে ঢুকিয়া মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর কোল জুড়িয়া বসিয়াছে। "ওঃ, ওঃ যায় না কেন? যা, যা—।" রীতিমতো নরে-বানরে যুদ্ধ!

নীচে হইতে সুজেৎ দৌড়িয়া আসিল। খোলা দরজায় টোকা মারিতেই সুধী তাহার দিকে তাকাইল। সুজেৎ তাহার স্বভাবসিদ্ধ সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, "মার্সেল আপনাকে খবর দিতে এসেছিল—ডিনার দেওয়া হ'য়েছে।"

সুধী কহিল, "ওঃ, তাই? আমি ভেবেছিলুম সার্কাস্ ধাতে এসেছে। আয় রে মার্সেল।"

জ্যাকী পথ দেখাইতে দেখাইতে চলিল, সুধীরা তার অনুগমন করিল।

৩০

বাদলের সঙ্গে কতকাল গল্প করা হয় নাই। এতদিনে তো লণ্ডনের জীবন দুইজনেরই অভ্যাস হইয়া গেছে, নূতনত্বের আকর্ষণে ছুটিয়া বেড়াইবার তাগিদ তেমন প্রবল নয়, রহিয়া-সহিয়া দেখিলে শুনিলে কোনোকিছু পলাইয়া যায় না।—সুধী একদিন ফোন্ করিয়া কহিল, "বাদল, সামনের উইকেণ্ড-এ বাড়ীতে পারবি? জায়গা আছে।" বাদল কহিল, "মিসেস্ উইল্‌সের কাছে কথাটা পেড়ে দেখি।"

মিসেস উইল্‌স রাজী হইলেন। অতএব বাদলও। শনিবার সন্ধ্যায় মাদামের বাহিরের দরজায় বেল বাজিল। "আমি খুল্‌বো" "আমি খুল্‌বো" বলিতে বলিতে মার্সেল ও সুজেৎ ছুটিয়া আসিল।

বাদল পুরাতন কুটুম্বের মতো নিঃসঙ্কোচে পা-পোষে জুতা ঝাড়িল, ষ্ট্যাণ্ডে টুপি-ওভারকোট লট্‌কাইল, লাউঞ্জে প্রবেশ করিয়া একটা গদীওয়ালা চেয়ারে ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া আগুনের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। তাহার সুটকেস্‌টা লইয়া মার্শেল ও সুজেৎ কাড়াকড়ি করিতেছে, কেহ কাহাকেও সিঁড়িতে উঠিতে দিতেছে না, দুইজনেই স্বল্পভাবী বলিয়া শুধু উভয়ের "উঃ" "আঃ" "না" ইত্যাদি অনুযোগসূচক অব্যয় শব্দ কানে আসিতেছিল।

সুধী সেই ঘরেই বসিয়া ছিল। কহিল, "ভেবেছিলুম তুই এখানে চা খাবি।"

বাদল কহিল, "খাবোই তো। খাওয়াও না এক পেয়ালা? অবশ্য শুধু চা, আর কিছু না। কী ভয়ানক ঠাণ্ডা!"

সুধী চায়ের কথা মাদামকে বলিয়া আসিল।

বাদল কহিল, "জ্বালাতন করছে সারাদিন। তর্ক আমি করতে ভালোবাসি শুনতেও ভালবাসি। কিন্তু কেবল বুলি, কেবল ধুয়ো, কেবল কুড়িয়ে পাওয়া ঘসা পয়সার মতো বিশদহীন সর্বজনব্যবহৃত বচন।"

সুধী জানিত, জিজ্ঞাসা না করিলেও ব্যাপারটা কী তাহা বাদল আপনা হইতেই বলিবে। বাদল বলিল, "কে বলে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা সাকসেসফুল হ'য়েছে! বি-এ এম-এ পাস্ করার নাম শিক্ষিত হওয়া নয়। নেতি নেতি ক'রে ভাব্‌তে শেখা চাই। লোকে যেটাকে সত্য মনে করছে সেটা নাও হ'তে পারে সত্য।"

সুধী দেখিল আসল ঘটনাটা বাদলের মনের তলায় চাপা পড়িয়া গেছে। অনেকখানি মাটি খুঁড়িলে তবে ঘটনা-রত্নটি উদ্ধার হইবে। সুধী ভাবিল, এক কোপ মারিয়া দেখি, যদি উদ্ধার হয়।

সুধী কহিল, "মিথিলেশকুমারীর সঙ্গে জোর তর্ক হ'য়ে গেল বুঝি?

বাদল যেন ধরা পড়িয়া গেল। হঠাৎ থামিয়া কহিল, "আগুনের এত কাছে বসা ঠিক হয়নি।" একটু দূরে সরিয়া বসিয়া কহিল, "কী বলছিলে, না মিথিলেশকুমারীর সঙ্গে না। তাঁর একটি নূতন বাহনের সঙ্গে। হা-হা-হা! দেবতাদের বাহনরা তো সাধারণতঃ চতুষ্পদ হ'য়েই থাকে। ভুলে যাচ্ছি কী তাঁর নাম—বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ কিম্বা সেইরকম কিছু। লোকটির বহিরঙ্গ ঠিক আছে, খুব স্মার্ট পোষাক-পরিচ্ছদ, চোখে প্যাঁস্‌নে। কী পড়েন জানিনে।"

চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া বাদল কহিল, "ভালো-কথা, একটা হাসির কথা তোমাকে জানাই। মিথিলেশ-কুমারী বব্ করেছেন। শুধু তাই নয়। ছিলেন মিসেস দেবী, হয়েছেন মিস দেবী। হা-হা-হা!"

মিথিলেশকুমারী কে তাহাই সুধী জানে না। কিন্তু জানিবার আগ্রহ তাহার ছিল না।

বাদল কহিল, "বিন্ধেশ্বরীজীর ধারণা স্ত্রী-স্বাধীনতা এদেশের মেয়েদের মাতৃত্বের অযোগ্য ক'রে তুলছে। বলেন, How can a typist make a good mother? বেচারী টাইপিষ্টের অপরাধ সে হাঁড়ি ঠেলে সময় কাটায় না, টাইপরাইটার খট্ খট্ ক'রে সময় কাটায়। কিছুদিন আগে বাবুদের বুলি ছিল—সতীত্ব গেল গেল। এখনকার বুলি—মাতৃত্ব গেল গেল!"

মসিয়ঁ রান্নাঘরে মাদামের সঙ্গে কথা বলিতেছিল। বাদলের গলা শুনিয়া বসিবার ঘরে আসিল। যথারীতি অভিবাদনের পর মসিয়ঁ কহিল, "মিস্তার সেনের শীত কেমন লাগ্ছে?"

বাদল উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "ও! চমৎকার!"

"চমৎকার! এই দারুণ শীত-বৃষ্টি-কুয়াসা! কিছু-দিনের মধ্যে বরফ পড়বে—"

মসিয়ঁর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বাদল কহিল, "তবে তো আরো চমৎকার হয়। ইংলণ্ডে থেকে সুইট্জারলণ্ডে থাকা যাবে। স্কেট্ করা যাবে, স্কী করা যাবে।" বাদলের কল্পনা সর্বত্র বরফ দেখিতে লাগিল।

বাদল অন্যমনস্কভাবে বলিতে লাগিল, "হাঁ, ইংলণ্ডের শীতকালটা চমৎকার। খুব শীত করে বটে, কিন্তু কয়লার আগুন পোহাতে কেমন মিষ্টি লাগে! গায়ে যথেষ্ট গরম কাপড় থাক্লে বাইরে ভিজেও আরাম আছে। কুয়াশার সাম্নের মানুষ দেখা যায় না, তবু আমি মাইল চারেক হেঁটে বেড়িয়েছি,—কারো গায়ে ধাক্কা লাগাইনি।"

সাপারের ডাক পড়িল।

খাইতে খাইতে বাদল কহিল, "শুন্বে মাদাম, আমার কতটা উন্নতি হ'য়েছে? ভারতবর্ষের মানুষ হাজার সাহেব সাজুক তার সাহেবিয়ানার অগ্নিপরীক্ষা হ'চ্ছে বীফ্ খাওয়া—সে-পরীক্ষায় ফেল করাটাই নিয়ম, না করাটা নিপাতন। যার একে-একে সব সংস্কার গেছে তার ঐ একটি সংস্কার যায় না। এই নিয়ে নিজের সঙ্গে প্রতিদিন দু'বেলা লড়াই করেছি, তোমাদের এখানেও। কিন্তু জয়লাভ করলুম এই সেদিন, সেও অপরের ষড়যন্ত্রে। শুন্বে ঘটনাটা?"

সুধীরের মুখে খাবার রুচিতেছিল না। বাদল, তাহার বাদলা গোমাংস খাইতে শিখিয়াছে! কখনো বিশ্বাস হয়! না খাওয়াটা হইতে পারে কুসংস্কার, হইতে পারে অযৌক্তিক। তবু—ভারতবর্ষের অতি দীর্ঘ ইতিহাস ও অতি ব্যাপক লোকমত কি কিছুই নয়!

৩১

পরদিন উপরের ঘরে বাদল ও সুধী আগুন পোহাইতেছে। অগ্নিস্থলীর পার্শ্বে বাদলের পিতার চিঠি। কাল রাত্রের ডাকে আসিয়াছে।

তিনি লিখিয়াছেন, পাশ্চাত্যের জীর্ণ কঙ্কাল বহন করিয়া যেন সুধী ও বাদল দেশে না আসে, যেন ইহারা পাশ্চাত্যের বাহ্য চাকচিক্যে সম্মোহিত না হয়। যাহা ভালো তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা মন্দ তাহা সর্বথা বর্জনীয়।

বাদল কহিল, "জগতের ইতিহাসে কি চিরকাল এই চল্তে থাক্বে?"

সুধী কহিল, "কী চল্তে থাক্বে?"

বাদল নিজের চিন্তায় বিভোর থাকিয়া ভাবে, সকলেই বুঝি সেই একই চিন্তায় বিভোর। সুধীদার পাল্টা প্রশ্ন শুনিয়া তাহার কাণ্ডজ্ঞান ফিরিল। সে কহিল, "আমি ভাব্ছিলুম প্রবীণের সঙ্গে তরুণের এই যে ভাবনা-বৈষম্য, এই যে দু'রকম ইডিয়ম ব্যবহার করা, এর কি প্রতীকার নেই?"

বাদল কী উপলক্ষ্যে অমন কথা পাড়িল সুধী ধরিতে পারিল না। সুধী কহিল, "হঠাৎ এ কথা তোর মনে উঠ্ল কেন?"

"দেখ্লে না, বাবা লিখেছেন, যাহা ভালো তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা মন্দ তাহা সর্বথা

বর্জনীয়? তুমি লিখ্‌লে লিখ্‌তে ওকথা? লিখ্‌লেও ঐ ইডিয়ম ব্যবহার কর্‌তে না।"

বাদল অস্ফুটস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিল, "যাহা ভালো তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা মন্দ—"

হঠাৎ খাড়া হইয়া আলস্য ভাঙিয়া কহিল, "বাবা একটু কষ্ট ক'রে একটা বাংলা অভিধান পাঠালে পার্‌তেন। 'ভালো' 'মন্দ' এ দুটো কথার মানে কী, সংজ্ঞা কী, সীমানা কতদূর—কে আমাকে বুঝিয়ে বল্‌বে? বাংলা ভাষার উপর আমার তেমন দখল নেই।"

বাদল পায়চারি করিতে করিতে চিন্তা করিতে ও তর্ক করিতে ভালোবাসে। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "কোনো দুজন মানুষের পক্ষে একই জিনিষ ভালো নাও হ'তে পারে একথা আমরা তরুণরা দেখে ও ঠেকে শিখেছি। এই ধরো বৃষ্টি। চাষারা দু'হাত তুলে আনন্দ জানাচ্ছে। বাবুরা গজ্‌ গজ্‌ করছে—কী আপদ! মাসির খক্‌ খক্‌ করে কাস্‌ছে, আর আমি তো খুব খুসীই হ'য়েছি। কিম্বা ধরো বরফ। অনেকে পা পিছ্‌লে প'ড়ে হাড়-গোড় ভাঙ্‌বে। অনেকে পিছ্‌লাতে পিছ্‌লাতে নক্সা কাটতে কাটতে স্কেট্‌ কর্‌বে। মিসেস্‌ উইল্‌সের সঙ্গে যুদ্ধের সম্বন্ধে গল্প হ'চ্ছিল। তিনি বল্লেন, কার' সর্ব্বনাশ কার' পৌষ মাস। কত-লোক সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে গেল, যেমন মিসেস্‌ উইল্‌সরা নিজেরাই। কতলোক সর্ব্বপ্রথম ঐশ্বর্য্যের মুখ দেখ্‌ল, যেমন অমুক স্যর ও অমুক লেডী।"

সুধী কহিল, "তথাপি স্বীকার কর্‌তেই হবে যে 'ভালো' ও 'মন্দ' এক নয়। এবং 'মন্দ'কে ছেড়ে 'ভালো'কে নিতে হবে।"

বাদল অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, "আমি বলি 'ভালো' ও 'মন্দ' একই বস্তুর দুই বিশেষণ। এবং বস্তুটির অর্দ্ধেক নিয়ে অর্দ্ধেক ফেলা সম্ভব নয়—হয় পূরো নিতে হবে, নয় পূরো ফেলতে হবে। এই ধরো বীফ্‌। বাবা বল্‌বেন মন্দ, আমি বল্‌বো ভালো। তিনি পূরো বর্জ্জন করবেন; আমি পূরো গ্রহণ না ক'রে পারিনে।"

সুধী মনে গ্লানি বোধ করিতেছিল। কহিল, "তর্ক থাক্‌, বাদ্‌লা। অন্ততঃ দু'হাজার বছর ধ'রে 'ভালো' ও 'মন্দ' নিয়ে কথা-কাটাকাটি হ'য়ে এসেছে। আরো দু'লাখ বছর হবে। সেইজন্যে তর্কের উপর আমার আস্থা নেই।"

বাদল 'তর্কের' পক্ষ লইয়া তর্ক করিতে উদ্যত হয়। সুধী নিজের দুই কানে দুই হাত দিয়া বলে, "নন্‌ ভায়লেণ্ট্‌ নন্‌কো-অপারেশান্‌।" দুইজনেই হাসিয়া উঠে।

বাদল আবার আসিয়া সুধীর কাছে বসিল। সুধী কহিল, "মেসোমশাই লিখেছেন, উজ্জয়িনী এখন থেকে তাঁর কাছে থাক্‌বেন, এইরকম কথা চলছে।"

"বটে? আমার লাইব্রেরীটা তাহ'লে তাঁকে উৎসর্গ ক'রে দেবো, আমার তো ফিরে যাবার সংকল্প নেই।"

"পাগ্‌ল!"

"সত্যি সুধীদা। তোমার কাছে এলে স্বপ্নের মতো মনে পড়ে ভারতবর্ষে এককালে আমি ছিলুম বটে। ইংলণ্ডের ভিতরে ডুবে আছি—ইংলণ্ডই আমার কাছে একমাত্র সত্যি।"

"পাট্‌নীতে কেমন ঘর পেয়েছিস্‌? খাওয়া-দাওয়া কেমন?"

"এই রকমই।"

"ঘুম কেমন হয়?"

"হয় না।"

সুধী দুঃখিত হইল। বাদলের যে কোনো-দিন ঘুম-হানি দূর হইবে সে আশা সুধীর ছিল না। সুধী কহিল, "বাদল, ঘুম তোর যথেষ্টই হয়। তবু তোর কেমন একটা সংস্কার হ'য়ে গেছে যে ঐ ঘুম যথেষ্ট নয়। তোর রোগ আসলে ঘুমহানি নয়, ঘুমহানি বিষয়ক সংস্কার।"

বাদল কহিল, "রোগটা যা'ই হোক আমাকে অর্দ্ধজীবী ক'রে রেখেছে। ইংরেজ ছেলেদের সঙ্গে যখন মিশি তখন নিজেকে মনে হয় অভিশপ্ত।"

"খুব মিশ্‌ছিস্‌ নাকি?"

"খুব নয়। টট্‌নহ্যাম কোর্ট রোডের Y M C. A.তে গিয়ে থাকি। ওখানকার ছেলেরা বেশীর ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য করে। কিন্তু খেলা-ধূলায় প্রত্যেকের মন প'ড়ে আছে—ছুটি পেলেই ড্রিল্, জিমন্যাষ্টিক, সাঁতার, ওয়াটার-পোলো, বেস-বল্, ব্যাস্কেট্-বল্, ফুটবল। সমাজসেবায় উৎসাহ আছে। ধর্ম্মচর্চ্চাও বাদ পড়ে না। কেবল লেখাপড়ার দিকটাই কাঁচা। তা ব'লে দেশবিদেশের খবর কেউ কম রাখে না, সব-বিষয়ে দু'চারটে কথা সকলেই বল্‌তে কইতে পারে।"

ইহার পর উঠিল মিসেস্ উইল্‌সের প্রসঙ্গ। কিন্তু উঠিতে না উঠিতেই নীচের তলা হইতে একটা সোর গোল শোনা গেল।

৩২

এতদিন পরে মঁসিয় স্থ সারকার আসিয়াছেন, তাই লইয়া আনন্দ কলরোল। জনপ্রিয় স্থ সারকার ইহাকে bow করিতেছেন, উহার করমর্দ্দন করিতেছেন, সুজেতের করতালুতে চুম্বন রাখিতেছেন, মার্সেলকে কাঁধে তুলিয়া লইয়াছেন।

সিঁড়ির উপর দুইটি স্তম্ভীভূত নরমূর্ত্তি দেখিয়া দে সরকার কহিল, নেমে আসুন, নেমে আসুন, মশাইরা। গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখ্‌ছেন নাকি?"

মাদাম কহিল, "আজ কিন্তু আপনাকে যেতে দিচ্ছি না, মঁসিয়। এইখানে খেতে হবে, গল্প করতে হবে।"

মঁসিয় (মাদামের স্বামী) কহিল, "হাঁ, মঁসিয়, আজ আপনাকে আমরা ছাড়্‌ছিনে। কাল মিস্‌তার সেন এসেছেন। আজ আপনি।"

বাদল যে এ বাড়ীতে ছিল না, দে সরকার জানিত না। কিন্তু নিজের অজ্ঞতা ফাঁস করিয়া দেওয়া দে সরকারের স্বভাব নয়। তাহার ওভারকোট খুলিয়া দিতে মঁসিয় আগাইয়া আসিল, সুজেৎ তাহার টুপী চাহিয়া লইল, দে সরকারের আপত্তি কেহ গ্রাহ্য করিল না।

মঁসিয়র সঙ্গে সিগ্‌রেট বিনিময় হইয়া গেলে দে সরকার সুধীকে কহিল, "এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিসায়। আমার কিছু বলবার আছে।"

সুধী কহিল, "বলতে আজ্ঞা হোক্।"

"এমন দুর্য্যোগে দেশী খিচুড়ি খেতে নিশ্চয়ই আপনাদের—না, অন্ততঃ আপনার—মন চাইছে। মিষ্টার সেন অবশ্য ইংরেজ।"

বাদল কহিল, "মাঝে মাঝে মুখ বদ্‌লাতে ইংরেজেরও আপত্তি নেই।"

সুধী কহিল, "কিন্তু খিচুড়ি পাই কোথা?"

সেই কথাই তো নিবেদন কর্‌তে যাচ্ছি। মশাইরা যদি দয়া ক'রে গরীবের গ্যারেটে পদার্পণ করেন তবে আমি স্বহস্তে খিচুড়ী রেঁধে খাওয়াই। তবে আমার হাতে খেলে যদি জাত যায়—"

দে সরকারের দুষ্টুমি বাদলকে হাসাইল। সে কহিল, "তবে আমরা ভারতবর্ষে কিছু গোবরের জন্যে চিঠি লিখ্‌বো।"

"তা যদি বলেন গোরু এ দেশেও দেখা যায়। কিন্তু ওকথা যাক্। মিস্ মেয়ো আমাদের বদনাম রটিয়েছে যে অপরে খায় গোরু আর আমরা খাই গোবর। সেই থেকে রক্ত টগ্‌বগ্ করছে। থাক্ ওকথা। খিচুড়ি খাবেন আমার ওখানে? এবেলা নয়, ওবেলা।"

বাদল কহিল, "রাজি। আমার জীবনে এমন সুযোগ তো আসে না।"

সুধী কহিল, "মাদামকে খবরটা দিয়ে রাখ্‌তে হবে।"

দে সরকার কহিল, "ফোন নম্বর জানা থাক্‌লে ফোন দ্বারা নিমন্ত্রণ করতুম। অবশ্য ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন। এতখানি আসা কি কম হাঙ্গাম? টিউব্, বাস্, শ্রীচরণ। কবে এরোপ্লেনের দাম কম্‌বে, আমাদের দুঃখ দূর হবে!"

বাদল দরদের সহিত কহিল, "বাস্তবিক।" যদিও এরোপ্লেনের কর্কশ গুঞ্জন বাদলের হেন্‌ডন ত্যাগ করার অন্যতম কারণ ছিল।

বাদল জানিত না দে সরকার তাহার উপর রাগ করিয়া তাহাকে এতকাল বর্জ্জন করিয়াছিল; সুধীও জানিত না। দে সরকারের সঙ্গে যে আর দেখা হয় না এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। লণ্ডনে কে কাহার খবর রাখে? বিরাট সহর—কলিকাতার আটগুণ বড়। যাহার সঙ্গে একবার কোনো সূত্রে আলাপ হইয়া যায় তাহার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয় না।

বাদল কহিল, "আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা একটা মির‍্যাক্ল, মিষ্টার দে সরকার! না জানি আপনার ঠিকানা, না জানাতে পারি আপনাকে ঠিকানা। বাসায় যেতে চেয়েছিলুম, যেতে দেননি—মনে আছে।"

দে সরকার কহিল, "আজ আমি সেধে নিয়ে যাচ্ছি, এখন থেকে যখন খুসি আস্‌বেন—মিষ্টার চক্রবর্ত্তী।"

সুধী কহিল, "ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা থাকে যদি, তবে প্রত্যহ।"

"আমার বাসা মিউজিয়মের এত কাছে যে রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ্ না খেয়ে সেইখানে লাঞ্চ্ খেতে পারেন - সময় ও পয়সা বাঁচ্‌বে। অবশ্য নিজেকে তৈরি ক'রে নিতে হবে আমার গ্যাসের অগ্নিস্থলীতে।"

"খাই তো হর্‌লিক্স্ আর মধু। একটি ছোট টী-রুম্ আছে, সেখানে একটি নির্দ্দিষ্ট আসনে বসি, একটি নির্দ্দিষ্ট মেয়ে এসে পাশে দাঁড়ায়, বলে, "yes, sir?" আমি বলি, 'তুমি তো জানো।' সে ফিরে যায়, নিয়ে আসে হর্‌লিক্স্ আর মধু।"

"তাই খেয়ে বেঁচে আছেন?"

"না, মশাই। সকাল-সন্ধ্যা আরো কিছু খাই।"

"আমার ওখানে সেই খরচে আরো কিছু খাবেন। সত্যি, বিলেতের শীতকালটা বিশ্বাসঘাতক। ক্ষুধা হয় না বটে, কিন্তু জোর ক'রে না খেলে শরীরটা ভিতরে ভিতরে দুর্ব্বল হ'তে থাকে। হঠাৎ একদিন টের পাওয়া যায় ক্ষয়-রোগ হ'য়েছে। এমন কত দেখ্‌লুম। প্রচুর আগুন পোহাবেন—আপনাদের গ্যাসের আগুন, না কয়লার?"

বাদল কহিল, "আমরা এখন ঠাঁই-ঠাঁই। আমি পাট্‌নীতে, সুধীদার এখানে উইকেণ্ড্ কাটাতে এসেছি।"

দে সরকার বিস্মিত হইল। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করা দে সরকারের স্বভাব নয়। সে কহিল, "ওঃ পাট্‌নী! চমৎকার জায়গা! পাট্‌নী হীথ্—খোলা ময়দান। সুখে আছেন। সেবার পাট্‌নী হীথে বেড়াতে বেড়াতে—" (ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

চীনদেশের ভাষা

ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী (প্যারি)

ভাষার ভিতর দিয়ে জাতির সভ্যতার একটা বড় বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। কোনো জাতির শিল্প, কলা, দর্শন প্রভৃতি যখন উন্নত হয় তখন তার ভাষাও সমৃদ্ধি লাভ করে। ভাষার উপর তার সমস্ত উন্নতির ছায়াপাত হয়। তাই যে-জাতিই সভ্যতার খুব উচ্চস্তরে উন্নীত হ'য়েছে, বুঝ্‌তে হবে তার ভাষাও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছে। চীনদেশের সভ্যতা খুব প্রাচীন। তার শিল্প, কলা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি জগতের প্রতি সভ্যজাতির নিকটেই সমাদর লাভ করেছে। তার ভাষা নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতেরা বহু আলোচনা করেছেন ও সেই ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনেকটা উদ্ধার করেছেন। কিন্তু চীনদেশের সভ্যতা সম্বন্ধে কিছুদিন থেকে আমরা মনোযোগী হ'লেও তার ভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তার সভ্যতা বুঝ্‌তে গেলে যে তার ভাষাকে বাদ দিলে চল্‌বে না, সে কথা আমরা ঠিক উপলব্ধি করি না। চীনা ভাষা অন্যান্য ভাষার চেয়ে অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব'লে তার লিখন-ভঙ্গী আমাদের লিখনপ্রণালীর চেয়ে পৃথক, সেই জন্য অদ্ভুত মনে ক'রেই বোধ হয় আমরা এই উদাসীন ভাব অবলম্বন করেছি। তারপর কয়েক শতাব্দী ধ'রে আমাদের দৃষ্টি পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর নিবদ্ধ রাখায় প্রাচ্যদেশসমূহ সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ স্থান অধিকার করে সে কথা ভুলে গিয়েছি ও সেই জন্যই আমাদের কবি চীনকে "অসভ্য" ও জাপানকে "বর্ব্বর" ব'লে উল্লেখ করেছেন। অথচ ঐ সব দেশের সঙ্গে খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের সম্বন্ধ অতি নিকট ছিল।

প্রাচীন সম্বন্ধের কথা ভুলে গেলেও প্রাচ্যদেশসমূহের সঙ্গে যে আমাদের নূতন ক'রে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে তা'তে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে চীনারা তাদের দেশ ও জাতিকে নূতন ক'রে গঠন করছে। তাদের অবস্থা আমাদের অবস্থারই অনুরূপ। জাতীয় জীবনের যে যে সমস্যার সমাধান তাদের করতে হ'চ্ছে আমাদের সাম্‌নেও সেই-সেই সমস্যাই উপস্থিত হ'য়েছে। তাদের ও আমাদের ভবিষ্যৎ যে অনেকভাবে জড়িত তা'তেও কোন সন্দেহ নাই। সেই সব কারণেই চীনদেশের খবর আমাদের নিতে হবে, তার ইতিহাস আলোচনা করতে হবে এবং তার সভ্যতার মূলসূত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'তে হবে। এই পরিচয় নিতে গেলে প্রথমেই তার ভাষার আলোচনা প্রয়োজন।

চীনা ভাষা প্রায় ৪০ কোটী লোকের কথিত ভাষা। সমগ্র চীনদেশে, মধ্য এসিয়ার নানাস্থানে এবং চীনাদের উপনিবেশগুলিতে এই ভাষা কথিত হয়। তা ছাড়া জাপান, কোরিয়া ও অনামের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁদের সভ্যতার সঙ্গে এই ভাষা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। অন্যূন চার-হাজার বছর ধ'রে এই ভাষার অনুশীলন হ'য়ে আসছে। যে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এই ভাষা পরিপুষ্টিলাভ করেছে তাও খুব প্রাচীন। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতকের পূর্ব্বেই যে তার গোড়া-পত্তন হ'য়েছে তাতে কেহ

সন্দেহ করেন না। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বাদশ শতক চেয়েও প্রাচীন খোদিত লিপি চীনদেশে পাওয়া গেছে। তা ছাড়া খৃঃ-পূর্ব্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থ চীনা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন হ'য়ে রয়েছে।

চীনা ভাষা আমাদের ভাষার অনুরূপ মোটেই নয়। আমাদের ভাষা বহুবর্ণাত্মক (Poly-syllabic), কিন্তু চীনাভাষা একবর্ণাত্মক (Mono-syllabic)। ভারতের সীমান্ত দেশসমূহে অনেক জাতির ভাষাই একবর্ণাত্মক—যেমন তিব্বতী, তিব্বতী থেকে উদ্ভূত নানা ভাষা লেপ্‌চা, লিম্বু প্রভৃতি, নেপালী, অহোম, বর্ম্মী ইত্যাদি। সংস্কৃতে এই সব ভাষাকে "একাক্ষর সমুল্লাপ" বলা হ'য়েছে। কোন চীনা শব্দই এক বর্ণের বেশী নয়—যেমন, আগুন=**হুও**, গাছ=**কি**, জল=**শুই**, বাতাস=**ফেং**। দুই কিম্বা তার চেয়ে বেশী শব্দ একত্র হ'য়ে বহুবর্ণাত্মক শব্দের সৃষ্টি করে—যেমন **শুইফেং**=বাতাস ও জল। কিন্তু সেগুলি প্রকৃতপক্ষে সংযুক্ত শব্দ।

চীনা ভাষার আর একটি বিশেষত্ব যে, তাহা বিভক্তি-যুক্ত (inflexional) নয়। আমাদের ভাষায় যেরূপ বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি বাচক শব্দ প্রয়োগ হিসাবে বিভক্তিযুক্ত হয় ও বিকৃত হয় চীনা ভাষায় তা' হয় না। বিশেষ্যকে বিশেষণে পরিণত করতে হ'লে অন্য শব্দ যোজনা করতে হয়। লিঙ্গ ও সংখ্যার পরিবর্ত্তনেও শব্দের কোন বিকৃতি হয় না। সুতরাং চীনা ভাষায় বাক্যরচনা অনেক সহজসাধ্য। বাক্যরচনায় শব্দবিন্যাস খুব সরল। প্রথমে কর্ত্তা, তারপর ক্রিয়া এবং শেষে কর্ম্ম। যেমন—আমি এ বই দিব না= **ঙো পু চে চে শু** (আমি না দিব এ বই)। তা ছাড়া আমাদের ভাষায় যেমন বিভক্তিযোগে ক্রিয়ার পরিণতি হয় এবং বর্ত্তমান অতীত প্রভৃতি কাল নির্দ্দেশ করা চলে, চীনা ভাষায় তা হয় না। 'আমি করি, করিয়াছি, করিব' চীনা ভাষায় অনূদিত হ'লে দাঁড়াবে—**ঙো ৎসে সা। ৎসেসা** ক্রিয়ার কালনির্দ্দেশে কোনই পরিবর্ত্তন হবে না। কথিত ভাষায় কখন অন্য শব্দ যোজনার দ্বারা বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল নির্দ্দিষ্ট হ'লেও সাহিত্যের ভাষায় কাল-ভেদে ক্রিয়ায় অন্য শব্দ যোজনা কখনই হয় না। বিষয় অবতারণা থেকে অর্থ বুঝে নিতে হয়। কর্ত্তৃপদের সংখ্যা বা লিঙ্গের পরিবর্ত্তনেও ক্রিয়ার কোন পরিণতি হয় না। 'আমি, আমরা দু'জনে বা আমরা সকলে করি' চীনা ভাষায় অনূদিত হ'লেও ঐ **ঙো ৎসেসা** হবে।

এই স্থানে চীন দেশের কথিত ও সাহিত্যের ভাষার ভিতর কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে সাহিত্যের ভাষায় সংখ্যা বা কাল বাচক কোন শব্দের ব্যবহার হয় না। কিন্তু কথিত ভাষায় সেগুলি চলে। যেমন—

আমি—	**ঙো**
আমরা—	**ঙো মেন্**
তুমি=	**নি**
তোমরা=	**নি মেন্**
করি—	**ৎসেসা**
করিয়াছি, করিয়াছিলাম=	**ৎসেসা লিয়াও**
করিব—	**ইয়াও ৎসেসা**

চীনা ভাষা একবর্ণাত্মক ব'লে বিদেশীর জন্য আর এক গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছে। সে হ'চ্ছে উচ্চারণের। অনেক শব্দের উচ্চারণ একই প্রকার। কিন্তু নানা বিভিন্নার্থবোধক শব্দের উচ্চারণ একপ্রকার হ'লেও তাদের ঠিক রাখবার একটা উপায় আছে। সেটি হ'চ্ছে ঝোঁক (accent)। চীনা ভাষার সাধারণতঃ চারটি ঝোঁক আছে। এই ঝোঁক বাদ দিলেই চীনা ভাষা শিক্ষায় নানা বিপদ উপস্থিত হয়, অথচ বিদেশীরা এই ঝোঁক ভাল ক'রে ধরতেও পারে না। একটি উদাহরণ থেকেই ঝোঁকের আবশ্যকতা ধরা যাবে। যেমন—কেনা= **মাই-ই** এবং বেচা=**মা-ই**।

মোটামুটি এই হ'ল চীনা ভাষার বিশেষত্ব। কিন্তু চীনা ভাষা চিরকালই এরূপ ছিল না। বহুযুগের ক্রম-বিকাশের ফলে রূপান্তর গ্রহণ করতে করতে একবর্ণাত্মক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভাষাবিৎরা মনে করেন যে, দু তিন হাজার বছর পূর্ব্বে চীনা ভাষা বহুবর্ণাত্মকই ছিল।

তখন ভাষার রূপ কি ছিল তা' এখন ঠিক ক'রে ওঠা যায় নাই। তবে দেড় হাজার বছর পূর্ব্বে ভাষার যে রূপ ছিল তা' নির্দ্ধারিত হ'য়েছে। ক্রমবিকাশের এই দেড় হাজার বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান কালে যে সমস্ত শব্দের উচ্চারণ একপ্রকার তার মধ্যে অনেকের উচ্চারণই সেকালে পৃথক ছিল। যেমন

ছয়	— **লিউ**, প্রাচীন	— **লিউক্**
বহিয়া যাওয়া	— **লিউ**, প্রাচীন	— **লিঅউ**
বন	— **লিন্**, প্রাচীন	— **লিঅম্**
প্রতিবাসী	— **লিন্**, প্রাচীন	— **লিঅন**

এই পরিবর্ত্তনের ইতিহাস ধরা পড়েছে নানাদিক দিয়ে। প্রথমতঃ চীন দেশের বিভিন্ন প্রদেশে ভাষার যে উচ্চারণ চল্‌তি আছে তার থেকে প্রাচীনকালের উচ্চারণ অনেকটা ধরা গেছে। উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। বাংলা শব্দগুলি বাংলা দেশের নানাস্থানে বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়। এই স্থানীয় উচ্চারণগুলি তুলনা করলে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে মূল বাংলা ভাষার উচ্চারণ কি ছিল অনেকটা ধারণা করা যায়। তেমনি ক্যাণ্টন, ফুকিয়াং, এবং পেকিং প্রভৃতি স্থানের উচ্চারণের ভিতর অনেক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন **ইন্** (অর্থ—স্বর) পেকিং-এর উচ্চারণ। কিন্তু ক্যাণ্টনে এই শব্দের উচ্চারণ হচ্ছে—**ইঅম্**। এর থেকে ভাষা-তত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে, ঐ শব্দের প্রাচীন উচ্চারণ ছিল **ইএম্**। নানাস্থানে উচ্চারণের খুব প্রভেদ থাক্‌লেও পেকিং বহুদিন ধ'রে চীন দেশের রাজধানী ছিল ব'লে পেকিং-এর উচ্চারিত ভাষা চীন দেশের সমস্ত প্রদেশের শিক্ষিত সমাজই জান্‌তেন। পেকিং-এর উচ্চারিত ভাষাকে বলা হয় মান্দারিণ। মান্দারিণ কথার মূল অর্থ হ'চ্ছে রাজপারিষদ—সংস্কৃত মন্ত্রী শব্দেরই রূপান্তর।

প্রাচীন উচ্চারণ উদ্ধার করবার আর একটি উপায় হ'চ্ছে কোরিয়া, জাপানী ও আনামী ভাষার আলোচনা। পূর্ব্বেই বলেছি যে, এই তিন ভাষার উপর চীন ভাষা তার প্রভাব বিস্তার করেছে। এই তিন জাতিই চীনা সভ্যতার সঙ্গে চীনা ভাষার বহু শব্দ ধার করেছিল। এবং যে যুগে ধার করেছিল সেই সব শব্দের সেই যুগের উচ্চারণই আজও বহাল রেখেছে। যেমন **পু** (অর্থ—ভৃত্য) হ'চ্ছে বর্ত্তমান কালের উচ্চারণ। কিন্তু ঐ শব্দই আনামীতে **বোক্**, জাপানীতে **পোকু** এবং ক্যাণ্টনের ভাষাতে **ব্কোক্** উচ্চারিত হয়। এর থেকেই ধরা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ঐ শব্দের উচ্চারণ ছিল **ব্োক্**। আনামীরা ও জাপানীরা অষ্টম শতাব্দীতে ঐ শব্দ ধার করেছিল।

আর প্রাচীন উচ্চারণ ধরা পড়ে যে-সব বিদেশী শব্দ চীনা ভাষায় রূপান্তরিত হ'য়েছিল তার ভিতর দিয়ে। সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্য সেকালে চীনা ভাষায় অনূদিত হ'য়েছিল। সেই সঙ্গে বহু সংস্কৃত শব্দ, বিশেষতঃ ব্যক্তি বা স্থানের নাম, চীনা অক্ষরে রূপান্তরিত হ'য়েছিল মাত্র। যেমন "বুদ্ধ" শব্দটিকে যে চীনা শব্দের দ্বারা রূপান্তরিত করা হ'য়েছিল তার বর্ত্তমান উচ্চারণ **কো** (পেকিং), কিন্তু ক্যাণ্টনীতে **ফৎ** এবং জাপানীতে **বুৎসু**। এই থেকেই ধরা যায় যে, প্রাচীন উচ্চারণ ছিল **বুদ্**, যা' সংস্কৃত 'বুদ্ধ' শব্দের খুব নিকট ছিল।

এই সব উপায়েই চীনা ভাষার প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্ব্বেকার উচ্চারণের সন্ধান পাওয়া যায়। গত হাজার বছরের ভিতর তার উচ্চারণে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। বিভিন্নার্থবোধক শব্দের একরূপ উচ্চারণ কেন দাঁড়িয়েছে তা' সেই সব শব্দের প্রাচীন উচ্চারণ আলোচনা করলেই ধরতে পারা যায়।

চীনাদের লিখনপ্রণালীই বিদেশীর কাছে তাদের ভাষাকে এত দুর্ব্বোধ্য করেছে। শব্দকে বিশ্লেষণ ক'রে বর্ণমালা সৃষ্টি না ক'রে প্রাচীন চীনেরা এক একটি শব্দের জন্য এক একটি অক্ষর সৃষ্টি করেছে। সেই অক্ষরগুলি দেখ্‌তেও অনেকটা গোলমেলে, কারণ এক একটি বহুরেখার সমষ্টিতে গঠিত। তাই চীনা ভাষায় কোন বর্ণমালা নাই—প্রতি শব্দের জন্য এক একটি

অক্ষর শিখ্‌তে হয়। চীনা ভাষায় মোট চল্লিশ হাজারের উপর শব্দ আছে। অক্ষরও ততগুলি। তবে এই ভাষা অধ্যয়ন করতে গেলে সমস্ত অক্ষর শিখ্‌তে হয় না। চার হাজার অক্ষর শিখ্‌লেই কাজ চলে। তবে প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করতে গেলে অভিধানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

চীনাদের লিপনভঙ্গীর ইতিহাসও এখন উদ্ধার হ'য়েছে। এই ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা বর্ত্তমান কালে প্রচলিত চীনা অক্ষরের প্রাচীন রূপ ধরতে পারি। তিন হাজার বছর পূর্ব্বেকার চীনা লিপন পাওয়া গেছে। এ লিপিগুলি বেশীর ভাগই কাছিমের খোলস কিংবা জন্তুবিশেষের হাড়ের উপর খোদিত। এই খোদিত খোলস এবং হাড় নিয়ে প্রাচীন চীনেরা দৈব গণনা করত। প্রাচীন চীনা সাহিত্যে এ সবের উল্লেখ আছে। এই খোদিত লিপিতে চীনা অক্ষরের যে রূপ দেখা যায় তা' খুবই প্রাচীন। এই সব প্রাচীন লিপি থেকে খৃঃ-পূর্ব্ব ৮ম শতকে চীনা অক্ষরের এক তালিকা প্রস্তুত হয়। পরবর্ত্তীকালে খৃঃ-পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীতে চীনসম্রাটের আদেশে তখন প্রচলিত চীনা অক্ষরের যে দ্বিতীয় তালিকা প্রস্তুত করা হয় তা' এখনও রক্ষিত আছে। তা'তে ৩৩০০টি অক্ষর পাওয়া যায়। রাজকর্ম্মচারীদের এই সব অক্ষর অনুশীলন করতে হ'ত। ঐ সময় থেকে অক্ষরের রূপের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই, শুধু লিখ্‌বার নানারূপ প্রণালী উদ্ভাবিত হ'য়েছে এবং অক্ষরগুলির সহিত নূতন অক্ষর যোজনা ক'রে বা তাদের ঈষৎ পরিবর্ত্তন ক'রে বহু নূতন অক্ষর সৃষ্টি হ'য়েছে। তাই খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আমরা প্রায় ৮০০০, তৃতীয় শতাব্দীতে ১০,০০০, এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ৪০,০০০ হাজার অক্ষরের হিসাব পাই। চীনা অক্ষরগুলিকে বিশ্লেষণ করলে তাদের সৃষ্টিপ্রণালী ধরা পড়ে।

চীনদেশে অক্ষরসৃষ্টি ঠিক কোন্ সময় হ'য়েছিল তা' বলা যায় না। প্রাচীন চীনা সাহিত্যে যে সব লোক-প্রবাদ নিবদ্ধ আছে তা' বিশ্বাস করলে ধরা যায় খৃষ্টের আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বে এই লিপি প্রথম উদ্ভাবিত হ'য়েছিল। এই সব লোকপ্রবাদ যে খুব মিথ্যা তা' মনে হয় না। কারণ চীনদেশের নানা স্থানে যে সব খোদিত লিপি পাওয়া গেছে সেগুলি খৃষ্টের দেড়হাজার বছর পূর্ব্বে এবং কতকগুলি তা'র চেয়েও প্রাচীন। এই খোদিত অক্ষর গুলির রূপ আলোচনা করলে মনে হয় তারা ঐ সময়ের বহুপূর্ব্বে উদ্ভাবিত হ'য়েছিল।

এই অক্ষরগুলির আলোচনা করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে অনেকগুলি ছিল এক প্রকার চিত্রলিপি। বহুকালের ক্রমবিকাশের ফলে তারা বর্ত্তমান কালে এমন রূপ নিয়েছে যে তাদের প্রাচীন চিত্রের খোঁজ সহজে মিলে না। কিন্তু প্রাচীন খোদিত লিপির সাহায্যে তাদের রূপের ক্রমবিকাশ ধরা যায়। যেমন—

প্রাচীন রূপ বর্ত্তমান রূপ

চক্ষু—চীনা—মি

দন্ত—চীনা—

সূর্য্য—চীনা—জ'*

চন্দ্র—চীনা—য়ুয়ে

বৃক্ষ—চীনা—কি

* "জ" এর উচ্চারণ বর্গীয় জ এর মত নয়। "শ" ও "জ" এর সংমিশ্রণে যে উচ্চারণ উদ্ভূত হয়, তাই।

উপরের অক্ষরগুলির নানারূপ তুলনা করলেই তাদের ক্রমবিকাশ ধরা যাবে। অতি প্রাচীন লিখনে 'চক্ষু' লিখতে গিয়ে চীনারা চিত্রটিতে একটি চক্ষুই নির্দ্দেশ করেছিল বেশ বোঝা যায়। 'দন্ত' লিখতে দু'পাটী দাঁতের, 'সূর্য্য' লিখ্‌তে গিয়ে সূর্য্যের, 'চন্দ্র'লিখতে গিয়ে চন্দ্রকলার, 'বৃক্ষ' লিখতে গিয়ে একটী গাছ ও তার শাখা-প্রশাখার চিত্র এঁকেছিল। তুলিতে চিত্রগুলির অনুশীলন হ'তে হ'তে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে সেগুলি বর্ত্তমান রূপ নিয়েছে।

কিন্তু মিশর দেশে যেমন চিত্রলিপির বিশ্লেষণে বর্ণমালা তৈরি হ'য়েছিল চীনদেশে তা' হয় নি। প্রকৃতির যে সমস্ত দৃশ্য কিংবা বস্তুকে চিত্রে রূপ দেওয়া যায় চীনারা তা' দিয়েছিল। এতে তাদের তুলির কৃতিত্ব পরিস্ফুট হ'য়ে রয়েছে। কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে তাদের ভাষা যখন পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো তখন শুধু চিত্রলিখনে আর ভাষাকে বেঁধে রাখা গেল না। নূতন অক্ষর সৃষ্টি আবশ্যক হ'য়ে উঠল।

এই করতে গিয়ে চীনারা আর এক শ্রেণীর অক্ষর তৈরী করল যার দ্বারা তারা অপ্রাকৃতিক বস্তুকেও নির্দ্দেশ করতে পারল। যেমন—

উঁচু, চীনা 'শ ং' 丄 上

নীচু, চীনা 'হিয়া' 丅 下

'উঁচুতে' কিংবা 'উপরে' বোঝাতে গেলে একটি রেখার উপরে ও 'নীচুতে' বোঝাতে গেলে রেখার নীচে অন্য রেখা এঁকেই প্রথমে 'উঁচু' ও 'নীচু' নির্দ্দেশ করা হ'ত। তুলির লেখাতে ক্রমশঃ সেই রেখায় মাত্রা যোজনা করা হ'ল। এই শ্রেণীর অক্ষরগুলিকে 'নির্দ্দেশক' বলা যেতে পারে। আর এক জাতীয় 'নির্দ্দেশক'ও উদ্ভাবিত হ'ল যার দ্বারা চীনারা প্রাকৃতিক বস্তুর সমষ্টি এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যকে নির্দ্দেশ করতে পারল। যেমন—

বন—চীনা—লিন্ 林

প্রাতঃকাল—চীনা—তান্ 旦

নিরীক্ষণ—চীনা—সিয়াং 相

উজ্জ্বল—চীনা—মিং 明

'বন' বোঝাতে গিয়ে অনেক গাছের সমষ্টি, 'প্রাতঃকালে'র জন্য একটি রেখার (=দিগন্ত রেখার) উপর সূর্য্য, নিরীক্ষণ বা 'নিরীক্ষণ করা'র জন্য বৃক্ষ+চক্ষু (অর্থাৎ গাছের আড়াল থেকে চোখ্ উঁকি মারছে) এবং উজ্জ্বল বোঝাতে গিয়ে সূর্য্য ও চন্দ্রের সমষ্টি নির্দ্দেশ করা হ'য়েছে।

এই শ্রেণীর সমজাতীয় আর কতকগুলি নির্দ্দেশক চীনা ভাষায় আছে—যেমন

প্রাচীন—চীনা—কু= 固

এই অক্ষরটি তিনটি বিভিন্ন অক্ষরের যোজনায় তৈরী হ'য়েছে। প্রথম রূপটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একটি বৃত্তাকার গণ্ডীর ভিতর দু'টি অক্ষর রয়েছে। বৃত্তটির বিশেষ কোন অর্থ নাই, শুধু অক্ষরের রূপটিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই অঙ্কিত হ'য়েছে। ভিতরে যে দু'টি অক্ষর তার উপরেরটির অর্থ হ'চ্ছে দশ, নীচেকারটির অর্থ হ'চ্ছে 'মুখ'—মুখের চিত্রলিখন। দশ ও মুখ একসঙ্গে ক'রে নির্দ্দেশ করা হ'চ্ছে দশজন পূর্ব্বপুরুষের কথা। এই থেকেই অক্ষরটির 'প্রাচীন' অর্থ ব্যবহার করা হ'য়েছে।

ভাষাকে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে চীনারা যখন এইরূপ বহু অক্ষর সৃষ্টি করল তখন আবার সেই সব অক্ষর খুঁজে বের করবার জন্য এবং তাদের অর্থ ঠিক করবার জন্য উপায় ঠিক করতে হ'ল অর্থাৎ রীতিমত অভিধান তৈরি করতে হ'ল। এই অভিধান তৈরি করতে গিয়ে নানা পণ্ডিতেরা নানা উপায় অবলম্বন করেছেন। কেউ অক্ষরের কথা ভেবে সেগুলিকে কতকগুলি নিয়ম অনুসারে সাজিয়েছেন কেউ বা ভাষার কথা ভেবে শব্দ-গোষ্ঠি অনুসারে অক্ষরগুলিকে সাজিয়েছেন (phonetic)। শেষোক্ত উপায়টি বিজ্ঞানসম্মত এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের নিকট থেকে শেখা। প্রথমটি বিজ্ঞানসম্মত না হ'লেও বেশী প্রচলিত। সমস্ত চীনা অক্ষরগুলিকে ২১৪টি মূল অক্ষর বা ধাতু (radical) অনুসারে সাজান হ'য়েছে। সাধারণতঃ একটি মূল অক্ষরের অর্থের সঙ্গে তার ভিতরের অন্যান্য অক্ষরের সহিত কিছু সম্বন্ধ থাকে। কখন কখন এ নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়েছে। মোট কথা, চীনা অভিধান দেখতে গেলে ২১৪টি মূল অক্ষরের সহিত পরিচয় থাকা চাই এবং অক্ষরগুলি কোন্ কোন্ মূল অক্ষরের সহিত সংশ্লিষ্ট তাও জানা চাই। বুঝতে হবে প্রতি চীনা অক্ষরকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথমটি মূল, যার সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ এবং দ্বিতীয়টি শব্দ-গোষ্ঠি (phonetic) যার সঙ্গে উচ্চারণের সম্বন্ধ। নীচের অক্ষরগুলি আলোচনা করলেই তা বোঝা যাবে—

方 舫 坊
妨 紡 仿 防

এই সাতটি অক্ষরের প্রথমটির উচ্চারণ ফ্যাং। পরবর্তী ছ'টি অক্ষরের প্রত্যেকটিতে এই ফ্যাং অক্ষরটি যুক্ত থাকায় ছ'টি অক্ষরেরই উচ্চারণ ফ্যাং, কিন্তু তাদের অর্থ বিভিন্ন, কারণ মূল অক্ষরগুলি বিভিন্ন। প্রথমটির মূল অক্ষরের অর্থ হচ্ছে 'নৌকা', সম্পূর্ণ অক্ষরটির অর্থ 'বড় নৌকা'; দ্বিতীয়টির মূল অক্ষরের অর্থ 'জমি', সম্পূর্ণ অক্ষরের অর্থ 'দোকান' (জমির উপর স্থাপিত ব'লে); তৃতীয়টির মূল অক্ষরের অর্থ 'স্ত্রী,' 'স্ত্রীজাতি,' সম্পূর্ণ অক্ষরের অর্থ 'বিরক্ত করা' (চীনারা স্ত্রীজাতিকে বোধ হয় ভাল চোখে দেখত না!); চতুর্থটির মূল অক্ষরের অর্থ 'রেশম', বা 'রেশমের সুতা', সম্পূর্ণ অক্ষরের অর্থ 'বাঁধা', ইত্যাদি। এই থেকেই মূল অক্ষর (radical) এবং শব্দ-গোষ্ঠির (phonetic) প্রয়োজনীয়তা ধরা যাবে।

এইবার চীনা ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু ব'লেই প্রবন্ধ শেষ করব। সংস্কৃত ও চীনা সমজাতীয় ভাষা না হ'লেও চীনা ভাষার উপর সংস্কৃতের বহু প্রভাব দেখা যায়। চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচারই তার মূল কারণ। কতকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধ শব্দ চীনারা তাদের ভাষার অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছে এবং সেগুলির জন্য নূতন অক্ষরও সৃষ্টি করেছে। যেমন—

বুদ্ধ—চীনা ফো 佛

সংঘ — সেং

বভিক্ষু

'বুদ্ধ' 'সংঘ' প্রভৃতি কথাগুলির চীনাভাষায় ঠিক অনুবাদ করতে না পারায় চীনাদের নূতন অক্ষর সৃষ্টি করতে হ'ল। শব্দ-গোষ্ঠির * ফো (প্রাচীন বুদ্) এবং সেং (প্রাচীন সেঙ্) এর সহিত 'মানুষ' অর্থ-বাচক মূল অক্ষর যোজনা করিয়া চীনারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করল।

* প্রতি লাইনের দ্বিতীয় অক্ষরটি উচ্চারণমূলীয় (Phonetic) এবং প্রথমটি মানুষ-অর্থবাচক মূল অক্ষরের সহিত যুক্ত সম্পূর্ণ অক্ষর।
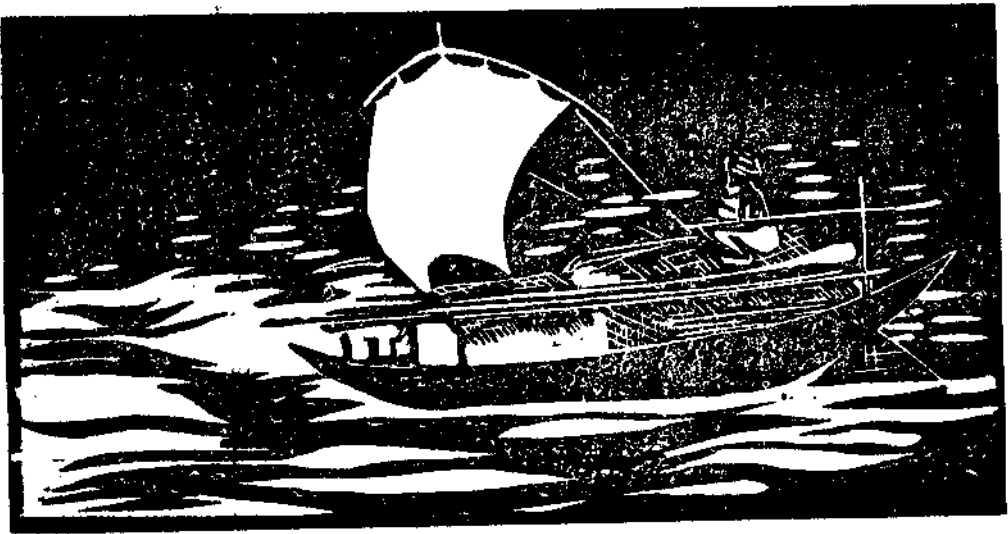
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

রূপসা নদী

পানকৌড়ি

পল্লীগ্রাম

সহরতলী

উপবন

প্রতিধ্বনি

—একাঙ্ক নাটিকা

—শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

—[কাঠের 'ফ্রেমে'র ওপরে 'ক্যান্‌ভাস্‌' আঁটা একটি মাঝারি গোছের চতুষ্কোণ ঘর। ঘরের দিকে চাইলে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, সেটি 'স্টেজে'র লাগাও সাজঘর। পিছনের দিকটা মাঝে-চেরা একটি কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা। ওপরে কোন ছাউনি নেই। ঘরের কাঠের 'ফ্রেমে'র উচ্চতা একটা সাধারণ মানুষের মত, কি তার চেয়ে সামান্য একটু উঁচু।

সাজঘরটি অতি সাধারণ।—একপাশে একটি আল্‌না, আর তারই পাশে একটি সাধারণ আয়না-সংযুক্ত 'ড্রেসিং টেবিল'। টেবিলের সামনে একটি চেয়ার। আল্‌নায় গোটা-দুই পোষাক ঝুলছে, আর ড্রেসিং টেবিলে'র ওপর 'পেইন্টে'র নানারূপ সরঞ্জাম। ঘরের আর একপাশে 'ড্রেসিং টেবিলে'র মুখোমুখি ছোট গোলাকার একটি পাথরের টেবিল। তার ওপরে একটি কাঁচের বাহারে ফুলদানি ও ফুলদানিতে নানাফুলের একটি গুচ্ছ। গোল টেবিলের তিনপাশে তিনটি চেয়ার।

পাত্রপাত্রীরা পিছনের কালো পর্দাটা ফাঁক ক'রেই প্রয়োজন-মত প্রবেশ ও প্রস্থান করবে। আর পর্দাটি ফাঁক হ'লে দর্শকদের চোখে পড়বে,—দু'টো 'উইঙ্‌স্‌'- এর মাঝ দিয়ে একটি বৃহৎ রঙ্গমঞ্চের খানিকটা—যেখানে অভিনয় চলেছে। ঐ বৃহৎ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এ নাটিকার স্থানে স্থানে সম্পর্ক থাকলেও তার বিশেষ কোন পরিচয় আগে থেকে দেওয়া চলবে না; ঐ রঙ্গমঞ্চের রূপ সব সময় এক রকম থাকবে না, কাজেই যথাস্থানে তার যথাযথ বিবরণ দেওয়া হবে।

এ নাটিকার পাত্রপাত্রীরা অপর একটি অভিনয়ের সাজ সজ্জা ক'রে থাকবে, প্রয়োজনমত তাদের পরিচ্ছদ-পরিচয় দেওয়া যাবে। এ নাটিকার জন্যে তাদের আলাদা কোন সাজ নেই।...

সুলেখা 'ড্রেসিং টেবিলে'র সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পেইন্টে'র ওপর কারিকুরি করছে। সুলেখা তরুণী ইরাণীর বেশে সজ্জিতা। গোল টেবিলের তিন পাশের তিনটি চেয়ারের একটিতে চঞ্চল আসীন। চঞ্চলের অঙ্গে মুসলমান যুবরাজের পরিচ্ছদ। চঞ্চলের চিবুকে কৃত্রিম নূর দাড়ী খাপ খেয়ে গেছে। মুখে প্রগাঢ় চিন্তার ভাব খেলে যাচ্ছে। ভিতরের উত্তেজনা চাপবার চেষ্টায় মুখ ক্রমেই বিবর্ণ হ'য়ে আসছে। ফুলদানি থেকে একটি ফুল ছিঁড়ে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে সেটিকে হাতের মধ্যে পিষে ফেলে সে উঠে দাঁড়ালো। ফুলের পাপড়িগুলো তার হাত থেকে টেবিলের ওপর ঝ'রে পড়ল।]—

চঞ্চল। (ঝরা পাপ্‌ড়িগুলোর পানে ব্যথিত দৃষ্টি ফেলে) এ তোমার অন্যায় সুলেখা। অভিনয়কে অভিনয় ব'লে ভাবতে পার না কেন?

সুলেখা। (চঞ্চলের দিকে ফিরে) ভাবতে পারি না তা ঠিক, কিন্তু কেন পারি না তা নিজেও জানি না। তুমি যতই কেননা চেষ্টা করো চঞ্চলদা, আমাকে দিয়ে আজ তা তুমি ভাবাতে পারবে না।

চঞ্চল। কিন্তু একবারও ভেবে দেখেছ কি সুলেখা যে, দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে যখন আমি তোমার হাতটা ধরতে গেলাম আর তুমি তা সরিয়ে নিলে তখন দর্শকদের চোখে সেটা কতখানি অশোভন দেখিয়েছে?

সুলেখা। কিছু না। অশোভন দেখালে তারা আমাদের ক্ষমা করত কিনা। তুমিও যেমন। তাহ'লে তারা টিট্‌কিরি দিয়ে হেসে উঠত, হাততালি দিত। দর্শকরা কসাইয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর চঞ্চলদা,—'আর্টিষ্টে'র জন্যে তাদের কোন সহানুভূতি নেই।

চঞ্চল। (মৃদু হেসে) তা নেই জানি, কিন্তু দর্শকদের দৃষ্টিই যে সব সময়ে নির্ভুল, তাও ত নয়?

সুলেখা। তা'ত নাই।

[রেণুকার কিশোর-মহিষীর বেশে প্রবেশ। হাতে একখানি বই]

রেণুকা। (কম্পিতকণ্ঠে) চঞ্চলদা, 'প্রম্‌টিং' ভারী বিচ্ছিরি হ'চ্ছে কিন্তু। একেত 'পার্ট' ভাল মুখস্থ নেই, তার ওপরে এ যা 'প্রম্‌টিং' হ'চ্ছে..... জঘন্য, জঘন্য একেবারে......

[কমলের হিন্দু সৈনিকের বেশে প্রবেশ]

কমল। (হতাশকণ্ঠে) এই যা:, সব মাটি হ'য়ে গেল। চঞ্চল, ছোরাটা নিয়ে যেতে ছবি ভুলে গেছে, ...এখন উপায়?

চঞ্চল। (বিচলিত কণ্ঠে) তাইত, এঁ্যা......

সুলেখা। আঃ, তোমাদের দু'জনারই কি মাথা খারাপ হ'লো নাকি? এটা যে 'মার্ডার্ সিন্' তা তোমাদের কে বল্লে?

কমল। নিশ্চয়। এটা 'মার্ডার্ সিন্' না হ'য়েই যায় না। ওই শোন ছবি কি বলছে।

[কমল কালো পর্দ্দাটা ফাঁক ক'রে ধ'রে দাঁড়ালো। চঞ্চল ও সুলেখা সামনে এগিয়ে গেল। রেণুকা সুলেখার পরিত্যক্ত চেয়ারটায় ব'সে প'ড়ে টেবিলের ওপর বইখানা খুলে রেখে তারই ওপর ঝুঁকে রইলো। মুখে অতি দ্রুত কি যেন সে আবৃত্তি ক'রে যাচ্ছিল। সুলেখা ও চঞ্চল ফিরে এসে দু'খানা চেয়ারে বসল। কমল অবশিষ্ট চেয়ারটার ওপর দু'টো হাতের ভর রেখে দাঁড়ালো।]

সুলেখা। (সশঙ্ক মুখে) অভিনয়ে ছবির যে কোন ত্রুটি হবে না, সে আমি লিখে দিতে পারি, কমলদা। ও যে এত বড় একটা ভুল করতেই পারে না সে সবাই জানে। ওর 'নার্ভ' যে কি 'ষ্ট্রং' তা কল্পনা করাও কঠিন।

চঞ্চল। (গম্ভীর কণ্ঠে) শুধু তা'ই নয়। ছবি অভিনয়কে অভিনয় ব'লে ভাবতে জানে। কাজেই কোথাও ওর ভুল থাকা সম্ভব নয়। ও শাহেনশা নবাব বাহাদুরের কণ্ঠসংলগ্ন হ'য়েই ওর বুকে ছোরা বসাবে। ওর বুক একটুও কাঁপবে না। ও যতক্ষণ অভিনয় করবে ততক্ষণ শাহেনশা নবাব বাহাদুরকে কনক ব'লে ভাববে না, নিজেকেও বেগম সাহেবা দৌলত্উন্নিশা ব'লেই ভাববে—সেখানেই ওর কৃতিত্ব। ও যে ভুল করতে পারে না সে আমি জানি।…

[হাসতে হাসতে ছবির বেগম সাহেবা দৌলত্উন্নিসার বেশে প্রবেশ।]

ছবি। ওগো, চিত্তারমহিষী রেণুকাবালা, 'পার্ট' মুখস্থ করবার এখন আর সময় নেই, রাণাসাহেব অরণ্যে রোদন করছেন—তাঁর দুঃখ ঘোচাওগে এইবার।

রেণুকা। (বইটা বন্ধ ক'রে আবার খুলে এস্তে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে) এই যা, সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আর যা 'প্রম্‌টিং'—এক-বর্ণও যদি তার কানে যায়। চঞ্চলদা, এ'সিন্'টা তুমিত 'অফ্' আছ, এইটা একবার ধর না গিয়ে, নইলে সত্যি বলছি…

[চঞ্চল, কমল ও রেণুকার প্রস্থান]

সুলেখা। (ছবিকে কাছে টেনে নিয়ে) কথায় কথায় অমন কনকদার গলা জড়িয়ে ধরিস্ কি ক'রে বল্ ত? দর্শকদের নিষ্ঠুর দৃষ্টির দিকে একবারও চেয়ে দেখেছিস্ কি?

ছবি। (হেসে) কেন দেখব না? কিন্তু দর্শকদের ত দেখা উচিত, বেগম সাহেবা দৌলত্উন্নিসা শাহেনশা নবাববাহাদুরের গলা জড়িয়ে ধ'রে প্রেমের অভিনয় করছে। ছবি আর কনক এর মধ্যে নেই! গোটা-তিনেক 'সিন্'ত আমরা বেগমসাহেবা আর নবাব-বাহাদুর সেজে কাটিয়েছি, ধর এখন যদি আমরা ঠিক সেই সেই 'সিন্'ই আবার ছবি ও কনক সেজে পুনর-ভিনয় করি তো দর্শকরা আমাদের কি ব্যবস্থা করে, ভাবতে পার?

সুলেখা। তা ত' পারি, কিন্তু এর পরে কাগজে যখন এ নিয়ে কথা উঠবে তখন—?

ছবি। পাগল না ক্ষ্যাপা? এ নিয়ে কথা উঠতেই পারে না। আর যদি ওঠেই তো উঠবে যে বেগমসাহেবা ও নবাব বাহাদুরের অভিনয় খুব 'নেচার্যাল্' হ'য়েছে। অভিনয় ব'লে এটা হবে স্বাভাবিক, আর ছবি ও কনকের জীবনের সত্যিকার ঘটনা হ'লে এটা যেমন হতো অস্বাভাবিক—তেমনি হতো অন্যায়। আমাদের দর্শকদের দৃষ্টি এমনি খারাপ যে, তারা নকলটাকে স্বাভাবিক ভাবতে শিখেছে কিন্তু আসলটাকে তারা অস্বাভাবিকতা ভাবে,—এমন কি ওর জন্যে শাস্তি-বিধানও ক'রে থাকে। কাজেই বিধান যাদের এমনি তাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোই হ'লো বিধি।

[কনকের শাহেনশা নবাব বাহাদুরের বেশে প্রবেশ]

কনক। সুলেখা,…শীগ্‌গির্……চঞ্চল 'উইঙ্‌স্' ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। আগের দৃশ্য শেষ হ'লো ব'লে।

সুলেখা। (আয়নার সামনে গিয়ে কপালের চুলগুলো হাত দিয়ে যথাস্থানে সরিয়ে দিয়ে) এই ত যাচ্ছি।

(প্রস্থান।)

ছবি। এর পরের দৃশ্যেই ত হত্যা, না কনকদা? যাই, ছোরাটা ঠিক ক'রে রাখিগে! [প্রস্থানোদ্যম]

কনক। (ছবির হাত ধ'রে বাধা দিয়ে) এত তাড়া কিসের ছবি? অভিনয়ের যেটুকু বাকী থেকে যাচ্ছে...

[ছবির হাত ছাড়িয়ে হাসতে হাসতে প্রস্থান]

(হেসে) এও ত অভিনয়, ছবি!

[কনক 'ড্রেসিং টেবিলে'র সামনের চেয়ারটায় ব'সে আয়নার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো। একটা 'পাউডার পাফ' দিয়ে মুখের উঠে-যাওয়া 'পেণ্টটা' ঠিক ক'রে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের 'রয়াল্ ড্রেস'টা খুলে আলনা থেকে আর একটা 'রয়াল ড্রেস' তুলে প'রে আবার আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। নিজের পরিচ্ছদ দেখে তার ভারী হাসি পেল। ছবি চ'লে যাওয়ার সঙ্গে অগ্রমঞ্চ ভেবে পিছনের পর্দাটা ফাঁক ক'রে দিয়ে যাবে। দর্শকদের চোখে পড়বে—বৃহৎ রঙ্গমঞ্চের অলিন্দের দৃশ্য। যুবরাজ আমন্ (চঞ্চল) ও ইরাণী (সুলেখা)—ইরাণী পাশে দাঁড়িয়ে, আর যুবরাজ অলিন্দের উপরে ব'সে। ইরাণীকে আমন্ যাতে সহজে স্পর্শ করতে পারে তেমন তফাৎ তাদের মধ্যে।]

আমন্। ইরাণী, তোমার ঐ আঙুর-পেশা ঠোঁটের মাঝে আমি সিংহাসন অধিকারের স্বপ্ন ডুবিয়ে দিয়েছি। তুচ্ছ সাম্রাজ্য, তুচ্ছ তার জয়-পরাজয়,...আমি চাই ইরাণের বৃন্তচ্যুত একটি গোলাপে অধিকার মাত্র।

ইরাণী। যুবরাজ, ভবিষ্যৎ দিল্লীশ্বরের এই সামান্য কামনা? কিন্তু দাসী ইরাণী আজ তাও মেটাতে অক্ষম: যুবরাজ, শাহেনশা নবাববাহাদুর বেগমসাহেবা দৌলত্-উন্নিসার প্রেমবিমুগ্ধ কুরঙ্গ—আর এই দৌলত্-উন্নিসা যে অজমীর মহিষী যোধাবাঈ, ছদ্মবেশে দিল্লীশ্বরের সর্ব্বনাশের স্বপ্ন দেখছে, তার খবর কিছু রাখ'?

আমন্। হা, হা, ইরাণী, দৌলত্-উন্নিসা যোধাবাঈ? অসম্ভব। যার প্রেমের অচলা কীর্ত্তি একদিন ভারতের আকাশে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তার প্রেমে সন্দেহ! তুমি কি পাগল হ'লে ইরাণী?

ইরাণী। পাগল আমি, না যুবরাজ তুমি?

আমন্। সত্য ইরাণী, যুবরাজ আসল পাগল। (হাস্যসহকারে) পাগ্লামিই তার কীর্ত্তি হ'য়ে থাক ইরাণী—সে সিংহাসনের বিনিময়ে যা চেয়েছে তাই তুমি তাকে পেতে দাও।

[আমন্ ইরাণীকে ধরতে গেলে ইরাণী চমকে পিছিয়ে গেল]

ইরাণী। যুবরাজ, ঐ শোন দিকে দিকে আজ উৎসবের নহবৎ বাজছে। শাহেনশা'র মৃত্যুলগ্নে এ যে ভারী নিষ্ঠুর পরিহাসের মত শোনাচ্ছে। যাও, যদি সাধ্য থাকে তো এ উৎসবের স্রোতমুখ বন্ধ ক'রে দাওগে'। আর বেগমসাহেবা দৌলত্-উন্নিসাকে নবাবজাদার আলিঙ্গন থেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে এসো... ...পারবে?

আমন্। পারব না ইরাণী? প্রেমের আলিঙ্গনে যদি মৃত্যু আসে তো সেও বাঞ্ছনীয়। তোমাকে আলিঙ্গনে ঘিরে মৃত্যু কেন, ইরাণী......

[ছবি, রেণুকা ও কমলের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে কালো পর্দাটার ফাঁক জোড়া লেগে দর্শকদের দৃষ্টি থেকে বৃহৎ রঙ্গমঞ্চটা স'রে যাবে।]

ছবি। সুলেখা সমস্ত মাটি ক'রে দিলে একেবারে। চঞ্চলদার 'ইমোশন'গুলো ফুটে ওঠবার মোটেই সুযোগ পাচ্ছে না। অথচ তার ওপরেই আমাদের আজকের সমস্ত 'সাক্সেস্' 'ডিপেণ্ড্' করছে।

কনক। কিন্তু কি করা যাবে, এখন আর উপায় নেই।

কমল। (একটা চেয়ারে ব'সে) ছবি, এর পরের দৃশ্যেই কিন্তু তোমার 'ক্লাইম্যাক্স্' মনে থাকে যেন।

ছবি। (ওড়্নার নীচে থেকে একটা ছোরা বের ক'রে সকলের চোখের সামনে তুলে ধ'রে) 'ক্লাইম্যাক্স্' ত বহুক্ষণ আগেই তুমি 'রীচ্' করিয়ে দিচ্ছিলে কমলদা! কী ভাগ্যিস্, ছোরাটা খুঁজে পাওনি, পেলে বোধ হয় 'স্টেজে'র মধ্যেই ছুঁড়ে দিতে? কেমন, দিতে না?

কমল। (হেসে) সবাই বললে 'মার্ডার্ সিন্,' আমিও ভাবলাম তাই বুঝি। কাজেই ত অত ঘাব্ড়ে গিছলাম। কেন, গতবারের 'প্লে'র কথা মনে নেই? এই রেণু কি কাণ্ডটাই না করলে।

রেণুকা। যাও, সে বুঝি আমার দোষে হ'য়েছিল?

কমল। তবে কার দোষে শুনি? হা, হা, হা,

খুন, ভীষণ খুন হ'য়ে গেল, তবু এক বিন্দু রক্ত গড়ালো না। হ্যাঁ, 'মারভার' বটে।

রেণুকা। (সলজ্জভাবে) আমি কি করব। 'স্পঞ্জ'টা কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ বিলম্ব করাও তখন আর চলে না।

কমল। (হেসে) 'রঙ্গদর্শনে' কেতকীদা ভারী সুন্দর 'কমেণ্ট' করেছিল কিন্তু।

ছবি। (মুখ টিপে হেসে) তোমার 'কমেণ্ট'টুকু মনে আছে কমলদা?

কমল। (হেসে) মনে নেই আবার! সে কি আমি ভুলতে পারি কখনও। (গম্ভীর কণ্ঠে) "রেণুকা-বালার অভিনয়ের চমৎকারিত্ব দর্শকদের যেমন মুগ্ধ করেছে, তেমনি তার রক্তহীন খুনের 'ম্যাজিক'ও অবাক ক'রে দিয়েছে। জানিনা তরুণ ডাক্তার চঞ্চলকুমার তার 'নার্ভ' জানে ব'লেই রক্ত দেখা তার পক্ষে নিষেধ আছে কিনা। আমাদের অনুমান যদি সত্য হয় তো তরুণ ডাক্তারকে সে জন্যে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অভিনয়ের মৃত্যু—সহ্য হয়, মানুষের মৃত্যু সহ্য করা যায় না। অবশ্য, রেণুকাবালার 'নার্ভ' অত কাঁচা ব'লে যদিও আমাদের ধারণা নেই।"

ছবি। (হাসতে হাসতে 'ড্রেসিং টেবিলে'র পাশে গিয়ে একটি 'স্পঞ্জ' তুলে নিয়ে তাতে একটি শিশি থেকে আল্‌তা ঢালতে ঢালতে) কমলদা, তুমি যে দেখছি হুবহু মুখস্থ ক'রে রেখেছ একেবারে।'

রেণুকা। (রাগ ও ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে) তা আর রাখবে না! কিন্তু মৃত-সৈনিক সম্বন্ধে 'রঙ্গদর্শন' কি বলেছিল শুনি?

কমল। (হেসে) হুঁ, বলেছিল, (গম্ভীর কণ্ঠে) "মৃত-সৈনিকের যে প্রাণ আছে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। উক্ত ভূমিকার অভিনেতা যে প্রতিভাবান তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা চলে। মৃতের মাঝে প্রাণসঞ্চার—প্রতিভার পরিচয় বই কি! তাঁর ক্রমোন্নতি আমরা আশা করি।"...(মৃদুহেসে) আমার আর অপরাধ কি, পিঁপড়ে বাহিনী হঠাৎ যে ভাবে আমাকে আক্রমণ ক'রে বসল তাতে প্রাণের পরিচয় না দিয়ে আর উপায় কি! [সকলের উচ্চহাস্য]

কনক। (হাসি থামিয়ে) উন্নতিও কিছু হ'য়েছে বই কি! এবার তাই জীবন্ত সৈনিক।

কমল। (হেসে) বলি, চিতোরমহিষী রেণুকবালা, এ অধম সৈনিক তোমার যদি না থাকতো তো এত দিনে কবে ঐ শাহেনশা নবাববাহাদুরের অন্তঃপুরের শোভা বাড়াতো।

[রেণুকা লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে রইলো। ছবি ও কনক হেসে উঠল।]

ছবি। আর চিতোরমহিষী রেণুকাবালার অধম সৈনিক কমলদাকে তাহ'লে আমরা নবাববাহাদুরের অন্তঃপুরের প্রহরী রূপেই পেতাম।

[রেণুকা রাগ ক'রে উঠে চ'লে গেল। আর সেই সঙ্গে 'রঙ্গদর্শনের' সম্পাদক কেতকীভূষণ প্রবেশ করলো। তার পশ্চাতে এ'লো চায়ের 'ট্রে' হাতে একটা চাকর। কেতকীভূষণের গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, পরনে খদ্দরের কাপড় ও গলায় খদ্দরের চাদর। চাকরটার সাধারণ চাকরের বেশ হ'লেই চলবে। চাকরটা গোল টেবিলের ওপর চা'য়ের 'ট্রে' রেখে চ'লে গেল।]

কনক। এই যে কেতকীদা যে, এস, বস। (কনক উঠে কেতকীভূষণকে একটা চেয়ারে বসিয়ে) সত্যি, কেমন হ'চ্ছে কেতকীদা! দর্শকের অভিমত কি?

কেতকী। তা তারা ত ভালই বলচে। এখন কথা হ'চ্ছে, সুলেখার 'প্লে' একটু লাইফ্‌লেস্‌' হ'য়ে পড়চে। কোথায় যেন ওর বাধচে। কোথায় যে ওর অভাব তা সবাই ধরতে না পারলেও ত্রুটিটুকু সবারই চোখে পড়চে। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলের—'ইমোশন'গুলো পূর্ণতা পাচ্ছে না। ছবির কিন্তু খুব ফল্‌টলেস্‌ প্লে হ'চ্ছে।

ছবি। (কেতকীর কাছে এগিয়ে এসে) এখানে ত কত কিছুই ব'লে যাচ্ছে, কাল কাগজে টিপ্পনি কাটতেও ত ছাড়বে'না।

[রেণুকার প্রবেশ।]

কেতকী। তা না হ'লে কাগজ কাটবে কেন!

ছবি। (রেণুকার দিকে চেয়ে হেসে) আচ্ছা কাল রেণুর সম্বাদ কি লিখবে শুনি?

রেণুকা। কি আবার লিখবে?

কেতকী। লিখবো বই কি, লিখবো, রেণুকাবালার চিতোরমহিষীর ভূমিকায় অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়েছে। সত্যি, ওর কোন ত্রুটি এখনও আমাদের চোখে পড়েনি।

রেণুকা। (সগর্ব্বে) এবার পড়তেও দেব না, তা জেনো।

কনক। ওদিকে চা যে যায়, সবাই আরম্ভ কর। কই কেতকীদা তুলে নাওনা একটা কাপ।

রেণুকা। (কেতকীর হাতে একটা কাপ তুলে দিয়ে নিজে একটা কাছে টেনে নিয়ে) ঘুষের মর্য্যাদা রেখো, কেতকীদা। কাল ছবিদি'কে আচ্ছা ক'রে ঠুকে দিও ত, ও ভারী দেমাকে, তখন ও বুঝবে।

কেতকী। (মুখ টিপে হেসে) আমাকে আর কষ্ট ক'রে লিখতে হবে না, দর্শকরাই মনে মনে বুঝবে। কনকের অতখানি লাভ তাদের চোখে সইবে কেন!

[সারঙ্গ-হাতে নর্ত্তকীর বেশে রেবার প্রবেশ।]

ছবি। এই যে এতক্ষণ কোথয়ে ছিলে রেবাদি?

রেবা। কি করব ভাই, শিপ্রা লোক পাঠিয়ে ধ'রে নিয়ে গেছ্‌ল। তার সঙ্গে ব'সে এতক্ষণ গল্প করছিলাম। সে যে তোর খুব বাহবা দিচ্ছে। শিপ্রার সঙ্গে তার স্বামীও দেখতে এসেছে। সে কিন্তু শিপ্রার সঙ্গে মত দিতে পারচে না। সে বলে, অভিনয় ভাল হ'লেও শীলতার হানি হ'চ্ছে।

ছবি। (সহজ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে) তবে যে শুনেছি শিপ্রার স্বামী বিলেতফেরৎ ছোক্‌রা 'ব্যারিষ্টার'।

রেবা। সবই সত্যি, কিন্তু মনের যা পরিচয় পেলাম তাতে ত মনে হয় বৃদ্ধ 'মোক্তার' [সকলের হাসি]

রেণুকা। তবু যে পেস্কার ক'রে ছাড়েনি রেবাদি, এ তার বহু পুরুষের ভাগ্যি বলতে হবে।

রেবা। নিশ্চয়।

ছবি। শিপ্রা এখানে এলোনা কেন, রেবাদি?

রেবা। বলতে পারিনা। তবে ওর আসবার ইচ্ছে ছিল, এটুকু বেশ বোঝা গেল। ওর দেবতাটির এসব পছন্দ হয় না ব'লেই হয়ত। ভদ্র-ঘরের মেয়েদের 'স্‌টেজে' নামা সম্বন্ধে তার ঘোরতর আপত্তি আছে, বিশেষ পুরুষের সঙ্গে।

ছবি। শিপ্রাও ত একদিন আমাদের এই দীপালি-সঙ্ঘের 'মেম্বর' ছিল, সেও ত একদিন আমাদের সঙ্গেই 'স্‌টেজ' নেমেছে। শিপ্রার স্বামী-রত্নটি কি সে সব খবর রাখে না?

রেবা। রাখে বই কি!

ছবি। তবে জেনে শুনে হঠাৎ শিপ্রাকেই আবার বিয়ে করল কেন?

রেবা। কি জানি। আচ্ছা, আর এক সময় ও নিয়ে কথা হবে।

[নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি]

যাই ভাই, ঐ ঘণ্টা বেজে গেল, সিন্ উঠছে—নবাবজাদার আসন্নমৃত্যুর গানখানা গেয়ে দিয়ে আসি।

[রেবার প্রস্থান ও সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল ও সুলেখার প্রবেশ]

চঞ্চল। (ক্ষিপ্তস্বরে) কারও যদি একটু কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে। এ যেন 'ফার্স' হ'চ্ছে। কোথায় রেবা সারঙ্গ-হাতে ক'রে ব'সে থাকবে তারপরে ধীরে ধীরে 'সিন্' উঠবে—তা না, আগে থাকতেই 'সিন্' তুলে ব'সে আছে। কারও একটু 'এফেক্ট' জ্ঞান যদি থাকে! কনক…(হঠাৎ কেতকীকে দেখে) বা, তুমি কতক্ষণ এলে কেতকীদা?

কেতকী। এইত মিনিট কয়েক হবে।…আজ তোর এমন হ'চ্ছে কেন বল্‌তো চঞ্চল? পার্টটাও অবশ্য এক-ঘেয়েমিতে ভরা, তা হ'লেও আর একটু…

[সুলেখার সকলের অলক্ষ্যে প্রস্থান]

চঞ্চল। কি করব, আমি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও 'লাইফ্' দিতে পারছি না।

কমল। 'রেস্‌পন্সের' অভাবেই হয়ত…

কেতকী। 'এক্‌জ্যাক্ট্‌লি'—

কনক। (চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে)

বাঃ, সুলেখা কোন্ ফাঁকে স'রে পড়ল? না, তাকে ডেকে তার 'ডিফেক্ট'-গুলো ব'লে দিলেই ত হয়।

চঞ্চল। না, এখন আর হয় না। শেষে 'নার্ভাস্' হ'য়ে গেলে সমস্তই মাটি হ'য়ে যাবে।

রেণুকা। ছবিদি বাদে কে এখনও 'নার্ভাস্' হ'য়ে বাকী আছে শুনি?

কমল। (গম্ভীরকণ্ঠে) চিত্তোরমহিষী।

রেণুকা। যাও, ঠাট্টা ক'রো না কমলদা'।

ছবি। ('ড্রেসিং টেবিলে'র সামনে এসে 'পাউডার-পাফ্' দিয়ে মুখের 'পেইন্ট' ঠিক ক'রে নিতে নিতে মুখ টিপে হেসে) সামান্য সৈনিকের এতদূর আস্পর্দ্ধা, মহিষী? এখনও বামপদাঘাতে ওর শির ধূলোয় লুটিয়ে দাওনি?

কমল। হায় বেগমসাহেবা! শাহেনশা নবাবজাদা আর ছদ্মবেশী শয়তানীর সম্বন্ধ? এ হ'চ্ছে মহিষী আর তার দীনতম সৈনিকের পবিত্র সম্বন্ধ…আস্পর্দ্ধা তাই ক্ষমার যোগ্য।

কনক। (হাস্যসহকারে উঠে দাঁড়িয়ে) ঘোর অরাজকতা!…ছবি, ওদিকে সময় হ'লো কিন্তু।

ছবি। (ত্রস্তে ছোরাটা কোমরবন্ধনীতে গুঁজে 'স্পঞ্জ'টা হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে এসে কেতকীর চোখের সামনে অলক্তকরঞ্জিত 'স্পঞ্জ'টা তুলে ধ'রে) কেতকীদা' এ আর রক্তহীন খুনের 'ম্যাজিক' নয়।

[সকলে রেণুর দিকে ফিরে হাসতে লাগলো। কনক ও ছবির প্রস্থান]

কেতকী। তবে উঠি, চঞ্চল। ছবির 'ক্লাইম্যাক্স্ সিন্'টা দর্শকদের মাঝে ব'সে দেখাই ভাল।

চঞ্চল। তার দেরী এখনও। 'সিন্ সেটিং' হ'তে হ'তে এক কাপ চা খেয়ে যেতে পারবে'খন, ব'স একটু। ডাকি। [প্রস্থানোদ্যম।]

কেতকী। (চঞ্চলের গতিতে বাধা দিয়ে) আর থাক্। এক 'কাপ' ত এসেই হ'য়েছে। এখন উঠি।

[প্রস্থান]

রেণুকা। ওটি একটি পাকা কসাই। ওকে আবার চা দিয়ে আপ্যায়িত করা কেন বাপু। কারও প্রশংসা করতে হ'লেও এমন ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে সাতঘাটের জল এক ক'রে এমন সাজাবে যে, কার বাবার সাধ্যি তা থেকে ভাল-মন্দ বেছে নেয়।

চঞ্চল। তা'হ'লেও আমরা ভদ্রতা করতে ছাড়ি কেন?

রেণুকা। তা ঠিক, শনিদেবতাকেই বেশী ক'রে সিন্নি দিতে হয়।

চঞ্চল। ঠিক তাই।

[সকলের প্রস্থান। ক্ষণিকের জন্য রঙ্গমঞ্চ শূন্য ও নিস্তব্ধ। একটি চাকরের প্রবেশ ও চায়ের 'কাপ'গুলো 'ট্রে'তে সাজিয়ে নিয়ে নীরবে প্রস্থান। এক মিনিটের জন্য রঙ্গমঞ্চে আবার সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করবে। তারপরে সারঙ্গ হাতে রেবার প্রবেশ। একপাশে সারঙ্গটা রেখে কালো পর্দাটা দুপাশে টেনে ফাঁক ক'রে দিয়ে এক কোণে একটা চেয়ার টেনে দিয়ে তাতে ব'সে বৃহৎ রঙ্গমঞ্চের দিকে নীরবে চেয়ে থাকবে। পর্দাটা ফাঁক হ'তেই দর্শকদের নজরে পড়বে বৃহৎ রঙ্গমঞ্চে একটি সোফায় নবাববাহাদুর আসীন। সম্মুখে একটি ছোট টেবিলে একটা ফুলদানিতে ফুল ও পাশে একটি পেয়ালা-চাপা-দেওয়া সুরাপূর্ণ পানাধার। নবাবের পশ্চাদ্দিক দিয়ে বেগমের প্রবেশ। মুখে অস্ফুট ক্রূর হাসি।]

নবাব। (ক্ষিপ্তের মত দৌলতউন্নিসাকে কোলের কাছে টেনে বসিয়ে জড়িতকণ্ঠে) দৌলত, শাহেনশা তোমার দাস, না—শাহেনশার তুমি দাসী?

দৌলত্। (নীরবে হাস্য)।

নবাব। দৌলত্, উত্তর দাও। হা, হা, তুমি কি কি ভাবছ—এ উন্মাদের প্রলাপ? অসম্ভব দৌলত্, শাহেনশা আজও উন্মাদ হ'তে শেখেনি। রাজ্যে আজ প্রশ্ন উঠেছে, প্রজাদের সন্দেহ জেগেছে, শত্রুপক্ষ নাকি সুযোগ খুঁজছে। তাও কি সম্ভব দৌলত্,—আমি রাজকার্য্য অবহেলা করছি?

দৌলত্। শাহেনশা, সম্ভব বই কি। রাজকার্য্য অবহেলা না করলে রাজ্যের এত বড় দুঃসংবাদ এতক্ষণ কানে এসে পৌঁছুতো নিশ্চয়ই।

নবাব। দুঃসংবাদ?

দৌলত্। ঘোরতর দুঃসংবাদ শাহেনশা। যুবরাজ

কুমার বাহাদুর আমন্ একটা সামান্যা ইরাণীবালার প্রেম-মুগ্ধ হয়ে তাকে নিয়ে দেশত্যাগী হয়েছে।

নবাব। কে, কুমার আমন্?

দৌলত্। হাঁ শাহেনশা, কুমার আমন্।

নবাব। ইরাণবালা?

দৌলত্। হাঁ শাহেনশা, ইরাণবালা। তা। বাপ এদেশে এনেছিল আঙ্গুর বেচতে।..দুঃসংবাদ নয় কি? (ঠোঁট চেপে মৃদু হাস্য)।

নবাব। হা, হা, হা,…(সোফায় এলিয়ে প'ড়ে) দৌলত্, গলা যে আমার শুকিয়ে উঠ্‌চে, (পাত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে) পাত্রে এই কি আছে, দেখ, ঢাল… গলা আমার ভিজিয়ে নিই দৌলত্। (দৌলত উঠে নবাবের মুখে পেয়ালা থেকে সন্তর্পণে সুরা ঢেলে দিতে) দৌলত্, দৌলত্, আমি কি উন্মাদ? ইরাণবালার প্রেমমুগ্ধ কুমার আমন্…হা, হা, হা,…তুমিও কি উন্মাদ নও দৌলত্?

দৌলত্। আমরা সবাই উন্মাদ শাহেনশা, শুধু নবাবজাদা…

নবাব। (বিকৃত হাস্যে) দৌলত্, হা, হা,…তুমিও নবাবকে চাটুবাক্যে ভোলাতে চাও, চমৎকার পরিহাস কিন্তু!

দৌলত্। পরিহাস নয় শাহেনশা।

নবাব। পরিহাস নয়? (অবিশ্বাসের বিকট হাস্য)।

[সুলেখার পশ্চাতে সামান্য বেগে চঞ্চলের প্রবেশ। কালো পর্দাটার খানিক তাদের প্রবেশে সঙ্গে মিশে গিয়ে দর্শকদের দৃষ্টি থেকে বৃহৎ রঙ্গমঞ্চটা আড়াল ক'রে দেবে।]

রেখা। (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে) আঃ, এমন দৃশ্যটাও দেখতে দিলে না।

[দ্রুত প্রস্থান]

চঞ্চল। সুলেখা, আমার 'লাইফ্‌লেস্ এ্যাক্‌টিং'-এর জন্যে দায়ী আজ একমাত্র তুমি। কনক আজ আমাকে অনায়াসে ছাপিয়ে যাচ্ছে। তোমার সামান্য একটু ত্রুটিতে—

সুলেখা। আমি পারব না চঞ্চলদা'। তোমার 'সাক্‌সেস্' যদি একান্তই কাম্য, তবে এখনও সময় আছে, অন্য কাউকে আমার ভূমিকায় নামাও।

চঞ্চল। তুমি কেন পারবে না সুলেখা? মুহূর্তের জন্যে নিজেকে ইরাণী ভাবতে পার না, আমাকে যুবরাজ আমন্ ভাবতে পার না?

সুলেখা। না পারি না, চঞ্চলদা'।

চঞ্চল। আমাদের এই রূপের, ভাষার, আবহাওয়ার এত পরিবর্ত্তন সত্বেও?

সুলেখা। পরিবর্ত্তন?

চঞ্চল। হাঁ সুলেখা। তুমি ইরাণীর বেশ করেছ, আমি যুবরাজ আমনের—এ কি পরিবর্ত্তন নয়?

সুলেখা। তবু আমি সুলেখা চঞ্চলদা', আর তুমি সেই চঞ্চলকুমার…

চঞ্চল। (কপালে হাত দিয়ে উত্তেজিতভাবে) না, না, সুলেখা, আজকের এই একটি রাতের জন্যে তুমি ইরাণী আর আমি যুবরাজ আমন্।

সুলেখা। (নীরবে হাস্য)।

চঞ্চল (সুলেখাকে ধরতে যাওয়া ও সুলেখার পিছিয়ে যাওয়া, তারপরে হতাশভাবে একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে) সুলেখা, তুমি যদি একবারও ভেবে দেখতে আজকের অভিনয়ের সাফল্য কি ভাবে তোমার মুখ চেয়ে আছে। তুমি যদি একবারও ভাবতে এর সামান্য ত্রুটিও আমাকে কি ভাবে আঘাত করচে।

সুলেখা। সমস্তই ভাবতে পারি চঞ্চলদা' কিন্তু তবু আমার উপায় নেই।

[নেপথ্যে তীব্র করতালি]

চঞ্চল। (চমক খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) এই শোনো সুলেখা,…কিসের এ করতালি অনুমান করতে পার? এসো, দেখে যাও।

[চঞ্চল ত্রস্ত পর্দাটার এক ধারি একপার্শ্বে সরিয়ে ধরল। সুলেখা ফিরে একপাশ হ'য়ে দাঁড়ালো। চঞ্চলের পর্দা সরানোর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে পড়বে বৃহৎ রঙ্গমঞ্চ, সেখানে একটি সোফার যোধাবাঈয়ের বেশে সজ্জিতা রবির কোলে মাথা রেখে নবাব মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে, বুক দিয়ে তার রক্ত গড়াচ্ছে, আর যোধাবাঈয়ের হাতে রক্তাক্ত শাণিত ছোরা। কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে

কম্পমান। যোধাবাঈ এক দৃষ্টিতে সেই রক্তাক্ত ছোরার দিকে চেয়ে আছে। মুখে তার নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তি, হয় ত ভয় মিশ্রিত দুর্বোধ্য হাসি। যোধাবাঈ কাঁপতে কাঁপতে নবাবের মস্তকে গোলাপ নামিয়ে দিয়ে বিকট হাস্যে উঠে দাঁড়ালো। তারপরে হাতের ছোরা ঘৃণায় দূরে নিক্ষেপ করে মাটি থেকে দৌলত-উন্নিসার পরিচ্ছদটা হাতে তুলে নিয়ে সেটাকে চোখের সামনে তুলে ধ'রে আবার সেই দুর্বোধ্য উন্মত্ত হাসি।]

যোধাবাঈ।···এতদিনে তৃপ্ত হলো তবে যোধাবাঈ। (হঠাৎ মৃত নবাবের দিকে ফিরে] বেগম সাহেবা দৌলত-উন্নিসা···হা, হা, এই রক্তে তার স্মৃতি ধুয়ে যাক্ ভারতের ইতিহাস হ'তে···(হাতের পরিচ্ছদ দারুণ ঘৃণায় নবাবের দেহের উপর নিক্ষেপ)।

[চঞ্চল পর্দা ফেলে দিল। দর্শকদের দৃষ্টির বাইরে দৃশ্য ক্রমকে স'রে গেল। শোনা গেল করতালি ও প্রশংসা-কোলাহল।··· চঞ্চল টলতে টলতে একটা চেয়ারে এসে ব'সে পড়ল। গোল টেবিল থেকে কাঁচের ফুলদানিটা হাতে তুলে অন্যমনস্কভাবে আবার সেটাকে টেবিলে রাখতে গিয়ে সেটা নীচে প'ড়ে ভেঙ্গে গেল। সুলেখা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সেখানে নীচু হয়ে ব'সে অতি সন্তর্পণে কাঁচের টুক্‌রোগুলো তুলতে লাগলো।

[কমলের দ্রুত প্রবেশ]

কমল। চঞ্চল, ও কিসের শব্দ হলো? (সুলেখার দিকে চেয়ে) ও কি, ফুলদানিটা ভেঙে গেল বুঝি?

সুলেখা। হ্যাঁ, কমলদা'। চাকরটাকে একবার ডেকে দাও না, কাঁচের টুক্‌রোগুলো বাইরে ফেলে দিয়ে আসুক।

[কমলের হেসে প্রস্থান]

ছি, চঞ্চলদা', কি আরম্ভ করলে বল ত'? কমলদা পর্য্যন্ত হেসে চ'লে গেল। যা সম্ভব নয় তার জন্যে উতলা হয়েই বা করবে কি,—শুধু লোক হাসানোই সার হবে। আজ যদি আমাদের হাতে অভিনয়ের মৃত্যু হয়ত' হোক্ না। একদিন 'দীপালি' সঙ্ঘের অভিনয়ে প্রাণ দিতেম আমরাই, আজ না হয় আবার তার মৃত্যুর কারণও হব আমরাই। তাতে বিশ্বের ত কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।

চঞ্চল। আর আজ যদি আমরা অভিনয়কে প্রাণবন্ত ক'রে তুলি, তাতেই বা বিশ্বের ক্ষতি কি সুলেখা?

সুলেখা। বিশ্বের ক্ষতি হোক্ বা নাই হোক্ চঞ্চলদা', আমার ক্ষতি আছে।

[চাকরের প্রবেশ]

হরিদাস, এই কাঁচের টুক্‌রোগুলো বাইরে ফেলে দিয়ে আয়তো।

[স্থানচ্যুত চেয়ারটাকে যথাস্থানে রেখে সুলেখার হাত থেকে কাঁচের টুক্‌রোগুলো নিয়ে হরিদাসের প্রস্থান]

চঞ্চল। (হতাশভাবে) তুমি ভুল করছ, সুলেখা। তোমার কোন ক্ষতি নেই।

সুলেখা। আছে চঞ্চলদা', সে আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না।

চঞ্চল। ক্ষতি থাকলে অবশ্যই বোঝাতে পারতে, কিন্তু ক্ষতি নেই ব'লেই বোঝাতে পারবে না। তুমি যে ভয় করছ সে ভয়ত' ছবিরও আছে, কিন্তু সে তো অভিনয়ের মুখ রক্ষা করতে সে দিকে একেবারেই দৃক্‌পাত করে নি, তবে তুমিই বা কেন······?

সুলেখা। ছবির কথা আমি জানিনা, কিন্তু আমার কথা আমি বলতে পারি···আমার উপায় নেই।

[রেবা, কনক ও ছবির প্রবেশ]

রেবা। (সোল্লাসে) 'সিম্‌প্লি বিউটিফুল' চঞ্চলদা'। ছবি এবার সবার ওপরে টেক্কা দিলে। যাক্, ফাঁকতালে কিন্তু কনকদা'ও নামটা কিনে নিলে।

কনক। ফাঁকতালে বই কি। (ছবির দিকে চেয়ে হেসে) কি ছবি, ফাঁকতালে নাকি? (রেবার দিকে ফিরে) বেশত', ওই বলুক না।

ছবি। ফাঁকি দিয়ে কিছুই হয় না রেবাদি'। দর্শকদের নজরকে ফাঁকি দেওয়া বড় চারিটিখানি কথা কিনা।

সুলেখা। বাঃ, এই ত কিছুক্ষণ আগে তুই নিজেই বলছিলি যে, দর্শকদের ফাঁকি দেওয়া ভারী সোজা। এখন আবার সুর বদ্‌লালি কেন?

ছবি। (মৃদু হেসে) তা না বল্‌লে উপায়?

এই দেখনা কিছুক্ষণ আগেই ছিলাম বেগম সাহেবা দৌলত্ উন্নিসা তার মুহূর্ত্ত পরেই হ'লাম যোধাবাঈ, তার মুহূর্ত্ত পরেই তোমাদের কাছে আমি যে ছবি সেই ছবিই। মুহুর্মুহু যাদের এমন রূপ বদ্‌লায় তাদের ধারণা যে আরও দ্রুত বদ্‌লাবে তাতে আর বিস্মিত হবার কি আছে, সুলেখাদি'?

রেবা। সত্যি চঞ্চলদা', ছবির হঠাৎ দৌলত্ উন্নিসা থেকে যোধাবাঈ-এ রূপান্তর এমন 'এফেক্‌টিভ্' হয়েছে যে কি বলব। দর্শকদের হাততালির ধুম যদি একবার দেখতে।

চঞ্চল। না দেখলেও কানে এসে সে শব্দ পৌঁছেচে। ছবির অভিনয়ের কৃতিত্ব আমাকে সত্যি প্রকাশের অতীত আনন্দ দিচ্ছে। বাকী অংশটা যদি আমরা সবাই ওর সম্মান রাখতে পারি তবেই ··

রেবা। সবাই এবার কিন্তু বেশ উৎরে গেছে। রেণুকে নিয়েই তো আমাদের সব চেয়ে বেশী ভয় ছিল, কিন্তু রেণুর 'নার্ভ' এ পর্য্যন্ত একটুও 'ফল্' করেনি। ওর 'প্লে' ও খুব স্বাভাবিক হচ্ছে বলতে হবে।

চঞ্চল। (হেসে) আরও হয়ত ভাল হতো যদি প্রম্পটিং'—

ছবি। (হেসে) আচ্ছা রোগ ওর যাহোক্, কেবল 'প্রম্পটিং' আর 'প্রম্পটিং'। ও প্রত্যেকবার 'ষ্টেজ' থেকে বেরিয়ে এসে সুরেশদা'র ওপর যে তম্বিটা করে দেখলে হাসি পায়। এই মারে তো এই মারে আর কি ·· যত দোষ যেন সুরেশদা'র 'প্রম্পটিং'-এর। [সকলের হাসি]

কনক। (ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে) আঃ, বাঁচা গেল। এতক্ষণ নবাব বাহাদুর ত নয়, যেন জেলেপাড়ার সং-বাহাদুর সেজে ছিলাম। (গায়ের রয়্যাল-ড্রেস্‌টা খুলতে খুলতে) বাপ্ রে, আমিত ভেবে পাই না যে নবাব-বাহাদুরা'এ 'ড্রেস্' পরতো কি ক'রে। আমিত এরই মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছি। আঃ, হরিদাসটা কোথায়? কাপড়-চোপড় প'রে এখন একটু আরামের নিশ্বাস ফেলা যাক্।

সুলেখা। কিন্তু চমৎকার মানিয়েচে তোমাকে কনকদা'।

কনক। (মৃদু হেসে) মানানোটা কি কম্‌প্লিমেন্ট্? এক্ষেত্রে সুলেখা?

সুলেখা। নিশ্চয়, কেন না?

কনক। (টেনে টেনে হেসে) কিন্তু আজও দু'বেলা সন্ধ্যাহ্নিক না ক'রে জল স্পর্শ করি না, 'দুর্গা' স্মরণ না ক'রে বাড়ীর চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াই না, হাঁচি-টিক্‌টিকি সবার চেয়ে একটু বেশী ক'রেই মানি, টিকি বন্ধু-বান্ধবদের জ্বালায় বার বার খোয়া গিয়ে এখন না হয় ভয়ানক ভাবেই একেবারে সাবধান হ'য়ে গেছি— তা'হলেও পুজোর ফুল বিল্লিপত্তর এখনও মাথায় তুলি ;— এ সব সত্ত্বেও কম্‌প্লিমেন্ট্? রক্ষে কর, কি ভাগিস্, মা 'প্লে' দেখতে আসেন নি, তা'হলে বাড়ীতেই হয় তো ঢুকতে পেতাম না।

ছবি। সত্যি পেতে না।

কনক। (চাপা হাসি হেসে) তাতেও তো ক্ষতি ছিল না। 'ব্যালান্স' তো দু'দিকেই সমান ছিল।

[সকলের হাসি। কনক 'ড্রেস'টা আলনার উপর ছুঁড়ে ফেলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।]

ছবি। (সলজ্জভাবে ঢাকবার চেষ্টা ক'রে) ওদিকে কোন্ দৃশ্য হ'চ্ছে সে খেয়াল কারু আছে? চঞ্চলদা', ওদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে সব খোঁজ খবর রাখ'চ' না, শেষে কোথায় কি হ'তে যে কি হ'য়ে যাবে!

চঞ্চল। (ঈষৎ চমকে) সত্যি, যাই দেখি গে।'

[চঞ্চল ও রেবার প্রস্থান]

সুলেখা। (একটা চেয়ারে ব'সে ও ছবিকে পাশের একটায় বসিয়ে) ছবি, আমার এখন মনে হচ্ছে, এমন বই 'প্লে' না করলেই হতো। লাভ সিন বাদ দিয়ে 'ড্রামা' হয় না? যাতে 'লাভ সিন্' একেবারেই নেই সে রকম কিছু হলেই ভাল হতো।

ছবি। ভাল হতো বুঝলাম কিন্তু তা যখন হয়নি তখন যা অভিনয় করতে নেমেছি তাতে প্রাণসঞ্চার করতে হবে তো?

সুলেখা। নিশ্চয়, কিন্তু কেন যে পারছি না, তা···

[হরিদাসের পশ্চাতে সুলেখার মা তারাদেবী ও সুলেখার মাসতুতো ভাই উদয়ের প্রবেশ। উভয়েরই দর্শকের বেশ। তাদের প্রবেশ করতে দেখে সুলেখা ও ছবি উঠে দাঁড়ালো।]

তারাদেবী। এই যে, ছবি যে। ভারী চমৎকার অভিনয় হচ্ছে তোর। (সুলেখার দিকে ফিরে) ও একলাই সমস্ত দর্শকদের মাত ক'রে রেখেছে। রেণুর অভিনয়ও ভালই হ'চ্ছে বলতে হবে। কনকের অভিনয়ও বেশ ভালই হ'য়েছে। চঞ্চল কিন্তু তেমন সুবিধে ক'রে উঠতে পারচে না, ওর গলা হঠাৎ কেমন ধ'রে গেছে···

ছবি। কাকীমা, এই চেয়ারটায় আগে বসো, তা'পর যা বলতে হয় বল।

তারাদেবী। তা এতক্ষণ ত ব'সেই ছিলাম, মা। এই···এই···হাঁা, ঐ কাবুলি সৈনিকটা কে বল তো?··· কমল বুঝি?

সুলেখা। মা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো না ঐ চেয়ারটায়। (বসলে পর) হাঁা, কমলদা'ই বটে, তেমন বিশেষ কিছু 'পার্ট' না থাকলেও অভিনয় ওঁর চমৎকার হ'চ্ছে।

তারাদেবী। তা সত্যি।

ছবি। উদয়, অমন হাঁ ক'রে চেয়ে আছিস্ যে, চিন্‌তে পাচ্ছিস্ না বুঝি?

উদয়। (ছবির কাছে এগিয়ে তার একটা হাত ধ'রে) হুঁ, চিন্‌তে পারব না কেন? আমি তোমাকে 'ষ্টেজে' ঢুকতে দেখেই চিনেছি। মা'ই বরং চিনতে পারেননি।

তারাদেবী। না ছবি, সত্যি ও তোদের চিনতে পারেনি। ব'লে দিলেও ও বিশ্বাস করেনি। (উদয়ের দিকে ফিরে') এখন আবার বাহাদুরি নেওয়া হ'চ্ছে!

উদয়। (লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে রইলো)।

সুলেখা। (উদয়কে কাছে টেনে নিয়ে) আমাকেও চিনতে পারিস্ নি উদয়?

উদয়। না, অত ভাল ক'রে সাজলে আবার চেনা যায় বুঝি কখনও?

[সকলের হাস্য। উদয়ের সমবয়সী মোহিতের রাজপুত-যুবরাজের বেশে দ্রুত প্রবেশ।]

মোহিত। ছবিদি, শীগ্‌গির, সুরেশদা তোমাকে একবার ডাকচেন। সৈনিকের অভাবে সুরেশদাকেই 'ষ্টেজে' নামতে হবে। এসো, শীগ্‌গির, একটু 'প্রম্‌পট' ক'রে দিয়ে যাও।

[বেগে প্রস্থান]

ছবি। আসি তা'হলে, কাকীমা।

[প্রস্থান]

সুলেখা। মা, তোমরা ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলে কেন বল ত?

তারাদেবী। সত্যি সুলেখা, তখন অতটা ভেবে দেখিনি। এখন দেখছি নির্মলকে সঙ্গে না আনাই সব চেয়ে বুদ্ধির কাজ হ'তো। ছবির অভিনয় দেখে ও এতদূর ক্ষুণ্ণ হয়েচে যে, বলবার নয়। এমন কি মাঝে মাঝে ওর মুখ দিয়ে ঘৃণায় 'ছি ছি'ও বেরিয়ে এসেছে। আর সত্যি ছবির অতটাই কি উচিত হ'য়েচে, তবে অভিনয় ব'লেই আমরা যেটুকু ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু নির্মল কোনমতেই ছবিকে ক্ষমা করতে পারচে না। ও বলে, হ'লোই বা অভিনয়, এতখানি অসংযম প্রকাশ করা তা ব'লে কোন নারীর পক্ষেই গৌরবের বিষয় নয়। ছবির ওপর একদিন আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু আমার শ্রদ্ধার ভিত্তি ও আজ টলিয়ে দিয়েচে।···সুলেখা, আমার সত্যি ভয় হ'চ্ছে। একদিন নির্মলের মুখেই এই তোদের 'দীপালি'-সঙ্ঘের মেয়ে-পুরুষের একত্র অভিনয়ের কত প্রশংসাই না শুনেছি, কিন্তু আজ একটি রাতের মধ্যেই ও হঠাৎ একেবারে পাল্টে গেছে। ছবির অভিনয়ে নির্মল এতদূর মর্ম্মাহত হ'য়েচে যে, ও উঠে চ'লে যাচ্ছিল, শুধু আমি ওকে কোনরকমে ধ'রে রেখেচি বললেই হয়। আর একটু হ'লেই দর্শকদের সামনে ও একটা যা-তা কাণ্ড ক'রে বসতো আর কি।

সুলেখা। কেন, ধ'রে রাখতে গেলে মা, চ'লে গেলেই ত' ভাল হ'তো।

তারাদেবী। না, ভাল হ'তো না সুলেখা। একবার এসেছে যখন তখন শেষ পর্য্যন্ত ওর দেখে যাওয়াই ভাল। নইলে শেষে ছবির অভিনয়ের সঙ্গে তোর না-দেখা অংশটাকে হয় ত কল্পনায় মিল খাইয়ে নেবে। তাহ'লে যে কি দাঁড়াবে সেত' তুইও ভাবতে পারিস্, সুলেখা।

সুলেখা। সেই ভাল হ'তো মা, সেই ভাল হ'তো। আমাদের বিয়ে যদি অমনি একটা কারণে ভেঙে যেত তো আমি খুশীই হ'তাম। এ যেন তোমরা আমার বুকে দশমণ পাথর চাপিয়ে রেখেছ—আমি প্রাণ খুলে আজকের অভিনয় কিছুতেই যোগ দিতে পারচি না!

তারাদেবী। সুলেখা, আজকে একটা রাতের অভিনয়ের কৃতিত্বের চেয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নারীর জীবনে অনেক বেশী কাম্য। ক্ষণিকের আনন্দে এ অভিনয়ের কৃতিত্বের অবসান, কিন্তু ভবিষ্যৎকে দুঃস্বপ্নের মত দুঃসহ ক'রে লাভ নেই। আজকের অভিনয়ের কৃতিত্বে যদি তোর ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হতো তো সমস্ত কিছু অস্বীকার ক'রে তা লাভ করাই হ'তো তোর একমাত্র লক্ষ্য, কিন্তু ভাগ্যচক্রে আজ যখন উল্টোদিকেই তোর জীবনের পাথেয় তখন অভিনয়ের পাথেয়—অভিনয়ের মৃত্যু তোকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সহ্য করতেই যে হবে, সুলেখা!

সুলেখা। আমার হাতে অভিনয়ের মৃত্যু হ'তে এখনও কিছু বাকী আছে, মা?

তারাদেবী। সে আমি জানি, সুলেখা। দর্শকরা সবাই তোর নিন্দে করচে তাও সত্যি, কিন্তু আর এক দিনের সাফল্য তোর এই ক্ষণিকের ব্যর্থতাকে অনায়াসেই ভোলাতে পারবে—এ আমি বিশ্বাস করি। নির্ম্মল রূপে-গুণে-ঐশ্বর্য্যে বংশে-বিদ্যায় যে কোন তরুণীর কাম্য। নির্ম্মলকে স্বামীরূপে পাওয়া···

সুলেখা। থাক মা, সে সব কথা আর কেন? তোর রূপ-গুণ-বিদ্যায় আমি কোনদিন সন্দেহ প্রকাশ করিনি, তার কিছুই আমি কোনদিন শুনতে চাইনি,···তোমাদের কামনা পূর্ণ করতে আমি সব কিছু খোয়াতে রাজী আছি, সে তো ভালো ক'রেই আমি তোমাদের ব'লে দিয়েছি, মা।

তারাদেবী। সুলেখা, জীবনের একদিকে আমরা যা খোয়াই, অপর দিকে আবার তা পূর্ণভাবেই ফিরে যাই। অনেক সময় ক্ষতির চেয়ে লাভের অংশটাই হয় বেশী! জীবননাট্যের এক দৃশ্যে ব্যর্থতা আর এক দৃশ্য সাফল্য-মণ্ডিত হয়···নইলে, দুনিয়া হ'তো একটা মস্ত পাগলা-গারদ।

সুলেখা। (নীরবে চিন্তানত হ'য়ে রইলো)।

তারাদেবী। সুলেখা!

সুলেখা। (চম্‌কে উঠে) যাই মা, আমার এ দৃশ্যে বোধ হয় 'এ্যাপিয়ারেন্স' আছে।

তারাদেবী। (উদয়ের হাত ধ'রে উঠে দাঁড়িয়ে) আমরাও যাই সুলেখা। কিন্তু সুলেখা···আমার ভারী ভয় হ'চ্ছে কেন জানিনে। দেখিস্, আমাদের মুখ রাখিস্।

[সুলেখার প্রস্থান।]

উদয়। (সবিস্ময়ে) ছোড়্‌দিকে ভারী মানিয়েছে কিন্তু মা, ও যেন ইরাণ দেশেরই মেয়ে।

তারাদেবী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব হ'য়েছে, এখন চল্।

[উদয়ের প্রস্থান। মুহূর্ত পরেই চঞ্চল ও ছবির প্রবেশ। চঞ্চল ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে যুবরাজের পরিচ্ছদ খুলে ফেলল। ছবি আলনা থেকে একটি তরুণ ইরাণের বেশ তার হাতে তুলে দিল।]

চঞ্চল। (বেশ পরতে পরতে) বেশপরিবর্ত্তনের কথা এতক্ষণ আমার মনেই ছিল না। আর একটু হ'লে যুবরাজের বেশেই তো 'সেটেজে' ঢুকে পড়তাম। তা হ'লেই চমৎকার হ'তো আর কি!

ছবি। (হেসে) তা আর বলতে!

[চঞ্চলের প্রস্থানোদ্যম]

আঃ, কি যে কর চঞ্চলদা, নূরটা খুলে রেখে যাও। তোমার ও বেশের সঙ্গে নূরটা মোটেই খাপ খায় নি।

চঞ্চল। (আয়নার সামনে আবার এসে দাঁড়িয়ে) সত্যি, ঠিক কথাইত'। (নূরটা খুলে 'ড্রেসিং টেবিলে'র ওপর রেখে) এইবার মানিয়েচে তো?

ছবি। হাঁ, এইবার যেতে পার।

[চঞ্চলের বেগে প্রস্থান]

(চিন্তিত ভাবে) চঞ্চলদা আর সুলেখাদি'র কি যে হ'লো আজ, বুঝি সমস্তই মাটি হ'য়ে যায়।

[ছবির প্রস্থান। প্রস্থানের সঙ্গে কালো পর্দাটা ফাঁক ক'রে দর্শকদের সামনে বৃহৎ রঙ্গমঞ্চটা প্রকাশ ক'রে দিয়ে যাবে। বৃহৎ রঙ্গমঞ্চে শুভ্রপ্রান্তরে ইরাণী ভূমিতে আসীন। তার পশ্চাদ্দিক দিয়ে একটি ফলের ঝুড়ি হাতে যুবরাজ আমনের ছদ্ম ইরাণের বেশে প্রবেশ।]

আমন্। ইরাণী!

ইরাণী। (সচকিতে) যুবরাজ!

আমন্। (ফলের ঝুড়ি ইরাণীর সামনে রেখে পাশে ব'সে) হা, হা, ইরাণী, তোমার ইরাণ দেশের মেয়েরা বুঝি এমনি ক'রেই ব্যঙ্গ করে? আজও তুমি ভুলতে পারলে না যে, আমি যুবরাজ নই? কেন, আমাকে কি তুমি মুহূর্ত্তের জন্যেও তোমাদের ইরাণদেশের কোন ক্ষুদ্র বালক ব'লে ভাবতে পার না? আমার বেশের দিকে চেয়ে দেখ ইরাণী—আমি যুবরাজের শেষ পরিচয়ও তো মুছে ফেলেছি। তবু আমি তোমার সেই যুবরাজ ...... হা, হা, হা.... আচ্ছা ইরাণী, শৈশবে কি তোমার কোন ইরাণবালকের সঙ্গে ভাব ছিল না?

ইরাণী। ছিল, কিন্তু তার কথা কেন জিজ্ঞাসা করচো যুবরাজ?

আমন্। হা, হা, আবার সেই যুবরাজ! না, তার কথা জানতে চাই না। আচ্ছা ইরাণী, ইরাণদেশের ছেলেদের কি নাম হয় তা আমাকে বলতে পার?

ইরাণী। (চিন্তা ক'রে) না যুবরাজ, সে আমি বলতে পারব না। তবে আমার যতদূর মনে পড়ে,— আমার ছেলেবেলার এক সাথী ছিল, তাকে সবাই চন্‌মন্ ব'লে ডাকত।

আমন্। (সোল্লাসে) চন্‌মন্?

ইরাণী। হাঁ, চন্‌মনই বোধ হয়।

আমন্। (সাগ্রহে ইরাণীর কাছে যেতে ইরাণী পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই তার পিঠের ওপর একটা হাত রেখে) চন্‌মন্! চমৎকার নাম, ইরাণী। আজ থেকে আমাকে তোমার সেই ছেলেবেলার সাথী চন্‌মন্ ব'লেই জেনো, ইরাণী। আমি সাম্রাজ্যের স্বপ্ন পশ্চাতে ফেলে এসেছি, ইরাণী, তুমি তোমার পশ্চাতে ফেলে আসা স্বপ্নকে আবার নূতন রূপে সামনে তুলে ধরবে শুধু এই আশায়।

ইরাণী। ..(মুখে ভয় ও বিষাদ এবং তা দমনের ব্যর্থ চেষ্টা)।

[রেবা ও ছবির প্রবেশ এবং কালো পর্দাটা তাদের প্রবেশের সঙ্গে পড়ে গিয়ে দর্শকদের দৃষ্টি থেকে বৃহৎ রঙ্গমঞ্চটা স'রে যাবে।]

ছবি। (একটা চেয়ারে ব'সে) সুলেখা সমস্ত মাটি ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু এখন যে কোন উপায়ই নেই রেবাদি।

রেবা। (আর একটা চেয়ারে ব'সে) সত্যি, ওরা যে এমন করবে তা কে জানত।

[নেপথ্যে ভীষণ করতালি ও প্রশংসা-কোলাহল।]

ছবি। (উভয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে শুনে') বলা যায় না রেবাদি,' চঞ্চলদা শেষ মুহূর্ত্তেও হয়ত' বা অভিনয়ে প্রাণ সঞ্চার ক'রে ছাড়তে পারে। ওর আশ্চর্য্য ক্ষমতা। শুধু 'রেসপন্সে'র অভাবেই যেটুকু ..

রেবা। সে আমিও বিশ্বাস করি।

[রেণুকার দ্রুত প্রবেশ।]

রেণুকা। ছবিদি, বড় যে অহঙ্কারে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলে। এইবার দেখে যাও—কথায় বলে না, ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে। এ একেবারে তাই ছবিদি', ...'সিম্‌প্লি গ্র্যাণ্ড্'।

ছবি। (কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ ক'রে) বলিস্ কি রেণু! আমি ত' ভাবছিলাম, দর্শকরা চিত্তোরমহিলার 'নার্ভ'কে চাঙ্গা রাখবার জন্যেই হাততালি দিচ্ছে।

রেণুকা। (সগর্ব্বে) কিন্তু আজ চিত্তোরমহিলা একটুও 'নার্ভাস্' হ'য়েছে বলতে পার'? এমন কি কেতকীদার মত সর্ব্বদেশে সম্পাদকও সে কথা বলতে পারেনি।

[নেপথ্যে করতালি ও কোলাহল।]

ঐ শুনতে পাচ্ছ ছবিদি? হঠাৎ হাওয়া ঘুরে গেছে

চঞ্চলদা' আর সুলেখাদি তোমার কৃতিত্বের অবসান ঘটিয়ে ছাড়ল ব'লে।

ছবি। সত্যি ?

রেণুকা। ঠাট্টা নয়, ছবিদি! চঞ্চলদা এ দৃশ্যে 'পারফেক্‌শন্ রীচ্ ক'রে' যেতেও পারে!

(প্রস্থান। নেপথ্যে করতালি ও কোলাহল।)

রেবা। সত্যি, রেণুর কথাইত ঠিক ছবি! হাওয়া যে অসম্ভব রকম ঘুরে গেছে। দর্শকদের করতালি শুনতে পাচ্ছিস্ ?—এ যেন অনেকটা মাতালের হল্লার মত শোনাচ্ছে।

ছবি। এমন যে হবে—এ আমি জানতাম, রেবাদি'। চঞ্চলদা একজন 'ট্রু আর্টিষ্ট'—ও মুহূর্ত্তে নিজেকে আমাদের মত তুণ-শূন্য ক'রে ফেলে না। শিল্পীর চূড়ান্ত সংযমের ও একটি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। দর্শকের সস্তা হাততালির জন্মে চঞ্চলদা আমাদের মত নিজেকে সর্ব্বত্র নিঃশেষে দান ক'রে বসে না। সেইখানেই ওর শিল্পী-প্রাণের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

[তারাদেবীর উত্তেজিত ভাবে প্রবেশ]

তারাদেবী। (রেবা ও ছবিকে লক্ষ্য না ক'রে স্বগতঃ) ছি, ছি, এতকালের সভ্য মানুষের মাঝে আজও সেই তার আদিম বর্ব্বরতা সুপ্তই আছে।

ছবি ও রেবা। (উঠে দাঁড়িয়ে) কাকী মা!

তারাদেবী। (পূর্ব্ববৎ স্বগতঃ) আমি খুশীই হ'য়েছি, তবু ওর অন্তরের পরিচয় পেলাম।

ছবি। কাকী মা, তোমাকে যে ভারী উত্তেজিত দেখাচ্ছে!

রেবা। (তারাদেবীর কম্পিত একটা হাত ধ'রে) কাকী মা, উত্তেজনায় তোমার সারাদেহ ভীষণ কাঁপচে। ঐ চেয়ারটায় ব'সে তা'পর যা বলতে হয় বল।

তারাদেবী। (চেয়ারে ব'সে) রেবা, মানুষ যে মুহূর্ত্তে আবার তার অতীত বর্ব্বরতার মাঝে ফিরে যেতে পারে—এ ধারণা সত্যি আমার ছিল না। নির্ম্মলের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও যে মুহূর্ত্তে এমনি ক'রে পায়ের তলায় মাড়িয়ে অনায়াসে নিজেকে নগ্ন ক'রে তুলতে পারে—এ এক মস্ত বিস্ময় রেবা! আমি স্বচক্ষে না দেখলে তোমাদের বিশ্বাসই করতেম না।

ছবি। কার কথা বলচ, কাকী-মা? হাতীবাগানের ছোক্‌রা জমীদার নির্ম্মলবাবুর কথা? সুলেখাদি'র সঙ্গে যার বিয়ের কথা চলছিল?

তারাদেবী। কথা চলছিল না ছবি, কথা পাকাপাকিই হ'য়ে গিছল।

ছবি। সত্যি? সে কি আমাদের অভিনয় দেখতে এসেচে আজ?

তারাদেবী। এসেছিল, আবার চ'লেও গেছে।

ছবি। বাঃ, সে কথা কই আমাদের ঘুণাক্ষরেও তো জানতে দাও নি, কাকী মা?

[নেপথ্যে করতালি ও কোলাহল]

তারাদেবী। না দিয়ে ভালই করেছি ছবি।

[চঞ্চল ও সুলেখার প্রবেশ। সুলেখা তারাদেবীর দিকে একটা চকিত দৃষ্টি ফেলে ড্রেসিং টেবিলের সামনের চেয়ারটায় গিয়ে বিমর্ষভাবে ব'সে পড়ল। তারাদেবী অপাঙ্গে সুলেখার গতি ও মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে উঠে দাঁড়ালো। আর সকলের মুখে নির্ব্বাক-বিস্ময়।]

(সুলেখার সামনে এগিয়ে) সুলেখা, মানুষ চেনা ভারী শক্ত···নির্ম্মল বর্ব্বরতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে চ'লে গেছে! দর্শকদের সামনে আমার মাথাটিকে পর্য্যন্ত সে অবনত ক'রে দিয়ে গেছে।

সুলেখা। (আয়নায় মুখ নিবদ্ধ রেখেই সচেষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে) আমাকে যে সে এত সহজে মুক্তি দেবে তা আমি ভাবিনি কোনদিন। তার এ মহানুভবতার জন্মে চিরদিন আমি তার কাছে ঋণী হ'য়ে থাকব; আমি খুশীই হয়েছি, মা!

তারাদেবী। আমিও খুশী হ'য়েছি সুলেখা! নির্ম্মলের পরিচয় পেলাম চঞ্চলের অভিনয়ের ভেতর দিয়ে। চঞ্চলকে আজ আমার প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ করতে ইচ্ছে করছে সুলেখা! চঞ্চলের আজকের রাতের অভিনয় জীবনে তোর মস্ত আশীর্ব্বাদ। (হঠাৎ চঞ্চলের দিকে ফিরে) চঞ্চল, তোর অভিনয়ের কৃতিত্ব আজ দর্শকদের হাততালিতে প্রকাশ পায়নি, প্রকাশ পেয়েচে এক জনকে

ছবিওয়ার মধ্যে। আমার আশীর্ব্বাদের বহু উর্দ্ধে স্থান আজ (কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো) !

[কমলের দ্রুত প্রবেশ]

কমল। রেবা, ওদিকে যে সর্ব্বনাশ হ'তে বসেছে—'ষ্টেজ' শূন্য প'ড়ে আছে। শীগ্‌গির একখানা যা হয় গান গেয়ে সময়টা কাটিয়ে দাও। রেণুর হঠাৎ 'নার্ভ সিক' করেছে,—সে ষ্টেজে প্রায় পা বাড়িয়ে ফিরে এসে ওপাশের 'গ্রিনরুমে' ব'সে হাঁপাচ্ছে...রীতিমত 'প্যাল্‌পিটেশন্' সুরু হ'য়ে গেছে।

রেবা। (সাশ্চর্য্যে) বল কি কমলদা ?

কমল। সত্যি, শীগ্‌গির উঠে এস। [প্রস্থান]

ছবি। চঞ্চলদা, শুনেছ, কমলদা কি ব'লে গেল ?

[ছবি ও রেবার দ্রুত প্রস্থান]

চঞ্চল। (একটি চেয়ারের ওপর হাতের ভর রেখে) সে আমি জানতাম কাকী-মা, তোমরা খুশীই হবে। নির্ম্মলের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের, কিন্তু তার সত্য পরিচয় তোমাদের কাছে দেবার সুযোগ আমার কোনদিন হয়নি। আজকের এত বড় সুযোগকে আমি তাই ব্যর্থ হ'তে দিইনি। আর এ ভিন্ন যে ভাবেই আমি নির্ম্মলের পরিচয় দিতে যেতাম তাতে তোমাদের সবার চোখে আমি ছোট ত হ'তামই, এমন কি, তোমরা তার অর্থও করতে অন্যরূপ। আজ যখন জানতে পেলাম নির্ম্মল আমাদের অভিনয় দেখতে এসেছে তোমার সঙ্গে, তখন কি যে আনন্দ পেলাম, ভাবলাম, জীবনে যে কথা বলতে পারিনি—সেই অকথিত বাণীর প্রতিধ্বনি আজকের অভিনয়ের মাঝে জাগিয়ে তোলার মধ্যেই আমার জীবনের কৃতিত্ব...আর তা জাগাতে পেরেছি জেনে নিজেকে আজ গৌরবান্বিত মনে করছি।...যে সূর্য্যের মুখ চেয়ে একদিন ফুল ফোটে সে সূর্য্যকে আড়াল ক'রে রাখলে ফুলের যা অবস্থা হয়, এক্ষেত্রে সুলেখারও ঠিক তাই হ'তো নাকি কাকী-মা ? অথচ, এ সহজ সত্যটা তোমাদের কারও চোখে একদিন ধরা পড়েনি। কিন্তু ও বুঝতে যাবে—এ আমি সহ্য করতে পারিনি। আমাকে আশীর্ব্বাদের ঊর্দ্ধে তুলে দিও না, কাকী-মা, বরং আমার একবার প্রাপ্য আজ আমাদের দু'জনার মাথায় একসঙ্গে তুলে দাও।

তারাদেবী। (চঞ্চলের কাছে এসে তাকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে তার মস্তকে আশিস-চুম্বন এঁকে দিয়ে) দস্যুবৃত্তি যার পেশা, সে কি আশিস চেয়ে নেয়, চঞ্চল ?

চঞ্চল। (সগর্ব্বে) না, চেয়ে তো নিই নি, ছিনিয়েই তো নিলাম, কাকী-মা।

তারাদেবী। (নীরবে হাস্য)

[রেবার প্রবেশ]

রেবা। চঞ্চলদা, রেণু খুব সামলে নিয়েচে কিন্তু। আর একটু হ'লেই সমস্ত মাটি হ'য়ে যেত আর কি ! হঠাৎ অকারণে মাঝখানে আমার গান গাওয়াটা কি যে বিচ্ছিরি হ'তো। কি ভাগ্যিস্, গাইতে হয় নি...এইবার চঞ্চলদা, শেষ রক্ষে ক'রে 'দীপালি'সঙ্ঘের মুখরক্ষে ক'রে আসতে দেখব।

চঞ্চল। (সগর্ব্বে) আচ্ছা, দেখে নিস্।

[সুলেখার পানে একটা আহ্বানের দৃষ্টি ফেলে চঞ্চলের প্রস্থান ও সুলেখার তদ্‌পশ্চাতে অনুগমন।]

রেবা। কাকী-মা, তোমার কি মনে হয়, 'খেয়ালী'-সঙ্ঘের চেয়ে আমাদের এবারকার অভিনয় ঢের ভাল হয় নি ?

তারাদেবী। (চেয়ারে ব'সে) এখনও শেষ হ'লো না, এরই মধ্যে মত দেওয়া কি ভাল হবে, রেবা ?

[নেপথ্যে করতালি ও হর্ষধ্বনি]

রেবা। হবে না কেন ? 'প্লে'র 'ক্লাইম্যাক্স্' তো ওঁদের হাতেই আছে।

তারাদেবী। তা'লেও, শেষ-বেশ ব'লে একটা কথা আছে যে।

রেবা। (হাসি)।

[নেপথ্যে করতালি ও হর্ষধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে ধুতি-পাঞ্জাবি গায়ে একখানা বইহাতে সুরেশের [illegible] প্রবেশ।]

সুরেশ। (বইখানা রাগে ছুঁড়ে নিক্ষেপ ক'রে) পারব না আমি 'প্রম্‌টিং' করতে। সব কিছুতেই ওর 'এক্‌টোক্রেসি' রকম সে—যা খুশী তাই ওরা করুক সে।

রেবা। কি হ'লো সুরেশদা, ব্যাপার কি?

সুরেশ। (রাগতঃ কণ্ঠে) আমি এক কথা ব'লে যাই তো—ওরা বলে আর এক কথা। এমন কি সুলেখা এক জায়গায় চন্দনের পরিবর্ত্তে চন্চলই ব'লে গেল। চমৎকার, এ যেন 'ফার্স'!—এ আমি জানতাম যে ওদের হাতেই আজকের অভিনয়ের মৃত্যু হবে।

[নেপথ্যে করতালি ও প্রশংসার হর্ষধ্বনি।]

রেবা। কি বলচো সুরেশদা, তবে ও হাততালি কিসের?

সুরেশ। (অধিকতর ক্রোধে) দর্শকগুলো যত কানা, ভাই।

রেবা। (মুখ টিপে হেসে) কানা নয় সুরেশদা,—যারা কানে শোনে না তাদের কালা বলে।

সুরেশ। ঐ.. ঐ…ঐ তাই। [প্রস্থান]

[নেপথ্যে ভীষণ করতালি ও হঠাৎ ম রূপ কোলাহলে তার সমাপ্তি। কিছুক্ষণ লোক-চলাচলের ভীষণ শব্দ। কল-কোলাহল ক্রমে শান্ত হ'য়ে এলো। সুরেশের উত্তেজিত ভাবে পুনঃ প্রবেশ।]

সুরেশ। 'ড্রপ্ সিন্' পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুলেখা 'ফেইন্ট' হ'য়ে গেছে, কাকী-মা!

তারাদেবী। অ্যাঁ, বলিস্ কি সুরেশ! (টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়ালো)।

রেবা। সত্যি, সুরেশদা?

[চঞ্চলের প্রবেশ]

তারাদেবী। (বিচলিতকণ্ঠে) চঞ্চল!

চঞ্চল। না, না, ও সামান্য…তেমন কিছুই না। আবার সে উঠে বসেছে। বড় বেশী ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল ব'লেই হয় তো। এখ্খুনি উঠে এলো ব'লে।

তারাদেবী। (মুখের দুর্ভাবনার ছায়া আবার মিলিয়ে যেতে চেয়ারে ধীরে ধীরে ব'সে) তবু ভাল।

[ক্লান্ত সুলেখাকে ধ'রে রেণুকা ও ছবির প্রবেশ এবং পশ্চাতে কনক (সাধারণ বেশে), কমল, কেতকীভূষণ, মোহিত ও আরো দু'চারজন দর্শকের প্রবেশ।]

ছবি। সুলেখাকে 'ড্রেসিং টেবিলের' সামনের চেয়ারটায় বসিয়ে দিয়ে) বাপ্ রে, যেভাবে আমাদের চমকে দিয়েছিলি!

সুলেখা। (ছবির পানে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসি)।

তারাদেবী। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমি যাই তবে চঞ্চল, উদয় হয়ত' আমার জন্যে গাড়ীতে অপেক্ষা করছে।

[প্রস্থানোদ্যত]

ছবি। আর একটু ব'সেই যাও না কাকী-মা, সুলেখাদি'ও তো তোমাদের সঙ্গেই যাবে? ওর একটু বিশ্রামের দরকার যে।

তারাদেবী। (ফিরে) চঞ্চল তো রইলো, ওই নিয়ে যাবে'খন। [প্রস্থান]

সুরেশ। ভাল কথা কেতকীদা, তোমার মত একজন চোস্ত ক্রিটিকের অভিমত তো এখনও শোনা হ'লো না।

কেতকী। (ভারিক্কি চালে) তা এবারকার অভিনয় একরকম ত্রুটিহীন হ'য়েছে বললেই চলে।

সুরেশ। (উচ্চহাস্য সহকারে) বলি, 'প্লে' দেখবার আগে বইটা একবারও পড়েছিলে?…কোথাও খাপছাড়া ঠেক্‌লো না? এমন কি, শেষের দিকেও না?

কেতকী। (চঞ্চলের দিকে ফিরে) হুঁ, ঠিক কথা চঞ্চল, শেষ দৃশ্যটা অমন সুন্দর ক'রে কে পাল্টেছে শুনি?

চঞ্চল। (সুরেশের দিকে চেয়ে হেসে) সুরেশদার অসীম কৃপায়। উনি ওঁর 'প্রম্পটিং'-এর সঙ্গে একটা কথা না মেলায় রাগ ক'রে বই ছুঁড়ে ফেলে উঠে গেলেন, ফলে আমাকে আর সুলেখাকে নূতন ক'রে শেষ দৃশ্যটা ঠেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রচনা ক'রে নিতে হলো। নাট্যকার মৃত তাই রক্ষে, নইলে এতক্ষণে হয়ত' এসে চুলের ঝুঁটি ধ'রে 'that the world is round' তা প্রমাণ ক'রে ছেড়ে দিতেন।

কেতকী। কখনো না। বরং, পুরানো 'এডিশন' পুড়িয়ে আর একটা নূতন 'এডিশনে'র বন্দোবস্ত করতেন।

সুরেশ। (বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে) হ্যাঁ, ভাই, ঠাট, আর কেতকীদার ভূমিকা হ'তো তার ললাটভূষণ, কি বল কেতকীদা?

কমল। (সুরেশ ও কেতকীর মাঝে দাঁড়িয়ে) Peace! Ho! বাজে কথা যত! (উচ্চকণ্ঠে) হরিদাস, হরিদাস, ও শর্ম্মারাম, চা আন্‌না রে, গলা যে শুকিয়ে সব বোশেখ মাসের মাঠ হ'য়ে গেল···

বহুকণ্ঠে। সাবাস!

[কোলাহল ও সবার পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ]

— যবনিকা —

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

সজল চোখের চপল হাসি

শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ

মম হিয়াতল করেছ উতল
নীরব ভাষার গানে,
ও দুটি চোখের সজল কাজল
লেগেছে আমার প্রাণে।
কী আঁখি তোমার! জল নেই তার,
বিস্ময়-ভরা মরি!
বরষা-সাঁঝের হাওয়ায় কাঁপানো—
তমালের মঞ্জরী।

অতি মনোহর অশ্রু-সায়র
নাচানো-হাসির ঢেউয়ে,
কান্না-হাসির মিলন-বাসর—
দেখেনি তো কভু কেউ এ!
ও দুটি আঁখির কূলে কূলে ভাসে
স্বপনের আলো-ছায়া,—
চাহনিটি ভরি' রেখেছ কি মরি
বোঝা-না-বোঝার মায়া!

মাধুরী-শিশির সিক্ত,—খোয়ানো
মিনতি-গলানো জলে,
নিখিলের আলো লুকানো ও দুটি
নয়নতারার তলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফিরিবার সময় কথায় কথায় হেমচন্দ্র বলিয়াছিল—'নিয়মিত কর্ষণে পতিত জমিতেও সোনা ফলে।'

প্রিয়নাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, সোনা ফলে কিনা একবার রীতিমত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

কিন্তু কেমন করিয়া?—প্রিয়নাথ তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বাটী পৌঁছিল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। ঘরে গিয়া দেখিল, জানালার কবাট খোলা, প্রতিমা জানালার ধারে নিশ্চলভাবে একা বসিয়া। ডাকিল "পাগ্‌লি"!

অমানিশায় চপলার হাসিতে গহন কাননস্থ পথিকের প্রাণ ভয়ে বিস্ময়ে ও আনন্দে যেমন চমকিয়া উঠে, প্রতিমাও তেমনই চমকিয়া উঠিল, চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। প্রিয়নাথ দেখিল, সেই হাসিমুখে বিষাদের ঘোর কালিমা, বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় তরুণ গাম্ভীর্য্য!

প্রিয়নাথ কতক্ষণ একদৃষ্টে মুখপানে চাহিয়াই রহিল। বুঝি ভাবিতে লাগিল,—সৌন্দর্য্যই যদি পৃথিবীর প্রাণ হয়, সৌন্দর্য্যময়ী রমণীই ত তবে ধরণীর শ্রেষ্ঠ রত্ন! সুন্দর যে তাহার সবই সুন্দর—মুগ্ধ মুখকমলের বিষাদ-রেখাও কি সুন্দর! আহা! এই সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যদি একটু আন্তরিকতা থাকিত!

আর প্রতিমা? প্রতিমা কেবল বিধাতার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছিল। বলিতেছিল,—প্রাণের দেবতা আবার যদি মিলাইলে বিধি, তুষ্ট করিবার উপকরণ দিলে কৈ? দেবতা চান বিপন্ন প্রাণের ভাষা। ভাষা ফুটে না কেন, ভগবন্? হীরা মুক্তা চাহি না, স্বর্ণের আশাও রাখি না, চাহি শুধু কথার বাঁধন, লজ্জা আসিয়া যেন মুখ চাপিয়া না ধরে! বিনিময়ে যাহা চাও তাহাই দিব, হৃদয়ের শোণিত চাও তাও স্বীকার। লজ্জার শাসন যেন এড়াইতে পারি।

প্রিয়নাথ আবার বলিল, "উত্তর দিলে না যে!"

প্রিয়নাথ ঘরে গিয়া দেখিল—জানালার কবাট খোলা, প্রতিমা জানালার ধারে একা বসিয়া।......প্রতিমা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল।

আন্তরিক প্রার্থনায় যে বলটুকু সঞ্চয় করিতেছিল, লজ্জার মুখে মুখে তাহার যে দুর্গাতত্ত্ব রচনা করিতেছিল, শব্দের ঝটিকায় তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। প্রতিমা এবারও নিরুত্তরেই রহিল।

নীরবতায় প্রিয়নাথ বিরক্ত হইল। প্রতিমা তাহা বুঝিল। কিন্তু বুঝিয়া কি ফল? ভাষা যে অবাধ্য! শুধু ভাবিল,—পতি দেবতা; দেবতা অন্তর্যামী শুনিতে পাই। মনোভাব বুঝেন না কি?

প্রিয়নাথ বিরক্ত হইয়াছিল বটে; বিরক্তি কিন্তু প্রকাশ করিল না—হেমচন্দ্রের কথামত সোনা ফলাইতে যে বদ্ধ-পরিকর। প্রতিমার মুখখানি বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল "এই বর্ষা-বাদলে কি ভাল লাগে, বল দেখি!"

সপ্তাহব্যাপী নিদাঘতাপদগ্ধ ধরিত্রীর ধূলিরাশি বারিপাতে যেমন গলিয়া যায়, প্রতিমাও যুগযুগান্তর পরে আদর সোহাগের আতিশয্যে তেমনই গলিয়া গেল। অন্তরের অন্তঃস্তলে কথার—ভাবের যেন এক বিপুল বিশ্ব সৃষ্ট হইল। সৃষ্টি হইল সংগোপনে—হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে; প্রকট হয় না কেন?

প্রতিমা মহা মুস্কিলে পড়িল। ভাসা ভাসা নয়নযুগল আনন্দ-হিল্লোলে কেবল কল্লোলিত হইয়া উঠিল।

কামনা-সর্ব্বস্ব প্রিয়নাথ কি বুঝিবে—কি মদিরা ঐ নয়নে। প্রতিদান-প্রয়াসী প্রাণ লইয়া কেমন করিয়া বুঝিবে, যাহার সীমা নাই তাহার ভাষাও নাই! বস্তুতঃ কূল ছাপাইয়া যে আনন্দ দেহ-মন প্লাবিত করে সে কি ভাষায় ধরা দেয়, না দিতে চায়!

রাগিনী যখন কড়ি হইতে কোমলে নামিল, আনন্দ উছলিয়া উঠিল, প্রাণের ভিতর অস্ফুট ভাবরাশির তখন একটা কলরব পড়িয়া গেল। সবাই আগে আসিতে চায়, একটাকে ধরিতে গেলে সবাই ছুটিয়া আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। লজ্জার বাঁধন খসিলেও কাজেই প্রতিমার আর বলা হইল না।

প্রিয়নাথ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ বলিলে না ত-কি ভাল লাগে?"

প্রতিমা এইবার বলিতে গেল "কি ভাল লাগে? কেন,: মরণ। এই স্নিগ্ধ-শীতল বুকের ভিতর এমনই করিয়া মাথা রাখিয়া মরণই সব চেয়ে ভাল।" কিন্তু অধরের অন্তঃপুরে কথা কয়টী বা দিতে না দিতেই শাশুড়ীর কুলিশ-কঠিন ভৎর্সনা কর্ণে পৌছিল!

বৃদ্ধা 'খাবারের ঠোঙা' সজোরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল "আঃ কপাল! আমি মরি সাত দেশ খুঁজে, কিনা খেয়ে রাজা করবেন তাই। তা' কে জানে, বাছা, সন্ধ্যে হতে না হতেই ঘরে ঢুকে সোয়ামীর কানে গুরুমন্তর দিচ্চে। তা ঢাল্ না ঢাল্ যত পারিস্ বিষ ঢাল্! আমার আর কি করবি? তিন কাল গিয়ে ত এই এক কালে ঠেকেছে—আর ক'টা দিনই বা!"

কন্যা লীলাবতীকে দেখিয়া সুর চড়িল—"আমি আর কি বা বলেছি! দিনরাত বাপের ভাবনা ভেবেই মেয়ে খুন। একটা বাপের জন্যে ত আর এত হয় না। তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেম, বলি, বাপ ক'টা গা? তা' আর মন্দ কথাটাই বা কি? ওদের ঐ স্বস্তিপুরে ত ঘরে ঘরেই এই। আমার ত আর জানবার বাকি নেই। সদু জুলেনীর কাছে সব শুনেছি।"

নিমিষে রামধনু ঘনঘোর মেঘে ঢাকিয়া গেল। জলমগ্ন ব্যক্তি তীরে উঠিবামাত্র সর্পদংষ্ট হইলে যেমন নির্ব্বাক নিস্পন্দ বিবর্ণ হয় প্রতিমাও ঠিক তেমনই বিবর্ণ হইল। ভাবহারা প্রিয়নাথ তাহা লক্ষ্য করিল না। মাতার রূঢ় বাক্যও তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। কাজেই আগ্রহভরে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল - "বলিলে না তবে কি ভাল লাগে?"

প্রতিমা নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে বলিল "আমার?—আমার? মরণই ভাল।"

"তবে তাই হোক্। জীবন্ত সমাধি! সেই ভাল।" —বলিয়াই প্রিয়নাথ দ্রুত চলিয়া গেল। প্রিয়নাথ এখন শুধু বিরক্ত নয়, ক্রুদ্ধ।

যাইতে যাইতে ভাবিল,—কোলে টানিতে যাই পিছলিয়া পড়ে, আপনার করিতে যাই পর ভাবে, মনের মত দেখিতে চাই উল্টা মূর্ত্তি ধরে! কেন? কেবল বৈরাগ্য, শুধু মৃত্যু-প্রার্থনা! কি হেতু? নৈরাশ্য হইতে বৈরাগ্যের উৎপত্তি, অশান্তি হইতে নৈরাশ্য—

অশান্তি দুঃখজাত। স্বামী-সুখে যে সুখী, এত দুঃখ, এত অশান্তি তাহার কেন? সুখী হইতে যে জানে না, সুখী করিতেও বুঝি সে শিখে না। না শিখুক, দুঃখ কল্পনা করিয়া লয় কেন? কাল্পনিক দুঃখে হাল্কা জীবন গুরুভারে পীড়িত করিয়া তুলে কেন? অজ্ঞতার দোহাই দেওয়া ত চলে না; সে নদীরও যে পার আছে। কিন্তু অবুঝ যে,—বুঝাইলে, বুঝিলেও যে না বুঝে সে নিবিড়ারণ্যে পথ নাই। মূর্খ আমি, পতিত জমিতে সোনা ফলাইতে গিয়াছিলাম। সোনা ফলিবে কি, অঙ্কুরোদ্গমই হয় না। জমি যে দূষিত, বিষাক্ত।
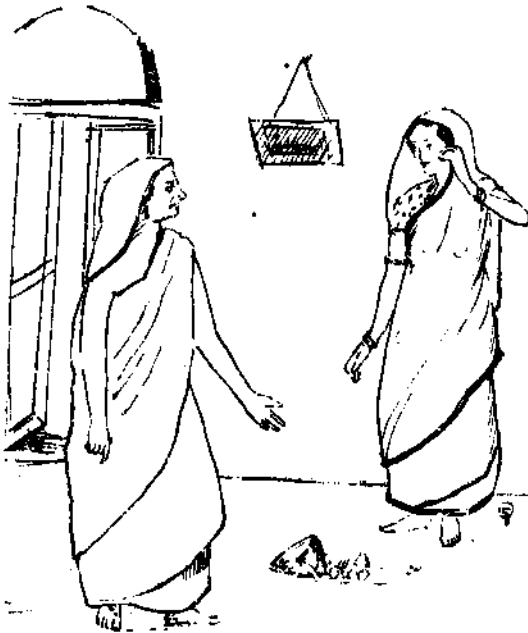
শাশুড়ী 'খাবারের ঠোঙা' সজোরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—আঃ কপাল! আমি ম'রি সাত দেশ খুঁজে, কিনা খেয়ে রাজা করবেন তাই।

দেবতা ছলিয়া গেলে যে অন্তর্দাহ, স্বামী চলিয়া গেলে প্রতিমাও তেমনই অনুতাপে পুড়িতে লাগিল। "হাতে পাইয়া আকাশের চাঁদ কেন হারাইলাম, হাতের লক্ষ্মী কেন পায় ঠেলিলাম, শাশুড়ীর গঞ্জনায় ইষ্ট দেবতার কেন অপমান করিলাম—হায়, হায়!"—প্রতিমা কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিল, আর ক্ষোভে দুঃখে পরিতাপে কাঁদিতে লাগিল।

হায় অভাগিনী! মনুষ্য-চরিত্রের খুটিনাটি কি বুঝিবে তুমি? কি বুঝিবে, ছেলের ছেলের ঝগড়া হইলে জননী রোরুদ্যমান নিজ সন্তানকেই কেন প্রহার করেন? কথা এই, ভালবাসার দাবি যেখানে ষোল-আনা, অভিমান বা অভিমানমূলক রোষের বিকাশ সেখানে পূর্ণমাত্রায়। শাশুড়ী গঞ্জনা দেন, ফলভোগ করে শাশুড়ীপুত্র—মান ভাঙ্গিতে স্বামীর প্রাণান্ত!

ঘোর বর্ষায় নিশীথে পুত্রকে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া বৃদ্ধা আগুন হইয়া উঠিল। সপ্তম সুরে প্রতিপন্ন করিল, ছোট-লোকের ঘরের মেয়ের জন্যই সংসারটা ছারখার হইতে বসিয়াছে। বলিল—"যা হোক্ জাঁহাবাজ মেয়ে! যেমন সেই পুতনা মা, তেমনি তার ছা। খাট দেবার কথা ছিল, সাতযুগ পরে দিল এক পালং। ভাল, তাতেও কথা কইনি। মেয়েটা কিনা এসে ক্রমে ক্রমে যেন আমার সোনার চাঁদকে পেয়ে বসলো—মাগী বুঝি কামিখ্যের ওষুধবিষুধ সঙ্গে দিছলো! দিন নেই, দুপুর নেই, কেবল গল্পের ঝুড়ি আর হাসিখুসি। যাক্, ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তাতেও টুঁ করি নি। কিন্তু এ সব কি কাণ্ড! ছেলেই না হয় পর হয়, তা' ব'লে মা ত আর পারে না। মিন্সেকে তখনই বলেছিলেম, খবরদার, অমন কাজ করো না, স্বস্তিপুরের গেঁছো মেয়ে ঘরে এনো না। যেমন কর্ম্ম তার তেম্নি ফল। নিজে জ্ব'লে পুড়ে মরেছে, আবার আমাকেও পুড়তে রেখে গেছে। তা আর ক'টা দিনই বা। এই ছটা মাস বৈ ত নয়। ডঙ্কা মেরে চলে যাব। গণক ঠাকুর যা বলেন তা' হুবহু ফলে।"

বৃদ্ধা এইবার বধূর দিকে চাহিল। দেখিল, ঔষধ ধরিয়াছে, চোখের জল মুখে টলটল। কাজেই নিরস্ত হইল, কন্যা লীলাবতীকে ব্যজন করিতে লাগিল।

সংসারে কেহ কাঁদিতে আসে, কেহ কাঁদাইতে আসে, তাহারও ভাগ্যে দুই ঘটে পর্য্যায়ক্রমে। বৃদ্ধাও একদিন কাঁদিয়াছিল যৌবনে, শাশুড়ীর গঞ্জনায়। সে যৌবন আর নাই, যৌবনের স্মৃতিটুকুও নাই। তা

থাকে না। দুঃখের স্মৃতি মানুষ সহিতে পারে না, সযত্নে মুছিয়া ফেলে। না থাক্, যে একদিন কাঁদিয়াছে সে পরকে কাঁদায় কেমন করিয়া, নিজের ব্যথা দিয়া পরের ব্যথা বুঝে না কেন?—প্রতিহিংসার উত্তেজনায়? কে জানে!

বুঝার এখন কাঁদাইবার পালা। প্রতিমা কাঁদিল। এমন নিত্যই কাঁদে—অজস্র কান্না। খাশুড়ীর গঞ্জনায় স্বামীর অবহেলায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া স্পন্দনে স্পন্দনে হৃদয়ের বাঁধন শিথিল হইতে শিথিলতর, এইবার বুঝি খসে! "আহা! তাই হোক্।" প্রতিমা বলিতেছিল "আহা! তাই হোক্! বাঁধ খসিয়াছে, নিত্যই খসিতেছে, এইবার ভাঙুক।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মন বেলোয়ারি বাসন—ভাঙিলে আর জোড়া লাগে না। প্রিয়নাথেরও লাগিল না।

ভাঙা মন লইয়া প্রিয়নাথ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, স্ত্রীকে তুষ্ট করিবে অন্ততঃ নিজ তুষ্টির জন্য। কিন্তু ভাঙা প্রাণে সহিষ্ণুতা কুলাইল না,প্রতিজ্ঞার মোহমন্ত্র ব্যর্থ হইল।

না হইবে কেন? হৃদয় যে তোষাখানা, তোষাখানায় সমুদয় ধনরত্ন এক নিশ্বাসে বিলাইয়া দাও, তুমি দেউলিয়া। দেউলিয়া হইলে অনুরাগের নিত্য-নূতন উপকরণ তোমার আর কোথায়? প্রণয়-সুধা পানের রসনা তোমার কৈ?

প্রিয়নাথ বুঝে নাই—শ্বেত পাথর জিনিষ সুন্দর বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে ভাস্কর যন্ত্র-সাহায্যে। শুধু ভালবাসিলেই হয় না, কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় তাহা শিখিতে হয়, শিখাইতে হয়।

প্রিয়নাথ তাহা শিখে নাই, শিখাইতেও পারে নাই। প্রণয়-ঘটিত হৃদয়ের যত ভাব একরাত্রে নিঃশেষ করিয়াছিল, প্রাতে উঠিয়া দেখে, সর্ব্বস্ব গিয়াছে, ভাবের ভাণ্ডার শূন্য। সেই অবধি প্রিয়নাথ প্রণয়ে হতাদর। সাব্যস্ত করিল, ভালবাসা সে কেবল ভোগ-বিলাসের কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন মাত্র।

দোষ শুধু প্রিয়নাথেরও নয়, দোষ প্রতিমারও বটে। অথবা প্রতিমারই বা কেন? দোষ সৌন্দর্য্যের। সৌন্দর্য্য এত চটকদার, এত সিঁদেল-চোর কেন? বাহারে নয়ন ধাঁধিয়া দেয় কেন? মনের ঘরে সিঁদ কাটিয়া পাগল করিয়া তুলে কেন?

"তবে তাই হোক্। জীবন্ত সমাধি। সেই ভাল।"—বলিয়াই প্রিয়নাথ দ্রুত চলিয়া গেল।

প্রতিমা সুন্দরী, রূপসী। কি ভাগ্যহীনা! রমণীর পক্ষে দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা ঐ রূপ। রূপে মানুষ মজে। রূপ কিন্তু ক্ষণিকের। নষ্টশ্রী দেখিলে মত্ততা প্রেম-বিহ্বলতা আদৌ টিকে না। অর্থলাভের প্রত্যাশায় যে প্রেম, রূপজ মোহেও তাই—প্রেম নয়, প্রেমের বিকৃতি। রাজকন্যাকে ভালবাস? রাজকন্যা মানুষ ভাল বলিয়া নয়, রাজার দুহিতা ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া। সুন্দরীকে ভালবাস? সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের জন্য, রূপে মন মাতে বলিয়া; সুন্দরীর ভিতর কেমন তাহা দেখিবার অবসর ত কৈ ঘটে না।

প্রিয়নাথ রূপে মজিয়াছিল, মজিয়া আত্মহারা

হইয়াছিল। রূপের অন্তরালে হীরা মুক্তা কিছু আছে কিনা দেখিবার অবসর বা প্রবৃত্তি তাহার হয় নাই। রূপের নেশা ছুটিতেই প্রিয়নাথ চাহিল—হৃদয়, বুকভরা ভালবাসা নয়, ভালবাসার বিকাশ। বিকাশ আকার ইঙ্গিতে, হাবভাবে, কথাবার্ত্তায়। প্রতিমা তাহার পরিচয় দিতে পারিল না। সে শিক্ষা ত বালিকা পায় নাই, নিজে শিখিয়া লইবার প্রয়োজনও কখন হয় নাই। মাধবীলতা সহকারে জড়াইতেই জানে, মুখ তুলিতে ত জানে না। অন্তদৃষ্টি প্রিয়নাথেরও নাই। রূপের পরপারে কাজেই দেখিল কেবল ঘোর কুয়াসা। প্রণয়ের মধুরোজ্জ্বল আলোকরশ্মি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। প্রিয়নাথ বিরক্ত হইল। বিরক্তি চরমে উঠিল বর্ষার দিনে শেষ-চেষ্টায়। প্রিয়নাথ হাল ছাড়িল।

বাটীর বাহির হইয়া বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে প্রিয়নাথ ধীরপদে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে ভাবিল,—অহেতুক মানসিক পীড়া কেন? আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই, অন্তও নাই। প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই মনুষ্যত্ব। নিবৃত্তি সাধনা-সাপেক্ষ। সেই সাধনাই লক্ষ্য হউক। দার্শনিক তত্ত্বে অন্তরাত্মাকে সান্ত্বনা দিয়া প্রিয়নাথ স্থির করিল, বাটীতে আর প্রবেশ করিবে না, না করিলে ক্ষতিও ত নাই, কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারানাথ সকল দিক দেখিয়া বেশ চলিতে পারিবে, অর্থের ভাবনা ভাবিবার ত প্রয়োজন নাই, সে ভাবনা পিতামহ যথেষ্টই ভাবিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

এই ভাবিয়া প্রিয়নাথ হেমচন্দ্রের দ্বারে গিয়া আঘাত করিল। এত দুর্য্যোগে বন্ধুবরকে পুনরাগত দেখিয়া হেমচন্দ্র বিস্মিত হইল, কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রিয়নাথ আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বলিল; গৃহত্যাগের সংকল্পও জ্ঞাপন করিল। হেমচন্দ্র প্রতিবাদ করিল, যুক্তি তর্ক স্তূপাকার করিয়া অনেক বুঝাইল, প্রতিমার হইয়া বিস্তর ওকালতি করিল। কিন্তু সকলই বৃথা। যুক্তিবিচারের চোখা চোখা বাণ স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল। হেমচন্দ্র অগত্যা বুঝিল, হৃদয়ের ক্ষত যুক্তি-মলমে সারে না, সারে সময়ে আপনা হইতেই। কাল-প্রভাবে এমন কত শত জটিল সমস্যার সুন্দর সমাধানই না হয়! হেমচন্দ্র কাল-প্রতীক্ষাই প্রকৃষ্ট পন্থা স্থির করিয়া প্রিয়নাথকে নিজ বাটীতে অবস্থান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল। প্রিয়নাথও দ্বিরুক্তি করিল না। হেমচন্দ্র 'মৌনং সম্মতি-লক্ষণং' বুঝিয়া বহির্ব্বাটীর একটি সুসজ্জিত কক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দিল। প্রিয়নাথ তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বাটীর প্রান্তস্থিত একটি কদর্য্য ভগ্ন গৃহ অধিকার করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ মিত্র

স্বর্গীয়া বামাসুন্দরী দেবী

শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি-এ

সূচনা

বাঙ্গালা সাহিত্যের উপন্যাস, নাটক, কাব্য প্রভৃতি বিভাগে আধুনিক যুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে, কিন্তু জীবনচরিত বিভাগে তাদৃশ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। অদ্যাবধি দুই-চারিজন কর্ম্মবীরের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সকল গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্প। বিশেষতঃ এদেশের পুণ্যচরিতা নারীগণের জীবন-কথা প্রকাশিত হইতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবে স্বামী বা পুত্র সমাজে বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও অক্লান্ত সেবাপরায়ণতার কাহিনী লোকসমাজে অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের জীবন-কথার উপাদান দূরের কথা, তাঁহাদের একখানি প্রতিকৃতি পাওয়াও অনেকস্থলে অসম্ভব হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও সাহিত্যসেবকগণের জননীর ও সহধর্ম্মিণীর প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। অধুনাবিলুপ্ত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামক মাসিকপত্রে কতকগুলি চিত্র প্রকাশিত হয়।

"নন্দকুমারের ফাঁসী," "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ," "অযোধ্যার বেগম" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া একদিন যিনি দেশে যুগান্তর আনিয়াছিলেন, সাহিত্যের সেই অকৃত্রিম অনুরাগী সেবক চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী সাধ্বী বামাসুন্দরী দেবীর একখানি প্রতিকৃতি সংগ্রহের মানসে যখন তাঁহার কন্যা 'আলো ও ছায়া'র বহুবিশ্রুত কবি মাননীয়া শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি, তখন কথোপকথন প্রসঙ্গে অবগত হই যে তিনি আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশ অনুসারে তাঁহার জননীর শ্রাদ্ধবাসরে পড়িবার জন্য তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় নাই। তাহার কারণ এই, মাতৃবিয়োগের পরে সপ্তাহমধ্যে যখন উহা রচিত হয় তখন রচয়িত্রীর মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না,—তিনি তখন কেবল মাতৃবিয়োগে কাতর ছিলেন না, তাঁহার প্রাণাধিকা এক দুহিতা তখন সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্তা। সুতরাং তাঁহার মানসিক উদ্বেগের সীমা ছিল না। আচার্য্য শিবনাথের আদেশ কোনও মতে পালন করিবার জন্যই তিনি যথাসম্ভব দ্রুতভাবে এই রচনাটি শেষ করিয়াছিলেন। আমি প্রবন্ধটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া 'বিচিত্রা'য় উহা প্রকাশিত করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করি, কারণ উহাতে গতযুগের সমাজের রীতি-নীতির ও নারীজীবনের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়—যাহা সচরাচর আমরা দেখিতে পাই না। আমার মনে হয়, দ্রুত রচনারও একটি গুণ আছে; বোধ হয় উহাতে ভাব ও ভাষার কৃত্রিমতা আসিতে পারে না, লেখকের আন্তরিকতা যেন বেশী ফুটিয়া উঠে। আমার এই ধারণা কতদূর সত্য পাঠকগণ শ্রদ্ধেয়া লেখিকার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া স্বয়ং তাহার বিচার করিবেন।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

আমি মনে করিতেছিলাম মাতৃদেবীর জীবনে ঘটনাবৈচিত্র্য নাই, অতি সংক্ষেপে তাঁহার আড়ম্বরহীন নীরব জীবনের কথা বিবৃত করিব। শ্রাদ্ধবাসরে স্বর্গগত আত্মার গুণ স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হয়, সে শ্রদ্ধা নীরবেও অর্পণ করা যায়। কিন্তু ভক্তিভাজন শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন, যেন আমার মাতৃদেবীর জীবনের কথা একটু বিস্তারিত করিয়া লেখা হয়। বুঝিলাম এই জীবনখানা তাঁহার নিকট একটু বিচিত্র বোধ হইয়াছে বলিয়াই ঐরূপ অনুরোধ করিয়াছেন। পুরাতন হইতে নূতনে, কুসংস্কারের অন্ধকার হইতে নূতন জ্ঞানালোকে যাহাদিকে পথ খুঁজিয়া উঠিয়া পড়িয়া ব্যথা সহিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহাদের জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলির মধ্যেও একটু বিচিত্রতা থাকে। সময়াভাবে রোগশোকের মধ্যে সব কথা বলা হইবে না; শুধু শৈশব হইতে এ-পর্য্যন্ত যাহা স্মরণ হইল লিখিয়া জানাইলাম।

রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ;
২২শে আগষ্ট, ১৯১৫।

বঙ্গাব্দ ১৩৫৪ সনের চৈত্রমাসে, বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে মাতৃদেবীর জন্ম হয়। আমাদের মাতামহ স্বর্গীয় চন্দ্রমোহন মুস্তৌব মহাশয় গ্রামের একজন মাতব্বর লোক ছিলেন। ধনী-দরিদ্র সকলে বিপদে-আপদে তাঁহার সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করিত। তিনি অতি স্নেহশীল ও সৌখীনপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার পত্নী শিবসুন্দরী দেবী অতিমাত্রায় আচারপরায়ণা এবং মৃতবৎসা ছিলেন। কয়েকটি সন্তান হারাইবার পর আমার মাতা বামাসুন্দরীর এবং পরে শ্যামা ও উমার জন্ম হয়। সে জন্য এই কন্যারা পিতামাতার অতিশয় যত্ন ও আদরে লালিত হইয়া ছিলেন। [বাসণ্ডা গ্রামেই শৈশবে কন্যার অনাদরের কারণসূচক একটি ছড়া আমি শুনিয়া মুখস্থ করিয়া

স্বর্গীয়া বামাসুন্দরী দেবী

ছিলাম ; সেটি এই—মেয়ের নাম 'ফেলি,' পরে নিলেও গেলি যমে নিলেও গেলি।] বিশেষ জ্যেষ্ঠা বামা। ইনি অতি সুদর্শনা ছিলেন ; সেই জন্য অনেকেই ইহাকে পুত্রবধূ করিতে ইচ্ছুক হইতেন। আমার পিতামহদেব তাঁহার অশান্ত দুর্দমিত পুত্রটির জন্য এই কন্যাটি পাইতে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেকালে সে গ্রামে অর্থ লইয়া পুত্রের বিবাহ দিবার রীতি বোধ হয় ছিল না, কিন্তু কন্যাবিক্রয়ের প্রথা একটু ছিল। আবার অষ্টমবর্ষে কন্যাদান করিয়া পৃথিবী-দানের পুণ্যফল লাভ হয়, নবমবর্ষে গৌরীদান হয়, এ সংস্কারও ছিল। অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতে মাতামহদেব কন্যাদান করিয়া পুণ্যার্জন করিয়াছিলেন। আধুনিক হিসাবে আমার মাতার যখন সাত এবং পিতার দশ বৎসর বয়স, তখন তাঁহারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

বালক স্বামী বালিকা বধূকে জননীর স্নেহভাগিনী মনে করিয়া যথেষ্ট ঈর্ষা করিতেন এবং সুযোগ পাইলে প্রহার করিতেও ছাড়িতেন না। পিত্রালয় শ্বশুরালয় একগ্রামে হইলেও শ্বশুরালয়েই বালিকার অধিকাংশ কাল কাটিয়াছে। কেবল পূজা-পর্ব্বাদি উপলক্ষে মাঝে-মাঝে পিতৃগৃহে গিয়া থাকিতে পাইতেন। শাশুড়ী তাঁহাকে সন্তাননির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। কিন্তু এই স্নেহলাভ বেশীদিন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার সার্দ্ধ দশবৎসর বয়সে আমাদের পিতামহী দেবী সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করিলেন। সাড়ে-দশ বৎসরের বালিকার পক্ষে এক গৃহের গৃহিণী হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া পিতামহদেব তাঁহার খুড়তাত ভ্রাতার সহিত একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকিতে লাগিলেন। উঁহার পরিবারে উঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যা ব্যতীত আরও এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি উঁহার অগ্রজের বিধবা। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইলে পিতামহদেব তাঁহার পূর্ব্বোক্ত খুড়তাত ভাই ও তাঁহার অগ্রজকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই ইহাদের অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও ইহার পুত্রকন্যাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। স্বাধীনচিত্তা, সত্যবাদিনী ও তেজস্বিনী পিতামহীদেবী নানাকারণে ইহাদিগের সহিত একত্র থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন না ; মৃত্যু-কালেও ইঙ্গিতে স্বামীকে ও পুত্রবধূকে তাহা জানাইয়া গিয়াছিলেন। পিতামহদেব যদি পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া পৃথক সংসারে থাকিতেন তাহা হইলে

উত্তরকালে আমাদের জননীকে যে দুঃখদায়িত্ব ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা হইতে তিনি রক্ষা পাইতেন।

বালিকা বধূ গৃহকর্ম্মে সুদক্ষা ছিলেন। একবার শাশুড়ী পাড়া বেড়াইতে গিয়াছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া আসন পাতিয়া তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। শাশুড়ী ফিরিয়া আসিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া প্রতিবেশী সকলকে ডাকিয়া বধূর গুণপনা দেখাইতে লাগিলেন।

সাধারণ ঘরকন্না ছাড়া সেকালের যাহা শিল্পবিদ্যা তাহাও বালিকা বধূ শিখিয়াছিলেন। যেমন আলপনা দেওয়া, বিবাহের পীঁড়ি চিত্রকরা, শিকা তৈয়ার করা, ঝাঁপি বোনা, মাটির উনান সরা হাঁড়ী তৈয়ার করা, ক্ষীরের ও আমসত্ত্বের ছাঁচ খোদাই করা, পিঠা পরমান্নাদি রন্ধন করা।

শৈশবে বা বাল্যে কেহ তাঁহাকে লিখিতে-পড়িতে শিখায় নাই। সাধারণ গৃহস্থদের পরিবারে স্ত্রীলোকের লিখন-পঠন শিক্ষা নিষিদ্ধই ছিল। কৈশোরে অথবা আরও পরে মাতৃদেবী নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় একটু লিখিতে-পড়িতে আরম্ভ করেন। বাড়ীর প্রাচীনাদের ভয়ে ইহা তাঁহাকে লুকাইয়া করিতে হইয়াছিল। রন্ধনগৃহের যে স্থানটি হেঁসেল বা হাঁড়ীশাল বলিয়া পরিচিত তাহা কাঁচা মাটির দেয়ালে ঘেরা ছিল। তাহারি গায়ে কাষ্ঠশলাকা দিয়া তিনি অক্ষর লিখিতে অভ্যাস করিতেন, ও প্রত্যহ রন্ধন-শেষে গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকার লেপ দিয়া তাহা ঢাকিয়া দিতেন। তখন গ্রামের লোকদের ধারণা ছিল যে স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া শিখাইলে দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত হইবে; স্ত্রীলোকেরা সকলের সহিত গোপনে পত্রালাপ করিবে। ঐ জন্যই মধ্যবিত্ত পরিবারে লেখাপড়ার চর্চ্চা কেহ প্রশ্রয় দিত না। ধনাঢ্য পরিবারে কন্যার আত্মীয়গণের নিকট কেহ কেহ বা সহোদরদিগের সহিত গুরু-মহাশয়ের নিকট লেখা অভ্যাস করিতেন।

আমার জন্মের কিছুদিন পূর্ব্বে পিতামহাশয় আমার মাতাঠাকুরাণীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য, মাতৃত্বের দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কিছু উপদেশ ছিল। পত্রখানি ডাকঘর হইতে আমাদের বাড়ীতে না আসিয়া গ্রামের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে গেল; সে বাড়ীর লোকেরা উহা খুলিয়া পড়িয়া আমার পিতামহদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রবধূকে পত্র লিখিয়াছে দেখিয়া তিনি লজ্জায় ম্রিয়মান হইলেন এবং পত্রখানি লইয়া তাঁহার বৈবাহিক আমার মাতামহদেবের নিকট গেলেন। তিনিও জামাতার এই নির্লজ্জতার পরিচয় পাইয়া বড় অপ্রতিভ হইলেন। চিঠিখানি পাইয়া বাড়ীতে একটা হুলুস্থুল ব্যাপার। যাঁহার নিকট আসিয়াছিল তাঁহাকে সেখানি দিবার আবশ্যকতা কেহ দেখিলেন না। বহুদিন পরে তিনি গোপনে চিঠিখানি খুঁজিয়া লইয়া পড়িয়া আবার পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের শৈশবে মাতৃদেবীর নিকটেই প্রত্যেকের অক্ষরপরিচয় হইয়াছে। ছেলেবেলা তাঁহাকে ও অন্য দুই একটি আত্মীয়াকে বাঙ্গলা রামায়ণ-মহাভারত ও কালীবিষয়ক একখানি বই পড়িতে শুনিতাম।

মাতৃদেবীর শ্রমশীলতা, সেবাপরায়ণতা, সদ্বিবেচনা ও মিষ্টভাষিতা তাঁহাকে গ্রামে ও শ্বশুরালয়ে অনেকেরই প্রিয় করিয়াছিল, কিন্তু অপরের প্রশংসা পাইয়াছিলেন বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক তাঁহার খুড়-শাশুড়ী তাঁহার প্রতি ক্রমেই বিমুখ হইতে লাগিলেন। সার্দ্ধ ষোড়শবর্ষ বয়সে তাঁহার প্রথম-সন্তানের জন্মের পর, এই বিমুখতা অত্যাচারে পরিণত হইল। তিনি দাসীর ন্যায় সকলের পরিচর্য্যায় রত থাকিতেন, কাহাকেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেন না। দিবাভাগে সন্তানকে ক্রোড়ে করিবার অবসরও তাঁহার সকল দিন ঘটিত না। সন্তানের সৌভাগ্যবশতঃ পিতামহ যখন গৃহে থাকিতেন শিশু তাঁহার বুকে স্থান পাইত। শুনিয়াছি একদিন শীতকালে সকালবেলা মাতামহ আসিয়া দেখিলেন আমাকে ঠাণ্ডা মাটিতে বসাইয়া রাখিয়া

মাতা গৃহকর্ম করিতেছেন, দেখিয়াই তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া আমাকে নিজের গৃহে লইয়া গেলেন। অতঃপর বহুদিন পর্যন্ত প্রত্যহ প্রভাতে আসিয়া তিনি আমাকে লইয়া যাইতেন, সন্ধ্যাবেলা ঘুম পাড়াইয়া ফিরাইয়া আনিতেন। মাতা সারাদিন সন্তানকে দুগ্ধপান করাইতে পারেন নাই বলিয়া রাত্রে শয্যায় গিয়া অশ্রুপাত করিতেন।

পিতামহদেবের স্বাস্থ্য যত ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল আমার মাতার প্রতি কর্ত্রীর দুর্ব্ব্যবহারের মাত্রা তত বাড়িয়া চলিল।

কুমারী কামিনী সেন

জীবনের প্রথম প্রায় সাত বৎসর আমি গ্রামের বাটীতে বাস করিয়াছি। তখন মাতার কাজকর্ম যাহা দেখিয়াছি এখনও মনে আছে। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি ঘরগুলি ঝাঁট দিতেন, তারপর গোবর ও মাটি গুলিয়া ঘর নিকাইতেন, ইহার পর রাত্রের ব্যবহৃত স্তূপীকৃত কাঁসার ও পাথরের থালাবাটী লইয়া পুকুরের ঘাটে মাজিতে বসিতেন। বাসন মাজা শেষ হইলে স্নান ও পূজা সারিয়া রাঁধিতে যাইতেন। যখন শাশুড়ীরা সদয় থাকিতেন দুইমুঠা পান্তাভাত খাইতেন। পিতামহদেবের পীড়ার সময় কখন দেখিয়াছি দুইটি ভিজা চাউল মুখে দিয়া খাইতেন।

আমার বয়স যখন ৪ কি ৫ বৎসর তখন মাতামহদেবের হঠাৎ মৃত্যু হয়। ইহার কিছুকাল পরেই পিতামহদেব পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। শ্বশুর পীড়িত, স্বামী বিদেশে, বধূর তখন বড়ই দুরবস্থা। শ্বশুরের সেবায় অনেক সময় ব্যয় হইত, তথাপি গৃহের অন্যান্য কর্ম হইতে তাঁহার ছুটি ছিল না। সারাদিন খাটিয়াও কটু-ভাষিণী গৃহকর্ত্রী বিধবা খুড়-শাশুড়ীর নিকট অনেক গঞ্জনা সইতে হইত। সেই হৃদয়হীনা কখন কখন বলিতেন, "যা বুড়াকে লইয়া আলাদা হইয়া যা।" —"আমার শ্বশুরেরও এই বাড়ীতে তালুকদারীতে সমান ভাগ আছে, এ বাড়ী আপনারও যেমন আমারও তেমন"—এইরকম দুই-চার কথা বলিয়া বধূ বেশ ঝগড়া বাধাইতে পারিতেন। জ্ঞাতি প্রতিবেশিনীরা সেইরূপ কথা শিখাইয়া দিতেন কিন্তু বধূ মুখ খুলিতেন না, খুড়শাশুড়ী ঝগড়া জমাইতে না পারিয়া নীরব হইতেন।

প্রতিদিন শ্বশুরের ময়লা বিছানা কাচিয়া ধুইয়া বাড়ীর সকলের জন্য রন্ধন করিয়া দিয়া তিনি তাহার শ্বশুরমহাশয়কে খাওয়াইতে যাইতেন। প্রত্যেকটি ভাতের গ্রাস তাঁহার মুখে তুলিয়া দিতে হইত তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাকে পাশ ফিরাইতে হইলে সম্পর্কিত দেবর ভাগিনেয় প্রভৃতিকে ডাকিয়া আনিতে হইত। তাঁহার নিজের দিবসের আহার বেলা ২টা ৩টার পূর্ব্বে কোন দিন হইত না। রাত্রেও আমার জন্য তত্ত্বাবধান তাঁহাকেই করিতে হইত।

এইরূপে দেড়বৎসর অনিয়মিত পরিশ্রম, অনাহার, অনিদ্রায় মাতৃদেবীর স্বাস্থ্য চিরকালের মত নষ্ট হইল। তিনি সেই সময় হইতে জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত শিরঃপীড়ায় দারুণ কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন।

আমার তিন পিসীমা ছিলেন। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার বাসণ্ডা গ্রামেই বিবাহ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠার শ্বশুরালয় গ্রামান্তরে হইলেও বেশী দূর ছিল না। ইঁহাদের দ্বারা পিতামহদেবের কোন সেবা হয় নাই। উত্তরকালে আমার পিতৃদেব আমাকে বলিয়াছেন—"তোমার মাতা আমার রুগ্ন পিতার সেবা করিয়া আমাকে নরকভোগ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

ইতিপূর্ব্বে পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আত্মীয়গণের বিরাগভাজন ও ভীতির কারণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতেন, বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র বিধর্ম্মী, শ্রাদ্ধ করিবে কে? পিতামহদেব স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায় বলিতেন, "শ্রাদ্ধ করিবেন আমার বউমা।" সকলেই জানিত তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত!

পিতামহদেবের ব্যাধি দুরারোগ্য ও মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া পিতামহাশয় ১৮৭১ সনের পূজার ছুটিতে বাটী আসিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে নিকটে উপস্থিত থাকিলে পাছে কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে লিপ্ত হইতে হয় এই ভয়ে শীঘ্রই বরিশাল ফিরিয়া গেলেন। ১৮৭১ সনের ১২ই জানুয়ারী পিতামহদেবের মৃত্যু হয়। মাঘমাসের দারুণ শীতে নদীতে স্নান করিয়া আর্দ্রকেশে আর্দ্রবস্ত্রে কম্পিতদেহেই আশুসন্তানবতী আমাদের মাতা তাঁহার মুখাগ্নি করিলেন। তৎপরে একমাস কাল একবেলা হবিষ্যান্ন খাইয়া তিনিই পুত্রস্থানীয় হইয়া শ্বশুরের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলেন। পিতৃদেব বরিশালে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে পরলোকগত পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন।

পিতামহদেবের মৃত্যুর পর ক্রমাগত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও পরামর্শ চলিতে লাগিল। সহস্রবার মাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করা হইত, "তুমি এখন কি করিবে? তোমার স্বামীর তো জাতি গিয়াছে, তুমি কোথায় থাকিবে—কোথায় যাইবে? তুমিও কি জাতিধর্ম বিসর্জ্জন দিবে? তোমার স্বামীর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; তুমি তাহার কাছে যাইওনা, সে হয়তো তোমাকে কিছুদিন পরে বেচিয়া ফেলিবে। বরং এখানে থাক, সে তোমার জন্য ফিরিয়া আসিতে পারে।" সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "তুমি দেশের বাড়ীতে থাক।"

সকলেই আশা করিয়াছিলেন, এবার তাঁহার একটি পুত্র হইবে। যখন সে আশা চূর্ণ করিয়া বাজলা ১২৭৮ সনের ৬ই আষাঢ় যামিনী ভূমিষ্ঠ হইলেন সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। মেজো পিসীমা অনেক আশা করিয়া সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কন্যা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং অবিলম্বে স্নান করিয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। কন্যার জন্ম সেকালে এতই দুঃখের ব্যাপার ছিল।

সেইদিন হইতে মাতাঠাকুরাণীর জীবন সকলে অসহনীয় করিয়া তুলেন। ছোট ঠাকুরদাদা মহাশয় বলিলেন, 'বউমা যদি বলেন তাঁকে পৃথক আটচালা তুলে দিব, আমার কনিষ্ঠপুত্রকে তাঁর পোষ্যপুত্ররূপে দান করব, তিনি পুত্রকন্যা নিয়ে সকল অভাব ভুলে থাকুন।' পিসিমারা বলিলেন—"তোমার মেয়েটিকে বিবাহ দিয়া ঘর-জামাই রাখ।" এবার মাতাঠাকুরাণী উত্তর দিলেন, বলিলেন,—"ঘর-জামাই না ঘর-জ্বালা! আমি ঘর জ্বালাইব না।" আজ সেই সময়ের কথা চিন্তা করিয়া মাতাঠাকুরাণীকে কিরূপে কৃতজ্ঞতা জানাইব জানি না। আমার শিক্ষাদীক্ষা সুখসৌভাগ্য যাহা কিছু পাইয়াছি, যাহা কিছু আমার মনুষ্যত্ব, যাহা কিছু এই ক্ষুদ্র জীবনের সফলতা সে সমুদয়ের মূলে আমার মাতৃদেবী—তাঁহার সেইদিনের দৃঢ়তা। পিসীমারা আমার সম্বন্ধ আনিয়াছিলেন, সেইদিন মাতার একটু হাঁ-কি-নার উপর সাড়ে-ছয় বৎসরের বালিকার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছিল।

মাঘমাসে পিতামহদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। পরবর্ত্তী আষাঢ় মাসে ভগিনী যামিনীর জন্ম হইল ও ভাদ্র মাসের মধ্যভাগে পিতামহাশয় আমাদিগকে নিজের কাছে আনিবার জন্য বাসণ্ডা গেলেন। গ্রামের লোকেরা সকলে মিলিয়া বলিলেন—"আমরা বিধর্ম্মীর

নৌকা ঘাটে লাগাইতে দিব না। স্ত্রীর সহিত একবার দেখা না করিয়া ফিরিয়া যান ভাল, নচেৎ নৌকা ডুবাইয়া দিব।" পিতৃদেব বলিলেন, "আমার স্ত্রীর সহিত একবার দেখা না করিয়া যাইতে পারি না। তিনি এখানে আসিয়া নিজের মুখে, আমাকে ফিরিয়া যাইতে বলুন, আমি চলিয়া যাইতেছি।"

ঘাটে লোকারণ্য, আমাদের বাড়ীতে লোকের ক্রমাগত যাতায়াত, আত্মীয়ারা আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতেছেন—যেন কি আকস্মিক বিপদ উপস্থিত। দূর-সম্পর্কিত এক ভাগিনেয় ও একটি দেবরকে

৺চণ্ডীচরণ সেন

সঙ্গে লইয়া অবগুণ্ঠাবৃতা মাতাঠাকুরাণী নৌকার কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ পতিপত্নীতে কথা হইল। তখন উপদেশ বা যুক্তিতর্কের সময় নয়। পতি বলিলেন—"আমি একলা বড়ই কষ্টে আছি, তুমি এস।" পত্নীর হৃদয় গলিয়া গেল তবু বলিলেন—"যদি আমার ধর্ম্মের উপর হাত না দেও আমি যাইতে পারি।" উত্তর পাইলেন, "তোমার ধর্ম্মের উ র হাত দিব না, তুমি তোমার ধর্ম্মবিশ্বাস, মত চালবে।" এই বলিয়া পিতৃদেব মাতৃদেবীকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন, সমবেত লোকদিগকে বলিলেন, "আমার স্ত্রী আমার সহিত আসিতে প্রস্তুত; কন্যাদুটিকে পাঠাইয়া দিন।" একটা ক্রোধ ও নিরাশার ভাব লইয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া রহিল, বাড়ীর লোকেরা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের দুই বোনকে নৌকায় তুলিয়া দিল। মাতাঠাকুরাণী বলিলেন "আমি একবার আমার মা'র সঙ্গে দেখা করিয়া যাইব।" পিতামহাশয় মাঝিদিগকে আমার মামা-বাড়ীর ঘাটে নৌকা লইয়া যাইতে হুকুম দিলেন। গ্রামের লোকেরা বলিলেন, "না, সেখানে না, তোমার স্ত্রীকে তাহার মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে দিব না।"

মাতাঠাকুরাণী বরিশালে আসিলেন। সেখানে নিয়মিত সন্ধ্যাআহ্নিক করিতেন, মাটির শিব গড়াইয়া পূজা করিতেন, ব্রতনিয়মাদিও পূর্ব্বের মত রক্ষা করিতেন। পিতা মহাশয় বাধা দিতেন না, কিন্তু হাসিতেন। মাতাঠাকুরাণী সদ্‌ব্রাহ্মণ ও সদ্‌বৈদ্য ছাড়া কাহারও ছোঁয়া খাইতে না। যাহার জল-চল, এমন চাকর না পাইলে পানাহার বন্ধ থাকিত। জল আনিবার লোক না থাকিলে কখন কখনও কেবল ডাবের জল খাইয়া থাকিতেন।

পিতামহাশয় দুইবেলা আমাদিগকে কাছে বসাইয়া উপাসনা করিতেন। তিনি আমাদের জন্য একটি শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়িনী সভা হইতে যে পরীক্ষা গৃহীত হইত, তাহার সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর পাঠ্য আমি পড়িতাম। মা আমার ঠিক উপরের শ্রেণীতে পড়িতেন—তাঁহার পাঠ্য ছিল বোধোদয়, সরল ব্যাকরণ, ভূগোলসূত্র এবং অঙ্কের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ। আমার পাঠ্য ছিল—বর্ণ-পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং ১০০ পর্য্যন্ত গণনা। পরীক্ষা দিয়া উভয়ে প্রায় একমূল্যের একপ্রকার পুরস্কারই পাইলাম। মা শিরঃপীড়া বশতঃ আর বেশীদিন

পড়া-শুনা করিতে পারেন নাই। গৃহকর্ম ও সন্তান-পালনে তাঁহার এত সময় যাইত যে পড়িবার অবকাশও পাইতেন না।

পিতা মহাশয় তাঁহার শ্রদ্ধেয় বন্ধু গিরীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে সপরিবারে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। ইঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া মাতা-ঠাকুরাণীর ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হইল। কিন্তু জাতিভেদ ত্যাগ করিতে তাঁহার অনেকদিন লাগিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তিনি অস্পৃশ্য হিন্দু কিম্বা মুসলমানের ছোঁয়া আহার বা পানীয় গ্রহণ করিতে পারিতেন না। বলিতেন—"রুচি হয় না, কি করি?"

এদিকে কিন্তু সকল-জাতীয় অতিথি-অভ্যাগতকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে প্রীতি বোধ করিতেন। এই সময় একটি কায়স্থবংশীয়া বালবিধবা হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া আমাদের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মা তাঁহার ছোঁয়া খাইতেন না, কিন্তু অন্যথা তাঁহাকে আপনার মত করিয়া রাখিতেন।

বাবা পিরোজপুরের মুন্সেফ হইয়া আসিলে পর তাঁহার বৈঠকখানায় প্রতি রবিবার ব্রাহ্মসমাজ বসিত। স্থানীয় ভদ্রলোকদের লইয়া রবিবার দুই-বেলা উপাসনা হইত। আমি ও মা ভিতরের দিক হইতে বেড়ার ফাঁক দিয়া উঁকি দিতাম ও সঙ্গীত প্রার্থনাদি শুনিতাম। মাতাঠাকুরাণী সংকীর্ত্তনের কথা ও সুরগুলি শিখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। "প্রভু দয়াল, ঐ সাধুমুখে আমি শুনেছি" এই গানটি সম্পূর্ণ আকারে পাইবার জন্য তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া এক-খানি স্লেট ও একটি পেন্সিল লইয়া উপর্য্যুপরি কয়েক রবিবার আমি বেড়ার পিছে বসিয়া গানটি লিখিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—বোধ হয় কৃতকার্য্যও হইয়াছিলাম। কেন যে মাতাঠাকুরাণী আমার পিতা-মহাশয়ের নিকট ব্রহ্মসঙ্গীতখানি চাহিয়া লয়েন নাই জানি না। হয়তো জানিতেন না গানটি পুস্তকে আছে কি না, নয়তো লজ্জাবশতঃ সঙ্গীতের অনুরাগ গোপন করিয়াছেন। আমার মনেও চাহিবার কথা উদয় হয় নাই; আমি পিতামহাশয়কে অত্যন্ত ভয় করিতাম। এ সময় আমার বয়স আট উত্তীর্ণ হইয়া নয় চলিতেছে। বোধ হয় এই সময়েই মাতৃদেবীর ব্রহ্মোপসনার প্রতি অনুরাগ জন্মে। মুন্সেফের স্ত্রী হইয়াও তাঁহাকে স্বহস্তে সকলের জন্য রাঁধিতে হইত, তবু উপাসনার সময় সব কাজ ফেলিয়া সেই মেটেঘরের পিছনে ভিজা-মাটির উপরে আসিয়া বসিতেন।

পিরোজপুরে আমার তৃতীয় সহোদর প্রেমকুসুমের জন্ম হয়। এখান হইতে অবসর পাইয়া পিতামহাশয় আবার কিছুদিন আমাদের লইয়া বরিশালে আসিলেন এবং মাস-দুই পরেই সকলে কলিকাতা রওনা হইলাম।

কলিকাতা আসিয়া মাতাঠাকুরাণী ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে প্রথম সামাজিক উপাসনা দেখিলেন। বরিশালে থাকিতে আত্মীয়স্বজনের মনঃপীড়ার ভয়ে সেখানকার সমাজে যান নাই। কিছুদিন কলিকাতা থাকিবার পর পিতামহাশয় অস্থায়ীরূপে ঠাকুরগাঁয়ের মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন এবং আমাদিগকে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে রাখিয়া গেলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তথায় সপরিবারে ছিলেন। তাঁহার পরিবারের সহিত মাতৃদেবীকে পরিচিত করিয়া দিবার পর অপরিচিত স্থানে অনেক অপরিচিতের মধ্যে বাস করিতে তাঁহার আপত্তি রহিল না।

এখানে দুইবেলা নিয়মিত উপাসনায় যোগ দিতে হইত, সকলের সহিত একপংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে হইত এবং দিনে একঘণ্টা করিয়া ভক্তিভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের নিকট পড়িতে হইত। দ্বিপ্রহরে শিশু-কন্যাদ্বয়কে ঘুম পাড়াইয়া একখানি 'সীতার বনবাস' ও বাঙ্গলা ব্যাকরণ হাতে লইয়া পড়িতে যাইতেন দেখিতাম।

শৈশবে আমার পিতামহদেব আমাকে অথবা তাঁহার জাতিপুত্রগণকে যে সকল ছড়া মুখস্থ করাইতেন, আমার মাতাঠাকুরাণী রন্ধনশালায় বসিয়া তাহা শুনিয়া শুনিয়া শিখিয়া লইতেন। প্রথম বয়সে শ্রুত এই সকল ছড়া

এবং পঠিত রামায়ণ-মহাভারতের বিশেষ বিশেষ অংশ তাঁহার বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত স্মরণ ছিল, প্রসঙ্গক্রমে সেসকল আবৃত্তি করিতেন। কথায় কথায় এমন পদ্য-প্রবচন আবৃত্তি করিতে আজকাল কাহাকেও শুনি না। শিরঃ-পীড়াদিবশতঃ পরবর্ত্তীকালে তাঁহার স্মৃতিশক্তি তেমন প্রখর ছিল না। পঠিত বিষয় ভুলিয়া যাইতেন। পিতা-মহাশয় তাঁহাকে যেরূপ শিক্ষিতা দেখিতে চাহিতেন, সেরূপ হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এজন্য পিতা-মহাশয়ের কথাবার্ত্তায় মাতৃদেবী সম্বন্ধে নৈরাশ্য ও কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পাইত। আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়

আমি বুঝিতেছিলাম যে, ইহাতে মাতৃদেবীর মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত লাগিত, কিন্তু মুখে কোনদিন বিশেষ কিছু বলেন নাই এবং স্বামীর বন্ধুবর্গের নিকট, এমন কি নিজের সন্তানগণের নিকটও সম্মান বা শ্রদ্ধার কোন দাবী রাখেন না এমন ভাব দেখাইয়াছেন।

তিনি কৈশোরে ও যৌবনে সুন্দরী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সুশীলতা, নম্রতা, সেবাপরায়ণতা ও সৌজন্যাদির জন্যও সকলে তাঁহাকে সুখ্যাতি না করিয়া পারিত না। অথচ তিনি আপনাকে মূর্খ মনে করিয়া নিজকে সর্ব্বদা সকলের পশ্চাতে রাখিতেন। নিজের মূর্খতা তাঁহাকে স্বামীর সর্ব্বথা যোগ্যা ও আদরণীয়া করে নাই; সকল ভাব, চিন্তা ও কার্য্যে স্বামীকে সহানুভূতি দিতে হয়তো পারেন না, এই কথা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা এই হইল যে কন্যাদিগকে এমন সুশিক্ষা দিবেন যেন তাহাদিগকে কেহ অজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা বা উপহাস করিতে না পারে। চরিত্রের মহত্ত্ব, স্বাভাবিক সুবুদ্ধি যে পুঁথিগত বিদ্যা হইতে কত অধিক মূল্যবান একথা জীবনের আরম্ভে ও মধ্যভাগে না হউক, প্রবীণবয়সে পিতৃদেব ভূয়োভূয়ঃ স্বীকার করিয়াছেন এবং আমাদের জননীদেবীকে যে একসময়ে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাহা মনে করিয়া দুঃখিত, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন। তিনি বুঝিয়া গিয়াছিলেন যে, মাতৃদেবীর সেবাপরায়ণতা বিবিধ ভাষা শিক্ষা করিয়া বা হাজারখানা পুস্তক পাঠ করিয়া শেখা যায় না। অনেক পড়িয়া, অনেক দিকে অনেক চিন্তা লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া আমরা একরকম মানসিক বিলাসিতা ও দৈহিক অলসতার মধ্যেই ডুবিয়া যাইতেছি। উচ্চ চিন্তা উচ্চ মতই যে উচ্চ জীবন নহে আমরাও তাহা দেখিতেছি এবং একান্তচিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন মাতৃদেবীর সরল নীতিজ্ঞান, সহজ ধর্ম্মবিশ্বাস, ধৈর্য্য ও ত্যাগশীলতা জীবনে লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি।

পিতৃদেব ভাগ্যবান ছিলেন যে, তাঁহার কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বা কোন সৎকার্য্যের পথে তাঁহার পত্নী প্রতিবন্ধক উপস্থিত করেন নাই; প্রত্যুত তাঁহার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। এখন স্ত্রীশিক্ষা ও বয়স্থা কন্যার বিবাহ হিন্দুসমাজের মধ্যেও প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু তখন হিন্দুসমাজে কেন, ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্তা অনেক নারীও কন্যাদের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতিনী ছিলেন না, এবং বাল্যদশা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই

তাহাদের বিবাহের জন্য নিজ নিজ স্বামীকে অস্থির করিয়া তুলিতেন। সেই সময়ে আমাদের জননী স্বয়ং শিক্ষিতা না হইয়াও আর কোন কথা না ভাবিয়া কেবল আমাদের কথাই ভাবিতেন। একটি দিনের জন্যও তাঁহার মুখে কন্যার বিবাহের প্রস্তাব কেহ শোনে নাই। আমি যে দশবৎসর বয়সে মিস একরয়েড-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মহিলা-বিদ্যালয়ের বোর্ডাররূপে প্রেরিত হইয়াছিলাম এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির জন্য পড়িতে পারিয়াছিলাম তাহার জন্য কেবল পিতৃদেব নহেন মাতৃদেবীও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। যামিনীকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে দিতে পিতৃদেবের আপত্তি ছিল, মাতৃদেবীর তাহাও ছিল না। তিনি ব্যবহারেও পুত্রকন্যার মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না। সাধারণ নারীদের মত বস্ত্রালঙ্কারে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ থাকিলে তিনি আমাদের শিক্ষার জন্য এত অর্থব্যয় স্বীকার করিতেন না, পিতৃদেবকেও স্থানে-অস্থানে দান ও পুস্তকক্রয় দ্বারা নিঃস্ব হইতে দিতেন না।

সকল মাতাই স্নেহময়ী, কিন্তু আমাদের মাতার স্নেহ একটু যেন এদেশের মাতৃসাধারণের স্নেহ হইতে বেশী গভীর বেশী উচ্চ এবং বাহিরের দিকে বেশী সংযত ছিল বলিয়া আমার মনে হয়। তিনি সন্তানগতপ্রাণা হইয়াও শৈশবে আমাদিগকে যথেষ্ট শাসন করিয়াছেন। আমি যখন তাঁহার অঞ্চলের একমাত্র নিধি সেই সময়েও আমি তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতাম তেমনি ভয় করিতাম। অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তাঁহার চক্ষের একটু দৃষ্টি আমাকে খেলা হইতে ফিরাইয়া আনিত। রোগেশোকে, বিশেষ পরীক্ষার মধ্যে মাতৃদেবীর স্নেহের গভীরতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত। তিনি কখনও অস্থির হইতেন না। একবার তাঁহার একটি সন্তানের যখন ধনুষ্টঙ্কার হইয়াছে, তাহার হস্তপদের বিক্ষেপ-দর্শন নিকটবর্তী সকলের যখন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে তখন সন্তানের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও নিজে কেবল অশ্রু মুছিয়াছেন, মুখ ফুটিয়া কাঁদেন নাই, আমাকে বলিয়াছেন—"কাঁদিও না, কাঁদিবার অনেক সময় আছে, চিকিৎসার সময় চলিয়া যায়।"

একটি সন্তান অল্পদিনের মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হইবে, শরীরের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন আর একটি টাইফয়েড রোগগ্রস্ত সন্তান শ্রীমান প্রভাতকে কোলে লইয়া দিনরাত্রি একাসনে কাটাইয়াছেন। ঈশ্বরকৃপায় প্রভাত ক্রমে আরোগ্য লাভ করিল।

কেবল নিজের সন্তান নহে, পরের সন্তানের জন্যও এইরূপ করিতে পারিতেন। একবার আমি বেথুন স্কুলের একটি ক্ষুদ্র বালিকার অভিভাবকত্ব প্রাপ্ত হই। তাহার টাইফয়েড জ্বর হইলে তাহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। চিন্ময়ীর জন্মের পর মাতৃদেবী তখন সূতিকাগার হইতে সবে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার ক্রোড়ের সন্তানটি দশ-বার' দিনের অধিক হইবে না। সেই অবস্থায় রুগ্না বালিকার কাপড়-চোপড় স্বহস্তে কাচিয়া দিতেন এবং অন্যপ্রকারে তাহার শুশ্রূষার সাহায্য করিতেন। তখন আমার বি-এ পরীক্ষা অতি নিকট বলিয়াই বোধহয় আমাকে খুব বেশী খাটিতে দিতেন না।

পিতামহাশয়ের পীড়ার সময় মাতৃদেবী রোগে-শোকে একান্ত ভগ্ন। তখনও দিবারাত্রি তাঁহার সেবা করিয়াছেন; দেখিয়া পিতৃদেব অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

আমার কনিষ্ঠ সন্তানের জন্মের কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার তৃতীয় ভগিনী প্রেমকুসুম স্বর্গগত হন। সে-সময় মাতৃদেবী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ওয়াল্টেয়ার যান। একটু আরোগ্য হইবার পরই, আমার কাছে কেহ নাই বলিয়া আমাকে ও আমার শিশুগুলিকে দেখা-শুনা আবশ্যক মনে করিয়া আমার নিকট আসিলেন। শোকের মধ্যে একরকম আলস্য ও বিলাসের অবসর থাকে, সে অবসর মাতৃদেবী গ্রহণ করেন নাই।

আমার ভাই যতীন্দ্র যখন মায়ের হৃদয় ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া গেল তখন তিনি বধূকে লইয়া নেপালে যামিনীর নিকট ছিলেন। সেই শোকের অবস্থায়ও বন্ধুগণ তাঁহাকে পানাহার করাইতে গেলে কাঁদাকাটি ও ওজরআপত্তি না করিয়া কিছু খাইতে চেষ্টা করিতেন। বলিতেন, "যামিনীর এত কষ্ট, আবার আমাকে লইয়া যেন তাহার কষ্ট না হয়।" তিনি না

খাইলে বাসিনীও কিছু খাইবে না সেজন্যও চেষ্টাপূর্ব্বক কিছু গলাধঃকরণ আবশ্যক মনে করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও কিছু বলিতেন না, কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই হার মানিতেন। নিজের মত প্রচার করা বা অন্যাকে বলপূর্ব্বক নিজের মতানুবর্ত্তী করিবার কোন চেষ্টা তাঁহার ছিল না। তিনি নিরভিমানিনী ছিলেন এমন কথা বলিতে পারি না। অনাদরের ব্যথা নীরবে এবং গোপনে বহন করা যদি অভিমানের চিহ্ন হয় তবে তাহা তাঁহাতে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এই অভিমানের সহিত আত্মবিলোপী ভাবের (self effacement) আশ্চর্য্য সমন্বয় দেখিয়াছি।

পুত্রকন্যাকে সকলে ভালবাসে, পুত্রবধূকে সকলে ভালবাসিতে পারে না। মাতৃদেবী পুত্র হারাইয়া বধূকে বুকে টানিয়া লইলেন, বলিলেন, "তুমি আমার বড় আদরের, তুমি যে তার একমাত্র চিহ্ন।"

দাসদাসীদের প্রতি তাঁহার স্নেহযত্ন সর্ব্বদাই দেখিয়াছি। অতিথিঅভ্যাগতদিগের জন্য অনেক ত্যাগ-স্বীকার করিতেন। এই শিক্ষা অতি অল্পবয়সেই আরম্ভ হইয়াছিল। দেশে থাকিতে কতবার এমন হইয়াছে যে পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় একদল কুটুম্ব ভৃত্যাদি লইয়া গ্রামান্তর হইতে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং এক-ক্রমে মাসাধিক কাল থাকিয়া যাইতেন। ইহারা তাঁহার পূর্ব্বকথিত খুড়শ্বশুর মহাশয়ের বৈবাহিক-পরিবার। প্রথম রাত্রে নিজেরা অভুক্ত থাকিয়া বালিকা বধূ ও খুড়শাশুড়ী আপনাদের আহার্য্য ইহাদিগকে বাঁটিয়া দিতেন। তাহার পর যতদিন ইহারা থাকিতেন ইহাদের জন্য রন্ধনাদিতে ব্যস্ত থাকাতে কি দিবসে কি রাত্রে বধূ ও গৃহিণীর সময়ে আহার হইত না। এ কালে এরূপ আতিথ্য কেহ চাহেও না, পায়ও না।

আলস্য কাহাকে বলে মাতা জানিতেন না। বালিকা-বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি চিরদিন খুটিনা খুটিয়াছেন, বহুকাল হইতে রন্ধন করিয়াছেন। ইদানীং সে শক্তি ছিল না। তথাপি যেদিন তিনি শেষশয্যা গ্রহণ করিলেন, সেদিন বধূরা কার্য্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিল বলিয়া নিজে গিয়া সকলের জন্য পান সাজিতেছিলেন।

১৮৭২।৭৩ সনে তিনি একেবারে পৌত্তলিকতার সকল সংস্রব ত্যাগ করেন। তারপরক্রমে ব্রাহ্মপদ্ধতি-অনুসারে তাঁহার তৃতীয়া কন্যার নামকরণ হয়। তদবধি জীবনে প্রতিদিন উপাসনা করিয়াছেন। পিরোজপুরে তাঁহার জন্য গান শিখিতে চেষ্টা করিয়াছি, চিরকাল যেমন করিয়া পারি তাঁহাকে গান শুনাইতে হইয়াছে। ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকখানি তাঁহার প্রিয় সঙ্গী ছিল। চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল তবু চসমা চোখে দিয়া সঙ্গীতগুলি পড়িতে চেষ্টা করিতেন। মৃত্যুকালেও সঙ্গীতখানি শিয়রে ছিল দেখিলাম। কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে জানিবার জন্য তাঁহার চিরদিন কৌতূহল ছিল। খবরের কাগজে কি আছে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখিতাম, সন্ধ্যার সময় অথবা রাত্রে পুত্রবধূর হাতে একখানি সংবাদপত্র দিয়া উহা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন; অনেক ঘটনা যাহা আমরা ভুলিয়া যাইতাম তিনি মনে রাখিতেন।

সাতবৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, দশবৎসরে তিনি স্নেহময়ী শাশুড়ীকে হারাইয়া খুড়-শাশুড়ীদের অধীনে থাকিয়া আত্মশাসনে অভ্যস্ত হইতে থাকেন, সাড়ে-একুশ হইতে তেইশ বৎসর প্রাণপণে শ্বশুরের সেবা করেন, সাড়ে-তেইশ হইতে ৫৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সুখে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীরূপে স্বামীর অনুবর্ত্তন করেন। তাঁহার পাঁচ কন্যা ও পাঁচ পুত্রের মধ্যে একটি কন্যার শৈশবেই মৃত্যু হয়। তৃতীয়া কন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার শেষবয়সে তাঁহাকে বড়ই ব্যথা দিয়া যায়। পুত্রের মৃত্যুর চারিমাস পরেই তাঁহার বৈধব্য-প্রাপ্তি ঘটে। তাহার পর নীরবে ক্রমে আরও দুইটি শোকের কঠিন আঘাত সহিতে হইয়াছে। আমাদিগের নিকট বসিয়া মৃত্যুকামনা করিলে আমি বলিয়াছি,

"মা, তুমি এখন গেলে চলিবে না, এ পরিবারের কেন্দ্র তুমি, তোমাকে ঘিরিয়া, তোমার টানে, সকলে যে-যাহার স্থানে আছে, তুমি সরিয়া গেলে কে কোথায় গিয়া পড়িবে। তিনিও সেই আশঙ্কা একটু করিতেন এবং সকলকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা কিয়দংশে পূর্ণও হইয়াছে।

তিনি কাহাকেও কষ্ট দিতে চাহিতেন না। দেহে বল না থাকিলেও পুত্রগণের ও পুত্রবধূদের বিনা-সাহায্যে চলিতে চাহিতেন। ১৩ই আগষ্ট দ্বিপ্রহর-রাত্রে স্নানের ঘরে গিয়া পড়িয়া যান, বধূ ও পুত্রেরা গিয়া ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেয়। তখন তাহারা বা ডাক্তার আঘাতের গুরুত্ব কেহ অনুভব করে নাই। পরদিন সকালে তাঁহার চৈতন্য লোপ হইল। বেলা ৯টার সময় নীরবে পুরাতন গৃহ ত্যাগ করিয়া নবগৃহে স্বামী পুত্র কন্যা জামাতা ও দৌহিত্রের সহিত মিলিত হইতে গেলেন।

শ্রীকামিনী রায়

স্ত্রীধন

গল্প

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

অজস্র শ্রাবণধারার ঝম্ ঝম্ শব্দের বিরাম নেই। বেলা যে কতটা কিছুই বোঝা যায় না, পূব-পশ্চিম সমান অন্ধকার; দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা যে-কোনো সময় হ'তে পারে—মনে হ'চ্ছে।

দালানে, ঘরেও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মল-পায়ে ঝম্ ঝম্ ক'রে বেড়াচ্ছে—। কান্নার কোলাহলে, ভুরি-ভোজনের আয়োজনে, বর্ষাবর্ষণে বাড়ী মুখরিত।

ফুলের মালায় খোঁপা জড়ানো, হাতের কাজললতা-খানি কখনো মাথায় গোঁজা কখনো হাতে, উপবাসক্লিষ্ট কোমল মুখখানিতে চন্দন-তিলক আঁকা, একটি ঘরের এককোণে ক'নে ব'সে আছে—। আশেপাশে সম-অসম-বয়সী সখীরা দিদিরা বধূরা নানাবিধ কথায়-চর্চ্চায় মশগুল। বেশীর ভাগই আপনার আপনার বিয়ে, বিয়ের দিনের কথা; কি রকম গোলমাল, বিষ্টিপড়া, কতরাত্রে লগ্ন, কি ভীষণ ঘুম পাওয়া—ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটু বড় জনকতক এলেন।

'খাওয়া হ'ল তোমাদের দিদি?' দিদি মাথা নাড়লেন। বোঝা গেল বেলা তিনটে পার হ'য়ে গেছে—।

'কি কি দেওয়া হ'ল রে সুকু? সবই কি প'রে আছে?' দিদি-সম্বোধিতা, একটি কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুকুমারী বল্লে, 'না, রাত্তিরে পরানো হবে, এখনো সব পরানো হয় নি, আমি জানি না সব কি-কি।'

'তোরা কে কি দিলি?'—আর একজন প্রশ্ন করলেন।

বছর-দেড়েক আগে মাত্র বিয়ে হ'য়েছে। সুকুমারী ভাবনায় পড়ল। আলাদা কিছু দিতে হয় - সে তো জানে না, সে জানে কুটুম্বরাই দেন,—দিদিদেরও দিতে হ ..

প্রস্তুত ভাবে বল্লে, 'জানি না তো—

কথার স্রোত অন্য দিকে বইল, 'সুকুর বিয়েতে অনেক খরচপত্র হ'ল কি না, জ্যেঠামশায়ের রাগ হ'ল।' দিদি বল্লেন একজনকে। ক'নে, ক'নের দিদি সুকুমারী যেন নেই সেখানে।

'তাইতে বুঝি সুনীতির গহনা কম-কম হ'ল?' অপরা জিজ্ঞাসা করলেন। 'হবেই তো। ওকে যে বেশ ভালঘরে দিলেন, প্রথম মেয়েটি। মানুষ আর কি বারে বারে পারে—? দেখি রে তোর চুড়ীটা?'

দিদি সুকুমারীর হাতখানি টেনে নিলেন, চমৎকার ছ'গাছি চুড় অর্থাৎ একটু চওড়া চুড়ী।

'কে দিয়েছে—শাশুড়ী?'

'না, বাপই তো দিয়েছিলেন।' সুকু জবাব দিলে।

সকলেরই চোখ ক'নের মণিবন্ধে পড়ল, ক'নেরও দিদির চুড়ীর দিকে পড়ল। ক'নের হাতে সোনার সরু-সরু চুড়ী ক'গাছা ক'রে।

সবাই চুপ ক'রেই রইল। আবার অন্যপথে কথা চল্‌ল।

'বাপ রে, কি বিষ্টি নেমেছে! বলে, ধারাশ্রাবণ, ঠিক তাই। আজকেও দেখছি কাঁথা-চাদর কিছু শুকবে না, কি ক'রে যে শোবে সব।'

সকালবেলা বর-ক'নে-আশীর্বাদের সময় দেখা গেল—স্বস্থ তার চুড় দুগাছি বোনকে দিলে।

সঙ্গিনী একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁরে ওটা দিলি যে? শাশুড়ী জানেন? বলেছেন?

'ওটা ওর ভারি পছন্দ। আর, শাশুড়ী আর কি বলবেন!' সুকুমারী নতমুখী ক'নের বস্ত্রাভরণ অঙ্গের দিকে চেয়ে ছিল।

'হ্যাঁ গা বৌমা, তোমার দুগাছা চুড় দেখছি নে? তোমার বাবা যে দিয়েছিলেন সেই?—ফেলে এসেছ? মাকে চিঠি লিখে দাও। কি অসাবধান্ বাছা!' শাশুড়ী বধূর গহনা লোহার সিন্দুকে তুলছিলেন।

বধূ অপ্রতিভত মুখে এসে দাঁড়াল,—'সেটা মা সুনীতিকে আশীর্বাদ করেছি।'

অবাক! শাশুড়ী আধমিনিট চুপ ক'রে রইলেন,—অবাক হবারই কথা—

'বলা নেই কওয়া নেই দিয়ে দিলে?—আমাকে একবার বলতে হয়—মরিনি তো! আর, কেমন আক্কেলই বা তোমার মা'র, তোমার জিনিষ নিয়ে দিয়ে দেয়—?'

বধূও অবাক হ'য়ে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল তার জিনিষ হ'লেই বুঝি সে দিয়ে দিতে পারে—

'আমি তো জানতুম না মা, আমি ভেবেছিলাম ওটা তো—আমারি—'

বাধা দিয়ে শাশুড়ী বল্লেন, 'আমারি হ'লোই বা,—তোমারি ব'লে কি বড়দের একটি জিজ্ঞেসাবাদ নেই...? তা না হয় তুমি জান না, ছেলেমানুষ, তোমার মা-বাপেরও তো একটা বিবেচনা আছে?'

'মা তো জানেন না, মা।' অতি মৃদুস্বরে বধূ বল্লে; তার প্রায় চোখ ভ'রে এসেছিল।

'হ্যাঁ, মা জানে না!—তোমার বাছা সব তাতে জবাবটি দেওয়া চাই!' মনে মনে অনেক বিরক্তিতে নানাবিধ কথা উঠছিল, এই 'বেআক্কেলে' 'নেকামী' 'আস্পর্দা' গোছের...।

'কি মা?'—অমর এসে দাঁড়ালেন।

কথা-প্রথা সমালোচনা-আলোচনা হ'ল। মা পাঠালেন ছেলেকে—সব কথা ব'লে বিহিত করতে।

বিহিত হ'ল। স্বশুর বাবা এলেন—হাতে দু'গাছা নতুন সেই গড়নের চুড়।

শাশুড়ী বল্লেন, 'হ্যাঁ তাইতো, উনি হলেন গিয়ে জানমান ব্যক্তি। তুলে রাখ এখন তোমার কাছে।'

ঘরে এসে ছল-ছল চোখে মেয়ে বল্লে, 'বাবা, আবার কিনলে? ও যে আমার ছিল, তুমিই দিয়েছিলে—'

বাপ হেসে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, 'পাগলী, হোলই বা তোর—এদের না জিজ্ঞেস ক'রে হোল কিনা—'

মানে বুঝতে পারা যায় না, মেয়ে চুপ ক'রে রইল একটুখানি। 'কিন্তু এতো ওঁদের দেওয়া নয় বাবা,—আর আমার জিনিষ আমি কাকেকে দিতে পাব না?' চোখ ছাঁপিয়ে উঠল। 'তবে আর শুধু প'রে কি হবে?'

বাপ তেমনিই হেসে মেয়ের মাথায় মৃদু-মৃদু আঘাত করতে লাগলেন,—'এই রকম করতে হয় মা—তুমি ছেলেমানুষ, জান না'।

বাপের সার্থক ঘরে দেওয়া হ'য়েছিল। যাকে বলে, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী থাকা। সুকুমারীর গহনার পর গহনা, কাপড়-চোপড়,—বাড়ী-ঘর,—গাড়ী-ঘোড়া, ঐশ্বর্য্য...তিন ছেলে, এক মেয়ে।

অনেকেরই ঈর্ষার ভাগ্য।

মেয়ের আর দুটি ছেলের বিবাহ হ'য়েছে।

সুকুমারী সিন্দুক খোলেন, সব জিনিষ নাড়াচাড়া করেন, গোছগাছ করেন। ভেতরে-বাহিরে সব জমেছে করছে।

সুনীতির পর যাদের বিয়ে হ'য়েছে, শাশুড়ী মাকড়ী কিনে দিয়েছেন, আংটি কিনে দিয়েছেন,—কখনো বা মাথার ফুলকাঁটা দিয়েছেন। মনের কোন্ খানে কখনো বেজেছে,—কিন্তু সব অভ্যেসেই 'কঁড়া' পড়ে তো—।

কিন্তু যাই হোক, গৃহ-কর্ত্রী তার, স্বামী-পুত্র তার, ঐশ্বর্য্য—ঐশ্বর্য্যের যদি আনন্দ থাকে গর্ব্ব থাকে সব তাঁর!—মুর্ষিডিকের ঢালথেকে লোহার সিন্দুকের চাবী তার।

সুতরাং সেকথা ভাববার অবসর নেই, বেদনাবোধও নেই।

চাল সে যত ইচ্ছে খরচ করতে পারে—তারই তো!—টাকাও সে খরচ করে—তা ৫৲ থেকে ১০৲ ২০৲ অবধি নিজেই খরচ করতে পারে; তার পরে অবিশ্যি জিজ্ঞেস করতে হয়—কিন্তু তারই তো!—আর কারের তো নয়—।

অবসরহীন দিন।—তাঁবাকি-প্রণালীতে সংসার চলে; দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনায় সমস্তক্ষণ নিযুক্ত থাকতে হয়;—ষোলআনা ভার। স্বামী অবধি মাঝে মাঝে পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন, ছেলেরা সুবিনীত।

লোকজন, চাকর-ঝি, স্বজন-কুটুম্ব, দান-ধ্যান, গৃহিণী-পনাতে নিরবসর দিন কাটে।

ভাই-বোনদের কখনো মনে পড়ে, কখনো পড়ে না। মাঝে মাঝে বাপকে মনে পড়ে—মধুর আনন্দে, নির্ম্মল কৃতজ্ঞতায়। ক্ষোভের অবসর নেই। সরল গর্ব্বে সংসার আনন্দময় হ'য়ে ওঠে। তারই সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাপ দেখেছেন, স্বামী দেখছেন,—ছেলেরা দেখে।

চাকাটা অন্যদিকে ঘুরল। কর্ত্তা গেলেন। সুকুমারীর শরীর মন ভেঙে পড়ল।

কাজের নিয়ম—ভাঙা শরীরে সুকুমারী আবার ওঠেন। 'কিন্তু লাগে অনেক,—কিন্তু মন মায়ার বশ, ভুলেও যায় সব।

পৃথিবীর দিকে সুকুমারীর আয়ুর চাকা ঘোরে। ছেলেরা [illegible] মাঝেমাঝে বলেন, 'বাবা, শরীর তো খুব [illegible]—এইবার তোমাদের সব ভাগ-যোগ ক'রে দি।'

ছেলেরা বলে, 'তাড়া কিসের মা—'।

ছেলেরা কিন্তু তোমিনিকম টাটান্ পেয়েছে।

বৌয়েদের জেঠ নেবার অধিকার,—আর কি-তাদের ছাড়াবার রাখবার ক্ষমতা।

বৌয়েরা নিমন্ত্রণ যাবে; শাশুড়ীর শোবার ঘরে এসে দাঁড়াল, শাশুড়ী চাবি দিলেন।

সিন্দুক খুলে দুই বৌয়ে গহনা নিতে বসল।

'ভাই দেখ, মার চুড়ীগুলি কি চমৎকার!—'

মেজবৌ বলে, 'কে বলবে সেকেলে গড়ন, যেন ঠিক এখনকার মতন। আমি সেদিন জষ্টিস্ মিত্তিরের বৌয়ের হাতে দেখেছিলাম।' মেজ বৌর বাপ বেশ বড় উকিল।

মার কানে গেল, বল্লেন, 'তা, তোমরা পর না বাছা যার যা ইচ্ছে হয়।—সীতাহারটি মেজবৌমা পর,—বড়বৌমা চুড়ী-দু'গাছা পর, আরও পর হাতের তাবিজ আর বাঁক, দু'জনে দু'জোড়া পর—।'

'তোমার সব গহনাই কিন্তু মা বেশ সৌখীন'—একেলে ধরণের বড়বৌ বল্লে।

মেজবৌ বলে, 'মা তোমার সব গহনাই কি বাবা দিয়েছিলেন তোমায়—? এইসব চুড়ী, মুক্তোর মালা?'

'না, চুড়ীজোড়াটা আমার বাবা দিয়েছিলেন। তিনি খুব সখ পছন্দর লোক ছিলেন। কোন বিলিতি দোকান থেকে কিনিয়ে এনেছিলেন—আরও অনেক গহনাই দিয়েছিলেন তিনি। আর কতক আমার শ্বশুর—কতক তোমার শ্বশুরও দিয়েছিলেন এখানে। মুক্তোর হার-ছড়াটি আমার শ্বশুর আশীর্ব্বাদ করেছিলেন।'

অতীতের সুখের ছায়াপথে মন একবার থমকে দাঁড়াল;—

সুনীতিকে চুড় দেওয়া, তাই নিয়ে কথা শোনা বাপের কথা,—তার পরে শত শত জায়গায় যাওয়া-আসা—বসনভূষণের,—শ্রীগড়নের প্রশংসালাভ—। কৃতজ্ঞ ব্যথিত-আনন্দে মা-বাবাকে মনে পড়ল,—স্বামীর কথা মনে হ'ল।

বৌয়েরা—নিমন্ত্রণে চ'লে গেল।

পুরনোস্মৃতে অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল।

সন্ধ্যের পর ছেলেরা এসে মা'র কাছে বসলেন,

মা'র মনে হ'ল, আর দেরী ক'রে কি হবে!—ইচ্ছেটা প্রকাশ করলেন।

বড় বল্লেন, 'তোমার কি নেহাৎ ইচ্ছে? তাহ'লে হোক্।'

বাড়ীর ভাগ, বাসনের ভাগ—চুল-চিরে' কড়াক্রান্তি ক'রে হয়। পেতল, কাঁসা, তামা, লোহার বাসনই কি কম? আট সিন্দুক বাসন-কোসন, দোল-দুর্গোৎসব সবই আছে!—রূপার বাসনই এক সিন্দুক—বিয়ে অন্ন-প্রাশনে, পৈতে-ক্রিয়াকাণ্ডে সব বেরোয়।

তবু মা কি ভাবেন কেবলি। শেষে একদিন জপের পর কম্বলেতে বারান্দায় ব'সে ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল—আর দেরী করা নয়।

ছেলেরা এলো।

মা বল্লেন, 'দেখ বাবা, সব তো করলাম, এইবার আমার দু'চারখানা যা গহনা আছে আর কিছু নগদ টাকা আছে তার ভাগ করলেই নিশ্চিন্ত হই।'

'কি রকম ভাগ করতে চান?'—ছেলেরা চুপ ক'রেই রইল।

বলতে আর পারেন না, ইতস্ততঃ ক'রে শেষে বল্লেন, 'সরিকে ভাল ঘরে দিতে পারিনি, তেমন কিছুই ওর নেই,—আমার নগদ টাকাক'টি আর গহনার অর্দ্ধেক ভাবছি তাকে দিই—আর যা থাকবে বাকি—তা থেকে শৈলেনের বৌর জন্যে,—আর কিছু-কিছু এ বৌমাদের থাক্।—এইটি হ'লেই নিশ্চিন্ত হই—।'

খানিকক্ষণ ছেলেরা চুপ ক'রে রইল।

বড় ছেলে খানিক পরে বল্লেন, 'শৈলর বিয়ে হ'লে বৌমাকে দিতে হবে বৈকি,—তাতো সত্যি;—কিন্তু সরিকে আবার কি দেবার দরকার—তার কি বিয়ে দাওনি? আর সেসময় তো খুবই দিয়েছিলে!—সরিকে দেবার কোনো মানে আমি খুঁজে পাইনে।'

মা সঙ্কুচিত ভাবে বল্লেন, 'ওর বিয়ের সময় তিনি খুব দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ওরা যে নিতান্ত গেরস্ত-ঘর কি না,—আর স্ত্রীধন তো দেওয়া যায় মেয়েকে—তাই, তাই ভাবছিলাম—'

ছোট ছেলে বেড়িয়ে ফিরল,—সে এসে বসল মা'র কাছে।

ঈষৎ উচ্চস্বরে বড় ছেলে বল্লেন, 'গেরস্থ আর কি—আর 'স্ত্রীধন' ব'লে তো বিলিয়ে দিতে পার না?—টাকা কিছু দিতে চাও দাও, তাই ব'লে ওটা আমার মনে হয় না। আর এরাও কি তোমার মেয়ের মতন না?'

মা লজ্জায় অপ্রস্তুতে পড়লেন। 'তা' এদের যে সবই রইল বাবা! তোমরা বেঁচে থাক, কত আনবে, দেবে—তোমাদের বাড়ী-ঘর টাকা-কড়িও তিনি ক'রে গেছেন—অভাব নেই।'

উষ্ণ ভাবে বড় ছেলে বল্লেন, 'ওকে কি সৎপাত্রে দাওনি? পয়সা কপালে থাকে,—আজ যদি কিছু ভাল-মন্দ হয় ওর, আমাদেরই তো দেখ্‌তে শুনতে হবে—'

'ষাট্, ষাট্, ও কি কথা বাবা—'

অপ্রস্তুত হ'য়ে বড় ছেলে বল্লেন, 'সে কথা বলছিনে আমি।—কিন্তু আমাদের ভাল-মন্দ হ'লেও তো ও দেখবে না।'

'বালাই,—কি বলিস্ সব!'

কথা কেমন থেমে গেল। মনের ভেতর তার মায়া অঙ্কুর বেরতে লাগ্‌ল। কিন্তু সকলেই চুপ ক'রে রইলেন। মারও শ্রান্তি বোধ হ'চ্ছিল, চোখ বুজে চুপ ক'রে রইলেন, বধূকালের সুনীতিকে চুড়ী দেওয়ার কথা মনে পড়ল একবার।

*

'তা' মেজবৌ, যা'ই বল, তুমি, এবার ঠিক হয় নি কিন্তু।'—সকালবেলা ভাঁড়ার ঘরে দুই জায়ে কথা হ'চ্ছিল।

'কিন্তু আমি তাই শুনেছি বাবার কাছে, এ-রকম নিয়ম আছে।' মেজবৌর বাপও উকিল, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সখও ছিল।

'তা হ'তে পারে—কিন্তু দেওয়া তো ঠাকুর্‌ঝিকে কম হয়নি। উনি তো বাপছাড়াই গোত্র ছাড়াই হ'লেন। মেয়ে তো হাজার হোক!—কোন্ কালে উনি জানবেন—দিলেই তো সব পরে পরে গেল।—বিয়েতে হাজার ১২।১৩ বাবা খরচ করেছিলেন, বাড়ীর-প্রেসিডেন্সি-পড়া ছেলে ব'লে।'

মেজবৌর মনে ছবির মতন বাড়ী-গাড়ী-মোটর-ঐশ্বর্য্যময় শ্বশুরবাড়ীর চিত্র ভেসে গেল, সে কিছু আর বল্লে না। মনে হ'ল—আমাদেরও তো দিয়েছিলেন, আর রইলও তো সবই।

বড় বৌ বল্লেন, 'আমাদের বাপ তো আমাদের দেন নি বাপু ছেলেকে বঞ্চিত ক'রে,—এ উচিত নয়—'

মেজবৌ চুপ ক'রেই রইল। এবং 'উচিত কথা' বলাও উচিত নয়, সর্ব্বত্র সত্যি কথা বলা যায় না।

*

যা'ই হোক, ভাগ হ'ল।

মার রোগশয্যার পাশে লোহার সিন্দুক উজাড় ক'রে গহনা পড়ল।

কন্যাকাল, বধূকাল, কিশোরীকাল, তার পর সমস্ত জীবনের নানাবিধ গড়নের নানা রকমের ছোট-বড় অজস্র গহনা—মুকুট, সিঁথি, টায়রা, কপালপাটী, ঝাপটা, কান, ইয়ারিং, মাকড়ি, কানবালা, ফুলকাঁটা চিক্ৰী, সাতনর, সীতাহার, নেকলেস্, চিক, দড়িহার, গোটহার, বিছেহার, মুক্তোর মালা, কলার, তাবিজ, বাঁক, অনন্ত, জসম, বাজু, রুলি, বালা, ব্রেসলেট, চুড়, মুক্তোর চুড়ী, সোনার চুড়ী, রতনচুর, আংটী, তারপর গোট, চন্দ্রহার ইত্যাদি সব কত-কি ছোট-বড় স্তূপাকারে পড়ল রূপোর থালায়। তিনখানা থালায় ভাগ হ'তে লাগল।

তিন ভাগ হ'ল—বড়, মেজ, শৈলেনের;—সব ভাগের পর গয়নুর জন্ত রাখা হবে কিছু।

'অকল্যাণ'—সেই অকল্যাণের কথার পর মা আর কিছু বলেন নি, আজও বল্লেন না। যুক্তি-বিচার-তর্কের অবকাশ মনে নেই—একটা শ্রান্তিতে ভ'রে চুপ ক'রে দেখতে লাগলেন।

মেজ আর বড়র ছেলে-মেয়েরা সব জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। 'তাহ'লে মা, এই অনন্ত, গোট, রুলি আর দড়িহার রইল সবির?' জিজ্ঞাসু চোখে ছেলেরা মার পানে চাইলেন, 'ভারি আছে—ওজন কম নয়! ঝিঁয়ের মতন অনন্ত!'

মা বল্লেন, 'আচ্ছা।'

শুধু মনে হ'ল, শাঁখাসিঁদুর প'রে যমের তুষ্টিতে সে থাক্; দিয়ে কে কাকে সমৃদ্ধ করতে পারে......?

ছেলেরা ভগ্নমনে কথা কচ্ছিলেন। 'মা'র হোলো গিয়ে মেয়েলী বুদ্ধি; যা সম্ভব তাই করা উচিত;' এই সব ধরণের কথা মনে উঠছিল; কথাও সেই ভাবের—যেন স্পষ্ট নয়। মা'র বুদ্ধিকে ছোট করা হোলো; মাকে কি?··· মেয়েমানুষের কবে বিষয়বুদ্ধি থাকে—।

বৌয়েরা অবগুণ্ঠন টেনে দরজার কাছে ব'সে ছিল।

বড়বৌ উঠে দাঁড়াল—রান্নাঘরে ঠাকুর ডাকাডাকি করছে, মার পথ্য তৈরী করতে হবে।

সুকুমারী বল্লেন, 'তোমরা তুলে ফেল মা এবার এই সব।' বৌর মেয়ে বল্লে,—'এ সব আমি নোব মা!' একটা মস্ত চন্দ্রহার সে গলায় প'রে মার সঙ্গে উঠল—আজকে সে সেইটে প'রে থাকবে—'তুমি পাবে না, সুরো পাবে না!'

সস্নেহে বাপ একটু হাসলেন; বল্লেন, 'আচ্ছা তুমিই নিও সব। এই বয়সে বেটী গহনা চিনেছে, দেখেছ মা—?

শাশুড়ী বল্লেন,—'ওগো বৌমা, ওকে একটা হার পরিয়ে দাও। চন্দ্রহার পরেছে গলায়।'

বাপ হাসলেন—মেয়ের হাত ধ'রে বাইরে উঠে গেলেন। মেজ ছেলেও উঠলেন।

শুকুমারী মেজবৌকে ডেকে বল্লেন, 'ও বৌমা, তোমার তোলো।' মেজ বৌরও কাজ প'ড়ে ছিল—শাশুড়ীর পূজার যোগাড় করা, কাপড় ছাড়ানো, সরবৎ ক'রে দেওয়া;—এসে দাঁড়াল।

তুলতে একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল; তার পেলে ক্ষতি নেই না পেলে বিরক্তি নেই, এই বোধ হয় ভাবটা।

ছোট ছেলে মা'র জন্তে ওষুধ ঠিক করছিল; বল্লে, 'মেজ বৌ, মাকে জল এনে দাও তো।'

মা বল্লেন, 'তোরটা কোথায় রাখবি? বৌমারা তুলবেন?'

মেজ বৌ জল আনতে গিয়েছিল।

ছেলে এসে মা'র কোলের ওপর মুখ রেখে বল্লে, 'আমার থেকে আদ্ধেক সরিকে দাও না মা ?'

মার চোখ থেকে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়তে লাগল।

একটু থেমে বল্লেন, 'তুমিই দাও, বাবা, ওতো তোমারি দেওয়া। আর নাই বা দিলে, দেওয়া তো হ'য়েছেও, হ'লও'

'কই ?—'

মেজ বৌ জল নিয়ে এলেন।

'ওষুধটা খাও এবার।'—ছেলে বল্লে।

'দাঁড়া, কাপড় ছাড়ি, পূজো করি,' মা উঠলেন।

'কি হে, হঠাৎ যে!'—সরযূর স্বামী—গিরীন্দ্র—ঘরে ঢুকে কনিষ্ঠ শ্যালককে দেখে বল্লেন, 'ভালোতো মা ?'

শৈলেন বল্লে,—'এমনি, আপনার তো ছুটির দিনও দেখা পাওয়া দুর্লভ। মা'র অসুখটা কম আছে,—সরিকে দেখতে এসেছিলাম।'

'সময় কোথা হে ? একজামিনের পেপার নিয়ে পড়িছি যে!'—ভগ্নীপতি বল্লেন। শৈলেন খানিক গল্প ক'রে চ'লে গেল।

টেবিলের ওপর স্তূপাকার খাতাপত্র। গিরীন্দ্র একমনে কাজ করছেন।

ছেলের দুধের বাটি,—পানের ডিবে, বিস্কুট, বাতাসা, ঝিনুক ইত্যাদি নানাবিধ নৈশ জিনিষে হাত ভরিয়ে সরযূবালা ঘরে ঢুকলেন।

'তবেই হ'য়েছে—ঐ কাজ নিয়ে পড়েছ!' স্ত্রী টীকা করলেন। স্বামী অন্যমনে বল্লেন, 'হুঁ, তারপর ?'

'তারপর আবার কিসের ?'···সরযূ বল্লে।

'এই যে তুমি কি বল্লে—না ?' স্বামী মুখ তুল্লেন।

সরযূ হাসলে—'কিন্তু আজ শোনবার মতন কথা আছে। আজ ছোড়দা এসেছিল।' গহনাভাগের সমস্ত পালা ব'লে সরযূ মৃদু হেসে বল্লে, 'তাই মা বলেছিলেন সরিকে গেরস্তঘরে দিয়েছি। সকৌতুকে স্বামীর মুখের দিকে চাইলে।

'তারপর ?' স্বামীও কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করলেন।

'তাই ছোড়দা সব গল্প করছিল—আর আমার কি-কি ছিল ছেড়ে গেল।'

'সত্যি ? তাহ'লে আজ কিছু লাভ হ'য়েছে বল তোমার! সকালে মুখ দেখেছি কার!—বিশ্বাস তো কর না!—দেখলে আমার চেহারার 'পয়'—!'

'আহা তাহ'লে তো রোজই পাওয়া উচিত!'

ঝিনুক-বাটীর কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে খোকাকে স-কোলাহলে দুগ্ধপান-নিরত স্ত্রীর পানে চেয়ে বল্লেন, 'কিন্তু গেরস্তদের বৌ আজ গরীব গেরস্তকে পান দিতে ভুলে গেছে!'

'ওমা দেখেছ,—একেবারে ভুলে গিছি—দিই!' ছেলেকে শুইয়ে হাত ধুয়ে সরযূ পান নিয়ে স্বামীর চেয়ারের পাশে দাঁড়াল। স্বামী পানশুদ্ধ তার ডান হাতখানা নিজের বাঁ হাতে মুঠো ক'রে ধ'রে নিলেন,—'তাহ'লে গেরস্তঘরে প'ড়ে সরোর কিন্তু বড় দুঃখ, না ?'—তাঁর চোখে সপরিহাস দৃষ্টি, ঠোঁটে মৃদু গাম্ভীর্য্য।

'যাও, কি যে কথার ছিরি! নাও পানটা।' সরযূ টেবিলের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে খাতার বহর দেখছিল,—'আজ আর খাতা দেখতে হবে না।'

—'কেন বলত ?—অনেক কাজ আছে যে!' স্বামী হাসলেন।

'রোজ রোজ কি কাজ,—পোড়া কপাল ছুটির'—

স্বামী অন্যমনে তার দিকে চেয়েছিলেন, মুঠোটা ছাড়িয়ে পান খাবার কিম্বা কাজ করবার কোনো আগ্রহই তাঁর মুখে দেখা যাচ্ছিল না।

বোধ হয় সংসারের কাজ সারা হ'ল।

ছেলেপিলে, অসুখ-বিসুখ, ঝি-চাকর, দারোয়ান-কোচম্যান সব সমস্যা আলোচনা হ'য়ে থামল।

'ঠাকুরপো তার ভাগ থেকে আদ্ধেক ঠাকুরঝিকে দিয়ে এসেছে জানো ?'

নগেন বল্লেন, 'বটে! না তো!'

'তা মার যেসব উল্টো ছিষ্টি,—একবার তো বাপু দেওয়া হ'য়েছে!'

নগেন শুধু 'হ্যাঁ' বল্লেন, আর কথা বাড়ালেন না। কেমিয়ে অকারণে কথা বলা তাঁর স্বভাব নয়—বিশেষ ক'রে মা'র বিষয়ে। মার বুদ্ধিতে তাঁর খুব

ভরসা না থাকতে পারে—কিন্তু তাই ব'লে সেটা আলোচনা করা !'

মেজবৌ বল্লে, 'কিন্তু যাই বল, এটা তোমাদের ভাল কাজ হয় নি, হকের হিসেবে;—আর মাতো অর্দ্ধেকই দিতে বলেছিলেন—তোমাদের তো সব রইল।'

কাগজ পড়তে পড়তে বরেন বল্লেন, 'হুঁ।'

'বাবা বলেন,—'মেজবৌ আর দু'একটা কি বল্‌তে গেল, উত্তর পেলে না, রাগ ক'রে শুয়ে পড়ল।

*

সুকুমারীর পথের যখন হিসাব মতন মাইল-কতক পথ আছে, আর মাস-ছয়েক হয়ত সময় আছে;—হঠাৎ খবর এলো, সরযূর ভাগ্য ভালমন্দের মন্দটা বেছে নিয়েছে।

মাইল এসে গজ-কতকে ঠেক্‌ল, ছ'মাস একমাসে দাঁড়াল; সেই যে মা মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লেন, আর সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেনও না ফিরেও চাইলেন না।

শাঁখা-সিঁদুর-সমৃদ্ধির পাশবন্ধন কাটিয়ে সরযূ মুক্ত হ'য়ে জগৎ মিথ্যার পথে এসে দাঁড়াল।

বছর কতক কেটেছে—ইতিমধ্যে শৈলেনের বিয়ে হ'য়েছে, একটি ছেলেও হ'য়েছে।

সরযূ বেশীর ভাগই এখানে থাকে। একটি মাত্র ছেলে—বছর সাতেকের।

সন্ধ্যের পর বৌয়েদের কোথায় নিমন্ত্রণ আছে—তার জন্ত তারা ঘরের ভিতর ব্যস্ত।

সরযূ ছোটভায়ের ছেলেকে কোলে নিয়ে বারান্দায় ব'সে ছিল।

ছোটবৌর প্রসাধন হ'ল।

'ওমা তুই হাতে শুধু ঐ প'রে যাবি?' বড় বৌ নিজের হাতের কি একটা গহনা পরতে পরতে বল্লেন।

মেজ'রও হ'য়েছিল, সেও চেয়ে দেখলে—'তাই তো, ছোট বৌর ওকি আজ হ'ল? হাতটা যে নেড়া মনে হ'চ্ছে। তোমার হাতের আর কিছু নেই?'

ছোট বৌ জায়েদের হাতের আর গলার আধুনিক অলঙ্কারের দিকে চেয়ে ছিল,—তাদের তুলনায় ওর নিতান্ত আস্তিকেলে গহনা।

'হোক্‌ গে ভাই, হবে'খন এতেই'—সে বল্লে।

মেজ বৌ বল্লে—'না, কেমন সং দেখাবে, না বড়দি? আমরা বড়রা এত প'রে যাব!'

মাথার ঘোমটা ঠিক করতে করতে বড় বৌ আয়নার দিকে চেয়ে বল্লেন, 'হুঁ—দেখি আমাদের আর কি আছে?' সুবিধেমতন কিছু পাওয়া গেল না নিজেদের বাক্সে।

'হ্যাঁ ভাই তোমাদের হ'ল? রাত হ'লো যে!' সরযূ এসে দাঁড়াল—'বেশ হ'য়েছে, কৈ ছোট বৌ, দেখি?'

'ছোট বৌর তেমন সুবিধেমতন কিছু পাওয়া গেল না'—বড় বৌ বল্লেন।

সরযূ বল্লে, 'আমার কিছু দোব?—এসো তো দেখি।'

গলার আর হাতের কি-দুটো দিয়ে সম্পূর্ণ হ'ল। ওরা চ'লে গেল।

অন্ধকার বারান্দায় সে খোকাকে ঘুম পাড়াতে বস্‌ল। অন্ধকারভরা বাগান,—আকাশে কৃষ্ণপক্ষের তারা। 'আয় ঘুম, যায় ঘুম, বাগদী পাড়া দিয়ে,' খোকার জন্ত একশো টাকার মলমলি-থান সোনার চাদর কিনে দিয়ে ঘুম এলো।

অনেক রাত্রে তারা এলো ফিরে;—খোকার পিসিমা তখন শুয়ে পড়েছে। বারবার ডাকায় কিন্তু ঘুম আজ বোধ হয় তার ওপর বিরক্ত হ'য়েছিলেন। তাই তার কাছে আর এলেন না।

বারান্দার একদিকে মাদুরে সে শুয়ে ছিল।

শৈলেন তখন বই পড়ছিল। সুসজ্জিতা পত্নীকে দেখে একটু পরিহাসের হাসিভরা দৃষ্টিতে সে চাইলে।

'পতিব্রতা স্ত্রীরা সেকালে শুনেছি স্বামীর জন্তই সাজতেন, একেলে পতিপ্রাণারা নিমন্ত্রণবাড়ীর সখীদের জন্ত সাজেন!'

'হ্যাঁ গো,—'টেবিলের ওপর অলঙ্কারের স্তূপ জমা হ'চ্ছিল। 'আচ্ছা এই চুড়ীদুটো কি রকম?' প্রশ্ন করলে।

'কোনটি? আমাদের নাকি গহনা মনে থাকবে?' শৈলেন বল্লে। ছোটবৌ হাতে তুলে দিলে স্বামীর।

'হ্যাঁ, মনে হ'চ্ছে—এটা মা'রি ছিল—কোথায় পেলে?'

'ঠাকুর্ঝি দিলেন পরতে।—তাই দিদিরা বলছিলেন।'

'কি বলেছিলেন?'—

ওঁরা বল্লেন, মাতো ওটা তোর জন্যেই রেখেছিলেন—ঠাকুঝির কাছে কবে গেল?'—

শৈলেন ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বল্লে, 'মা'র ইচ্ছে হ'য়েছিল সরো তাঁর সব জিনিষ নাহোক খানিকটা পায়,—যাক্, সেটা হ'লনা যখন, তখন আমি আমার ভাগের থেকে অর্দ্ধেক সরোকে দিয়ে এসেছিলাম মা'র মত নিয়ে।—ও মা'র মেয়েই।

'আমি কি বলছি কিছু? দিদিরা বল্লেন, ঠাকুঝিকে তো বিয়ের সময় কম কিছু দেওয়া হয়নি,—আর ওঁর দরকারই বা কি এখন গয়নার—?' ছোটবৌ মুক্তোর মালটাও খুলে রাখলে। 'ওঁরা বল্লেন হিসেব মতন মা ওটা তোর জন্যেই রেখেছিলেন।'

'তোমরা সব কি কথা কও!' ব'লে শৈলেন উঠে গেল। সুসজ্জিতা গ্রীষ্ম রাত্রির সমস্ত মাধুর্য্য ঝ'রে পড়ে যেন একটা হাড়-বেরকরা সঙ্কীর্ণ লোলুপতা সুমুখে এসে দাঁড়াল।

সরযূর কানে পৌছল খানিক। মনে হ'ল, একবার উঠে কোথাও স'রে যায়,—কিন্তু শৈলেনের বিরক্ত মুখের কথা পাশের ঘরে তার কানে পৌছাল।

এত ইতিহাস সে জানতো না। বহুদিন আগের সেই সন্ধ্যা মনে পড়ল…।

গহনার দুঃখ আর কি হবে? হাসি এল একটু—কিন্তু পরক্ষণেই চোখ ভ'রে উঠ্‌ল।

সমস্ত রাত্রি কি অন্যমনে নির্ব্বাক অদ্ভুত জটিল বেদনায় কেটে গেলো, ঘুম আর আসে না।

শেষরাত্রে তখন ভোরের আকাশে পূবে শুকতারা জ্বল্ জ্বল্ করছে,* বারান্দায় মাদুরে—ঘুম এলো, ছেলে ঘরে ঘুমচ্ছে।

শৈলেন ডাকলে, 'সরো, এখানে যে?—এত বেলা!'

সরোর ঘুম ভেঙে গেল। ভোরের স্বপ্নটা কোথায় পথ হারিয়ে ফেলে,—অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠে বসল।

শৈলেন একটু আশ্চর্য্যভাবে তার দিকে চেয়ে রইল। সমস্ত রাত্রির ব্যাকুল জাগরণক্লিষ্ট মনের ছাপ মুখে পড়েছে;…মুখের হাসির পাশে মনের সাগরে অশ্রু টলমল করছে—।

সন্ধ্যার সময় বারান্দায় এক-'পেতে' সুপারি নিয়ে সরযূ উন্মন হ'য়ে ব'সে ছিল। স্বপ্নটা সারাদিন ধ'রে মনে আর আনতে পারছিল না। মনে হ'ল, একবার এসে দাঁড়িয়ে কি ব'লে গেলেন। গায়ে তেমনি সাদা পাঞ্জাবি, সহাস্য মুখ, স্নিগ্ধ চোখ; কিন্তু কি কথা…কিছুতেই মনে আসে না। নিরভিমান মনে আর কোন কথা ছিল না।

হাতে জাঁতির মাঝে সুপারি দেওয়া,—কাটতে ভয় হ'চ্ছে পাছে ধ্যানস্মৃতিতে আনা সে-ই হারিয়ে যায়;—

ছোট বৌ এসে দাঁড়াল—'কি করছ ভাই?'

জাঁতি আপনার কাজে মন দিলে, সুপারি কাটা হ'তে লাগল। 'কিছু না, বসেছিলাম সুপুরিগুলো নিয়ে।'—সরযূ সোজা হ'য়ে বসল।

'তোমার গহনাগুলো নেবে?—এখন তুলবে?'—ছোট বৌ দুটো গহনার কেশ হাতে ক'রে জিজ্ঞেস করলে।

ননদ বল্লে, 'এগুলো তুমি রাখনা ছোট বৌ,—আমি তো তোমাকে কিছু দিইনি এমন।'

'সে কি ভাই?'…সবিস্ময়ে ছোট বৌ চেয়ে রইল ননদের দিকে। ঠাকুঝি কি ওদের বাড়ীর আলোচনা জানতে পেরেছে?—কি ক'রে জানলেন? কিন্তু কথাতো রাগ করবার মতন নয়, বেশ সহজইতো মনে হ'চ্ছে।—

স্মিতহাস্যে সরযূ বল্লে, 'ভাবছ কেন, আমিতো দিতে পারি তোমাকে,—তোমার বয়সে কত বড়, আর আমার কি হবে ওসব!'

'সে কি ভাই, তোমার নলিন্ বেঁচে থাক্—তার বৌ পরবে।' 'নারে পাগল, তখন তার মামারা দেবে 'খন,' সরযূ বল্লে, 'যাও রেখে দাও—'

ছোট বৌ বিস্ময়ে আশ্চর্য্যে একেবারে ভ'রে গিয়েছিল, মায়েদের কাছে বলতে গেল সব কথা।

সরযূ হারানো স্বপ্নের খেই সকালের কাজের আড়ালে, দুপুরের শুব্ধ অবসরে, এখন সন্ধ্যায় দৃষ্টিহীন অপরূপ অন্ধকারের বুকে ধ্যানের মধ্যেও খুঁজে পেলে না;—অন্ধকার বারাণ্ডায় ব'সে শুধু রাশীকৃত কাটা-সুপারিতে 'পেতেটি' ভ'রে উঠতে লাগল।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

অন্তরাগ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৪০

পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যে বিমলা একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিলেন, তারপর ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিলেন। বিনয় পাশেই ছিল, সে বাধা দিয়া বলিল, "এখন তাড়াতাড়ি উঠবেন না, একটু শুয়ে থাকুন।"

এখন আর বিনয় পূর্বের মত বিমলাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিল না। প্রস্তাবিতা পত্নীর মাতার কৃত্রিম মাতৃত্ব অতিক্রম করিয়া যে এখন জননীর দাবী উপস্থিত করিয়াছে, যে দাবী সত্য হইলে জীবনের মধুরতম দিকটা একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে, তাহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতে মুখে বাধিল।

বিমলা ধীরে ধীরে বিনয়ের বাঁ হাতখানা টানিয়া লইয়া অস্ত্র-চিহ্নের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন, তারপর তাঁহার দুই চক্ষু হইতে নিঃশব্দে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিমূঢ়ভাবে দ্বিজনাথ মনে মনে কি চিন্তা করিতেছিলেন, বিমলাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন, "কাঁদছ কেন বিমল? বিনয় যদি আমাদের সেই হারানো ছেলে হয় তা হ'লে ত খুব আনন্দেরই কথা।"

আঁচলে চক্ষু মুছিয়া বিমলা বলিলেন, "যদি বলছ তুমি? এখনো তোমার সন্দেহ আছে? এখনো খোকাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না?"

অপ্রতিভ হইয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "তা পারছি—কিন্তু—"

দ্বিজনাথকে কথা শেষ করিতে না দিয়া অধীর ভাবে বিমলা বলিলেন, "তুমি বাপ, তোমার 'কিন্তু' থাকতে পারে—আমার কিন্তু নেই।"

এবার বিনয় কথা কহিল। দৃঢ় অথচ শান্ত স্বরে সে বলিল, "দেখুন, আমার কিন্তু এ বিষয়ে রীতিমত 'কিন্তু' আছে। আমার বাবা ছিলেন প্রিয়কান্ত রায়; তিনি যখন মারা যান তখন আমার বয়স সাত বৎসর। মা যখন মারা যান তখন আমার বয়স পাঁচ বৎসর। তিনি আমার সম্মুখেই মারা যান—সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে; পাঁচ বছর বয়সের অনেক কথাই আমার মনে পড়ে। আমার মনে হয় এ বিষয়ে আপনাদের ভুল হচ্চে।"

কমলা অবসন্ন দেহে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল, বিনয়ের কথা শুনিয়া সোজা হইয়া ফিরিয়া বসিল। অকস্মাৎ যে অচিন্তিত বিপর্যয় জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎকে ওলট-পালট করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইবার আশায় তাহার দেহের মধ্যে রক্ত চলাচল আরম্ভ হইল। জননীর অনুমান মিথ্যা হউক, এই প্রার্থনায় তাহার সমস্ত চিত্ত, যে অপরিজ্ঞাত অবিদিত দেবতার এ পর্যন্ত কোনো দিন শরণ ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় নাই, তাহার পদতলে অবনমিত হইতে লাগিল।

বিনয়ের দিকে চাহিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "এখন কথা হচ্চে এই যে, প্রিয়কান্ত রায় তোমার পালক পিতা ছিলেন কি না। তোমাকে দেখে বিমলার চিন্‌তে পারার সঙ্গে তোমার বাঁ হাতে অস্ত্রের দাগ বেরুনো এমন একটা প্রবল ঘটনা যে, একে সহজে উপেক্ষা করবার উপায় নেই। প্রিয়কান্ত রায় তোমার পালক

পিতা ছিলেন ব'লেই একটা কঠিন সন্দেহ দাঁড়াচ্ছে। সে প্রায় বাইশ তেইশ বছরের কথা হ'ল, জানকী চৌধুরী নামে একজন বড় জমিদারের মানহানির মকর্দমায় আমি ঢাকা গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে বিমলা আর আমাদের একটি বছর দুয়েকের ছেলে ছিল। ফেরবার সময়ে ঝড়ে ষ্টীমার ডুবি হয়। আমি আর বিমলা কোনো রকমে রক্ষা পাই কিন্তু বিমলার বাহুবন্ধন থেকে ছিন্ন হয়ে আমাদের সে ছেলেটি যে কোথায় যায় তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। বহু অর্থব্যয় ক'রে সাতদিন পদ্মার তীরে তীরে খোঁজ তল্লাস করাই—কিন্তু কোনো ফল হয় নি। বছরখানেক বয়সের সময়ে সে ছেলেটির বাঁ হাতে একটা খুব বড় ফোড়া হ'য়ে অস্ত্র হয়। তোমার সঙ্গে আমাদের সে ছেলেটির মোটামুটি বয়সের মিল, তোমার বাঁ হাতে অস্ত্রের দাগ, কোনো আত্মীয়ের জিম্মা না ক'রে দিয়ে ভিন্নজাত মায়ের তোমাকে মিশনে দেওয়া,—এ সমস্তই বিমলার অনুমানের স্বপক্ষে প্রবল ভাবে ইঙ্গিত করছে।"

দ্বিজনাথের কথা শুনিয়া বিনয়ের মুখমণ্ডল চিন্তাবৃত হইল। ক্ষণকাল মনে মনে কি ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে বলিল, "বাঁ হাতে অস্ত্রের দাগ খুবই আশ্চর্য্য ঘটনা বটে। তা ছাড়া এর মধ্যে আর একটা বিশেষ কথা আছে। আমার মিশন ছাড়বার সময়ে মিশনের রেক্টর আমাকে বলেছিলেন যে, আমার সম্পর্কে যদি কোনো দিন কোনো বড় রকম সমস্যা উপস্থিত হয় তা হ'লে আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমার মনে হয় তাঁর সঙ্গে দেখা করলে এ সমস্যার সমাধান হ'তে পারে;—এ'ত একটা কম গুরুতর সমস্যা নয়।"

ব্যগ্র স্বরে দ্বিজনাথ বলিলেন, "নিশ্চয়ই নয়। চল, এখনি তোমার মিশনে যাওয়া যাক্। মহবুব্!"

অবিলম্বে মহবুব্ আসিয়া দাঁড়াইল।

"জল্‌দি গাড়ি তৈয়ার করো।"

"যো হুকুম" বলিয়া মহবুব্ ক্ষিপ্রবেগে প্রস্থান করিল।

চা, টোষ্ট, মাখম, কেক, সন্দেশ, রসগোল্লা সমস্তই নিজ নিজ স্থানে পড়িয়া রহিল, কাহারো সে সকলের কথা মনেও পড়িল না, দ্বিজনাথ বিনয়কে লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিমলা ফিরিয়া দেখিলেন কমলা নিঃশব্দে বসিয়া রহিয়াছে—মুখে তাহার বর্ষার জলাভূমির তমসা; স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন, "কমল!"

"কি মা?"

"শরীরটা এখনো একটু দুর্ব্বল মনে হচ্ছে—আমাকে ধ'রে নিয়ে চল্। ঘর গিয়ে শোব।"

"আর একটু এখানে থাক না মা।"

"না, এখন আর তত দুর্ব্বল মনে হচ্ছে না—যেতে পারব।" বলিয়া বিমলা উঠিয়া বসিলেন।

কমলা তাড়াতাড়ি আসিয়া জননীকে ধরিয়া তুলিল, তাহার পর ধীরে ধীরে শয়ন কক্ষে লইয়া গিয়া শয্যার উপর বসাইয়া দিল।

"আস্তে আস্তে শুয়ে পড় মা।"

বিমলা বলিলেন, "না, এখন একটু ব'সেই থাকি। তুই আমার পাশে ব'স্ কমল।"

কমলা মাতার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিমলা বলিলেন, "যে যাই বলুক, বিনয় যে আমার সেই হারানো ছেলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আজ কত আনন্দের দিন কমলা, আমরা অত দুঃখের ছেলে ফিরিয়ে পেলাম—তুই তোর দাদা পেলি। কেমন, ঠিক নয়? খুব আনন্দের দিন নয়?" বিমলা কমলার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন।

কমলা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আনন্দের দিন বই কি।"

বিমলা বলিলেন, "তা ছাড়া, বিনয়কে আমরা ত হারালাম না—আরো বেশি ক'রেই পেলাম। তাই যে কত আদরের জিনিস তা এইবার তুই বুঝ্‌বি কমল। এ ত আর সম্পর্ক পাতানো ভাই নয়, একেবারে মায়ের পেটের ভাই। দু দিনেই দেখ্‌বি কত মায়া প'ড়ে যাবে।"

জননীর এই সকল কথার উৎস কোথায় এবং গতি কোন্ দিকে তাহা নির্ণয় করিতে কমলার এক মুহূর্ত বিলম্ব হইল না। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তুমি তবে একটু

ঘুমোবার চেষ্টা কর মা। তোমার গলার আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে এখনো তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হও নি।"

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়; কথা বলিতে বিমলার তখনো হাঁপ ধরিতেছিল এবং উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় একটা দুর্বলতার অবসন্নতা শরীরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মুখে বলিলেন, "না, এখন আর কোনো কষ্ট বোধ করছি নে।" কিন্তু ধীরে ধীরে শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন। কমলা সরিয়া বসিয়া বিমলার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। ক্লান্ত দেহে নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না—বিমলা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

তখন কমলা বসিয়া বসিয়া কত রকম কি চিন্তা করিতে লাগিল। সে চিন্তার আকার প্রকার কিছুই নির্ণয় করা যায় না—তাহার না আছে আদি না আছে অন্ত, সে চিন্তার মধ্যে লাভ ক্ষতির কোনো হদিস্ নাই—কুজ্ঝটিকার মত সে না বায়ু না বাষ্প! ভাবিতে ভাবিতে কমলারও চক্ষু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আসিল—সে তাহার জননীর পাশে ক্লান্ত অবশ দেহ এলাইয়া দিল।

ঘুম ভাঙিল দ্বিজনাথের কণ্ঠস্বরে। বেলা তখন প্রায় এগারোটা। কমলা ও বিমলা নিদ্রোত্থিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "তোমার কথাই ঠিক বিমল! বিনয় আমাদের সেই হারানো ছেলে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

উৎফুল্ল মুখে বিমলা বিনয়ের দিকে চাহিলেন। "তোমার কোনো সন্দেহ আছে বিনয়?"

বিনয় বলিল, "না মা, আমারো কোনো সন্দেহ নেই।"

বিমলা উঠিয়া গিয়া বিনয়ের শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন—বিনয় নত হইয়া বিমলার পদধূলি গ্রহণ করিল।

দ্বিজনাথকে সম্বোধন করিয়া বিমলা কহিলেন, "প্রমাণের জন্ত আমার মনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না—তবু তোমরা কি প্রমাণ নিয়ে এলে শুনি?"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "বিনয়কে বিসর্জন দেবার সময়ে প্রিয়কান্ত রায় একটি সীল করা চিঠি তখনকার রেক্টরের হাতে দিয়ে অনুরোধ করছিলেন যে, যদি কখনো বিনয়ের বিষয়ে কোনো গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হয়—তখন যেন চিঠিখানি খুলে প'ড়ে প্রয়োজন হ'লে বিনয়কে দেখ্‌তে দেওয়া হয়—অন্যথা নয়। আজকের ঘটনা শুনে রেক্টর বল্‌লেন, চিঠিতে যে ঐ সংক্রান্ত কোনো খবর আছে তার সন্দেহ নেই। খুলে দেখ্‌লেন ঠিক তাই। একজন জেলের ঘরে বিনয়কে দেখ্‌তে পেয়ে পঞ্চাশটাকা দিয়ে নিঃসন্তান প্রিয়কান্ত বিনয়কে কিনে নেন। তার মাস ছয়েক আগে হরিপুরের চরের বাঁকে একটা বড় তক্তার ওপর কাপড় চোপড় জড়িয়ে ভাস্‌তে দেখে জেলে তাকে উদ্ধার ক'রে বাড়ি নিয়ে যায়। চিঠিতে যা তারিখ দেওয়া আছে তা হিসেব ক'রে দেখ্‌লে বিনয়কে জেলের পাওয়ার সময়ের সঙ্গে ষ্টীমার ডুবির সময় ঠিক মিলে যায়। সুতরাং বিনয় যে আমাদের হারানো ছেলে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়েচে।"

প্রমাণ-কাহিনীর ভারে সমস্ত ঘরটা যেন ভারী হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কাহারো মুখে কথা সরিল না,—অবশেষে দ্বিজনাথ বলিলেন, "আজকের শুভদিনটা আমোদ প্রমোদ ক'রে কাটাতে হবে—সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দ। খাওয়া-দাওয়ার পরই কোথাও বেরিয়ে পড়া যাবে। শিগ্‌গীর খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে নাও।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না—কিন্তু কোথাও যাওয়াও হইল না। আনন্দের দিন নিরানন্দের কূলে কূলে অতিবাহিত হইল। সুখ-দুঃখ হাসি-অশ্রুর মধ্যে যে উদাস নিঃসঙ্গ অনুভূতি আছে তাহাই সকলের মনকে অধিকার করিয়া রহিল। গল্প জমিল না, কথোপকথন ছোট হইয়া শেষ হইয়া যাইতে লাগিল, কথাবার্তার মধ্যে নীরবতার পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে সকলে এক একখানা বই অথবা খবরের কাগজ লইয়া পরস্পরের নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইল। এই অলস উদাস দিনযাপনের জন্ত কেহ কাহারো নিকট কৈফিয়ত চাহিল

না, সকলেই বুঝিল, যে বাঁশির নল ফাটিয়াছে তাহা হইতে সুর বাহির করা কাহারো সাধ্য নহে।

সন্ধ্যা হইতেই আহারের তাড়া পড়িল—এবং আহার শেষ হইতেই প্রত্যেকে নিজ নিজ শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

৪১

পরদিন সকাল হইতে কিন্তু এই উদাস আড়ষ্ট ভাবটা কমিয়া আসিতে লাগিল এবং দিন চার পাঁচের মধ্যে অসতর্ক দৃষ্টি হইতে একেবারে তাহা লোপ পাইল।

অপরাহ্ণের দিকে কমলা আপনার ঘরে বসিয়া একটা বই পড়িতেছিল, পিছন দিকে বিনয় আসিয়া ডাকিল, "কমল!"

কমলা ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, "কি দাদা? কি মৎলব ক'রে?"

বিনয় বলিল, "একটা কথা বল্‌তে।"

"কি কথা শুনি?"

একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া বিনয় বলিল, "একটি ছেলে আছে—

কমলা বলিল, "হ্যাঁ তা'ত জানি। কিন্তু একটি মেয়েও আছে—

"নাম তার সন্তোষ।"

"নাম তার শোভা।"

"ধনে মানে-তার জোড়া পাওয়া শক্ত।"

"রূপে গুণে তার তুলনা পাওয়া কঠিন।"

"তুই যদি তাকে বিয়ে করিস—

"তুমি যদি তাকে বিয়ে কর—

"তা হ'লে খুব—

"তা হ'লে অতিশয়—

বিনয়কে বিলম্ব করিতে দেখিয়া কমলা হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে খুব কি হয় বল?"

গম্ভীরভাবে বিনয় বলিল,"খুব চমৎকার একটা কমেডি হয়।"

কমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; বলিল, "কমেডিটা খুব উপভোগ কর তুমি?"

বিনয় বলিল, "করি নে? এ কি সহজ কমেডি? আমার দিকটাই ধর। সন্তোষ বেচারা মনের দুঃখে দিলে শাপ, তাতে বর হ'ল—বউ পেতে গেয়ে পেলাম বোন। বউ ত' বিয়ে করলেই পাওয়া যায়—কিন্তু বোন কি ইচ্ছে করলেই কেউ পায়?"

কমলা বলিল, "বেশ ত, বিয়ে করলেই যখন বউ পাওয়া যায় তখন শোভাকে বিয়ে কর না।"

বিনয় বলিল, "রক্ষে কর! ন্যাড়া বেলতলায় ক'বার যায়। শোভাকে বিয়ে করতে গেলে হয় ত' সন্তোষ বেচারার দ্বিতীয় বারের শাপে প্রমাণ হ'য়ে যাবে যে, শোভা আমার মামাতো বোন!"

কমলা হাসিয়া বলিল, "বেশ ত ভালই হবে, বউ পেতে গিয়ে বোন পাবে। বোনত বউয়ের চেয়ে ভাল জিনিস!"

বিনয় বলিল, "ভাল জিনিষ বটে, কিন্তু ভাল জিনিষেরও ত' একটা সীমা আছে।"

কমলা হাসিয়া বলিল, "একটা বোনেতেই সীমা পৌঁছে গেলে? আর একটা হ'লেই সীমা অতিক্রম করবে?"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "নাঃ, তোমার সঙ্গে দেখ্‌চি কথায় পেরে ওঠা কঠিন।"

সন্ধ্যার সময় কমলা বারান্দায় বসিয়া বিমলার সহিত কথা কহিতেছিলেন, দ্বিজনাথ একজন পুরাতন ধনী মক্কেলের খাতিরে কমিশনে সাক্ষী জেরা করিতে গিয়াছিলেন। বিনয় আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, "মা, তোমার মেয়েটি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করচে না।"

বিমলা হাসিয়া বলিলেন, "কেন, কি করচে?"

বিনয় বলিল, "ভাল ক'রে কথাই কয় না।"

কমলা বলিল, "ওমা! সমস্ত দিন কথা ক'য়ে ক'য়ে মুখ ব্যথা হয়ে যায়--আবার বলছ কথা কয় না? কেন, তোমার সঙ্গে কথা কবনা কোন্ দুঃখে।"

"সম্পত্তির দুঃখে। বুঝেচ মা, কমলা মনে করে সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হ'য়ে দিব্যি

ব'সে ছিলাম, কোথা থেকে এক দাদা উড়ে এসে জুড়ে বসল। কাজ নেই মা, তুমি বাবাকে ব'লে সমস্ত সম্পত্তি ওর নামে লিখিয়ে দেওয়াও। শেষকালে ব্যারিষ্টার সন্তোষ চৌধুরী যখন জাল বিনয়চাঁদ ব'লে আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করবে তখন আমি পোটো মানুষ কি তার সঙ্গে পেরে উঠ্‌ব ?"

বিনয়ের কথা শুনিয়া বিমলা হাসিতে লাগিলেন। কমলা স্মিতমুখে বলিল, "পোটো মানুষটি কিন্তু নিতান্ত সহজ নয় মা, পেটের মধ্যে অনেক জিনিষ পোরা আছে।"

এই ভাবে সমস্তদিন হাস্য-পরিহাস, রঙ্গ-কৌতুক, কথাবার্ত্তা চলে। দ্বিজনাথ মনে মনে নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবেন ভাই-বোনের সম্পর্ক খুব সমারোহের সহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, কিন্তু বিমলার মন হাল্‌কা হয় না, সমারোহের দিকটাই তাঁহার মনকে ভাবাইয়া তোলে, মনে হয় এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন ভাবে শুধু অভিনয়েরই মধ্যে একটা জিনিষ গড়িয়া উঠিতে পারে। যে গাছে এক ঘণ্টার মধ্যে ফল ফলে সে গাছ মায়াতরু, তার শাখা প্রশাখা অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু মূল থাকে না।

দিন পাঁচেক পরে কালীপূজা এবং তাহার দুই দিন পরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। একটা কথা হঠাৎ খেয়াল করিয়া বিমলা মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ব্রতটি বেশ একটু ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত করিতে হইবে এবং কমলাকে দিয়া বিনয়কে ভাই ফোঁটা দেওয়াইয়া উভয়ের মনে ভাই-বোনের উপলব্ধিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কথাটা দ্বিজনাথও বেশ পছন্দ করিলেন। খুব সমারোহের সহিত উপঢৌকন-বস্ত্রাদির ফর্দ্দ হইতে লাগিল, দর্জ্জি আসিয়া বিনয়ের অনেক রকম মাপ লইয়া গেল, এবং বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলেও দ্বিজনাথ পুরোহিত ডাকাইয়া সেই দিনের জন্য কিছু মাঙ্গলিক পূজা পাঠের ব্যবস্থা করিলেন। বাড়ির মধ্যে একটা রীতিমত উৎসবের হৈ চৈ পড়িয়া গেল

সন্ধ্যার পর দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে শয়ন করিয়া বিনয় নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে কমলা আসিয়া নিকটে একটা চেয়ারে বসিল।

"দাদা, ভাই-ফোঁটার দিন তুমি আমাকে কি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবে, বল।"

বিনয় কমলার দিকে পাশ ফিরিয়া নড়িয়া শুইয়া বলিল, "আমাকেও কিছু দিতে হবে না কি কমল ?"

কমলা হাসিয়া বলিল, "হবে না ? আমি তোমাকে প্রণামী দোবো, আর তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদী দেবে না ?"

একটু ভাবিয়া বিনয় বলিল, "দোবো; আমার মনের একান্ত শুভ কামনাটুকু তোমাকে দোবো,—যাতে তোমার নির্ম্মল পবিত্র ভবিষ্যৎ একটি শিশির-ধোয়া ফুলের মত সুখে সৌন্দর্য্যে ফুটে ওঠে, কোনো দিক থেকে কোনো দুঃখ দৈন্য তাকে স্পর্শ না করে, আমার মনের সেই ঐকান্তিক কামনাটি আমার আদরের বোনটিকে আশীর্ব্বাদী দোবো। গরীব পটুয়া দাদার কাছ থেকে তার বেশী আর কি আশা করতে পার বল ?"

বিনয়ের কথা শুনিয়া কমলার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সন্ধ্যার তিমিরাহত আলোকের অন্তরালে নিজের মুখ লুকাইয়া লইয়া সে বলিল, "না দাদা, ফাঁকি দিলে হবে না, আমি আমার ইচ্ছে মত আশীর্ব্বাদী সে-দিন তোমার কাছ থেকে চেয়ে নোবো। আমাকে সে-দিন তোমার এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আসচে অঘ্রাণ মাসে তুমি শোভাকে বিয়ে করবে। তুমি জান না দাদা, শোভা তোমাকে কত ভালবাসে। তার সে ভালবাসা ব্যর্থ হবার নয়—তাকে তোমায় বিয়ে করতেই হবে। আমার এ অনুরোধে তুমি রাজি হও—লক্ষ্মীটি !"

বিনয় বলিল "পুরুষ-মানুষ হয়ে আমি কি ক'রে লক্ষ্মী হব—তার চেয়ে তুমি লক্ষ্মীটি হ'য়ে সন্তোষকে বিয়ে করতে রাজি হও ভাই। তুমিও জান না

কমল, কি ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে সন্তোষ তোমাকে ভালবাসে!" সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বিনয় বলিল, "তুমি যদি কথা দাও কমলা, আমি দার্জ্জিলিং-এ টেলিগ্রাম ক'রে সন্তোষকে ভাই-ফোঁটার দিন আসতে নিমন্ত্রণ করি।"

ব্যগ্রকণ্ঠে কমলা বলিল, "ও-সব ছেলেমানুষী কোরো না দাদা!—আমি স্থির করেছি বিয়ে করব না।"

এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় শুইয়া পড়িয়া বিনয় বলিল, "তুমি মেয়েমানুষ হ'য়ে স্থির করেছ বিয়ে করবে না—আর পুরুষমানুষ হ'য়ে আমিই কি বিয়ে করব ব'লে স্থির করেছি? আমি বিয়ে করব না বললে কেউ কিছু ভাববেও না, বলবেও না; তুমি সে কথা বললে সমাজ লগুড় নিয়ে তাড়া ক'রে আসবে। তখন সন্তোষ ত সন্তোষ যে-কোনো অসন্তোষকে বিয়ে করতে পথ পাবে না।"

কম্পিত কণ্ঠে কমলা বলিল, "সমাজকে আমি একটুও গ্রাহ্য করিনে!"

বিনয় বলিল, "তুমি হয় ত' কর না—কিন্তু বাবা করতে পারেন, মা করতে পারেন, আমি করতে পারি!"

সবিস্ময়ে কমলা বলিল, "তুমি কর দাদা?"

"করি নে?—যে ঘরে বাস করি সেই ঘরে কখনো দেশলাই জেলে আগুন লাগাতে পারি? শোনো কমলা, মনের অগোচর কথা নেই। সূর্য্য অস্ত যায়, কিন্তু আকাশে তার লাল রঙটুকু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লেগে থাকে—এ আমিও জানি তুমিও জানো। এ ক'দিন আমরা যা-ই ভাবি যা-ই বুঝি না কেন, ভাই ফোঁটার দিন আমরা আমাদের মনের আকাশকে যেন একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে ফেলি। তুমি আমার ছোটবোন আর আমি তোমার দাদা—সেদিন থেকে এ চেতনা যেন এক মুহূর্ত্তের জন্তেও আমাদের মন থেকে লোপ না পায়।"

কমলা কোনো উত্তর দিল না, সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

"আমার চিঠিগুলো কি এখনো তোমার কাছে আছে কমলা?—না নষ্ট ক'রে ফেলেছ?"

"আমার কাছে আছে।"

"সেগুলো আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো—কিম্বা পুড়িয়ে ফেলো।"

"ফিরিয়েই দোবো।"

"আর তোমার চিঠিগুলো?—সেগুলোর কি করা যায়?"

"সেগুলো আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো।"

একটু ভাবিয়া বিনয় বলিল, "না। সেগুলোও, পুড়িয়ে ফেলব।"

"তাই ফেলো।"

কেহ আর কোনো কথা বলিল না, শুধু সন্ধ্যার তিমিরান্তরালে এক ফোঁটা চোখের জল মাটিতে খসিয়া পড়িল, এবং একটা অবরুদ্ধ নিঃশ্বাস বায়ুমণ্ডলে মুক্তি-লাভ করিল। সে বার্ত্তা জগতের কেহ জানিল না। এমন কি বিনয়-কমলাও পরস্পরে সম্পূর্ণ ভাবে নয়।

৪২

ভাইফোঁটার দিন প্রত্যুষ হইতেই গৃহে উৎসবের কলরোল উঠিয়াছে। বেলা আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে কয়েকজন আত্মীয়-আত্মীয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কেহ শাঁক বাজাইতেছে, কেহ চন্দন ঘষিতেছে, কেহ মালা গাঁথিতেছে। পুরোহিত আসিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা শেষ করিয়া মাঙ্গলিক স্তব পাঠ করিতেছেন।

শুভ সময় উপস্থিত হইলে বিনয় আসিয়া মূল্যবান প্রশস্ত গালিচার আসনে বসিল। স্নান করিয়া সে কমলার দেওয়া রেশমের বস্ত্র, রেশমী পাঞ্জাবী, রেশমী উত্তরীয় পরিয়াছে, কণ্ঠে ফুলের মালা, মুখে মৃদু মৃদু হাস্য

একটা ছোট সোনার বাটিতে শ্বেত চন্দন, সম্মুখে দুইখানি নবনির্ম্মিত রৌপ্যপাত্রে নানাপ্রকার ফল মূল মিষ্টান্ন, রূপার গেলাসে জল, শ্বেত পাথরের গেলাসে সরবৎ। ডান দিকে বিচিত্র কারুকার্য্য করা কাঠের ট্রে-তে নানাপ্রকার প্রসাধন-দ্রব্য এবং পরিধেয় সম্ভারাদি। বাম

দিকে ধূপাধারে পাঁচটি ধূপ এবং একটী প্রদীপ জলিতেছে। দুই পাশে দুইটি তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে শাঁক লইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে,ফোঁটা দেওয়া আরম্ভ হইলেই বাজাইবে।

নববস্ত্র পরিধান করিয়া কমলা আসিয়া সম্মুখে উপবেশন করিলে পুরোহিত আসিয়া স্বস্তিবাচন করিলেন। তাহার পর কমলা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীতে চন্দন লইয়া বিনয়ের ললাট স্পর্শ করিল। ঘন ঘন শাঁক বাজিতে লাগিল। পিছন দিক হইতে বিমলা বলিলেন, "আমি যা বলি শুনে শুনে ব'লে যা কমল।"

"বল্।

যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দিই ভাইকে ফোঁটা,
ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দোরে পড়ল কাঁটা।
যম যেমন অক্ষয় অমর,
ভাই তেমনি হোক্ অক্ষয় অমর।"

তৃতীয়বার মন্ত্র পড়িবার সময়ে হঠাৎ এক ফোঁটা চোখের জল কমলার চক্ষু হইতে টপ্ করিয়া মাটির উপর পড়িল। প্রণাম করিবার সুযোগে কমলা তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু কোনো প্রকারে মুছিয়া লইল।

এ ব্যাপার আর কেহ লক্ষ্য না করিলেও বিনয় করিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার পরই স্মিতমুখে পকেট হইতে একটা মখ্‌মলের বাক্স বাহির করিয়া কমলার হাতে দিয়া বলিল, "দাদার আশীর্ব্বাদী।"

"এ আবার কি দাদা?" বলিয়া কমলা বাক্স খুলিতে সকলে দেখিল হীরামুক্তাখচিত একটি মূল্যবান কন্ঠী।

কমলা বলিল, "এই বুঝি তোমার শুভ-কামনা?"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "মনে করছিস্ বুঝি চিৎকার করি নি ব'লেই সেটা পাস্ নি?"

বিমলা সেটি লইয়া কমলার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দাদাকে প্রণাম কর।"

তাহার পর বিজনাথ ও বিমলা পুত্রকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া হাস্য-কৌতুক আমোদ-প্রমোদ চলিল। সন্ধ্যার পর শতাধিক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আহার করিলেন। অভ্যাগতেরা প্রস্থান করিবার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আহারাদি সারিয়া সকলে যখন নিজ নিজ ঘরে আশ্রয় লইল তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটা।

ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনয় একটা চেয়ারের পিঠ ধরিয়া মিনিট পাঁচেক ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর বারান্দায় আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িল। সম্মুখে দ্বিতীয়ার অন্ধকার আকাশে অসংখ্য তারকামালা জল জল করিতেছে—তাহার দিকে চাহিয়া চিন্তা এবং চিন্তাহীনতার অবস্থায় বিনয় এক ঘণ্টা সময় কাটাইয়া দিল। চারিদিক নিঃশব্দ সুষুপ্ত, কোথাও জনমানবের কণ্ঠস্বর শুনা যায় না,—একবার চারিদিক বারান্দায় বারান্দায় ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়া বিনয় ত্বরিতবেগে ঘরে প্রবেশ করিল, তাহার পর তাড়াতাড়ি একটা স্যুট পরিয়া লইয়া একটা চামড়ার ব্যাগে ভাইফোঁটার কমলার দেওয়া কয়েকটা জিনিস এবং অপরাপর কয়েকটা দ্রব্য ভরিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। একটা চিঠি পর্য্যন্ত লিখিয়া গেল না।

সন্তর্পণে নীচে নামিয়া গেটের কাছে আসিয়া দেখিল চাবি বন্ধ। গেট বেশী উচ্চ নহে, লোহার খাঁজে খাঁজে পা দিয়া গেট্ টপ্‌কাইয়া রাজপথে লাফাইয়া পড়িল। খানিকটা দ্রুতপদে চলিয়া আসার পর একটা ট্যাক্সি মিলিল। ট্যাক্সিতে উঠিয়া বলিল, "হাওড়া, খুব্ জোর!"

ট্যাক্সি দ্রুতবেগে ছুটিল।

* *

ইহার প্রায় মাস দুই পরে একদিন অপরাহ্নে একটা ইউরোপগামী জাহাজে বিনয় আরোহণ করিল, সঙ্গে তাহার শিল্পী-বন্ধু মসিয়ে জনি। ফ্রান্সে জীবন-যাপন করিবার একটা পাকা ব্যবস্থা করিয়া দিবে বলিয়া সে বিনয়কে আশ্বাস দিয়াছে।

জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ডেকের উপর দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষের তীরের দিকে চাহিয়া বিনয় মনে মনে বলিতেছিল—"বিদায়, হে ভারতবর্ষ, তোমার আশ্রয় থেকে এ জন্মের মত বিদায়! পরজন্ম যদি থাকে তা'হলে তোমার কোলেই যেন আবার জন্মাই, কিন্তু সে জীবনে বিধি-লিপি যেন একটু অন্য রকম হয়। তুমি যদি ত একবারেই যেন তুমি, এ রকম ক'রে যেন তুমি নে!"

সমাপ্ত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

চিন্তা-কণা

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র, বি-এ

প্রতিভা বিকাশের জন্য প্ররোচনা চাই; সময়ে সময়ে প্রতিরোধও চাই।

—লঙ্গিনাস

*　　*

যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম দরিদ্রকে সাহায্য করিবার উপায় আবিষ্কার করেন তিনি অকারণ হতভাগ্যের সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। যে ব্যক্তি সুখে জীবন যাপন করিতে অক্ষম তাহার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

—লঙ্গিনাস

চিন্তা-শক্তির বলই প্রত্যেক মানুষের সত্ত্বাকে প্রকাশ করে

—এরিষ্টটল

যৌবন মনস্তাপের তোয়াক্কা রাখে না।

—ইউরিপাইড্‌স্‌

*　　*

দেবতা যাহাদিগকে ভালবাসেন, তাহারা অকালে ধরাধাম ত্যাগ করে।

—মিণ্ডানডার

*　　*

যে লোক দরদ দিতে পারে, তাহার সহিত রক্তের যোগ থাক্ বা না থাক্ সহস্রজন ঘরের লোক হইতেও তাহার মূল্য বেশী।

—ইউরিপাইড্‌স্‌

*　　*

বর্ত্তমান সকল সময়ে সকলের কাছেই দুর্ব্বহ বোধ হয়।

—থুসিডাইড্‌স্‌

*　　*

কৃষক চিরকালই আগামী বৎসরে বড়লোক হইবার স্বপ্ন দেখে।

—ফিলামেন

*　　*

সকল প্রকার শব্দের ভিতর অপর কর্ত্তৃক গুণ-গানই অধিক শ্রুতি-মধুর।

—জেনোফন

*　　*

মানুষ কেবল নিজের জন্যই জন্ম গ্রহণ করে না। তাহার খানিকটা চায় দেশ, খানিকটা বাপ-মা, আর বাকিটা বন্ধু-বান্ধব।

—প্লেটো

*　　*

ন্যায়-যুদ্ধে দুর্ব্বলই প্রবলকে পরাস্ত করে।

—ডুকোক্লিস

*　　*

জ্ঞানী ব্যক্তি যখন স্বীয় বিজ্ঞতা জাহির করিতে না থাকেন তখনই মহৎ কার্য্য সু-সম্পন্ন করিতে পারেন।

—এ্যারসিক্লিস

*　　*

গণতন্ত্রকে কোন সীমার ভিতর রাখা আবশ্যক। ইহাকে পুরাপুরি শাসন-যন্ত্র বলা চলে না; ইহা শাসন-যন্ত্রের আড়ত মাত্র।

—প্লুতার্ক

*　　*

গণতন্ত্র যখন বাঁধা-ধরা আইন দ্বারা পরিচালিত হয় তখন নেতার কোন প্রয়োজন নাই; শ্রেষ্ঠ অধিবাসীগণ রাষ্ট্রের সকল পদ পূর্ণ করিয়া থাকেন। শাসন যেখানে শিথিল, সেইখানে নেতার দল দেখিতে পাওয়া যায়। জনগণ সেখানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াও রাজার ন্যায় প্রভুত্ব করিতে থাকে। সেখানে সংখ্যাই বলবান,—ব্যক্তিগতভাবে নয়, সমষ্টিগতভাবে।

*　　*

সভ্য সমাজে ব্যক্তির অধিকার আইনমত নির্দ্ধারিত হয়,—রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে তাহার হাত থাক্ বা না থাক্। কিন্তু জাতীয় ব্যাপারে প্রবলই দুর্ব্বলকে বিধান দিতে থাকে।

—থিউডিডিস

কৌশল

গল্প

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন বি-এ

১

মহাভারতের মেয়ের কাল বিয়ে। তাদের পুরানো জীর্ণ, বনেদী বাড়ীর ফটকে দু'ধারে বড় পিতলের কলসীতে দু'টা কলাগাছ বসানো। দেউড়ীতে শানাই বাজিতেছে মধুর রাগিণীতে।

মহাভারত রায়েরা এ গ্রামের প্রাচীন জমীদার। কিন্তু ভাগের ভাগ জমির আয়ে তাদের এখন একবেলা অন্নসংস্থান হওয়াও মুস্কিল। রোগ হইলে চিকিৎসার খরচা জোটে না। এক জোড়া জুতা ছিঁড়িলে আর একজোড়া কিনিতে ছ'মাস কাটিয়া যায়। মাহিনা দিতে না পারায় স্কুলে ছেলেদের নাম কাটা গিয়াছে, তাই মহাভারতের মেয়ে অমিয়া বড় হইলে গ্রামের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল মেয়েত বড় হইয়াছে, এখন পার করিবে কি করিয়া।

বাঙ্গালীর মেয়ের পার হওয়া ঠেকিয়া থাকে না। ছেলেরা পার হয় প্লীহা, যকৃতে অথবা যক্ষায়। আর মেয়েরা পার হয় কানা খোঁড়া অন্ধ আতুর যে কোন একটা পুরুষের হাত ধরিয়া।

দিল নগরের নবাবের দেড় লাখ টাকার কাচারির নায়েব সাধন ঘোষের স্ত্রী ভবসাগর পাড়ি দিলেন—বোধহয় মহাভারতের মেয়ে অমিয়াকে পার করিবার জন্যই। সাধন বাবুর বয়স তখন ষাটের উপর। তাঁর ছেলে ছিল না, মেয়ে ও ভাইপোরা আশা করিয়াছিল বিষয় পাইবে। নগদ তাঁর পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা ছিল, জমিজমায় আয়ও বছরে দু হাজারের উপর।

সাধন বাবু নিষ্ঠাবান হিন্দু। স্বর্গগত পূর্ব্বপুরুষদিগকে পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ করিবার জন্য পুত্র-লাভের আশায় তিনি পাত্রী খুঁজিতেছিলেন। তাঁর পয়সা আছে, বংশ ভাল, স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই; তাই কন্যাদায়গ্রস্তেরা মধুকরের মত বররূপী এই জড় ফুলটিকে ঘিরিয়া ধরিলেন।

সাধনবাবু চুলে কলপ দিলেন, দাঁত বাঁধাইলেন, রঙীন মোজা, কালা-পেড়ে ধুতি আর ছিটের সার্ট গায়ে দিতে আরম্ভ করিলেন। হাতে রিষ্টওয়াচ উঠিল। তাঁর দাড়ি কামানো ও তার পর ভ্যাজলিন মাখার বহর দেখিয়া কাছারির মহরি ও পাইক পেয়াদারা হাসিত। কলিকাতা হইতে প্রায়ই নার-ভিনর ও কবিরাজ [illegible] বিস্তার্ণবের যৌবন-মদিরার পার্শেল আসিত।

সাধন বাবু অনেক মেয়ে দেখিয়া শেষে অমিয়াকেই মনোনীত করিলেন। কচুপাড়ার রায়েরা [illegible] ঘর। অমিয়াও দেখিতে নম্র, সুশ্রী, ডাগর ডাগর চোখ দু'টি। নূতন যৌবনের পরশ পাইয়া শরীরখানি কচি কিশলয়ের মধুর শোভা ধারণ করিয়াছে। নৃত্য-চপল গতি-ভঙ্গীতে তাকে হরিণীর মত সুন্দর দেখায়। তাই সাধনবাবু পুত্রের বয়সী ভাবী-শ্বশুরের হাতে মেয়ে দেখিবার দিনই গোপনে একশত টাকা প্রণামী দিলেন, উপরন্তু বলিলেন——আপনাদের মর্য্যাদার উপযুক্ত খরচপত্রের জন্য যা দরকার জানাবেন আমি পাঠিয়ে দেব। শ্রীমতীকে সাজগোজ করবার ভার আমার উপর।

ভাবী জামাতার এইরূপ উদারতা দেখিয়া মহাভারত মনে করিলেন বিবাহ হইয়া গেলে মেয়ের দৌলতে সংসারের অবস্থাও ফিরিতে পারে। তাঁর স্ত্রীও অমিয়াকে পাত্রস্থ করিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল ছিলেন। পাত্রের

তারা অকস্মাৎ মাটীর উপর শুইয়া পড়িল। মেয়েদের মুখপাত্রি পরাণ বলিল—আপনি এই যে' সিঁড়ুতেই করতে পারবেন না। ইচ্ছে হ'লে আমাদের বুকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যান।

সাধনবাবু তখন মনে মনে ভাবিতেছিলেন সকাল-বেলা হতভাগাদের এতগুলি টাকা দিলাম, সব বেইমান, জোচ্চোর! জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হিরণ্যবাবু কোথায়? দেশবন্ধু ক্লাবের সেক্রেটারী রাজকুমার কোথায়?' সকালে যাদের হাতে টাকা দিয়াছিলেন তাদের কিন্তু দেখা পাওয়া গেল না।

এমন সময় মহাভারত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানারূপ খরচপত্র বাবদ তিনি ভাবী জামাতার নিকট হইতে মোটা রকমের একটা টাকা আদায় করিয়াছিলেন। বেশ উঁচুদরেই মেয়েটিকে বেচা হইতেছে। গরীব বাপের পক্ষে এখন সে দাম ফিরাইয়া দেওয়া অসম্ভব। তা'ছাড়া সমাজ আছে, ন্যায় আছে। তিনি ছেলেদের নিকট অনেক মিনতি করিলেন—'বাবারা, এ গরীবের মেয়ের বিয়েটা পণ্ড করে দিও না, তা'হলে যে আমাকে ডুবিয়ে মারা হবে।' ছেলেরা তাঁর উত্তরে চেঁচাইয়া উঠিল—জে, এম, সেনগুপ্ত কি জয়।

সাধনবাবু দূর হইতে ভাবী শ্বশুরকে ডাকিয়া বলিলেন—থানায় আমার নামে খবর দিন। দারোগাকে ব'লে পাঠান পুলিশ সাহেব আমাদের ম্যানেজারের বন্ধু।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে থানা হইতে খবর আসিল যে দারোগা ইহার প্রতিবিধান করিতে অক্ষম। সাধন বাবু শুনিয়া বলিলেন—আচ্ছা, দেখে নেওয়া যাবে ও-কে।

ছেলের দল নাছোড়বান্দা, সাধনবাবুও ততোধিক। ছোট্ট একখানি নৌকা চড়িয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনি ভাবী শ্বশুর বাড়ীর দিকে চলিলেন। রায় বাড়ীর পিছনেই একটা খাল ছিল, সেই খাল বাহিয়া খিড়কির দরজায় পৌঁছিতে পারিলে অনেকটা নিরাপদ। সাধনবাবু সেকালের ইংরাজী জানা লোক, ইতিহাসেও তাঁর দখল ছিল। তিনি ভাবিলেন, তৃতীয় নেপোলিয়ন যেরূপ ফুল-ফ্রেঞ্চ করিয়া ফ্রান্সের সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ একটা কু করিয়া পাত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেন।

কিন্তু অপর পক্ষেরও ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল না। মহাভারতের খিড়কির দরজায় সার বাঁধিয়া ছেলেরা দাঁড়াইয়াছিল। পাত্রীর পিতার ও পাত্রের সমস্ত অনুরোধ উপরোধই বিফল হইল। সাধনবাবু তখন তাঁহা যাহা গুটিকয়েক ইংরাজী গালি দিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় মহাভারতকে বলিলেন—এ সব আপনারই কারসাজী। আচ্ছা দেখে নেওয়া যাবে টাকা কি ক'রে হজম করেন। সবাইকে জেলে না দিই ত' আমার নাম সাধন ঘোষ নয়। তা' ছাড়া পাত্রীর সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কটূক্তি করিলেন যাহা কর্ণকে পীড়িত করে।

মহাভারত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অপমানে ও দুশ্চিন্তায় তাঁর শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। এমন বিপদও তাঁর ভাগ্যে ছিল। তিনি সব অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। অমিয়ার মা সাধন বাবুর চলিয়া যাওয়ার সংবাদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

আর অমিয়া ভাবিতেছিল—এই বিবাহ ফিরিয়া যাওয়ায় ভবিষ্যতের জন্য যে লাঞ্ছনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে তার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। বুড়ো বরের হাতে পড়া নরক বটে কিন্তু এই অবস্থায় বিবাহ ফিরিয়া গেলে যে দুর্নাম রটিবে তাহা নিদারুণ। তাছাড়া সাধনবাবুর উক্তিও তার কাণে গিয়াছিল। সে জানিত কি পরিমাণ টাকা তার পিতা ভাবী জামাতার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

সমস্ত বাড়ীময় একটা নৈরাশ্যের ভাব। শানাই বাজা বন্ধ, ভিয়েনের বামুনরা হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে, এয়োস্ত্রিরা শিশুদের ঘুম পাড়াইতেছেন ও বুড়োরা দু' চারজন চলিয়া গিয়াছেন, ছেলের দল ভাবিতেছে এমন লুচিটা খুব ফস্কাইয়া যায়, আরও ছোট যারা তাদের মধ্যে কেহ কেহ আঙুল চুষিতেছিল। এমন সময় তরুণ সঙ্ঘের নেতা শরৎ ঘোষ মহাভারতকে বলিল—আপনার ভাবনা নেই, রায় মশাই, আমরা এখুনি বর এনে দিচ্ছি।

মহাভারত বলিলেন—"বরকে ত' তোমরাই দেশ থেকে তাড়ালে, আবার বর এনে দেবে কেমন ক'রে ?"

শরৎ বলিল—"এ সে বর নয়, এ ছোকরা বর। কুলে, শীলে, বাহ্যে—

"তা কি পারবে বাবা, সে কি সম্ভব ?"

"আচ্ছা আপনি হুকুম করুন। এমন বর নিয়ে আসছি যাকে সবাই পছন্দ করবে।"

* * *

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে গোপেন মিত্রদের বাড়ী। তাদের সঙ্গে রায়েদের কি দলাদলি ছিল তাই নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। মিত্ররাও পুরাণো বংশ, ক্রিয়াকর্ম্মে রায়েদের প্রায় সমকক্ষ। গোপেনদের আর্থিক অবস্থাও ভাল।

রাত্রি ন'টায় তরুণের দল গোপেনের দরজায় আসিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল—গোপেন, গোপেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজার উপর ঘন ঘন করাঘাত।

গোপেনের বাবা বাড়ী ছিলেন না। মা দোতালা হইতে জানালা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তোমরা, কি চাই ?

শরৎ বলিল—আমি শরৎ, আপনার কাছে এসেছি, জ্যেঠাইমা, জরুরী কাজ।

গোপেনের মা ডাকিলেন—'গোপেন, গোপেন, শরৎরা এসেছে, দরজা খোল।' গোপেন তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তাই তার মাকেই দরজা খুলিতে হইল। বাড়ির উঠানে আসিয়া শরৎ বলিল—"আপনার ছেলেকে চাই।"

"কেন ?"

"গরীবের উপকার করতে হ'বে—রায়েদের মান বাঁচাতে হ'বে।"

গোপেনের মা ব্যাপারটা সবই জানিতেন। গোপেন যখন ল ক্লাসে ভর্ত্তি হয় তখন মহাভারত একবার সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গোপেনেরও মেয়ে দেখিয়া পছন্দ হইয়াছিল। কিন্তু তার বাবা মোটা রকমের পণ চাওয়ায় সম্বন্ধ ফিরিয়া যায়। গোপেন সেই হইতে গোপনে বিরহের কবিতা লিখিয়া খাতা বোঝাই করিয়াছিল। অবশ্য তার বাপ-মা এ খবর জানিতেন না।

গোপেনের মা ভাল মানুষ। তিনি প্রথমে একটু ক্ষীণ আপত্তি করিলেন। কিন্তু শরতের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার সামনে সে আপত্তি টিকিল না! সে পণপ্রথার বিরুদ্ধে লম্বা এক বক্তৃতা করিল। গরীবের উপকার করাই যে মানব জীবনের চরম সার্থকতা সে সম্বন্ধে উৎসাহের সহিত অনেক কথাই বলিল।

শেষে গোপেনের মা সম্মত হইলেন। সদলবলে শরৎ গোপেনের ঘরে গিয়া তার ঘুম ভাঙ্গাইল।

গোপেন চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল—"কি ব্যাপার ? ডাকাতি করবে না কি ?"

শরৎ বলিল—"হ্যাঁ, ডাকাতিই করব,—তবে তৈজস পত্র নয়—বিয়ের পাত্র।"

চাঁদিনী রাতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই হৌক অথবা বড় একটা কিছু কাজ করার আত্মপ্রসাদেই হৌক শরৎ পথে গান ধরিল—

"কোথায় সীতা, কোথায় সীতা।
জ্বলছে বুকে স্মৃতির চিতা।"

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও কোরাস ধরিল 'কোথায় সীতা ?'

* * *

গোপেন ও অমিয়ার বিবাহ হইয়া গেল। অবশ্য ব্যাপারটা ঠিক শুভলগ্নে হইয়া উঠে নাই। কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্রে যাহাই থাকুক না কেন এই অশুভ লগ্নের ব্যাপারটাই একটা আনন্দের প্রবাহ বহাইয়া দিল। সাধন বাবুর খরচায় যে সানাই আনা হইয়াছিল তাহা সাহানায় বাজিয়া উঠিল। বীরতাং ভুজ্যতাং রবে চারদিক মুখরিত। তরুণদের মনে আনন্দ আর ধরে না। বিজেরা প্রথমে একটু শঙ্কিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে এ আনন্দ তাঁদের মধ্যেও সংক্রামিত হইল। অমিয়ার মার মুখে হাসি ফুটিল। তিনি বুঝিলেন বিবাহটা মেয়ের পছন্দমতই হইয়াছে।

*

তখন শেষ রাত্রি। বিয়ে বাড়িতেও সব নিঝুম। বাসর ঘরে মেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বর চুপি চুপি কনেকে

বলিল—কেমন একটা বিপদ হ'য়ে গেল, বল দেখি? কোথায় বড়-মানষের ঘরে যেতে—

কনে ঘোমটার মধ্য হইতে বলিল—চুপ, কেউ শুন্‌তে পাবে।

একটু পরে গোপেন আবার বলিল—বুড়োর জন্যে সত্যি কষ্ট হচ্ছে, এত আশা করেছিল, এত খরচা করলে!

"এ সব ভগবানের হাত, তুমি কি করবে?"

"হাত এতে আমারও খানিকটা ছিল। আমিইত দু'দিন যাবৎ ভলাণ্টিয়ার খাড়া ক'রে বুড়োর বিয়েটা ফস্কে দিলুম। তোমাকে পাওয়ার জন্যে তাদের সন্দেশ খাইয়েছি।"

"তুমি ত ভারী দুষ্টু!"

এমন সময় অমিয়ার একটি বাল্য সঙ্গিনী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

ঐতিহাসিক অভিশাপ

শ্রী—

অতি প্রাচীন কাল হইতে নানা অভিশাপের কাহিনী চলিয়া আসিতেছে। অভিশাপের প্রভাবেই অহল্যা পাষাণী, ইন্দ্রদেব সহস্রলোচন, দশরথ অসময়ে লোকান্তরগামী এবং শকুন্তলা পতিপরিত্যক্তা। এ সকলই অবশ্য বড় কথা। তবে মুনিঋষিরা অল্প কারণেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া অভিশাপ দিতেন, পৌরাণিক উপাখ্যানে তাহার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট, অথচ ইঁহারাই সংযমী বলিয়া প্রখ্যাত! প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীরা যখন তখন নরনারীকে লইয়া 'ভাটা' খেলিতেন তাহার পরিচয়ও কাব্য-সাহিত্যে প্রচুর। ইংরাজ আমলের প্রারম্ভেও ব্রাহ্মণেরা কথায় কথায় যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া 'শাপ' দিতেন, সুদূর পল্লীগ্রামে এখনও তাহার ধ্বনি শুনা যায়।

অভিশাপ শুধুই যে ভারতবর্ষের একচেটিয়া তাহা নয়। পৃথিবীর সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই উহার অল্পাধিক নিদর্শন পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে নানা গ্রন্থ ইহার আলোচনায় পূর্ণ।

ভারতবর্ষে শুধু যে হিন্দুদের মধ্যেই অভিশাপ সীমাবদ্ধ তা' নয়—মুসলমান-সমাজেও তাহা প্রকট। বাদশাহ আকবরের রাজকোষের উপর নিদারুণ অভিশাপ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের বিবরণী হইতে নিম্ন প্রসঙ্গ সংগৃহীত। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে উক্ত কোম্পানী সুরাতের সপরিষদ সভাপতির নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হন—

"ঔরঙ্গজীবের কুশাসনে, পাঠান এবং অসভ্যদের বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রামে' সর্ব্বাঙ্গতার বশে মুসলমান প্রজাদিগকে ভূমি-কর,রাহারি বা পথ-কর এবং পণ্য-শুল্ক হইতে নিষ্কৃতিদানে, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদিগের অত্যাচারণে ও তহবিল-তছরূপে, পিতা ও পিতামহ

প্রভৃতির এবং রাজকোষের অনিষ্ট সাধনে যখন বাদশাহ অর্থকৃচ্ছ্রতার বিষম বিপাকে পড়িলেন এবং সৈন্যদলের বেতনাদি প্রদানে অসমর্থ হইলেন, তখন সৈন্যদল তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে উদ্যত হইল। তিনি তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্রাট আকবরের সুবিখ্যাত রাজকোষের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইলেন।

"ভিতরের দ্বারের সম্মুখীন হইয়া দেখিতে পাইলেন যে তাহাতে একখণ্ড তাম্রফলক সংযুক্ত রহিয়াছে এবং উহাতে বড় বড় অক্ষরে এই কয়টি কথা খোদিত রহিয়াছে—'যে কেহ এইখানে সংরক্ষিত ধনরত্নের দ্বার উদ্ঘাটন করিবে এবং ধনাদি স্থানান্তরিত করিবে তাহার সর্বনাশ হইবে—সবংশে নিধন অবশ্যম্ভাবী।' বাদশাহ প্রথমতঃ এই অভিশাপের ভীষণতায় শঙ্কিত ও হতবুদ্ধি হইলেন, কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরে নিদারুণ অভাবের তাড়নায় ধনরত্নে হস্তক্ষেপ করিতে ও দ্বার খুলিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু অভিশাপের ভীষণতা হইতে ত্রাণ পাইবার বাসনাও সঙ্গেসঙ্গে প্রকট হইল। যে দ্বারে তাম্রফলক সংযুক্ত সেই দ্বার খুলিবেন না স্থির করিলেন। কক্ষের যে পার্শ্বে ধনাদি সংরক্ষিত সেই দিকের দেওয়ালে একটি গর্ত ফুটাইলেন এবং গর্ত-সাহায্যে অজস্র স্বর্ণমুদ্রা—যাহা সেখানে ছিল সমস্তই গ্রহণ করিলেন।

"ইতিমধ্যেই চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছে যে অভিশাপের ফল রাজবংশে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী সুলতান মামুদ পূর্বেই পিতা কর্তৃক কারারুদ্ধ হন, কিন্তু কিছুদিন হইতে আবার বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। এই মামুদ কিন্তু নিষিদ্ধ ধনরত্ন-হরণের পরেই সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে অথবা অস্বাভাবিক উপায়ে ঘটিয়াছে তাহা লইয়া নানা জল্পনা চলিতেছে। যুবরাজের অপর তিন ভ্রাতা নানা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন, ইহা সর্বজনবিদিত। তাহাদেরও পরিণাম অতি ভয়াবহ হইবে, ইহাই সাধারণের দৃঢ় ধারণা।"

* *

পত্রখানি এইখানেই শেষ; কিন্তু শেষাংশে যে আভাস দেওয়া হয় প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। যুবরাজ সুলতান মামুদের অপর তিন ভ্রাতা—আকবর, মুয়াজ্জম ও কমবক্সকে পিতা কর্তৃক নিষেধ-অমান্যের ফল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে হয়; সুলতান মামুদ এবং আরও এক ভ্রাতাও বাদ যান নাই! ইহা অদৃষ্টের পরিহাস, অথবা অভিশাপের বিড়ম্বনা, কে বলিবে? ঘটনাগুলি নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

ঔরঙ্গজীবের দ্বিতীয় পুত্র মুয়াজ্জম ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর সাহ নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন—পরে আবার শাহ আলম নাম গ্রহণ করেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বন্দী হন ও ১৬৯৪ পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন। ঔরঙ্গজীবের প্রিয়তম পুত্র আকবর ১৬৮১ অব্দে বিদ্রোহী হওয়ায় পারস্য দেশে নির্বাসিত হন; এইখানেই ১৭০৪ সালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ভ্রাতা মুয়াজ্জমের সহিত কমবক্স যুদ্ধ করেন; সেই যুদ্ধেই তিনি নিহত হন। এই তিন জন ব্যতীত ঔরঙ্গজীবের আর এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার নাম মহম্মদ আজাম। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ইনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, কিন্তু ১৭০৭ সালের জুন মাসে আগ্রার দক্ষিণে জাজৌ নামক স্থানে নিহত হন। জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ সুলতান মামুদ পরলোক গমন করেন ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। পিতা ঔরঙ্গজীবের আদেশক্রমে ইহার গুপ্ত-হত্যা সংঘটিত হয়।

* * *

এইরূপে অভিশাপের বাণী ষোলকলা পূর্ণ হইল। মহাকবি সেক্সপীয়রের সেই বিখ্যাত উক্তি বড়ই স্মৃতিপথে উদিত হয়—'দর্শন-বিজ্ঞানের কল্পনারও অতীত এমন অনেক সত্যই পৃথিবীতে নিত্য বিরাজমান।'

যুগ-সন্ধি

—উপন্যাস— —শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল, বি-সি-এস

চতুর্থ স্তবক

সেইণ্ট বার্থোলোমিয়ুর হত্যাকাণ্ড

শিশুদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সর্ব্বপ্রথমে নেত্র উন্মীলন করিল ছোট্ট মেয়েটি।

শিশুদের জাগরণ কুসুমকোরকের প্রস্ফুটনের মতো—উহাদের সরল কোমল বাল-আত্মা হইতে দেবনিঃশ্বসিতের সুরভি যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। জর্জ্জেটির বয়স কুড়িমাস, সে মাসেও সে মাতৃস্তন্য পান করিত। সেই সকলের ছোট। আস্তে আস্তে ছোট্ট মাথাটি তুলিয়া সে তাহার শয্যার উঠিয়া বসিল। নিজের পাদুটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া কলকাকলিতে কক্ষটি মুখরিত করিয়া তুলিল।

প্রাতঃসূর্য্যের একটি রশ্মি সেই শিশু-শয্যার উপর পড়িতেছে। জর্জ্জেটির পা কিংবা সেই রশ্মিটি বেশী রাঙা, বলা সুকঠিন। মনের খুসিতে জর্জ্জেটি কল্ কল্ করিতে লাগিল।

আর দুইটি—তখনো ঘুমাইতেছে। বালিকাদের চেয়ে বালকদের ঘুম অধিক গভীর। রেনিজিনের চুল বাদামী রঙের, গ্রোস্-এলেনের চুল ঈষৎ লাল, আর জর্জ্জেটির সোনালী। বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইসব রঙের পরিবর্ত্তন হইবে। রেনিজিনের চেহারা অনেকটা শিশু হার্কিউলিসের মতো। সে উপুড়-হইয়া দুই মুষ্টিবদ্ধ হস্তের উপর চোখ রাখিয়া ঘুমাইতেছিল। গ্রোস্-এলেনের পা শয্যার বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

তিন জনেরই বসন ছিন্ন। লাল পল্টনের সেপাইরা তাহাদিগকে যে কাপড়-চোপড় দিয়াছিল তাহা ছিঁড়িয়া টুকরো টুকরো হইয়া গিয়াছে। কামিজ তাহাদের একটিও ছিল না। ছেলেদুইটি প্রায় উলঙ্গ বলিলেই হয়। জর্জ্জেটির পরিধানে একটা জীর্ণ জামা—ওটা একটা পুরানো পেটিকোট, ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে এখন জ্যাকেটের মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কে এই ছেলেদের এতদিন তত্ত্বাবধান করিয়াছে বলা অসম্ভব। মায়ের যত্ন পায় নাই—তাহা নিশ্চয়। এই কঠোর-প্রকৃতি সৈনিকগণ তাহাদিগকে কিছু-কিছু সুপ খাইতে দিয়াছে, এইমাত্র। কর্ত্তৃত্ব করিবার লোক অনেক ছিল, কিন্তু পিতৃস্নেহ দিবার কেহ ছিল না। শৈশবের জীর্ণ চীরও স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত। এই কচি শিশু-তিনটি দেখিবামাত্রই মন কাড়িয়া লইত।

জর্জ্জেটির কাকলি চলিতেছে।

পাখীর কূজন এবং শিশুর কাকলিতে একই বন্দনা-গান—অস্পষ্ট, অব্যক্ত কিন্তু গভীর অর্থপূর্ণ। তবে পাখীর ভবিষ্যতের ভাবনা নাই, মানবশিশুর সম্মুখে সুগভীর ভবিষ্যৎ। এই কথা মনে হইলে বালকণ্ঠের আনন্দোজ্জ্বল কলতান শুনিতে শুনিতেও হৃদয় বিষাদ-কাতর হইয়া উঠে। শিশুর ওষ্ঠপুটের ভিতর দিয়া মানবাত্মার এই যে অস্পষ্ট আত্মপ্রকাশের চেষ্টা, পাপমলিন পৃথিবীতে তাহাই পবিত্রতম ভগবদ্গীতি। এই অপরিস্ফুট গুঞ্জন যেন জগতের চিরন্তন ন্যায়ধর্ম্মের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিতেছে। ইহা বুঝি বা জীবনপথের প্রারম্ভে দণ্ডায়মান মানবাত্মার সংসার-যাতনার বিরুদ্ধে অভিযোগ। এ অভিযোগ সজ্ঞান নয়, কিন্তু তবুও বড়ই করুণ। এই অজ্ঞতা, অসীম জীবনরহস্যের ভিতরে শিশু-চিত্তের এই ভাবনাহীন সহাস্য প্রবেশ সমগ্র প্রকৃতিকে কিন্তু চিন্তাভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে—না জানি এই দুর্ব্বল, অসহায় জীবটির অদৃষ্টে কি আছে! দুঃখ যদি ইহাকে স্পর্শ করে, তবে তাহা যে নিতান্তই বিশ্বাসঘাতকের কাজ হইবে।

শিশুর কাকলিকে ঠিক বাক্য বলা যায় না, কিন্তু এক হিসাবে তাহা বাক্য হইতেও শ্রেষ্ঠ। তাললয়যুক্ত না

হইলেও ইহা সঙ্গীত ; অর্থযুক্ত না হইলেও ইহা ভাষা ; স্বর্গে এই কলগীতির আরম্ভ, পৃথিবীতেও ইহার শেষ নাই ; জন্মের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া উহা পরজগতেও ঝঙ্কৃত হইতে থাকিবে। স্বর্গের দেবতা থাকিতে শিশু যে কথা কহিত এবং অনন্তলোকে প্রয়াণের পর পুনরায় সে যে কথা কহিবে, এখনকার অবাক্ত গুঞ্জন তাহারই প্রতিধ্বনি। সূতিকাগারের অতীত আছে, শ্মশানেরও ভবিষ্যৎ আছে। অতীত ও ভবিষ্যতের এই দ্বিগুণ রহস্য অবোধ্য শিশু-কাকলিতে যুক্ত রহিয়াছে। কুসুমকোরকতুল্য শিশু-আত্মাকে ঘিরিয়া এই যে নিয়তির করাল ছায়া, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্বের এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ আর কি আছে ?

জর্জ্জেটির কাকলির মধ্যে বিষাদের অতি ক্ষীণ আভাষও ছিল না। তাহার সমগ্র বদনমণ্ডল হাস্যোদ্ভাসিত—চোখে হাসি, মুখে হাসি, গালের টোলদুটিতে হাসি। প্রভাতটিকে সে যে অন্তর্নিবিষ্টচিত্তে সানন্দে ও সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে হাসিটি তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। আত্মা সূর্য্যকিরণে একটু স্বস্তি বোধ করে। আকাশ সুনীল, ঈষত্তপ্ত, সুন্দর। এই দুর্ব্বল অসহায় প্রাণটি—কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না, চিন্তা করিবার শক্তি তাহার হয় নাই, কিন্তু সুকোমল শৈশব-শয্যায় আপনার খেয়ালে আপনি বিভোর হইয়া বৃহৎ বনস্পতি, তৃণশষ্পের শ্যাম আস্তরণ, পাখীর কূজন, পাতার মর্ম্মর, ঝরণার ঝর্ঝর এবং ঝিল্লীর ঝঙ্কার—চারিদিকের এই সব সূর্য্যা-করোজ্জ্বল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে সে নিজেকে নিতান্তই নিরাপদ মনে করিতেছিল।

জর্জ্জেটির পরে সকলের বড়টি—রেনিজিন্ জাগরিত হইল। তাহার বয়স চারবছরের উপর। সে উঠিয়া বসিল এবং পুরুষোচিত ভাবে লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে নামিল। সুপের বাটিটি নিকটেই দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

জর্জ্জেটির বকবকানিতেও গ্রোস্-এলেনের সুপ্তি-ভঙ্গ হয় নাই, কিন্তু এখন চামচে-ডিসের শব্দে সে চমকিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। গ্রোস্-এলেন তিনবছরের ছেলে। সে দেখিল, হাত বাড়াইলেই তাহার বাটিটি পাওয়া যাইবে। সুতরাং বিছানা হইতে না নামিয়াই—সে রেনিজিনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। দুই হাঁটুর উপর সুপের বাটি রাখিয়া, ছোট্ট মুঠার ভিতর চাম্‌চেটি ধরিয়া খাইতে লাগিল।

জর্জ্জেটি এই সকল শব্দ শুনিতে পায় নাই। তাহার কণ্ঠস্বর যেন কি এক স্বপ্নসঙ্গীতের ছন্দানুবর্ত্তন করিতেছিল। তাহার বড় বড় চোখদুটি উপরের দিকে ফিরানো—যেন স্বর্গীয় ভাবে বিভোর। মাথার উপরে গৃহের ছাদ যতই পুরু, যতই মসীকৃষ্ণ হোক্ না কেন তাহাতে শিশুর চক্ষে নন্দনের ছবি প্রতিফলিত হইবার কোন বাধা হয় না।

রেনিজিন নিজের সুপ শেষ করিয়া চাম্‌চে দিয়া বাটির তলা চাটিতে চাটিতে একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার সুপ খেয়ে ফেলেছি।"

এই কথা কানে যাওয়াতে জর্জ্জেটির খেয়াল ভঙ্গ হইল। "সুপ !"—সে বলিয়া উঠিল।

রেনিজিন সুপ খাইয়াছে এবং গ্রোস্ এলেন খাইতেছে ; —দেখিয়া সেও নিজ শয্যাপার্শ্বস্থ বাটিটি লইয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তবে চাম্‌চেটি অনেকবারই মুখের নিকট না গিয়া কানের নিকটে পৌছিতে লাগিল।

সময় সময় শিষ্টাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সে অঙ্গুলির সাহায্যেই খাইতে লাগিল।

চাঁছিয়া পুঁছিয়া নিজের বাটির সুপ খাইয়া গ্রোস এলেন বিছানা হইতে লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল এবং দাদার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল

:

সহসা নিম্নে অরণ্যের দিকে বিউগলের কঠোর উচ্চধ্বনি শ্রুত হইল।

টাওয়ারের উপর হইতে শিঙার আওয়াজে তাহার জবাব আসিল।

এইবার বিউগল ডাকিতেছে এবং শিঙা উত্তর দিতেছে।

বিউগল দ্বিতীয়বার বাজিল ; শিঙাও দ্বিতীয়বার প্রত্যুত্তর জানাইল।

তারপর কাননের প্রান্ত হইতে সুস্পষ্টস্বরে কে একজন ডাকিয়া বলিল,—"হে বিদ্রোহীগণ, তোমরা শোনো।

সূর্য্যাস্তকালে তোমরা যদি বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ না কর, তবে আমাদের আক্রমণ আরম্ভ হইবে।"

বজ্রস্বর মতো ক্রুদ্ধগর্জ্জনে টাওয়ারের উপর হইতে কেহ জবাব দিল, "আক্রমণ কর।"

নীচেকার লোকটি পুনরায় বলিল, "আক্রমণ আরম্ভের আধঘণ্টা পূর্ব্বে একটা তোপ দাগিয়া তোমাদিগকে শেষবারের মতো সতর্ক করা হইবে।"

উপরকার লোকটি আবার বলিল, "আক্রমণ কর।"

এই সব কথাবার্ত্তা ছেলেদের কানে পৌঁছিলনা, কিন্তু বিউগল ও শিঙার আওয়াজ তাহারা বেশ স্পষ্টই শুনিতে পাইল। প্রথমবারের বিউগল-ধ্বনিতে জর্জ্জেট মাথা তুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল এবং ভোজনে বিরত হইল। শিঙার আওয়াজে তাহার হাত হইতে চামচেটি বাটিতে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার যখন বিউগল বাজিয়া উঠিল, তখন তাহার তালে তালে সে তাহার ছোট্ট তর্জ্জনীটি উঠাইতে ও নামাইতে লাগিল। বিউগল এবং শিঙা উভয়ই থামিয়া গেলে তাহার অঙ্গুলি অন্যমনস্ক ভাবে উর্দ্ধেই উত্তোলিত রহিল এবং সে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "বাদনা।"

তাহার বলিবার অভিপ্রায় বোধ হয় ছিল "বাজনা"।

বড় শিশুদুইটি বিউগল ও শিঙার আওয়াজ মোটেই লক্ষ্য করে নাই। তাহাদের মন তখন অন্য একটা ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিমগ্ন ছিল। লাইব্রেরী ঘরের মেঝের উপর দিয়া একটা গাছপোকা চলিয়া যাইতেছে।

গ্রোস্ এলেন ওটা দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, "একটা জানোয়ার।"

রেনিজিন সেখানে দৌড়িয়া আসিল। গ্রোস্ এলেন বলিল, "এটা কামড়ায়।"

"ওটাকে মেরোনা।"—রেনিজিন বলিল। উভয়েই পোকাটির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

জর্জ্জেট অতঃপর তাহার অবশিষ্ট সুপ খাইয়া ভাইয়ের খোঁজ করিতে লাগিল। রেনিজিন ও গ্রোস্ এলেন তখন সেই পোকাটির উপর ঝুঁকিয়া অভিনিবেশসহকারে তাহাকে পরীক্ষা করিতেছে। তাহাদের মাথায় মাথায় ও চুলে চুলে ঠেকাঠেকি হইয়াছে। বিস্ময়ে তাহারা প্রায় রুদ্ধ-নিঃশ্বাস। পোকাটা থামিয়াছে এবং চলিবার আর কোন চেষ্টা করিতেছে না। বালকদের প্রশংসমান দৃষ্টি উক্ত প্রাণীটি যে বড় একটা উপভোগ করিতেছে, এমন বোধ হয় না।

জর্জ্জেট যখন দেখিল, তাহার ভ্রাতৃযুগল কি একটা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, তখন সেটা কি জানিবার জন্য তাহার অতিমাত্রায় ঔৎসুক্য হইল। তাহাদের নিকট গমন করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য ছিলনা। বাধা-বিঘ্ন বিস্তর—মেঝের উপর কত জিনিষই না ছড়ানো রহিয়াছে। কোথাও উল্টানো ছোট টুল, কোথাও পুরাতন কাগজের স্তূপ, কোথাও ঢাক্‌না-ভাঙ্গা খালি প্যাকিংবাক্স, ট্রাঙ্ক এবং কত রকম বাজে জিনিষ—এসব পার হইয়া যাইতে হইবে। যাত্রাটি অগণিত দ্বীপ-পুঞ্জের অন্তর্বর্ত্তী সংকীর্ণ প্রণালী-পথে অর্ণবপোত পরিচালনার মতোই সঙ্কটসঙ্কুল, এতৎ সত্ত্বেও জর্জ্জেট এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। প্রথম সঙ্কট তাহার দোলা হইতে নামিয়া আসা। সেটা সমাধা হইলে সে তৈজসপত্রের মগ্ন-শৈলের ফাঁকে ফাঁকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুই-একটা টুল এদিকে ওদিকে একটু সরাইয়া দিল, কোথাও বা সিন্দুকের নীচ দিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিয়া গেল, কাগজের স্তূপের একপার্শ্বে আরোহণ করিয়া অপর পার্শ্বে গড়াইয়া পড়িল। নগ্নপদে আঁচড় বা আঘাত লাগিতে পারে, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। ক্রমে সে একটু খোলা জায়গায় অর্থাৎ যে অংশে তৈজসপত্রাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল না—এমন স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। নাবিকদের ভাষায় বলা যাইতে পারে সে এইবার 'মুক্ত সমুদ্রে' পড়িল। তখন সে হামাগুড়ি দিয়া বিড়ালশাবকের মতো ক্ষিপ্রগতিতে সেই জায়গাটা অতিক্রম করিয়া জানালার ধারে পৌঁছিল। সেখানে তাহার সম্মুখে আবার এক নূতন সঙ্কট। বড় মইটা ঐ জানালার নিকট হইতে কক্ষের অপর দিকের একটা কোণ পর্য্যন্ত প্রাচীরের গা-ঘেঁষিয়া রক্ষিত ছিল। উহাতে জর্জ্জেট

এবং তাহার ভাইদের মধ্যবর্ত্তী স্থলে একটা অন্তরীপের মতো হইয়াছে—সেটা অতিক্রম করিয়া জর্জ্জেটিকে যাইতে হইবে। সে থামিয়া একটু ভাবিল, তারপর তাহার স্বগতচিন্তার অবসান হইল। বুঝা গেল সে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। মইএর একটা ধাপ আপনার গোলাপী আঙুলে আঁকড়িয়া ধরিয়া—দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে দুইবার পড়িয়া গেল, কিন্তু তৃতীয়বারে কৃতকার্য্য হইল। তখন একটার পর আর একটা ধাপ এইরূপে ধরিয়া ধরিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া জর্জ্জেটি মইএর শেষ মাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে আর ধাপ ছিল না। সে প্রায় পড়-পড় হইয়া দুইহাতে মইএর দীর্ঘ দণ্ডদ্বয়ের একটার প্রান্ত ধরিয়া অন্তরীপটি ঘুরিয়া আসিল। এবং রেনিজিন ও গ্রোস্ এলেনের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

সেই মুহূর্ত্তে রেনিজিনের কীট সম্বন্ধীয় পর্য্যবেক্ষণ সমাপ্ত হইল। সে মাথা তুলিয়া বলিল, "এটা মাদী পোকা।"

জর্জ্জেটির হাসিতে রেনিজিন হাসিয়া উঠিল, রেনিজিনকে হাসিতে দেখিয়া গ্রোস্ এলেনও হাসিতে লাগিল।

জর্জ্জেটি আসিয়া তাহার ভাইদের পাশে বসিল। ইতিমধ্যে তাহাদের অভ্যাগত পোকাটি অদৃশ্য হইয়া গেল। ছেলেদের হাসির অবকাশে সে মেঝের ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

ক্রমে আরও অনেক ঘটনা ঘটিল।

প্রথমতঃ, এক ঝাঁক চড়ুই উড়িয়া গেল। ছাদের ধারে বোধ হয় ওদের বাসা ছিল, ছেলেদের হাসিতে চমকিত হইয়া উহারা কিচির-মিচির করিতে করিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। উহাদের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ছেলেরা উপর-দিকে চাহিল এবং পোকার কথা ভুলিয়া গেল।

জর্জ্জেটি সেগুলির দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, "মুর্গীর বাচ্চা।"

রেনিজিন তাহার সংশোধন করিয়া বলিল, "মুর্গীর বাচ্চা নয় গো মেয়ে, ওরা পাখী।"

জর্জ্জেটি পুনরাবৃত্তি করিল, "খাক্-কি।"

তিনজনে বসিয়া বসিয়া তখন চড়ুইগুলিকে দেখিতে লাগিল।

অতঃপর একটি মৌমাছির প্রবেশ। মৌমাছি অনেকটা আত্মারই অনুরূপ। আত্মা যেমন নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া আলোক সংগ্রহ করে, মৌমাছিও তেমনই পুষ্পে-পুষ্পে সঞ্চরণ করিয়া মধু আহরণ করে।

মৌমাছি গুন্ গুন্ করিতেছিল—যেন বলিতেছিল, "আমি এসেছি, আমি সকলের আগে গোলাপগুলিকে দেখে এসেছি, এখন এলেম ছেলেদের দেখ্তে। কি হ'চ্চে এখানে?"

মধুমক্ষিকা অনেকটা গিন্নীর মতো।—এর গানেও একটু বকুনী আছে। ছেলেরা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মৌমাছিটি লাইব্রেরী খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিতে লাগিল, কক্ষকোণের সন্ধান লইয়া আসিল, গুন্ গুন্ করিতে করিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলমারীর কাচের ভিতর দিয়া বাঁধানো বইগুলির নাম-পরিচয় পরীক্ষা করিয়া দেখিল—যেন সে এসব বুঝিতে পারে। এবং এইরূপে অনুসন্ধানকার্য্য সমাপ্ত হইলে সে প্রস্থান করিল।

রেনিজিন বলিল, "ও তার বাড়ী চ'লে গেল।"

গ্রোস্ এলেন বলিল, "ওটা একটা পশু।"

"না," রেনিজিন বলিল, "ওটা একটা মাছি।"

"মাত্তি"—জর্জ্জেটি বলিল।

এই সময় গ্রোস্ এলেন দোরের নিকট গাঁট-দেওয়া একটুকরো দড়ী পাইয়া তাহার অপর প্রান্ত অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিল এবং মনোযোগের সহিত সেই ঘূর্ণন দেখিতে লাগিল।

এদিকে জর্জ্জেটি আবার নিজেকে চতুষ্পদে পরিণত করিয়া মেঝের উপর যদৃচ্ছাক্রমে চরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে সে একটা সুবৃহৎ আস্তরণমণ্ডিত আরাম-কেদারা আবিষ্কার করিল। সেই পুরাতন আস্তরণটি এতই কীটজর্জ্জরিত যে অনেক স্থলেই তাহার অভ্যন্তরস্থ অশ্ব-লোম বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই আসনটির নিকটে থামিয়া সে তাহার ছিদ্রগুলিকে বড় করিতে লাগিল এবং অধ্যবসায়সহকারে লম্বা ঘোড়ার লোমগুলি টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাহার একটি অঙ্গুলি উপরদিকে উঠাইল। ইহার মানে—"শোনো।"

ভ্রাতৃদ্বয় মাথা ফিরাইল।

বাহির হইতে একটা অস্পষ্ট সুদূর কোলাহল উত্থিত হইতেছে, শোনা গেল। বোধহয় উহা বনের ভিতর আক্রমণকারীগণের উদ্যোগপর্ব্ব। অশ্বের হ্রেষা, ট্রামের ঝর্ঝর, চক্রের ঘর্ঘর, শৃঙ্খলের ঝনৎকার, কুচকাওয়াজের আদেশ-প্রত্যুত্তর—সবগুলি মিলিয়া তাহার মধ্য হইতেও যেন বিশেষ একটা সুর ধ্বনিত হইতেছিল। শিশুগণ আহ্লাদের সহিত তাহা শুনিতে লাগিল।

রেনিজিন বলিল, "পরমেশ্বর এ সব করচেন!"

গোলমাল থামিল। রেনিজিন তখনও স্বপ্ন-বিভোর।

শিশুর মাথায় কত নূতন খেয়াল নিমেষে জাগিয়া উঠে, আবার নিমেষে মিলাইয়া যায়। ক্ষণ-স্থায়ী শিশু-স্মৃতির মূলে না জানি কি গোপন-রহস্য? এই সরল, চিন্তামগ্ন বালকটির মনের ভিতর বায়স্কোপের ছবির মতন পর পর কতকগুলি চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল—দয়াময় পরমেশ্বর, প্রার্থনা, যুক্তকর এবং একটি স্নেহময় কোমল হাসির স্নিগ্ধ আলোক (যাহা পূর্ব্বে ছিল, এখন আর নাই)। ভাবনামগ্ন রেনিজিনের মুখ হইতে হঠাৎ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উচ্চারিত হইল, "মা।"

গ্রোস্-এলেন সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিল, "মা।"

জর্জ্জেটিও বলিয়া উঠিল, "মা।"

তারপর রেনিজিন লাফাইতে আরম্ভ করিল। উহা দেখিয়া গ্রোস্ এলেনের পদযুগলও আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে তাহার ভাই-এর প্রত্যেকটি গতি ও ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল। তিন বৎসর চারি বৎসরের অনুকরণ করে, কিন্তু কুড়িমাস আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। জর্জ্জেটি বসিয়াই থাকিল, তবে মাঝে মাঝে দুই-একটা শব্দ উচ্চারণ করিতেছিল। পূর্ণ বাক্য বলা তখন পর্য্যন্ত তাহার রপ্ত হয় নাই। সে ভাবে, আর অর্দ্ধোচ্চারিত একটি-দুইটি শব্দের ইঙ্গিতে সংক্ষেপে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করে।

তবুও খানিকক্ষণ পরে দৃষ্টান্ত সংক্রামক হইয়া উঠিল এবং জর্জ্জেটি ভাইদের অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। তখন সেই পুরাতন মসৃণ কাষ্ঠতলের ধূলিরাশির উপর মর্ম্মর-মূর্ত্তিসকলের গম্ভীর দৃষ্টির নিম্নে তিনযোড়া ছোট্ট নগ্ন পদের ধাবন, কুর্দ্দন, নৃত্য আরম্ভ হইল। জর্জ্জেটি মাঝে মাঝে এই মূর্ত্তিগুলির দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, আর আস্তে আস্তে বলিতেছিল, "মা—মানুচ।"

জর্জ্জেটির ভাষায় ইহার অর্থ হয়ত, যাহা মানুষের মতো দেখাইতেছে অথচ ঠিক মানুষ নহে। ছায়ামূর্ত্তির ধারণায় ইহাই বুঝি সূচনা।

জর্জ্জেটি টলিতে টলিতে—'হাঁটিতে হাঁটিতে' বলা ঠিক হইবে না—ভাইদের পেছনে পেছনে ফিরিতেছিল। কিন্তু তাহার অভ্যস্ত ও পছন্দসই চলার সাধারণ পদ্ধতি হইতেছে—দুই পা ও দুই হাতে ভর দিয়া।

রেনিজিন ইতিমধ্যে জানালার নিকট গিয়াছিল। সহসা মাথা তুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া পুনরায় মাথা নীচু করিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের এককোণে আসিয়া লুকাইল। এইমাত্র তাহার নজরে পড়িল, একজন লোক তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। লোকটা মালভূমিতে সন্নিবিষ্ট নীলদলের একজন সৈনিক। সাময়িক সন্ধির সুযোগে সে একেবারে খদের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেখান হইতে লাইব্রেরীর অভ্যন্তরভাগ দৃষ্টিগোচর হয়। রেনিজিনকে লুকাইতে দেখিয়া গ্রোস্ এলেনও লুকাইল। সে গুড়ি-মারিয়া তাহার ভাইএর পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল। জর্জ্জেটিও তাড়াতাড়ি তাহাদের পেছনে আশ্রয় লইল। কিছুক্ষণ সকলে নিস্পন্দ—চুপ্‌চাপ। জর্জ্জেটির অঙ্গুলি তাহার ওষ্ঠপুটের উপর স্থাপ্ত। কয়েক মিনিট পরে রেনিজিন ভয়ে ভয়ে বাহিরের দিকে চাহিল। সৈনিক তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া। রেনিজিন আবার পালাইয়া আসিল। শিশু-তিনটি সাহস করিয়া জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেও পারিতেছিল না। এইরূপ অনিশ্চিত ভয় ও উদ্বেগে কিছুক্ষণ কাটিল, অবশেষে জর্জ্জেটির বিরক্তি ধরিয়া গেল। সে সাহস করিয়া বাইরের দিকে চাহিল। সৈনিক অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আবার শিশুরা ছুটাছুটি ও খেলা করিতে লাগিল।

গ্রোস্ এলেন্ রেনিজিনের ভক্ত ও অনুকরণকারী হইলেও তাহার একটু বিশেষত্ব ছিল। সেটা হইতেছে তাহার

আবিষ্কার-ক্ষমতা। তাহার ভাই ও বোনটি সাহস্রা দেখিতে পাইল, সে বাক্সের পেছন হইতে একটা খেলার গাড়ী আবিষ্কার করিয়া সেটাকে টানিয়া টানিয়া উদ্দামভাবে ছুটিতেছে।

এই পুতুলের গাড়ী ধূলিরাশির মধ্যে বহুবর্ষ ধরিয়া বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ-সমষ্টি ও পণ্ডিত-গণের প্রতিমূর্ত্তির সান্নিধ্যে সে শান্তিতে ও নিরাপত্তিতে এতকাল অবস্থান করিয়া আসিয়াছে।—হয়তো এটা গডেনের শৈশবকালের একটি ক্রীড়নক।

গ্রোস্ এলেন তাহার রজ্জুখণ্ডটিকে চাবুকে পরিণত করিয়া কল্পিত অশ্বের উদ্দেশ্যে উহা সপাং সপাং আস্ফালন করিতেছিল। সে একটু গর্ব্বিত। আবিষ্কারক মাত্রেরই মনের ভাব এইরূপ হয়। শিশু আবিষ্কার করে একটি ক্ষুদ্র ক্রীড়াণকটি; আর পরিণতবয়স্ক মানুষ আবিষ্কার করে একটা আমেরিকা—দুঃসাহসিকতা উভয়ত্রই সমান।

কিন্তু এই অভাবিত লাভের অংশীদার হওয়া আবশ্যক। রেনিজিনের ইচ্ছা সে এই গাড়ীর ঘোড়া হয়, আর জর্জ্জেটির ইচ্ছা উহাতে চড়ে। সে কোনোরূপে গাড়ীতে চড়িয়া বসিল, রেনিজিন হইল ঘোড়া, আর গ্রোস্ এলেন হইল কোচ্ম্যান্। কিন্তু স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোচ্ম্যানের কোনই জ্ঞান ছিল না। অথ তাহাকে শিখাইয়া দিতে লাগিল।

রেনিজিন তাহাকে বলিয়া দিল, "বল, হুয়া!"

গ্রোস্ এলেন আওড়াইল, "হুয়া!"

রেনিজিন গাড়ীতে টান দিবা মাত্র গাড়ী উলটিয়া গেল; জর্জ্জেটি গড়াইয়া পড়িল। দেবশিশুরাও চীৎকার করিতে পারে; জর্জ্জেটি চেঁচাইতে লাগিল।

তাহার ইচ্ছা হইল একটু কাঁদে। উপক্রম দেখিয়া রেনিজিন বলিল, "মিস্, গাড়ীটার পক্ষে তুমি বড়।"

"আমি বড়!"—জর্জ্জেটি কোনোরূপে উচ্চারণ করিল।

সে-যে বড় এই কথা ভাবিয়া তাহার পতন-জনিত দুঃখের কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইল।

জানালার বাহিরে প্রশস্ত কার্ণিসের উপর বৃষ্টি-ভেজা জমাট ধূলিমাটিতে বায়ু-তাড়িত বীজ হইতে একটা বুনো জামের গাছ ঝোপ বাঁধিয়া গজাইয়া উঠিয়াছিল। এই আগষ্ট মাসে সেই ঝোপটা কালো কালো ফলে একেবারে ভর্ত্তি। একটা শাখা জানালার ভিতর দিয়া আসিয়া প্রায় মেঝের উপর পড়িয়াছে।

রজ্জু এবং ক্রীড়াণকটি আবিষ্কারের পর গ্রোস্ এলেন এই বুনো জামের গাছটি আবিষ্কার করিল এবং উহার নিকটে গিয়া জম্বুফল ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

রেনিজিন বলিল, "আমার খিদে পেয়েছে।"

জর্জ্জেটি হাত ও হাঁটুর উপর ভর দিয়া ঘোড়ার মতো লাফাইতে লাফাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন তিনজনে মিলিয়া সেই শাখাটির জাম নিঃশেষ করিয়া আনিল। জম্বুফলের লাল রঙে তাহাদের হস্ত ও বদনমণ্ডল রঞ্জিত হইয়া উঠিল। আনন্দে তাহারা চেঁচামেচি করিতে লাগিল।

সময় সময় গাছের কাঁটায় তাহাদের অঙ্গুলি ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল।—সুখের সঙ্গে দুঃখ সর্ব্বদাই যুক্ত থাকে।

জর্জ্জেটি তাহার আঙুল উঁচু করিয়া রেনিজিনকে দেখাইল। তথায় ক্ষুদ্র একবিন্দু রক্ত। ঝোপের দিকে দেখাইয়া জর্জ্জেটি বলিল, "কামড়ায়।"

গ্রোস্-এলেনও কাঁটায় খোঁচা খাইয়াছিল। ঝোপটার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, "এটা একটা জানোয়ার।"

"না," রেনিজিন বলিল, "এটা গাছের ডাল।"

"তা হ'লে গাছের ডাল ভারী দুষ্টু!" গ্রোস্ এলেন মন্তব্য করিল।

জর্জ্জেটি আবার কাঁদিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু একথা শুনিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে রেনিজিন মনে মনে একটা মস্ত ফন্দী আঁটিল। ছোট ভাইটির একাধিক আবিষ্কারে তাহার মনে একটু ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইয়াছে। বিশেষ একটা কিছু করিতে না পারিলে আর মান থাকে না। কয়েক মিনিট ধরিয়া সে লাইব্রেরীর মধ্যস্থলে স্মৃতি-স্তম্ভের মতো দণ্ডায়মান।

একপায়া-টেবিলটার যে দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। উহারই উপরে সেই সুবিখ্যাত শাস্ত্রকার সেইন্ট (ঋষি) বার্থোলোমিউর গ্রন্থখানা রক্ষিত।

ইহা একখানা চমৎকার এবং অমূল্য গ্রন্থ। বাইবেলের ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের সুপ্রসিদ্ধ সংস্করণের খ্যাতিমান্ প্রকাশক কর্ত্তৃক এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল রেশম ও তুলা হইতে আরবদেশে প্রস্তুত সুন্দর শুভ্র কাগজে,—সাধারণ ওলন্দাজি কাগজে নহে। এই কাগজের রং কখনো হলদে হইয়া যাইত না। বইটি গিল্টি-করা চামড়ায় বাঁধানো, রূপার বন্ধনীতে আবদ্ধ, বহু চিত্র-পরিশোভিত এবং নানান্ দেশের মানচিত্র-সম্বলিত। এরূপ গ্রন্থ বড়ই দুষ্প্রাপ্য ছিল।

বইটি বড়ই সুন্দর। চাহিয়া চাহিয়া রেনিজিনের আর আশা মিটিতেছিল না। যে পাতায় সেইন্ট বার্থোলোমিউর বৃহৎ চিত্র, ঘটনাক্রমে বইখানি সেইখানটায়ই খোলা ছিল। রেনিজিন যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে উহা দেখা যাইতেছিল। জামগুলি নিঃশেষে ভক্ষিত হইলে সে ব্যাকুল-আগ্রহে ছবিটির দিকে তাকাইয়া ছিল। ভাইএর দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া জর্জেটিও উহা লক্ষ্য করিল এবং পুলকিত-অন্তরে বলিয়া উঠিল, "অবি!"

জর্জেটির এই সাহ্লাদ বাক্যে রেনিজিনের মন হইতে সকল দ্বিধা যেন ঘুচিয়া গেল। এবং একমুহূর্ত্তেই সে আপনার মতলব ঠিক করিয়া লইল।

তারপর এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল যাহাতে গ্রোস্ এলেন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। লাইব্রেরী-ঘরের এক কোণে একটা বড় ওক-কাঠের চেয়ার ছিল; রেনিজিন সটান সেখানে গিয়া ওটাকে টানিয়া টানিয়া একলাই সেই টেবিলের নিকট লইয়া আসিল। তারপর চেয়ারের উপর চড়িয়া দুই হাতে বইটি ধরিল।

উচ্চপদে আরূঢ় হইলে লোকের মনে স্বভাবতই একটু বদান্যতার ভাব আইসে। রেনিজিনও অনুভব করিল তাহার এখন একটু বদান্যতা দেখানো আবশ্যক। সে 'ঋষিটি'র উপরপ্রান্তে ধরিয়া ধীরে ধীরে উহা ছিঁড়িয়া ফেলিল। ছেঁড়াটা সেইন্টের উপর দিয়া কোণাকুণি চলিয়া গেল। এই প্রাচীন ঋষির বামপার্শ্বের একটি চক্ষু এবং মস্তকের আলোক-বেষ্টনীর একটু অংশ পুস্তকে রহিয়া গেল; আর তাহার অপরার্দ্ধ (চর্ম্মসমেত) রেনিজিন জর্জেটিকে উপহার দিল। জর্জেটি উহা হাতে লইয়া বলিল, "মা—মাহুচ।"

গ্রোস্ এলেন বলিল, "আর আমার?"

শিশুগণ কর্ত্তৃক কোনো পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা ছিন্নীকরণ, বয়স্কলোক কর্ত্তৃক প্রথম রক্তবিন্দুপাতেরই মতন;—ভাবী ধ্বংসকার্য্য উহাতে অনিবার্য্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া যায়।

রেনিজিন পুস্তকের সেই পাতাটি উল্টাইল। ঋষির পরেই ভাষ্যকার প্যান্টিনাসের চিত্র। রেনিজিন তাহাকে গ্রোস্ এলেনের হস্তে সমর্পণ করিল।

ইতিমধ্যে জর্জেটি তাহার ছবির বড় খণ্ডটিকে ছিঁড়িয়া দুইটুকরো করিল। এবং তারপর সেই দুইটুকরোকে আবার চারিটুকরায় পরিণত করিল। এইরূপে তাহার কাজ চলিতে লাগিল। ইতিহাস লিখিয়া রাখিতে পারিত যে, আর্মেনিয়াতে সেইন্ট বার্থোলোমিউর গাত্রচর্ম্ম ছাড়াইয়া লওয়ার পর বৃটেনীতে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

শাস্ত্রকর্ত্তা ও তাহার ভাষ্যকারের চিত্র খণ্ড-বিখণ্ড করা হইলে জর্জেটি হাত বাড়াইয়া বলিল, "আল্—ও।"

অতঃপর হস্তক্ষেপ করা হইল কুঞ্চিত-ভ্রূ টীকাকারগণের উপর। তাহাদের মধ্যে প্রথম গ্যাভেন্টাস। রেনিজিন তাহাকে ছিঁড়িয়া জর্জেটির হাতে দিল। সমস্ত টীকাকারগণ পর্য্যায়ক্রমে এরূপ সদ্‌গতি লাভ করিল।

দাতার মধ্যে একটা বড়মানুষির ভাব থাকে। রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছিলেন,—রেনিজিনও নিজের জন্য কিছুই রাখিল না। গ্রোস্ এলেন এবং জর্জেটি যে মুগ্ধনেত্রে তাহার কার্য্য সন্দর্শন করিতেছিল, রেনিজিন তাহাতেই সন্তুষ্ট। তাহারাই তাহার জনসাধারণ—যাহাদের প্রশংসাই তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত পুরস্কার।

রেনিজিনের বদান্যতার অবধি নাই। সে গ্রোস্ এলেনকে কেব্রিমিও পিগ্‌নাটেলি এবং জর্জেটিকে কাথার ফ্লিস্টিং-এর প্রতিকৃতি প্রদান করিল। তৎপর গ্রোস এলেনের হস্তে এলকন্দ্‌স্ টোস্টাট এবং জর্জেটির

হস্তে কর্ণেলিয়াস্ আ লাপিদে সমর্পিত হইল। একজন পাইল উৎসর্গপত্র, আর একজন পাইল উপক্রমণিকা। ক্রমে ম্যাপগুলি বিতরিত হইল ;—ইথিওপিয়া গ্রোস্ এলেনের, আর লাইকোনিয়া জর্জেটির ভাগে পড়িল। দানযজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া রেনিজিন গ্রন্থাবশেষটুকু গৃহ-কুটিমে নিক্ষেপ করিল।

ছেলেদের নিকট এই মুহূর্তটি বড়ই ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছিল। ভীতিমিশ্রিত উল্লাসের সহিত গ্রোস এলেন ও জর্জেটি লক্ষ্য করিল—দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান রেনিজিন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, মুষ্টিবদ্ধ হস্তে বিশাল গ্রন্থটিকে তাহার আধারের উপর হইতে ঠেলিয়া দিতেছে। সেই মহিমান্বিত গ্রন্থের পরিণামটি হইল বড় করুণ। ধাক্কা খাইয়া মুহূর্তের জন্য উহা ডেস্কের প্রান্তে থামিয়া যেন ইতস্ততঃ করিতে করিতে আপনাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিল, তারপর সশব্দে ভূমিতলে নিপতিত হইল,—কোথায় গেল তাহার বাঁধাই, কোথায় বা গেল তাহার বন্ধনী। সৌভাগ্যক্রমে বইটা ছেলেদের উপরে পড়ে নাই। তাহারা শুধু স্তম্ভিত হইয়াছিল, আহত হয় নাই। বিজয়ের এমন সুচারু উপসংহার অনেক সময়ই দেখা যায় না।

কীর্তিচিহ্ন মাত্রই ভূমিসাৎ হইবার কালে একটা কোলাহল উত্থিত হয় এবং ধূলিপটলে গগন-মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই পতনেও তেমনই শব্দ হইল এবং একরাশ ধূলি উড়িয়া গেল।

পুস্তকখানিকে ভূপাতিত করিয়া রেনিজিন চেয়ার হইতে অবতরণ করিল।

কিছুক্ষণ সকলে ভয়ে চুপ করিয়া রহিল। বিজয়ও সময় সময় আপনার কৃতকর্মে ভীত হইয়া পড়ে। শিশুত্রয় পরস্পর হাতধরাধরি করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া ঐত ছিন্নবিচ্ছিন্ন বইটির দিকে সশঙ্ক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালমাত্র। গ্রোস্ এলেন অচিরেই অগ্রসর হইয়া উহার উপর এক লাথি বসাইয়া দিল।

অধিক প্ররোচনার প্রয়োজন ছিল না। সংহারপ্রবৃত্তি অতি সহজেই জাগিয়া উঠে। রেনিজিনও উহাকে পদাঘাত করিল, জর্জেটিও তাহার ছোট্ট পা দিয়া উহাকে লাথি দিতে গিয়া নিজেই পড়িয়া গেল, এবং তারপর উঠিয়া গিয়া বইটার উপর একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইন্দ্রজাল সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া গেল। রেনিজিন ছবির উপর লাফাইয়া পড়িল, গ্রোস্ এলেন তাঁহার উপর নৃত্য করিতে লাগিল। তখন কেউ ছবি ছিঁড়িতে লাগিল, কেউ পাতা ছিঁড়িতে লাগিল, কেউ বা সোনালী বাঁধাই চামড়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিতে লাগিল। তাহাদের হস্ত, পদ, নখ ও দন্তের আর বিরাম রহিল না। আঁচড়াইয়া, মোচড়াইয়া, বিমর্দন করিয়া তাহারা সেই অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থখানিকে একেবারে তাল পাকাইয়া ফেলিল। এইরূপে সেই প্রফুল্ল, বিজয়দৃপ্ত, করুণালেশশূন্য, পুষ্প-পেলব, সহাস্য, নিষ্ঠুর ধ্বংস-দেবত্রয় কর্তৃক আত্মরক্ষায় অসমর্থ বেচারা শাস্ত্রকারের উৎসাদন সম্পন্ন হইল।

আর্মেনিয়া, জুডিয়া, বেনেভেন্টো, যেখানে যেখানে মহাপুরুষের কীর্তিচিহ্ন বিরাজিত ছিল, সবই তাহাদের হস্তে নির্বাণ প্রাপ্ত হইল। এই সুপ্রাচীন গ্রন্থের বিনাশকার্যে তাহারা এরূপ তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদের পাশ দিয়া একটা মূষিক দৌড়িয়া গেল, সেটাও তাহাদের লক্ষ্য হইল না।

এ যে একটা বিরাট হত্যাকাণ্ড! পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান; কুসংস্কার, ধর্মোন্মাদ, সৃষ্টিরহস্য; সুপবিত্র লাটিন ভাষা,—এক কথায় আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত একটা সমগ্র ধর্মকে এইরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা—তিনজন বিপুল-শক্তি বিরাটকায় দৈত্যের কর্ম। কিন্তু তিনটি শিশুই তাহা সমাধা করিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একত্র তাহাদের খাটিতে হইল, কিন্তু কার্যটি তাহারা শেষ করিল। সেইন্ট বার্থোলোমিউর আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না।

যখন কার্য সমাপ্ত হইল, যখন পুস্তকের শেষপত্র ছিন্ন এবং শেষচিত্র ভূলুণ্ঠিত হইল, যখন কেবল বাঁধাই-এর কঙ্কালটুকু ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তখন রেনিজিন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আহ্লাদে করতালি দিতে লাগিল।

গ্রোস্ এলেন ভ্রাতার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিল।

জর্জেট পুস্তকের একটি ছিন্নপত্র হাতে লইয়া জানালার চৌকাঠে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল এবং ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া সেইটি শতটুক্‌রো করিয়া জানালার বাহিরে ছড়াইয়া দিতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া রেনিজিন এবং গ্রোস্ এলেনও তৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। সমগ্র গ্রন্থটি সেই অধ্যবসায়শীল, নাছোড়বান্দা অঙ্গুলিগুলি কর্তৃক ছিন্নীকৃত হইয়া বাতাসে উড়িয়া যাইতে লাগিল। জর্জেট মনোযোগের সহিত এই ছিন্ন পত্রাংশগুলির উড্ডয়ন লক্ষ্য করিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল,—"প্রজাপতি!"

গ্রন্থের শবদেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিন্নাংশগুলি এইরূপে নীলাকাশে অদৃশ্য হইয়া গেলে হত্যাকাণ্ডের অবসান হইল।

৫.

এইরূপে দ্বিতীয়বার এই ধর্ম্মপ্রচারক ঋষির বলিদান হইল। তাঁহার প্রথমবারের আত্মবিসর্জ্জন হইয়াছিল যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ঊনপঞ্চাশৎ বৎসর পরে।

ক্রমে সন্ধ্যাতপ্ত ধরণীর গায় তাহার ধূসর স্নিগ্ধ ছায়া প্রলেপ মাখাইয়া দিল। বাতাসের কোমল স্পর্শে তন্দ্রার আবেশ।—জর্জেটির নয়নযুগল মুদিয়া আসিতে লাগিল। রেনিজিন একটা খড়ের বোঝা জানালার নিকট টানিয়া আনিয়া তাহার উপর সটান শুইয়া পড়িল; বলিল, "এখন ঘুমানো যাক্।"

গ্রোস্ এলেন রেনিজিনের মাথায় ঠেস্ দিয়া মাথা রাখিল, জর্জেট আপনার মস্তকটি গ্রোস্ এলেনের [illegible] উপর ন্যস্ত করিল। তারপর তিনটি দস্যি ছেলেমেয়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার সুরভি নিঃশ্বাসের মতো ঈষদুষ্ণ সমীরণ বনফুলের গন্ধ-বাসিত হইয়া মুক্ত গবাক্ষপথে বহিয়া আসিতেছিল। অস্তগামী তপন আপনার সস্নেহ করে সৃষ্টিকে আলিঙ্গন করিতেছিল। চারিদিক আনন্দোজ্জ্বল, শান্তিময়, মৈত্রী-করুণায় ভরা। সমগ্র জড়জগৎ যেন একসুরে বাঁধা—তাহার নিখিল মধুরতা আনিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতেছিল।

সৃষ্টি একটা [illegible]-রহস্যের মহিমময় বিকাশ, আর তাহার কল্যাণকারিতার হইতেছে সেই মহিমার পূর্ণতা। বিশাল প্রকৃতির মধ্যে একটা স্নেহশীল মাতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা অনুভব করিতে পারি, যেন এক অদৃশ্য শক্তির প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা জীবনসংগ্রামের প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে প্রবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই জাগ্রত রহিয়াছে। অথচ সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য ও কোমলতা।

সততপরিবর্ত্তনশীল ছায়ালোকের বিচিত্র সম্পাতে তটিনীবক্ষে, শ্যামল প্রান্তরে যে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল রচিত হয়, ঘুমন্ত প্রকৃতির উপর সেইরূপ একটা অস্পষ্ট মোহময় আবরণকে যেন কে টানিয়া দিতেছিল। লঘু বাষ্পরাশি নীরবে ঊর্দ্ধে উঠিয়া মেঘে মিশাইয়া যাইতেছিল—যেন কল্পনাক্রমে স্বপ্নে পরিণত হইতেছিল। দুর্গের উচ্চশীর্ষের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাখীরা উড়িতেছিল। সোয়ালো-গুলি জানালার ভিতর দিয়া মাথা গলাইয়া দেখিতেছিল,—শিশুরা বেশ ভালরূপে ঘুমাইতেছিল কিনা, যেন তাহাই তাহারা জানিতে চায়। বালকন্দর্পের মতো এই তরুণ শিশুগুলি অর্দ্ধনগ্ন স্তব্ধভাবে জড়াজড়ি করিয়া শুইয়া রহিয়াছে। কি সুন্দর! তিনজনের বয়স একত্র করিলেও নয় বৎসর হয় না। তাহারা নন্দনের আনন্দ-স্বপ্নে বিভোর,—ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখায় সে আনন্দের ঈষৎ আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। হয়তো করুণাময় জগৎপিতা স্বয়ং তাহাদের কর্ণমূলে ঘুমপাড়ানিয়া সঙ্গীত গুঞ্জন করিতেছিলেন।

তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে সব চুপচাপ। নিখিল বিশ্ব [illegible] কাণ পাতিয়া তাহাদের কোমল বক্ষ হইতে উৎসারিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মৃদু শব্দ শুনিতেছিল। গাছের পাতায় স্পন্দন নাই, মাঠের ঘাস অবিকম্পিত। মনে হইতেছিল, যেন নক্ষত্র-খচিত বিপুল জগৎ এই ছোটো শিশুকয়টির নিদ্রা-ভঙ্গের আশঙ্কায় আপনার শ্বাসরোধ করিয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্রতার প্রতি বিরাট প্রকৃতির এই সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা—এতদপেক্ষা মহত্তর আর কি হইতে পারে?

সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ, প্রায় দিকচক্রবালে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সহসা এই গভীর শান্তির মধ্যে অরণ্যের প্রান্ত হইতে বিদ্যুচ্ছটার মতো একটা দীপ্তি ঝলকিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর শব্দ। এইমাত্র একটা তোপ দাগা

হইয়াছে। পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে কামানগর্জ্জন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই শব্দে জর্জ্জেটির নিদ্রাভঙ্গ হইল।

সে মাথা একটু তুলিল, ছোট্ট আঙুলটি উঁচু করিয়া বলিল, "বুম !"

শব্দ ক্রমে আকাশে মিলাইয়া গেল। আবার সব নিস্তব্ধ হইল। জর্জ্জেটি গ্রোস্ এলেনের গায়ের উপর মাথা রাখিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

তরণী

শ্রীমমতা মিত্র

মেঘে রৌদ্রে চলিয়াছে খেলা,
নদী-বুকে ভাসায়েছি ভেলা।
কতদূরে কোন্ তীরে তরী মোর ভিড়িবে রে ?
এদিকে যে প'ড়ে আসে বেলা,
নদী বুকে ভাসায়েছি ভেলা।

চারিদিকে শুধু জলরাশি,
একা আমি তরী'পরে ভাসি।
নির্ঝরিণী ব'য়ে চলে কুলুকুলু কলকলে
তরল হরষভরে হাসি,
একা আমি তরী'পরে ভাসি।

ধানক্ষেত শোভে দুই তীরে,
মুগ্ধচোখে চাই ফিরে ফিরে ।
সবুজ বসনখানি কে ওরে পরাল আনি
যতনে সারাটি দেহ ঘিরে ?
মুগ্ধচোখে চাই ফিরে ফিরে।

ছিলাম বসিয়া আনমনে,
সহসা হেরিনু পূর্ব্বকোণে
পুঞ্জ পুঞ্জ কৃষ্ণ মেঘে আকাশ ফেলেছে ঢেকে,
চিকুর চমকে ক্ষণে ক্ষণে,
সহসা হেরিনু পূর্ব্বকোণে।

এ ছবি কে আঁকিল গো মরি !
দেখি, দেখি দুই চোখ ভরি।
আকাশ নামিয়া ধীরে চুমে যেন জাহ্নবীরে,
মৌন স্নিগ্ধ মিলনমাধুরী।
দেখি, দেখি দুই চোখ ভরি।

ক্রমে বেগে নেমে এল জল,
চল্ ওরে ত্বরা ক'রে চল্।
বৃষ্টিধারা লাগে গায়, জল যে ভরিল নায়,
তটিনীতে এল বুঝি ঢল,
চল্ ওরে ত্বরা ক'রে চল্।

রোষ-দৃষ্টি হানিছে দামিনী,
মনে মনে বড় ভয় মানি।
অতল অকূল নীরে তরী মোর ভেসে ফিরে,
কোথা তট কিছুই না জানি,
মনে মনে বড় ভয় মানি।

বাতাসে তরণী মোর দুলে,
জলরাশি উঠে ফুলে ফুলে।
ওই হোথা তরুছায় কুটীর না দেখা যায়,
হোথা গেলে উত্তরিব কূলে,
জলরাশি উঠে ফুলে ফুলে।

শোপেন্‌হাওয়ার-এর সাহিত্যিক মতবাদ

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

পরিচয়

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্যের দর্শন-শাস্ত্রের ওপর জার্মান্ দার্শনিক আর্থার শোপেন্‌হাওয়ার যে অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা আজ সকলেরই বিদিত। "The World as Will and Idea"; "On Will in Nature" প্রভৃতির লেখকরূপে শোপেনহাওয়ার তদানীন্তন দার্শনিকদিগের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন।

প্রধানতঃ, দর্শন-শাস্ত্রবিদ-রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও শোপেনহাওয়ার সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকখানি চমৎকার প্রবন্ধ লিখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে লেখকের মনের যে স্বাধীন চিন্তাধারা প্রবাহিত হ'য়েছে, যে তীব্র মতামত প্রচারিত হ'য়েছে, আমাদের দেশের পাঠক সেগুলি পাঠে বিশেষ আনন্দ এবং সুফল পাবেন ব'লেই আশা করি। এ-সংখ্যায় তাঁর "গ্রন্থকার" এবং "লেখার ষ্টাইল" সম্বন্ধে সরস সুযুক্তি-পূর্ণ কথাগুলি লিপিবদ্ধ করলাম। পরে, সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ে তাঁর স্বাধীন মতামতগুলি প্রকাশ করব।

শোপেনহাওয়ার-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী ডান্‌টুজিক্ শহরে শোপেন্‌হাওয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যখন পাঁচ বছর বয়স সেই সময় পিতামাতা ডান্‌টুজিক পরিত্যাগ ক'রে হামবার্গ্-এ উঠে আসেন। শোপেনহাওয়ার সেইখানেই স্কুলে ভর্ত্তি হন।

কিছুদিন পরে (১৮০৩-০৫) পিতামাতার সঙ্গে তিনি য়ুরোপ-ভ্রমণে বাহির হন, এবং ওয়েম্বলডন্ বোর্ডিং-স্কুলে তিন মাস অতিবাহিত করেন।

বাল্যকাল থেকেই শোপেনহাওয়ার তীক্ষ্ণ-ধী এবং স্পষ্ট-বক্তা ছিলেন; বিজাতি স্কুলের প্রতি যে বিরুদ্ধ মনোভাব তিনি কর্তৃপক্ষের সুমুখেই প্রকাশ করেন, তাতে তাঁর মাতা লজ্জিত হ'য়ে পুত্রকে ভৎ'সনা করতে বাধ্য হন।

১৮০৪ সালে শোপেনহাওয়ার ডান্‌টুজিকের এক সওদাগরী আপিসে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৮০৫ সালে এপ্রিল মাসে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে।

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী উইমার-এ গমন করেন। এবং তথায় সাহিত্যিক-মহলে এবং সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন।

ঐ সময়ে দেশময় গ্রীক ভাষা শেখ্‌বার বিশেষ উৎসাহ প'ড়ে যায়; এবং শোপেনহাওয়ার ১৮০৭ সালে গোথার স্কুলে ভর্ত্তি হন। সেই সময় তাঁর মায়ের সহিত শোপেন-হাওয়ার-এর মনোমালিন্য ঘটে।

পুত্রের সকল বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ, উদ্ভট্ মতামত এবং সর্ব্বোপরি তাঁর রুক্ষ মেজাজের জন্য মাতা তাঁকে কোনোদিন সহ্য করতে পারতেন না। মা ছিলেন হাল্কা-প্রকৃতির স্ত্রীলোক; সমাজে মেলামেশা এবং আমোদ-প্রমোদ—এই নিয়েই থাকতেন; তাঁর লঘু-চিত্তের জন্য পুত্র তাঁকে কোনদিন শ্রদ্ধা করতে পারেন নি। ১৮১৩ সালের শেষে মায়ের সহিত শোপেনহাওয়ার এর চির-বিচ্ছেদ ঘটে। ঐ-বছরের প্রারম্ভে তিনি কিছুদিনের জন্য মায়ের সহিত একত্র বসবাস করেন। সেই সময় ভন্ মুলার নামে একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীকে নিয়ে মাতা-পুত্রে ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হয়। শোপেনহাওয়ার একটি দরিদ্র ছাত্রকে বাড়ীতে এনে রাখেন; কিন্তু তাঁর মা তাকে ঘোর আপত্তি প্রকাশ করেন এবং মুলারকে নিজের বাড়ীতে রাখেন। এই যুবক মুলার-এর ওপর সন্দিগ্ধচিত্ত শোপেনহাওয়ার অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেন; ফলে মাতা-পুত্রের মধ্যে চির-বিচ্ছেদের যবনিকা প'ড়ে যায়। এ-ব্যাপারের পর দু'জনের মধ্যে আর কোনদিন সাক্ষাৎ হয়

নি, যদিও শেষ বয়সে তাঁদের মধ্যে পত্র-ব্যবহার আরম্ভ হ'য়েছিল।

১৮১৪ সালে শোপেন হাওয়ার ড্রেস্‌ডেন্‌-এ গমন করেন। সেখান থেকে চার বছর পরে "The World as Will & Idea" নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

সেই সময় দেশের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে ইতালী ভ্রমণ করবার ধুম প'ড়ে যায়। এবং ১৮১৮ সালে শোপেনহাওয়ারও ইতালী গমন করেন।

দীর্ঘকাল সেখানে অতিবাহিত ক'রে ১৮৩৩ সালে ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট্‌-এ ফিরে এসে শোপেনহাওয়ার কৃতসঙ্কল্প অকৃতদার রূপে সেইখানে বাস করতে থাকেন। ১৮৩৬ সালে তাঁর বিরাট গ্রন্থ "On the Will in Natrue" প্রকাশিত হয়; তখন একজন অসামান্য প্রতিভা-সম্পন্ন দার্শনিকরূপে শোপেনহাওয়ার-এর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

শোপেনহাওয়ার-এর শেষ-জীবন নিঃসঙ্গভাবে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট-এর এক নির্জন গৃহকোণে ভারতের উপনিষদ এবং দর্শনশাস্ত্র-পাঠে অতিবাহিত হয়। যে-ঘরটিতে তিনি বসতেন, তার আস্‌বাবের মধ্যে ছিল কেবলমাত্র একখানি কৌচ ও ছোট একটি টেবিল; ঘরের এক কোণে Kant-এর আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি, টেবিলের ওপর ভগবান বুদ্ধের ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত প্রতিকৃতি। শোপেনহাওয়ার বুদ্ধের বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

১৮৬০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর প্রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

সাহিত্যিক মতবাদ

গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব (Authorship)

ক

শোপেনহাওয়ার বলেন—গ্রন্থকার আছেন দু'প্রকারের। এক যাঁরা লেখেন—বিষয়-বস্তুর জন্য; আর যাঁরা লেখেন—লেখবার জন্য। নিজের চিন্তা বা অভিজ্ঞতা জগতকে উপহার দেবার উপযুক্ত-বোধে একজন গ্রন্থ রচনা করেন; অন্যজন চান—টাকা. সুতরাং তিনি লেখেন টাকার জন্য. তাঁর চিন্তাকে তিনি গ্রন্থরচনা-ব্যবসায়ের মূলধন ব'লে গণ্য করেন।

অর্থ-প্রাপ্তির লোভে গ্রন্থ রচনা করা মানেই সাহিত্যকে অবনতির শেষ-সোপানে নামিয়ে দেওয়া।

শুদ্ধ মাত্র বিষয়-বস্তুর প্রেরণায় যদি লেখক গ্রন্থ রচনা করেন, তবেই সে লেখা সার্থক।

কী অপরিমেয় সৌভাগ্যই না আমাদের হ'ত যদি সাহিত্যের সকল বিভাগে বই থাক্‌তো খুব কম সংখ্যক—শুধু যেগুলি উৎকৃষ্ট। এ ভাগ্য আমাদের কোনদিন হবে না যতদিন লেখক বই লিখে টাকা রোজগারের চেষ্টা করবেন।

বড় বড় লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনা তখনই লিখিত হ'য়েছে, যখন তাঁরা কেবল লেখবার প্রেরণায় লিখতেন,—অর্থের জন্য নয়।

খ

আর একদিক দিয়ে গ্রন্থজীবীদের তিন ভাগ করা যায়।

প্রথম দলে হ'চ্ছেন তাঁরা, যাঁরা না ভেবে-চিন্তেই লেখেন। তাঁদের বিদ্যা পুঁথিগত; সময় সময় তাঁরা সেরা-বিদ্যার আশ্রয়ও নিয়ে থাকেন,—অর্থাৎ অপরের বই থেকে বেমালুম আত্মসাৎ করেন। বাজারে এঁদের ভীড়ই সব-থেকে বেশী!

দ্বিতীয় দলের লেখকেরা লিখতে লিখতে ভাবেন; লেখার জন্যই তাঁদের যা-কিছু চিন্তা। এঁদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

শেষের দলে আছেন সেই সব লেখক, যাঁরা লেখা আরম্ভ করবার পূর্ব্বে চিন্তা করেন। এঁরা অতি অল্প।

এই তিন প্রকার লেখকের ওপরে আছেন সেই ক'টি অল্প-সংখ্যক লেখক, যাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ রচনায় বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে মনে মনে মৌলিক-ভাবে পর্য্যাপ্ত আলোচনা করবার পর লিখতে সুরু করেন।

সচরাচর সাধারণ লেখকেরা কি করেন? তাঁরা যে বিষয়ে লিখতে মনস্থ করেছেন সেই বিষয়ে যে-সব বই লিখিত হয়েছে, সেই-সব বইগুলি তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে প'ড়ে নেন। তাঁদের চিন্তাকে গতিশীল করবার জন্য তাঁরা অন্যের চিন্তাধারার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফল হয় এই যে, অপর

শক্তিমান লেখকের চিন্তাধারার দুরতিক্রম্য প্রভাব তাঁদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে এবং শত চেষ্টাতেও তাঁরা কোনদিন কোন যথার্থ মৌলিক (original) রচনা সম্পাদন করতে পারেন না। তাঁদের মৌলিকতা চিরতরে নষ্ট হ'য়ে যায়।

যাঁরা একমাত্র নিজের চিন্তাধারায় সাহায্য নিয়ে লেখেন তাঁদের রচনার মধ্যেই নিজস্ব এবং বিশিষ্ট প্রতিভার ছাপ পাওয়া যায়। তাঁরাই সর্ব্বকাল এবং সর্ব্ববাদী-সম্মত, দীর্ঘকালস্থায়ী এবং সম্পদ-শালী রচনায় জাতীয়-সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করেন।

গ

লেখকের বিষয়-বস্তু এবং রচনা-রীতি যদি তাঁর নিজের মস্তিষ্ক-প্রসূত না হয় তাহ'লে তা অপাঠ্য।

পুস্তক-প্রস্তুত-কারক, গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা, সাধারণ ইতিহাস-লেখক এবং এমনি-ধরণের গ্রন্থকারের দল সটান অন্য গ্রন্থ থেকে তাঁদের বিষয়-বস্তু সংগ্রহ ক'রে থাকেন; ফলে তাঁদের লেখা স্বভাবতঃই এমন বিশৃঙ্খল এবং অস্পষ্ট হ'য়ে দাঁড়ায় যে, তাঁরা যে কি বলতে চাচ্ছেন এই বুঝতেই পাঠকের গলদঘর্ম্ম উপস্থিত হয়। তাঁরা বলবেন কি? তাঁদের নিজস্ব চিন্তাই কিছু নেই। তাঁদের রচনা হয়, ঠিক একটা ছাঁচ্ থেকে নেওয়া আর একটা ছাঁচের মত—মুখ-চোখের রেখার এমনি অবস্থা হ'য়ে যায় যে কে হয়ত আর চেন্‌বারই উপায় থাকে না।

ঘ

লেখকের শেষের-রচনাই বেশী ভাল; শেষের দিকে যা রচিত হ'য়েছে, গোড়ার লেখা থেকে তা অধিকতর সুসংস্কৃত ও উৎকর্ষ-সাধিত। কিন্তু পরিবর্ত্তন মানেই প্রগতি,—এর থেকে ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই নেই।

সত্যকারের চিন্তানায়ক, সঠিক বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন সুধী,—এঁরা নিয়মের ব্যতিক্রম; সংসারে অনিষ্টকারী নীচাশয়ের সংখ্যাই অধিক। অত যথার্থ গুণী ব্যক্তির পরিশ্রম অজ্ঞতাবশে সাহিত্যে নূতনত্ব আনবার জন্য এঁরা সকল সময়ে সবিশেষ যত্নবান। এই সব কপট এবং অন্তঃসারশূন্য লেখকদের সাবধানে এড়িয়ে চলা উচিত।

যদি কোন বিশেষ বিষয় পড়বার ইচ্ছা পাঠকের মনে জাগ্রত হয়, তবে তিনি যেন সেই বিষয়ে লিখিত আধুনিকতম এবং নূতনতম বইগুলির প্রতি এই ভেবে আকৃষ্ট না হন যে, বিজ্ঞান সদাই উন্নতিশীল, এবং নূতন গ্রন্থ লিখিত হবার সময় ঐ বিষয়ে লিখিত পুরাতন গ্রন্থরাজির সার-বস্তুর সাহায্য নেওয়া হ'য়েছে। তা হয়ত হ'য়েছে; কিন্তু কেমন ক'রে? নূতন গ্রন্থের লেখক হয়ত পুরানো গ্রন্থগুলিকে সম্যক বুঝে উঠ্‌তেই পারেন নি; অথচ তিনি তাদের ভাষা এবং ভাবের পরিবর্ত্তন ক'রে নিজের পুস্তকে চালিয়ে দিয়েছেন। এর ফল যা দাঁড়ালো, তা সহজেই অনুমেয়!—নূতন লেখক বিশ্রী এবং অপকৃষ্ট উপায়ে সেই-সেই কথাগুলিই লিপিবদ্ধ করলেন, যে-গুলি অনেক সুন্দরতর ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক নিজের বিস্তৃত অভিজ্ঞতার সাহায্যে সুশৃঙ্খল উপায়ে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন।

নূতন লেখক অনেক সময়ে পুরাতন লেখকের সেরা কথা, চমৎকার উপমা, সুন্দর যুক্তিগুলিকে ছেঁটে বাদ দিয়ে ফেলেন; কারণ, তিনি হয়ত তাদের উপকারিতা এবং সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতেই পারেন না,—অতখানি উচুস্তরের রসবোধ হয়ত তাঁর নেই।

অনেক সময় দেখা যায় যে, একখানা নূতন এবং অপকৃষ্ট বই বেরিয়ে সেই-বিষয়ে লিখিত পুরানো এবং উৎকৃষ্ট বইখানাকে কিছুদিনের মত চাপা দিয়ে দেয়।

নূতন বইখানার বিজ্ঞাপনের বাহার আর বাহ্যিক চাকচিক্য কিছুকালের জন্য পাঠকমহলে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করে।

সাহিত্যে যখন একটা নূতন স্রোত আসে, তখন অনেক সময় এমনিতর আড়ম্বরের ঘন-ঘটা দেখা দেয়। যা মেকী, তা কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় না। পিলুটির রং যেমন অচিরকালের মধ্যে উঠে যায়, সত্যবস্তু-শূন্য লেখার স্বরূপও তেমনি একদিন প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তখন তার আর সংসারে স্থান থাকে না।

এই সম্পর্কে এই বাক্যটি অত্যন্ত স্থানোপযোগী ব'লে মনে হয়:—'নূতন বস্তু সচরাচর ভাল হয় না; কারণ ভাল জিনিষ অতি অল্পদিনের জন্যই নূতন থাকে!'

"If a thing is new, it is seldom good; because if it is good, it is only for a short time new."

একদল লেখক আছেন যাঁরা অন্যের লেখা অনুবাদ ক'রে থাকেন; শুধু অনুবাদ ক'রেই ক্ষান্ত হন না,—সেগুলি সংশোধিত এবং সংস্কৃতও করেন। তাঁদের এ অনধিকার-চর্চ্চাকে আমি অত্যন্ত উদ্ধত এবং অসঙ্গত ব'লে মনে করি। তাঁদের বলি—নিজেরা এমন লেখা লিখুন যা অনূদিত হবার যোগ্য হ'য়ে উঠবে; অন্যের লেখা যেমন আছে তেমনি থাকতে দিন।

চিঠির যেমন ঠিকানা, পুস্তকের তেমনি শিরোনামা (Title)। চিঠির ঠিকানার মত পুস্তকের শিরোনামার উদ্দেশ্যও হওয়া উচিত, তাকে সেই সব পাঠক-মহলে পৌঁছে দেওয়া—যারা ঐ বইখানির অপেক্ষায় ব'সে আছে। শিরোনামা সেই কারণে সুব্যক্ত হওয়া প্রয়োজন। এবং যেহেতু তার আকার স্বভাবতঃই সংক্ষিপ্ত, তা সারগর্ভ এবং অর্থব্যঞ্জক হওয়া আবশ্যক। অতিবিস্তৃত শিরোনামা মন্দ; এবং তেমনিই মন্দ হ'চ্ছে তারা, যারা কিছুই প্রকাশ করে না, কিম্বা যারা অতি-প্রচ্ছন্ন এবং দ্ব্যর্থ-বাচক। তারা পাঠককে ভুলপথে নিয়ে যায়। ভুল-ঠিকানাযুক্ত পত্রের যে অবস্থা হয়, এই সব দুর্ব্বোধ্য বা ভ্রান্ত শিরোনামা-যুক্ত পুস্তকেরও সেই অবস্থা ঘটে।

সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট শিরোনামা হ'চ্ছে সেই সব, যারা অপহৃত হ'য়েছে;—অর্থাৎ যারা পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তকে পূর্ব্বেই অন্য গ্রন্থকার কর্তৃক ব্যবহৃত হ'য়েছে। প্রথম, তা হ'ল রচনা-চৌর্য্য; দ্বিতীয়, লেখকের মৌলিকতার একান্ত অভাবের সুনিশ্চিত প্রমাণ। একটি তাজা শিরোনামা উদ্ভাবন করবার মত যথেষ্ট মৌলিকতা যাঁর মাথায় নেই তিনি যে তাঁর পুস্তকে নূতন কিছু দিতে সক্ষম হবেন, এ আশা দুরাশা মাত্র!

গ্রন্থ তার কারকের মনের এবং মাথার ছাপ মাত্র। পুস্তকের মূল্য নির্ভর করবে, হয় তার বিষয়-বস্তু (matter), নয় তার প্রকাশ-রীতির (form) ওপর।

কোন পুস্তক যখন খ্যাতিলাভ করে তখন দেখা উচিত তার মূলে লেখকের কোন্ অবদানটি আছে—বিষয়-বস্তু, না প্রকাশ-রীতি?

কেবলমাত্র বিষয়-বস্তুর জন্য প্রসিদ্ধ কোন পুস্তক খুব সাধারণ এবং অল্প-বিদ্যা লোকের দ্বারাও রচিত হ'তে পারে; যেমন সুদূর প্রদেশের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কিম্বা কোন অত্যাশ্চর্য্য নিসর্গ-ঘটনা; কোন অলৌকিক অভিজ্ঞতা কিম্বা কোন ঐতিহাসিক বিপ্লব;—এমনি-তর অদ্ভুত কোন ঘটনা যা প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য ঐ লেখকের জীবনে এসেছে।

অপরদিকে যেখানে বিষয়-বস্তু সকলেরই পরিচিত, সেখানে লেখকের প্রকাশ-রীতির ওপরেই গ্রন্থের ভাল-মন্দ নির্ভর করবে। এবং তিনি কেমন ক'রে কি ভাবে সেই সর্ব্বজন-বিদিত বিষয়টিকে নিজের লেখনীমুখে ফুটিয়ে তুলেছেন,—লেখকের সেই লিপিকৌশলের দ্বারাই গ্রন্থের মূল্য এবং খ্যাতি নিরূপিত হবে।

এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শক্তিশালী লেখকই পঠন-যোগ্য কিছু উপহার দিতে সক্ষম হবেন। মানব-মনের চিরন্তন বৃত্তিগুলিকে নিয়েই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ চিত্র রচনা ক'রে গেছেন—তাঁদের অনন্যসাধারণ লিপি-নৈপুণ্যের সাহায্যে।

গেটের 'ফষ্ট' থেকে আরম্ভ ক'রে কালিদাসের 'শকুন্তলা' পর্য্যন্ত—জগতের সকল সেরা রচনা সম্বন্ধেই এই কথাটি খাটে।

লিখন-ভঙ্গী (Style)

ক

লিখন-ভঙ্গী লেখক মনের যথার্থ পরিচয়; এবং মুখের চেয়ে অধিকতর সুনিশ্চিত পরিচয়-চিহ্ন.—Style is the

physiognomy of the mind and a safer index to character than the face……।

অন্য লেখকের লিখন-ভঙ্গী অনুকরণ করা আর উৎসব-সভায় মুখোস প'রে আনন্দ-বিতরণ করা—দুই-ই সমান! মুখোস যতই ভাল হ'ক কিছুক্ষণের মধ্যে তা দর্শকের মনে বিরক্তি উৎপাদন করবেই করবে;—কারণ, তা প্রাণহীন! সুতরাং সংসারে কুৎসিত জীবন্ত মুখও প্রাণহীন মুখোস অপেক্ষা সহনীয়।

প্রত্যেক সাধারণ (mediocre) লেখক তাঁর স্বাভাবিক লিখন-ভঙ্গীকে মুখোসের দ্বারা আবৃত করেন; কারণ তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন, যে তাঁর নিজের ষ্টাইল হয়ত জগতের চোখে অত্যন্ত অগভীর এবং বাল-সুলভ ব'লে বিবেচিত হবে। সুতরাং তিনি প্রথম থেকেই তাঁর অকৃত্রিম লিখন-ভঙ্গী পরিত্যাগ ক'রে অন্য একটি আড়ম্বর-পূর্ণ এবং অন্তঃসার-শূন্য ষ্টাইলের আশ্রয় গ্রহণ করেন—বাহ্যিক চাকচিক্যের মোহ দিয়ে তিনি পাঠক-চিত্ত আকৃষ্ট করতে অভিলাষী হন.

কিন্তু যাঁরা বড়-দরের লেখক, তাঁরা তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত লিখন-ভঙ্গীতে লিখতে কিছুমাত্র ইতঃস্তত করেন না; নিজেদের শক্তির ওপর বিশ্বাস আছে ব'লেই তাঁরা তাঁদের চিন্তাকে অকুণ্ঠ এবং অবাধ গতি প্রদান করতে ক্ষণেকের জন্যও দ্বিধান্বিত হন না।

সাধারণ লেখক কিন্তু তা করতে অত্যন্ত শঙ্কিত হন; মনে করেন তাহ'লে হয়ত অসার প্রতিপন্ন হ'য়ে তাঁদের লেখার মূল্য একেবারেই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। সেই কারণে তাঁরা তাঁদের রচনাকে এমন ভাবে সজ্জিত করবার চেষ্টা করেন, যাতে ক'রে তা খুব বিজ্ঞ এবং গভীর রূপ ধারণ করবে। এবং পাঠকের মনে এই রেখাপাত করবে যে, সেই জমকালো লিখন-ভঙ্গীর অন্তরালে বস্তুও আছে তেমনি সারবান! এই প্রবল ইচ্ছার বশীকৃত হ'য়ে সেইসব লেখক বিনাবিচারে এমন অনেক কথাই লিখে ফেলেন, শেষ পর্য্যন্ত যার কোন অর্থই হয় না। কিন্তু তাতে তাঁদের কিছুমাত্র যায় আসে না; বড় বড় কথা ব্যবহার করতে পারলেই তাঁদের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হ'য়ে যায়!

মনের এই বাসনাকে সার্থক ক'রে তোলবার আশায় তাঁরা একবার একপ্রকার, পরক্ষণেই অন্যপ্রকারের ষ্টাইলের আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন। নিজেদের শক্তির ওপর বিশ্বাস-হীন হ'য়ে পরের দ্বারস্থ হ'লে এই রকম মনোভাবই হয়। অন্য ধাতুর সংমিশ্রণে সোনা উৎপাদন করবার ব্যর্থ চেষ্টার মত, এইসব লেখকও পাঁচ রকম লিখন-ভঙ্গীর সাহায্যে সত্য-সুন্দরের সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হন।

নিজের যতটুকু পাণ্ডিত্য আছে তার বেশী বিদ্যা জাহির করবার চেষ্টার অপেক্ষা সাধারণ লেখকের অধিকতর মূর্খতা আর কিছুই নেই!—কারণ, পাঠক-সমাজকে প্রতারিত করা অত সহজ নয়; তারা অবিলম্বেই বুঝবে,—যেখানে অতথ নি বাহ্যিক চকমকির দীপ্তি, লেখকের অন্তরের সত্য-বস্তুর অম্লান শিখাটি সেইখানেই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ!

লিখন-ভঙ্গীর স্বভাব-সারল্য এবং অকৃত্রিমতা লেখকের একটি বিশেষ গুণ; তদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লেখক নিজের যথার্থ রূপটিকে জগতের কাছে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত নন।

সাহিত্যে এই সত্যটি বার বার প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছে যে, রচনার স্বভাব-সারল্য পাঠককে মুগ্ধ করে। এবং কৃত্রিমতা সকল ক্ষেত্রেই মনের মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব এনে দেয়।

সরলতা সত্যের চিহ্ন এবং তা প্রতিভার পরিচায়কও বটে।

যে ভাবটিকে ষ্টাইল প্রকাশ করে সেই ভাবের ঐশ্বর্য্যই ষ্টাইলকে সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করে!—কিন্তু যারা কপট চিন্তাশীল, তারা ষ্টাইলের জন্যই ভাবকে সুন্দর ব'লে মনে করে।

ষ্টাইল ভাবের পার্শ্ব-চিত্র মাত্র। মন্দ বা অস্পষ্ট ষ্টাইল মানে লেখকের বুদ্ধি স্থূল, এবং মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত!

গ

দুর্ব্বোধ বা অস্পষ্ট লিখন-ভঙ্গী সর্ব্ব সময়ে এবং সর্ব্বস্থানে লেখকের সুনামের প্রধান পরিপন্থী!

শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে ভাবের অস্পষ্টতা থেকেই তার উৎপত্তি। এবং আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'লে হয়ত দেখতে পাওয়া যায় যে, আদিতে সেই ভাবটি হয়ত একেবারেই ভ্রমপূর্ণ। কাজেই, যে লিখন-ভঙ্গী সেই ভ্রান্ত ভাবটিকে প্রকাশ করতে চায়, তা যে আপনা থেকেই অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং কষ্টক্লিষ্ট হ'য়ে দাঁড়াবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

অনেক সময় দেখা যায়, যে-সব লেখক দুর্ব্বোধ এবং দ্ব্যর্থ-বাচক ষ্টাইলে লেখেন, তাঁরা হয়ত নিজেরাই জানেন না, আসলে তাঁদের প্রতিপাদ্য কি। তাঁদের মনের চিন্তা হয়ত তখনো পর্য্যন্ত সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করেনি; একটা আবছা ছায়ামাত্র মনের মধ্যে উদিত হ'য়েছে মাত্র।

তাঁরা নিজেরা যা জানেন না, জগতকে জানাতে চান যে, তাঁরা সেই বিষয়েই সবিশেষ অভিজ্ঞ।

অভিজ্ঞতার অভাব আছে ব'লেই তাঁরা নিজেদের খুব বেশী অভিজ্ঞ রূপে জাহির করতে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন; এবং সেই উদ্দেশ্যেই অর্থহীন বাগাড়ম্বরের সাহায্য গ্রহণ করেন।

যদি কোন লেখকের সত্যকার বাণী কিছু দেবার থাকে তাহ'লে তিনি সেটি প্রকাশের জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করবেন—অস্পষ্ট, দুর্ব্বোধ, না, সরল, সুব্যক্ত প্রকাশ-রীতি?

খ

হেঁয়ালীর ছন্দে কথা বলা গ্রন্থকারের পক্ষে অবশ্য পরিহারতব্য; ষ্টাইলের এই দ্বিধাগ্রস্ত ভাব অনেক সময় রচনাকে insipid অর্থাৎ নীরস ক'রে ফেলে।

অতি-রঞ্জন সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। আমরা যা বলতে চাই, অতিরঞ্জন-দোষে তার বিপরীত অর্থ প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে।

একথা সত্য যে ভাবকে সুস্পষ্ট করবার জন্যই শব্দের সৃষ্টি;—কিন্তু তারও যথারীতি সীমা আছে। শব্দ-সমষ্টি যদি সেই সীমা লঙ্ঘন করে তাহ'লে তাদের ভারে ভাব সমাধি-লাভ করে।

মনের ভাবটিকে যথাযথ এবং অখণ্ডরূপে কেবলমাত্র অবশ্যপ্রয়োজনীয় কথার দ্বারা প্রকাশ করা—এই হ'চ্ছে ষ্টাইলের একমাত্র কাজ।

সুতরাং সমস্ত ঘোরালো বচন-বিন্যাস এবং প্রয়োজন-অতিরিক্ত শব্দ-লহরী সাবধানে লেখনীর মুখ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। পাঠকের সময়, ধৈর্য্য এবং মনোযোগের মূল্য আছে;—আপনার নামের জোরেই হ'ক বা কলমের জোরেই হ'ক কোন ক্রমেই তাদের ওপর অত্যাচার করা সমীচীন নয়।

বাজে কথা লিপিবদ্ধ করা অপেক্ষা সময় সময় দু'চারটে ভাল কথা বাদ দেওয়াও ভাল।

অল্প ভাব প্রকাশ করবার জন্য খুব বেশী কথা ব্যবহার করা—লেখকের লিপি-বৈগুণ্যের অভ্রান্ত প্রমাণ। অল্প কথায় বেশী ভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতার মধ্যেই তাঁর প্রতিভার ছাপ স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে। লিখন-ভঙ্গীর সংক্ষিপ্ত প্রকাশ-নৈপুণ্য লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ।

যা বলবার যোগ্য শুধু সেই কথাটুকু সাজিয়ে দেওয়া এবং অন্য সমস্ত অতিরিক্ত বস্তুকে সতর্কে পরিহার করা,—এর দ্বারাই প্রকাশ-রীতির যথার্থ সংক্ষিপ্ততা আনা যায়। এবং সেই সংক্ষিপ্ত প্রকাশ-রীতির মধ্যেই লেখকের লিপি-কৌশল চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

ভাবের ঐশ্বর্য্য এবং গুরুত্বই লিখন-ভঙ্গীকে যথার্থ সংক্ষিপ্ত আকার দান ক'রে তাকে জমাট ক'রে তোলে। সুতরাং লেখার শব্দ, রচন-বিন্যাস এবং অবয়ব নির্ব্বিচারে সংক্ষিপ্ত না ক'রে তাঁর মনের ভাবটিকে বিবৃত করাই লেখকের কর্ত্তব্য।

অসুখে ভুগে রোগা হ'য়ে যে লোকের জামাগুলি তাঁর দেহের পক্ষে বড্ড ঢলঢলে হ'য়ে পড়েছে, সেগুলিকে পুনরায় নিজের দেহের মাপ-সই ক'রে নেবার জন্য জামাগুলিকে কেটে ছোট না ক'রে তিনি তাঁর শরীরের পূর্ব্বেকার সুপুষ্ট অবস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্যই যত্নবান হবেন।

যে সমস্ত লেখক অত্যন্ত ব্যস্ত এবং অযত্ন সহকারে লেখেন তাঁদের ওপর শোপেনহাওয়ার-এর মনোভাব অত্যন্ত

কঠোর। তিনি বলেন, যেমন নিজের পরিচ্ছদের প্রতি অবহেলার দ্বারা, আমি যে সমাজে নিমন্ত্রণ গিয়েছি সেই সমাজকে অবজ্ঞা করি, তেমনি যে লেখক হেলায়-অশ্রদ্ধায় লেখেন তিনি তাঁর পাঠক-বর্গের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন।

এ বিষয়ে পুস্তক-সমালোচকদের লিখন-ভঙ্গী বাস্তবিকই হাস্যোদ্দীপক!—পরের লেখা তাঁরা মন্দ এবং বিশৃঙ্খল ব'লে তীব্র সমালোচনা করেন,—নিজেদের মন্দ এবং বিশৃঙ্খল লিখন-ভঙ্গী দিয়ে! এ ঠিক যেন, বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি বিচারে এলেন—তাঁর নৈশ-পরিচ্ছদ (sleeping suit) পরিধান ক'রে!

যে মানুষ নোংরা পোষাকে ভূষিত, তার সঙ্গে সহসা আলাপ করতে যেমন সঙ্কোচ বোধ করি, তেমনি একখানা বই তুলে নিয়ে যদি তার লিখন-ভঙ্গীর যত্নাভাব এবং অসৌন্দর্য্য লক্ষ্য করি, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ তার প্রতি মন বিমুখ হ'য়ে ওঠে। সে বই পড়বার আর আগ্রহ থাকে না মোটেই।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কবিতা

শ্রীযুক্ত মনোমোহন নরসুন্দর

ছন্দবদ্ধা—গানময়ী ওগো উচ্ছ্বসিতা,—
নিখিলের করস্পর্শে তুমি অনিন্দিতা!
আসিয়াছ সুন্দরের বীণাধ্বনি হ'তে
সত্য তুমি, মুক্ত তুমি—চলিয়াছ স্রোতে।
নিঃসীম ধরার মাঝে চলিয়াছ ছুটি,
সর্ব্ব বন্ধ, সর্ব্বশঙ্কা অনায়াসে টুটি।
রুদ্ধ নহে তব বাণী চাটুকারিতায়
সত্যেরে ঘোষিয়া বিশ্বে মিথ্যারে টলায়।

সুন্দরের অন্তর্লীন স্বর্গ-সুষমায়
ধরা দিলে কল্পলতা কবির হৃদয়।
নানা শব্দে, নানাবর্ণে, নানা গন্ধে গানে
ধরেছ অমৃত-পাত্র নিখিলের পানে।
ধরায় বিচিত্র গতি চলিয়াছে ছুটে,
তুমি তারে বাঁধিয়াছ কবি ওষ্ঠপুটে।
মানব-অন্তরতলে যে বিচিত্র সুর
প্রাণের স্পন্দন-মাঝে নিত্য ভরপুর,
তুমি তারে নিয়ে আসি ছড়া, গাথা, গানে
সৃজিয়াছ কবিরাণী আপনার প্রাণে।
উষর ধরায় বুকে ওগো অসংবৃতা!
ছুটেছ নির্ঝর-রূপে ধরার দুহিতা।

দাদু

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

কুসুমডাঙ্গার মুখুয্যেরা বনেদি বংশ। সংসারের লক্ষ্মী ছিলেন বড় গিন্নী। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙ্গন সুরু হইল এবং কয়েক বছরের মধ্যেই অতবড় বাড়ীটা একেবারে নিঝুম হইয়া গেল। বাকী রহিলেন ছোট কর্ত্তা শিবচরণ এবং তাঁহার বছর দশেকের ভ্রাতুষ্পুত্র মোহিতকুমার। শিবচরণ বিবাহ করেন নাই; এই একমাত্র বংশপ্রদীপটিকে রক্ষা করিবার গুরুভার একাই হাতে তুলিয়া লইলেন। জনবল যখন যায়, ধনবল তাহার অনুসরণে বিলম্ব করে না। কিন্তু মোহিতকে তাহা একটি দিনের তরেও জানিতে হইল না। গ্রামের ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেসন পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্য্যন্ত সে নিতান্ত স্বচ্ছন্দ এবং স্বচ্ছল গতিতেই চলিয়া গেল। বেশভূষা এবং আহারবিহারের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের একটি মাত্রাও কম পড়িল না। এই সহজ গতিপথের কঠিন ইতিহাসটি শিবচরণ নিজের কাছেই গোপন রাখিলেন।

কলেজ ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই মোহিতের একটা ভাল রকমের সংস্থান হইয়া গেল। শিবচরণের বাড়ী তখন পাওনাদারের পদধূলিতে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া মুখুয্যে বংশের শূন্য গৃহে বহুদিন পরে লক্ষ্মীপ্রতিষ্ঠার আয়োজনে লাগিয়া গেলেন। মনোমত পাত্রী খুঁজিতে মাস-ছয় কাটিয়া গেল। এমন সময় একদিন একখানা লাল রঙের খাম আসিয়া হাজির। সামান্য একখানা বাংলা চিঠি—বার বার পড়িয়াও যেন তাহা বোধগম্য হইল না। গ্রাম্য পোষ্টাফিস, সুতরাং কথাটা প্রচার হইতে দেরি হইল না। প্রতিবেশীরা অনেকেই সহানুভূতি জানাইতে আসিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় কহিলেন, তাইতো ছোঁড়াটা শেষটায় এই করলে! তর্করত্ন লাঠি ঠুকিয়া কহিলেন, আরে এতো হবেই। আগেই বলেছি হবে। পৈত্রিক জোতজমা খুইয়ে পড়ালে কিনা—ইংরেজি। বিষবৃক্ষ রোপণ করলে তার ফলভোগটাও তো সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে।

শিবচরণ একটু উষ্মার সঙ্গে কহিলেন, কিন্তু তার অন্যায়টা আপনারা কোথায় দেখলেন, তাতো বুঝতে পারছি না পণ্ডিত মশাই। যার যেটা মানায়। চার-চারটে পাশ দিলে; সোনার মেডেল পেলে; চাকরিও পেলে—যে সে নয়,—একেবারে সব চেয়ে বড় কলেজের প্রোফেসর। তার কাছে মেয়ে দিতে পারে এ রকম লোক, কই পেলাম না তো দেশের মধ্যে একটাও। নবীন রায় গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, বুঝলাম। কিন্তু বিদেশে বিয়ে করল ব'লে আমাদের একটা খবরও কি দিতে নেই, ভায়া? চণ্ডী সরকার প্রবল বেগে সমর্থন করিয়া কহিল, ঠিক বলেছ দাদা। মোহিতের বিয়ে কোলকাতায় হবে, এই তো আমাদের ইচ্ছা, কি বলেন গাঙ্গুলী মশায়। ঘটা ক'রে বরযাত্রী যাবো, ভালো-অভালো খাবো, কোলকাতায় শহর চোখে দেখিনি—সেটাও হবে, অমনি মা গঙ্গায় দুটো ডুবও দিয়ে আসবো। তা সবই হ'ল! ওসব কপালে না থাকলে হয় না বুঝলে?

বিবাহ-রাত্রিটায় শিবচরণের কিছুতেই ঘুম আসিল না। বারংবার উঠিয়া বাহিরে পায়চারি করিতে লাগিলেন। মনকে বুঝাইলেন, এ ভালোই হইল। ও যাহাতে সুখে থাকে, তাহাই হউক, তাহাতেই আমার সুখ। কিন্তু সহস্র প্রবোধের মধ্যেও মনের কোণে একটা গোপন ক্ষোভ মাথা তুলিয়া রহিল। আলো জ্বালিয়া সেই চিঠিখানা আবার পড়িলেন। কলিকাতায় তাহাদের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের নামে নিমন্ত্রণ জানান হইয়াছে। হায়রে! এই গৌরবটা কি একান্তপক্ষে তাহারি প্রাপ্য ছিল না? স্বর্গগত অগ্রজকে মনে পড়িয়া আজ বহুদিন পরে শিবচরণের চোখের কোণ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মরিবার সময়ও এতটুকু

বিচলিত হন নাই। কনিষ্ঠকে কাছে ডাকিয়া সেই চিরকালের পরিহাসতরল কণ্ঠেই কহিয়াছিলেন, মনে করেছিলি বিয়ে না ক'রে খুব ফাঁকি দিয়েছিস, না? ঘরে ব'সে রুদ্রাক্ষের মালা টিপেই দিন যাবে। আরে, এ কি মানুষের হাত? অ্যাঁ? এবার রুদ্রাক্ষের মালা?......বলিয়া মোহিতের হাত দুখানি তাঁহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিলেন। সেই স্পর্শটা যেন আজ সহসা অনুভব করিয়া শিবচরণ চমকিয়া উঠিলেন।

এক একটা ছুটি আসে, শিবচরণ অনেক করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে লেখেন, "বৌমাকে লইয়া অবশ্য অবশ্য বাড়ী আসিও।" উত্তর আসে, "এবারে আর হইল না, আগামী বারে দেখা যাইবে।" অসুখ-বিসুখ, কাজের ভিড়, দেশ-ভ্রমণ ইত্যাদি নানারকম কারণ থাকে। এমনি ভাবে প্রায় বছরখানেক গেল। সেবার পূজার কিছু পূর্ব্বেই শিবচরণ জ্বরে পড়িলেন। মোহিতকে লিখিলেন—"আমার শরীর ভালো নয়, হয়তো যাবার দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমার মা-লক্ষ্মীকে কখনো চোখে দেখি নাই, একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই তাঁহার সংসার তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া যাইতে চাই। যেমন করিয়া হউক, দুইদিনের জন্য হইলেও একবার আসিও। মোহিত আসিল কিন্তু একা। শিবচরণের আগ্রহোন্মুখ বুকখানা দ্বিগুণ দমিয়া গেল। কিন্তু পরদিন যখন শুনিলেন, বধূ অন্তঃসত্ত্বা তাই বাপের বাড়ী গিয়াছেন, সহসা যেন হাতে স্বর্গ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। এবং অবগায়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ওপাড়ার রায় মহাশয়কে খবর দিতে ছুটিলেন।

ছয়মাস পড়িতেই শিবচরণের মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহার মোহিতের ঘরে প্রথম সন্তান হইবে, ঘটা করিয়া 'সাধ' না দিলে মুখুয্যে বংশের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না, তাঁহারও মন ভরিতে চায় না। কিন্তু সেটা যখন সম্ভব নয় তখন কেবল-মাত্র রীতিরক্ষার জন্যই গোটা এশেক টাকা কুটুম্ববাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। যথাসময়ে টাকাটা ফিরিয়া আসিল। শিবচরণ প্রথমটা খুব আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মুখুয্যে বাড়ীর প্রাচীন বংশগৌরব বুকের রক্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল। উত্তরটা কি রকম কড়া হওয়া দরকার মনে মনে তাহারি তর্জমা করিতেছিলেন, এমন সময় মোহিতের চিঠি আসিল। অত্যন্ত রুক্ষভাবে লিখিয়াছে, এই কয়টা সামান্য টাকা পাঠাইবার কি প্রয়োজন ছিল? তাহার শ্বশুরশাশুড়ী ইহাতে অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়াছেন, তাহাকেও নিতান্ত অপদস্থ করা হইয়াছে। কড়া জবাবের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনের কোণেই রহিল। চিঠিখানা হাতে করিয়া গভীর অন্তঃস্তল হইতে কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

যথাসময়ে কুটুম্ববাড়ী থেকে খবর আসিল, মোহিতের একটি কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে। শিবচরণ তাহার জবাব দিলেন না। নিজের সহস্র অপমান তিনি সহিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু যে ঔদ্ধত্য তাঁহার বংশমর্য্যাদাকে অপমান করিয়াছে, তাঁহার দারিদ্র্যকে উপহাস করিয়াছে, তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিলেন না। ইদানীং তাঁহার পূজা-অর্চ্চনার পালাটা অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহারি মধ্যে মনোনিবেশের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় বোধ হয় অন্যরূপ। পূজার আসনে বসিয়া চক্ষু বুজিলেই তাঁহার দেবতাকে আড়াল করিয়া ভাসিয়া উঠিত কোথাকার একখানি ফুটফুটে সুন্দর হাসিভরা কচিমুখ—চোখ দুইটি টানাটানা, নাকটি বাঁশীর মতন, ভ্রূ-দুখানি ধনুকের মত বাঁকা। শিশুর কান্না শুনিলেই তাঁহার অন্যমনস্ক মন সহসা চমকিয়া উঠিত। মনে হইত, এ কণ্ঠ যেন তাঁহার কত পরিচিত। কার্য্যসূত্রে কোথাও যাইতে হইলে, যত শীঘ্র হয় চলিয়া আসিতেন।

মনে হইত তাহারা আসিয়াছে, হয়তো বাহিরে বসিয়া আছে। কত বড় হইয়াছে, দেখিতে কেমন হইয়াছে, তাহাকে হয়তো চিনিবে না, ইত্যাদি অনেক কিছু ভাবিতে ভাবিতে দ্রুতগতি ক্রমশঃ বাড়াইয়া দিতেন। বাড়ী ফিরিয়া ব্যস্তভাবে চারিদিক চাহিতেন। সেই শূন্য ঘর তেমনি খাঁ খাঁ করিতেছে। শিবচরণের বুকের ভিতর থেকে একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিত। ঘরের দাওয়ায় তামাক লইয়া বসিতেন। মনে হইত, উঠিবার মত শক্তিও তাঁহার চলিয়া গিয়াছে।

২

অপেক্ষাকৃত বড় লোকের ঘরেই মোহিতের বিবাহ হইয়াছিল। তাহাদের তুলনায় নিজের সাধারণ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তাহার সঙ্কোচের অবধি ছিল না। স্ত্রীকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা যে তাহার মনে জাগে নাই তাহা নহে; কিন্তু সে প্রস্তাব করিবার মত সাহস হয় নাই। পুরুষানুক্রমে গ্রাম্য সভ্যতার মধ্যেই তাহারা মানুষ। আত্মীয়-স্বজন সব গ্রামে। তাহাদের কোন উল্লেখও সে শ্বশুরবাড়ীতে করে নাই। তাহাদের সঙ্গে কোন রকম ঘনিষ্ঠতাও পাছে শ্বশুরপরিবারের আভিজাত্য ইতর বলিয়া মনে করে, এই আশঙ্কায় সে সমস্ত অতীত জীবনটাকে একরকম মুছিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল।

মেয়েটির বয়স যখন বছরখানেক, মোহিত খুব খানিকটা সাহস সংগ্রহ করিয়া একদিন শাশুড়ীকে বলিল, কাকা বারবার ক'রে লিখছেন—এদের কাউকে তো দেখেননি, একবার দেখতে চান। আসছে গরমের ছুটিতে, ভাবছি একবার দেশে ঘুরে আসবো।

শাশুড়ী জামাতার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। মোহিত এই নীরবতার অর্থ বুঝিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিতান্ত কুণ্ঠার সঙ্গে কহিল, বেশীদিন অবিশ্যি থাকা পোষাবে না, বড় জোর দিনসাতেক। কাকা বারবার ক'রে বলছেন।

শাশুড়ী একটু ব্যঙ্গের সুরে কহিলেন, তা,' নাতনীকে দেখতে তিনিও তো একবার আসতে পারেন। মায়া এই খাটের কোলে একবছরের ওপর হ'তে চলল। একটা খোঁজও তো কই নিলেন না!

মোহিত কহিল, তাঁর পক্ষে খোঁজ নেওয়া সোজা নয়। আমাদেরই বরং একবার যাওয়া উচিত ছিল।

শাশুড়ী আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহার জামাতার কণ্ঠে এই তর্কের সুরটি একবারেই নূতন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা নিশ্বাসের সঙ্গে কহিলেন, বেশ নিয়ে যাও।

ইহার পরে কি বলা যাইতে পারে মোহিত ভাবিয়া পাইল না;· এইটুকু বুঝিল যে ইহার চাইতে স্পষ্ট নিষেধও ছিল ভাল। কিছুক্ষণ পরে শাশুড়ী কহিলেন, আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ। উচিত-অনুচিত ওসব কিছু বুঝিনা বাবা। আমি জানি, আমি তোমাকে দেখেই মেয়ে দিয়েছি। তোমার ঘরবাড়ী, আত্মীয়স্বজন কিছুই দেখতে চাইনি। তোমাকেই চিনি, তোমারি ওপরে নির্ভর। সেসব জেনেও যদি আমার মেয়েটাকে যেখানে-সেখানে টেনে নিতে চাও, বেশ যাও। অদৃষ্টের লেখন্ তো আর এড়ানো যায় না।—শেষের দিকে গলাটা ভারী হইয়া উঠিল। আঁচল দিয়া চোখের কোণ মুছিতে লাগিলেন।

মোহিত জানিত পাড়াগাঁ সম্বন্ধে তাহার শ্বশ্রূমাতার আপত্তি বহু এবং প্রবল। প্রধানতঃ তিনটি বিষয় তিনি প্রায়ই উল্লেখ করিতেন—সেখানে পাকা বাড়ী নাই, বাথ্‌রুম নাই, ভাল ডাক্তার নাই। এরূপ অকাট্য যুক্তির পরে তর্ক করা বৃথা জানিয়া মোহিত হাল ছাড়িল, কহিল, আচ্ছা থাক্ তাহ'লে গিয়ে কাজ নেই। শাশুড়ী কাঁদো কাঁদো স্বরে কহিলেন, না, বাবা তুমি রাগ করতে পারবে না, আমি সব সইতে পারি কিন্তু তুমি মন খারাপ ক'রে থাকবে, সেটা সইতে পারবোনা।

মোহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না মা, আমি রাগ করছি না। কাকাকেই বরং আসতে লিখে দিই।

পরদিনই চিঠি লেখা হইল। শিবচরণ নানা কাজের ওজর দিয়া অস্বীকার করিলেন। মোহিত তাঁহাকে না জানাইয়া বিবাহ করিয়াছে। তাহাও তিনি তুচ্ছ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজিকার এই অনুরোধ তাঁহার সহ্য হইল না। তাঁহার বংশের যে ক্ষুদ্র অতিথিটিকে তিনি এখনো চোখে পর্য্যন্ত দেখেন নাই, তাহারি উপরে আজ তাঁহার সমস্ত অভিমান ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, দিদি আসিল না? থাক্ বাঁচিয়া থাক্। বড় হইয়া যদি কোনদিন দাদুর কথা মনে করিয়া দেখিতে আসে, দেখিব। নতুবা থাক্।

ইহার পরে দুইদিক থেকেই চিঠিপত্র একরকম বন্ধ হইয়া গেল। বছরখানেক পরে, দেনাটার একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহায্য প্রার্থনা

করিয়াছিলেন। উত্তরে মোহিত আর কোন পথ না দেখিয়া লিখিল যে প্রয়োজন হইলে তাহার অংশে যে জমি আছে সেটা বিক্রী করা যাইতে পারে। চিঠি পড়িয়া শিবচরণ হাসিলেন, কিন্তু জমি বিক্রী করিলেন না। তাঁহার মহাজন মিত্তিরদের সেরেস্তায় সামান্ত গোমস্তাগিরির চাকরি জুটাইয়া লইলেন। বছর কয়েকের মধ্যেই দেনা এবং স্বাস্থ্য একসঙ্গেই শেষ হইল। অতঃপর আর বেশী দিন নাই দেখিয়া একদিন সমস্ত অভিমান ত্যাগ করিয়া কলিকাতার গাড়ীতে চাপিয়া বসিলেন।

৩

শিবচরণ কলিকাতায় কোন খবর না দিয়াই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। অজানা শহর, অচেনা পথ। সকালে গাড়ী থেকে নামিয়া অনেক ঘোরাঘুরি এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর মোহিতদের রাস্তায় যখন পৌঁছিলেন, তখন বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। একটা বাড়ীর রোয়াকে কতগুলি ছেলেমেয়ে জটলা করিয়া খেলা করিতেছিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, মোহিতের বাসাটি কোথায় বলতে পারেন, মোহিত মুখুয্যে প্রোফেসর?

ভিড়ের মধ্য থেকে একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে লাফ দিয়া উঠিয়া কহিল, আমার বাবা? আমার বাবাকে খুঁজছ?

শিবচরণের মুগ্ধ চক্ষু সেই দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল। তাহার সমস্ত রক্তস্রোত যেন কলকণ্ঠে হাঁকারি সঙ্গে একতানে সাড়া দিয়া উঠিল। পথশ্রমের ক্লান্তি, অনাহার, অস্বাস্থ্য সব ভুলিয়া বৃদ্ধ সজলচোখে কাছে সরিয়া আসিয়া মেয়েটির চিবুকে হাত দিয়া কহিলেন, হাঁ দিদি, তোমার বাবা। আমারও বাবা

অর্দ্ধমলিন পোষাক-পরিহিত এই অপরিচিত বৃদ্ধের আদর এবং বিশেষ করিয়া তাহার বাবার উপর এই ভাগ বসাইবার চেষ্টা মায়ার ভাল লাগিল না। সে খানিকটা পিছাইয়া গিয়া কহিল, তুমি কে?

আমি? আমি দাদু।

মায়া ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, ঈস্! দাদুর বুঝি দাড়ি থাকে? তোমার চশমা কই?

শিবচরণ কহিলেন, আমি তোমার বুড়ো দাদু কিনা; বুড়ো দাদুর তো চশমা থাকে না। •

—বুড়ো দাদুর চশমা থাকে না?

—না দিদি, চশমা থাকে না।

ঈস! তাই বুঝি? আচ্ছা চলতো মার কাছে, জিজ্ঞেস ক'রে আসি।

শিবচরণ অত্যন্ত উৎসাহ দেখাইয়া কহিলেন, আচ্ছা চল,—বলিয়া মায়ার হাত ধরিলেন। মায়া আপত্তি করিল না। পথে যাইতে যাইতে কহিল, আমার দাদুর ভালো চশমা আছে, সোনার চশমা, বুঝলে? দাদু তাই প'রে আসত। এখন আর আসে না। স্বর্গে গেছে কি না! হাঁ৷ বুড়ো দাদু, তুমি স্বর্গে যাবে না?

শিবচরণ ভাবিলেন, যাহাকে পাইয়াছি তাহার কাছে স্বর্গ তো তুচ্ছ। কহিলেন, না দিদি, আমি স্বর্গে যাবো না। তোমার কাছে থাকবো।

—আমায় বেলুন কিনে দেবে?

—দেবো।

—খুব বড়, বুঝলে? এই এত বড়।

—হাঁা, এই এত বড়।

বাড়ী পৌঁছিয়াই মায়া ছুটিয়া উপরে গেল। চেঁচামেচি করিয়া কহিল, মা, মা, আমার বুড়ো দাদু এসেছে। দেখবে, এসো। এসো না? তাহার মা তখন নভেল-লোকের ঘূর্ণিপাকে তন্ময়। প্লটটা সবে মাত্র জমিয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ ব্যর্থপ্রেমিকা নায়িকা পারুলবালা দীর্ঘ তিনপাতা অশ্রু-বর্ষণ করিয়া সবে বিষের পাত্রটি তুলিয়া মুখে ঢালিতে যাইবে, এমন সময় পিছন হইতে কে আসিয়া খপ্ করিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিল। একটি নূতন পরিচ্ছেদে এই আগন্তুকের পরিচয় দেবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, হে পাঠক-পাঠিকা, বসন্ত-মলয়ান্দোলিত, সুধাকর-কিরণ-মণ্ডিত নির্জ্জন নিশীথে এই নানা-ভূষণ-সজ্জিত নিভৃত কক্ষে এই অপূর্ব্ব-দর্শন বিশাল-হৃদয় আগন্তুককে আপনারা চিনিতে পারিয়াছেন কি? ইনিই আপনাদের পূর্ব্ব-পরিচিত রমেন্দ্রনাথ।

এহেন অবস্থায় তুচ্ছ মায়ার হাঁকডাক কোন পার্টিকারই কানে যাইবার কথা নয়, সুতরাং নির্মলারও গেল না। মায়া পাশের ঘরে গিয়া দিদিমাকে ঘুম থেকে টানিয়া তুলিল। তিনি উঠিয়া আসিয়া রেলিং ধরিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানার ভিতর দিকের বারান্দায় একটা বুড়া বসিয়া কাসিতেছে। তাহার ঐ সেকেলে ময়লা সাটের উপর অপেক্ষাকৃত ফরসা চাদর, পরনের মোটা কাপড়, দেশী মুচির হাতে তৈরী চটি এবং সর্ব্বোপরি ঐ বাঁশের ডাঁটের শাদা কাপড়ের ছাতাটা—এ সমস্ত দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, ইনিই মোহিতের কাকা। দিদিমার চক্ষু দুইটি ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মায়াকে কহিলেন, তোকে ওখানে যেতে হবে না। ছাদে ব'সে খেলা করগে যা।

মায়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বিমর্ষমুখে চলিয়া গেল। দিদিমা চাকরকে ডাকিয়া বাবুকে তামাক দিতে বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। কিছুক্ষণ পরেই মোহিত ফিরিল। প্রথমটা কাকাকে চিনিতেই কষ্ট হইতেছিল। কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আপনার কি অসুখ হ'য়েছিল, কাকা? শিবচরণ বহুকাল পরে, পুত্রের চেয়ে আপনার তাহার এই একমাত্র বংশধরটির দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন। কি একটা বলিতে গিয়া কথা বাধিয়া গেল। চোখের কোণে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল আসিয়া পড়িল।

বুড়া দাদুর সঙ্গে মায়ার একদিনেই ভাব জমিয়া উঠিল। পরদিন সকাল হইতেই নীচে দাদুর ঘরে আসিয়া কহিল, দাদু তুমি আমার জন্যে কিছু আননি?

—এনেছি বৈ কি দিদি, এনেছি। তোমার জন্যে ভালো কাপড় এনেছি। তোমার করিম কাকা দিয়েছে।

—করিম কাকা কে দাদু?

শিবচরণ তাহার ক্যান্‌বিসের ব্যাগ খুলিয়া একখানা ডুরে সাড়ী বাহির করিয়া মায়াকে পরাইতে পরাইতে করিম কাকার গল্প বলিতে লাগিলেন। কুসুমতলীর জোলারা তাঁহাদের প্রজা। করিমের সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্যই ছিল। শিবচরণ কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে তাহাকে একখানা ভাল কাপড় ফরমাস দিয়াছিলেন। করিম কিছুতেই দাম নিলনা, দাঁতে জিব কাটিয়া কহিল, বলেন কি কত্তা! দাদাবাবুর মেয়ের কাছে আমি কাপড় বেচতে পারবো না। মায়া কাপড় পরিতে পরিতে তাহাদের গ্রামের কথা শুনিতে লাগিল। সেই বুড়া বটতলার ধার দিয়া যে মাটির রাস্তাটা বরাবর পূবদিকে গিয়াছে, তাহারি শেষপ্রান্তে গাঙের ঘাট, সেখানে রোজ সকালে বৌঝিরা সব বাসন-কোসন মাজে, বিকেলে কলসীকাঁখে জল আনিতে যায়। তার পাশেই—মায়া মাঝখানে হঠাৎ বাধা দিয়া বিপুল উৎসাহে বলিয়া উঠিল, আমি জল আনবো দাদু। দাদু কহিলেন, এনো। তোমার জন্যে ছোট্ট কলসী কিনে রেখে এসেছি। বাড়ী গিয়ে তাতে ক'রে জল এনো।—সেই ঘাটের পাশেই ভাঙা শিবমন্দির; সেখানে সন্ধ্যাবেলা আরতির কাঁসরঘন্টা বাজে। তাহার পাশেই মাধব পণ্ডিতের পাঠশালা, সেখানে ছেলেমেয়েরা পড়িতে যায়। মায়া দাদুর গলা জড়াইয়া বলিয়া ওঠে, আমিও ইস্কুলে যাবো, দাদু। দাদু তাহার ছোট্ট মুখখানি দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া বলেন, পড়বে বৈ কি দিদি! তোমার জন্যে শেলেট-পেন্সিল সব কিনে রেখেছি।

কাপড় পরিয়া মায়া নাচিতে নাচিতে উপরে চলিয়া গেল। সিঁড়ির মুখেই দিদিমার সঙ্গে দেখা। তিনি গালে হাত দিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, ও মা। এ কিরকম কাপড়ের ছিরি! এ কাপড় তোকে কে দিলে?

মায়া ভয়ে ভয়ে কহিল, দাদু দিয়েছে।

—ছি ছি ছি! এ কি চাষাড়ে কাণ্ড! ভদ্দর লোকে এরকম কাপড় পরে, এ তো কখনো শুনিনি। খুলে ফেল্‌, খুলে ফেল্‌। লোকে দেখলে গায়ে থুতু দেবে।…বলিয়া নিজেই টানিয়া খুলিয়া দিলেন। মায়া কাঁদিয়া ফেলিল। নির্মলাও ঘরে ঢুকিতেছিল, কহিল, থাক্‌ না। ছেলেমানুষ, পরেছে। কিছুক্ষণ পরে আপনিই তো খুলে ফেলত। তবে থাক্‌, আমার ঘাট হ'য়েছে, মাপ কর—বলিয়া কাপড়খানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিদিমা দুম্‌ দুম্‌ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

মায়া কিছুক্ষণ পরে যখন দেখিল, কেউ কোথাও নাই, চুপি চুপি কাপড়খানা গুটাইয়া দাদুর ঘরে গিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল, দিদিমা পরতে দিলে না, দাদু।

দাদু সবই শুনিয়াছিলেন, কাপড়খানা নিয়া কহিলেন, থাকগে এ তুমি প'রোনা। এটা কাউকে দিয়ে দেবো; আর তোমার জন্যে—

মায়া ভয়ানক জোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, কখখনো না। আমার কাপড় কাউকে দেবো না।...বলিয়া নিজেই সেটা দাদুর ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া কহিল, লুকিয়ে রেখে দিলাম। কাউকে দিও না কিন্তু দাদু। তারপর কাছে আসিয়া শিবচরণের গলা ধরিয়া তাহার মাথার উপর গণ্ড রাখিয়া চুপি চুপি কহিল, বড় হ'য়ে যখন শ্বশুরবাড়ী যাবো, তখন প'রে যাবো, কেমন দাদু?

দাদু তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া নিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চোখের জল রাখিতে পারিলেন না।

শিবচরণ রোজ বিকালে বেড়াইতে যাইতেন। মায়া এই সময়টির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকিত এবং বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাড়া দিয়া দাদুকে অস্থির করিয়া তুলিত। দিদিমা মাঝে মাঝে বাধা জন্মাইতেন। এইজন্য ইদানীং সে নানারকম কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল। একনম্বর—দুপুর বেলাতেই, হেনাদের বাড়ী খেলা করতে যাচ্ছি, বলিয়া বাহির হইয়া যাওয়া এবং পথে দাদুর সঙ্গলাভ। দুইনম্বর—বাবার কাছে আব্দার, আমি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাবো। মোহিত আড্ডাপ্রিয় লোক মেয়েকে সঙ্গে লওয়া সম্ভব হইত না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত দাদুর উপরেই সে ভার পড়িত। সেদিন এই দুইনম্বর কৌশল আশ্রয় করিয়া মায়া দাদুর সঙ্গে বাহির হইতেছিল। মোহিত কহিল, একটা গাড়ী বরং ডেকে দিক্। কাল রাত্রে ওরএকটু একটু জ্বর হ'য়েছিল।

শিবচরণ কহিলেন, বেশীদূর যাবো না। এই মোড় থেকেই ঘুরে আসবো।

পথে বাহির হইতেই এই দুইটি সীমান্ত-বয়সী বন্ধুর মধ্যে গল্পের বান্ ডাকিয়া যায়। ওদিন কথা হইতেছিল, মায়া যখন শ্বশুরবাড়ী যাইবে, তখন বুড়া দাদুর দশাটা কি হইবে।

মায়া কহিল, কেন তোমাকে নিয়ে যাবো।

দাদু গম্ভীর ভাবে কহিলেন, কিন্তু তোমার নতুন বর যদি আমাকে মারতে আসে?

—ইস্! আমি বুঝি আর মারতে পারবো না?

তারপরে প্রশ্ন উঠিল, বরের দাড়ি থাকিবে কিনা। আলোচনা শেষ না হইতেই হঠাৎ গলির মোড়ে কাঠের থালার উপর বড় বড় লালরঙের জিলাপি সাজাইয়া হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালা হাঁক দিয়া উঠিল, জিলাপি চাই! মায়া লাফাইয়া উঠিল, আমি জিলিপি খাবো দাদু। জিলিপি-ওয়ালা, ও জিলিপিওয়ালা—

অখাদ্য বলিয়াই হউক, অথবা যে জন্যই হোক, এ জিনিষটির প্রতি মায়ার অনেকদিনের লোভ। কিন্তু মা, বাবা, দিদিমা অথবা রামদীন্ ঠাকুর কাহারও সাহায্যেই সে লোভ-তৃপ্তির সুযোগ ঘটে নাই। দাদু নিশ্চয়ই অতটা অবুঝ হইবেন না। অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই মায়া বড় বড় চারখানা বাসি জিলাপি হাতে তুলিয়া লইল এবং সঙ্গে সঙ্গে খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। স্নেহ-মুগ্ধ বৃদ্ধ একটুখানি মৃদু আপত্তি করিলেন, কিন্তু কাজ হইল না।

বাড়ী ফিরিবার পরেই মায়া কহিল, বড্ড গা বমি বমি করছে দাদু। দাদু কহিলেন, তাহ'লে উপরে গিয়ে শুয়ে থাকগে! বলিয়া বাহিরে ঘরে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ উপরে একটা চীৎকার শুনিয়া বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, মায়া গলগল করিয়া বমি করিতেছে, তাহার মা তাহাকে ধরিয়া বসিয়া আছে। আর কাছে দাঁড়াইয়া দিদিমা তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, বল্ হতভাগী, জিলিপি কোথায় পেলি? কে কিনে দিয়েছে বল্।

মায়া নিঃশব্দে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। দিদিমার ক্রুদ্ধ প্রশ্নের কোন উত্তর করিল না। তিনি কাছে আসিয়া আরো উচ্চকণ্ঠে ঐ একই প্রশ্ন ক্রমাগত হাঁকিয়া চলিলেন। শিবচরণ হুঁকাটি রাখিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেলেন এবং অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে কহিলেন, ওর কোন দোষ নেই বেয়ান। জিলিপি আমিই কিনে দিয়েছিলাম।

বেয়ান একটু তিক্তকণ্ঠে কহিলেন, কেন আপনিই বা এই পচা অখাদ্যগুলো ওকে দিতে গেলেন কেন? ওতো পাড়াগাঁয়ে জন্মায়নি, যে যা' তা' দিলে হজম করবে?

আমি ঠিক বুঝতে পারিনি...বলিয়া শিবচরণ মায়ার কাছে গিয়া সস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া ডাকিলেন, দিদি, খুব কষ্ট হ'চ্ছে?

মায়া মাথা নাড়িল। মা এবং দিদিমার মুখে দাদুর প্রতি তাহার কোনরূপ আস্থার প্রকাশ পাইত না। ছোট হইলেও এই কথা সে কেমন করিয়া বুঝিয়াছিল যে সেটা কোনদিক থেকেই সুখকর নয়। নির্ম্মলা কহিল, সামনের বাড়ীতে ললিত ডাক্তারকে একটা খবর দেওয়া দরকার। রামদীনকে একবার—

—না, না, আমিই যাচ্ছি, বলিয়া বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া পড়িলেন।

মোহিত ফিরিতেই শাশুড়ী ভয়ানক কান্নাকাটি আরম্ভ করিলেন। অবশেষে কহিলেন, আমাদের বাবা তুমি মুর্শিদাবাদ পাঠিয়ে দাও। নিলী তার সংসার নিয়ে থাক। কিন্তু আমার আর কি আছে? ঐ একফোঁটা সম্বল বৈ ত নয়। ওকে চোখের ওপর মেরে ফেলতে আমি কিছুতেই দেবো না।

মোহিত গম্ভীর হইয়া রহিল; হাঁ,-না কিছুই বলিল না।

সেই রাত্রেই মায়ার জ্বর বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পেটে গোলমাল। শিবচরণ অপরাধীর মত নিঃশব্দে তাহার শিয়রে বসিয়া রহিলেন। আহারনিদ্রা কোথায় গেল। ক্রমাগত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'ভগবান, আমি সজ্ঞানে কোন পাপ করিনি, আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিও না।' সাত-আট দিন ক্রমাগত চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ফলে মায়া ভাল হইয়া উঠিল। শিবচরণ নিশ্বাস ফেলিয়া শান্তমনে নীচে নামিলেন।

তার পর থেকেই তাঁহাদের শিশুবৃদ্ধের সভাটা ছন্নছাড়া হইয়া গেল। মায়াকে প্রায়ই নীচে আসিতে দেওয়া হইত না। আসিলেও সে দাদুর ঘরে বড় একটা যাইত না। চোখোচোখি হইলে চোখ ফিরাইয়া নিত, ডাকিলে কাছে আসিত না। তাহার সেই হাসা-চঞ্চল মুখখানা কেমন গম্ভীর হইয়া গেল। কখনো কখনো দুপুর বেলা সবাই ঘুমাইয়া গেলে সে দাদুর কাছে লুকাইয়া আসিত; কিন্তু আগের মত সে কথার ভিড় জমিত না। শিবচরণ ও তাঁহার এই ক্ষুদ্র দিদিটির কাছে তেমন সহজ হইতে পারিতেন না; কেমন বাধবাধ ঠেকিত। এমন একদিন দাদুর কাছ থেকে চুপিচুপি বাহির হইয়া মায়া উপরে উঠিতেছিল। সিঁড়ির শেষেই দিদিমার সঙ্গে দেখা। তিনি খপ্ করিয়া হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কোথায় গিয়েছিলি?

মায়ার বুকের ভিতরটা চমকাইয়া উঠিল। একটু থামিয়া ঢোক গিলিয়া কহিল, কেনাদের বাড়ী গিয়েছিলাম।

—কেনাদের বাড়ী! ওরে বজ্জাত মেয়ে, আবার মিথ্যে কথা শিখেছিস্! হবে না? সংসর্গের গুণ যায় কোথায়? কেনাদের বাড়ী গিয়েছিলাম!—

বলিয়া ঠাস করিয়া তাহার গালে এক চড় বসাইয়া দিলেন। মায়ার ঠোঁটদুটি ফুলিয়া উঠিল, তবু কাঁদিল না। প্রাণপণ বেগে উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া সে ছুটিয়া ছাদে চলিয়া গেল। নিজের ঘরে বসিয়া চোখের উপরে শিবচরণ এই দৃশ্য দেখিলেন। বৃদ্ধরক্ত ক্ষণকালের জন্য উষ্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল, চুপ করিয়া থাকার একটা সীমা আছে, এবং সেটা বহুদিন পার হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র ঝঞ্ঝাটের ভয়ে শিশুর উপর এই অন্যায় অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করা পুরুষের ধর্ম্ম নয়। মুখুয্যে বংশের ভ্রষ্টগৌরব আর একবার তাঁহার মনে দোলা দিয়া উঠিল। হুঁকা হাতে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নির্ম্মলা নীচে নামিয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল। শিবচরণ কহিলেন, বৌমা, একটা কথা শোন।

নির্ম্মলা দাঁড়াইল।

—মোহিতকে আমি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি। তার মেয়ে, আমার বংশের রক্ত। তার ওপরে কি আমার কোন জোর নেই? সে যদি আমার কাছে আসে, সেটা কি এমনি একটা মারাত্মক অপরাধ যে তার জন্যে তাকে ধ'রে মারতে হবে? শাসন করুন, ভালো কথা। কিন্তু এ কী রকম শাসন বল দিকিন্।

নির্ম্মলা উত্তর দিল না, মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু উত্তর দিলেন তাহার মা। উপর থেকে তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, তোর শ্বশুরকে বল নিলী, আমার

শাসন যখন তাঁর এতই অসহ্য, ভাইপোকে ব'লে এ আপদ তাড়াবার ব্যবস্থা করেন না কেন? আমি তো এখানে যেচে আসিনি যে কাউকে ভয় করতে যাবো!

ঝগড়া জিনিষটা শিবচরণ করিতেও পারিতেন না, দেখিতেও পারিতেন না। বিপদ দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া আবার হুঁকার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

রাত্রেই কথা উঠিল। শাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, বাবা, তোমার হাতে ধ'রে বলছি, আমার মাথা খাও, আমাকে মুর্শিদবাদ পাঠিয়ে দাও। আমার জন্যে তোমাদের সংসারে কোন অশান্তি ঘটে, এটা আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না।

মোহিত কহিল, কেন কি হ'য়েছে?

—আমি মায়াকে কোনরকম শাসন করি, এটা তোমার কাকা পছন্দ করেন না।

—কেন?

কি জানি বাবা? আমরই দোষ। হাঁপানি রোগীর কাছে, অতটুকু মেয়ে বেশী যেতে দিইনা; তাই তিনি হোক-না-হোক দশকথা আমায় শুনিয়ে দিলেন। আমার কপাল খারাপ, তাই তোমার সংসারে প'ড়ে আছি। তিনি বেঁচে থাকলে—বলিয়া পরলোকগত স্বামীর উল্লেখ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মোহিত কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া তাড়াতাড়ি নীচে আসিল, এবং ব্যস্তভাবে শিবচরণের ঘরে ঢুকিয়া হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, মায়াকে শাসন করা সম্বন্ধে আপনি শাশুড়ীকে কিছু বলেছেন?

শিবচরণ চমকাইয়া উঠিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। সেই অর্থহীন বিহ্বল দৃষ্টির দিকে চাহিয়া মোহিতের উত্তেজনা কমিল, কিন্তু বিরক্তি পড়িল না। কটুকণ্ঠে কহিল মায়ার সঙ্গে ওদেরও তো একটা সম্পর্ক আছে। ছোটো-খাটো ব্যাপার নিয়ে এই সব পাড়া-গেঁয়ে হিংসাদ্বেষ আপনাদের সমস্ত জীবনেও গেল না দেখছি।

শিবচরণ ইহারও কোন উত্তর দিলেন না। মোহিত চলিয়া গেল।

দিনদুয়েক পরে দুপুরে মায়া চুপিচুপি নীচের ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, দাদু। শিবচরণ জানালার কাছে বসিয়াছিলেন, সাড়া দিলেন না, মায়াকে কাছে ডাকিয়াও নিলেন না। দাদুর কাছ থেকে এরকম আচরণ মায়ার পক্ষে এই নূতন। অপমানে অভিমানে তাহার কণ্ঠ ঠেলিয়া আসিল। দুয়ারে দাঁড়াইয়া ঠোঁট ফুলাইয়া মুখ দোলাইয়া কহিল, আচ্ছা, না বললে কথা? তা—রী—তো। আমরা তো কাল মামাবাড়ী যাচ্ছি। বেশ মজা হবে! শিবচরণের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া কহিলেন, মামাবাড়ী যাচ্ছ?

হাঁ, যাচ্ছিই তো; আমি আর দিদি মা।

সত্যি?

হুঁ, সত্যি। দিদিমা তাই বললে। কি বললে জানো দাদু?—এবার কাছে আসিয়া চাপা গলায় হাতমুখ ঘুরাইয়া একটি পাকা গিন্নীর মত গম্ভীর ভাবে কহিল, দিদিমা বললে কি? 'মায়া তোর দাদু কেবল সারাদিন কাসে দেখছিস না? এখানে থাকলে তোরও অমনি কাসি হবে।' তাইতো আমরা মামাবাড়ী যাচ্ছি। আচ্ছা দাদু, তোমার কাসি হ'ল কেন?

দাদুর কানে এ প্রশ্ন গেল না। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া যেন আপন-মনে কহিলেন, না দিদি তোমাকে যেতে হবে না; আমিই যাবো।

মায়া অত্যন্ত খুসী হইয়া দাদুর গলা জড়াইয়া লাফাইতে লাফাইতে কহিল, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

পরক্ষণেই দাদুর মুখখানা সজোরে নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, আমাকে নিয়ে যাবে দাদু?

শিবচরণ আর পারিলেন না, দুইহাতে তাঁহার এই একান্ত অবুঝ ভক্তটিকে বুকের সাথে চাপিয়া ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, দিদি তুই আমার কাছে আর আসিসি না।

মায়া এই আর্তকণ্ঠের অর্থ বুঝিল কিনা সেই জানে। দাদুর কাঁধে মাথা রাখিয়া তাহারও চক্ষুদুইটি সজল

হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে, দিদি যেমন করিয়া ছোট ভাইটিকে শাসন করে এমনি ভাবে কহিল, তুমি ভারী দুষ্টু হ'য়েছ দাদু। তোমাকে কত বলি, দাদু হিমে যেওনা, হিমে যেওনা। তবু তুমি যাবে। তাইতো কাসি হ'ল। হিম লাগলেই তো কাসি হয়। হাঁ। হয়, মা বলেছে।......এমনি অনেক অনুযোগ। শিবচরণের কানে কতক গেল, কতক গেলনা। কিন্তু তাঁহার গাঢ় আলিঙ্গন তিনি ক্ষণেকের তরেও শিথিল করিলেন না। মনে হইল এই শেষ। তাঁহার 'স্বর্গ' ভাঙিয়া গিয়াছে।

পরদিন বিকালে খাবার খাইয়া মোহিত নীচে আসিলে শিবচরণ কহিলেন, আমার গাড়ীটা কখন একটু দেখে রাখিস তো খোকা। একবার বাড়ী যাওয়া দরকার।

মোহিত খবরের কাজে থেকে মুখ না তুলিয়াই কহিল, কেন, হঠাৎ বাড়ী যাবেন কেন?

—অনেকদিন যাইনি। চাষবাসের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া এ জায়গায় শরীরটাও টিকছেনা। হাঁপানির টানটাও বেড়ে গেছে। কলিকাতায় আসিয়া শিবচরণের স্বাস্থ্যের অনেকখানি উন্নতি হইয়াছিল। সেই দিকে চাহিয়া মোহিত কহিল, আচ্ছা বেশ, ট্রেণ তো সকাল আটটায়। তা'হলে কালই যাবো—বলিয়া একটু থামিলেন, একটু ইতস্ততঃ করিলেন, পরে আবার কহিলেন, শরীরের যা অবস্থা আবার যে আসতে পারবো: সে ভরসা করি না। মরলে একবার দেখে যাস। আর...একটা কথা। মিত্তিরদের সেরেস্তায় পাঁচবচ্ছর চাকরি করেছিলাম। দেনা-টেনা কাটা গিয়ে শ'তিনেক টাকা এখনো পাওনা আছে। অনেক কষ্টে প'ড়েও টাকাটায় হাত দিইনি। ওর সমস্তটাই মায়ার। ঐ দিয়ে আমার দাদুকে বিয়ের সময় একটা কিছু গড়িয়ে দিস্। নিজে হাতে যে দিয়ে যাবো সে কপাল আর—সহসা শিবচরণের গলা ধরিয়া আসিল। কথার মাঝখানেই ঘর থেকে বাহির হইয়া গেলেন।

রাত্রে মায়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল, দাদু তুমি বাড়ী যাচ্ছ, আমি যাবো।

শিবচরণ এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন; কহিলেন, আমি যে দু'দিন পরেই চ'লে আসছি। এসে তোমাদের সকলকে নিয়ে প্রকাণ্ড নৌকায় চ'ড়ে বাড়ী যাবো। কেমন দিদি?

নৌকায় চড়িবার লোভ মায়ার অত্যন্ত বেশী। কিন্তু আজ এসব কথা সে কিছুতেই শুনিতে চাহিল না। অনেক অনুনয়বিনয় এবং বোঝাপড়ার পরে স্থির হইল যে, দুইদিন দেরি করিলে চলিবে না। কালই আসিতে হইবে।

ভোরে উঠিয়াই শিবচরণ যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মায়া জাগিবার পূর্ব্বেই রওনা দেওয়া দরকার। বেয়ানের ঘরের দুয়ারে গিয়া কহিলেন, বেয়ান, হয় তো আর দেখা হবে না। অনেক কিছু কটুমন্দ বলেছি। কিছু মনে করবেন না।

বেয়ান গলগল করিয়া উঠিলেন, ওমা সে কি কথা? ছিঃ মনে আবার কি করবো? এক সংসারে থাকতে গেলে—ইত্যাদি।

নির্ম্মলার ঘরে গিয়া কহিলেন, বৌমা এদিকে এসো। নির্ম্মলা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শিবচরণ কহিলেন, তোমার শাশুড়ী মরবার সময় এই জিনিষটি আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "আমার মোহিতের বৌ এলে দিও।" মনে করেছিলাম, তোমাকে ঘরে নিয়েই দেবো। তা আর হ'লো না—

বলিয়া একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তাই আজই—দেখি তোমার হাতটা দাও দিকিন মা।

দুইগাছি অত্যন্ত সেকেলে গড়নের মোটা সোনার বালা বধূমাতার হাতে পরাইয়া দিতে দিতে কহিলেন, মুখুয্যে বাড়ীর লক্ষ্মী ছিলেন বৌঠান। তাঁর যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তো সব গেল। তিনি তোমাকে চোখে দেখে যেতে পারেননি। এই-ই তাঁর আশীর্ব্বাদ। সেকেলে হ'লেও বালাজোড়া প'রে থাকতে লজ্জা ক'রোনা মা। সতীলক্ষ্মী স্বর্গ থেকে তোমার মঙ্গল করবেন।—বলিয়া দুইহাত কপালে ঠেকাইয়া মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়ার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইলেন।

নির্ম্মলা শ্বশুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পায়ের ধূলা নিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার গণ্ড বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

মায়ার ঘুমন্ত মুখখানার দিকে শেষ লোলুপ দৃষ্টি রাখিয়া নিঃশ্বাস চাপিয়া শিবচরণ নীচে নামিয়া আসিলেন। চাকর গাড়ী ডাকিয়া আনিয়াছিল। ব্যাগটা নিয়া উঠিতে যাইবেন, ঠিক এমনি সময়ে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মায়া আসিয়া সদর দরজায় দাঁড়াইল এবং বিনা-ভূমিকায় গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে গম্ভীর শান্তকণ্ঠে কহিল, আমি যাবো, দাদু।

শিবচরণ ভীত হইয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে তুলিয়া কহিলেন, ছিঃ দিদি, এই বুঝি তুমি কথা শোনো? আমি তো আজই আসছি নৌকা নিয়ে। তখন যাবে। তুমি যাবে, মা যাবে, সব্বাই যাবে।

—না, আমি এক্ষুণি যাবো।—বলিতে বলিতে বড় বড় জলের ফোঁটা তাহার দুইগণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। মোহিত আসিয়া কহিল, তুই আমার সঙ্গে চল। গাড়ী ক'রে বেড়িয়ে আসি। মায়া উদ্ধতকণ্ঠে কহিল, না আমি যাবো না, আমি দাদুর সঙ্গে যাবো।

অগত্যা মোহিত তাহাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল, শিবচরণ কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মায়া উন্মাদের মত আছড়াইয়া কামড়াইয়া পিতার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। আর্ত্তকণ্ঠে ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল, আমি যাবো, যাবো। ও দাদু, আমায় নিয়ে যাও, আমি যাবো...।

গলির মোড়ে গাড়ীখানা অদৃশ্য হইয়া গেল।

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
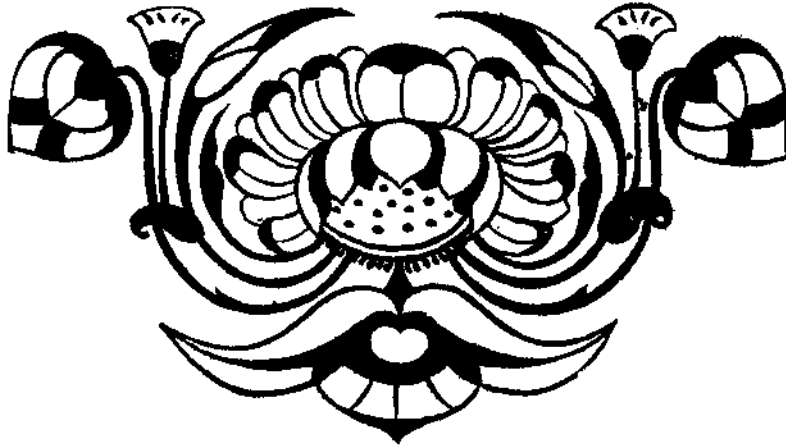
সাধনা ও সিদ্ধি

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ এম-এ, বি-এল

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের যাহাই আমাদের অভীষ্ট হউক না কেন, সেই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আমরা সর্বদাই লালায়িত। জীবনের প্রতি মুহূর্তেই আমরা সফলতার স্বপ্ন দেখি, কল্পনা করি অকস্মাৎ আমাদের বাঞ্ছিত আশাতরু পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। আমাদের এইসব সুখস্বপ্ন রঙীন কল্পনাই রহিয়া যায়, অনেক সময়েই কার্য্যে পরিণত হয় না।

ঐশ্বর্য্য, সম্মান, কীর্ত্তি, প্রাচুর্য্য, পদগৌরব, যাহাই কামনা করিনা কেন তাহার জন্য ঐকান্তিক সাধনা চাই। বিনা-সাধনায় কোথাও সিদ্ধি মিলে না। কি মনোজগতে, কি বস্তুজগতে সর্বত্রই এই একই নীতি। আধ্যাত্মিক সম্পূর্ত্তি প্রেম, প্রীতি, চরিত্রলাবণ্য, সকলই সাধনার ফলে সঞ্জাত।

এই সাধনার মূলসূত্র আত্ম-নির্ভরতা ও আত্ম-প্রত্যয়। পদে পদে বাধা জাগে, অন্তরায়-রাক্ষস বিপ্লব বাধায়, ত্রুটি ও বিচ্যুতির ঘনান্ধকার গুহা গ্রাস করিতে আসে। তথাপি আত্ম-বিশ্বাসী সাধক নিরুৎসাহ না হইয়া চলিতে থাকেন, আর চলার পথে একদিন সিদ্ধি বিজয়মাল্য লইয়া আনন্দ করে।

আমাদের দেশের মানুষের মনে এই মহাকল্যাণ-কর আত্ম-বিশ্বাস নাই। দেশের চারিদিকে শুধু মৌন অবসাদ ও ঘন নিরাশা ভূতের মত মানুষের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। দৈবের ও ভাগ্যের উপর সমস্ত অপরাধ চাপাইয়া ক্লীবের মত শুধু আমরা গালি পাড়িতেই শিখিয়াছি, বীরের মত জয়শ্রীকে আত্মশক্তিতে জয় করিতে শিখি নাই। এই সব মূঢ় ম্লান অবসন্ন মানুষের কণ্ঠে যৌবনের জয়গান জাগাইতে হইবে, আত্ম-প্রত্যয়ের দুর্দম শক্তি ফুটাইতে হইবে। মানুষ যখন নিজের সুপ্ত শক্তিকে জানে, তখন তাহার চিত্তে ভাদ্রের ভরানদীর মত দুর্জয় স্রোতোবেগ জাগে, সে স্রোতোবেগের সম্মুখে কোন বাধাই দাঁড়াইতে পারে না, মানুষ তখন অসাধ্য সাধন করে।

আমাদের দেশের মানুষ কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে শিখুক

> "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
> মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

মানুষ একদিন বনের পশুর মত নিরাশ্রয় ও নিরালম্ব ছিল, নিজের শক্তির বলেই সে প্রকৃতিকে যুগে যুগে জয় করিয়া বর্ত্তমানের দীপ্তিময় সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। কত বিপ্লবের অট্টহাসি, কত প্রলয়ের ভীম ঝঞ্ঝা মানুষের যাত্রাপথকে দুর্গম ও ভীতিসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে, মানুষ তবু ভয় পায় নাই। ভগবান মানুষের কানে অভয়মন্ত্র পড়িয়া দিয়াছেন, তাই মানুষ সমস্ত বাধাকে জয় করিয়া, সমস্ত শঙ্কাকে তুচ্ছ করিয়া সত্য, শিব ও সুন্দরের আবির্ভাবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের দেশের দুর্বল, ভীরু মানুষের কানে এই অভয়মন্ত্র দেওয়ার প্রয়োজন আছে। দারিদ্র্য, দুঃখ আছে থাকিবে, শোক তাপ ব্যাধি আছে ও থাকিবে, তথাপি মানুষের বিমর্ষতার কারণ নাই। প্রতিদিন প্রাতঃস্মরণের যে মন্ত্র পড়ি, সে মন্ত্রের তাৎপর্য্য যেন শ্রবণ ও মননের দ্বারা আমাদের চিত্তে সঞ্চারিত হয়।

> অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি, ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্
> সচ্চিদানন্দ পুরুষোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্।

প্রতিদিন যেন অনুভব করি যে

"আমি দেবতা, আমি ছোট নহি, আমি ব্রহ্ম, আমি সচ্চিদানন্দ, শোক আমাকে ক্লেশ দেয় না, আমি বন্ধনে বদ্ধ নহি, মায়াতীত মুক্তপুরুষ আমি, আমি আমার গৌরবময় স্বভাব জানি।"

মানুষকে তার এই অমৃতত্বের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলে জগতের শাশ্বত কল্যাণ হইবে। মানুষের সাধনা সীমাকে ছাড়াইয়া অসীমকে, রূপ ছাড়াইয়া অরূপকে,

কাল ছাড়াইয়া কালাতীতকে স্পর্শ করিতে চাহে, তাহার জন্ম মানুষের মনে তাহার বৃহৎ অধিকারের বাণী, তাহার বিরাট শক্তির বার্ত্তা জাগ্রত ও প্রস্ফুট করিবার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।

দেশের চারিদিকে আজ সমস্যার ছড়াছড়ি। অন্ন-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, নারী-সমস্যা আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। এইসব সমস্যাসমাধানের জন্ম কত চিন্তাশীল মনীষী কত উপায়েরই না সন্ধান করিতেছেন কিন্তু কোনটিই কার্য্যকরী হইতেছে না। তাহার কারণ দেশে মানুষের অভাব।

মহাভারতের কর্ণের কথা স্মরণীয় ও বরণীয় হউক। মাতৃ-ত্যক্ত কুল-ত্যক্ত কর্ণ নিজশক্তিতে কি কীর্ত্তিই না লাভ করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে কর্ণ অদ্বিতীয়বীর মহাবীর অর্জ্জুনও কর্ণের নিকট ম্লান ও নিষ্প্রভ। সেই কর্ণ একদিন বড় গলায় বলিয়াছিলেন,

"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষম্ ।"

মানুষের পৌরুষ মানুষের হাতেই। ভাগ্যদেবী অলক্ষ্যে মানুষের জীবনের সুতা লইয়া জাল বুনিতেছেন, গ্রীক-পুরাণের এ গল্প কেবল গল্পই, মানুষ আপন হাতেই আপন ভাগ্য গড়িয়া তুলে।

মানুষ অমের শক্তিধর, এই মহাবৈচিত্র্যময় পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত গৌরবেই মানুষের ন্যায্য অধিকার আছে। ভাগবত তেজ-সম্পন্ন মানুষ, অমৃতের পুত্র মানুষ, জীবনে যাহাই কামনা করুক না কেন তাহাই সে লাভ করিতে পারে।

আমেরিকার গদ্যছন্দের কবি হুইটম্যান্ লিখিয়াছেন

There is no endowment in man or woman
that is not tallied in you
There is no virtue or beauty in man or woman
but as good in you.
No pluck, no endurance in others
but as good in you.
No pleasure waiting for others,
but equal pleasure wait for you.

ভীরু যে সেই বাধা দেখিয়া পিছাইয়া পড়ে, যুবন্ প্রাণ সমস্ত বিঘ্নকে পরাজয় করিয়া অশান্তউল্লাসে ছুটিয়া চলে। বিপদের ঝটিকায় যখন সাগরের ঢেউ মাতাল হইয়া আকাশ ভাঙ্গিতে চায়, যৌবনের পূজারী তখন ভেলায় চড়িয়া নাচিতে থাকে, কারণ সে জানে দুঃখ ও শঙ্কার মধ্য দিয়াই অভয়কে মেলে।

সাধারণ মানুষ হয়ত বলিবে তোমার বড় কথা শুধু কল্পনারই কুহক, সত্যের ভিত্তি তাহার নাই। আমি বলি, জগতে যাঁহারা গুণী, জ্ঞানী, মহাপুরুষ আখ্যা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মানুষ। তাঁহাদের সফলতার মূলমন্ত্র তাঁহাদের সুগভীর আত্ম-বিশ্বাস। নিজের গুপ্তশক্তির পরিচয় জানিয়া সে শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ করিয়াই তাঁহারা কীর্ত্তির মুকুট পরিয়াছেন।

কর্ম্মের প্রতি দৃঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধা চাই, অনুরাগে ও আগ্রহে, আনন্দে ও উৎসাহে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে মানুষের প্রাণে অলক্ষ্য শক্তির সঞ্চার হয়। পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ডাকিয়া বলিতেছে, "ওগো আমায় লও, ওগো আমায় লও।" ঘরে বসিয়া যে কেবল অকৃতকার্য্যতা, ব্যর্থতার স্বপ্ন দেখে, তাহাকে তাহারা বরণ করে না। সাহসী ও বীর যে অটল অধ্যবসায়ে কাড়িয়া লইতে চাহে, পৃথিবীর সমস্ত মধু ও মাধুরী আপনা হইতেই সেই বীর্য্যবানের কাছে ধরা দিতে চাহে।

জগতে কোন কাজই ছোট নহে। অমৃতময়ের অমৃত দিয়াই জগৎ ব্যাপ্ত আছে, সকল পথই তাঁরই আনন্দলোকের দ্বারে মিলিয়াছে, সকল কাজই তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে। সংশয়সমাকুল পার্থকে ভগবান একদিন মধুর কণ্ঠে বলিয়াছেন,

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
যত প্রবৃত্তি ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণাতমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

আমাদের কাজ দিয়াই আমরা কল্যাণময়ের পূজা করি নিজ নিজ কাজ আন্তরিকতা ও শুচিতার সহিত করিলেই পরম সিদ্ধি পাওয়া যায়।

মধুর স্মৃতির অচলায়তন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আমরা দেশে

চাষ করার গান ও লোহার ঘুম ভাঙানর গান প্রচার করি। পথের ধুলায় ত প্রভুর পায়ের ধূলি আছে, কুলি-মজুর-শ্রমিক ও কৃষক কেহই নীচ নহে। সকলের কাজ দিয়াই ত রাজার-রাজার উৎসব-সমারোহ চলিতেছে। যে ফুল তোলে, যে পথ ঝাড়ু দেয়, যে আতসবাজী বানায়, যে রোসনাই জ্বালায়, সবার'পরেই তাঁর করুণ স্নেহদৃষ্টি আছে। শ্রমের এই মর্যাদা, কর্মের এই মহিমা নিদ্রালস দেশবাসীর কর্ণে জলদগম্ভীরস্বরে প্রচার করিতে হইবে। বুঝাইতে হইবে, মানুষের সেবায় ও সাধনায় ছোট কাজ মহীয়ান ও গরীয়ান হইয়া মানুষকে মহৎ করিয়া তুলে। আপন কাজকে সুন্দর, শুভ্র, দীপ্ত করিয়া তোল, তাহা হইলেই তুমি নিজেও সুন্দর ও সম্মানী হইবে।

যে কর্মই মানিয়া লট, তাহার সাধনের প্রথম ও চরম পন্থা আত্ম-নির্ভরতা। গীতায় কথাতেই পুনরায় বলি :—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

ভাগ্য, দৈব, কিম্বা ভগবৎ-কৃপা আমাদের সহায়তা করিবে না। মানুষ আত্মার দ্বারাই আত্মার উদ্ধার করিবে, পতনের মসৃণ পিচ্ছল হইতে আপনাকে বাঁচাইবে। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু।

জীবন-সংগ্রাম আজ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পঙ্গু ও অপটুর স্থান কোথাও নাই। এই জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন হইবে, অযোগ্য বিলোপ হইবে। তাই আজিকার দিনে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, যোগ্যতা চাই আর সে যোগ্যতা আত্ম-নির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি সহজেই লাভ করিতে পারে।

আমাদের প্রাচীন সরল ও সহজ জীবন-ধারা আর চলিবে না, বিশ্ব তাহার বৈচিত্র্য ও কোলাহল লইয়া দ্বারে দেখা দিয়াছে। বৃন্দাবনের প্রেমলীলা গাহিয়া, কোকিল-কুহু শুনিয়া আর মলয়পবন ভুঞ্জিয়া দিন চলিবে না, জীবনের পঙ্কু-কুটিল নানাপথে নানাভাবে ছুটিয়া জয়ী হইতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিয়া থাকিতে হইবে, না হইলে পরিত্রাণ নাই। আশাহীন এই সব দুর্বলচেতা মানুষকে বলি, "মা ভৈঃ মা ভৈঃ," তোমার শক্তিকে চেন, শক্তির সদ্ব্যবহার কর, তবেই আলাদিনের প্রদীপস্পর্শের মত তোমারও সকল [illegible] হইবে।"

ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।—এই ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। অপটু আর অকর্মা ভাবিয়া ভাবিয়া নিজকে হেলা করি, আর সময় ও সুযোগ চলিয়া যায়। আমাদের চিন্তা, আমাদের সঙ্কল্প, আমাদের অনুধ্যান আমাদের চিত্তফলকে দাগ রাখিয়া যায়, যে জয়ের কল্পনা করে, জয় তাহাকে আলিঙ্গন করে।

Nothing venture, nothing gain. ছোটকে কোল করিয়া যাহারা ভুলিয়া থাকে, বৃহৎকে তাহারা পায় না।

কূলে যে সওদাগর নৌকা ভিড়ায় রত্নাকরের অকূলের রত্ন তাহার ভাগ্যে জুটেনা।

স্বাস্থ্য, দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও সাহস আত্মবিৎ পুরুষের না থাকিয়াই পারে না। যিনি জানেন মানুষ কেবল দেহী নহে, দেহাতীত ব্রহ্মশক্তি তাহার, সাধনায় ও তপশ্চর্য্যায় তাহার সুপ্ত শক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবে, তখন মানুষের আপনাআপনিই মহাবীর্য্য জন্মিবে।

মানুষ তাহার আদর্শ-অনুসারেই বাড়িয়া চলে। অনন্ত মাধুর্য্যময়, অনন্ত শক্তিময় ব্রহ্মের আদর্শ যখন আমাদের সম্মুখে ধরিব, তখন অবিসংবাদিত ভাবেই আমাদের আদর্শের প্রকর্ষ হইবে ও তাহার সহিত আমাদেরও উৎকর্ষ লাভ হইবে।

শব্দ ব্রহ্ম। শব্দের মধ্যে জড়িত শক্তি আছে। মানুষ ভাবুক, তাহার ভাবনা মানুষ জপুক, তাহার জপ তাহাকে উন্নত করিবে।

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক
সচ্চিদানন্দ পুরুষোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্।"

গভীর অনুভূতির সহিত, পরমানন্দের সহিত, জয়োল্লাসের মুখর কোলাহলে আজ বলি, আমি ব্রহ্ম, আমি দেবতা, মুক্তি আমার দাসী, আনন্দ আমার বার্তাবহ। কোন দুঃখই আমার পায় না, দুশ্চিন্তা ও বিকার আমার নাই।

Gestefield তাঁহার Science of the larger life নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

Try to see what a power and opportunity are yours and set yourself to the doing of this work the work of co-operation with the great

design. your use of voluntury suggestion will transfrom you into which you declare, change you, the sense soul, into the realization of God-being which is the divine soul, and crown of creation.

মহাভারতের সেই অবজ্ঞাত নিষাদপুত্রের কথা মনে কর। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যের লাঞ্ছনা একলব্যকে পরাঙ্মুখ করেনাই। আর্য্যাস্ত্রের সত্যঅধিকারী মহাপ্রাণ একলব্য নির্জ্জন কাননে সাধনা করিয়া দ্রোণের প্রিয়শিষ্য পার্থের চেয়েও সুনিপুণ ধনুর্বিদ্যা লাভ করিল। নিষ্ঠুর মানসগুরুর প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা দিয়া একলব্য তৎকালীন খ্যাতি ও কীর্ত্তি হারাইয়াছিল বটে, কিন্তু মানুষের ইতিহাসে একলব্য চিরকালের মহাগুরু। একলব্যের সুদৃঢ় নিষ্ঠা, একলব্যের আত্মোৎসর্গ, একলব্যের অধ্যবসায় আজিকার দিনে আমাদের আদর্শ হউক। আমাদের অভয়মন্ত্র হউক,—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত। সময় চলিয়াছে, জীবনে যাহা চাই তাহা এখনই করিতে হইবে।

যত্ন করিলেই পৃথিবীর বালুতীরেই অক্ষয়মঠ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব।

হে পান্থ! জীবনের বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে চল। বিচিত্র-রূপে, বিচিত্রবেশে, বিচিত্রবর্ণে, বিচিত্রময়ের জয়যাত্রাকে দিব্যোজ্জ্বল করিয়া তোল। তিনি ডাক দিয়াছেন—সকলকে ডাক দিয়াছেন—অন্ধ আতুর খঞ্জ বধির কেহই বাদ পড়ে নাই, সেই উৎসবের মিলনপীঠে অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত মাধুর্য্য, অনন্ত প্রেম, অনন্ত প্রাণ বিতরণ হইতেছে।

ঐক্যতানের মাঙ্গলিক ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। তোমার সহিত বিশ্বের মিলনের বাঁশী মধুরসুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। কি মধুর রাগিণী! স্তব্ধবিস্ময়ে একবার শোন।

আত্ম-বিশ্বাসের সঞ্জীবনমন্ত্র চারিদিক উদ্বুদ্ধ করুক। হে আত্ম-ভোলা মানুষ মায়ামৃগের পিছনে ছুটিয়া হয়রান হইওনা। তুমি নির্ভয় হও, নিঃসংশয় হও, চক্ষু মেলিয়া দেখ—নবপ্রভাতের রক্তজ্যোতির লাবণ্যে দিগ্বধূরা পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। নিরলস উদ্যমে যাত্রা কর, সত্য ও ঋত তোমার শুভ্রকেতন হউক।

নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি লইয়া যাত্রা আরম্ভ কর। দিগ্বলয় যেমন ধাবমান ব্যক্তির নিকট কখনও ধরা দেয় না কেবল দূরে দূরেই সরিয়া যায়, মানুষের প্রগতিও তেমনি অন্তহীন, মানুষ ধরি-ধরি করিয়াও কখনও তাহা ধরিতে পারিবে না। শান্ত ও অনন্তের এই দ্বৈতলীলা যুগযুগান্তর চলিবে।

মানুষের সার্থকতা যুগোপযোগী অভ্যুদয়ের অনুপাতেই বিচার করা হইবে। মানুষ তাহার জন্ম, কর্ম্ম ও অবিচারকে ছাড়াইয়া নূতনত্ব আনিবে, মধুরত্ব আনিবে, সেখানেই তাহার মহত্ব, সেখানেই তাহার বৈশিষ্ট্য।

মধুব্রহ্মের শক্তি মানুষের চিত্তে প্রস্ফুট হউক। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার ব্রহ্মতেজের দ্বারা পরাশান্তিকে লাভ করিবে, সত্য ও জ্ঞানকে অধিকার করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবে।

আশার ও আনন্দের এই বাণী আমাদের কর্ম্মকে চালিত করুক, ধর্ম্মকে সবল করুক। আমাদের সাধনা বহুমুখী হইয়া পৃথিবীকে সুন্দরতর ও শুভ্রতর করুক, মর্ত্ত্যকে স্বর্গের চেয়ে লোভনীয় করুক।

এই কল্যাণবুদ্ধিতে সমবেত হইয়া আমরা প্রার্থনা করি:—

য একো বর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

শ্রীমতিলাল দাশ

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র দে
১৩ নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা।

পোড়ো বাড়ী

শ্রীমতী অমিয়া দত্ত

সন্ধ্যায় সময় 'ক্যাল্‌কাটা ক্লাবে' জনকয়েক বন্ধু মিলে অলৌকিক কাহিনী সম্বন্ধে নানারূপ আলাপ-আলোচনা চল্‌ছিলো। প্রায় সকলেই একটা একটা গল্প ব'লে, তার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁরা যে নিঃসন্দেহ সে কথা জানালেন।

পরিশেষে অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিষ্টার বোস বললেন, "আমি আমার নিজের জীবন থেকে একটা ঘটনা তোমাদের শোনাবো। সে আজ সাতচল্লিশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু এখনো এমন মাস যায় না, যে মাসে আমি ঐ ঘটনা স্বপ্নে প্রত্যক্ষ না করি। ভয়ের ছায়া সেদিন থেকে আমার হৃদয়ে চিরমুদ্রিত হ'য়ে আছে। দশ মিনিট ধ'রে আমি যা সহ্য করেছিলুম, সে তোমাদের বোলে বোঝাতে পারবো না। এখনো হঠাৎ কোন শব্দ হ'লে আমি চম্‌কে উঠি, সন্ধ্যাবেলা কোন লোকের বা জিনিষের ছায়া দেখ্‌লে পালাতে ইচ্ছা হয়। সত্য বল্‌তে গেলে রাত্রে আমায় ভয় করে।"

যৌবনে একথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা হ'তো। কিন্তু সত্তর বছর বয়সে কাল্পনিক বিপদের সামনেও লোকে আতঙ্কিত হয়, এ বয়সে সবই বলা চলে। সত্যকার বিপদে কিন্তু আমি কখনো বিচলিত হইনি।

কোনরকম ব্যাখ্যা না ক'রে ব্যাপারটা যেমন ঘটেছিল, তেমনি তোমাদের বল্‌ছি। এ পর্য্যন্ত এ কথা আমি কাকেও বলিনি।

১৮—সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলুম ব্যারাকপুরে। একদিন সকালে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াতে বেরিয়েছি, রাস্তায় একজন লোককে দেখলুম, মনে হ'লো সে আমার পরিচিত। কিন্তু ঠিক বুঝ্‌তে পারলুম না সে কে। ঘোড়ায় গতি কমাতেই হঠাৎ লোকটি আমার দিকে চাইলে ও আমাকে চিন্‌তে পেয়ে কাছে এসে আমার হাত চেপে ধরলে।

সে আমার কলেজের বন্ধু। তাকে খুবই ভালবাস্‌তুম। মাত্র বছর পাঁচ-ছয় আর তার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু এর মধ্যে সে এত বুড়ো হ'য়ে গেছে যে তাকে চেনা শক্ত। সে কুঁজো হ'য়ে পড়েছে, মাথার চুল সব সাদা। দেখে মনে হয়, তার বয়স ষাট বছরের কম নয়। আমার বিস্ময় দেখে বললে, "ভাই, আমার জীবনের ওপর দিয়ে যে কী ভীষণ ঝড় ব'য়ে গেছে, তা যদি শোনো তা হ'লেই বুঝ্‌বে আমার চেহার এত আশ্চর্য্য রকম বদ্‌লে গেছে কেন।"

আমি পূর্ব্বেই জানতুম যে সে খুব ভালোবেসে একটি তরুণীকে বিয়ে করেছিল ও তারা পরম সুখী হ'য়েছিলো। এরূপ ভালোবাসা সাধারণতঃ দেখা যায় না। একমুহূর্ত্ত পরস্পরকে ছেড়ে থাক্‌তে পারতো না। বন্ধু বললে, বিবাহের মাত্র বৎসরখানেক পরেই তার স্ত্রী হৃদ্‌-রোগে মারা যায়। বোধ হয় এত সুখ তাদের সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল না। পত্নীর মৃত্যুর পরদিনই সে নিজের প্রকাণ্ড প্রাসাদ ছেড়ে এইখানে তার যে একটি ছোট বাংলো বাড়ী ছিল, তাতেই স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্য আসে। এখনও সেখানেই রয়েছে,—একলা ও আশাহীন। ৪।৫ মাইল দূরে নিজের প্রাসাদোপম বাড়ীতে আর ফিরে যায়নি। সে শূন্য বাড়ীতে কি হবে? জীবন তার পক্ষে বোঝা। মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন কাম্য জিনিষ তার আর নেই।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার সে বললে, "ভাই, তোমার সঙ্গে যখন এরূপ অভাবনীয় ভাবে দেখা হ'লো, তখন তোমাকে আমার একটা কাজ ক'রে দিতে হবে। তুমি আমার বাড়ীতে তো কতবার গেছ। এখন যদি সেখান থেকে কতকগুলো জরুরী কাগজপত্র এনে দাও তো বড় উপকার হয়। সেখানে এক বৃদ্ধ পুরাতন সরকার ছাড়া আর কেউ নেই। আমাদের শোবার ঘরে লেখ্‌বার টেবিলের দেরাজের ভিতর কাগজগুলো তাড়া বাঁধা আছে। আমি

আমার কোন কর্ম্মচারী বা উকীলের লোক দিয়ে ওগুলো আনাতে পারছি না। কেননা সেই কাগজপত্র খুবই গোপনীয়। আর আমার কথা যদি বল, আমি জীবনে ও-বাড়ীতে আর পা দেব না। পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও নয়। আসবার সময় আমি নিজে ঐ ঘর তালা-বন্ধ ক'রে এসেছি। সে চাবি এবং টেবিলের দেরাজের চাবি আমি তোমাকে দেবো। তা ছাড়া একটা চিঠিও দেবো আমার সরকারের নামে। তুমি কাল সকালে আমার বাড়ীতে যেয়ো। সেই সময় এ সম্বন্ধে সমস্ত বুঝিয়ে দেবো। তোমার কি কোন অসুবিধা হবে ?"

আমি তার ছোটখাট কাজটা করতে স্বীকৃত হ'লুম। তার বসত-বাড়ী এখান থেকে চার-পাঁচ মাইলের বেশী নয়। ঘোড়ায় গেলে বড়-জোর ঘণ্টাখানেকের রাস্তা।

পরদিন বেলা সাড়ে-আটটার সময় আমি তার বাংলোয় গিয়ে পৌঁছলুম। খাওয়ার সময় আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ না থাকলেও সে প্রায় সমস্ত সময়টা নির্ব্বাক হ'য়েই রইলো। যদিও বিশেষ কোন কথা ব'লে আমার চিত্ত-বিনোদন করতে না পারায় সে নিজেকে অপরাধীই মনে করতে লাগ্‌লো। এটা যেন বুঝা গেল। সে কতবার বললে আমি যেন তার মৌনতাকে ক্ষমা করি। যে বাড়ীতে ও যে ঘরে তার কত সুখস্মৃতি জড়িত আছে, আমি সেইখানেই যাচ্ছি। এই চিন্তায় তার মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে থাকায় সে কথাবার্ত্তা কইতে পারছে না বললে। তাকে দেখেও মনে হ'লো, যেন তার হৃদয়ে কিসের আলোড়ন চলছে ও সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক।

খাওয়ার পর আমাকে সেখানে গিয়ে কি করতে হবে সে সম্বন্ধে সে বিস্তারিত উপদেশ দিলে। কাজটা এমন কিছুই নয়। খুবই সোজা। তার টেবিলের ডান-দিকের প্রথম দেরাজ থেকে দু' বাণ্ডিল চিঠি ও একতাড়া কাগজ আমাকে নিয়ে আসতে হবে।

যাবার সময় কুণ্ঠিতস্বরে সে বললে, "ভাই, একটা অনুরোধ তোমাকে করছি, আশা করি তুমি কিছু মনে করবেনা। তুমি ঐ ঘরটার চারিদিকের কিছু দেখোনা বা লক্ষ্য কোরোনা।"

তার কথায় আমি ক্ষুব্ধ হ'লুম ও মনোভাব গোপন করতে না পেরে একটু ঝাঁজের সঙ্গেই তা প্রকাশও ক'রে ফেললুম। সে বললে, "ভাই, ক্ষমা করো। আমি এত যন্ত্রণা ভোগ করছি যে আমার মাথার ঠিক নেই।" তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌লো। যাহোক্, প্রায় বেলা বারোটার সময় তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি তার বাড়ীর অভিমুখে রওনা হলুম।

দিনটি সুন্দর—উজ্জ্বল রৌদ্রে চারিদিক আলোকিত। পথের দু'ধারে বড় বড় গাছ। ডালগুলি মাঝে মাঝে আমার মাথায় লাগ্‌তে লাগ্‌লো। মনে হ'লো যেন তারা আমার কপোলে তাদের স্নেহহস্তের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। নানারকম পাখীর গানে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন মুখরিত। ঘোড়া ছুটিয়ে চল্‌তে লাগলুম।

প্রাসাদের কাছাকাছি এসে সরকারকে দেবার জন্য পকেট থেকে চিঠিখানা বের ক'রে সাশ্চর্য্যে দেখি যে সেখানার খাম শীলকরা। বিরক্তি ও রাগে কাজটা না সেরেই তখনি আমার ফিরে আস্‌তে ইচ্ছা হ'লো। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লুম যে তাতে অভদ্রতা প্রকাশ পাবে। তা'ছাড়া আমার বন্ধু তার দুঃখভারে এত অভিভূত ও আনমনা হয়ে আছে যে সে হয়তো অন্যমনস্কে চিঠিখানা বন্ধ ক'রে ফেলেছে।

বাড়ীখানা দেখে মনে হ'লো বহুদিনের পরিত্যক্ত পোড়োবাড়ী। অন্ততঃ বিশ বছর যে তাতে কোন মানুষ বাস করেছিল তার কোন চিহ্ন নেই। চূণ-বালি খ'সে পড়েছে। বাগানের চারিদিক জঙ্গল ও ঘাসে পূর্ণ। কেয়ারীগুলো দেখে মনে হয়, এককালে সেখানে সুন্দর ফুলবাগান ছিল। কিন্তু এখন অযত্নে সবই লুপ্ত। কেবল কি ক'রে জানি না ফটকটা সোজা দাঁড়িয়ে আছে।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে ও আমার ডাকাডাকিতে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। আমি ঘোড়া থেকে নেমে চিঠিখানা তার হাতে দিলুম। সে সেখানা নাড়াচাড়া ক'রে তিন-চারবার পড়লে। প'ড়ে চিঠিখানা পকেটে পুরে বললে, "আপনি কি চান ?"

আমি বিরক্তির সঙ্গে বললুম, "সেকথা তোমার জানা উচিত। তোমার মনিবের হুকুম তো দেখ্‌লে। আমি প্রাসাদের মধ্যে যেতে চাই।"

বজ্রাহতের মত সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে বললে, "আপনি তাহ'লে ঐ ঘরে…মায়ের ঘরে সত্যই যেতে চান ?"

ক্রুদ্ধস্বরে আমি বললুম, "তোমার মতলব কী ? আমাকে কি এখানে দাঁড় করিয়ে জেরা করবে নাকি ?"

বিচলিতভাবে সে বললে, "না…হুজুর…কিন্তু…বলতে গেলে মায়ের মৃত্যুর পর ওঘর আর খোলা হয়নি। পাঁচ-মিনিট যদি অপেক্ষা করেন, তাহ'লে আমি গিয়ে…গিয়ে একবার দেখি…।"

রাগে আমার গা জ্ব'লে গেল। "চাবি রয়েছে আমার কাছে, তুমি কি ক'রে সে ঘরে ঢুকবে ? আমাকে কি বোকা বোঝাচ্ছ ?"

সে কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে বললে, "তা হ'লে আসুন হুজুর, আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাই।"

"সিঁড়িটা আমাকে দেখিয়ে দিয়ে তুমি যাও। আমি একলাই ঘর চিনে যেতে পারবো। তোমাকে দরকার হবে না।"

"কিন্তু…হুজুর…তাহ'লেও…"।

এবার আমার অসহ্য বোধ হ'লো। আমি তাকে সজোরে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলুম।

প্রথমেই বড় একটা বারাণ্ডা, তারপর হলঘর। হল-ঘরের পাশ দিয়ে দোতলায় প্রশস্ত মার্বেল পাথরের সিঁড়ি। আমি সোজা ওপরে উঠে গেলুম। একটু খোঁজার পরই আমার বন্ধুর বর্ণনামত ঘরের দরজা দেখ্‌তে পেয়ে চাবি খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লুম।

ঘর এত অন্ধকার যে প্রথমে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তার ওপর বহুকাল বন্ধ থাকায় দূষিত বাষ্পে আমার দম-বন্ধ হবার উপক্রম। কিন্তু উপায় কি ? অগত্যা আমি মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘরের চারদিক দেখ্‌বার চেষ্টা করতে

দেখ্‌লুম যে ঘরটি খুব বড়। ঘরের মাঝখানে খাটের ওপর কতকগুলো বালিশ, কিন্তু ওয়াড় ও বিছানার চাদর ইত্যাদি নেই। একটা বালিশ দেখে মনে হ'লো তার ওপর কেউ শুয়েছিল। এইমাত্র উঠে গেছে।

ঘরের চারিদিকে কতকগুলো চেয়ার ছড়ান। লক্ষ্য করলুম যে পাশের একটা ঘরের দরজা অর্দ্ধেকটা খোলা।

আমি একটা জানলার দিকে এগিয়ে গেলুম, যাতে সেটা খুলে দিলে ঘরে আলো আসে। কিন্তু কিছুতেই খুলতে পারলুম না। কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টার পর শ্রান্ত হ'য়ে টেবিলের কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলুম। যা অল্প আলো দরজা খোলা থাকায় ঘরে এসেছিল, তা'তেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। কতক্ষণেরই বা কাজ।

দেরাজ খুলে দেখি কাগজপত্রে সেটি একেবারে পরিপূর্ণ। আমার দরকার মাত্র তিন বাণ্ডিল। আমি মনোযোগের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজগুলো খুঁজছি, এমন-সময় আমার মনে হ'লো বা অনুভব করলুম যেন আমার পিছনে কাপড়ের মৃদু খস্‌খসানি শব্দ হ'চ্ছে। আমি ভাব্‌লুম বাতাসে বোধহয় কোন পরদা উড়ছে, এজন্য সেদিকে আর চেয়েও দেখ্‌লুম না।

কিন্তু মিনিটখানেক পরেই আবার সেইরকম শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লো। আমি সেইমাত্র দ্বিতীয় বাণ্ডিলটা খুঁজে পেয়েছি এবং তৃতীয়টাকেও দেখ্‌তে পেয়ে তুলতে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার ঘাড়ের ওপর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ পেয়ে আমি ত্রস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌লুম।

সভয়ে তাড়াতাড়ি পিস্তলটা পকেট থেকে বের ক'রে নিলুম। ওটা কাছে না থাকলে, ভীরুর মত পালাবারই যে চেষ্টা করতুম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যে চেয়ারে আমি একটু আগে বসেছিলুম তারই পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দরী তরুণী। পরিধানে চওড়া লালপাড় সাড়ী। দৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ।

এত ভয় জীবনে পাইনি। প্রায় প'ড়ে যাচ্ছিলুম। যে নিজে ও অবস্থায় না পড়েছে, তাকে সেই ভীষণ ভয়ের কথা বোঝাতে পারবো না। প্রেতাত্মার অস্তিত্বে কোন

কালেই বিশ্বাস করিনা। কিন্তু তখন মনে হ'লো অকস্মাৎ হৃদ্‌স্পন্দন থেমে গিয়ে এখনি আমার মৃত্যু হবে। রমণী যদি কথা না বল্‌তো তাহ'লে আমি হয়তো পাগল হ'য়ে যেতুম। কিন্তু সে আস্তে আস্তে কথা বললে। মধুর ও দুঃখময় তার কণ্ঠস্বর।

সে বললে, "অনুগ্রহ ক'রে আমার একটু উপকার করবেন কি ?"

আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কথা ফুটলো না। শুধু অস্পষ্ট একটা শব্দ গলা থেকে বেরুলো মাত্র।

সে পুনরায় বল্‌লে, "আপনি যদি একটু সাহায্য করেন, তাহ'লে আমি বাঁচতে পারি, সুস্থও হ'তে পারি। আমি ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছি—ওঃ! ভীষণ যন্ত্রণা!"

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার পরিত্যক্ত চেয়ারের ওপর ব'সে পড়লো। দৃষ্টি তখনো আমার প্রতি নিবদ্ধ। "বলুন, আমার এটুকু উপকার করবেন ?"

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম। কিন্তু তখনো কথা বল্‌তে পারলুম না।

সে একখানা চিরুণী এনে আমার হাতে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, "আমার মাথার চুলগুলো আঁচড়ে দিন। তাহ'লেই আমি সুস্থ হবো। একজনকে দিয়ে আমার চুল আঁচড়ে নেওয়াতেই হবে। আমার মাথার দিকে চেয়ে দেখুন। চুলগুলোর জন্যই আমার অসুখ। কি ভয়ানক যন্ত্রণাই যে পাচ্ছি!"

সে চুল এলিয়ে দিলে। খুব লম্বা মিশ্‌মিশে কালো তার চুল। চেয়ারের ওপর দিয়ে মেঝের লুটিয়ে পড়লো।

আমি কেন তার অনুরোধ রক্ষা করেছিলুম? তার হাত থেকে কম্পিত হস্তে কেনই বা চিরুণীখানা নিয়েছিলুম? তার লম্বা কেশের রাশি নিজের হাতে তুলে নিতেই মনে হ'লো অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় আমার হাত অসাড় হ'য়ে এসেছে। ঠিক বিষধর সাপ হাতে নেওয়ার মত। অনেকদিন ঐ স্পর্শ আমার আঙুলে লেগে ছিল, ও মনে হ'লেই চম্‌কে উঠতুম।

যন্ত্রচালিতের মত আমি তার চুল আঁচড়াতে লাগলুম। কি ক'রে জানিনা সেই বরফের মত ঠাণ্ডা চুলের রাশির জটা ছাড়িয়ে পরিষ্কার ক'রে বেঁধে দিলুম। সে মাথা নীচু ক'রে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। মনে হ'লো সে সুস্থ বোধ করছে।

হঠাৎ সে বলে উঠলো "ধন্যবাদ, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলুম।" এবং আমার হাত থেকে চিরুণীখানা একরকম কেড়ে নিয়ে পূর্ব্বদৃষ্ট অর্দ্ধোন্মুক্ত দরজা দিয়ে সে কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেলো। আর কোন সাড়া নেই, শব্দও নেই। সব নিঝুম, নিস্তব্ধ!

একলা কয়েক মুহূর্ত্ত আমি ভয় ও স্বপ্ন দেখে অভিভূত হওয়ার মত দাঁড়িয়ে রইলুম। যখন চৈতন্য ফিরে এলো প্রথমেই ছুটলুম জানলার কাছে। সবলে আঘাত করতে এবার জানলাটা খুলে গিয়ে ঘর আলোয় প্লাবিত হ'য়ে গেল। তখন আমি যে দরজা দিয়ে রমণী অন্তর্হিত হ'য়েছিলো, সেই দরজার কাছে এসে দেখি ভিতর থেকে দ্বার রুদ্ধ। আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে তাতে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলুম। কিন্তু তবুও দরজা খুললো না। পাথরের মত অচল ও অটলভাবে যেমন ছিল তেমনই রইলো।

পুনরায় ভয়ে আমার শরীর ও মন কেঁপে উঠলো। আমি তাড়াতাড়ি খোলা দেরাজের ভিতর থেকে তিনতাড়া চিঠি বের ক'রে নিয়ে সিঁড়ির তিন-চার ধাপ একসঙ্গে লাফিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। সামনেই দেখি ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে। তখনি উঠে পড়লুম ও কোনদিকে না চেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলুম।

একেবারে সহরে আমার বাংলোর কাছে এসে ঘোড়া থামালুম। লাগামটা একজন চাপরাশীর হাতে দিয়ে একেবারে আমার নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম। ব্যাপারটা কি স্থিরভাবে ভালো ক'রে দেখা দরকার।

প্রায় একঘণ্টা চিন্তার পর স্থির করলুম, আমি হয়তো স্বপ্ন দেখেছি, কিম্বা মাথাটা হঠাৎ খারাপ হ'য়ে গিছ্‌লো—ঐ পোড়োবাড়ীর বদ্ধ ঘরে ঢুকে। এ ছাড়া আর কি হ'তে পারে? এই সিদ্ধান্তের পর আমি উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়লো আলনায় টাঙানো আমার কোটের ওপরে। লম্বা লম্বা কালো চুল কোটের বোতামগুলোয় জড়িয়ে র'য়েছে। তাও একটা দুটো নয়,—অনেক।

কম্পিতহস্তে একটার পর একটা খুলে জানলার বাইরে ফেলে দিলুম।

তারপর আমার চাপরাশীকে ডাকলুম। সেদিন মনটা এত বিক্ষিপ্ত হ'য়েছিল যে বন্ধুর কাছে আর নিজে যেতে পারলুম না। তা'ছাড়া, তাকে কি বলবো ও কতটা বলবো সেটা ভাল ক'রে না বুঝে যাবার ইচ্ছা ছিল না। চাপরাশীর হাতে বন্ধুকে তার কাগজপত্র পাঠিয়ে দিলুম। কিছু পরে চাপরাশী ফিরে এলো ও বন্ধুর সহস্তে লেখা রসিদ আমাকে দিলে। তাকে প্রশ্ন ক'রে জানলুম যে, আমার বন্ধু আমি কেমন আছি সেকথা উদ্বিগ্নভাবে বারবার জিজ্ঞাসা করেছে। চাপরাশী উত্তরে বলেছে যে আমার শরীর ভালো নেই। রোদে ঘুরে মাথার যন্ত্রণা হ'য়েছে, এজন্য নিজে তার কাছে যেতে পারিনি। শুনলুম বন্ধু এ সংবাদে বিশেষ বিচলিত।

সত্যকথা বলবার জন্য তৈরী হ'য়ে পরদিন সকালেই তার বাংলোর গেলুম। সে আগের দিন রাত্রে কোথায় বেরিয়েছে, তখনো ফেরেনি। দ্বিপ্রহরে পুনরায় গিয়ে শুনলুম যে সে তখনো আসেনি। চারিদিকে খোঁজ করা হ'য়েছে, কিন্তু কেউ তাকে দেখেনি। একসপ্তাহ অপেক্ষা করলুম, কিন্তু সে আর ফিরলোনা দেখে পুলিশে খবর পাঠালুম। তারা তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান করলে, সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গাতেই। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তার পলায়ন বা তার বর্ত্তমান বাসস্থান সম্বন্ধে কোন খবরই বের করতে পারলে না।

তার প্রাসাদে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ করা হ'লো। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। কোন স্ত্রীলোক যে সে বাড়ীতে লুকিয়ে ছিলো, তারও প্রমাণাভাব। কাজেই কোন ফল না পেয়ে কিছুদিন পরে পুলিশ অনুসন্ধান বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হ'লো।

সে আজ সাতচল্লিশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু সেদিন যতটুকু জানা ছিল, আজ এই দীর্ঘকাল পরেও তার চেয়ে বেশী কিছুই জানতে পারা যায়নি। সমস্ত ব্যাপারটা চিরকাল অস্পষ্ট ও রহস্যাবৃত হয়েই রইলো। *

শ্রীঅমিয়া দত্ত

* Maupassant

ছেঁড়া জুতো

-গল্প-

—শ্রীযুক্ত অরবিন্দ দত্ত

যেদিন সারাটা সকাল চড়াই আর উৎরাইয়ের ধূলি-কাঁকর মাড়াইয়া, ছোট-বড় স্বচ্ছ জলের ঝরণা আর বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া অনিল যখন বাসায় ফিরিতেছিল, তখন তাহার জুতোজোড়ার মস্ত 'হাঁ'করা জায়গাটার মাঝখানে নিজের হাতের সূক্ষ্ম দড়ির যে একটা গ্রন্থি ছিল, হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল।

পথের ধারে কদমগাছের ঘনছায়ায় বসিয়া নাতিদীর্ঘ দুই সূতার দুটি মুখ এক করিয়া বন্ধন আঁটিতে জিভ্ বাহির হইয়া আসিতেছে। এমন সময় অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রমাপ্রসাদের কন্যা লতিকা এবং ইঞ্জিনিয়ার বিষ্ণুপদর মেয়ে রেবা হাওয়া খাইয়া ফিরিবার পথে ছেলেটির এই শিল্পচাতুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেইখানে থামিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

দাঁড়াইবার আর এক কারণ এই যে, ইহার লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ গৌরবর্ণের দেহখানা দেখিলে সে দেহে জরা আসিবে বলিয়া ধারণা হয় না। মুখখানা এবং দেহের ভঙ্গী—বাঙলাদেশের না হইলে যুবকটিকে কাবুল কিম্বা ঐরকম কোন সজীব দেশের বলিয়া মনে হওয়া কিছু বিচিত্র হইত না। তাই পথের লোকের পক্ষে ইহাকে চোখ বুজিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া যাওয়া কঠিন।

রেবার শ্লীলতাজ্ঞান ছিল কিছু কম। সাজপোষাকের ঘোর-ঘটার দিকে তাহার ঝোঁক বেশী। সেদিনও ইহার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। পায়ে হিলওয়ালা জুতো, পরনে আস্‌মানী রংয়ের সাড়ী, হাতে রিষ্টওয়াচ, চোখে চশমা,—এই সব। লতিকার বেশ অতি সাধারণ। সেমিজের উপর—একখানা লাল চওড়াপাড়ের সাড়ীমাত্র আর একটা সাধারণ জামা।

মুখ তুলিয়া চাহিতেই অনিল দেখিল রেবা-মেয়েটির হাসিতে বিদ্রূপের এক অপূর্ব্ব ভঙ্গী। মায়ের জাতি বলিয়া সসম্ভ্রমে মাথাটি সে আবার নীচু করিয়া লইল।

চোখে-চোখে মিলিতে রেবাও কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কতক্ষণ এখানে আছেন? আমাদের একটা চাকর—হাতে টিফিন-কেরিয়ার—এপথে যেতে দেখেছেন?"

অনিল মুখ তুলিয়া বলিল, "না। আমি অল্পক্ষণ এখানে আছি। আপনারা হাস্‌লেন কেন? আমার এই মেরামতের কাজ দেখে? এ এমন-কিছু না। ছেঁড়ার মাঝামাঝি জায়গাটায় সূতোর একটা বাঁধন দিয়ে আটকে রাখ্‌ছি। এইভাবে ত মাসদেড়েক চল্‌ল—আরও মাস-চারেক কাটবে বোধ হয়।"

স্বরে কোন উত্তেজনা ছিল না—যেন কতদিনের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ মানুষ। উভয় দিক্‌কার যে বয়স, তা'তে এরূপ নির্জ্জন পথে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা বলা লোকের চোখে যে বিসদৃশ ঠেকিতে পারে একথা মেয়েদের মনে উঠিতে অবকাশ পাইল না। রেবা হাসিয়া বলিল, "এভাবে দেড়মাস চালানোর পর আরও চারমাস জুতোজোড়ার সঙ্গে সম্পর্ক আপনি রাখ্‌তে চাইছেন?"

অনিল বলিল, "তার কারণ, ওদের আমি যত্নে রাখি—বিশ্রাম দি—সব সময় খাটিয়ে নি-নে। আর নেহাৎ ওরা না ছাড়্‌লে ত্যাগও করিনে—যেমন সাপে হঠাৎ খোলস ছাড়ে না। আজ একটু জঙ্গলের পথে ঘুরব ব'লে পায়ে দিয়েছিলুম, নইলে দরকার হ'ত না।"

অনিলের কথাবার্ত্তা খোলা এবং সোজা। যাহাদের দৃষ্টি তলায় না ভাসিয়া চলে—তাহাদেরও মনে একটা নেশার আমেজ আসে। রেবার পরিহাসপটু মন সেই আনন্দটুকুই গ্রহণ করিতেছিল। কিন্তু নববধূ যেমন রাত্রি-বাসরে প্রণয়ীর নিকট মুখের সবখানি ওড়্‌না খুলিয়া ফেলে, লতিকার অন্তরে ইহার সমস্তখানি প্রস্তুতির তেমনি একটা সুন্দর লীলা গোপনে চলিতেছিল।

রেবা বলিল, "জুতো-জোড়াটা মুচির হাতে ঘুরে এলে বোধ করি চারমাসের উপর আরও দু'মাস যেতো।"

অনিল বলিল, "একেবারেই না। কলকাতায় থাকতে একবার যাচাই করেছিলুম; যে সওদাদরের জুতো আমার—সে দামে একজোড়া নূতন হয়। তাও না হয় সাবালুম, মাসখানেক হাঁটাহাঁটির পর আবার সেই মুচিকের দলে। অকারণ পয়সা দিতে যাই কেন? এ একরকম পয়সাও বেঁচে গেল, কাজও চ'লে যাচ্ছে।"

রেবা বলিল, "বেশ হিসেবী লোক আপনি! পয়সার উপর আপনার খুবই ঝোঁক্।"

অনিল বলিল, "হবে।"

তাহার ভাসা চক্ষুদুটি হাসির দীপ্তিতে আরও অধিক ভাস্বর হইয়া উঠিল।

রেবা চশমাজোড়া পুঁছিয়া লইয়া পুনর্ব্বার চোখে পরিল। হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকেও একবার চাহিয়া দেখিল—প্রায় বারটা।

লতিকা মৃদুস্বরে সঙ্গিনীর গায়ে একটা টিপ্ দিয়া বলিল, "আর কতকাল দাঁড়িয়ে কাটাবে? চল।"

"হাঁ, চল যাই। আপনি বুঝি এখানে সবে এসেছেন? আর কোনদিন দেখিনি ত আপনাকে।"

অনিল বলিল, "দিন-পনর এসেছি।"

"দিন-পনর?" রেবা সচকিত হইয়া উঠিল। বলিল, "এখানকার পদ্ম-দীঘিতে যাননি আপনি? দীঘি কেন বলে জানিনে—একটু বাষ্পও ত্রিসীমানায় নেই। প্রকাণ্ড একটা মাঠ—সবুজ ঘাসে ঢাকা—গাছপালা লতাগুল্মে বেশীর ভাগ জায়গায় ছায়া বিছিয়ে রেখেছে। যেন মায়াপুরী! সকালে-বিকেলে এখানকার লোকে আর ঘরে থাকে না—সব সেইখানে যায়।"

অনিল হাসিয়া বলিল, "কেন, একের খাস অপরে গ্রহণ করতে? কলকাতাতে দেখি এই কাণ্ড; পার্কগুলোয় লোকে গিজ্ গিজ্ করে। এখানে এলেও সেই বদ অভ্যাস পরিত্যাগ নেই। আপনারাও বুঝি সেই মায়াপুরী

রেবা হাসিল। বলিল, "বেলা অনেকখানি হ'য়ে গেছে। আসি তবে এখন। নমস্কার!"

লতিকা এবার দুইহাতে একটা ক্ষুদ্র প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাদের প্রগলভতা মাপ করবেন।"

অনিল সকৌতুকে লতিকার দিকে দুই চক্ষু বিস্তৃত করিয়া ধরিল। নিতান্ত অশোভন ও অসামাজিক হইলেও ইহা যে চরিত্রের খুৎ নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার মত কিছুই মেয়েদুটির মনে উদিত হইল না।

অনিল দু'দিকে দুটি প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিল, "উভয়ের মার্জ্জনাটা আপনি একাই চাইছেন, অথচ আপনি একটি কথাও বলেন নি। তা হোক, আপনার কথা আর ওঁর মুখের কথা—একই কথা। আমি খুব সামান্য ব্যক্তি। আমার আগেই আপনারা সৌজন্য প্রকাশ ক'রে বসলেন। তাহ'লেই দেখুন, কে কাকে ক্ষমা করার যোগ্য।"

লতিকা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

রেবা মনে মনে একটু গরম হইয়া উঠিয়া বিশুষ্কমুখে বলিল, "জ্যেঠামশায় পথের দিকে চেয়ে রয়েছেন—শুনছ লতি?" বলিয়া অগ্রসর হইল।

লতিকা তাহার অনুসরণ করিল।

অনিল জুতাজোড়া পায়ে আঁটিয়া দূরে দূরে ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

রেবা একবার ফিরিয়া দেখিল, লোকটি পিছু পিছু আসিতেছে। সে পায়ের গতি কিছু মৃদু করিয়া দিল। অনিল কাছাকাছি আসিলে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাসা কোথায় জিজ্ঞাসা করা হয়নি। একলাই এসেছেন নাকি এখানে?"

"হাঁ, বাসা ঐ ডান হাতে। সামনে যে বড়ো বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে—ওরই পশ্চিম দিক্‌কার চালাটা। দু'টাকা ভাড়া—মাসে। বাড়ীটা হ'চ্ছে যদু কাপালির।"

বিকৃত হাসির মাত্রাটা বাড়াইয়া—অনেকক্ষণ স্থায়ী করিয়া রেবা ইহাকে বিদ্ধ করিতে করিতে চলিল। মুখে বিদ্রূপের নিকষ হাসি ফুটাইয়া রেবা বলিল, "আরও একটু

অনিল বলিল, "হয়ত যেত—কিন্তু দুরবস্থার একশেষ হ'ত। বন্ধুর সঙ্গে ট্রেনেই আলাপ। দেখলাম, মানুষটি ভাল—অসুবিধা হবে না।"

ততক্ষণে ইহারা বন্ধুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। রেবা বলিল, "আমাদের আরও একটু এগিয়ে যেতে হবে। এখন তবে আসি।"

এই বলিয়া তাহারা আরও একটি নমস্কার করিয়া গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইল। অনিলও কপালে হাত ঠেকাইয়া শিকল খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

রমাপ্রসাদের বাড়ী বড় রাস্তার উপর। হলদে রংয়ের—গোল বারাণ্ডাওয়ালা—দ্বিতল—বেশ ফিট্‌ফাট্‌। মাঝখানে কাঁকরের রাস্তা, বড় রাস্তার সীমানায় ফটকের ধারে আসিয়া মিশিয়াছে। দুইধারের বাগানে গোলাপ, রজনীগন্ধা, হাসনাহেনা দিবারাত্র বাতাসের সঙ্গে মাতলামি করে। ফটকের দু'পাশে দুটি রক্তকরবীর গাছ ফুলে-ফুলে ডাল-পাতা ঢাকিয়া—পথিকজনকে সম্ভাষণ জানায়। রমাপ্রসাদ ইহারই একটির তলায় দাঁড়াইয়া মেয়েদুটির জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রেবা ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হাসিমুখে বলিল, "আজ এক অদ্ভুত জীব দেখে এলাম জ্যেঠা-মশায়!"

প্রশান্ত দুইচক্ষুর দৃষ্টিতে স্নেহ বিস্ফুরিত করিয়া রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জীব দেখে এলে? এখানকার পাহাড়ের বুঝি কিছু?"

রেবা হাসিয়া বলিল, "না পাহাড়ের নয়,—সমতল-এর।"

এই বার কথায় হাসিল সে অনেক বেশী। পরে ছেঁড়া জুতা সেলাইয়ের ঘটনাটা সবিস্তারে বিবৃত করিয়া মন্তব্য [illegible] করিল, "এই নিরেট নির্ব্বোধ লোকটির যদি কখনও টাকা হয়, মৃত্যুর পরেও যখের ধন আগ্‌লে সে মোহজালে জড়িয়ে থাকবে।"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "এখানে যিনি আসেন, কাকেও ত ছেড়ে কথা বলিস্‌। একে ত সংসারটাই একটা পান্থনিবাস, তাতে এই স্বজনহীন স্থানে কেউ এসে কি ক'রে দূরে ছেড়ে থাকা যায়? যাব একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তা' বেলা ত অনেক হ'য়েছে। তুমি আর বাসায় যাবে কেন? দুটিবোনে একসঙ্গে থেকে য'স।"

রেবার এক খুড়তুতো বোন্‌ কলিকাতায় চলিয়া যাইবে বলিয়া থাকা হইল না। সে চলিয়া গেল।

লতিকা সমস্ত দিনটা অন্যমনস্কভাবে কাটাইল। বুকের মধ্যে কি যেন একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার চলিতেছে—ঠিক ধরা যায় না, আবছা অন্ধকারের মধ্যে মধুচক্রের মত শুধু যেন একটা অচিন্তিত সৌভাগ্য দেখা যায়। দিনের বেলা জানালায় জানালায় সে উঁকি-ঝুঁকি দিল; সন্ধ্যাকালে গামছা কাঁধে করিয়া গামছা খুঁজিল; শাঁখ বাজাইতে ঘণ্টাটি হাতে তুলিয়া ধরিল; গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া কাটাইল।

একদিন রমাপ্রসাদ কন্যাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। রেবা আসে নাই। ফিরিবার সময়—লতিকা আঙুল দিয়া দেখাইল, "বাবা! সে বাবুটি এই বাড়ীতে থাকেন।"

রামপ্রসাদ অপ্রতিভমুখে বলিলেন, "ওঃ! সেদিন রেবা যাঁর কথা বল্‌ছিলেন? মনের কি গতি হ'য়েছে দেখ! এমন ভুল কিন্তু আগের দিনে ছিল না। চল মা! একবার দেখে যাই তাঁকে।"

লতিকা বলিল, "এখন যাবে? বেলা যে অনেক হ'য়েছে?"

"তা' হোক। নূতন জায়গায় এসেছেন, কোন অসুবিধায় পড়্‌লেন কিনা—একবার জানা কর্ত্তব্য।"

বদ্রু তখন উঠানের একপার্শ্বের সীমানায় বেড়াটা তালি-তুলি দিয়া ঠিক করিতেছিল। রমাপ্রসাদকে দেখিয়া সে হাত ঝাড়িতে ঝাড়িতে একটা প্রণাম করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "একটি বাবু এসে নাকি তোমার এখানে আছেন। কোথায় তিনি?

বদ্রু বলিল, "আজ্ঞে, ঐ চালাটার ভিতর। রান্না করছেন বোধ করি।"

লতিকা সেইদিকে অগ্রসর হইয়া দালানের দরজার কাঁপখানার নিকট দাঁড়াইয়া দেখিল, উঠানের উপর

অনিলের ভাতের হাঁড়িটা টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে। একপার্শ্বে দড়ির একখানা চারপায়া খাট। অনিল তাহারই উপর হেলিয়া পড়িয়া কি একখানা বই পড়িতেছে।

লতিকা গলাখাঁকার দিয়া শব্দ করিতে অনিল চাহিয়া দেখিয়া চম্‌কাইয়া গেল। কি করিবে না করিবে এইরূপ সমস্যার ভাব লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

লতিকার পরনে কালা চওড়াপাড়ের সাড়ী—স্কন্ধে একটা সোনার ব্রোচ দিয়া নীচের সেমিজের সঙ্গে আঁটা। হাতে দু'গাছা সোনার চুড়ি। পায়ে জুতা বা অন্যকিছু পরিচ্ছদপরিপাট্য ছিল না। অনিল বলিল, "ঠিক একই বেশ! সেদিন যে-রকম পরেছিলেন, আজও তাই। দু'দিনের দেখায় আপনার চলাফেরার একটা ধারা আমি পেলাম। আপনাকে আমার বেশ ভাল লাগ্‌চে!"

লতিকা লজ্জায় মুখ নীচু করিল। পাছে এই সরল মানুষটি সহজভাবে আরও কত কি বলিয়া বসে—ইহাকে সর্ব্বতোভাবে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলিল, "বাবা এসেছেন আমার সঙ্গে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

তালের পাতার ঝাঁপখানা দরজার অর্দ্ধেক পথ আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পাশের দিকে ঠেলিয়া দিয়া অনিল বাহির হইয়া আসিল। বৃদ্ধটির হাসি দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল, ইঁহার কাছে পাইবার এমন অনেক অমূল্য বস্তু আছে, যাহা বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। সে একটা নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার দড়ির খাটখানা হিড়্‌হিড়্‌ করিয়া বাঁশের চৌকাঠের আঘাত সাম্‌লাইয়া বাহিরে টানিয়া আনিল। বলিল, "গরীবের আস্তানায় এলেন আপনারা? এই তুচ্ছ আসনখানা বিছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু উপায় আমার নেই। যদুর কাছে—সেদিন এখানকার একজন মহাপুরুষের কথা শুনছিলুম। বোধ করি সে আপনিই হবেন। দীনবন্ধু ছাড়া দীনের ঘরে আর কে যায় বলুন?"

এই বলিয়া খাটের উপরকার কম্বলখানা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া সে বিছাইয়া দিল। বলিল, "বসুন। ব'সে থাকবেন। আসুন, আপনার ঘর-সংসারটা আগে দেখি।" বলিয়া সেই অপরিসর দ্বারের ফাঁকে ভিতরে উঁকি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রান্না বুঝি নিজেই করেন?"

অনিল হাসিতে হাসিতে বলিল, "খাই নিজে, সুতরাং রাঁধি নিজেই। প্রথমদিনের ভাত চিবুতে দাঁতের পরিশ্রম একটু বেশী হ'য়েছিল। যদুর ঘরের মেয়েরা বল্‌লেন,—খেলে পেটের অসুখ করবে। তারপর—হাতা কেটে টিপ্‌তে শিখিয়ে দিলেন। এখন আর কতক মাংস কতক হাড়—হয় না। হাত বেশ পেকে এসেছে।"

কথাটা নিতান্ত সামান্যভাবে রমাপ্রসাদের অন্তরে তখনি-তখনি শেষ হইতে পারিল না। মনের গোপন কোঠায় ঘুরিয়া-ফিরিয়া আঘাত করিতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাত চড়িয়েছেন বুঝি? আর কি রাঁধবেন?"

অনিল বলিল, "ঐ এক—আর ঐ অদ্বিতীয়। দুটি আলু ওরই ভিতরে একযাত্রায় সিদ্ধ হ'চ্ছে। দুধ আছে—ঘি-ও আছে একটু—আর চাই কি!" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাছ্‌-টাছ্‌ খান্‌না বুঝি?"

"খাই। কোট রে—ভাজ রে—বিদেশ-জায়গা—বড় হাঙ্গামা।"

যদুর ছেলেটি এইসময় স্কুলের বেতনের জন্য—কাঁদা-কাটি করিতেছিল। অনিলের কানে গেল। ছেলেটিকে ডাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মাইনে কত?"

ছেলেটি বলিল, "আট আনা ক'রে মাইনে—ছ'মাসের তিন টাকা।"

অনিল জামার পকেট হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়া ছেলেটির হাতে দিল। জিজ্ঞাসা করিল, বই-টই আছে ত?"

"আর সব আছে। পাটীগণিত নেই।"

"আচ্ছা! স্কুল থেকে এসে কার তৈরি লিখে

ছেলেটি টাকাক'টি কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া পা তুলিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

লতিকার হৃৎপিণ্ডটাও উল্লাসে দুলিতেছিল। কিন্তু রেবা এই ঘটনার কথা জানিতে পারিল না, এই একটুখানি বেদনার খোঁচা সে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিল।

সে বলিল, "বাবা! এদিকে ভাত বুঝি হ'য়ে গেছে। পথে পথে বেড়িয়ে এলুম—কাপড়খানা ছাড়্‌তে পার্‌লে, আমিই না হয় নামিয়ে দিয়ে যেতুম।"

অনিল সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "রান্নার প্রথম অংশটা আপনাদের মত আমি বেমালুম আয়ত্ত ক'রে ফেলেছি। কাটকুটোগুলো ঠেসেঠুসে আলটা বেশ উস্‌কে দিতে পারি। শেষের বেলায় ফেন গাল্‌তে হাঁড়ি সরে—কি হাঁড়ি সাম্‌লাতে বেড়ি সরে—মুখের সে আতঙ্কের ভাবটি যদি দেখেন, আমার উপর আপনাদের আর শ্রদ্ধা থাক্‌বে না।"

রমাপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন, "মা! ফেনটা তা'হলে তুমি কি গেলে দেবে?"

"দিতুম ত! কাপড়খানা না ছাড়্‌লে কি ক'রে দিই?"

অনিল সুটকেশ খুলিয়া নরুণ পেড়ে একখানা ধোয়া ধুতি বাহির করিয়া খাটের একপার্শ্বে রাখিয়া দিল।

লতিকা কাপড়খানা বামহাতের মুঠায় লইয়া ঘরের পিছনের দিক্‌টায় চলিয়া গেল।

অনিলেরই কাপড় এখানা। পরিতে দেহে তড়িৎ খেলিতেছে। সমস্তক্ষণটা এইরকম তড়িৎ-সঞ্চার চলিলে ফেন গালা হইয়াছে আর কি! হাঁড়ি সরে কি বেড়ি সরে—এবার যে দুইজোড়া চোখে একযোগে দেখিবে। কম্পিতবক্ষে সেমিজশুদ্ধ ছাড়া কাপড়খানা নিকটের পুঁই-মাচার উপরে জড় করিয়া রাখিয়া, দেহের কাপড়খানা আঁট-সাট্‌ করিয়া লইয়া সে রান্নাঘরে ঢুকিল।

লতিকার হাত দুটি বেড়ির সঙ্গে সঙ্গে নড়িয়া-চড়িয়া উপরে উঠিতেছে—যেন পদ্মেরই দল মেলিতেছে। অনিল ইহার সুকুমার রূপ-রস দুই চোখে ভরিয়া লইতে লাগিল। ফেন গালা শেষ হইলে লতিকা হাঁড়িটায় একটা ঝাঁকানি দিল।

অনিল বলিল, "আমার আনাড়ি হাতে ফেনের সঙ্গে কিন্তু অর্দ্ধেকগুলো ভাত বের হ'য়ে আসত।"

রমাপ্রসাদ চক্ষুদুটি অর্দ্ধমুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "যার কাজ তারই সাজে ভাল।"

ভাত বাড়িয়া রাখিয়া কুয়ার জলে অনিলের কাপড়খানা কাচিয়া আনিয়া লতিকা রৌদ্রে শুকাইতে দিল। ঝাঁপখানায় ভর দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার হাতে একখানা বই দেখ্‌ছিলুম—কি বই?"

অনিল বলিল, "চৈতন্য ভাগবত।"

"শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের খবরটা কোনো বইতে ঠিক-মত পাইনে। একবার বইখানা পেলে প'ড়ে দেখ্‌তুম।"

অনিল খুশী হইয়া বইখানা তাহার হাতে দিল।

পথে রমাপ্রসাদ বলিলেন, "চমৎকার ছেলেটি! এরই মধ্যে—জীবনটি একটি বিশিষ্ট নিয়মের অধীন ক'রে ফেলেছে। রেবা সেদিন বলছিলেন,—ঘরের ধন আগ্‌লে প'ড়ে থাক্‌বে। ছেলেমানুষ কিনা—চোখ এখনও খোলেনি। চোখ খুললে দেখাটা কি অত শীঘ্র ফুরায়?

লতিকার পা দু'খানা বিহ্বল-আনন্দে কাঁপিতে লাগিল।

পরদিন পাহাড়ের কতকটা অংশ চক্কর দিয়া রমাপ্রসাদ যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, লতিকা বলিল, "আজ খুবই সকাল সকাল ফেরা হ'ল—না বাবা?"

রমাপ্রসাদ কহিলেন, "হাঁ। ওদিকে অনিলবাবুর আবার ফেন গালার সময় হ'য়ে এল। কাল থেকে মনে করছি,—ওঁর খাওয়ার ব্যবস্থাটা আমাদের ওখানেই করব। কি জানি কথাটা কি ভাবে নেবেন্‌?"

কতকগুলো চুল অসম্বদ্ধ কবরী এড়াইয়া কপালে আসিয়া পড়িতেছিল, সেগুলি কানের-পিঠের চুলের মধ্যে ঠাসিয়া দিয়া বিনুনীটা আঁট-সাঁট করিয়া কাঁটা গুঁজিতে গুঁজিতে লতিকা চিন্তিতমনে পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। রাঁধা-বাড়ার অনভ্যস্ত এই মানুষটির প্রতি পিতার মমত্বের পরিচয় আন্তরিক হইলেও সময়ের কি তাহার এতই অভাব যে, শুধু—ভাতের হাঁড়িটায় একবার স্পর্শ দিয়াই সে সরিয়া পড়িবে?

কাল ভাত বাড়িয়া দিয়াই সে যে বলিয়াছিল, "বাবা, এইবার চল আমরা যাই।" এ তীর নিজের বুকে নিজে ছুঁড়িয়া না মারিলে তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত রাখিয়া অনিলই বা কি করিয়া আসনের উপর যাইয়া বসিত? কিন্তু কত স্ফুট কামনাই যে অন্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা জানিবার কথা ত অপর কাহারও ছিল না।

সেদিনকার সেই কদমগাছটার কাছে আসিতেই লতিকা চম্‌কাইয়া গেল। যেন অনস্থভূত আনন্দের একখানা মহাকাব্য এই গাছতলাটিতে নির্জ্জনে রচিত হইয়া ইহার এক একটি শ্লোক প্রতি ফুলে ও পাতায় মৃদু হাওয়ায় দোলা খাইতেছে। পিতা সঙ্গে না থাকিলে হয়ত ইহার গুঁড়িটায় হেলান দিয়া বসিয়া নীচেকার বাতাসের সজীবতাটুকু অনেকক্ষণ ধরিয়া সে চক্ষে লাগাইয়া লইত।

পিতা চলিতেছেন—দাঁড়ানও যায় না, বলাও যায় না,—তুমি একটু পা থামাও বাবা!—এই সিদ্ধপীঠটার একবার মাথা নত করি।

যদু কাপালিকের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে বলিল, "সেখানে যেতেই যদি বল, একেবারে কাপড়-চোপড় ছেড়ে গেলেই ত ভাল হয়।"

এ কি এড়াইয়া চলিবার প্রয়াস?—রমাপ্রসাদ চাহিয়া দেখিলেন। লতিকাও দেখিল, পিতার মুখের সহজ গাম্ভীর্য্য বেশ ঘন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তাঁর যে প্রকৃতি, হয়ত ভাতের হাঁড়ি চাপাবার ঘড়ি-ঘণ্টাই নেই। এই ত বাসা—কি কর্চ্ছেন, চল, একবার খবর নিয়ে যাই।"

অঙ্গনে ঢুকিয়া দূর হইতে উভয়েই দেখিলেন, রান্নাঘরের ঝাঁপ বন্ধ। যদু আঙ্গিনায় বসিয়া কাঠ কাটিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ভোর বেলায় উঠিয়াই বাবুটি কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত দেখা নাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা চলিয়া আসিলেন।

হাঁড়ির সম্পর্কে এই একটুখানি কাছে আসিয়া দাঁড়াইবার সূত্র গড়িয়া উঠিয়েছিল;—আর কিনা ঘুমচোখে হাই তুলিতে তুলিতে তিনতুড়িতে বাহির হইয়া গেলেন?

বিকালে বাড়ীর সম্মুখের ফুলবাগানটি পিতাপুত্রী তদারক করিয়া বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় অনিলকে রাস্তার ধূলি লাগাইয়া দ্রুতপদে চলিতে দেখিয়া লতিকা সোৎসাহে বলিল, "বাবা! ঐ যে—"

রমাপ্রসাদ দ্রুতপদে ফটকের ধারে আসিয়া ডাকিলেন, "অনিলবাবু!"

অনিল কাছে আসিয়া রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "এইটেই কি আপনাদের আশ্রম?"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "হুঁ। এই কুটীরেই আমরা বাস করি।"

"বাঃ! বেশ মনোরম ক'রে সাজিয়েছেন ত?"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "চুলগুলো উস্কখুস্ক দেখ্‌ছি। খাওয়া দাওয়া—

"এইবার সেই চেষ্টায় চলেছি।"

রমাপ্রসাদ সস্নেহে ইহার হাতদু'খানা চাপিয়া ধরিয়া গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লতিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা! তুমি যাও। দুটি গরম গরম ভাত এঁকে দিতে হবে।"

লতিকার অন্তরে আবার একটা উল্লাস জাগিয়া উঠিল।

বাহিরের ঘরে আসিয়া উঠিতেই সকলে দেখিলেন, যে লোহার সিন্দুকটা কলিকাতা হইতে আসিয়া পড়িয়াছে, নীচে বাঁশ লাগাইয়া সেটাকে একটা চৌকির উপর তুলিতে চারিটি মজুর হিম্‌সিম্ খাইয়া যাইতেছে। রমাপ্রসাদ বলিলেন, "এখন থাক্ না। কাল আর জনচারেক লোক ধ'রে তুলে নিও।"

বাঁশের যে দিক্‌টা মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িতেছিল না, অনিল ঝটিতে যাইয়া সেইদিক্‌টা চাড়া করিয়া তুলিল। রমাপ্রসাদ ব্যস্তভাবে আগাইয়া যাইয়া তাহার বাহু চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "থাক্—থাক্ অনিলবাবু! আপনি—একি—"

ততক্ষণে সিন্দুকটা চৌকির উপর উঠিয়া গিয়াছে। সেখাও ঠিক সেই সময় দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বসিয়া পড়িল। রমাপ্রসাদের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি লজ্জা পাবেন না। শক্তি চেপে রাখা একটা সাজা।"

বিকৃত মুখভঙ্গীতে রেবার মুখখানায় হাসি উছলাইয়া পড়িতেছিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "এঁর কাজটা কাল অবধি প'ড়ে থাক্‌লে অপরের চোখে হয়ত আমার মান বেঁচে যেত। কিন্তু আমি মনে করতুম, জেগে লুকিয়ে থাকলাম। এ রকম জেগে ঘুমোনোর ক্ষতি কি একটু?"

রেবা হাসিয়া বলিল, "সকল কাজেই কি জেগে কাটান্‌ নাকি? আমার ত মনে হয় আপনার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলোর সঙ্গে কাজকর্ম্মের একটা মিল আছে। মাথায় কি চিরুণী দেন না?"

অনিল হাসিয়া বলিল, "দিই। অনেকে বলেন খাওয়া-দাওয়ার পর শক্ত চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ালে চোখের দৃষ্টি বাড়ে—তাই দিনে ঐ দুটিবার মাত্র। তা' ছাড়া চল্‌তে ফির্‌তে বেরুতে দি-নে। যখন নেহাৎ চুলগুলো কপালের উপর এসে পড়ে, মাথাটায় একটা ঝাঁকানি দি—তাই যেটা যেখানে এসে দাঁড়ায়।"

রেবার দিকে একবার ভ্রূ-কুঁচ্‌কাইয়া চাহিয়া অতিথি-চর্য্যার জন্য লতিকা ভিতরে প্রবেশ করিল। এই অপ্রীতিকর আলোচনা চাপা দিবার জন্য রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকালে একবার আপনার খোঁজ করেছিলুম। এত সময় কেটে গেল—বিশেষ কোন কাজে হয় ত—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া রেবা বলিয়া উঠিল, "ওঁর একটা বড় কাজ আছে জেঠামশায়! সে ওঁর জুতো মেরামত করা। আজ বোধ করি পালার দিন ছিল অনিলবাবু?"

অনিলের খাবার প্রস্তুত করিবার জন্য লতিকার পৃষ্ঠে ছুটি পড়িতেছিল। কিন্তু ইহাকে রেবার নিষ্ঠুর অপমানের তীব্র জ্বালার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া যাইতে সে দু'পা আগাইতেছিল—দু'পা পিছাইতেছিল। অবশেষে দ্বারের আড়ালেই দাঁড়াইয়া রহিল। রেবার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে অনিল হাসিয়া বলিল, "[illegible] সেদিন একরকম পেয়েছেন। কিছু বল্‌তে বাকী ছিল ব'লেই কথাটা আবার উঠে পড়ল। জুতোর সম্পর্কে যে কথা—আমার সকল খরচপত্রের সম্পর্কেও সেই কথা—এই আপনাদের ধারণা। ধারণাটা ঠিকই। আমি যা খরচ করি, আমার বাবারই টাকা। নিজের উপায় কিছুই নেই। তাঁর মতলব জানি, বুঝে-সুঝে সেই পথেই খরচ করি। আরো একটা টাকার মেশাল ঐ সঙ্গে আছে। সে কিঞ্চিৎ বিষয়সম্পত্তির টাকা। বিষয়টা বাবার অর্জ্জিত নয়—পূর্ব্বপুরুষের। তাঁদের ত মতলব জানিনা। অথচ টাকাটা খরচ করার স্বাধীনতা আমি পেয়েছি। এমন স্বাধীনতা যে ধুলোর মত উড়িয়ে দিতেও পারি। কিন্তু দৃষ্টিটা তাঁদের আমার খরচপত্রের দিকে প'ড়ে আছে। ধমকানি নেই—এমন দৃষ্টি। বুঝুন, সে টাকা আমাকে কি ভাবে খরচ করতে হয়।"

মেয়েটির ধৃষ্টতায় জন্য রমাপ্রসাদ উত্তিক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নিজেই উঠিয়া গিয়া গন্ধতেলের শিশিটা বাহির করিয়া আনিয়া দিলেন। বলিলেন, "এসকল কথা এখন থাক্। বেলা ত নেই; আপনি স্নানটা ক'রে ফেলুন।"

খাওয়া-দাওয়ার পর অনিল আর অপেক্ষা করিল না। কাজ ছিল, চলিয়া গেল।

যাইবার সময় রমাপ্রসাদ বলিলেন, "কাল দুপুরে এখানে দুটি না খেলে এ অ-বেলায় খাওয়ার দুঃখটা কিন্তু লতিকার কাটবে না। রেবা, মা, তুমিও সকাল সকাল এসে বোনের সঙ্গে ঘরকন্নায় সাহায্য কর—এই আমি চাইছি।"

পিতার কথায় লতিকা প্রথমটা বতখানি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, রেবার আমন্ত্রণে ততখানি মুসড়িয়া গেল। রেবাকে সে পরিহার করিয়া চলিতে চাহিতেছিল।

পরদিন অনিল সকাল সকাল স্নান সারিয়া হাজির হইল। আসিয়া দেখিল, রেবা বসিয়া জেঠামহাশয়ের সঙ্গে গল্প করিতেছে।

ঠাকুরের সঙ্গে যোগ দিয়া লতিকা নিজের হাতেই অনেকগুলি রান্না শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন অনিলের সাড়া পাইয়া বাকিটা ঠাকুরের হাতে ছাড়িয়া দিয়া সে বাহিরের ঘরে আসিল। তাহার ভয়ের সামগ্রী ছিল রেবা। না জানি তাহার অগোচরে কি শক্তিশেল সে ছাড়ে!

গল্প বেশ সতেজে চলিতেছিল। ইতিমধ্যে ফুলবাগানের ময়দানে বাঁধা একটা গরুর উপর নজর পড়ায় অনিলের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। অবশেষে একসময়ে হঠাৎ উঠিয়া গিয়া গরুর দড়িটা খুলিয়া তাহাকে ফটকের বাহির করিয়া দিয়া যেন স্বস্তি পাইল।

রেবা বলিয়া উঠিল, "অনিলবাবু গরুটা ছেড়ে দিলেন যে! সেই নূতন গরুটা না জ্যেঠামশায়?"

রমাপ্রসাদ ইহার অদ্ভুত আচরণে কিছু আশ্চর্য্য কিছু বিরত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাইত! ছেড়ে দিলেন! পরের বাঁধা গরু—"

রেবা হাসিয়া বলিল, "মাথায় ছিট্ আছে।"

অনিল ঘরে আসিয়া ঢুকিতেই অনেক দিক্কার সংযুক্ত ক্রোধ একা তাহারই ঘাড়ে ঝাড়িয়া দিয়া লতিকা বলিয়া উঠিল, "গরুটা ছেড়ে দিলেন? নূতন গরু পাহাড়ে গিয়ে উঠ্‌লে আর কি পাওয়া যাবে? পোষ মানেনি যে সেই টানে ফিরে আস্‌বে।"

অনিল মৃদু হাসিয়া বলিল, "ফিরে না আসাইত' ভাল।" লতিকা একবার পিতার দিকে একবার রেবার দিকে তাকাইয়া লজ্জায় মাথা নীচু করিল।

অনিল বলিল, "গরুটার জাব কাটার লক্ষণ দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছিলুম, ওর যক্ষ্মা হ'য়েছে। ওর দুধ খেলে উপকার যা হবে অপকার তার অনেক বেশি। সুতরাং ওর দড়ি খুলে দিয়ে বিশেষ কিছু অন্যায় করা হয়নি।"

সকলের চিন্তাটা আবার একটা স্থির পথ ধরিল। রমাপ্রসাদ বলিলেন, "আপনি কি গরুর চিকিৎসা জানেন?"

"হ্যাঁ। বাবার সঙ্গে পাটনায় থাক্‌তে একজন

"কিন্তু আমার আশ্রয়ে ও আছে, চিকিৎসা না করিয়ে ছেড়ে দেওয়া কি ভাল হ'ল?"

অনিল বলিল, "গরুদের যে ক'টি যক্ষ্মার রোগী চোখে পড়েছে বিশেষ তদ্বিরেও কোনটা বাঁচেনি। তার চেয়ে প্রকৃতির কোলে ছেড়ে দিলুম—হয়ত বেঁচে যাবে।"

কিছুক্ষণ কেহ আর কোন কথা বলিলেন না। অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "গরুটা কত দিয়ে কিনেছিলেন আপনি?"

"তা' বেশ সস্তায়—পঁয়ত্রিশ টাকায়। দুধ কিন্তু পাঁচ-সাত সের দিত।"

অনিল মনিব্যাগটি খুলিয়া নোটক'খানা বাহির করিয়া দেখিল, ত্রিশটি টাকা মাত্র আছে। বলিল, "পঁয়ত্রিশটে টাকা ত নেই। ত্রিশ আছে—ত্রিশই নিন্ আমার সিদ্ধান্তের প্রমাণ যখন হাতে হাতে দিতে পারছিনে তখন ক্ষতিটা উপস্থিত আমারই সহ্য করা উচিত।"

রেবা সবিস্ময়ে দেখিল এ লোকটা খরচ করিতেও জানে। রমাপ্রসাদ একটু হাসিলেন। বলিলেন, "ব্যাগ-ত শেষ ক'রে দিলেন। বিদেশে কাল আপনি খাবেন কি?"

অনিল হাসিয়া বলিল, "চার-পাঁচদিনের মত চাল আর আলু আছে। বাবাকে লিখ্‌লে এর মধ্যে টাকা এসে পড়্‌বে।"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "আচ্ছা ওটাকা এখন আপনার ব্যাগেই থাক্। আপনি এক বিষম বিপদ থেকে বাঁচালেন। তার মূল্যও ত দিতে হবে আমাকে। লতি-মায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এর পরে না হয় ঋণ-শোধের ব্যবস্থা করব।"

অনিল নোটক'খানা ব্যাগে পুরিতে পুরিতে কহিল, "কর্ত্তব্যসাধনের কোনো ফি-নেই রমাপ্রসাদ-বাবু, না করলে অপরাধ আছে।"

খাওয়া-দাওয়ার পর অনিলের প্রতি একটু অতিরিক্ত সৌজন্য প্রকাশ করিবার হেতু তাহাকে সঙ্গে লইয়া—রমাপ্রসাদ উপরে গেলেন। এবং ঘরগুলির প্রত্যেক

দিন-দুই পরে রেবা ও লতিকার সঙ্গে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় রেবা হঠাৎ থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বলিল, "দেখেছেন জ্যেঠামশায়? অনিলবাবুর কাণ্ড! এবার বুঝি রাখাল-বেশ!"

রমাপ্রসাদ ব্যস্তভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "কৈ —কোথায়?"

"ঐ যে! দেখতে পাচ্ছেন না? হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলে নাতাড়-ঘাড়ে গরু ঠেঙিয়ে বেড়াচ্ছেন।"

এ-রকমের একটা কৌতুকাবহ দৃশ্য দেখিবার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। রেবা বোধ করি লম্বা-চওড়া চেহারা আর কাহাকেও দেখিতে ভুল করিতেছে! রমাপ্রসাদ চশমাজোড়া কাপড়ে মুছিয়া নাকে পরিলেন, দেখিলেন অনিলই বটে। আরও দেখিলেন, পাহাড়ের নীচে সুবৃহৎ এক ধান্যক্ষেত্রের চারিধারে কাঁটার বেড়া। বেড়ার এক জায়গায় আলগা হইয়া পড়ায় পালে পালে গরু ঢুকিয়া পড়িয়া শীষগুলি লুটিয়া খাইতেছে আর অনিল ছুটাছুটি করিয়া ঘর্ম্মাক্তদেহে গরু তাড়াইয়া বেড়াইতেছে। রমাপ্রসাদ বলিলেন, "এঁদের তা'হ'লে এখানে জমিজমা আছে।" আরও একটু অগ্রসর হইয়া তিনি ডাক দিলেন, "অনিলবাবু!"

অনিল চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিল। তাড়াতাড়ি খুঁটগুলি খুলিয়া কাপড়খানা পায়ের দিকে ছড়াইয়া দিল। বলিল, আপনারা দাঁড়ান একটু। তাড়িয়ে শেষ করেছি। শুধু এইদুটো গরু ঘুরে-ফিরে বড্ড জ্বালাতন করছে।

গরুদুটিকে তাড়াইয়া দিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে ইঁহারা দেখিলেন, ধানের শীষে পায়ের স্থানে স্থানে ছড়িয়া গিয়া রক্ত ঝরিতেছে। রমাপ্রসাদ বলিলেন, "আহা! এ হ'য়েছে কি? আপনাদেরই জমি বুঝি?"

"জমির মালিকের ঠিকানা পেলে ত বেঁচে যেতুম। এত বড় একটা ফসল—কত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় এর উপরে। এ ক্ষতি চোখে দেখে যাই বা কি ক'রে?"

"এ দিকে বেলা যে মাথার উপরে। খাওয়া দাওয়া আছে ত?"

অনিল হাসিয়া বলিল, "একজনের একবেলার অন্নে মন দিতে গেলে একটা সংসারের সারাবছরের অন্ন মারা যেত।"

রেবা বলিল, "তা' আপনি ভদ্রলোকের ছেলে—আর কতটা কি করবেন? যাদের ফসল তাদের ত মন নেই।"

অনিল বলিল, "মন আছে দৃষ্টি নেই। যন্ত্রপাতি পেলে কাঁটাকুটি কেটে না হয় জায়গাটা মেরামত ক'রে দিয়ে যেতুম। নিকটে লোকালয়ও দেখিনে। দেখি, পথ-চলতি লোক যদি পাই—খোঁজ পাই, একটা খবর তাদের দিয়ে পাঠাব।"

রেবা হাসিয়া বলিল, "মেরামতের কাজে আপনি বেশ পটু, তা জানা আছে। কিন্তু অস্ত্রপাতি যদি না পান, আর খবর পাঠাতে না পারেন?"

"সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আগলে ব'সে থাকতে হবে। সন্ধ্যার সময় গরুগুলো অবিশ্যি বাড়ী ফিরবে; সেই সময় লোকালয়ে গিয়ে একবার সন্ধান নেব।"

এই সময় দূরের পাহাড়ের একটা বাড়ী হইতে ডাক-পিওন চিঠি বিলি করিয়া ফিরিতেছিল। অনিলকে দেখিয়া বলিল, "বাবু, তার আছে।"

জরুরি চিঠিপত্র আসিবার সম্ভাবনা অনিলের সর্ব্বদাই থাকিত। সে যখন যেখানে যাইত সেগুলি সময়ে বিলি হইবার জন্য ডাকঘরে কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া আসিত।

তার পড়িয়া অনিল অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। তারপর সেখানা রমাপ্রসাদকে পড়িতে দিল। তাহার এক বন্ধু লিখিয়াছে পূর্ব্ববঙ্গ বন্যায় ভাসিয়া অধিবাসীদের অনেকে অদৃশ্য হইয়াছে। বাকী সকলে জলের উপর ভাসিতেছে। ইহাদের সাহায্যার্থ তোমার পিতা প্রচুর অর্থ দিতে প্রস্তুত। তাঁর নিজের নড়িবার সামর্থ্য নাই। তুমি যদি সমর্থন কর—আর টাকাটা তোমার হাত দিয়া ব্যয় হয় তিনি দিবেন। তোমার ফটো যদি কাছে থাকে একখানা সঙ্গে এনো।

সুশীল

রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পিতা—"

"অতুলকৃষ্ণ ঘোষ।"

"বালীগঞ্জের ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তিনি যে একজন ক্রোরপতি।"

অনিল লজ্জায় জড়সড় হইয়া বলিল, "না—কিছু না। বারটায় একখানা এক্সপ্রেস্ আছে বুঝি ?"

"হ্যাঁ। সে ট্রেন ধরতে গেলে ত আর খাওয়া হয় না।"

"সেটা বেশী কিছু বড় জিনিষ নয়। চলুন, আর দেরী করা যায় না।"

রেবা বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "আপনার এ ধানের ক্ষেতের উপায় কি ?"

অনিল বলিল, "আমার চোখে যখন ক্ষেতখানা প্রথম পড়ল, তখন বুঝেছিলুম, এই অপচয় রক্ষার আমারই উপর ডাক পড়েছে। এখন যে আহ্বান এল, সে একটা বিরাট কাজের বড় আহ্বান। এখন এ ছেড়ে যেতে পারি।"

সে আর দাঁড়াইল না। নক্ষত্রবেগে ষ্টেশনের দিকে বাতাসের আগে আগে ছুটিয়া চলিল।

রমাপ্রসাদ স্তব্ধভাবে সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। কী যেন কী অপরাধের ব্যথায় রেবার চিত্ত ব্যথিত এবং অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদের আঘাতে লতিকার চিত্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় কিন্তু হঠাৎ অনিল আসিয়া ঘরে ঢুকিল। রমাপ্রসাদ ফরাসের উপর আলোর কাছে বসিয়া কয়েকখানা পত্রের জবাব লিখিতেছিলেন। তিনি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি যান্ নি ?"

"যাওয়া আর হয়নি। মাত্র তিনটি মিনিটের জন্ত ট্রেনখানা যেতে যেতেই ছেড়ে দিলে। এখন পরের ছাড়া উপায় নেই। লতিকা কোথায় ? ভাগবতখানার ভিতর একটা কাগজের মোড়ক ছিল। একটু দরকার আছে।"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "লতি উপরে আছে। বোধহয় লক্ষ্মীর পূজা করছে। আপনি যান্ না—প্রসাদটাও পেয়ে আসবেন।"

সুনীল ফটো লইয়া যাইতে বলিয়াছে হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায় সুটকেশটা আতিপাতি করিয়া ঘাঁটিয়া না পাইয়া ভাগবতখানার ভিতরে থাকিতে পারে এই সন্দেহবশে সে লতিকার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে। লতিকাকে চমকিত করিবার এবং পুনর্ব্বার বিদায়ের ব্যথা-পুলক জাগাইয়া তুলিবার একটু গোপন লিপ্সাও ছিল।

সেদিন লক্ষ্মীবার; লতিকা লক্ষ্মীর পূজা শেষ করিয়া ঘরের এককোণে স্থাপিত অনিলের ফটোটার গলদেশে ফুলের একছড়া তাজা মালা দোলাইয়া দিয়া ধ্যানমগ্ন ছিল।

দ্বারদেশে আসিয়া উঁকি মারিয়া দাঁড়াইতে সমস্ত ব্যাপারটাই একসঙ্গে অনিলের চোখে পড়িল। দেখিল বন্ধু যাহা চাহিয়াছে সেই ফটোর সঙ্গে এই ব্রতচারিণীর চিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল ঐক্যে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। সে চকিত হইল। বর্ব্বরহস্তে ইহাকে পৃথক করিতে হইবে ভাবিয়া দুঃখিত হইল। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া লতিকার মাথাটি ক্রোড়ের দিকে টানিয়া লইয়া বলিল, "একি কাণ্ড করছ লতিকা! রেবা দেখ্‌তে পেলে যে তোমার ফাঁসির হুকুম হবে!"

অপ্রত্যাশিত আনন্দে, বেদনায়, লজ্জায় লতিকা অনিলের বক্ষে মুখ লুকাইল।

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

ভাঙিল ঘুম মৃদুল বাতে,
শিশির-ঝরা শারদ প্রাতে।
শিথিল কার অলক খুলি'
লুটায় ভুঁয়ে শেফালিগুলি ;—
তন্দ্রাতুর গন্ধ তারি
আনিল জল নয়নপাতে।
হৃদয় বলে তাহারে জানি,
মর্ম্মমাঝে নীরবে বাজে
সুদূর তার বিরহখানি ;
আবেশ-লাগা আঁখির আগে
চকিতে তার ছবি যে জাগে,
জীবন মম তাহারি লাগি'
বেদনা ফুলে মালাটি গাঁথে ॥

কথা—শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত
সুরসাগর

জৌনপুরী—দাদ্‌রা

	+				২				+				২			
II	পা	-া	-দমা	।	পা	-র্পর্সর্সা	ণদা	I	পা	-া	-া	।	-া	-সা	-া	I
	ভা	•	••		ঙি	••ল•			ঘু	•	•		•	ম্	•	
I	রা	মা	মা	।	পদা	-মপদা	-মপা	I	মজ্ঞা	-া	স-রা	।	ণ-সা	-া	-া	I
	মৃ	দু	•		বা•	•••	••		তে	•	••		••	•	•	
I	রা	-মা	-া	।	পদা	-র্সর্সা	ণদা	I	পা	-া	-া	।	-া	-া	-া	I
	ভা	•	•		ঙি	••	ল•		ঘু	•	•		•	ম্	•	

I { সা ণজ্ঞা জ্ঞা | রমা -জ্ঞরা -সরা I ণ্সা -রমা -জ্ঞরা | ণ্সা -া -া I
শি শি র স্ব • • • • • • • • • • • স্না • •

I রা মা মা | পা -া -দমা I পা -র্সা -া | -র্সর্রা -র্সর্রা -র্মজ্ঞা I
শা র দ প্রা • • • তে • • • • • • • •

I র্রা -র্সা র্সণা | দপা -া -া II
ভি ন • •

\+ ২ +
II { মা পা পা | ণদা -া -ণা I ণা ণর্সা র্সা | -া -া -া I
শি খি ল কা • য় অ ল • ক • •

I ণর্সা -পণা -র্সর্রা | -র্মজ্ঞা -র্রসা -ণদা I -ণা -া -র্সা | র্সা -া -া I
• • • • • • • • • • লি •

I র্সা র্সা -র্রা | র্সর্রা -র্মজ্ঞা র্রর্সা I র্সা ণা -া | র্রর্সা -ণা র্সা I
লু টা য় ভূঁ • • • য়ে • শে ফা • লি গু

I ণদা -ণদা -পা | -া -া -া } I পা -দা পদণা | দা পা -া I
লি • • • • • • • ত ন্ ত্রা • • তু র •

I মপদা -মপা মা | মরা -মা পা I পা -ণা র্সণা | দা পা -া I
গ • • • ন্ ধ ভা • রি ত ন্ ত্রা • তু র •

I মপদা -মপা মা | মরা -মা পা I সা রা মা | পা -া -দমা I
গ • • • ন্ ধ ভা • রি আ লি ন অল্ • • •

I পা পর্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্রর্সা -া -া I ণর্রা -র্সণা -দপা | -মজ্ঞা -রসা -ণ্সা I
ম য় ন পা • • • তে • • • • • • • • • • •

I -রমা -পদা -মপা | ণর্সা -া -া I ণদা -ণা দা | পা -া -া II

II { জ্ঞা রমা -জ্ঞরা । -জ্ঞা রা সা I রা মা -া । পা -দা মপা I
স্ব দূ • • • • ব লে তা হা • রে • আ • •

I মপা -া -া । -া -া -া I (পা -দা পদণা । দা পা -া I
নি • • • • • ম র্ ম • • মা ঝে •

I মা মপদা মপা । মজ্ঞা -রা সা I সা সজ্ঞা জ্ঞর্রা । র্সা -া র্সা I
নী র • • বে বা • জে সু দূ • র • তা • র

I ণা ণর্সর্রা ণর্সা । ণদা -া পা) } I { মা পা পা । ণদা -া দণা I
বি র • • হ গা • নি আ বে শ লা • গা •

I ণা ণর্সা র্সা । -া -া -া I ণা -পণা -র্সর্রা । -র্সজ্ঞা -র্রসা -ণদা I
আঁ খি র • • • আ • • • • • • • • • • •

I -ণা -া -র্সা । র্সা -া -া I র্সা সর্রা র্রা । র্সর্রা -র্সজ্ঞা -র্রসা I
• • • গে • • চ কি তে তা • • • র্

I র্সা ণা -া । র্রসা -ণা র্সা I ণদা -ণদা -পা • । -া -া -া } I
ছ বি • যে • • আ গে • • • • • • •

I পদা পদণা ণা । দা পা -া I পদা মপদা মপা । মরা -মা পা I
জী • ব • • ণ ম ম • তা • হা • • রি • লা • গি

I পণা ণা র্সণা । দা পা -া I পদা মপদা মপা । মরা -মা পা I
জী • ব ণ • ম ম • তা • হা • • রি • লা • • গি

I সা রা মা । পা -দা মা । পা পজ্ঞা জ্ঞা । র্সা -া -া I
যে হ না দু • লে মা লা টি গাঁ • • •

I পর্ঝা -র্সণা -দপা । -রসা- ণ্‌সা I I -রমা -পদা -মপা । -পর্সা -া -া I
থে

পদা -ণা দা । পা -া -া } II II
ভি

জৌনপুরী রাগ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ :—

"কোমল গ ম ধ নি তীখ রিখব চঢ়ত গন্ধার ন
ধগ বাদী সংবাদীতে জৌনপুরী কহি সোঈ॥"

—রাগচন্দ্রিকাসার—

যে রাগে কোমল গ, ম, ধ, ন ও তীব্র রিখব ব্যবহৃত হয়, আরোহণে গান্ধার বর্জ্জিত হয় এবং যে রাগের বাদী ধৈবত ও সংবাদী গান্ধার, তাকে জৌনপুরী বলে।

জৌনপুরী, আসাবরী ঠাট (কোমল গ ম ধ ন) হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছে। এর জাতি ষাড়ব-সম্পূর্ণ। গাইবার সময় দিবসের দ্বিতীয় প্রহর (বেলা প্রায় ৯টা থেকে মধ্যাহ্নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত)। তীব্র রিখব সংযুক্ত আসাবরীর সহিত জৌনপুরীর অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে; বিভিন্নতা শুধু হ'চ্ছে যে, পূর্ব্বোক্ত রাগে আরোহণে ন বর্জ্জিত। অন্য কথায় বলতে গেলে আসাবরীর জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ আর জৌনপুরীর ষাড়ব-সম্পূর্ণ।

আরোহাবরোহ স্বরূপ

স, র ম, প, দ, ণ র্স । র্স, ণ দ, প, ম জ্ঞ, র স ।

পকড় (যে বিশিষ্ট স্বরবিন্যাস দ্বারা রাগের পরিচয় পরিস্ফুট হয়)

ম প, ণ দ, প, দ, ম প জ্ঞ, র ম প।

শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

বিবিধ সংগ্রহ

অবতারবাদ—বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভ—তাঁহার অস্থি-বিভাগ

শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র

যুগে যুগে রূপ পরিগ্রহ করেন বিশ্ব-নিয়ন্তা। গীতাকারের উক্তি এই। আরও বলেন—উদ্দেশ্য বিশ্বের হিত, ধর্ম্ম-সংস্থাপন। প্রচলিত সংজ্ঞাও উহাই।

নব নব ভাব-ধারার জন্য লালায়িত মানুষ; নূতন নূতন প্রেরণার মুখাপেক্ষী। অশ্রুত অজ্ঞাত মন্ত্রের প্রচারে বিস্মিত

তথাগত

ও বিমোহিত হইয়া লোকে মহা-মানবে ঐশী শক্তির আরোপ করে—ফলে অবতারের আবির্ভাব প্রচারিত হয়। কিন্তু মূলকথা যাহা সেই অক্লান্ত সাধনার অন্বেষণ ও তাহার অনুসরণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিচিত্র কি? তখন হইতেই যে অবতারের নামে পূজা অর্চ্চনার সূত্রপাত, ক্রমশঃ অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ, পরিণামে পূর্ণ ব্রহ্মত্বের দাবি। এমনই করিয়া সৃষ্টির আদি হইতে এখনও পর্য্যন্ত বীর-পূজা বা অবতারবাদ বিঘোষিত।

তা' হউক। তন্মধ্যেই তৃপ্তি। অতৃপ্তি ও অশান্তির আগার এই সংসার। ঐ গুরুভার লাঘবের অপর পন্থার সন্ধান যদি তাহাদের না মিলে, অপূর্ব্ব জ্ঞান, অসাধারণ বুদ্ধি, অপ্রমেয় হৃদয়বত্তা এবং অলৌকিক কর্ম্ম-ধারার পরিচয় পাইয়া মহা-মানবকে ঈশ্বরজ্ঞানে যদি সাধারণে উপাসনা ও আরাধনা করে, দেশে বিদেশে দিকে দিকে তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রবল প্রচার করিয়া যদি অমল আনন্দ অনুভব করে, করিলই বা। যেটুকু শান্তি, যতটুকু স্বস্তি তাহাতে এবং মহা-মানবের বাণী হইতে লাভ করিতে পারে করুক। মহাজ্ঞানী কার্লাইলের মহদুক্তি সর্ব্বথা স্মরণীয়—"মহতের বাক্যে অপ্রত্যয় অপেক্ষা নীচতা বা ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় আর নাই।"

যে সকল বরণীয় অতি-মানবকে আমরা অবতার বলিয়া মান্য ও প্রচার করিয়া আসিতেছি তাঁহারা কেহই কিন্তু আপনাদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ইঙ্গিত করেন নাই। বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, বা মহম্মদ, কেহই নন। শুধুই বিনয়বশে বা অসত্যের প্রচারে অনাসক্তি হেতু যে করেন নাই তাহারও প্রমাণাভাব।

অন্তবৃত্তির সহিত, ষড়রিপুর সহিত বুদ্ধদেবের ন্যায় মহা-পুরুষকেও কি বিপুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, কত প্রলোভন জয় করিয়া, কত আত্ম-নিগ্রহ সহিয়া, ধ্যান ধারণা দ্বারা সমাধির অবস্থা লাভ করিয়া মনকে একাগ্রভাবে চরম

জ্ঞানের অভিমুখে পরিচালনা করিতে হইয়াছিল তিনি স্বয়ং তাঁহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন ; জন্ম-জন্মান্তর কত যোনি পরিভ্রমণ করিয়া, কত ভজন-সাধনের মধ্য দিয়া অবশেষে বুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন তাহারও সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছেন। যে অবস্থা জ্ঞানের প্রদীপ্ত অনল-শিখায় সমুজ্জ্বল—যতঃ ন নিবর্ত্তন্তে—সেই স্থানে উপনীত হইয়া পুরুষ-প্রবর যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ও জীবন-ধারার ক্রম-বিকাশের নির্দ্দেশ করেন আমরা তাহার আলোচনা ও গবেষণার অবকাশ পাই না—গৃহী বা সন্ন্যাসী তাঁহা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পথের সাধারণতঃ পথিক নহেন। সেই সাগরসলিলে জীবন-তরী বাহিত করিলে দুঃখের অবসান হইতে পারিত—এত বড় গরিষ্ঠ লাভ কঠোর সাধনা-সাপেক্ষ অবশ্যই। চাই দুর্গম পথ সম্মুখে রাখিয়া চলা। তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাজবর্ত্মের শোভায় আমরা অথচ আকৃষ্ট হই ; কায়া ভুলিয়া ছায়া অবলম্বনেই আমাদের অতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা—মূঢ় অবিবেকী আমরা !

মহা-পরিনির্ব্বাণ লাভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বোধিসত্ত্ব ভক্ত শিষ্য আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"ধর্ম্মকেই প্রদীপ জ্ঞানে ধর্ম্মেই সম্পূর্ণ আশ্রয় লও। স্বীয় অন্তরে অনুসন্ধান করিলে সেই আশ্রয় সহজেই পাইবে।"

অন্তিমকালের তাঁহার শেষ-বাণী—"বিদায়, ভিক্ষুগণ, বিদায়। তোমরা একান্ত মনে স্ব-স্ব মুক্তি সাধন কর।"

দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা এই। কালের আবর্ত্তে দেড় হাজার নগণ্য। এই স্বল্প কালেই অথচ মহাত্মার মহদুক্তি ব্যর্থ। মানুষ ব্যস্ত তাহার পালনে নয়—লঙ্ঘনে ! কোলাহল শুধু নাম লইয়া—মাহাত্ম্য প্রচারে।

বোধিসত্ত্বের ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রধান কেন্দ্র বারাণসী—সারনাথে ; পরিনির্ব্বাণ-লাভ কুশীনগরে—গোরক্ষপুরের সন্নিকটে। ঐ দুই বিশিষ্ট স্থলেও মৃত্তিকাপ্রোথিত কতকগুলি ভগ্নস্তূপ ব্যতীত বিরাট পুরুষের স্মারক পরিচয় দুর্লভ ! তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাধন-পদ্ধতি যথাযথ অনুসৃত হইলে জগৎ কখন সাধুহীন হইবে না—ইহা তাঁহার একটি প্রধান উক্তি ; তাঁহার শিষ্যবর্গ কর্ম্মক্ষেত্রে ইহার সমর্থক কি পরিচয় দানে অগ্রসর ! অর্হত্ত্ব লাভের ঐকান্তিক কামনাযুক্ত ভিক্ষুমণ্ডলীর জন্মভূমিতে—প্রধান কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার চিহ্ন লুপ্তপ্রায়। যদি কোথাও তাহা বিদ্যমান থাকে সে সুদূরে—সিংহলে, তিব্বতে, চীনে, জাপানে প্রভৃতিতে। ভক্ত ও অনুরক্তবৃন্দ এখনও ভক্তিশ্রদ্ধার অর্ঘ্যদানে কৃতার্থম্মন্য। তাঁহার শ্রীমুখের মহাবাণী—অর্হত্ত্ব-লাভের নিয়মাবলী আদৃত, কিঞ্চিৎ পঠিত, কার্য্যে পরিণত স্বল্পক্ষেত্রেই—দুঃখ বিমোচনের তাহাই অথচ ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া এখনও সমস্বরে স্বীকৃত ! 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'

বুদ্ধের চরণ বন্দনা

'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি'—এই সহজ নীতি মৌখিক উচ্চারণে অথবা পালনে বুদ্ধদেবের সকল জ্ঞানের ও আদেশের এখন চরম নিবৃত্তি ! মহানের পরিণতি অদ্ভুতে।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বাঞ্ছিতের গন্ধস্পর্শ অনুভূতির দিকে। গতাসু প্রিয়তমার মাথার কেশ সংরক্ষণে কত আগ্রহ ও মমত্ব ! ভক্তেরই বা না হইবে কেন ? দুর্ব্বলতা বলিতে চাও বল। মৃন্ময় পুত্তলিকা মুক্তিকা খুঁজিবে, বিচিত্র কি ?

তাই তথাগতের দেহাবশেষ লইয়া কতই না কাণ্ড !

ব্যাপিয়া তাহার জন্ত কি আকিঞ্চন! সেই ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত বুদ্ধদেব দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা ও প্রচার কার্য্য পরিচালনা করেন যখন তিনি বুঝিলেন যে তাহা সমাধা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিলেন যে, ধ্বংসশীল কুম্ভীপাকে শরীর আবদ্ধ রাখা আর নিষ্প্রয়োজন, তখন তনুত্যাগের অভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পর্য্যায়ক্রমে মৌদ্গল্যায়ন ও শারীপুত্রের নির্ব্বাণলাভের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার পরিনির্ব্বাণ-লাভেচ্ছা প্রবলতর হইয়া

কলোরেডো-প্রস্রবণ সম্মুখে দেবোদ্যানে অদ্ভুত স্তর-সংহতি

ঘটনাক্রমে এই সময়ে তিনি পাবা নগরীতে গমন করেন এবং চুন্দ নামক কর্ম্মকারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে বন্য পশুর মাংস ভোজনে অতিসার রোগাক্রান্ত হন। তখন কুশীনগরের (বর্ত্তমান কাশিয়া) অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কুকুত্থা নাম্নী নদীতে স্নান করেন এবং এক বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রাম করেন। পরে কুশীনগরের নিকটবর্ত্তী বিশাল শাল-বনে প্রবেশ করিলেন। প্রিয়তম প্রধান শিষ্য আনন্দ শালতলী পত্রের শয্যা রচনা করেন। তথাগত সেই পর্ণ-শয্যায় উত্তর শিয়রে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলেন এবং ধ্যানস্তিমিত লোচনে বহুক্ষণ সমাধিগ্রস্ত হইয়া রহিলেন।

নির্ব্বাণপ্রাপ্তি নিকটবর্ত্তী এই সংবাদ তড়িৎ বেগে চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। মল্লগণ সপরিবারে মহামানবের দর্শন লাভে আসিলেন, দেশ-দেশান্তর হইতে যে যেমন সংবাদ পাইল ছুটিয়া আসিল। তখন তথাগত নির্ব্বাণচিন্তায় বিভোর,—সর্ব্বাঙ্গে দিব্য জ্যোতি, বদন-মণ্ডলে অপূর্ব্ব দ্যুতি বারেক নয়নযুগল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বিদায়বাণী বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে সমাধিযোগে মহাপুরুষ মহাপরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। ভক্তবৃন্দের আকুল আর্ত্তনাদে গগন পবন প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

চন্দন-কাষ্ঠের চিতায় তাঁহার পর শব স্থাপিত হইল। 'ধাতুবংশ' নামক গ্রন্থে প্রকাশ, দেবতাদের শক্তিবলে তখন চিতায় অগ্নিসংযোগ হইল। চিতা কিন্তু জ্বলিল না। পরে প্রবীণ ভিক্ষু মহাকাশ্যপ দ্রুতগতি পৌঁছিলে এবং তিনবার চিতা প্রদক্ষিণান্তে পবিত্র শবকে প্রণাম করিলে চিতা ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল দাহকালে ধূম বা ভস্ম কিছুই কিন্তু পরিদৃষ্ট হইল না। আকাশ, পাতাল এবং পৃথিবী সকল দিক হইতেই জলধারা আসিয়া চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

বুদ্ধদেবের শেষ অভিপ্রায় অনুযায়ী তখন তাঁহার দেহের অংশ-বিশেষ দৃষ্টিগোচর হইল। সেইগুলি সংখ্যায় সাতটি। মণিমুক্তার ন্যায় বর্ণে এবং সুবর্ণের ঔজ্জ্বল্যে তাহা দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিল। ললাটের অস্থি, দুইখানি কণ্ঠাস্থি এবং চারিটি শৌবন-দন্ত এই সাতটিই বৌদ্ধদিগের নিকট "সপ্ত মহা-দেহাবশেষ" বলিয়া খ্যাত। দর্শকেরা কিছুক্ষণ ভয় ও বিস্ময়ের সহিত একদৃষ্টে উহা নিরীক্ষণ

করিতে লাগিল। পরে উহা হস্তগত করিবার জন্ত বিশাল জনতার মধ্যে 'কাড়াকাড়ি' পড়িয়া গেল। কুশী-নগরের অধিবাসীরা বলিল যে, তাহারাই তত্রত্য ভূমির অধিকারী, সুতরাং দেহাবশেষ তাহাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু যে প্রবল প্রতাপান্বিত বৌদ্ধ রাজন্তবর্গ নিকটস্থ ও দূরবর্ত্তী সাম্রাজ্য হইতে সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহারা ঐ দেশবাসীর দাবি গ্রাহ্য করিতে চাহিলেন না। মগধের সম্রাট অজাতশত্রু, কপিলবস্তুর শাক্যগণ, অলকল্পের বুলিগণ, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, রাম গ্রামের কোলিয়গণ এবং বৈথদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব দাবি পূর্ণ মাত্রায় বাহাল রাখিতে চাহিলেন। মল্লগণ অপর সকলেরই দাবি তুচ্ছ করিতে উদ্যত হইলেন। ক্রমশঃ সংগ্রাম সম্ভাবনা হইল।

অবশেষে তথাগতের 'শাস্তা' নাম এবং 'ক্ষান্তি' তাঁহার প্রধান ঐশ্বর্য্য এই দুই কথার সবিস্তার উল্লেখে ও ব্যাখ্যায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা ধার্য্য হইল যে, ব্রাহ্মণ দ্রোণকে আনাইয়া স্মরণ-চিহ্ন ন্যায্যরূপে বিভাগ করা হইবে। তাহাই হইল। সর্ব্বমান্ত পুরোহিত স্বভূ লইলেন কণ্ঠাস্থি—ইহা পরে মহাবানমে রক্ষিত হয়। ঋষি-ক্ষেম বাম দন্ত পাইলেন। অবশিষ্ট ভাগ অষ্ট তুল্যাংশে বিভক্ত করিয়া আটজন নৃপতিকে প্রদত্ত হইল। তন্মধ্যে কুশী নগরের ভূপতিও একজন। প্রত্যেকেই এক একটি স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেহাবশেষ তাহাতে সংরক্ষিত করিলেন। যে পাত্রে দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছিল দ্রোণ তাহা লন—কিম্বদন্তী এই। কাহারও কাহারও মতে চিতা নির্ব্বাণের জলের কলসীটি তিনি লইয়াছিলেন। যদি কলসীই লইয়া থাকেন উহা সেই জলাধার কিনা, কে জানে,—যাহা বহুকাল পরে কান্দাহারের সন্নিকটে আবিষ্কৃত হয়। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে মুসলমানেরা উহা নিজ ধর্ম্মের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। 'ধাতুবংশে'র মতে বুদ্ধদেবের শবদাহকালে ভস্মাবশেষ দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রতি উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ স্তূপ ও চৈত্যের কোন না কোন অংশে তাঁহার দেহ-ভস্ম সংরক্ষিত বলিয়া প্রকাশ। এসম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে, দেহাবশেষ বিতরণ শেষ হইয়া গেলে পিপ্পলি বনের মৌর্য্যগণ এই চিতা-ভস্মের কথা কথাই কি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কে বলিবে?

ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন যে "দেহাবশেষ মহাসপ্তকের" মধ্যে একটি শাক্যগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হয়, অপর একটি গান্ধার অধিবাসীবৃন্দ কর্ত্তৃক এবং তৃতীয়টি নাগরাজগণ কর্ত্তৃক। এজন্য উঁহারা স্মৃতি-সৌধ নানাস্থানে নির্ম্মিত করেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত স্মরণ-চিহ্ন যে দন্ত তাহা বর্ত্তমানে সিংহলের অন্তর্গত কান্দী সহরে সুরক্ষিত

কলোরেডো প্রস্রবণের নিকটস্থ দক্ষিণ চেনি কেনিয়নে জলপ্রপাত-সপ্তক

রহিয়াছে। এইটির সম্বন্ধে নানা গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা দেশ-দেশান্তরে বহুবার প্রেরিত হইয়াছে। ঋষি-ক্ষেম কলিঙ্গের রাজা ব্রহ্মদত্তকে উহা প্রথমে প্রদান করেন। নৃপতি দন্তপুরে উহা সংরক্ষিত করেন। সেখান হইতে কোন রাজকুমারীর কেশগুচ্ছে গোপনে সিংহলে আনীত হয়। সিংহল হইতে

শীঘ্রই উহা প্রভূত অর্থ-বিনিময়ে পুনরায় সিংহলে চলিয়া যায়। পর্তুগীজদিগের শাসনকালে বারংবার স্থানান্তরিত হইলেও এক্ষণে উহা কান্দী নগরের রমনীয় এক মন্দিরে বিরাজ করিতেছে। ঐ মন্দিরের চতুর্দ্দিক বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত, বহুমূল্য প্রস্তরাদিতে সুশোভিত। ঐশ্বর্য্যশালী অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ মন্দিরটি নয়নাভিরাম করিয়া রাখিয়াছেন।

* বর্ত্তমান অমরাবতীর প্রাচীন নাম দন্তপুর। উহা কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত, নগর জুনাকুণ্ড হইতে বেশী দূরে নহে। ঐ স্থানে এক্ষণে খননাদি কার্য্য চলিতেছে। সেখানে যে সমস্ত মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ স্থান দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি কেন্দ্র ছিল। বুদ্ধদেবের বহু মূল্যবান স্মরণ-চিহ্ন ঐখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপরোক্ত বিখ্যাত দন্ত যখন ঐ স্থানে প্রেরিত হয় সম্ভবতঃ সমসাময়িক কালে ঐগুলিও প্রেরিত হইয়াছিল।

শ্রীকালীচরণ মিত্র

কলোরেডোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকে কলোরেডোকে খনিপ্রধান ও কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়াই জানেন, কিন্তু এ প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যে সত্যই অতুলনীয়, সে কথা বোধ হয় সকলে জানেন না; এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্ত প্রতি বৎসর ইহার পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহে বহু সহস্র যাত্রীর সমাবেশ হইয়া থাকে। কলোরেডোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এক ধরণের বা একঘেয়ে নয়। মর্ম্মরনাদী পার্ব্বত্য তটিনী, তুষারাবৃত পর্ব্বত শিখর, হ্রদ, বনানী ও নানা ধরণের বনপুষ্পের বিচিত্র সমারোহে এদেশ সত্যই এত অদ্ভুত যে, একবার আসিয়া বা দেখিয়া তৃপ্তি হয় না, যে একবার আসে তাহাকে বার বার আসিতে হয়। এখানে আসিবার রাস্তা-ঘাটের সুবিধাও খুব, রেল বা মোটর সব রকমেই আসা যায়। আমেরিকাতে অধিবাসীরা ক্রমশঃই অত্যন্ত ভ্রমণপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের সুবিধার জন্ত এই সব পথঘাট স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক তৈয়ারী হইয়াছে। পর্ব্বতগুলির ও সুন্দর উপত্যকাদির যে কোন স্থানে এই সকল পথ চলিয়া গিয়াছে। এই উপত্যকার মধ্যে স্থানে স্থানে গবর্ণমেন্ট হইতে খানিকটা বন ও পার্ব্বত্যভূমিকে সাধারণের বিচরণ-ভূমির জন্ত আলাদা সকল স্থান হইতে কাঠ কাটিবার ও খনিজ-দ্রব্য উত্তোলন করিবার অধিকার দেওয়া হয় না। ছুটী-ছাটার সময় বহু সহস্র নর-নারী রেল বা মোটর যোগে এই 'পার্ক'গুলিতে আসিয়া থাকে, দশ পাঁচদিন তাঁবু খাটাইয়া থাকে। এই দলে শিকারী, বৈজ্ঞানিক, পর্ব্বত-আরোহণকারী, খনি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ—নানা ধরণের লোক থাকে এবং সকলেই নিজের নিজের প্রিয় বিষয়টির চর্চ্চা করিবার জন্ত আসে। অথচ কিছুকাল পূর্ব্বেও এই সব বিচরণ-ভূমির কথা সাধারণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

পাইক্‌স্‌-খুঙ্গের চূড়ায় কগ্‌ রেলগাড়ী ও মানমন্দির

পার্ব্বত্য প্রদেশের মত দুর্গম বা দুরারোহ নয়, ইহাই একটা প্রধান সুবিধা; ইহার জন্ত উপরোক্ত পার্কগুলি সাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। মোটরের রাস্তা এত বেশী যে, উপত্যকাগুলির তো বটেই, এমন কি পর্ব্বত-শিখরেরও অধিকাংশ স্থানে মোটরযোগে যাওয়া চলে—দশ হাজার ফুটের কাছাকাছি উচ্চ ভূমিতে ক্রিপল্ ক্রীক্ ও লেড্‌ভালি

পাইন্‌স-শৃঙ্গ ও উটির অপ্রশস্ত গমন-পথ

নামে দুইটি ছোট সহর আছে—এখানে প্রধানতঃ খনির মজুর ও মালিকেরা বাস করে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে আট দশটি খনি আছে—কিন্তু ইউরোপের আল্পস্ পর্ব্বতে এ রকম উচ্চ স্থানে যাতায়াত অনেক বেশী বিপজ্জনক। সামান্ত ছুটী পাইলেই সমতল ভূমির ও শহরের নরনারীরা এখানে অবসর-যাপন করিতে আসে।

কলোরেডোর জল বায়ু খুব ভাল। গ্রীষ্মকালে অন্ত অন্ত প্রদেশের পার্ব্বত্য ভূমির মত হঠাৎ বৃষ্টি বা ঝড় হয় না, সব গরমও বোধ হয় না, রাত্রিতে কিছু কিছু ঠাণ্ডা বোধ হয়। গ্রীষ্মকালের দিনগুলিতে প্রায়ই ষাট ডিগ্রী উত্তাপ সমভাবে বজায় থাকে।

অত্যন্ত উচ্চভূমি হইতে তুষারাবৃত শিখরগুলির সৌন্দর্য্য, বিশেষ করিয়া তাহাদের অহরহ পরিবর্ত্তনশীল মূর্ত্তি বড় অদ্ভুত দেখায়—এই হয়তো কোনোটা মেঘাবৃত আছে, আবার এখনি মেঘ সরিয়া গিয়া পরিপূর্ণ সূর্য্যকিরণে তাহার প্রতি-অঙ্গ স্নাত হইতেছে—দূরে অন্ত একটা ছোট শিখরে হয়তো ততক্ষণ বৃষ্টি সুরু হইয়াছে, অথচ এখানে মাথার উপরকার আকাশ ঘন নীল, মেঘগুলির প্রান্ত রৌদ্রে চিক্‌মিক্ করিতেছে। এখানকার সূর্য্যাস্তগুলিও দেখিবার জিনিষ—সমতলভূমিতে এ ধরণের সন্ধ্যার দৃশ্য চোখে পড়ে না।

যাহারা মৎস্ত-শিকার পছন্দ করে, তাহাদের সুযোগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এখানকার পার্ব্বত্য নদীগুলি নানাপ্রকার মৎস্তে পরিপূর্ণ, হ্রদগুলিতে মৎস্তের সংখ্যা আরও বেশী—প্রতি বৎসর শুধু মৎস্ত শিকার করিবার জন্তই কত লোক আসিয়া থাকে ও দশ দিন, পনেরো দিন ধরিয়া নির্জ্জন নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু খাটাইয়া বাস করে। এ প্রদেশের পর্ব্বতগুলির গঠন পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ত ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা প্রায়ই আসেন, কখনো কখনো উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ ও পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণেরও আমদানী হইয়া থাকে—রকি পর্ব্বত-মালার অন্ত কোনও স্থানে এত বিচিত্র ধরণের পক্ষী বা গাছপালা নাই।

অনেকে আসে শুধু সাঁতার দেওয়া বা অশ্বারোহণের আনন্দের জন্ত—জল খুব বেশী ঠাণ্ডা না হওয়ার দরুণ গ্রীষ্মকালে বা শরৎ ঋতুর প্রারম্ভে এখানকার পার্ব্বত্য হ্রদগুলিতে সাঁতার দেওয়ার অত্যন্ত সুবিধা।

বনের মধ্যে নানা ধরণের শিকার মিলিয়া থাকে, এজন্ত অনেক শিকারীও আসে। পর্ব্বতের উপরের দুর্গম স্থানগুলিতে এক জাতীয় পাহাড়ী-ভেড়া চরিয়া বেড়ায়—তাহাদের শিং খুব বড় বড়, গায়ের লোমও খুব লম্বা ও কর্কশ। এই জাতীয় ভেড়া সহজে শিকার করিতে পারা যায় না বলিয়াই ইহাকেই মারিবার ঝোঁক শিকারীদের মধ্যে

ভেড়ার সন্ধানে নির্জ্জন বনের মধ্যে দুর্গম পার্ব্বত্য পথগুলি বহিয়া একা একা বেড়াইয়া থাকে—কখনও কৃতকার্য্য হয়, কখনও বা ভেড়ার সন্ধানই মেলে না।

পাহাড়ী-ভেড়া ছাড়া নানা ধরণের হরিণ, ভালুক, পাহাড়ী-সিংহ, বন্য বিড়াল প্রভৃতি বন্যজন্তুও যথেষ্ট। এত ধরণের পাখী অন্য কোনো পার্ব্বত্য অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় না—এ পর্য্যন্ত ৪০৫ প্রকার জাতি ও ৫০ প্রকার উপজাতির পাখী হ্রদের ধারের বনগুলিতে দৃষ্ট হইয়াছে। বনের মধ্যের নির্জ্জন স্থানগুলিতে একা বেড়াইলে নানা বিচিত্র ধরণের পাখী চোখে পড়িবে—মানুষের সর্ব্বদা গতি-বিধির স্থানে ইহারা প্রায়ই থাকে না।

দশ হাজার ফুটের ঊর্দ্ধে গাছপালা ক্রমশঃই কমিয়া আসিয়াছে—এখানে হিম ও তুষারপাতের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া প্রায় কোনো গাছপালা টিকিতে পারে না, কয়েকটি বিশেষ জাতীয় বৃক্ষ ছাড়া। ইহাদেরও শাখাগুলি বাঁকা ও পত্রহীন, গুঁড়ি অনেকস্থলেই ঝড়ের বেগে দুমড়াইয়া গিয়াছে, অধিকাংশই খর্ব্বাকৃতি—অনবরত তুষার-ঝটিকার সঙ্গে যুঝিতে গিয়া ইহারা বাড়িবার সুযোগ পায় নাই।

উপত্যকাগুলির মধ্যে একটিতে একটি বিখ্যাত উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাহার জলের গুণ খুব অদ্ভুত—বাত ও নানা ধরণের দুরারোগ্য অসুখ এখানকার জলে স্নান করিলে আরোগ্য হয় বলিয়া বহুদূর হইতে রোগীরা আসিয়া থাকে। এই উষ্ণ প্রস্রবণের চারিপাশে অনেক খনি আছে—রৌপ্য, সীসা, তামা, এমন কি সোনার খনিও আছে। এখানকার আকরিৎ দ্রব্য হইতে রেডিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ উষ্ণ প্রস্রবণের জলের এই রেডিও-এ্যাক্‌টিভ্‌ প্রকৃতির জন্যই তাহাতে ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে এবং তাহাই স্বাভাবিক।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জর্জ্জ জ্যাক্‌সন এ অঞ্চলে প্রথমে সোনার খনি আবিষ্কার করেন। ডেনভার মোটর-পথের ধারে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ আছে। জ্যাক্‌সন সোনার খনি বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চল লোকে ভরিয়া যায়। কাঞ্চনের লোভে দলে দলে লোক আসিতে থাকে। শীঘ্রই এমন অবস্থা হইয়া উঠে যে খনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে নানা ধরণের বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করিতে হয়—ইহারই নিকটে চেরী ক্রীক্ নামক স্থানে আর একটি বৃহৎ সোনার খনি আছে—বিখ্যাত জর্জটাউন লুপ নামক রেলপথ দ্বারা এই উভয় স্থান সংযুক্ত।

প্রাচীন পার্ব্বত্য নিবাস,—মেসা ভার্ডি
জাতীয় নগরোদ্যান

জর্জটাউন হইতে ৫০ মাইল দূরে নির্জ্জন পর্ব্বত-গাত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের বসতিস্থান সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি সত্যই দেখিবার জিনিষ। নিকটেই গুহাগুলির মধ্যে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহের একটি মিউজিয়ম স্থাপিত হইয়াছে, ইণ্ডিয়ানদের কয়েকটি গ্রামও অদূরে অবস্থিত। দু'তিন মাইলের মধ্যে অনেকগুলি এরূপ প্রাচীন মানবের বসতিস্থান আছে। এগুলির বিশেষত্ব এই যে দুরারোহ

পর্ব্বতশৃঙ্গের পার্শ্বদেশ কাটিয়া এই সকল বসতি প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল—এই প্রাচীন জাতির বহু মৃৎপাত্র ও বিশাল পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এগুলি দেখিবার জন্ত গ্রীষ্মকালের প্রথমে মিউজিয়মটিতে খুব নরনারীর ভিড় হইয়া থাকে।

জেম হ্রদ হইতে লংস্ গিরি-শৃঙ্গ—প্রস্তরময় পর্ব্বতে জাতীয় নগরোদ্যান
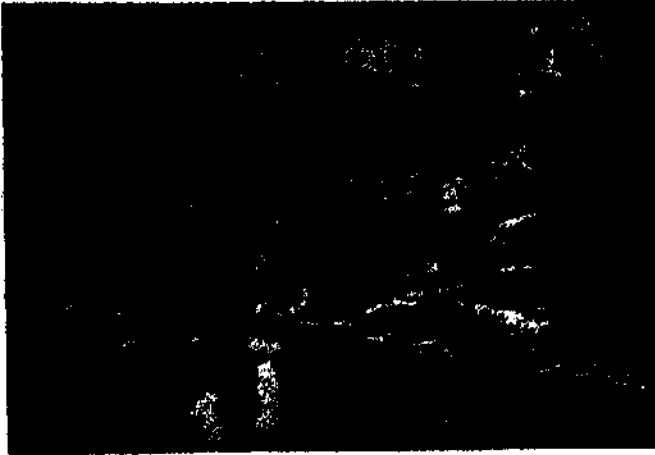
ইহার দক্ষিণে বিখ্যাত ইষ্টেস্ পার্ক। এটি একটি আরণ্য-ভূমি। ১৯১৫ সাল হইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহা বেড়াইবার স্থান হিসাবে রক্ষিত হইতেছে। সমগ্র কলোরেডো অঞ্চলের মধ্যে এমন অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা আর কোথাও নাই। জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এখানে আসা চলে। এখানকার জলপ্রপাতগুলি অতীব মনোরম এবং এক সঙ্গে এত জলপ্রপাত বোধ হয় আমেরিকার কোন অঞ্চলেই নাই। অক্টোবর মাসের পরেই শীত পড়িলে যাতায়াতের রাস্তা তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া দুর্গম হইয়া পড়ে—ঘোড়া বা মোটর কিছুই আর চলে না। সেই সময়ে বিপজ্জনক বলিয়া অক্টোবরের পর হইতে গবর্ণমেণ্ট যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
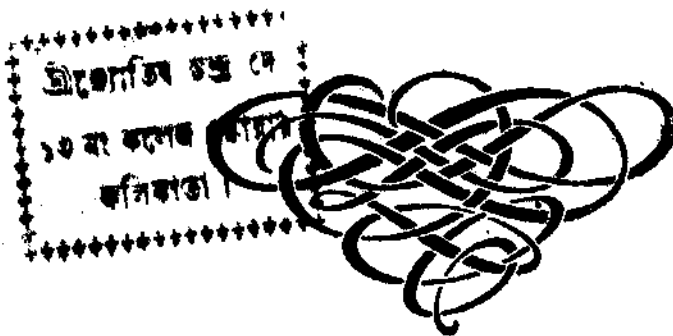
বিচিত্রার দপ্তর

[বিশ্বামিত্র]

দেহান্তে মৃত্যু নয়

খাঁচা পড়িয়া থাকে, পাখী উড়িয়া যায়—দেহ ও দেহী সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত এই। কিন্তু যায় কোথায়?—প্রশ্ন ইহাই। নানা মুনির নানা মত। ধর্ম্মশাস্ত্রে ও দর্শনে মত-বিরোধ। পণ্ডিতে পণ্ডিতে, দেশে দেশে, যুগে যুগে মতানৈক্য। দেখিয়া আসিবার ত উপায় নাই—দেখিয়া ত কেহ গূঢ় বার্ত্তার সন্ধান দেয় নাই। কিন্তু পরলোকের পর্দ্দা টানিতে মানুষের প্রাণ চায়, প্রিয়জনের মৃত্যু-রহস্তজাল ভেদ করিবার জন্য অদম্য স্পৃহা জাগাইয়া তুলে।

ডব্‌লিউ, টি, ষ্টেড্, সার কোনান্ ডইল, সার অলিভর লজ্ প্রভৃতি অনুসন্ধিৎসু মনীষীগণ প্রেততত্ত্বের বহুল আলোচনা করিয়াছেন। সার অলিভর এ বিষয়ে অদ্বিতীয় —কারণ তিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং প্রেততত্ত্বজ্ঞ। দেহ-বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যের স্থায়িত্বেরও বিলকুল নাশ হয় কিনা? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন—"কখনই নয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ হইলেই অস্তিত্ব লোপ ঘটিবার কোনই কারণ নাই। মস্তিষ্ককে আমরা অন্যায় প্রাধান্য দিই। কর্ম্মের মনন ও ব্যঞ্জনার কর্ত্তা—মন; মস্তিষ্ক নয়।"

কথাটা সুস্পষ্ট করিবার জন্য বলিতেছেন—"নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যাঁহাদিগকে আমরা মৃত বলি তাহারা প্রকৃতপক্ষে মৃত নয়—শারীরিক কল-কব্জা হইতে পৃথক হইয়াছে মাত্র। এমন বিস্তর লোকের মনের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আমি বহুবার আসিয়াছি যাহারা নশ্বরদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও পূর্ব্বতন স্মৃতি, চরিত্র ও অনুরাগ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আমার পুত্র রেমণ্ড বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে নিহত হয়, কিন্তু তাহার প্রেতাত্মার সাহায্যেই একখানা উইলের সন্ধান পাই—সে সন্ধান পাইতে শত শত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।"

স্যার অলিভর দৃঢ়তার সহিত এই মত প্রচার করেন—"অন্ততঃ শতায়ু মানবের অবশ্যপ্রাপ্য। বর্ত্তমান কালে ঔষধ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও জীবনযাপন-প্রণালীর উৎকর্ষতা হেতু ৭০ বৎসর বয়সেও আমাদের পূর্ণ যৌবন রক্ষা করা উচিত।"

এই সম্পর্কে তাঁহার দৃঢ় ধারণাও ব্যক্ত করিয়াছেন—"যে সকল কার্য্য যন্ত্র-সাহায্যে সম্পন্ন করা সম্ভব তাহা সেই ভাবেই করা কর্ত্তব্য। তবে কলাজ্ঞানের বা চিন্তা-শক্তির প্রয়োজনে হস্তাদির সাহায্য অবশ্য লইতে হইবে।"

মাছির রূপজ্ঞান

মাছি ও মক্ষিকার রূপের বোধ যে প্রখর একথা শুনিলে কেহই হয়ত হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা এই যে মাছিরা লোহিত ও পীত বর্ণকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, পক্ষান্তরে নীল এবং সবুজ রঙের তাহারা ভক্ত ও অনুরক্ত। লিভারপুলের ট্রপিকাল মেডিসিন বিদ্যালয় হইতে এই সত্যের প্রবল প্রচার হইতেছে।

বহু বৈজ্ঞানিক সত্যের ন্যায় উপরোক্ত তথ্যটিও কোন অবৈজ্ঞানিকের নিকট প্রথম ধরা পড়ে। একদিন হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল তাঁহার খাইবার ঘরের (ল্যাম্পের) আলোর আবরণের উপর বিস্তর মাছি বসিয়া আছে। তাহার পার্শ্বেই অথচ জানালায় পরদা ঝুলিতেছে, তাহাতে একটিও নাই। এই নিরীক্ষণের ফলে অতি প্রয়োজনীয় তথ্যটি প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার বিষয়ীভূত হয়। তাঁহারা এখন অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন যে, লাল রঙের উপর মাছিরা খড়্গহস্ত, কিন্তু নীল রং তাহাদিগকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। বেগুনে, নীল ও সবুজ রং তাহাদের অতি প্রিয়, অথচ লাল, হলুদে ও কমলা লেবুর রং তাহারা আদৌ সহ্য করিতে পারে না।

রোগের বীজাণু মাছিরাই বহন করিয়া আনে এবং অধিকাংশ সংক্রামক ও অন্যান্য ব্যাধি ঐ উপায়েই সংক্রামিত হয়—ইহা চিকিৎসা-শাস্ত্রসম্মত মত। যদি হাসপাতালের কক্ষগুলি, গৃহের রন্ধনশালা, বিদ্যালয়-গৃহ প্রভৃতি লাল ও হরিদ্রা রঙে সুশোভিত করা হয় তাহা হইলে মাছি তথা বহু সংক্রামক ব্যাধির কবল হইতে আমরা নিস্তার পাই। সুতরাং এ বিষয়ে অবহিত হওয়া ও এই তথ্যের বহুল পরীক্ষা করা সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য।

মশক-অভিযান

মশক-বংশ নির্ব্বংশ করিবার অভিপ্রায়ে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের গভর্ণমেণ্ট এই বৎসরে ২৬ কোটি মুদ্রা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। মশক হইতেই বহু দুরারোগ্য রোগের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি। রোগের বীজাণু বহন করিয়া আনিতে এবং গবাদি পশুর ও মনুষ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে মশক অদ্বিতীয়—মাছি প্রভৃতি তাহার নিকট অপেক্ষাকৃত বহুলাংশে তুচ্ছ।

আমেরিকার স্বাস্থ্য-বিভাগ নানা প্রক্রিয়া দ্বারা এই অভিযান চালনা করিবেন। যন্ত্রপাতির সাহায্য ত লইবেনই, অধিকন্তু এ বিষয়ে পক্ষী, মৎস্য, নানাবিধ তৈল—এমন কি নরমাংসভুক্ মশকেরও সাহচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গৃহাদিতে যেরূপ বৈদ্যুতিক পাখা আছে তদ্রূপ পাখার সাহায্যে চূর্ণীকৃত চূণ ও প্যারিস-গ্রীন নামক গুড়া ছড়াইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই সকল বিল-খালে যেখানে মশককুল অসংখ্য পরিমাণে বর্ত্তমান। পাখার সাহায্যে মিনিটে ৫২৫ ফিট গুড়া ছড়াইয়া পড়িবে। পাখা ঘুরিবে প্রতি মিনিটে ১৫০০ ফিট।

যে সকল পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি মশক ভক্ষণ করে তাহাও প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল স্থানে আমদানী করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তদ্দ্বারাও বহু সুফল আশা করা যাইতেছে। বাদুড়ের দ্বারাও অনেক কাজ হইবে। ইহারা মশা পাইলে আর কিছুই খাইতে চায় না। বাদুড়ের উদর পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, এক রাত্রিতে একটি বাদুড় এক হাজার মশা খাইয়া থাকে।

আমাদের বাংলাদেশ ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত। মশকের প্রাদুর্ভাব তাহার মূলীভূত কারণ—বিশেষজ্ঞগণের ইহাই অভিমত। পৌরী সেন কোথায় কে কে আছেন যাঁহারা যুক্তরাজ্যের সরকারের ন্যায় অকাতরে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া গ্রাম-পল্লীর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবেন?

কলকব্জার কুফল

কলকব্জা বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহার ফল কি—সু অথবা কু? ইহাই প্রশ্ন। নব নব কলের উদ্ভাবন-কর্ত্তা বৈজ্ঞানিকপ্রবর মিঃ টমাস এডিসন পরিণত বয়সে ইহারই সমাধানে সচেষ্ট হইয়াছেন।

তিনি বলেন,—কলের শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ দৌড়িয়াছিল তাহারই অভিমুখে, এখন কলের কুফল দেখিয়া মোহ ভাঙ্গিয়াছে—প্রয়োজনের অতিরিক্ত যোগানে লোকে বিরক্তির চরমে পৌঁছিতেছে। কলের কৃপায় মজুরের মজুরী বাড়িয়াছে, যথেষ্ট অবকাশ ভোগ তাহার সম্ভব হইয়াছে, মোটর গাড়ীর ও রেডিওর সুখভোগে কৃতার্থ হইয়াছে। মোটর-গাড়ী নির্ম্মাতা ফোর্ড সাহেব প্রভৃতি তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে ঐ সকল আরাম উপভোগ করিতে হইলে তাহাদিগের ব্যক্তিত্বে জলাঞ্জলি দিতে হইবেই, একঘেয়ে একই কর্ম্মে সারাজীবন তাহাদিগকে নিযুক্ত থাকা চাই—একই কলের মুখে সারাদিন একই ভাবে টুকরা ফেলিতে থাকাই তাহাদের জীবনের চরম সার্থকতা!

কিন্তু কলের কাজ এখন শেষের দিকে। স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি কর্ম্মে—এই মন্ত্র সোৎসাহে উচ্চারিত হইয়াছিল। এখন লোকের ভুল ভাঙ্গিয়াছে—স্বাচ্ছন্দ্য এখন শুকাইতে বসিয়াছে।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে কাজে একশত কুলি-মজুরের প্রয়োজন হইত এখন ৭৫ জন দ্বারা তাহা সমাধা হইতেছে। আরও বিশ বৎসর পরে প্রয়োজন হইবে হয়ত ৫০ জনেরও কম। তাহার পর—? কি হইবে, কে জানে! ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

বিচিত্র ব্যাপার এই, শ্রমিকের যতই কম প্রয়োজন হইতেছে, উৎপন্ন দ্রব্য ততই বাড়িতেছে। কি কৃষিকার্য্যে,

কি কলকারখানার কার্য্যে সর্ব্বত্রই এই। সুতরাং চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী হইতেছে, দর কমিতেছে, দুঃখ-দৈন্য বাড়িতেছে। গত বৎসর নানা দেশের কারখানা হইতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তৈয়ার হইয়াছে ২০ লক্ষ মোটর গাড়ী। পুরাদমে চলিলে যত কারখানা আছে তাহা হইতে ৪০ লক্ষ মোটরগাড়ী বাহির হয়—যাহার ক্রেতা নাই!

মোটর-গাড়ী চাষের কাজে লাগাইয়া ফল হইয়াছে এই যে, যত শস্য উৎপন্ন হইতেছে তাহার কাটতি নাই। দর ক্রমাগত কমিতেছে, ফলে কৃষককেও সাধিতে হইতেছে—কমাও চাষ। সকল দ্রব্যই পর্য্যাপ্ত, নাই কেবল ধন, নাই টাকা।

নানাবিধ ভঙ্গিমার সহিত বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণকে বিক্রেতাগণ বলিতেছেন—লও লও লও, কষ্টার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার কর আমাদের জিনিষ খরিদ করিয়া। যে সকল কলকব্জা লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে, দশজনের কাজ একজনের দ্বারা নির্ব্বাহ করিতেছে, সেই সকল জিনিষ-পত্র খরিদ করিবে কে? কার্য্যের অভাব; বেকারের দলের খরিদের অর্থ কোথায়?

সমস্যা এখন এই। এ সমস্যা সমাধানের উপায় কি? বৈজ্ঞানিকবর তাহার উত্তর দেন নাই, দিতে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন।

সোজা উত্তর—ভাঙ্গ কল, ডাকিয়া আন—পুরাতন যুগ ও প্রাচীন পদ্ধতিকে। কিন্তু পাগলের প্রলাপে সাড়া দিবে কে?

স্যার কোনান্ ডইলের শেষ-বাণী

পৃথিবীতে আমরা কেন, কি উদ্দেশ্যে? পারলৌকিক অবস্থা ইহলোকের অপেক্ষা ভাল কেন?—মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বেও স্যার ডইল তাহার আলোচনা করেন। উহাই তাঁহার শেষ কথা।

তিনি বলেন—"শুধু কল চালাইতে ও মজুরী করিতেই মানুষ জন্ম গ্রহণ করে নাই; জীবনের আসল উদ্দেশ্য জড়-জগতের বোঝা নামাইয়া—আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ। দুঃখ ও সংঘাত এই দুই সেই পথের চালক। দুঃখ অশুভ ত নয়ই, পরন্তু উহাই সার বস্তু। একবার এক প্রেতাত্মার এই বার্ত্তা পাই—"আমরা সেই সকল দুর্ভাগাদিগকে কৃপার পাত্র মনে করি যাহাদের দুঃখ নাই।" ৩০ বৎসর বয়সে যেরূপ ছিল ৭০ বৎসরেও যদি কেহ তদপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও দয়াপ্রবণ না হয় এবং অধিকতর সহানুভূতিপূর্ণ ও ত্যাগী না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জীবিত-কাল ব্যর্থ হইয়াছে নিশ্চয়, কারণ তাহাকে হয় এই পৃথিবীতে নয় লোকান্তরে আবার অক্লান্তভাবে যুঝিতে হইবে। আমার মতে অধিকাংশ লোকেই উন্নতি লাভ করে এবং তদ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। ধর্ম্ম-মতের বাকবিতণ্ডা নিষ্ফল। চাই কাজ—ধর্ম্মমতবাদ নয়। চারিত্রিক বলই প্রধান, বিশ্বাস নগণ্য। একজন অজ্ঞেয়বাদী মহাপুরুষ হইতে পারেন, পক্ষান্তরে ধর্ম্মযাজক হয় ত সয়তান।"

অনেকের ধারণা এই যে, স্যার কোনান্ প্রেততত্ত্বজ্ঞ সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহা ছিলেন না। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন—"সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান একজনের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি। তাঁহাকেই আমি বলি—ঈশ্বর। এটা অন্ধ বিশ্বাসের কথা নয়—জ্ঞানের। জ্ঞানেরই যুগ এই। আমাদের চেয়ে যাঁহারা বহু উচ্চস্তরের সেই সকল পারলৌকিক আত্মার বাণী হইতে আমরা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিব। বিনা প্রমাণে আমরা কিছুই গ্রহণ করি না। ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের জ্ঞান-সমষ্টি আমাদিগকে প্রকৃত জ্ঞানের আলোক দেখাইবে, এই আমার দৃঢ় ধারণা। লোকান্তরে সকল শ্রেষ্ঠ আত্মা প্রভূত উন্নতি করিতেছেন। আমরা এই পৃথিবীতে নিঃস্বার্থতার দ্বারা যে মহত্ত্ব অর্জ্জন করি তাহাই পরলোকে আমাদের উন্নতিকল্পে পাথেয়স্বরূপ।"

তাঁহার বাণীর উপসংহার-ভাগ এই—"জীবের পূর্ণ পরিণতি উচ্চতম লোকে বাস। পাপ, নরক—এই সবই বাজে বুকনি। উচ্চলোকে উপনীত হইলে আনন্দের ধারায় আমরা আত্মোন্নতি করিতে পারি। মৃত্যু আমাদের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন সাধন করে না। প্রার্থনা ও স্তবস্তুতি অনাবশ্যক নয়, তবে তাহার বাহুল্য নিরর্থক। প্রেততত্ত্ব আমার কাছে ধর্ম্মের অন্তর্গত ও অঙ্গীভূত। উন্নত প্রেতাত্মার বাণী ও ইহলৌকিক জ্ঞানালোচনা এই দু'য়ের

সমন্বয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অভিব্যক্ত হইবে এবং পরিশেষে চরম জ্ঞানের পূর্ণ অধিকার ঐ প্রক্রিয়ার আয়ত্তাধীন হইবে, এই আমার স্থির সিদ্ধান্ত।"

*　　　*　　　*

তার কোনান্ এখন কোন্ লোকে, কে জানে! যে জ্ঞানের আলোক গ্রহণে ও বিতরণে তিনি প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অতিপ্রিয় কথা-সাহিত্যকেও অবহেলা করিয়াছেন, লোকান্তর হইতে কি উপায়ে কি সমৃদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন, তাহা প্রকৃতই অনুশীলন ও পর্য্যবেক্ষণের যোগ্য।

সঙ্গীত-কলা

নানা জাতি, নানা ধর্ম্ম, বিচিত্র ভাবধারা, বিভিন্ন কর্ম্ম-পদ্ধতি এই ভারতবর্ষে। ঐক্যের স্থান কোথায়—কোন্ সূত্রে? সমন্বয় সম্ভব সঙ্গীত-কলার আলোচনায় নহে কি? আহারে বিহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে, জ্ঞানে বিশ্বাসে পার্থক্য যতই থাক্, হিন্দু-মুসলমানে, শিখে-খ্রীষ্টানে, বৌদ্ধে-পারসিকে এক বস্তুতে ভেদজ্ঞান তিরোহিত। তাহা সঙ্গীতের চর্চ্চায় এবং ইহারই আনুষঙ্গিক আলোচনায়—গান-বাজনায়, নৃত্যকলায়।

মহীশূরের দেওয়ান স্যার মির্জ্জা ইসমাইল সম্প্রতি বাঙ্গালোরে সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান উৎসবে প্রকারান্তরে ঐ কথাই কহিয়াছেন। তিনি বলেন,—সাধারণের ধারণা সঙ্গীতজ্ঞেরা খুবই সুখী। বস্তুতঃই এমন নির্দ্দোষ আনন্দ আর কিছুতেই নাই। মানুষ শুধু এই এক বিষয় লইয়াই মসগুল থাকিতে পারে। বিখ্যাত জার্ম্মাণ পরিহাস-রসিক রিক্টরের মতে শুধু মানুষ নয় পশুরা পর্য্যন্ত সঙ্গীতের যোষনে সাড়া দেয়—ইঁদুর ও হাতী, মাকড়সা ও পাখী অবধি। রসিকের মন্তব্য বলিয়া কথাটা অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু মানুষের উপর সঙ্গীতের প্রভাব যে তীব্র ও স্থায়ী তাহা নিঃসন্দেহ।

প্রাচীন সংস্কৃত বচন—"গানাৎ পরতরং নহি।" চীনাদের মতে সঙ্গীত-শাস্ত্র বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ। ভারতবর্ষে সঙ্গীত মাত্রই—বিশেষতঃ সাধন-ভজনের গান স্মরণাতীত কাল হইতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিদ্যাদেবী সরস্বতী "বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত-হস্তে।" আবার সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক এই ত্রয়ীর সৃষ্টিকর্ত্তা দেবাদিদেব শিব সঙ্গীত-কলার অতি ভক্ত। তিনিই নটরাজ। মহামানব শ্রীকৃষ্ণ উচ্চস্তরের সঙ্গীত-শিল্পী—বংশী-বাদনে সর্ব্বদাই নিরত। নারদের ন্যায় মহামুনি, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরদের ন্যায় অমরগণ সঙ্গীতের অনুরক্ত ভক্ত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের নামান্তর গন্ধর্ব্ব-বেদ। এই বাক্য হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সঙ্গীত-শাস্ত্র প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুদের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল।

'গীত-গোবিন্দ'-কার জয়দেব, আকবরের রাজসভার উজ্জ্বলতম রত্ন তানসেন, দাক্ষিণাত্যের সুবিখ্যাত ত্যাগ রাজা, দেবতা পান্দরীনাথের অতুলনীয় অনুরাগী পুরন্দর দাস—ইঁহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ কলাবিৎ।

রামায়ণে প্রকাশ, আর্য্য-সভ্যতার প্রতীক শ্রীরামচন্দ্রের বংশধরগণ অতি উচ্চদরের সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন; পক্ষান্তরে দ্রাবিড় সভ্যতার প্রতিনিধি লঙ্কেশ্বর রাবণ স্বয়ং উচ্চস্তরের সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত-বিদ্যার পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। আধুনিক কালে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধীশ্বর কৃষ্ণ দেবনারায়ণ ও অন্যান্য হিন্দুরাজগণ এবং মোগল আমলের আলাউদ্দীন, আকবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি সম্রাটেরা সঙ্গীতের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। আকবরের ন্যায় প্রতাপান্বিত সম্রাট তানপুরা লইয়া তানসেনের গৃহে এবং ছদ্মবেশে তানসেনের ওস্তাদের আলয়ে গমন করিতেন—এই ওস্তাদই অথচ রাজসভায় আসিয়া সঙ্গীতালাপ করিতে অসম্মত হন। এই সকল কিম্বদন্তী একপক্ষে যেমন আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, পক্ষান্তরে বাদশাহের সঙ্গীতানুরাগের প্রবলতা সূচিত করে।

বিশ্বামিত্র

নানাকথা

লন চ্যানি

গত ২৬এ আগষ্ট লস্ এঞ্জেলসে বিখ্যাত ছায়াচিত্র অভিনেতা লন চ্যানি মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি স্পেনদেশীয়। তাঁহার পিতা মাতা উভয়েই বোবা ও কালা।

তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ চিত্র ভিক্‌টর হুগোর অমর উপন্যাস "The Hunchback of Notre Dame।" এই চিত্রে তিনি ঘণ্টাবাদক কোয়াসিমডোর ভূমিকায় অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। তাঁহার অভিনয়ের গুণে কোয়াসিমডোর চরিত্র জীবন্ত ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। কুব্জদেহ দেখাইবার জন্য তাঁহাকে পিঠে plaster of Paris বাঁধিয়া অভিনয় করিতে হইত এবং গির্জ্জা-দৃশ্য অভিনয় এরূপ বিপজ্জনক ছিল যে অনেক বীমা কোম্পানী তাঁহার জীবন বীমা করিতে স্বীকৃত হয় নাই।

রূপসজ্জায় তাঁহার অসামান্য দক্ষতার নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে "বহুরূপী" বলিত। "The Unholy Three" নামক তাঁহার একখানি সবাক্ চিত্রে তিনি তিনটি ভূমিকায় তিন রকম স্বরে অভিনয় করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

ছায়াবিহীন অট্টালিকা

৫০৫ ফিট উচ্চ ও ৪০ তলা বিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা মার্কিণের নিউ ইয়র্ক সহরে সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। তিন তলা পর্য্যন্ত ইহার বহির্ভাগ নিকেল দিয়া মোড়া। অট্টালিকার বিশিষ্টতা এই যে, ইহার ছায়া কোথাও পড়িবে না। বাহিরে জানালা নাই, কালো ও সাদা মালমশলায় ইহা প্রস্তুত। এজন্যই নাকি ইহার ছায়াহীনতা সম্ভব হইয়াছে। ছায়াবিহীন অট্টালিকা পৃথিবীতে এই প্রথম। মার্কিণের সকলই তাজ্জব।

বার্নার্ড শ

দিনকয়েক হইল, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বার্নার্ড শ তাঁহার ৭৪ বার্ষিক জন্মোৎসব সমাধা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সেদিন তিনি সাঁতার কাটিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ও কর্ম্মক্ষমতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে। সম্প্রতি তিনি তাঁহার "How she lied to her husband" নামক বইখানির সবাক্ চিত্র তুলিবার জন্য একটী ইংরাজ কোম্পানীকে অনুমতি দিয়াছেন। ইংরাজী ও জার্ম্মাণ এই দুই ভাষায় সবাক্ চিত্রটি তৈয়ার হইবে। কেননা ইংলণ্ড অপেক্ষা জার্ম্মানীতেই তিনি বেশী জনপ্রিয়। তাঁহার মতে থিয়েটার সবাক্ চিত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠিবে না, এটা সবাক্ চিত্রেরই যুগ। "Arms and Man" বইখানি তাঁহার দ্বিতীয় সবাক্ চিত্র হইবে।

মাতৃত্ব ও শিশুমঙ্গল

বিলাতী দৈনিক পত্র "ডেলি হেরাল্ড" একটী অভিনব ঔষধ আবিষ্কারের বিশিষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। এই ঔষধ সেবনে নাকি প্রসব-যন্ত্রণা বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইবে, আনুষঙ্গিক বিপদের আশঙ্কা তিরোহিত হইবে এবং শিশু সুস্থ ও সবল হইবে। সত্য হইলে, আবিষ্কারক যে শ্রেষ্ঠ দানের পুণ্যে ধন্য হইবেন, সন্দেহ নাই। প্রসবের পর বহু প্রসূতি ও শিশু ভারতে অকালমৃত্যুর পথে পতিত হয়। প্রসব সহজ ও নবজাত সন্তান সুস্থ হইলে অকালমৃত্যুর হার প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পাইবে। নারীমাত্রেই এই ঔষধের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিবেন, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই সঙ্গে প্রসূতি ও শিশুর পুষ্টিকর সুলভ পথ্যের একটা পন্থা আবিষ্কৃত হইলে সর্ব্বাঙ্গীন অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ

সম্প্রতি বার্লিনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত বিখ্যাত পণ্ডিত আইনষ্টাইন সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই দুই প্রতিভাশালী ব্যক্তির মিলন বিশেষ আনন্দের কথা।

জার্ম্মানীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। সমালোচকদের মতে চিত্রগুলিতে তাঁহার দার্শনিকতা পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে। আমেরিকাবাসীর বিশেষ অনুরোধে সম্ভবতঃ তিনি শীঘ্রই মাস তিনেকের জন্য মার্কিণ যাত্রা করিবেন।

বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা ও দার্শনিকতায় মুগ্ধ হইয়া বরোদার মহারাজা স্যার সয়াজী রাও গায়কোয়ার তাঁহার শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ বিশ্বকবিকে পাঁচ হাজার টাকা উপহার দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ টাকা বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন।

উদয়শঙ্কর

প্রতিভাশালী ভারতীয় নর্ত্তক উদয়শঙ্কর তাঁহার শেষ নৃত্য সেদিন নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে দেখাইয়াছেন। বিশেষ করিয়া গন্ধর্ব্ব নৃত্য, শিবের তাণ্ডব নৃত্য ও ইন্দ্রনৃত্য অতি সুন্দর হইয়াছিল। গত ২৭এ আগষ্ট ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। তিনি শীঘ্রই পুনরায় ইউরোপ যাত্রা করিবেন।

নবীন তুরস্ক

আঙ্গোরায় ভূতপূর্ব্ব আফগান মন্ত্রী গোলাম জিলানী খাঁ সম্প্রতি আঙ্গোরা হইতে কাবুলে ফিরিবার পথে পেশোয়ারে বলিয়াছেন যে, তুরস্কে নারী-আন্দোলন প্রত্যহই প্রবল হইতেছে। আজকাল সেখানে মহিলারা শিক্ষয়িত্রী, ডাক্তার, কেরাণী, মেকানিক প্রভৃতি সব রকম কাজই করিতেছেন। তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন যে ভারতীয় মুসলমান মহিলারা এখনও সমাজের ভারস্বরূপ হইয়া আছেন।

রেমব্র্যাণ্ডের চিত্র

ডাব্লিনের জনৈক চিত্র-ব্যবসায়ী সম্প্রতি অমর চিত্রকর রেমব্র্যাণ্ডের একখানি অতি সুন্দর চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ছবিখানি রেমব্র্যাণ্ডের পত্নী সুস্কিয়ার—১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও গত দুই শত বৎসর ধরিয়া এই ছবিখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ভারত-স্ত্রীমহামণ্ডল

বিবাহিতা ও বয়স্থা কুমারীদের জন্য ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল ১৫নং কলেজ স্কোয়ারে একটি স্কুল খুলিয়াছেন। প্রত্যহ বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত স্কুলের কার্য্য হইবে। এই স্কুলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১। বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, ২। সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণ, ৩। ইংরাজী সাহিত্য ও ব্যাকরণ, ৪। হিন্দী সাহিত্য ও ব্যাকরণ, ৫। বাংলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ইংলণ্ড, গ্রীস, রোম ও আমেরিকার ইতিহাস, ৬। ভূগোল, ৭। পাটীগণিত, ৮। ইংরাজী কথাবার্ত্তা, ৯। সরল ব্যাখ্যার সহিত গীতাপাঠ, ১০। পুরাণের গল্প, ১১। স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ১২। গৃহস্থালী মিতব্যয়িতা।

উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত—টাইপ-রাইটিং, [illegible], সঙ্গীত, সূচীশিল্প, "তকলী" ও "চরকায়" সূতাকাটা [illegible] তাঁতবোনাও শিক্ষা দেওয়া হইবে।

আশা করা যায়, এই স্কুল হইতে আমাদের অন্তঃপুরিকারা যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। এইরূপ একটি স্কুলের বিশেষ অভাব ছিল। মহিলারা গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম সারিয়া স্কুলে যাইতে পারিবেন এবং ৩টার সময় ফিরিলে তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইবে না। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, বি, এ, জেনারেল সেক্রেটারী, ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল, ৩নং সানি পার্ক, বালিগঞ্জ, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত খবর পাইবেন।

Printed at the Susil Printing Works Ltd. 46, Pataldanga Street, Calcutta.

চতুর্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড   আশ্বিন, ১৩৩৭   চতুর্থ সংখ্যা

গান

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়
বিদেশী নায়ে,
তাহারি রাগিণী লাগিল গায়ে।
সে সুর বাহিয়া ভেসে আসে কার
সুদূর বিরহবিধুর হিয়ার
অজানা বেদনা,
সাগর বেলার অধীর বায়ে
বনের ছায়ে।

তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসে
হৃদয় মাঝে,
শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবী
নীরবে বাজে ;
ছবি মনে আনে আলোতে ও গীতে,
যেন জনহীন নদীপথটিতে
কে চলেছে জলে কলস ভরিতে অলস পায়ে
বনের ছায়ে।

নাথু সর্দ্দার

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(একখানি জাপানী নাটিকা অবলম্বনে)

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ

লালা রামলায়েক সিং	জমিদার
দেওয়ালী সিং	ঐ পুত্র
নাথু সর্দ্দার	ঐ তাঁবেদার
ছাঁহুর	নাথুর পুত্র
বিশ্বদেও	মঠাধ্যক্ষ

(সাধারণী বাক্—কোরাস)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মঠের সম্মুখস্থ পথ। নাথু সর্দ্দার।

নাথু

আমি জঙ্গলপুরের নাথু সর্দ্দার,—লালা বংশের তিন-পুরুষের তাঁবেদার। মনিবের আমার একটিমাত্র ছেলে—তাকে তিনি গুরুকুলের মঠে পাঠিয়েছেন,—সঙ্গে আছে আমার ছেলে—ছাঁহুর। মনিবের ছেলেটি কিন্তু লেখা পড়ায় মোটেই মন দেন না;—কেবল হুড়োহুড়ি আর ঘুষোঘুষি এই নিয়েই আছেন। তাই বোধ হয় ত্যাজ্যপুত্র করবার জন্তে, লালা সাহেব একে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন। বার বার লোক পাঠানও সেই জন্তই। ছেলেও তেম্‌নি একরোখা একগুঁয়ে,—কেউ তাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারলে না। তাই আবার আমাকে আস্‌তে হ'ল। দেখি। (মঠের সম্মুখে গিয়া) কে আছেন গো ভিতরে? অ্যাঁ! ভিতরে কে আছেন?

ছাঁহুর

নাথু

কে? ছাঁহুর? কুমার সাহেবকে বল, আমি তাঁকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্তে এসেছি।

ছাঁহুর

যে আজ্ঞে। (নেপথ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া) কেমন ক'রে বলা যায়?…আজ্ঞে…আজ্ঞে…সর্দ্দার আপনাকে নিতে এসেছেন।

(দেওয়ালীর প্রবেশ)

দেওয়ালী

এই দিকে ডাক।

ছাঁহুর

যে আজ্ঞে। (নাথুর দিকে অগ্রসর হইয়া) পা' তুলে এই দিকে আসুন।

নাথু

তাইত! সব নূতন ঠেক্‌ছে; অনেক দিন আসিনি কিনা!

দেওয়ালী

এই যে সর্দ্দার! হঠাৎ এখানে? কি মনে ক'রে?

নাথু

আজ্ঞে, লালা সাহেবের হুকুম; আপনাকে আমার সঙ্গে দেশে ফিরতে হবে; নিতে এসেছি।

দেওয়ালী

আঃ! জ্বালাতন করলে দেখ্‌ছি,…আচ্ছা চল,…কিন্তু যাবার আগে উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে হবে;

আজ্ঞে, কখুনো মাফ্ করতে হবে, লালা সাহেবের সে-রকম হুকুম নেই।

দেওয়ালী

তাই নাকি ?…আচ্ছা, চল।

নাথু

ছাঁহুর ! দাঁড়িয়ে রইলি যে ? তুইও আয়।

ছাঁহুর

দাঁড়িয়ে কি ? আমি তো পা বাড়িয়ে রইছি।

নাথু

বে-আদব !…চল্।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

লালা সাহেবের বসিবার ঘর। লালা রামলায়েক আসীন।
নাথু সর্দার ও দেওয়ালীর প্রবেশ।

নাথু

তাইত !…মাথা গুঁজে ব'সে আছেন…একবারও চাইছেন না…কি ক'রে নজর ফেরানো যায় ?…

(গলা খাঁকার দিয়া) আজ্ঞে, কুমার সাহেব এসেছেন।

লালা

দেওয়ালী ! আমি তোমায় মঠে পাঠিয়েছিলাম লেখাপড়া শিখার জন্য ;…কেমন ?…আচ্ছা ; এখন এই সংস্কৃত-সূত্র-গ্রন্থ থেকে খানিকটা পড় দেখি।

দেওয়ালী (স্বগত)

হায় আমি সূত্রপাঠ করিব কেমনে ?
হরফ কেমনে দেখে তাই নাহি জানি ;
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ মম, অশ্রু দু'নয়নে,
পিতার আদেশে মনে বড় ভয় মানি।

লালা

হুঁ…বোঝা গেছে ; হাজার হোক্ আমার পুত্র কিনা …শুদ্ধ শান্ত হ'য়ে, সংযত হ'য়ে, কেবল উপাসনার কালেই সূত্রপাঠ কর্ত্তব্য,…এটা বোঝে…তাই কুণ্ঠিত হ'চ্ছে। আচ্ছা দেওয়ালী ! একটা শ্লোক রচনা কর দেখি।

দেওয়ালী

রচনা ?…রচনা আমার হয় না।

লালা

হয় না !…আচ্ছা, কিছু আবৃত্তি কর।

দেওয়ালী

(নিরুত্তর হইয়া রহিল)

লালা

এ কি ? নিরুত্তর ? জিভ খ'সে গেছে নাকি ?
কী করিলে এতদিন মঠে তবে থাকি' ?
পিতার আদেশ—সে কি হাওয়ার সমান ?—
মন হ'তে মুহূর্ত্তেই হ'ল অন্তর্ধান।
ক্রোধে কাঁপে সর্ব্ব-দেহ—পুত্র বলি' তোরে
পরিচয় দিতে লোকে—হতভাগা !—ওরে—

সাধারণী বাক্

আচম্বিত ঝলসি' যে ওঠে তলোয়ার !
লালা বুঝি কেটে ফেলে পুত্র আপনার !
নাথু প'ড়ে মাঝখানে চোখের পলকে,—
আসন্ন মরণ হ'তে বাঁচায় বালকে !
সবলে সে সসম্ভ্রমে ধরে দুই হাতে—
প্রভুর উদ্যত বাহু,—বালকে বাঁচাতে।

নাথু

রাজা সাহেব ! এবারটা—একটাবার ছেলেমানুষকে মাফ করুন।

লালা

কেন তুমি হাত ধর্‌লে…অবাধ্য নির্ব্বোধ ছেলের বেঁচে থাকা হবে না—ওকে জীবন্ত থাক্‌তে দেব না ;…এই নাও তলোয়ার, কেটে ফেল,…আমি ওর রক্ত দেখতে চাই।

(প্রস্থান)

নাথু

এ কি কাণ্ড ! রাগ চণ্ডাল !…ওঁর রাগ তো সহজে পড়বে না,…এ রাগ তো ক্ষণস্থায়ী ব'লে বোধ হয় না। এখন উপায় ?…কি করি ? কী করি ? (চিন্তিতভাবে মুহুর্মুহু পায়চারি করিতে লাগিল) হুঁ…হয়েছে,…হয়েছে

…সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে কুমার সাহেবকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে।…এ করতেই হবে। ছাঁহুর!… ছাঁহুর!…ওখানে আছিস্?

ছাঁহুর

আজ্ঞে করুন।

নাথু

কুমার সাহেব কোথায়?

ছাঁহুর

আমি এত বোঝালুম…এত বললুম…ফল হ'ল না; উনি কিছুতেই লুকিয়ে এখান থেকে চলে যেতে রাজী হলেন না।

নাথু

সে কি?…কেন যাবে না? আচ্ছা! ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ! তার যে গর্দ্দানা নেবার হুকুম হয়েছে।

(ধীরে ধীরে দেওয়ালীর প্রবেশ)

দেওয়ালী

সর্দার! আমি যে এখনও বেঁচে আছি সে কেবল তোমার স্নেহে। আমি সব শুনেছি। কিন্তু পালাব না।

আমার বাঁচা ও মরা দুই এক কথা,
প্রভু পাশে তুমি দোষী হ'লে পাব ব্যথা।
পড়িলে তাঁহার কোপে রক্ষা কারো নাই,
মোরে বধি' পিতারে দেখাও শির, তাই।

নাথু

কুমার সাহেব! দেওয়ালী! স্থির হও। আমি থাকৃতে একাজ হ'তে পারবে না। আমি তোমায় বুক দিয়ে রক্ষা করব। (আকাশে) আঁ্যা! কি বললে? লালা সাহেব আবার একজন লোক পাঠিয়েছেন?… আমার সমস্ত মৎলব গোলমাল হ'য়ে গেল যে!…আবার লোক?…খবর জানতে এসেছে?…দেওয়ালীর রক্ত দর্শন করতে এসেছে?

হায়! এই দুঃখ সুখ—এ সব কেবল
জন্মান্তরে কৃত পুণ্য-পাতকের ফল।

ছাঁহুর

জন্মান্তরে পাপ ছিল—

দেওয়ালী

হায়! আজ তার—

সাধারণী বাক

গুরুদণ্ড। ভাবিয়ো না মনে তবে আর—
তুমি ভুঞ্জিতেছ দণ্ড পরের লাগিয়া;
নিজেরি এ কর্ম্মফল; কি হবে রাগিয়া?
কাঁদিয়া দেওয়ালী কহে "কাট মোর শির"
বালকের কথা শুনে ঝরে অশ্রুনীর।

নাথু

আহা, কুমার! যদি বয়েস আমার তোমার সমান হ'ত।—তাহ'লে ছাঁহুরের হাতে নিজের শির পাঠিয়ে,— রাজা সাহেবকে ভুলিয়ে, তোমার শির বাঁচিয়ে দিতাম।

ছাঁহুর

বাবা,…একটা কথা;…আপনাকে বলব?

নাথু

কি এমন কথা বাপু?

ছাঁহুর

আপনি আমায় জ্ঞান দিলেন;…আপনার কথায় আমি আমার নিজের কর্ত্তব্য বুঝে নিয়েছি।…রাজা সাহেবের রক্ষার ভার আপনার, কুমার সাহেবের ভার কিন্তু আমার। এ…'না' বললে হবে না।…আর, এই বোধ হয় ঠিক সময়, আমাদের বয়সেও ঠিক এক।…তা হ'লে… তা হ'লে…আর দেরী নয়…আমায় কেটে ফেলে ছিন্ন মুণ্ডটা কুমার সাহেবের ব'লে রাজা সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক্।

নাথু

ঠিক্! (তরবারি উত্তোলন)

দেওয়ালী

(হাত ধরিয়া) এ বিষম কাজ আমি দিব না করিতে,
এ ভীষণ কাণ্ড আমি না পারি হেরিতে।

কথা রাখ, এ কর্ম্ম করো না সমাধান,
মরিলে ছ'াহুর,—আমি রাখিব না প্রাণ।

ছ'াহুর

কিন্তু এ যে জানা কথা,—সর্ব্ব লোকে বলে,—
"ভৃত্য দিবে তুচ্ছ প্রাণ—প্রভুর মঙ্গলে?"

দেওয়ালী

ক্ষুদ্র হোক্, তুচ্ছ হোক্, মানুষ সবাই;
অন্যে বলি দিয়ে আমি বাঁচিতে না চাই।

নাথু

হায়! হায়! কি আশ্চর্য্য তর্ক দু'জনার!
দু'জনেরি চেষ্টা আগে নিজে মরিবার!

ছ'াহুর

আমার মিনতি রাখ—

দেওয়ালী

রাখিয়াছি দূরে।

নাথু

হায়, হায়, পুত্র মোর—

ছ'াহুর

ভুলিছ প্রভুরে!

সাধারণী বাক্

দু'জনের মাঝখানে নাথু দাঁড়াইয়া—
কি কহিবে, কি কহিবে পায় না ভাবিয়া।
প্রভুর লাগিয়া পারে দিতে নিজ প্রাণ,
আজি সে সাহস হায় কেন মুহ্যমান?

দেওয়ালী

যারে অপদার্থ জেনে ত্যজে পিতামাতা,—
জীবনের 'পরে তার কিসের মমতা?
মিথ্যা মমতায় হায় আর কেন মোরে
ডুবাবে নরকে তুমি?

ছ'াহুর

হায়, স্নেহভরে
হেন কাজ করিতেছি ভাবিয়ো না মনে;
কলঙ্ক স্পর্শিবে কুলে, কলঙ্ক জীবনে,—

"নিজ রক্ত দিলে প্রাণে বাঁচিতেন প্রভু"—
কহিবে সকলে—"নীচ বেঁচে আছে তবু!"

সাধারণী বাক্

দু'জনই বালক হায়! দু'জনই বালক—

নাথু

দুইজনেরই প্রাণে কিবা কর্ত্তব্য-আলোক!

সাধারণী বাক্

প্রিয় তব প্রভু—

নাথু

প্রিয় সন্তান আমার।

সাধারণী বাক্

প্রভুভক্ত জানে—প্রাণ কখনো তাহার—
চাহিবে না প্রভুপুত্রে দিতে বলিদান
যেথা বলি দিলে চলে আপন সন্তান।

না তুলিয়া নত আঁখি অন্ধ অশ্রুজলে,
"ছ'াহুর বাঁ-দিকে বুঝি!" মনে মনে বলে।
পলকে ঝলসে খড়্গ,—কণ্টকিত কেশ,
আপন সন্তান আহা! হ'ল খণ্ডশেষ।

নাথু

হাঃ! কী দুরদৃষ্ট!...শেষে নিজের হাতে নিজের নির্দ্দোষী ছেলেটার গর্দ্দান নিতে হ'ল?...হাঃ!...যাই প্রভুকে রক্ত দেখাই— (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

লালা সাহেবের বাড়ীর আর একটি ঘর

লালা ও নাথু

নাথু

কেমন ক'রে হুজুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়?... (গলা খাঁখার দিয়া) আজ্ঞে...হুকুমমত...কুমার সাহেবের গর্দ্দান নেওয়া হ'য়েছে।

লালা

অ্যাঁ?...কাজটা শেষ হয়ে গেছে?...হুঁ...মৃত্যুকালে

বোধ হয় সে কাপুরুষের মতই আচরণ করেছিল ?…… কেমন…না ?

নাথু

না, হুজুর,…আমিই বরং তলোয়ার হাতে নিয়ে ইতস্ততঃ করছিলাম,…কুমারই আমাকে সাহস দিয়ে দৃঢ়স্বরে ব'লে উঠলেন, "নাথু সর্দ্দার ! আর বিলম্ব কেন ?…আমি এ প্রাণ রাখব না।" এই তাঁর শেষ কথা।

লালা

নাথু, তুমি জান, কুমার দেওয়ালী সিং আমার একমাত্র সন্তান ছিল।…ছুঁছরকে ডাক, আমি তাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করব। আহা ! দেওয়ালী আমার—ছুঁছরকে ছেড়ে একদণ্ড থাকৃত না,…বড় স্নেহ করত…বড্ড ভাব ছিল হু'টিতে…কই ছুঁছরকে ডাকলে ?

নাথু

ছুঁছর ?…সে তার 'কুমার সাহেব'কে হারিয়ে…কোথায় যে চ'লে গেছে…তা' কেউ বলতে পারে না।

আমিও এসেছি নিতে তব অনুমতি,
দেশ ছেড়ে বনে গিয়ে করিব বসতি।

লালা

কঠোর সে আজ্ঞা মোর,—পালনে কঠিন ;
বুঝিতেছি কুমারের শোকে তুমি ক্ষীণ।
আমার সে দুই ছেলে আপনার করি'
ভাল মন্দ দু'টিরেই হারাইলে, মরি !
কী করিবে ? জগতে এ প্রথা চিরদিন,—
প্রভুর পালিবে আজ্ঞা—যে জন অধীন।

(উভয়ের প্রস্থান)

সাধারণী বাক্

নানা উপদেশে লালা নাথুরে বুঝায়
তবু সে বিষণ্ণ, হায়, অবসন্ন-প্রায় ;
বাহিরে লোকের কাছে পারে না সে আর
লুকাতে প্রাণের ব্যথা, নয়নের ধার।
দেখ শোকাবহ দৃশ্য—করি' হাহাকার
নিজ সন্তানের নিজে করিছে সৎকার।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লালা সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে।

বিষণদেও

আমি বিষণদেও—গুরুকুলের উপাধ্যায় ; লালা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছি ; একটু কর্ম্ম আছে। ওহে ! …আমি প্রবেশ করতে ইচ্ছা করি।

নাথু

কে প্রবেশ করতে চায় ?…ওঃ আচার্য্য বিষণদেও !… প্রণাম।

বিষণ

আহা ! ছুঁছর ছেলেটি বড় ভাল ছিল।

নাথু

হুঁ…কিন্তু দেখুন, দোহাই আপনার, হুজুরকে যেন ওসব কথা শোনাবেন না।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

লালা সাহেবের ঘর। লালা সাহেব উপস্থিত। নাথুর প্রবেশ।

নাথু

প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।…বল্‌ছিলাম কি… গুরুকুলের মঠ থেকে আচার্য্য বিষণদেও এসেছেন।

লালা

তাঁকে এইখানে নিয়ে এস।

নাথু

যে আজ্ঞা (অগ্রসর হইয়া) এই পথে আসুন…এই যে …এই দিকে।

(বিষণের প্রবেশ)

লালা (অভিবাদন করিয়া)

আজ আমার পরম সৌভাগ্য…এখন আপনার পদার্পণের কারণ জানতে পারলে অনুগৃহীত হ'তে পারি।

বিষণ

কারণ বিশেষ কিছুই নয়…আমি কুমার দেওয়ালী

লালা

দেওয়ালীর সম্বন্ধে?...সে সম্বন্ধে আর কী বল্‌বেন? তার সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে;...আমি নাথু সর্দারকে হুকুম দিয়েছি...সে তামিল করেছে।

বিষণ

অধীর হ'য়ে পড়বেন না; আমি তার বিষয়েই কিছু বল্‌ব।......নাথু সর্দারকে আপনি হুকুম দিয়েছিলেন বটে...কিন্তু সে কাজে নাথুর কোনো মতেই প্রবৃত্তি হ'ল না; প্রভুপুত্রের রক্তপাত প্রভুর রক্তপাতের সমান মনে করে। পাতকের ভয়ে, লোকান্তরের দণ্ডের ভয়ে, জন্মান্তরে আত্মার অবনতির ভয়ে, কলঙ্কের ভয়ে, কুমার সাহেবের মমতায় সে নিজপুত্র ছাঁহুরের মুণ্ড এনে আপনাকে দেখিয়েছে। আজ আমি দেওয়ালীর হ'য়ে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বসেছি, আপনি তাকে ক্ষমা করুন।...যাঁর জন্যে লোকে নিজের সন্তান বিসর্জ্জন দিতে পারে, তাকে তুচ্ছ মনে করবেন না,...তার জীবন একেবারে মূল্যহীন হ'তে পারে না,...সে ক্ষমার্হ—

লালা

অাঁা......তবে সেটা কাপুরুষের কাজই করেছে,...যা ভেবেছিলাম তাই! ছাঁহুরকে তার জন্ম বলি দেওয়া হ'ল,...আর সে এমনি অপদার্থ...যে নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে সাহস করলে না?

বিষণ

আপনি ওসকল চিন্তা ত্যাগ করুন। ছাঁহুর স্বর্গে গেছে, তার আত্মা যাতে চঞ্চল হয়, এমন আলোচনা মনে স্থান দেবেন না। পুত্রকে আর ভর্ৎসনা করবেন না।

সাধারণী বাক্

বলিতে বলিতে, আহা, হিতৈষী ব্রাহ্মণ
বার বার মুছে আঁখি, ফিরায় বদন।
লালার কঠিন মন গলিল এবার,
পুত্রে ক্ষমা করি' প্রাণ লঘু হ'ল তাঁর।
নাথু আজ তাঁহাদের বাড়ায়ে আনন্দ
আনাগোনা ঘন ঘন, তবু কেন মন
উদাস হইয়া যায়, ভাবে সে এখন—
একদিন লালার নাতির নাতি হবে,
তাদের ক্ষরিতে সেবা নাথুর কে রবে?

বিষণদেও

নাথু সর্দার! ভগত! এই শুভদিনে তুমি আমাদের একটা গান শোনাও।

নাথু

যে আজ্ঞা। (গান)

শিমুলফুল! শিমুলফুল!
শিমুলফুলের পাখী!
আজ্‌কে কেন একলাটি তুই?
অরুণ কেন আঁখি?
কোথায় রে তোরা তরুণ সাথী?
আজকে সে কোথায়?
(আজ) আনাগোনা ঢেউ গণা তোর
ফুরাতে না চায়।
(শুধু) ঝাঁপিয়ে পড়া পাখা ঝাড়া
ঢেউয়ের ফেনা মাখি'।

সকলে

শিমুলফুল! শিমুলফুল!
সঙ্গীহারা পাখী!

নাথু

হায় যদি বাছা মোর থাকিত গো আজ,
হ'ত ছাঁহুরের সঙ্গে দেওয়ালীর নাচ;
আমিও দিতাম যোগ উঁহাদের দলে
আনন্দে ঝরিত আঁখি শোকের বদলে।

সাধারণী বাক্

দেখ আহা, চোখ দিয়া পড়িতেছে জল,
[illegible] আমোদ করে অন্তর বিকল।

নাথু

পড়িছে চোখের জল, কিন্তু দেখে লোকে

সাধারণী বাক্

রাখিতে প্রভুর মান নাথু নৃত্য করে !

নাথু

সম্মুখে ডাহিনে বামে হিমকণা ঝরে !

সাধারণী বাক্

হায় হিমকণা সম ঝরে আঁখিজল,
শোকাশ্রু-সাগরে ঘেরা পৃথিবী-মণ্ডল ।

*

চুপ্ ! শোনো ! কি বলিছে আচার্য্য বিষণ,
"যাত্রাকাল উপস্থিত !" দেওয়ানী এখন—
পিতার নিকটে ওই লইছে বিদায় ;
গুরু সহ উঠিল সে বংশ-শিবিকায় ।

নাথু তার সঙ্গে সঙ্গে যায় কতদূর ;
বিদায় মাগিছে কহি' বচন মধুর !

কি বলিছে ?…"শান্ত হ'য়ো, পাঠে দিও মন !
এবার রুখিলে প্রভু, কি হবে তখন ?"
এত বলি' মাথা নুয়ে
ভূমি ছুঁয়ে লইল বিদায় ;
দূর হ'তে দূরান্তরে
দেওয়ানীর শিবিকা মিলায় !
বাষ্পাকুল নেত্রে নাথু
চিত্রার্পিত দাঁড়ায়ে এখনো—
চাহিয়া সে পথ পানে,—
দুই হাতে অশ্রু মুছে ঘন !
কাঁদে আর ভাবে মনে
"টোল হ'তে এই পথে আর
ফিরিবে না পুত্র মোর,—
ফিরিবে না ছাঁহুর আমার !"

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

যবনিকা

আত্ম-ধারা

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়

ফারসী ও ফরাসী কাব্য রুশ উপন্যাস
প’ড়ে প’ড়ে সাধ্য নাই হই সাহিত্যিক ;
পয়ার ত্রিপদী ছন্দ হয়েছে অভ্যাস
তাই এসে পড়ে হাতে। ছন্দ সাংস্কৃতিক
অনেক ত’ ছিল জানা, কিছু গেছি ভুলে
আর কিছু বাঙ্গলায় মানায়ে লিখিতে
পারি না সহজে। শূন্যে লেখনীটি তুলে
ভেবে ভেবে গুণে মেপে মিলাতে শিখিতে
চাহি ধৈর্য্য ; হায়, হায়, সে আমার নাই ;
চাহি দীর্ঘ অবসর—কোথায় তা পাই ?

কবিতায় চাই ‘সাকী’ ‘সুরার পেয়ালা’,
পাগল প্রেমিক হবে মস্ত দার্শনিক
জগতের হাসি-কান্না শিশুর দেয়ালা,
নিত্য সত্য জীবনের যা কিছু ক্ষণিক।
ক্ষণিকের মসী আর লেখনীর বলে
‘ওমারী’ অমিয়া পিয়া হইতে অমর
গন্ধময় এ জীবনে পারে কি সকলে,
বিচারে আচারে যেথা নিয়ত সমর ?
তুষিতে নবীন কর্ণ নব্য বুলি চাই—
নব্য ছন্দ নব্য গীতি—শিক্ষা তাহে নাই।

তবু লিখিয়াছে হাত যা বলেছে মন,
তবু গাহিয়াছে কণ্ঠ বেদনা আপন,
আপন আনন্দ-বার্ত্তা ক্ষণিকেরে ভুলি
সমুচ্চ সুদূর পানে আশা-দৃষ্টি তুলি।

অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম-এ

ছুটির দরখাস্ত

একখানি নূতন মাসিক পত্রিকার আবির্ভাবের কথা শুনলেই আমার হরিষে বিষাদ হয়। আনন্দের কারণ এই যে সংসার-বিষবৃক্ষের যে দুটি ফল অমৃতোপম, তার অন্যতম ফল বাঙলা দেশে যে নিত্য নতুন ক'রে ফলছে এর পরিচয় পেয়ে কার মন না উৎফুল্ল হয়। সেই সঙ্গে বিষাদের কারণ এই যে ভয় হয় যে আবার ধরলে! এ ভয়ের কারণ অমূলক নয়—কেন না আমি একজন পুরোনো লেখক। আর নতুন লেখকের সঙ্গে পুরোনো লেখকের স্পষ্ট প্রভেদ এই যে, পুরোনো লেখকের জন্য মাসিক পত্রের দুয়োর খোলা আর নতুন লেখকের জন্য সে দরওয়াজা বন্ধ। যে ঢের লিখেছে সে না লিখতে চাইলেও আর পাঁচজনে তাকে ধর-পাকড় ক'রে লেখাবে, আর যে সবে লিখতে আরম্ভ করেছে আর পাঁচজনে তাকে ঢের লেখার সুযোগ দেবে না। ইংরাজরা বলেন যে বেহালা আর সুরা যত পুরোনো হয়, তত তার দাম বাড়ে, লেখা জিনিষটেও, লোকের বিশ্বাস ঐ সুর কিম্বা সুরার স্বজাতি।

সম্পাদকরা যে আমাদের লেখা চেয়ে নেন্ এ অবশ্য আমাদের পক্ষে অতি শ্লাঘার কথা। এ ব্যাপারে আমাদের vanity পরিতুষ্ট হয়,—যেমন নতুন লেখকদের লেখা প্রত্যাখান করলে তাঁদের vanity আহত হয়। জগৎটা vanity of vanities হ'তে পারে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক vanity মায়া নয়—অন্ততঃ আমাদের কাছে ত নয়ই। আমরা ভারত-উদ্ধারের কাজেই লাগি আর ভারতী-সেবার কাজেই লাগি, আমাদের সকল কাজের ভিতরেই কার্যাকরী শক্তি হ'চ্ছে আমাদের অহং।—পলিটিসিয়ান ও সাহিত্যিকের প্রভেদ এই যে, পলিটিসিয়ান জানে না তার অন্তরে দম দিচ্ছে কে, আর সাহিত্যিক জানেন।

আমার হস্তাক্ষর মাসিক পত্রিকায় অবাধে ছাপার অক্ষরে পরিণত হয় জেনে, আমি যে আত্মপ্রসাদ লাভ করি সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই সঙ্গে যে ভয়ই পাই সে কথাও অস্বীকার করবার যো নেই। এ ভয়ের প্রথম কারণ এই যে আত্মপ্রসাদ কারও আত্মশক্তি বাড়ায় না। বরং নিত্য দেখতে পাই যে যখন মানুষের ভিতরকার দম ফুরিয়ে আসে তখনই সে বাইরের ঠেলা চায়, অর্থাৎ সব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে ওঠে।—

আমার লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, আর আমি জানি জনকতক পাঠকের তা আছে, তাঁরা জানেন যে আমি কিছুদিন থেকে সাহিত্যরাজ্য হ'তে স'রে পড়বার জন্য পাঁয়তারা করছি। বঙ্গ-সাহিত্যের আসরে বীরবলের কোনও কালে অবতীর্ণ হবার প্রয়োজন ছিল কি না জানিনে, কিন্তু এখন যে নেই সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আজকাল শুনতে পাই বঙ্গসাহিত্যের পাঠক বড় বেশী নেই—যেদার আছেন পাঠিকা। বীরবলের লেখা পাঠিকাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে না, কারণ তা গল্প নয়। লোকমত এই যে, পাঠিকারা গল্প তেমনি ভালবাসেন গল্প যেমন পাঠকরা ভালবাসেন গুজব। স্ত্রীজাতি যে গল্প করতে ভালবাসেন তা ত সবাই জানে। তাঁরা পাঁচজনে একত্র হ'লে তাঁদের গল্প আর ফুরোয়ই না। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা যে গল্প শুনতেও ভালবাসেন তা আমি জানতুম। কেননা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে স্ত্রী-পঞ্চায়তে সকলেই একসঙ্গে কথা বলে; এবং কেউ কারও কথা শোনবার অবসর পায় না। তবে সাহিত্যের দরবারে হয়ত তাঁরা মুখ বন্ধ ক'রে কান খুলে রাখেন। কারণ এ দরবার হ'চ্ছে—আসলে পুরুষের দরবার।

বীরবল

বিচারপতি

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া তখনও অস্ত-সূর্য্যের শেষ রশ্মিকে অন্তরাবৃত করিতে সমর্থ হয় নাই, উচ্চশীর্ষ নারিকেল বৃক্ষের উন্নত শিরে সুবর্ণখচিত শিরোস্ত্রাণের মতই স্নিগ্ধ-সজল পত্ররাজির মধ্যের স্বর্ণময় সূর্য্যকিরণ বাতাসের মৃদু হিল্লোলে ঝলমল করিয়া উঠিতেছে, ঝকমক করিয়া জলিতেছে। পশ্চিমাকাশ শেষ শরতের স্বচ্ছ সুনীল আকাশকে নিজের সদ্যপ্রাপ্ত সুবর্ণ-লোহিত আবরণের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতেছিল, তাহারই প্রতিচ্ছায়ায় সমস্ত পৃথ্বীতল রক্তোজ্জল স্বর্ণপ্রভায় অনুরঞ্জিত প্রতিবিম্বিত।

সেই অরুণিমা রামাবতী মহানগরীর মস্তকের উপর বিমানচারী দেববৃন্দের হস্ত বর্ষিত আশীষ পুষ্পের মতই প্রতীয়মান হইতেছিল। মনে হইতেছিল, কলিঙ্গ-বিজয়ী প্রবল প্রতাপশালী মহারাজাধিরাজের বিজয়-সম্বর্দ্ধনার্থ আজ সুর সুন্দরীরা তাঁদের স্বহস্ত গ্রথিত স্বর্ণখচিত রক্ত-কমলের মালাসম্ভার সুরপুর উজাড় করিয়া এই মর্ত্ত্য রাজধানীর শিরোপরে ঢালিয়া দিয়াছেন।

নগর তোরণ হইতে রাজপুরী পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত ও তরুবীথিকা শোভিত রাজপথের দুইধারে পত্র পুষ্প গ্রথিত মাল্যদাম, কদলী বৃক্ষ, নবীন ধান্ত মঞ্জরী এবং দীপাবলী বিজয়ীকে সুস্বাগত জানাইতেছে। নগর তোরণ-পার্শ্বে এবং প্রাসাদ তোরণে সনারিকেল মঙ্গলঘট এবং ধৃতশঙ্খ পুরকন্যাগণ, স্বস্তিক হস্ত আচার্য্যসকল উৎসুক আগ্রহে প্রতীক্ষা পরায়ণ হইয়া আছে, তোরণে তোরণে বিজয়রাগিণী বাদিত হইতেছে। সমস্ত নাগরিক তাহাদের গৃহ পুষ্পমাল্যে ও আলোকমালায় ভূষিত করিয়া লাজপুষ্প বহিয়া প্রাসাদ শীর্ষে পথিপার্শ্বে উন্মুখচিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে। সমুদয় নগর বহিয়া গৌরবের ও আনন্দের স্রোত অপ্রতিহত বেগে বহিয়া যাইতেছিল।

আজ দুর্দ্ধর্ষ কলিঙ্গ-প্রজার গর্ব্বখর্ব্বকারী, অবনত অধঃপতিত পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা এবং পূর্ব্ব-গৌরবোজ্জল সম্মানের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা পরমকুশলী, পরম-সৌগত পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীরামপাল দেব দীর্ঘ প্রবাস হইতে বিজয় গৌরব বহন পূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। সঙ্গে কলিঙ্গ বিজয়ের সর্ব্ব-প্রধান সহায়ক ভট্টারক পাদীয় যুবরাজ শ্রীমান রাজ্যপাল দেব।

রাজহস্তী বিদ্যামাণিক্য আজও তার বিশাল শরীরকে বারাণসী শিল্পজাত জগতে অতুলীয় স্বর্ণসূত্রখচিত ঘন আস্তরণে সুপ্রশস্ত পৃষ্ঠদেশকে আবৃত করিয়া স্বর্ণ ও রজতময় অসংখ্য বিভূষণে দেহভার বর্দ্ধিত ও শোভাবিস্তার করিয়া সুবর্ণময় অসংখ্য গলঘণ্টার রব তুলিয়া মত্ত গমনে শোভাযাত্রার সকল শোভাকে পূর্ণতর করিয়া চলিয়াছে। মাতুল অঙ্গরাজ প্রদত্ত এই অতুলনীয় উপহার প্রিয়তর হস্তিপৃষ্ঠে ইহার সুবর্ণখচিত আসনে মুক্তার ঝালরযুক্ত স্বর্ণময় ছত্রতলে সূর্য্যদীপ্ত উজ্জল হীরকমণ্ডিত মুকুটধারী মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক, পরম সৌগত রামপালদেব সমাসীন। তাঁর স্বভাবসুন্দর স্থিরগাম্ভীর্য্যময় মুখ দীর্ঘ প্রবাসের পর স্বদেশ ও স্বজন সম্মিলনের সুখে সুখমিত। তিনি তাঁর চরিত্রোচিত ধীর বিনম্র শিরে মস্তক নত করিয়া তাঁর সকল প্রজার সভক্তি অভিবাদনের প্রত্যভিবাদন জানাইতেছিলেন। আভ্যন্তরিক তেজোদীপ্তি এবং সুসংযত চরিত্রবল এই প্রৌঢ় সীমায় শেষপ্রান্তেও ইঁহাকে নিরুৎসাহ অথবা বার্দ্ধক্যজীর্ণ করিতে পারে নাই, সেই যৌবনের খরোজ্জল মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মতই দেহমনে প্রদীপ্ত রাখিয়াছে।

রাবণ-বিজয়ী রামচন্দ্রের মতই প্রজারঞ্জক ন্যায়বান নরপতির গৃহাগমন, প্রজাসাধারণ পুলক স্পন্দিত বক্ষে উচ্চ-আনন্দ-রবে মুখরিত করিয়া তুলিল।

রাজাধিরাজের দক্ষিণে মহাগজ সুপ্রতিষ্ঠিকের পৃষ্ঠদেশে কাশ্মীর প্রদেশীয় সূক্ষ্মশিল্পযুক্ত আস্তরণে রজত স্বর্ণমণ্ডিত

দ্বিতীয় আসনে ইন্দ্রের পার্শ্বে জয়ন্তকুমারের মতই শোভা পাইতেছিলেন যুবরাজ রাজ্যপাল দেব।

রাজকীয় শোভাযাত্রা যে সকল পথের উপর দিয়া চলিল তাহারই এক পথের ধারে একটি সামান্য অবস্থাপন্ন গৃহস্থ গৃহের ছাদের উপর যাত্রাদর্শনেচ্ছুক পুরনারীদের মধ্য হইতে হুলুধ্বনি ও লাজপুষ্প-বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একগাছি সুচারুরূপে গাঁথা পদ্মকুঁড়ির মালা যুবরাজের মাথার উপর এবং পরক্ষণেই তাঁর রত্নখচিত শিরোস্ত্রাণ স্খলিত হইয়া তাঁর গলার উপর নামিয়া আসিল। চমকিত হইয়া রাজপুত্র মুখ তুলিলে পাশের বাড়ীর ছাদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেই একতলা বাড়ীখানি তাঁর সুপরিচিত, ছাদের আলিসার উপর দিয়া ঝুলিয়া পড়া মাল্যদাত্রীর হাতখানি ও উৎসুক আনন্দে সুখ-সমুজ্জ্বল মুখটীও তাঁর ঔৎসুক্যান্বিত প্রসন্ন-মধুর দৃষ্টির মধ্যে ধরা দিল। তাঁর স্মিত-প্রফুল্ল সুন্দর মুখ আনন্দের প্রোজ্জ্বল আভায় আলোকিত হইয়া উঠিল। মৃদুমধুর হাস্যের সস্মিত-রেখা প্রবালরক্ত সূক্ষ্ম অধরপ্রান্তে খেলিয়া গেল। উহার পার্শ্ববর্ত্তিনী অপরা বর্ষিয়সী নারীর প্রতি চাহিয়া ললাটে যোড়কর স্পর্শ করাইয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন।

রাজহস্তী তাঁহাকে বহন করিয়া ইহার মধ্যেই চলিয়া আসিল। এই ক্ষুদ্র গৃহ যুবরাজ রাজ্যপালের শাস্ত্রশিক্ষক আচার্য্য সুদেব ভট্টের আবাস-গৃহ।

রাজ পুরাঙ্গনে বিচিত্র আলিম্পনের মধ্যে সুবৃহৎ কদলী-বৃক্ষ প্রোথিত করিয়া সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ আবৃত হইয়াছিল, কদলী-কাণ্ড পুষ্পমাল্যে বিজড়িত এবং চন্দ্রাতপের ঝালর সমস্তই সুগ্রথিত পুষ্পমাল্য দ্বারা রচিত হইয়াছিল। বরেন্দ্র, মগধ, উৎকলিঙ্গ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষের সার্ব্বভৌম অধীশ্বরের পট্টমহিষী, পট্টমহাদেবী সন্ধ্যা দেবী রক্তাম্বর ও রত্নাভরণ-ভূষিতা হইয়া স্বুবর্ণ বরণডালা হাতে পতি-পুত্রকে বরণ করিয়া লইতে আসিলেন। সহস্র সহস্র পুরনারী হুলুধ্বনি, শঙ্খরব এবং মঙ্গলসঙ্গীত গাহিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তন করিল। পুষ্পলাজ এবং পুষ্পমাল্য ধারাকারে বর্ষিত হইতে লাগিল।

মঙ্গল প্রদীপ উজ্জ্বলশিখায় জ্বলিতে লাগিল, শ্রীবর্ত্তিক এবং ক্ষৌমবস্ত্রাবৃত রঞ্জিত স্বর্ণ-সুসজ্জিতা কুল-লক্ষ্মী-গণের হস্তে বিচিত্র শোভায় মণ্ডিত হইয়া দেখা দিল। স্বর্ণভৃঙ্গার জলধারা দিয়া পুষ্পময় পথে পরমেশ্বর, পরমকুশলী ভট্টারক প্রধান রাজাধিরাজ এবং রাজাধিরাজ কুমারকে গৃহ প্রবেশ করান হইল।

বিরহতাপতপ্তা সন্ধ্যাদেবীর আনন্দস্মিত মুখে চিরমধুর স্নেহ-দৃষ্টিপাত করিয়া রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল ছিলে সন্ধ্যা ?"

পট্টমহাদেবী মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "ভালছিলাম না, ভাল আছি।"

রামপালদেব উত্তর শুনিয়া প্রীতচিত্তে মৃদু হাসিলেন, রাজ-কুমারের ললাটে বক্ষে মঙ্গলদীপ হইতে তাপ লইয়া সেই হাত বুলাইয়া দিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান রাজার দিকে ঈষৎ ফিরিয়া চাহিয়া সন্ধ্যাদেবী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,—

"এইবার আমার রাজুকে বউ সঙ্গে ক'রে বরণ করতে চাই মহারাজাধিরাজ ; আর এখন একলা বরণ পছন্দ হচ্চে না। কবে বউ আনচেন, বলুন ?"

রাজ্যপালের গৌরমুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে ঈষৎ নতমুখে গলার সেই পদ্মমালাটা হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

রাজাধিরাজ সস্মিতমুখে মহিষীর দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, "সে ব্যবস্থা আমি ক'রেই এসেছি, মহাদেবি! জানি, তা না হলে ফিরে এসেই তিরস্কৃত হতে হবে। কল্যাণের রাজকন্যা কুমারী জয়শ্রীর সঙ্গে বিয়ের কথা স্থির হয়ে গেছে। এখন একটা দিন স্থির করাই শুধু বাকি।"

সন্ধ্যারাণী মুহূর্ত্তে আত্মবিস্মৃতা হইয়া গিয়া গভীর হর্ষবেদনায় সমুচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—"কল্যাণের রাজকন্যা! দিদিও তো কল্যাণেরই রাজকন্যা ছিলেন ?"

রামপাল এই আনন্দোৎসবের মধ্যখানে অকস্মাৎ এই বিস্মৃত দুঃখ-স্মৃতির আলোচনা আসিয়া পড়ায় ঈষৎ বিমনা হইয়া গিয়া একটা মৃদু নিক্ষিপ্ত শ্বাসের সহিত ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—

"হ্যাঁ, এই মেয়েটি তাঁরই ভাইঝি।" তারপর একটুখানি নীরব থাকিয়া এবার ঈষৎ বেগের সহিত কহিয়া উঠিলেন, "সেই তাঁরই মত মুখশ্রী, তেমনই শ্বেতপদ্মের মত

বর্ণ, আর আমি আশাকরি, আমি আশাকরি তাঁর মতই উন্নত উদার চরিত্র, তেজস্বিতা ও হৃদয় সম্পদের অধিকারিণীও এ সম্পূর্ণরূপে হ'তে পারবে।"

রাজাধিরাজ চলিয়া গেলেন, সন্ধ্যার দুই নেত্র সজল হইয়া আসিল, পতনোন্মুখ অশ্রু কষ্টে রোধ করিয়া সে আবার যথাকার্য্যে মনোযোগী হইতে গেল। যুবরাজের আনন্দোৎফুল্ল মুখ ইহার মধ্যে বিরস ও বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, ঈষৎ অসহিষ্ণু হইয়া অনুযোগ পূর্ণকণ্ঠে অন্যের অশ্রাব্য মৃদুস্বরে তিনি কহিয়া উঠিলেন,—

"কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবে মাগো! আমার পা ব্যথা করে না বুঝি?"

গভীর স্নেহের দৃষ্টিতে পুত্রের মুখে চাহিয়া সলজ্জা জননী দ্রুতহস্তে বরণক্রিয়া সমাধা করিতে করিতে বাৎসল্যরসে সিক্তকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন,—

"এই যে বাপধন! এই যে হয়ে গেল!"—

মনে মনে স্মরণ করিয়া একান্ত ভক্তিভরে উদ্দেশ্যে সে তখন কহিতেছিল, "দিদি! তুমি কোথা আছ, তুমি তোমার রাজুকে স্বর্গ থেকে আজ আশীর্ব্বাদ করো, ওতো আমার নয়, ও যে তোমারই।"—

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

কবীর

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ

শোভন বাণী কত
সরস সুরচনা
কণ্ঠে উঠে আজি ধ্বনিয়া,
শুভদ রাগ সনে
রাগিণী অনাহত
উঠিছে হৃদি মাঝে রণিয়া।

আমারি সনে সেই
হৃদয়-সখা মোর
খেলিতে হোরি আজ আসে গো,
বাজিছে ধ্বনি তার
কত না সুরে সুরে
মিলন-উৎসব মাঝে গো।

শব্দ শুনে তার
শয্যা ত্যজি' আজ
কামনা জায় মোরে জাগারে,
পবন বঁধু মোর
বাসর রজনীর
মিলন-দীপ রাখে জ্বালায়ে।

আধুনিক বাংলা নাট্য-সাহিত্য

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার, আই-সি-এস্

আধুনিক বাংলা নাট্য-সাহিত্য নেই বল্‌লে একটা অপ্রিয় সত্যকে শুধু প্রিয় ক'রে বলা হবে। আমাদের দেশের তথাকথিত আধুনিক রঙ্গমঞ্চগুলিতে যে সব নাটকের অভিনয় দেখে আমাদের নাট্যরসিকদের রোমাঞ্চ জাগে অথবা, অবস্থা-ভেদে ভাবাবেশ হয়, কোনোও বিদেশী দর্শক যদি সেগুলির রসবোধ করতে পারতেন, তাহ'লে আমাদের রঙ্গালয়গুলির আবহাওয়া যে তার সজাগ মনে রূপকথার ঘুমন্তপুরীর স্মৃতি জাগিয়ে তুলত না, সে কথা নিশ্চয় ক'রে বলা শক্ত হবে! বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাস করেও যে-দেশের রসিক সজ্জন তিন্‌শো বছর আগেকার ঐতিহাস ঘটনা বা ত্রিশ বছর আগেকার, জীর্ণ সামাজিক-সমস্যাকে অবলম্বন ক'রে রচিত নাটকের অভিনয় দেখে পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজেদের রসক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারেন, সে-দেশের থিয়েটার দেখে কোনোও বিদেশী রসবেত্তার এ ভুলটি হওয়া নেহাৎ অস্বাভাবিক নয়।

কথাটাকে একটু বিশদ ক'রে বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি। আমাদের দেশের নাট্যালয়গুলিতে গত পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে যে সব নাটক অভিনীত হ'য়েছে সেগুলোর একটা টীকা-সম্বলিত তালিকা সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লে আমার বক্তব্যটি অনেক অংশে সহজ হ'য়ে যেত। এবিষয়ে যখন কোনোও বিশেষজ্ঞের গবেষণা ছাত্রের কাছে নেই, তখন আমাকে নিজের সামান্য জ্ঞান ও স্বল্প অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করতে হ'চ্ছে। আমাদের দেশের রঙ্গালয়ে সাধারণতঃ যে সব নাটকের অভিনয় হ'য়ে থাকে, সেগুলোকে মোটামুটি এই কয়টি শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে—

(১) ঐতিহাসিক নাটক—এই শ্রেণীর নাটক রচনা ক'রে যাঁরা যশ-অর্জ্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে গিরীশ ঘোষ, ডি, এল, রায় ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাম সকলের কাছে সুপরিচিত। বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চে এই ধরণের নাটকের জনপ্রিয়তা এতকাল ধ'রে অব্যাহত রয়েছে যে, অনেক অজ্ঞাতনামা নাট্যকার এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে এখন পর্য্যন্তও নাট্যামোদীদের কাছ থেকে খ্যাতি আহরণ কর্‌ছেন। উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

(২) পৌরাণিক নাটক—আজকাল পৌরাণিক নাটকের রেওয়াজ অনেকটা কমে গেছে দেখতে পাই। কিন্তু কয়েক বছর আগেও এই শ্রেণীর নাটক বাঙালী দর্শকদের রসবোধকে কি ভাবে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুল্‌তো, কৈশোরের অনেক স্মৃতি এখনও তার সাক্ষ্য দেয়। অনেক রসিক বৃদ্ধের মুখে এখনও এমন কথাও শুন্‌তে পাই যে এই জাতীয় নাটকই নাকি একান্তভাবে বাংলার নিজস্ব জিনিষ,—আমাদের দেশের কালচার ও অবদানের সঙ্গে এই শ্রেণীর নাটকেরই নাকি একমাত্র যোগ-সূত্র আছে।

(৩) রোমান্টিক নাটক—রবীন্দ্রনাথের যে দু' একটা নাটক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে স্থান পেয়েছে, সেগুলোকে বাদ দিলেও আমাদের রঙ্গমঞ্চে মাঝে মাঝে এই ধরণের নাটকের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব চোখে পড়ে।

কিছুদিন আগে থেকে এই শ্রেণীর নাটকের একটা রূপান্তর আমাদের ষ্টেজে দেখা দিয়েছে। নৃত্যগীত-বহুল বিদেশী 'মিউজিক্যাল কমেডী'র (musical comedy) সঙ্গে এই নতুন আমদানীর যেন একটা গোত্রসম্বন্ধ আছে। কিন্তু তাই ব'লে এই ধরণের নাটককে আমাদের দেশে সব সময়ে কমেডি-পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। উৎকট হাস্যরসের সঙ্গে ট্র্যাজেডির অসঙ্গত মিলন ঘটানো আমাদের অঘটন-ঘটন-পটীয়ান্ নাট্যকারদের কাছে এখনও অসম্ভব নয়!

(৪) সামাজিক নাটক—প্রযোজনার সুবিধা ও সুলভতার দিক দিয়ে এই শ্রেণীর নাটক এককালে রঙ্গালয়ের ম্যানেজারদের কাছে খুব প্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। দর্শকদের কাছেও পনেরো-ষোলো বছর আগে এই-শ্রেণীর নাটকের জনপ্রিয়তা কম ছিল না। কিন্তু যেদিন থেকে সমাজ-সংস্কারের দাবী জোড়াতালির সহজ পথ ত্যাগ ক'রে নতুন সৃষ্টির গুরু-দায়িত্বকে গ্রহণ করেছে, সেইদিন থেকেই গিরীশী আমলের সামাজিক নাটকের আভ্যন্তরিক আকর্ষণ ক্ষীণ হ'য়ে পড়েছে। তাহ'লেও এই শ্রেণীর নাটকের সমঝদার এখনও আমাদের দেশে নেহাৎ কম নয়।

(৫) "নভেলী'' নাটক—সম্প্রতি, উপন্যাসকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী ক'রে নাটকে পরিণত করবার একটা ফ্যাশান খুব দ্রুত বেড়ে চলেছে দেখতে পাই। গত কয়েক বছরের মধ্যে একাধিক উপন্যাস এইভাবে নাট্যরূপ গ্রহণ ক'রে, আমাদের থিয়েটারের আহার যোগাচ্ছে। আমাদের নাট্য-সাহিত্যের দারিদ্র্য ও দুর্ব্বলতার—এইটেই সব চেয়ে সুপরিস্ফুট প্রমাণ কিনা সে কথা এখানে আলোচনা করতে চাই নে।

মোটামুটি এই পাঁচধরণের নাটক নিয়েই আমাদের আধুনিক বাংলা থিয়েটার। এই থিয়েটারের স্বরূপ দেখে আমাদের নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করা আর যার পক্ষেই সম্ভব হোক না কেন, বৃহত্তর জগতের যুগ-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, অথবা তুলনামূলক বিচার করবার সুযোগ যাঁদের হ'য়েছে—তাঁদের পক্ষে যে এটা সম্ভব হবে না সে কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। কোনোও বিশেষ নাটক বা নাট্যরীতির সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এমন কথাও আমি বলতে চাইনে যে আমাদের নাটকের বিষয়বস্তু সব সময়ে উচ্চশ্রেণীর রসমূর্ত্তি সৃষ্টিকরার পরিপন্থী—যদিও গত যুগের ইংরেজ নাট্যকার ষ্টিফেন্ ফিলিপ্‌সের (Stephen Phillips) অদ্ভুত নাট্য-জীবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা একথা নিশ্চয় ক'রে বলতে রাজী হবেন না। আমার বক্তব্য শুধু এই যে আমাদের তথাকথিত আধুনিক রঙ্গমঞ্চগুলিতে যেসব নাটকের অভিনয় আমরা সচরাচর দেখতে পাই, তাদের সঙ্গে আমাদের যুগ-জীবনের কোনোও সংস্পর্শ নেই। সুতরাং রসসৃষ্টি হিসেবেও এই সব নাটক আমাদের রসানুভূতির উদ্রেক করে না। একথা যদি সত্য হয়, তবে আমরা প্রবন্ধের এই মূল প্রশ্নটির একটা সদুত্তর চাই—ষ্টেজের আবহাওয়া ও বাইরের জীবনের মধ্যে এই বিরাট ব্যবধানটা একটা অভিকায় চৈনিক প্রাচীরের মত কেমন ক'রে এসে দাঁড়ালো? বাত্যাবহ সমুদ্রের মত ভাব-বিক্ষুব্ধ প্রাক্-সাময়িক বিলেতী সমাজ-জীবনের যে বহুচিত্র রূপটি সে-যুগের বিলেতী নাট্য-সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছিল, শ' (Shaw) ও গল্‌স্‌ওয়ার্দির (Galsworthy) পাঠকের কাছে তা সুপরিচিত। বাংলার নাট্য-সাহিত্যে আধুনিক জীবনের সেই নাড়ী-স্পন্দনের আভাস নেই কেন?

এই সমস্যাটি আলোচনা করবার পূর্ব্বে মুখবন্ধ হিসেবে একটা কথা ব'লে রাখতে চাই। সাহিত্যকে যাঁরা সমাজ-দেহের সংশ্রবে দেখতে চান্, অথবা সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র নেই বলে অনুযোগ করেন, তাঁরা কেউ কখনো ঘুণাক্ষরেও সাহিত্যকে পলিটিক্সের প্রতিচ্ছায়া হিসেবে দেখতে চান না। একথাটা বল্‌বার প্রয়োজন ছিল। কারণ সম্প্রতি দেখলুম দু' একজন সাহিত্যিক একটা ধুয়ো তুলেছেন—আমাদের সাহিত্যে আজকালকার দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনোও সাড়া নেই কেন? বলা বাহুল্য এই ধরণের অভিযোগের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নেই। কবে কোথায় রাজনৈতিক আন্দোলনের চাঞ্চল্যকে আশ্রয় ক'রে উঁচু দরের সমসাময়িক সাহিত্য গড়ে উঠেছে? স্বদেশী আন্দোলনের সাহিত্যিক উর্ব্বরতার কথা এখনও ইতিহাসের বিস্মৃতীভূত হয় নি। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত যখন যেখানে স্বাধীনতার আন্দোলন হয়েছে, সেগুলোর ইতিহাস স্মরণ করলে এই কথাটাই কি বারবার মনে হয় না যে, পলিটিক্সের আবহাওয়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল নয়? প্লাবনের জলে শুধু ধ্বংসেরই সংবাদ থাকে; সৃষ্টির বীজ খুঁজতে

হলে যন্ত্রা-শেষের পরিমাটির অপেক্ষায় থাকতে হবে। বাংলা নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে আমার অনুযোগ সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্তরের। আমার জিজ্ঞাস্যের মর্ম শুধু এই যে, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলন নিরপেক্ষ, আধুনিক জীবনের যে স্পন্দন, খুব ক্ষীণ হলেও, লক্ষ্য করছি। নাট্য সাহিত্যে তার ইঙ্গিতটুকুও নেই কেন ?

কেন নেই ?—শেষ পর্যন্ত সে প্রশ্নের কোনোও সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারিনে। তবে, কিছুদিন থেকে এ বিষয়ে যে দু' চারটে কথা মনে এসেছে এই প্রবন্ধে সেগুলো আলোচনা করতে চাই। কিন্তু তার আগে একটা অতি পুরোনো যুক্তিকে বিচার ক'রে দেখা আবশ্যক। আমাদের আধুনিক যুগের থিয়েটার সম্বন্ধে দৈবাৎ যদি কখনো কোথাও সুধীজনের মধ্যে আলোচনা হয়, তবে নৈরাশ্যের সুরে একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, যতদিন আমাদের দেশের দর্শকদের রুচির পরিবর্ত্তন না হচ্ছে, ততদিন নাকি আমাদের রঙ্গমঞ্চগুলিতে উচ্চাঙ্গের নাটকের কোনোও স্থান হবে না। কথাটাকে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় এই শ্রেণীর সমালোচকদের মতে থিয়েটারের স্বরূপ নির্ভর করে একান্ত ভাবে দর্শকদের চাহিদার ওপর।

এই মতবাদটি যে শুধু আমাদের দেশেই প্রবল তা' নয়। ইউরোপেও বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকে যখন থিয়েটারের বাজার মন্দা হ'তে সুরু হয়, তখন অনেক চপলমতি সমালোচক এই যুক্তিরই অনুসরণ ক'রে থিয়েটারের ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশ হ'য়ে পড়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিলেতী ড্রামার ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক সুধী ও বিজ্ঞ সমালোচকও এই ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন। বছর দু' তিন আগে জনৈক ইংরেজ প্রফেসার, জন্ কুন্‌লিফ্ (Prof. John. W. Cunliffe) 'Modern English playwrights' নাম দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বিলেতী ড্রামার একটা অতি উপাদেয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে সুরু ক'রে অষ্টম দশক পর্য্যন্ত বিলেতী নাট্য সাহিত্যের মুমূর্ষু অবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে, শেষটায় কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি এই যুক্তিটিরই ইঙ্গিত করেছেন। সে যুগের নাট্যরসিকদের মতামত আলোচনা ক'রে, একজন সমসাময়িক বিজ্ঞ রসবেত্তার দিনপঞ্জী থেকে নিজের অনুমানের সপক্ষে এই ক'টি কথা উদ্ধৃত করে দিয়েছেন—

"The great want of the stage in our day (1861) is an educated public that will care for its successes, honestly inquire into its failures, and make managers and actors feel that they are not dependent for appriciation of their efforts on the verdict that comes of the one mind divided into fragments, between Mr. Dapperwit in the stalls, Lord Froth in the side boxes, and Pompey Doodle in the gallery."

বাঙালী দর্শকদের রুচির এই ধরণের কিম্ভুত কিমাকার বর্ণনা আমাদের দেশের অনেক নাট্যরসিকদের মুখেও শুনেছি। এই প্রকারের বাধা বিঘ্ন যে সত্যিকার নাট্য-সাহিত্য রচনার পরিপন্থী সে কথা একেবারে অস্বীকার করবার উপায় নেই। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে—যেমন কাব্যে অথবা উপন্যাসে—পাঠকপাঠিকাদের চাহিদার প্রভাব অতি সামান্য; প্রয়োজন হলে, জনসাধারণের রুচিকে অগ্রাহ্য ক'রেও কবি বা কথা—সাহিত্যিকের পক্ষে রসরূপ সৃষ্টি করা শক্ত নয়। কিন্তু এতখানি স্বাতন্ত্র্য কোনো দেশের নাট্যকারেরাই এখন পর্য্যন্তও অর্জ্জন করতে পারেন নি—যাঁরা এই দুঃসাহসে ব্রতী হ'য়েছেন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে সহজে তাঁদের স্থান হয়নি। সুতরাং এই ধরণের যুক্তিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। কিন্তু তা'হলেও একথা মানতে হবে যে দর্শকদের রুচির দৌরাত্ম্যকে নিয়মিত করবার শক্তি প্রতিভাবান্ লেখকমাত্রেরই অল্পাধিক পরিমাণে আছে; আর জনসাধারণের রুচিকে মার্জ্জিত ক'রে তোলার নিদর্শনও নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল

নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপীয় থিয়েটারে ইব্‌সেনের প্রতিষ্ঠা ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিলেতী ষ্টেজে বার্ণাড্‌ শ'র প্রভাব—তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভিক্টোরিয়া যুগের মাঝামাঝি থেকে সুরু ক'রে ত্রিশ বছর ধ'রে—রবার্টসনের (T. W. Robertson) বাস্তবভাবী (naturalistic) কমেডী, ফরাসী নাট্যকার স্যরদুর (Sardou) ভাবানুবাদ, গিল্‌বার্ট ও স্যালিভানের (Gilbert and Sullivan) অপেরা, হেন্‌রি আর্থার জোন্‌সের (H. A. Jones) যৌবনের ভাবপ্রবণতা ও আর্থার্‌ পিনেরোর (A. W. Pinero) মজলিসী ড্রামার ওপর একাদিক্রমে লালিত নাট্যামোদী দর্শকদের রুচির সুসংস্কার সাধন করলেন বার্ণাড শ' কেমন ক'রে, সে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করা এ প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে, বার্ণাড শ'র পক্ষে যা বিলেতে সম্ভব হয়েছিল, প্রতিভাবান্‌ নাট্যকারের পক্ষেও আমাদের দেশে তা' সম্ভব হ'তে পারে। সুতরাং দর্শকদের বদরুচির অজুহাৎ দেখিয়ে আমাদের আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের দুরবস্থার কৈফিয়ৎ দেওয়া চল্‌বে না।

সবদেশের থিয়েটারের মত আমাদের বাংলা থিয়েটারেরও তিন্‌টি অঙ্গ—(১) কথা, (২) অভিনয় ও (৩) প্রয়োগ শিল্প। এই তিনটি অঙ্গের সহযোগিতার ওপর থিয়েটারের সাফল্য নির্ভর করে; এদের পরস্পরের প্রতিযোগিতার ফলে থিয়েটারের রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়। সুতরাং থিয়েটারের এই তিনটি অঙ্গের সবিস্তার আলোচনা না ক'রে বাংলা থিয়েটার সম্বন্ধে কোনোও কথা নিঃসন্দেহে বলার দায়িত্ব যে যথেষ্ট, সে কথা আমি বিস্মৃত হই নি। কিন্তু এই প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য অতটা ব্যাপক নয়; তা ছাড়া রূপদক্ষতা ও প্রয়োগ-শিল্প সম্বন্ধে অবিশেষজ্ঞের মত দু'চারটে কথা বলতে গিয়ে আমার মূল বাক্তব্য থেকে আমি বিচলিত হ'তে চাই নে। থিয়েটারের একটা অঙ্গই আমার আলোচ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বিলেতী থিয়েটারের মত আমাদের এ যুগের থিয়েটার এখনও শুধু অভিনেতাদের আসর জমাবার প্রশস্ত ক্ষেত্র। বিদেশী দর্শকদের মত আমাদের দর্শকদের এ কথা বলতে শুনিনে, 'চলুন অমুকের অমুক নাটকটা দেখে আসি, বা অমুকের নতুন নাটকটা কোথায় অভিনীত হচ্ছে, খবর নি।' শুনি এই ধরণের কথা,—'চলুন আজ নাট্যমন্দিরে যাওয়া যাক, শিশির ভাদুড়ী নামছেন; 'ষ্টারে' গিয়ে লাভ নেই, অমুক নট আজ নামবেন না; মনোমোহনে অমুক নট অমুক ভূমিকায় অভিনয় করবেন'—ইত্যাদি। আমাদের দেশের নটনটীর ওপর কটাক্ষ কর্‌বার প্রবৃত্তি আমার নেই; আমি শুধু আমাদের দর্শকদের মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়ে আমাদের বাংলা থিয়েটারের বর্ত্তমান অবস্থাটা নির্দ্দেশ করতে চেষ্টা করছি। দেশ বিদেশের থিয়েটারের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁদের কাছে বাংলা থিয়েটারের এই অবস্থাটা যতই শোচনীয় মনে হোক না কেন, অভূতপূর্ব্ব মনে হবে না। যখনই যে দেশে নাট্য-সাহিত্য দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, তখনই সেখানে সেই অনুপাতে অভিনেতাদের প্রভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বিলেতী নাট্য-সাহিত্যের রুগ্ন অবস্থায়, বিলেতী দর্শকেরাও নাট্যকারদের উপেক্ষা ক'রে অভিনেতাদেরই গৌরবান্বিত করতেন। বিংশ শতাব্দীর দর্শকদের মত পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতেন না, 'চলুন, শ' বা গল্‌স্‌ওয়ার্দির নতুন নাটকটা দেখতে যাবেন?' বলতেন, 'চলুন, কেম্‌ব্‌ল্‌ (Kemble), কীন (Keen), ম্যাক্‌রেডি (Mackready), ফেল্‌প্‌স্‌ (Phelps), অথবা আরভিং (Irving) দেখে আসি। বিলেতের একজন তরুণ নাট্য-সমালোচক, আইভর্‌ ব্রাউন (Ivor Brown) সেই যুগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন...

"The primary interest was not in the thing written, but in the thing done......what mattered was neither the mind of the original Shakespeare nor the absence of a new one, but the arrival of a new virtuoso who would berattle the town with his rhetoric

or conquer it with his grace in some grand Shakespearean *rôle*."

সমসাময়িক দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাগজে আমাদের দেশের থিয়েটারের সমালোচনা দেখে, এই কথাগুলোর প্রতিধ্বনিই কি মনে জাগে না? আমার মনে হয় আমাদের দেশের থিয়েটারের একটা প্রধান সমস্যা হ'চ্ছে রঙ্গালয়ে সাহিত্যিকদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা। যতদিন না তা' হ'চ্ছে, ততদিন আমাদের যুগজীবনের সঙ্গে আমাদের থিয়েটারের কোনো যোগ-সম্বন্ধ থাকবে না। Actors' theatreকে dramatists' theatreএ পরিণত করার এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হ'বে আমাদের সাহিত্যিকদেরই।

এ দায়িত্ব এ যাবৎ তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি কেন? কেন শুধু কাব্য ও উপন্যাসের মধ্যেই তাঁদের প্রতিভা সীমাবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে? বুদ্ধিগত গভীরতার যে লক্ষণ আমরা কাব্যে ও উপন্যাসে দেখতে পাই, নাটকে তার আভাসটুকুও নেই কেন?—এই সব প্রশ্নের উত্তরে একটা খুব সহজ উত্তর অনেকের মুখে শুনেছি। তাঁরা বলেন কালচক্রের আবর্ত্তের মত নাকি সাহিত্যের বিকাশেও উত্থান পতন আছে। তাই এক এক যুগে শুধু এক এক ধরণের সাহিত্যই নাকি বিকাশ লাভ করতে পারে। এই থিওরির কেন্দ্রগত সত্যটিকে স্বীকার ক'রে নিতে রাজী আছি। কিন্তু আমার আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এই থিওরির কোনোও সম্পর্ক নেই। নাট্য-সাহিত্যের যুগগত দুর্ব্বলতার হেতু আমার জিজ্ঞাস্য নয়। ত্রিশ চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ শৈশব অতিক্রম ক'রে আমাদের নাট্য-সাহিত্য এখনও কেন যৌবনের রাজটীকা দাবী করতে পারলে না, সেইটেই আমি জানতে চেয়েছি।

আমার মনে হয় আমাদের নাট্য-সাহিত্যের অবিকাশের প্রকৃত কারণ খুঁজতে গেলে আমাদের আধুনিক 'ড্রামার' জন্ম-ইতিহাস স্মরণ করতে হবে। এই ড্রামার জন্ম হয় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে। তার পাঁচশ বছর আগেই প্রাচীন ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের বংশ লোপ হ'য়েছিল। সুতরাং, আমাদের সে যুগের নাট্যকারদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাচীন ভারতীয় নাট্য-শিল্পীদের কাছ থেকে কোনোও রকম ইঙ্গিত পাবার সৌভাগ্য হয়নি। বাধ্য হয়ে সম-সাময়িক বিলেতী নাট্য-সাহিত্যের মডেল থেকেই তাঁদের সৃষ্টির প্রেরণা সংগ্রহ করতে হ'য়েছিল। আমাদের নাট্য-সাহিত্যের দুরদৃষ্টক্রমে একটা অশুভক্ষণে এই আত্মীয়-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। ভিক্টোরিয় যুগের মধ্যভাগে বিলেতী নাট্য-সাহিত্য কত বেশী দুর্ব্বল ও অসার ছিল, একাধিকবার সে কথা এই প্রবন্ধেই বলেছি। ফলে, নাটক-রচনার যে সব বিলেতী ধাঁচ ও পদ্ধতি সে যুগের নাট্যকারেরা আমাদের নাট্য-সাহিত্যে হুবহু প্রবর্ত্তন করেছিলেন, তাতে কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতার অংশ যতখানি ছিল, জীবনের বিচিত্র রসানুভূতিকে মূর্ত্ত ক'রে তোলবার উপযোগিতা ততখানি ছিল না। শুধু তাই নয়; তদানীন্তন বিলেতী নাট্য-সাহিত্যের বিষয়-বস্তুর সঙ্কীর্ণতা আমাদের শিশু-নাট্য-সাহিত্যকে জীবনের প্রারম্ভেই সঙ্কুচিত ক'রে রেখেছিল। কালক্রমে যখন আর্থার জোন্‌স্, পিনেরো ও বার্ণার্ড শ'র সমবেত প্রচেষ্টায় বিলেতী ষ্টেজে সাহিত্যিকদের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে দেশের নাট্য-সাহিত্যে যে নবযুগের সূচনা হ'য়েছিল তার কোনও সংবাদই আমাদের সম-সাময়িক ড্রামাটিষ্টদের কানে এসে পৌঁছয় নি। তাই দেখতে পাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও গিরীশচন্দ্র সেক্‌সপীরীয় নাট্যরীতির পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চ'লেছেন; আর তাঁর প্রতিভা-বর্জ্জিত শিষ্য-প্রশিষ্যেরা এ যুগেও তাঁর নাট্য-সৃষ্টিকে আদর্শ ক'রে আমাদের নাট্য-সাহিত্যের শিশু-গৌরব বজায় রাখছেন!

কেউ কেউ হয়ত প্রশ্ন করবেন—আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যও ত ধার করা? বঙ্কিম প্রমুখ ঔপন্যাসিক পথ-প্রদর্শকেরাও ত মডেলের খোঁজে প্রাচীন ভারতের দিকে না চেয়ে বিদেশী কথা-সাহিত্যেরই আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলেন। তবে কেন আমাদের উপন্যাস-সাহিত্য আমাদের নাট্য-সাহিত্যের মত উনবিংশ শতাব্দীর চোরা-বালিতে আটকা পড়ে নেই? এ প্রশ্নের উত্তরে সে যুগের বিলেতী মডেলের অপূর্ব্ব বিকাশের চিত্রটি স্মরণ করতে হবে। আমাদের কথা-সাহিত্যিকদের, আমাদের দেশের নাট্যকারদের মত, একটা নির্জীব, প্রাণগতি বিবর্জ্জিত

আদর্শের কাছ থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করতে হয় নি। ফলে, উপন্যাস-সাহিত্যের যে শিল্পরূপটি তাঁরা আয়ত্ত ক'রেছিলেন, তাতে অকাল-বার্দ্ধক্যের আড়ষ্টতা ছিল না। জীবনের বিচিত্র ছন্দকে রসমূর্ত্ত ক'রে তোল্‌বার মত সজীবতা এই শিল্পরীতির যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। সুতরাং প্রয়োজন মত উপন্যাস-সাহিত্যকে পরিবর্ত্তিত ক'রে নেওয়া আমাদের উপন্যাসিকদের পক্ষে মোটেই শক্ত হয়নি। তা' ছাড়া এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে। বিদেশী কথা-সাহিত্যের ক্রমঃবিকাশের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যিকদের যতটা ঘনিষ্ঠতা আছে, সেই অনুপাতে বিদেশী নাট্য-সাহিত্যের বিকাশ ও রূপ বিবর্ত্তনের সঙ্গে কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও আমাদের সাহিত্যিকদের পরিচয় খুব সামান্যই ছিল। এ যুগের আরম্ভেও যদি এ পরিচয়টি নিবিড় হ'ত, তা' হলে আমার, দৃঢ়বিশ্বাস আমাদের নাট্য-সাহিত্য এতদিনে বহু বয়ের বালসুলভ নর্ত্তনকুর্দ্দন ভুলে গিয়ে, ট্রাডিশনের পায়ের বেড়ী ভেঙ্গে ফেলে, নবসৃষ্টির জয়-যাত্রায় বহুদূর অগ্রসর হোতো।

নাট্য-সাহিত্যের এই আগামী রূপের ক্ষীণ ইঙ্গিত আমাদের সম-সাময়িক সাহিত্যে মাঝে মাঝে দেখতে পাই। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এই ধরণের নাটক এখনও প্রবেশের অধিকার অর্জ্জন করতে পারেনি ব'লে, আমরা এদের "সাহিত্যিক ড্রামা" নাম দিয়েছি। সুযোগ হলে বারান্তরে এ বিষয়ে দু'চারটে কথা বল্‌বার ইচ্ছে রইল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার

ফাঁকী

(ওমর খৈয়ামী)

এ, জেড, নূর আমেদ

তোমার এ প্রেম নহে, এ যে শুধু ছল্;
মুখে তাই লোনা লাগে প্রিয় আঁখি জল
ধরার বাজারে শুধু ফাঁকী বেচা-কেনা—
ঢিলেতে পাট্‌কেল্ হানি' শুধিও এ দেনা।
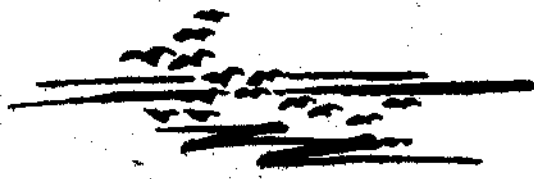
খাতা

শ্রীযুক্তা কল্পনা দেবী

হে খাতা আমার,
শৈশবের চিরসাথী যৌবনের স্বপ্ন কল্পনার!
একান্ত সঙ্গিনী মোর দুঃখে শান্তি, বিপদে নির্ভয়,
আনন্দের সহচরী, ব্যথিতার গোপন আশ্রয়;
কখনো প্রভাত-রবি, কখনো করুণ সন্ধ্যাবেলা
পাতায় পাতায় তোর হাসি অশ্রু করিয়াছে খেলা
গোপন কাহিনী মোর চুপে চুপে এঁকে গেছি পাতে—
কত অর্দ্ধ-রাতে!

দূরে যায় অস্তাচলে ম্লানপ্রভ সপ্তমীর শশী
ঘুমন্ত চপল বায় থেকে থেকে উঠিছে নিঃশ্বসি
যেন বা স্বপন-ঘোরে; সুপ্তি-মগ্ন ধরণীর বুকে
আকাশে নক্ষত্র-সভা নত হ'য়ে বিস্ময়ে কৌতুকে
নীরবে চাহিয়া আছে।
হেথা নিদ্রা, অমরার মেয়ে
সুষুপ্তির বাসখানি ঢেকে দেয় ধরণীর দেহে
ভুলাতে দিনের ক্লান্তি; সযতনে বসিয়া শিয়রে
স্বপনের মালা তার গেঁথে তোলে সুনিপুণ ক'রে
তারি সাথে গায় গান—"আয় সুপ্তি, আয় আঁখিপাতে,"
কত অর্দ্ধ-রাতে!

আমি হেথা ধরণীর এক কোণে একান্তে নিরালা
ঘুম ভেঙে উঠে বসি, গৃহকোণে ছিল দীপ জ্বালা,—
কখন নিভিয়া গেছে;—ছায়া-ঘেরা অস্পষ্ট আঁধার
নিঃশব্দে ঘেরিয়া আসে—জাগাইয়া দেয় মনে কা'র
সলজ্জ কুণ্ঠিত স্পর্শ! গৃহকোণে পুষ্পপাত্র হ'তে
ভেসে আসে ফুলগন্ধ—স্পর্শ পাই, না পাই দেখিতে
কাছে থেকে নেই কাছে। মনে হয় খোলা বাতায়নে
কে যেন সরিয়া গেল, কার কথা গেল যেন কানে
অস্ফুট গুঞ্জন সম!—বাজে দ্বার কা'র করাঘাতে?—
কত অর্দ্ধ-রাতে!

স্বপন টুটিয়া যায়,—প্রদীপ উজল ক'রে জ্বালি,
ফিরিয়া দাঁড়াই শেষে, নেড়ে দিই কুসুমের থালি
আদরে সযত্ন করে; একটী বা তুলে লই বুকে
বুলাই কপোলে কেশে, নত হ'য়ে চুমি কভু মুখে
কখনো আঁখিতে রাখি।
রাত্রি হ'য়ে আসে সুগভীর
ঘুম-ঘোরে মগ্ন ধরা, আমি শুধু চঞ্চল অস্থির;
ছোটে মন দিখিদিকে; ওরে খাতা—হে চির-সঙ্গিনী,
তখন—তখন সখি—সে খেয়ালে তুমিও রঙ্গিনী
সাথে সাথে যোগ দাও; অর্থহীন প্রলাপ আমার
কে শোনে পরম ধৈর্য্যে—কার দু'টি দৃষ্টি অনিবার
উৎসাহ জাগায় মনে? জীবনের চিরন্তন সুর
ক্ষতি-লাভ সুখ-দুঃখ—হর্ষোজ্জ্বল করুণ বিধুর,
লেখনীতে ছুটে চলে, এঁকে যাই তোরি পাতে পাতে
কত অর্দ্ধ-রাতে!

শ্রীকল্পনা দেবী

সত্যাসত্য

—উপন্যাস-

লীলাময় রায়

৩৩

দে সরকার বিনয় করিয়া গ্যারেট বলিয়াছিল বটে, কিন্তু ঘরখানি তাহার সুধীর ঘরেরই মতো উপরতলার একটি ঘর।

দে সরকার কহিল, "বসুন। অমন ক'রে কী দেখছেন? এই ঘরখানার প্রত্যেক ইঞ্চির একটি ক'রে ইতিহাস আছে। ঐ চেয়ারখানিতে একজন বসতো, ঐ ওয়াল পেপার এক জনের পছন্দ মতো বসানো,. ঐ টাইমপীস্ ঘড়ি একজনের উপহার।"

বাদল ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পরে জিভ কাটিল, "ঐ একজনটি কে?"

"সে কি একটি? তিনজনের উল্লেখ করলুম, মিষ্টার সেন। কিন্তু মিষ্টার সেন কেন বলছি? আপনাকে তো আগে 'সেন' ও 'তুমি' বলতুম।"

বাদল সতর্ক হইয়া লইয়াছিল, কৌতূহল জ্ঞাপন করিল না। 'Sunday Times' উল্টাইতে লাগিল। সুধী ও দে সরকার খিচুড়ির উদ্যোগ করিতে বসিল।

দে সরকারের কাবার্ডে ডাল চাল নুন ঘী (মাখন) ইত্যাদি মজুত ছিল। 'Barber's Bellatee Bungalow' হইতে খরিদ করা। কিছু বড়ী বাহির হইয়া পড়িল, দেশ হইতে প্রেরিত। দে সরকারের ভাণ্ডারে আদা, লঙ্কা, গোলমরিচ, হলুদ ইত্যাদি এত রকম রসদ ছিল যে বহুতর ভারতীয় আহার্য্য প্রস্তুত করা যায়।

সুধী শুধাইল, "আপনি কি প্রায়ই এই সব করেন না কি?"

"প্রায়ই। ঐ একটা বিষয়ে আমি এখনো খাঁটি বাঙ্গালী আছি। দেশের ধর্ম্ম বদ্‌লাক্, সমাজ বদ্‌লাক্, স্বরাজ হোক, সোভিয়েট্ হোক, কিন্তু আমাদের সনাতন রন্ধনকলাটি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।"—সকলে হাসিল।

দে সরকার পাকা রাঁধুনি। সুধীও মন্দ রাঁধে না। দুইজনে মিলিয়া দেখিতে দেখিতে খিচুড়ি, আলুর দম ও পায়েস বানাইল এবং বড়ী ভাজিল। পড়ার টেবিলটা খাইবার টেবিলে রূপান্তরিত হইল, উহার উপর তিন গ্লাস জল রহিল, কোথা হইতে একটা ফুলদানীতে করিয়া কিছু carnation ফুল উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল। কাবার্ড হইতে চাটনী নামিল।

দে সরকার কহিল, "সেনের খুব অসুবিধা হবে জানি—ছুরী কাঁটা নেই। তবে হাত ধোবার সময় গরম জল জোগাতে পারবো।"

বাদলের অসুবিধা হইতেছিল না বটে, কিন্তু খাবারের গায়ে আঙুল ছোঁয়াইতে কেমন-কেমন লাগিতেছিল, যেন আঙুল অশুচি হইয়া যাইতেছে।

খোসগল্প করিতে করিতে খাওয়া যখন শেষ হইল তখন সুধী কহিল, "এমন তৃপ্তির সহিত ভোজন বহুদিন থেকে হয়নি।"

দে সরকার কহিল, "এবার দক্ষিণা দিতে হবে না কি; ঠাকুর?"

"দিন্। এদেশে দক্ষিণা দিয়ে ভোজন করতে হয়, দক্ষিণা নিয়ে ভোজন করা ইংলণ্ডের মাটিতে আমিই প্রবর্ত্তন করি।"

দে সরকার একটি তিন-পেনী-মুদ্রা বাক্স হইতে বাহির করিল। আমাদের দুয়ানি আকারের রজতখণ্ড। কহিল, "ঠাকুর, গত বড়দিনের নিমন্ত্রণে একজনদের বাড়ী থেকে এইটি অর্জ্জন ক'রে এনেছিলুম—আমার ভাগ্যে উঠেছিল। সৌভাগ্যের নিদর্শন বলে এটিকে। আসল মানুষটিকেই যখন হারালুম তখন এটিকে কাছে রেখে কেন স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকবো? আমি স্মৃতি ভার মুক্ত হ'তে চাই।"—এই বলিয়া তিন-পেনী-খণ্ডটি সুধীর হাতে গুঁজিয়া দিল।

ঘরের ইলেক্‌ট্রিকের আলো হঠাৎ নিবাইয়া দিয়া সুধী বলিল, "বলুন আপনার কাহিনী।" সুধী বুঝিতে পারিয়াছিল দে সরকার নিজের কাহিনী কাহাকেও কহিতে না পাইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া বাস করিতেছে।

দে সরকার কহিল, "ভয়ে বল্‌বো, না, নির্ভয়ে বল্‌বো ?"

"নির্ভয়ে।"

"তবে এই সর্ত্তে বল্‌বো যে আপনারাও আপনাদের কাহিনী বল্‌বেন।"

"উত্তম।"

দে সরকার আরম্ভ করিল :—

"আমার জীবনে একটার পর একটা প্রেম আসে আর আমাকে ধরাশায়ী ক'রে রেখে যায়। আমার কাজকর্ম্ম যায় চুলোয়, আমার জীবনের ব্রত হয় ভঙ্গ, আমাকে আবার গোড়া থেকে গড়্‌তে হয়।

ভাঙ্গা মেরুদণ্ড নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ানো কল্পনা কর্‌তে পারেন ? কী অসীম সহিষ্ণুতা সাপেক্ষ সেই পুনরুত্থান! ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে, উঠে দাঁড়াই, চলি। আবার লগুড়াঘাত। আর পারিনে। তবু পারি। মানুষ যে কত পারে তার ধারণা তার নিজের নেই। এইজন্যেই তো আমার সন্দেহ হয় যে মানুষ আত্মবিস্মৃত সর্ব্বশক্তিমান। আত্মবিস্মৃত ভগবান।"

বাদল বাধা দিয়া কহিল, "ঐখানে আমার আপত্তি। ভগবান একটা fallacy যেমন আত্মবান একটা myth."

দে সরকার বলিয়া চলিল :—

"স্কুলজীবনের প্রেমকে আপনারা বল্‌বেন calf-love. আমার ভালো মনেও পড়ে না। এক এক জনের জীবন কি দীর্ঘ! আমি যেন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আছি। নিজের বাল্যকাল নিজের কাছে সত্য যুগের মতো পুরাতন।

"কলেজে পড়্‌বার সময় যাকে পেলুম তার আসল নাম বল্‌বো না, আপনারা বাংলা মাসিক পত্রে প্রায়ই তার নাম দেখ্‌তে পান—"

বাদল বাধা দিয়া কহিল, "আমি তো বাংলা মাসিকপত্র খুলেও পড়িনে, আমার কানে কানে বলুন না ?"

"পড়েন না সেটা আপনার সেকেলে সাহেবিয়ানা, সেই প্রাক্-মাইকেল যুগের। লর্ড সিংহের মতো লোক যা পড়েন আপনি তা পড়েন না ; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা—যাতে থাকে আপনি তা পড়েন না। Shame !"

সুধী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "বাদলকে ভুল বুঝ্‌বেন না, দে সরকার। বাংলা সাহিত্য ওর বেশ ভালো ক'রে পড়া আছে এবং রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বই ওর লাইব্রেরীতে। কিন্তু বাংলা মাসিকে ও চিন্তার খোরাক পায় না ; বলে, 'জল-মেশানো-চিন্তা।' বাস্তবিক, আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাবুকরা ভালো জিনিষ ইংরেজীতে লিখে খেলো জিনিষ বাংলাতে লেখেন। তা যাক্, আপনি আসল নাম নাই বা বল্লেন। ধরে নিলুম তাঁর নাম পদ্মিনী দেবী।"

দে সরকার হাসিয়া কহিল, পদ্মিনী নারী বল্লে অত্যুক্তি হবে হয় তো। পদ্মিনী দেবীই বল্‌বো।...

"পদ্মাকে পেলুম আমি যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। থার্ড ইয়ারটা ছাত্র সমাজের অলিখিত আইন মেনে Scrupulously ফাঁকি দিয়েছি। ফোর্থ ইয়ারে ক্লাসের ধুরন্ধর ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করছি, 'কি হে, বিশ্ববিদ্যালয় কী কী বই পাঠ্য নির্দ্দেশ করেছে ?' ভাব্‌ছি কেমন করে আরম্ভ করা যায়, সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স্‌টা তো পেতেই হবে।...

"ক্লাসের শেষ সারির বেঞ্চি আমার রিজার্ভ করা। সেইখানে ব'সে আমি গল্প ও কবিতা লিখি। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ আমার ষ্টুডিও। পাশের ছেলেরা আড্ডা দেবার সময় পরস্পরকে বলে, 'এই, আস্তে। দেখ্‌ছিস্ নে উনি লিখ্‌ছেন ?" প্রথম প্রথম ওরা চেষ্টা করেছিল আমার ধ্যান ভাঙাতে। কিন্তু আমি বল্লুম, 'আড্ডা আমি দু'বেলা দিয়ে থাকি, প্রমাণ চান্ তো আসুন আজ সন্ধ্যায়। কিন্তু কাজের সময় কানের কাছে ঢাক বাজালেও আমি টল্‌বো না। ওরা হাল ছেড়ে দিলে। তারপর থেকে ওরা আমার বন্ধু।...

"আমাদের বেঞ্চিতে আমরা অন্য কারুকে বস্‌তে দিইনে। কিন্তু একদিন দেখ্‌লুম সাম্‌নের সারি থেকে একজন আমার পাশের ছেলেটির সঙ্গে জায়গা বদল করে

করেছেন। বল্লেন, 'এখন থেকে এইখানেই বসবো, আপনার আপত্তি আছে?' বল্লুম, 'থাকলে আপনি শুনবেন কেন?' তিনি বল্লেন, 'ছি ছি রাগ করবেন না; আপনি সাহিত্যিক, আপনি তরুণ, আপনি বিদ্রোহী—শ্রদ্ধা করি বলেই তো কাছে এসেছি।' ছেলেটিকে দেখতে বড়ো মধুর। লাজুক নয়, সপ্রতিভ; কিন্তু তার মনের স্বপ্ন তার দেহের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে।...

"আমি জিজ্ঞাসা করলুম 'আপনার নামটি জানতে পারি?' সে বল্লে, 'অবশ্য। আমার নাম মৃত্যু।'... 'বাপ-মায়ের রাখা নাম, না, নিজের দেওয়া নাম?'...

'দুইই। ওঁরা বলেন মৃত্যুঞ্জয়, আমি বলি মৃত্যু। মৃত্যুকে জয় করতে পারে কেউ? মৃত্যুই জেতা।'...

"একদিন মৃত্যু বল্লে, 'একখানা কাগজ বার করছি। বার করছি ঠিক না। আমাদের পারিবারিক কাগজখানাকে জগতের করছি।

'মাতৃগর্ভে শিশু চিরকাল থাকে না, থাকলে জগতের প্রতি অন্যায় হয়।' আমি বল্লুম, অন্য সময় খুঁজে পেলেন না? পরীক্ষার খড়্গ মাথার উপর ঝুলছে।'...'দুর্ভিক্ষের দিনেও শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। প্লাবনের রাত্রে ঘর ভেসে গেছে, গাছের উপর নারী আশ্রয় নিয়েছে, সেখানেও শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে।'...

"বাংলা মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা বারো মাসের যে কোনো মাসে বেরোতে পারে; এমন কি চৈত্র মাসেও কোনো কোনো কাগজের বর্ষারম্ভ হয়েছে জানি। মৃত্যুর কাগজের প্রথম সংখ্যা বেরোবে আশ্বিন মাসে—প্রথম থেকেই পুজার সংখ্যা। সেজন্যে আমার লেখা চাই। আমি সাহিত্যিক, আমি তরুণ, আমি বিদ্রোহী। জিজ্ঞাসা করলুম, 'আর কার কার কাছে লেখা চেয়েছেন, মৃত্যুবাবু?' উত্তর হলো, 'অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেশ সেনগুপ্ত—' আমি বাধা দিয়ে বল্লুম, 'নরেশ সেনগুপ্ত তরুণ নাকি?' মৃত্যু বল্লে, 'বয়সের ওই মুখোসখানা তো প্রকৃত নয়, প্রাকৃতিক। কুমার বাবু, আপনিও জড়বাদী হলেন?'

বাদল চুপ করিয়া শুনিতেছিল। আর থাকিতে পারিল না। কহিল, "আপনি কি জড়বাদী না, Vitalist, না, আধ্যাত্মবাদী?"

দে সরকার রসিকতা করিয়া কহিল, "আমি বিসবাদী। অর্থাৎ আমি বাদী মাত্রেরই সঙ্গে বিবাদ বাধাই। আমি কিছু মানিনে, কিছুতে বিশ্বাস করিনে, আমার কোনো লেবেল নেই।"

বাদল উচ্ছ্বাস গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, "ঠিক আমার মতো।"

দে সরকার নির্দয় ভাবে কহিল, "মোটেই না। আমি জাতীয়তাই মানিনে। আপনি স্বজাতীয়তা ত্যাগ ক'রে বিজাতীয়তা বরণ করেছেন। আমার বাড়ী Cosmopolis, সে জায়গা কোথাও নেই। আপনার বাড়ী লণ্ডন

বাদলের মুখখানা লাল হইয়া গেল কি কালো হইয়া গেল অন্ধকারে দেখা গেল না। কিন্তু সুধী তো বাদলের নাড়ী-নক্ষত্র জানে। সে অনুমানে বুঝিয়া কহিল, "গল্পটা আমার বড়ো ভালো লাগছিল। এইবার পদ্মিনী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে—সর্বগুণান্বিতা অনবদ্যা সুন্দরী। নিন্, খেই ধরিয়ে দিলুম।"

৩৪

দে সরকার কহিল, "আশ্চর্য, তখন অনবদ্য সুন্দরীই মনে হতো বটে; বয়োধর্ম ব'লে একটা জিনিষ তো আছে। মনটা এখনকার মতো বিশ্লেষণশীল হয় নি। কিন্তু কী বলছিলুম? মৃত্যু আমাকে একদিন একরাশ লেখা দিয়ে বল্লে, 'দেখে দাও না!' মৃত্যুদের বাড়ীর সকলেই লেখক, মায় বেড়াল কুকুর পর্যান্ত। ঠাকুর পরিবারেও এমনটি দেখা যায় না। 'ইনি কে হে, মৃত্যু?' ...'ওঃ! উনি? আমার পটল মামা; আমাদের বাড়ীতে থেকে ডাক্তারি পড়েন।'...'আর ইনি?'...'রাঙা পিসির কথা জিজ্ঞাসা করছো? ওঁর জোরেই তো কাগজ বার করছি। আমার সমবয়সী ও মন্ত্রী।'...মৃত্যুদের বাড়ীর সকলের নাম-পরিচয় একে একে জানলুম। তখন ওঁদের সঙ্গে দেখবার কৌতূহল জাগলো। বল্লুম, 'মৃত্যু, এ সব মূল্যবান document আমার মেসে থাকলে [illegible]

নাম বদ্‌লে অক্সেরা ছাপ্‌বে। একটা আপিস্‌ করো।' মৃত্যুঞ্জয়ের বৃহৎ বাড়ীর এক কোণে আমাদের আপিস বসলো। সাইনবোর্ড্‌ খাটানো গেল—'কনীনিকা। বয়ঃকনিষ্ঠদের মুখপত্র।' "

এবার সুধী বাধা দিয়া শুধাইল, "কই, নাম শুনেছি বলে মনে হয় না তো?"

দে সরকার হাসিয়া উত্তর করিল, "আমাদের প্রথম সংখ্যাই হলো শেষ সংখ্যা আর বর্ষারম্ভ হলো বর্ষ শেষ। তার কারণ মৃত্যু বেচারা মৃত্যুমুখে পড়্‌লো।"

বাদল কহিয়া উঠিল, "আঃ হাহা!"

দে সরকার গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিল, "মৃত্যু যে দিন প্রথম তাদের ওখানে আমাকে নিয়ে গেল সেদিন আমাকে আপিস ঘরে বসিয়ে রেখে ভিতরে প্রত্যেককে বল্‌তে বল্‌তে চল্লো, 'মা গো, সেই বিখ্যাত লেখক—'...'চা খেতে বল্‌'...'রাঙা পিসি, সেই তরুণ লেখক—'...'সেই যিনি অশ্লীল লেখেন?'...'শৈলেন, সেই ষ্টাইলিষ্ট্‌ লেখক—'... 'আচ্ছা, আমি আস্‌ছি তাঁর কাছে।'

বাদল আন্দাজ করিয়া কহিল, "সেই রাঙা পিসিটিই পদ্ম, না?"

"তিনিই। তবে তাঁর নাম পদ্ম নয় আসলে। 'তিনি' বলছি বলে হাসি পাচ্ছে, মিষ্টার সেন। এক সময় তাঁকে 'তুই' বলেছি কি না।...

"ঘনিষ্ঠতার বিলম্ব হলো না। দু'একদিন পরে তাঁর সঙ্গে যেই প্রথম দেখা হয়েছে ফস্‌ করে বলে' বস্‌লুম, 'আপনার কাছে একটা নালিশ আছে। নালিশটা আপনারই নামে।' পদ্ম একটু একটু কাঁপ্‌ছিল। 'কী নালিশ?' 'আপনি নাকি বলেছেন আমি অশ্লীল লিখি?' পদ্ম থতমত খেয়ে বল্লে, 'কে বলেছে? মৃত্যুঞ্জয়?' তার পরে ক্রমশঃ তার লজ্জা ভাঙ্‌লো। আমার কবিতা প'ড়ে সে প্রথম জান্‌লে যে তার মতো সুন্দরী আর নেই, সেই এ যুগের হেলেন, বেয়াত্রিচে, এমিলিয়া ভিভিয়ানী। পদ্মের স্বামী তাকে বিয়ে করেই স্বর্গে চলে যান্‌—সেই থেকে পদ্ম এতদিন তাঁর ফটো পূজা করে আস্‌ছিল। কিন্তু ফটো তো ফিরে পূজা করে না। পূজার ক্ষুধা পদ্মের আমি মেটালুম তখন আমার ফটো পদ্মের বাক্সে উঠ্‌লো।...

"ইতিমধ্যে বেচারা মৃত্যুর হলো অকাল-মৃত্যু। কাগজ গেল সহমরণে। কোন্‌ সূত্রে ওদের বাড়ী যাই? তখন একটা ছল আবিষ্কার কর্‌লুম। মৃত্যুর যাবতীয় লেখা সংগ্রহ করে বই ক'রে বার করবো। বাংলা সাহিত্যে মৃত্যুর স্মৃতি থাক্‌বে। পদ্ম লিখ্‌বে মৃত্যুর জীবন কথা। আমি লিখ্‌বো ভূমিকা।...

"ছ'মাসের মধ্যে আমরা পরস্পরের অন্তর্যামী হলুম; যতক্ষণ দেখা হয় না ততক্ষণ মরে থাকি; দেখা হলে এত খুসী হই যে সব সময়টা বাজে বকি; সেও মিষ্টি লাগে। নমো নমো করে বি-এ পরীক্ষা দিলুম, কোনোমতে ডিগ্রীটা পেলে বাঁচি।...

"অবশেষে পদ্মকে লিখ্‌লুম, 'নী—, প্রেমকে স্থায়ী কর্‌বার উপায় পরিণয়। তার সময় আসেনি কি?' পদ্ম জবাব দিলে না। লিখ্‌লুম, "নী—, আমাদের দু'জনের জীবনকে ক'রে তুল্‌বো একখানি উপন্যাস। দু'জনে মিলে একখানি জীবনোপন্যাস লিখ্‌বো—'নিখিলের কথা,' 'বিমলার কথা,' তোমার একটি পরিচ্ছেদ, আমার একটি পরিচ্ছেদ, এমনি ক'রে অসংখ্য পরিচ্ছেদ।' পদ্ম জবাব দিলে না।...

"যে দিন তার সঙ্গে দেখা হলো তার চোখে দেখ্‌লুম জল টলমল কর্‌ছে। তার কাঁচা সোনার মতো রঙ, চাঁপা ফুলের মতো শাড়ী, ঋজু তরুর মতো গড়ন, শুকতারার মতো চাউনি। সে আমার স্ত্রী; সে আমার ভবিষ্যৎ; সে আমার যশ ও লক্ষ্মী, সন্তান ও সার্থকতা। এক নিমেষে বহু দিবসের সৌধ টলে পড়্‌লো, তার কয় বিন্দু অশ্রুর মতো।...

"পদ্ম বল্লে, 'আমার শ্বশুরের মাথা নীচু হবে, আমার শাশুড়ী অভিসম্পাত দেবেন। তা ছাড়া আমাদের জাত এক নয়।'..

"কানের ভিতর দিয়ে গলানো সীসে মরমে প্রবেশ কর্‌লে। আমার বাবা তার শ্বশুর নন্‌, আমার মা তার শাশুড়ী নন্‌, এঁদের প্রতি তার কর্তব্য নেই।' জাত।

আপনারা বাংলা নভেল পড়েছেন—মিষ্টার সেনও। তাতে নায়ক নায়িকার জাত লেখা থাকে না, তবু বাঙালীর সমাজে জাত প্রবলভাবে আছে। বাংলা খবরের কাগজের ছত্রে ছত্রে লেখে, 'জাতির অপমান,' 'জাতির সংকল্প'; তবু জাতি বলে কিছুই নেই। আছে জাত। ধর্ম বদ্‌লাতে পারি, পেশা বদ্‌লাতে পারি, মিষ্টার সেনের মতো দেশ বদ্‌লাতে পারি, কিন্তু জাত বদ্‌লানো যায় না।...

"ইংলণ্ডে পালিয়ে এলুম। বাবা মোক্তার। ভাইবোন অনেকগুলি। বেশী পাঠাতে পারেন না। বন্ধুরা চাঁদা ক'রে কিছু পাঠায়। আর সাহিত্য নয়, আর প্রেম নয়, পুরুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে, কাজ। Man of action হতে হবে—Clive এর মতো, Cecil Rhodes এর মতো, Henry Ford এর মতো, Lenin এর মতো।...

"কিন্তু মানুষ প্লান করে, আর বিধাতা বলে যদি কেউ বা কিছু থাকেন তিনি প্লান ভাঙেন। অন্তত প্রেম সম্বন্ধে আমি destiny মানি গ্রীক্‌দের মতো। প্রেম আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার দাস নয়। সে আমার কথা না শুনে পালায়, আমার খবর না দিয়ে আসে। কিন্তু আজ কি আপনাদের সময় হবে, ভাই চক্রবর্ত্তী ও সেন? বারোটার আগে না উঠ্‌লে টিউব্‌ পাবেন না ট্যাক্সি ক'রে বাড়ী ফিরতে হবে।"

৩৫

সুধী আলোটা জালিয়া দিয়া বাদলের দিকে তাকাইল। বাদল কহিল, "আমি অনিদ্রা রোগী। বেশি রাত করবো না।"

দে সরকার কহিল, "এক পেয়ালা কোকো ক'রে দিই—পাঁচ মিনিট লাগ্‌বে।"

বাদল বলিল, "একটা কথা জান্‌তে ইচ্ছা করে। আজকের আগে আমাদের এ বাড়ীতে আসতে দেন নি কেন?"

কোকো করিতে করিতে দে সরকার উত্তর দিল, "কারণ কাল পর্য্যন্ত একজন এ বাড়ীতে খবর না দিয়ে যখন তখন উপস্থিত হতো। আপনারা কী ভাব্‌ছেন!"

বাদল হাত গরম করিতে করিতে কহিল, "কিছু ভাব্‌তুম না। বল্‌তুম ওঁকে, কোকো ক'রে খাওয়ান; কিম্বা টি তৈরি করুন; গৃহিণী থাক্‌তে কর্ত্তা খাটবেন, এ কেমনতরো Chivalry?"

দে সরকার তিন পেয়ালা কোকো টেবিলে রাখিয়া কহিল, "ওকে বল্‌তে হতো না, বরঞ্চ ও-ই খেতে অনুরোধ করতো। সবই তো ওর ছিল, কেবল বিছানাটা ছাড়া।"

বাদল দুষ্টুমি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কম চওড়া বলে?"

দে সরকার সুধীর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইল। কিন্তু সুধীও হাসিতেছে দেখিয়া সাহস পাইল। বলিল, "না গো মশাই, সেটা কি একটা কারণ হতে পারে!"—পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ঠাহর করিতে লাগিল এর পর যাহা কহিবে তাহাতে সুধী ও বাদল শক্‌ পাইবে কি না। ইহারা নূতন ইংলণ্ডে আসিয়াছে, স্কুল অব্‌ ইকনমিক্‌সেও পড়ে না।

দে সরকার ঢোক গিলিয়া কহিল, "এখনো সেণ্ট পারসেণ্ট্‌ সাক্‌সেস্‌ফুল হয় নি।"

বাদল উৎকণ্ঠার সহিত কহিল, "কী সেণ্ট্‌ পারসেণ্ট্‌ সাক্‌সেস্‌ফুল হয় নি?...বলুন না? অর্দ্ধেকটা বলে রহস্য-বোধ উদ্রেক ক'রে দিলেন।"

দে সরকার গম্ভীরভাবে কহিল, "চক্রবর্ত্তী, আপনার খোকা ভাইটিকে চিরকাল আপনি আগ্‌লে রাখ্‌তে পারবেন না। এই প্রলোভনের দেশে এঁর পদস্খলন যদি হয় তবে এখানকার বেহায়া মেয়েরা সহজে মেহাই দেবে না, আইন আদালত করবে।...(গলাটা পরিষ্কার করিয়া) সেইজন্যে এঁকে অবিলম্বে মারী ষ্টোপ্‌সের বই পড়তে দেওয়া ভালো। আসল বইখানা আমার কাছেই আছে, ধার দিতে পারি।"

বাদল যে ও-কথা শোনে নাই এমন নয়। বার্থ্‌ কণ্ট্রোল সম্বন্ধে কড়া কড়া প্রবন্ধ পর্য্যন্ত লিখিয়াছে, নতুবা ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দূর হইবার নয়। কিন্তু তাহার নিজের জীবনে ঐ জিনিষের আবশ্যকতা হইতে পারে একথা কখনো

তাহার খেয়াল হয় নাই। তাহার সংস্কার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ছি ছি ছি। বাদলের মন যতই উদার হউক না কেন তাহার সংস্কার পিউরিট্যানের সংস্কার। চিন্তার দিক দিয়া সে আধুনিকদের ছাড়াইয়া গেছে, চিন্তা হইতে সে কোনো বিষয়কে বাদ দেয় না। কিন্তু কার্য্যতঃ উহা করিতে হইবে—মা গো! অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সহিত গোমাংস খাইয়াছে, সেজন্য এখনো গা-বমি-বমি যায় নাই, শুকারকে জোর করিয়া দাবাইতে হয়।

বাদল কোকোর পেয়ালা ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "আর খাবো না, ওটুকু ফেলে দেবেন। এবার উঠি।"—এই বলিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইল।

দে সরকার টিউব্ ষ্টেসন অবধি আগাইয়া দিতে চলিল।

হঠাৎ বাদল প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, আপনি বীফ্ খান?"

"নিশ্চয়ই। কেন খাবো না?"

"তবে কেন c—t—c—n করেন না?"

"ঐ যে বল্লুম। সেন্ট্ পারসেন্ট্ সাক্‌সেস্‌ফুল হয় নি।'

বাদল ভাবিল, আমিই তবে ওল্ড্-ফ্যাশান্‌ড্। দে সরকার আপ্-টু-ডেট্।—দে সরকারের উপর বাদলের যুগপৎ ঈর্ষা ও শ্রদ্ধা জাত হইল

সুধী এতক্ষণ নিঃশব্দে চলিতেছিল। হঠাৎ দে সরকারকে জিজ্ঞাসা করিল, "পদ্ম'র খবর পা'ন?"

"মাঝে মাঝে। পদ্ম চিঠি লেখে, পদ্মদের বাড়ীর অনেকেই চিঠি লেখেন। আমি সর্ব্বত্র জনপ্রিয়।"

"টেন্টারটন ড্রাইভের। কিন্তু আমাদের সুজেৎটিকে ভোলাবেন না, দোহাই আপনার।"

"পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিলে আগুন কী করবে?"

"না, না। ওটি বড়ো নিরীহ, বড়ো সরল। ওকে একটু প্রশ্রয় দিলেই বিয়ের স্বপ্ন দেখবে, গৃহলক্ষ্মী হবার স্বপ্ন। যে স্বপ্ন ভাঙ্‌বেই সে স্বপ্ন জাগাবেন না।"

সুধী একটু থামিয়া কহিল, "মেয়েদের পক্ষে ষোলো সতেরো ও ছেলেদের পক্ষে উনিশ কুড়ি বড়ো বিপজ্জনক বয়স। ও-বয়সে মানুষ বিনা বিবেচনায় দেহ ও মন বিলিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। পদ্ম'র বয়স যদি তখন ষোলো-সতেরো হতো আপনি হাত পেতে আশার অতিরিক্ত পেতেন। জাত কুল শ্বশুর শাশুড়ী তাঁর মনেই উঠ্‌ত না।"

দে সরকার কহিল, "Destiny!"

জল পড়িতেছিল না, কিন্তু আকাশ ঘোলাটে হইয়া রহিয়াছিল। মেঘ ও কয়লার ধোঁয়া মিশিয়া ঐ অপরূপ রঙ্। রবিবারের রাত্রি—সিনেমা হইতে লোকজন বাড়ী ফিরিতেছে।

মাটির নীচে ষ্টেশন। টিকিট—উইকেট পর্য্যন্ত গিয়া দে সরকার টুপী তুলিল।—"চীয়ারিও।"

সুধী কহিল, "পুনর্দর্শনায় চ। মাঝে মাঝে লাঞ্চের সময় বিরক্ত করবো।"

"ওঃ! নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি যদি বাড়ী না থাকি ল্যাণ্ডলেডীকে বল্লেই আমার ঘরে পৌঁছে দেবে। কাল আসবেন? বুড়ীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। দেড়টার আগে আস্‌বেন, দয়া করে।"

বাদল চিন্তায় মগ্ন ছিল। কখন বিদায় লইয়া কেমন করিয়া ট্রেণে চড়িল তাহার নজর ছিল না। বাদল ভাবিতেছিল, প্রিয়জনকে পাইবার জন্য মানুষ ধর্ম্ম বদ্‌লাইতে পারে, পেশা বদ্‌লাইতে পারে, দেশ বদ্‌লাইতে পারে, কিন্তু জাত বদ্‌লাইতে পারে না। তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না রাখিয়া জন্মসূত্রে তোমার জাত নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেছে, সে নির্দ্দেশের উপর আপীল চলে না। Determinism! মানুষের এর চেয়ে অসহায়ত্ব আর কী হইতে পারে। দে সরকার বলে, Destiny! আমি হইলে কী বলিলাম? বলিতাম, কাপুরুষতা। পদ্মকে আমি জোর করিয়া বিবাহ করিতাম। বিবাহ? না, 'বিবাহ' কথাটা ওল্ড ফ্যাশনড্। 'Mate' করিতাম। কিন্তু জোর করিয়া? জোর করিলে উহার ইচ্ছা রহিল কোথায়? উহার কি ইচ্ছা ছিল না? ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইচ্ছার বাধাও ছিল—শ্বশুর শাশুড়ীর ইচ্ছা, জাতের লোকের ইচ্ছা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইচ্ছার বাধা। ইচ্ছা Versus ইচ্ছা। কেমন? সেই সংগ্রামে পদ্ম'র ইচ্ছা পরাস্ত হইল। শ্বশুর শাশুড়ীর ইচ্ছা, জাতের লোকের ইচ্ছা জয়ী হইল। কেমন? তা হলে তর্ক উঠে:—পদ্ম'র ইচ্ছা যদি পরাস্তই হইবে, তবে

আমার ইচ্ছার ছায়া হইবে না কেন? জোরকে আমি মানি না, কিন্তু পদ্ম মানে। যখন মানে তখন কোন্ জোর বড়? আমার জোর, না, দুইটা ইডিয়টের ও একটা ষ্টুপিড প্রথার জোর?

পদ্ম'র বুদ্ধিবৃত্তি ও সে সরকারের 'পৌরুষ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া বাদল পাশের বৃদ্ধটির গায়ে ঢুলিয়া পড়িল। বৃদ্ধটির তন্দ্রাভঙ্গ হইল। বৃদ্ধটি উন্টা লজ্জিত হইয়া কহিল, "Sorry."

বাদল তখন ভাবিতেছিল, ঐ দুইটা ইডিয়ট তো শীঘ্রই মরিবে, বুড়া হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে মৃত্যু বলিয়া একটা ব্যাপার জগতে আছে। কিন্তু ঐ ষ্টুপিড প্রথাটা পদ্মকে যাবজ্জীবন বাধা দিতে থাকিবে। জাতিভেদকে দশ বৎসরে উচ্ছন্ন করা যায় না? কামাল পাশা হইলে একদিনে উৎপাটন করিতেন। আমরা ব্রিটিশরা দেড় শত বৎসর ইণ্ডিয়ায় রাজত্ব করিতেছি, সতীদাহ তুলিয়া দিলাম, জাতিভেদ তুলিয়া দিতে পারিলাম না। লজ্জার কথা'।

গত শতাব্দীর ইংলণ্ডে Laissez faire নীতি প্রবল হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ থাকিবে, সাক্ষীগোপালের মতো। সমাজে ও বাণিজ্যে প্রতিপক্ষেরা লড়িয়া যাইবে।

বাদল ভাবিতেছিল, নাঃ! অমন নীতি সকল সময় সমর্থন করা যায় না। বাপ যদি ছেলেকে ঠেঙায়, গবর্ণমেণ্ট ছেলের পক্ষ লইয়া বাপকে ঠেঙাইবে। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ছিল কেশবচন্দ্র সেনের পক্ষ লইয়া জাতিভেদের গোড়ায় কোপ মারা।

বাদল আর একবার ঢুলিয়া পড়িতেই তাহার মাথা কাহারও গায়ে বাধা পাইল না; গাড়ী অর্দ্ধেক খালি হইয়া গিয়াছিল। আহত ও অপ্রস্তুত হইয়া বাদল খাড়া হইয়া বসিল। বাধারও প্রয়োজন আছে। বাধা কেবল বাধা নয়, আশ্রয়।

সুধী কহিল, "সবাইকে বলে বেড়াস তোর দারুণ অনিদ্রা রোগ।"

বাদল তর্ক করিল, "কই আমি তো ঘুমোইনি। ভাবছিলুম ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল Casteকে Unlawful assembly declare করা।"

মিসেস্ উইলসের বয়স ৩৭৷৩৮ হইবে। নিঃসন্তান। চোখে কৌতুকের স্থির বিদ্যুৎ। শরীর দেখিয়া মনে হয় না যে কিছুমাত্র বল আছে। কিন্তু একাকী সকল গৃহকর্ম করেন, দাসী রাখেন নাই। পোষাক পরিচ্ছদে শৌখীন। অবসর পাইলেই নূতন জামা তৈরী করিতে বসেন কিম্বা পুরানো জামাকে নূতন চেহারা দিতে।

বাদলের সঙ্গে latch key ছিল। সদর দরজা খুলিয়া মিসেস্ উইলসের কাছে হাজিরা দিতে গেলে মিসেস্ উইলস্ কহিলেন, "এই যে বার্ট। কখন এলে?"

"এইমাত্র আসছি, মিসেস্ উইলস।"

"তারপরে? উইকেণ্ড সুখে কাটল?"

"মন্দ না। ধন্যবাদ। কেবল ঘুমটা—"

"জানি। ভালো হয়নি। কিন্তু তর্ক-বিতর্ক কেমন হলো?"—মুচকি হাসিয়া কহিলেন "ঐতো তোমার প্রাণ।"

বাদল উৎসাহ পাইয়া বলিল, "শুনবেন মিসেস্ উইলস্? কাল থেকে আমি ভাবছি কোন্ উপায়ে ইণ্ডিয়ার থেকে কাষ্ট্ উৎপাটন করা যায়। ভেবে দেখলুম ও হচ্ছে সেই শ্রেণীর গাছ যার শিকড়ে কুড়ুল মারলে কুড়ুল ভেঙে যায়। ক্যালিফর্ণিয়ার সেই বিরাট বনস্পতি আর কি!"

মিসেস্ উইলস্ চোখে হাসিয়া কহিলেন, "হাল ছেড়ে দিলে?"

"মোটেই না। গাছের গোড়ায় উই পোকার চাষ করবো। ভিতর থেকে মাটী আলগা হয়ে গেলে বনস্পতি চিৎপাত। শুনুনই না উপায়টা।"—বাদল আর গোপন করিতে পারিতেছিল না। ধীরে ধীরে বুঝাইয়া কহিবার মতো ধৈর্য্য ছিল না তাহার। এক একজন ছাত্র থাকে মাষ্টার মহাশয় ক্লাসের অন্য কোন ছাত্রকে প্রশ্ন করিলে অনাহুতভাবে দাঁড়াইয়া বলে, "আমি বলবো মাষ্টার মশাই?" অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া প্রশ্নের উত্তরটি বলিয়া দেয়।

বাদল সোল্লাসে কহিল, "Electrification!"—উত্তরটা ঠিক হইল কি না জানিবার জন্য কান পাতিয়া রহিল।

মিসেস্ উইলস্ তাঁহার সেলাই হইতে মুখ না তুলিয়া কহিলেন, "Electrical engineering পড়তে যাচ্ছো নাকি?"

"ঠাট্টা করছেন? কিন্তু সবটা শুনুন আগে। ইণ্ডিয়াতে যথেষ্ট কয়লা নেই বলে যথেষ্ট রেলওয়ে নেই, যথেষ্ট ফ্যাক্টরী নেই। ইংলণ্ড কিম্বা জার্ম্মাণীর মতো তাড়াতাড়ি ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালাইজড্ হতে পারছে না। শুধু কয়লার অভাবে একটা দেশ জগতে পারিয়া হয়ে রয়েছে। অথচ জল থেকে তড়িৎ সংগ্রহ করবার সুযোগ ও-দেশে অপরিশেষ।"

"তা হলে ওদেশে আর অন্ধকার থাকল না দেখছি!"

"কি করে থাকবে? গ্রামে গ্রামে ফ্যাক্টরী। এখন মাত্র ৩৭ হাজার মাইল রেল্ লাইন। ভবিষ্যতে ৩৭ লক্ষ মাইল। যে পারিপার্শ্বিক জাতি প্রথাকে লালন করেছিল সে মরে যাবে, কাজেই জাতি প্রথাও।"

এইবার একটু গম্ভীর হইয়া মিসেস্ উইলস্ কহিলেন, "মা ম'রে গেলেও ছেলে বেঁচে থাকে, বার্ট্। এখনো এদেশে শ্রেণী প্রথা আছে।"

বাদল বলিয়া ডাকিতে অস্বস্তি বোধ হয় বলিয়া বাদলকে ইঁহারা বার্ট্ বলিয়া ডাকিতেন। এই ইংরেজী নামকরণ বাদলের সম্পূর্ণ মনঃপূত হইয়াছিল। 'সেন'-টাকে কোনমতে 'স্মিথ্' করা যায় না বলিয়া তাহার আক্ষেপ ছিল।

এক একটা আইডিয়া, বাদলকে নেশা পাওয়াইয়া দেয়। লোকে পাগল বলিয়া ক্ষেপাইবে, নতুবা সে ট্রেণে আসিবার সময় উপনিষদের ঋষিদের মত ঘোষণা করিতে করিতে আসিত, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ…!" মগজের চায়ের কেট্‌লিতে আইডিয়ার বাষ্প গর্জ্জন করিতেছে, সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যকে ভব্যতার ঢাকনা দিয়া কতক্ষণ শায়েস্তা রাখা যায়? ষ্টেশন হইতে বাস্, বাস্ হইতে বাসা—বাদল অতি কষ্টে পা দুইটাকে সংযত করিয়া মিসেস্ উইল্‌সের work-roomএ পৌছিল।

এ বাড়ীর প্রত্যেক ঘরেই তাহার অবাধ প্রবেশাধিকার। (রাত্রি বেলা স্বামীস্ত্রীর শোবার ঘরটি ছাড়া)। বাদলের বয়সের তুলনায় তাহাকে ছোট দেখায়, তাহার মুখে বড় বড় কথা শুনিতে এই নিঃসন্তান দম্পতীর কৌতুক বোধ হয়। সে চোখ বুজিয়া ঠিক সময়ে বিল্ মিটায়, অনুরোধ করিবামাত্র কৃতার্থ হইয়া ফরমাস খাটে, মিসেস্ উইল্‌সের সঙ্গে বাজার করিতে গিয়া বাজার বহিয়া আনে, মিসেস্ উইল্‌সের ছুঁচে সূতা পরাইয়া দেয়। এমন মানুষকে ঘরের মানুষের অধিকার দিতে বিলম্ব হয় না।

আরো আশ্চর্য্যের কথা, বাদল মিসেস্ উইলসের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী হইয়া তাঁহার চিঠিপত্র লিখিয়া দিত—সেই বাদল, যে নিজের পিতাকে ও নিজের স্ত্রীকে চিঠি লিখিবার সময় করিয়া উঠিতে পারিত না। মিসেস্ উইল্‌সের ফোন ধরিতে ধরিতে কত লোকের সঙ্গে তাহার আলাপ হইয়া গেছে। চিঠি লিখিতে লিখিতেও। একজন হবু ইংরেজের পক্ষে এ কি সামান্য লাভ?

বাদল দিবা-স্বপ্ন দেখিত। দশ বৎসর কাটিয়া গেছে, বাদল প্র্যাক্‌টিস্ জমাইয়া তুলিতেছে, এতদিন অমুক K.C'র জুনিয়ার ছিল, এবার স্বতন্ত্র হইয়াছে। এখন Temple অঞ্চলে তাহার আপিস্, পিকাডিলী কিম্বা সেণ্ট্-জেম্‌স্ অঞ্চলে তাহার ক্লাব্—সেইখানে সে সোমবার হইতে শনিবার অবধি বাস করে। তাহার বাসার ঠিকানা জানিতে চাও তো who's who খুলিয়া দেখ। ক্লাবের নাম পাইবে। রবিবারটা সে Countryতে কাটায়, Dorsetshireএ তাহার কুটীর আছে—"far from the madding crowd". সেখানে সে আইন আদালত ভুলিয়া বই লেখে, গল্‌ফ্ খেলে। ততদিনে Moth Aeroplane সস্তা হইয়াছে—বাদল তাহার নিজের এরোপ্লেনে চড়িয়া গ্রামে যায় ও শহরে আসে।

উইল্‌স্ গৃহিণীর কাছে তাহার শিক্ষানবীশী চলিতেছে, সংসার-সংক্রান্ত কোন শিক্ষাই সে বাদ দিবে না, অতিমাত্রায় প্র্যাক্‌টিকল, না হইলে ব্যারিষ্টার হইবে কী করিয়া? এই ভাবিয়া সে মিসেস্ উইল্‌সের রান্নাঘরে গ্যাসের উনুন ধরাইয়া দেয়। তাঁহার হাত হইতে Vacuum Cleaner কাড়িয়া লইয়া ঘর ঝাঁট দিতে যায়।

৩৭

একদিন মিসেস্ উইলস্ বলিলেন, "আচ্ছা মেয়েলি ছেলে যা হোক্। তোমার কি লেখাপড়া নেই, দিনরাত আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরো?"—চোখে হাসিয়া কহিলেন।

কী! আমাকে মেয়েলি বলা! বাদলের অভিমানে আঘাত লাগিল। দিনরাত যদি সঙ্গে ঘুরিয়াই থাকি—সত্য নয়, আমি প্রায়ই একা বেড়াইতে বাহির হই, নিত্য নূতন পথ ঘাট আবিষ্কার করিতে—তবু সেটা সব বিষয়ে চৌকষ হইবার আশায়। এবং একজনের সঙ্গে তর্ক না করিলে আমার অসুখ করে বলিয়া।

বাদল কহিল, "বলে নিন্ যা বল্‌বার। যে দিন বি. সি. সেন, K. C. 'র চেম্বারে লীগ্যাল্ অ্যাড্‌ভাইস্ নিতে যাবেন সেদিন আমার বক্তব্য আমি বল্‌বো।"

"ও মা, লীগ্যাল্ অ্যাড্‌ভাইস্ আমার দরকার হবে না কি? আমরা গরীব মানুষ, কারুর সাতেও থাকিনে, পাঁচেও থাকিনে। এক যদি আমরা নিজেদের নামে ডিভোর্সের মামলা করি!"

এই দম্পতীর পরস্পরের প্রতি আনুগত্য বাদলকে মুগ্ধ এবং ঈর্ষান্বিত করিত। সারাদিন "বার্ট" "বার্ট" "বার্ট" কিন্তু সন্ধ্যায় যখন মিষ্টার উইল্‌স্ কোন এক জেটিতে ম্যানেজারি করিয়া ফিরেন তখন থেকে শুধু "জর্জ্জ" "জর্জ্জ", "জর্জ্জ"। রবিবার আসিলে স্ত্রীটি স্বামীর বাহু লগ্ন হইয়া কোন একটি আধুনিক তন্ত্র গির্জ্জাতে যান। রাত করিয়া ফিরেন।

"হুঁ! আপনারা কর্‌বেন ডিভোর্স্! Silver wedding কর্‌ছেন কবে তাই বলুন! কর্ত্তাটি Darby, গিন্নীটি Joan!"

সেদিন রাত্রে খাইবার সময় মিসেস্ উইলস্ মিষ্টার উইল্‌স্‌কে বলিলেন, "শুনেছ জর্জ্জ, বার্ট বলে তুমি নাকি Darby আর আমি নাকি Joan!"

জর্জ্জ হঠাৎ এই উক্তির রসগ্রহণ করিতে পারিলেন না। একটু সময় লইয়া বলিলেন, "তার মানে আমরা দুটি বুড়ো বুড়ী—খুব সেকেলে। কেমন?"

"না গো। খুব পরস্পরানুগত।"

"হোঃ হোঃ হোঃ!"—কিন্তু অভদ্রতা হইতেছে ভাবিয়া এক মুহূর্ত্তেই জর্জ্জ গম্ভীর হইলেন। একজন বিদেশীর সাক্ষাতে এতটা অসংযম যে-কোনো ইংরেজের পক্ষে লজ্জার কথা।

নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া জর্জ্জ কহিলেন, "মোটের উপর ঠিকই বলেছে বার্ট। আমি লোকটা বদরাগী হলেও অনুরাগীও কম নই। আর তোমাকে না ক'রে অন্য কাউকে বিয়ে ক'রে থাক্‌লে সেও কম অবাধ্য হতো না, কুইনী।"

কুইনী বাদলের দিকে কৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "শুন্‌লে তো বার্ট? যাকে বলে left-handed compliment। তুমি যাকে Joan বলো উনি তাকে বলেন অবাধ্য।"

খাইবার ফাঁকে বাদল কহিল, "ইতিহাসে অবশ্য এমন কথা লেখে না যে Joan তাঁর স্বামীর অবাধ্য ছিলেন না।"

কুইনী কহিলেন, "অবাধ্য, অথচ অনুগত। আহা, কী রোম্যান্টিক! স্বামী আজ্ঞা কর্‌লেন, 'Joan, খেতে দাও।' স্ত্রী সেই অন্যায় হুকুম অমান্য কর্‌লেন। বল্লেন, 'এই যে দিচ্ছি। কিন্তু খাবার নয়, ওষুধ। তোমার শরীর ভালো নেই যে।"

জর্জ্জ কহিলেন, "আশা করি বার্টের ভাগ্যে এমনি একটি স্ত্রী জুট্‌বে।"

বাদল যে বিবাহিত একথা ইঁহাদের জানার নাই। হাতে আংটি না দেখিয়া ইঁহারাও অনুমান করিয়াছিলেন যে বাল্য-বিবাহের দেশেও এই বালকটি অবিবাহিত।

বাদল ইঁহাদের ভ্রান্তি ভাঙিল না। সত্যটা চাপিয়া গেল। কিন্তু বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কেননা তাহার সংকল্প ছিল মিসেস্ উইল্‌স্‌কে উজ্জয়িনীর কথা বলিয়া ডিভোর্স সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রার্থনা করিবে। ন্যায়তঃ উজ্জয়িনীকে মুক্তি দেওয়া তাহার কর্ত্তব্য। উজ্জয়িনীর জীবন-স্বপ্ন তাহার জীবন-স্বপ্নের সহিত বেখাপ হইবেই। তখন উজ্জয়িনী চাহিবে আপন জীবন-সঙ্গী খুঁজিয়া লইতে, বাদলের তো জীবন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন নাই। শয্যা-সঙ্গিনীই তাহার যথেষ্ট।

বাদল জিজ্ঞাসা করিল, "স্ত্রী বলতে আপনি কী বোঝেন, মিষ্টার উইল্‌স্? Mate, না life-mate?"

জর্জের বিদ্যাবুদ্ধি কম নয়, তিনি একজন গোঁড়া-সোশ্যালিষ্ট্ হিসাবে স্বপক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তি আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু চট্ করিয়া এমন প্রশ্ন বুঝিয়া উঠিবার মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। তিনি 'তাই তো', 'তাই তো' করিতে লাগিলেন।

কুইনী কহিলেন, "আমি বল্‌তে পারি। যৌবনের দেবী, প্রৌঢ়ত্বের কণ্টক, বার্দ্ধক্যের আশ্রয়-যষ্টি।—ধর্‌তে পার্‌লে না, বার্ট্; নাঃ, তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ।"

ছেলেমানুষ-আখ্যা লাভ করিয়া বাদল অপমান বোধ করিল। বয়স তাহার যতই কম হউক সে কাহারো চেয়ে ছোট নয়। মিসেস্ উইল্‌সের যদি লেশমাত্র দূরদৃষ্টি থাকিত তিনি বিংশতি বর্ষীয় বাদলকে ছেলেমানুষ বলিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেন না, পঞ্চাশৎ-বর্ষীয় নোবেল প্রাইজ অধিকারীকে এখন হইতে সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতেন। কত বড় জিনিয়াস্‌কে দিয়া বাজার বহন করাইতেছেন, ইহা লইয়া ভাবীযুগের জীবনীকারগণ তাঁহাকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করিবে। বাদল যেন তাহার জীবনীর একটা অধ্যায় কল্পচক্ষুতে পড়িতে পারিতেছে। ভাবিতে তাহার চমৎকার লাগিতেছে যে মিসেস্ উইল্‌সের সঙ্গে বাস তাহার জীবনের একটা অংশ নয়, জীবনীর একটা অধ্যায়।

তখন বাদলের ভাবনা হইল শত বর্ষ পরে যখন আমেরিকান টুরিষ্টেরা বাদলের বাসা দেখিতে আসিবে তখন কি এই বাড়ী এমনি থাকিবে, না, ততদিনে এই জমিতে একরাশ flat নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে? বলা যায় না। লণ্ডন যে গতিতে বাড়িতেছে, হয়তো বিশ বৎসর পরে এই স্থানে Putney Heath Court বা তেমনি কোনো নামের এক বিরাট সৌধ দাঁড়াইবে, উহাতে তিনশো'টা ছোট ছোট flat—প্রাচীর গাত্রে বড় জোর উৎকীর্ণ হইবে বাদলের নাম ও অব্দ। হায়! হায়!

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

বলশেভিক কবিতার বিপ্লবী রূপ

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ

শিশু যখন নতুন হাঁটিতে চেষ্টা করে তখন পদে পদে তাহার পদস্খলন দেখিয়া হাসি পায় না, কিন্তু একজন পরিণত বয়সের লোকে যখন অসাবধানে হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায় তখন সাধারণ লোকে হাস্য সংবরণ করিতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য, সময়ে সময়ে জাতির পক্ষেও তাহা সত্য। তাই মানব সভ্যতার প্রথম ধাপে বা তথা-কথিত অসভ্যতার মধ্যে বিবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অসম্পূর্ণতাগুলি দেখিয়া নৃতত্ত্ববিদ্ বা বিবেচক মানুষে কোন কৌতুক অনুভব করে না। কিন্তু যাহাদিগকে সম্পূর্ণ সভ্য মনে করা হয় এমন জাতি বিশেষ যদি প্রচলিত সংস্কার বহির্ভূত কোন কাজ করিতে সুরু করে, তবে তাহা সম সাময়িক মানবের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও হাস্যরসের সঞ্চার করিতে বাধ্য। বহু শতাব্দীর অত্যাচার নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত নবোত্থিত রুশিয়া নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া তাহার সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রচলিত সংস্কারগুলির যেরূপে নির্ম্মম ভাঙ্গা-গড়া করিতেছে, তাহার স্বরূপ দেখিয়াও সময় সময় হাস্য সংবরণ করা করা দায় হইতে পারে, কিন্তু নবীন রুশিয়াকে এরূপে বিচার করিলে তাহা এক হিসাবে অন্যায় হইবে, কারণ জারের স্বৈরাচারের উপর যবনিকা পাত করিয়া যে দিন রুশিয়া সমূহ-তন্ত্রের (Collectivism) অধীনে আত্মসমর্পণ করিয়াছে সে দিন হইতে রুশিয়ার এক অভিনব সভ্যতা জন্মলাভ করিয়াছে। ইহাকে একটি সুপরিণত সভ্যতার মাপ কাটিতে বিচার করিতে গেলে পদে পদে ভুল করা হইবে। এই কথাটি মনে রাখিয়া বলশেভিক রুশিয়ার নবীন কাব্য-সৃষ্টির আন্দোলনটিকে দেখিতে হইবে। বর্ত্তমান দিনে যাহারা এক অদ্ভ সময়ের আতিশয্যে সর্ববিষয়ে রুশিয়ার প্রেরণা খোঁজেন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কথা কয়েকটি মনে রাখিলে তাঁহাদের উপকার হইতে পারে আশা করা যায়। বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে রুশিয়া তাহার সত্যিকার দানটি কিরূপে দিতেছে তাহা বুঝিতে হইলেও এই কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন।

বলশেভিক মতবাদ অনুসারে 'আত্মা' নামে কোন একটি জিনিষ নাই এবং মানুষ একটি যন্ত্র মাত্র। তাই কাব্যজগৎকে 'আত্মা'র প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া যন্ত্রের অনুরূপে গড়িয়া তোলাই রুশিয়ার তরুণ সাহিত্যিকদের প্রথম চেষ্টারূপে দেখা দিল। ইঁহারা আসরে নামিয়াই পুশকিন্, গোগল, ডষ্টয়ভেস্কি ও টলষ্টয় প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিদের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন; উদ্দেশ্য কাব্যের স্বরূপ ও অর্থকে একদম ওলটপালট করিয়া দেওয়া এবং নতুন কিছু করা। কিন্তু এই নূতন কিছু করার বেশির ভাগই হইল 'কবি-প্রতিভা', 'অন্তর্দৃষ্টি', 'প্রেরণা' অথবা কাব্যসৃষ্টির অন্য রহস্যগুলির সম্বন্ধে সাহিত্যিক মহলে প্রচলিত কুসংস্কার নিচয়কে দূর করিয়া দেওয়া। রুশিয়ার শরীর তত্ত্ববিদ্‌রা ইহার আগেই প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, মানুষের সবখানিই জড়ধর্ম্মী; শরীর অন্যান্য জড় পদার্থের মতই বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে সাড়া দেয়, তাহার তথাকথিত আধ্যাত্মিক কর্ম্মগুলিও এই তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। বলশেভিক মনস্তত্ত্ববিদেরা ভাবিলেন কাব্যসৃষ্টির সমুদয় রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; এখন হইতে বাঁধাধরা নিয়মে উচ্চাঙ্গের কাব্য নাটক ও অপরাপর সাহিত্যিক 'চীজ' উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। তাঁহারা বলিলেন কবিতায় যে যে মানুষ আনন্দ পায় তাহার একমাত্র কারণ কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ মানুষের মস্তিষ্ককে উত্তেজনা দেয়। আর চিত্রকলায় আনন্দের কারণ হইল ঐ দিক দিয়া বিবিধ রঙের প্রতিক্রিয়া; অতএব ইহাদের মতে কবিতা কতকগুলি শব্দের যথেচ্ছ সমষ্টি আর ছবি কেবল কতকগুলি খামখেয়ালী রঙ-বেরঙের 'পোঁচড়' মাত্র। কলাসৃষ্টির পন্থা কেবল বহু

বিচিত্র শব্দ সাজানো এবং বিবিধ বর্ণ যোজনার কৌশল মাত্র।

এই যান্ত্রিক কবিতার তত্ত্বটি বিশেষ স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে রূপবাদী (imagist) কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে। শর্শেন এভিচ্‌ এবং মারিয়েন হোফই হইলেন এই দলের প্রধান 'চাঁই'। শর্শেন্ এভিচ্ তাঁহার দুই দুগুণে পাঁচ (?) নামক পুস্তকে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ছবি বা রূপের সমষ্টিই কবিতার প্রাণ; একটি মুখ্য ছবিকে ফুটাইয়া তোলার জন্য তাহার সঙ্গে অন্য কতকগুলি ছবি ফুটাইয়া তোলা অকর্ত্তব্য। কবিতার প্রত্যেক অংশ টুকু আলাদা আলাদা করিয়া উপভোগ্য হওয়া উচিত। ঐ গ্রন্থে শর্শেন এভিচ্‌ বলেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, কোন কবিতা তাহার অন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পড়িলেও সমানভাবেই তাহার রস উপভোগ সম্ভব হইতে পারে, অন্ততঃ হওয়া উচিত; কারণ নবীন রুশ চিত্রকরদের কাহারও কাহারও ছবি উল্টা করিয়া রাখিলেও তাহার রসবোধের কিছু মাত্র অসুবিধা হয় না।

'অপ্রচ্ছন্ন ভবিষ্যবাদ' নামক অপর এক পুস্তিকায় শর্শেন্ এভিচ্‌ কবিতাকে কেবল মাত্র শব্দ গ্রন্থনের কৌশল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁর মতে কবিতা কেবল কতকগুলি বিশেষ্য-বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া পদের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহার এক বিশেষত্ব এই যে ইনি শব্দের অর্থকে বিশেষ আমল দিতে চান না। তিনি বলেন, প্রত্যেক শব্দই আমাদের চোখের সামনে একটি ছবি আনিয়া দেয় এবং ইহাই প্রতি শব্দের আদিমতম স্বভাব। কবির উচিত, শব্দগুলিকে ছবির বাহনরূপে কবিতায় ব্যবহার করা। প্রত্যেক শব্দ একটি জানোয়ারের চিৎকার মাত্র, মানুষের ভিতর হইতে ভাবাবেগে উহা বাহির হইয়া আসে এবং ক্রমে চিন্তা-জগতের চক্রে পড়িয়া উহা অর্থযুক্ত হয়। কাজেই সমস্ত ব্যাকরণের নিয়মে জলাঞ্জলি না দিলে কবিতা তৈরী করার উপায় নাই—ইত্যাদি।

আর, একদল রুশীয় কাব্যরসিক আছেন যাঁরা পূর্ব্বোক্ত মতেরই অনুরূপ মত পোষণ করেন। খেল্‌বনিকভ হইলেন এই দলের ধুরন্ধর। তিনি বলেন শব্দের একটা স্বাধীন শক্তি আছে; তাহা দ্বারাই চিন্তা ও হৃদয়-বৃত্তির সরসতা সম্পন্ন হয়, কাজেই তিনি শব্দের মূলে ধাতুতে পৌঁছিতে চেষ্টা করেন এবং তাহারই উপর সমস্ত কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মতামত সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়ায় আর একটা মত এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈজ্ঞানিক ভাবে শিক্ষিত শ্রমজীবীর হাতে সাহিত্য বস্তু শব্দের রাসায়নিক সংমিশ্রণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ক্রমে এই অপূর্ব্ব বিজ্ঞান শাস্ত্রের-উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষ রকমের ল্যাবরেটরীও স্থাপিত হইয়াছিল। বলশেভিক গভর্ণমেন্ট এরূপ ল্যাবরেটরীর প্রয়োজন বিশেষ ভাবে স্বীকার করেন। এই ল্যাবরেটরীর প্রচলিত কবিতার প্রত্যেক কণাটিকে আলাদা করিয়া উহার বিশ্লেষণ ও সংশোধন করিয়া লওয়া হইল। এই কারখানার চালকেরা বলেন যে, এরূপ করিলে কবিতার সর্ব্ববিধ রহস্যময় যাদুর শক্তি দূরীভূত হয়। এইখান হইতে কবিতা তৈরীর নানা 'প্রেসক্রিপসন'ও বাহির করা হইল। এই ল্যাবরেটরীর চালকেরা আশা করেন যে কবিতা লেখাও এক দিন পিয়ানো বাজনার মত লোকের শিক্ষণীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। ড্রয়িংএর মত কবিতা লেখাও প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত করা হইবে। মুষ্টিমেয় লোক যে প্রতিভার দোহাই দিয়া বুজরুকী করিয়া কাব্যনির্ম্মাণের যশ একা ভোগ করিবে তাহা আর চলিবে না। স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েরাও এই সকল 'জারিজুরি' সহজে আয়ত্ত করিয়া ফেলিবে এবং অনায়াসে কবিতা রচনা করিবে।

ইহার পরেই এক রকম সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, প্রতিভা, অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদি কথার কথা মাত্র; ঐ সকল শুধু বুর্জোয়া এবং বিপ্লববিরোধী দলের স্বার্থমূলক কুসংস্কার।

প্রাচীন-পন্থী কবি প্রতিভাতত্ত্বের খণ্ডন করিয়াই নব্য বলশেভিক কবিরা ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহাদের মতে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য কোন প্রকার 'প্রপ্যাগাণ্ডা'র সহায়তা করা। কাজেই বিপ্লবী কবিতাকেও

যে কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগিতে হইল তাহা বলাই বাহুল্য। কবিতা ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে জীবনকে সৌন্দর্য্যময় করা ও তাহার রস উপলব্ধি করা এই ধারণা ত আরম্ভেই সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাই কমিউনিজ্‌মের নীতি-অনুযায়ী জীবনকে যথাযথভাবে পুনরায় গড়িয়া তোলার কাজে শিল্পকলাকে লাগানো হইল। নব কবিতা, উপন্যাস, নাটক আদি আর চিন্তা, হৃদয়বৃত্তি অথবা কোন প্রকার আদর্শ ছবি আঁকিল না, কমিউনিজ্‌ম্ অনুসারে, জীবনের ভাঙ্গা-গড়ার কাজে মজুরী করার জন্য সে কঠোরভাবে লাগিয়া পড়িল। বলশেভিক সমালোচক বলিলেন, "সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্ব নয় উহা জীবনের সংগঠক। দুর্ব্বল বুর্জোয়ার হাতে ইহা বিলাসিতাময় দর্পণ আর শ্রমিক সাধারণের মুষ্টির মধ্যে ইহা শক্ত হাতুড়ি।"

বলশেভিক কবিতার উপর প্রথম দাবী হইল বিপ্লবীভাব জন্মানো। বলশেভিক গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষিত জাতীয় কবি ডেম্‌ইয়ান বোড্‌নি এই শ্রেণীর প্রচুর কবিতার স্রষ্টা। তিনিই বলশেভিকদের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রাম-গীতির কয়েকটি ছত্রের মর্ম্মানুবাদ নিয়ে দেওয়া হইল।

"ওঠ! ওঠ! হে মানব, প্রতিশোধ নিতে হবে
বিশ্বমাঝে যত দুর্ভোগের!

তোমরা হে শ্রমজীবী দল,
পিষে ফেল গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে!
তোমাদের মুষ্ট্যাঘাতে
ছায়ামূর্ত্তি 'গড্' মশায়েরে!
তোমরাই প্রভু আজ
দুনিয়ার ভাগ্য-অভাগ্যের!
হে শ্রমিক মুক্ত তুমি, মুক্ত আজ!

হিংসার প্রখরতা ও ঘৃণা উৎপাদনে ফরাসীদের জাতীয় সঙ্গীত ইহার নিকট হার মানে। 'রাজপথ' শীর্ষক এই কবির আর একটি কবিতাও এই ভাবে লেখা। এই কবিতা শ্রমিক জীবনের সংগ্রাম ও গৌরবের দ্যোতক বলিয়া রুশিয়ায় বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছে। কবি লিখিতেছেন,

"কে ও খানে? নষ্ট হায়!
এইখানে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছে শুনি?
হও অগ্রসর, মনিবের দল,
জাহান্নমে যাক্, সব বিলাসিতা,
ধ্বংস তোমাদের চাইনা আমরা,
চাটুবাদ যত তোমাদের মুখে!
রাখ ছ্যাক-নাড়া সকরুণ ভাবে,
মারি তোমাদের মুখের উপর,
হে মনিবের দল!
জাহান্নমে যাও! যাও জাহান্নমে!
অস্থি তোমাদের পচিছে চর্ব্বিতে!
শুয়ে পড়্, রক্তলোভী কুকুরের দল!
চাটুকার! চোপা বন্ধ কর্!
তোরা যত মরণার অবতার!
পড়্ যেয়ে নর্দ্দমায়!
জাহান্নমে ঢোক্
রাস্তা খোলা রয়েছে সদাই!
যাক্ জাহান্নমে সারা দল বল!
এক দুই! এক দুই!
চলো—চলো!"

বেড্‌নির কবিতা রুশিয়ার কমিউনিষ্ট মহলে বিস্তর সমাদর লাভ করিয়াছে। রণক্লান্ত লাল ফৌজের বহুসৈন্য বেড্‌নির কবিতা শুনিয়া যুদ্ধের জন্য নূতন প্রেরণালাভ করিয়াছে। যদিও সাধারণ শান্তি-পিপাসু সভ্য সমাজে এরূপ কবিতা বর্ব্বরতার নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে। বলশেভিকরা এই বেড্‌নিকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত লাল ফৌজের কর্ত্তা খোদ ট্রট্‌স্কীও বেড্‌নির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

কিন্তু সরকারী সম্মান ও ট্রট্‌স্কীর প্রশংসাপত্র লাভ করিলেও রুশিয়ার অন্য বিপ্লবী কবিরা তাহাকে 'সেকেলে' বলিতে ছাড়িল না। তাহাদের মতে বেড্‌নির কবিতায় প্রাচীন ছন্দ ও অলঙ্কারের দাগ রহিয়াছে। এই দলের

লোকেরা মাইয়াকভ্স্কীকে সত্যিকারের বিপ্লবী কবি বলিয়া ঘোষণা করিল। সত্যিই এই বিপ্লবী কবি তাঁর নামের উপযুক্ত কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁর কবিতায় উৎকট গলার আওয়াজ, মুষ্টি-যোদ্ধার গায়ের জোর আর গুণ্ডাদের ধৃষ্টতা এ সব গুলিরই আভাস রহিয়াছে। পাশবিক ভাবের উত্তেজনা দিতে তাঁহার কবিতাগুলি বেড্‌নির কবিতার চেয়ে কম সক্ষম নয়। 'লেফ্‌ট মার্চ্চ' নামক একটি কবিতায় তিনি লিখিতেছেন :—

"চল, এগিয়ে চল, চল জোরে জোরে,
বাক্যের আড়ম্বর আর ভণ্ডামি খুব হ'ল,
মিথ্যা চ্যাঁচামেচির এবার অন্ত করে দাও!
এই বুলি ধর, কমরেড্‌ মাউশার!
গেল সংসারটা ছেঁড়া ন্যাকড়া হয়ে
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!!
শিকার ধরতে এগিয়ে চল!!
লেফ্‌ট!
লেফ্‌ট!
লেফ্‌ট!"

কিন্তু রুশীয় 'বিদ্রোহী' কবির উল্লিখিত রচনাটি অদ্ভুত মনে হইলেও 'দেড়শ মিলিয়ন' নামক ইহার যে একটি রচনা আছে তাহাকে রুশীয় বিপ্লবের মহাকাব্য বলা যায়। এ কাব্যে কয়েকটি স্থল এমন আছে যাহা বিশেষ কৌতুহলপ্রদ, যথা—

"উপন্যাসের জগৎটাকে উপড়ে ফ্যাল!
শোকধ্বনির গায়কদেরে চেপে মার!
বাপ দাদাদের দুঃখবাদের বাণী যত!
চেপে মার, অধিকারের উন্মাদ-পেষণে!
সাহসী হও খেলোয়াড়ের মতো—শক্ত পেশী নিয়ে,
কর্ম্মটাকেই ধর্ম্ম পুরাপুরি মনে কর, আত্মা তোমার!
বাষ্প আর রুদ্ধ হাওয়া বিদ্যুৎস্পন্দন!
শানাও সবে দাঁত।
কামড় মার সময়-পরে'
কেটে ফেল বন্ধন!
নূতন নূতন মুখ! নূতন নূতন স্বপ্ন!
নূতন নূতন গান! নূতন নূতন দৃশ্য!
নূতন পুরাণ কথা দিচ্ছি মোরা ছেড়ে;
জেলে তুলছি আমরা এক নূতন চিরন্তনী!

* * *

যারা সবে চাপড়াচ্ছে বুক
তা'দের কাছে এই ঘোষণা বাণী;
পচা পুতি গন্ধমাঝে বহুদিন ধ'রে
আর কতদিন!
ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে!
এবার শেষ, এবার শেষ!
করব মোরা, পারব মোরা!
কেন ক'রব না?
হও এক কাট্টা।"
বেরিয়ে এস বহু শতাব্দীর অন্ধকার হ'তে
চল সবে সমান তালে পা ফেলে!"

এই সকল নতুন ধরণের অদ্ভুত কবিতা কেবল সামাজিক বিপ্লবের জয়গান করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না, পরন্তু সাময়িক ও স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেও কবিদের 'ওস্তাদী' অনেক কাজে লাগিয়াছিল। রুশিয়ার ধর্ম্ম-সংস্কার বা খ্রীষ্টানী-সংহারের ব্যাপারেও কবিদের কৃতিত্ব কম নহে তাঁহাদের কবিতা-বাণে সশিষ্য যীশুখ্রীষ্ট এবং কুমারী মেরীকে কম জর্জ্জরিত হইতে হয় নাই।

কিন্তু এমন সব কর্ম্ম করিলেও কবিদের উৎপন্ন দ্রব্য-গুলিকে বলশেভিক সরকার যাচাই করিবার অধিকার ষোল আনা খাটাইতে চাহিলেন। তাঁহাদের ভয় পাছে ঐ সকল কবিতায় কোন গতিকে বিপ্লব-বিরোধী কোন কথা বা ধরণ ধারণ ঢুকিয়া পড়ে! তাহা হইলে ত সব পণ্ড হইবে! কমিউনিষ্ট দলের লোকেরা মাইয়াকভ্স্কির কবিতাকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাঁহারই আদর্শে নূতন রুশিয়ার কাব্য-জগৎ নিয়ন্ত্রিত হইবে এমন আশঙ্কা দৃঢ় হইল।

সমাজের অর্থ নৈতিক চেহারার সঙ্গে তাহার শিল্পরূপের একটা সামঞ্জস্য থাকিবে ইহা কম্যুনিষ্ট মতবাদের একটা অংশ। ডেমিয়ান্ বেদনি মাইয়াকভস্কি প্রভৃতি কবি-রত্নগণকে বলশেভিকেরা কাব্য মন্দিরের শীর্ষস্থ মনে করিলেও পূর্ব্বোক্ত মতবাদ পুনরুত্থিত হইয়া উহাতে কিছু

অসুবিধা করিয়া দিল। রাশিয়ার সমাজ সমষ্টি তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেই উহার শিল্পকলার উপরও সমষ্টির ছাপ থাকা প্রয়োজন। কোন ব্যক্তিবিশেষ যে সমষ্টির প্রতিনিধিরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে ইহা সমষ্টি তন্ত্রের মূলগত নীতির বিরোধী। কাজেই বিপ্লবী রাশিয়ান্ সংস্কারকেরা অচিরে এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে কাব্য সাহিত্যাদিকে সর্ব্বতোভাবে অ-ব্যক্তিগত হইতে হইবে।

এই নব প্রচেষ্টা, নূতন সাহিত্যের রূপ ও প্রতিপাদ্য বিষয় এই দু'য়েতেই আত্মপ্রকাশ করিল। কবি বগ্দানব ঘোষণা করিলেন যে, সত্যিকারের শ্রমিক শিল্পকলা কেবল সমষ্টিদ্বারাই রচিত হইতে পারে। তাঁহার প্ররোচনায় 'কাব্যরচনার কারখানা' সকল স্থাপিত হইল। উহাতে 'শব্দের কারিগরেরা' সকলে মিলিয়া কাব্যরচনায় নিরত হইলেন।

নব্য রাশিয়ার বহু সাহিত্য-পত্রিকায় 'চতুর্দ্দশ-কবি', 'তেত্রিশ জনের মণ্ডলী', 'রিয়াসন্ গ্রামের কবিমণ্ডলী' ইত্যাদি রচয়িতা নাম সম্বলিত বহু গ্রন্থ দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত 'কাব্য কারখানা' গুলির গর্ব্ব তৈয়ারী মালের বিশালত্ব লইয়া এবং ইহাতে অন্যায় কিছুই নাই কারণ পরিমাণের বিশালত্বই সমষ্টিতন্ত্রের দ্যোতক, গুণানুসারে কাব্য-বিচার করা যে নেহাৎ সেকেলে ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সূচক

এই সকল কারণে বলশেভিক কাব্যজগতের ধুরন্ধরেরা দেখিলেন যে কোণঠেসা হইয়া না থাকিতে হইলে অচিরে সমষ্টিতে ভিড়িয়া আত্মবিলোপ সাধন করা ছাড়া উপায় নাই। 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'; তাই খ্যাতনামা কবিরা দুই এক সপ্তাহের মধ্যে নিজ ব্যক্তি-নাম চাপা দিয়া পণ্ডিতের মত নামহীন ব্যক্তিত্বহীন সমষ্টির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। মাইয়াকভ্স্কি এ বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হইলেন যে তাঁহার পরবর্ত্তী কাব্যগুলিতে তিনি নিজ নাম একেবারেই দিলেন না। তাঁহার 'দেড়শ মিলিয়ন' বা 'পনর কোটি' নামক গ্রন্থের রচয়িতা রূপে সমগ্র রাশিয়ান জাতির নাম লেখা হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থের জন্য যশ এবং উহার দোষের জন্য দায়িত্ব দুইই পনর কোটি লোকের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। মাইয়াকভ্স্কি নিশ্চয় জানিতেন যে রাশিয়ায় কোন লোকই নিজকে সমগ্র গ্রন্থের স্রষ্টা বলিয়া দাবী করিতে সাহসী হইবে না। গ্রন্থের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে তিনি যে মুখপত্র লিখিয়াছেন তাহা এই প্রকারের :—

পঞ্চদশ কোটি, পঞ্চদশ কোটি,
এই নাম এ কাব্যের রচয়িতাদের ;
দুম্দাম্ দুড়্দাড়্ গোলার আওয়াজ
হয় এর ছন্দোমান ;
অগ্নির ঝলক্ ছোটে আঁকা বাঁকা হয়ে ;
লিখিছে আগুন—'মাইনে'র পথ,
'মাইন্' বিস্ফোরণ, বিদ্রাবণ,
গৃহোপরি গৃহ চড়ে,—
আমি এক কথা কওয়া কল,—
মেঝের পাথর ঘু'রে চলে ;
তোমাদের পদভরে কাঁপুক ধরণী
ঝণৎকারে বর্ণমালা সম ;
পঞ্চদশ কোটি, পঞ্চদশ কোটি,
দাঁড়াও !
এইরূপে এই গ্রন্থ মুদ্রিত কেথায়।

মাইয়াকভ্স্কির পক্ষে সমষ্টি রচিত কবিতার পক্ষ সমর্থনের মধ্যে একটু বিস্ময়ের কারণ আছে কারণ কিছুদিন আগে এই কবি যে কেবল নিজ নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিতেন তাহা নয় পরন্তু গ্রন্থের নামের সঙ্গেও তাঁহার নাম জোড়া থাকিত ; যথা তাঁহার লেখা ব্যঙ্গ কবিতার সংগ্রহগুলির নাম ছিল 'মাইয়াকভ্স্কির অট্টহাস্য' 'মাইয়াকভ্স্কির স্মিতহাস্য' 'মাইয়াকভ্স্কির হাস্যকৌতুক' ইত্যাদি। আলোচ্য বিষয়গুলির সঙ্গেও তাঁহার ব্যক্তিত্ব জড়িত থাকিত, কবিতাগুলিতে পদে পদেই মাইয়াকভ্স্কির নাম পাওয়া যাইত।

* * * *

সাহিত্য লইয়া এত বিপ্লব চলিলেও রাশিয়ার সাহিত্যের ভবিষ্যৎ প্রকৃত প্রস্তাবে অন্ধকারময় নয় ; এই বিচিত্র চেষ্টা ও সংগ্রামের ভিতর দিয়াই সে তাহার যথার্থ স্বরূপকে খুঁজিয়া পাইবে।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

অচেনা মেয়ে

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

গৌরী নদীর ওপারে ভাঙন লাগিয়া এপারে শ্যামাঙ্গিনী পল্লীর কোলে আধ মাইলটাক্ চর পড়িয়া গ্রামের শোভা যেমন তিরোহিত হইয়াছে, নদীর জল আনিয়া শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার দিনে প্রতিদিন ঘরে তোলাও তেম্‌নি কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের বনপ্রান্ত দিয়া নদী বহিত—যাঁহারা স্রোতস্বিনীর দৃশ্য-সৌন্দর্য্য দেখিবার আশায়, আর একটু নির্ম্মল বায়ুর লোভে তার ধার ঘেঁসিয়া বৈঠকখানা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাঁহারা নেহাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গেছেন; বৈঠকখানার বসিয়া তাঁহারা এখন বিস্তীর্ণ বালুরাশি দেখেন—চোখের উপর তার অনাবৃত রুক্ষ মূর্ত্তি থর্ থর্ করে—সয় না। রৌদ্রে বালু আগুন হইয়া এমন গরম নিঃশ্বাস ছাড়ে যে সময়ে অসময়ে গাছের পাতা কুঁকড়াইয়া ওঠে…

কিন্তু এ গেল বহিরঙ্গণচারী পুরুষদের কথা; তাঁহারা এই মরুভূমির দিকে পিছন্ ফিরিয়া বসিলেই আর কষ্টের কারণ থাকে না।…কে একবার মরিয়া হইয়া তরমুজের আবাদ করিয়াছিল, কিন্তু সে কথা আর কেন!

কষ্ট বেশী মেয়েদের—প্রত্যহ জল টানিতে হয় তাহাদেরই; জলভরা ঘড়া কাঁখে লইয়া আধ মাইল পথ বালু ভাঙিয়া আসিতে তাহাদের পা সহজে সরে না—হাঁটুর কষ্টে কান্না পায়; ঘরে পৌঁছিয়া জলের ঘড়া নামাইয়া ঘন ঘন দমের টানে মুখে রা সরে না অনেকক্ষণ—আর, কোমরের জ্বালা কি!

ষড়ানন দত্তের স্ত্রী সুরমা, বিধবা ভগিনী ক্ষমাসুন্দরী এবং বিধবা ভ্রাতৃবধূ উল্লাসিনী ঐ বালু ভাঙিয়া একদিন জল লইয়া আসিতেছিল।

প্রথম, বছর-দুই ইহারা ষড়াননকে বাড়ীতে ইঁদারা কাটাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিয়াছিল; ক্ষমা বলিত,—জল টানতে আর পারিনে, দাদা…উঃ।

ষড়ানন বলিত,—দাঁড়া…ছাব্বিশ সালের লোকসানটা একটু সাম্‌লে নিই—বড় ধাক্কা গেছে—তারপর এমন ইঁদারা কাটাব যে তার ভিতরে প'ড়ে তোরা ননদ-ভাজে সাঁতার কাটবি। বলিয়া ইঁদারা যেখানে কাটাইবে বলিয়া যথার্থই স্থির করিয়া রাখিয়াছে সেই স্থান-টার পরিধি হাত ঘুরাইয়া দেখাইয়া দিয়া ষড়ানন মনের সুখে হাসিত।

কিন্তু ওটা ষড়াননের মিথ্যা কথা।

ছাব্বিশ সালের লোকসান সাতাশ সালেই উঠিয়া আসিয়াছে; কিন্তু ষড়ানন পাটে জল ঢালিয়া পাইকারকে যেমন, নানান্ কথা কহিয়া ঘরের লোককেও তেম্‌নি ঠকাইতে জানে।…তার আশ্বাসপ্রদ হাসি দেখিয়া ক্ষমারা ননদ-ভাজে প্রবঞ্চিত হয়; ভাবে, তাই বুঝি!…আরো কত সাল গেল—পাটের দর পঁচিশ টাকা হইয়া ছাব্বিশ সালের লোকসানের প্রসঙ্গটাকেই আবরণের উপর আবরণ দিয়া স্তরে স্তরে ঢাকিয়া দিয়া গেল—লাভ উপ্‌ছিয়া পড়িল, কিন্তু ক্ষমাদের তা' চোখে পড়িল না—

ননদ-ভাজের সাঁতার কাটিবার মত করিয়া ইঁদারা কাটান হইল না—ক্ষমাদের জল টানা বন্ধ হইল না।

যাহা হউক, একদিন ক্ষমারা তিনজনে জল আনিতেছিল।

অগ্রহায়ণের অপরাহ্ণ—

সূর্য্য পশ্চিমের বনান্তরালে নামিয়া গেছে; পিছনে ওপারে দীর্ঘতম গাছটির মাথায় রৌদ্রের পিঙ্গল স্পর্শ আছে, নিয়ে ভাঙনের এলান' মাটির গায়ে আলোকের অবশেষটুকু অবসানের দিকে গড়াইয়া আসিয়া তখনও টিঁকিয়া আছে—কিন্তু তাহাদের সম্মুখের বৃক্ষবহুল গ্রামের অভ্যন্তরে ছায়া নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

দূরে কোথায় অসময়ে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল…

ক্ষমা বলিল,—একটু পা চালিয়ে এস বৌ; সন্ধ্যে হ'য়ে এল যে।

সুরমা বলিল,—তা' আসুক। বালির ওপর কি তাড়াতাড়ি করা যায়?—হুড় মুড়িয়ে প'ড়্ব যে ঘড়া নিয়ে!

পড়ার চিত্রটা বাস্তব—

একদিন সরকারদের বাড়ীর অনুরূপার ঐরূপ অবস্থাই তাদের চোখের সামনে ঘটিয়াছিল; মনে পড়িয়া তিনজনেই হাসিয়া উঠিল…

উল্লাসিনী বলিল,—সে মেয়েরও জ্ঞান খুব! আমি ত ঘড়া নিয়ে উঠ্তেই পারতাম না আর।

ক্ষমা বলিল,—সবাই ত' বাড়ীর ছোট বৌয়ের মত পল্কা নয়!…বালির উপর কুকুরের পায়ের দাগ দেখিয়া ক্ষমা পুনরায় বলিল,—আর এক খবর শুন্লাম আবার—শীত না পড়তেই বাঘ দেখা দিয়েছে!

সুরমার বিশ্বাস হইল না; বলিল,—হ্যাঃ এখনই বাঘ!

—পরেশদের গাঁয়ের কাকে জখম করেছে, পরেশ বল্ছিল। গোয়ালে ঢুকেছিল—

—সে পরেশদের গাঁয়ে—এখানে কি তার!

সম্ভবতঃ ফুসফুসের ক্লান্তিবশতঃই আলোচনা আর চলিল না।

তিন জনকেই মাথা হেঁট করিয়া হোঁচটের ভয়ে পায়ের দিকে তাকাইয়া চলিতেছিল—সর্ব্বাগ্রে সুরমা, তার পশ্চাতে ক্ষমা, সকলের পিছনে উল্লাসিনী।

চলিতে চলিতে সুরমা হঠাৎ একবার মুখ তুলিয়া বিস্মিত হইয়া গেল—দেখিল, পনেরো ষোল বছরের একটি মেয়ে আলুথালু হইয়া তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।… স্ত্রীলোক ঘাটের পথে দৌড়াইতেছে ইহাই এক পরম আশ্চর্য্য ব্যাপার, তার উপর মেয়েটি অপরিচিতা, এ গ্রামের নয়—এবং কোথা হইতে সম্মুখে এখন হঠাৎ উদিত হইল, কোন্ আকাশ হইতে কি কোন্ জঙ্গল হইতে, তাহা কে জানে!…

সুরমার আরো চোখে পড়িল, মেয়েটির হাঁটুর নীচে কাপড় আঙুল আটেক ছেঁড়া, বলিল,—ঠাকুরঝি, দেখ দেখ।

—কি? বলিয়া মুখ তুলিয়া ক্ষমা দেখিল; উল্লাসিনীও দেখিল।

উল্লাসিনী বলিল,—ওমা, এ আবার কি!

কিন্তু বিশেষ কিছু ভাবিয়া লইবার সময়ই হইল না; তৎপূর্ব্বেই দেখিতে দেখিতে মেয়েটি আসিয়া—সুরমা ছিল সর্ব্বাগ্রে—তাহারই পায়ের কাছে ঠাস্ করিয়া পড়িল; বলিল,—আমায় বাঁচাও তোমরা।

সুরমাকে দাঁড়াইতে হইল।

পথে ঘাটে বাঘ দেখার রেওয়াজ এখানে খুব। লোকে বলে, সুন্দরবনের বাঘ নদীর ধারে ধারে জঙ্গলে জঙ্গলে এদিকে আসে; যেখান হইতেই হউক আসে সত্যিই, এবং লোকের সাম্নে পড়েও—

সুরমা তাই জিজ্ঞাসা করিল,—বাঘ দেখেছ?

—না। বলিয়া মেয়েটি চক্ষের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইল; ছট্ফট্ করিতে করিতে বলিল,—দাঁড়িও না, চলো শীগ্গির…তোমাদের বাড়ী কতদূরে?…আমায় তোমরা তোমাদের ঘরে নিয়ে চলো—যেন কেউ দেখ্তে না পায়।

এ একেবারে অবাক্ কাণ্ড—

মেয়েটির রূপ, তদুপরি যৌবন, তার ছট্ফটানি, ত্রাস আর ব্যাকুলতা—কিছুরই অর্থ না পাইয়া ক্ষমা জিজ্ঞাসা করিল,—কে তুমি? কোথা থেকে' আসছ?

—এখানে কোন কথা নয়; আগে তোমাদের ঘরে যাই…বলিয়া মেয়েটি গা গুটাইয়া ওদের তিনজনের ব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় লইল, এবং মুহুর্মুহু চোখ ফিরাইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল…

বলিল,—চলো।—পারিলে ওদের উড়াইয়া লইয়া যায় এম্নি মেয়েটির চলিবার তাড়া…

প্রত্যাগত পাখীর কলরব তখন দূরে-নিকটে তুমুল হইয়া উঠিয়াছে—

সুরমা বলিল,—বেলা গেল।…তাই চলো; বাড়ীতে গিয়েই তোমার কথা শুনব।

ক্ষমা ভাবিল, ছুঁয়ে একাকার ক'রে দিলে! জিজ্ঞাসা করিল,—কি জাতের মেয়ে তুমি?

মেয়েটি বলিল,—বামুন।

"চলো, চলো"...বলিয়া ক্ষমাদের ভারাক্রান্ত মন্থরগতির উপর পুনঃপুনঃ অসহিষ্ণু ধাক্কা দিতে দিতে মেয়েটি ওদের লইয়া চলিল...সমস্ত পথটা তার সচকিত দৃষ্টি আর লুকাইবার চেষ্টা যেন পাগলামিতে দাঁড়াইয়া গেল।

যখন ওরা বাড়ীতে পৌছিল তখন সন্ধ্যা আসন্ন... অস্পষ্ট আলোকেই ক্ষমারা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, মেয়েটির চমৎকার রূপ—খুঁজিলে খুঁৎ অক্লেশেই বাহির করা যায়, যেমন ভুরুদুটি বেশী ঘন, কপালের মাঝখানটা একটুখানি উঁচু, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমগ্র মুখশ্রীতে যে লাবণ্য বিরাজ করিতেছে তাহা মনে রাখিবার মত... শরীরের যত্ন লওয়া হয় নাই তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়—চুলে তেল নাই, কাপড় ধুলিময়—কিন্তু ইহার দিকে চাহিলেই অযত্নের মলিনতা যেন অপসৃত হইয়া যায়—মাধুরী চোখে পড়ে।...বহু অশ্রুমোচনের পর যেমন চোখের পাতা ভার হইয়া থাকে আর মুখমণ্ডলে একটা প্রশ্নাতীত শুষ্ক স্থিরতা আসে ইহারও তেমনি

তিনজনেই ঘরে উঠিয়া ঘড়া নামাইয়া রাখিল...বউয়েরা সন্ধ্যার কাজে ব্যস্ত হইল· এবং ক্ষমা আসিয়া দেখিল, মেয়েটি সেখানে নাই।

ক্ষমার বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল; ব্যগ্র হইয়া ডাকিল, —কই গো তুমি, কোথায় গেলে?

কোনো জবাব আসিল না, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া আগের মতন দু'হাত দিয়া ক্ষমার পা জড়াইয়া ধরিল; বলিল,—কেউ যদি আমায় খুঁজতে আসে তবে ব'ল না যে আমি এখানে আছি।...তোমাদের বাড়ীর বেটাছেলেরা কই?...বড় ভয় করছে আমার...আমায় তোমরা লুকিয়ে রাখ।

ক্ষমা তাহার প্রয়োজন বুঝিল না; তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিল; বলিল,—কি হ'য়েছে বলো। আমি কিন্তু রকম ভাল বোধ করছি নে। বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছ?

—না। বলিয়া মেয়েটি আবার বসিয়া পড়িল... তারপর সে কাঁদিতে লাগিল...এমন কান্না কেউ দেখে নাই...মানুষের বুকে অত জল থাকে না...অম্বর আকাশই যেন রূপ-বর্ণ-বিবর্জ্জিত হইয়া গলিয়া গলিয়া তার দু'টি চোখের রন্ধ্র দিয়া নিরন্তর নির্গত হইতে লাগিল·

এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সে তার কাহিনী বলিয়া গেল।...ক্ষমার মনে হইল, এম্‌নি করিয়া অফুরন্ত কান্নার স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াই এ-কথা বলিতে হয়।

ক্ষমা বুদ্ধিমতী মেয়ে—

তার সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ুজাল অসহ্য একটা চমক খাইয়া একবার থর থর করিয়া উঠিলেও শেষ অবধি সে ধীরভাবে কান পাতিয়া শুনিল—গোলযোগ তুলিল না, বাধা দিল না, প্রশ্ন করিল না...দেহের রক্ত হিম হইয়া শরীরের উপর দিয়া বারম্বার যে কণ্টকতরঙ্গ বহিতে লাগিল তাহাও ক্ষমা নিবারণ করিতে পারিল না।

তার বলার যখন শেষ হইল, তখন ক্ষমার মনে হইল, পৃথিবীতে আর কিছুই নাই—এই গৃহ-ক্ষেত্রে তারা দু'টি নারী, এবং তাহার বাহিরে অসংখ্য ক্ষুধিত পশু ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে চারিপাশে হাত বাড়াইয়া, সম্মুখে পা ফেলিয়া, দিগ্বিদিকে দৃষ্টি হানিয়া শিকারের সন্ধানে অশেষ অন্ধকার মথিত করিয়া ফিরিতেছে...

ক্ষমা সহসা ভয় পাইয়া ছিট্‌কাইয়া উঠিল...মেয়েটির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া তাহাকে একটা ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া বলিল,—এই ঘরে বন্ধ থাক তুমি...দাদা না এলে আমরা কিছু ঠিক করতে পারছিনে।...কিছু ভয় নেই তোমার।...বলিতে বলিতে ক্ষমার প্রাণে আপনাদেরই অসহায় নিঃসঙ্গতার অনুভূতির মাঝেই কেমন একটা সান্দ্র লোলুপতা সহসা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল...মেয়েটির আনতমুখ আরো সুন্দর...দু'পা আগাইয়া যাইয়া মেয়েটিকে দু'বাহুর গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ক্ষমা পুনরায় বলিল, —কিছু ভয় নেই তোমার। বলিয়া বাহির হইয়া আসিয়া সে দরজায় শিকল তুলিয়া দিল।...

আপন অদৃষ্টে সন্তুষ্ট হোক্ অসন্তুষ্ট হোক্, এই তিনটি নারীরই কলকণ্ঠে আনন্দ-আলাপে বাড়ী সারাক্ষণ জমজম্ করিত; কিন্তু সে সন্ধ্যায় কাহারো মুখে শব্দটি রহিল না... শঙ্খের মুখে ফুৎকার দিতে যাইয়া ফুৎকার বসিল না...সন্ধ্যার যে ধ্যানী মূর্ত্তি আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের গৃহের মৃত্তিকায় আর প্রাণের আসনে উপবেশন করিত সে টলিয়া স্থানচ্যুত হইয়া গেছে; যে বায়ুপ্রবাহ তাহাদের গৃহের মাটি হইতে নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া নক্ষত্রের রশ্মি আনিয়া ধূলিকণার গায়ে মাখাইয়া দিত তার গতায়াত অসাড় হইয়া থামিয়া গেছে...

তিনজনে পরস্পরের মুখের দিকে চায়, প্রাণ আকুলি-বাকুলি করে আর অনুভব করে, ভাল মন্দ কিছুই ঠাহর হইতেছে না—আপনাকে ব্যক্ত করিতে গেলেই বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে...

থাকিয়া থাকিয়া ক্ষমা কেবলি ঢোক্ গিলিতে লাগিল, আর ভ্রাতৃবধূদের কর্ণমূলে উৎকণ্ঠা প্রবেশ করিতে লাগিল,—দাদা আস্‌বে কখন! এত দেরী কেন কর্‌ছে আজ!

ষড়াননের বিলম্বে উদ্বেগের কষ্ট সহিয়া সহিয়া ক্ষমা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় ষড়াননের সাড়া পাওয়া গেল...এতক্ষণে কাজের লোকের ফিরিবার সময় হইয়াছে!

ষড়ানন ঘোরতর শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ঢুকিল,—সব চুপচাপ কেন রে ক্ষমা? ঘুমিয়ে পড়্‌লি নাকি তোরা!

প্রত্যুত্তরে অন্যদিনের মত ক্ষমার সদা চঞ্চল কণ্ঠ তাহাকে সম্ভাষণ করিতে ছুটিল না—ক্ষমা আস্তে আস্তে যাইয়া তার কাছে দাঁড়াইল, চুপি চুপি বলিল,—ঘরে এস। কথা আছে।

—চুপি চুপি কি কথা রে!

এস ত'। বলিয়া ক্ষমা তাহাকে তাহার শোবার ঘরে তুলিল।...ঘরে চার পাঁচটি জানালা ছিল; ক্ষমা যাইয়া প্রত্যেকটির কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

ষড়ানন অবাক্ হইয়া ক্ষমার কাজ দেখিতেছিল; হাসিয়া বলিল,—আমায় কয়েদ কর্‌লি না কি? কথাটা কি? ব্যাপারটা কি?

কিন্তু ক্ষমা ফিরিয়া দাঁড়াইতেই তার মুখের দিকে চাহিয়া ষড়াননের মুখের হাসি তিরোহিত হইয়া গেল—কথাটা তবে হাসির নয়! বলিল,—কি বল্‌বি তুই? এত সাবধান হ'য়ে নিলি!

—বলি, দাদা; বড় কঠিন সমিস্যে। বলিয়া ক্ষমা দাদাকে লণ্ঠনের সম্মুখে বসাইয়া নিজে তার অদূরে বসিয়া মেয়েটির মুখে যে কথাগুলি শুনিয়াছিল তাহাই সে অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে একটির পর একটি করিয়া বলিয়া গেল...

ক্ষমার মনে মনে একটা আশা ছিল, সমস্যার সহজ সমাধান হইবে; কিন্তু নিস্তব্ধ অগ্রজের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষমার মনে হইতে লাগিল, দাদা কিছু চিন্তা করিতেছে বটে, কিন্তু তাহা সরল নহে।

খানিক নির্ব্বাক্ থাকিয়া ষড়ানন 'জামাই' কথাটা পুনশ্চ যেন ভয়ে ভয়ে জানিতে চাহিল,—কারা তারা?

ক্ষমা বলিল,—বলেছি ত' আর কতবার বল্‌ব! ওরা ত' মোটে চার-পাঁচ ঘর, গাঁয়ের একটেরে—

ষড়ানন গাত্রোত্থান করিল; বলিল,—শুনিগে চল।

—আর কি শুন্‌বে তুমি মেয়েছেলের কাছে?

—আছে।...পালাল কেমন ক'রে?

—তের চোদ্দ বছরের একটা ছেলে পাহারায় ছিল। তাকে কেমন ক'রে ভুলিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল।

—হুঁ। বলিয়া ষড়ানন বাহিরে আসিল—ক্ষমাকে বলিল,—আন্ ত' মেয়েটাকে, শুধোই ভাল ক'রে।...বিয়ে হয়েছে?

—উঁহুঁ।

ক্ষমা এতবেলা নিজের উদ্বেগে ধুঁকিয়াছে; আবার শুধাইয়া বেশী কি জানিবার আছে, আসল কথাটার কোনই নিষ্পত্তি হইতেছে না ইত্যাদি কারণে কোনো দিকেই ভরসা না পাইয়া এই অব্যবস্থায় ভিতরে ক্ষমার রাগ হইতেছিল...কিন্তু দাদা যা মনে করিয়াছে তাহা করিবেই—

ঘরের শিকল খুলিয়া ক্ষমা মেয়েটিকে বাহিরে আনিল;

চাহিয়া দেখিল, রান্নাঘরের বারান্দায় সুষমা আর উদাসিনী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু মেয়েটিকে ক্ষমা বাহিরে আনিতেই ষড়ানন তাহাকে কি কাহাকেও কিছু শুধাইল না—সমুখবর্ত্তিনী অস্পষ্ট স্ত্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া মনের কথাটা সে সুনিশ্চিত গম্ভীর সুরে আর এক-নিঃশ্বাসে বলিয়া শেষ করিয়া দিল; বলিল,—তোমার বাপু এখানে থাকা হয় না, তারা যদি টের পেয়ে আসে তবে আমি ধনে প্রাণে মারা যাব। তুমি যাও।

ক্ষমা সহসা একটু পিছাইয়া গেল—যেন দাদার দ্বিতীয় লজ্জা সে-ই…

এক মুহূর্ত্ত সবাই নীরব—

যে অনন্ত কালধারা নিরবধি বহিয়া চলিয়াছে তাহারই ক্ষুদ্রতম একটি অংশ যেন অকস্মাৎ মাঝখানে জমাট বাঁধিয়া মানুষে মানুষে দুস্তর একটা অন্তরাল রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—

কিন্তু এই অন্তরালই যে চরম সত্য তাহা বিশ্বাস করিতে সে ত' পারে না যে মানুষের মুখের দিকে চাহিয়া আছে—

মেয়েটি ছুটিয়া যাইয়া পুরুষটির সমুখে বসিয়া পড়িল—তার পায়ের গোড়ায় মাথা কুটিতে লাগিল,—তুমি আমার বাবা; তুমি আমার ভগবান··তোমার পায়ে আশ্রয় নিয়েছি, আমার রক্ষা কর—মেয়ের ইজ্জৎ—

ক্ষমা চোখ ফিরাইল—

তুলসীমূলে সন্ধ্যা-দীপটি তখনও ধুক্ ধুক্ করিতেছে; সকলের নীচেকার একটা শাখার পাতার উপর আলো তখনই মরিয়া তখনই বাঁচিয়া উঠিতেছে…

ক্ষমা চোখে আঁচল দিল।

ষড়াননের কানেও মেয়েটির কথাগুলি প্রবেশ করিল, কিন্তু কথার অর্থ তার হৃদয়ঙ্গম হইল না…ষড়াননের আত্মা তখন সিন্দুকের টাকা, দেহস্থ প্রাণ আর আপন স্ত্রী-পরিবারের ইজ্জতের ভয়ে কাঁপিয়া হেলিয়া এদিকে যেমন তার স্বরভঙ্গের উপক্রম হইয়াছে, ওদিকে তেমনি আমবাগিচায় অন্ধকারে বাতাসের সর্সর্ শব্দকে শস্ত্রপাণি মানুষের সতর্ক পদশব্দ বলিয়া তার ভ্রম হইতেছে…মশাল বুঝি জ্বলিয়া উঠিল…

শুষ্ককণ্ঠ ষড়ানন বলিয়া উঠিল,—আপন ইজ্জৎ আগে। যাও। বলিয়া পিছন ফিরিল।

মেয়েটি ষড়াননের পদতল হইতে উঠিল—উঠিয়া ষড়াননের উঠান পার হইয়া বাহির-দরজা খুলিয়া সেই অন্ধকার আম্রবাগিচার দিকেই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

বিরহ-বিধুর

(ভিক্টর হুগো)

শ্রীমমতা মিত্র

আকুল অন্তরে সব ঘরে ঘরে
খুঁজিনু বৃথাই হায় !
ভাবে প্রতিবেশী হারায়ে প্রেয়সী
হ'য়েছি পাগল প্রায়।
আসিবে সে ঘরে কত আশা ভরে
খুলিয়া রেখেছি দ্বার,
মিছে খুঁজি তা'রে ! গেছে পরপারে,
ফিরিবে না সে যে আর।

চমকি অমনি চরণের ধ্বনি
শ্রবণে পশে গো যবে,
মনে মনে গণি হয়ত এ ধ্বনি
আমারি প্রিয়ার হবে।
পুলক-রঙিন ফাগুনের দিন
কোথা গেল তা'রি সনে ?
গানহারা পাখী মুদিত দু'আঁখি,—
সাড়া নাই উপবনে।

ত্যজিয়া আমায় সে যে অমরায়
গেছে চ'লে চিরতরে।
বল গো কেমনে তাহারি বিহনে
রব মরু-ধরা পরে ?
সুনীল আকাশে ওই চাঁদ হাসে
তিমির-কালিমা নাশি।
ঘুমহারা হ'য়ে দু'বাহু বাড়ায়ে
শুধু আঁখি জলে ভাসি।

বাতায়নে ব'সে অতীত দিবসে
স্বপ্নে ফিরি নিশিদিন ;
সে হাসি, সে গীতি, সুরভিত স্মৃতি
হেরি চির-অমলিন।
বীণা ল'য়ে করে সুমধুর স্বরে
গাহিত যে সদা গান,
খুঁজি শতবার, কোথা সে আমার !
অবেলায় অবসান।

পুরুষ ও নারী

[এক দিক]

শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন

খাস্তগিরের গঠিত মূর্ত্তির ছায়াচিত্র

চিত্রশালা

পুরুষ ও নারী

[অপর দিক]

শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন

খাস্তগির গঠিত মূর্ত্তির ছায়াচিত্র

জননী

শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন

খাস্তগির গঠিত মূর্ত্তির ছায়াচিত্র

পাঠরতা

হংস

শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধাংশু রায়ের দুইখানি উড্-কাট্

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত সুরসাগর

ভৈরবী—ত্রিমাত্রিক তালের ছন্দ

II সণ্‌া সদা দা । দপা পা পা I পা পা -দা । র্সণা -ধণা দপা I
স ০ ক ০ রু ণ ০ বে ণু বা জা ০ য়ে ০ ০ ০ কে ০

I মজ্ঞা -রা -জ্ঞা । -পা -া দপা I মজ্ঞা -রা -জ্ঞা । -মা -া -া I
যা ০ ০ য় ০ কে ০ যা ০ ০ য় ০ ০

I জ্ঞা জ্ঞমা জ্ঞা । ঋা সা -া I সা সা -মা । মা -া -া I
বি দে ০ শী না য়ে ০ তা হা ০ রি ০ ০

I মা মা -পা । মপা -ণদা -পমা I জ্ঞরা জ্ঞা -া । রজ্ঞা -মপাঃ -মঃ I
রা গি ০ ণী ০ ০ ০ ০ ০ লা ০ গি ০ ল ০ ০ ০ ০

I জ্ঞরা মা জ্ঞা । ঋা সা -া II
লা গি ল গা য়ে ০

II { র্সর্সা র্সা -া । র্সা র্ঋা র্সা I ণা ণর্সা ণা । দা পা -া I
সে ০ সু র বা হি রা ছে সে ০ আ সে কা য়

I পা পা র্সা । ণা দা পা I মা জ্ঞরা জ্ঞা । রা- মজ্ঞা -ঋসা I
সু দূ র বি র হ বি ধু ০ র হি য়া ০ ০ য়্

I সা সা ঋা । র্মজ্ঞা -রজ্ঞা ঋা I সা -া -া । -া -া -া } I
অ জা না বে ০ ০ ০ দ না ০ ০ ০ ০ ০

I সা র্গজ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞরা জ্ঞা -া I মা পা পদা । মপা -জ্ঞা -া I
সা গ র বে লা য় অ ধী র বা ০ য়ে ০

I জ্ঞমা মা জ্ঞা । ঋা সা -া II
ব নে র ছা য়ে ০

II { সা মা মা । মা মা মা I মা পা মপদা । পা মজ্ঞরা জ্ঞা I
তা ই শু নে আ জি বি জ ন ০ ০ প্র বা ০ সে

I রা জ্ঞা -মা । জ্ঞরা জ্ঞা -া I দা ণা -সা । সা সা সা I
হৃ দ য় মা ০ ঝে ০ শ র ৎ শি শি রে

I সা সা -ঋা । র্মজ্ঞা -রজ্ঞা ঋা I সা -া -া । -ঋা -জ্ঞা -মা I
ভি জে ০ ভৈ ০ ০ ০ র বী ০ ০ ০ ০ ০

I জ্ঞা জ্ঞমা জ্ঞা । ঋা সা -া } I মা পদা দা । দা দা দণা I
নী র ০ বে বা জে ০ ছ বি য নে আ নে ০

I ণা ণর্সা র্সা । র্সা র্সণা র্সা I পা র্সজ্ঞা র্জ্ঞা । র্ঋা র্সা -া I
আ লো তে ও ০ শী তে বে দ ০ ন হী ন

I ণা র্সর্ঋা র্ঋর্সা । র্সণা ণদা দা I দা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্ঋা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা I
ন দী • প থ টী তে কে • চ লে • ছে

I র্ঋা র্সা -া । -া -া -া I ণা র্সা ণর্সর্ঋা । র্সা ণা দা I
জ লে • • • • ক ল স • • ভ রি তে ,

I পা দা পদণা । দা পা -া I পমা মপা জ্ঞা । ঋা সা -া II II
অ ল• স • • পা য়ে • ব ০ নে ০ র ছা য়ে •

* গানখানির প্রসঙ্গে দু'টী কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার সময় তালের উপর যথেষ্ট ঝোঁক বা প্রাধান কোথাও দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু লয় বা ছন্দ ভ্রষ্ট যাতে না হয় সেদিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া দরকার। এজন্ত গানখানির স্বরলিপিতে কোথাও তালাঙ্ক বসানো হয়নি, শুধু ছন্দানুযায়ী মাত্রা বিভাগ করা হয়েছে। গানখানি অল্প ঢিমে লয়ে গীত হবে,। প্রত্যেক তালের উপর ঝোঁক দিয়ে চপল ছন্দে গীত হ'লে গানটার সৌন্দর্য্য হানি হবে।

গানখানি শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে আমি শিখেছি এবং স্বরলিপি ক'রে তাঁকে দেখিয়েছি। তিনি আমাকে স্বরলিপি প্রকাশিত করবার অনুমতি দিয়েছেন ব'লে তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

যুগান্তরের কথা

উপন্যাস— —শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

(১ম হইতে ৪র্থ পরিচ্ছেদের আভাস) ('দিদি' রচয়িত্রী)

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। সুদূর-বিস্তীর্ণ মাঠের উপর দিয়া একখানি গোযান মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছিল; আরোহী দুইটী স্ত্রীলোক, একটী অল্পবয়সী ও অপরটী দাসী জাতীয়া। একজন 'পাইক' গোচালকের সাহায্যার্থে সঙ্গে যাইতেছিল। বৈকালে কালবৈশাখী পথিকগণকে কিছু বিপর্যস্ত করিয়া চলিয়া গেল। নিকটস্থ কোনও গ্রামে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া ও প্রত্যূষে স্নানাহার সারিয়া যাত্রীগণ পুনরায় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে 'পাগলাদহ' নামক একটী দহে যানসহ নৌকায় পার হইতে হইল। দূরে পাগলাচণ্ডীর ভগ্ন মন্দির অল্প দেখা যাইতেছে।

গ্রামের প্রান্তে নদী—নাম জলঙ্গী। গ্রামের মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড বট বৃক্ষটীর প্রাচীনত্ব এবং স্থান-সংস্থান সত্যই সম্ভ্রমোদ্দীপক। বৃক্ষটী 'কালিগাছ' নামে সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ। ইহার নিম্নে কালীমাতার প্রতিষ্ঠান। বৎসরান্তে ফাল্গুনের শুক্লপক্ষের কোনও শনি মঙ্গলবারে গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণে সমবেত হইয়া কালীপূজা করিয়া থাকে। রায়েদের অনতিপ্রৌঢ়া সৌম্য-দর্শনা রমণী 'কৃষ্ণপ্রিয়া' কালিতলার জপ সারিয়া শিবের কোঠা হইতে পূজান্তে গৃহাভিমুখে যাইবার কালে পথে রাধাবল্লভের মন্দিরের নিকট এক বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বৈষ্ণব-বেশোচিত সমস্ত হইলেও তাহার সমুজ্জ্বল গৌরবর্ণে ও সুদীর্ঘদেহে সাধারণ বৈষ্ণবের সহিত কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। কৃষ্ণপ্রিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন নবাগত শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিয়াছেন ও লক্ষীজোলার গৌর-নিতাই মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন শ্রীবৃন্দাবন হইতে এক মহাত্মা বৈষ্ণব আসিয়াছেন।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশের প্রথমেই চোখে পড়ে বহু পুরাতন প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ীটা। চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে ভগ্নাবশিষ্ট কাঠ-কাঠরা ধুলি জঞ্জালের মধ্যে অর্দ্ধমগ্ন ভাবে তাহাদের অতীত সৌভাগ্যের ধ্যান করিতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপ, ধানের মরাই, গোশালা প্রভৃতি তখনও তা জীর্ণ দেহ লইয়া বহু লতাপাতার ঝোপ হইতে নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল। মধ্যাহ্নে রন্ধনগৃহে একটী অল্পবয়স্কা বিধবা বধূ তখনও গৃহকার্য্য করিতেছিল। এমন সময় একটী মধ্যবয়স্কা রমণী "মাসীমা কই" বলিয়া প্রবেশ করিলেন। বধূটীর মাসী-শাশুড়ী অনুপস্থিত থাকায় বধূই অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। কথা প্রসঙ্গে আগন্তুক তাহার জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল। আগন্তুকের নাম রাধা। তাহার পিতা মাতা, তাহাকে এক বৎসর বয়সে ও তাহার চার পাঁচ বৎসরের ভগিনীকে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত বধূটীর জেঠ-শাশুড়ীর নিকট দুই টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ ভগিনী অল্পদিনের মধ্যেই মারা যায়। সেই সময় কুচবিহার হইতে আরও কয়েকটী মেয়ে তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন এবং তাহাদের বৈষ্ণবদলভুক্ত করিয়া পরে বৈষ্ণবের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু রাধাকে তিনি একটু বেশী স্নেহ করিতেন এবং তাহার দ্বারা কন্যার অভাব মোচন করিয়াছিলেন। আপন কাহিনী সমাপন করিয়া রাধা শিব কোঠায় একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'এখনও হয়ত দিদি ঠাকরুণ কালিতলা হইতে মন্দিরে ফেরেন নি।' বধূ বিস্মিত হইয়া বলিল, 'এখনও ওঁর পূজা শেষ হয়নি। আচ্ছা উনি কি রোজই ঐ রকম পূজা করেন, কিন্তু ওঁকে ত কখনও রাধাবল্লভের মন্দিরে যেতে দেখি না।' রাধা বলিল, 'জাননাত আমাদের ধর্ম্মের এই শাক্ত বৈষ্ণবের ঝগড়া নিয়ে ওঁর জীবনে কি হয়েছে? এ বাড়ীর পুরুষ পরম্পরায় সকলেই বৈষ্ণব আর ওঁর শ্বশুররা হলেন শাক্ত। এই ধর্ম নিয়ে উভয়ের মধ্যে মনান্তর হয়। তদবধি উনি আর শ্বশুর গৃহে যাননি এবং ওঁর বাপ জ্যাঠারা নিজেদের গুরুকে দিয়েই ওঁকে দীক্ষা দেন। কিন্তু তাঁহাদের অবর্ত্তমানে উনি ক্রমে ক্রমে শাক্ত ধর্ম্মই গ্রহণ করেছেন ও প্রত্যহই ঐরূপ পূজা করিয়া থাকেন। ওঁর জীবনের এক একটী ঘটনা আমার মনে দাগ কেটে আছে, যদিও আমি তখন বেশ ছোট ছিলাম।" কিন্তু সেদিন আর সব কথা বলা হইল না। রাধা বলিল, "আর একটী কথা তোমাকে এ পর্যান্ত বলা হয়নি। তোমার স্বামী আমার মানুষ করা ছোট ভাইটির মতই ছিল।" মাসীমা প্রত্যাবর্তন করিয়া নীচে হইতে রাধাকে ডাকিয়া বলিলেন যে কৃষ্ণপ্রিয়া তাহাকে খুঁজিতেছেন। এই শুনিয়া উভয়ে নীচে আসিলে মাসীমা বলিলেন, 'জান বৌমা, তোমার জাতিশ্বশুর হরিনাথ রায় ছেলের বিয়ে দিতে বাড়ী আসছেন আজ চিঠি এসেছে। বড় বৌমা কৃষ্ণপ্রিয়াকেও লিখেছেন।'

৫

"—উঠেছে সন্ধ্যাতারা, দিবসের শেষ হ'য়ে গেল দেওয়া
অস্তসাগর পারায়ে।
ধেনু এল গোঠে ফিরে, পাখীরা এসেছে নীড়ে, পথ ছিল যত
জুড়িয়া জগৎ আঁধার গিয়েছে হারায়ে।"

অপরাহ্ন, কিন্তু তখনো মাঠ হইতে গাভীরা গ্রামে ফেরে নাই। রাখালেরা মৃদুমৃদু করুণ সুরের সঙ্গে তাহাদের তলতা বাঁশের বাঁশীর পাল্লা স্থগিদ রাখিয়া এখন হৈ হৈ শব্দে পাল জড় করিতে ছিল। গ্রাম্য পথে মাত্র কয়েকটি ভদ্র গৃহস্থের বধূ ঈষৎ ত্রস্ত পদে বৈকালিক অবগাহন ও পানীয় জলের জন্য ঘাটে যাইতেছে। আজ হাটবার, গ্রামের পুরুষেরা দ্বিপ্রহরে প্রায় সকলেই গ্রামান্তরের হাটে গিয়াছে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা ফিরিবে, এবং জনবিরল পথটি এখনি তাহাদের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিবে। রমণীগুলির কক্ষে পিত্তলের কলসী, স্কন্ধে গামছা, কাহারো হস্তে গুটিসুটি করা বিবর্ণ বালুচরে চেলি বা অর্দ্ধমলিন বিষ্ণুপুরি তসর। শুচিতার জন্য পাটের কাপড় ছাড়া কার্পাস বস্ত্র তো ঘাটে আনা চলিবেনা। যাহার তাহা নাই তাহাকে ভিজা কাপড়েই ঘরে ফিরিতে হইবে, তাই তাহাদের তাগিদ একটু বেশী। একজন বলিল, "আর একটু দাঁড়ালেই মন্দা দিদি আসতে পারতো, তা দিদির তর সইলোনা!" দিদি-উল্লিখিতা রমণী ঈষৎ ঝঙ্কারের সহিত বলিলেন, "হ্যাঃ, সে সেই পাত্র কিনা! এখনো ধান তুলবে, উঠোন ঝাঁট দেবে, হ'তে হ'তেই তার গরু বাছুর রাখাল এসে পড়বে। তার বেরুনো সেই ভরসন্ধ্যে বেলা ফড়ে দিদির সঙ্গেই ঘটে। ভয়ে ছুটতে ছুটতে উর্দ্ধশ্বাসে ঘড়া নিয়ে ছুটবে। এমন ভীতু আবার যে, শেয়াল দেখলে মনে করে বাঘ! সেদিন সন্ধ্যের অন্ধকারে দূরে একটা কুকুর দেখে ভির্‌মি যাবারই যোগাড়, ফড়ে দিদি ব'লে হেসে বাঁচেনা। তবু সেই সন্ধ্যে নইলে বাবুর বার্ হয়না"। অপর একজন সহানুভূতির স্বরে বলিল, "কাজ মেটেনা বেচারার—কি করবে।" "কাজ মেটেনা ব'লে মরবে নাকি একদিন দাঁত-কপাটি খেয়ে? না হয় পরেই কাজ সারবে!" "কিলা? কার নিন্দে করতে করতে চলেছিস? এ নিশ্চয়ই আমার নিন্দে"?

প্রায় ছুটিতে ছুটিতে একজন রমণী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহাদের দলে মিশিল। তাহাকে দেখিয়া রমণীর দল ঈষৎ আনন্দের কোলাহল তুলিয়া তাহার প্রশ্নটি চাপা দিয়াই ফেলিল। "মন্দাদি আসতে পারলি ভাই,—কি ভাগ্যি!" 'দিদি'-উল্লিখিতা রমণী পথের দুই পার্শ্বের বাঁশ ঝাড় ও উচ্চ বৃক্ষ শ্রেণীর মাথার দিকে চাহিয়া কৃত্রিম গম্ভীর মুখে বলিলেন, "যখন রণে রাবণ বেরিয়েছে তখন পালাও শেষ হ'য়ে এল বলে। হাঁখত্ গাছের আগায় ওটুকু রোদ না চাঁদের আলো?" মন্দা দিদিও কৃত্রিম ঝগড়ার সুরে বলিল, "যার জ্বালা সেই জানে গো! এখনো গরুর সাঁজাল্ দেওয়া হল না—ধান গুলো উঠোন থেকে সব তোলা হল না—" "তবে এলি যে বড়?" "ফড়ে দিদি হাটে গিয়েছে, ফিরতে তার রাতই হবে হয়ত—" "ওঃ তাই! আমরা মনে করছি বুঝি আমাদেরই কপাল ফিরলো। সাধে বেড়াল গাছে ওঠেনি; তলায় তাড়া পেয়েছে!" "বেশ ভাই! আমার বুঝি তোমাদের সঙ্গে আসতে সাধ হয় না! কি করব, সময় করতে পারি না। গা ধুয়ে কি ভাই, আর উঠোনের ধুলো কি গরুর খিঁচমাটি ঘাঁটতে ভাল লাগে। তাই একেবারে কাজ সেরে একাই আসতে হয়। হ্যাঁরে বৌ, বড়দিদি ঘাটে এল না? কিশোরী এলো না?" বৌ-অভিহিতা আমাদের পরিচিতা বিধবা বধূটি উত্তর দিল, "দিদি ওবাড়ীর ঠাকুরঝির কাছে গেছেন, তাঁর তো এতক্ষণে পূজো শেষ হয়। আর কিশোরী কোথায় বেড়াতে গেছে বুঝি?"

সকলে পুষ্করিণীর উচ্চ পাড়ের উপর পৌছিতেই জলের ঝপ্ ঝপ্ শব্দের সঙ্গে বালকণ্ঠের উচ্চ হাস্য সেই ঘন বৃক্ষ-সন্নিবেশে মলিনা প্রকৃতির সায়াহ্ন-গাম্ভীর্য্যকে যেন উপহাস করিয়া বনদেবীর নৃত্য-চপল নূপুরের মত বাজিয়া উঠিল। সে উচ্ছল হাসি যেন সেখানে একেবারে অপ্রত্যাশিত—অত্যন্ত নূতন—তাই নারীদলের মধ্যে দু এক জনের 'কে রে' প্রশ্ন মুখের মধ্যেই প্রায় থাকিল—সকলেই একটু দ্রুত অগ্রসর হইয়া ঘাটের অর্দ্ধভগ্ন বিস্তৃত চাতালের উপরে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল সেই শান্ত সরসীকে মথিত করিয়া একটি কমল-কলিকার মতো বালিকা সাঁতার কাটিতে কাটিতে হাত ও পায়ের দ্বারা উচ্ছলভাবে জল

ছিটাইতেছে ও উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছে, "ধরনা দেখি, ধরনা"। আর একটি রমণী সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া অলক্ষিত সন্তরণে তাহার জল ছিটানো হইতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিতেছে এবং তাহাকে অনুনয়ের সুরে বলিতেছে, "আর না কিন্তু ফিরে আয়—লক্ষী মাণিক—আর না!"

"ধরনা,—এসে ধরনা—কেমন—দেখি!"

নারীদল একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া বালিকার সেই সন্তরণ-রঙ্গটি যেন মুগ্ধ চক্ষে দেখিয়া লইল। তারপরেই একজন রমণী অভিভাবিকার সুরে ঈষৎ তর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমারই বা কি আক্কেল রাধা, এই অবেলায় ওকে এমন ক'রে জলে নামতে দিয়েছ? ওরা সহরে থাকে, এমন সময়ে পুকুরে ডুবপাড়া কি ওর অভ্যাস আছে? বড় দিদিরই বা কি আক্কেল, এমনি ক'রে মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছে? যাদের মেয়ে তাদের তো কোন বালাই-ই নেই। চুলটুল সব ভিজে গেল, এই ভর্ সন্ধ্যেবেলায়।"

রাধাকে ভর্ৎসনার বহর শুনিয়া বালিকার উচ্ছল জলরঙ্গ আপনিই থামিয়া গিয়া তাহাকে তীরাভিমুখী করিয়াছিল, হাসির শব্দও বন্ধ হইয়াছিল। রাধা কিন্তু অনুযোগের কোন উত্তর না দিয়া বালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং নিঃশব্দ ইঙ্গিতে বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া লইয়া তাহার মস্তক ও গ্রীবা প্রভৃতি মুছাইয়া দিতে লাগিল। নারীদলও তখন একে একে ঘাটে অবতরণ করিয়াছিল। বধূটি মৃদুস্বরে একবার রাধাকে বলিল, "তোমরা কখন ঘাটে এলে রাধা ঠাকুঝি?" রাধা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বালিকা হাসিয়া বলিল, "অনেকক্ষণ কাকিমা!—রাধা পিসিকে খুব জব্দ করেছি।" পূর্ব্বোক্তা রমণী ঈষৎ ভ্রূভঙ্গে বলিল, "রাধা দিদিকে জব্দ? ও সাঁতার দিয়ে বানের আগে ছুটতে পারে তা জানিস? এই সন্ধ্যেয় যে এমন ক'রে নেয়ে উঠ্লি, তোর মা কি বলবে বল দেখি বাছা? রাধার এমন একা একা লুকিয়ে তোকে নিয়ে ঘাটে আসাইবা কেন? আমাদের সঙ্গে এলে হ'ত না?" "তোমাদের সঙ্গে এই সন্ধ্যেবেলা? তাহ'লে হ'ত আরকি! ক'বার এই পুকুরটা এপার ওপার করেছি জিজ্ঞাসা কর পিসিকে।" "ছিঃ মা তুমি এখন বড় হচ্চ, এ পাড়াগাঁ, লোকে দেখ্লে নিন্দে করবে।" "লোক বুঝি তোমাদের এই আম কাঁটাল গাছগুলো? বেশ যা হোক!" তাহার কাকিমা তাহাকে কথা না বাড়াইয়া উঠিয়া যাইতে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করায় কিশোরী জল হইতে উঠিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে রাধাও উঠিল। তারপরে সকলে শুনিতে পাইল, সিক্তবস্ত্র ছাড়াইবার জন্য রাধার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বালিকা আবার হাসিতে হাসিতে চপল হরিণীর মত ছুটিয়া পলাইতেছে! তাহার হাসির ও পায়ের মলের ঝন্ ঝন্ শব্দে পুষ্করিণীর চারিপাশের স্তব্ধ মূক বৃক্ষ-প্রাচীরকে যেন স্পন্দ-চঞ্চল করিয়া তুলিল। তাহারা চলিয়া গেলে পূর্ব্বকথিতা রমণী একটু বিশেষ ভঙ্গীর সহিত বলিলেন, "রাধার এইগুলো বড় অন্যায়! তোর কিছু মনে নেই তাতো নয়। আজ দশ বারো বছরে যাহোক্ কথাটা সবাই ভুলেছে, আবার মেয়েটাকে নিয়ে এমনি বাড়াবাড়ি করলে সকলের কি নতুন ক'রে মনে পড়বে না? মেয়ে এখন বড় হ'চ্ছে, এতদিন বিয়ে দেওয়াই ওঁদের উচিত ছিল—শেষে কি একটা গোল উঠবে আবার? বড়দি যে ভার নিলেন মেয়ের, তিনিই বা কি করছেন এতদিন; আর মেয়ের নিজের পিসিতো ঠাকুরতলায় চোখ বুঁজেই দিন কাটিয়ে দেন—মেয়ে যে আমার নলিনীর জুড়ি, সে এর মধ্যে দু'বার শ্বশুর ঘর ক'রে এল! সহরে থাকে ব'লে সেখানে কি কেউ কারুর খোঁজ রাখে না? বিয়ে কি দেবে না নাকি?"

আর একজন মৃদুস্বরে বলিলেন, "হয়ত সেখানেও কথাটা জানাজানি হ'য়ে গেছে তাই—"কি কথা জানাজানি হ'য়েছে" মন্দা অভিধেয়া নারীটি প্রায় গর্জ্জন করিয়াই উঠিল, "সবাই বোঝে সেটা মিথ্যে কলঙ্ক তবু কেন এতদিন পরে সে কথা খুঁচিয়ে তোল বল দেখি? ছিঃ, মা নেই বাপ নেই, সম্পর্কে জেঠিতে মায়া ক'রে মানুষ করেছে, চাঁদের মত মেয়ে, বাছার মুখ দেখলে মায়া হয়—আর ওর মাকে তোমরা দেখনি তাতো নয়, ঐ বয়সে যখন সে এই ঘাটে আমাদের সঙ্গে আসত অমনি মুখখানির আদল আর অমনি হেসে কুটি-পাটি স্বভাব ভাই দিদি, তোমারও কি মনে পড়্ল না? আমার তো এবারে ওকে দেখে অবধি ওর মাকে মনে আসছে! আর ঐ হতভাগি রাধা ঐতো প্রথমে ওকে ওর মরা মার বুক থেকে প্রথমে বুকে নিয়ে বাঁচিয়েছিল। যদিও

পাঁচজনে ঢের যন্ত্রণা দিয়েছে এর জন্তে, সেও ওর ভাগ্যের ফল; কিন্তু তাই ব'লে মেয়েটার ওটাতে আখের মন্দ হয় এমন কথা যদি আমরাই বলি তাহ'লে পরে বল্‌বে না কেন বল?" দিদি-কথিতা যিনি এ সমস্ত কথার মূলস্বরূপা তিনি সহসা মধ্যস্থতা অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "মেয়ের কথা আবার কে কি বল্‌ছে? তবে রাধার যে একটুও 'হায়া' নেই এ বল্‌তেই হবে। নৈলে যে মেয়ে তোর কোলে দেখে লোকে অত কথা ব'লেছিল, সেই মেয়েকে কাছে পাওয়া মাত্র তাকে নিয়ে ঘাটে মাঠে বনে যেন সবারই চোখ বাঁচিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ক'রে খেলা দিয়ে নিয়ে ফির্‌ছিস্?"

'আহা' বলিয়া আবার মন্দা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল এমন সময়ে আমাদের বধূটি যে এই কথাবার্তার মধ্যে একেবারে বিস্ময়বিমূঢ়া হইয়াছিল সে মৃদুস্বরে তাহাকেই প্রশ্ন করিল, "কিশোরী কি আমার দিদির পেটে হয়নি?" সকলে একসঙ্গে তাহার দিকে চাহিয়া একযোগে বলিয়া উঠিল, "আ-কপাল তুমি তাও জান না বুঝি ছোট বৌ?" মন্দা বলিলেন, "ও কি ক'রে জান্‌বে—ক'বারই বা এ গাঁয়ে এসেছে, সকলের সঙ্গে দেখাই বা কবে হ'য়েছে! সে অনেক কথা ভাই—"

কেহ কেহ তখনি বলিবার জন্ত উৎসুক হইতেছিলেন কিন্তু বধূটির রাধার সঙ্গে সেদিনের কথোপকথনগুলা মনে পড়িয়া গেল। এই ঘটনার সঙ্গেও তাহার জীবনের এবং সেদিনের কথার কিছু কিছু যোগ আছে বলিয়াই মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল সে বলিয়াছিল রাধার মুখ হইতেই একথা সে শুনিবে, অন্তত্রে নয়। ব্যস্ত হইয়া সে মন্দা দিদিকে মৃদুস্বরে বলিল, "সন্ধ্যে দিতে হবে ভাই দিদি, একটু শীগ্‌গির চলুন না"—"যা বলেছিস্ ভাই, আমারও গরু ফিরে এতক্ষণ উঠোনের ধানগুলো হয়ত শেষ করল, রাখাল ছোঁড়াতো আর ফিরেও তাকাবে না, বেড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই সেতো খালাস!"

বাস্তবিক ইহারা দুইজনে দলের অগ্রে অগ্রে চলায় পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনীদের কথা আর বেশী কানে গেল না, তবু গুঞ্জন যে বন্ধ হইল না তাহা বেশ বোঝা গেল। হাট হইতে তখন দলে দলে লোক নানা দ্রব্য বেসাতি লইয়া ঘরে ফিরিতেছিল। গ্রামের সামান্ত দোকানী তাহার দোকানের জিনিষ ফুরাইয়া যাওয়ায় পাইকারীদরে হাট হইতে চাল ডাল আলু নুন তেল মিঠাই মায় কিছু কাপড় গামছা হইতে সুচ সুতা ঘুন্‌সি কাঠের চিরুনী প্রভৃতি খরিদ করিয়া ছ্যাট্ ছ্যাট্ শব্দে একখানি গোশকট চালাইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেছিল। আশা গ্রামবাসী যেদিন দায়ে ঠেকিবে যেদিন হাট থাকিবে না, সেদিন সে এই পরিশ্রমেরও সুদে আসলে পোষাইয়া লইবে। কেহ একখানি বস্ত্র খরিদ করিয়া সে ঠকিয়াছে কিম্বা দোকানীকে ঠকাইতে পারিয়াছে তাহাই প্রত্যেকের নিকট যাচাই করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। হাট হইতে বৈষ্ণব ভিখারী একজন ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে, সন্ধ্যার বাতাস গায়ে লাগায় মনের আনন্দে খঞ্জনী বাজাইয়া মৃদুস্বরে কেহ গাহিতেছিল—

> "আও তো ঘর লালন মেয়ে নাচি নাচি নাচিয়ে।
> বালক যত তাল ধরত চোহ্ ওর হি ফেরিয়ে,
> (বালক যত নৃত্য করত ক্ষীর নবনী যাচিয়ে
> মা তোর গোপাল এনে দিলাম বলে)

রমণীর দল গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেই নিকটস্থ 'কড়ে' বাড়ী হইতে নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনিতে পাইয়া কেহ কেহ মন্তব্য করিল, "এই ম'ল মাঝি বেটা বৌর সঙ্গে ঝগড়া করে!" কেহবা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "কি করে আর না ক'রে! হয়ত মাগি এল হাটে সারাদিন তরকারীর বোঝা বিক্রী ক'রে আর বৌটি হয়ত ভাতও রাঁধেনি, ছেলেটাও—" কেহ কেহ নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "কি রূপেরই বৌ, আঁধার ঘর আলো করে! দাঁতগুলোও কি তেমনি মাগো।" "আ মর্ চাষা কৈবর্ত্তের ঘরে আবার কেমন বৌ হবে?" "তা বলো না ভাই, ঐতো আর সবারই বৌ আছে—এমনটি যেন আর গাঁয়েই নেই।" সকলে গরীবের অজন-ব্যবধানের কচার বেড়ার পার্শ্বে সঙ্কীর্ণ পথে যখন যাইতেছিল তখন শুনিল ক'ড়ে গিন্নি গর্জন করিতেছে' "ঐতো বৌয়ের ছিরবা, ওইতো উপ্, যেন মা অকে-কালি—তাইতেই তোর বৌর ওপর এত মায়া বউকে নড়ে বস্‌তে দিসনে, আর যদি তোর বৌ ঐ সব বামুন বাড়ীর মেয়া বামুন নবনে বামুন হয়ে বামুনের বৌর মত বো হ'তোষ তাইলে

আর মাটিতে বসতে দিতিথ্‌নে, তাহিলে আদার মদন গাদা ক'রে আদা মরের বামে বসিয়ে আখ্‌তিথ্‌।"

কৈবর্ত্ত গৃহিণীর ঝগড়ার বচনবিন্যাস শুনিয়া নারীদল রুদ্ধ হাসিতে ফাটিয়া পড়িবার মত হইতেছিল। বর্ষীয়সী 'দিদি' আর থাকিতে না পারিয়া কচার ধারে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আ মর্! বামণিদের পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছিস্ কেন এই সন্ধ্যেবেলা?" ফড়ে দিদি হাঁউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "দিদি ঠাকরুণ, দেখে যাও একবার ছুঁড়ীটা—" "সেতো তোর রোজকার দুঃখু, 'আদার মদন গাদা' আবার কিলো পোড়ার মুখী।" ফড়ে দিদি তখন চোখ মুছিতে মুছিতে ঈষৎ হাসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "আমার মুখে কি বেরোয় দিদ্‌ঠাকরুণ, আদার মদন—কিসে বলে?"

"রাধার মদনমোহন বুঝি রাধা বল্লভের বাঁয়ে বসেন? সব দিকেই ঠিক্‌ঠাক্! আর মুখে বেরবে না তবু বলার সখটুকু আছে হতভাগির। বামুণগুলোকে হাতে ক'রে মানুষ করেছে বড় হ'তে বিয়ে হ'তে আবার কাউকে কাউকে মরতেও দেখেছে কিনা তাই যমের বাড়ী গিয়েও তাদের এই ভরা সাঁজে বিষম খাইয়ে দিচ্চে।" বর্ষীয়সী 'দিদি' সস্নেহেই কথাটা বলিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। তখন রাধাবল্লভের অঙ্গনে আরতির কীর্ত্তনধ্বনির প্রথম ঝঙ্কারের শব্দে দিকে দিকে মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল।

"—ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল রে, আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির 'পরে। * * *

—এস এস তুমি এস, এস তোমার তরী বেয়ে।"

বহুকাল পরে গ্রামে আসিয়া হরিনাথ রায় গ্রামের কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন। বিশেষত ৺রাধা-বল্লভের কোঠায়। যেখানের সন্ধ্যারতির একটা শব্দও এতদিন গ্রামবাসীর কর্ণে বড় বেশী প্রবেশ করিত না, পুরোহিত অনির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া কখন টুন্‌টুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া কার্য্য সারিয়া যাইত, সেখানের একটা ঐক্যতান মধুর শব্দ প্রবাসী কর্ত্তাকে আজ অত্যন্ত আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল। বিদেশে বহুকাল কার্য্য ব্যপদেশে থাকিয়া তিনি এসবের বড় ধার ধারিতেন না, কিন্তু নিজ গ্রামে আসিয়া বহুদিনের অদেখা প্রিয়জনের সব খবরই রাখিতেছিলেন, তাই পুত্রের বিবাহের কর্দ্দাকর্দ্দিগুলা সহসা ক্যাশবাক্সের মধ্যে ফেলিয়া তিনি ঠাকুর কোঠার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

জনতা দুইভাগে বিভক্ত ও বদ্ধাঞ্জলী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ধূপ ও বকুল ফুলের সুরভিতে স্থানটি আমোদিত। উঠানে কয়েকটি বৈষ্ণব মৃদঙ্গ ও খোলের মৃদু তালের সঙ্গে আরতি গাহিতেছিল—

"রাধারমণভুবনমনোমোহন বৃন্দাবন-বন দেব
জয় বৃন্দাবন-বন দেব।"
গোবিন্দদাস হৃদয়-মণিমন্দিরে (রহু) অবিচল
মুরতি ত্রিভঙ্গ।

কর্ত্তা তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন বকুল বৃক্ষের নিম্নে এক দীর্ঘ অসাধারণ-মূর্ত্তি বহির্বাসধারী উদাসীন যেন সন্ধ্যার বৃক্ষছায়ায় অন্ধকারে আপনাকে অনেকটা গোপন করিয়া স্থিরভাবে আরতি দর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি যে নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। প্রায় সকলেই আরতির মধ্যেই একবার একবার বকুল বৃক্ষেরদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। কর্ত্তাও বোধ হয় ইঁহার কথা কিছু কিছু শুনিয়া থাকিবেন তাই মন্দিরের দালানে না উঠিয়া অঙ্গনের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন।

আরতি ও প্রণামের পর গায়ক বৈষ্ণবেরা সাঙ্কোচিত কোন পদ ধরিতেছিল কিন্তু সহসা সেই সুন্দর বপু অঙ্গনের মধ্যস্থলে আসিয়া দুইহাত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভাবগম্ভীর উদাত্ত স্বরে গাহিয়া উঠিলেন—

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
জয়তি জয়তি নামানন্দ রূপং মুরারে
বিরমিত নিজ ধর্ম্ম-ধ্যান পূজাদি যত্নং,
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমৃত মেকো জীবনং ভূষণং মে।
মধুর মধুর মেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাং

সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নর মাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম।

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই "নামানন্দে" মাতিয়াউঠিল। হরিনাথ রায় স্তব্ধ হইয়া শুনিতে ও দেখিতে লাগিলেন। জমায়েৎ লোকগুলির একটিও শেষ পর্য্যন্ত কমিল না এবং রায় মহাশয় নিজের সহিষ্ণুতাতে নিজে একটু আশ্চর্য্য হইতেছিলেন এরকম ব্যাপার তাঁহার জীবনেও এই প্রথম।

সঙ্কীর্ত্তন শেষ হইলে সকলে বিগ্রহকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছে, ইতি অবসরে সেই উদাসীনটি নিঃশব্দে অপসৃত হইবার জন্য একদিকে অগ্রসর হইতেই হরিনাথ রায় তাঁহার সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিবার জন্য অবনত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে উদাসীনও তদপেক্ষা সমধিক নত হইয়া গেলেন। "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" শব্দ করিয়া প্রণাম শেষে মাথা তুলিয়া বৈরাগী বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ! আমাদের সতত নমস্য। আমরা দীন ভিক্ষুক। আমাদের অপরাধী করবেন না।"

কর্ত্তা বেশী কিছু বলিতে না পারিয়া যোড়হস্তে কেবল মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনি বৈষ্ণব, তাতে উদাসীন বৈরাগী।"

"এই ভেকের দায়ে বহুস্থানে এমনি পাপ সঞ্চয় করতে হয়। আপনাকে তো এতদিন এ গ্রামে দেখিনি ?".

"আমি প্রবাসে থাকি। পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে দেশে এসেছি। বৃন্দাবন হ'তে এসে একজন মহাপুরুষ এই গ্রামে মাঝে মাঝে আমাদের এই বিগ্রহ দর্শন করতে আসেন, আর তাঁরই প্রভাবে এই সময়ে এই স্থানটিতে গ্রামান্তর থেকেও ভক্ত বৈষ্ণবাদির সমাগম হয়—সুন্দর নাম সঙ্কীর্ত্তন হয়, গ্রামে এসে পর্য্যন্ত শুনছি। আজ চক্ষে দেখে তার চেয়েও অধিক অনুভব করলাম।" উদাসীন একবার হাত যোড় করিয়া উদ্দেশে কাহাকে যেন প্রণাম করিয়া অনুচ্চস্বরে ইষ্ট স্মরণ করিলেন। রায় মহাশয় আবার বিনীত ভাবে বলিলেন, "এখন এ অঞ্চলে কিছুকাল কি থাকা হবে ? কাল আবার কি দর্শন পাব ?"

বৈরাগী মৃদুস্বরে বলিলেন, "ভগবানের ইচ্ছা, তবে শীঘ্রই বোধ হয় দিন কতকের জন্য গ্রামান্তরে যেতে হবে।" রায় মহাশয় একটু যেন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কতদূরে যাবেন, আবার দেখা পাবতো ?" উদাসীন একটু হাসিলেন, তাঁহাদের গতি বিধির বিষয়ে যে সন্ধান লইতে নাই তাহা এ সরল বর্ষীয়ানটি জানেন না বুঝিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, "বেশী দূর হবে না বোধ হয়!" "তবু কত ক্রোশ ? এই অঞ্চলের মধ্যেই তো ?" "আজ্ঞে হাঁ! সহসা রায় মহাশয় একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন, "আমার ইতা ক্ষমা করবেন। নিজে বেশীদিন তো থাকতে পাব না, ছেলের বিয়ে দিয়েই আবার চ'লে যেতে হবে। আপনার মত ব্যক্তির দর্শন পেয়েই আরও কিছু বেশী পাবার জন্য লোভ আসছে, অথচ আপনি থাকবেন না শুনছি, তাই অসংযত ভাবে এত প্রশ্ন করছি!" বৈষ্ণব মধুর হাসিয়া বলিলেন, "তাতে কি। আবার বোধ হয় এদিকে আসতে হবে। আপনার পুত্রের বিবাহের আর কত দেরী ?"

"আর দেরী নেই, পরশ্বই গাত্রহরিদ্রা। বিবাহও এই অঞ্চলেই এস্থানে হতে চার পাঁচ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান সুন্দরপুর গ্রামে।" সহসা উদাসীন মুখ তুলিয়া রায় মহাশয়ের দিকে চাহিলেন, হরিনাথ রায়ের মনে হইল আবার উদার চক্ষে কিসের যেন একটা প্রশ্ন! পলকে সে দৃষ্টি নামাইয়া বৈরাগী ঈষৎ স্তব্ধতার পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ও! তা আপনাদের কুটুম্বিতার উপযুক্ত ঘরে এ শুভকার্য্য হচ্ছে নিশ্চয়! তাঁরা কি বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি ? ব্রাহ্মণটি ভাল ?"

"সে যদি বলেন, আমাদের অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়েই তাঁরা এখন উন্নতিশীল! অবশ্য পুত্রের বিবাহ দিতে কন্যাটি ছাড়া এসব এত দেখার দরকার হ'ত না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি গুরুতর কথাও আছে। ওঁদের সঙ্গে আমাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ এবার নূতন নয়, বহু পূর্ব্বে স্বর্গগত কর্ত্তারা ঐখানে একবার এই সম্বন্ধ স্থাপন করেন, কিন্তু সেবারে আমাদের ঘরের কন্যা ওঁদের ঘরে গিয়েছিল এবং সে সূত্রে ঐ বংশের নিকট কর্ত্তারা অপমানই মাত্র লাভ করেছিলেন। সে দুঃখও আমাদের ঘরে ও বংশে জাজ্জ্বল্যমান রয়েছে। কিন্তু সে অপমান যাঁরা ভোগ করেছেন তাঁদের অতি কনিষ্ঠ মাত্র আমি এখনো আছি, আর ওদিকে কেহই অবশিষ্ট নাই, মাত্র কতকগুলি বিধবা আর দুই চারিটি পুত্র কন্যা। তাঁরাই উপযাচক ভাবে আবার এই বংশে আমার পুত্রকে কন্যা

দান করতে ব্যগ্র হওয়ায় আমার দিকে একটা প্রতিশোধ স্পৃহার সুখও অজ্ঞাতে যে রয়েছে এবং সেইজন্যই যে এ বিবাহে কতকটা আমি সম্মত হ'য়েছি একথা আপনার ন্যায় মহাপুরুষের নিকটে আমি লুকাবো না।" সাধু একটু যেন বিচলিত ভাবে হাসিলেন, আবার তখনি ইষ্টস্মরণ করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কি প্রতিশোধ নেবেন? তাঁদের কন্যাকেও কষ্ট দিয়ে?—না সকলকে অপমান করে?"

কর্ত্তা জিভ কাটিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে না। ততখানি নীচতা এ বংশের মধ্যে আসতে পারেনা ব'লেই মনে করি। আমরা তাদের ঘরে মেয়ে দিয়ে তাদের কাছে নীচু হ'য়েছিলাম—এবারে তারা আমাদের কাছে যোড়হাত করবে—মনের এই প্রতিহিংসা-বৃত্তির শোধ নেওয়া মাত্র, এর বেশী নয়।"

উদাসীন হাসিলেন। তারপরে সহসা বলিলেন, "কাল আবার সাক্ষাৎ হবে।—এখন যদি অনুমতি করেন—"

"কবে? কাল আবার সাক্ষাৎ হবে?" সরলচিত্ত ভদ্রলোক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। আনন্দপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে কথা কইতে আপনাকে দেখতে এত ভাল লাগছে যে, আপনি গ্রামান্তরে যাবেন শুনে কষ্ট বোধ হ'চ্ছিল। আপনি লক্ষ্মী-জোলার ৺গৌর নিতাই দেবের মন্দিরের নিকটে আছেন শুনেছি। গেলে কি দর্শন পাব?"

"সকালে ভিক্ষায় যাই, অন্য সময়ে যান্ যদি—"

"কই, এগ্রামে তো ভিক্ষায় আসেন না?"

"এইতো এসেছি। প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যায় রাধা-বল্লভদেবের দর্শনভিক্ষায় এ গ্রামে আসি। সর্ব্বত্রের ভিক্ষা তো সমান হয় না।" মধুর অভিবাদনের সঙ্গে বিদায় লইয়া বৈরাগী কীর্ত্তন গায়কদের বলিলেন, "তোমরা যে পদ ধরছিলে বাধা দিয়ে অপরাধ করেছি, আমার ওপর সদয় হ'য়ে সেটি আবার ধর যদি বড় সুখী হই।"

গায়কেরা সবিনয়ে উদ্দেশ্যে হাত তুলিয়া সাধুকে অভিবাদন জানাইয়া সাক্ষাদর্শন মিলনের পদ ধরিল।

"ঐ না—বেশে আইস আমার ঘরে হে।

ঐ না বেশে আইস তুমি, দাঁড়ায়ে রয়েছি আমি,
তুয়া বঁধু ল'য়ে যাবার তরে।

রবি যবে বৈসে পাটে, মুই যাই যমুনার ঘাটে, তুয়া
লাগি চাহি চারি পাশে হে॥

ব্রজের কিশোর যত, সবে চলি আওত, আজি কেন
তুমি সবার পাছে হে।—

চঞ্চলা ধরণীর সনে কতই না ভ্রমিলে বনে, ও শ্রীমুখ গেছে
শুকাইয়ে হে।—

আমার মন্দিরে গিয়ে কর্পূর তাম্বুল খেয়ে আলিশ রাখ
হে তথায় গিয়ে।

আমার মন্দির মাঝে বিচিত্র পালঙ্ক আছে, আশে পাশে
ফুলের বালিশ হে

তাহাতে শুইবে তুমি চরণ সেবিব আমি, দূরে যাবে
বনের আলিশ হে॥

কর্ত্তা এক সময়ে চাহিয়া দেখিলেন, উদাসীন কখন সকলের অলক্ষিতে চলিয়া গিয়াছেন। হরিলুটের পর 'জয় গানের' সঙ্গে জনতা ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী

সাহিত্যে নোবেল-প্রাইজ

শ্রীযুক্তা অমিয়া দত্ত

'নোবেল প্রাইজে'র নাম কাহারও অজ্ঞাত নাই। বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যিকের পক্ষে এই প্রাইজ বা পুরস্কার-লাভই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সম্মান। এ পর্য্যন্ত দেশ-বিদেশের যে সকল মনীষী ঐ প্রাইজ পাইয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় জানিবার জন্য মনে স্বতঃই একটা আগ্রহ জন্মে। বাংলা ভাষায় এ সম্বন্ধে কোন ধারাবাহিক আলোচনা হয় নাই। কেবলমাত্র সাহিত্যে যাঁহারা নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন তাঁহাদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই প্রবন্ধে থাকিবে।

এই প্রাইজ "ডাইনামাইট্"-আবিষ্কারক সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড্ নোবেল কর্ত্তৃক স্থাপিত। ১৮৩৩ সালে ষ্টক্‌হোল্‌মে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতাও একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন এবং বিস্ফোরক সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন। পড়াশুনায়, বিশেষতঃ রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও মাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আলফ্রেডের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ১৭ বৎসর বয়সে জাহাজ নির্ম্মাণ শিখিবার জন্য নিউইয়র্কে পাঠান। এক বৎসর পরে তিনি সুইডেনে ফিরিয়া আসেন ও পিতার সহিত একযোগে নাইট্রোগ্লিসরিন ও অন্যান্য বিস্ফোরক প্রস্তুত করিতে থাকেন। কিন্তু সর্ব্বদাই তিনি এমন একটা জিনিষ খুঁজিতেন যাহা আরো বেশী শক্তিশালী অথচ কম বিপজ্জনক। ১৮৬৫ বা ৬৬ সালে একান্ত আকস্মিক ভাবে তিনি "ডাইনামাইট" আবিষ্কার করেন। ইহা আবিষ্কারের পর তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস হইল, এই বিস্ফোরক হইতে যথেষ্ট ধন উপার্জ্জনের সম্ভাবনা। উহার পেটেন্ট গ্রহণের জন্য তিনি কতকগুলি দেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন ও কারখানা খুলিবার জন্য অর্থ-সংগ্রহে বদ্ধপরিকর হন। ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়ান ও ক্যালিফোর্ণিয়ার আলফ্রেডের পিতৃবন্ধু ডাক্তার ব্রাণ্ড্‌ম্যানের যত্ন ও চেষ্টায় উক্ত দুইদেশে সর্ব্বপ্রথম দুইটি কারখানা স্থাপিত হয়।

প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে এই ডাইনামাইট হইতে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। কিন্তু প্রভূত যশ ও অর্থের মালিক এই লোকটি নিতান্ত নিঃসঙ্গ ছিলেন। যৌবনে তিনি একটি তরুণীকে ভালবাসিতেন। অল্পবয়সে তাহার মৃত্যু হয়। মনস্তাপে তিনি সারা-জীবন অবিবাহিত রহিলেন।

মাতার প্রতি নোবেলের ভালবাসা গভীর ছিল। পরবর্ত্তী জীবনে যখনই সময় পাইতেন, মাতাকে দেখিবার জন্য সুইডেনে আসিতেন।

তাঁহার স্বাস্থ্য বাল্যকাল হইতেই খারাপ ছিল। অনেক সময় তিনি মাথায় কাপড় বাঁধিয়া কাজ করিতেন। সর্ব্বাঙ্গে যন্ত্রণা, কিন্তু দৈনিক কাজ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁহার অতি অল্পই ছিল। সর্ব্বদাই তিনি ভয়ে ভয়ে থাকিতেন এবং লোকে কেবলমাত্র তাঁহার অর্থে আকৃষ্ট হইয়াই তাঁহার কাছে আসে, এই তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল।

১৮৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর 'সান্‌রেমো'তে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। ভাবে ও নূতনত্বে, তাঁহার উইল সভ্যজগতের বিস্ময় উৎপাদন করে। ধ্বংসের উপাদান আবিষ্কার করিয়া যে মানুষ বিখ্যাত, তিনিই আবার গঠনমূলক জনহিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রভূত ঐশ্বর্য্য দান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। অদৃষ্টের একি পরিহাস!

তাঁহার উইলের সর্ত্ত এই—তাঁহার সম্পত্তির সুদ হইতে সমানভাগে বৎসরে পাঁচটি করিয়া প্রাইজ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষীকে দেওয়া হইবে। প্রথম—সাহিত্য; দ্বিতীয়—রসায়ন-শাস্ত্র; তৃতীয়—পদার্থবিদ্যা; চতুর্থ—চিকিৎসা-শাস্ত্র এবং পঞ্চম—শান্তি। যদি কোন বৎসরে কোন বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই প্রাইজের টাকা কাহাকেও না দিয়া মূলধনের সহিত জমা করা হইবে। প্রতি বৎসর ১০ই ডিসেম্বর—আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে, সুইডিস্ বিদ্যাপীঠ (Swedish Academy) সরকারীভাবে নির্ব্বাচিত মনীষীগণের নাম প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেককে একখানি চেক্, একটি স্বর্ণপদক ও ডিপ্লোমা প্রদান করেন। এই প্রাইজগুলির প্রত্যেকের পরিমাণ প্রায় একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা।

স্যালী প্রীদম্ (Sully Prudhomme)

জন্ম—১৮৩৯; মৃত্যু—১৯০৭; প্রাইজ-লাভ—১৯০১

ইংরাজী ১৯০১ সালে প্রথম বৎসরের সাহিত্যে নোবেল-প্রাইজ ফরাসী কবি স্যালী-প্রীদম্ লাভ করেন। তিনি কবি, দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। উনবিংশ শতাব্দীর জীবিত ফরাসী কবিদিগের তিনি শীর্ষ-স্থানীয় ছিলেন। প্যারি নগরে তাঁহার জন্ম। অল্পবয়সে পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহার মাতাই তাঁহাকে মানুষ করেন। কলেজে পড়াশুনায়,

বিশেষতঃ গণিতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তিনি আইন ব্যবসা বা অধ্যাপনা কার্য্য করিবেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক "Stanus et Poems" প্রকাশিত হয় ও তাহা যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া তিনি সাহিত্য-সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতে দৃঢ়সংকল্প হন

অতি লঘু ও হাল্কা ভাব বিচিত্র নিপুণতার সহিত ফুটাইতে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার কবিতায় তর্ক-বিচার অপেক্ষা হৃদয়ের জয়-ঘোষণাই বেশী। লেখায় তিনি স্বচ্ছ-ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। বঙ্গভাষায় অনূদিত তাঁহার "স্বপ্ন" নামে একটি কবিতা হইতে এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

স্বপ্নে দেখি রাতের বেলা কৃষাণ এসে কয়,—
"লাঙ্গল ধর, বাবুগিরির গিয়েছে সময় ;
কর এখন নিজেই নিজের ক্ষেত খামারের কাজ,
পরের হ'য়ে খাটব না আর স্থির করেছি আজ।"
বলছে তাঁতি "পরবে ধুতি ? আপনি চালাও তাঁত—"।
মিস্ত্রি সরে, মাথার পরে হাঁ হাঁ করে ছাদ ;
যারা আমায় নিত্য খাওয়ায় নিত্য পরায় হায়,
বর্ষা শীতে সুখে ঘুমাই যাদের করুণায় ;
তারা আমায় চল্ল ছেড়ে একলা আমি রে,
থম্ থমিয়ে মেঘলা আকাশ ডুব্‌ছে তিমিরে ;
থেকে থেকে যাচ্ছে শোনা বাঘের গরজন,
'ধর্ম' ঘটে সব করছে যেন প্রলয়-আয়োজন।

বুঝেছি গো এবার আমি জানতে পেরেছি,
জন্মাবধি পরের কাছে কি ধার ধেরেছি ;
পাঁচ পরে খাই বাঁচিয়ে রাখে তাইতো বাঁচে প্রাণ,
সম্পদেরি নিদান্ মোদের দিন-মজুরের দান।
স্বপ্নে আমি শিখি শেলাম, জানতে পেলাম তাই,
সবাই আমার ভালোবাসার, সবাই আমার ভাই। **

গীতি-কবিতা ভিন্ন স্যালী-প্রীদম্ বহু রূপক-কাব্যও লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে "La-Justice"ই প্রধান। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ন্যায় ও সত্যের অনুসন্ধান এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। বহু অন্বেষণের পর অনুসন্ধানকারী আবিষ্কার করিল যে ন্যায় ও সত্য বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নাই,—মানুষের হৃদয়-মন্দিরেই তাহার বাস।

তাঁহার দ্বিতীয় কাব্য "Le Bonpeur"এ ফস্টাস্ ও টেলা তিনটি বিভিন্ন পথে সুখের সন্ধানে যাত্রা করে। এই তিন পথ—কৌতূহল, বিষয়াসক্তি ও বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম ও আত্মত্যাগ। ইহা La-Justice অপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় হয়।

আল্‌ফ্রেড্ নোবেল

স্যালী-প্রীদমের স্বাস্থ্য কখন বিশেষ ভাল ছিল না। শেষ বয়সে তিনি পক্ষাঘাতে কষ্ট পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে ৬৬ বৎসর বয়সে তিনি "La varie religion selon Pascal" নামে পুস্তক রচনা করেন। ইহা সাহিত্যে ও জীবনে আধ্যাত্মিকতার স্থান সম্বন্ধে তাঁহার জীবনব্যাপী অনুসন্ধানের ফল।

৬৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎকালীন ফরাসী সমালোচকেরা তাঁহাকে ভিক্টর হুগোর সহিত তুলনা করেন।

** "মণি-মঞ্জুষা"—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ

থিয়োডোর মম্‌সেন্ (Theodor Mommsen)

জন্ম—১৮১৭ ; মৃত্যু—১৯০৩ ; প্রাইজ-লাভ—১৯০২

জার্ম্মানীর কার্ডিং সহরে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থিওডোর মম্‌সেনের জন্ম। তাঁহার গবেষণায় মুগ্ধ হইয়া বার্লিন বিদ্যাপীঠ (Berlin Academy) ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই তাঁহাকে রোমান লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য ইতালি ও ফ্রান্সে প্রেরণ করেন। আইন ও ইতিহাস দুইই তিনি খুব ভাল জানিতেন। ১৮৪৮ সালে লাইপ্‌জিগ্ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-অধ্যাপনার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে উদারমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া শীঘ্রই তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তিনি যথাক্রমে জুরিখ ও ব্রেসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন রোমান আইনের অধ্যাপনা করেন। ১৮৫৮ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক হন এবং সেখানে পণ্ডিতমণ্ডলী ও সাধারণ পাঠকদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন।

মম্‌সেন্ সুপণ্ডিত ছিলেন। আইন, ভাষা, রীতিনীতি, প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপর তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল এবং তাঁহার গ্রন্থগুলিতে ইহার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। মৌলিক ও অনুবাদে তিনি শতাধিক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। "রোমের ইতিহাস" নামক গ্রন্থই তাঁহার অমর কীর্ত্তি। বিশেষ করিয়া এই পুস্তকের জন্যই তিনি নোবেল-প্রাইজ লাভ করেন। ইহা চারিখণ্ডে সমাপ্ত। সভ্য জগতের সকল ভাষাতেই এই পুস্তক অনূদিত হইয়াছে।

সমালোচক ই, এ, ফ্রীম্যান্ বলেন "মম্‌সেন্ এ যুগের সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত ব্যক্তি; এমন কি সর্ব্বকালের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের পাশাপাশি দাঁড়াইবার যোগ্য!"

নোবেল-প্রাইজ পাইবার মাত্র এক বৎসর পরে ৮৫ বৎসর বয়সে মম্‌সেনের মৃত্যু হয়। তাঁহার লেখার বিশিষ্ট গুণ এই যে তাহা সাধারণ পাঠক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি উভয়কেই সমানভাবে আকৃষ্ট করে।

বিয়র্ণসন্ (B. Bjornson)

জন্ম—১৮৩২ ; মৃত্যু—১৯১০ ; প্রাইজ-লাভ—১৯০৩

নরওয়ের জাতীয় কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার বিয়র্ণসন্ উনবিংশ শতাব্দীর অমর লেখকগণের মধ্যে অন্যতম। ডোভ্রার পাহাড়ের উপত্যকায় ভিক্‌নে নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা সেখানে পাদ্রী ছিলেন। বিয়র্ণসনের বয়স যখন ছয় বৎসর তখন তাঁহারা রম্‌স্‌ডালে আসেন। ঐ স্থানের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহার হৃদয়ে চিরমুদ্রিত ছিল। ১৭ বৎসর বয়সে পড়াশুনার জন্য তিনি ক্রিস্‌টিয়ানিয়া সহরে প্রেরিত হন। বিখ্যাত নাট্যকার ইব্‌সেন্ সেখানে তাঁহার সতীর্থ ও বন্ধু ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাদের আজন্ম বন্ধুত্বকে আত্মীয়তা-সূত্রে আরও ঘনিষ্ঠ করিবার উদ্দেশ্যে বিয়র্ণসন্ তাঁহার কন্যার সহিত ইব্‌সেনের পুত্রের বিবাহ দেন।

ক্রিস্‌টিয়ানিয়াতেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার প্রথম সূত্রপাত। তাঁহার "নববিবাহিত দম্পতী" এইখানেই লেখা আরম্ভ হয়, তবে দশবৎসর পরে উহা সমাপ্ত হয়। ইহার পর তিনি কৃষক-জীবনের গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার "Arne", "The Fisher Maiden", "Synnove Solbakken" "A Happy Boy" প্রভৃতি উপন্যাসগুলি নরওয়ে, ডেন্‌মার্ক্ ও জার্ম্মাণীতে যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হয়। এই গল্পগুলি সরল, জীবন্ত ও কবিত্বপূর্ণ।

উপন্যাস ব্যতীত ছোট-গল্পেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার বিরচিত—"পিতা" বিশ্ব-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প।

"কবিতা ও গান" নামক পদ্য-গ্রন্থে বিয়র্ণসনের কতক-গুলি সুন্দর কবিতা আছে। তাহার মধ্যে "নরওয়ের গান" একটি প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীত। ইহার আরম্ভ ভাগ এইরূপ—

ঝঞ্ঝা-মথিত সাগরোত্থিত
ভালবাসি এই দেশ,
হ'ক বন্ধুর,— আকর্ষণের
তবু তার নাহি শেষ।

ওগো ভালবেসো, তারে ভালবেসো,
না ভুলি' পূর্ব্বকথা,
ভুলোনা মোদের "সাগা" সঙ্গীত,—
মধুময়ী সে গাথা॥ **

সত্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁহার সমস্যামূলক নাটক "রাজা", "সম্পাদক", "দেউলিয়া" প্রভৃতিতে তিনি কপটতা অন্যায় ও অত্যাচারকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছেন।

তাঁহার "নববিবাহিত দম্পতী"র আখ্যানবস্তু মনস্তত্ত্বমূলক। একটি কিশোরীর মনে পিতামাতার প্রতি ভালবাসা ও নূতন পতিপ্রেম এই উভয়ের দ্বন্দ্ব নাটকে সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক চরিত্রই জীবন্ত। "দেউলিয়া"র আইন-ব্যবসায়ী বেরেণ্ট-চরিত্রে তিনি সবলমনা পুরুষের চিত্র আঁকিয়াছেন। ব্যবসায়ীগণের অপরের টাকা ব্যবহার করিবার প্রলোভন এই নাটকের সমস্যা। আর্টকে কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না করিয়া টাকা-কড়ি-সম্বন্ধীয় এরূপ সরস রচনা বিশ্বসাহিত্যে আর নাই বলিলেও চলে। "Leonarda"-র গীতি-কবিতা ও নাটকীয় গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে।

"দ্বন্দ্বে আহ্বান"—("A Gauntlet") নামক নাটক নাকি নরওয়েতে যথেষ্ট আলোচিত হয়। নরনারী উভয়েরই নৈতিক চরিত্র সমানভাবে পবিত্র থাকা উচিত, ইহাতে তিনি, এই মত প্রচার করেন। শোনা যায়, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরে নরওয়েতে শতশত বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। নাটক হিসাবে এখানি সেরূপ উচ্চস্তরের না হইলেও ইহার নৈতিক মূল্য খুবই বেশী।

"লিওনার্দা ও "ম্যান্‌হাইল্ড্" আধুনিক সমস্যা লইয়া রচিত। অনেক সমালোচকগণের মতে "ম্যান্‌হাইণ্ড্"-এ চরিত্র চিত্রাঙ্কনে তিনি যেরূপ মাধুর্য্য ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে নাই। তরুণ সঙ্গীতজ্ঞ Tande, সুন্দরী মিসেস্ ব্যাং ও তাঁহার স্বামীর চরিত্র এবং ম্যান্‌হাইল্ডের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার "ভগবানের পথে" বইখানির আরম্ভ ভাগে যুক্তিবাদ ও আধ্যাত্মিকতা একত্র মিলিয়াছে। "নগরে বন্দরে উড়ে পতাকা নিশান" নামক উপন্যাস বিয়র্ণসনের একখানি শ্রেষ্ঠ রচনা। ইহা বংশানুক্রম সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত লইয়া লেখা।" ইতিপূর্ব্বে শিক্ষা ও সমস্যা লইয়া নরওয়েতে কোন উপন্যাস প্রকাশিত হয় নাই। এজন্য প্রথমে লোকে এই পুস্তকের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিবার পরে বইখানি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়।

নোবেল-প্রাইজ পাইবার অব্যবহিত পরে, ঐ প্রাইজের নিয়মানুসারে "Poetry As a Manifestation of the sense of vital Surplus" নামে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা দেন। তাঁহার নিজের প্রফুল্লতা এবং জীবনকে উপভোগ করিবার ক্ষমতা বরাবর সমান ছিল। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন আদর্শ-স্বামী ও স্নেহময় পিতা। তাঁহার স্ত্রী একাধারে তাঁহার গৃহিণী, সচিব, সখী, সেক্রেটারী ও সমালোচক। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসাধারণ সহানুভূতি ছিল। কোথাও নিমন্ত্রিত হইলে তিনি জিদ করিতেন যে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। ইহা অবশ্য অনেক সময়েই সামাজিক নিয়মবিরুদ্ধ হইত, কিন্তু তিনি এবিষয়ে সমাজবিধি মানিয়া চলিতে চাহিতেন না।

প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় ভাষাতেই বিয়র্ণসনের গ্রন্থরাজির অনুবাদ আছে। নোবেল-প্রাইজ পাইবার পূর্ব্ব হইতেই তিনি "নরওয়ের পিতা" নামে অভিহিত ছিলেন। ইব্‌সেন্ ও বিয়র্ণ্‌সনের তুলনা করিয়া বিখ্যাত সমালোচক জর্জ্ ব্র্যাণ্ডেস্ বলেন, "ইব্‌সেন্ ভালবাসিতেন ভাবকে, কিন্তু বিয়র্ণ্‌সনের ভালবাসা মানবজাতির উপর।

মিস্ত্রাল্ (Frédéric Mistral)

জন্ম—১৮৩০; মৃত্যু—১৯১৪; প্রাইজ-লাভ—১৯০৪

১৯০৪ সালের নোবেল-প্রাইজ ফরাসী-কবি মিস্ত্রাল্ ও স্পেনের নাট্যকার একেগারে (Echegaray) একযোগে লাভ করেন। মিস্ত্রাল্ ফ্রান্সের অন্তর্গত প্রভেন্স্ জেলার লোক। তিনি ধনী জমিদারের পুত্র। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে পুত্র আইন-ব্যবসায়ী হয়। কিন্তু

** "তীর্থ সলিল"— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মিস্ত্রাল্ নাইম্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পড়াশুনা শেষ করিয়া প্রভেন্স্ জেলার চল্‌তি ভাষায় কবিতা ও কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। এই কবির মাতা লেখাপড়া না জানায় মাতার বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি চল্‌তি ভাষায় বই লেখেন। তাঁহার প্রধান পুস্তক Mireio। এই কাব্য বারো সর্গে সমাপ্ত। ইহার আখ্যান-ভাগ খুবই সাদাসিধা। এক জমিদার-কন্যা একটি গরীবের ছেলেকে ভালবাসিত। তাহাদের ভালবাসায় পরম সুখ ও গভীর দুঃখ দুইই ছিল। শেষ দৃশ্যে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা তরুণী নায়িকা তাহার প্রিয়তমকে নানারূপ সান্ত্বনা ও পরলোকে

বিয়র্ণষ্ট্যার্ণ বিয়র্ণসন্

চিরমিলনের আশার বাণী শুনাইয়া যায়। এই কাব্যে প্রভেন্স্ জেলার নানারূপ রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও মিস্ত্রালের নিজ জীবনের কাহিনী আছে। নায়িকার পিতার চরিত্রে তাঁহার (মিস্ত্রালের) পিতার ছায়া দেখা যায়।

বড় কাব্য ব্যতীত তিনি গীতি-কবিতাও অনেক লিখিয়াছেন। তাঁহার ছোট কবিতাগুলি কোমল ও মধুর। "বন্ধু বিরহে" ও "চাঁদনী রাতের চাঁদ" নামে তাঁহার দুইটি সুন্দর কবিতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

হে প্রিয়! পাহাড়ে আজ তুষার কেবল,—
চূড়া ধবলে ধবল,—
নাই তৃণ ফুল ফল।
বন্ধু! নিদাঘ ফিরে আসিবে যবে,
গিরি শ্যাম-গরবে
ফিরে গরবী হবে।
অমনি বিরহ-শেষে হে প্রিয়তম!
সুখী হিয়ার মম
দূরে যাবে এ তম।
অমনি যদি গো ফিরে এস তুমি দেশ,
হবে নিমেষেই শেষ
মোর মরমেরি ক্লেশ।

মৃদু-মন্থর চাঁদ গগন-কোণে
আপন মনে
স্বপন বোনে।
রাতের ফড়িং-পরী-নাচে সুবেশা,
বাতাস ঘোড়ার মত করিছে হ্রেষা।
মেতেছে তরুণ ছাগ খোস্-পোষাকী,
তরুণী ছাগীরে বুঝি ভাবে সে সাকী—!
মধু-যামিনীর চাঁদ মধু-নয়নে
স্বপন বোনে
সারা ভুবনে।*

* * *

নিজ জেলার উপর মিস্ত্রালের গভীর অনুরাগ ছিল। প্রোভেন্স্ ছাড়িতে হয়, আশঙ্কায় তিনি ফরাসী বিদ্যাপীঠের (French Academy) সদস্য-পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হন।

পরিণত বয়সে প্রভেন্সের ফুল পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তিনি এক মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী স্থাপন করেন। নোবেল-প্রাইজের প্রাপ্ত টাকার অধিকাংশ ইহাতে ব্যয়িত হয়। তিনি বলিতেন এই মিউজিয়ামই তাঁহার "শেষ কবিতা"।

* "মণি-মঞ্জুষা"—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

একেগারে (Jose Echegaray)

জন্ম—১৮৩০ ; মৃত্যু—১৯১৬ ; প্রাইজ-লাভ—১৯০৪

স্পেনীয় নাট্যসাহিত্যে একেগারের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। কল্পনাশক্তি ভাব-প্রবাহ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাঁহার লেখার বিশেষত্ব। তিনি স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। গণিতে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। ভূতত্ত্ব এবং দর্শনেরও তিনি গবেষণা করেন। রিপাব্লিকান গবর্ণমেণ্টের অধীনে শিল্প ও বাণিজ্য-মন্ত্রী, শিক্ষা-পরিষদের সদস্য প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

অবসর-বিনোদনের অভিলাষে একেগারে প্রথম নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু "ঋষি বা পাগল" নামক নাটক প্রকাশিত হইবার সঙ্গেসঙ্গেই তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; কিন্তু এখানি যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা তাহা নয়।

এই গল্পের নায়ক ডন্ লোরেঞ্জো মাদ্রিদের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার কন্যার সহিত ডাচেস্ অব অল্মন্তের পুত্রের বিবাহের দিন স্থির হইলে তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। তাঁহার ধাত্রী জুয়ানা মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে বলিয়া যায় যে তিনি তাহারই গর্ভজাত পুত্র। ইহার পর ডন লোরেঞ্জো সত্য কথা প্রকাশ করিবার জন্য এবং তাঁহার নাম ও সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিবার জন্য সংকল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার বাড়ির লোকে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একজন ডাক্তার ও একজন মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞকে ডাকিয়া আনে। লোরেঞ্জোর শেষ স্বগতঃ উক্তি নাটকীয় আর্টের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি বলিতেছেন—"এও কি সম্ভব! একজন সুস্থ ও নীরোগ লোক কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া পাগল বলিয়া প্রচারিত হইবে! ইহা কোন মতেই হইতে পারে না। মানুষ কখন এত অন্ধ নয় বা এত খারাপও নয়!"

এই নাটকখানিতে কল্পনা, রোম্যান্স্ ও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রোম্যাণ্টিক্ নাটককে পুনর্জীবিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন এবং জীবনে ভালবাসা ও কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব নিপুণভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার নাটকের দোষ এই যে, অনেক সময়েই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র অপেক্ষা নাট্যকারের উদ্দেশ্য বড় হইয়া চোখে পড়ে। তাঁহার অধিকাংশ নরনারী সত্য ও সম্মানের জন্য সংগ্রাম করে—ঠিক পুতুলের মত। নাটকে স্বগতঃ উক্তির ব্যবহারও খুব বেশী।

"The Great Galeoto" এবং "The son of Don Juan" তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক। ইংরাজীতে ও অন্যান্য ভাষায় দু'খানির একাধিক অনুবাদ আছে। "The Great Galeoto" নাটকের বর্ণনীয় বিষয় পরচর্চ্চা ও তাহার

ফ্রেডেরিক্ মিস্ত্রাল্

কুফল। এই নাটকের প্রধান পাত্র একবারও ষ্টেজে দেখা দেয় না; সর্ব্বদা অদৃশ্য থাকিয়া নানারূপ বিরক্তি-জনক ঘটনার সৃষ্টি করে। তাহারই ইঙ্গিতে নাটকের অন্যান্য পাত্র-পাত্রীরা চলাফেরা করে ও কথা কয়। ইহার সৃষ্ট—কুমন্ত্রণাকারী ডন্-সিভিরিওর চরিত্রের সহিত মহাকবি সেক্স্পিয়ারের ইয়াগোর তুলনা করা যাইতে পারে।

"ডন-জুয়ানের পুত্র" ইব্সেনের "প্রেতাত্মা"কে মনে করাইয়া দেয়। পিতার পাপের প্রতিফলস্বরূপ সন্তান

পাগল হইল—ইহাই এই নাটকের আখ্যান-বস্তু। নায়ক ল্যাজারাসের মাতার চরিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিক।

একেগারে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। স্পেনের লোকে প্রায় দেবতারই মত তাঁহাকে পূজা করিত। ফ্রান্সেও তিনি যথেষ্ট সমাদৃত। তাহারা তাঁহাকে বলিত "দ্বিতীয় ভিক্টর হুগো"। তিনি বিয়োগান্ত, মিলনান্ত, রোম্যান্সমূলক ও ঐতিহাসিক সকল রকমের নাটকই লিখিয়াছেন।

হেন্‌রিক্ সিঙ্কিভিচ্

হেন্‌রিক্ সিঙ্কিভিচ্ (Henryk Sienkiewicz)

জন্ম—১৮৪৬; মৃত্যু—১৯১৬; প্রাইজ-লাভ—১৯০৫

পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত লেখক হেন্‌রিক্ সিঙ্কিভিচ্ নোবেল-প্রাইজ লাভ করিলে ইউরোপীয় সমালোচকেরা বিস্মিত এবং রাশিয়ানেরা একান্ত দুঃখিত হয়। তাহাদের ইচ্ছা ছিল যে একজন রাশিয়ান্ এই সম্মান লাভ করে।

লিথুয়ানিয়া সহরে উচ্চ অভিজাত বংশে সিঙ্কিভিচের জন্ম। ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহের পর রাজনৈতিক কারণে তিনি পোল্যাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া রুশিয়ায় যান ও সেণ্ট্ পিটার্স্‌বুর্গে (বর্ত্তমান লেনিনগ্রাড্) কিছুদিন একখানি কাগজের সম্পাদকতা করেন।

ইহার পর তিনি দেশ-ভ্রমণে বাহির হন এবং দক্ষিণ-ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরিয়া ১৮৮০ সালে পোল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসেন। তাহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়।

"আগুন ও তলোয়ার" নামে সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি লিখিতে সিঙ্কিভিচের আট বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ইহা তিন খণ্ডে সমাপ্ত। এই গ্রন্থে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও নাটকীয় প্রতিভার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুস্তক "Quo Vadis" বা "কোথা যাও"। নোবেল-প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বেই এই উপন্যাস নানা ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইহার বর্ণনীয় বিষয়, পৌত্তলিক শক্তির উপর খৃষ্ট-ধর্ম্মের জয়। পল, পেট্রোনিয়াস; আর্সাস, চিলো ও বন্দিনী তরুণী লিজিয়ার চরিত্র ফটোগ্রাফের মত সুন্দর। কিন্তু সিঙ্কিভিচের মত চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে দক্ষ লেখকও রোমান-সম্রাট নীরোকে আধুনিক পাঠকদের নিকট জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

উপরোক্ত পুস্তকগুলি ভিন্ন সিঙ্কিভিচ্ আরও কতকগুলি উপন্যাস ও ছোট-গল্প রচনা করেন। সহানুভূতি ও আধ্যাত্মিকতা এই দুইটি গুণ "Quo Vadis" ছাড়া সিঙ্কিভিচের অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ত্তমান। তাঁহার গভীর স্বদেশ-প্রেম উল্লেখযোগ্য। "বন্দীর প্রার্থনা" নামে তাঁহার একটি ছোট কবিতায় তিনি ভগবানের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা করিতেছেন'—

> বন্দী মোরা,—মোরা ভাগ্যহীন,
> ভগবান! দাও হে সুদিন।
> কর প্রভু শৃঙ্খল মোচন,—
> দূর কর অধর্ম্মাচরণ!
> ল'য়ে চল উদার মন্দিরে,
> স্নিগ্ধ শান্ত স্বর্গনদী তীরে;

ল'য়ে চল আনন্দের চির নিকেতনে,
ল'য়ে চল শান্তিধামে—সান্ত্বনা-ভুবনে।*

* * * *

বৃদ্ধ বয়সেও সিঙ্কিভিচের সাহিত্য-সৃষ্টির শক্তি হ্রাস পায় নাই। "জোলা"-কে সমালোচনা করিবার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন,—"উপন্যাসের কর্ত্তব্য জীবনের বলবৃদ্ধি করা, তাহাকে নিরুৎসাহ করা নয়; উন্নত করা, কলুষিত করা নয়; উচ্চচিন্তার সংবাদ দেওয়া, পাপের নয়।" তাঁহার এই উক্তি তিনি নিজে বরাবর পালন করিয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমিয়া দত্ত

* "তীর্থ-সলিল"—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আলোচনা

বাঙলার কায়স্থ—ক্ষত্রিয় না ব্রাহ্মণ ?

শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র

কায়স্থেরা যে ক্ষত্রিয়—বঙ্গীয় কায়স্থ সভা ও সমাজ তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা ব্রাহ্মণ কিনা? ডাঃ ভাণ্ডারকরের গবেষণা হইতে এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়।

প্রাচীনত্ব হিসাবে বাঙ্‌লার কায়স্থ যে জাতি-মণ্ডলীর পুরোভাগে তাহা অবিসম্বিত সত্য। এই কায়স্থের মূল—সূত্র কোথায়, কাল-নির্ণয়ের দিক দিয়া তাহার বিচার-ফল কি—ইহার উত্তরে ডাঃ ভাণ্ডারকর নানা প্রমাণপ্রয়োগ সহ যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা প্রনিধানের যোগ্য।

তাঁহার মতে বাঙ্‌লার কায়স্থেরা স্বল্প দিনের নন, খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। নাগর ব্রাহ্মণেরা গুজরাতে ও কাথিবাড়ে বসবাস করেন, বঙ্গ উড়িষ্যা ও আসামেরও অধিবাসী হন, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। এই নাগর ব্রাহ্মণগণের সহিত কোনরূপ যোগসূত্রে আদিম কায়স্থেরা আবদ্ধ হন, ইহা সম্ভব; কিন্তু বেশী সম্ভব যে, নাগর ব্রাহ্মণেরা কালক্রমে কায়স্থরূপে পরিগণিত হন। ইঁহারাই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন—ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত ও গুহ নামে।

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত "নাগর-পুষ্পাঞ্জলিতে" প্রকাশ যে, পেশার পরিবর্ত্তনে নাগর ব্রাহ্মণেরা উত্তর ও পশ্চিম ভারতে রাজপুত ও বেনিয়া বনিয়াছেন। বঙ্গেও যে তাহা ঘটিয়াছে ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান।

৭০০ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই ও গুজরাতে যে সকল নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহাদের সাধারণ আখ্যা—শর্ম্মণ, কিন্তু উপাধি—ঘোষ, মিত্র, দত্ত, বর্ম্মণ, নাগ ইত্যাদি। খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর বলভী তাম্রফলক দৃষ্টে জানা যায়, যে সকল শর্ম্মণদিগকে ভূমি দান করা হয় তাঁহাদের নামের শেষে মিত্র, দত্ত, ত্রত প্রভৃতি উপাধি ছিল। এই শর্ম্মণেরা জনপদ—আনন্দ-পুর হইতে আসিয়া এই অঞ্চলে বসতি করেন। সুতরাং এই নাগর ব্রাহ্মণদিগের সহিত বঙ্গীয় কায়স্থগণের ইতিহাস যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য।

সেন রাজগণের ও গুপ্ত আমলের তাম্রফলক দৃষ্টে পূর্ব্বোক্ত মীমাংসা সম্বন্ধে সংশয়ের কোন কারণই থাকে না। শ্রীহট্টে প্রাপ্ত তাম্রফলক হইতে জানা যায় যে, যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ভূম্যাদি প্রাপ্ত হন তাঁহাদের উপাধি ঘোষ, দেব, পালিত, দত্ত, দাম, ভূতি, কুণ্ড প্রভৃতি, অথচ ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। বনমালদেব নামক নৃপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া নাগর ব্রাহ্মণেরা যে দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রীহট্টে আসেন ও জায়গীর পাইয়া সেখানে বসতি করেন তাহার সুস্পষ্ট বহু প্রমাণ বিদ্যমান।

আমানউল্লাহ্

মৌলভী মোতাহের হোসেন চৌধুরী বি-এ

আমানউল্লাহ্ আজ পরাজিত, সিংহাসনচ্যুত। এ সংবাদটা পাত্রভেদে হর্ষবিষাদের কারণ হ'য়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ আজ উৎফুল্ল এই ভেবে যে, ইস্‌লাম আজ জয়ী হ'ল, অনাচারী পথভ্রষ্টের দর্পচূর্ণ হ'য়ে ইস্‌লামের ইজ্জত রক্ষা হ'ল। আবার কেউ আজ দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করছেন মুস্‌লিম-দুনিয়ার-ভাগ্যাকাশ থেকে একটা জ্যোতিষ্ক খ'সে পড়ল ব'লে।

ইটালীতে ইউরোপীয় বেশে রাজা
আমানুল্লাহ ও বেগম সুরাইয়া

আমানউল্লাহ্‌র রাজ্যাভিষেক, তাঁর প্রজা-প্রীতি; তাঁর য়ুরোপ ভ্রমণ, য়ুরোপ থেকে স্বদেশে প্রত্যাগমন, কুচক্রীর চক্রান্ত বশতঃই হোক্ অথবা দেশবাসীর ধর্ম্মান্ধতার দরুণই হোক্ আফগানীস্থানের অন্তর্বিপ্লব, এবং অবশেষে আমানউল্লাহ্‌র ইটালী—গমন—এ সব কথা দৈনিক ও সাপ্তাহিকের দৌলতে আজ ঘরে ঘরে প্রচারিত। তাই এ সব কথার বিবৃতি হ'তে বিরত থেকে সাধারণভাবে আমার মনে যে-কথাটুকু জেগেছে তাই বল্‌তে চেষ্টা করব।

খুব বেশীদিনের কথা নয়। মুসলমান সমাজের কতিপয় মহাপ্রাণ ব্যক্তি স্বজাতির ঘোর দুর্দ্দিনে ব্যথিত হ'য়ে সমস্ত মুস্‌লিম দেশগুলো এক ক'রে মুস্‌লিম দুনিয়ার জাগরণের সাড়া আন্‌বার এক বৃহৎ স্বপ্ন রচনা করেছিলেন। স্বপ্ন বলছি, আদর্শ কার্য্যে পরিণত হ'তে পারেনি ব'লে নয়, হ'তে পারে না ব'লেই। ভূগোলকে অবহেলা করা যায় স্বপ্নেই, বাস্তবে নয়; আর Theocracyর যুগ ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা যে কত নিরর্থক রাজনীতির প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষেও তা' বুঝে ওঠা কষ্ট-সাধ্য নয়।

সেদিন আমাদের কাছে জাগরণের অর্থ ছিল শুধুই উদ্দেশ্যহীন আস্ফালন, শুধুই অর্থবিহীন উত্তেজনা। মুস্‌লিম দুনিয়ার জাগরণের মানে যে বিভিন্ন মুসলমান দেশের অধিবাসীদের ধনে-মানে সাহিত্যে-শিল্পে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠা, কিছুটা স্বপ্নগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিলেম ব'লেই তখন তা আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। আমাদের চোখের সাম্‌নে তখন ঝকঝক ক'রে উঠ্‌ছিল আনোয়ার-কামালের তলোয়ার, আর কানের কাছে গুন্ গুন্ ক'রে বেজে উঠ্‌ছিল—

"চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্থান হামারা"—ইত্যাদি। স্বদেশের লোকেরা দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে মরতে লাগ্‌ল, কিন্তু সেদিকে আমাদের খেয়ালই নেই। কাফেরের দেশের লোকেরা মরছে তাতে আমাদের কি? ভারতের বাইরের মুসলমানেরা বহাল তবিয়তে থাক্‌লেই আমাদের বাস্। সমস্ত যুক্তি, সমস্ত বিচার-বুদ্ধি এম্‌নি ক'রেই সেই দিন আমরা এই Pan Islamic স্বপ্নের কাছে বিকিয়ে দিয়েছিলেম। সে দিনকার বক্তা, লেখক ও কবি সবারই মুখে ও কলমে ছিল—ইস্‌লাম জাগ্‌বে, কেননা ইস্‌লামই আল্লাহ্‌র একমাত্র প্রিয় ধর্ম। আমরা তখন সে সব শুনে খুবই খোস হ'য়ে উঠ্‌তাম; বলতাম, বক্তার জবানের তেজ বলার থাক্,

লেখকের কলমের জোর বৃদ্ধি পাক। কাইজারের ইস্‌লাম গ্রহণের অঙ্গীকার, তুর্কী সুলতানকে কাইজারের অভিবাদন, কাইজারের মক্কামোয়াজ্জমা "জিয়ারত"* করণ,—এ সবই ছিল সেদিনের ঘরে-ঘরে-বলা কথা। সেদিন যদি আমি আজ্‌কের বয়সের থাক্‌তাম, তা এই ব'লে গর্ব্ব ক'রে বেড়াতাম যে, কোন ব্যক্তি নয়, ভারতের মুসলমান সমাজটাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কবি, কেননা সে-ই সব চাইতে বড় স্বাপ্নিক। —এ সব কথা পাগ্‌লামি নয়; আমান উল্লাহ্‌র অগ্রবর্ত্তী, তাঁর সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্ত্তী অর্থাৎ তাঁর সিংহাসন-চ্যুতির পরবর্ত্তী মানুষের মনোভাবের কথা কিছু না বল্লে আমান উল্লাহ্‌র জীবন পাঠ অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

Pan Islamism এর জোয়ারের পরই এল তা'রই ছোট ভাই খেলাফত আন্দোলন। আমরা সবাই ভারতোদ্ধারে মেতে উঠ্‌লাম এই মনে ক'রে যে, ভারতোদ্ধারই খেলাফত উদ্ধারের প্রধান উপায়, আর ভারতোদ্ধার না হ'লে ইংরাজের অধীনে আমরা হুবহু "শরাশরীয়তে"র আদেশানুযায়ী ধর্ম্ম-জীবন যাপন করতে চিরকালই অপারগ থেকে যাব।† তাই চল্‌ল আমাদের মান-অভিমানের পালা ইংরাজের সঙ্গে। —কিন্তু আমাদের আবেদন-নিবেদন সমস্ত তুচ্ছ প্রতিপন্ন ক'রে কামাল যে নিজেই হটিয়ে দিল গ্রীকদের, জয় ক'রে নিল তুর্কীর সিংহাসন শত্রুর হাত থেকে। একটা তীব্র আনন্দে গেয়ে উঠ্‌লাম—"জয় কামালের জয়"; আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বল্লাম,—বেঁচে থাক নিজে লাখ বছর, আর বাঁচিয়ে রাখ আমাদের খেলাফতকে। কিন্তু কামাল—সৃজনধর্ম্মী, বাস্তবের পূজারী, নিজের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জাগ্রত কামাল আমাদের সমস্ত আশা দিল পণ্ড ক'রে আমাদের অতি সাধের পর্দ্দা প্রথা আর খেলাফত উড়িয়ে দিয়ে। যতটুকু তীব্রতা নিয়ে আমরা আনন্দে নেচে উঠেছিলাম তার চাইতেও অনেক বেশী তীব্রতা নিয়ে খাপ্পা হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লাম,—A devil in the shape of an angel; কিন্তু এই যে আমাদের অতি প্রিয় কামালপাশার প্রতি আমাদেরই অশ্রদ্ধা, একটু খুঁজলেই বুঝতে পারা যাবে, তার কারণ হয়তো আমাদের মধ্যেও নেই, কামালপাশার মধ্যেও নেই, আছে আমাদের স্বপ্ন-প্রিয় নেতাদের মধ্যেই।

বোরখা পরিহিত আফগান মহিলা

জাগরণের মানে হা হুতোহস্মি করা নয়, দেশকে অথবা একটা জাতিকে সৃজন ক'রে তোলা; আর সৃজনের মানে ধন-মান, সাহিত্য-শিল্পের সৃজন। কিন্তু সে ভাবে সৃজন করতে গেলে জাতির প্রকৃতিরও কিছুটা পরিবর্ত্তন দরকার। ঠিক যে মনোভাব নিয়ে আছি সে ভাবেই থাকা তখনই উন্নতি ব'লে ধরা যাবে যখন দাঁড়িয়ে থাকাই হাঁটা ব'লে পরিগণিত হ'বে। অপরিবর্ত্তনের অবস্থা একটা জাগ্রত জাতির লক্ষণ নয়। জানিনা কি কারণে, হয়তো তাঁরা

* পরিদর্শন।

† সেদিনও অনেক স্বরাজকামী মুসলমান তাঁ'র বক্তৃতায় বলেছেন,—স্বরাজ আমরা চাই, কারণ স্বরাজ না হ'লে হুবহু ইস্‌লামের আদেশানুসারে আমরা জীবনযাপন করতে পারব না। স্বরাজ হ'লে শর্দা বিলের মত অনৈস্‌লামিক বিল আইনে পরিণত হ'তে পারত না। স্বরাজ কামনার কি যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্য!

নিজেই বুঝ্‌তে অপারগ ছিলেন ব'লে, হয়তো তাঁদের আদর্শটা নিজের কাছেই অত্যন্ত নিরাকার ও অস্পষ্ট থাকায়, এ কথাটা নেতৃবর্গ দেশের মুসলমানদের বুঝিয়ে দেননি। তাই দেশবাসী মনে ক'রে নিল, জাগরণের মানে স্বপ্ন দেখা —সারা মুস্‌লিম দুনিয়া আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতে বসন্তের এক পুণ্য প্রভাতে জেগে উঠবে, এই স্বপ্ন দেখা। আমাদের নেতাদের মধ্যেও যে এমন একটা খাঁটি কবিত্ব ছিল না, তা' নয়। সাধারণের স্বপ্নটা নেতাদের হাত থেকেই পাওয়া। সুতরাং কামাল পাশা এসে যখন সৃষ্টির কাজে অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের কাজে হাত দিলেন তখন আমাদের আঁৎকে উঠা খুব আশ্চর্য্য কিছুই নয়। অশ্রদ্ধার

আমানুল্লার প্রতিষ্ঠিত দিয়াশলাই কারখানা—অনাথা স্ত্রীলোকদিগকে এখানে কাজে নিযুক্ত করান হইত

কারণ জনসাধারণের মধ্যে পাওয়া যাবে না কেন বলেছি, আশা করি, এখন কারো বুঝ্‌তে দেরী হ'বে না। আবার কামাল পাশা দোষী নয় এ জন্য যে, জাগরণের সর্ব্ব-সম্মত পন্থা গ্রহণ ক'রেই অর্থাৎ শুধু রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক পরিবর্ত্তন কামনা না ক'রে সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতিরও কিছুটা পরিবর্ত্তন ক'রে তিনি দেশকে জাগাতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসের পাতায় জাগরণের অর্থ এই। কামাল পাশা জাগ্রত মানুষ, স্বপ্নদর্শী নন। ইস্‌লামের প্রাচীন ইতিহাসের গৌরব কাহিনী শুনে' দশাপ্রাপ্ত হ'বার দশা তাঁর নয়। অতীতের ইতিহাসকে তিনি শ্রদ্ধা করেন নিশ্চয়ই, কিন্তু শুধু তাকে নিয়েই ব'সে থাকা তিনি স্রেফ আহাম্মকি মনে করেন। তাই, শুধু দেশোদ্ধার ক'রেই চুপ ক'রে ব'সে না থেকে বর্ত্তমান জগতের ভাবানুযায়ী নিজেকে ও দেশকে গ'ড়ে তোলাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন। গ্রীক-হটিয়ে-দেওয়া কামাল শুধুই বীর, পর্দ্দা-উঠিয়ে-দেওয়া কামাল একজন স্রষ্টা। হয়তো কোন তর্ক-রসিক ব'লে উঠ্‌বেন,—শুধু উচ্ছেদের দ্বারা, শুধু ধ্বংসের দ্বারা কি সৃষ্টি হয়? সৃষ্টি তো হাঁ-মূলক, না-মূলক নয়।—উত্তরে তাঁকে বলি,—একটু চিন্তা করলেই বুঝ্‌তে পারা যাবে, অনেক সময় ধ্বংসের দ্বারাই সৃষ্টি হয়, যেমন সৃষ্টি আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই বাগানের গাছের এলোমেলো-ভাবে বেড়িয়ে-পড়া লতা-পাতাগুলি ছেঁটে কেটে দেওয়ার মধ্যে। বাজে জিনিষের ধ্বংসই একটা সৃষ্টি।

নেতাদের দোষী মনে করছি এ জন্য যে, তাঁরা উন্নতি গ্রহণের জন্য দেশবাসীদের তৈরী করেন নি। উন্নতি মানে যে হৈ-চৈ করা নয়, ভাব-জগতে ও বাস্তব জগতে কিছুটা এগিয়ে যাওয়া তা' তাঁরা দেশবাসীদের বুঝিয়ে দেননি তাঁরা শুধু উত্তেজনা ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেই রয়েছেন, কি ভাবে যে এই উদ্দীপনা ও উত্তেজনাকে সত্যিকার সৃজন-মূলক কাজে লাগান যায় তা' তাঁরা দেশবাসীকে বুঝিয়ে দেননি।

যাক, তা'র পর আমরা কামালের থেকে মুখ ফিরিয়ে আমান উল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এলাম। আবার ভাব-প্রবণতার মীড় চড়িয়ে দিয়ে ব'লে উঠ্‌লাম,—আমান-উল্লাহ্‌, ইস্‌লামের জন্য জানকবুল কাবুলবাসীদের "সের তাজ" * আমান উল্লাহ্‌ আমাদের খেলাফত রক্ষা ক'রে আমাদের মৃত্যু-পন্থী ইস্‌লামের জান ফিরিয়ে দাও; আমরা তোমাকে আমাদের খেলাফতের তখ্‌তে বসাব।—নিন্দা করছিনে, আমান উল্লাহ্‌ এই কথায় যারা কিছুটা

* মাথার মুকুট।

মোহগ্রস্ত হ'য়েছিলেন বই কি। হয়তো সারা মুস্‌লিম দুনিয়ার ভক্তি-শ্রদ্ধা পা'বার একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা তাঁর মনে জেগেছিল। কিন্তু তা' ততটা দোষের মনে করিনে এই ভেবে, জাগ্রত মানুষের যা' লক্ষণ—মোহের অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া—পরে, তাঁর জীবনে তা' দেখা দিয়েছিল। তাঁর পরের কার্য্যাবলীই এর সাক্ষী।

আমান উল্লাহ্ তরুণ; হয়তো তাই জাগরণের সত্যিকার অর্থটা যে কি তা' তিনি সহজেই "Genial sense of youth" এর সাহায্যে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যৌবনের একটা স্বাভাবিক সত্য-প্রীতি আছে; যা' সত্য ও সুন্দর তা' সহজেই তার ভালো লাগে। আমান উল্লাহ্ সত্য-বধূটির হাতছানি পেয়েছিলেন—ঘোমটার আড়ে ইতিউতি চেয়ে বধূটি তার ভাবী প্রিয়তমের প্রাণে ভালোবাসার সঞ্চারও করতে পেরেছিল। আমান উল্লাহ্ও তাঁর জীবনে তাকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাকে নিয়ে ঘর করবার জন্ত আমান উল্লাহ্কে সুযোগ দিইনি আমরা—শাস্ত্রের পীরামিডের তলে জাগ্রত-হৃদয়-গোরদানকারী আমরা। আমরা বল্লাম এ জন্ত যে, আমান উল্লাহ্র এই পতনের জন্ত সমগ্র মুসলমান সমাজকেই আমি দায়ী মনে করি। সমগ্র মুসলমান সমাজের গতানুগতিক মনোভাবটাই তো তার পেছনে। আফগানিস্থানে যা' হ'য়েছিল ভারতেও তা'ই হ'ত, যদি আমান উল্লাহ্ ভারতের রাজা হ'তেন। ভারতে ও আফগানে সেই একই ধর্ম্মান্ধতা।

অনেকের ধারণা এই যে, আমান উল্লাহ্ য়ুরোপের দ্বারা সম্মোহিতই হয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে সত্য কিছুই ছিল না। তা' না হ'লে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত এত বড় সংস্কার-প্রচেষ্টা এত তাড়াতাড়ি তিনি চালাতে চেষ্টা করতেন না।—কিন্তু সম্মোহিত যদি তিনি হ'তেন তাহ'লে সেই মোহ-জাত আদর্শকে দেশবাসীর ভয়ে সহজেই তিনি তালাক দিতেন, যেমন গুরুজনের ভয়ে আমরা দিয়ে থাকি মোহে-প'ড়ে-বিয়ে-করা স্ত্রী কে। সম্মোহিতের অবস্থা তাঁর ছিল না, যেটুকু ছিল খাঁটিই ছিল। সত্যকে প্রকৃতই তিনি উপলব্ধি ক'রেছিলেন। আর যদি তাঁকে অনুকারক বলা যায়, তবে বল্‌তেই হ'বে, মৃতের অনুকরণ তিনি করেন নি, জীবন্তের অনুকারকই তিনি ছিলেন; —আর এই জীবন্তের অনুকরণ হ'তেই পাওয়া যায় গতি-বেগ যা' মানুষকে উদ্যোগী করে তোলে।

আমানুল্লার প্রতিষ্ঠিত বায়স্কোপ গৃহ

এখন আবার আরেক প্রশ্ন,—কী সে সত্য যা তিনি জীবনে পেয়েছিলেন?—যা সমর্থিত হবে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান পুঁথি পত্রের দ্বারা।—আশাকরি কোন জাগ্রত

আমানুল্লা প্রতিষ্ঠিত একমাত্র রেল-লাইন

ব্যক্তির থেকে এ প্রশ্ন উঠবে না, উঠবে তার থেকেই যার কাছে পুস্তকটাই হ'য়ে গেছে দুনিয়া। আমান উল্লাহ্ সজীব মানুষ; তাই তাঁ'র সত্য নির্জীব বইএর সত্য নয়। তাঁর সত্য বাস্তব সত্য—দেহ-প্রাণ-মন-দিয়ে-উপলব্ধি-করা সত্য। তিনি অনুভব করেছেন, জীবন সত্য, জগৎ সত্য। তারা উপভোগ্য উপেক্ষণীয় নয়।—হয়তো অনেকে বলবেন, এ আবার একটা নতুন সত্য কি? আমরা কি আর ভোগ করছিনে? সবাই ত' ভোগ করছি।

—করছি নিশ্চয়ই; কিন্তু মানুষের ভোগ শুধু খানিয়া খাবার কোথাও নয়; মানুষের ভোগ দেহ-মন-আত্মা সম্বন্ধে, নিজের শক্তি সম্বন্ধে সদা-জাগ্রত থাকায়—কোন গুরু অথবা কোন শাস্ত্রের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে বিকিয়ে না দিয়ে। আমান উল্লাহ্ তা' জেনেছিলেন। তাই সমস্ত অনাবশ্যক বন্ধন মোচন ক'রে তিনি আফগান বাসীদের শক্তি বিকাশের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। য়ুরোপ গিয়ে তিনি জীবনটা ভোগ ক'রে এলেন, আর দেশে ফিরে এসে দেশবাসীদের তা' উপভোগ করবার জন্য তৈরী করতে চাইলেন। দেশের উন্নতি করা তিনি মনে করলেন দেশবাসীকে ভোগের জন্য তৈরি করা, কেননা ভোগের স্পৃহা জাগ্‌লে সৃষ্টি আপনা হ'তেই দেখা দেয়।

এ উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়েই তিনি শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে লেগে গেলেন। সব চাইতে বেশী লাগ্‌লেন শিক্ষা বিস্তারের কাজে—শুধু
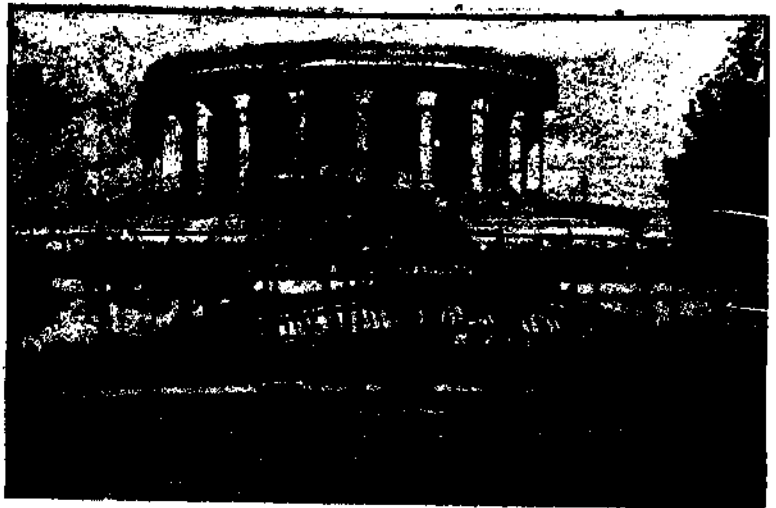
কাবুল রাজ-প্রাসাদ

পুরুষের জন্য নয়, নারীর জন্যও। নারীও তাঁর দেশেরই অধিবাসিনী; সুতরাং তাকে বঞ্চিত রাখা অন্যায়। কিন্তু নারী শুধু শিক্ষিতা হ'লেই তো সকল উদ্দেশ্য সফল হয় না; তাই দিলেন তিনি পর্দা উঠিয়ে: আফগান রমণীদের রুচি-

সম্পন্না ও স্বাবলম্বিনী ক'রে তোল্‌বার জন্ত। বহু মেয়ে স্কুল তো প্রতিষ্ঠিত করলেনই, তার উপর ইউরোপের নানা দেশে মেয়েদের পাঠাতে লাগলেন সে সমস্ত দেশের জ্ঞান—বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন আহরণ করবার উদ্দেশ্যে। দেশের সর্ব্বপ্রকার অন্ধতা দূর ক'রে দেশবাসীকে সুন্দর ও শোভন ক'রে গ'ড়ে তোলাই তিনি ক'রে নিলেন তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। দেশ-রক্ষার্থে য়ুরোপ থেকে তিনি নানা যন্ত্র-পাতি এনেছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এই যন্ত্র-পাতি আনায় তাঁর এমন কোন কৃতিত্ব নেই, কারণ একজন সাধারণ রাজার পক্ষেও তা' অসাধারণ কিছু নয়। তাঁ'র কৃতিত্ব শত্রুর হাত থেকে দেশ-রক্ষার চেষ্টায় নয়, কুসংস্কারের হাত থেকে দেশবাসীকে মুক্তি দেবার চেষ্টায়। একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্ব্বর দেশের রাজার পক্ষে এ খুবই বড় কথা। নিজের ত্রুটি-স্বীকার ক'রে তা' দূর করবার চেষ্টার মধ্যেই তো মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয়।

সৃষ্টির দিক দিয়ে আমানউল্লাহ্‌ আধুনিক রুশের স্রষ্টা Peter the Greatএর সঙ্গে তুলিত হ'তে পারেন। পার্থক্য কেবল এই যে Peter the Great কৃতকার্য্য হ'য়েছিলেন, আমান উল্লাহ্‌র ভাগ্যে তা' ঘটেনি। সফলতা অবশ্য কামনার বস্তু, কিন্তু শুভ বুদ্ধিরও একটা মূল্য আছে। আমান উল্লাহ্‌র দোষ এই যে, নিজের আদর্শ সম্বন্ধে সজাগ থাক্‌লেও নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ তিনি ছিলেন না। আদর্শবাদীদের ঘ'টেই থাকে এ কথা।
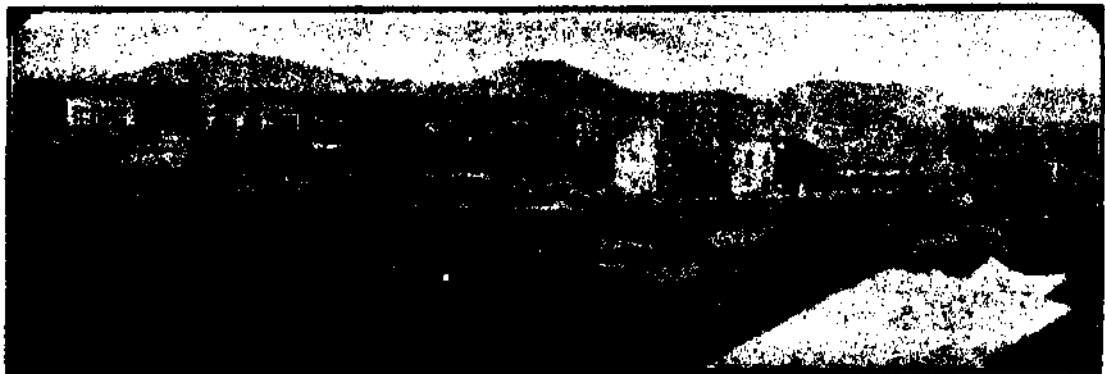
শিকারিণী বেশে বেগম সুরাইয়া

দারুল-আমান বা নূতন শহর

বাস্তবের প্রতি অন্তর্দৃষ্টির অভাব একটা মস্ত দোষ নিশ্চয়ই কিন্তু তা' আমাদের প্রাণে একটা করুণতার উৎস খুলে' দেয় না কি? আদর্শ কেটে ছেঁটে প্রয়োগ না করায় তিনি মানুষের নিকট দোষী নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁর আদর্শদাতা বিধাতার নিকট সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ র'য়ে গেলেন। Shakespeareএর Brutusএর চরিত্র-সমালোচনায় শেষ দিকে যা বলা যায় আমান উল্লাহ্‌র বেলাও তা বলা যেতে পারে;—He had failings and many of them,

But his errors only manifest the nobleness of his character, and his failings lean to virtue's side.

এত গেল আমান উল্লাহ্ সম্বন্ধে। এখন তাঁর সম্বন্ধে তাঁর নিজের দেশের ও আমাদের দেশের লোকের ধারণাটা কি তা' বলা দরকার মনে করি। আশা করি, তাঁর নিজের দেশের ধারণা গবেষণা ক'রে বের করতে হ'বে না। কেননা, তা'দের কার্য্যের দ্বারা তা' সহজেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু, আমাদের ধারণাটা খুব স্পষ্ট নয়। তাই একটু চিন্তার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই।

আমাদের দেশের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে আমিও একজন। সুতরাং আমার মনোভাবটাই আগে বলতে চাই। আমার মনোভাব যে কি পূর্ব্বেই তা' অনেকটা ধরা পড়েছে। আমান উল্লাহ্ একাধারে আমার ভালোবাসা, ভক্তি ও স্নেহের পাত্র। তাঁকে ভালোবাসি এজন্য যে, তিনি শুধু আমার স্বধর্ম্মী নন, স্বমর্ম্মীও বটেন। আদর্শের ক্ষেত্রে তিনি আমার ভাই, আর এই আদর্শের ভ্রাতৃত্ব যে কত মধুর, এতটুকু আদর্শের আঁচ আছে যাঁর মধ্যে তাঁকে আর বক্তৃতা দিয়ে বুঝাতে হ'বে না। আমান উল্লাহ্ আমার বন্ধু, আমান উল্লাহ্ আমার মনের মিতা। তাঁকে ভক্তি করি এজন্য যে, আমাদের মত আদর্শকে শুধু বুকে চেপে' রেখে' তিনি জীবনযাপন করেননি, সহস্র বিপদ-আপদের আশঙ্কা জেনেও তিনি তা' প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন। একদিকে তাঁ'র সহধর্ম্মিণী ও সহমর্ম্মিণী সোরাইয়াকে আরেকদিকে কাবুল-সিংহাসন রেখে' ধর্ম্মান্ধ-আফ্‌গানবাসীরা যখন বল্ল,—বেছে' নাও তোমার ইচ্ছামত—তখন তুচ্ছ সিংহাসনকে নয়, প্রিয়তমাকেই তিনি ব্যগ্র বাহু মেলে' আলিঙ্গন করলেন। চারটি-বিয়ের-

কাবুল শহরের সাধারণ দৃশ্য

অধিকারী মুসলমানের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ একটা স্মরণীয় দিন। এদিক দিয়ে তিনি রামায়ণের রামকেও অনেক পেছনে ফেলে গেছেন। তাই দুর্ব্বল আমি তাঁর নিকট মাথা নত করি,—নত করি নয়, আপনা হ'তেই মাথা নত হ'য়ে আসে। তার পর তাঁকে স্নেহ করি ধর্ম্ম-যুদ্ধে-পরাস্ত পুত্রের পিতার কারুণ্যের মত তিনি আমার প্রাণে একটা স্নেহের উৎস খুলে' দিয়েছেন ব'লে। ইচ্ছে করে তাঁর দেহ-মনে করুণ কল্যাণ হস্ত বুলিয়ে দিয়ে বলি,—শান্ত হও, শান্ত হও, তোমার জয় নিশ্চিত ভবিষ্যৎ যুগের মানুষের মধ্য দিয়ে, ওই শোন কোরাণের মহাবাণী, "নাছ্রুম্ মিনাল্লাহে ওয়া ফাত্হুন করীব," আল্লাহ্র সাহায্য ও জয় নিকটবর্ত্তী, যে আল্লাহ্ মানুষের হৃদয়ের মধ্য দিয়ে কথা কন সে আল্লাহ্র, যে আল্লাহ্ শাস্ত্রের শুক্‌নো পাতার মধ্যে আবদ্ধ সে আল্লাহ্র নয়।

গভীর ঘুমে নিদ্রিত। তা'রা আমান উল্লাহ্র নাম শুন্‌লেই রেগে লাল হ'য়ে উঠে। দ্বিতীয় প্রকার,—নিদ্রিত, নিশ্চয়ই, তবে স্বপ্ন দেখে চম্‌কে-চম্‌কে-উঠা মানুষ। এরা আমান উল্লাহ্কে ভালোবাসে, কেন না আমান উল্লাহ্ কাবুলের বাদ্‌শা; রুশের বাদ্‌শার পরই তাঁ'র স্থান।

কাবুলে ছেলেদের কলেজ

কাবুলে মেয়েদের কলেজ

তা'র পর আমাকে বাদ দিয়ে আমার অন্য স্বদেশবাসীদের কথা। স্বদেশবাসীরা দুই ভাগে বিভক্ত;—হিন্দু আর মুসলমান। হিন্দুরা আমান উল্লাহ্কে বরণ ক'রে নিয়েছে। তা'রা একটা জাগরণেচ্ছু জাতি, তাই আমান উল্লাহ্র সংস্কার প্রচেষ্টা তা'দের কাছে ভালো লেগেছে। মুসলমানদের মধ্যে তিন প্রকার মানুষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এক প্রকার নিরাকার অর্থাৎ স্বপ্নহীন
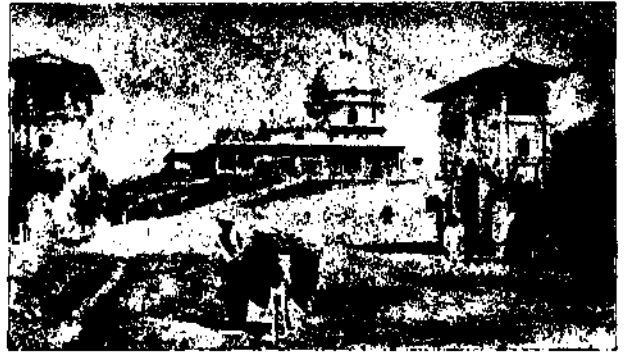
মানুষ আমান উল্লাহ্কে তা'রা পছন্দ করে না, বাদ্‌শা আমান উল্লাহ্কেই করে। "আমান উল্লাহ্র জয় গাহি মোরা, কাবুল-রাজের গাহিনা জয়,"—নজ্‌রুলের এ লাইনটা এদের জন্য নয়।......তৃতীয় প্রকার একদল নতুন-জেগে-উঠা মানুষ। নয়া জমানার আজান শুনে এঁরা জেগে উঠেছেন—নতুন চোখে বিশ্বকে আনন্দময় ক'রে দেখ্‌বার জন্য। বাংলাদেশেই এখানে সেখানে এঁদের চিহ্ন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বাংলাদেশেরই একটি বিশিষ্ট শহরে এঁরা কাজ করছেন—কাজ করছেন নয়, ভাব দিচ্ছেন। শহরটি ইসলামি স্মৃতির জড়োয়া-জড়িত হ'লেও তাঁ'রা অতীতের মোহে স্বপ্ন দেখেন নি। এতেই বোঝা যায় তাঁরা জেগে আছেন। এঁরাই আমান উল্লাহ্র প্রকৃত ভক্ত, কেন না তাঁ'র আদর্শের ভক্ত। বাদ্‌শা আমান উল্লাহ্র নয়, মানুষ আমান উল্লাহ্রই জয়-গান করেন তাঁ'রা। "আমান উল্লাহ্র জয় গাহি মোরা কাবুল-রাজের গাহিনা জয়,"—এ লাইনটা তাঁদের জন্যেই লেখা।

শুধু আমান উল্লাহ্‌র তারিফ ক'রে ও তাঁ'র পতনে আপ্‌শোষ ক'রে কাল না কাটিয়ে আমান উল্লাহ্‌কে জয়ী ক'রে তুলুক তাঁ'রা তাঁর আদর্শ নিজের জীবনে প্রয়োগ ক'রে—অর্থাৎ তাঁদের সমাজকে সৃষ্টি ক'রে। সৃষ্টি করা কিছু পরিবর্ত্তন ক'রে তা'কে একটা আল্‌মারীতে অথবা টেবিলে পরিণত করি। তাহ'লে আমাদের দরদ বেড়ে যাবে এর প্রতি। সমাজ সম্বন্ধে যা' বল্লাম স্বদেশ সম্বন্ধেও তা'ই বলা চলে। নিজের সৃষ্ট স্বদেশই স্বদেশ,—এমনি

বানদক দুর্গ

যায় সমাজকে কেটে ছেঁটে ও তা'র সঙ্গে নূতন কিছু যোগ ক'রে। ছাঁটতে হ'বে যা' দুষ্ট অর্থাৎ যা' মানুষের বিশুদ্ধ ভোগের পক্ষে অন্তরায়, আর যোগ করতে হ'বে যা প্রয়োজনীয়,—নিজের না পরের তা' বিচার না ক'রে। এ ভাবে সৃষ্ট হ'বে যে সমাজ, তা'ই হ'বে আমাদের প্রকৃত আপনার ধন, যেমন আপনার হয় একটুক্‌রা কাঠ যখন পাওয়া স্বদেশ তো তুচ্ছ, হোক্‌না তা' পিতৃপুরুষ থেকেই পাওয়া। মানুষের অন্তরের শুভ বুদ্ধিতে আমি আস্থাহীন নই, সুতরাং পূর্ব্বপুরুষের বিধানের কারাগারে উত্তরপুরুষের বুদ্ধিকে বন্দী রাখার আমি পক্ষপাতী নই।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

দাদূ দয়াল

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

"ভারতবর্ষের একটি স্বকীয় সাধনা আছে, সেইটি তার অন্তরের জিনিষ—অন্তরতর যদ্-অয়ম্ আত্মা তাকে সর্ব্বভূতে সমভাবে অনুভব করা। ভারতের এই সমদৃষ্টি মাঝে মাঝে সংস্কার ও লোকাচারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু তখনই আবার দেশে দেশে সত্যদ্রষ্টা মহাত্মারা আবির্ভূত হ'য়ে ভারতের মোহ অপসারিত করতে চেষ্টা করেছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতবর্ষীয় চিত্তে যে একটি বড় আন্দোলন জেগেছিল সেটি মুসলমান অভ্যাগমের আঘাতে। মুসলমান শাসনের আরম্ভকাল থেকেই ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই আপন জীবনে ও বাক্যপ্রচারে সম্প্রদায়গত বিরুদ্ধতার সমন্বয়সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যে-সব উদার চিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হ'তে পেরেছে, সেই সব চিত্তে সেই ধর্ম্মসঙ্গমে ভারতবর্ষের যথার্থ মুক্তিতীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেই সব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, তা অন্তহীন কালে প্রতিষ্ঠিত। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্যশ্রেণীর লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। তাঁদের সাধনার ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়; এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প। বস্তুত এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয়, এবং সমাজশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস সহজ সত্য অনুভূতির মধ্যে, অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে; তা সহজে উৎসারিত হয়েছে বিধিনিষেধ ও সংস্কারপ্রথার পাথরের বাধা ভেদ ক'রে। এঁদের মধ্যে সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্ত্তা মিলিতকণ্ঠে ঘোষণা করেছে। রামানন্দ কবীর দাদূ নানক প্রভৃতির চরিতে এই ধর্ম্মসঙ্গমের পবিত্র তীর্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছে।"

গুরু রামানন্দের সত্যধর্ম্ম সাধনার উত্তরাধিকারী ছিলেন কবীর, এবং কবীর সাহেবের সমদর্শন ও সত্য সাধনার প্রধান উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন গুরু নানক ও দাদূ দয়াল। কবীরের বাণীর সঙ্গে দাদূর বাণীর ভাবগত ও সময় সময় ভাষাগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

ভারতবর্ষ অনাবশ্যক সঞ্চয়ের প্রতি কখনো লোভ প্রকাশ করে নি। সে তার মহাপুরুষদের জীবনের প্রধান পরিচয় তাঁদের বাণী যুগ-যুগান্তর ধ'রে বহন ক'রে চলে, কিন্তু তাঁদের ক্ষুদ্র তুচ্ছ অন্য পরিচয় সঞ্চয় ক'রে রাখে না। মহাপুরুষেরা তো কোনো বিশেষ দেশকালের মানুষ নন, তাঁরা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের। তাই তাঁদের জন্ম-জাতি ও কুলের পরিচয় সব অযত্নে কালের অন্ধকারে হারিয়ে যায়, বেঁচে থাকে কেবল তাঁদের বিশ্বকালীন উপদেশ আর সেই বাণীকে চিহ্নিত ক'রে স্বতন্ত্র করবার জন্য একটা নাম—তাও সব সময় যথার্থ নয়।

দাদূ সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। তাঁর আসল নাম, জাতি, কুলপরিচয়, জন্মস্থান ও জন্মমৃত্যুর সময় সবই সংশয়াচ্ছন্ন হ'য়ে হারিয়ে গেছে। চিরজীবী হ'য়ে আছে তাঁর একটি কল্পিত নাম দাদূ ও তাঁর শাশ্বত সত্য সুন্দর উক্তি।

দাদূর পরিচয় সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কেউ বলেন দাদূর পিতার নাম ছিল লোদীরাম, তিনি আহমদাবাদের গুজরাটী ব্রাহ্মণ ছিলেন; আহমদাবাদে ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে দাদূর জন্ম হয়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল মহাবলী। কেউ বলেন দাদূর পিতা ছিলেন মুসলমান, তাঁর নাম ছিল সুলেমান, এবং দাদূর নাম ছিল দাউদ; এই দাউদ শব্দ লোকমুখে অপভ্রষ্ট হ'য়ে দাদূ হ'য়ে গেছে। কেউ বলেন দাদূর জন্মস্থান কাশীর নিকটে জৌনপুরে; তিনি জাতিতে চামার বা ধুনুরী ছিলেন। ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার শ্রেষ্ঠ সন্ধানী বন্ধুবর ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন, "বহু গ্রন্থ দেখিয়া নিশ্চয় করিয়াছি যে তিনি মুসলমান ধুনকর ছিলেন।" দাদূ নিজে নিজের বিশেষ কোনো কুলপরিচয় রেখে যান নি; এক জায়গায় তিনি নিজেকে ধুনুরী বলেছেন এবং এক জায়গায় নিজের নাম ও বৃত্তির পরিচয় মাত্র দিয়েছেন—

সাচা সমরথ গুরু মিলা, তিন তত দিয়া বতাই।
দাদূ মোট মহাবলী, ঘট ঘৃত মথি করি খাই॥

সত্য সমর্থ গুরু মিলেছে, তিনি তত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। দাদূ—যার নাম ছিল মহাবলী ও যে কূপ থেকে জল

তোলবার চামড়ার মোট সেলাই ক'রে জীবিকা অর্জন করে সে—এখন ঘটের মধ্যে ঘৃত মথন ক'রে খাচ্ছে, অর্থাৎ সাধনা দ্বারা অন্তরের আনন্দরস পান করছে।

জনশ্রুতি আছে যে দাদূ কখনো ক্রোধ প্রকাশ করতেন না, তিনি সকল লোককেই দাদা ব'লে সম্বোধন করতেন; তাই লোকেও তাঁকে সমাদর ও সম্মান ক'রে দাদূ বলত। এবং সর্বজীবে তাঁর সমদৃষ্টি ও করুণা ছিল ব'লে লোকে তাঁকে উপাধি দিয়েছিল দয়াল।

দাদূ-দয়াল বাল্যকাল থেকেই ধর্মপরায়ণ ও ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন। তিনি ১২ বৎসর বয়সে জন্মস্থান আহমদাবাদ বা জৌনপুর ত্যাগ ক'রে কাশীতে আসেন এবং সাধুসঙ্গ ভক্তসঙ্গ অনুসন্ধান ক'রে নানাস্থান পর্যটন করেন। কেউ কেউ বলেন এই সময় কবীরের পুত্র কমালের সঙ্গে দাদূর মিলন ঘটে ও দাদূ কমালের কাছে ধর্মজীবনে দীক্ষিত হন, দাদূ যে সত্য সমর্থ গুরুর [illegible] তিনিই কমাল। আবার কেউ কেউ বলেন কমাল ও দাদূর মধ্যে চারজন গুরুর ব্যবধান আছে; দাদূ কাশী থেকে রাজপুতানায় চ'লে যান এবং আজমীর ও জয়পুরের কাছে সম্বর নগরে বুর্হানুদ্দীন নামক এক ধার্মিক ব্যক্তির কাছে তিনি ধর্মের সার্বজনীনত্ব শিক্ষা লাভ করেন। দাদূ রাজপুতানাতেই অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন ও তাঁর বাণী প্রচার করেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ৫৯ বৎসর বয়সে তাঁর দেহত্যাগ হয়।

দাদূ আকবর বাদশাহের রাজত্বের শেষভাগে ও জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বের প্রথম সময়ে বিদ্যমান ছিলেন বলা যেতে পারে।

কিম্বদন্তী আছে যে সম্রাট আকবর দাদূর সত্যদর্শন ও ভগবদ্‌ভক্তির খ্যাতি শুনে দাদূর দর্শনপ্রার্থী হন। তাতে দাদূ উত্তর দিয়েছিলেন যে—সম্রাট আমার মতন দরিদ্র লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে কী লাভ করবেন? তবে যদি ঈশ্বরভক্ত আকবর আমাদের দর্শন দিতে চান তবে তিনি স্বাগত। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আকবর দাদূর সঙ্গে ৪০ দিন যাপন করেছিলেন। দাদূর সঙ্গে আলাপের ফলে আকবর না-কি নিজের রাজ্যের টাকা প্রভৃতি মুদ্রা থেকে নিজের নাম তুলে দিয়ে এক পিঠে আল্লাহু আকবর ও অপর পিঠে জল্লজ্বলালুহু মুদ্রিত করান। কবীরের ন্যায় দাদূও লেখাপড়া জানতেন না। সহজ অনুভব থেকে তাঁর যে সত্যদর্শন ঘটত তাই তিনি প্রকাশ করতেন।

> সন্ত ন পঢ়তে বিদ্যা কোই।
> উনকে অনুভব সমুদ্র সমানী॥

যিনি সত্য প্রেমের সাধক তাঁকে কোনো বিদ্যা প'ড়ে জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয় না, তাঁর অনুভবই সমুদ্রসমান গম্ভীর হয়।

> সন্ত কহহি সব সন্ত।

সত্য প্রেমের সাধকেরা সত্য অনুভব করেন ও সত্য প্রকাশ করেন।

দাদূ গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল হবা (ইংরেজী Eve)। দাদূর দুই পুত্র ছিলেন গরীবদাস ও মিস্কিনদাস—এঁরা দু'জনেই দাদূর মৃত্যুর পর দাদূপন্থের গুরুর পদ গ্রহণ করেন। দাদূর দুই কন্যা ছিলেন অব্বা ও সব্বা,—তাঁরা পিতার অনুমতি নিয়ে চিরকুমারী থেকে ঈশ্বর-আরাধনায় জীবনযাপন করেন। এখন তাঁদের নাম হয় নানী বাঈ ও মাতা বাঈ (মাতামহী দেবী ও মাতা দেবী)।

যৌবনেই দাদূর স্ত্রীবিয়োগ হয়। তদবধি তিনি গৃহস্থ সন্ন্যাসী হ'য়ে জীবনযাপন করেন। দাদূ ত্যাগব্রতী হয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন, ঈশ্বরের দয়া ও যথাতথ্য বিধানের উপরে তাঁর পরম নির্ভর ছিল। এজন্য লোকের তাঁকে সন্ন্যাসী ব'লেই মনে হতো; কিন্তু সন্ন্যাসীর বাহ্য বেশ-চিহ্ন তিনি কিছুই ধারণ করতেন না, ভিক্ষা করতেন না, নিজের সামান্য জীবিকা নিজে উপার্জন ক'রে নিতেন কূপ থেকে জল তোলবার চামড়ার মোট সেলাই ক'রে,—এতে লোকে তাঁকে সংসারী বিষয়ী ব'লেও সন্দেহ করত। সংসারী যদি, তবে সঞ্চয়ের ও আর্থিক লাভের চেষ্টা নেই কেন? নির্লোভ সন্ন্যাসী যদি, তবে তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ভিক্ষাতেই জীবন ধারণ করা উচিত? এই সংশয় লোকে তাঁর কাছে উপস্থিত করেছিল। তাতে দাদূ উত্তর দিয়েছিলেন—আমি ঘরেও থাকি না, বনেও যাই না, কোনো কায়ক্লেশও স্বীকার করি না; হৃদয় মনের মধ্যেই মনি মিলেছে সদ্‌গুরু পরমেশ্বরের উপদেশ।—

না ঘর রহা, ন বন গয়া, ন কুছু কিয়া কলেস।
দূ মনহী মন মিলা—সৎগুরু-কে উপদেস।

দাদূ ঘরেই বা কেন থাকবে, আবার বনেই বা কেন যাবে? ঘর বন পরিপূর্ণ ক'রে সর্ব্বত্র তো আনন্দময় বিরাজ করছেন, তাঁর সঙ্গেই তো আমার প্রেম লেগেছে।

কাহে দাদূ ঘর রহই, কাহে বনখণ্ড জাই।
ঘর বন রহতা রাম হৈ, তাহী সেঁ।'লব লাই॥

বৈরাগী বন নিয়েই থাকেন, গৃহস্থ থাকেন ঘর নিয়ে, আর আনন্দময় ভগবান থেকে যান নিরালা—তাঁকে কেউ চায় না। দাদূ এদের কোনো দলেই নেই।

বৈরাগী বন-মে রহৈ, ঘরবাসী ঘর মাহি।
রাম নিরালা রহি গয়া, দাদূ ইন্-মে নাহি॥

সন্ন্যাসের বাহ্যিক বেশ চিহ্ন ধারণও নিষ্ফল যদি অন্তরে বৈরাগ্য প্রেমভক্তি না থাকে; আর অন্তর পূর্ণ হ'লে বাহ্য চিহ্নেরই বা কি দরকার? "কনক কলস যদি বিষে ভরা হয় তবে-তা কোন্ কাজে লাগবে? আর চামড়ার পাত্রও মহামূল্য যার মধ্যে অমৃত আনন্দময় বিরাজ করছেন"—

কনক কলস বিষ সোঁ ভরা, সো কিস্ আব্ ই কাম।
সো ধন কূটা চাম-কা, জা মে অমৃত রাম॥

দাদূ আধেয় বস্তুকেই দেখেন, আধার বাসনটা কিসের তা দেখেন না; যিনি দাদূর ভিতর ভ'রে রেখেছেন, তিনি আমার মনের মধ্যে বিরাজ করছেন।—

দাদূ দেখই বস্ত-কো, বাসন দেখই নাহি।
দাদূ ভীতর ভরি ধরা, সো মেরে মন মাহি।

মালা তিলক কিছুই নয়, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। আমার অন্তরে এক বিরাজ করছেন, অহর্নিশ আমি তাঁরই নাম স্মরণ করি।—

মালা তিলক সোঁ কুছ নহী, কাহু সেতী কাম।
অন্তর মেরে এক হৈ, অহনিসি উস্-কা নাম॥

এই প্রসঙ্গে আমাদের বাংলা দেশের এক বাউল বৈরাগীর কথা মনে পড়ছে। তাঁর অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা ছিল না, মালা তিলক ছিল না। তিনি বৈরাগীর ভেক ধারণ করেন নি কেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাঁর একতারা বাজিয়ে গেয়েছিলেন—

অন্তরে রস না হৈলে কি বাইরে তারে রং ধরে?
জলে কি অমৃত নামে বাইরে তারে রং ক'রে?

দাদূ ভিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন—আমার পরমেশ্বর পূর্ণাৎ পূর্ণ। তাঁর কাছে অন্ন প্রার্থনা করো তিনি বহুতর দান করবেন। সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টিরক্ষার জন্য সহজেই দান করবেন, তবে কেন আমি ভিক্ষা করতে ধাবিত হবো? বিশ্বম্ভর সর্ব্ব জগৎকে পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছেন, তবে উদর-চিন্তায় লোকে কেন কেঁদে মরে? বিশ্বপালক পূর্ণাৎ পূর্ণ, সকলের সকল অবস্থা তিনিই চিন্তা করছেন। সেই জগন্নাথ পরম সমর্থ, দাদূ তাঁর সঙ্গে-সাথে থেকে তাঁর এই শক্তি দেখছে।—

পূরন ব্রহ্ম পরমেশ্বর মেরা।
অন্ন মাঁগ, দেবই বহুতেরা॥
সিরজনহার সহজ-মে দেঈ।
তো কাহে ধাই মাগি জিন লেঈ॥
বিসম্ভর সব জগ [illegible]ঈ।
উদর-কাজ নর [illegible]ঈ॥
পূরক পূরা হৈ গোপাল।
সব-কর চিন্ত্ করই হর হাল॥
সমরথ সোঈ হৈ জগনাথ।
দাদূ দেখ রহে সঁগ সাথ॥

আনন্দময়ই দাদূর জীবিকা, তিনিই আমার রাজা ও মনোরঞ্জক; দাদূ সেই তাঁর প্রসাদ থেকে সব পরিবার পোষণ করে।—

দাদূ রোজী রাম হৈ, রাজক রজক হমার।
দাদূ উস্ পরসাদ-সেঁ পোষা সব পরিবার॥

সেই প্রভুই আমার বস্ত্র, সেই প্রভুই আমার গৃহ আশ্রয়, সেই প্রভুই আমার শিরোভূষণ, সেই প্রভুই আমার অন্ন ও প্রাণ।—

সাহিব মেরা কাপড়া, সাহিব মেরা ধাম।
সো সাহিব সিরতাজ হৈ, সাহিব পিণ্ড পরান॥

ধরিত্রী কোন্ সাধনা ক'রে শ্যামল শোভার আস্পদ হয়েছে; আকাশ কোন্ সন্ন্যাস ক'রে নীল অম্বর ধারণ করেছে; রবি-শশী কোন্ সাধনার ফলে জ্যোতির অমৃতে ভ'রে গিয়ে পরমেশ্বরের সেবা করছে?—

ধরতী কা সাধন কিয়া, অংবর কৌন সন্ন্যাস।
রবি শশী কিস আরংভ-তে অমর ভয়ে নিজ দাস।

দাদূ বারবার বলেছেন ভগবানের কাছে কিছু প্রার্থনা না ক'রে ঈশ্বরের বিশ্বসেবার সঙ্গে নিজের সেবা মিলিয়ে দিলে যোগ গভীর হবে এবং সকল অভাব আপনিই পূর্ণ হ'য়ে যাবে।

দাদূ ভগবানকে নামরূপের অতীত ব'লে জেনেছিলেন; কাজেই তিনি বুঝেছিলেন—অনন্তের নামের অন্ত নেই, অসীমের রূপেরও সীমা নেই—"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর!" কিন্তু তাই ব'লে বিশেষ কোনো মূর্ত্তি তিনি নন।

জগৎ অন্ধ, তার নয়নে সত্য-দৃষ্টি নেই, যিনি সৃজন করেছেন তাঁকে বোঝে না, তারা পাথরের পূজা ক'রে আত্মহত্যা করে।—

জগ অংধা নয়ন ন সূঝই।
জিন [illegible] তাহি ন বুঝই॥
পা[illegible] পূজা করই
করি আতমঘাতা॥

সত্যস্বরূপ আনন্দময় জগৎকে পূর্ণ ক'রে বিরাজ করছেন—কেউ সেই সত্য রামকে জানলো না 'সাঁচা রাম ন জানহি রে'। আমার পূর্ণের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, পূর্ণের বোধ আমার অন্তরে জেগেছে।—

পূরে সে"। পরচা ভয়া, পূরী মতি জাগী॥

তেল যেমন তিলের অন্তঃপ্রবিষ্ট, গন্ধ যেমন ফুলের অন্তরে, মাখন যেমন ক্ষীরের মধ্যে ব্যাপ্ত, তেমনি সেই পরমপ্রভু প্রত্যেক রূপের অন্তরে অরূপ হ'য়ে বিরাজ করছেন।—

জীয়ে তেল তিলন্নি-মে, জীয়ে গংধি ফুলন্নি।
জীয়ে মাখন ষীর মেঁ ঈয়ে রব রূহন্নি॥

অসীম ভগবান সর্ব্বব্যাপী। জলের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দৃষ্টি উদ্ঘাটিত ক'রে দেখলে যেমন সমস্তই জলে ভরা বোধ হয়, ব্রহ্ম-বিচারও সেইরূপ।—

পানী মাহৈঁ পইসি-কর্ দেখই দৃষ্টি উঘার।
জলা ভ'ব্'র সব ভরি রহ্যা, ঐসা ব্রহ্মবিচার॥

অসীম আর সীমা ক্রমাগত পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন ক'রে আত্মপ্রকাশ করছে। তাদের দু'জনের ধরাধরি খেলা চলেছে। অসীম তো সকল আকারের মালা—মালা সব আকারকী। চিরদিনই অসীম এইরূপ সীমার জন্ত ও সীমা অসীমের জন্ত কাঁদছে—এই হ'চ্ছে বিশ্বক্রন্দন, এই তো ক্রন্দসী রোদসী!

গন্ধ কহে আমি যদি ফুলকে পাই তবেই আত্মপ্রকাশ করতে পারি, ফুল বলে যদি আমি বাসকে পেতাম তাহ'লে আমি সার্থক হতাম। ভাব বলে যদি আমি সত্যকে পাই তবেই আমি সার্থক; আর সত্য বলে আমি চাই ভাবকে, নইলে আমি প্রকাশ পাব কিসে? রূপ বলে আমার চাই ভাবকে, ভাব বলে আমি চাই রূপ। এইরূপে দু'জনে পরস্পরকে পূজা করতে চায়। এ পূজা যে অপরিমেয় ও অনুপম!

বাস কহে হম ফুল-কো পাউঁ,
ফুল কহে হম বাস।
ভাব কহে হম সৎ-কো পাউঁ,
সৎ কহে হম ভাস॥
রূপ কহে হম ভাব-কো পাউঁ,
ভাব কহে হম রূপ।
আপস-মেঁ দউ পূজন চাহে,
পূজা অগাধ অনূপ॥

এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের রমণীয় অনুরূপ কবিতা—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা॥

দাদু বল্‌তেন আল্লা আর রাম একই দেবতার দুই নাম। সম্প্রদায়-ভেদের সঙ্কীর্ণ কুসংস্কার সকলকে এই সহজ সত্যটি বুঝ্‌তে দেয় না।

দাদু আল্লা ও রাম এই দুই নামের পক্ষ থেকে দূরে; যিনি গুণ ও আকার-রহিত, তিনিই আমার গুরু।—

দাদু অলহ্ রাম কা দোনোঁ পক্ষ-তেঁ ন্যারা।
রহিতা গুণ-আকার-কা সো গুরু হমারা॥

হিন্দু না মুসলমান এই নাম নিয়ে কোন্ আবশ্যক, আসল আবশ্যক সেই পরমেশ্বরকে নিয়ে।—

হিন্দু তুরুক ন হোইবা, সাহিব সেতী কাম॥

হিন্দু মন্দির নিয়ে মত্ত, মুসলমান মস্‌জিদ নিয়ে ক্ষিপ্ত, আর আমি এক অলখ যিনি তাঁর সঙ্গে লিপ্ত হ'য়ে আছি, তাঁর সঙ্গেই সদা নিরন্তর প্রীতি।—

হিংদু লাগে দেহুরা, মুসলমান মহজীতি।
হম লাগে এক অলখ-সোঁ, সদা নিরন্তর প্রীতি॥

সেই অলক্ষ্যের মধ্যে হিন্দুর দেবালয়ও নেই, মুসলমানের মসজিদও নেই; হে দাদু, তিনি আপনাতে আপনি বিরাজ করছেন, সেখানে সীমাবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বার রীতিই নেই।—

তহাঁ ন হিংদু দেহুরা, নহী তুরুক মহজীতি।
দাদু, আপই আপ হৈ, তহাঁ নহী রহ রীতি॥

এই হৃদয়ই দেবালয়, হৃদয়ই মসজিদ, সৎগুরু আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন; অন্তরেই সেবা ও বন্দেগী চল্‌ছে; তবে বাহিরে কেন যাই?

য়হ মসীতি য়হ দেহুরা, সতগুরু দিয়া দিখাই।
ভীতর সেবা বংদগী, বাহর কাহে জাই?

হিন্দু বলে আমার পথ এই, মুসলমান বলে আমার পথ এই; অলক্ষ্য যিনি তাঁর পথ কোথায়? হে দাদু, তুমি তাঁকে এইরূপ সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ক'রে না রেখে তাঁকে সর্ব্বরূপ ও সর্ব্বময় ব'লে দেখো।—

হিংদু মারগ কহই হমারা, তুরুক কহই রহ মেরী।
কহাঁ পংথ হৈ কহো অলখ-কা, তুম্‌হ তো ঐসী হেরী॥

হে দাদু, বারোরকম পথে চল্‌তে গিয়ে বেচারারা সব পথ আঁকড়েই প'ড়ে আছে; খবরদার এদের কারো সঙ্গে যেও না, তাহ'লে উল্টো অধোগতিতে তোমার সর্ব্বনাশ হবে।

দাদু, পংথহি পর গয়ে, বপুরে বারহ বাট।
ইন্‌হকে সংগ ন জাইয়ে, উলটা অবিগতি ঘাট॥

আমি সব শুদ্ধ ক'রে দেখেছি, ভিন্নতা দ্বৈধ কোথাও নেই; সর্ব্বঘটে একই আত্মা বিরাজ করছেন—কি হিন্দু কি মুসলমান।—

সব দেখা মৈঁ সোধি কর, দুজা নাহী আন।
সবঘট একই আতমা, কা হিংদু মুসলমান॥

এই দুই ভাই হিন্দু-মুসলমানের হাত পা কান নয়ন সবই সমান।

দোনোঁ ভাঈ হাথ পগ, দোনোঁ ভাঈ কান।
দোনোঁ ভাঈ নৈন হৈঁ, হিংদু মুসলমান॥

তবে কার সঙ্গে কার ঝগড়া বা শত্রুতা? পর তো কেউ নয়। যাঁর অঙ্গ থেকে সকলের উৎপত্তি, তিনিই তো সকলের মধ্যে রয়েছেন।—

কিন্‌হ সোঁ বৈরী হোই রহ্যা, দুজা কোঈ নাহি।
জিন্‌হ-কে অংগ-তেঁ উপজই, সোঈ হৈ সব মাহি॥

আল্লা-রামে ভেদ-বুদ্ধির ভ্রম আমার ছুটে গেছে। হিন্দু-মুসলমানে কিছু ভেদ নেই, আমি সর্ব্বত্র তোমাকেই দর্শন করছি।—

অলহ রাম ছুটি গয়া ভ্রম মোরা।
হিংদু তুরুক ভেদ কুছ নাহীঁ, দেখউঁ দরসন তোরা॥

হে পিতা, তুমি ছাড়া দ্বিতীয় আর তো কিছু নেই। এক তুমি, তোমার নাম অনেক। আমার কাছে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। অলখ ইলাহী এক তুমি, তুমিই রাম রহিম, তুমিই মালিক মোহন, কারো কাছে তোমার নাম করীম। তুমি স্বামী, সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমি পাবন পবিত্র। তুমি স্থির, তুমি কর্ত্তা, তুমি স্বয়ং হরি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তুমি বন্ধু, তুমি রাজা, তুমি বিচিত্র সুন্দর। তুমি সর্ব্বশক্তিমান কর্ত্তা, তুমি প্রভু, তুমি রাজাধিরাজ। তুমি দুর্জ্জেয়, তুমি আল্লা, তুমি ঐশ্বর্য্যশালী ঈশ্বর, তুমি বিশ্বস্বামী। তুমি অপূর্ব্ব অনুপম। হে দাদু, তাঁর যে নাম অনেক।—

বাবা নাহীঁ দুজা কোঈ।
এক অনেক নাম তুম্‌হারে, মো পই ওর ন হোঈ।
অলখ ইলাহী এক তুঁ, তুঁ হী রাম রহীম।
তুঁ হী মালিক মোহনা, কেসো নাউঁ করীম।

সাঈঁ সিরজনহার তূঁ, তূঁ পাবন তূঁ পাক।
তূঁ কাইম করতার তূঁ তূঁ হরি হাজির আপ।
সিতা বাজিক এক তূঁ, তূঁ সায়ংগ সুভান।
কাদির করতা এক তূঁ, তূঁ সাহিব সুলতান।
অবিগতি অলহ এক তূঁ, গনী গোসাঈঁ এক।
অজব অনুপম আপ হৈ, দাদূ নাউঁ অনেক॥

যেমন জল এক পদার্থ, তার নাম ভাষাভেদে ভিন্ন, সেই নামের সংখ্যা কে ব'লে শেষ করতে পারে, আর বলো দেখি কোথায় তার সমাপ্তি?—

পানী-কে বহু নাম ধরি, নানা বিধি কী জাতি।
বোলনহারা কৌন হৈ, কহহু ধোঁ কহাঁ সমাতি

দাদূ আল্লা ও রাম দুই নামেই ভগবানকে ডাকতেন; তিনি পূজাও করতেন, নমাজও করতেন, যদিও তাঁর পূজা ও নমাজ ছিল মানস।

এই প্রকারে রামের আরতি করো, আত্মার অন্তরকে প্রদীপ ক'রে আলো[illegible] তনু-মনকে করো চন্দন, প্রেমকে করো মালা, অনাহত ঘণ্টাধ্বনি ক'রে দীনদয়ালের আরতি করো, জ্ঞানের দীপক আলো, তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস হোক তার বর্তিকা, দেবনিরঞ্জনকে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে পূজা করো। আনন্দ ও মঙ্গলভাবে হোক তাঁর সেবা, মানস-মন্দিরে সেই আত্মদেবতার। নিরন্তর ভক্তি হোক নৈবেদ্য। দাদূ তো তোমার সেবার কিছুই জানে না।

য়েহি বিধি আরতী রাম-কী কীজই।
আতম অংতরি বারন লীজই।
তন মন চংদন, প্রেম-কী মালা।
অনহদ ঘংটা দীনদয়ালা।
জ্ঞান-কা দীপক, পবন-কী বাতী।
দেব নিরংজন পাঁচউ পাতী।
আনংদ-মংগল-ভাব-কী সেবা।
মনসা মংদির আতমদেবা।
ভগতি নিরংতর মৈঁ বলিহারী।
দাদূ ন জানই সেবা তুম্হারী॥

আমার দেহই আমার শাস্ত্র, তার উপরে দয়াময়ের নাম লিখে রাখি। মন আমার মোল্লা, দেবতা হচ্ছেন সুমহান্।

কায়া হমারী কিতাব কহিয়ে,
লিখি রাখউ রহিমান।
মন হমারা মুল্লা কহিয়ে,
সুরতা হৈ সুবহান।

আমি দেহ-মন্দিরে নমাজ সম্পন্ন করি, সেখানে আর কেউ আসতে পায় না। আমি মন-মণির জপমালা ফেরাই, তখন প্রভুর ভাকে মন অভিষিক্ত হ'য়ে যায়।—

কায়া-মহল-মেঁ নিমাজ গুজারই,
তহাঁ ঔর ন আব্‌ন পাব্‌ই।
মন-মণি-কে তহ তস্‌বী ফেরই,
তব সাহিব-কে ব্‌হ মন ভেব্‌ই।

বিশ্ব-হৃদয়-সাগরে আমার স্নান, সেখান থেকে আমার চিত্তকে ধৌত ক'রে নিয়ে আসি। প্রভুর সম্মুখে বন্দনা করি। বার বার আমি আপনাকে তাঁর কাছে বলিরূপে—নিবেদন ক'রে দি।

দিল-দরিয়া-মেঁ গুসল হমারা,
উজু করি চিত লাউঁ।
সাহিব আগে করউঁ বংদগী,
বের বের বলি জাউঁ॥

ওরে দাস, যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ সর্বদা প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত থাক্‌বে। দাদূ তো প্রভুর মন্দির; মাত্র পাঁচ বার নমাজের চেষ্টা ছাড়ো।

হরদম হাজির হোনা বাবা,
জব লগ জীবই বংদা।
দাদূ মংদির সাঈঁ সে তী,
পাঁচ বখত-কা ধংধা।

দাদূর উদার ভাবের কথা সাধারণ লোকের বোধগম্য হচ্ছিল না। তারা বুঝে উঠ্‌তে পারছিল না যে দাদূ কোন্ সম্প্রদায়ের লোক—তিনি হিন্দু না মুসলমান। তারা প্রশ্ন করিতে লাগ্‌ল—তোমার পন্থ কি? দাদূ উত্তর দিলেন—

না হম হিংদু হোহিঁগে, না হম মুসলমান।
ষট্ দরসন-মে হম নহী, হম রাতেহিঁ রহিমান।

আমি হিন্দুও হবো না, আমি মুসলমানও নই। ষড়্‌দর্শনের কচকচিতেও আমি নেই, আমি কেবল দয়াময়ের নাম রটনা করি।

কিন্তু লোকের সংশয় মেটে না। একটা কিছু পন্থা বা সম্প্রদায় থাকা চাই তো? দাদূ উত্তর দিলেন—

যে-সব কৌই কিস্ পন্থ-মে ধরতী অরু অসমান।
পানি পবন দিন-রাতকা চন্দ সূর রহিমান॥

এরা সব কোন্ সম্প্রদায়ের—এই ধরিত্রী আর আকাশ; জল পবন দিন-রাত্রির সূর্যচন্দ্র—এরাই বা কোন্ সম্প্রদায়ের হে দয়াময়?

মহাপুরুষ ধর্মপ্রবর্ত্তকদের নামে লোকে সম্প্রদায় গঠন করে। কিন্তু তাঁরা নিজেরা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক?

মহম্মদ কার সম্প্রদায়ে ছিলেন, স্বর্গদূত জিব্রাইল (Gabriel) কোন্ পন্থ স্বীকার করেন? এঁদের গুরু বা পীর কে? তাঁকে এক অদ্বিতীয় আল্লা ব'লেই জেনো। এঁরা সব কোন্ সম্প্রদায়ের ছিলেন তাই আমি মনের মধ্যে চিন্তা ক'রে দেখি। অলক্ষ্য আল্লাই জগতের গুরু, দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

মহম্মদ থে কিস পন্থমে, জিবরাইল কিস্ রাহ্।
ইনকে মুরসিদ পীর কো, কহিয়ে এক অলাহ্॥
যে-সব কিস্‌কে হোই রহে, য়হ মেরে মন মাহিঁ।
অলখ ইলাহী জগতগুরু, দূজা কোই নাহিঁ॥

সম্প্রদায়-ভেদ স্বীকার করলে পূর্ণকে খণ্ডিত করা হয়। যে পূর্ণব্রহ্ম সকল খণ্ডতাকে মিলিত করছেন, তাঁকেই লোকে এদলে ওদলে খণ্ড খণ্ড ক'রে ভাগ করছে। হে দাদূ, জীবন্ত ব্রহ্মকে ত্যাগ ক'রে সবাই ভ্রমের গ্রন্থি বাঁধছে।

খণ্ড খণ্ড করি ব্রহ্মকো পক্ষ পক্ষ লিয়া বাঁট।
দাদূ জীবত ব্রহ্ম তেজি বাঁধে ভরমকী গাঁঠ॥

আপন আপন জাতি ও সম্প্রদায় নিয়ে সকলে পংক্তিতে বসেছে; দাদূ প্রেমময় ও আনন্দময় রামের সেবক, তার হৃদয়ে তো কোনো ভ্রান্তি স্থান পেতে পারে না।

অপনী অপনী জাতিসোঁ সবকোই বৈসৈ পাঁতী।
দাদূ সেবক রামকা তাকো নহি ভরাঁতী॥

পূর্ণব্রহ্মের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখবে সকল এক, কেবল বাহ্য রূপ দেখলেই নানা বিভেদ চোখে পড়ে।

পূরণ ব্রহ্ম বিচারিয়ে সকল আতমা এক।
কায়াকে গুণ দেখিয়ে নানা বরণ অনেক॥

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সত্যদর্শন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টিলাভই হয় না; হে দাদূ, বন্ধনাতীতকে ছেড়ে সবাই পথেই কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে বদ্ধ হ'য়ে পড়ে।

সাচ ন সুঝই জবলগা তবলগ লোচন নাহি।
দাদূ নিরবন্ধ ছাড়ি-করি বন্ধা হোই পথ মাহি॥

হে দাদূ সকলে একের ছিল, কিন্তু সেই একক জানল না। এরা এখন বহু জনের হ'য়ে গেছে। এই জগৎ পাগল।—

দাদূ সব থে এক-কে, সো এক ন জানা।
জনে জনে-কা হোই গয়া, য়হ জগত দিবানা॥

দাদূ নিজকে বলেছেন অলেখ-পন্থের লোক—দাদূ পংথ অলেখ; সহজ-পন্থের লোক—

সহজই সহজই হোইগা, জো কুছ রচিয়া রাম।
কাহে কো কলপহিঁ মরহিঁ, দুখী হোত বেকাম॥

সহজেই সব হ'য়ে যাচ্ছে যা কিছু রাম রচনা করেছেন। কেন কল্পনা ক'রে মরছ, কেনই বা বিনা কারণে দুঃখ ভোগ করছ।

ভাইরে, আমার পন্থ এমনি,—দুই-পক্ষ-রহিত পূর্ণ পন্থ আমি গ্রহণ করেছি।—

ভাইরে ঐসা পংথ হমারা।
দোই পখরহিত পংথ গহি পূরা।

এইরূপে বারবার দাদূ নিজকে সহজ-পন্থের যাত্রী বলেছেন। যে সব ভক্ত সাধক নানা দিগ্‌দেশ থেকে তাঁর কাছে এসে জুটেছিল তাদের নাম তিনি দিয়েছিলেন সহজ-সম্প্রদায় বা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়। পরে এই সহজ-সমাজ দাদূ-পন্থী নামে পরিচিত হ'য়ে আসছে। দাদূ তাঁর মতন সর্ব্বসম্প্রদায়বহির্ভূত সাধু ভক্তদের

একত্র মিলিত হবার স্থানের নাম রেখেছিলেন অলখ-দরীবা। দরীবা মানে হাটবাজার আর দর্বা মানে পায়রা বস্‌বার টং। দাদূর মনের মধ্যে এই দুই অর্থই ছিল তা তাঁর উক্তি থেকে বুঝতে পার যায়।

দাদূ খুব স্পষ্ট ক'রেই নিজের ধর্ম্মমত প্রকাশ কর্‌ছিলেন, তবু লোকে বুঝতে পারে না, গণ্ডীতে ফেলে সব-কিছুকে দেখা যে তাদের অভ্যাস। তাই তারা দাদূকে বল্‌লে—তা হ'লে তুমি একেশ্বরবাদী, নিরাকার-বাদী?

এর উত্তরে দাদূ বল্‌লেন—আমি এ দুয়ের কিছুই নই। যিনি সকল আকারের মালা—যিনি রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ—সেই আনন্দময়কে দাদূ স্মরণ ক'রে থাকে।

মালা সব আকারকী দাদূ সুমিরই রাম।

ভগবানকে যদি এক বলি তবে দুই বাদ প'ড়ে যায়। তাঁকে যদি দুই অর্থাৎ বহু বলি তবে এক বাদ পড়ে। এইরূপে তাঁকে সংখ্যার সীমায় ধর্‌তে গিয়ে দাদূ হয়রান হ'য়ে গেছে। অতএব তিনি যেমন তেমনি দেখাই নিরাপদ।

এক কহূঁ তো দো রহই, দোয় কহূঁ তো এক।
যোঁ দাদূ হৈরান হৈ, জোঁ হৈ তোহীঁ দেখ॥

সেই রাজা কারীগর বিশ্বকর্ম্মা সজ্জা ক'রে বিশ্বযন্ত্র বাজিয়েছেন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের রস-অনুভব সেই যন্ত্রের সুর, আর দাদূর ভিতর দিয়ে হ'চ্ছে তারই প্রকাশ।—

জংএ বজায়া সাজ করি কারীগর করতার।
পাঁচহূঁ-কা রস নাদ হৈ, দাদূ বোলন হার॥

সুন্দরী মূর্ত্তি-সকল চীৎকার ক'রে বলছে আমরা সকলে অগম্য অগোচরে চলেছি।—

মূরতি পুকারই সুন্দরী অগম অগোচর জাই।

যিনি সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী তাঁকে তীর্থে তীর্থে খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক।

কোঈ দৌড়ে দ্বারিকা, কোঈ কাশী জাহিঁ।
কোঈ মথুরা-কো চলে, সাহিব ঘটহী মাহিঁ॥

কেউ দ্বারকায় দৌড়ায়, কেউ কাশী যায়, কেউ মথুরায় চলে, কিন্তু প্রভু তো দেহমন্দিরে অন্তর্যামী-রূপে বাস করছেন।

মন-মোহন মেরে মনহিঁ মাহিঁ।

মনোমোহন আমার মনের মধ্যেই বিরাজ করছেন।

দাদূ সহজ আত্মপ্রত্যয় ও স্বানুভূতিকেই ঈশ্বর-পরিচয়ের প্রধান উপায় ব'লে জেনেছিলেন, তাই তিনি ঈশ্বরকেই সৎগুরু ব'লে তাঁরই নির্দ্দেশ প্রার্থনা করেছেন, কোনো মানুষকে তিনি গুরু ব'লে স্বীকার করেন নি। দাদূ বলেছেন—যিনি নির্গুণ নিরাকার তিনিই আমার গুরু।—

রহিতা-গুণ-আকার-কা সো গুরু হমারা॥

তুমিই আমার গুরুদেব। তোমার নামই আমার সব-কিছু। তুমিই পূজা, তুমিই সেবা, তুমিই শাস্ত্র, তুমিই দেবতা, যোগ যজ্ঞ সাধন জপ তুমিই, তুমিই আমার আত্মীয়াধিক পরমাত্মীয়। তুমিই তপস্যা তীর্থ-ব্রত তীর্থস্নান, তুমিই জ্ঞান, তুমিই ধ্যান। বেদ বিচার পুরাণপাঠ তুমিই, তুমিই দাদূর ইহপরকালের অন্ন, তুমিই দাদূর প্রাণস্বরূপ।—

তূঁহী-তূঁ গুরুদেব হমারা।
সব কুছ মেরে নাউঁ তুম্হারা॥
তূঁ হী পূজা তূঁ হী সেবা।
তূঁ হী পাতী তূঁ হী দেবা॥
জোগ জজ্ঞ তূঁ সাধন জাপ।
তূঁ হী মেরে আপহি আপ॥
তপ তীরথ তূঁ ব্রত অসনানা।
তূঁ হী জ্ঞানা তূঁ হী ধ্যানা॥
বেদ ভেদ তূঁ পাঠ পুরানা।
দাদূ-কে তুম্হ পিংড পরানা॥

মন থেকে অহঙ্কার দূর করলেই ভগবানকে পাওয়া যায়। "আমার মলিন বস্ত্র ছাড়্‌তে হবে এ মোর অহঙ্কার!" "যখন আমার এই আমি আমি দূর হবে, তখন দেখ্‌তে দেখ্‌তে আনন্দময় রাজার সঙ্গে ত্বরিত মিলন ঘটবে।"

জব যহ মৈঁ মৈঁ মেরী জাই।
তব দেখত বেগি মিলই রামরাই॥

আত্মম্ভরিতাতেই আত্মহত্যা ঘটে, অহং আমারই বিনাশ ঘটায়। অহংই আমার কাল, দাদূ এই কথা বুঝিয়ে বল্‌ছেন।—

আপই মারই আপ-কো, আপ আপ-কো খাই।
আপই অপনা কাল হৈ, দাদূ কহ সমুঝাই॥

যেখানে রাম থাকেন সেখানে আমি থাকে না, যেখানে আমি আছে, সেখানে রাম নেই। হে দাদূ, স্থান অতি সূক্ষ্ম, দুয়ের ঠাঁই একসঙ্গে হয় না।—

জহাঁ রাম তহঁ মৈঁ নহীঁ, মৈঁ তহঁ নাহীঁ রাম।
দাদূ মহল বারীক হৈ, দুই-কো নাহীঁ ঠাম॥

ভগবানকে পাওয়ার একমাত্র উপায় ভগবান ভিন্ন অপর সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করা।

যা আমি হাত থেকে ছেড়ে দি তা তুমি হস্ত প্রসারিত ক'রে তুলে নাও; যা আমি ফিরে পাই তা তুমি প্রীতিভরে একেবারে ঢেলে দাও।

জো হম ছাড়হিঁ হাথ তেঁ সো তুম লিয়া পসার।
জো হম লেহিঁ প্রীতি-সোঁ, সো তুম্হ দীয়া ডার॥

"দিলেম যা রাজ-ভিখারীরে,
স্বর্ণ হ'য়ে এলো ফিরে;
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভ'রে—
তোমায় কেন' দিইনি আমার
সকল উজাড় ক'রে!"

মানুষ সংসারের জীব হ'য়েও বিষয়াসক্ত হবে না, যেমন রক্তকুমুদ মলিন জলে উৎপন্ন হ'য়েও জল থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নির্মল পবিত্র থাকে,—চন্দ্রের সঙ্গেই যে তার প্রেম, মলিন জলের সঙ্গে তো নয়।

লাল কমল জল ঊপজই ক্যোঁ সো জুদা জল মাহিঁ।
চংদ হিতে আহি প্রীতড়ী যোঁ জল সেতী নাহিঁ॥

মানুষ তো প্রকৃত শুভ-অশুভ সুখ-দুঃখ নির্ণয় কর্‌তে পারে না; তাই তার নিরাপদ পন্থা হ'চ্ছে জ্ঞানময় ও দয়াময় বিধাতাকে শুধু বলা—যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব—যাহা আমাদের মঙ্গলকর ব'লে তুমি জানো তাই আমাদের দাও, আমরা যা প্রার্থনা করি তা নয়, কারণ আমরা

যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

তখন চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে স্বীকার কর্‌তে হয়—

আমি সুখ ব'লে দুখ চেয়েছিনু,
তুমি দুখ ব'লে সুখ দিয়েছ।

যা যথাতথ বিধান হবার তা তো হ'য়েই রয়েছে; অতএব সুখ-দুঃখ বাছাই কোরো না; কারণ সুখ খুঁজ্‌তে গিয়ে দুঃখ পাওয়া কিছু অভাবনীয় নয়; তোমার মুখ্য কর্তব্য কেবল প্রিয়কে বিস্মৃত হ'য়ো না, তিনিই তোমার কল্যাণ বিধান কর্‌বেন।

হোনা থা সো হোই রহ্যা,
জিন বাঁছে সুখ দুখ।
সুখ মাঁগে দুখ আইসী,
পিয় ন বিসারী মুক্ষ॥

জীবনকে সর্বদা সচেতন রাখতে হবে; যার বুদ্ধি মুক্ত ও চিত্ত প্রবুদ্ধ তার কাছে কোন অকল্যাণ ঘেঁষ্‌তে পারে না। তাই দাদূ বলেছেন—

জাগ্রত জনের কাছ থেকে কেউ কখনো কিছু চুরি ক'রে নিতে পারে না। জাগ্রত জ্ঞানী তার সম্পত্তি রক্ষা ক'রে পাহারা দেয়, চোর তার কাছে ঘেঁষ্‌তে পারে না।

জাগত-কো কদী ন মুসই কোই।
জাগত জানি জতন করি রাখই,
চোর ন লাগূ হোই॥

সুপ্ত হ'লে বাদশাহও রক্ষা পায় না, চোর ঘেরাঘরে চুরি করে; আশে পাশে কেউ যদি পাহারা না থাকে তবে সব সম্পত্তি অপহৃত হ'য়ে যাবে।

সোব্‌ত সাহ বস্ত নহিঁ পাব্‌ই,
চোর মুসই ঘর ঘেরা।
আসিপাসি পহরো কোউ নাহী,
বস্তু কীন্‌হ নবেরা॥

সাধারণ মানুষ অন্ধের মতো, তাই বিশ্বের সৌন্দর্যরসের আনন্দাস্বাদ তারা পায় না।

জড়মতি জীব জানেই না তাতে পরম স্বাদ-সুখ আছে। জাগ্রত হ'য়ে যে আনন্দ করে সেই সুখস্বাদ পায়। সুপ্ত থেকে

সুখ পাবে না, প্রেম হ'লেই তবে মিলনের বাধা অপসারিত হয়।

> অড়মত জিব জানই নহী পরম স্বাদসুখ জাই।
> জাগত জো আনঁদ করই সো পাবই সুখস্বাদ।
> সূতে সুক্খ ন পাইয়ে, প্রেম গবাঁয়া বাদ॥

দাদূ সর্ব্বধর্ম্মের সারগ্রাহী ও সর্ব্বজনের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু তবু গোঁড়া লোকেরা তাঁকে দেখ্‌তে পারত না, তাঁর নিন্দা করত। কিন্তু দাদূ দয়াল নিন্দুকেরও প্রশংসা ক'রে বলেছেন—

আমার নিন্দুক মহাবীর, তিনি বিনা পারিশ্রমিকে বিচার করেন; কোটি কর্ম্মের সঞ্চিত পাপ তিনি পরিষ্কার করেন; বিনা লাভে তিনি পরের উপকার করেন। তিনি আপনাকে ডুবিয়ে পরকে উদ্ধার করেন; এমনি প্রিয়তম তিনি যে মজ্জমানকে তিনি পারে উত্তীর্ণ ক'রে দেন। আমার নিন্দুক যুগ যুগ জীবিত থাকুন। হে আনন্দময় দেবতা, তোমাকে আমি তাঁর জন্যই দেখ্‌তে পাই। নিন্দুক বেচারা পর-উপকারী; হে দাদূ, তিনি আমার নিন্দা ক'রে থাকেন।

> নিংদক বাবা বীর হমারা।
> বিনহী কৌড়ে বহই বিচারা॥
> কর্ম কোটি-কে কসমল কাটই।
> কাম সঁবারই বিনহী সাটই॥
> আপন ডুবই ঔর-কো তারই।
> অইসা প্রীতম পার উতারই॥
> জুগ জুগ জীবউ নিংদক মোরা।
> রাম দেব তুম্‌হ করউ নিহোরা॥
> নিংদক বপুরা পরউপকারী।
> দাদূ নিংদা করই হমারী॥

দাদূ জেনেছিলেন ধর্ম্মপথ বিপদসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ দুঃখময়।

> "সংসার-পথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে।"

ধর্ম্মের মহত্ত্বই এইখানে যে ধর্ম্ম মানুষকে দুষ্কর কাজ করতে বলে, মহৎ আদর্শের অনুসরণ করবার পথের দুঃখ ও বিপদকে অগ্রাহ্য করতে বলে। যা সহজ, ধর্ম্ম যদি আমাদের কেবল তাই করতে বলত তাহ'লে মানুষের উন্নতি হ'তো না। অতএব সকলকেই বীরব্রতী হ'য়ে সত্য ও ধর্ম্মের সাধনা করতে হবে।

শূরবীর যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম করেন, স্বামী তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হন এবং শূরের সঙ্গে স্বামীর মিলন ঘটে। হে দাদূ, তুমি কেবল ব'সে ব'সে সময় খেয়ো না।

> সূরা জুঝহি খেত-মেঁ, সাঁই সনমুখ আই।
> সূরে-কো সাঁই মিলই, দাদূ কাল ন খাই।

যে আত্মা ঝঞ্ঝা-বিজয়ী তাতেই আনন্দ-ভাব নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়।—

> ঝংঝা-বিজয়ী আতমা উপজা আনন্দ-ভাব্।

দাদূ পরম-সুন্দরের পূজারী ছিলেন।—তিনি নিত্য নিরন্তর ভগবানের ঐশ্বর্য্যে লীলায় সৌন্দর্য্যে আনন্দে অবগাহন ক'রে থাকতেন; তাঁর প্রাণমন সেই চেতনায় পরিপূর্ণ হ'য়ে থাকত। রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেছেন—

> "বাতাস জল আকাশ আলো
> সবারে কবে বাসিব ভালো,
> হৃদয়-সভা জুড়িয়া তারা
> বসিবে নানা সাজে।"

দাদূ এই সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে তাঁর অন্তরের অনুভব প্রকাশ করেছেন—

হে মোহন, এই যে সব ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড পরম সৌন্দর্য্য-লীলায় উৎসবময়, এ তোমারই লীলা, আমাকে এতে মুগ্ধ করছে। বাতাস জল রবি চন্দ্র সবাই মৌন থেকেও আমাকে মুগ্ধ করছে হে পরমেশ্বর!

> যে-সব চরিত তুম্‌হারে মোহন মোহে সব ব্রহ্মংড-খংডা।
> মোহে পবন পানী পরমেশ্বর সব মুনি মোহে রবি চংদা।

সপ্তসাগর ধরণীধর অষ্টকুলাচল মেরু পর্ব্বত আমাকে মোহিত করছে। হে জগৎজীবন, তোমারই ভবন এই ত্রিভুবন আমাকে মোহিত করছে। সকল সৌন্দর্য্যে নিরন্তর তোমারই পূজা ও সেবা শোভা পাচ্ছে।

> সায়র সপ্ত মোহে ধরনীধরা অষ্টকুলা পরবত মেরু মোহে।
> তিনলোক মোহে জগজীবন সকল ভবন তেরী সেব্ সোহে॥

অগম্য অগোচর অপার অসীম এই তোমার লীলা যে না দেখলে সে হতভাগ্য পরম বঞ্চিত। হে সুন্দর, কি

অপরূপ শোভায় তোমায় শোভিত দেখ্‌ছি। দাদূ যে কি ব'লে এর প্রশংসা কর্‌বে তা তো জানে না।

> অগম অগোচর অপার অপরংপার
>
> জো য়হ তেরে চরিত ন জানহিঁ।
>
> য়হ সোভা তুম্হ-কো সোহই সুন্দর,'
>
> বলি বলি জাউঁ দাদূ ন জানহিঁ॥

তাঁরই জ্যোতিতে কোটি রবি আকাশের নীল সরোবরে পদ্মের ন্যায় ফুটে উঠেছে আর তাদের অঙ্গে অঙ্গে অনন্ত তেজ ঝলমল কর্‌ছে। সেই মোহন আমার হৃদয়-মন্দিরে এসেছেন, আমার তনু মন জীবন তাঁকে সমর্পণ না ক'রে কেমন ক'রে থাকি?—

> "রাজার দুলাল গেল চলি মোর
>
> ঘরের সমুখ-পথে –
>
> মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
>
> রহিব বলো কী মতে?"

হে দাদূ, সুন্দর সুখ লাভ হ'য়েছে, যুগ যুগ এই রসরঙ্গ চল্‌ছে।

> পদম কোটি রবি ঝিলমিলে অংগ অংগ তেজ অনংত।
>
> সো মন্দির মোহন আবিয়া বারউঁ তন মন জীব॥
>
> দাদূ সুন্দরী সুখ ভয়া জুগ জুগ য়হ্‌ রসরংগ॥

তোমার সৌন্দর্য্যরসে ডুবেই সব কিছু সুন্দর, তাই সব অতি সুন্দর লাগে; তিনি যদি তাঁর সুন্দর শোভা কেড়ে নেন তা হ'লে জগতের সকল সৌন্দর্য্যই চ'লে যায়

> তেরী খুবী খুব হৈ, সব নীকা লাগই।
>
> সুন্দর সোভা কাঢ়ি লে, সব কোই ভাগই॥

কিন্তু রস-সাধনের প্রধান সহায় হ'লো রস। যার হৃদয়ে রস নেই সে রসানুভব কর্‌তে পারে না। রসেই রসের বর্ষণ হয়—রস হী মেঁ রস বরসিহই—যেমন পথের শুষ্ক ধূলায় একবিন্দুও শিশির থাকে না, কিন্তু পথের ধারের সরস ঘাসের উপর মুক্তা-বর্ষণ হ'য়ে যায়।

হে দাদূ, মন চিত্ত ধ্যান লাগিয়ে শ্রাবণের হরিৎ শোভা দেখ। কত যুগ কেটে গেছে তবু ধরিত্রীর হরিৎ শোভা তো গেল না। হে দাদূ, হৃদয়ের সব রস যখন বিলীন হ'য়ে যায় তখন মন পঙ্গু হ'য়ে পড়ে, কায়া থাকে নবযৌবনে ভরা কিন্তু মন যায় বুড়া হ'য়ে।

> সাব্‌ন হরিয়রি দেখিয়ে মন চিত ধ্যান লগাই।
>
> দাদূ কেতে জুগ গয়ে তোভী হর্‌য়া ন জাই॥
>
> দাদূ মন পংগুল ভয়া সব রস গয়া বিলাই।
>
> কায়া হৈ নব্‌ যোবন য়হ মন বূঢ়া হোই যাই॥

জ্ঞানের অগম্য বিশেশ্বর আকাশে বিরাজমান। ধরিত্রী অসীম অনন্তের খবর না জেনেও হরিৎ পট্টবসন পরিধান ক'রে অপরূপ প্রসাধন কর্‌ছে। পৃথিবী অনন্ত অপার ফুলে ফলে সুশোভিত হ'য়ে বসুধা হ'য়ে উঠেছে। গগন পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের জয়জয়কার-ধ্বনিতে জলস্থল পূর্ণ কর্‌ছে। কালের মুখে কালী দিয়ে স্বামী নিরন্তর সুকাল ও উৎসবময়। তোমার ঘরে প্রেমের সৌন্দর্য্যের আনন্দের মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে, দীনদয়াল এবার বর্ষণ কর্‌বেন।

> অজ্ঞা অপরংপার-কী বসি অংবর ভরতার।
>
> হরে পটংবর পহিরি করি ধরতী করই সিংগার॥
>
> বসুধা সব ফুলৈ ফলই পৃথিবী অনংত অপার।
>
> গগন গরজি জল থল ভরে দাদূ জয়জয়কার॥
>
> কালা মুহ করি কালকা সাঈঁ সদা সুকাল।
>
> মেঘ তুম্হরে ঘর ঘনা, বরসহু দীনদয়াল॥

এই সৌন্দর্য্য আনন্দ ও প্রেমের রসাস্বাদ মানুষকে সচল সক্রিয় গতিবান করে—অগ্রসর ক'রে উন্নতির দিকে নিয়ে চলে। প্রেম মানুষের একাধারে আশ্রয় এবং প্রাগ্রসর যাত্রার প্রেরণা—প্রেম গতি বিসরাম। তাই তো—মধুর নামের জন্য তাকে ভজনা করি, গতির নিমিত্ত তাকে ভজনা করি, প্রেমের নিমিত্ত তাকে ভজনা করি। এমনি ক'রেই রস সুন্দর হ'য়ে ওঠে।—

> নাবঁ নিমিত্ত সোই ভজই, গতি নিমিত্ত ভজই সোই।
>
> প্রেম নিমিত্ত সোই ভজই, সো রস সুন্দর হোই॥

কিন্তু যিনি অসীম অনন্ত তাঁকে তো সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। তাই জীবনের গতিরও বিরাম নেই, অশেষের সন্ধানেরও শেষ নেই—

> "শেষ নাহি যে শেষ-কথা কে বলবে?"

আবার—

> "শেষের মধ্যে অশেষ আছে।"

তাই মানব-মন চিরবিরহী, না-পাওয়ার বেদনায় হাহাকার ক'রে মরে—

"তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর,
যবে আমার জনম হবে ভোর।"

তখন ভক্ত অসীমকে অন্তর-সীমায় ধর্‌তে না পেরে বিরহ-ব্যথায় ক্রন্দন করে—

আজও আমার কঠোর প্রাণ বাহির হ'য়ে গেল না, আমার সুন্দর প্রিয়তমের দর্শন বিনা বহুদিন অতীত হ'য়ে গেল। চার প্রহর যেন চার যুগ ব'লে মনে হ'চ্ছে, রজনী জাগরণে ভোর হ'লো—"জাগি পোহাল বিভাবরী"—তার নাগাল তো আজও পেলাম না, সেই চিত্তচোর কোথায় রইলো? কখনো নয়ন তাকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখ্‌তে পেলে না, পথের উপরে দৃষ্টি বিস্তারিত ক'রে রেখেছি। দাদূ এমন আতুর বিরহিনী— যেমন চাঁদের সুধার জন্ম চকোর।

অজহুঁ ন নিকসে প্রাণ কঠোর।
দরসন বিনা বহুত দিন বীতে সুংদর প্রীতম মোর।
চার পহর চারহু জুগ বীতে রৈন গঁবাঈ ভোর॥
অবধি গএ অজহুঁ নহিঁ আএ কতহুঁ রহে চিতচোর।
কবহুঁ নৈন নিরখি নহিঁ দেখে, মারগ চিতবত তোর।
দাদূ অইসহি আতুরি বিরহিনি, জইসহি চংদ চকোর॥

দর্শন দেও, দর্শন দেও। আমি তো তোমারই, আমি তোমারই থাক্‌তে চাই, আমি তো মুক্তি চাই না। আমি সিদ্ধি চাই না, ঋদ্ধি চাই না, হে গোবিন্দ, আমি কেবল তোমাকেই চাই। আমি যোগ চাই না, ভোগ চাই না, হে আনন্দময়, কেবল তোমাকেই চাই। আমি ঘর চাই না, বর চাই না, তোমাকেই চাই হে পরমদেবতা। দাদূ তোমা বিনা আর কিছু জানে না, দর্শন প্রার্থনা কর্‌ছে, দর্শন দাও হে।—

দরসন দে, দরসন দে।
হোঁ তো তেরী, মুকতি ন মাগৌ রে॥
সিধি ন মাগৌ, রিধি ন মাগৌ, তুম্‌হহী মাগৌ গোবিন্দা।
জোগ ন মাগৌ, ভোগ ন মাগৌ, তুম্‌হহী মাগৌ রাম জী॥
ঘর নহিঁ মাগৌ বর নহী মাগৌ, তুম্‌হহী মাগৌ দেবজী।
দাদূ তুম্‌হ বিন ঔর ন জানৈ, দরসন মাগৈ দেহ জী॥

দাদূর প্রতি রোমে রোমে রসের পিপাসা চীৎকার কর্‌ছে। হে সৃষ্টিকর্তা আনন্দময়, হৃদয়ে ভাবের ঘনঘটা ঘনিয়ে তুলে রস বর্ষণ করো—

"মহারাজ কেব্‌াড়িয়া খোলো, রস-কী বূঁদ পড়ে।"

হে রসময়, এই রসের প্রীতি আমার পঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং প্রতি রোমে রোমে প্রিয়তম প্রিয়তম ক'রে চীৎকার কর্‌ছে, আর কোনো ডাক তার নেই। তোমার প্রেমে আমার সকল দেহ রসনাতে পরিণত হয়েছে, সকল দেহ রসনা হ'য়ে গান গাচ্ছে, সকল দেহ নয়নময় হ'য়ে তোমার অপরূপ অনন্ত রূপ সম্ভোগ কর্‌তে চায়—ওরে দাদূ, এই বিরহ হয়েছে ব'লেই তো এই রূপ-বৈচিত্র্য দেখ্‌তে পেলাম—এই রকমই তো বিরহের দৃষ্টি।—

রোম রোম রস প্যাস হৈ দাদূ করই পুকার।
রাম ঘটা দিল উমগি করি, বরসহু সিরজনহার॥
প্রীতি জো মেরে পীবকী পইঠি পংজর মাহি।
রোম রোম পিব পিব করই, দাদূ দুসর নাহি॥
সব ঘট রসনা সুরতি-সোঁ, সব ঘট রসনা বৈন।
সব ঘট নৈনা হোই রহই, দাদূ বিরহা ঐন।

আত্মার ক্ষুধা অপরিমিত। মহাত্মা দাদূ তাই বলেছেন—

আমি পবন জল সব পান করেছি, ধরিত্রী আকাশ চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি এই পাঁচ মিলে আমার একটি গ্রাস মাত্র।—

পব্‌না পানী সব পিয়া ধরতী অরু আকাস।
চংদ সুর পাব্‌ক মিলে পাঁচো এক গরাস॥

হে আল্লা, নীলমণিতে গড়া আকাশ-পেয়ালা আলোর রসে ভ'রে ভ'রে আমাকে পান করাও।—

আল্লা আলে নূর-কা ভরি ভরি প্যালা দেহ।

বিপুলাত্মা বিশ্বের সমস্ত কিছুকে উপভোগ কর্‌তে চায়; এই হ'লো মহৎ চিত্তের আশা। বিশ্বানুভূতির প্রসব-বেদনা মহৎ চিত্তকে উতলা ক'রে তোলে।—

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্দ্ধ শিখা জ্বালি' চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

যতক্ষণ অনুভবের আনন্দ আপনাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ কর্‌তে না পারে, ততক্ষণ মনের মধ্যে গুঞ্জগুঞ্জনের দুঃখ-ভোগের আর শেষ থাকে না।—

পার ন দেবই আপনা গুপ্ত গুঁজ মন মাহিঁ।

যিনি আনন্দরস পান করেছেন তিনিই জল্‌ছেন, কারণ তিনি যে তখনও গভীর অন্তরের গুঞ্জনধ্বনি প্রকাশ ক'রে জানাইতে পারেন নি।—

সোই সেবক সব জরই জেতা রস পীয়া।
দাদূ গূংজ গভীরকা পরকাস ন কীয়া॥

আমি যেমন অনন্তকে পাবার জন্য লালায়িত তিনিও তেমনি আমাকে পাবার জন্য ভিখারী। তাই কবীর বলেছিলেন।

মোর ফকিরুয়া মাংগি জায়,
মৈ দেখা দেখহু ন পৌলোঁ।
মংগন-সে ক্যা মাংগিয়ে,
বিন মাংগে জো দেয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"ওগো ভিখারী, আমায় ভিখারী করেছ
আরো কি তোমার চাই?"
"তাই তোমার আনন্দ আমার পর,
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হ'তো যে মিছে।" •

দাদূও বলেছেন—আমি যদি না থাকি তো ভগবানের অস্তিত্ব কোথায়? নাম উচ্চারণের দ্বারাই তো নাম-স্বরূপের নামের সার্থকতা। আমি ছাড়া সেই সার্থকতা কেমন ক'রে হবে।—

মৈ নাহী তব ন্যায়, ক্যা কহা কহাবৈ আপ।

যেমন নাদ ছাড়া শ্রুতি ও শ্রুতি ছাড়া নাদ ব্যর্থ, যেমন নয়ন ছাড়া রূপ ও রূপ ছাড়া নয়ন ব্যর্থ, রসনা বিনা স্বাদ ও স্বাদ বিনা রসনা যেমন ব্যর্থ, তেমনি সকল আমাতে ও তাঁতে। হে দাদূ, এ এক অনুপম বৃত্ত।—

শ্রবণা রাতে নাদ-সোঁ নৈনা রাতে রূপ।
জিহ্বা রাতী স্বাদ সোঁ দাদূ এক অনূপ।

আমাকে আশ্রয় ক'রে আপনাকে প্রকাশ করবার জন্য স্বয়ং ব্রহ্ম জ্বালায় জল্‌ছেন।—জল্‌ছেন সেই নাথ নিরঞ্জন, জল্‌ছেন সেই অলক্ষ্য অভেদ; জল্‌ছেন সেই সকল-যোগী-জনজীবন, জল্‌ছেন সেই জগতের দেবতা; জল্‌ছেন যিনি পরম প্রকাশ, জল্‌ছেন সেই পরম জ্যোতির্ময়; জল্‌ছেন সেই যিনি পরম আশ্রয়, জল্‌ছেন সেই পরম বিলাস।

জরই সো নাথ নিরংজন বাবা, জরই সো অলখ অভেব্।
জরই সো জোগী-সবকা জীবনি জরই সো জগমে দেব্॥
জরই সো পরম প্রকাশ হৈ, জরই সো পরম উজাস।
জরই সো পরম নিবাস হৈ, জরই সো পরম বিলাস॥

অতএব ব্রহ্মের জ্বালা থেকে আপন জ্বালা গ্রহণ করো, তাঁর দীপশিখার সঙ্গে তোমার চিত্তপ্রদীপ মিলিত ক'রে তোমার দীপের মুখে শিখা জেলে তোলো; চন্দ্রালোকের মতো তাঁর দয়াও আছে, কিন্তু রসমন্দিরে যেতে হ'লে এই দীপকে কর্‌তে হবে সাথী।

"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো,
আলো রে তারে বিরহানলে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা,
এই কি ছিল ললাটে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।"

দীএ দীজা কীজিয়ে গুরমুখ মারগ জাই।
দাদূ জগমে চাঁদনা, দীয়া চালই সাথি॥

পরমাত্মার সঙ্গে তোমার প্রাণকে সংযুক্ত করো, তাঁর সঙ্গীতে তোমার যন্ত্রের সুরটি বেঁধে নাও; তোমার এই মন সেই মননের সঙ্গে বেঁধে নাও, তোমার চিত্তকে সেই চৈতন্যে আশ্রিত করো।—

সবহৈ সবদ সমাইলে পরমাতম সোঁই প্রাণ।
য়হ মন মন-সোঁ বাঁধি লে, চিত্তই চিত্ত-সোঁ জান॥

তাঁর সহজে আপন সহজ মিলিয়ে দাও, তাঁর পরম জ্ঞানের সঙ্গে তোমার জ্ঞানের বন্ধন ঘটাও, তাঁর সর্ব-

দ্রষ্টার দৃষ্টিতে আপন দৃষ্টি মিলিত করো, তাঁর ধ্যানে বাঁধো তোমার আপন ধ্যান।

> সহজই সহজ সমাই লে জ্ঞানই বাঁধা জ্ঞান।
> দৃষ্টিই দৃষ্টি সমাই লে ধ্যানই বাঁধা ধ্যান॥

তাঁর ভাবের সঙ্গে তোমার ভাব মিলাও, তাঁর ভক্তির সঙ্গে তোমার ভক্তি সমান কোরে তোলো; মনে মনে মিলিয়ে দাও, তাঁর প্রেমের সুরে তোমার প্রেমের সুরটি বেঁধে আনন্দরস পান করো।

> ভাবই ভাব সমাই লে, ভগতই ভগতি সমান।
> মনহি মন সমাই লে, প্রীতি প্রীতি রস পান॥

ওস্তাদ কালোয়াৎ যখন বীণাযন্ত্রে সুর বাঁধেন, তখন বীণার তারে বড়ো টান লাগে, অঙ্গুলির আঘাতে যন্ত্রনা বাজে, কিন্তু সেই বেদনাই বীণার বুক থেকে মধুর সঙ্গীত হ'য়ে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে। ওস্তাদের অন্তরের রসবোধের আকৃতি বীণার বেদন-ঝঙ্কারে প্রকাশ পায়। বিশ্বেশ্বর আমাকে আপন বীণা ক'রে আপন কোলে বামে রেখে বাজাচ্ছেন, আর আমি বাজ্‌ছি। এখান হ'তেই সেই অসীমসুর ধ'রে নাও। আনন্দময়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল সাধুভক্তের হৃদয় বাজ্‌ছে। হে গুরু, আমাকে শীঘ্র আমার সুরটি দাও।—

> বাঁধে সুরধ্রু বাঁয়ে বাজই ইহবু সো ধর লীজহু।
> রাম সনে হি সাধু বাজে, বেগ মোহি কলি দীজহু॥

রবীন্দ্রনাথও এই রসানুভূতি থেকে বলেছেন—

> "আমারে করো তোমার বীণা,
> লহ গো লহ তুলে।
> উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি
> মোহন অঙ্গুলে॥"

আর—

> "যখন তুমি বাঁধ্‌ছিলে তার,
> সে যে বিষম ব্যথা।
> আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
> সকল দুখের কথা॥"

যখন অসীমের সৌন্দর্য্য ও আনন্দানুভূতিতে চিত্ত আবিষ্ট হ'য়ে যায়, তখন মন থেকে সকল খণ্ডতার বোধ দূর হ'য়ে যায়, সকল চিহ্ন একের ভাবে লুপ্ত হ'য়ে যায়। সেখানে জন্ম মরণ এক ঠাঁই থাকে, ইহ-পরকালের ভেদ ঘুচে যায়—জিবন মরন তিস ঠৌর; সেখানে মৃত্যু অমৃত হয়, দুঃখ দুঃখাতীত হয়—

> মরনা ভাগা মরনতেঁ দুক্‌হি ভাগা দুক্‌খ।

এই একরসের অচিন্ত্য ধামের সংবাদ দাদু পেয়েছিলেন—

> চল দাদু তহঁ জাইয়ে, মরই ন জীবই কোই।
> অবাগমন ভয় কো নহীঁ, সদা একরস হোই॥

হে দাদু, চলো সেখানে যাই, যেখানে কেউ মরেও না বাঁচেও না, যেখানে গমনাগমনের ভয় নেই, যেখানে সর্ব্বদা একরস প্রবাহিত হ'চ্ছে।

> চল দাদু তহঁ জাইয়ে, চংদ সুরজ নহিঁ জাই।
> রাত দিবস-কী গম নহীঁ, সহজহিঁ রহা সমাই॥

চলো দাদু, সেই দেশে যাই যেখানে চন্দ্র নেই সূর্য্য নেই, রাত্রি ও দিবসের গতি নেই, যেখানে সহজ অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে রয়েছে।

> এক দেস হম দেখিয়া ঋতু নহি পলটই কোই।
> হম দাদু উস দেস-কে সদা একরস হোই॥

আমি এমন এক দেশ দেখেছি যেখানে ঋতুপর্য্যায় নেই; আমি দাদু সেই দেশের, সদা একরস হয়ে আছি।

> বেদ কোরান-কা গম নহীঁ তহঁা কিয়া পরবেস।
> তহঁ কুছু অচরজ দেখিয়া, যহ কুছু ঔরহি দেস॥

সেই বেদ-কোরানের অগম্য দেশে প্রবেশ ক'রে দেখ্‌ছি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য লীলা, এ দেশ একবারে এক স্বতন্ত্র দেশ!

যত মানুষ তত সম্প্রদায়। এমনি ক'রেই বিধাতা বৈচিত্র্য রচনা করেছেন। সকল সম্প্রদায়ের সব প্রণতি

মিলে একটি মহাপ্রণতির ধারা হরি-সাগরের দিকে চলেছে। তাই অনন্তের লীলায় অভিভূত প্রাণ মন তাঁর সম্মুখে প্রণত হ'য়ে বলে—নমস্তেঽস্তু – তোমাকে আমার প্রণাম সত্য হোক। তুমি হরি—প্রাণমন হরণকারী, তুমি নারায়ণ নরগণের গতি ও আশ্রয়, তুমি সর্ব্বব্যাপী জগদীশ্বর, তুমি জীবের ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করেছ, তুমি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভাব্য সুন্দরী প্রকৃতি সৃষ্টি করেছ, তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি।—

নমোঁ নমো হরি নমো নমো।
তাহি গোসাঈঁ নমো নমো॥
অকল নিরংজন নমো নমো।
সকল-বিয়াপী জে হি জগ কীন্‌হা
নারায়ণ নিজ নমো নমো।
শ্রবন সবাঁরি নইন রসনা
মুখ অইসো চিত্র কিয়ৌ।
ধরতী অংবর সুর চংদ, জিনি পানী পব্‌ন কিয়ৌ॥
নমো নমো হরি নমো নমো।
নারায়ণ নিজ নমো নমৌ॥*

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

* এই প্রবন্ধ রচনায় মধ্যযুগের সাধকদের বাণীর শ্রেষ্ঠ রসিক সংগ্রাহক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের বাংলা ইংরেজী রচনা থেকে আমি প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করেছি; উদ্ধৃত তাঁর কাছে, প্রবাসীর ও Visva-Bharati Quarterlyর সম্পাদক মহাশয়দের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

শিশু-মনের চলচ্চিত্র

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ এম্-এ, বি-এল

১
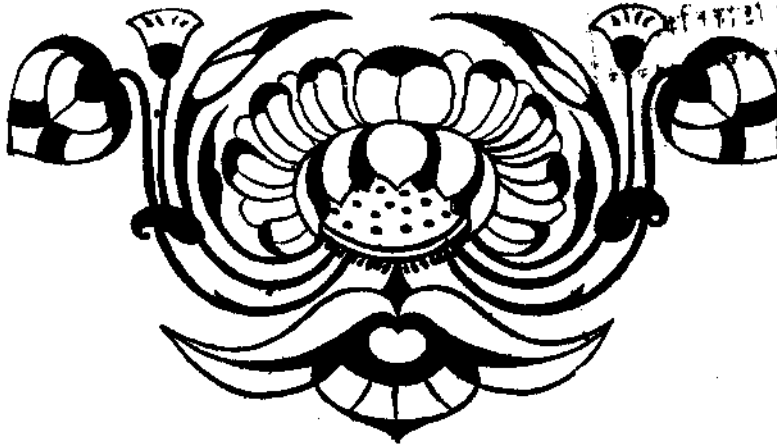
মামাবাড়ী !—

কথা শুনিতেই মন যেন অকারণে খুসী হইয়া ওঠে। মামাবাড়ী-নামের মধুরতা অব্যক্ত। মরমীর দরদ দিয়া অনুভব করিতে হয়।

বর্ত্তমান বয়সের ভাষায় বলিতে পারি—যেন ঊষার প্রথম আশিসের মত স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন, যেন বাদলদিনের কাজলরাতের মত চিরবাঞ্ছিত, প্রিয়ার প্রেমোচ্ছ্বসিত উষ্ণ-স্পর্শের মত অপূর্ব্ব ও অনুপম।

কাছে নয়,—দূরে।

পাশে যাহা থাকে, তাহার সুষমা মনকে ভুলায় না। অজানার মাঝে যেন কোনও মধু লুকাইয়া থাকে, রূপকথায় তাই অচিন-দেশের রাজপুত্র চাই!

শ্যামা বাংলার কলনাদিনী নদী।—

কত যে তার ভঙ্গী, কত যে তার রঙ্গ। বাঁকে বাঁকে তার নূতন রূপ, বীচিকল্লোলে তার পলে পলে নূতন সুর। যতই চলি, ততই যেন স্বর্গ-পরীর যাদু মেলে।

ধানের ক্ষেত, পাটের ক্ষেত, খামার-বাড়ী, নদীর ঘাট, পথিক-চলা বাট, ধূ ধূ উদাস মাঠ, নৌকার পাল, জেলের ডিঙি, মাছধরা জাল, হাঁড়িভরা কুমারের হাটুরিয়া নৌকা শিশু-মনে কত কৌতূহল জাগাইয়া তোলে। মায়ে কোলে ঘুম আসে না।—প্রশ্নে প্রশ্নে জ্বালাতন হইয়া ওঠেন মা।

মামা বাড়ীতে দুই-নৌকা লোক চলিয়াছি। ঘোমটা-পরা মামীরা ঘোমটা খুলিয়া পৃথিবীর মুক্ত রূপ দেখছেন। পিছনে বাপের ঘরের আদর, সম্মুখে অনিশ্চিত শঙ্কা।

ছোট মামীর মন তাঁর ছোট ভায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। আমায় আদর করিয়া ডাকিলেন, "খোকা আমার কোলে এস।" আমি তখন ৭।৮ বৎসর বয়সের মালিক। খোকা অপবাদ গায়ে তুলিতে চাই না। তাই মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলাম, "আমি খোকা নই, আমি অজিত।"

মায়ের মুখে হাসির প্রসন্ন আভা ঝলকিয়া গেল। মেয়েরা সব হাসিয়া কুটি-কুটি হইল।

সন্ধ্যা নামে।

মাঠে মাঠে ধানের শীষে গোধূলির রক্ত আলোক দোল দিয়া যায়। আকাশ-পথে বকেরা ঘরে ফিরিয়া চলে; নদীর নিস্তরঙ্গ জলে বকদের সেই উড়ন্ত রূপ নাচিতে থাকে। দূরে গ্রামের মন্দিরে সন্ধ্যারতির বাজনা বাজে, তরুবীথির ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে।

ছোট মামা পায়ে পট্টি বাঁধিয়া মালকোঁচা মারিয়া বন্দুক হাতে ছইয়ের উপর বসেন। পথে সব ডাকাতের ভয়—গা ছম-ছম করিয়া ওঠে! বন্দরে নৌকা ভেড়ে; তীরে রাত্রির মায়া চলে।

আজিমার কোলে মাথা দিয়া গল্প শুনি।

আজিমার শান্ত মধুর রূপ আমার জীবনে ভুলিব না। করুণা-প্রশান্ত হাস্যবিভাত তাঁর সঙ্গ যেন এক আনন্দের লোকে লইয়া চলে। কতদিন কত যে কথা, কত যে কাহিনী, কত যে পুরাণ, কত যে গান তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, আজিও হয়ত মর্মচৈতন্যে তাহারা লুকাইয়া রহিয়াছে।

রূপকথা বাঙ্গালীর ছেলেরা এখনও শুনিতে পায় কিনা জানি না। বর্ত্তমানের বধূ ও গৃহিণীরা নভেল পড়িয়া কাল কাটান; দেশের যে প্রাচীন ভাবধারা যুগে যুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া আসিয়াছে তাহার সহিত নবীনাদের যোগ নাই।

যৌবনের তটপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কতবার ভাবি—যদি আবার রূপকথার শৈশবে ফিরিতে পারিতাম।

পক্ষীরাজ ঘোড়া!

তেপান্তর মাঠ ছাড়াইয়া, মরু-কান্তার ভেদিয়া কত অচিন দেশে সে ছুটিয়া চলে। মনের পটে কত আধ-জাগা ছায়া জাগে।

রাজপুত্তুর ঘুঁটেকুড়ানি মায়ের দুঃখ দূর করিবার জন্ত মাণিকদহে মাণিক আনিতে চলিয়াছেন। কত বিঘ্ন, কত বাধা। রাক্ষস ও দৈত্যের দেশ হ'তে "কুঁচবরণ কন্তা আর মেঘবরণ চুল" নিয়া ফিরিয়াছেন। মনের 'পরে এই রূপকথা সুদূরের কি পিপাসা জাগাইয়া তুলিত! রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতাম।

আমিও যেন চলিয়াছি। বিজয়ী বীরের মত সাগর-নদী পার হ'য়ে, গহনবন ছাড়িয়ে...

তারপর হিজিবিজি হইয়া যায়।

কোনও দিন বা হীরার পালঙ্কে নিদ্রিত, সোনার-প্রতিমা রাজকন্তা চোখে ভাসিত। বীভৎসদর্শন রাক্ষসেরা ছুটিয়া আসে—ভয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

চোখ মেলিয়া দেখি, পূবের আকাশে কে সিঁদূর লেপিয়াছে। শেষরাতে মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়াছে—বন্দর ফেলিয়া, বড় নদী ছাড়িয়া খালে পড়িয়াছি; জলো দেশ।

খালের পর খাল চলিয়াছে, ওড়্‌ গাছের ফল ভাসিয়া চলিয়াছে।

শীতলপাটির ঘাসে ফুল ভরিয়াছে। যত চাই, তত যেন কি এক যাদু নয়নে লাগিয়া যায়।

প্রকৃতির আবেদনের চেয়ে পেটের আবেদন বেশী।

মায়েরা সব সম্মুখে ঝুঁকিয়া মামাবাড়ী কতদূর তাহার হিসাব করেন। নন্দীগাঁয়ের বটতলা ছাড়ালেই কুশদ্বীপ।

কুশদ্বীপের শিবমন্দিরের চূড়া ঐ যে দূর হইতে দেখা যায়,—তারপরই মামাবাড়ী।

নৌকার পাটাতনের তলে হরেকরকমের খাবার। সেজো মামা, বাদুড় ও আমি যুক্তি করি, পাটাতন তুলিয়া দুধের ক্ষীর, ছাঁচ, নারিকেলের নেওয়া-আতা, জিরে-লাড়ু, গাল ভরিয়া তুলিয়া লই।

আজিম'র দৃষ্টি পড়ে। পাটাতন বন্ধ করিতে হয়। কিন্তু যতটুক পাই, তা'ই যথেষ্ট সেজো মামা বয়সে বড়; নাদুস্ নুদুস চেহারা। মামা বলে, "জানিস, আমি কচু খেতে পারি,—তাই না লোকে ন্তাদা ব'লে ডাকে।"

অবাক হইয়া থাকি। সজারুর সহিত মামার জ্ঞাতিত্ব-বন্ধনের ইতিহাস কৌতুকপ্রদ। "তুই ভাবছিস্ মিথ্যে, চ' একদিন কচু খেয়েই তোকে পরখ দেখাব।" বাদুড় মাসতুতো ভাই,—বয়সে বড়। দাদার হটিবার সখ নাই। দাদা বলে, "চুপ কর ন্তাকা, তোর ন্তাকামি করতে হবে না। শোন অজু, মামাবাড়ী অমৃত-ফল আছে, আমি তোকে অনেকগুলি এনে খাওয়াব, বুঝলি? কিন্তু তোর ঐ লাল লাটিমটা আমায় দিতে হবে।"

আমায় আর পায় কে! কাকামণি দম-দেওয়া লাটিমটি দাম দিয়া কিনিয়া দিয়াছিলেন। মামাবাড়ীর সবাইকে দেখাইয়া চমক লাগাইব মনে ছিল। তাই শয়নেও বালিসের তলায় আমার সাতরাজার-ধন-মাণিককে লুকাইয়া রাখিতাম।

কিন্তু অমৃত-ফল? অজানার এক মোহ আছে। সে আমায় ভুলাইল। বালিসের তলা হইতে সন্তর্পণে আনিয়া বাদুড়-দাদার হাতে দিলাম। পরক্ষণেই ফেরত লইলাম।

মনের মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্ব। ধ্রুবকে ছাড়িয়া অধ্রুব-গ্রহণের জন্ত নয়; যাহাকে প্রিয় করিয়াছি তাহাকে বিদায় দিতে ব্যথা লাগে! যে পরম আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহাকে যে আত্মায় ছাড়িতে চায় না।

সেজো মামা বলে, "অজু, দিসনে।"

ভাবাইয়া তুলে, কি করি ঠাহর করিতে পারি না। বাদুড় বলে, "না দিস চাইনে, অমন লাটিম কত পাব!"

মিথ্যা দম্ভ, অহেতুক আস্ফালন।

কিন্তু তখনকার বয়সে বুঝিবার সাধ্য ছিল না। অস্থির-মতি হইয়া বলিলাম, "আচ্ছা যখন চাইবো, তখন দেবে ত?"

বাদুড় তখনই স্বীকৃত হইল। কিন্তু বয়সের চেয়ে বুদ্ধি তাহার বেশী, তাই সে বলিল, "কিন্তু লাটিম আমার হ'ল বুঝলে ত?"

স্বামিত্বের জ্ঞান তখন পুরামাত্রায় জাগিয়াছিল কিনা বলা কঠিন। স্বত্যাগের মধ্যে যে চিন্তা ও বোধ চাই, তাহা হয়ত তখন জন্মে নাই। জন্মিলে হয়ত চুক্তি

করিতাম, কারণ তাহা হইলে পরে চুক্তিভঙ্গের নালিশের কারণ থাকিত, আর উকীল মোক্তার মহুরীর পয়সার সংস্থান হইত।

তাই ব্যাপার না বুঝিয়াই বলিলাম, "আচ্ছা।"

পরক্ষণেই বলিলাম, "কতগুলি অমৃত ফল দেবে?"

বুদ্ধিমান বাদুড়-দাদা উকিল হইবার জন্ত হয়ত জন্মিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বকাটে হইয়া যুদ্ধের পাড়ি জমাইয়া এখন সুস্থশরীরে আইন-রক্ষার কাজ করিতেছেন। মাথা নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "যে ক'টা পাব, তোকেই দেব; এ যে-সে লোক নয়—মরদ্‌কা বাত হাতীকা দাঁত!"

উপমার বাহাদুরি তখন বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তথাপি একটি প্রবল আশ্বাসে লাটিমটি বাদুড়-দাদাকে দিলাম।

কুশদ্বীপ ছাড়াইয়া, মামাদের মনসাতলার ঘাট ছাড়াইয়া, হাট পার হইয়া মঠের পাশে নৌকা ভিড়িল।

মামাবাড়ীর লোক তীরে দাঁড়াইয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিতেছিল। নৌকা থামিতেই লাফাইয়া আজা-মহাশয়ের স্কন্ধে চাপিলাম। স্নেহার্দ্রস্বরে তিনি বলিলেন "দূর শালা!"

স্নেহমধুর এই গালাগালি আমার দৌরাত্ম্য থামাইতে পারিল না। মা বাহির হইয়া আসিয়া আজা-মহাশয়ের পায়ে প্রণাম করিলেন। আমাকে বলিলেন, "অজু, বাপধন! নেমে এস, ছি—আজা-মহাশয়ের গায়ে পা দিতে নেই।"

নীতিশাস্ত্র মনে ধরে না, কিন্তু কেমন করিয়া জানি না প্রীতির স্পর্শ অনুভূতিকে ব্যাকুল করিয়া তোলে।

মায়ের আদেশ আর প্রীতির অদৃশ্য আকর্ষণ আমায় দ্বিধান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু আজা-মহাশয় মায়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "থাক্‌, থাক্‌ ছেলেমানুষ!" ছেলে মানুষ!...

দুরন্ত অভিমান বুকে জাগিয়া ওঠে। আজা-মহাশয়ের সাদা চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলি, "আমি ত আর ছেলে মানুষ নই?"

জীবনের প্রান্তদ্বারে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ কৌতুক অনুভব করেন। হাস্যোচ্ছ্বসিত কৌতুকে বলেন, "ভুল হ'য়েছে দাদা, তুই কি ছেলেমানুষ?—তুই যে আদ্যিকালের বুড়ো!"

খুসী হইব কিনা বুঝি না। ছোটবয়সে বড় হইবার জন্ত বৃহৎ পিপাসা থাকে। অনুভূতির সমস্ত পথ শিশুর জন্ত খোলা নহে। তাই শিশু ব্যাকুলতায় নব নব অভিজ্ঞতা-অর্জ্জনের আশায় ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

"আদ্যিকালের বুড়ো!"

কল্পনার লাগাম ছুটাইতে হয়। রূপকথায় ভাসা-ভাসা মনের যে প্রসার হইয়াছে তাহাই অবলম্বন করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করি। কোন্ অনাদি যুগের যাত্রার স্মৃতি যেন চকিত করিয়া তোলে। কিন্তু সকলই অস্পষ্ট,—সকলই আব্‌ছায়া।

বিপত্নীক আজা-মহাশয়। তাঁহার পুত্রকন্যার মধ্যে আমিই প্রথম বংশধর। তাই অফুরন্ত আদরে দিন কাটিয়া যায়। বুড়ার সহিত শয়ন, ভ্রমণ ও লীলা-কৌতুক। আমায় বুকে করিয়া বুড়া হয়ত হারানো স্মৃতির জন্ত উতলা হইয়া ওঠেন।...মামাবাড়ীতে বিবাহ সন্নিকট হইল।

লোকজনে, সমারোহে,চারিদিক সরগরম হইল। কাজেই বুড়ার সঙ্গ ছাড়িয়া সমবয়সীদের সঙ্গ লইতে হইল।

মা বড়-মেয়ে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, তাঁর বাপের বাড়ীতেও কাজের সীমা নাই। তাই মায়ের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া বাহির হইয়া পড়ি।

আজা-মহাশয় একটা চকচকে টাকা ও একটি পয়সা দিয়াছিলেন। টাকাটি খরচ করিতে প্রাণ সরে না। সেটি পুতুলের বাক্সে জমাইয়া রাখিলাম।

পয়সাটি হাতে হাতে ফেরে।

সে যুগ রকমারিরকমের কোট-প্যান্টের যুগ নয়। নীলাম্বরী ধুতি পরিয়া আলো ও বাতাসের স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতাম। বিনামা নাই, সিল্কের ফেজ নাই, সার্ট নাই, তাহার জন্ত ব্যথা ছিল না। প্রকৃতির নগ্ন শিশুর মত প্রকৃতির কোলেই ঘুরিতাম।

কোচায় খুঁটে পয়সা দেখিয়া সেজো মামা বলিল, "চল্, হাটে বিলাতী মিঠাই কিনে খাওয়া যাক্?"

আপত্তির কিছুই ছিল না। হাট দেখিবার জন্তও মন ব্যস্ত ছিল। মামাবাড়ীর দরদালানের সম্মুখ দিয়াই সড়ক—

বড় পুকুর পার হইয়া, বটতলা ছাড়াইয়া, মাঠের মাঝ দিয়া হাটে পড়িয়াছে।

কর্ত্তারা হয়ত যাইবার অনুমতি দিবেন না। বাদুড় বলিল, "চল, খিড়কী দিয়ে যাই।"

বাড়ী পার হ'য়ে নালার পাশে অনেক বুনো-কচুর গাছ। ভাবানুসঙ্গ মনে নৌকার কথা জাগাইয়া তুলিল। বলিলাম, "কুই মামা, কচু খাও?"

সেজো মামা অম্লানবদনে বলিল, "খাচ্ছি, তাহ'লে কিন্তু আমার ছুটো বেশী মিঠাই দিতে হবে।"

কৌতুকের এ দাম দিতে অস্বীকার করা চলে না।

সেজো মামা কচ্ কচ্ করিয়া বুনো-কচুর ডগা চিবাইয়া তাহার সজারু নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া তুলিল।

পাড়াগাঁয়ের হাট। আয়োজন অপ্রতুল। দু' চারখানি খালি চালা রহিয়াছে। হাটের দিনে পসারী বসে। বাঁধাঘর দু' তিনখানি আছে। এক পয়সায় দোকানী আটটি বিলাতী মিঠাই দিতেছিল। বাদুড় বলিল, "আর একটি দিয়ে দেও হে!"

দোকানী অপ্রসন্ন হইল, কিন্তু আর একটি দিয়া পুঁটুলি বাঁধিতে বসিল। আমার মনে ভাগ-সমস্যা প্রকাশ হইয়া দেখা দিল। আমি দোকানীর মুখের দিকে করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম, "আর একটি দাও না?"

দোকানী আমার স্নিগ্ধ-ব্যাকুলস্বরে চকিত হইয়া চাহিল। তাহার পর বিনাদ্বিধায় দশটি বিলাতী মিঠাই দিল।

সহজে যাহা পাওয়া যায়, মানুষের মন তাহাতে ভোলে না। মানুষ 'ফাউ' চায়, ফাউকে সে বাহাদুরি ও লাভ বলিয়া মনে করে। কিন্তু আমার আবেদনের মধ্যে এ ভাব ছিল না।

সেজো মামাকে অনিচ্ছায় চারিটি মিঠাই দিতে হইল। আমার পয়সা; আমি চারিটি নিলাম—বাদুড় দুটি পাইল।

বাদুড় ইহাতে তুষ্ট নহে। আকাশে ওড়া যাহার স্বভাব, অল্প লইয়া তাহার চলে না। আমার মন ভুলাইবার জন্ম বলিল, "শুন্‌ছিস্ অজু, কাল অমৃত-ফল আনতে যাবই। আমার আর একটা দেনা?" কি করি, লাটিম গিয়াছে, বিলাতি মিঠাইও একটি বেশী দিতে হইল। পরের দিন অমৃত-ফল আনিতে যাওয়া হইল না। সমবয়সী মাসী বলিল, "আঁচাখুঁচি" খেলিতে হইবে। আমাদের বাড়ীর লম্বা উঠানের শেষে আমগাছের ছায়ায় বনশিমুল গাছ ভরিয়া উঠিয়াছিল। সেখানে রান্নাবান্না খেলা চলিল। মাসী রাঁধুনি। আমরা নারিকেলের পুষ্প কুড়াইয়া চাল আনিলাম, বনতেলাকুচের ফল কুড়াইয়া ডাল করিলাম, নালা হইতে চুণা-পুঁটি ধরিয়া মাছ করিলাম। কলাপাত আনিয়া পাতা করিলাম। এমনই করিয়া খেলা চলিতেছিল।—ব্যাং-মামা আসিয়া অনর্থ করিল।

রাজকুমার রাজার ঘরে না জন্মিয়া কুমারের ঘরে জন্মিয়াছিল। মন ছিল তার উদার ও প্রশস্ত। ছোট-বয়সে মাকে সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। মা তাহাকে কাকা বলিয়া ডাকেন, আর কাকার মত সমাদর করেন।

রাজকুমার-দাদা, মামাবাড়ী পৌছিতেই একটা সুন্দর পুতুল আনিয়া দিয়াছিল। পুতুলটি একটি মেয়ের মূর্ত্তি—রং ফলাইয়া তাহাকে রাজকুমার জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

আজিমা'রা ঠাট্টা করিয়া বলেন, "ওটি কি তোর বউ?"

আমি মুখে রাগ করিয়া বলি, "যাও, মেরে ফেলবো বলছি।"

কিন্তু মনে যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দ জাগে। নিজের বউ—কল্পনায় যেন এক সুখস্রোত অঙ্গে খেলিয়া যায়।

সেই মনোহরণ বউ আমতলায় আনিয়া সাজানো হইয়াছিল। ব্যাং-মামা দৌড়াইতে বউ দুইখণ্ড হইয়া ভূমিতে লুটাইল। রাগে ও দুঃখে আমার কান্না পাইল। ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম,—"আমার বউ, আমার বউ!..."

বড়-মামী কি কাজে পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। কারণ শুনিয়া হাসিলেন, পরে সান্ত্বনা দিতে বলিলেন, "কাঁদিস নে অজু, রাজকুমার আবার একটা পুতুল দিয়ে যাবে'খন।"

কান্না থামে না। বিয়োগ-দুঃখ অত সহজে নিঃশেষ হয় না। দর্শন এখানে মূক হইয়া যায়; যুক্তি এখানে হৃদয়স্পর্শ করে না। ছোট-মামা হল্লা শুনিয়া আসিয়া

বিচারকের গম্ভীর চালে ব্যাং-মামাকে উত্তম-মধ্যম দিয়া আপন শক্তির পরিচয় দিলেন।

প্রতিহিংসা বোধহয় মানুষের আদিম সহজ-প্রবৃত্তি। ব্যাং-মামা মার খাইতেই অনেকটা উল্লাস হইল।

মাসী প্রায় সমবয়সী। কিন্তু মেয়েরা অল্প-বয়সেই অনেক জানে। আমায় চুপি চুপি বলিল, "কাঁদিস নে অজু, বাবাকে ব'লে তোর একটা রাঙা বউ এনে দেবো।"

রাঙা বউ রঙীন স্বপ্নধারা লইয়া মনের মহলে-মহলে হানা দেয়। ব্যাপার হয়ত এখানেই শেষ হইত। কিন্তু ব্যাং-মামা রাগে গরগর করিতেছিল। ছোটমামা পলাইতেই ছুটিয়া আসিয়া আমার পিঠে ঘা-কয়েক দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ছোট বয়সের মারণাস্ত্র—কান্না।

নানা সুরে কান্না চলিল। মাসীর প্রবোধে চিত্ত শান্ত হয় না। মেজ আজিমা যাইতেছিলেন। আদর করিয়া কোলে লইয়া বলিলেন, "বউয়ের জন্য কাঁদছিস? ছি!—আমায় বিয়ে করবি?"

এ সব রস-কৌতুক তখনকার দিনে চলিত। বর্ত্তমানের সভ্যতার মাপকাটিতে মাপিলে ইহা অশ্লীল বলিয়া মনে হইবে কিনা জানি না।

ভাবনায় পড়িলাম। আশা যত দূরে থাকে, ততই মধুর থাকে। কোনও ভাবনা থাকে না। প্রৌঢ় আজিমাকে বউ করিবার মধ্যে কৌতুক-রস হয়ত ছিল কিন্তু তাহা কৌতুক বলিয়া অনুভব করিবার বয়স ছিল না।

নিরুত্তর হইয়া আজিমার বুকে মুখ লুকাইলাম। আজিমা হাসিয়া বলিলেন, "কিরে অজু, আমায় পছন্দ হয় না? দেখ্ না, কেমন কাঁচা সোনার রঙ, বড় বড় কি চুল......"

ছেলেরা হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ হওয়ার চেয়ে আমিও হাসিতে যোগ দিলাম। পরের দিন সকালে ফেন-ভাত খাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মামাদের গোয়াল-ভরা একপাল গরু ছিল। রাখালের সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম।

ধানের মাঠ মাইলের পর মাইল চলিয়া গিয়াছে। দূর-দিগন্তে চক্রবাল শ্যামা ধরণীর অনুরাগে নত হইয়া পড়িয়াছে। বিলান-দেশ, খালে বিলে ভরা।

খালের ধার দিয়া চলিলাম। অমৃত-ফল ফলিবার সময় নয়; লতানো গাছ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ফল মিলে না। চলিতে চলিতে অজানা মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়ি।

ছোট বয়স হইতে সাপের ভয় বেশী। মানবের মনে সাপের ভয় বোধহয় আদিম যুগ হইতে বংশানুক্রমে অনুক্রমিত হইয়াছে। জলা জায়গা আর আর্দ্র কর্দ্দমে পা পড়িতেই শিহরিয়া উঠি। তথাপি "অমৃত-ফল" পাইবার আশা নেশার মত চাপিয়া ধরে। খুঁজিতে খুঁজিতে একটি লতায় চারিটি ফল মিলিল।—ছোঁ মারিয়া একটি ফল লইলাম।

সবুজবরণ কোষের তলে দেশী বাদামের শাঁসের মত সাদা সাদা দুইটি কি তিনটি শাঁস। খাইতে ঈষৎ মিষ্ট। বর্ত্তমানের কেক-খাওয়া শিশুরা হয়ত তাহাকে জংলা ফল বলিয়া দূর করিবে, কিন্তু শৈশবের কল্পনামাখা অমৃতফল খাইয়া কি যে অনির্ব্বচনীয় অমৃত পাইয়াছিলাম, আজ তাহা শুধু গভীরভাবে অনুভব করিবার বিষয়, বর্ণনার নহে।

বাকী তিনটি তিন জনে লইয়া বিজয়ী বীরের মত গৃহে ফিরিতেছিলাম।...ধানের চেহারা দেখিয়া অবাক হইতে হয়।

এতক্ষণ মন ব্যস্ত ছিল তাই নিসর্গ-মাধুরী দেখি নাই। এবার দেখিলাম, বিতত শ্যামলিমা। মাঝে মাঝে রূপালি জলরেখা চলিয়া গিয়াছে। পাখীর মেলা বসিয়াছে। কত যে রঙ-বেরঙের পাখী—নাম শিখি নাই। কিন্তু তাদের কলকূজন মনের মাঝে যে রেখাপাত করিয়াছিল অর্দ্ধজাগ্রত চৈতন্য হইতে তাহা এখনও যেন কানে ভাসিয়া আসে।

পথে একটি মাঠের পাশে নালায় চাতরা পাতিয়া চাষীরা মাছ ধরিবে বলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। বাচ্চু-মামার দুষ্টামি জাগিয়া উঠিল, বলিল, "মাছ ধরিতে হইবে।"

আমার বাধ-বাধ লাগিতেছিল। কিন্তু দুরন্তপনার প্রতি মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক টান আছে। তাই মাতিয়া উঠিলাম।

বাচ্চু ও তাজা অমৃতফল দুটি ডাঙায় রাখিয়া জলে নামিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করিল। আমি ডাঙায় রহিলাম।

ধানের ক্ষেতের আলির উপর দিয়া পথিক চলিতেছিল। তিনজন লোক—একজনের হাতে বলিষ্ঠ খাঁড়া। আমাদের

দুষ্টামি বুঝিতে পারিয়া তাহারা চেঁচাইয়া বলিল, "ক'গ্রা রে ?" খাঁড়া হাতে বীর খাঁড়া দোলাইল। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল! অপরিচিত মানুষের হাতে প্রাণ-ঘাতী অস্ত্র, আর অত্যাচারী অসহায় আমরা। বাছড় ও ন্যাজা জল হইতে লাফাইয়া ছুটিল। আজও ছুট— কালও ছুট।

বড় হইয়া পড়িয়াছি :—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ ধনৈরপি দারৈরপি।"

বই পড়িয়া একথা শিখিবার প্রয়োজন নাই, কারণ এটা পশু-ধর্ম্ম, মানুষের সমস্ত সৃষ্টির মাঝে এটা এখনও সদা-জাগ্রত চক্ষু মেলিয়া রহিয়াছে।

বাছড় ও ন্যাজা পলাইল। অসহায় সঙ্গীর কথা ভাবিবার সময় নাই। নিরুপায় আমিও পিছনে ছুটিলাম।

কিন্তু সবল উহারা, আমার আগে কোথায় মিলাইয়া গেল কে জানে!—"দে ছুট, দে ছুট!"

কাঁটাবন ঝাঁপাইয়া খাল ডিঙ্গাইয়া চলিলাম। কিন্তু অশিক্ষিত পা চলে না। নিরাশ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

সম্মুখে চাহিয়া দেখি কেহ নাই, পিছনে কেহ নাই। ধু-ধু মাঠ আর বিরাট নির্জ্জনতা।

ধানের শীষ বাতাসে ছলিয়া যায়,—তরুশাখে পাখীরা গান গায়। খালের জল উল্লাসে ধায়।

চারিদিকে বৃহৎ পৃথিবী। পুষ্পেপত্রে তরুলতায় কি সুন্দর অভিযান চলিয়াছে। কিন্তু এই বিরাট আয়োজনের মধ্যে আমি যেন একা। আর কখনও একা হইনি।

মনের মাঝে প্রথমে জাগিল ভয়। অপরিচিত জগৎ তার অপরিচয় দিয়া বুদ্ধ ব্যাকুল করিতে চায়।

উপায়হীন।

ভয়ের শিহরণ ধীরে ধীরে থামিয়া যায়। মনে সাহস সঞ্চয় করি।

ভয় ও সাহস এক দোলকের দুই প্রান্ত। একবার ভয় জাগে, আবার সাহস ফোটে।

সেই সাহসের সময় আমার মনে হইল, আমি যেন একা নই—বিশ্বের ফুলে-জলে যে সুর বাজে, আমার চিত্তেও তাহা বাজিতেছে। সমস্ত পৃথিবীর সহিত আমার একাত্ম ঐক্য সেই বিশ্বের মুহূর্ত্তে আমার সারা প্রাণ মাতাইয়া তুলিল। বিস্ময়ভরা হইয়া আনন্দ-ভরা দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চাহিলাম। এ যেন বরবধূর প্রথম দৃষ্টি-বিনিময়।

আড়ালে যাহারা থাকে, এক শুভদৃষ্টির যাদুতে তাহারা পরস্পরের পরম আপন হইয়া যায়। অজানা যে ছিল, সে শাশ্বত রসের ভাণ্ডারী হইয়া দেখা দেয়। হৃদয় দিয়া অনুভব করিলাম।

সে অনুভূতি আজিও মনে পড়ে। সকল ঐশ্বর্য্যের জাঁক-জমকের পিছনে পৃথিবীর যে আনন্দমূর্ত্তি তাহাই তখন দেখা দিল।

নির্ভয়ে অগ্রসর হইলাম।—মানুষ চিরন্তন পথের পান্থ, পথের রেখা যেন তাহাকে চিনিয়া লয়।

পথের রেখা ধরিয়া অগ্রসর হইলাম।

দূরে চাষীরা চাষ করিতেছে। বলদগুলি উদাস দৃষ্টি মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া রয়।

মানুষ যে কত আপন তাহা তখন বুঝিলাম। চাষীর উপস্থিতি প্রাণে যেন অপূর্ব্ব আনন্দ ও অভয়ের সৃষ্টি করিল।

পথের বাঁক ফিরিতেই ব্যাং-মামার সহিত দেখা। স্বস্তি জাগিল। ব্যাং-মামা ছিপ লইয়া মাছ ধরিতে আসিয়াছিল। বাঁ হাতে সুতায় করিয়া মাছের রাশি, ডান হাতে ছিপ। ব্যাং-মামা যেন দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিতেছিল।

ডাকিয়া বলিল, "কিরে ভ্যাবা-গঙ্গারাম! কোথায় গিয়েছিলি?"

রাগও হইল, কান্নাও পাইল। কিন্তু কোনটাই সুবিধা-জনক নয় মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

নিরুত্তর আমাকে খোঁচাইবার জন্ত ব্যাং-মামা বলিল, "কিরে! একেবারে যে ধ্যানী মুনি হ'য়ে গেলি!"

ছোট বয়স হইতে ব্যাং-মামা কথার অলঙ্কার দিত। তাহাকে যাহারা জানে সবাই একথা হলফ করিয়া বলিবে।

অশ্রুসজল নেত্রে সেদিনের অভিযানকাহিনী বর্ণনা করিলাম।

শুনিয়া ব্যাং-মামা কারিকী চালে উত্তর দিল, "ওদের সঙ্গে তুই ব'স নে, আমার সঙ্গে বেড়াস, তোকে একটা মানিক-জামা এনে দেবো।"

ছোট বয়সে ভাব-আড়ি কথায় কথায় হয়।

আমিও স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিলাম, ব্যাং-মামারই সাথী হইব।

বাড়ীতে আসিয়া মাছ রাখিয়া ব্যাং-মামা বলিল, "চল্, চিলেকোঠায় খেলা করবি।"

বাদুড় আর ন্যাজা আসিয়া বলিল, "না ভাই অজু, রাগ করিস নে, তখন এমন ভয় পেয়েছিল যে কি করি বুঝেই পাই নি।"

বাদুড় বলিল, "আর তুই ছোট ব'লে তোকে কেউ কিছু বলত না। আমাদের পেলে নাস্তানাবুদ ক'রে ছাড়ত।"

ন্যাজা বলিল, "সেই জন্যেই ভাই, দেখনা তাড়াতাড়িতে আমরা অমৃত-ফল ফেলে এসেছি।"

ব্যাং আমার হইয়া বলিল, "ফাজলামি ক'রোনা, তোমাদের বাহাদুরি বেশ ধরা গেছে। ছেলে-মানুষটিকে ফেলে তোমারা সব বাগীরা পালিয়ে এসেছ।"

আমিও উৎসাহিত হইয়া বলিলাম, "না ভাই, তোমাদের সঙ্গে আড়ি। বাদুড় ও ন্যাজা ম্লানমুখে ফিরিয়া গেল। ব্যাং-মামা হাসিতে লাগিল। চিলে-কোঠার একান্ত নির্জ্জনে ব্যাং-মামা আমার সঙ্গে ভাব পাতাইতে আরম্ভ করিল।

ব্যাং-মামা বলিল, "কইরে অমৃত-ফল কোথায়?"

আমি কোচার খুঁট খুলিয়া বাহির করিলাম। ব্যাং হাতে করিয়া লইল। তাহার পর সতৃষ্ণ-নয়নে ফলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমায় দিবি?"

আমি এক নিঃশ্বাসেই উত্তর দিলাম, "না।"

ব্যাং-মামা খানিক থামিয়া অন্য কথা পাড়িল।

"পায়রার ডিম দেখেছিস?"

আমি বলিলাম, "না।"

ব্যাং-মামা বলিল, (যেন আপন মনেই বলিতেছিল!)—"দেখতে কি-খাসা! হাতে করলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।"

কৌতূহল-ভরে প্রশ্ন করিলাম, "তুমি দেখেছ?"

সে তাচ্ছিল্যসহকারে বলিল, "হাঁ কত ঐ চিলে ছাদের ফোকরে আছে।"

আমি বলিলাম, "কি ক'রে দেখা যায়?"

"সে ত খুব সোজা, দাঁড়া—তোকে পেড়ে দেখাচ্ছি।"

ব্যাং-মামা অবলীলাক্রমে পুরাতন ছাদের কাটালে পা দিয়া উঠিয়া পড়িল। পারাবত-মাতা নীড়ে বসিয়া ছিল। ব্যাং-মামার তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া ভয়ে উড়িয়া গেল।

ব্যাং-মামা ধীরে ধীরে দুইটি ডিম পাড়িয়া আনিল।

ডিম আমার হাতে দিয়া বলিল, "দেখছিস? কেমন সুন্দর দেখতে!"

ডিমদুটি পাইয়া বারে বারে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম। তাহার পর আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে বলিলাম, "চল, ওদের দেখাই।"

"কিন্তু আমায় অমৃত-ফলটি দে।"

আমি রাজী নই। সে ক্রোধভরে বলিল, "বা, তোর জন্য কত কষ্ট ক'রে ডিম পেড়ে আনলাম!...জানিস্ ওর ভিতর সাপ থাকে?"

মনে ভয় জাগিল, কিন্তু ব্যাং-মামার যুক্তি বুঝিলাম না। আত্মরক্ষার জন্য বলিলাম; "তোমার ডিম তুমি নাও।"

ব্যাং-মামা অট্টহাস্যে বলিল, "বোকা আর কাকে বলে? ডিম নিয়ে আমি কি করবো হবুচন্দ্র? কত ডিম দেখেছি—কাকের ডিম, বকের ডিম, ছাতারের ডিম, গাং-শালিকের ডিম। ও ডিম তোর জন্যই পেড়েছি, তোকেই নিতে হবে।"

"তবে আমায় অমনি দাও।"

"অমনি কি সংসারে কিছু পাওয়া যায়, সব জিনিষের দাম দিতে হয়।"

ব্যাং-মামা এ সব পাকামি কোথা হইতে শিখিয়াছিল জানি না। সেদিন রূঢ় ও নিষ্ঠুর লাগিলেও আজ ঠেকিয়া শিখিয়াছি—দাম না দিয়া কোন জিনিষই পাওয়া যায় না।

"তাহ'লে তোমার ডিম চাই না।"

এই বলিয়া ডিমদুটি চাতালে রাখিয়া দ্রুতপদে নামিয়া পড়িলাম। কিন্তু ব্যাং-মামা চালাক ছেলে। সে ডিম-দুটি হাতে করিয়া পিছনে পিছনে নামিয়া আসিল। তারপর আমাকে চিলের মত ছোঁ দিয়া ধরিয়া ফেলিল।

ডিমদুটি সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া আমার হাত হইতে অমৃত-ফল কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করিল।

আমি মাটিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম।

সে কি কান্না!

পুত্রশোক-বিধুরা মাতাও হয়ত এরূপ কান্না কাঁদে না। চারিদিকে সোরগোল পড়িয়া গেল।

সবাই ছুটিয়া আসিয়া কহে, "কিরে, কি হ'য়েছে?"

উত্তর দেয় কে? কান্নার আওয়াজ দেওয়ালে লাগিয়া দ্বিগুণ হইয়া বাজে। সকলে ভ্যাবাচাকা খাইয়া যায়।

আজা-মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি অজু?"

আমি কাঁদি আর নাকিসুরে বলি, "ব্যাং আমার অমৃতফল কেঁড়ে নিয়েছে—"

কান্নার মধ্য দিয়া বক্তব্য ধরা মুস্কিল। যখন বহু প্রশ্নে ব্যাপার জানিয়া ব্যাঙের খোঁজ হইল, তখন অমৃতফল ব্যাং-মামার উদরে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছে।

ছোটমামা ব্যাং-মামাকে ধরিয়া আনিল।

ব্যাং-মামার মুখ মলিন হইল না। অবশচিত্ত হইয়া সে বিন্দুমাত্র কাঁপিল না। বেশ জোর-গলায় নির্জ্জলা মিথ্যা বলিল, "আমি ওকে ডিম দিয়েছি, ও আমায় ফল দিয়েছে।"

গলার জোর সংসারে অনেক সময় জয় আনিয়া দেয়। ব্যাং-মামার কথায় ছোটমামা কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

আমি ডিম আছড়াইয়া ভাঙিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে বলিলাম, "মিথ্যে কথা!" কিন্তু সে প্রশ্নের বিচার করিতে গেলে মুস্কিল। আজা-মহাশয় তাই বলিলেন, "আচ্ছা, তুই কাঁদিস নে, তোকে একঝুড়ি অমৃতফল এনে দিচ্ছি।"

আমি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম আর বলিলাম, "এঁবা দাও।" মা এতক্ষণ ছিলেন না; আসিয়া পৌঁছিলেন। মাকে দেখিয়া আমার গলার জোর কমিল, কিন্তু কান্না থামিল না।

আজা-মহাশয় বলিলেন, "কাঁদিস নে দাদু, এখুনি লোক পাঠাচ্ছি।"

মা কোলে তুলিয়া লইয়া তাঁহার শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন। খাবার দিয়া ভুলাইতে চাহিলেন। আমি রাগে গর-গর করিতে করিতে বলিলাম, "অমৃতফল চাই, তবে ভাত খাবো।"

ছোট্ট বয়সে রাগিলে 'ভাত খাইব না' বলিয়া ভয় দেখাইতাম। মাতা কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

চাকর-বাকর দিকে দিকে ছুটিল। কিন্তু অমৃতফল কোথাও মিলিল না। অমৃতফল তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। খাল বিল মাঠ ঢুঁড়িয়া চাকরেরা গৃহে ফিরিল, সকলের মুখেই নিরাশার বাণী।

না খাইয়া ক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

বৈকালে বাদুড় ও ভ্যাজা চুপি চুপি আসিয়া বলিল, "আমাদের সঙ্গে ভাব কর্‌বি ভাই?"

আমি বলিলাম, "না।"

বাদুড়-দাদা বলিল, "ভাব যদি করিস, তবে সেদুটি অমৃতফল কুড়িয়ে আনি।"

সেজো মামা বলিল, "লক্ষ্মী! রাগ করিস না, আর কখনও তোকে ফেলে পালাবো না।"

সময়ই মনে শান্তি আনে। সকাল বেলার দৌরাত্ম্য আর ইন্ধন না পাইয়া নিভিতে বসিয়াছিল।

কাজেই বাদুড় ও ভ্যাজার সহিত ভাব করিয়া লইলাম। কিন্তু সে অমৃতফল তাহারা খুঁজিয়া পায় নাই। পথচারী রাখালবালক হয়ত কখন কুড়াইয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল।

বড় হইয়া আরও মামা বাড়ী গিয়াছি। কিন্তু তখন অন্য চিন্তা মন ব্যাপিয়া ছিল, কাজেই অমৃতফলের সন্ধান হয় নাই।

তাহার পর জীবনের চল-চঞ্চল স্রোতে পৃথিবীর কত ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়াছি—কত লেনা-দেনা, কত মেলা-মেশা করিয়াছি, কিন্তু অমৃতফলের পিপাসা জাগে নাই।

ছোট বয়সের এ ইতিহাস আজ ভাবিলেও হাসি পায়। কিন্তু সেদিনের সে কান্না কি জীবনে ব্যর্থ হইয়া যাইবে? অমৃতত্বের আস্বাদ কি জীবনে মিলিবে না?

কে জানে! আশার কথা এই, কবি ও বৈজ্ঞানিক বলেন, সংসারে কিছু হারায় না। সেদিনের বেদনা তাই মিথ্যা নয়, কারণ—

> যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
> জানিহে জানি তাও হয়নি হারা।

শ্রীমতিলাল দাশ

কাশফুল

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত জগৎ মিত্র বি-এ

বিধবা হবার প্রায় এক বৎসর পরে সুধা একখানা চিঠি পেলো। মুকুল লিখেছে—স্নেহের বোন, এতদিনে তুমি একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়েছো আশা করি। তাই তোমাকে ভরসা ক'রে লিখ্‌ছি। আজ তোমার নিদারুণ দুঃখের দিনে তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই কিন্তু ভগবানের কাছে আমি সর্ব্বদাই প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে শান্তি দেন। তোমার সোদর হ'য়ে জন্মাইনি এ আমার দুর্ভাগ্য, নইলে তোমার কাছে গিয়ে আমার সস্নেহ দৃষ্টিতে তোমাকে আমি নিশ্চয়ই সুস্থ ক'রে তুলতাম। পূত মনে মুকুলদা আজ তোমায় শুধু স্মরণ করছে সুধা। স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী মুকুলদা

চিঠি পেয়ে সুধা বিস্মিত হোল না। আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে অনেকেই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে লিখেছে কিন্তু মুকুলের চিঠি পেয়ে সুধার মনটি একটি উদাস অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। এই অসীম পৃথিবীর একটি কোণ থেকে একটি তরুণ তাকে মনে ক'রে লিখেছে। লিখেছে—তোমার 'সোদর' হ'য়ে জন্মাইনি এ আমার দুর্ভাগ্য, নইলে আমার সস্নেহ দৃষ্টিতে তোমাকে আমি নিশ্চয়ই সুস্থ ক'রে তুলতাম।

এমনি ধারা আরো দু'চারটি লাইন—সামান্য একখানি চিঠি। তবু সেই চিঠিখানি নিয়ে সুধা অনেকক্ষণ জানালায় ব'সে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে। দূরে চক্রবাল-সীমায় শান্ত মধুর বর্ণচ্ছটা। আলো ও ছায়ার সেই অপরূপ বর্ণসমাবেশের দিকে চোখ রেখে সুধার অন্তরটি একটি করুণ ধ্যান-মৌন স্তব্ধতায় ভ'রে গেল। মনে হোল—জীবন ও মৃত্যু, বিচ্ছেদ ও মিলন আজ অভিনব রূপ নিয়ে তার ধ্যানলোকে ফুটে উঠ্‌লো।

বাহিরে যখন আর কিছুই দেখা যায় না তখনো মুকুলের চিঠিটি সুধার হাতে। তার লাইনগুলি সুধার মুখস্থ হ'য়ে গেছে। মনে হয়, সেই লাইনগুলির মধ্যে কোথায় যেন একটি অশ্রুসজল নীরব সহানুভূতি, দু'ফোঁটা অশ্রু,—একটু করুণ সুর। মনে হয়, সে সুর যেন সুধার নিজেরই অন্তরের কিংবা বর্ষণক্লান্ত ঘনায়মান আষাঢ়-সন্ধ্যার। সে সুর বাজে মধ্যরাত্রে পূর্ণিমার নীরব উদাস জ্যোৎস্নায় কিংবা নিদ্রাহীন তারার চোখে যখন তারা ঘুমন্ত পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকে।

চিঠিখানি হাতে নিয়ে সুধার মনে পড়ল—একটি উনিশ-কুড়ি বছরের শ্যামল উজ্জ্বল ছেলে। চোখদুটি তার টানা—স্নিগ্ধ। পাত্‌লা কোঁকড়া চুল। দাঁতগুলি একটু বড়—ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। কথাবার্ত্তায় ও দৃষ্টিতে একটি ভীরু সশ্রদ্ধ সঙ্কোচ—নিজেকে কোথাও যেন জোর ক'রে প্রতিষ্ঠিত করতে ভয় পায়।

মুকুলের অনেক কথাই সুধার মনে আছে, কিন্তু ওর মুখের আসল ছবিটি ওর মনে পড়ছে না। ভুলে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়। বিয়ের পর একটি বৃহৎ পরিবারের মধ্যে সুধা এসে পড়লো। কাজকর্ম, আমোদ-উৎসব, হাসি-ঠাট্টার মধ্যে সুধা নিজেকেই ভুলে গেলো। তার ওপর বিদ্বান রূপবান উদার তার স্বামী। সুধা ভুলে গেলো যে সে মুকুলের জন্যে একদিন কেঁদেছিলো। ভুলে গেলো যে বিয়ের রাত্তে মুকুল পালিয়ে বেড়িয়েছে। সুধা অনেক কিছুই ভুল্‌লো,—তার সঙ্গে একটি তরুণের বিষাদম্লান কোমল মুখখানি ভুলতেও তার বেশী দেরী হোল না। সুধার অশ্রুর সম্বল সামান্যই ছিল।

গরীবের ছেলে। মুকুল বি-এ পড়্‌তো আর সুধার দুই ভাই-বোন মন্টু এবং হাসিকে পড়াতো। হাসিই বড়ো, বয়স তখন তার এগারো। নিরীহ ভীরু মাষ্টার—দুর্দান্ত দুটি ছেলে-মেয়েকে পড়াতে "হিমসিম" খেয়ে যেতো। গোলমাল শুনে মা হয়তো বলতেন, যা তো মা, দেখে আয়তো ওরুটো পড়ছে না মারামারি

ক'রে মরছে। বেচারাকে ছেলেমানুষ পেয়ে যেন মানতেই চায় না।

দিদিকে দেখে ভাইবোন ঝগড়া থামাতো। মাষ্টার দিদির দিকে করুণ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে চোখ নামাতো। সুধা হেসে বল্‌তো, অত ভালমানুষ হ'লে চল্‌বে না—বেশ ক'রে ধা-কতক দিয়ে দিতে পারেন না?

ভাই-বোনের খিলখিল ক'রে হাসি। মাষ্টারকে জ্বালাতন করত সব চেয়ে বেশী হাসিই। সে বল্‌তো—হ্যাঁ ভারি তো মাষ্টার, ভাল ক'রে গোঁফই বেরুই নি এখনো।

এই রকম সামান্য সূত্র ধ'রে মুকুলের সঙ্গে সুধার মাঝে মাঝে সামান্য দু' একটা কথাবার্ত্তা। মা ছেলেটিকে ভারি স্নেহ করতেন। মুকুল শেষে বাড়ীর ছেলের মতোই হ'য়ে গেল। তারপর মুকুল বি-এ পাস্ করলো। এদিকে সুধার জন্ত পাত্র দেখা হ'চ্ছে। মা একদিন বল্‌লেন—ওগো, মুকুল ছেলেটিকে আমার ভারি ভাল লাগে বাপু,—ওর সঙ্গে সুধার বিয়ে দিলে হয় না? তা'হ'লে মেয়ে আমার কাছে কাছেই থাকে।

বাবা বললেন—কিন্তু ওরা ভারি যে গরীব।

—হ'লোই বা। মুকুল তো আইন পড়বে ঠিক করেছে। পাস্ ক'রে বেরুলে তুমি যদি ওকে একটু দেখো, ও তো ভালই রোজগার করবে।

সুধার বাবা ভাল উকিল, বল্‌লেন—আচ্ছা ভেবে দেখবো।

কথাটা হাসি শুনেছিলো। দিদিকে খবরটা দেবার জন্যে সে ছুটে গেলো এবং রাত্রে মুকুল যখন পড়তে এলো সে হেসে চীৎকার ক'রে বল্‌লো—মুকুলদা, তোমার সঙ্গে দিদির বিয়ে—সব ঠিক। কি খাওয়াবে বল?

মুকুল বিস্ময়ে স্তম্ভিত—কি উত্তর দেবে? হাসির চীৎকার পাশের ঘরে সুধার কানে গিয়েছিলো, সে লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো। হাসির কথা সত্য হোক আর না হোক সেইদিন থেকে মুকুল ও সুধার মাঝে সঙ্কোচের একটি অভ্রভেদী প্রাচীর খাড়া হ'য়ে রইলো। সুধা সহজে মুকুলের সামনে বেরোয় না। হঠাৎ চোখো-চোখি হ'লে মুকুল যেন মাটিতে মিশে যেতে চায়। একটি অব্যক্তীত জন্যে পরস্পরের প্রতি ওদের মনোভাব ধরা প'ড়ে গেলো। অথচ এই অনুরাগটি ব্যক্ত করবার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও কারুরি চেষ্টা ছিল না কোনদিন। সুধা কোনদিন মুকুলকে একটা রুমালও উপহার দেয়নি, মুকুল একটা ফুলও না। ওদের মধ্যে ভাষা ছিল না, সাহস ছিল না, অনুভূতির দৃঢ়তা ছিল না। ছিল দুর্জ্জয় সঙ্কোচ, মুগ্ধসুলভ ভীরুতা ও বেপথু। আশা ও অপেক্ষা ছিল,—আর ছিল নিদ্রাহীন রাতে আকাশ-পাতাল ভেবে ভেবে তারার দিকে চেয়ে থাকা!...

তাই সুধার যেদিন অন্যত্র বিয়ের ঠিক হোল, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া মুকুলের আর কিছু করবার রইলো না। আর সুধা? আড়ালে চোখের জল ফেলে অদৃষ্টকে সে স্বীকার ক'রে নিল। এবং বিয়ে যখন হ'য়ে গেল চোখের জল তার শুকিয়ে তো গেলই, এমন কি মুকুলের স্মৃতিটি পর্য্যন্ত মনে রাখবার মতো কোন সম্বন্ধই তার রইলো না।

আজ হঠাৎ একটি ষোড়শী বালবিধবার কাছে কৈশোরের ভুলে যাওয়া এক তরুণের চিঠি এসেছে।...দুটি বৎসরের বিবাহিত জীবন—এমন আর কি বেশী? তাও স্বামীকে সুধা কোনদিনই নিবিড় ক'রে পায়নি। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন এঞ্জিনিয়ার। তার ওপর বেশ বয়স্ক—তিরিশের ওপর তাঁর ছিল বয়স। সুধার বয়স তখন চৌদ্দ। মা কান্নাকাটি করেছিলেন কিন্তু সুধার বাবা বল্‌লেন—একটু বয়স তা কি হ'য়েছে? ছেলেটি ভাল, আর ওদের বেশ পয়সাকড়িও আছে।

স্বামীর কাছে সুধা অনেক ছেলেমানুষ। সুধাকে তিনি স্নেহের চক্ষে দেখতেন—তাঁর ভারি মায়া লাগতো, বল্‌তেন—তোমাকে আগে না দেখে ভারি ভুল করেছি, সুধা। একটি কুড়ি-একুশ বছরের তরুণের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল।

স্বামীর উদারতায় স্নেহে তার প্রতি সুধার শ্রদ্ধার শেষ ছিল না। স্বামীকে সে সবে ভালবাসতে সুরু করেছে এমনি সময় সব ওলোট-পালোট হ'য়ে গেল। সুধার কপাল ভাঙ্‌লো। স্বামীর ছবিটিকে বুকে নিয়ে সুধার কত রাত্রি বিনিদ্র কেটেছে। সে চুল ছোট ক'রে কাট্‌লো এবং পরে

ধরলো। বৈধব্যের যত কিছু আচার একান্ত নিষ্ঠায় পালন করলো। ব্রতোপবাসে দেহ ক্ষীণ করলো এবং দিনে একাধিকবার স্নান ক'রে নিজেকে শুদ্ধ মনে করতে লাগলো। অসুখের ভয় দেখিয়ে বাধা দিতে এলে সে কেঁদে-কেটে মরতে চাইলো। তারপর যারা বাধা দিতে এসেছিল তারাই শেষে সদ্যবিধবার দুঃসাহস দেখে বাহবা দিতে লাগ্‌লো—হাঁ, স্বামী-ভক্তি বটে!

প্রশংসার আশা তো সামান্য নয়। সুধা শেষে শয্যা নিতেও ত্রুটি করলো না। সুধাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি। কঠিন 'টাইফয়েড' রোগ—মা-বাবা ছুটে এলেন। সুধা বাঁচ্‌লো বটে কিন্তু তার স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্যই ভেঙে গেলো। সুধার নিত্য সাথী রইলো—দুরারোগ্য অজীর্ণ, দৃষ্টিক্ষীণতা এবং হাঁপানি।

এই রোগ থেকে উঠে সুধার প্রথম চোখ ফুটলো। মিথ্যা প্রশংসার লোভে নিজের মৃত্যুকে বরণ করার মধ্যে মূল্য কোথায়? তা'ও মুহূর্তের মৃত্যু নয়, তিল তিল ক'রে মৃত্যুযন্ত্রণা। সুধা বুঝলো, সব ভুল,—সব ফাঁকি। নিগূঢ় ধ্যানের মধ্যে স্বামীকে পাওয়া যায় কই? তাঁকে উপলক্ষ ক'রে কেবল আড়ম্বর, মিথ্যা আত্মস্তুতি ও প্রবঞ্চনা। স্বামীর ছবিটি সেইদিন থেকে সুধার বাক্সে বন্দী হ'য়ে রইলো।

মনকে নিযুক্ত রাখবার জন্যে সুধা সংসারের নানা কাজে মন দিল। বৃদ্ধ শ্বশুরশাশুড়ীর সেবা ও একটি দেবরের মাতৃহীন কয়েকটি অপোগণ্ড শিশুর পরিচর্যা নিয়েই বেশীর ভাগ সময় কাটতো। শরীর তার সুস্থ না হ'লেও সংসারের কর্তৃত্ব বেশীর ভাগ তারই ওপর। স্বামীকে সুধা কোনদিনই একান্ত ক'রে পায়নি ব'লে বৈধব্য সুধার কাছে গুরুতর ব্যাপার হ'য়ে উঠ্‌লো না।

বাবা সুধাকে নিতে যেতে এলেন। মা কেঁদে-কেটে চিঠি লিখ্‌লেন—কিন্তু সুধা বাপের বাড়ী যেতে চাইলো না। সুধা বুঝ্‌লো, এখানে কাজে কর্মে তার একরকম কাটে কিন্তু মায়ের কাছে উদয়াস্ত অবসর। নিজেকে নিজের কাছে একলা রাখতে সুধার ভারি ভয়—কাজের মধ্যেই সে ডুবে থাকতে চায়!

এমনি এক দিনে সুধার কাছে মুকুলের চিঠি এলো। চিঠি পেয়ে একান্ত অভিভূতের মতো সুধার খানিকক্ষণ কাটলো। কয়েকটা পুরানো স্মৃতিও মনে জাগ্‌লো, কিন্তু তাই নিয়ে ব'সে থাকবার সময় তো সুধার নেই। সংসার প্রতিনিয়তই তাকে ডাকছে। তিন-চার দিন পরে সুধার খেয়াল হোল যে মুকুলদা'কে 'ধন্যবাদ' দিয়ে একটা জবাব দেওয়া দরকার—কিন্তু চিঠিটা যে সে কোথায় রেখেছে সুধা কিছুতেই খুঁজে পেল না। মুকুলের ঠিকানা সুধার জানা ছিল না সুতরাং চিঠির উত্তর দেওয়া তার আর হ'য়ে উঠ্‌লো না।

কয়েকদিন সুধার ভয়ানক খারাপ লাগ্‌লো কিন্তু বেশীদিনের জন্য নয়। ভাল লাগা মন্দ লাগারও একটা অবসর থাকা চাই—সুধার তা নেই। নিজেকে সে কোথাও একলা রাখেনি। কাজের মধ্যে তার কোথাও ফাঁক ছিল না। এমন কি তা'র জীবনযাত্রায় নিজের কোন দাবি-দাওয়া ছিল না। পাঁচজনে তাকে যেদিকে টেনে নিয়ে যায়, সে সেইদিকে চলে। সুধা হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলো, কেমন ক'রে জানি না, সংসারের সমস্ত কর্তৃত্বের ভার তার ওপর এসে পড়েছে। আত্মীয়পরিজন দাসদাসী সকলেই তার মুখ চেয়ে থাকে। সামান্য কিছু উপলক্ষ্যেই দেবর-জা-ননদ প্রভৃতি সকলে তারই কাছে ছুটে আসে। যদিও সে সংসারের বড় বৌ তবু সকলের শেষেই সে এ বাড়ীতে আসে। তার স্বামী বেশী বয়সে বিয়ে করেছিলেন। জায়েরা অনেকেই তার চেয়ে বড় কিন্তু তাহ'লে কি হয় কখনো কখনো যদি জা' এবং দেবরদের মধ্যে ঝগড়া বাধে তার মীমাংসা করতে হয় সুধাকেই। এমন কি সংসারের কুচো কুচো ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া সেলাই প্রভৃতি শেখানো এবং অবসর-মতো তাদের নিয়ে একটু গানের চর্চা সুধার কাজের মধ্যে গণ্য হ'য়েছে। এমন কি দেবরদের বৈচিত্র্যহীন নীরস জীবনযাত্রায় হাসিঠাট্টার একটি অনাবিল ঝরনাধারা এনে দেবার ভারও সুধার ওপর। অসুখে-বিসুখে, বারব্রতে সুধার হয়তো মাসে পনেরো দিনই খাওয়া হয় না। যেদিন খেতে বসে সেদিন হয়তো কোন দেবর ঠাট্টা ক'রে বললো—কতো গিলছো বৌদি, পেটে কি তোমার রাক্ষস ঢুকেছে!

সুধা হেসে জবাব দেয়—মাসের মধ্যে এমনি পনেরো দিন তো খেতে দাও না ভাই। মেয়েদের জন্তে শাস্ত্র—সেতো তোমাদেরই লেখা, তাই আজ সেই অনেক দিনের খাওয়াটা পুষিয়ে নিচ্ছি— বুঝলে না ?

বুড়ো বুড়ো দেবররা এতটুকু বৌদির কাছে কথায় হার মানে—সময়ে অসময়ে সুধার পায়ের ধুলো নেয়। সুধা পা বাড়িয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করে—আপত্তি করে না ; মনে মনে বলে, ওরা সম্মান করে আমাকে নয়,—এ বাড়ীর বড় বৌকে।…

এই ভাবে আরো এক বছর কাটলো। সুধার শরীর সারে না, দিন দিন আরো ক্ষীণ হ'চ্ছে। চোখ দেখিয়ে চশমা না নিলে আর চলে না। সুদূর বেহারে তার শ্বশুরবাড়ী—ভাল রকম চিকিৎসা করাবার তার সেখানে কোন সুযোগ নেই। এমনি অবস্থায় সুধা একদিন আবিষ্কার করলো, বৈধব্যের আড়ম্বর যেমনি মিথ্যা তেমনি মিথ্যা সংসারের এই কর্তৃত্ব এখানেও সেই প্রশংসার মোহ, পদমর্য্যাদার মোহ। তার উপর সংসারের নানা তুচ্ছ বন্ধন। কেন সে বন্ধন চায় ? সকলের জন্তে তিল তিল ক'রে মরেও সুধার জীবনে শান্তি নেই।

এবার সুধা নিজের থেকেই বাবার কাছে চ'লে এলো—প্রায় চার বছর পরে। যেখানেই হোক কিছু বৈচিত্র্য, কিছু মুক্তি সে চায়। মেয়ের চেহারা দেখে মা চীৎকার ক'রে উঠলেন—এমনি ক'রে নিজেকে মেরে ফেলতে হয় মা !

বাবা অন্তদিকে চোখ ফেরান। মার কোলের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সুধা কান্নার বদলে হাসে শুধু। শরীর তার কেন ভাঙলো সে কথা মাকে তো বলা যায় না। দিদির মুখে হাসি দেখে ছোট বোন হাসি চোখ মুছে হাসবার চেষ্টা করে। হাসিকে দেখে সুধার বিস্ময় লাগে। সেই এগারো বছরের দুর্দান্ত মেয়েটির আজ একি পরিবর্তন। হাসি এখন পোনেরোয় পড়েছে। তার পূর্ব্বের সেই চপলতা ও উচ্ছ্বাস কোথায় যেন লুকিয়েছে, সে এখন সঙ্কোচাবনতা লজ্জানম্রা তন্বী। তার ভীরু দুটি চোখে যেন পল্লবান্তরাল বিরাট উদার আকাশের ইঙ্গিত,—তার হাসিতে সমুদ্রের অতল গভীরতা।… —

মার কাছে এসে সুধার করবার তো কিছুই নেই—হাসিকে নিয়ে তার সময় কাটে। দিদির মুখের দিকে চেয়ে হাসি প্রায়ই কেঁদে ফেলে। সুধা ওর মুখে চুমো দিয়ে ওর মাথাটি বুকের মধ্যে চেপে ধরে। হাসিকে সুধা নানাভাবে দেখে। ওকে দেখে বিস্ময়ের অবধি নেই। হাসি যেন সুধার কুমারী-রূপটি আবার ফিরিয়ে এনেছে। সুধাই যেন নতুন ক'রে ওর মধ্যে জন্ম নিয়েছে।

হাসিকে দেখে সুধার অনেক কিছুই মনে পড়ে। মনে পড়ে—মুকুলের কথা। মুকুল যে তা'কে চিঠি লিখেছিল তাও মনে পড়ে। মুকুলের কথা সুধার জানতে ইচ্ছে হয়—কেমন আছে, কি করছে এই সব। কিন্তু মাকে বা হাসিকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ওর ভারি সঙ্কোচ। হাসি জানে, দিদির সঙ্গে মুকুলদার বিয়ের কথা উঠেছিল। সুতরাং সে যদি কিছু মনে করে ?

বাড়ীতে নারায়ণ-ঠাকুরের নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। নিজেকে ব্যাপৃত রাখবার জন্তে তো সুধা খানিকটা ঠাকুর-সেবার ভার নিল কিন্তু চিন্তা তাতে বাধা মানে না। অসতর্ক মুহূর্ত্তে নানা চিন্তা এসে তাকে অভিভূত ক'রে তোলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কতো রাত্রি তার বিনিদ্র কেটেছে। মিথ্যা ঠাকুর-সেবা ! সবই মিথ্যা ! জীবন-মৃত্যু, বিরহ-মিলন, মুক্তি ও বন্ধন সবই মিথ্যা ! সুধা ভেবে ভেবে কূলকিনারা পায় না। বিশ্রামের মধ্যে চলার মধ্যে কোথাও তার শান্তি নেই। সুধা ভাবতে চেষ্টা করে কি সে চায় ?…প্রেম, ভালবাসা, সন্তান, স্বামী, আত্মীয়-পরিজন ?…না, না ! কিছুই সে চায় না। সব মিথ্যা, সব ভুল ! সুধা নিজের মনে বার বার স্বীকার করে মুকুলের জন্তে সত্যিই তার কোন ব্যথা, কোন মমতা, কোন আকুলতা নেই। সে স্বীকার করে, তার বর্ত্তমান জীবনে মুকুল তার বহু পরিচিতের মধ্যের একজন ছাড়া আর কিছু নয়। তবে তার সম্বন্ধে এতো সঙ্কোচ কেন ?

সুধা মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো—হ্যাঁ মা, তোমার মনে আছে মুকুল ব'লে একটি ছেলে হাসি আর সন্তুকে পড়াতো। তার ঠিকানাটা জানা আছে মা ?

মা সবিস্ময়ে মেয়ের দিকে চাইলেন, বললেন—মুকুল ?

সেতো কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আমাদের কাছে আসতো। কেন বলছিস ? তাঁর বাড়ী সতু বোধহয় চেনে।

সুধা বললো কিছুদিন আগে তিনি অত্যন্ত দুঃখ জানিয়ে আমাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন কিন্তু চিঠিখানা কোথায় যে [illegible]লো, উত্তর দিতে পারিনি সেই থেকে।

মার চোখে জল দেখা দিল—গরীব ব'লে কর্ত্তা যদি তখন অমত না করতেন আজ সুধার অবস্থা এ রকম হ'তো না। মা ভাবলেন,—মুকুল বা সুধা বোধহয় কেউই এই বিয়ের কথা জানতো না।

সুধা বললো—হ্যাঁ মা, মুকুলদা' বুঝি এখন ওকালতি করছে—পসার হ'চ্ছে তো ?

—মুকুল তো সেদিন পর্য্যন্ত ওঁর কাছে মামলা সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে আসতো। আহা, ভারি ভাল ছেলে—মুকুল। তোর কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করতো, কতো দুঃখু করতো—ছেলেটিকে আমার কিন্তু ভারি ভাল লাগে সুধা,—এতো মিষ্টি।

একটা কথা হঠাৎ সুধার মনে হোল, বললো—হ্যাঁ মা, মুকুলদা'র সঙ্গে হাসির বিয়ে দিলে হয় না ?—হাসিতো পনেরোয় পড়েছে, ওর জন্যে সম্বন্ধ দেখ্ছো না ?

মা চমকে উঠ্লেন, বল্লেন,—আমরা সে চেষ্টা করেছি সুধা, উনি নিজে মুখে মুকুলকে বলেছেন কিন্তু সে রাজি হয়নি। কি বল্লে জানিস ? বল্লে—হাসিকে বিয়ে করবার মতো টাকা আমার এখনো হয়নি মেসোমশাই—কোনদিনই হয়তো হবেনা—আপনি অন্যত্র সম্বন্ধ করুন।

সুধা বিস্মিত হ'য়ে বললো—সত্যি মা, মুকুলদা' বললো একথা ?

—হ্যাঁ মা, বোধহয় সেই জন্যেই মুকুল এ বাড়ীতে আর আসে না—ওর সঙ্কোচ লাগে। ওকে অনুরোধ ক'রে আমরা কি খুব অন্যায় করেছি সুধা ?

সুধা কি উত্তর দেবে ? হাসিকে বিয়ে করবার মতো টাকা মুকুলের যে আজো হয়নি একথা তো সত্যি নয় তবে সে রাজি হোলনা কেন ?

হঠাৎ কেন জানিনা আপনা থেকে সুধার চোখে জল এসে পড়ে। দারিদ্র্যের অভিমান ? হায়, এ সংসারে অভিমানের দামতো কেউ দেয় না ?

সুধা নিজের মনেই বলে—অভিমান নিশ্চয়ই নয়। হয়তো আজো ওর সত্যিই টাকা হয়নি তবু আমি নিজেই একবার চেষ্টা ক'রে দেখবো। সুধার চোখে আবার জল আসে।...একদিন গরীব ব'লে মুকুলকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল।

সেইদিনই দুপুর বেলা সুধা মুকুলকে কয়েক লাইন লিখে সতুর হাতে পাঠিয়ে দিল, লিখলো—শ্রীচরণেষু—দাদা, অনেক দিন পরে বাবার কাছে এসেছি। তুমি খবর পাওনি বোধ হয় ? তোমার চিঠি শ্বশুরবাড়ীতে পেয়েছিলাম কিন্তু উত্তর দিতে পারিনি ব'লে ক্ষমা চাইছি। জানইতো দাদা, কি বৃহৎ পরিবারের মধ্যে আমাকে তোমরা পাঠিয়েছো। সারা-দিন এতো কাজ যে নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলবার অবসর পাইনে। চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে দেখ্তে আসবে। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিও। ইতি

স্নেহের বোন সুধা।

মুকুলকে সুধা কোনদিনই তুমি বলেনি, আজ এই প্রথম। দিদিকে চিঠি লিখতে দেখে হাসি এসে বল্লো—দিদি, কাকে লিখ্ছো—বেহাইকে বুঝি ?

সুধা শুধু বল্লো—না।

—তবে কাকে ?

চিঠি শেষ ক'রে সুধা বল্লো—মুকুলদা'কে...ওকি, ওরকম বড় বড় ক'রে চাইচিস্ যে ?

হাসি সবিস্ময়ে বল্লো—দিদি সত্যি ? তুমি ওঁকে লিখ্তে পার্লে ?

—কেন লিখ্তে পারবো না ? মুকুলদা' কি কিছু অন্যায় করেছে ?

—না অন্যায় নয়...

সুধা বল্লো—তবে অবাক হ'চ্ছিস যে ? কি বল্তে যাচ্ছিলি বল্। লুকোচ্ছিস যে ?...ও বুঝেছি—মুকুলদা'র সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হ'য়েছিল এই তো ? তাতে কি ? সম্বন্ধ তো আরো কত-জায়গায় হ'য়েছিল তাই ব'লে কি লজ্জায় ম'রে থাকতে হবে নাকি ? তোর দিন দিন বা বুদ্ধি হ'চ্ছে হাসি !

দিদির সহজ উত্তরে হাসি স্তব্ধ হ'য়ে গেল, অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্‌লো—হুঁ, আমি বুঝি তাই বল্‌লাম ? যাক্‌গে,—ঘাট হ'য়েছে দিদি !

হাসি অভিমান ক'রে চ'লে যাচ্ছিল। সুধা তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে হেসে বললো—কি লিখ্‌লেম জিজ্ঞেস করলিনে বুঝি ? তবে শোন। মুকুলদা'কে তোর বিয়ের কথা নিয়ে লিখেছি। আর লিখেছি যে হাসি চায় না আমি তোমাকে চিঠি লিখি, মুকুলদা'।

সুধা হাস্‌তে লাগ্‌লো। হাসি ছিটকে স'রে গেলো—যাও, তোমার খালি ঠাট্টা ! তোমার মুকুলদা'কে তুমি লিখ্‌বে,—আমার কি ! আমার কথা নিয়ে তোমার এতো মাথা ঘামাবার তো দরকার নেই। আমি কি এখনো সেই কচি খুকীটি আছি দিদি ? আমি কি জানিনে, বাবার কথায় কেন মুকুলদা' অমত করেছেন ?—

চোখে জল নিয়ে হাসি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সুধা সেইখানেই স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো। আজ হাসির এ কি রূপ ! সুধা শত চেষ্টাতেও নিজেকে লুকোতে পারেনি। তার মিথ্যা সরলতা হাসিকে ভোলাতে পারেনি সত্য, কিন্তু হাসির মধ্যেই বা আজ এ কি অভিব্যক্তি ? সেও কি মুকুলকে ভালবাসে ?

সুধার চিঠি পেয়ে মুকুল সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা এসে হাজির। সুধার মা খুসী হ'য়ে বললেন—এসো বাবা এসো, অনেকদিন তোমায় দেখিনি, মুকুল !

মুকুল বললে—মাসীমা, সুধা এসেছে শুনলাম—কোথায় সে ? মা বল্‌লেন—হাঁ বাবা ; সে একবার ঠাকুর ঘরে গেছে, এই এলো ব'লে। হাঁ, সুধা তোমার কথাই বলছিল। ওরে হাসি, মুকুলদা' এসেছে রে, দিদিকে খবর দিয়ে আয়। আর একখানা আসন দিয়ে যা এখানে।

হাসি তার আগেই দিদির কাছে ছুটেছিল উর্দ্ধশ্বাসে—দিদি, মুকুলদা' এসেছে।

সুধা বললো—ও, আচ্ছা বসতে বল্‌গে যা, আমি আসছি,—আমার ঘরেই বসাস্, বুঝ্‌লি ?

হাসি কিন্তু মুকুলের সামনে বেরুলো না। কিছুক্ষণ পরে সুধা ঠাকুর ঘর থেকে নেমে এলো, পরনে তার পট্ট-বস্ত্র। মুকুলকে প্রণাম ক'রে সুধা বল্‌লো—এই যে মুকুলদা' এসেছো, আমার চিঠি পেয়েছিলে ? একি, এখনো ব'সোনি ? —চল আমার ঘরে। মুকুলদা'কে কিছু খেতে দাও মা। আর, হাসিটাই বা গেল কোথায়—মুখপুড়ী কোথায় যে লুকিয়েছে !

সুধার ঘরে এসে মুকুল [illegible] চেয়ারে বস্‌লো। সুধা তা'র সামনে তক্তাপোষে বস্‌লো। সুধা বল্‌লো—তার পরে মুকুলদা' কেমন আছ ? এতদিন এসেছি, একবার বুঝি খোঁজও কর্‌তে নেই ছোট বোনের !

মুকুল কি উত্তর দেবে ? বললো—তুমি কি ঠাকুর-ঘরে ছিলে সুধা ?

সুধা হেসে বল্‌লো—আর কি করি দাদা !—ইহকালের ভাবনা তো শেষ হ'য়ে গেছে, এইবার একটু পরকালের ভাবনা ভেবে দেখি।

মুকুল বল্‌লো—সেতো ভালই কাজ দিদি।

—ভালই। বিশেষ ক'রে আমাদের পক্ষে, না দাদা ? ঠাকুরের সেবা, হবিষ্যি, আর ব্রতোপবাস নিয়ে থাকলে তোমরা ভারি নিশ্চিন্ত থাক না ভাই ? এই পাড়ের কাপড়ে আমাকে কেমন মানিয়েছে বললে না মুকুলদা' ?

সুধার কোন কথাতেই জবাব দেওয়া যায় না। মুকুল অভিভূত হ'য়ে সুধার কথা শুনছিলো। সুধা বলছিল—শাস্ত্র পুরুষের তৈরী, তাই ব'লে আমি তাকে ঘৃণা করছিনে মুকুলদা'। যারা বোঝে না তাদের পক্ষে শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে—তারা আচার-বিচার-অনুশাসন ছাড়া একপাও চল্‌তে পারে না। যাদের মনে শক্তি নেই, তাদের বিশ্বাসের শক্তি আছে বলেই টিঁকে যায়। কিন্তু মিথ্যা নিয়ে আমার দিন্ যে আর কাটে না মুকুলদা'! শালগ্রামশিলাকে আমি যদি দেবতা ব'লে মান্‌তে না পারি, সে কি আমার দোষ ? মিথ্যা আচার-বিচারের প্রতি আমার নিষ্ঠা নেই ব'লেই কি আমি অধার্ম্মিক—আমি কি মন্দ কাজ কর্‌তে পারি ? আমার কি নিজের ন্যায়-অন্যায় সদসৎ বোধ নেই ?

সুধা আপন মনে অনেক-কিছু ব'লে যাচ্ছিল, মুকুল তাকে বাধা দিয়ে বললো—বেশী পরিশ্রম ক'রো না

সুধা। মাসীমা বলছিলেন, তুমি নাকি ভয়ানক ভুগ্ছো? —তোমার চেহারাও খারাপ দেখ্ছি।

সুধা হেসে বল্লো—মা' গোঁড়া-ঘরে আমায় দিয়েছ দাদা!—সকলের মন রাখ্তে রাখ্তেই আমি গেলাম।··· থাক্গে, কি সব বাজে বক্ছি! ছিঃ ছিঃ, তোমার সামনে কত কি ব'কে গেলাম। তুমি আমার ভাই হ'য়ে অম্মাগুলি ব'লে দুঃখ ক'রে লিখেছিলে, না মুকুলদা'? তাই তোমাকে ভাই জেনে এতো কথা ব'লে ফেললাম, কিছু মনে কোর' না যেন। না দাদা, সত্যিই আমার শ্বশুরবাড়ীর লোকগুলি ভারি ভাল। শ্বশুর-শাশুড়ী তো দেবতার মতো। দেওরগুলি এক একটি রত্ন—বৌদি বল্তে অজ্ঞান! আর স্বামী যা পেয়েছিলাম, খুব কম মেয়ের ভাগ্যেই সে রকমটি জোটে।

তারপর সুধা তার স্বামী সম্বন্ধে কত কথা বল্লো—তাঁর স্নেহ-মায়া-উদারতার কথা, তাঁর সুন্দর আকৃতির কথা, তাঁর অসুখের কথা। বল্তে বল্তে সুধা যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে; মুকুল মুগ্ধ হ'য়ে শুন্ছে। সুধার ওপর শ্রদ্ধা তার ক্রমশঃই বাড়্ছে। অথচ এই সরল মেয়েটি সম্বন্ধেই একদিন তার অভিমানের শেষ ছিল না। এই সুধার কথা ভেবেই কত রাত্রি সে অনিদ্রায় কাটিয়েছে ভেবে নিজেকে মুকুল ভারি অপরাধী মনে করতে লাগ্লো। সুধার সেই শান্ত, সংযত, পবিত্র ও করুণ-মূর্ত্তির দিকে চেয়ে মুকুলের অন্তর একটি মহান অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল।

মুকুল বল্লো—আজ আসি সুধা, আর একদিন এসে তোমার সঙ্গে অনেক কথা কইব।

সুধা বল্লো—সেকি মুকুলদা'! আসল কথাটাই যে বাকি—আবার তুমি কবে আস্বে না আস্বে। আমারও শরীর ভাল নয়।

—কি বল'তো?

সুধা বল্লো—আমার একটা অনুরোধ মুকুলদা'! বাবার কথায় তুমি অমত করেছিলে কিন্তু আমার কথা তুমি ঠেল্তে পাবে না। হাসিকে তোমার নিতে হবে—না ব'ল, না ভাই। হাসিকে বা তোমাকে কাউকেই আমি দূরে ঠেলে দিতে পার্বো না।...

মুকুল চম্কে উঠ্লো, উদ্বেগের সঙ্গে বল্লো—আমি কি হাসির উপযুক্ত সুধা? আমার পয়সা যে আজো হয় নি। জীবনে যথেষ্ট পয়সা করতে হ'লে যে, অনেকদিন লাগ্বে। ততদিন কি হাসি আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারবে? তা'ছাড়া আমি যে এখন কিছুদিনের জন্য বাইরে যাব দিদি!

—কোথায় যাবে?

—রেঙ্গুনে! সেখানে গেলে পসার বাড়্বে।

—কেন, এখানে থাক্লে কি হয় না? যাবে যেও, কিন্তু হাসিকে সঙ্গে নিতে হবে। একলা তোমায় ছাড়ছিনে মুকুলদা'!

সুধার গলা চোখের জলে ভারি হ'য়ে উঠ্লো। মুকুলের পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লো—তুমি আমাদের পর ক'রে দিওনা মুকুলদা'। বল, হাসিকে নিতে রাজি আছ? আর আমার মনে হয়, হাসি তোমার অযোগ্য হবে না। সে হাসি আর নেই। তা'ছাড়া, ও তোমাকে ভয়ানক শ্রদ্ধা করে মুকুলদা!

মুকুল নীরব—নানান অভিনব অনুভূতি তাকে নির্ব্বাক করেছিল। এই শুক্লবসনা অষ্টাদশী মেয়েটিকে আজ রাতের অন্ধকারে সে চিন্তে পার্ছে না যেন! সুধা বল্লো—আমি আস্ছি দাদা,—একটু মিষ্টি খেয়ে যাবে। বোনের কাছে এসে মিষ্টি মুখ না ক'রে যেতে নেই।

কয়েক মিনিট পরে সুধা ফির্লো। একহাতে তা'র খাবারের থালা, আর একহাতে একটি মেয়ে। সুধা হাসিকে টেনে এনেছে—তার জন্যে তা'কে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হ'য়েছে। হাসি কিছুতেই আস্বে না! হাসিকে কোলের মধ্যে নিয়ে সুধা তা'র মাথাটি তুলে ধ'রে বল্লো—মুকুলদা' পছন্দ হয়? না দেখে মত করতে আমি বল্ছিনে; হাসি কিন্তু আমার চেয়েও দেখ্তে ভাল, নয় কি?

হাসির দিকে চেয়ে মুকুল চম্কে উঠ্লো। কে যেন ছেলেবেলার সুধাকেই আবার ফিরিয়ে এনেছে! ঐটুকু সময়ের মধ্যে সুধা হাসির চুলগুলি বেশ ক'রে বেঁধে দিয়েছে। পরনে একখানি সুন্দর ডুরে-শাড়ি। পায়ে আল্তা। কপালে সিঁদুরের টিপ। হাতে কয়গাছি সোনার চুড়ি চিক্-চিক্ করছে। বেশের বাহুল্য নেই। তবু প্রদীপের সেই

স্নান আলোয় হাসিকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। দিদির কথায় হাসি অত্যন্ত সংকোচে মুকুলকে প্রণাম ক'রে ছুটে পালালো।

সে রাত্রে দিদির গলা জড়িয়ে হাসি কেঁদে বল্‌লো—আমার জন্যে কেন তুমি ওঁকে বলতে গেলে দিদি! যদি ওঁর পছন্দ না হয়?

সুধা বল্‌লো—সে ভাবনা আমার! যদি না চাস তাহ'লে বুঝে বারণ ক'রে দি।

—তোমার কষ্ট হবে না দিদি?

সুধার চোখে জল, বল্‌লো—কষ্ট? আমার জিনিষ আমি দিচ্ছি। যে দান করে তার বুঝি আবার কষ্ট হয়?

দিদির বুকে মাথা রেখে হাসি মহা তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো। বেচারা জান্‌লোও না, চোখের জলে সেরাত্রে দিদির বুক ভেসে গেছে। হায় পঞ্চদশী নবযৌবনা অনূঢ়া! ঐ দিদিরই বুকের ওপর মাথা রেখে হয়তো হাসি মুকুলের কত স্বপ্ন দেখেছে।···

মুকুল রাজি হ'য়েছে—বাবা-মার আনন্দের শেষ নেই। বিয়েরও আর মাত্র দিন-পনেরো বাকি। মুকুল সেদিনও এসেছিল—সুধার সঙ্গে সে অনেক গল্প ক'রে গেছে। সুধা কত ঠাট্টা করেছে,—মুকুল হেসে জবাব দিয়েছে। হাসি ভাবে, দিদি এমন ক'রে নিজেকে লুকালো কেমন ক'রে! আর মুকুলদা'? ও হয়তো দিদির কথা কিছুই জান্‌লো না কোনদিন! সামনে দিদি হাসে, ঠাট্টা ক'রে, তাতে কিন্তু হাসির চোখে জল আসে—ওর মনে হয়, সেই হাসির মধ্যে অশ্রু লুকানো। দিদি যখন একলা থাকে, হাসি ওকে লুকিয়ে লক্ষ্য করে। হাসির মনে শান্তি নেই। মুকুলকে না পেলে হয়তো কাঁদবে, কিন্তু মনে হয়, দিদির হাসিঠাট্টার চেয়ে সে কান্না ঢের বেশী লঘু।

দিদিকে বেশীক্ষণ না দেখ্‌লে হাসি তাকে খুঁজে বেড়ায়। সেদিন দেখ্‌লো দিদি একলা ছাদে ব'সে। সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি। হাসি বল্‌লো—দিদি তুমি ছাদে এসেছো, আমাকে ডাকনি?

সুধা বল্‌লো—তুই গা' ধুলি, তারপর সাজগোজ করছিলি, ইতিমধ্যে আমি একটু হাওয়া খেয়ে নিচ্ছি—আজ আল্‌তা পর্‌লিনে যে বুড়ি? ··চ', পরিয়ে দিগে'।

—না আজ থাক। কেমন চাঁদ উঠেছে, দেখেছো দিদি?

সুধা হেসে বল্‌লো—তা দেখেছি; দেখ্‌বার জন্যেই তো এলাম, কিন্তু তোর চাঁদ কই? তারও যে আস্‌বার কথা ছিল—আর কতদিন আছে রে বুড়ি—[illegible]দিন না?

—যাও, তোমার খালি ঠাট্টা! দিদি, চল নীচে যাই।

—কেন রে? চাঁদের আলো ভাল লাগছে না?

—না ভাই, আমার ভারি কান্না পাচ্ছে।

—কেন মুকুলের জন্যে মন-কেমন-কর্‌ছে বুঝি?

—তা নয়। দিদি, এই জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে আমার কি মনে হচ্ছে জান'? মনে হ'চ্ছে, আজ প্রকৃতি যেন তোমারই মতো একলা উদাস ছন্নছাড়া হ'য়েছে। মনে হয়, সে যেন তোমারই হাসি চুরি করেছে...তার হাসি কান্নায় ভেজা! দিদি, তোমাকে না দেখ্‌লে জ্যোৎস্নাকে আমি এমন ভাবে কখনই দেখ্‌তে পেতাম না। চাঁদের আলো নানা জনের কাছে নানাভাবে দেখা দেয় না ভাই?

সুধার চোখে জল। হেসে বল্‌লো—তুই বুঝি আজকাল কবিতা লিখিস্‌ হাসি—তা ভালই হোল, মুকুলদা'ও বেশ কবিতা লেখে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে হাসির বিয়ের দিন-চারেক আগে সুধার নামে একখানা 'টেলিগ্রাম' এলো। এক দেবর লিখেছে—যদি ভাল থাক বৌদি, পত্রপাঠ চ'লে এসো। 'মধুর' ভয়ানক অসুখ, তোমাকে সে রাতদিন খুঁজছে—সে বোধ হয় আর বাঁচে না।

সুধার বুক কেঁপে উঠ্‌লো। মধুকে যে সে আঁতুড় থেকে মানুষ করেছে। মাতৃহারা অপোগণ্ড শিশুগুলির মধ্যে মধুই সব চেয়ে ছোট। সুধা সেইদিনই রওনা হ'লো। হাসির বিয়ে, মায়ের চোখের জল, মুকুলের স্মৃতি কোন-কিছুই তাকে বাধা দিতে পারলো না। সুধার চোখে বিহ্বলতা ও ভীতি দেখে মনে হয় না যে এই মেয়েটিই একদিন সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে মুক্তি চেয়েছিল। ভগবান জানেন, মাতৃত্বের চেয়ে বড় জিনিষ নারীর জীবনে আর কিছুই নেই! মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মধু বড়মাকে খুঁজছে—সুধা তাই শুনেই পাগল হ'য়ে ছুটেছে।

বিদায়ের সময় হাসি দিদির গলা জড়িয়ে ধরলো। সুধা তার মুখে চুমো খেয়ে বললো—বুড়ি, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে লিখিস সব। মানুষগুলি কেমন, আর বরই-বা কি বলে—লিখতে ভুলিস নে, কেমন?

হাসি দিদির পায়ের ধুলো নিলো।

বিয়ে হ'য়ে গেলো। তার এক সপ্তাহ পরে সুধা হাসির চিঠি পেলো। হাসি লিখেছে—মস্ত বড় চিঠি। তার মধ্যে মুকুলের সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। হাসি লিখেছে—আমাকে উনি মোটেই অনাদর করেন নি দিদি। মানুষটি এতো ভাল যে কি বলব! তোমাকে উনি কত যে শ্রদ্ধা করেন তাতো জানই। তোমার সম্বন্ধে কত দুঃখ করছিলেন। একটা কিন্তু মজার কথা শোন। উনি আমাকে বারবার আদর ক'রে বলেন—বিয়ের সময় তুমিও নাকি ঠিক আমারই মতো ছিলে। হাঁ দিদি সত্যি? আমরা দু'জনে কি যমজের মতো দেখতে?…

হাসির চিঠিখানি নিয়ে সুধা বাইরের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ ব'সে রইলো—এমনি ভাবে সে আরও একদিন বসেছিলো। দু'বছর আগে এমনি একদিনে মুকুলের চিঠি এসেছিলো। সে চিঠি কোথায় যে গেছে কে জানে! মুকুল বলেছে—দু'বোনে যেন যমজ। হবেও বা! সন্ধ্যার প্রাকালে আজো দূরে চক্রবালসীমায় অস্তমান সূর্য্যের অভিনব সেই বৈচিত্র্য—আলো ও ছায়া, জীবন ও মৃত্যুর লীলা-কৌতুক।…

সুধার ছোট-ছেলে 'মধু' বেঁচে উঠেছে।

শ্রীজগৎ মিত্র

বিচিত্রার দপ্তর

[বিশ্বামিত্র]

উদ্ভিদের চক্ষু

"পুত্তলিকার চক্ষু আছে কিন্তু দেখিতে পায় না।" উদ্ভিদের চক্ষু নাই, কিন্তু দেখিতে পায়—জীবের ন্যায় একজোড়া জলজলে আঁখি না থাকিলেও দেখিতে পায় এমন কোন ব্যবস্থা আছে। কথাটা সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে। মার্কিণের ওয়াসিংটন সহরে সরকারী পরীক্ষাগারে বিবিধ পর্য্যবেক্ষণের ফলে ইহা নির্ণীত হইয়াছে। যে রং উদ্ভিদের বৃদ্ধি বা পুষ্টির পক্ষে সহায়ক নয় সেইদিকে সে অবনত হইয়া পড়ে। তা' ছাড়া কোন কোন উদ্ভিদের রং-বিশেষের প্রতি বিজাতীয় বিতৃষ্ণা, অথচ অন্য উদ্ভিদের তত নয়। কৃত্রিম ঘোরবর্ণ আলোকমাত্রই উদ্ভিদের বৃদ্ধির হানিকর। যে দিকে বেশী আলো পড়ে সেই দিকে তাহার পুষ্টি অল্প হয়। লাল এবং পীত আলোক অধিকাংশ উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায়-স্বরূপ। সবুজ ও নীলাভ বেগুণে রংয়ের আলোক হানিকর—ইহাতে গাছগুলি নুইয়া পড়ে।

এই তথ্য অভ্রান্ত সত্য প্রমাণিত হইলে ফসল উৎপাদনে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই।

পৃথিবীতে মোটর গাড়ী কত ?

পশুর এখন পোয়া বারো। মানুষে টানিতেছে রিক্সা গাড়ী, আর গো-মহিষ-ঘোড়ারা যানবাহন হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। শুধু তাহাই নয়; যে সকল পশু এখনও বোঝা বহিতেছে তাহাদের জন্য পশুক্লেশ-নিবারণী সভা আছে। মানুষের দুঃখ-ক্লেশ নিবারণ করে কে? মোটর-ব্যবসায়ীরা তাড়াতাড়ি তাঁহাদের গাড়ীর উল্লেখ করিবেন; কিন্তু গাড়ী চড়িবার ভাড়া যোগাইতে মানুষের প্রাণ যে ওষ্ঠাগত!

মোট কত মোটর গাড়ী এখন সারা পৃথিবীতে চলিতেছে তাহার হিসাব দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। সংখ্যায় উহা সাড়ে তিন কোটি! মার্কিণের "অটোমোবাইল" পত্রের তরফ হইতে গাড়ীর সেন্সস গণনা করা হয়। গণনার ফলে জানা গিয়াছে যে, এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, ওশেনিয়া এবং নানা দ্বীপপুঞ্জে বর্ত্তমান বর্ষের ১লা জানুয়ারী তারিখে ৩৫৮৭১৯২৩ খানা চড়িবার গাড়ী ও ২৫৬৫৮৮৯ খানা সাইকেল চলাচল করিয়াছিল। এক বৎসরে ব্যবহৃত গাড়ীর সংখ্যা ৩০২১৫৩০ খানা বাড়িয়াছে। কি চক্রবৃদ্ধি হারে সংখ্যা বাড়িতেছে, মোটর-রাক্ষস কি ভাবে শ্রমিকের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে তাহা ভাবিলে প্রকৃতই হতবুদ্ধি হইতে হয়।

১৯৩৯ সালে গমের দুর্ভিক্ষ

পণ্ডিতদের মাঝে মাঝে টনক নড়ে। কবে এই পৃথিবী ধ্বংস হইবে, জ্যোতির্ব্বিদেরা সময় সময় তাহার ভবিষ্যবাণী প্রচার করেন; কি কি কারণের উপর ঐ বাণীর ভিত্তি তাহারও লম্বা ফিরিস্তি দেন। কিন্তু এই অতিবৃদ্ধা বসুমতীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই—যেমন চিরকাল চলিয়া আসিতেছে সে তেমনই চলিতে থাকে!

সম্প্রতি আর এক দল পণ্ডিত গমের হিসাব লইয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াছেন। পৃথিবীতে যেভাবে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে সেই পরিমাণে গম উৎপন্ন হইতেছে না। তাঁহাদের মতে যত জমি চাষ-আবাদের উপযোগী বা যাহাতে বর্ত্তমানে চাষ চলিতেছে তাহা হইতে উৎপন্ন গম বড় জোর ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত প্রয়োজনমত হইবে, তাহার পরেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু গমের দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে; অতএব এখন হইতেই কৃত্রিম উপায়ে ও সুকৌশলে ফসলের পরিমাণ বৰ্দ্ধিত করা আবশ্যক। তাঁহারা বলিতেছেন—বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সাহায্যে ও নূতন নূতন সার-যোগে ফসলের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। উক্ত উপায়ে যেখানে

গাছ আদৌ জন্মিত না এখন নাকি সেখানে গাছ বেশ গজাইতেছে, যে গাছে দু'একটা পাতা গজাইতে মুস্কিল বাধিত এখন ৫০৬টা পাতা দেখা দিতেছে। দুর্ভিক্ষের আতঙ্কের কারণ থাক্ বা থাক্, ফসলের বৃদ্ধি অর্থে মূল্যের হ্রাস, ইহাই পরম লাভ। লোকে সস্তায় পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।

বৃক্ষারোহী ছাগ ও মেষ

পশুদের মধ্যে ভল্লুক গাছে চড়িয়াও মানুষকে তাড়া করে, শুনা যায়। কিন্তু আহারের জন্য ছাগল ও ভেড়া যে প্রকাণ্ড বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় উঠিয়া উদর-পূর্ত্তি করে তাহা এ পর্য্যন্ত অবিদিত ছিল। ডেভিড ফেয়ারচাইল্ড নামক বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিদ সম্প্রতি ভারতবর্ষ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও মরোক্কো দেশ পর্য্যটনে আসেন। উদ্দেশ্য অবশ্যই উদ্ভিদ-তথ্য-সংগ্রহ।

মরোক্কো ভ্রমণকালে বৃহৎ বৃক্ষে একপাল ছাগল ও ভেড়া যথেচ্ছা চরিতেছে দেখেন। শাখা হইতে শাখান্তরে সহজেই ঈষৎ লাফাইয়া লাফাইয়া তাহারা উঠিতেছে নামিতেছে, পিছনের দুই পায় ভর দিয়া সমুখের পা দিয়া ডাল হইতে কচি পাতা ছিঁড়িয়া খাইতেছে, ইহা দেখিয়া বিস্মিত হন। যেমন উহারা দেখিতে পাইল যে, তরুতলে মানুষ উহাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ছবি তুলিতেছে, অমনই তাহারা নামিয়া দৌড় দিল—ভোঁ দৌড়, উপত্যকার উপর দিয়া, কাঁটা গাছের ঝোপ পার্শ্বে রাখিয়া।

ছাগ ও মেষ গৃহপালিত পশু, আদিম যুগ হইতে মানুষের সাথী। ইহারা যে গাছে চড়িয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে, ইহা অভিনব সত্য। রাখালের শিক্ষার গুণে কি ?

দেড় শত বৎসর বাঁচিবার উপায় কি ?

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু'—জন্মিলে মরিতেই হইবে। পুরাতন কথা এই, জানে সবাই ; কিন্তু মরিতে চায় কে ? যদি অমর হই !—এই কামনা আদি-যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। জীবনে দুঃখবেদনা যথেষ্ট থাকিলেও অমরত্ব-লাভের জল্পনা-কল্পনা প্রচুর, চেষ্টা-যত্ন অশেষ। প্রতীচ্যের লোকেরা এত কল্পনাবিলাসী নয়। তাই তাহারা বানরের গ্রন্থি নরদেহে সংযুক্ত করিয়া দীর্ঘায়ু হইবার প্রয়াসী, খাদ্য-তারতম্যে পরমায়ু-বৃদ্ধির নানা উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। সম্প্রতি চিকিৎসকমণ্ডলী হইতে ফতোয়া বাহির হইয়াছে যে, দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিবার উপায়—রন্ধন-বর্জ্জন ও কাঁচা দ্রব্য ভক্ষণ !

ডাঃ রৌচাকফ্ দিগ্বিজয়ী বৈজ্ঞানিক। নানা তদন্তের পর সম্প্রতি ইনি পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটে নিজ তদন্তের ফলাফল পাঠাইয়াছেন। বহু পরীক্ষান্তে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"রন্ধন-করা দ্রব্য ভক্ষণে অজীর্ণতার উদ্ভব, এ জন্যই রক্তে শ্বেত-কোষের আধিক্য হয়। কাঁচা জিনিষ খাইলে তাহা হয় না। অস্থি-মেদকে কারখানা বলা যাইতে পারে, উহাতে লাল ও সাদা কোষগুলি তৈয়ার হয়। ঐ শ্বেতবর্ণ কোষেই শরীরের পুষ্টি। সুতরাং রন্ধনের চিরাচরিত অভ্যাস ত্যাগ করিলে ও কাঁচাজিনিষ আহারের প্রথা প্রচলিত হইলে দেড় শত বৎসর আয়ু-লাভ আদৌ বিচিত্র নহে।"

৫ বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন বিজ্ঞ চিকিৎসক এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, অপর প্রাণীর যকৃতের সারাংশ ভীষণ রক্ত-হীনতা পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে সক্ষম। এই কথায় সকলেই ব্যঙ্গ করেন। এখন কিন্তু উহাই চিকিৎসা সম্মত প্রণালী বলিয়া নির্দিষ্ট। ডাঃ রৌচাকফের সিদ্ধান্তও হয়ত অনুরূপ সফলতা লাভ করিবে, কে জানে! কিন্তু মানুষ রন্ধনের মোহ কোন কালে ছাড়িতে পারিবে কি ? জিহ্বা যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে !

অন্ধ-শিক্ষার জন্ম-কথা

লুই ব্রেলের খ্যাতি পৃথিবী-ব্যাপ্ত—অন্ধদিগকে সহজে শিক্ষাদানের নূতন প্রণালী উদ্ভাবন হেতু। নিয়তি যাহাদের প্রতি বিরূপ ব্রেল তাহাদের পরম সুহৃদ্। ভুক্তভোগী বলিয়া তাঁহার এই সৌহার্দ্য অকৃত্রিম—যশোলিপ্সার গন্ধ তাহাতে আদৌ নাই।

৩ বৎসরের শিশু ব্রেল একদিন পিতার দোকানে খেলিতে যায়। সে আজ শতাধিক বর্ষের কথা। শিশু

দোকান হইতে একটা ক্ষুরধার যন্ত্র তুলিয়া লয়। যন্ত্রটা গুরুভার; সামলাইতে না পারায় উহা তাহার চক্ষের উপর পড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু ফুলিয়া উঠিল—ফলে শিশুর দু'টি চক্ষুই নষ্ট হইয়া গেল।

এই দুর্ঘটনাই কিন্তু তাহাকে পরবর্ত্তী কালে অন্ধদিগের প্রধান নায়ক পদে বরণ করিল। গুটেনবর্গ অন্ধের জন্ত ছাপার অক্ষর আবিষ্কার করেন। ব্রেল তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিলেন। তাঁহারই উদ্ভাবিত পদ্ধতিক্রমে অন্ধেরা অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা অক্ষর দেখিতে শিখিল।

দশমবর্ষে ব্রেল অন্ধ-বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরিত হন। বিদ্যালয়ে অক্ষর এবং অঙ্কশাস্ত্র ও গানবাজনা শিক্ষা করেন। ১৬ বৎসর বয়সে কাপড়ে বুটি তোলার মত embossed অক্ষর সংক্রান্ত নিজ প্রণালী উদ্ভাবন করেন এবং অভিনব শ্লেট তৈয়ার করিয়া তাহাতে ঐরূপ অক্ষর লিখিয়া যাহাতে অঙ্গুলিস্পর্শে অন্ধেরা অনায়াসে তাহা পড়িতে পারে এরূপ ব্যবস্থা প্রচলন করেন। পরে যখন একটি অন্ধ-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন তখন উচ্চ 'ফুটুকি' মাত্র দিয়া লিখন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন। অদ্যাবধি ঐ উপায়েই অন্ধদিগের জন্ত পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। সরু যন্ত্রসাহায্যে সূক্ষ্ম উচ্চ 'ফুটুকি' তৈয়ার করা হয়। ইহা দ্বারা নানাবিধ সাহিত্য-গ্রন্থ, সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রভৃতির শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে।

তবে উহা ছাপিবার ব্যয় বিস্তর। ২০০৲ টাকায় সাধারণ যে পুস্তক ছাপা যায়, অন্ধদিগের পঠনের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাতে ২০০০৲ খরচ পড়ে। এজন্ত পরহিতব্রতী সদাশয় নরনারীগণ টাইপ-রাইটিং কলে বিনা পারিশ্রমিকে তাহা প্রস্তুত করিয়া দেন। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া রেড্‌ক্রশ্‌ মিশন-দল লক্ষ লক্ষ শ্লেট ও পুস্তক এইভাবে তৈয়ার করিয়া পরোপকার-বৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন।

এমন নিঃস্বার্থ কষ্টসাধ্য কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে আমরা কবে শিখিব? সেই দিনটাই গণিতেছি।

আমি প্রতিভাবান কিনা?

কাহার ভিতর কি শক্তি নিহিত আছে, কে জানে! নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির নাম প্রতিভা। এই প্রতিভার বীজ রবীন্দ্রনাথে, এডিসনে, কার্ণেগীতে অন্তর্নিহিত; তোমাতে আমাতে যে নাই, কে বলিল? পরিচয় পাইলে সেই শক্তি-বিকাশের প্রেরণা ও চেষ্টা আসিবে। তাহার সন্ধান লইবার সহজ পন্থা কি? মার্কিনে মিঃ কে, বি, মরে তাহার একটা উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ধরুন একটা কথা—অপসরণ। মোটা কড়া কাগজ ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া প্রত্যেকটায় অ, প, স, র ও ণ লিখুন, লিখিয়া টুকরাগুলা উলটপালট করিয়া বন্ধুর হাতে দিন। বন্ধু মাথা না ঘামাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সামান্ত মানসিক চিন্তার ফলে যদি বলিয়া দিতে পারেন যে কথাটা কি, তাহা হইলে বুঝিবেন যে তাঁহার ভিতর এমন শক্তি বর্ত্তমান যাহা স্ফুরণের অপেক্ষায় আছে। চাই ধৈর্য্যের সঙ্গে তাহার অনুশীলন—তাহাতেই প্রতিভা অবশেষে ফলেফুলে আত্মবিকাশ করিবে। এটা নয়, ওটা নয়, এই ভুল হইল, এইবার ঠিক হইবে—ঐভাবে যদি বন্ধু অবশেষে কথাটা বাহির করেন, বুঝিতে হইবে তাঁহার ভিতর প্রতিভার ছাপ নাই।

প্রকাণ্ড দেহ, বলিষ্ঠ মাংসপেশী, দুর্দ্ধর্ষ শারীরিক বল প্রতিভাবানের প্রয়োজন নাই। চাই শুধুই সজীবত্ব বা জীবনধারণের উপযোগী বল। প্রতিভাবান মাত্রেই কঠোর পরিশ্রমী। সেজন্ত সুস্বাস্থ্য ও প্রচুর সুবিধা-সুযোগ যে অত্যাবশ্যক তাহা নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান সাহিত্যিক গেটের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন না কোন সমস্যা ভাবিতে ভাবিতে তিনি রাত্রে শয়ন করিতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরান্তে প্রায়ই স্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠিতেন, দেখিতেন স্বপ্নেই তাঁহার সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ কাগজে উহা লিখিয়া রাখিতেন। সঙ্গীত-সম্রাট মোজার্ট সর্ব্বদাই সুর-রচনায় ব্যস্ত থাকিতেন—আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, কত অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রতিভার পূর্ণবিকাশ সম্ভব। তবে তোমাতে আমাতে প্রতিভার বীজ উপ্ত আছে কিনা তাহার নির্ণয় জন্ত মরে সাহেব মাত্র একটা ইঙ্গিত করিয়াছেন।

পুরুষ বেশে নারী

পুরুষের ছদ্মবেশে নারী !—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিরল নয়। সম্প্রতি এক মহিয়সী মহিলার কাহিনী নূতন করিয়া আলোচিত হইতেছে। 'কোথায় তুলনা তুমি এ মহী-মণ্ডলে !' মহীমণ্ডলে না হউন, বিলাতে ইনি অদ্বিতীয়া। জেমস্ বারি নামে ইনি পরিচিতা ; তিনি স্কটল্যাণ্ডের এক অভিজাত-বংশের কন্যা। তাঁহার জন্ম ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে। পুরুষ বেশে ও উক্ত নাম লইয়া ইনি এক হাসপাতালের কর্মচারী নিযুক্ত হন ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে। তাহার পর ক্রমশঃ এসিষ্টান্ট সার্জ্জেন, সার্জ্জেন-মেজর, ডেপুটি এসিষ্টান্ট জেনারেল পদে উন্নীত হন ; পরিশেষে ১৮৫৮ অব্দে সামরিক চিকিৎসা-বিভাগের বড় কর্ত্তা বা ইন্স্পেক্টর জেনারেল পদ প্রাপ্ত হন। ইংলণ্ডের উত্তরাংশে বিসূচিকা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইলে এই ভীষণ ব্যাধি প্রশমনের জন্য ইনি যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রচলনে সফলতা লাভ করেন তাহা দেখিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। লর্ড এবারসলি বলিতেন যে, এমন যোগ্য চিকিৎসক কমই দেখা যায়। মাল্টা, কেপ কোলনি প্রভৃতি সুদূর বিদেশেও ইনি সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। ১৮১৫ সালে ইঁহার পরলোক গমনের পর তবে লোকে জানিতে পারে যে, ইনি পুরুষ নন—নারী !

গোঁফদাড়িবিহীন প্রকাণ্ড মুখ, রক্তবর্ণ মাথার কেশ, চোয়ালের হাড় উঁচু, অথচ দেখিতে ছোকরার মত, এই তাঁহার চেহারা। মেয়েলি ভাব তাঁহার ভিতর বেশ উঁকি মারিত। অথচ প্রকৃতি কলহপ্রিয়—তিনি মারামারির অপ্রবৃত্ত ছিলেন। একবার দুইবার বিদেশ হইতে গ্রেপ্তার হইয়া বন্দীবেশে দেশে আনীত হন। তাঁহার জীবনব্যাপী সঙ্গী ছিল এক কৃষ্ণকায় চাকর। সেই সম্ভবতঃ জানিত যে, জেমস্ বারি পুরুষ নন—স্ত্রী। ইঁহার শেষ অনুরোধ এই ছিল, মৃত্যুর পরেও যেন তাহার 'পোষ্ট মর্টেম' পরীক্ষা না হয়—অথচই ছদ্মবেশ ধরার মাথায় উঠেছে। বারি যখন মৃত্যু-শয্যায়, নার্সেরা তাঁহার পরিচিত বন্ধাদিবাহুল্যে বিস্মিত হন। অন্তরালকালে দ্রৌপদীর যেমন বস্ত্রের অন্ত ছিল না, বারিরও তিদ্ নাই।

মিস্ নেপোলিয়ন—'শিশু ঈগল'

ফরাসী ধরনীর না হইলেও এককালে প্রায় সমগ্র ইউরোপের অধীশ্বর—সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার অধস্তন পুরুষ জীবিত আর নাই। সম্প্রতি একটি অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার সন্ধান মিলিয়াছে।

বালিকার নাম কলেট। পিতার নাম মসিয়ে রিবেট। ফরাসী রাজধানী প্যারি হইতে পঁচিশ ক্রোশ দূরে এক গণ্ডগ্রাম—নিকটেই বিখ্যাত অরণ্যানী। এই গ্রামে কলেটদের বাস। সম্রাট নেপোলিয়নের শোণিত-ধারা এই বালিকার ধমনীতে প্রবাহিত। তবে তাহাকে সরাসরি বংশধর বলা চলে না, কারণ সে তাঁহার জারজ-সন্তান কোম্‌ৎ লিও নেপোলিয়নের সন্ততি। শেষ বয়সে যদি বোনাপার্টির ভাগ্য-বিপর্যয় না ঘটিত, কে জানে, এই বালিকা হয়ত রাজ-সিংহাসনের দাবি করিতেও পারিত। গ্রীসের রাজকুমার জর্জ্জের জায়া প্রিন্সেস্ মেরী এই বালিকার ধর্ম্মমাতা।

বালিকার প্রকৃতি মিষ্ট ও মধুর—গ্রামস্থ সকলেরই সে অতি প্রিয়। সম্রাট নেপোলিয়নকে লোকে "ঈগল পক্ষী" বলিয়া অভিহিত করিত। বালিকাকে লোকে "শিশু ঈগল" বলিয়া ডাকে ; তাহাতে সে মৃদু হাসে। গ্রামের অপর বালিকার সহিত তাহার পার্থক্য এই, সে এই আট বৎসর বয়সেই ফরাসী ইতিহাসে বিশেষ ব্যুৎপন্না, নেপোলিয়নের জীবনী—অদ্ভুত উত্থান ও পতন সম্বন্ধে সকল তথ্য তাহার কণ্ঠাগ্রে। নেপোলিয়নের শৈশবাবস্থার একখানি চিত্র সে নিজ শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া প্রতি রাত্রেই প্রার্থনা করে—'ভগবান ! সম্রাটকে তোমার নিকটে রাখিয়া পরম সুখী করিও।' বালিকার পূর্ব্বপুরুষ কোম্‌ৎ লিও নেপোলিয়নের ইতিবৃত্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট বিশ বৎসরের এক যুবতীকে দেখিয়া বিমোহিত হন। যুবতী দীর্ঘাকার, ক্ষীণাঙ্গী, তাহার মাথার কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ভ্রমর-কৃষ্ণ তাহার নয়ন-যুগলে নক্ষত্রের দীপ্তি, কণ্ঠস্বরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ। এই যুবতীর নাম লুই ইলিওনর। সম্রাটের সহোদরা প্রিন্সেস ক্যারোলাইন মুরাটের ইনি সহচরী ছিলেন। ইঁহারই গর্ভজাত সন্তান লিও। এই পুত্রকে

নিষ্কলঙ্ক করিবার জন্ত সম্রাট মহিষী-জোসেফাইনকে প্রস্তাব করেন যে, তিনি যেন উহাকে স্বীয় গর্ভজাত পুত্র বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু মহিষী তাহাতে সম্মত হন নাই। ভগিনী ক্রিশেল মুরাটের পুত্রকন্যার সহিত একত্রে লুইর শিক্ষা দীক্ষা সম্পন্ন হইতে থাকে। সম্রাট বিস্তর ভূসম্পত্তি উহার নামে লিখিয়া দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা লুইর হস্তগত হয় নাই। সহসা সম্রাটের পরাজয় ও দুর্দশা আরম্ভ হইলে লুই বিশেষ বিপন্ন হইল—তখনও সে বালক। বন্ধু-বান্ধবেরা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এমন কি তাহার জননীও কলঙ্কের পসরা বহিয়া বেড়াইতে অসম্মতা হইয়া স্বীয় মাতৃত্বও অস্বীকার করিল।

লুইর বাকি জীবন দুঃখ-কষ্টে অতিবাহিত হয়। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে তাহার মৃত্যু হইলে একমাত্র কন্যা শার্লট্ পৃথিবীতে একা ও কপর্দকহীন। পাদ্রিদের সাহায্যে শার্লট কিছু লেখাপড়া শিখিয়া শিক্ষকতার কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি মসিয়ে মেস্‌নারকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার কন্যা লিয়ন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মুসো রিবেট নামক এক ফরাসী স্থপতিকে বিবাহ করেন। ইঁহাদেরই কন্যা কলেট। অষ্টমবর্ষীয়া হইলেও দুঃসাহসিক কার্য্যের প্রতি কলেটের প্রগাঢ় অনুরাগ। উড়ো জাহাজে চড়িয়া সারা পৃথিবী ভ্রমণের ও মহাসাগর পার হইবার জল্পনা-কল্পনায় তাহার প্রাণ তন্ময়।

১৫৬ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ জারো আঘা

পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লোক কে? মিঃ জারো আঘা। তাঁহার বয়স ১৫৬ বৎসর। তুরস্ক দেশের ছাড়পত্র লইয়া সম্প্রতি ইনি রোড্ দ্বীপ-পুঞ্জের প্রভিডেন্স নামক বন্দরে অবতরণ করেন। এই ছাড়পত্রে তাঁহার জন্মের উল্লেখ ছিল—১৭৭০ খৃষ্টাব্দ।

জারো পর পর বারোটি রমণীর পাণিগ্রহণ করেন—সকলেই অবশ্য গতায়ু। এক্ষণে তিনি যে-কোন রূপসী কামিনীর পাণিপ্রার্থী। আর প্রার্থী একসেট উৎকৃষ্ট কৃত্রিম দন্তের। মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য মার্কিন-বাসীদের উপদেশ দিতে তিনি সেখানে আসিয়াছেন।

জারো জীবনে কখনও ধূমপান করেন নাই। নিউইয়র্ক নগরের বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার রোগ পীড়া বিলকুল নাই, বার্দ্ধক্যের ভারে শিরাগুলি কিছু কঠিন হইয়াছে মাত্র এবং দক্ষিণ চক্ষে ছানি দেখা দিয়াছে, তদ্ভিন্ন অপর সকল বিষয়ে তাঁহার স্বাস্থ্য চমৎকার। দোভাষীদের সাহায্যে খুব উৎসাহের সহিত সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে ইনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

সংবাদপত্রের রিপোর্টারদিগকে গোপনে বলিয়াছেন যে সুন্দরীদের তিনি খুব পছন্দ করেন এবং ত্রয়োদশ পত্নীর যাচাই-বাছাই করিতে তাঁহাকে যেন উঁহারা সাহায্য করেন। আরও বলেন যে, তাঁহার জীবন খুব মধুময় ছিল। তাঁহার ১২টি স্ত্রী সকলেই তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। অবশেষে সানন্দে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, তাঁহার তৃতীয়া পত্নী তাঁহার খুব প্রিয়পাত্রী ছিলেন এবং সপ্তমাটি পরমা সুন্দরী বটে কিন্তু অত্যন্ত চপলপ্রকৃতি ছিলেন।

আঘা নিউইয়র্ক সহরে পৌঁছিয়া প্রথমদিন সারা সহর দেখিয়া বেড়ান। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া নমাজ পড়িতে থাকেন, কিন্তু মক্কা কোন্ দিকে তাহা নির্ণয় করিতে বহুক্ষণ বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন।

রাণীর আকাল

রাজরাণী হইব—কোন্ কুমারীর মনে না জাগে এই সাধ! এত কামনার ধন প্রত্যাখ্যান!—তাও হয়! দুর্ভাগ্য কাহার—রাজার না কুমারীদের?

বুলগেরিয়ার নৃপতি বোরিস যুবক—বয়স ৩৬, রূপবান, বুদ্ধিমান, সদাশয়, কিন্তু অনূঢ়। নৃপতি স্বয়ং ভবিষ্য-মহিষীর অন্বেষণে নিরত, পাত্রমিত্র ও প্রজাপুঞ্জও শশব্যস্ত। দেশে দেশে রাজবংশীয় কুমারীদের ব্যর্থ পাণিপ্রার্থনা, অভিজাত-মণ্ডলীর অনুনয়ের, নিমিত্ত নিষ্ফল আবেদন-নিবেদন। অদৃষ্টের পরিহাস!—হাঁ, তাহারই চরম দৃষ্টান্ত বৈ আর কি!

রাজা-বিনা রাজ্য অচল। রাণী-বিহনে রাজা অচল। রাজকার্য্যে কল্যাণীর পদ্মহস্তের স্পর্শ যে চাই—

দরবারে চাই, উৎসবে ব্যসনে ছোট-বড় সকল অনুষ্ঠানে চাই। কিন্তু সারা ইউরোপ ঘুরিয়াও রাণী জুটে কৈ? এযাবৎ প্রায় এককুড়ি বিবাহযোগ্যা রাজকুমারীর তরফ হইতে বিবাহ-প্রস্তাবে 'নামঞ্জুরী' আসিয়াছে। হিতৈষীগণ কিন্তু হার মানিতে নারাজ।

সম্প্রতি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বিশিষ্ট পারিষদ-সহ রাণী-সংগ্রহে অভিযান করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধানতম লক্ষ্য দিনেমার বা ডেনমার্ক। এই দেশ বহু রাজ্যের রাণী জোগাইয়া আসিতেছেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সাম্রাজ্ঞী এলেক্জান্দ্রা, রুশিয়ার জারিণা মেরী প্রভৃতি দিনামার রাজ-দুহিতা। ডেনমার্ক ইউরোপের 'শাশুড়ী' নামে খ্যাত। এই ডেনমার্কে এখন সহোদরা তিনটি বিবাহযোগ্যা রাজকুমারী—জ্যেষ্ঠা ফিওডোরা বয়স ২১, মধ্যমা কেরোলাইন ১৮ এবং কনিষ্ঠা এলেক্জেনড্রাইন ১৭ বর্ষ বয়স্কা। বুলগেরিয়ার মন্ত্রীবর পর-পর এই তিন জনকে বিবাহপ্রস্তাব করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। তিনজনেই বিমুখ হইলে সুইডেনের পরমা-সুন্দরী প্রিন্সেস্ ইনগ্রীদের শরণাপন্ন হইবেন, এই সঙ্কল্প। ইনিও অসম্মতা হইলে—? সে বিভ্রাটের সম্মুখে কল্পনা সত্যই পঙ্গু!

রাজারাজড়ায় ক'নের অভাব—ব্যাপার বিস্ময়কর অবশ্যই, কিন্তু কারণহীন নয়। প্রথমতঃ রাজার ধনাভাব। তাঁহার বাৎসরিক আয় ৭৫ হাজার টাকা মাত্র; সম্প্রতি সওয়া লক্ষে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই স্বল্প আয় হইতে কি বা তিনি চাকর-চাকরাণীর বেতন বাবদে, কি বা মহিষীর জহরতাদি-ক্রয়ে ব্যয় করিবেন! তাহার উপর কতকগুলি দুর্বৃত্ত প্রজা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রাজা ও রাজ-পরিবারস্থ লোকজনের নিধন-সাধনে সর্ব্বদা পাঁয়তাড়া কষিতেছে। একবার রাজার মোটরগাড়ীর উপর গুলিবর্ষণ হইয়াছিল। একটা গুলি তাহার গোঁফের কেশের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু গাড়ীতে উপবিষ্ট কয়জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হন। আর একবার এক উৎসবে নৃপতি আসিবেন সংবাদ পাইয়া দুর্বৃত্তেরা বোমা লইয়া সদলে উপস্থিত। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া কৌশল অবলম্বন করেন। ফলে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইলেও তিনি ত্রাণ পান; কিন্তু দলপতির সঙ্কেতক্রমে বহু বোমা একযোগে ফাটে; তাহাতে ১১২ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাণনাশ ঘটে ও ৩০০ জন আহত হয়। নিত্যই এরূপ ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কা। অনূঢ়া রাজকুমারীরা রাণী হইবার সাধে জলাঞ্জলি দিবেন, বিচিত্র কি?

অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকন্যা

অদ্ভুত কাহিনী ছায়াচিত্রের অঙ্গ। ভাগ্য-বিপর্য্যয়, রোমাঞ্চকর ঘটনা তাহার শিরায় শিরায়। বাস্তব জগতে তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও অসম্ভব নয়। অষ্ট্রিয়া-হঙ্গেরীর ভূতপূর্ব্ব সাম্রাজ্ঞী জিতা ও তাঁহার পুত্র অটো তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সাম্রাজ্ঞী চান অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকন্যা—১৮ বৎসর বয়স্ক পুত্রের জন্য।

জার্ম্মাণ মহাসমরে অষ্ট্রিয়া লিপ্ত হইলে রাজবধূ জিতা অত্যন্ত সন্তপ্তা হন। ফরাসী জাতির প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ও অনুরক্তিই নাকি তাহার কারণ। বৃদ্ধ সম্রাট ফ্রান্সিস তাহা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হন; রাজকুমার চার্ল্‌স্ তখন রণক্ষেত্রে। সম্রাট বধূকে ডাকাইয়া অনেক কটুকাটব্য করেন তাঁহার চিঠিপত্র না পড়িয়া তাঁহাকে দিতেন না এবং বধূকে রাজপ্রাসাদে বাস করিতে বাধা করেন। বৃদ্ধ সম্রাট পরলোকগমন করিলে বধূ সাম্রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইলেন। যুদ্ধের অবসানে অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ে তখন তাঁহাকে সুইজারল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিতা হইতে হয়। স্বামী সম্রাট চার্ল্‌স্ বহু চেষ্টা করিয়াও স্বদেশে ফিরিতে বিফল হন—মনস্তাপে বিদেশে স্বল্পকালের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিধবা সাম্রাজ্ঞী তখন ৭টি সন্তানসহ: এবং একটি গর্ভে ধারণ করিয়া অকূল পাথারে পড়েন—অসহায়, কপর্দ্দকহীন, পতির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যয়নির্ব্বাহেও অসমর্থা। স্পেনের রাজ্ঞী তাঁহার ভগিনী। অবশেষে সেইখানে আশ্রয় লন। পরে গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ট হইলে বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে একটি বাসস্থান প্রাপ্ত হন। সেইখানে দুঃখে কষ্টে কয় বৎসর কালযাপন করিতে থাকেন।

ভূতপূর্ব্ব সাম্রাজ্ঞীর মনের বল অসাধারণ। এখন তিনি পরলোকগত সম্রাটের বহু সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পুত্র প্রিন্স অটোকে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের না হইলেও অন্ততঃ হাঙ্গেরীর নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর। তদুপযোগী শিক্ষাদীক্ষাও তাহাকে দিয়াছেন। নৃপনন্দন অটো কিন্তু ১৭ বৎসরের বালক মাত্র। এই বয়সেই ইতালীর রাজকন্যা মেরিয়ার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিতে জননী উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। উদ্দেশ্য—তাহাতে অন্যান্য শক্তিশালী রাজন্যবর্গের সহায়তায় সিংহাসনপ্রাপ্তি সম্ভব হইবে। ইতালীর রাজা ও রাণী ও মহাপ্রতাপশালী মুসোলিনী পর্য্যন্ত ইহাতে অভিলাষী। বালক অটো মিষ্টভাষী, প্রতিভাবান, নানা ভাষাবিদ্ ও অতি প্রিয়দর্শন। রাজকুমারী মেরীও রূপসী ও বিদুষী। রাজপুত্র অটোর গতিবিধি লইয়া সারা জগতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, সাংবাদিকমহলে নানা জল্পনা। ইতালীর রাজকুমারীর সঙ্গে ভবিষ্য পরিণয়-বার্ত্তা লোকের মুখে মুখে। যাহা রটে তাহার কতকও বটে। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কি তাহা 'কালেন পরিচীয়তে।'

বিশ্বামিত্র

ভুলের ফুল

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

আজ বুঝেছি বিরাগ নহে,
রাগ নহে,—তোর অনুরাগ্ই ;
এখন থেকে কপট ঘুমে
চক্ষু বুজে' রইব জাগি'।
তুই সরমে সঙ্কুচিতা
কিসের ভয়ে সদাই ভীতা,
চাইতে গেলেই দৃষ্টি ফিরাস্,
কাঁপিস্ মৃদু পরশ লাগি' ;
রাগ নহে,—তোর অনুরাগ্ই ॥

ঘুম ভেঙে' আজ নিশীথ-রাতে
জ্যোছ্না-ঝরা শয্যা-'পরে
আধেক-বোঝা তন্দ্রা-ভেজা
চক্ষু চেয়েই, চক্ষে পড়ে—
আমার মুখে অপলকে
চেয়ে আছিস্ কোন্ পুলকে,
ধীরে ধীরে ঠোঁট দুটি তোর
নাম্‌ছে আমার অধর মাগি' ;
রাগ নহে,—তোর অনুরাগ্ই ॥

মত্ত দাদুরী

—গল্প—

—কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

"মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী"

কিন্তু এই নিতান্ত গদ্যময় ব্যাপারটাকে লইয়া কোনো-কালে কবিতা হইতে পারে, অতুল গাঙ্গুলী তাহা কিছুতেই স্বীকার করিত না। স্বীকার না করিবার কারণ ছিল—সে কবিতার মধ্য দিয়াই উক্ত প্রাণীটির ও তাহার মত্ত-ধ্বনির পরিচয় লাভ করে নাই, উহার প্রকৃত নাম ও উহার প্রাকৃত ডাক, দুইই তাহার আবাল্যপরিচিত! অতুলের বাড়ী একেবারেই পাড়াগাঁয়ে অর্থাৎ পূর্ব্ব-বাঙ্গলার একটা অর্দ্ধ-শহর অর্দ্ধ-গ্রাম মহকুমায়। আজ সে কলিকাতারই অধিবাসী—এই শহরকে সত্যসত্যই ভালোবাসে। কিন্তু তাই বলিয়া ড্রইংরুমে বা ক্লাবঘরে 'মত্ত দাদুরী' শুনিয়া কাব্যোন্মত্ত হইয়া ওঠার মত শহুরে বা সাহিত্যিক সে নয়।

কলিকাতার আকাশে এবার ইন্দ্রদেবতার আসন অচল হইয়াছে। মর্ত্ত্যলোকেরও কলিকাতাই ইন্দ্রপুরী;—তাই বুঝিয়াও বুঝিয়া ওঠা যায় না। এমনি সময় হঠাৎ কি ভাবিয়া আকাশের দেবতা একটু ক্ষান্ত হইলেন—বৈকালের শেষে বৃষ্টি থামিল। মেঘ-গম্ভীর, আকাশ স্তব্ধ হইতেই অতুল বাহির হইয়া পড়িল। বর্ষা-মসৃণ পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অতুল দেখিল সে কখন রেড্ রোডের পার্শ্ববর্ত্তী একটি গাছের তলায় একটি বেঞ্চে বসিয়া আছে। স্থানটি অপরিচিত নয়, কালটাও অস্বাভাবিক নয়, তথাপি যেন তাহার কাছে দুইটিই একটু অভিনব মনে হইল। প্রতিদিনের মত আজ গাড়ী নাই, ভিড় নাই, উচ্চকিত মোটরের দৃপ্ত গতি বা দৃপ্ত গর্জ্জন নাই।

অনেকদিনের পরিচিত মুখ যেমন অনেকদিনের অদর্শনের পরে দেখিলে চিনি-চিনি করিয়াও চিনিয়া উঠা যায় না, আজিকার এই জাতবর্ষণ কর্ম্মোদ্বেগমুক্ত সন্ধ্যাক্ষণটিও অতুল গাঙ্গুলীর নিকট তেমনি চেনা-চেনা বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু কোথায়, কবে যে ঠিক এমনিতর বর্ষাস্নাত কোমলতা ও অনির্বচনীয় অলসতার সঙ্গে তাহার নিবিড় পরিচয় হইয়াছিল, তাহাও মনে পড়িল না।—এই আর্দ্র অলসতা, এই কর্ম্ম-কোলাহলহীন অবসর, আকাশ-বাতাস-পৃথিবীর এমনি গা এলাইয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকা—তন্দ্রায় নয়, প্রাণহীন নির্জীবতায় নয়, শুধুই একটি অতি মনোরম, অতি রমণীয় আলস্যে—ইহা যেন তাহার খুবই পরিচিত—এত পরিচিত যে, যেন ইহার সহিত একটা অন্তরের যোগাযোগ সাধিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি ইহার এই রূপটি আর কোথায় তাহার চোখে পড়িয়াছে, অতুলের মনে পড়িলনা।

মাঠের মধ্যে হইতে একসঙ্গে অনেকগুলি ব্যাঙ্ হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল। অতুল চমকিত হইল—মনে পড়িয়া গেল—এই ধ্বনি, এই সজল মন্থরতা, এই মেঘ-সমাচ্ছন্ন আকাশ, এই বর্ষাস্নাত পৃথিবী তাহার কতদিনকার পরিচিত। কিন্তু ইহাদের সহিত কি তাহার অন্তরের যোগ হইয়াছে? কবে তাহা সাধিত হইল? সহসা বহুদিনকার বিস্মৃত সন্ধ্যার তিক্ততায় ও বিতৃষ্ণায় তাহার মন ভরিয়া গেল। ব্যাঙের ডাক্—অতুল কান পাতিয়া শুনিল—সমস্ত মাঠ ব্যাপিয়া তখন শুধু এই একটি শব্দ—সহস্র সহস্র কুৎসিত প্রাণীর কুৎসিত ধ্বনি!

ছোট্ট একটি কথা বা সামান্য একটু কণ্ঠধ্বনি যেমন করিয়া বিস্মৃত-প্রায় মুখখানিকে সুপরিচিত করিয়া তোলে, এই কুৎসিৎ ধ্বনি তেমনি করিয়া একনিমেষে অতুলের চেতন ও অচেতন লোকের মধ্যেকার রুদ্ধ বাতায়নটি খুলিয়া দিল! যে সন্ধ্যা সজল ও কোমল হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, নিমেষের মধ্যে তাহা বিরস, বিষাদ হইয়া গেল।

* * *

এমনি বৃষ্টি—সূর্য্য যেন আকাশে অতিথি, মেঘেই যেন সেখানকার অধিবাসী।

ঢেউ-টিনের ঘরের উপর প্রায় ক্লান্তি-হীন নৃত্য চলিতে থাকে—প্রথম প্রথম শুনিতে মন্দ নয়,—কিন্তু শেষে মন বিদ্রোহ করে।

বাতাসের ঝাপ্‌টা বাঁশের বেড়ার গায়ে সপাং সপাং করিয়া বেত মারিয়া যায়। অদূরের মাঠে দেহের উর্দ্ধভাগে আকাশের আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া ও অপরার্দ্ধে জল ঠেলিয়া চাষী 'রোয়া' রোপণ করিতেছে—ভাবিতে বেশ, দেখিতেও মন্দ নয়; কিন্তু তাহার উদাহরণেও এই কর্দ্দমাভিষেক ঠিক মনঃপূত হয়না। ঘর অসহ্য, বাহির অসম্ভব। তমসাস্পষ্ট ঘরের কোণে বই লইয়া বসিলেও মন বসে না, মনের ভিতরেও যেন বর্ষার আর্দ্র অলসতা সংক্রমিত হইয়াছে।

প্রতিবেশী মাঝে মাঝে দর্শন দেন—নিরুৎসাহ-চিত্তে সেই একই কথা—খাদ্যাভাব, মৎস্যাভাব, কাঠের অভাব। অভাবের দাসত্ব হইতে মুক্তির তাড়া নাই—ইচ্ছা নাই, শক্তিও হয়ত নাই—কিন্তু অভাবের অভিযোগ আছে।

পুঁটু তাহার স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘরে ঢুকিয়া একবার ভিজা চুলগুলি নাড়িয়া নিঙড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল —বাবা গো! বাঁচলুম!

অতুল একটু কৌতুক বোধ করিল, বলিল—কি বাঁচলিরে পুটু?

—বোলোনা, সেজদা, বোলোনা! দমবন্ধ হ'য়ে মরছিলাম। যে বৃষ্টি বাবা! বেরোবার উপায় নেই। দু' দু'বার পা বাড়িয়েছি কি মা ডাকলেন—'পুঁটি, বেরোস্‌নে বলছি এ জলে।' বাবা ঘরে—ঘরে ফিরে গিয়ে বল্লেন—'বেরোচ্ছি কোথায়? তুমি যেমন সব সময়েই মিছিমিছি হাঁকবে—'বেরোস্‌নে বেরোস্‌নে।' মা কি ছাড়েন?—সেই কাল ক'বার বেরিয়েছি, ক'বার ভিজেছি, কখানা কাপড় ভিজিয়েছি—কখানা কাপড় শুকোয়নি—রান্নাঘর থেকে সে-সব মাথা মুণ্ড ব'কে চল্লেন। ভাগ্যিস্ বাবা মায়ের বকর-বকরে কান্ দেননা—তুমি শুনছনা, মেজদা?

—পাগল! না শুনে পারি? বেশ। তোর বাবা তোর মায়ের কথায় খুব কান দেন, বেশ, বল্ এখন।

—ছাই শোনেন বাবা মায়ের কথা, ছাই শুনেছ তুমি আমার কথা—মাথামুণ্ড হিজিবিজি ওগুলো না রাখ্‌লে আমি বাড়ী চল্লেম!

খোলা বই রাখিয়া দিয়া অতুল বলিল—না, বই আমি পড়ছিনে। বল্ এবার।

—বাবা গেছেন বাইরের ঘরে—কে যেন হাঁকছিল, 'নায়েব বাবু, নায়েব বাবু', আমিও সেই সুযোগে পিছনের দুয়ারটা দিয়ে পালালুম। মা দেখে গাল পাড়তে লাগলেন, 'আজকে আবার চুল কাপড় ভিজিয়ে জ্বরে পড়বি—তখন ত আমাকেই ভুগ্‌তে হবে! হাড় জ্বালালে অলক্ষুণে মেয়ে।' কে শোনে সেসব কথা? একছুটে তোমার কাছে এসে হাজির!

—তা তুই এলি কেন? না এলেও ত চল্‌ত।

—কেমন ক'রে, শুনি? তুমি যেতে আমাদের বাড়ী? যেত মাসীমা? বলোনা, বলোনা? মিনু পোড়ারমুখী শ্বশুর-বাড়ী গেছে, আর তোমাদের বেড়ালটিও আমাদের ওদিকে পা বাড়ায়নি। তবু মিনু থাক্‌তে দু'দশ বার ঘুরে ঘুরে যেত। মাসীমাকে বলি, বলেন, কাজ, কাজ, কাজ। তোমার ত বই, বই, বই। চুলোয় যাক্ ওঁর কাজ, চুলোয় যাক্ তোমার বই! আমার যে ছাই মরণ—ভোর হ'লেই মনে হয়, যাই দেখে আসিগে' মাসীমাকে, দেখে আসি মেজদা'কে। না এসেও পারিনে।—আচ্ছা মিনু আবার কবে আসবে? এলেই ত পারে। দু'দশ দণ্ড কথা ব'লে বাঁচি। তোমাদের সঙ্গে ত কথা বল্‌বার উপায় নেই! মাসীমার কাছে গেলে বলেন,—'দাঁড়া, ঠাকুরের নামটা শেষ ক'রে নিই', কিম্বা বল্‌বেন, পড় দেখি আজ কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডটা।' আর তোমার কাছে এলেই শুনব হয় গল্পো, নয় চরকা, নইলে বড় বড় পুঁথির—বড় বড় কথা—মুখ্যু মানুষ—মরি আর কি!

—তা হ'লে এলি কেন আবার এখন?

—ঐ যে বল্লেম, না এসেও পারিনে।

—বেশ করেছিস্। তা খুব ভিজেছিস? দেখি।

—কই ভিজেছি!

অতুল তাহার ভিজা কাপড়ের প্রান্ত ও চুলের প্রান্ত ধরিয়া দেখিয়া বলিল—না, খুব শুকনো ত। রোদে শুকিয়ে আনছি বুঝি ? আরো কতবার এমনিতর রোদে শুকোনো চল্‌বে ?

—একশ বার, হাজার বার,—যতবার খুসী !—তোমার কি ? এসেছি তাই বই পড়তে পারছনা ব'লে কষ্ট হ'য়েছে ? নাও তোমার বই—নাও, মুখে গুঁজে থাক। আমি চল্লুম।

পুঁটু বইটাকে অতুলের নাকের ডগায় ঠেকাইয়া কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পালাইতে গেল। অতুল ধরিয়া ফেলিল; বলিল—শোন্ পাগলী, যাচ্ছিস কোথা ?

—যেখানে খুসী। বাড়ীতে।

—ভিজে গেলে গাল খাবি যে আবার ?

—আমি গাল খাব—তোমার কি ?

—বোস্।

অতুল জোর করিয়া টানিয়া বসাইয়া বলিল—

—বল্ কি বলবি ?

পুঁটু অভিমানে চুপ করিয়া রহিল।

—বল্‌না। এবার যত খুসী ব'কে যা, আমি শুন্‌ব।

পুঁটু মুখ ফিরাইয়া লইল। অতুল আদর করিয়া বলিল, পুঁটু, রাগ করলি ? ভেবেছিলাম তোর রাগ নেই।—ছিঃ !

—রাগ করবো না ? আমিই কেবল রাগ করি, না ? আর তুমি ? দিন নেই রাত নেই যত লক্ষীছাড়া বখাটে ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে তুমি যে মাথামুণ্ড ব'কে যাও, আমি কিছু বলেছি ?

অতুল অপরাধ স্বীকার করিল। পুঁটু ভুলিয়া গেল। আবার আদিহীন ও অন্তহীন কথা চলিল। অতুল কান না দিয়া, হাঁ-না করিয়া সাড়া দিতে লাগিল। বাহিরে টপ্ টপ্ ঝর্ ঝর্ করিয়া নিরবসর বৃষ্টির শব্দ চলিয়াছে—অতুল তাহার মধ্যে কত আশা-নৈরাশ্যের কত সুখ-বেদনার বাণী শুনিতে পায় ! সময়ে সময়ে মনে হয়, সে যেন বৃষ্টিপাত নয়—সমস্ত বাঙ্‌লা দেশের অশ্রুপাত। অতুল তন্ময় হইয়া তাহার দিকে কান পাতিয়া বসিয়া থাকে।

সহসা বৃষ্টির শব্দ হইতে কান পার্শ্ববর্ত্তিনী বাহুবের কথার দিকে ফিরিয়া আসে—পুঁটু সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া চলিয়াছে, ঘোষেদের বিন্দি কেমন বেহায়া—সেদিন দিন-দুপুরে নাকি বরের সঙ্গে কথা বলিয়াছে। সবে বছর-খানেক ত বিয়ে হয়েছে। ঢঙ্ দেখ্‌লে ম'রে যাই ! টেরা দিয়েছে আবার সেনেদের মণি—যেন পটের বিবি ! কাশী—না কাছাড় গেছলেন্—ছিলেন তিন মাস, বলেন,— 'দেখ, বিকেলে না বেরুলে দেহটা ভাল বোধ করিনে। আর একি রাবিশ বাবা ! খালি-পা—পোড়ার দেশে জুতো পরার ও উপায় নেই—পা'টাও কাদায় খেয়ে ফেলে !' কথা শুনে হাসি না কাঁদি ! আবার সেদিন কিনা সেনেদের মণি—

—আচ্ছা পুঁটু, তোর কাছে বৃষ্টি খুব ভাল লাগে, না ?

—কেন লাগ্‌বেনা শুনি ? আমরা কি কাশী—না কাছাড় গেছি ?—না, মেমসাহেব সেজে জুতো প'রে বেরিয়েছি ! আমাদের কাছে বৃষ্টিই ভালো লাগে।

—এইভাবে ব'সে থাকা; এই তোর ভাল লাগে ?

—বেশ লাগে। যখন খুসী তোমাদের কাছে ছুটে এলুম—বিন্দি পোড়ারমুখীর মুখ দেখ্‌তে হয় না। মণির দেমাক্‌ও সহ্য করতে হয় না। হয় তোমার কাছে, নয় মাসীমার কাছে বসি, কথা বলি।—বেশ লাগে। তোমার ভাল লাগে না, মেজদা' ?

—লাগে বইকি। তাইত তোকে জিজ্ঞাসা করলেম্।

—তুমি যদি দেখ্‌তে হিমসাগরের পাড়ে পাড়ে জল আজ থৈ থৈ করছে ! কেমন মজা ! ইচ্ছে করে ঝাঁপিয়ে পড়ি, খানিকটা ডুব-সাঁতার কেটে, জল ছিটিয়ে এপার ওপার পাড়ি দিয়ে নিই।

—নিস্‌নে কেন ?

—কেউবে সঙ্গে আসে না। বলে, 'মা গাল দেবেন।' আরে, কার মা আবার কাকে গাল দেন্ না ? তাই ব'লে অমন পুকুরটাতেও এমন সময় দু'দশটা ডুব দিবিনে ? একটু জল ছিটিয়ে, সাঁতার কেটে, কুমীর বা পানকৌড়ি খেলবিনে ? সবাই মেয়ে যত সব ! মুখে ঝাঁটা অমন লক্ষী মেয়েদের।—আচ্ছা মেজদা', তুমি যাবে বোস-পুকুরে নাইতে ? সত্যি বল্‌ছি, পাঁচটা ডুব আর একবার এপার-

ওপার—এর বেশী নয়। দেখো তুমি, তোমাকে না হারাই ত আমার নাম পুঁটি নয়।

—আচ্ছা পুঁটি সুন্দরী, তার চেয়ে এই মাঠটায় কেন ঝাঁপিয়ে পড়না—ওটাও জলে থৈ থৈ করছে।

—পড়ব? তুমি বলছ? কিন্তু বাবার বসবার ঘর থেকে দেখা যাবে যে।—তার চেয়ে বলো ত নতুন পুকুর থেকে শালুক ফুল নিয়ে আসি। কি ফুলই ফুটেছে যদি দেখতে মেজদা! জল দেখা যায় না—শাদা আর লাল, লাল শাদা!—

—তার চেয়ে দেখনা কদম কেমন ফুটেছে।

পুঁটি বাহির হইয়া গেল—আঁকসি দিয়া কদমের অবাধ্য ডালগুলির সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। শেষটা আঁচল ভরিয়া ভিজা কদম ফুল লইয়া সামনে ধরিয়া বলিল—বেছে নাও শীগগির বলছি—সব পাবে না, পাঁচটা মাত্র, আচ্ছা সাতটা দিচ্ছি।

* * * *

বারো বছরের মেয়ে পুঁটি চৌদ্দ বছরের হইয়া উঠিল। চরকাগুলি ততক্ষণ জ্বালানি কাঠের অভাব মিটাইতেছে—সামান্য কিছু কাটা-সূতা স্বর্ণমূল্যে কেনা হইয়া ঘরের কোণে বিশ্রাম করিতেছে—পাটের গাঁটগুলি দৃপ্ত মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া ব্যঙ্গ করিতেছে।

জমিদারের নায়েব নৃসিংহ চাটুয্যে বলেন—বাবা দেখলে ত? আমরা কি আর মানুষ—গণ্ডারের চামড়া, এদেশ বাবা ভগবান্ বাঁচালেই বাঁচবে—মানুষের হাত নেই। এখন একবার আইন পরীক্ষাটা দিয়ে তাহ'লে ব'সে পড়ো।

—তাই বসবো।

সুবুদ্ধির উদয় দেখিয়া নৃসিংহবাবু আশান্বিত হইলেন। —তিন তিনটে বছর নষ্ট হ'ল, আগে যদি শুনতে।—তা আমাদেরও মামলা-মোকদ্দমা আছে—তোমাকে কি আর এক-আধটু সুবিধে ক'রে দিতে পারব না?

রজলাল পাটের দালালের হিসাব শেষ করিয়া বলেন—বাবুজি, মিছামিছি খেটেছেন। বিলকুল বেইমান্—সব টাকা লেবে, পাটের বেলা দেবে না। আপনি আমার সঙ্গে এ ব্যবসায় আসুন—দেখতে পাবেন সব মজা।

অতুল আশ্বাস দিল শীঘ্রই আসিবে। কিন্তু এখানে নয়—কলকাতায় কেউ রজলালের চেনা আছে?

পরমোৎসাহে রজলাল কয়েকটি মাড়োয়ারবাসীর নাম করিয়া গেল।—আমি চিঠি দেব—যা বলেন, যার কাছে চান।

* * * *

মাস-দুই পরে, নৃসিংহবাবুর গুপ্ত-পরামর্শটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মা যথোচিত ভূমিকার সহিত তাঁহার আশু-কাশীবাসের ইচ্ছা, পারলৌকিক কর্ম্মাদির প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া সংসার কাহার হাতে সমর্পণ করা যায় সেই সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করিলেন। গুরুতর সমস্যার মীমাংসাটাও এইরূপ ভূমিকার পরে তাঁহার উত্থাপন করিতে অসুবিধা হইল না। পুঁটির সঙ্গে যদি—। না, তেমন আগ্রহ তাঁহার নাই, তবে নৃসিংহ বাবুর দু'পয়সা আছে, জোত-জমাও নায়েব মহাশয় কিছু করিয়াছেন; ছেলে যখন নাই, পুঁটিকেই দিবেন। পুঁটির ভাল সম্বন্ধের অভাব হইবে না। তবে, নায়েব মহাশয়ের নাকি অতুলকে ভাল লাগিয়াছে।

অতুল হাসিয়াই খুন—ওরে বাপ্! পুঁটি পাগলী!

মা বলিলেন—পাগলী কোথায়? তোর যেমন কথা! ছেলে-মানুষ তাই অমন সরল—ছেলেমানুষি ক'রে বেড়ায়।

ছেলেমানুষি ছেলে-মানুষের সম্পত্তি—অতুলের নিকট ছেলেমানুষি অবহেলার বস্তু নয়। খুব আদরেরই জিনিষ। ও-জিনিষ এদেশে নাই বলিয়াই তাহার দুঃখ। এখানকার ছেলেরা তবু স্কুলকলেজে ডাং-পিটিয়া কতকটা ভগবানের দেওয়া বালকত্ব উপভোগ করিতে পায়। কিন্তু মেয়েরা একেবারে টোপাকুলা শিশু হইতে গুণ্ঠনাকুলা বধূ হইয়া বসে।

তবু কিনা পুঁটি!

খাসা মেয়ে পুঁটি—একটু মাত্র সঙ্কোচ নেই, একেবারে সাচ্চা বালিকা। নৃসিংহ চাটুয্যে খাঁটি বৈষয়িক লোক, তাহার ঘরে এমন লক্ষীছাড়া মেয়ে আসিল কি করিয়া? বাঙালীদের সব মেয়ে যদি এমনি পাগলী হইত!

তবু কিনা পুঁটি!

অতুলের হাসি আর ধ'রে না।

* * * *

অতুল খপ্ করিয়া পুঁটুর দু'টি হাত ধরিয়া বলিয়া ফেলিল—শুনেছিস্ পুঁটু, আমার সঙ্গে তোর বিয়ের কথা হ'চ্ছে?

পুঁটু তেমনি অকুণ্ঠিত ভাবে উত্তর দিল—বেশ ত, তাতে হ'য়েছে কি?

অতুল ঠিক এতটা দ্বিধাহীন সহজ উত্তরের জন্যও প্রস্তুত ছিল না। একটু থামিয়া কি বলিবে ঠিক্ না পাইয়া তেমনি কৌতুকের সহিত বলিল—হবে আবার কি? ধর, যদি বিয়ে হয়—

—যখন হবে তখন;—তাই ব'লে এখন আমি দাঁড়াতে পারব না। ছাড়ো বল্‌ছি—আমার ঢের কাজ আছে। এখনি না গেলে পুব-বাগানের পেয়ারাগুলো ক'পে' ডাকাতটা শেষ করবে। স্কুল এখনো ভাঙেনি—এই বেলা পেড়ে রাখ্‌তে হবে।

—সেগুলো এখনো কাঁচা।

—না গো, পেকেছে! একটু শক্ত তা নুন দিয়ে খেলে খাসা লাগবে। তুমি খাবে? ছাড়ো তাহ'লে, দেখিগে ক'টা আছে।

—খুব যে আমার উপর কৃপা রে! যদি সম্বন্ধটা ভেঙে যায়?

—তাহ'লে তোমাকেই আইবুড়ো ব'সে থাকতে হবে।

—আচ্ছা, যদি আমি রাজী হই—

—রাজী হই? যেন আমায় রাজা করবেন! কথার ছিরি দেখ।

—বটে! তাহ'লে আমি রাজী হব না বল্‌ছি।

—নিজের কপাল চাপ্‌ড়াবে—কার কি? তোমার কপালেও আবার বিয়ে! হাত ছাড়ো।

আচম্‌কা হাত ছাড়াইয়া পুঁটু ছুটিয়া পালাইল।

অতুল আপনার মনেই হাসিতে লাগিল—এমন ছেলেমানুষেরও আবার বিবাহ! কিন্তু বিবাহ ত ইহার হইবেই, যেখানেই হউক হইবে। পাত্রের অভাব হইবে না—নায়েব মহাশয়ের টাকার থলেটি ভারী। তবে মেয়েটা ভাল-লোকের হাতে পড়িলেই হয়। বাঙ্‌লা দেশে তেমন বুদ্ধিমান্ ছেলে বেশী কই যে, ইহার কাঁচা মনটিকে রাতারাতি না পাকাইয়া তুলিয়া অপেক্ষা করিতে পারে। পারিত সে নিজে।

তবু কিনা পুঁটু!

* * * *

সুপাত্রই জুটিল—অতুল আইন পাশ করে নাই, ইনি আইনের দেউড়ি পার হইয়া আসিয়াছেন। বাড়ী একটু দূরে, তা শ্বশুরগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখানকার আদালত ফৌজদারীতে ব্যবসা চালাইতে কোনই অসুবিধা হইবে না।

অতুলের মা কহিলেন—সেই চক্কোত্তিদের ছেলের সঙ্গেই পুঁটুর সম্বন্ধ হ'ল। ভালই হ'ল—চক্কোত্তির অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নয়।

অতুল বলিল—মন্দ নয়, কেন? রীতিমত ভালো।

—ছেলেটিও ত বেশ ভালো শুনছি।

—চমৎকার নম্র, শান্ত, বুদ্ধিমান্।

—দেখ্‌তে একটু ময়লা না? রোগা রোগা। তা ব্যাটা ছেলে, একটু শ্যামবর্ণ হ'লেই বা কি?

—তাইত ভরসা। নইলে তোমার ছেলের মত শ্যামসুন্দরের ত দুর্ভাবনার শেষ থাকত না।

মা কহিলেন—মোটের উপর পুঁটুর সম্বন্ধ ভালই হ'ল। মেয়েটার কপাল ভালো।

—আমারও ত মনে হয়।

মা আর যাহা বলিলেন না, তাহাও অতুলের জানা ছিল।

* * *

চাটুয্যেগিন্নী কহিলেন—বাবা তোমাকে ত দেখ্‌তে শুনতে হবে। আমার ত যে ছিল—ননী থাকলে আজ—

বিশ বৎসর পূর্ব্বে অতুলের সমবয়সী তাঁহার পুত্রটির কাল হইয়াছিল। বিশ বৎসর পরে তাহার কথাই আজ মায়ের প্রাণে জাগিয়া উঠিল। তাঁহার চোখে জল আসিল। অতুল বিব্রত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল—

—না, না, এ আবার একটা কথা কি? আপনার বল্‌তে হবে কেন? আমি নিজে থেকেই ত যেতেম।

—কিন্তু বাবা, দিদি বল্লেন মণ্ডপ-তলায় কি সভা সেদিন।

—সে সভা পিছিয়ে গেছে। আপনি কিছু ভাব্‌বেন না।

কথাটা সত্য নহে, কিন্তু অতুল কথা বাড়াইবার প্রয়োজন দেখিল না। চাটুয্যেগিন্নী কহিলেন—কর্ত্তা বলেন, 'সে কি আস্‌বে? সে আস্‌বে না। ওরা হ'ল স্বদেশী-লোক, আমরা খয়ের খাঁ। তা নইলে মেয়েটাকেই ওর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতেম। সে তা নিলে কই?' আমি বলি অদৃষ্টের লেখা—যার যেখানে নির্দ্ধারিত হবেই হবে, কেউ কিছু করতে পারবে না। তাই ব'লে অতুল কি আর আমাদের বাড়ীর কাজে আস্‌বে না? ননী বেঁচে থাকলে না এসে পারত?

বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার অকালমৃত বন্ধু বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত দূরে সরিয়া থাকা চলিত; কিন্তু দীর্ঘদিনের প্রতিবেশিনী-মায়ের এই কথার পর আর পালাইবার উপায় রহিল না।

*　　*　　*　　*

আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে ঝর্ ঝর্ ঝর্। তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বিরতি নাই।

বিবাহবাড়ীর আয়োজন-উৎসবেরও অন্ত নাই—অতুল কোমর বাঁধিয়া ছুটাছুটি করিতেছে—কাজের শেষ নাই।

সেই নিরবসর কাজকর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে একবার পুঁটুর সহিত দেখা হইতে চিরাভ্যস্ত কৌতুকের সহিত অতুল কহিল—দেখে এলেম পুঁটু, তোর বর। না, কপাল তোর ভাল বটে। লজ্জায় ত ব্যাচারী চোখই তোলে না। তোকেই ওর লজ্জা ভাঙাতে হবে দেখ্‌ছি। তা তুই পারবি? কেমন পারিবি না?

পরিহাসটার অনুরূপ উত্তর নিশ্চয়ই আসা উচিত। কিন্তু অতুল সবিস্ময়ে দেখিল, পুঁটু কথাই বলিল না—বোধহয় তাহার মুখে কথা যোগাইল না। সে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে শুধু অতুলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—দেখ্‌ছিলুম আর ভাবছিলুম, আহা ব্যাচারী! জানত না অদৃষ্টে কি লাঞ্ছনাটা আছে। 'মজা টের পাবে এর পরে শ্রীমতী পুঁটু সুন্দরীর হাতে!

পুঁটুর সমবয়সী নীলা হঠাৎ কহিয়া উঠিল—সত্যি বলছ মেজদা? এই ভয়েই বুঝি তুমি নিজে পিছিয়ে গিয়ে ওঁকে ঠেলে দিয়েছ? সাহস বটে তোমার!

পুঁটু একটু যেন পূর্ব্বেকার পুঁটুর মত জাগিয়া উঠিল—শুধু সাহস! বুদ্ধি কি ওঁর কম! ভয় হয় নীলু, অতি-বুদ্ধিমান হাঁটুজলেই না ডুবে মরে।

অতুল হাসিয়া বলিল—দেখ্‌তেই পাব শ্রীমান্ যদুনাথ কতটা পেপান, আর শ্রীমতী পুঁটু সুন্দরীই বা কোন্ হিমসাগরে পাড়ি দেন।

*　　*　　*　　*

গভীর নিশীথের মৌন বিদীর্ণ করিয়া মধ্যে মধ্যে বাসরঘর হইতে কৌতুকরসোন্মত্তা রমণীগণের উচ্চ হাস্যধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

একা শয্যায় এমনি একটি হাসির তরঙ্গে চম্‌কাইয়া জাগিয়া অতুলের চোখে ঘুম আসিল না। চোখ বুজিয়া শয্যাশ্রয় করিয়া সে পড়িয়া রহিল।

কট্—কট্—কট্।

অতুল চম্‌কাইয়া উঠিল—কি কুৎসিত! শ্রান্ত-বর্ষণ রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙিয়া একযোগে সহসা পুকুরের চারিপারে সহস্র সহস্র ভেক চীৎকার করিয়া উঠে—ঠিক বাসরঘরের সেই তীব্র হাসিরই মত।

চোখে আর নিদ্রা নাই,—অতুল ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল—মনে হইল এই কুৎসিৎ প্রাণীগুলি বুঝি তাহারই কানের কাছে এই কুৎসিৎ শব্দ করিতেছে।

*　　*　　*

যদুনাথ ছেলেটির প্রাণে সখ আছে। নামটি সেকেলে হইলে কি হয়—মুখচোরা লোকটির প্রাণে একেলে ঢেউ লাগিয়াছিল। অতএব সে যে হঠাৎ তাহার স্ত্রীকে 'এক[illegible]শিক্ষিতা' করিয়া তুলিতে চাহিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। বিস্মিত হইল তবু অতুল।

ঝিন্দি বা মণি—পূর্ব্ববর্ত্তিনী অভিজ্ঞা প্রতিবেশিনীগণ এই উপলক্ষে পুঁটুকে দু'এক কথা শুনাইবার জন্ত আসিয়া কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল।

'কথা শুনাইবার' প্রতিযোগিতায় পুঁটু হার মানিবার মত মেয়ে নয়। হইলে হয় কি, হয়ত ইহারই প্রতিক্রিয়ায় শ্রীমান্ যদুনাথকেও ব্যর্থমনোরথ হইতে হইল। তাহার গোপনে কেনা পুঁথি-পত্র, কাগজ-পেন্সিল-খাতা এরূপ নূতন রহিল যে, শ্বশুরের সদ্যকেনা তাহার ভারি ভারি বইগুলিও সে তুলনায় পুরাতন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পুঁটুর সঙ্গে কি'আঁটিয়া উঠিবার সাধ্য আছে?—পি, ইউ, টি, পুট্ কিন্তু বি, ইউ, টি, বাট্—এই সরল তত্ত্বটা প্রায় চল্লিশ মিনিটে দশবার ব্যাখ্যা করিয়াও যদুনাথ ধৈর্য্যসহকারে পুঁটুর কথায় আর একবার ব্যাখ্যা শেষ করিতেছে—'ইংরেজির এমনি ধরণ, পি, ইউ, টি,—পুট্, বি, ইউ, টি,—বাট্', এমন সময়ে উচ্ছ্বসিত হাসির তরঙ্গ যেন সহসা ফাটিয়া পড়িল। পুঁটুর ছলনার গাম্ভীর্য্যে সহসা যদুনাথ সঙ্কুচিত ও বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

—মা গো মা, পুট্ না প্যট্, বুট্ না বাট্—তা নিয়ে এতও লোকে বক্‌তে পারে!—

পুঁটুর হাসি আর থামে না। কিন্তু যদুনাথ বিরক্ত হইলনা, গম্ভীর হইল। সে চিন্তা করিয়া দেখিল যে, কড়া না হইলে পুঁটুর পড়াশুনা হইবে না। অতএব যদুনাথ একটু কড়া হইল। কিন্তু এমন ব্যাপারে সচরাচর পড়শীদের কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগিয়া উঠে। এ-ক্ষেত্রেও অন্যথা হইল না। কথাটা অতুলের কানে পৌঁছিল। সে একদা সজোরে টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া বলিয়াছে,—না জাগিলে ভারত ললনা ......অতএব বাঙলার মা'রা, মেয়েরা বেরিয়ে এসো, পর্দ্দা ছিঁড়ে', অন্ধকার পিছনে ফেলে'!—কিন্তু যদুনাথের প্রতি সে এখন প্রসন্ন হইতে পারিল না।

সৌখিন, কলেজ-পড়া ছোকরা—সে কি বুঝিতে পারেনা পুঁটু অন্য ধাতুতে গড়া, অন্য ছাঁচে ঢালা, অনেক উঁচু প্রকৃতির মেয়ে? যে এখনো পুঁটুকে চিনিতে পারে নাই, সেই কিনা পুঁটুকে নিজের মত করিয়া গড়িতে চায়!

পুঁটু কি ধাতুর মেয়ে এবং তাহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইলে কতটা শিল্প-কৌশলের প্রয়োজন সেবিষয়ে যদুনাথকে একটু সচেতন করিয়া দিবার সদুদ্দেশ্য লইয়া অতুল একদিন যদুনাথের নিকট উপস্থিত হইল।

কি ব্যবস্থা হইল বুঝা গেল না। অতুল ফিরিয়া আসিল ক্রুদ্ধ হইয়া ও অপমানিত বোধ করিয়া—যদুনাথ তাহাকে জানাইয়াছে যে, প্রত্যেকেরই অধিকার ও অনধিকার সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকা উচিত।

দৃঢ়পদে পুঁটু ঘরে ঢুকিয়া কহিল—মেজদা' তোমাকে কে কবে স্থপারিশ করেছিল যে, তুমি গায়ে প'ড়ে ওঁকে অপমানিত করতে গেছলে?

—ওকে অপমান করেছি আমি!

—নিশ্চয়। আমাকে ত করেছই—সে না হয় তোমার পুরানো খেলা। কিন্তু ওঁর সঙ্গে তোমার ব্যবহার আর একটু ভেবে চিন্তে করা উচিত ছিল।

দৃঢ়পদে পুঁটু বাহির হইয়া গেল। তারপর এ বাড়ীতে পুঁটুকে আর দেখা গেল না—পাড়াতেও বড় একটা না। সেই পুঁটু কখন ফার্ষ্ট বুক ছাড়াইয়া শিক্ষার প্রথম কটক্ উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

অতুল আর নৃসিংহ চট্টোর বাড়ীর দিকে ভুলেও তাকায় না। পথে অতুলের সহিত দেখা হইলে যদুনাথ এই স্বদেশী নেতাকে কপট-সম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়; অতুল মনে মনে জ্বলিয়া উঠে।

* * *

অদৃষ্টের এমনি বিধান, যাহাদের সম্পর্ক দুই বছর ধরিয়া বিরূপ হইয়া রহিল, একদিন বর্ষা-সন্ধ্যায় তাহাদেরই একজনের কাঁধে চড়িয়া আর একজন পাড়ার উপর দিয়া চলিয়া গেল। পাড়ার কেহ সেদিন ফিরিয়াও তাকাইল না—একে মুষলধারে বৃষ্টি, তাহাতে আসন্ন সন্ধ্যা, শ্মশান নদীর পারে, অনেক দূরে। প্রত্যেকেরই ঘরে বিয়ের-শেষ নাই। কেবল নির্ব্বিঘ্নে আছে অতুল গাঙ্গুলী। দাহ-শেষে গভীর রাত্রিতে অতুল পুকুরে স্নান করিল। তখনো কানে গেল—সন্ত-বিধবার তরুকণ্ঠের ক্রন্দন।

অতুল ভাবিল—পুঁটু—সেই পুঁটু!

কদমের ডাল ফুলে ফুলে একাকার, হিমসাগর তেমনি বর্ষার জলে থৈ-থৈ, বোস-পুকুরের মাঝে তেমনি শাদা-লাল শালুক ফুল।

সেই ক্ষীণ অবসন্ন কান্নার শব্দ!···হঠাৎ পুকুরের চতুর্দ্দিক্ হইতে ভেকের ধ্বনি উঠিল।—সারারাত অতুলের কানে এই দুই শব্দ ধ্বনিত হইল।

তারপর আরো কয়মাস। পুঁটু একটু সামলাইয়া লইয়াছে। অতুলের স্বদেশ-উদ্ধার-পর্ব্ব শেষ হইয়াছে।—কিছুতেই চেষ্টা করিয়াও আর উহার জের টানিয়া রাখা যায় না।

অতুল মাকে বলিল—হ্যাঁ, এবার হ'তে পারে—তেমন কোন বাধা নেই। তবে এ বয়সে একটি ছোট খুকী আর মানায় না। বিশেষতঃ—

'তবে' ও 'বিশেষতঃ' মায়ের নিকট দুরূহ বাধা পাইল। অনেকদিন পরে যে আশাটুকু হঠাৎ তিনি লাভ করিয়াছিলেন—তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে উড়িয়া গেল। নৈরাশ্যের স্থলে দেখা দিল বিরক্তি।

—তোমার যা খুসী করো বাপু; আমি কিছু জানিনে।

অগত্যা অতুল নিজেই অগ্রসর হইল।

পুঁটু চুপ করিয়া সব কথাই শুনিল। তারপর অতি ক্ষীণ পাণ্ডুর হাসি হাসিয়া অনেককালের পুরাতন বিস্মৃত-প্রায় সহজ পরিহাসের সুর ফিরাইয়া আনিয়া কহিল—তোমায় আইবুড়ো থাকতে হবে, বলেছিলাম না, মেজদা'? এখন দেখ।

অতুল অপ্রতিভ হইয়া গেল। কহিল—কেন? তোমার নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?

—কে বল্লে নেই?

—কেন, কিসের আপত্তি?

পাংশুমুখে তেমনি হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া পুঁটু কহিল—

—বলেছিলাম, তোমার কপালে আবার বিয়ে।

* * *

সমস্ত রাত্রি অতুল উত্তপ্ত মস্তকে বসিয়া কাটাইল। পুকুরের পাড়ের কুৎসিত ডাক। মনে হইল, সহস্র সহস্র এইরূপ প্রাণী বুঝি তাহার মস্তিষ্কের ভিতরে বসিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে—কট্,কট্,কট্।

রঙ্গলালের নিকট হইতে চিঠি লইয়া পরদিনই অতুল চলিয়া আসিল কলিকাতায়। তারপর তিন বৎসর পাটের বাজারে সব ধ্বনি তলাইয়া গিয়াছে।

সত্যই কি তলাইয়া গিয়াছে? হঠাৎ আজ তিন বৎসর পরে সেই বীভৎস প্রাণী-জগতের এই কর্কশধ্বনি তবে কেন তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল?

কঠিন কৌতুকে অতুল গাঙ্গুলী মুখ বাঁকাইয়া কেবলই হাসিতে লাগিল আর আওড়াইতে লাগিল—

"মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী"।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

ভ্রমণ-স্মৃতি

শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ

সারারাত্রি আসাম মেল আমাদিগকে বহন করিয়া বিরাট্ দানবের মত ছুটিয়া চলিয়াছে।

সকালে যখন জাগিলাম তখন আমরা রঙ্গিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছি। রঙ্গিয়া তখন রঙ্গে রঙ্গে রক্তরাঙ্গা। ষ্টেশনেই ফুলের শয্যা পাতা রহিয়াছে! পূর্ব্বে তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে; আমরা পশ্চিমে মুখ করিয়া বসিয়া আছি। পশ্চিম আকাশ সোনার আলোর উচ্ছ্বাসে পূর্ণ; দূরের পাহাড়গুলির উপরে নীলিমা লালিমায় মিশিয়া অপরূপ উৎসব। আমি সূর্য্যের উদয়লীলা দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু তার আলোকের অভিনয় আকাশের মহিমায় যে ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে তাহা কল্পনার কল্পলোকাতীত রূপে আমার নয়নে প্রতিভাত। সবুজ গাছপাতা, দূর্ব্বাদলপূর্ণ প্রান্তর, অনন্ত শ্যামলিমার লীলাপ্রাঙ্গণ, আকাশের খণ্ডিত অংশ-টুকুর নীলিমার ব্যবধান, সব স্বর্ণ-আলোকে হরিতে-হিরণে ঝল্মল্ করিতে থাকে। পত্রাবলী বিচলিত হইয়া উঠে, তরুরাজি স্বাগত জানায়, আমি মুগ্ধনয়নে চাহিয়া থাকি, নূতন দিনের নব আবাহন শুনিতে পাই, আর প্রাণে প্রাণে অনুভব করি সচেতন-করা আলোকে উষার উদ্বোধন-মন্ত্র।

আমরা চলিয়াছি—চারিদিকের অসীম তন্দ্রা ও সুপ্ত কলরবকে জাগাইয়া আমাদের ট্রেন চলিয়াছে।

দূরের শ্যামল মাঠ এখনও তত স্পষ্ট দেখা যায় না, যেন নিশান্তের সুখস্বপ্নের আবছায়া স্মৃতিখানি। উষা যেন প্রভাতের জাগরণের ভাষা নিঃশ্বাসরুদ্ধ হৃদয়ে শুনিতে শুনিতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। সহসা ট্রেনের বাঁশী একবার বাজিয়া উঠিল। দূরান্তের বেণুর স্বরের মত এই শব্দে মন আকুল হইয়া কত দূরে কোথায় চলিয়া গেল।

আমিনগাঁয়ে ষ্টীমারে নদী পার হইয়া পাণ্ডুতে আসিলাম। সেখান হইতে নৌকায় কামাখ্যায় গেলাম চারিধারে উচ্চ পাহাড়, মধ্যে খরস্রোত ব্রহ্মপুত্র অরুণ-কিরণে ঝল্মল্। ছোট নৌকার চারিধারে জলরাশি নাচিতেছে বাতাস বহিয়াছে, সূর্য্য উঠিয়াছে, তরণী চলিয়াছে—এমন ভাবেই কি জীবন যায় না? জলের নীচের অদৃশ্য পাথরে

ব্রহ্মপুত্র-বক্ষে

আঘাত পড়ে, নৌকা টলমল করিয়া কাঁপে, বুঝি বা ডুবিবে। জলের উপর লঘু মেঘের ছায়া পড়ে। উপরে চাহিয়া দেখি অনন্ত আকাশ, পাশে চাহিয়া দেখি কল্লোলিত নদীর দু'ধারে মৌনম্লান কূল। নীচের জলের নিবিড় তিমির যেন বলে নিত্য-মৃত্যুর কথা; হঠাৎ মনে হয় মৃত্যুও বুঝি চমৎকার!

গৌহাটিতে নদীর মধ্যে আশানন্দ ও উমানন্দের মন্দির দেখিলাম। তখন গগনকোণে পর্ব্বতমালার অন্তরালে সূর্য্য

শেষ মায়ার তুলিকা বুলাইতেছে। অস্তরশ্মি-উদ্ভাসিত বেলাশেষের আকাশের সব ঐশ্বর্য্য নদীবক্ষে প্রতিফলিত। সূর্য্য যেন তার বিদায়ের আয়োজন শেষ করিয়া উঠিতে পারে নাই; তাই তাহার শেষ চিহ্নটি আকাশের মেঘের ওই গোধূলি-সজ্জায় কোথাও রাখিয়া যাইতে চায়।

অস্তরবির কিরণোজ্জ্বল শান্ত সন্ধ্যা, স্নিগ্ধ শীকরসিক্ত পবন, উপরে নিত্যনব চিরচঞ্চল সৌন্দর্য্যের বর্ণগরিমা; ওপারে যতদূর দৃষ্টি চলে শ্যামবিটপীশোভিত তটের সবুজ রেখা, আর ওইখানে দুইটি পর্ব্বতচূড়ার ঠিক মাঝখানে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে; দিকে দিকে জাগিয়া উঠিয়াছে রূপ ও অরূপের অনন্ত লীলা-বৈচিত্র্য।

"আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধুপান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।"
"আমার মনের নৃত্য কতবার জীবন-মৃত্যুরে
এড়ায়ে চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।"

সূর্য্যাস্ত-সময়ে এ সীমারেখাহীন নীলাকাশের তলে জীবনের শত দুঃখক্লান্তি কোথায় অবসান লাভ করিল।

কিন্তু সেদিকে আমাদের পথ নহে। এই পথেরই এত প্রশংসা শুনিয়াছিলাম; তাই একটু নিরাশ হইলাম।

ক্রমশঃ পর্ব্বত-পথ সম্মুখে আসিল। এখন শুধু চড়াই ও উৎরাই। পর্ব্বতশ্রেণীর উপরে বৃক্ষলতায় উষার বিদায়ের শেষ অশ্রুবিন্দু ঝলমল করিতেছে। প্রভাত-কাকলি তরুরাজির মর্ম্মরে যোগদান করিয়াছে। পাখীর কলগীতি, বিজন পথের শ্যামশান্তি, পর্ব্বতের অচপল লীলাময় কান্তি উপভোগ করিতে করিতে আমরা চলিয়াছি। পথ ঘুরিয়া-ঘুরিয়া পাহাড়ের অঙ্গে অঙ্গে বাহিয়া চলিয়াছে। পরপারে উচ্চ পর্ব্বত নীলাভা বিকীর্ণ করে; মাঝে মাঝে দুই পাহাড়ের মধ্যে পাই—গভীর খাদের পরম রমণীয়তা; সেখানে হয়ত একটি উপলবিষমা স্রোতস্বিনী পর্ব্বতবালিকার মত নাচিয়া নাচিয়া মনের আনন্দে চলিয়াছে। তাহার গতির শেষ যে কোথায়, কোথায় যে তাহার এই আনন্দ-অভিযানের পরিণাম লোকচক্ষুর অন্তরালে মিলাইয়া যাইবে তাহা সে জানে না। আমাদের জীবনের অশান্ত ব্যস্ততাও

আলোক-রেখায় যে লিখন দেখা দিয়াছিল, আমি অন্ধকারে বিজনে বসিয়া তাহাই পড়িতেছি—সে যে তাঁহার অক্ষরে লেখা, অনির্ব্বাণ, অনবলুপ্ত। চারিদিকের দীনতা, আবর্জ্জনা ও অশোভনতার মধ্য হইতে আপনাকে শাপমুক্ত মনে হয়। মনে হয়,—জীবন যেন একটি ছন্দোবদ্ধ, যতিপূর্ণ, সংযত শ্লোক। একটা অসীম বাধাহীনতার অব্যাহত শক্তি, নিখিল মন্থন-করা অমৃতের অভিষেক, অন্ধকার পূর্ণকরা আনন্দের সামগান অনুভব করি।

গৌহাটি-শিলং রাজপথের বাঁক

পরদিন সকালে শিলং-এর পথে বাহির হইলাম। মোটর দ্রুতবেগে আঁকাবাঁকা পথে ছুটিল। দু'ধারে শুধু আসামের সমতল শ্যামল মাঠ। দূরে পাহাড় দেখা যায়,

যদি অমনি চলার আনন্দেই চলিতে পারিত তাহা হইলে কি আর এমন করিয়া ব্যর্থতার পাষাণ-দুয়ারে মাথা ঠুকিয়া মরিতে হয়?

এদিকে পিছনে তাকাইলে দেখা যাইবে একটা বালুকা-শুভ্র পথ কেমন দ্রুত নীচে নামিয়া গিয়াছে। হয়ত তাহারই ঠিক মাথার উপরে আমরা চলিয়াছি। পথের বাঁক দূরের অজানার আকর্ষণে মনকে উধাও করিয়া লইয়া যাইতে চায়। দীর্ঘ ৬৫ মাইল পথ যে কোথা দিয়া চলিয়া গেল তাহার স্মৃতি এখন স্বপ্নপুরে নিহিত।

শিলং-এ মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। শান্ত-উজ্জ্বল দিনগুলি একটা অনির্বচনীয় মধুর আলস্যে পরিপূর্ণ। আমার জানালার সম্মুখে উন্মুক্ত প্রান্তর, সেখানে আমার শ্রান্ত নয়নের দৃষ্টি বিশ্রাম লাভ করে। দক্ষিণে বামে শ্যামরেখাঙ্কিত ধূম্র পর্ব্বতশ্রেণী, চারিদিকে ঘনচ্ছায়া-মেদুর পাইনের অরণ্য। যেখানে বনের একটু অবকাশ, সেইখানেই একটুকরা ক্ষেত বা তরুশ্রেণী-সমন্বিত একটি খাসিয়া পল্লী।

খাসিয়া সম্মেলন

সেখানে বর্ত্তমান সভ্যতামুক্ত খাসিয়ারা অতি আশ্চর্যভাবে দিন কাটায়। সবল পরিশ্রমী গৌরবর্ণ এই পার্ব্বত্যজাতি উল্লাস-পূর্ণ দিনগুলি মনের আনন্দে চা খাইয়া কাটাইয়া দেয়। চক্ষে দেখি তাহাদের অমিত সুখ, অসীম আনন্দময় দিন-যাপনের ধারা, সামনে ভাসিয়া উঠে পর্ব্বত-অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে অধিত্যকা-উপত্যকার আনাচে কানাচে বিচিত্র

খাসিয়া নাচ

সংস্কারবহুল একটি জীবন-যাত্রা। চারিদিকে ফুলের মেলা, আকাশে মেঘে মেঘে রংএর খেলা; পাইনের অশ্রান্ত মর্ম্মর-মুখরতা; পাহাড়ের উপর রৌদ্র, ছায়া ও নীলাঞ্জন একটা মধুর স্বপ্ন বিস্তার করে। ঘননীল আকাশের ও ঘনশ্যাম পাহাড়ের সন্ধিস্থলে যেখানে সীমা অসীমের নিবিড় সঙ্গ চায়, যেখানে রূপ ও কল্পনা এক হইয়া যায়, সেখানে একটি বিলীয়মান রেখা দেখা যায়। রাত্রি যখন মানুষের ঘরে ঘরে আপনার স্নেহহস্ত বুলায়, আকাশের ব্যাকুল নয়ন ভিন্ন আর কোন ক্লান্তচক্ষু অমুদিত থাকে না, গৃহের দ্বারে-দ্বারে বাতাস মর্ম্মরিত হইয়া মরে, তখনও 'আনন্দময় ভুবন' বাহিরে খেলা করে।

একদিন আমরা নংক্রোম গেলাম। এখানে একজন খাসিয়া রাজার আবাস। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা; মধ্যে একটি উপত্যকা—স্থানে স্থানে গ্রাম্য গোচরের মধুর শোভা। একটি জায়গায় খাসিয়া নাচ হয়, কুমার ও কুমারীগণ আসিয়া নাচে ও মধ্যে মধ্যে নিজেরাই বিবাহ-প্রস্তাব করে। এই ভূমিখণ্ডের মধ্যে সারা পৃথিবী যেন হঠাৎ আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার আর যেন কোন সন্ধান

পাওয়া যাইবে না। ওই যে অস্তগামী সূর্য্যের রঞ্জিত আভা আশে-পাশের পর্ব্বতমালার উপর তরঙ্গভঙ্গে লুটাইয়া পড়িয়াছে উহার ঠিক নীচেই প্রসারিত সমভূমিই এই বিপুল পৃথ্বী; আর ওই যে পর্ব্বতের ও আকাশের সন্ধিস্থলে যেখানে চিররহস্ত অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান—ওই পৃথিবীর শেষ সীমারেখা। সেখানে রাত্রি তিমির-পক্ষ ছড়াইয়া নামিয়া আসে, চন্দ্র ধীরে ধীরে ক্লান্ত পথিকের ন্যায় দেখা দেয়, বিরাট্ ধূ ধূ প্রসারিত পৃথিবী একাকী রাত্রিযাপন করে। দিবালোকে মাঝে মাঝে দূরে শিলং-এর ঘরবাড়ী দেখা যায়, কিন্তু সেই পর্ব্বতচ্ছায়া-পরিপূর্ণ লোকালয়ের স্তব্ধশান্তি দেখিলে মনে হইবে না যে ওই লোকপরিপূর্ণ স্থানও হাসি-অশ্রুর সমাবেশে বিচিত্র এবং সুখদুঃখের অনুভূতিতে স্পন্দিত। অনিবিড় পাইনবনের ফাঁকে ফাঁকে অযত্ন-বর্দ্ধিত অর্কিড আপনার বিকাশের আনন্দে আপনি হাসে; শুধু দু'য়েকটি পাখীর ডাকে বিজন স্তব্ধতা ভাঙিয়া যায়।

আর একদিন বিশপ ফল্‌স্ দেখিলাম, উপরে—কত উপর হইতে গর্জ্জন করিয়া জলস্রোত নামিয়াছে। নীচের ধারাকে যন্ত্রে বাঁধিয়া বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউস-(Power House) এ লাগান হইয়াছে। স্রোত আমার সম্মুখে; চঞ্চলা নির্ঝরিণী ললিত-লাস্যে চলিয়াছে; তাহার উপল-প্রতিহত মুখরতা আমরা দূর হইতেই শুনিতে পাইতেছি। আমরা স্রোতের পাশে পাশে কিছুদূর চলিলাম। হঠাৎ তাহার সহিত বিচ্ছেদ হইল। উপরে তাকাইয়া দেখি—শ্যামতৃণাচ্ছাদিত পর্ব্বতের মধ্যে একটি প্রস্তর তাহার পাষাণ-কঙ্কাল লইয়া দণ্ডায়মান। হঠাৎ ডানদিকে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা দেখা দিয়া অন্তরালে চলিয়া গেল। পাহাড়গুলি রৌদ্রে ক্লান্ত ও অস্পষ্ট, তাহাদের উপর একটা সান্ধ্য-তন্দ্রার ছায়া পড়িয়াছে। একটি অপার অখণ্ড পরিপূর্ণ আকাশ নীরব নির্নিমেষ নয়নে অতলস্পর্শী জলপ্রপাতের প্রণালীকে দেখিতেছে।

কয়দিন ধরিয়া কেবলি বৃষ্টি ঝরিয়া ঝরিয়া আকাশের বাষ্পাকুলতা কিছু কমিয়া আসিতেছে, তবু সম্পূর্ণ যায় নাই। এই মেঘমেদুর বর্ষণস্নিগ্ধ আকাশে আজ একটু রৌদ্রের আভা দেখা দিয়াছে। কয়দিনের অনিবার মেঘ মৌন-ম্লানভাবে আকাশে অন্ধকার লেপিয়া দিয়াছিল; আজ মলিন দিনের উদাস-করা আকাশে স্বচ্ছ নীলের অবকাশ আশার আলোক-প্রদীপের মত ফুটিয়া উঠিল; আমরাও চেরাপুঞ্জির পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। ধীরে ধীরে রৌদ্র প্রখর হইল। বিদায়োন্মুখ বসন্ত তখন তাহার সকল মাধুরী-সম্ভারে পূর্ণ হইয়া আমাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। সারাদিন ব্যাপিয়া সেদিন প্রকৃতির আনন্দোৎসব। শ্যামবর্ণে বিভোর বনশ্রীর আকুঞ্চিত চঞ্চল দুকূলের পাটে-পাটে কত লাবণ্য উদ্ভাসিত। অরণ্যের অন্তরালে মুকুলিত তরুবীথি আকুল গন্ধভারে চারিদিক পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ঘন-অন্ধকারের উপরে সূর্য্যের আলো নিবিড়-ভাবে ফুটিয়াছে। কিন্তু কোথা হইতে ধীরে ধীরে চারিধারে কুয়াসা করিয়া আসিতে লাগিল। ঘন-শ্বেত বাষ্পে

দূরে চেরাপুঞ্জী

নীচের উপত্যকা সব অন্ধকার; পাশে একটি মুখর জলস্রোত চলিয়াছে, তাহাকে দেখা যায় না, শোনা যায়।

বিরাট কুয়াসার আবরণে আমরা ঢাকিয়া গেলাম। মোটরের কাঁচে লাগিয়া 'ফগ' জল হইয়া গেল। আমরা বাহিরে হাত বাড়াইয়া তাহাকে অভিনন্দন করিলাম, সেও আমাদের হাত ভিজাইয়া প্রত্যুত্তর দিল।

মশমাই প্রপাত—১৮০০ ফুট চেরাপুঞ্জী

নীচে গহ্বরে 'ফগের' আবরণ, উপরে মেঘের চন্দ্রাতপ, সম্মুখে চেরাপুঞ্জীর লুপ্ত পর্ব্বতমালা। সজলজলদম্লান আকাশতলে ছায়া অত্যন্ত নিবিড় করিয়া নামিয়া আসিয়াছে, কেবল দূরে একটি শিখরে মেঘমুক্ত ম্লান রৌদ্ররেখার একটি অস্পষ্ট আভাস দেখা যায়। এই চির-মেঘমালার দেশে, এই অশ্রান্তবর্ষণের মধ্যে সবই যেন একটা অনন্ত রহস্যে আবৃত। এ যেন কুহেলী আবাস, এ যেন স্বপ্নের মায়াপুরী। অশান্ত পবন পর্ব্বতশিখরে খেলা করে; তাহার হাসির ঢেউ সমতলে আসিয়া প্রতিহত হয়। অনন্ত মেঘ আকাশে মিলন-মেলায় রত; তাহার কেলি-উৎসের শীকর-কণা নিত্য সমীরবিধৃত হইয়া নামিয়া আসে। অনিবিড় কুহেলিকাদল নিয়ে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া থাকে; তাহার লীলাকৌতুকের দুই-একটি উচ্ছ্বাস সহসা তরঙ্গিত হইয়া আমাদিগকে ঢাকিয়া দেয়।—আমরাও সানন্দে লোকচক্ষু হইতে লুপ্ত হইয়া যাই।

সম্মুখে শিলেটের সমতলভূমির পথ। কঠোর বন্ধুর উৎরাই—পথ অতি পিচ্ছিল। সেই পথে অনভ্যস্ত কেহ নামিয়া যাইতে পারিবে না। এই কুহেলি-আবরণের পরপারে একটি শস্যশ্যামল, উর্ব্বর সমতলভূমি যে রহিয়াছে তাহা কল্পনা করিতেও মনে বাধে। উপরে এই মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি, বারিধারায় সিক্ততা ও পর্ব্বতের উবরতা হয়ত সমতলের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। 'থারিয়াঘাটে'র নদীকলধ্বনিত শ্যাম বনপথে চলিতে চলিতে কোন পথিকের হয়ত মনে হয় না যে, উপরে এই মেঘলোকে এমন একটি বিপরীত দৃশ্য নিত্য অভিনীত হইতেছে।

সম্মুখের পর্ব্বতগর্ভে মশমাই-প্রপাতের অবিশ্রান্ত ঝমঝম্ ধ্বনি শুনিতেছি;—কিছু দেখা যায় না, শুধু অধীর প্রতীক্ষায় আমরা অপেক্ষা করিতেছি। ওই নিরন্ধ্রান্ধকার অন্তঃপুরে না জানি কত ঐশ্বর্য্য মায়াকাঠির স্পর্শে ঘুমন্ত রহিয়াছে। মাঝে মাঝে তাহার কত আভাস পাই, কিন্তু মেঘ ও 'ফগ' একাকার হইয়া কিছুই দেখিতে দেয় না। মেঘের নিরুদ্দেশ যাত্রা ও 'ফগে'র অন্তস্থানে বিচরণের মধ্যে একটা পরম মিলন হইয়াছে; তাহার মধ্যে অতি-দূরের গগনের নিকট অতি-নিকটের পৃথিবী আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। এদিকে নিমেষের জন্য ফগের আবরণ সরিয়া গেল—আমরা কেবল দেখিলাম, উপর হইতে যেন চন্দ্রকিরণ টুক্‌রা টুক্‌রা ভাঙ্গিয়া সফেন কলহাস্যে ঝরিয়া পড়িতেছে! আবার সব বন্ধ হইয়া গেল।

আমরা ঘরের পথে চলিয়াছি। তখন পূর্ব্বদিকে নব কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র উঠিয়াছে। এই সীমারেখাহীন বালুকাময় পথের উপর চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণ পড়িয়া একটা অনাদি চিররহস্যে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। দূরদূরান্তরে সন্ধ্যাতারা স্থির অপলকে চাহিয়া আছে; লোকলোকান্তরে চন্দ্র আপনার প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে আপনি মগ্ন। পাইনের অনন্ত

আনন্দ-মর্মরে, শুভ্র অভ্রদলের লীলাকলায়, ঘন-ঘন-পবনের জ্যোৎস্নাহসিত শ্যামলিমায় কাহার যেন আভাস পাই—তাহা বিশ্বপ্রকৃতির। সে যে চিরনবোঢ়া, চিরলজ্জাবিধুরা,

মেঘ ও 'ফগের' মিলন ক্ষেত্র

চিরহাস্যমধুরা। গোপন বলিয়াই সে মধুর, নীরব বলিয়াই তাহার জন্য বাঁশী চিরন্তন মুখর, অপ্রকাশ বলিয়াই তাহাকে বুক চিরিয়া প্রকাশ করিবার জন্য এত ভুবনভরা আয়োজন।

তবু যাহার স্পর্শে মানবের অন্ধ তামসী-রজনী ধরিয়া শত দীপালি-উৎসব জাগে সে মৌন। তাই মনে পড়ে Blasco Ibanez-এর কথা—

"The heaven and the stars know nothing of our life, and neither does this world.

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

অতন্দ্র

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র পাল

সম্মুখে উঁচু-নীচু বিস্তীর্ণ প্রান্তর, তাহার মাঝে মাঝে কয়েকটি ইটের পাঁজা, আর দূরে একটি নিঃসঙ্গ নারিকেল গাছ। নিস্তব্ধ রাত্রের মেঠো বাতাসে নারিকেল-পাতায় যেন ব্যথিত সকাতর দীর্ঘনিশ্বাসের বিলাপ জাগিয়া ওঠে। কখনও আবার ঝড়ের দামাল বাতাসে তাহার পাতায় পাতায় অশ্রান্ত কান্না থামিতে চায় না। প্রান্তরের উপর অসহায় আশ্রিতের মত একটি ক্ষীণ রুগ্ন পথ পড়িয়া আছে। শীর্ণ পথের একটি ধারে একখানি ছোট সাদা বাড়ীকে ঘিরিয়া ফুলের সুসজ্জিত বাগান। ধারে ধারে কচিৎ আর দু'একখানি যে বাড়ী দেখা যায়, তা নিতান্তই গরীবের সুতরাং অনাড়ম্বরও দীনতা-জীর্ণ।

শীতের রাত্রি কুয়াসায় আচ্ছন্ন। শুক্লপক্ষ। যেন পুঞ্জ পুঞ্জ লঘু সাদা মেঘের উপর একাদশীর ম্লান জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। সেই অপরূপ আলোয় বহু দূরের ইটের পাঁজাগুলি স্তব্ধ প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া। নারিকেলগাছের পাতায় শীতের বাতাসের কাঁপুনির শব্দ শোনা যাইতেছে। সাদা বাংলোর বারান্দায় একটি ইজিচেয়ারে সুপ্রকাশ হেলান দিয়ে বসিয়া আছে, পাশে তাহার নববিবাহিতা স্ত্রী কল্যাণী নীরবে বসিয়া।

বিবাহের পর আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া এই নির্বান্ধব সহরে আপনাকে নির্বাসিত করার মূলে ছিল সুপ্রকাশের তিক্ত অতীত—যে ইতিহাস তার শেষ দশটি বৎসরের সকল শান্তি বিষাক্ত করিয়া দিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে সুপ্রকাশ বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে বলে, কল্যাণী, এ-রকম ক'রে থাকা তোমার পক্ষে যে কি কষ্টকর হ'য়ে উঠছে তা' আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমার মত স্বামী পাওয়া আজকালকার মেয়েদের পক্ষে একটা কঠোর অভিশাপ নয় কি?

একথার কোন উত্তর কল্যাণীর নিকট হইতে আসিল না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইতে যাইতে শুধু বলিয়া গেল, বড় বেশী ঠাণ্ডা পড়েছে, যাই র‍্যাগটা নিয়ে আসি।

সুপ্রকাশের কথার কি উত্তরই বা সে দিবে! বিবাহের পর একটি দিনও এই লাজুক মেয়েটি স্বামীকে একান্তভাবে পায় নাই; এমন কি স্বামীর কথাবার্ত্তার সংখ্যার হিসাব দেওয়া তাহার পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার মনে হইত, সুপ্রকাশের ভিতর কোথায় যেন একটি বিপুল সঙ্কোচ লুকাইয়া থাকিয়া তাহার সমস্ত আনন্দকে আড়াল করিয়া রহিয়াছে। তবু প্রথম দিনই অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া সে বলিয়াছিল, আপনি জীবনে বুঝি খুব বড় রকমের দুঃখ পেয়েছেন?

ইহার উত্তরে সুপ্রকাশ এমন ক্লান্ত, এত অসহায় ভাবে তাহার দিকে চাহিয়াছিল যে দ্বিতীয়বার এ প্রশ্ন করিবার নির্বুদ্ধিতা কল্যাণীর হয় নাই। দাম্পত্য-জীবনের সকল ক্ষুণ্ণতা লইয়া সে স্বামীর বহিঃসংসারের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এমন কি, প্রথমবার স্বামি-গৃহে আসার দিন-তিনেক পরে যখন তাহার পিতা তাহাকে লইতে আসিলেন তখন সে কিছুতেই গেল না, বলিল, এখন তো আমার যাওয়া হ'তে পারে না। কালকে আমাদের যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত হ'য়ে গেছে; এইমাত্র উনি বার্থ রিজার্ভ ক'রে এলেন। রোগা শরীরে যাবেন, সেখানে কেউ দেখবার নেই—না, আমাকে সেখানে ওঁর সঙ্গে যেতেই হবে।

কল্যাণী সেই যে ভিতরে গিয়াছে এখনও ফিরে নাই। কিছুক্ষণ পরে সে র‍্যাগ হাতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়;

তখন সুপ্রকাশ আপনার চিন্তায় অর্দ্ধ-তন্দ্রামগ্ন। কল্যাণীর আসার কোন সাড়াই তাহার নিকট পৌঁছাইল না। কল্যাণী সুপ্রকাশের মাথার নিকট স্বপ্নাবিষ্টের মত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। চারিদিকের নিস্তব্ধতার ভিতর তাহার অশান্ত হৃদয়ের আর্ত্তশব্দ কানে আসিয়া বাজে—নারীর নির্ম্মম পরাজয়! কল্যাণীর মনের সকল অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা মুক্তির সন্ধানে অন্ধকারে পথ খোঁজে।

সন্ধান-যে-দিতে-পারে সে ততক্ষণ জীবনের অতীত তটের ধারে ধারে আত্মবিস্মৃত ক্ষ্যাপার মত বেড়াইতেছে। রুদ্র মহাদেব সতীর চিতাভস্ম মাখিয়া উদাস; তপশ্চারিণী গিরিকন্যার সন্ধান সে জানেনা, জানিতে চায় না।

কিছুক্ষণ পরে কল্যাণী অতি সন্তর্পণে র‍্যাগটিতে সুপ্রকাশকে ঢাকিয়া দিতে যাইবে এমন সময় সে বলিয়া ওঠে, তুমি কতক্ষণ এসেছ কল্যাণী? কিন্তু এখানে আর নয়, চল ভেতরে গিয়ে বসি। এই জ্যোৎস্নার রাতগুলো কিছুতেই আমি সহ্য করতে পারি না'।

শেষের কথাগুলি আপনার মনে বলিতে বলিতে সে ঘরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়ায়, ঘরে চেয়ারে বসিয়া হঠাৎ সুপ্রকাশ বলিয়া ওঠে, তুমি আমার কাছে স'রে এস কল্যাণী, আরও কাছে।

কল্যাণী ধীরে আসিয়া ইজিচেয়ারের নিকট দাঁড়াইতেই সুপ্রকাশ তাহার হাতটি ধরিয়া নিজের পাশে চেয়ারের হাতলের উপর বসাইয়া দিল। কল্যাণীর বিষণ্ণ মুখখানিতে ঘরের নীলাভ আলো এক অপরূপ স্নিগ্ধতা ছড়াইয়া দিয়াছে।

সহানুভূতির সুরে সুপ্রকাশ বলে, তোমার চোখের পাতা যে এখনও ভারী হ'য়ে আছে,—তুমি কাঁদছিলে কল্যাণী?

স্বামীর নিকট এতখানি আদর কল্যাণী পূর্ব্বে পায় নাই। উত্তর দেওয়ার মত কথা তাহার কিছু ছিল না, শুধু মনে হয়, এই নির্লিপ্ত মানুষটির বুকে মুখ গুঁজিয়া সে যদি তার নিরুদ্ধ কান্নার সবক'টি দুয়ার খুলিয়া দিতে পারে তবেই বুঝি তৃপ্তি হয়।

কিন্তু সুপ্রকাশ তখন বলিতেছে, আমার এ-রকম ক'রে বেঁচে থাকার পেছনে যে মস্ত বড় একটা দুঃখের ব্যাপার আছে তা' বোধহয় তুমি প্রথমদিনেই বুঝেছিলে। আমি সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র এতদিন তোমায় জানাতে পারিনি। পারিনি ব'লেই আমি আজ নিজের মনকে ক্ষতবিক্ষত অসহায় ক'রে তুলেছি, তোমারও ক্ষোভের সীমা নেই কিন্তু আজ আমি বুঝছি তোমার আমরা মধ্যে এই গোপনতা আর রাখা চলবে না।

পাশের খোলা জানালা দিয়া ঝলকে ঝলকে শীতের বাতাস ঘরের ভিতর ছুটিয়া আসে। কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশের তারাগুলি নিষ্প্রভ, রাত্রির নিবিড়তার সহিত জ্যোৎস্নার প্রাচুর্য্য বাড়িয়া যায়—তাহারি খানিকটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

যূঁই, চামেলীর সৌরভ নদীর নূতন স্রোতের মত দম্‌কা হাওয়ার সঙ্গে বারবার নিজেকে বিলাইয়া দেয়। ঘরের ভিতর জ্যোৎস্নার রেখাটুকু পড়িতেই সুপ্রকাশ ত্রস্তভাবে বলে, শীগ্‌গির জান্‌লাটা বন্ধ ক'রে দাও।

জানালাটা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিতে সুপ্রকাশ বলিল, কিন্তু আমার জীবনের সেইসব মর্ম্মান্তিক ঘটনা তোমার পক্ষে না শোনাই ভাল ছিল। এখন আর উপায় নেই, তুমি জেনে নিয়েছ—কি একটা বিষণ্ণতা আমার সমস্ত মনকে পঙ্গু ক'রে দিয়েছে। অতীতকে যে কিছুতেই ভুলতে পারলাম না! আচ্ছা কল্যাণী, আমার জীবনের পুরানো ঘটনা শোনবার জন্যে তোমার খুব আগ্রহ হয়?

মৃদুস্বরে কল্যাণী বলে, সে সব শোনবার অধিকার তুমি তো আমায় কোনদিন দাওনি!

সুপ্রকাশ নীরব। কিছুক্ষণ পরে কল্যাণীর একটি হাত নিজের হাতের উপর তুলিয়া সে বলে, এ যে তোমার নির্ম্মম অভিমান। অধিকার যদি নিজে থেকেই তোমায় দিতে পারতাম, তবে তো এসব আলোচনার প্রয়োজনই ছিল না; তোমার দুর্দ্দান্ত আকাঙ্ক্ষার আড়ালে আমি আমার সমস্ত দুর্ব্বল সত্তাকে গোপনে রাখতে চাই। যে মানসিক চিন্তার ব্যাধি দুঃস্বপ্নের মত আমার

অবশ ক'রে দিয়েছে তোমায় সুস্থ মনের ছোঁয়াচে সে যেন সেরে ওঠে, এই আশাতেই তোমাকে আমার কাছে ডেকেছি। একি তোমার পক্ষে খুবই কঠিন,—তুমি কি পারবে না আমার এই অনুনয়টুকু সহ্য করতে?

কল্যাণীর মুখখানি গভীর আনন্দে অপ্রকাশের বুকে আশ্রয় খুঁজিয়া লয়, তাহার দ্রুতনিশ্বাসের উত্তেজনার ভিতর সে যেন বলিতে চায়, পারব—আমি পারব, সে বিশ্বাস নিয়েই যে বেঁচে আছি।

অপ্রকাশ সোহাগ করিয়া কল্যাণীর খোঁপার কাঁটা-কয়টি তুলিয়া লয়, কুঞ্চিত কালো কেশ নিবিড় সন্ধ্যার মত তাহার পিছনদিকে ছড়াইয়া গিয়া নীচ অবধি লুটাইয়া পড়ে। আর অপ্রকাশ ভাবে তাহার জীবনে প্রণয়ের উৎসব কতদিন পূর্ব্বেই অবসান হইয়া গেছে, আজ ইহাকে দিবার মত কিছুই তাহার নাই। কিন্তু তাহার নিকট হইতে সামান্য আদর পাইলে যে-মেয়েটির তৃপ্তিতে জোয়ার আসে, সেই তৃপ্তির পরিপূর্ণ প্লাবনের জন্য অভিনয়ই যথেষ্ট।

কল্যাণী মুখ তুলিয়া বলে, বলবে না তোমার সেই সব কথা?

অপ্রকাশ চমকাইয়া উঠিল। অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে বলিয়া ওঠে, নিজে মুখে আমি পারব না সে সব বলতে—কিছুতেই না। কিন্তু তুমি কি শুনবেই?

শোনা যে আমার দরকার।—কল্যাণী দৃঢ়স্বরে বলিল। স্বামীর অতীত-জীবনের বেদনা-অনুশোচনা সে যেন মুছিয়া ফেলিতে চায় বলিয়াই তাহার সমস্ত জানা প্রয়োজন।

বেশ, তাহ'লে সুধীরকে এখানে আসতে লিখে দেবো। সে আমার বাল্যবন্ধু, আমার সম্বন্ধে একটি কথাও তার জানতে বাকী নেই। আর একজন জানে, শুধু মৌখিক জানা নয়, সমস্ত হৃদয় দিয়ে সে আমার পরিচয় পেয়েছে।—বলিতে বলিতে অপ্রকাশের কণ্ঠ যেন অপরিসীম দুর্ব্বলতায় ক্ষীণ হইয়া আসে, মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়।

অস্থিরতার সহিত তখন সে বলিতেছিল, জীবনের শান্তিতে তার আগুন ধরিয়ে দিয়েছি, পৃথিবীতে বেঁচে থাকা তার লজ্জার বিষয়, রাতে হয়তো চোখে ঘুম আসে না। আমারি মত জ্যোৎস্না দেখ্‌লে কেঁপে ওঠে। কিন্তু থাক্‌—

সুপ্রকাশকে এতখানি উত্তেজিত হইতে কল্যাণী পূর্ব্বে দেখে নাই। কিছুক্ষণ পরেই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! শান্তকণ্ঠে সে তখন বলিতেছে, তোমার চুলগুলো রেশমের মত নরম,—আর চোখ দুটোর কী চমৎকার স্নিগ্ধতা! মুখখানি মেঘ্‌লা আকাশের মত থম্‌থমে হ'য়ে উঠেছে, তুমি রাগ করলে কল্যাণী? শুনবে এখন সমস্তই সুধীরের কাছে, কিন্তু লক্ষীটি তার আগে আর এ সম্বন্ধে কোন কথাই আমায় জিজ্ঞাসা কোরো না। আচ্ছা কল্যাণী তোমার মুখটি আমার কাছে আর একটু এগিয়ে আনবে—

এক সপ্তাহ পরে সুধীর আসিয়া পৌঁছায়। কল্যাণী সুধীরের দূর সম্পর্কীয় বোন। বলাবাহুল্য সুপ্রকাশের এই পরিণয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল সুধীর, সে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলে, কিরে খুকী, তোর বুঝি অপ্রকাশের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি কিছু হ'য়েছে—তাই সন্ধির সন্ধান দিতে আমার ডাক পড়েছে। চিরকাল কি আর ছেলেমানুষি ক'রে কাটে!—একটু গিন্নীপণা করতে শেখ্‌।

কৃত্রিম ঝঙ্কারের সঙ্গে কল্যাণী বলিল, দেখ সকলের সামনে আমায় খুকী ব'লে ডেকোনা কিন্তু বলে দিচ্ছি।

খুকীই তো! এই তো সেদিনও—বলব নাকি? আর-সকল বলতে ত' শুধু সুপ্রকাশ।—সুধীর হাসিয়া বলে

তোমাকে পণ্ডিতি উপাধি দিতে হ'লে বাচস্পতি মিথ্যা-গুণাকর দেওয়াই উচিত। যাক্‌, এখন শীগ্‌গির হাত-মুখ ধুয়ে এসো, আমি তোমার খাবারটা নিয়ে আসি; না হ'লে তো বৌয়ের কাছে গিয়ে আমার নামে নালিশ করবে—আর সে আমার শ্রাদ্ধ ক'রে সাড়ে-দশ পাতার বকুনি পাঠাবে। এমন বেহায়া বউ তোমার!—বলিয়া হাসিতে হাসিতে কল্যাণী চলিয়া গেল। দেখিলে মনে হয়, স্বামীর সম্বন্ধে এতটুকু গ্লানি তাহার নাই। আকাশের বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতিটি রঙ তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে, সে যেন লঘু মেঘের মত মৃদু বাতাসের স্পর্শে ভাসিয়া বেড়ায়,—

তবু মাঝে মাঝে সুপ্রকাশের নির্জ্জন চিন্তার বিষণ্ণ ক্লান্ত দৃষ্টি তাহার মনের রামধনুর সাতটি রঙকে বিবর্ণ করিয়া তুলিতে চায়; কিন্তু সে ক্ষণিক্—কল্যাণীর সমুখে সুপ্রকাশের অভিনয়ে আগ্রহের ত্রুটি ছিল অল্প।

কল্যাণী চলিয়া যাইতে সুধীর বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল, ব্যাপার কি! তোমার জীবনের সমস্ত ঘটনা ওকে জানানো যে মোটেই সঙ্গত হবে না, তা' তুমি জানো অথচ তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন?

সুপ্রকাশ ম্লান হাসির সঙ্গে বলে, ওর জেদ ও শুনবেই। তা ছাড়া এই গোপনতা আমার অসহ হ'য়ে উঠেছে। কৃত্রিমতায় আমি ক্লান্ত; সমস্ত জানার পর তার প্রতি আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটিবিচ্যুতি সে যদি নিজে থেকে ক্ষমা করতে পারে, সেও শান্তি।

কিন্তু তাকে সমস্ত বলা যে কতবড় কঠিন কাজ—

সুধীরকে কথা শেষ করিতে না দিয়া সুপ্রকাশ ব্যস্তভাবে বলিয়া ওঠে, কিন্তু এ যে তোমায় পারতেই হবে,—শুধু আমার জন্যে নয়, কল্যাণীর, সুখশান্তির দিকে চেয়ে। কারণ এ রকম অভিনয় দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখা বেশীদিন আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

এমন সময় কল্যাণী খাবারের রেকাবি হাতে আসিয়া পৌঁছাইল।

বিকালবেলা ছোট বারান্দাটিতে তাহারা তিন জনে বসিয়াছিল। হঠাৎ সুপ্রকাশ চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিল, তোমারা দু'জনে ব'সে গল্প কর, আমার শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই, তা' ছাড়া অনেকগুলো দরকারী চিঠিপত্রও লিখতে হবে; আমি ভেতরে যাই।

উদ্বিগ্নভাবে কল্যাণী সুপ্রকাশের কপালে হাত দিয়া বলে, জ্বর হয়নি তো? লুকিয়ে অসুখের কষ্ট সহ্য করবার অভ্যেস তো তোমার খুবই আছে; পরশু সমস্ত রাত মাথার যন্ত্রণায় ছটফট্ করেছ তবু একবারও আমাকে ডাকোনি; এ তোমার ভারি অন্যায় কিন্তু! হাঁগা আজকে তোমার কপালের ব্যথাটা বেড়ে উঠেছে?

না গো না, আমার কিছুই হয়নি, শুধু বাইরে অনেক ব'সে থাকতে আর ভাল লাগছে না তাই ভেতরে গিয়ে চিঠিপত্র লেখার কাজগুলো সেরে ফেলব ভাবছি। বলিয়া সুপ্রকাশ ভিতরে চলিয়া গেল।

সুধীর ও কল্যাণী কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। অমবস্তার আকাশ তারায় তারায় সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, বহুদূরে কুয়াসার রেখা বন্যার জলের মত আগাইয়া আসে। কল্যাণী বলিল, হঠাৎ যে বড় গম্ভীর হ'য়ে পড়লে সুধীরদা'?

গম্ভীরভাবে সুধীর উত্তর দেয়, এতখানি স্তব্ধতা আর অন্ধকারের সামনে সমস্ত চাঞ্চল্য আপনাআপনি শান্ত হ'য়ে আসে। মনটাও সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন বিষণ্ণ হ'য়ে ওঠে,—মনে হয়, আমি ছাড়া পৃথিবীতে বুঝি আর কেউ বেঁচে নেই। সুপ্রকাশের কি যে খেয়াল! অতীতের স্মৃতি ভুলিয়ে দেবার জায়গা তো এ নয়, এ যে স্মৃতিতে একনিষ্ঠভাবে মগ্ন হ'য়ে যাবার স্থান!

সুধীরের উচ্ছ্বাসে কল্যাণীর চিন্তা তখন পুরানো পথে চলিতে সুরু করিয়াছে। তাহার স্বামীর গোপনীয় সকল কাহিনী এই লোকটির অজ্ঞাত নয় এবং সেই সমস্ত ব্যক্ত করিবার জন্যই আজ সে আমন্ত্রিত এই কথা মনে হওয়াতে এক দুর্নিবার আগ্রহে কল্যাণী বলিয়া ফেলিল, ওঁর জীবনে মস্ত বড় কি দুঃখ আছে আর তার সন্ধান তুমি জানো, তোমাকে সমস্ত কথা আজ আমায় বলতে হবে সুধীরদা'!

এ যেন অনুনয় নয়,—কল্যাণীর আদেশ। বিনা আপত্তিতে সুধীর বলিতে আরম্ভ করে, সুপ্রকাশের অবস্থা যে কোনকালে অসচ্ছল ছিল না, আজও যে নেই তা' তুই ভাল ক'রেই জানিস। স্বামীর বিপুল সঞ্চয়ের বোঝা তার মা যখন আগলেছিলেন তখন সে ছিল বিলেতে প্রবাসী ছাত্র। তারপর সে ফিরে এলে তার মা পৃথিবী হ'তে মুক্তি নিলেন। শেষনিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর শেষ আশীর্ব্বাদ হ'ল—জীবনে কোনদিন উচ্ছৃঙ্খলতার স্বপ্ন দেখবার চেষ্টা কোরো না, সহজ জীবনের ভেতর আনন্দ আছে, শান্তিও পাবে।

একটুখানি থামিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, কত বড় বেদনায় নারীর মুখে এই কথা তারা পেতে পারে তা' সেই অবস্থায় যে না-পড়েছে তার পক্ষে বোঝা অসম্ভব। সুপ্রকাশের মা সুলতা দেবীর বিবাহিত জীবনের আগাগোড়া পঁচিশটি বৎসর এক নিদারুণ অনৈক্যের ভেতর

দিয়ে কেটে গেছে। সংসারের সকল সাধারণ নিয়মের বিরুদ্ধে মহীতোষ বাবুর সৃষ্টিছাড়া বিদ্রোহ বিকশিত হ'ত। সেই বিদ্রোহের চরম উত্তেজনায় তিনি রাশিরাশি মদ গিলতেন। কিন্তু এই বিরুদ্ধবাদীর দুর্ব্বলতার মধ্যে ছিল তাঁর সামাজিকতার মোহ অর্থাৎ লোকের সঙ্গে মেলামেশার নেশা; তাকে দুর্ব্বলতা বললে ভুল করা হবে, কারণ নিজের বিরুদ্ধমতের কতকগুলি সহিষ্ণু-শ্রোতা তিনি নিজেই গ'ড়ে তুলেছিলেন। স্বামীর এই মেলামেশার নেশাটাই সুলতা দেবীর অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। দু'জনের পথ ছিল আলাদা, কিন্তু বাইরের মানুষগুলির কাছে তাঁদের দাম্পত্যজীবনের যে ফাঁকিটুকু ত্রুটিহীন অভিনয় দিয়ে আড়াল করতে হ'ত সেইটেই ছিল তাঁর মনস্তাপের একমাত্র কারণ।

সুধীর নীরব হইয়া গেল, যেন এক প্রবল সঙ্কোচ আসিয়া ইহার পরের কাহিনী বলিবার মুখ চাপা দিয়াছে। কিন্তু কল্যাণীর ঔৎসুক্যের সীমা ছিল না, অস্থির হইয়া সে বলে, চুপ করলে যে? শুনতে আমার কষ্ট হবে ব'লে কিছু বাদ দেবার চেষ্টা কোরো না সুধীরদা'

সুধীর অগত্যা বলিতে আরম্ভ করিল, মহীতোষবাবু বিলেত গিয়েছিলেন। আই-সি-এস-এ Compete করবার জন্যে। শ্বশুরের নিন্দে তোর কাছে বেশী না করাই ভাল, তবে এইটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে তাঁর প্রবাসের দিনগুলো তিনি সৎভাবে কাটাননি এবং তার পরিণামে আই-সি-এস-এর আশা ছেড়ে দিয়ে তাঁকে এদেশে ব্যারিষ্টার হ'য়ে ফিরতে হ'য়েছিল। কিন্তু ফিরে যখন এলেন তখন-সে দেশের মেয়েদের চটুলতা, সপ্রতিভ ব্যবহার তাঁর মনে অনেকখানি বিপর্য্যয় ঘটিয়ে দিয়েছে। এদেশের লজ্জানম্রা বধূটিকে তিনি পূর্ব্বেকার আত্মীয়তা দিয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু এঁর জন্ম হ'য়েছিল কখন —তাঁর বিলেত যাওয়ার আগে না তিনি ফিরে আসার পর?

সুধীর উত্তর দেয়, না, মহীতোষবাবু বিলেতে থাকাকালীন খবর পেয়েছিলেন যে তাঁর একটি পুত্রসন্তান হ'য়েছে, যাই হোক, সুপ্রকাশই ছিল স্বামী-স্ত্রীর ভেতর যা' কিছু যোগ, কিন্তু সেখানেও একটা অবহিত অত্যাচার ঘটত যা' এড়াবার উপায় ছিল না। মা-বাপ দু'জনেরই অপত্যস্নেহ প্রবল, দু'জনেই চাইতেন ছেলেকে নিজের ধারায় মানুষ করতে। দক্ষিণ উত্তর দুই দিকের বাতাসে লাগল সংঘর্ষ, সেই অন্তর্বিপ্লবে কোনো ঝঙ্কার উঠল না, বিসদৃশ কোন ঘটনাও বাইরের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি, কিন্তু আঘাত গিয়ে দু'জনের মনের ক্ষত বাড়িয়ে তুললে, তাঁদের অন্তরে গ'ড়ে উঠল এক অবিনীত অভিমান—চাপা কান্নার মত একটা গুমরানি। ফলে সুপ্রকাশ বাপের কাছ থেকে পেল তাঁর খেয়াল, মায়ের কাছ থেকে তাঁর সহিষ্ণুতা।

কল্যাণী তার জানিবার ঔৎসুক্যে এতটুকু ফাঁক রাখিতে চায়না, তাই আবার প্রশ্ন করে, কিন্তু তুমি তো তখন নেহাৎ ছোট, তাঁদের মনের এত বৈষম্যের সংবাদ যা' বাইরে প্রকাশ হবার পথ পায়নি তা' তুমি কি ক'রে জানলে?

সুধীর এইবার হাসিয়া ফেলে; বলিল, বোকা মেয়ে! এসব কি কোনদিন লুকিয়ে রাখা যায়? থিয়েটারে সু-অভিনয়ের গুণে আসল চরিত্রগুলো যেন চোখের সামনে হাজির হয় ব'লে আমাদের মনে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল যতটুকু সময় আমরা রঙ্গালয়ের ভেতরে থাকি, পরে বাইরে এলেই মনে হয় এশুধু ফাঁকি; স্বপ্নের পর চেতনা পাওয়ার মত ধরা প'ড়ে যায় যে এইমাত্র যা দেখে এলাম সে অভিনয়। তেমনি ক'রেই মহীতোষবাবুর ওখানে যাঁরা যেতেন তাঁরা বুঝতেন স্বামী-স্ত্রীর ভেতরকার বৈষম্য। শুধু মহীতোষবাবুর সঙ্গে নয়, তাঁর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ সকল পরিবারের সঙ্গে আমাদের আলাপ-আত্মীয়তা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই সূত্রে সুপ্রকাশদের বাড়ীর ব্যাপার আমার কাছে কিছুই অজ্ঞাত নেই।

হঠাৎ নীরব হইয়া সুধীর যেন একটি মস্ত-বড় দুঃসংবাদ কোমল করিয়া শুনাইবার পদ্ধতি চিন্তা করে। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকাও বিপদ, কল্যাণীর অপ্রশমিত আগ্রহে সন্দেহের ছায়া না আনাই তাহার ইচ্ছা।

এক কৃত্রিম প্রশান্তির সঙ্গে সে বলিতে সুরু করিল, মহীতোষবাবুর বন্ধু বিপত্নীক ব্যারিষ্টার মজুমদারের বাড়ীতে সুপ্রকাশের যাওয়া-আসার বাতিক ছিল একটু বেশী রকম,

কারণ মিঃ মজুমদারের বাড়ীতে আধা-সাহেবী মজ্‌লিসের চুম্বক ছিলেন তাঁর সুন্দরী কন্যা রমলা। সুপ্রকাশের মনে আজ অবধি সেই মেয়েটি একাধিপত্য করছে।

কথাটা বলিয়াই সুধীরের মনে হয়, নিকট-আত্মীয়ের অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদ শোনার যে অপরিমেয় রূঢ় বেদনা তাহার অব্যক্ত আর্ত্ততা সে যেন কল্যাণীর মর্ম্মে মর্ম্মে ছড়াইয়া দিয়াছে।

অপরাধীর কুণ্ঠিত-কণ্ঠে সুধীরের মুখ হইতে বাহির হয়, তোর শুনতে কি খুব কষ্ট হ'চ্ছে কল্যাণী?

একটু ক্ষীণ হাসির সঙ্গে উত্তর আসিল, না।

অন্ধকারে কল্যাণীর মুখ দেখিতে পাওয়া গেল না, দেখিলে বোঝা যাইত কী সুতীব্র বেদনা তাহার সমস্ত অন্তরটি ছাইয়া ফেলিয়াছে,—ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের স্রোতের মত তাহার মনের শান্তি, জীবনের সকল কামনা, আশা যেন পাষাণ-কঠিন তটে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। সেখানে "বিলাপ" মুখর নয়, অপরিসীম নৈরাশ্যে পঙ্গু।

সুধীর তখন সসঙ্কোচে বলিতেছে, রমলাকে একান্ত ক'রে পাওয়ার বিরুদ্ধে সুপ্রকাশের বিলেত যাওয়া হিমালয়ের মত মাথা উঁচু ক'রে বাধা দিয়েছে। এ তার বাপের একটা খেয়াল। তিনি কন্যাপক্ষকে বুঝিয়ে দিলেন যে বিলেত থেকে ফিরে আসার পরেও যদি রমলার প্রতি সুপ্রকাশের অনুরাগ অটুট থাকে তবেই বিয়ে হ'তে পারে, না হ'লে সমস্ত সংসারটি অশান্তিতে ভ'রে উঠবে। সুপ্রকাশের আরাধ্যা রমলার অভিভাবক এ যুক্তিটা অস্বীকার করতে পারলেন না।

সুধীর একবার অন্ধকারের ভিতর কল্যাণীর অবস্থা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়া চলিল, যা'ই হোক্‌, সুপ্রকাশ তো একদিন বিলেতের জাহাজে চ'ড়ে বসল সেখানে ইঞ্জিনীয়ারিং শেখার অভিপ্রায়ে। বিদায়ের আগে রমলার বিচ্ছেদকাতর ছল্‌ ছল্‌ দৃষ্টিতে তার চিত্ত তখন ভরপুর। রমলার প্রেম তাবিজ-ধারণের মত তাকে বিলেতের সকল মোহ হ'তে রক্ষা করবে এই হ'ল তার সান্ত্বনা, এদিকে মহীতোষবাবুর কাছে মৃত্যু এল অকস্মাৎ শব্দহীন পদে—কোর্টে একটা বড়দরের কেস্‌-এ হেরে গিয়ে প্রবীণ ব্যারিষ্টারটি বাড়ী ফিরে এলেন, এসেই সেই যে লাইব্রেরী-রুমে গা-ঢাকা দিলেন, সজ্ঞানে আর সেখান হ'তে তাঁকে বেরোতে হ'লনা। সমস্ত রাত্রি আলো জ্বল্‌ল, ব্যারিষ্টার সাহেব মনের উত্তেজনায় আইনের পাতাগুলি আবার উল্টোতে লাগলেন। সকালবেলা দেখা গেল তিনি চেয়ারেই ব'সে আছেন, সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার ক্লান্তিতে যেন সবে মাত্র তাঁর চোখদু'টি বুজে এসেছে—হাতে সিগার, সামনে খোলা বই। সে-ই তাঁর শেষ ঘুম—ডাক্তারেরা বললে অতিরিক্ত মদে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রটি ডুবে গেছে, তাঁর স্পন্দনের সাড়া আর মিলবে না। সুপ্রকাশের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছল তখন সে সমুদ্রের বুকে।

দুর্য্যোগের মত কল্যাণীর ক্লিষ্ট মন তাহার নৈরাশ্যের চিন্তাকে আর নীরবে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সুধীরের নিকট আপনার দুর্ব্বলতা প্রকাশ হওয়ার ভয়ে সে উঠিয়া বলে, এখন আর থাক, ওঁর খওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হ'বে, তুমিও চল খেয়ে নেবে।

ভিতরে গিয়া জানিতে পারিল সুপ্রকাশ অনেকক্ষণ পূর্ব্বে শয্যার আশ্রয় লইয়াছে। স্বামীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কল্যাণী নির্নিমেষে স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। সেই বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন সুপ্রকাশের অবসন্ন নিস্তেজ প্রাণের সঠিক সংবাদ পায়; মনে হয়, তাহার ও সুপ্রকাশের মধ্যে ব্যবধান—সে অনন্ত—পৃথিবীর কোন আকর্ষণই সেই ব্যবধানের শূন্যতা ভরিয়া তুলিতে পারেনা। এ যেন দুরারোগ্য ব্যাধি, মৃত্যুই যার একমাত্র মুক্তি। কল্যাণী নিজেকে প্রশ্ন করে, সুপ্রকাশকে ছাড়িয়া কোথাও যাইলে সে শান্তি পাইবে কি? তৃপ্তি, শান্তি এসব তো বহুদূরে, স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতে যে তাহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই।

কল্যাণীর দৃষ্টি চোখের জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসে, বাহিরের বারান্দায় সে নীরবে আসিয়া দাঁড়াইল। সুধীর তখন ভিতরে চলিয়া গেছে। সেই অসীম নিস্তব্ধতার ভিতর থাকিয়া থাকিয়া বহুদূরের কোন উৎসবমত্ত গ্রাম হইতে উল্লাসের ছোট ছোট আওয়াজ ভাসিয়া আসে।

কল্যাণীর মনে হয়, সে যেন কোন শোকাকুলা নারীর বিলাপ।

অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী সুধীরের নিকট একটি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসে। কিজন্য যে সে আসিয়াছে তাহা সুধীরের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু এত রাত্রে এতক্ষণ পরে যে বাকী কাহিনীটা শুনিতে সে ফিরিয়া আসিবে, এ সুধীর ভাবে নাই।

পাথরের মত ভাবলেশহীন মুখের দিকে চাহিলেই কল্যাণীর অন্তরের অসহনীয় ব্যাকুলতার আভাস বেশ বোঝা যায়। আলোর সেটুকু আবিষ্কার করিয়া সুপ্রকাশের সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিতে সুধীরের ইচ্ছা হয় না। সে বলিল, আজ নিশ্চয়ই তোর খাওয়া হয়নি! বাকীটা না হয় সেই শুন্‌লি কল্যাণী? দুঃখকে যেচে বরণ করায় যে কোন মানেই হয় না।

জানি, কিন্তু সে কষ্ট জয় করবার শক্তি আমার আছে। এই বেদনাকে আমি ভুলব, আমায় ভুলতেই হবে, সমস্ত শোনবার পর আমার সামনে থাকবে স্ত্রীর পরম কর্ত্তব্য, তুমি বল।—কল্যাণী শান্ত মৃদুকণ্ঠে উত্তর দেয়।

কল্যাণীর উত্তরে সুধীর হয়তো আশ্বস্ত হইল কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে একজনের মুখে নিষ্ঠুর হাসি ফুটিয়া ওঠে, অভন্ত্র বিধাতা।

সুপ্রকাশ কোথায়?—সুধীর জিজ্ঞাসা করিল।

—ঘুমিয়েছেন।

তখন সুধীর আবার বলিতে সুরু করে, সুপ্রকাশ চ'লে যাওয়ার পর একটি নবীন ব্যারিষ্টারের, মিঃ মজুমদারদের বাড়ীতে অভির্ভাব হ'ল, সে আমার পরিচিত অনন্ত রায়। বাপের সম্পত্তি আর নিজের দৈহিক সৌন্দর্য্য ও কথা বলবার পটুতায় সে সেখানকার মজ্‌লিস সরগরম ক'রে তুললে। সকলের সঙ্গে তার হৃদ্যতা জ'মে উঠল। রমলাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য। সে যে কতখানি সফল হ'য়েছিল তার সন্ধান পেয়েছিলাম তাদের বিয়ের সংবাদে।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, তাঁদের কি বিয়ে হ'য়ে গেছে? তাঁরা এখন কোথায়?

—বিয়ে তাদের হ'ল। মিঃ মজুমদারের আর পুত্র-সন্তান ছিলনা, রমলাই তাঁর সমস্ত বিত্ত পেয়েছিল। মাতাল অনন্তের স্বভাবচরিত্রের সংবাদ আর কেউ না রাখলেও তার সংসারে এসে রমলার কিছু জানতে বাকী রইলনা। কিছুদিন তার অত্যাচারে রমলার জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেছিল। পাষণ্ড অনন্ত আমাকে তার বন্ধু ভেবে অনেক কথাই বলত—স্ত্রীকে কেমন ক'রে সে শাসন করে আর তাকে লুকিয়ে কেমন নিপুণতার সঙ্গে তার দুশ্চরিত্রতার অভিসার চলে, এসব ছিল তার গর্ব্বের বিষয়। রমলাকে বেশীদিন এই নরকভোগ করতে হয়নি, দুরারোগ্য ব্যাধি তাকে মুক্তি দিলে।

চম্‌কাইয়া কল্যাণী বলে, তিনি মারা গেছেন!—এমন ভাবে বলে যেন এই কাহিনী শোনার কয়েকটি মুহূর্ত্তে রমলার সহিত তাহার অন্তরঙ্গ পরিচয় হইয়া গেছে।

—হ্যাঁ। সে মারা যাওয়ার কিছুদিন পরে সুপ্রকাশ বিলেত থেকে ফিরে এল। এসে আমার কাছে অনন্তের কীর্ত্তির কথা সমস্ত শুনে সে যেন উন্মাদের মত হ'য়ে গেল। রমলার সম্বন্ধে সে বল্‌লে, 'এ সন্দেহ আমার হ'য়েছিল যখন সে আমার চিঠির উত্তর দেয়নি। সে যদি আজ বেঁচে থাকত তাহ'লে আমিই তাকে গুলি ক'রে মারতাম—যেমন ক'রে সে আমার বিশ্বাস, আমার প্রেমকে প্রতারণা করেছে।'

তাকে শেষকালে বললাম, প্রতারণা সে করেনি। রমলার রোগ শয্যাতে তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ায় সে আমায় বলেছিল 'যা সত্য নয় তা চিরকাল থাকে না। আজ আমার মিথ্যা মোহ ভেঙে গেছে। আমি আর বাঁচব না জানি, তাই পরস্ত্রী হ'য়েও আজ আমি অস্বীকার করব না যে মরবার মুহূর্ত্তে যদি আমার কোন সান্ত্বনা থাকে সে তাঁর ভালবাসা আর আমার হারানো-তিনি আবার আমার ভেতর ফিরে এসেছেন—তারি আনন্দ! আমার অপরাধ তিনি যেন ভুলে যান; জানি তিনি আমায় ক্ষমা করবেনই।'
সেইটুকু শোনবার পর সুপ্রকাশ শান্ত হ'ল। সে যেন কি ভাবনায় ডুবে গেছে।—সুধীর চুপ করে।

কিছুক্ষণ পরে কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, উনি যে

বলছিলেন আর একজন-কে তাঁর জীবনের এইসব কথা জানে, সে কি অনন্ত রায় ?

হঠাৎ এই প্রশ্নে সুধীর বিব্রত হইয়া পড়ে। কল্যাণীর দিকে চাহিয়া তাহার কতবার মনে হইয়াছে, সে বুঝি তাহার কথা শুনিতে শুনিতে মূর্চ্ছা যাইবে। পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার বিরুদ্ধে দুঃখ আছে অনেক, সেখানে সান্ত্বনা শুধু মানুষের অনন্ত আশা। স্বামীকে ফিরিয়া পাওয়ার উন্মুখ-মনটি কল্যাণী এখনও হারায় নাই ; আর একটি গভীর আঘাতে সেই চিন্তাকে চূর্ণ করিয়া দিতে সুধীরের মন সঙ্কোচ অনুভব করে।

সুতরাং সুধীরকে সত্যমিথ্যার মাঝামাঝি একটি উত্তর তৈয়ারী করিতে হয়। সে বলিল, না, অনন্ত তো মারা গেছে। জানে যে, সে তার দ্বিতীয় পক্ষের বিধবা-স্ত্রী মাধুরী। মেয়েটি মামার গলগ্রহ হ'য়ে থাকত। মামার স্নেহে হয়তো তার কিছু অধিকার ছিল, কিন্তু মামী ছিলেন তার প্রতি একেবারে বিরূপ। হতভাগ্য অনন্তের সংসারে অভাগিনী মাধুরীকে অগত্যা আসতে হ'ল।

কল্যাণী বলিয়া ওঠে, তুমি বড় বাজে কথা বলছ সুধীরদা'। মাধুরীর সঙ্গে এ সমস্ত জানার কি সম্পর্ক তা'তো কিছু বলছ না। এঁর সঙ্গে কি মাধুরীর পরিচয় আছে ?

—শুধু পরিচয় কেন, সুপ্রকাশকে রমাদের বাড়ীতে দেখা থেকে মাধুরীর হৃদয় তার প্রতি গোপন প্রেমে বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল—একথা সুপ্রকাশ আজও জানে না বোধ হয়। জানত যে, সে রমলা। তাই রোগশয্যায় শুয়ে সে আমায় অনুরোধ করেছিল, 'মাধুরীর ভালবাসা যেন আমার মত নিষ্ঠুর আঘাত না পায়। সুপ্রকাশের সঙ্গে তার বিয়ের চেষ্টা তুমি কোরো।' কিন্তু সে চেষ্টা করবার অবসর আমি পাইনি।

এই শেষ,—কল্যাণীর নিকট হইতে আর কোন প্রশ্ন আসিল না ; পাথরের স্তব্ধ মূর্ত্তির মত সে মৌনভাবে নতদৃষ্টিতে বসিয়া রহিল। ভবিষ্যতের দুর্ব্বহ জীবনের চিন্তা ভীরু শিশুটির মত তাহার কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে চায়, কিন্তু সত্যবিধবা মাতার অনাদরে সে যেন অভিমানে ফিরিয়া গেল ;—কল্যাণীর মনে আজ আকাশের অসীম শূন্যতা।

অনেকক্ষণ পরে সুধীর বলিল, আমায় যে কাল যেতে হবে কল্যাণী !

কল্যাণী শঙ্কিতভাবে বলিয়া ওঠে, সে হবে না সুধীরদা' তোমাকে আরও কয়েকদিন এখানে থেকে যেতে হবে। এ-রকম অবস্থায় কি ক'রে আমি থাকব ? ওঁর সঙ্গে কথা বলবার সাহস যে আমার হারিয়ে গেছে !

সুধীর কল্যাণীর এই আড়ষ্টতার কারণ বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহার মনে হয়, এ সময়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে দো-ভাষীর মত তাহার না থাকাই একান্ত প্রয়োজন, তাহাতে দুইজনের মাঝে ব্যবধান বাড়িয়াই চলিবে।

সে বলে, না কল্যাণী, আমায় যেতেই হবে।—এমন ভাবে বলে, যেন ইহার পর আর অনুরোধ করা বৃথা।

কিছুক্ষণের নীরবতার পর স্নেহার্দ্রস্বরে সে বলিল, আপনার ভেতর আপনি সহজ হ'য়ে থাকিস্ বোন, তাহ'লে কোন দুঃখ, কোন মনস্তাপ তোকে বিব্রত করতে পারবে না।

—আশীর্ব্বাদ করো দাদা, আমায় সেই আশীর্ব্বাদ করো।—বলিয়া অকস্মাৎ কল্যাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

সেদিন সমস্ত রাত তন্দ্রাহীন কল্যাণী বারান্দায় বসিয়া রহিল। চারিপাশে তার অন্ধকারের সমারোহ, শীতার্ত্ত বাতাসের অভিশাপ। অতীত তাহার চিন্তার আতিথ্য নেয় নাই, ভবিষ্যতের আতঙ্ক যেন গভীর শঙ্কায় দুয়ারের নিকট হইতে ফিরিয়া যাইতেছে, বর্ত্তমানের বেদনা তাহাকে স্রোতে স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে,—ভয়ে সে ভাষাহীন, তাহার স্থিতির স্থান যেন সে ভুলিয়া গেছে,—নামহারা এক অপরিসীম দুর্ব্বলতায় তাহার অস্তিত্ব যেন অন্তর্গত।...

পরদিন সকালে সুধীর চলিয়া গেল।

সুপ্রকাশ ও মাধুরীর সম্বন্ধে গোপনীয় পরিচ্ছেদটি সে ইচ্ছা করিয়াই বলে নাই। গতরাত্রে সেই স্তব্ধ মেয়েটির

দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইয়াছিল, তাহার কোন কথা বুঝি কল্যাণীর নিকট পৌঁছাইতেছে না। সেইখানে সে নীরব হইয়া আশ্বস্ত হয়।

কিন্তু সকালবেলা কল্যাণী বলিল, চল সুধীরদা', তোমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।

তাহাদের বাড়ী হইতে ষ্টেশনের পথ বেশীদূর নয়। সমস্ত পথ কল্যাণী অত্যন্ত সহজভাবে কথা কহিতে কহিতে চলিল। বলে, দাদা বাড়ী পৌঁছে আমাদের একেবারে ভুলে যেও না, চিঠিপত্র দিও। দেখছই তো, লোকালয় হ'তে আমাদের নির্বাসন হ'য়েছে, একদিনের জন্যে এখানে এসে তোমার খুব কষ্ট হ'য়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার জন্যে রাগ কোরো না দাদা!—বৌদিকে নিয়ে শীগ্‌গির আর একবার এলে বুঝব তুমি রাগ করো নি।

কল্যাণীকে সহজভাবে কথা কহিতে শুনিয়া সুধীর আনন্দ ও আশ্বস্তিতে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে, বিস্মিতও হয় এই মেয়েটির মনের জোর দেখিয়া। হাসিয়া বলে, আসব—নিশ্চয়ই আসব। কিন্তু তোর বৌদিটি যে ঝগড়াটে মেয়ে, আমিই বলে তার কাছে হার মেনে যাই, তুই কি পারবি তাকে জব্দ করতে?

হাসিতে হাসিতে কল্যাণী উত্তর দেয়, খুব পারব। কিন্তু বৌদিকে জানাব নাকি যে তুমি তাকে ঝগড়াটে মেয়ে বলেছ?

কাতরতার ভঙ্গী করিয়া সুধীর বলে, এমন কাজটিও করিসনে। শুধু তো ঝগড়াটে নয় অভিমান আছে ষোলোমাত্রায়, বাপের বাড়ীতে গিয়ে ব'সে থাকবে, মান ভাঙাতে টাকা আর পরিশ্রমে আমার যা' খরচ হবে তা'তে স্বচ্ছন্দে আর একটা বিয়ে করা চলতে পারে।

—বেশ, বৌদি এলে তার কাছে গিন্নীপনা আর অভিমান করার ধরণ-ধারণ শিখে নিতে হবে।

হঠাৎ যেন সে আপন মনে বলে, কিন্তু কার উপরই বা আমি অভিমান করব!

এমনি কথাবার্ত্তার ভিতর তাহারা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছায়, অল্পক্ষণ পরে ট্রেন আসিয়া প্ল্যাটফরমে ঢুকিল। ছোট ষ্টেশন, গাড়ী বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। কল্যাণী হঠাৎ গম্ভীর ভাবে বলে, মাধুরীর সম্বন্ধে অনেক কথাই তুমি আমায় কাছে কাল গোপন করেছ দাদা! একদিন উনি আভাসে ব'লে ফেলেছিলেন, তাঁর জন্তেই মাধুরীর বেঁচে থাকা অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। এ জেনেও কালকে তোমার ফাঁকি ধরবার উৎসাহ ও মনের অবস্থা আমার ছিল না। এখন তোমায় ব'লে যেতে হবে কি-যে কারণ যার জন্যে সেই মেয়েটির জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেছে, আর ওঁরও অনুতাপের অন্ত নেই।

কল্যাণীর এই হঠাৎ প্রশ্নের জন্য সুধীর প্রস্তুত ছিল না। বলিল, এখন আর তোর সেসব শুনে দরকার নেই।

—তুমি বলতে চাও না সেই কথাই বল, কিন্তু আমি শুনবই, গাড়ী ছাড়বার সময় হ'য়েছে, তুমি যদি না বল তাহ'লে এই গাড়ীতে তোমার সঙ্গে আমি চ'লে যাব—এজন্মে আর এখানে ফিরব না।

কল্যাণীর কথা শুনিয়া সুধীর বুঝিতে পারে, তাহাকে সমস্ত না বলিয়া আর উপায় নাই। কিন্তু গাড়ী তখন ছাড়ে-ছাড়ে। সুধীর সংক্ষেপে বলে, অনন্তের উপর নিদারুণ প্রতিশোধের ইচ্ছায় এক সর্ব্বনেশে মুহূর্ত্তে সুপ্রকাশ মাধুরীকে একটি প্রণয়-লিপি পাঠিয়েছিল। চিঠি-রচনার ধরণে বেশ বোঝা যায়, যেন মাধুরী বহুদিন আগে থেকে অনন্তকে প্রতারণা ক'রে এসেছে। সেই চিঠি পড়েছিল অনন্তের হাতে; মাধুরীর ওপর অনন্তের নির্য্যাতনের কথা ছেড়েই দিই, কিন্তু সেই নির্দ্দোষী মেয়েটি যে সমস্ত হৃদয় দিয়ে সুপ্রকাশকে পূজা করত, তার প্রতি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে সে যে অন্যায় করেছিল, সেই অনুতাপই তার ভবিষ্যতের সবক'টি দিন বিষাক্ত ক'রে দিয়েছে। মাধুরী হয়তো তাকে ক্ষমা করেছে, কিন্তু হতভাগ্য সুপ্রকাশের অনুশোচনা কিছুতেই তা' বিশ্বাস করতে চায়না।

গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল শূন্য প্ল্যাটফরমের সেই স্থানটিতে পাথরের স্তব্ধ মূর্ত্তিটির মত কল্যাণী দাঁড়াইয়া আছে। রেল লাইন পার হইলেই সম্মুখে দুরন্ত মাঠ—রুক্ষ, শূন্য। চেতনা ফিরিয়া পাইতেই তাহার মনে হয়, মাঠের শূন্যতা পার হইয়া

যেখানে তাহার সন্ধান কোন মানুষ জানিতে পারিবেনা সেইখানে সেই নির্জ্জন নিবিড় বনে যদি সে আপনাকে একনিমিষে হারাইয়া ফেলিতে পারে তবেই বুঝি এই নির্মম অশান্তির শেষ হয়।

কিন্তু বাড়ীর চাকর আসিয়া যখন জানাইল যে বাবু তাহাকে বউদিদিমণির খোঁজে পাঠাইয়াছেন, তখন কল্যাণী আবার ফিরিয়া চলিল। চোখের জলে দৃষ্টি তাহার ঝাপ্‌সা,— ভীরু মন তাহার পথচলার গতিকে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

আপনার ভিতর আপনি পরিপূর্ণ যে-প্রেম, সেখানে মানুষ অতীতের স্মৃতি লইয়া তপস্যা-বিভোর থাকে। সেখানে দুঃখ নাই, অশান্তি নাই, আছে বাসনারঞ্জিত জগতের প্রতি এক উদার উদাসীনতা। রমলার শেষ মুহূর্ত্তের স্বীকারে সুপ্রকাশ পরিতৃপ্ত।

নির্জ্জন প্রান্তরে ছোট দেউলের মাঝখানে রমলার স্মৃতিকে ঘিরিয়া যেন এক নিত্য পূজারীর ভক্তি ধূপধূনায় নিবেদিত হয়। সেই সমাহিত আরাধনার সম্মুখে প্রেত-ছায়ার মত ভাসিয়া ওঠে মাধুরীর জন্য সুপ্রকাশের সুতীব্র অনুতাপ।

আর মন্দিরের রুদ্ধ-দুয়ারের বাহির হইতে প্রার্থনাকাতর একটি স্বর ছুটিয়া আসিয়া বলে, তোমাকে সাহায্য করবার জন্তে তুমি আমায় সঙ্গিনী করেছ, আমার অধিকার আমি চাই।—সে স্বর কল্যাণীর।

এই ক্ষুব্ধ মনের দীর্ঘশ্বাসে প্রদীপ নিভিয়া যায়। সুপ্রকাশের আরাধনা অন্ধকারে পথ হারাইয়া ফেলে।

ঘরের খুঁটিনাটি কাজ লইয়া কল্যাণী নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে। দুপুরে বারান্দায় ইজিচেয়ারটিতে সুপ্রকাশ অবসন্নভাবে পড়িয়া ছিল। কিছুক্ষণ পরে কল্যাণীকে ডাকিয়া বলে, বসো কল্যাণী!

দু'জনেই নীরব। সম্মুখের মাঠ রোদে ছাইয়া গেছে; বাতাসে শীতের আমেজ। সুপ্রকাশ বলিবার মত কথা খুঁজিয়া পায় না, অপরাধীর মত সে সলজ্জ, মৌন অনুনয়ে তাহার দৃষ্টি যেন কল্যাণীর নিকট ক্ষমাভিক্ষা করে।

অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, তোমার বলবার কিছুই নেই কল্যাণী? এমনি ক'রে আমার প্রতি তোমার বিরক্তি জ'মে উঠবে, নীরবতার ভেতর তোমার ঘৃণা গোপন র'য়ে যাবে, সে যে আমি পারবনা সহ্য করতে। সাধারণ স্বামীর মত তোমার মনের স্বাধীনতাকে আমি কেড়ে নিতে চাইনি; আমার সংসার তোমার অনিচ্ছায় কোনদিন তোমায় বেঁধে রাখবার জিদ্‌ ধরবে না—এ নিশ্চয় জেনো; কিন্তু এই শুধু অনুরোধ, আমার প্রতি তোমার মনের ভাব কোনদিন লুকিয়ে রেখো না!

শুক্লাতিথির গভীর রাত্রে বিস্তীর্ণ মাঠের উপর কুয়াসা সাগরের ফেনার মত জমিয়া ওঠে। বিবর্ণ আকাশে তারা তন্দ্রাতুর চোখে চাহিয়া থাকে। বিছানায় নিদ্রিত সুপ্রকাশ প্রলাপের ভিতর রমলার নিকট প্রেমনিবেদন করে, মাধুরীর নিকট তাহার অনুতপ্ত মন ক্ষমাভিক্ষা চায়।

সমস্ত রাত্রি কল্যাণীর চোখে ঘুম আসে না। সম্মুখের জানালাটি থাকে খোলা, তাহারি ফাঁকে কুয়াসাচ্ছন্ন মাঠের শুভ্রতা, আকাশের নীল রেখাটি দেখিতে পায়। নারিকেল গাছের মাথায় একটুকরা কালো মেঘের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কয়েকটি চিল হয়তো সেখানে রাত্রির আশ্রয় লইয়াছিল—তাদের ভীত তীক্ষ্ণ স্বর, পাখার ঝাপটু, আর শুকনো পাতার শব্দ শীতার্ত্ত হাওয়ায় ভাসিয়া আসে।

কল্যাণী বসিয়া বসিয়া ভাবে, জীবনে একি কঠোর অভিশাপ! এর না আছে সীমা, না আছে মুক্তি! এই অনন্ত অশান্তি, এই ভীরু মূক বৈচিত্র্যহীন বেদনা কোনদিন কি কাহারও নিকট মুখর হইয়া উঠিবে না?

নিদ্রিত স্বামীর কপালের উপর হইতে সযত্নে চুলগুলি সরাইয়া দিতে কল্যাণীর ইচ্ছা হয়। স্বপ্নে দেখে, যেন

তাহার উন্মত্ত প্রেমের শিহরণে সুপ্রকাশের সকল দুঃখ সকল অনুতাপ চিরদিনের জন্ত নিঃশেষ হইয়া গেল—নবজাত অনুরাগের সাড়া বন্যার মত আবেগে কল্যাণীকে বিহ্বল করিয়া দিবে !

আবার অনিমেষ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সুপ্রকাশের সুপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া মনে হয়, কে যেন তোতাপাখীর মত বারবার বলিতেছে, তোমাকে ও চায় না, চায় না। বহুদূরের নীলাভ শুক্তার মত ও মায়া, মিথ্যা।

এক রূঢ় চেতনায় কল্যাণী চমকাইয়া ওঠে। নিবিড় নিস্তব্ধতার ভিতর কল্যাণীর মনে হয়, নিদ্রিত সুপ্রকাশের মুখখানি শবের মত নিষ্প্রভ, সর্বাঙ্গে তাহার মৃত্যুর অসাড়তা। তাহাকে স্পর্শ করিবার সাহসও ক্রমশঃ মূক ভয়ে অবশ হইয়া আসিতেছে।

কল্যাণী খোলা জানালার নিকট সসঙ্কোচে সরিয়া যায়। জানালার বাহিরে কুয়াসার সমুদ্র, তাহার উদ্ধত স্রোতগুলি যেন নিশীথের বিবর্ণ আকাশ অবধি উঁচু হইয়া উঠিতেছে। তারার দিশাও মিলাইয়া আসে। নারিকেল পাতার ফাঁকে পাণ্ডুর চাঁদের রেখাটুকু দেখা যায়। ঠাণ্ডা হাওয়া কল্যাণীকে কাঁপাইয়া দিতেছিল।

তাহার নিদ্রিত স্বামী তখন স্বপ্নের ঘোরে বলিতেছে, তোমার জন্তে আমি অতীতকে ভুলবো কল্যাণী !...

হঠাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন সুপ্রকাশের এই মিথ্যা আশ্বাসে কল্যাণীর মনে আবার মধুর চিন্তাগুলি ফিরিয়া আসে।

কিন্তু সে ক্ষণিকের উল্লাস। জানালার গরাদে মাথা রাখিয়া অন্তর্বিপ্লবে অবসন্ন কল্যাণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার আর্ত্ত আত্মার অশান্ত প্রশ্ন যেন সজল আরক্ত দুটি চোখে বাহিরের পুঞ্জীভূত কুয়াসার অলক্ষ্য বিধাতার নিকট নীরবে জিজ্ঞাসা করে, অসীম দুরাশা আমায় আত্মহত্যার পাপ হ'তে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু এই অতন্দ্র প্রেমের অতৃপ্তির দুঃখ আমার কতদিনে মিটবে,—কিসে আমার মুক্তি ?

শ্রীফণীন্দ্র পাল

• ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভগ্নগৃহে বসিয়া প্রিয়নাথ উদ্ভট উৎকট অনেক ভাবনাই ভাবিত। প্রণয়ের অসারতা, সংসারের অনিত্যতা, ইহকাল পরকালের কথা, অনাদি অনন্ত কালব্যাপী চর্ব্বিতচর্ব্বণ এমন কতই কল্পনা—শেষ নাই, মীমাংসাও নাই। চিন্তায় শ্রান্তি বোধ হইলে প্রিয়নাথ বাহিরে আসিত, উড়ে-মালীকে লইয়া ফুলের চাষে মন দিত। ভাবিত,—আদর সোহাগ প্রেম ভালবাসা মানুষ উপেক্ষা করিতে পারে, আপনার ভাবিয়া কোলে টানিলেও দূরে সরিতে পারে, জড়ে তাহা পারিবে না—মাটীর ভিতর শিকড় সে-যে দৃঢ়বদ্ধ, আমরণ সম্বন্ধযুক্ত, পলাইবার উপায় নাই।

নিত্যসেবার সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে ফুলগাছগুলি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। প্রিয়নাথ নিজহস্তে প্রত্যহ একটি করিয়া তোড়া বাঁধিত; সে তোড়াটি মালী সযত্নে হেমচন্দ্রকে দিয়া আসিত। প্রিয়নাথ যে অতিথি এই ফুলের তোড়াই তাহার নিদর্শন—নিকটে থাকিয়াও প্রিয়নাথে হেমচন্দ্রে ঘনিষ্ঠতার এমনই অভাব। হেমচন্দ্র প্রত্যহ আলাপের চেষ্টা করিত, প্রিয়নাথ নানা অছিলায় পাশ কাটাইয়া যাইত—দূরে দূরে থাকিতে চাহিত। বাটীর লোক বা আত্মীয় স্বজন দেখা করিতে আসিয়াও দেখা পাইত না। মালীর উপর নিষেধাজ্ঞা বড় কড়া—মালী নানা আপত্তি বচনায় সকলকেই বিদায় করিত। সবাই অগত্যা বুঝিল, জীবনের একটা জবর ঢেউ বৈরাগ্য, সেই ঢেউ লাগিয়া জীবন-তরণী কিছু বানচাল হইয়াছে—কূলে সহজে ভিড়িবে না। গ্রামময় ক্রমশঃ রাষ্ট্র হইল, প্রিয়নাথ যোগসাধনায় মাতিয়াছে। কেহ বলিল, যোগসাধনা নয়, শবসাধনা, অমাবস্যায় রাত্রে ভৈরবী-চক্রে বসিয়া পঞ্চমকারের শ্রাদ্ধ করিতে দেখিয়াছে। কেহ বলিল, প্রাণায়ম-বলে আকাশ-মার্গে বিচরণ করিতে দেখিয়াছে। ছোকরা কবির দল রটাইল, নক্ষত্র-বধূদের প্রাণ চুরি করিয়া, বসন হরণ করিয়া হাস্য কৌতুক পরিহাস করিতে দেখিয়াছে। দিনে দিনে কথাটা এমনই নানাবর্ণে চিত্রিত হইয়া অবশেষে অতি ঘোরাল আকার ধারণ করিল, যোগসাধনার প্রথম সিদ্ধান্তই সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হইল। তখন সে বিচিত্র কাহিনী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শুনিল, শুনিয়া বিশ্বাসও করিল। হেমচন্দ্র শুনিল, কিন্তু বিশ্বাস করিল না।

আলুলায়িতদেহ রমনীর ন্যায় শরতের মেঘ তখন একটু ধীর স্থির—পূর্ণিমার চাঁদ গালভরা হাসি লইয়া নাতিদূরে অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া। এই ঝিকিমিকি সন্ধ্যায় হেমচন্দ্র দেখিল, ফুলের বাগানে বিমর্ষমনে প্রিয়নাথ একা দাঁড়াইয়া,—পথহারা পথিকের ন্যায় নয়নদ্বয় ব্যাকুল কাতর। সুবর্ণসুযোগ বুঝিয়া হেমচন্দ্র আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল, কহিল—"ক্ষমা করিও প্রিয়, তোমার নীরব সাধনায় বাধা দিলাম। কিন্তু তিন মাসের ভিতর এমন সুবর্ণসুযোগ ত পাই নাই। আলাপ করিতে গেলেই ছুটিয়া পলাও—কেন, ব্যাপার কি?"

প্রিয়নাথ কোন উত্তর দিল না, কেবল একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

"উত্তর দিতে না চাও, শুনিয়া যাও। বলিতেছিলাম, এ ত তোমার লোকালয়বাস নয়—বনবাস।"

প্রিয়নাথ ক্ষীণ হাসি হাসিল, হাসিয়া বলিল, "বন! তা হইলই বা বন! বনেই ত ফুল ফুটে, হেম!"

হেমচন্দ্র বুঝিল,—অনুমান অমূলক নয়, মায়ার বাঁধন খসিয়াছে, মানুষ ছাড়িয়া জড়ে বেড়িয়াছে, হৃদয়ের যত কোমল বৃত্তির কেন্দ্রস্থল হইয়াছে ফুল—এই কুসুমকানন। বুঝিয়াও তবু বলিল।—"তা ফুটুক্ ফুল রাশিরাশি। কিন্তু শুধু ফুল লইয়া ত মানুষ টিকে না।"

"টিকে বৈ কি। জীবনের নির্য্যাস আর কি? একটু আশা, একটু আকাঙ্ক্ষা, একটু তৃপ্তি—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ—ফুলে নাই কি?"

নিত্যসেবার সৌষ্ঠবে ও সৌন্দর্য্যে ফুলগাছগুলি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। প্রিয়নাথ প্রত্যহ নিজ হস্তে একটি করিয়া তোড়া বাঁধিত।

হেমচন্দ্র এইবার গোলে পড়িল; কি উত্তর দিবে সহসা স্থির করিতে পারিল না, পারিলেও ব্যক্ত করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। বলিল—"শুধু হাওয়া খাইয়া তুমি থাকিতে পার থাক, আপত্তি নাই; কিন্তু হাওয়ার অতিরিক্ত কিছু দিবে বলিয়া যাহার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাহার কি?"

"আবার সেই পুরাণো কথা। না, না, হেম। ক্ষমা কর। ও কথা আর তুলিও না।"

হেমচন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল, প্রিয়নাথ বাধা দিয়া বলিল—"বড় রূপ ঐ ময়ূরের, কিন্তু স্বর কি কর্কশ! রূপে মজিয়াছিলাম হেম, স্বরে পিছাইয়াছি। আর কেন?"

"আর কেন? যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া। অবহেলাও অত্যাচার তা' জান? বিনা দোষে হইলে তাহার মার্জ্জনা নাই, তা জান? পাপ পুণ্য মান না, দেবতা ভগবান স্বীকার কর না? না কর, জ্ঞানকৃত স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য বিবেকের কাছে দণ্ডিত হইতে হয় তা' বিশ্বাস কর? জীবনের পরপারের কথা স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দাও? ভাল, সারাজীবন ঐ বিবেকের দণ্ড বহিয়া বেড়াইতে হইবে তা' কি বুঝ না? সুখ ভোগ করিতে সবাই পারে, প্রিয়; সুখী করাই কথা।"

তীব্র তাড়নায় মর্ম্মাহত হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বাষ্পবিজড়িত স্বরে প্রিয়নাথ বলিল—"বিবাক্তি দহনে অহঃরহ পুড়িতেছি, হেম। বন্ধু তুমি, এ অনলে আর ফুৎকার দিও না। সুখভোগের কথা তুলিলে। কিন্তু সুখ কবে পাইয়াছি, বলিতে পার?"

"পাও নাই!—সে দোষ তোমার, অপরের নয়। সুখ আদায় করিয়া লইতে হয়। আদায়ের কষ্টটুকুও স্বীকার করিতে না চাও, প্রত্যাশাও রাখিও না।"

"তোমার কথা বেশ বুঝিয়াছ বটে, আমার কথা ত কৈ বুঝিলে না! তোমার সেই সেদিনকার জটিল প্রেম-বিজ্ঞান এই তিনমাস কাল আন্দোলন আলোচনা বিশ্লেষণ করিয়াছি। কিছুই বুঝিলাম না, হেম; কিছু না। বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলাম না, মনকে বুঝাইতে পারিলাম না। ও সকল কথা এখন আর তুলিও না, নিষ্ফল। বুঝিতে দাও, সময়ে হয়ত বুঝিব, কে জানে!"

"কিন্তু জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে তাহা ত সহ্য হইবে না। ঐ ভাঙ্গা ঘরে একা বসিয়া কেবল বিশ্বের ভাবনা ভাবিবে, তা' হইবে না।"

"একা! কে বলিল? ঐ দেখ, তোমার লাইব্রেরীটা তোমারও অজ্ঞাতে ভাঙ্গা ঘরে উঠিয়া আসিয়াছে।"

হেমচন্দ্র উঠিয়া গিয়া দেখিল, সত্যই বটে। কাব্য, নাটক, ইতিহাস, উপন্যাস ভগ্নগৃহটিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে; কিছু পাণ্ডুলিপিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিল। দেখিয়া বুঝিল, বাল্যের সেই হস্ত-কণ্ডূয়ন বা গ্রন্থরচনার ব্যাধি নির্জ্জনতার

পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে। টেবিলের উপর জরাজীর্ণ সংবাদ-পত্রের নীচে বড় বড় স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরে লেখা একখানা কাগজ দেখিতে পাইল। প্রিয়নাথের অলক্ষিতে সাগ্রহে তুলিয়া লইয়া দেখিল, অতি নূতন রচনা। পকেট-জাত করিয়া বলিল,—"শুধু গ্রন্থপাঠ লইয়া তোমায় থাকিতে দিব না। কিছু সাংসারিকতাও করিতে হইবে, প্রিয়।"

"বেশ।"

"শুধু 'বেশ' বলিলেই চলিবে না। অনুরোধ রক্ষিত হইতেছে তাহার প্রমাণ দেখাইতে হইবে। আমার সংসারের সমুদায় ভার তোমায় লইতে হইবে। কেমন, রাজি ?"

"হাঁ রাজি ; তবে ওকথা আর তুলিবে না, বল।"

"তেমন করিয়া বলিতে পারি না। তবে কিছুদিন হয়ত নয়।"

"তাই স্বীকার।"

"তবে এ ঘাড়ের বোঝা ও ঘাড়ে ফেলিবার আয়োজন করিগে। আজই কাজে বাহাল হইতে হইবে মনে, থাকে।"

বলিয়াই হেমচন্দ্র অন্দর-মহলে সুহাসিনীকে শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে ছুটিল। সুহাসিনী সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিল। হেমচন্দ্র প্রিয়নাথের লিখিত সেই কাগজখানা পড়িতে আরম্ভ করিল। সুহাসিনী বাধা দিয়া বলিল "অন্দরে দলিল-দস্তাবেজ কিসের ?"

হেমচন্দ্র উত্তর দিল,—"দলিল নয়, এ একটা রচনা, বন্ধুর রচনা, চুরি করিয়া আনিয়াছি। বেশ মজার। শুনিবে ?"

হেমচন্দ্র পড়িতে আরম্ভ করিল।

"নারী-সৃষ্টি"

অনাদি অনন্ত কালের কথা। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তখন নবজাত শিশু। নর-সৃষ্টির 'পর বিধাতার নারী-সৃষ্টির বাসনা হইল। কল্পনা করিতে গিয়া দেখেন, নর-নির্ম্মাণেই তাঁহার তাবৎ দ্রব্য-সম্ভার নিঃশেষিত হইয়াছে, নূতন উপকরণ অবশিষ্ট আর নাই। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বিশ্বপতি অসীম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন—অনন্তর চিন্তাবসানে নিম্নলিখিত উপাদান সংগ্রহে রত হইলেন।—চন্দ্রের বর্ত্তুলতা, সর্পের অঙ্কুর ভঙ্গী, মাধবীলতার-পর-নির্ভরতা, তৃণের কম্পনশীলতা, মৃণালের তনিমা, এবং কুসুমের স্ফুটনোন্মুখ সৌন্দর্য্য, পল্লবের লঘুতা এবং হরিণের দৃষ্টি, সৌর-কিরণের প্রফুল্লতা এবং মেঘের রোদনশীলতা, পবনের চাঞ্চল্য এবং শশকের ভীরুতা, ময়ূরের মদগর্ব্ব এবং শুক-বক্ষ-লোমের কমনীয়তা, হীরকের কাঠিন্য, মধু-র মিষ্টতা, ব্যাঘ্রের নিষ্ঠুরতা, অনলের আভা, তুষারের অতিশীতলতা, চটকের বাকচটুলতা, কোকিলের কূজন, সারসের কপটতা

হেমচন্দ্র উত্তর দিল—"দলিল নয়, এ একটা রচনা—বন্ধুর রচনা ; চুরি করিয়া আনিয়াছি। বেশ মজার ; শুনিবে ?" হেমচন্দ্র পড়িতে আরম্ভ করিল—"নারী-সৃষ্টি।"

এবং চক্রবাকের মিলন-স্পৃহা,—এইগুলি একত্র মিলিত করিয়া রমণী সৃজন করিলেন। এই অভিনব সৃষ্টি উপহার—ছলে পুরুষের হস্তে সমর্পিত হইল।

পক্ষান্তে ঐ পুরুষ বিধাতার নিকট ফিরিয়া আসিল। বলিল,—"ভগবন্, আপনি যাহাকে আমায় দিয়াছেন সে তিষ্ঠিতে দিল না। কথা কহিবে অবিশ্রাম, কোন কর্ম্ম করিতে দিবে না ; অকারণে কাঁদিবে এবং তেমনি অকারণেই হাসিবে—অসুখের অন্ত নাই।"

বিধাতা তাহাকে ফিরাইয়া লইলেন।

সপ্তাহান্তে পুরুষ আবার বিধাতার নিকট আসিয়া বলিল,—"ভগবন্, সেই সঙ্গী ফিরাইয়া দেওয়া অবধি প্রাণ অবসাদে ভরিয়া রহিয়াছে। আহা! কেমন আমার সম্মুখে গান গাহিত, গাহিতে গাহিতে নাচিত, নাচিয়া নাচিয়া চুরি করিয়া চাহিত। কেমন খেলা করিত, গায় পড়িত—"

বিধাতা আবার নারীকে তাহার হস্তে প্রদান করিলেন।

এবার কিন্তু দিবসত্রয় অতীত হইতে না হইতেই বিধাতা দেখিলেন, সেই পুরুষ আবার তাঁহার নিকট আসিতেছে।

"ভগবন্"—পুরুষ কহিল, "ভগবন্, ঠিক বলিতে পারি না কেন, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, নারী আমাকে সুখী অপেক্ষা বিরক্তই করে অধিক। দয়া করিয়া তাহার হস্ত হইতে আমাকে মুক্ত করুন।"

বিধাতা কহিলেন,—"যাও, একত্র বাস করিতে চেষ্টা কর"।

পুরুষ কহিল,—"না, আমি উহার সহিত থাকিতে পারিব না।"

"সে ভিন্নও তুমি থাকিতে পারিবে না"—বিধাতা উত্তর করিলেন।

দুঃখিত মনে পুরুষ বলিতে লাগিল,—"হা অদৃষ্ট! আমি তাহাকে লইয়াও তিষ্ঠিতে পারি না, ছাড়িয়াও থাকিতে পারি না!"

* * *

"অতি সুন্দর"—সুহাসিনী কহিল, "অতি সুন্দর! কিন্তু সকল কথা ত বুঝিতে পারিলাম না। আর একবার পড় দেখি।"

হেমচন্দ্র একবার, দুইবার, তিনবার পড়িল। সুহাসিনী চিত্রার্পিতের ন্যায় শুনিতে লাগিল। পাঠান্তে সুহাসিনীর মুখে রচনার সুখ্যাতি ধরে না।

প্রশংসা-বাহুল্য হেমচন্দ্রের কিন্তু ভাল লাগিল না—নারীনিন্দায় হেমচন্দ্রের যে বিজাতীয় ঘৃণা। নারীর মুখে সেই নিন্দার সমর্থন হেমচন্দ্রের আরও বিষতুল্য বোধ হইল। কিন্তু সে তাহার মনোভাব প্রকাশ করিল না, প্রিয়নাথের কথাই ভাবিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ মিত্র

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই উপন্যাসের বহুলাংশ বিরচিত। সেই সময়ে তিব্বতীয় গ্রন্থাগার হইতে একখণ্ড সংস্কৃত ভাষার পুঁথি জনৈক রসজ্ঞ ইংরাজ উদ্ধার করেন। বিলাতী "sketch" পত্রে প্রকাশিত উহারই অংশবিশেষ অবলম্বনে 'নারী-সৃষ্টি' সঙ্কলিত—লেখক।

নানাকথা

রুশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ

দুইজন সেক্রেটারী ও একজন ডাক্তার সঙ্গে লইয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি রুশিয়ার মস্কাও নগরে পৌঁছিয়াছেন। সেখানে তাঁহার 'চিত্র প্রদর্শনী' খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। মস্কাওতে তাঁহার একমাস থাকিবার কথা।

সারনাথে বুদ্ধবিহার

মহাবোধি সোসাইটী কাশী সারনাথে একটী নূতন জ্ঞান ও শান্তি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার নাম হইয়াছে মূলগন্ধকুটী বিহার। সৌন্দর্য্যের কোনরূপ হানি না করিয়া প্রাচীন ও আধুনিক স্থাপত্য-শিল্পের ইহা একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত বিখ্যাত ধামেখ স্তূপের সম্মুখে এই নূতন বিহার অবস্থিত। মহাবোধি সোসাইটী আশা করেন, ইহা একদিন প্রসিদ্ধ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান অধিকার করিবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা শীঘ্রই বিখ্যাত পণ্ডিত-গণকে বিহারে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। এই বিহারে মন্দির, উপাসনাগৃহ, লাইব্রেরী, বক্তৃতা সভা করিবার জন্য বড় হল, বাসগৃহ, প্রভৃতি সমস্তই আছে। শ্যামদেশের রাজা আগামী নভেম্বর মাসে ইহা উন্মোচন করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

শিশির ভাদুড়ী

প্রথিতযশা অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী বারোজন বাঙ্গালী আর্টিষ্ট সঙ্গে লইয়া সম্প্রতি করাচী হইতে নিউইয়র্ক যাত্রা করিয়াছেন। হিন্দু নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করিবার জন্য আমেরিকাবাসী কর্ত্তৃক তিনি আমন্ত্রিত হইয়াছেন। নিউইয়র্কে পৌঁছিলে সেখানকার মেয়র সিটী হলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবেন। ভারতীয় অভিনেতার আমেরিকায় এরূপ সম্মানলাভ এই প্রথম। তাঁহার অভিনয়ের উদ্বোধন রজনীতে সম্ভবতঃ কবিবর রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিবেন।

বলীয়ান বাঙালী যুবক

যে দুইজন বাঙ্গালী যুবকের প্রতিকৃতি এখানে প্রকাশিত হইল তন্মধ্যে শ্রীমান সুকুমার বসু শারীর বিদ্যা অনুশীলনের

রেণু রায়

জন্য শীঘ্রই জার্ম্মাণীতে যাইতেছেন। অপর চিত্রটি রেণু রায়ের। ইঁহার শারীরিক গঠনাদির প্রশংসা করে আমরা যখন ইঁহার চিত্রের ব্লক প্রস্তুত করিতে দিতেছিলাম তখন এ কথা সুদূর কল্পনাতেও মনে হয় নাই যে সে ব্লক ব্যবহৃত হইবে শোক প্রকাশের উপলক্ষে। দৈবের বিধান

বিচিত্র। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে একটি মোটর সাইক্ল্ করিয়া শ্রীমান রেণু রায় কড়িয়াপুকুর রোডের মোড়ে সার্কুলার রোড্ দিয়া যাইতেছিলেন, সম্মুখে বাধা পাইয়া পাশ কাটাইয়া যাইতেই পিছন হইতেই একটা বাস্ তাহার উপর আসিয়া পড়ে। সেই দুর্ঘটনায় সাংঘাতিক আঘাতের ফলে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।

শ্রীমান্ সুকুমার বসু

শ্রীমান রেণু রায় শিল্প-জগতে ধীরে ধীরে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন। গত ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্ চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁহার অঙ্কিত একখানি তৈলচিত্র প্রথম পুরস্কারের সম্মান লাভ করে। কিন্তু যে ফুল ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল অসময়ে কাল তাহাকে হরণ করিল। আমরা সেই বিকচোম্মুখ ঝরা ফুলটির জন্য এখানে এক বিন্দু শোকাশ্রু রাখিয়া দিলাম।

জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের মূলে স্বাস্থ্য। তাই বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ শারীরিক উৎকর্ষের উপর অত বেশি ঝোঁক দিয়াছিলেন। তাঁহার ভারতীয় বক্তৃতা গুলিতে এই কথার বারবার উল্লেখ আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, শারীরিক বলহীন ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভ সুদূর পরাহত। উপনিষদের বাণীও তাহাই—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। আমাদের দেশের যুবকগণ যদি সেই কথা মনে রাখিয়া এই দুইটি যুবকের মত শরীর গড়িয়া তুলিবার বিষয়ে মনোযোগী হন তাহা হইলে জাতি গড়িয়া উঠিতে বিলম্ব হয় না। মূলে সার পড়িলে পত্রেপুষ্পে রস সঞ্চারিত হইবেই।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন

আগামী বড়দিনের অবকাশে আগরা সহরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত অধিবেশনে সর্ব্ব-সাধারণকে নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ বাগচী যে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়া আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে মুদ্রিত করিলাম।

"প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন আগামী বড় দিনের অবকাশে আগরা নগরীতে হইবে, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সম্মিলন প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরবের জিনিষ ও বঙ্গবাণী সেবার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। গত ৮ বৎসর আমাদের সমবেত সাহিত্য সেবার মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনকে সর্ব্ব প্রকারে সার্থক করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা চলিতেছে।

স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছি। আপনাদের সহায়তা ব্যতিরেকে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। সেই জন্য সর্ব্বাগ্রে আপনার নিকট হইতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্প ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে একাধিক তথ্যপূর্ণ সুললিত প্রবন্ধাদি পাইবার প্রার্থনা করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ এই শুভানুষ্ঠানে যোগদান

করিবার জন্য বঙ্গভারতী-সেবীদিগকে আমন্ত্রণকল্পে আপনাকে সবিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি যে, আপনি দয়া করিয়া স্থানীয় বাঙ্গালীগণের ও বাঙ্গলা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্ত্তাগণের নাম-ধাম আদি জানাইয়া বাধিত করিবেন, আপনার নিকট হইতে বিশদ বিবরণ জানিতে পারিলে সকলকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইব।

প্রতিনিধিগণের চাঁদা ৫৲ পাঁচ টাকা ও ছাত্রগণের জন্য ২॥০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। সমাগত প্রতিনিধিবর্গের আহার ও বাসস্থানাদির যথাসম্ভব ব্যবস্থা অভ্যর্থনা-সমিতি করিবেন।

আপনাদের নিকট হইতে এই আবেদন-পত্রের উত্তর পাইবার পর সম্মিলনের অধিবেশনের তারিখ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় শীঘ্রই জনসাধারণকে জ্ঞাপন করা হইবে। ইতি।—"

উক্ত সম্মিলন উপলক্ষে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে। তৎসম্পর্কে আমরা যে পত্র পাইয়াছি সাধারণের অবগতির জন্য তাহাও নিম্নে প্রকাশিত হইল।

প্রবাসী বঙ্গছাত্র ও ছাত্রীগণের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা প্রচারার্থ একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইবে। বঙ্গের বাহিরে সকল ছাত্র ও ছাত্রীগণ, যাঁহারা প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সদস্য এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। যাঁহারা সদস্য নহেন তাঁহারা প্রবন্ধের সঙ্গে অথবা পূর্ব্বে বাৎসরিক চাঁদা আট আনা অথবা একটাকা পাঠাইয়া দিবেন। (ষোল বৎসর হইতে কুড়ি বৎসর বয়স্ক ছাত্র ও ছাত্রীর জন্য আট আনা, তদূর্দ্ধ বয়স্ক ছাত্র ছাত্রীর জন্য এক টাকা)। পরিচালন সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলে সদস্য হইবার আবেদন পত্র পাঠান হইবে। প্রবন্ধটি ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে পরিচালক সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

বিষয়:—(ছাত্রদিগের জন্য)—"নব্যযুবকদিগের কর্ত্তব্য কি?" লেখকেরা নিজের মতের সমর্থন বঙ্গ-সাহিত্য হইতে করিবেন। প্রথম পুরস্কার স্বর্ণপদক; দ্বিতীয় পুরস্কার রৌপ্য পদক।

(ছাত্রীদিগের জন্য)—"স্ত্রীলোক ও পুরুষের অধিকার সমান হওয়া উচিত, কিম্বা তাহাতে প্রভেদ থাকিবে?" লেখিকারা নিজমতের সমর্থন বঙ্গ-সাহিত্য হইতে করিবেন। প্রথম পুরস্কার স্বর্ণপদক; দ্বিতীয় পুরস্কার রৌপ্যপদক।"

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বিচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

দীপালী ছাত্রীসঙ্ঘ লাইব্রেরী

১১নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট স্থিত দীপালী ছাত্রীসঙ্ঘ একটি মহিলা পাঠাগার স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। একমাত্র মেয়েদের জন্য কোনো লাইব্রেরী ও বসিয়া পড়িবার স্থান কলিকাতায় আছে বলিয়া মনে হয় না, সুতরাং এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান মেয়েদের শিক্ষা ও উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইবে। আমরা দীপালী ছাত্রীসঙ্ঘের এই শুভ প্রচেষ্টায় আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

নিজ নিজ প্রকাশিত পুস্তক উপহার দিয়া এই পাঠাগারে সাহায্য করিতে আমরা বাঙলা দেশের গ্রন্থকারদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

চিত্র প্রদর্শনী

ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটীর চিত্রশালায় সম্প্রতি শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের চিত্র প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। ইনি একজন প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী। বর্ত্তমান প্রদর্শনীতে, বিশেষ করিয়া রাধাকৃষ্ণের গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত তাঁহার ২০ খানি চিত্রে তিনি বাংলার প্রাচীন শিল্পকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

জনপ্রিয় পুস্তক

ক্রয়ডন লাইব্রেরীর বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত বৎসর ইংলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বই ছিল, জার্ম্মান লেখক রিমার্কের All quiet on the Western Front। এই উপন্যাসখানি যুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখা। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্বেই 'বিচিত্রায়' বাহির হইয়াছে।

প্রথম চিত্রপুস্তক

বার্ণ মুর নামে একজন চিত্র ব্যবসায়ী সম্প্রতি ইংলণ্ডের প্রথম মুদ্রিত চিত্র পুস্তক আবিষ্কার করিয়াছেন। এখানি ৫০০ বৎসরের পুরাতন গ্রন্থ। ইহার মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। ইহাতে ৮ খানি ছবি আছে।

বাইবেলের ঘটনা লইয়া চিত্রগুলি অঙ্কিত। ব্রিটিশ মিউজিয়াম বইখানি ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

প্রফেসার এস্, এন, বসু

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের রহস্যোদ্‌ঘাটন বিষয়ে স্বামী প্রেমানন্দ আশ্রমের প্রফেসার এস, এন, বসু অসাধারণ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। যোগ শক্তির বলে ইনি ইঁহার গণনা নিরূপিত করেন।

জীবন-বীমা

জীবন-বীমা যে ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। উপার্জ্জনক্ষম পিতা, পতি প্রভৃতির মৃত্যুর পর সাধারণ সংসারের সঙ্কটের অন্ত থাকে না। ইহা বুঝিয়াই মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভদ্রলোক অনেকেই জীবন বীমা করিতে আজকাল উন্মুখ হন। কিন্তু বহু বিদেশীয় বীমা-কোম্পানীর বীমার ধন বণ্টনকালে নানারূপ বিভ্রাট উপস্থিত করেন। আমাদের দেশীয় কোম্পানীগুলি এ বিষয়ে মুক্তহস্ত।

৯নং ক্লাইভ রো হইতে শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র নাগ স্বদেশী বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে আমাদের নিকট যে মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন সাধারণের অবগতির জন্য তাহার শেষাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আজকাল আমাদের দেশীয় বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে অধিকাংশগুলি এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে আমাদের আর বীমা করিবার জন্য বিদেশী বীমা কোম্পানীর দ্বারস্থ হওয়া নিষ্প্রয়োজন। দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলেই হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক, জাতীয়তা-বোধ ক্রমেই প্রবল হইতেছে, তাহার ফলে দেশীয় কোম্পানী সমূহের ব্যবসা উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিতেছে। ইহা খুবই আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। এখনও যাঁহারা বিদেশী কোম্পানীর মোহে আচ্ছন্ন রহিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার এই নিবেদন, "এস ভাই। সকলের সমবেত চেষ্টায় ভারতের ঘরে ঘরে দেশীয় কোম্পানী সমূহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের অর্থ নৈতিক স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন করি।"

চীনা পুঁথি প্রদর্শনী

ব্রিটিশ মিউজিয়ামস্থিত রাজ-পুস্তকাগারে চীনদেশীয় পুস্তক ও হস্তলিখিত পুঁথির একটী নূতন প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। তিনটী ভিন্ন অপর সমস্ত হস্তলিপি গুলিই চীন কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইহাতে ৬০০ বৎসরের নানা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত দলিল ও পুঁথি পত্রাদি আছে। সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পুঁথির তারিখ—৪০৬ সালের ১০ই জানুয়ারী, এবং বিশেষ করিয়া সময় নিরূপিত আছে রাত্রি ৭টা হইতে ৯টা! ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশাসন সম্বন্ধে লিখিত। লিপিকর সন্ন্যাসী তেয়ু এই বলিয়া তাঁহার লেখা শেষ করিয়াছেন যে, তাঁহার হস্তাক্ষর অস্পষ্ট, পাঠের অনুপযোগী ও উপহাসযোগ্য মনে করিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিতেছেন; কিন্তু তবুও তিনি ইহা লিখিতে সাহস করিয়াছেন এই ভরসায় যে, সহৃদয় পাঠকগণ হস্তাক্ষরের কদর্য্যতা উপেক্ষা করিয়া পুঁথিখানির সার মর্ম্মই গ্রহণ করিবেন।

গলস্‌ওয়ার্দ্দির সবাক্ চিত্র

প্রসিদ্ধ ইংরাজ উপন্যাসিক ও নাট্যকার জন গলস্‌ওয়ার্দ্দির "Escape" নামক নাটকখানির সবাক্ চিত্র তোলা হইয়াছে। ইহাই তাঁহার প্রথম সবাক্ চিত্র। সম্প্রতি ঐ ছবি আমেরিকায় সাত শত থিয়েটারে প্রদর্শিত হইয়াছে। সার জেরাল্ড দ্যু মারিয়ে নাটকের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্রই গলস্‌ওয়ার্দ্দির আর একখানি বিখ্যাত নাটক "The Skin Game" এর সবাক্ চিত্র তোলা হইবে।

বর্ত্তমান সংখ্যায় আমানুল্লাহ প্রবন্ধের চিত্রগুলি সওগাত পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

Printed at the Susil Printing Works Ltd. 48, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.

চতুর্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৩৭ | পঞ্চম সংখ্যা

বিদ্যার যাচাই

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার মনে আছে বালককালে একজনকে জানতাম তিনি ইংরেজিতে পরম পণ্ডিত ছিলেন; বাংলা দেশে তিনি ইংরাজি শিক্ষার প্রথম যুগের শেষ ভাগের ছাত্র। ডিরোজিয়ো প্রভৃতি শিক্ষকদের কাছে তিনি পাঠ নিয়েছিলেন। জানি না কি মনে ক'রে তিনি কিছুদিন আমাদিগকে ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করলেন। ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে তিনি তাঁর মনে একটা শ্রেণীবিভাগ-করা ফর্দ্দ লটকে রেখেছিলেন। তার মধ্যে পয়লা, দোসরা এবং তেস্‌রা নম্বর পর্য্যন্ত সমস্ত পাকাপাকি ঠিক করা ছিল। সেই ফর্দ্দ তিনি আমাদিগকে লিখে দিয়ে মুখস্ত করতে বললেন। তখন আমাদের যে-টুকু ইংরেজি জানা ছিল তাতে পয়লা নম্বর দূরে থাক্ তেসরা নম্বরেরও কাছে ঘেঁসতে পারি এমন শক্তি আমাদের ছিল না। তথাপি ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে বাঁধা বিচারটা আগে হ'তেই আমাদের আয়ত্ত করিয়ে দেওয়াতে দোষ ছিলনা। কেন না রুচি রসনা দিয়ে রস বিচার করা ইংরেজি কাব্য সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে প্রশস্ত নয়। যে হেতু আমাদিগকে চেখে নয় কিন্তু গিলে খেতে হবে, কাজেই কোন্‌টা মিষ্ট কোন্‌টা অম্ল সেটা নোট্-বুকে লেখা না থাকলে ভুল করার আশঙ্কা আছে। এর ফল কি হয়েচে বলি।

আমাদের শিশু বয়সে দেখতাম কবি বায়রন সম্বন্ধে আমাদের দেশের ইংরেজি পোড়োদের মনে অসীম ভক্তি ছিল। আধুনিক পোড়োদের মনে সে ভক্তি আদবেই নেই। অল্প কিছুদিন আগেই আমাদের যুবকেরা টেনিসনের নাম শুনলেই যে রকম রোমাঞ্চিত হতেন এখন আর সে রকম হন না। উক্ত কবিদের সম্বন্ধে ইংলণ্ডে কাব্য-বিচারকদের রায় অল্প বিস্তর বদল হয়ে গেছে এ জানা কথা। সেই বদল হবার স্বাভাবিক কারণ সেখানকার মনের গতি ও সামাজিক গতির মধ্যেই আছে। কিন্তু সে কারণ ত আমাদের মধ্যে নেই। অথচ তার [illegible] ঠিক ঠিক মিলচে। আদালতটাই আমাদের এখানে নেই, কাজেই

বিদেশের বিচারের নকল আনিয়ে আমাদিগকে বড় সাবধানে কাজ চালাতে হয়। যে কবির যে দর আধুনিক বাজারে প্রচলিত, পাছে তার উল্টো বল্লেই আহাম্মক ব'লে দাগা পড়ে এই জন্যে বিদেশের সাহিত্যের বাজারদরটা সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হয়। না হ'লে আমাদের ইস্কুলমাষ্টারি চলে না, না হ'লে মাসিকপত্রে ইবসেন্ মেটারলিঙ্ক ও রাশিয়ান ঔপন্যাসিকদের কথা পাড়্‌বার বেলা লজ্জা পেতে হয়। শুধু সাহিত্যে নয়, অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিদেশের পরিবর্ত্তনশীল বিচারবুদ্ধির সঙ্গে অবিকল তাল মিলিয়ে যদি না চলি, যদি জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মন্ত্র কার্লাইল্ রাস্কিনের আমলে আওড়াই, বিলাতে যে সময়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের হাওয়া বদল হয়েচে সেই সময় বুঝে আমরাও যদি সঙ্ঘবাদের সুরে কণ্ঠ না মেলাই, তবে আমাদের দেশের হাই ইংরেজি স্কুলের মাষ্টার ও ছাত্রদের কাছে মুখ দেখাবার জো থাক্‌বে না।

ইংরেজি ইস্কুলে এত দীর্ঘকাল দাগা বুলিয়েও কেন আমরা কোনো বিষয়ে জোরের সঙ্গে স্বকীয়তা প্রকাশ করতে পারলাম না, এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঠেচে। এর কারণ, বিদ্যেটাও যেখান হ'তে ধার ক'রে নিচ্চি বুদ্ধিটাও সেখান হ'তে ধার করা। কাজেই নিজের বিচার খাটিয়ে এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করতে ভরসা পাই নে। বিদ্যা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইংরেজের ছেলে পরবশ নয়, তার চারদিকেই স্বাধীন সৃষ্টি ও স্বাধীন বিচারের হাওয়া বইচে। একজন ফরাসী বিদ্বান নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যার বিচার করতে পারে; তার কারণ, যে ফরাসী বিদ্যা তার নিজের সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রয়েচে; এই জন্যে মাল যেখান হতেই আসুক যাচাই করবার ভার তার নিজেরই হাতে, এই জন্যে নিজের হিসাব মত সে মূল্য দেয় এবং কোন্‌টা নেবে কোন্‌টা ছাড়বে সে সম্বন্ধে নিজের রুচি ও মতই তার পক্ষে প্রামাণ্য। কাজেই জ্ঞানের ও ভাবের কারবারে নিজের পরেই এদের ভরসা। এই ভরসা না থাক্‌লে স্বকীয়তা কিছুতেই থাক্‌তে পারে না।

আমাদের মুস্কিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যেটাই আমরা পরের কাছ হ'তে পাই—সে বিদ্যা মেলাব কিসের সঙ্গে, বিচার করব কি দিয়ে? নিজের যে বাট্‌খারা দিয়ে পরিমাপ করতে হয়, সে বাট্‌খারাই নেই। কাজেই আমদানি মালের ওপরে ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা থাকে সেই টিকিটটাকেই ষোল আনা মেনে নিতে হয়। এই জন্যেই আমাদের ইস্কুল মাষ্টার এবং মাসিকপত্র-লেখকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অঙ্ক যে যতটা ঠিকমত মুখস্থ রাখতে ও আওড়াতে পারে তার ততই পসরা বাড়ে। এতকাল ধ'রে কেবল এম্‌নি ক'রেই কাটল, কিন্তু চিরকাল ধ'রেই কি এম্‌নি ক'রে কাটবে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবরাত

(কবি ও বন্ধু সতীশচন্দ্র রায়ের অকাল-মৃত্যুতে)

৺ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

'তত্ত্ব' ভুলে ছিনু আমি 'উপাধি'র লোভে
ভুলেছিনু সারদে তোমায় ;
সহসা শোকের ঝড়ে—মনের সংক্ষোভে
ক্ষুব্ধ আমি, ডাকি তোরে, আয় মাগো আয় !

আজ গাহিব না গান আনন্দ-লহরী,
গাঁথিব না বন্দন-মালিকা ;
আজ শুধু তুলসীর মঞ্জুল মঞ্জরী
দিব জলে, নিবাইব শোক-বহ্নি-শিখা ।

একা, হায় ! আজ আমি নিতান্ত একাকী—
দেবরাত ! তুমি আজ নাই !
আজ আমি সঙ্গীহীন, মিথ্যা হবে নাকি
এ সংবাদ ?—কুসংবাদ, সত্য সে সদাই ।

শূন্য আজি গুরু-গৃহ, শূন্য তপোবন,
বক্ষে গুরু মৌনতার ভার ;
মনের জগতে মোর মারী হ'য়ে যেন
একদিনে হয়ে গেছে সব ছারখার ।

আজ হ'তে একা আমি ভ্রমিব এ বনে,
তুমি আর আসিবেনা ভাই ;
অশ্বিদ্বয় সম মোরা ছিনু দুই জনে,
আজ আর দুই নাই—ভাবি শুধু তাই ।

আমাদের মনে ছিল সংকল্প অনেক,
দু'টি মন দৃপ্ত তেজীয়ান ;
বৃথা হ'ল আশা তরু-মূলে জলসেক,
অঙ্কুরে শুকায়ে গেল—সব অবসান ।

দেশের গৌরব কোথা, গৌরব ভাষার,
কোথা হায় উদ্দেশ্য মহান্—
পুণ্য ভাব-উদ্বোধন ? হায়রে আশার
দাস !—বৃথা, সব বৃথা, আশা অভিমান !

শুক্রের শিষ্যত্ব আমি লয়েছিনু ব'লে
ক্ষুণ্ণ তুমি হয়েছিলে ভাই ;
কালের শাসনে আজ তুমি গেছ চ'লে,
ক্ষুণ্ণ আমি, মর্ম্মাহত, শূন্য-পানে চাই !

শূন্যে উঠিয়াছে আজ পূর্ণিমার চাঁদ,
কবি তুমি দেখিবেনা তায় ।
কোথা তুমি ? কেন হায়—মৌন মনোসাধ ;
অশ্রু আজ আঁধার করিছে পূর্ণিমায় ।

বসন্ত আসিবে ফিরে দুই চারি দিনে,
তুমি একা রহিবে নীরব ;
পল্লবিত মুকুলিত রমিত বিপিনে
তুমি শুধু জানিবে না বসন্ত-উৎসব ।

মুকুলে আশ্চর্য্য গন্ধ—সুপক্ক ফলের,
জানিতাম মোরা সে বিশেষ ;
আজ মনে পড়ে কথা সুদীর্ঘ কালের—
দুঃখ শুধু সে মুকুল হ'ল স্বপ্ন-শেষ ।

হ্রদতীরে পল্লবের লক্ষশাট পটে
সাজে পুনঃ 'বৃক্ষ-সভাসদ',
কাহারে বলিব ? তুমি নাহি যে নিকটে—
দূর হ'তে দূরে গেছ চ'লে । সেই হ্রদ—

শোভিত পলাশ ঋাসে তেমনি দু'কূল,
নেচে ফিরে খঞ্জন শালিক ;
জলে দোলে বারুণীর তরঙ্গিত চুল,
তুমি নাই, কে দেখিবে ? স্তব্ধ চারিদিক ।

শফরী লীলায় কাঁপে ছায়ার ভুবন,
মায়ার ভুবন কাঁপে তায় ;
কেন এ মায়ার মোহ, ছায়ার সৃজন,
কে বুঝিবে, কে বুঝাবে, জানে কেবা হায় ?

বর্ষাদিনে গুরু-গৃহে আমা দোঁহাকার
গুরু হ'ত মেঘের গর্জ্জন ;
তা'ছাড়া কিছুই কানে পশিত না আর,
ভেসে যেত উপদেশ—গম্ভীর বচন।

তারি সনে ভেসে যেত দূর ভবিষ্যতে
কি কুহকে দোঁহাকার মন ;
দেখিতাম সাম্য-রাজ্য বিস্তৃত ভারতে
সমুন্নত শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ।

জগৎ ভাসিয়া যেত ভাবের বন্যায়,
বেঁচে থাকা হ'ত সে মধুর ;
মুছে যেত অত্যাচার, ঘুচিত অন্যায় ;
কোথা সে—স্বপন আজি ? দূর—চিরদূর !

কালাগ্নি-জর্জ্জর-তনু, শ্মশানে বর্জ্জিত
বন্ধুহীন হে বন্ধু আমার,
সর্ব্বভুক বিশ্বগ্রাসী কাল-কবলিত ;
এ অশ্রু তর্পণে জ্বালা জুড়াক্ তোমার।

উচ্চারিয়া মন্ত্র-বাণী যমে করি' জয়
প্রাণ তুমি লভ' দেবরাত !
অমর বাণীর বরে হ'য়ে মৃত্যুঞ্জয়
ফিরে এস ; পুনঃ মোরা দোঁহে এক সাথ—

গাঁথিব অশোক-ফুলে বিজয়-মালিকা,
নব গান গাব এ ধরায়,
পরাবে যশের টীকা কল্পনা-বালিকা,
প্রভেদ না রবে আর ধরা অমরায়।

এস মন্ত্রবলে হেরি মানবের মন,
তত্ত্ব তার শিখি সংগোপনে ;
এস মায়াবলে মোরা হেরি ত্রিভুবন,
এঁকে লই ছবি তার সজনে বিজনে।

"অনেক বলিতে আছে বাকি আমাদের"—
মুখে তব ছিল সদা ওই,
বলিলে দুজনে মিলে বলা হ'ত ঢের,
দেবরাত! একা আমি পারি তাহা কই ?

দেবরাত! দেবরাত! বাণীর সেবক !
দেবরাত! নির্ম্মল-জীবন !
দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী উজ্জ্বল পাবক
কী নিদ্রায় মগ্ন হায়,—কি দেখ স্বপন !

মাঘ, ১৩২০। ৺ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

"ভারত কি সভ্য ?"

(শ্রীঅরবিন্দ)

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত

"ভারত কি সভ্য ?" ("Is India Civilised ?") এই এক চমৎকার রকমের নাম দিয়া স্যার জন উড্রোফ্ একখানি ছোট বই লিখিয়াছেন। তিনি একজন সুবিখ্যাত জজ, সুপণ্ডিত ও তন্ত্রের ব্যাখ্যাতা ; তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার ও ব্যাখ্যা করিয়া এবং তন্ত্রের প্রকৃত অর্থের সমর্থন করিয়া ইতিপূর্ব্বেই তিনি ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ নাট্যসমালোচক মিঃ উইলিয়ম আর্চার (William Archer) ভারতের সমগ্র জীবন ও শিক্ষা দীক্ষাকে উৎকট-ভাবে আক্রমণ করিয়া একখানি বই লিখিয়াছেন, এই বইখানি তাহারই উত্তর। মিঃ আর্চার যতক্ষণ নাট্য-সাহিত্যের সমালোচনা করেন ততক্ষণ তিনি আপনার নিরাপদ ক্ষেত্রে থাকেন, কিন্তু ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিবার তাঁহার প্রধান অধিকার হইতেছে এ বিষয়ে আত্মম্ভরিতাপূর্ণ পরম অজ্ঞান। তিনি ভারতের দর্শন, ধর্ম্ম, আর্ট, সাহিত্য, উপনিষদ, রামায়ণ সবকে একসঙ্গে ধরিয়াই বলিয়া দিয়াছেন—ধিক্কারজনক অকথ্য বর্ব্বরতার স্তূপ। তাঁহার নিন্দার এমনিই বাহাদুরী যে তাহা হইতে কিছুই বাদ পড়ে নাই। মিঃ আর্চারকে আক্রমণ করা খুবই সহজ, সর্ব্বত্র তাঁহার ছিদ্র, পদে পদে দেখাইয়া দেওয়া যায় কেমন করিয়া তিনি নিজেই নিজেকে ধরা দিয়াছেন্। স্যর জন্ উড্রোফের আছে স্থির বিচারোপযোগী মন ও বহুকৃত সুস্পষ্টতা, আর্চারকে নিপাত করা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন হয় নাই। বলিতে পারা যায়, এ-যেন একটা প্রজাপতিকে (না—গুবরে পোকাকে ?) জাঁতায় পিষিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু, প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, এই সব অজ্ঞতাপূর্ণ আক্রমণকে অবহেলা করা কখনই উচিত নহে। এমন কি তিনি এইটিকে এক বিশেষ শ্রেণীর আক্রমণের উদাহরণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ খ্রীষ্টান পাদ্রীরা যে-ভাবে ভারতীয় সভ্যতাকে আক্রমণ করে এটি সে-ধরণের নহে ; যুক্তিবাদের দিক হইতে (rationalistic standpoint) প্রশ্নটি এখানে তোলা হইয়াছে এবং এই সব আক্রমণের পিছনে যে প্রচ্ছন্ন দুরভিসন্ধি থাকে তাহাও এখানে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এক বিশেষ শ্রেণীর আক্রমণের উদাহরণ স্বরূপ মিঃ আর্চারের কীর্ত্তির আলোচনা পরে হয় ত আমাকে করিতে হইবে *, । উপস্থিত এই বইখানিতে তাহার নির্লজ্জ অত্যুক্তি সকল তন্ন তন্ন করিয়া তাহার ভিতরের মতলবটি কেমন প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পাঠকগণকে তাহাই অনুধাবন করিতে বলি।

দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহাদের পক্ষে স্যার জন্ উড্রোফের এই বইখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য ; এমন কি যাঁহারা মানবজাতির আধ্যাত্মিক, মানসিক ও সংস্কৃতি-বিষয়ক (cultural) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎসুক তাঁহাদের পক্ষেও এই বইটি আলোচনা করার বিশেষ উপযোগিতা আছে বলিতে পারা যায়। স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক জোরের সহিত অতি সুস্পষ্টভাবে এখানে এমন একটি প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, মানবজাতির ভবিষ্যৎ সংগঠনে যত সমস্যার সমাধান করিতে হইবে সে সকলের মধ্যে সেই প্রশ্নটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইতে পারে ;

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "Arya" পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি খুবই সময়োপযোগী হইবে বলিয়া এখানে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।—অনুবাদক

* পরে তাঁহার A Defence of Indian Culture নামক গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দ Mr Archerএর আক্রমণকে উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র ভারতীয় জীবন ও কাল্‌চারের যে গভীর ও সুবিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন, সেটি ভারতের দর্শন, ধর্ম্ম, আর্ট, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির অপূর্ব্ব দিগ্‌নির্দ্দেশ।

ইউরোপ আজ যে-সকল সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতেছে, এইটির তুলনায় সেগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক তুচ্ছ ও মাত্র সাময়িক প্রয়োজনের অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। স্যার জন্ উড্রোফ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হন নাই,—বস্তুতঃ একটা সভ্যতা আছে কি না তাহা আর তর্ক ও আলোচনার বিষয় নহে, কারণ যাহাদের মতের কোনও মূল্য আছে তাহারা সকলেই ভারতে এক বিশিষ্ট সভ্যতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন—তিনি কেবল এই সভ্যতার মোটামুটি একটা পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু যে গুরুতর তথ্যটি তিনি পুনঃ পুনঃ বিশেষ জোরের সহিতই পাঠকগণের সম্মুখে ধরিয়াছেন সেটি হইতেছে বিভিন্ন কাল্চারের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিশেষতঃ ইউরোপীয় ও এশিয়াটিক কাল্চারের সংঘর্ষ; অপেক্ষাকৃত বাহিরের জিনিষ বৈষয়িক দ্বন্দ্ব হইতেই এই কাল্চারের দ্বন্দ্ব উত্থিত হইয়াছে; বিশেষ করিয়া ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট মর্ম্ম কি এবং সেই সভ্যতা যে আজ মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন, তাহাই তিনি অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে ভারতীয় সভ্যতাকে রক্ষা করা মানবজাতির কল্যাণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়; এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই সভ্যতা বিষম সঙ্কটাপন্ন; তাঁহার আশঙ্কা হইতেছে—এবং একস্থানে তিনি স্পষ্ট করিয়াই এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিক্ষেপের ঘূর্ণাবর্ত্তে জগতে পরিবর্ত্তনের যে প্রচণ্ড বন্যা আসিতেছে তাহাতে হয়ত ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ভাসিয়া যাইবে; একদিকে ইউরোপীয় আধুনিকতার সুতীব্র আক্রমণ, অন্যদিকে তাহার সন্তানগণের নিদারুণ অবহেলা, ইহার ফলে ভারতের সভ্যতা, এবং জাতির যে আত্মা এই সভ্যতাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, উভয়ে একই সঙ্গে চিরদিনের মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এই বইখানি আমাদিগকে সনির্ব্বন্ধ আহ্বান করিতেছে, আমাদের উপর যে পবিত্র গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে আমরা যেন আরও ভাল করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করি এবং ইহার আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে আরও সজাগ হইয়া উঠি, এই বিষম পরীক্ষার সন্ধিক্ষণে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত দণ্ডায়মান হইতে পারি। গ্রন্থকার অতিশয় দক্ষতা ও অনেকখানি শান্ত গভীরতার সহিত তাঁহার মতটি পরিস্ফুট করিয়াছেন, এবং প্রবন্ধগুলিতে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও পরিষ্কার প্রকাশ-ভঙ্গীর এত নিদর্শন আছে যে, কেবলই সেইগুলি তুলিয়া দিতে লোভ হয়। কিন্তু, মূল বিষয়বস্তুটির বাহিরে যাইলে আমার চলিবে না।—কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সেইটির সারমর্ম্ম দেওয়াই সব চেয়ে ভাল হইবে।

জগতে প্রকৃত সুখের স্বরূপ কি, মানুষের পার্থিব জীবনের যথার্থ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, স্যার জন উড্রোফ প্রথমেই তাহার বর্ণনা দিয়া আরম্ভ করিয়াছেন; বলা যাইতে পারে, উহা হইতেছে আত্মা, মন ও দেহের সুসঙ্গতি। অতএব কোনও কালচারের (Culture) গুণ বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, উহা এই সঙ্গতির মূলসূত্র কতখানি ধরিতে পারিয়াছে; কোনও সভ্যতার (,Civilisation) গুণ বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, উহার মূল-নীতি, ভাব, আদর্শ, অনুষ্ঠান, জীবনপদ্ধতিগুলি ঐ সঙ্গতিকে কতখানি কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে, উহার ছন্দকে কতটা অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছে, উহার স্থায়িত্ববিধান ও ক্রমবিকাশ-সাধনের কতদূর ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে। তাহা হইলে কোন সভ্যতা আধুনিক ইউরোপীয় কাল্চারের ন্যায় প্রধানতঃ দেহবাদী জড়বাদী (materialistic) হইতে পারে, অথবা প্রাচীন গ্রীকো-রোমান কাল্চারের ন্যায় প্রধানতঃ বুদ্ধি ও মনের স্ফূর্ত্তি লইয়া থাকিতে পারে, অথবা ভারতের অদ্যাপি স্থায়ী কাল্চারের ন্যায় প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক হইতে পারে। ভারতীয় কাল্চারের কেন্দ্রগত জিনিষ হইতেছে অনন্তের পরিকল্পনা,—শাশ্বত আত্মার পরিকল্পনা,—সেই আত্মা এখানে জড়ের মধ্যে বদ্ধ ও অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, জড়ের স্তরে ব্যাপ্তির জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া পরিণামে মানসিক জীব মানুষের মধ্যে ভাব ও চিন্তার জগতে, সজ্ঞান নৈতিকতা বা ধর্ম্মের জগতে প্রবেশ লাভ করিতেছে; আরও অগ্রসর হইয়া মনোযন্ত্রের সাত্ত্বিক ও

আধ্যাত্মিক অংশের ক্রমবর্দ্ধনশীল বিকাশের ফলে ব্যষ্টিগত জীব নিজেকে শুদ্ধ অধ্যাত্ম চেতনার সহিত একীভূত করিতে সক্ষম হয়। এই পরিকল্পনার উপরেই ভারতের সমাজ প্রণালী গঠিত, তাহার দর্শনশাস্ত্র এইটিকেই প্রচার করিয়াছে, তাহার ধর্ম্ম হইতেছে অধ্যাত্ম চেতনা ও তাহার ফললাভের স্পৃহা (aspiration), তাহার আর্ট ও সাহিত্যেরও আছে ঐ ঊর্দ্ধদৃষ্টি, তাহার সমগ্র ধর্ম্ম বা জীবননীতি ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রগতি (progress) ভারত স্বীকার করে, কিন্তু তাহা হইতেছে এই আধ্যাত্মিক প্রগতি; জড়াত্মক বৈষয়িক সভ্যতায় ক্রমশঃ বেশী বেশী সমৃদ্ধ ও দক্ষ হইয়া উঠাকেই ভারত প্রগতি বলিয়া স্বীকার করে না। এই সমুচ্চ পরিকল্পনার উপর জীবনের প্রতিষ্ঠা, অধ্যাত্ম ও শাশ্বতের দিকে তাহার প্রেরণা, ইহাই তাহার সভ্যতার বিশিষ্ট মূল্য; মনুষ্যোচিত যতই দোষ ত্রুটি থাকুক তাহার আদর্শের প্রতি এই নিষ্ঠাই তাহার সন্তানগণকে মানবসমাজে এক বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু, জগতে আরও অন্য রকমের কাল্‌চার আছে, তাহাদের কেন্দ্রগত পরিকল্পনা বিভিন্ন, এমন কি তাহাদের লক্ষ্য বিপরীত; এবং যে দ্বন্দ্বনীতি জড়জগতের সর্ব্বপ্রথম নীতি, তাহার ফলে বিভিন্ন কাল্‌চার পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে আসিবে, নিজেদের বিস্তার করিতে এবং বিরোধী ও বিপরীত কাল্‌চার সকলকে ধ্বংস করিতে, আত্মসাৎ করিতে, তাহাদের স্থান গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষই শেষ বা আদর্শ অবস্থা নহে; সে আদর্শ অবস্থা আসিবে যখন বিভিন্ন কাল্‌চার স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশ করিবে, পরস্পরকে দ্বেষ করা, ভুল বুঝা বা আক্রমণ করাকেই বিশিষ্ট লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না পরন্তু সকলের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ঐক্য রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিবে। কিন্তু, যতদিন দ্বন্দ্বের নীতিই বলবৎ রহিয়াছে, ততদিন অস্ত্রত্যাগ করা মারাত্মক; যে-কাল্‌চার নিজের স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন করিবে এবং আত্মরক্ষার উপায় অবহেলা করিবে, অপরে তাহাকে গ্রাস করিয়া লইবে এবং যে-জাতি সেই কাল্‌চারকে ধরিয়া জীবন-যাপন করিতেছিল সেই জাতি নিজের আত্মাকে হারাইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।—কারণ, মানবসমাজে যে-আত্মা নিজেকে প্রকাশ করিতেছে প্রত্যেক জাতিই সেই প্রকাশশীল আত্মার এক একটি বিশিষ্ট শক্তি এবং ঐ শক্তির বিকাশই তাহার জীবনের নীতি। ভারতবর্ষ হইতেছে ভারত-শক্তি, এই মহান্ অধ্যাত্ম পরিকল্পনার জীবন্ত তেজমূর্ত্তি; ইহার প্রতি একান্ত নিষ্ঠাকেই তাহার জীবনের মূলনীতি করিতে হইবে। ইহার কল্যাণেই সে জগতের অমরজাতিগুলির মধ্যে অন্যতম হইতে পারিয়াছে।

দ্বন্দ্বনীতি ইতিহাসে বিরাটরূপে দেখা দিয়াছে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে যুগযুগব্যাপী সংঘর্ষে; এই সংঘর্ষের যেমন বাহ্যিক ও বৈষয়িক দিক আছে, তেমনি কাল্‌চার ও আধ্যাত্মিকতার দিকও আছে। বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়াই পুনঃ পুনঃ ইউরোপ এশিয়ার উপর এবং এশিয়াও ইউরোপের উপর পড়িয়াছে, জয় করিতে আত্মসাৎ করিতে প্রভুত্ব করিতে চাহিয়াছে; কখনও ইউরোপ আগাইয়াছে এশিয়া পিছাইয়াছে, কখনও ইহার বিপরীত হইয়াছে, এবং পর্য্যায়ক্রমে বরাবর এইভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। সমগ্র এশিয়ারই সর্ব্বদা আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক ছিল, যদিও সর্ব্বত্র ইহার গভীরতা বা স্পষ্টতা সমান ছিলনা; কিন্তু এ-বিষয়ে ভারতই হইতেছে এশিয়ার বিশিষ্ট জীবনধারার শ্রেষ্ঠরূপ। ইউরোপেরও মধ্যযুগের যে কাল্‌চার, তাহার উপর এশিয়া হইতে উদ্ভূত খ্রীষ্টান আদর্শের প্রভাব থাকায়, অধ্যাত্মলক্ষ্যই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এবং তখন এশিয়ার কাল্‌চারের সহিত ইউরোপীয় কাল্‌চারের মূলতঃ একটা সাদৃশ্য হইয়াছিল, কতকটা বৈষম্যও ছিল। তথাপি কাল্‌চার বিষয়ে প্রকৃতিগত প্রভেদ মোটের উপর বরাবরই আছে। গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপ জড়বাদী, আক্রমণশীল, লুণ্ঠনপর হইয়া উঠিয়াছে এবং মানুষের ভিতর ও বাহিরের যে সুসঙ্গতি হইতেছে সভ্যতার প্রকৃত অর্থ এবং সত্য প্রগতির কার্য্যকরী কারণ ইউরোপ তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছে। বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য, বৈষয়িক উন্নতি, বৈষয়িক কার্য্যদক্ষতা এই সবই হইয়াছে তাহার উপাস্য দেবতা। যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা এশিয়ার উপর পতিত হইয়াছে, এবং ভারতীয় আদর্শের উপর তীব্র আক্রমণ সকলের মধ্যে

যাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতেছে স্বরূপে এই জড়বাদী বৈষয়িক কালচার। অধ্যাত্ম লক্ষ্যের উপাসক ভারত কখনও ইউরোপের উপর এশিয়ার বাহ্যিক বৈষয়িক আক্রমণে যোগদান করে নাই; তাহার ভাব ও আদর্শগুলি জগৎমাঝে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়াই ছিল ভারতের বিশিষ্ট প্রণালী; আজ আবার আমরা সেই প্রণালীরই অভ্যুদয় দেখিতেছি। কিন্তু সে নিজে আজ বৈষয়িক ব্যাপারে ইউরোপ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং এই বৈষয়িক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই কাল্‌চার অধিকারের চেষ্টাও আসিয়াছে এবং সেই আক্রমণও কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। অন্তপক্ষে ইংরাজশাসন ভারতকে তাহার সামাজিক আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে সক্ষম করিয়াছে, তাহাকে আত্মচেতনায় জাগাইয়া তুলিয়াছে, এবং যতক্ষণ না সে নিজের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে ততক্ষণ তাহাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিয়াছে, নতুবা তাহা ভারতের সভ্যতাকে ডুবাইয়া ধ্বংস করিয়া দিত। এখন তাহাকে নিজের পায়ে ভর দিয়াই দাঁড়াইতে হইবে, বিদেশী প্রভাব হইতে নিজের কালচারকে রক্ষা করিতে হইবে, তাহার বিশিষ্ট আত্মা, মূলগত নীতি, স্বভাবানুযায়ী অনুষ্ঠান সমূহ রক্ষা করিয়া নিজের মুক্তি-সাধন এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিতে হইবে।

কিন্তু এখানে অনেকগুলি প্রশ্ন উঠিতে পারে। এইরূপ আত্মরক্ষা ও আক্রমণের ভাব পোষণ করা কি ঠিক? মানবজাতি যে-উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে আমাদের পক্ষে ঐক্য, সামঞ্জস্য ও আদান প্রদানের ভাব পোষণ করাই কি ঠিক হইবে না? সমগ্র জগতে এক অখণ্ড সভ্যতাই কি ভবিষ্যতের প্রশস্ত লক্ষ্য নহে? আধ্যাত্মিক সভ্যতা কিম্বা বৈষয়িক সভ্যতা কোনটির উপরে অতিমাত্রায় ঝোঁক দেওয়া কি মানবপ্রগতি বা পূর্ণতার পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে? উভয়বিধ সভ্যতার সমন্বয়ই আত্মা, মন ও দেহের সুসঙ্গতি বিধানের প্রকৃত পন্থা বলিয়া মনে হয়। আবার এই প্রশ্নও রহিয়াছে, শুধু মূল ভাব ও আদর্শটিকে রক্ষা করিতে হইবে, না, বাহ্যিক রূপ ও অনুষ্ঠানগুলিকেও রক্ষা করিতে হইবে? তার জন্ উড্‌রোফ্‌ মানবপ্রগতির যে তিনটি অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার দ্বারাই তিনি এই সব প্রশ্নের জবাব দিবেন। প্রথম অবস্থা হইতেছে দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতায়; অতীতে বরাবর এইটিরই প্রাধান্য ছিল, এখনও উহা মানবজাতির বর্ত্তমানকে ঘিরিয়া রহিয়াছে; কারণ যখন রূঢ় রকমের বৈষয়িক দ্বন্দ্ব উপশমিত হয়, তখনও দ্বন্দ্বনীতিটি জীবন্ত থাকে, এবং কাল্‌চারের দ্বন্দ্ব আরও প্রবল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় অবস্থার সহিত আসে মিলন ও ঐক্য; তৃতীয় ও শেষ অবস্থার লক্ষণ হইতেছে ত্যাগ ও আত্মদানের ভাব, সে অবস্থায় সকলেই এক আত্মা বলিয়া অনুভূত হয়, প্রত্যেকেই অপরের কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে।—অধিকাংশের পক্ষে দ্বিতীয় অবস্থাটি এখনও আরম্ভ হয় নাই বলিলেই চলে; তৃতীয়টি ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার মধ্যে নিহিত আছে। ব্যক্তিগত ভাবে কেহ কেহ উচ্চতম অবস্থাটিতে উঠিয়াছেন; সিদ্ধ সন্ন্যাসী, মুক্তপুরুষ, যে-জীব পরমাত্মার সহিত এক হইয়াছে, সে জানে যে সর্ব্বভূত সে নিজেই, তাহার পক্ষে সকল আত্মরক্ষা বা আক্রমণ নিষ্প্রয়োজনীয়, সে যে-সত্য দর্শন করিয়াছে তাহার মধ্যে এ-সবের স্থান নাই; ত্যাগ ও আত্মদানই স্বভাবতঃ তাহার কর্ম্মের একমাত্র নীতি হইয়া উঠে। কিন্তু কোন জাতিই সে স্তরে উঠিতে পারে নাই, এবং অজ্ঞান বা অনিচ্ছায় বা নিজের চৈতন্যের কাছে যাহা সত্য তাহার বিরোধাচরণ করিয়া কোনও নীতি বা আদর্শের অনুসরণ করা মিথ্যা, তাহা আত্মহত্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত মেষশাবকের ন্যায় যদি আমি আমাকে নিহত হইতে দিই, তাহাতে আমার কোনও বিকাশ, উন্নতি বা আধ্যাত্মিক শুভ হইতে পারে না। মিলন ও ঐক্য যথাসময়ে আসিতে পারে, কিন্তু তাহা হওয়া চাই, মূলগত ঐক্য, তাহাতে থাকিবে প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা; তাহা একজনের দ্বারা আর একজনের পূর্ণ গ্রাস নহে—অথবা অসম্বদ্ধ ও অসঙ্গত ঐক্য নহে; জগৎ তাহার জন্য প্রস্তুত না হইলেও সে ঐক্য আসিতে পারে না। যুদ্ধকালে অস্ত্র পরিত্যাগের অর্থ মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনা। আধ্যাত্মিকতার সহিত বৈষয়িকতার পূর্ণ সামঞ্জস্যবিধান অবশ্যই করিতে হইবে, কারণ আত্মা মন ও দেহের মধ্য

দিয়াই ক্রিয়া করে; বিশেষতঃ খাঁটি মানসিক বা গাঢ়ভাবে বৈষয়িক কাল্‌চারের অন্তস্তলে মৃত্যুর বীজ নিহিত আছে, কারণ কাল্‌চারের চরম লক্ষ্য হইতেছে পৃথিবীতে স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু যদিও ভারতের প্রেরণা শাশ্বতের দিকে—কারণ সকল সময়ে সেইটিই শ্রেষ্ঠ, সেইটি পূর্ণভাবে সত্য—তথাপি তাহার কাল্‌চার ও তাহার দার্শনিক তত্ত্বে আছে শাশ্বতের সহিত বৈষয়িকতার পরম সমন্বয়; ইহা তাহাকে বাহির হইতে খুঁজিতে হইবে না। ঐ নীতি অনুসারেই আবার বাহ্যরূপ ও আকার মূলভাব ও আত্মার ন্যায়ই প্রয়োজনীয়, কারণ আকার হইতেছে আত্মারই ছন্দ, আকারকে ভাঙ্গিয়া দিলে আত্মার আত্ম-প্রকাশকেই আহত ও বিপর্যস্ত করা হয়। আকারের পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও হইবে, কিন্তু তাহা হইবে একটা নূতন আত্মপ্রকাশের ভঙ্গী, তাহা ভিতর হইতে আত্মারই স্বধর্ম্ম অনুসারে বিকশিত হইয়া উঠিবে, একটা বিজাতীয় কাল্‌চারের বাহ্যরূপের হীন অনুকরণমাত্র হইলে চলিবে না।

তাহা হইলে ভারত তাহার এই সঙ্কটকালে বাস্তবিক কোথায় দাঁড়াইয়া আছে? ইতিমধ্যেই সে ইউরোপীয় কাল্‌চারের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে এবং সে বিপদ এখনও মোটেই দূর হয় নাই, বরং আসন্ন ভবিষ্যতে তাহা আরও প্রবল ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। এশিয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছে; ঠিক এইজন্যই ইউরোপীয় সভ্যতা এশিয়াকে গ্রাস ও আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা প্রবল ও ঘনীভূত করিয়া তুলিবে, ইতিমধ্যেই তাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছে; আর প্রতিযোগিতার নীতি অনুসারে এরূপ করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও বৈধ; এশিয়া যখন জগতের বৈষয়িক ব্যাপারে আবার নিজের স্থান করিয়া লইবে তখন যেন এশিয়ার আদর্শ ইউরোপের উপর চাপাইয়া দিবার আর কোন আশঙ্কা না থাকে। এটা হইতেছে কাল্‌চারের কলহ, এবং রাজনীতিক সমস্যার দ্বারা ইহা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। কাল্‌চার বিষয়ে এশিয়াকে হইতে হইবে ইউরোপের একটা প্রদেশ, এবং রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়া এশিয়াকে হইতে হইবে ইউরোপীয় সঙ্ঘের, অন্ততঃ একটা ইউরোপীয় ভাবাপন্ন সঙ্ঘের অংশমাত্র, যেন ইউরোপকে কাল্‌চার বিষয়ে এশিয়ার একটা প্রদেশে পরিণত হইতে না হয়, জগতের নব-বিধানে সমৃদ্ধ, বিপুল, শক্তিশালী এশিয়ার জাতি সমূহের বিজয়ী শক্তিতে এশিয়ার ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতে না হয়! মিঃ আর্চারের আক্রমণের খোলাখুলি উদ্দেশ্য হইতেছে রাজনৈতিক। তিনি যে-তান ধরিয়াছেন তাহার মূল সুর হইতেছে এই যে, জগতের নব-সংগঠন যুক্তিপন্থী, (rationalistic) জড়বাদী ইউরোপীয় সভ্যতারই নীতি ও আদর্শ অনুসারে হওয়া চাই; ভারত যদি তাহার সভ্যতাকে,* তাহার অধ্যাত্ম প্রেরণাকে, তাহার অধ্যাত্ম গঠননীতিকে ধরিয়া থাকে তাহা হইলে সে হইবে এই সুন্দর, দীপ্তিমান, যুক্তিপন্থী জগতের একটা জীবন্ত বিপর্য্যয়, কুৎসিৎ কলঙ্ক; হয় তাহাকে তাহার সমগ্র সত্তায় ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, যুক্তিপন্থী, জড়বাদী হইয়া উঠিতে হইবে এবং এইভাবে স্বাধীনতার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে, নতুবা তাহাকে পরাধীনতা পাশে বদ্ধ রাখিয়া শাসন করিতে হইবে, তাহার ত্রিংশকোটি ধর্ম্মভীরু বর্ব্বরকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখিয়া মহান্ ও আলোকপ্রাপ্ত খ্রীষ্টীয়-নাস্তিক ইউরোপীয়গণের দ্বারা শিক্ষিত ও সভ্য করিয়া তুলিতে হইবে। এটা শুনিতে অদ্ভুত রকমের লাগে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ এইটিই হইতেছে ভিতরের কথা। এই রকম সব আক্রমণের * বিরুদ্ধে ভারত অবশ্য জাগিয়া উঠিতেছে, নিজের পক্ষ সমর্থন করিতেছে, কিন্তু একমাত্র যে ঐকান্তিকতা, স্পষ্ট দৃষ্টি ও দৃঢ় সঙ্কল্প ভারতকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে, এখনও তাহার অভাব রহিয়াছে। আজ ইহা আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; ভারত কি করিবে, বাঁচিতে চায় না ধ্বংস হইতে চায়, এখন সে বাছিয়া লউক।

আমি এখানে কেবল একটা সাদাসিধা বর্ণনা দিলাম; স্যার জন উড্‌রোফ তাঁহার বিচারকোচিত বুদ্ধি লইয়া বিষয়টিকে যেরূপ পূর্ণতার সহিত পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং সকল দিক হইতে দেখিয়াছেন, নানা প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক

* অবশ্য সকলেই এইভাবে আক্রমণ করে না, কারণ ভারতীয় সভ্যতার গুণ গ্রহণ ও মর্ম্ম উপলব্ধি আজকাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

কথার উত্থাপন করিয়াছেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমার পক্ষে সে-সব তুলিয়া দেওয়া সম্ভব নহে এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। এই মতবাদটির সহিত মোটামুটি ভাবে আমার মতের ঐক্য আছে; লেখক যে সাবধানবাণী শুনাইয়াছেন তাহাও অবহেলা করা চলে না; ইউরোপীয় লেখক ও রাজনীতিবিদ্‌গণ সম্প্রতি যে-সব উক্তি করিয়াছেন তাহাতে স্যার জন উড্‌রোফের আশঙ্কাটি সমর্থিত হয়, বিপদটি বাস্তব বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ যুগান্তরসূচক বিশাল পরিবর্ত্তনের এই সন্ধিক্ষণে বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা ও মানবজাতির কাল্‌চারের গতি হইতে অবশ্যম্ভাবীরূপেই এই বিপদটি উঠিয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার কিছু মতভেদ আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া ভাল মনে করি। তিনি ইউরোপের মধ্যযুগের কাল্‌চারের যে গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা আমি ঠিক মানিয়া লইতে পারি না; ঐ যুগের সুকুমার শিল্পচর্চ্চার প্রবৃত্তি এবং গভীর ও ঐকান্তিক ধর্ম্মপ্রেরণা, আমার মতে সেই সময়কার বহুল পরিমাণ অজ্ঞান ও সংস্কার-বিরোধিতা, নিষ্ঠুর পরমত-অসহিষ্ণুতা ও কতকটা আদিম টিউটনিক (Teutonic) জাতি-সুলভ কঠোরতা, কর্কশতা বর্ব্বরতার দ্বারা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তিনি পরবর্ত্তী ইউরোপীয় কাল্‌চারকে অত্যধিক মাত্রাতেই আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়; এই কাল্‌চারের মধ্যে যে প্রয়োজনবাদী জড়তান্ত্রিকতার (Utilitarian materialism) ধারা রহিয়াছে তাহা খুবই কদর্য্য এবং যদি আমরা তাহার অনুকরণ করি তাহা হইলে আমাদের পক্ষে মহাভুল করা হইবে; কিন্তু তথাপি উহা এমন সব মহত্তর আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত যাহা মানবজাতির বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছে, যদিও তাহাদের স্বরূপ এখনও অপরিণত ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে এবং ভারতীয় মনের সম্পূর্ণ গ্রহণোপযোগী করিতে হইলে সে গুলিতে অধ্যাত্মভাব ও সার্থকতা দিতেই হইবে। আরও আমার মনে হয় যে, তিনি ভারতের নবজাগরণের শক্তিটাকে একটু কম করিয়াই ধরিয়াছেন; তাহার বাহিরের সাফল্য নহে, তাহা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক ও অন্তর্নিহিত শক্তি ও অবশ্যম্ভাবিতার যথার্থ পরিমাপ তিনি করেন নাই। যে এক শ্রেণীর ভারতীয়গণ পরম অশুভসূচক দাসসুলভ কল্পনাকে মুখে ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারে যে, "ইউরোপীয় রীতিনীতি অনুষ্ঠানকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা ছাড়া ভারতের আর গত্যন্তর নাই", তিনি সেই শ্রেণীকে লইয়াই একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন।—এরূপ মনোভাব এখন কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়,—অবশ্য এটাও যে একটা খুবই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র তাহা আমি স্বীকার করি এবং এখানে এক মতে বড় বিপদের দ্বার খোলা রহিয়াছে; কিন্তু এখানেও গভীর ভাব-পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে। আমার আরও মনে হয়, ভারতের ভাব ও আদর্শ সমূহ যে ইউরোপে সঞ্চারিত হইতেছে এবং এই ভাবেই ভারত আপন বিশিষ্টরীতিতে ইউরোপীয় আক্রমণের জবাব দিতেছে, এই সত্যটিকেও তিনি যথেষ্ট মর্য্যাদা প্রদান করেন নাই। এই দিক হইতেই আমি সমগ্র সমস্যাটিকে একটা বিভিন্ন রূপ দিতে চাই।—

স্যার জন্ উড্‌রোফ আমাদিগকে তেজের সহিত আত্মরক্ষা করিতে আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান সংঘর্ষে শুধু আত্মরক্ষা লইয়া থাকিলে তাহা কেবল পরাজয়েই পর্য্যবসিত হইবে; যদি যুদ্ধই করিতে হয়, আত্মরক্ষার দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আক্রমণ করাই একমাত্র নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য নীতি; কারণ কেবল ইহার দ্বারাই আত্মরক্ষা সুসিদ্ধ হইতে পারে। কেন এখনও এক শ্রেণীর ভারতবাসী ইউরোপীয় সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইতেছে আর কেনই বা এখন রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা সকলেই তাহার দ্বারা মোহগ্রস্ত হইতেছি? কারণ তাহারা সর্ব্বদা সকল শক্তি, সৃষ্টি ও কার্য্যপরতা শুধু ইউরোপের দিকেই দেখিয়াছে এবং ভারতের দিকে দেখিয়াছে শুধু নিষ্ক্রিয়তা, শুধু অচল, অক্ষম আত্মরক্ষার দুর্ব্বলতা। কিন্তু যেখানেই ভারতীয় আত্মা তেজের সহিত প্রতিঘাত করিতে পারিয়াছে,—সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে, সেইখানেই ইউরোপের ইন্দ্রজাল তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মোহিনী শক্তি হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্ম বিষয়ে

ইউরোপ প্রথমে খুবই তেজের সহিত আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু এখন আর তাহার শক্তি কেহ অনুভব করে না,—কারণ হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে যে সব সৃষ্টির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাহা ভারতের ধর্ম্মকে প্রাণময়, বিকাশশীল, নিঃশঙ্ক, বিজয়ী ও আত্মপ্রসারী শক্তিতে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু দুইটি ঘটনার দ্বারা এই ব্যাপারের চূড়ান্ত নিশ্চয় হইয়াছিল, থিওসফিকাল্ (Theosophical) আন্দোলনের উত্থান ও চিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। কারণ এই দুইটিতে ভারতের আধ্যাত্মিকতা আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত দেখা গিয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্যের জড়ভাবাপন্ন মনকে জয় করিতে, পরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিল। ভারতের সমগ্র শিক্ষিত সমাজ সৌন্দর্য্য-বোধ বিষয়ে হীনরুচি ও ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; বঙ্গীয় কলাপরিষদের (Bengal School of Arts) আবির্ভাবে সহসা যে সমুজ্জ্বল ঊষার উদয় হইয়াছে তাহার জ্যোতি সুদূর টোকিও, লণ্ডন, প্যারিসে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে; যদিও এই ঘটনা খুবই অল্প দিনের তথাপি কাল্‌চার বিষয়ে ইতিমধ্যেই ইহা একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে; অবশ্য এটি পূর্ণ হইয়া উঠিতে এখনও অনেক বাকী, তথাপি ইহার অগ্রগতি অপ্রতিরোধণীয়, ইহার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটিতেছে। এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তথাকথিত চরমপন্থীদের নীতির এইটিই ছিল নিগূঢ় অর্থ; দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইউরোপের অনুকরণ ব্যতীত ভারতের পক্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছু সৃষ্টি করা অসম্ভব এই প্রচলিত ধারণাটিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া দেওয়াই ছিল ঐ আন্দোলনের চেষ্টা। সে চেষ্টা সাময়িক ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে; উহার প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে অথবা সেগুলি শক্তিহীন এবং মূল আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া পড়িয়াছে; অতএব এই দিকে ভারতীয় আত্মার পক্ষে এখনও সমূহ বিপদ রহিয়াছে। কিন্তু যখন অনুকূল অবস্থার ফলে প্রশস্ততর দ্বার উন্মুক্ত হইবে তখনই আবার সেই চেষ্টার পুনরভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। ইতিমধ্যেই কেহ কেহ Self-determination বা স্ব-রাজের গভীরতর অর্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কিন্তু আমাদিগকে প্রথমে সমগ্র প্রশ্নটিকে বৃহত্তর জগদ্ব্যাপী সার্থকতার দিক হইতেই দেখিতে হইবে। সত্য বটে যে, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, প্রতিযোগিতার নীতি এখনও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ শাসিত করিতেছে এবং আরও কিছুকাল করিবে,—যদিও যুদ্ধ উঠিয়া যায় তথাপি অন্য আকারে করিবে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, মানবজাতির জীবনে পরস্পরের সহিত নৈকট্যের ভাব বর্দ্ধিত হওয়াই আজিকার প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ এইটিকেই রূঢ়ভাবে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, যুদ্ধাবসানের পরবর্ত্তী যুগে ইহার পূর্ণ অর্থ বুঝা যাইবে। এখনও প্রকৃত মিল হয় নাই, সত্য ঐক্যের সূচনা আরও সুদূরপরাহত, কিন্তু ঘটনাচক্র জোর করিয়াই আমাদিগকে এক বাহ্য ঐক্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। মানসিক, নৈতিক ও কাল্‌চারের ক্ষেত্রে এই বাহ্য ঐক্যের ফল নিশ্চয়ই ফলিবে। সম্ভবতঃ নানা দিকে ইহা প্রথমে দ্বন্দ্বকেই স্পষ্ট করিয়া তুলিবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ ধনিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্বের কথা বলা যাইতে পারে; হয় ত শেষ পর্য্যন্ত একটা কাল্‌চারের দ্বন্দ্বও উপস্থিত হইতে পারে। কাল্‌চারের ক্ষেত্রে ইহার পরিণাম এইরূপও হইতে পারে যে, ইউরোপের আক্রমণশীল কাল্‌চার অন্যান্য সবকে গ্রাস করিয়া লইয়া এক ধরণের ঐক্য সৃষ্টি করিবে, তাহার রূপ কি দাঁড়াইবে, বুর্জ্জোয়াতন্ত্র, শ্রমিকতন্ত্র না যুক্তিতন্ত্র, তাহা এখন হইতে বলা সহজ নহে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, মূলগত ঐক্যকে ধরিয়া একটা মুক্ত সমন্বয় সাধিত হইবে। কিন্তু প্রত্যেক জাতি নিজেকে তীক্ষ্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপন আপন পৃথক কাল্‌চারের বিকাশ করিবে এবং সকল প্রকার বিদেশী ভাব ও অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিবার নীতি অনুসরণ করিবে এই যে-আদর্শ কিছুকাল হইতে প্রচারিত হইতেছিল এবং ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, সেইটি আর দাঁড়াইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না,—তবে মিলন ও ঐক্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে যে League of Nations বা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের প্রচার করা হইয়াছে সেটি যদি ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় তাহা হইলে আলাদা

কথা এবং এরূপ বিভ্রাটও একেবারে অসম্ভব নহে। ইউরোপই এখন জগতের উপর আধিপত্য করিতেছে; অতএব এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা খুবই স্বাভাবিক যে, সমগ্র জগৎ ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে এবং ইউরোপীয় ঐক্যের মধ্যেই যে সামান্য ইতর বিশেষ থাকিতে পারে তাহা ছাড়া আর কিছুই বরদাস্ত করা হইবে না। কিন্তু এই ভবিষ্যসম্ভাবনার উপরে আসিয়া পড়িতেছে ভারতবর্ষের বিশাল ছায়া।

স্যার জন্ উড্রোফ অধ্যাপক ডিকিন্সনের (Lowes Dickinson) মত তুলিয়া দিয়াছেন যে, দ্বন্দ্বটি ততটা এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে নহে, যতটা ভারত ও বাকী সমস্ত জগতের মধ্যে।—এই মতের পশ্চাতে একটা সত্য আছে, যদিও ইউরোপ ও এশিয়ার দ্বন্দ্বও একটা গণ্য করিবার জিনিষ। আধ্যাত্মিকতা ভারতের একচেটিয়া নহে; এটি বৌদ্ধিকতার (intellectualism) নীচে যতই চাপা পড়ুক বা অন্য কোন আবরণের দ্বারা লুকান থাকুক, এটি মানব জীবনে একটি অবশ্যম্ভাবী অংশ। কিন্তু প্রভেদ হইতেছে এই যে, আধ্যাত্মিকতাকেই বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ সমগ্র জীবনের প্রধান প্রেরণা ও নির্ণায়ক শক্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইবে, না, আধ্যাত্মিকতা কেবল একটা আনুষঙ্গিক শক্তি হইয়া থাকিবে। যৌক্তিকতার দাবী বা জড়ানুগামী প্রাণের দাবীর কাছে ইহার দাবীকে অস্বীকার করা হইবে বা নীচে স্থান দেওয়া হইবে। প্রথমটি ছিল প্রাচীন প্রজ্ঞার স্বরূপ; এককালে—যথার্থই চায়না হইতে পেরু—সকল সভ্যদেশেরই এই ছিল আদর্শ। কিন্তু আর সকল জাতি এই আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, ইহার উদার ব্যাপকতার হ্রাস করিয়াছে, অথবা—এখন যেমন এশিয়াতে হইতেছে—ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আক্রমণশীল ধনতান্ত্রিক, বাণিজ্য-তান্ত্রিক, শিল্পতান্ত্রিক যুক্তিপন্থী প্রয়োজনবাদী আধুনিক আদর্শকে গ্রহণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। একমাত্র ভারত, যতই ক্ষুন্ন জ্ঞান ও শক্তির সহিত হউক, এই অধ্যাত্ম আদর্শের মূল সত্যটির প্রতি নিষ্ঠাবান রহিয়াছে; একমাত্র সেই-ই কিছুতে ইহাকে ছাড়িতে না চাহিয়া "অবাধ্য" হইয়া রহিয়াছে, বস্তুতঃ মিঃ আর্চার রুষ্ট হইয়া এই অভিযোগই করিয়াছেন,—তিনি বলিয়াছেন, চায়না ও জাপান এই নির্বুদ্ধিতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ তাহারা উভয়েই যুক্তিপন্থী ও জড়বাদী হইয়া উঠিয়াছে,—যদিও মিঃ আর্চারের এই কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে আমি প্রস্তুত নহি,—একমাত্র ভারতই (ব্যক্তিগত ভাবে বা ছোট ছোট শ্রেণী-হিসাবে যে যাহাই করুক না কেন) জাতি হিসাবে তাহার উপাস্য দেবতাকে বর্জ্জন করিতে এবং যুক্তিতন্ত্র, বাণিজ্যতন্ত্র ও ধনতন্ত্ররূপী প্রবল প্রতাপশালী প্রতিমার সম্মুখে মাথা নোয়াইতে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়াছে। তাহাতে আঘাত লাগিয়াছে, কিন্তু সে এখনও অভিভূত হইয়া পড়ে নাই। কতকগুলি পাশ্চাত্যভাব সে গ্রহণ করিতেছে, যথা স্বাধীনতা, সাম্য, সাধারণতন্ত্র; এ-সব তাহার বৈদান্তিক সত্তার বিরোধী নহে—কিন্তু, সেগুলি যে-পাশ্চাত্যরূপ লইয়া আসিতেছে তাহাতে তাহার তৃপ্তি হইতেছে না, এবং কেমন করিয়া সেগুলিকে ভারতীয় রূপ দেওয়া যায় ইতিমধ্যেই সে তাহা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা হইলেই সেগুলি নিশ্চয় অধ্যাত্মভাবাপন্ন হইয়া উঠিবে। এই যে অবস্থা ইহার কেবল দুইটি পরিণাম হইতে পারে। হয় ভারত ইউরোপের প্রভাবে যুক্তিপন্থী ও শিল্পতান্ত্রিক হইয়া উঠিবে, অথবা সে তাহার দৃষ্টান্তের দ্বারা এবং কাল্‌চার বিষয়ক ভাব-সঞ্চরণের দ্বারা পাশ্চাত্যের নব নব প্রবৃত্তিগুলিকে তেজের সহিত সাহায্য করিয়া সমগ্র মানবজাতিকেই অধ্যাত্মভাবাপন্ন করিয়া তুলিবে। আজ এই প্রশ্নটিই সমাধান অপেক্ষা করিতেছে—ভারত যে-অধ্যাত্ম আদর্শের প্রতিনিধি সেইটি ইউরোপের উপর জয়ী হইবে, না, ইউরোপের যুক্তিতন্ত্র ও ব্যবসাতন্ত্র ভারতীয় কাল্‌চারের আদর্শটিকে বিনষ্ট করিয়া দিবে।

ভারত সভ্য কি না সেইটিই প্রশ্ন নহে। যে আদর্শ ভারতের সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিয়াছে বা প্রাচীন ইউরোপের বৌদ্ধিক (intellectual) আদর্শ বা আধুনিক ইউরোপের জড়তান্ত্রিক (material) আদর্শ—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি মানবীয় কাল্‌চারকে পরিচালিত করিবে? আমাদের জড়জীবনের স্থূল নীতি বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

হইয়া অথবা বড় জোর আধ্যাত্মিকতার একটু ক্ষীণ নিষ্ফল স্পর্শ লইয়াই আত্মা মন ও প্রাণের সুসঙ্গতির ভিত্তি হইবে, না, আত্মার শক্তিই প্রাধান্য লাভ করিয়া মন, বুদ্ধি ও দেহের জীবনকে উচ্চতম সামঞ্জস্য ও সঙ্গতিতে উঠিবার মহত্তর সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করিবে? এইটিই প্রকৃত প্রশ্ন।—ভারতকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে তাহার জাতীয় জীবনের অনুষ্ঠানগুলিকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করিয়া যেন সেগুলি তাহার প্রাচীন আদর্শটিকে অধিকতর শক্তি, নিবিড়ত্ব ও পূর্ণতার সহিত প্রকাশ করিতে পারে; এইরূপে উন্মুক্ত শক্তি ও তেজের তরঙ্গ লইয়া সে আবার জগৎকে পরিক্রমণ করিবে, সুদূর অতীতে যে জগৎকে সে এককালে অধিকার করিয়াছিল অন্ততঃ শিক্ষা দীক্ষার আলোক দিয়াছিল সেখানে এইভাবেই আবার ভারতকে বিজয়ের অভিযান করিতে হইবে। সাময়িক ভাবে যে দ্বন্দ্বই দেখা যাউক না কেন, তাহা পাশ্চাত্যের উচ্চ চিন্তাধারা হইতে যে-সব উৎকৃষ্ট জিনিষ বাহির হইতেছে সেগুলিকে কার্য্যতঃ উঠিতেই সাহায্য করিবে। অতএব তাহা বস্তুতঃ এক উচ্চতর ভূমিতে মিলনের সূত্রপাত করিবে এবং এইভাবেই প্রকৃত ঐক্যের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে।

শ্রীঅনিলবরণ রায়

নিষ্ফলতার আগ্রহ

[প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ]

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী

হিমাদ্রি মেলিয়া বাহু অনন্তের পানে
ছুটে এসে এইখানে থেমে গেছে, সখি,
অকস্মাৎ। কি আগ্রহে, মোর চিত্ত জানে,
শ্যামা বঙ্গ-ভূমি প্রতি রয়েছে নিরখি'।
বহুনিম্নে পদতলে ক্ষীণ স্বচ্ছধারা
নিশ্চপল; অরণ্যানী মসী-বিন্দু-রেখা;
উপত্যকা মুষ্টিমেয়; বনস্পতি চারা;
দিগন্তর কুহেলিতে নাহি যায় দেখা॥

এস এইখানে বসি; আজ শেষবার
ওই হাত হাতে দাও; ওই দুটি আঁখি
রেখো মোর মুখ-পরে; গাঢ় কেশভার
খুলে থাক্; এই মত কিছুক্ষণ থাকি।
তারপরে চিরদিন এ হিমাদ্রি প্রায়
নিষ্ফলে মেলিয়া বাহু চাহিব তোমায়॥

বিচারপতি

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

২

সন্ধ্যা হইয়াছে, শুক্ল পক্ষের সন্ধ্যা, তাই সন্ধ্যার সঙ্গে চাঁদও দেখা দিয়াছে, অন্ধকার নাই। যুবরাজ ছাদে উঠিয়া আসিয়া ডাকিলেন, "শ্রীলতা?"

শ্রীলতা কাপড় তুলিয়া গুছাইতেছিল, এ আহ্বানে সর্ব্ব শরীর মনে চমকিত হইয়া সে বংশীরবমুগ্ধা বিত্রস্ত হরিণীর মতই সাগ্রহে ফিরিয়া দাঁড়াইল, একটা উদ্দাম আনন্দের উন্মত্ত প্লাবন তার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া তীব্র বেগে প্রবাহিত হইয়া চলিয়া গেল। নিগূঢ় আনন্দে সমস্ত মুখ তার রক্ত পদ্মের মতই বিকশিত হইয়া উঠিল।

"এর মধ্যে তুমি কি ক'রে এলে কুমার! আজকেই যে আসতে পারবে সে আমি মনেই করতে পারিনি! ওঃ কিরকম মনটা খারাপ হয়ে গেছলো! এতদিন পরেও ফিরে কবে না কবে দেখা হবে তাই ভাবছিলুম!"

শ্রীলতার এই আনন্দ-সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে রাজকুমার রাজ্যপাল তার দিকে হাস্যস্মিত মুখে কয়েক পদ অগ্রসর হইতে হইতে প্রসন্নকণ্ঠে কহিল—

"এতদিন পরে জীবন মরণের সন্ধি-পথ থেকে ফিরে তোমার কাছে ছুটে আসা কি তোমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে শ্রীলতা? আমার তো সেইখান থেকেই, সেই মৃত্যু-ভীষণ জীবন-আহবের যজ্ঞকুণ্ড থেকেই কতবার ছুটে তোমার কাছে পালিয়ে আসতে ইচ্ছে হয়েছে! কিন্তু সে কথা যাক্, কি সুন্দর তোমায় তখন দেখাচ্ছিল! আমার চোখ দুটোকে কিছুতে আর টেনে ফেরাতেই পারিনে। অথচ এম্নি দুষ্টু, ঐ সুপ্রতীক, ছুটে চ'লে গেল।"

শ্রীলতা এই প্রশংসাবাক্যে ঈষৎ সলজ্জ হইয়া একান্ত উন্মুখ তার ব্যগ্রদৃষ্টি যুবরাজের মুখের উপর হইতে ক্ষণেকের জন্য নামাইয়া লইল, তথাপি কৌতূহলীচিত্ত তার এ লজ্জাকে প্রশ্রয় দিতে সায় দিল না, পরক্ষণেই উদ্দীপ্ত আগ্রহে সুবৃহৎ কৃষ্ণতারকোজ্জ্বল আশ্চর্য্য চক্ষু দুইটা উঠাইয়া লজ্জাস্মিত আরক্তমুখে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল,

"কখন?"

যুবরাজ মুগ্ধ বিহ্বলনেত্রে অপূর্ব্ব সুন্দরী শ্রীলতার আরক্ত সুন্দর মুখের অভিনব সৌন্দর্য্য সমাবেশ দর্শন করিতেছিল, দেখিতে দেখিতে তার তরুণ চিত্ত যেন সেই সৌন্দর্য্য সাগরে তলাইয়া গেল। সে ক্ষণকাল নিরুত্তর স্পন্দহীন থাকিয়া শুধু তাহাকে দেখিল, তার পর যেন সমধিক সলজ্জ-স্মিতমুখে আরও একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া শ্রীলতার অত্যন্ত নিকটস্থ হইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,

"তুমি যখন আমারগলায় এই মালা পরিয়ে দিয়েছিলে সেই সময়! বাস্তবিক তুমি রাজরাজেশ্বরী হ'বারই যোগ্য শ্রীলতা!"

শ্রীলতার ক্ষুদ্র বক্ষ উদ্বেলিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস সহসাই উঠিয়া আসিল, তার সস্মিত মুখের ছবি সহসাই ম্লানিমা-বিরস হইয়া আসিল, সে তার সদ্য ফোটা পদ্মের পাপড়ীর মতই ঢল ঢল চোখের দৃষ্টি পুনশ্চ নত করিয়া ফেলিয়া শুধু শিথিল স্বরে কহিল,

"যাও—"

রাজ্যপাল মৃদু হাসিল।

"যাচ্ছি দাঁড়াওনা, একটা কথা আছে, আগে ব'লে নিই। শোন শ্রীলতা! এই যে মালা তুমি আমায় আজ দান করেচ, এই দেখ আমার গলায় তা' এখনও রয়েচে, এ কিন্তু তোমার ঠিক হয়নি, এতে একটা মস্ত বড় ভুল রয়ে গেছে। তাই আমি তোমায় তাড়াতাড়ি সেই কথাটাই বলতে এসেছি, নৈলে আজ কি আর আসবার সময় আছে? এখনই আমার ফিরে যেতে হবে।—"

শ্রীলতা ঈষৎ বিস্মিত ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া মুখ তুলিয়া সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,

"ভুল আছে?— কি ভুল যুবরাজ?"

রাজ্যপাল মৃদুমন্দ হাসিতেছিল, তেমনই হাসিমুখেই গলার মালা খুলিয়া তাহা হাতে দোলাইয়া উত্তর করিল,

"এ মালা তুমি লালপদ্মের কুঁড়ি দিয়ে গেঁথেছ, এ মেয়ে-মানুষের পরবার, পুরুষের হ'লে সাদা হতো, তা'ও জানো না বোকা!"

শ্রীলতা এইবার হাসিয়া ফেলিল, তারপর তার ফুলশরবৎ অতিসূক্ষ্ম চিত্রাঙ্কিতবৎ ভ্রূযুগল ঊর্দ্ধে টানিয়া কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আহাগো! বড্ড তো পণ্ডিত মশাই! কে বল্লে যে লালপদ্ম পুরুষের পরতে নেই?"

কুমার কহিল, "পুরুষে কি সিঁদুর পরে?"

শ্রীলতা মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, "না।"

"আলতা পরে?"

শ্রীলতা হাসিয়া কহিল,—"যাঃ"—

রাজ্যপাল পুনশ্চ প্রশ্ন করিতে ছাড়িল না, এইবার প্রশ্ন করিল, "লাল সাড়ী?"

শ্রীলতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "আহা, তা' পরলে যা' দেখাত, যেন জহ্লাদ!"

যুবরাজ কহিল, "তবে?"

শ্রীলতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি তবে?"

"লাল মালাই বা পরবে কেন?—"

শ্রীলতা তার স্বপক্ষীয় অপর কোন যুক্তি খুঁজিয়া না পাইয়া রাগ করিয়া জবাব দিল—

"না পরে নাই পরবে, ফেলে দিলেই তো হয়, কেউতো বারণ করেনি।"

রাজ্যপাল হাসিয়া কহিল, "তাই তো ফেলে দিতেই এসেছি, যার জিনিষ তাকে না জানিয়ে তো আর ফেলে দেওয়া যায় না; এই নাও তোমার মালা তোমাকেই ফিরিয়ে দিলুম।"—

এই বলিয়াই যুবরাজ রাজ্যপাল সহসা কাছে আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজের গলা হইতে খোলা সেই পদ্মমালা শ্রীলতার গলায় ফেলিয়া দিয়াই শ্রীলতার দু'খানা হাত দুইহাতে ধরিলেন, "শ্রীলতা! তুমি আমার মালা পরিয়ে দিয়েছিলে, আমিও আমার গলার মালা তোমায় পরিয়ে দিলুম।"

ছাদের সিঁড়ি হইতে কে ডাকিল, "শ্রীলতা—"

শ্রীলতা চমকিয়া যুবরাজের হাত হইতে নিজের হাত টানিয়া লইল, কুমারও ত্রস্তভাবে তখনই তার হাত ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া গেলেন।

মাতা ডাকিলেন, "শ্রীযুবরাজ ভট্টারককে নিয়ে নেমে আয়, ইনি আহ্নিকে বসবেন, তার পূর্ব্বে তাঁকে দেব-নির্ম্মাল্য দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবেন।"

শ্রীলতা তার লজ্জা-বিজড়িত চকিত কটাক্ষে বারেক রাজপুত্রের আনন্দোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়াই দ্রুতপদে অগ্রসর হইল, তাহাকে অনুসরণ করিয়া সুখস্মিত মুখে রাজ্যপাল নীচে নামিয়া সকলকে শুনাইয়া বলিল,—"যদি দেবার ইচ্ছা থাকে সাদা পদ্মের মালা গেঁথে রেখ, কাল এসে নিয়ে যাব।"

আচার্য্য-গৃহিণী সম্মুখে আসিয়া সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েচে বাবা?"

রাজ্যপাল শ্রীলতার গলার মালা দেখাইয়া দিয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিলেন, "দেখুন না একগাছা রাঙা পদ্মের মালা দিয়ে আমায় সং সাজান হ'য়েছে; হাঁগা মা! পুরুষে কখন লাল পদ্মের মালা পরে? তাই ওর মালা আমি ওকে ফেরৎ দিতে এসেছি।"

আচার্য্য-গৃহিণী সস্নেহ হাস্যের সহিত কুমারের কুমার-প্রতিম মুখের দিকে চাহিলেন, স্নেহমধুর কণ্ঠে কহিলেন, "তোমায় আমরা আর কি দোব বাবা, বিদুরের খুদে নারায়ণ তৃপ্ত হন, তাই দিতে যাওয়া,—নৈলে—"

রাজকুমার অসহিষ্ণুতায় মাথা নাড়িয়া বাধা দিল, "কেন পুকুরে কি আর সাদাপদ্ম ফোটে না? শ্রীলতা! কাল যেন এসে সাদাপদ্মর মালা পাই,—কই পণ্ডিত মশাই কোথায়?—"

গুরুপত্নীর পদবন্দনা করিয়া শ্রীলতার মুখের উপর বারেক কোমল কটাক্ষে চাহিয়া হাসিমুখে রাজ্যপাল চলিয়া গেল, কিন্তু বেশীদূর না গিয়াই আবার সে ফিরিয়া আসিল,—"হাাঁ, মা! আপনার সঙ্গে আমার একটা ঝগড়া আছে, আচ্ছা, আপনি আমায় তখন যুবরাজ ভট্টারক বল্লেন কি বলে?"

আচার্য্য-পত্নী ইচ্ছাদেবী এই স্নেহের অনুযোগে স্নেহ-স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত সন্ত্রমে উত্তর করিলেন,—"কিছু তো অন্যায় বলিনি বাবা, তুমি এখন বড় হ'য়েছ, কলিঙ্গ-বিজয়ী মহাবীর-তোমার পদোচিত মর্য্যাদা সকলেই যে দেখাতে বাধ্য।"

রাজ্যপাল ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—"বেশ! মাকে গিয়ে বলিগে তিনিও এবার থেকে আমায় যেন আর 'রাজু' না বলে 'যুবরাজ ভট্টারক' বলতে আরম্ভ করেন! কেন তিনিই বা বাদ যাবেন কেন?"

ইচ্ছাদেবী হাসিয়া ফেলিলেন, গভীর স্নেহের সহিত কাছে আসিয়া তাহার বাহু স্পর্শ করিয়া স্থির স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "দীর্ঘজীবী হ'য়ে পিতৃসিংহাসনের গৌরব বর্দ্ধিত করো।"

রাজ্যপাল বিদায় লইলেন। পুঁথিপাঠরত স্বামীর নিকট বসিয়া ইচ্ছাদেবী ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন, "দেখ, কুমারের ব্যবহার আমার কিন্তু ভাল ঠেকচে না।"

সুদেব বিস্ময়ের সহিত মুখ তুলিলেন, "যুবরাজের? কেন, অতি অমায়িক ব্যবহার তো!"

ইচ্ছাদেবী ঈষৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "সে কথা নয়, শ্রীর সম্বন্ধেও ব্যবহার আমার যেন কেমন কেমন লাগলো।"

সুদেব হাসিয়া কহিলেন, "একসঙ্গে ছোটবেলা থেকে মেলামেশা করে এসেছে, তাই ভগ্নীর মতই ব্যবহার, এতে দুষ্ট কি দেখলে? যুবরাজ অতি সচ্চরিত্র!"

ইচ্ছাদেবী স্বামীর এই সরল যুক্তি প্রদর্শনের পর নিজের অন্তরজাত অতি সন্দেহের ক্ষুদ্র অঙ্কুরটিকে প্রকাশ করিতে ঈষৎ কুণ্ঠিত হইলেন, তথাপি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কি ভাবিয়া লইয়া আবার কহিলেন,—"সে ত সবই আমি জানি, কিন্তু আর তো এখন ওরা দুটি বালক বালিকা নেই, আজকার কাণ্ডে আমি একটু ভয় পেয়েছি।" বলিয়া শ্রীলতার মাল্যদানের কাহিনী জানাইয়া কহিলেন, "তখন আমারও কিছু মনে হয়নি, কিন্তু বাড়ী ফিরেই তাড়াতাড়ি তার এর কাছে ছুটে আসা, সেই মালা আবার নিজের গলা থেকে খুলে নিয়ে ওকে পরিয়ে দেওয়া, এইগুলো কি ভাল বোধ করচো? নবীন জীবন, রক্ত গরম, কি হ'তে কি হ'য়ে ওঠে বলাতো যায় না কিছুই তুমি এইবেলা বর খুঁজে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও, আর একটুও দেরি করা নয় যদি সম্ভব হয় তো আমি আর দু'দিনও দেরি করতে ইচ্ছা করিনে।"

সুদেবভট্ট স্ত্রীর ব্যগ্রতায় ও কথিত কাহিনীতে ঈষৎ বিমনা হইয়া রহিলেন, তারপর তাঁর ব্রাহ্মণোচিত উদারতার বশে ইহার ভাল দিকটাকেই গ্রহণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "কি যে বল! না না, রাজকুমার অতি নির্ম্মলবুদ্ধি, তিনি অপ্রাপ্য বস্তুতে কখনই লোভ করবেন না—এ তাঁর স্বভাবজাত স্নেহপ্রবণতা মাত্র। আচ্ছা, আমি শীঘ্রই পাত্রান্বেষণ করচি। তবে যদি নিতান্তই তোমার মন স্থির না হয়, শ্রীলতাকে তুমি একটু ইঙ্গিতে একটু সাবধান করে দিও, যদিই তোমার মনে কোন দ্বিধা এসে থাকে, তবে আমার বিশ্বাস, ও তোমার সংশয় মাত্র। যাকে শাস্ত্রে বলে থাকে, রজ্জুতে সর্প ভ্রম।"

ইচ্ছাদেবী একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক বিমনাভাবে কহিলেন, "তাই হোক! সর্পে যেন রজ্জুভ্রম ক'রে সর্ব্বনাশ ডেকে আনি না। বয়স্থা মেয়ে ঘরে রেখে তুমি পুঁথির মধ্যে ডুবে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ, আমার কিন্তু দুর্ভাবনার আর অন্ত নেই। আবার তাতে দিন দিন যেন অতুলন্ত রূপের বোঝা ওই মেয়েটার অঙ্গেই চাপিয়ে দিচ্চেন ভগবান্। ওর দিকে চোখ মেলে খানিকক্ষণ যেন চেয়ে থাকাই যায় না—তাই না অত ভয় করে।"

আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ইচ্ছাদেবী উঠিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

নতুন মানুষ

—গল্প-

-শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

আর যাহাই হোক্ মেজ ছেলেটার পড়াশুনায় চাড় খুব। চায়ের পর্ব্ব সারিয়াই হাতে ঘড়ি বাঁধিয়া সাইকেল লইয়া বাহির হইল। এই রকম রোজ সকালে বন্ধুদের বাড়ী ঘুরিয়া কলেজের নোট সংগ্রহ করিতে হয়। বন্ধুচক্রের পরিধিও কম নয়—টালিগঞ্জ বেহালা ইস্তক। ফিরিতে এগারোটা বাজিয়া যায়। ইহাতেও বোধ করি সময়ে কুলাইয়া উঠে না। তাই ইদানীং মায়ের কাছে একটা মোটর সাইকেলের ফরমায়েস হইয়াছে। কোথায় নাকি একটা আনকোরা নূতন গাড়ী একেবারে জলের দামে বিক্রী হইয়া যাইতেছে।

এমন সুবিধাটা হাতছাড়া হইয়া যায়-যায় তাই আজ চায়ের টেবিলে গিন্নি গিরিজানাথকে বড় ধরিয়া বসিয়াছেন। গিরিজা বাড়ীর কর্ত্তা বটে কিন্তু সংসারের কাজে তাহাকে বড় দরকার পড়ে না, মায়ে ছেলেয় মিলিয়া খাসা কাজ কর্ম্ম চালাইয়া যায়। কিন্তু এই ব্যাপারটা একটু স্বতন্ত্র। ব্যাঙ্কের হিসাবে কিম্বা জানাশুনা কোথাও কিছু জমা নাই, অথচ আবশ্যক মাত্রই টাকা বাহির করিয়া দেওয়া—ইহার অত্যাশ্চর্য্য কৌশলটি কেবলমাত্র গিরিজার জানা আছে। সেইজন্যই কেবল মধ্যে মধ্যে গিরিজার আবশ্যক হয়।

কিন্তু গিরিজা ক্রমাগত আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিতেছিল—সুমতি, তোমার ছেলে বুঝবে না তা জানি, কারণ তার বাবা বড়লোক। কিন্তু আমি গরীবের ছেলে ছিলুম বলে' এত ইতস্ততঃ করি। পায়ে হাত দিতে বলিনে, তবু শ্রীমানকে একবার তাকিয়ে দেখতে বোলো তার বাপের পায়ে এখনো কতগুলো কাঁটা খোঁচায় দাগ আছে। নীলগঞ্জের স্কুল মামার বাড়ী থেকে দুই ক্রোশের কম হবে না; আমিত স্বচ্ছন্দে এই পা দু'খানা সম্বল করে' দশ বছর চালিয়ে দিইছি—

সুমতি বাধা দিয়া বলিলেন—তা' ব'লে এই সকাল বেলা তোমার সেই সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনতে চাচ্ছিনে।—

ইহারা কেহই তাহার সে ইতিহাস শুনিতে চায় না। গিরিজার বয়স চল্লিশের কোঠা পার হইয়া গেছে। এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে আনন্দ ও অশ্রুজলে সিক্ত জীবনের কতকগুলি দিন হেলা-ফেলায় ছড়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছে। এখন বার্দ্ধক্যের সীমায় আসিয়া মুখ ফিরাইয়া তাহাদের হয়ত মাঝে মাঝে দেখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু নিজের ভালো লাগে বলিয়া যাহাদের সে বয়স নয় তাহাদের ভালো লাগিবে কেন? তার উপর কাহিনীটা একেবারেই ঘরে ঘরে যে রকম ঘটিয়া থাকে, তাই—

অর্থাৎ কচি ছেলে ও বিধবাকে রাখিয়া গিরিজার বাবা মারা গেলেন—দয়া করিয়া কোন অবিবাহিতা মেয়ে রাখিয়া যান নাই। দেনায় ভিটা বিক্রী হইল। গিরিজার মা ছেলে লইয়া ভুবন-ডাঙার ভাইয়ের বাড়ী উঠিলেন। ভাই সীতানাথ বাবুর বাড়ী গোমস্তাগিরি করিতেন। সীতানাথ ঐ গ্রামেরই—গ্রাম সুবাদে ওঁদের সকলের দাদা, অবস্থা ভালো, মানে চারি গোলা ধান, ক্ষেত-খামার ও মোটা সুদে টাকা দাদনের কারবার। গিরিজার মামার মাহিনা ছিল মাসিক তিন টাকা, কিন্তু কি বুধবারে কামিনীপুরে যে হাট বসিত তাহাতে কেবল মাছই কিনিতেন তিন টাকার কম নয়। গিরিজা দুইক্রোশ দূরের নীলগঞ্জের বড় স্কুলে পড়িত। শীতকালে আসন্ন সন্ধ্যায় স্কুল হইতে ফিরিবার পথে খেজুর গাছের মাথায় চড়িয়া ভাঁড়ের মধ্যে পাঁকাটি দিয়া খেজুর-রস চুরি করিয়া খাইত। খাল সাঁতরাইয়া পার হইয়া চরের ক্ষেতের মটরশুঁটি আনিয়া ইচ্ছামত

ভোগ বিতরণ করিত। স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতমহাশয় 'নর'শব্দের রূপ খাতায় পাঁচবার লিখিতে হুকুম দিয়া টেবিলে মাথা ফেলাইয়া নাকডাকা সুর করিতেন, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ঘণ্টার মধ্যে পাঁচবার লেখা সারা করিয়া কেহ যে তাঁহাকে দেখাইতে আসিবে এমন সম্ভাবনা ছিল না, অতএব নিদ্রাটা বেশ নিরুপদ্রবেই ঘটিত। কিন্তু গিরিজা বাধাইত মুস্কিল, সে শব্দরূপ ত লিখিতই না—স্কুলের বেড়া হইতে ভাঁটফুল তুলিয়া আনিয়া তাঁহার টিকিতে বাঁধিবার ব্যবস্থা করিত। এমনি করিয়া তাহার বয়স লেখাপড়া দুটাই বাড়িয়া চলিল এবং একদা সমস্ত গ্রামটিকে সচকিত করিয়া সে পাশ করিয়া ফেলিল তৃতীয় বিভাগে।

সুমতিদের এত সব পুরানো কথা শুনিতে ভালো লাগে না। ছোট মেয়ে মিনা টেরিয়ার কুকুরটাকে টানিয়া লইয়া বিস্কুট খাওয়াইতে বসিল। বাবুর্চ্চি পা টিপিয়া একবার ওধারের ঘরের পর্দ্দা তুলিয়া সার্সির ফাঁকে দেখিল, তারপরে ম্লানমুখে ফিরিয়া গেল। ওর এক ভাই দশটার গাড়ীতে দেশে যাইবে, তাহাকে কটা কথা বলিয়া দিতে একবার বাসায় যাওয়ার দরকার। সুমতির নিকট হইতে ছুটিও লইয়াছে। কিন্তু মুস্কিল বাধিয়াছে এই, বড়দাদা বাবু এখনও উঠেন নাই। এতক্ষণে শয্যাত্যাগ করিবার কথা, কিন্তু কাল বোধ হয় থিয়েটার দেখিয়া ফিরিতে একটু বেশী রাত হইয়া গিয়াছিল। চোখ খুলিবার সাথে সাথে চা তাঁহার চাই-ই।—

সুমতি গিরিজাকে অভয় দিয়া বলিতেছিলেন—কিছু নয়, শ' তিনেক টাকাতেই হ'য়ে যাবে—তুমি ওটা দিয়ে দাও গে, ছেলেটা যখন ধরেছে—

ছেলেটা না হোক, ছেলের মা যখন ধরিয়াছেন তখন দিতেই হইবে—গিরিজা জানিত। আপাততঃ পলায়ন করিবার প্রয়োজন। বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা-হরসুখলালের সাথে অফিসের একটা হিসাব মিটাতে হবে—আমি ও ঘরে চললুম; আর দেখ, হিসাবটা বড় জরুরী, কেউ যেন ওখানে গিয়ে গোলমাল না করে—এটা হ'য়ে গেলে হরসুখের কাছ থেকে কিছু মিলতেও পারে।—

সুমতি ও কথায় বিশেষ মনোযোগ না করিয়া বলিলেন—কিন্তু, এত সস্তায় ছাড়ছে, বেশীদিন ত প'ড়ে থাকবে না! টাকাটা তুমি দিচ্ছ কবে?—কাল? আচ্ছা, শনিবার অবধি না হয়, ব'লে ক'য়ে রাখা যাবে। ওরি ভেতর দিয়ে দিও, কেমন?—

গিরিজা পলায়ন করিল এবং প্রত্যুত্তরে একটা কিছু বলিয়াও গেল। সে শব্দটা হাঁ কিম্বা না যেটা খুসী হইতে পারে।

বসিবার ঘরের টেবিলের উপর একখানা অমৃতবাজার পত্রিকা ও একগাদা চিঠি। সবগুলির উপরেই নানা ফার্মের নাম ছাপান আছে, অতএব ভিতরের বৃত্তান্ত না খুলিয়াও বলা চলে। কেবল একখানিতে সে সব কিছু নাই। গিরিজা খুলিয়া দেখে, মনোরমা লিখিয়াছে।

মেয়েলী হাতের গোটা গোটা অক্ষর, কাটাকুটি ও বানান ভুলের অন্ত নাই। মুসাবিদা যাহারই হোক, হরফগুলি সেই মনোরমার আদি ও অকৃত্রিম। কিন্তু ইংরাজীতে বাহিরের ঠিকানা লিখিয়াছেন বোধ করি, নীলমণি—মনোরমার স্বামী।

অসংখ্য প্রণতি পুরঃসর নিবেদন করিয়াছে—দাদা, এই গরীব ভগ্নীটিকে বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছেন। মনোরমা বলিয়া যদি চিনিতে না পারেন, ঘোষেদের পুঁটির কথা বোধহয় মনে পড়িবে। আজ তিন বৎসর হইল পিতাঠাকুরমহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।—

এই মনোরমা ভুবন-ডাঙার সীতানাথ বাবুর মেয়ে-গিরিজার মামা যাহার চাকরী করিতেন। সীতানাথ মারা গিয়াছেন। পাকাদাড়ি, মাথায় টাক—তিনি গিরিজাকে বড় ভালবাসিতেন। পাশের খবর বাহির হইলে নিমন্ত্রণ করিয়া পুকুর হইতে মাছ ধরাইয়া কাতলা মাছের মস্ত মাথাটা তাহার পাতে দিয়াছিলেন। আর

আদর-আপ্যায়ন যে কত, যেন ভূ-ভারতে এণ্ট্রান্স পাশ আর কেহ করে নাই!

—পিতাঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে যে কি দুর্দ্দিন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আর কি লিখিব। গত বৎসর বন্যায় চিতলমারীর বাঁধাল ভাসিয়া যায়, ফলে ধানের একচিটাও গোলায় উঠে নাই। আগের বৎসরের যাহা ছিল তাহাতে কোন গতিকে সংসার চলিতেছে। আপনকার ভগ্নীপতিকে কতদিন হইতে সকলে মিলিয়া বলিতেছি যে ভদ্রলোকের ছেলের চাষবাস করিয়া পোষায় না, কলিকাতায় গিয়া চাকরী বাকরী কর, কিন্তু এমন অবুঝ মানুষ কখনও দেখি নাই। দুঃখের কথা আর কি লিখিব, মেঝ খোকা ও ছোট খুকী আজ তিন মাসের বেশী ভুগিয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে, গঞ্জের ডাক্তার ডাকিয়া যে তাহাদের একবার দেখাইব এমন পয়সা নাই। অবশেষে উনি রাজী হইয়াছেন। জোত জমি মোড়লদের সহিত ভাগ-বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া উনি আপনার কাছে যাইতেছেন, অতি সত্বর একটা চাকরী ঠিক করিয়া দিবেন, অন্যথা না হয়। শুনিলাম, আপনি খুব বড় একটা আফিসের বড়বাবু—সাহেবেরা আপনার মুঠোর মধ্যে। যেমন করিয়া পারেন, আপনার আফিসে উঁহাকে ঢুকাইয়া লইবেন। ও বাড়ীর সকলে কেমন আছেন তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।—প্রণতা

শ্রীমনোরমা দাসী

পুনশ্চ করিয়া লিখিয়াছে,—আগামী পরশ সোমবার সকালেই উনি আপনার বাসায় পৌছিবেন। অবিলম্বে একটা চাকরীর যোগাড় করিয়া না দিলে আমি তিনটি ছেলেমেয়ে লইয়া ভিটায় শুকাইয়া মরিব, আর উপায় নাই।

অর্থাৎ নীলমণি আসিতেছেন। এবং যদি বাড়ী হইতে বাহির হইবার পথে হাঁচি-টিকটিকির কোন উপদ্রব না ঘটিয়া থাকে, মেঝ খোকা ও ছোট খুকী নূতন কোন গোলযোগ বাধাইয়া না বসে, তাহা হইলে মেলগাড়ীতে সারারাত্রি জাগিয়া চোখ লাল ও গুঁড়া কয়লায় সর্ব্বাঙ্গ বোঝাই করিয়া এখনই এই বাড়ীতে দর্শন দিবেন।

মনোরমা লিখিয়াছে, অতি সত্বর চাকরী খুঁজিয়া দিতে হইবে। ওরা ভাবে,—পাড়াগাঁয়ের পুকুর ঘাটে এখানে-সেখানে যেমন কলমী-শালুক ফুটিয়া থাকে, কলিকাতা শহরের অলি-গলি হইতে চাকরী খুঁজিয়া লইতে পারিলেই হইল। এবং একবার একটা চাকরী জুটাইয়া লইলেই সুখ-সমৃদ্ধির আর অন্ত নাই। গিরিজার মনে পড়িয়া গেল, আজকালের মধ্যেই তার আফিসের হেড ক্লার্ক বাবু তিন মাসের লম্বা ছুটি লইয়া শরীর মেরামত করিতে পশ্চিমে যাইতেছেন। সেকেণ্ড ক্লার্ক তাঁর জায়গায় কাজ করিবেন। তাহা হইলে মাস তিনেকের জন্য আপাততঃ নীলমণিকে ঢুকাইয়া লওয়া যায়।

নীলমণির কপাল ভালো এবং গিরিজারও। কারণ, চাকরী না হইলে কতদিন যে এই বাসায় পড়িয়া অন্ন ধ্বংস করিত তা বলা যায় না। পুঁটির স্বামীকে ত তাড়াইয়া দেওয়া যায় না!

পুঁটির নাম করিলেই কেন জানি না গিরিজার মনে আসে, মাসিকপত্রে কবে একটা ছবি দেখিয়াছিল যে একটা লাউয়ের দু'টা ঠ্যাং গজাইয়াছে—সেই ছবির কথা। লাউটি যেন গুটি গুটি পা ফেলিয়া তাহার মামার নটে'র ক্ষেতে শাক তুলিয়া বেড়াইত। কিন্তু আজ আর সে পুঁটি নাই—মনোরমা হইয়াছে, এবং তিনটি ছেলেমেয়ের মা!

ঘরটা কেমন আঁধার আঁধার ঠেকিতেছিল, উঠিয়া পূবের জানালাটা খুলিয়া দিল। সামনে একটা চারতলা বাড়ী দৃষ্টিটাকে আড়াল করিয়া খাড়া রহিয়াছে। বাড়ীর পাশ দিয়া সরু গলি। গলির আগায় একটুখানি ফাঁকা জমি, তাহাতে কয়টা নারিকেল গাছ। সকালের আলোয় গাছের পাতাগুলি ঝিলমিল করিয়া নড়িতেছে।

অনেকদিন—পুঁটির বিয়ের পর গিরিজা আর মামার বাড়ী যায় নাই। তারপর বয়স কতখানি গড়াইয়া গিয়াছে—পুঁটিরও গিয়াছে। গিরিজা হালকা লোক নয়, ইদানীং কাজ কর্ম্ম করিয়াই সময় পায় না, কলিকাতার বাহিরে যে জীবজগৎ আছে এবং তাহার সাথে ঐ জগতের একদিন যে নিবিড় পরিচয় ছিল, তাহা প্রায়ই ভুলিয়া বসিয়া থাকে। তবু পুঁটির সব কথা স্পষ্ট মনে পড়িল। সেই যে শ্যামল

ছোট মেয়েটা রুক্ষ চুলের বোঝা, কস্তাপেড়ে সাড়ীর আঁচল এবং কালো ডাগর চোখ নাচাইয়া যেখানে সেখানে পাড়াময় ঘুরিয়া বেড়াইত,—সে আজ গৃহিণী হইয়াছে, বড় কলসী কাঁখে করিয়া দীঘির ঘাটে জল আনিতে যায়, ধান ভানে, ছেলেমেয়ের খবরদারী করে, বড় জ্বালাতন হইলে ছেলে ঠেঙাইয়া আবার নিজেই কাঁদিতে বসে, কোন্দল করে, সারারাত জাগিয়া রোগা ছোট মেয়েটিকে বাতাস করে—এবং সেই পুঁটি আজ লিখিয়াছে গিরিজা চাকরীর যোগাড় করিয়া না দিলে তাহারা ভিটায় শুকাইয়া মরিবে।

নীচে বাথরুমের কাছে অকস্মাৎ ভয়ানক রকমের চীৎকারের সুরু হইল, অর্থাৎ এতক্ষণে বড় ছেলের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। আশ্চর্য্য নয়, রামায়ণে লেখা আছে—কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গিলে নাকি ত্রিভুবন শুদ্ধ কাঁপিত।

আর ভুবন-ডাঙ্গায় এখন হয়ত গোবরে নিকানো কাঁচা দাওয়ার উপর চাটাই পাতিয়া বসিয়া মনোরমার ছেলে দুলিয়া দুলিয়া পড়া মুখস্থ করিতেছে, ঘুনশীতে বাঁধা গলার একরাশ নানা আকারের মাদুলী সাথে সাথে দুলিতেছে। মনোরমা খালের ঘাটে সেই বাঁকা তালগাছটার গুঁড়িতে বসিয়া মাজন নিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া কড়াই মাজিতেছে। তালগাছটা এতদিন কি বাঁচিয়া আছে?—কবে উপড়াইয়া খালে পড়িয়া গেছে, তার ঠিক নাই। একদিন কচি তাল কাটিতে গিয়া ঐ গাছের বাগুড়ায় পা হড়কাইয়া গিরিজা পড়িয়া গিয়াছিল। খালের জলে পড়িয়াছিল বলিয়া লাগে নাই; কিন্তু পুঁটি বাড়ীতে তার মাকে বলিয়া দিয়া মার খাওয়াইয়াছিল। নীলমণিকে চাকরী করিয়া দিতেই হইবে। পুঁটি লিখিয়াছে, পুঁটি তাহার পর নয়। ঐ পুঁটির সাথে একটা বড় সম্পর্ক ঘটিতে ঘটিতে বড় বাঁচিয়া গিয়াছে। সেটা গিরিজার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

গিরিজার পাশের খবর আসিল এবং সীতানাথ নিমন্ত্রণ করিয়া কাতলা মাছের মুড়া খাওয়াইলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় মামা মায়ের সাথে তার বিয়ের কথা বলিতেছেন নিজের বিয়ের প্রসঙ্গ কেনা শুনিতে চায়?—গিরিজাও চুরি করিয়া শুনিল। সীতানাথ বাবু বড় ধরিয়াছেন, তাঁহার ছেলে নাই, ভিটায় প্রদীপ জ্বলিবে না সেই আশঙ্কায় পুঁটিকে গিরিজার হাতে সমর্পণ করিয়া তাকে ঘর জামাই করিয়া রাখিতে চা'ন। মামা সীতানাথের নানাবিধ আয়ের বিস্তৃত ফিরিস্তি দিয়া গিরিজা যে কতদূর সুখে থাকিবে উৎফুল্ল মুখে তাহার পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন। ম্লান দীপালোকে মায়ের মুখভাবটা ঠিক ঠাহর হইতেছিল না, তিনিও বোধ করি বিমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন। কিন্তু সে যে ঘরজামাই হইবে, এবং পুঁটি তাহার বউ হইবে, কোনটাই গিরিজার ভালো লাগিল না। আলো জ্বালাইয়া ঢোল ও সানাই বাজাইয়া, পাল্কী চড়িয়া, ক্রোশের পর ক্রোশ মাঠ, বাঁওড়, ধানের ক্ষেত ও বাঁশ বাগান পার হইয়া এক নূতন গ্রামে যাইবে, তারপর শুভদৃষ্টির কালে একখানি খাসা টুকটুকে মুখ দেখিবে, যাহাকে সে আর কোনদিন দেখে নাই। সে কেমন মজা! আর এই পুঁটি লাল চেলীতে সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া জবুথবু হইয়া তাহার পাশে দাঁড়াইবে একথা ভাবিতেই হাসি পায়। ও ভাবে পুঁটিকে মোটেই মানায় না।

পরদিন সকালবেলা রথখোলার গাছে চড়িয়া সে জামরুল খাইতেছিল, দেখিল পুঁটি চলিয়াছে। ডাকিল—এই দাঁড়া। পুঁটি চলিতে চলিতে কহিল—না, এখন অনেক কাজ, আজ যে আমার ছেলের সাথে পটলীর মেয়ের বিয়ে। কালাদা'র কাছে যাচ্ছি, কলার খোলার পাল্কী ক'রে দেবে বলেছে—ও গিরিদা, দুটো ভালো জামরুল ছুঁড়ে দাও না—বলিয়া পুঁটি লোলুপ চোখে গাছটির দিকে চাহিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

গিরিজা ভাবীবধূর সাথে প্রেম সম্ভাষণ সুরু করিল—তোকে ছাই দেবো মুখপুড়ী, দাঁড়াতে বল্‌লাম্ তা নয় কল্‌কলিয়ে চল্লো কালার কাছে। যাক্ না এই ক'টা মাস—আসুক অঘ্রাণ, তারপরে দেখে নেবো। তখন কালার কাছে গেলে ধর্‌বো চুলের মুঠি—বলিয়া সে ঝপ্‌ঝপ্ করিয়া নামিয়া আসিল।

পুঁটি রাগিয়া বলিল—সকালবেলা গাল-মন্দ কোরো না বলছি ; জেঠিমাকে যদি না ব'লে দিই—

গিরিজা নিরুদ্বেগ কণ্ঠে কহিল—বল্‌গে যা। তা'তে আর কিছু হচ্ছে না, মণি। বাড়ীতে শুনে দেখিস্—তোর সাথে আমার বিয়ে। আগে হয়ে যাক, মজাটা টের পাবি। তখন কথার উপর জবাব করলে পিঠের উপর তিন কিল।—বলিয়া শূন্যে মুষ্টি সঞ্চালন করিল।

এইরূপ নিদারুণ সম্ভাবনার কথা শুনিয়া পুঁটির মুখখানা কেমন হইয়া গেল, যেন আর ঝগড়া করিতে জোর পাইল না। তবু অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মুখ ঘুরাইয়া বলিল—ধোৎ।

—সত্যি কিনা বুঝ্‌তে পার্‌বি তখন। নে—নে—আর দেমাক ক'রে চলে যায় না, এই ক'টা নিয়ে যা—বলিয়া তাহার হাতে কয়েকটা জামরুল দিল। কিন্তু পুঁটি লইল না, ফেলিয়া দিয়া গেল।

গিরিজা ভাবিল, বিবাহ করিলে পুঁটিটাকে কিন্তু খুব জব্দ করা যায়। সেদিন ঘুঁড়িটাকে একটু ধরিয়া দিতে বলিয়াছিল, তা মুখের উপর না—বলিয়া চলিয়া গেল। আর একদিন পুঁটির মার তাস চুরি করিয়া ঢেঁকিশালে বসিয়া কয়জনে খেলিতেছিল। একখানা পঞ্জা হয়-হয়, আর সেই সময়ে কিনা পুঁটি মাকে ডাকিয়া আনিয়া বকুনি খাওয়াইয়া তাস কাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল! কিন্তু বউ হইলে এ সকল চলিবে না, তখন গিরিজা যা বলে তাই করিতে হইবে এবং যাহারই কাছে নালিশ করুক গিরিজাই হইবে হাইকোর্ট। আর তখন পুঁটিদের দক্ষিণের ঘরে তক্তাপোষের উপর বসিয়া সকলের সামনে সমস্ত দিন শাশুড়ীর ঐ তাস লইয়া সে বিস্তি খেলা করিবে, তবে ছাড়িবে।

কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে সুপারি কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া ক'নের বাজু কণ্ঠমালা সমস্তই গড়ানো মজুত, তবু বিবাহ হইল না! নূতন ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, আগের দিন সীতানাথের স্ত্রী আসন্ন শুভকার্যের খরচের জন্য অনেক রাত্রি অবধি চিঁড়া কুটিলেন। পরদিন আর উঠিতে পারিলেন না, বুকে বড় ব্যথা এবং একরূপ বিনের দিন পাড়ার সকলে তাঁহার মাথা ভরিয়া সিঁদুর ও দুই পায়ে আলতা পরাইয়া বলাই-তলার শ্মশানে চিতায় তুলিয়া দিল। শুভকর্মে বাধা পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে গিরিজা এক দূর সম্পর্কীয় পিসে মহাশয়ের সাথে চাকরী করিতে কলিকাতায় গেল। মাস দুই উমেদারী করিয়া চাকরী জুটিল—এক মার্চেন্ট অফিসে বিল-সরকারী। কয়েক মাস পরে ইহা ছাড়িয়া দিয়া কাকিনাড়ায় একটা পাটকলে ঢুকিল, কুলীদের হাজিরা লিখিবার কাজ। চাকরীটা ভালো—দু'চার পয়সা উপরি আছে। তাহার পর তিরিশ বছর উপরওয়ালার মন ভিজাইবার নানা কৌশল আয়ত্ত করিয়া আজ সেখানকার বড়বাবু হইয়াছে। চাকরীর প্রথম কয়েক বছর মা ভাইয়ের বাড়ীতেই ছিলেন এবং গিরিজার ভূষণডাঙায় যাতায়াত ছিল। পূজার সময় সীতানাথ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—আর কেন বাবা, পরের গোলামী ক'রে শরীরের এই হাল করছ? আয়না ধ'রে দেখো তো শরীরের কি হাল হয়েছে! আফিসের খাটুনি কি সোজা? তুমি বরঞ্চ এই মরশুম থেকে ক্ষেতের কাজ দেখ। বুড়ো হ'য়েছি আর পেরে উঠি না। যা কিছু খুদ কুঁড়ো আছে, তোমরা বুঝে সুঝে নাও। গড়িমসি করে' ক' বছর কেটে গেল, এবারে আর দু'হাত এক না ক'রে ছাড়ছি না।—

গিরিজা জবাব দেয় নাই, ঘাড় নীচু করিয়া হবু-জামাইদের যেমনটি হইতে হয়, তেমনি ভাবে চলিয়া গেল। কিন্তু ঐ যে ঠাঁয় রৌদ্রে তেপান্তরের মাঠের মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়া ক্ষেতের মাটি উপযুক্ত রূপ গুঁড়ানো হইল কি না এবং আরও কত বোঝা সার উহাতে ঢালিতে হইবে—এইসব তদারক করিয়া বেড়ানো মোটেই ভদ্রতা-সঙ্গত বলিয়া ঠেকিল না। একটু পরে সে রান্নাঘরের মধ্যে পুঁটিকে আবিষ্কার করিয়া বলিল—পুঁটি, একটু চা করে' দে না লক্ষ্মিটি,—। পুঁটির বয়স বাড়িয়াছে, চোখের তারা একটু বেশী স্থির ও যেন বেশী কালো হইয়াছে। সে খাসা চা তৈয়ারী করে।

পুঁটি চা করিতে লাগিল। গিরিজা কলিকাতার গল্প শুরু করিল। শহরের গল্প শুনিতে পুঁটির বড় ভাল লাগে। সেখানে রেড়ির তেল দিয়া দীপ জ্বালাইতে হয়

না, কল টিপিলে আপনিই জলিয়া উঠে। আকাশে যে ঝিলিক মারে উহাকে সাহেবেরা তারের ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছে, বড় বড় গাড়ি ঐ তার ছুঁইয়াছে কি, গড়গড় করিয়া চলিতে থাকে। সকল কথা পুঁটি বিশ্বাস করে না। তবে চিড়িয়াখানা ও বায়োস্কোপ তাহার বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। বর্ণ পরিচয় যখন তাহার শেষ হইল, তখন ঠিক প্রথম পাতার নীচে বানান করিয়া দেখিল, লেখা আছে কলিকাতা। তারপর সে পড়িয়াছে—শিশুশিক্ষা, পাকপ্রণালী, মহাভারত, কঙ্কাবতী, কুঞ্জলতার মনের কথা—কত বই!

সব বইয়ে সেই এক জায়গার নাম দেখিয়াছে, কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বইওয়ালা কলিকাতায় বসিয়া বই তৈয়ারী করে। কলিকাতা শহরটা তার বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। ফস্ করিয়া বলিল—আমাকে একবার নিয়ে যাবেন কল্‌কাতায়?

গিরিজা তাহার দিকে একটুখানি চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—যাবোই ত। বাধা প'ড়ে গেল যে—নইলে এতদিন কোন কালে নিয়ে যেতাম—গিরিজার হাসি দেখিয়া পুঁটির খেয়াল হইল। সে লজ্জায় মরিয়া গেল—আর কথা না কহিয়া চা করিয়া দিয়া ওঘরে চলিয়া গেল।

কয়েক মাস পরে সীতানাথ সদন্তে একদিন চাটুর্য্যের আটচালায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—ক্ষেপেছো দাদা, ওই চটকলের কুলির হাতে মেয়ে দেবো আমি? কাজ ত কুলির সর্দ্দারী, ইজ্জতের সীমা নেই! কুলিরা হপ্তাভোর খেটে খেটে যা রোজ পাবে তার উপর ভাগ বসানো, ও চাকরী ক'দিন? যেদিন সাহেবরা টের পাবে গলাধাক্কা দিয়ে দূর ক'রে দেবে। আমি ঐ নীলমণির সাথে কথা পাকা করলাম। ভালো ছেলে, মুখে কথাটি নেই, পাশ-টাশ নাই বা করেছে, পাশ ক'রেই বা কে কি কচ্ছে তা' ত দেখ্‌তে পাচ্ছি।—

তিন চার দিনের মধ্যেই সীতানাথের উষ্মার হেতুটা সকলের কাছে প্রকাশ পাইয়া গেল। গিরিজা কাহাকেও কিছু না জানাইয়া বিবাহ করিয়া বসিয়াছে। কী করিয়া কবে যে সুমতির সাথে এই বিবাহের আয়োজন সুরু তাহা সেই বলিতে পারে। গিরিজা শুনিয়াছিল, সুমতি শহরে মেয়ে, চালাক-চতুর, আবার ইংরাজী পড়িয়াছে—যাকে বলে একেবারে আপ্‌ টু ডেট্‌। তাহার প্রমাণ পাইতেও দেরী হইল না। ফুলশয্যার রাত্রিতে আর উৎকণ্ঠা দমন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সুমতি, তুমি ইংরাজী জানো? সুমতি বলিল—না। গিরিজা দমিয়া গিয়া বলিল—সে কি? শুনলুম তুমি ন্যাড়াগির্জ্জের মেয়েদের স্কুলে পড়েছো। সুমতি কহিল—ফাষ্ট বুকের খানিকটা পড়েছিলুম, তা—কিছু মনে নেই। গিরিজা বলিল—মনে নেই? কখখনো নয়, ও তোমার দুষ্টুমি। আচ্ছা, বলতো 'দি র‍্যাম' মানে কি?—সুমতি একটুখানি ভাবিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি বলিল—বর।

শুভক্ষণের বাক্য মিথ্যা হইল না। সুমতি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিল, সেই প্রকারই ফলিয়া গিয়াছে। গিরিজার অবস্থা ভালো হইয়াছে, বিস্তর বড় ঘরের আত্মীয় স্বজনও জুটিয়াছে। ঐ সবের সাথে চলিবার কায়দা গিরিজা আজও দুরস্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু সুমতি ভারী ভারী সিন্দুক ও আলমারীর চাবিগুলি, এবং ততোধিক ভারী আত্মীয় সম্প্রদায় মায় গিরিজাকে পর্য্যন্ত অক্লেশে বহিয়া বেড়ান। আজ পঞ্চাশের প্রান্তে পৌঁছিয়া সংসারের রথচক্রের বিরাট বহর দেখিয়া গিরিজা ঘাবড়াইয়া যায়, এবং ভাবে—ভাগ্যিস মেষশিশুর মতো হাবা, নিতান্ত আনাড়ী, ঐ মনোরমার সাথে তার বিয়ে হয় নাই!

সীতানাথ বাবু পাটোয়ারী ব্যক্তি, মনে যাহাই থাকুক বাহিরে কোন কাজে কাহারও খুঁত ধরিবার সাধ্য নাই। নীলমণির সাথে বিবাহ সাব্যস্ত হইলে যথাসময়ে গিরিজার কাছে পোষ্টকার্ডের চিঠি আসিল যে, মনোরমা তাহার বোনের সামিল, অতএব গিরিজাকেই খাটিয়া খুটিয়া শুভ-কর্ম্মটি সুসম্পন্ন করিতে হইবে। গিরিজা অফিসের ছুটি করিয়া 'পতিব্রতা' মার্কা সিঁদুর কৌটা এবং একজোড়া

...ন সোনার শাঁখা কিনিয়া যথাসময়ে ভুবন-ডাঙ্গায় পৌঁছিল। ...বীঠাকরুণ আর অকারণ বিলম্ব করিলেন না, সীতানাথ যে তাহাকে চটকলের কুলি বলিয়াছেন পৌঁছিবামাত্রই যথাসম্ভব গুছাইয়া বর্ণনা করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন— ঐ কৌটায় সিঁদুর ভরিয়া না দিয়া বাসি উনান হইতে বিনামূল্যে বস্তু-বিশেষ ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু গিরিজা খুব খাটিল, আগাগোড়া পরিবেশন করিল, চেঁচাইয়া গলা ভাঙিল, নীলমণির মাথায় দইয়ের হাঁড়ি উপুড় করিয়া মাথের রাত্রিতে তাহাকে নাওয়াইয়া তবে ছাড়িল।

খাটিয়া খুটিয়া সকলে চণ্ডীমণ্ডপে শুইয়া পড়িয়াছে। ফরাসের উপর ঢালা বিছানা এবং গিরিজার ঠিক পাশেই তাহার মামা, তাঁহার বোধ করি একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। পাড়ার বৌ-ঝিরা বিদায় লইয়াছেন, বাসর ঘরে আর গণ্ডগোল নাই। বরের সাথে পুঁটি কিরূপ প্রেমালাপ করিতেছে, সেটা গিরিজা একটু দেখিবার প্রয়োজন বোধ করিল কিন্তু মামার নিদ্রাকে বিশ্বাস নাই। বুড়া বয়সে কাশীর দোষ ত হইয়াছে, তাছাড়া রাত্রির মধ্যে অন্ততঃ বার আষ্টেক তামাক পিপাসা হয়। এখনই হয়ত টিকা ধরাইতে বসিবেন এবং পাশে গিরিজাকে না দেখিলে যতগুলি ভদ্রলোক এখানে ঘুমাইতেছেন সকলকে জাগাইয়া রীতিমত তদন্ত সুরু হইবে। গিরিজা মাথার বালিশটার উপর পাশবালিশটা শোয়াইল এবং পাশবালিশের আগাগোড়া লেপমুড়ি দিয়া খাট হইতে নামিয়া আসিল। নীচে মেজের উপর কখন আসিয়া শুইয়াছে, ও বাড়ীর ছোকরা চাকর বনমালী। গিরিজা তাহা জানে না, অন্ধকারে তাহার ঘাড়ের উপর পা চাপাইয়া দিতেই সে হাউমাউ করিয়া উঠিল। সাথে সাথে মাতুল মহাশয়েরও ঘুম ভাঙিল এবং আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া আরম্ভ করিলেন—কি! কি! কি! গিরিজা চট করিয়া মেজের বসিয়া পড়িয়া বনমালীর মুখে হাত দিল। ব্যাপারটি বুঝিয়া ফেলিয়া বনমালী সামলাইয়া বলিল—একটা বেড়াল। হামাগুড়ি দিয়া গিরিজা বাহিরে আসিল। তারপর বাসর ঘরের বেড়ার বাখারী ফাঁক করিয়া সমস্ত শীতের রাত্রি ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু পুঁটি চেলী জড়াইয়া ভৌগলিক পৃথিবীর মতো গোলাকার হইয়া পড়িয়া ছিল। বেচারা নীলমণি চেষ্টার ত্রুটী করে নাই, সোহাগ, অভিমান, ক্রোধ, মায় দোরের খিল খুলিয়া বাহির হইবার উপক্রম পর্য্যন্ত, কিন্তু তাহাতে অপরপক্ষের চুড়িগাছি পর্য্যন্ত নড়িল না। হতোৎসাহ হইয়া নীলমণি নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিল। নীলমণির দুর্গতি দেখিয়া গিরিজা সেদিন খুব খুশী হইয়াছিল।

নীচে অরগ্যান বাজিয়া উঠিল, গানের মাষ্টার আসিয়াছেন। তৎসহ সঙ্গীত—রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী—। গিরিজা ভাবিল, ওখানে গিয়া বলিয়া আসে—বাপুহে, তোমরা ছাত্রশিক্ষকে মিলিয়া যে কাণ্ডটা করিতেছ ওটা কি ঠিক বাঁশীর আওয়াজের মতো হইতেছে, না হৈ-রৈ শব্দে বিশ্ব-কবিকে বাঁশ লইয়া তাড়াইয়া যাওয়া! টেবিলে আর যে চিঠিগুলা পড়িয়া ছিল, গিরিজা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

প্রথমখানি চিঠি নহে,—ওরিয়েণ্টাল কিউরো সপের বিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি আবার কলা-রসিক। ঘর সাজাইবার জন্য তিনি একটি একহাত প্রমাণ পাথরের নটরাজের মূর্ত্তি কিনিয়াছেন। কনিষ্কের প্রপিতামহের আমলের মূর্ত্তি—তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে—সে হিসাবে দাম খুব সস্তা, মোটে একশো পঁচাত্তর টাকা; মূর্ত্তিটির নাক নাই বলিয়া দাম কষিয়া বাদ দিয়া দাঁড়াইয়াছে একশো একাত্তর টাকা পাঁচ আনা।

পরের খানি জ্ঞানদায়িনী সভার সম্পাদক লিখিয়াছেন। চারি পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া অভিধানের প্রচুর জ্ঞান জাহির করিয়া গিরিজাকে বিবিধ বিশেষণে অভিহিত করণান্তর মূল কথাটি নীচে ব্যক্ত করিয়াছেন—কিঞ্চিৎ চাই।

তৃতীয় খানা নিতাইচাঁদ দাসের চিঠি। দাস মহাশয় বৈষ্ণব সজ্জন, ভাষাও বিনীত। সবিনয়ে জানাইয়াছেন— শতকরা মাত্র আঠারো টাকা সুদ ধরিয়াও হ্যাণ্ডনোট

সুদে আসলে অনেক দাঁড়াইয়াছে। সকাল বিকাল বাসায় আসিয়াও নিতান্ত দুরদৃষ্টবশতঃ গিরিজার ধরা পাওয়া যায় না। গিরিজার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি তাঁহার মতো কীটাণুকীটের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া অক্লেশে এতদিন মিটাইয়া দিতে পারিতেন। তিনদিনের মধ্যে নিতান্তই যদি কোন ব্যবস্থা না হয় তবে দাস মহাশয় অতীব দুঃখের সহিত আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

তারপরের খানির উপরে ছাপা—দি গ্রেট বেঙ্গল মোটর ওয়ার্কস। পেট্রোলের দাম বাকী।

তারপর, ছক্কড়লাল ক্ষেত্রী—

অতঃপর, পি, মুদেলিয়ার এণ্ড কোং—

অন্যান্যগুলি গিরিজা আর পড়িল না। এইসব চিঠি পড়িয়া তাহার উদ্বেগ-আশঙ্কা হয় না। আজ বছর পাঁচেক ধরিয়া দিনের পর দিন এমনই আসিয়া থাকে, তাহাতে নূতন কিছু নাই। চিঠিগুলি ব্লটিং প্যাডের উপর হইতে ঠেলিয়া রাখিয়া মনোরমার চিঠিখানি সে আর একবার পড়িল।

আজ সীতানাথ বাবু বাঁচিয়া নাই যে! থাকিলে দেখিতে পাইতেন চটকলের কুলি বলিয়া যাহাকে গালি দিয়াছিলেন, তাহার কাছে তাঁর মেয়ে কত করিয়া চিঠি দিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সে অক্লেশে নীলমণির চাকরী করিয়া দিতে পারে। আর যদি তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, তবে নীলমণি গ্রামের ভিটায় ফিরিয়া গিয়া মনোরমার সাথে মুখোমুখী হইয়া অনাহারে শুকাইবে। সীতানাথ বাঁচিয়া থাকিলে বেশ হইত—কিন্তু তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে, এবং আশঙ্কার বিষয় স্বর্গ হইতে নাকি সর্ব্বত্র নজর চলে। এই যে চিঠির গোছা গিরিজা একপাশে ঠেলিয়া রাখিল— কলিকাতা শহরের যত লোকের সাথে তাহার আনাগোনা, কেহই ইহার খবর রাখে না। কিন্তু এগুলি সেই স্বর্গীয় পাটোয়ারী ব্যক্তিটির নজর এড়াইতে পারিয়াছে ত?

গিরিজা তখন খুব ছোট, একদিন কী খেয়াল চাপিয়াছিল —তার ছোট রাঙা ছাতাটা মাথায় দিয়া ঝনুঝন্ করিয়া বড় রাস্তা দিয়া গঞ্জমুখো চলিয়াছিল। মা পিছন হইতে ডাকিতেছিলেন—অ খোকা, যাস্‌নে—ফিরে আয়, ফিরে আয়। খোকা শুনিল না, এক একবার পিছন ফিরিয়া মায়ের দিকে তাকায়, হাসে—আরো জোরে চলে। তারপরে মা ছুটিয়া আসিয়া তাকে কোলে করিয়া ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। ঘটনাটা কিছুই নয়, ভূষণ-ডাঙার কথা ভাবিতে এমনই মনে পড়িয়া গেল যে তাহার মা বাঁচিয়া নাই।

সেই গ্রামটিকে একটিবার দেখিতে ইচ্ছা করে। এখন যাহারা খালে ছিপবড়শীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, কেহই গিরিজাকে চিনিতে পারিবে না। আর এই বুড়ো বয়সে সে যদি তল্‌তা-বাঁশের ছিপ কাটিয়া খালের পাড়ে তাহাদের পাশে বসিতে যায়—কেবল হাস্যকর নহে, এখনই ছক্কড়লাল, নিমাইচাঁদ ও স্বস্তিকোম্পানী ব্যাপারটি রীতিমত মর্ম্মান্তিক করিয়া তুলিবেন। গত বৎসর গিরিজার নিউ-মোনিয়া হইয়াছিল। বড় বড় ডাক্তার ডাকিয়া এবং বিস্তর তদ্বির করিয়া সুমতি ও পুত্রকন্যারা তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিলেন—বোধ করি, তাহার অভাবে বাসাখরচের অসুবিধা ঘটিবে এই আশঙ্কায়। যমালয়ে পলাইয়াও যে স্বস্তি পাইবে সে পথ ইহারা মারিয়া রাখিয়াছে। মা বাঁচিয়া থাকিলে এবার একবার ভূষণ-ডাঙায় বেড়াইয়া আসিত। মনোরমার বিয়ের পর আর ওদিকে যাওয়া ঘটে নাই।

মনোরমার বিয়ের পরদিন গিরিজা সকাল সকাল খাইয়া ট্রেন ধরিবার জন্য ছুটিতেছিল। বিলের প্রান্তে আমবাগানের সরু পথ আসিয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে পিছনে গ্রামের মধ্যে বাসি বিয়ের সানাই বাজিয়া উঠিল। বিলের মধ্যে পড়িয়া আর শোনা গেল না। এই সমস্ত গিরিজা ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ কত বৎসর পরে যৌবন পার হইয়া আসিয়া মনোরমার চিঠির সাথে যেন সেই সানাইয়ের একটুখানি সুর কানের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুঁটির সাথে যখন তার বিয়ের কথা চলিতেছে, পুঁটি বলিয়াছিল,— আমাকে নিয়ে যাবেন কল্‌কাতায়?—আর সে জবাব দিয়াছিল—যাবেই ত। আজ যদি জীবনের সেই মোহানায়

ফিরিয়া গিয়া পুঁটির সাথে তার দেখা হয়, গিরিজা ঠিক বলিত—ওরে মুখপুড়ী, তোর এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইয়াছে? ঐ খালের ঘাট, আউশধান ও পাটেভরা হ'চ্ছের বিল, তকতকে নিকানো আঙিনা টুকুন—এসব ফেলিয়া কোথাও টিঁকিতে পারিবি, ভাবিয়াছিস?—এবং যদি সত্যই পুঁটির সাথে তার বিয়ে হইয়া যাইত, অভাবের মধ্যে পুঁটি ঝগড়া করিত, কাঁদাকাটা করিত, তবে বড় অসহ্য হইলে ছাতা মাথায় ঐ ঘাটের ক্ষেতের কোণেই ফের বসিয়া ঘাস বাছিতে আরম্ভ করিত, তবু নীলমণির মতো কলিকাতায় চাকরীর জন্ম ধর্ণা দিতে যাইত না।

নীচে হইতে সাড়া আসিল—গিরিজাবাবু, আছেন? গলাটা নিতাইচাঁদের মতন। গিরিজা মিনাকে ডাকিয়া বলিল—যাও, বলে' এসোগে' বাবা বাড়ী নেই,—মিনা থোপাথোপা চুল নাচাইয়া নীচে ছুটিল। মিনা মেয়ে ভালো বয়স কম হইলে কি হয়, খাসা গুছাইয়া বলিতে শিখিয়াছে।

নীচে হইতে পুনশ্চ শোনা গেল—আচ্ছা, খুকী, বাড়ীর ভেতর বলোগে' তুবণ-ডাঙা থেকে এক বাবু এসেছেন, এখানেই থাকবেন।

অতএব নীলমণি আসিয়াছেন, নিতাইচাঁদ নয়। গিরিজা নীচে নামিল। বলিল—এসেছো? আর, চাকরীর যা অবস্থা হয়েছে—সব অফিস থেকে লোক কমাচ্ছে। সন্ধান পেলে তোমাকে চিঠি লিখে জানাবো। বরঞ্চ আপাততঃ দেশে ফিরে গিয়ে দেখো গে, পাটের মরশুমটা নষ্ট না হয়।

শ্রীমনোজ বসু

আলোচনা

ভাষা-তত্ত্ব

শ্রী——

চলতি বহু ইংরাজী (slang) শব্দ যে হিন্দী-মূলক তাহা লইয়া আলোচনা আজকাল বিরল নয়। ইউরোপীয়েরা এখন বুঝিতে শিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের নিত্য-ব্যবহৃত বহু শব্দের জন্ম হিন্দুস্থানের কাছে তাঁহারা ঋণী। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে:—

হিন্দী ভাষায়	ইংরাজী ভাষায়
চোর বা চুর (তস্কর)	Cur (chur, choor)
মু (যেমন মু'পর—মুখের উপর)	moo, mun (munch, chew)
পানি, পনি (জল)	parney (rain)
জিব (জিহ্বা)	jibb (jabber)
চীজ্ (জিনিষ)	cheese
মাঙো—মাংতা (চাহি)	maung (beg)
জঙ্গল (বন)	jungle
চিট্ (চিঠি)	chit
টিফিন	tiffin

আমরাও অবশ্য গেলাস, বাক্স ডেস্ক, টেবিল, লণ্ঠন, টুল প্রভৃতি নানা শব্দ ভাষাগত করিয়াছি। এই বিষয়ে নানা দিক দিয়া আলোচনা হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়।

বিচিত্রা-চিত্রশালা

শ্যাম-দেশীয় বুদ্ধমূর্ত্তি
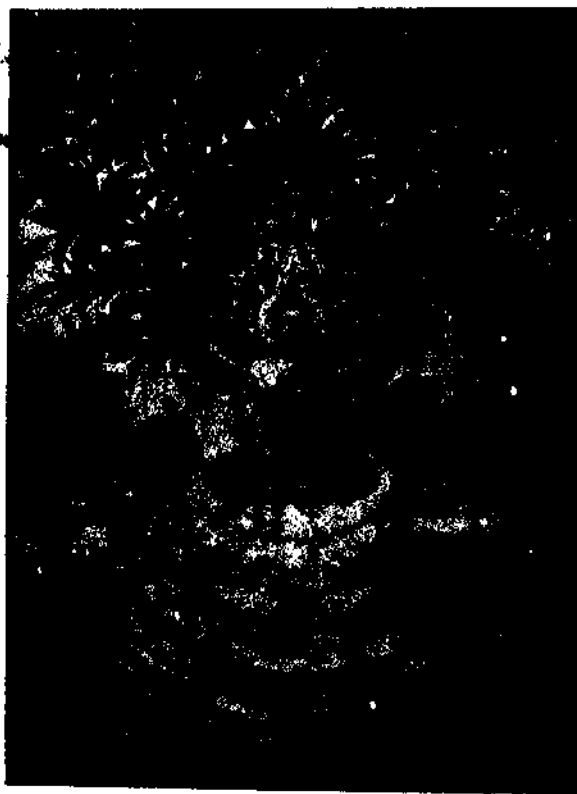
হাতির দৌড়— পেনাং
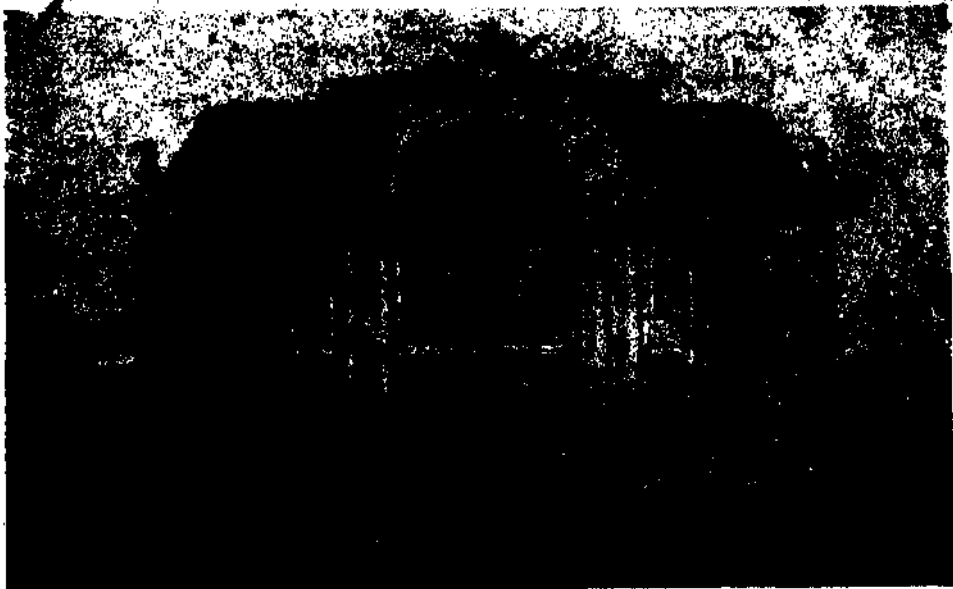
নটিগণের একটি নাট্যশালা

নূতন বন্দর— সিঙ্গাপুর

চীন-দেশীয় অভিনেতা
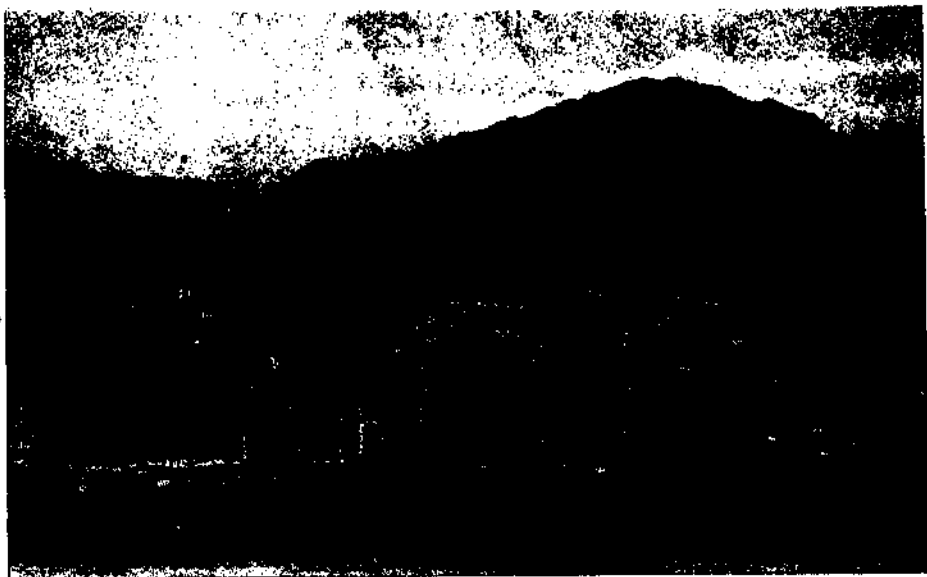
সাধরণ দৃশ্য—হংকং

পীক্ ট্রামওয়ে—হংকং

আজিকার মত

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়

আমার এ গান বিশ্ব হবে নিত্য কালের তরে,
এত বড় আশা তো ভাই পুষি না অন্তরে।
আপন দেহ আড়াল রাখি
গায় সে যখন বনের পাখী,
চেয়ে চকিত হৃষ্ট পথিক চ'লে যায় ঘরে,
দাঁড়ায় যদি দাঁড়ায় শুধু ক্ষণেকের তরে।
ফুটছে ফুল হাসি-মুখে
সুবাস লয়ে কোমল বুকে,
সে ও তো ভাই শুকায় রোদে, ঝরে দু'দিন পরে,
সেও তো নয় নিত্য কালের তরে।

আজকের মত গাই রে যেন ক্ষণিকের এ গান,
আমার প্রাণের হর্ষ যেন স্পর্শে অপর প্রাণ।
আশাহত যে মনখানি
শুনায় তারে আশার বাণী,
লুপ্ত সংকল্পেরে যেন বারেক সজাগ করে,
দু'দণ্ডের তরে রে ভাই দু'দণ্ডেরি তরে।

আর যদি তা না-ও করে' খেদ নাহি রে তায়,
গেয়ে যাক্ কণ্ঠ আমার হৃদয় যাহা গায়।
উঠে, পড়ে, ফোটে ঝরে,
যত জন্মে যত মরে,
সাগর-বুকে ঢেউরা যেমন ঢেউ ডিঙ্গায়ে যায়।
আমার পরে উঠ্‌বে কেহ, অন্তে তাহার পরে,
নয়গো কিছু নয়গো কেহ নিত্য কালের তরে।

কাজের লোক

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত ললিত ঘোষ

সকাল বেলা। শহরের চারিদিকে তখন কাজকর্ম্মের সাড়া জেগে উঠেছে।

জয়ন্ত প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র তাঁর নির্দ্দিষ্ট ঘরটিতে ব'সে কর্ম্মচারীদের কাছে কাজকর্ম্মের হিসাব বুঝে নিচ্ছিলেন। জিতেন তার আগের দিন না-আসার কারণ সবিনয়ে নিবেদন করছিল। বেচারা চাকরির ভয়ে একেবারে জড়সড়। ভদ্রলোকের ছেলে—মাইনে পায় ত্রিশ টাকা, বকুনি খায় ত্রিশ বার। অতিকষ্টে হরিধনকে সে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, কাল ছিল তার বোনের বিয়ে—সেইজন্য সে বাড়ী থেকে বেরোতে পারেনি। তার ঘাড়েই সমস্ত কাজের ভার পড়েছিল।

হরিধন একটু হেসে বল্লে—বটে? প্রেসের বাইরে তুমি ত দেখি সব কাজেই 'এক্সপার্ট'। কিন্তু এটুকু ভুলে গেলে চলবে না যে, শুধু সেজন্তে তোমাকে মাইনে দিয়ে রাখা আমার মত গরীব লোকের অসাধ্য।

ঐ ত হ'য়েছে মুস্কিল! হরিধনকে এ পর্য্যন্ত কেউ রাগতে দেখেনি। যত রাগের কথাই হোক ওর মুখে যেন একটা চাপা হাসি লেগেই আছে। আর সেইজন্তেই ওকে অত কঠোর ব'লে মনে হয়। ওর বুদ্ধি আছে কিন্তু ওর কাছে ক্ষমা নেই। শুকনো গলায় জিতেন জানালে যে ভবিষ্যতে আর তার কোন ত্রুটি হবে না। তার উত্তরে হরিধন আগের মতই হেসে বল্লে—ভবিষ্যতের কথা ত এখন হ'চ্ছে না—কথা হ'চ্ছে কাল যে ক্ষতিটা তুমি করলে সেটা পুষিয়ে দেবে কি ক'রে? আজ রাত্তিরটা খেটে দাও—কি বল?

জিতেন ঘাড় নীচু ক'রে বল্লে—আচ্ছা।

বেশ, তাহ'লে পাঁচটায় দিনের কাজ শেষ হ'লে এক ঘণ্টা তোমার ছুটি। ওর মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে ছ'টার সময় এসে আবার জয়েন করবে। যাও।

বেচারী সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরলে তবে বর-বউ যাবে। কিন্তু কি করবে—উপায় নেই। প্রেসের মধ্যে তার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু রমেশের কাছে গিয়ে হরিধনকে গালাগালি দিয়ে গায়ের ঝাল মিটোতে লাগল। দু'জনে মিলে একমত হ'য়ে স্বীকার করলে যে, এতদিন কবে তারা এ কাজ ছেড়ে দিত,—খালি লোকটা অর্থাৎ হরিধন, বিপদে আপদে মানুষের, অর্থাৎ তাদের নিজের উপকার করে ব'লেই যা এই গালমন্দ আর অত্যাচার স'য়ে প'ড়ে থাকা। নইলে—হাঃ—

ঘরটার এক কোণে স্তূপীকৃত সমাদরে কেনা নানা রকমের কাগজ। ছাতের কাছ বরাবর লম্বা লম্বা তাক ভর্ত্তি ছাপা কাগজপত্র—যে টেবিলে হরিধন বসে সেটা পর্য্যন্ত হরেক রকম ব্লক আর প্রেকশিটে ভরা। এই সবের মধ্যে হরিধন একেবারে সমাধিস্থ। পাশের একটা ঘর থেকে ইলেকট্রিক মেসিনের শব্দ আসছিল—সেই হ'ল ওর জীবন-গ্রন্থের সঙ্গীত! আমোদ কাকে বলে ও বোঝে না—কল্পনাও করতে পারে না, দু'দণ্ড একেবারে চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় কি ক'রে! আত্মীয়স্বজন ওর কাছে যা স্নেহের দাবী করে ও তা নির্ব্বিকার ভাবে টাকা দিয়ে পূরণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়। পাকা রকমের হিসেব ক'রে রেখেছে কি উপলক্ষে কাকে কি দিতে হবে—তার ম্যানেজারের কাছে সেই ফর্দ্দ ফেলে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত। এমন কি তার স্ত্রীর বছরের মধ্যে কবার কি দামের কাপড় চোপড় চাই তার হিসেব পর্য্যন্ত ঐ ম্যানেজার লোকটির কাছে পাওয়া যেতে পারে। তার একমাত্র ছেলে টুনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—বাবা, কাল আমার জন্মদিন—আমার কি কিনে দেবে? ও ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে—ও, কাল তোর জন্মদিন না কি? আচ্ছা যা ম্যানেজার বাবুকে গিয়ে বল্‌গে।—ব'লে প্রেকশিট উল্টোতে লাগল।

সেদিন সকালে বোধ হয় ওর মেজাজটা একটু খারাপই ছিল এমন সময়ে ওর শালা প্রকাশ একটা সুটকেশ হাতে ক'রে এসে হাজির। শালাকে হরিধন দু'চক্ষে দেখতে

পারত না। যে রকম বড় বড় চুল আর মিহি গলার স্বর তা'তে যে ও কোনও দিন 'মানুষ' হতে পারবে এ ধারণা হরিধনের ছিল না। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে—কি হে, হঠাৎ যে?

প্রকাশ উৎসাহ ভরে বলতে লাগল যে, তার ছোট বোন্ নীলিমার বিয়ে। মেয়ে কালো হলেও খুব ভাল পাত্র পাওয়া গেছে। পাত্রের রূপ গুণ, এবং কত কষ্টের পর এমন পাত্র পাওয়া গেছে কিছুই সে বলতে বাকি রাখলে না। সব শুনে হরিধন গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলে,—তাই দিদিকে নিয়ে যেতে এসেছ?

প্রকাশ হাসিমুখে বল্লে—বাঃ, শুধু দিদিকে কেন? আপনাকে যেতে হবে। নীলির বিয়েতে কিন্তু জামাইবাবু—

হরিধন বাধা দিয়ে বল্লে—যাও, বাড়ীর ভেতর গিয়ে মুখ হাত পা ধোও। ওরে ভজা, বাবুকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যা।

বেলা বারটার সময়ে নেয়ে খেয়ে হরিধন অন্দরে গেল। তার শোবার ঘরে তখন ভাইবোনের পরম উৎসাহে আলোচনা চলছিল। ও যেতেই দু'জনে উঠে দাঁড়াল। বিছানায় শুয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার দিদিকে কখন নিয়ে যাচ্ছ?

আজ বিকেলের ট্রেনেই যেতে হবে। আপনি আজ যেতে পারবেন ত? এমন তাড়াতাড়ি হ'ল যে আপনাকে এর আগে খবরও দিতে পারলুম না।

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হরিধন বল্লে—বেশ, তা'হলে তুমি ঘন্টাকয়েকের জন্যে একটু গড়িয়ে নাও। আবার ত সারারাত জাগতে হবে। স্ত্রীর দিকে ফিরে বল্লে—ওর শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছ?

স্ত্রী মৃণাল ঘাড় নেড়ে ভাইকে তার শোবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে ফিরে এল। স্বামীর পায়ের কাছে ব'সে তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। প্রতিদিন দুপুরে এই সময় হরিধন ঘন্টা দেড়েকের জন্যে ঘুমোয়, তার পরেই আবার বেরিয়ে যায় প্রেসের কাজে। এইটুকু বিশ্রামের সময়ের মধ্যে ওদের সাধারণত কোন কথাই হয় না। কিন্তু দৈনন্দিন নিয়মের আজ একটু ব্যতিক্রম হল। হরিধন জিজ্ঞাসা করলে—বোন্‌কে দেবার জন্যে একটা কিছু ত নিয়ে যাওয়া চাই?

মৃণাল মৃদুস্বরে বল্লে—হাঁ।

কি দেওয়া যায় বল দেখি?

তুমি যা ভাল বোঝ।

আমি ওসব বুঝি না। বাইরে গিয়ে ম্যানেজারকে পাঠিয়ে দেব এখন। যা হয় একটা রেডিমেড গয়না-টয়না আনিয়ে নিও।

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। হরিধন তখনও ঘুমোয়নি দেখে মৃণাল জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁগা, তুমি একবার যাবে না?

কথাটা শুনে হরিধনের বড় কৌতুক বোধ হল। একটু হেসে বল্লে—ক্ষেপেছ! কাল সকালে আছে স্মিথ কোম্পানীর অর্ডার সাপ্লাই—হাজার টাকার কারবার—পরশু দিনের মধ্যে যদি টাকা না দিতে পারে তাহলে সেই মাড়োয়ারীর মোটরখানা বাগিয়ে নিতে হবে,—এই সবের মধ্যে আমি যাব তিনশ মাইল দূরে শালীর বিয়ের নেমন্তন্নে! ওসব কথা ছেড়ে দাও। হাঁ, তোমার কদিনের হাত খরচের জন্যে যা টাকার দরকার ঐ আলমারিটা থেকে নিও।

অন্যদিন হ'লে মৃণাল চুপ ক'রে যেত। কিন্তু আজ বোনের বিয়ের খবর পেয়ে তার মনটা একেবারে পরিপূর্ণ। সে জেদ ক'রে ব'লে ফেল্লে—বেশ, আজ না পার কালকে যেও। শালী ব'লে তুমিই না হয় পর ভাব কিন্তু সে ত তোমার আশীর্ব্বাদ প্রত্যাশা করে? আর টাকাই কি সব? তোমার প্রেস আর কাজ ত চিরদিনই থাকবে।

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে হরিধন মনে মনে হাসলে—ওর সঙ্গে তর্ক ক'রে লাভ কি? একেবারে কিছুই বোঝে না—যাকে ছেলে মানুষ বলে তাই আর কি। একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে সে পাশ ফিরে শুতে যাবে এমন সময় হঠাৎ গায়ে একটা কোমল স্পর্শ অনুভব করলে। ফিরে দেখে মৃণাল হঠাৎ উঠে এসে হাত দিয়ে তার গায়ের ওপর ভর দিয়ে একেবারে তার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। অবাক হয়ে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বাধা পেল। মৃণাল তার একটা হাত চেপে ধ'রে বল্লে—

কখনও আমি তোমায় কিছু অনুরোধ করিনি। আমার আজকের কথা তোমায় রাখতেই হবে। বল—রাখবে?

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত ব'লেই বোধ হয় হরিধন তত বিরক্ত হ'য়ে উঠতে পারলে না। মনে মনে ভাবলে—মাঝে মাঝে একটু আধটু প্রশ্রয় দেওয়া মন্দ নয়। এমন কি একটু রসিকতা করবার চেষ্টা পর্যান্ত ক'রে বল্লে—ব্যাপারটা কি, ব'লেই ফেল।

হরিধনের গলাটা যেন একটু কোমল বোধ হল। এইতেই মৃণালের সমস্ত শরীর আবেগে কেঁপে উঠল। স্বামীর বুকে মুখটা চেপে সে চুপ ক'রে রইল।

প্রথমটা হরিধনের হাসি পেতে লাগল—ধোৎ একি ছেলেমানুষি হ'চ্ছে। কিন্তু পরে কি ভেবে মৃণালের মাথায় একটা হাত রাখলে।

ঢং ক'রে ঘড়িটায় দেড়টা বাজল। হরিধন তৎক্ষণাৎ মৃণালকে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল। আপন মনে বলতে লাগল—নাঃ, কাজের তাড়ায় আমি গেলুম। এবার ভাবছি দিন কতক সব ছেড়ে ছুড়ে কোথাও বেড়িয়ে আসব। আর পারা যায় না।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁচা খোঁচা চুলগুলো আঁচড়ে নিয়ে ড্রয়ার থেকে কি একটা জিনিষ পকেটে ফেলে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল—হঠাৎ চোখ পড়ল মৃণালের মুখে। খাটেতে হেলান দিয়ে নিষ্কম্প নির্জীব প্রতিমার মত সে দাঁড়িয়ে আছে—স্বামীর বুকে মুখ রাখার সময় দু'গাছি চুল খুলে এসে মুখের ওপর প'ড়েছিল হাত দিয়ে তা সরিয়েও দেয়নি—চোখ দৃষ্টিহীন—মুখে এমন একটা ভাব যে হরিধনের মত লোকও তা দেখে থমকে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল—তোমার কি কোনও অসুখ করছে?

মৃণাল শরীরটাকে জোর ক'রে সোজা ক'রে একটু হেসে বল্লে—না কিছু হয়নি, তুমি যাও। ব'লে ঘোমটাটা মাথার ওপর তুলে দিয়ে বারান্দার দিকে চ'লে গেল। হরিধন এক মুহূর্ত্ত অপ্রতিভের মত দাঁড়িয়ে থেকে গলা উঁচু ক'রে বল্লে—আমি বেরিয়ে রইলুম—যাবার সময় একবার খবর দিও। বলতে বলতে ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেল।

সেই সন্ধ্যে সাতটায় ট্রেন। সমস্ত দুপুরটা এখনও সামনে। অন্যান্য দুপুরগুলো যে ভাবে কাটে আজকেও মৃণাল সেইভাবে কাটাবার চেষ্টা করলে। বারান্দায় একটা দড়িতে ঝোলান ভিজে কাপড়গুলো দু' তিনবার সরিয়ে সরিয়ে দিলে—যাতে ঠিকমত শুকোয়। ষ্টোভটা জেলে ছেলেটার জন্যে একটু বার্লি ফুটিয়ে নিলে—ক'দিন থেকে সে পেটের অসুখে ভুগছে। টেবিলটা পরিষ্কারই ছিল তবু দু-একটা জিনিষ নড়িয়ে চড়িয়ে রাখলে। কার্পেটের ওপর একটা হরিণের ছবি তুলছিল সেটা নিয়ে খানিকক্ষণ সময় কাটল। কিন্তু তারপর আর কাজ নেই। একটা সুটকেশের মধ্যে নিজের যা যা দরকার গুছিয়ে নিতে মোটেই সময় লাগল না। অন্যদিন হয়ত এই সময় একটা মাসিকপত্র নিয়ে বসত কিন্তু আজ ভাল লাগল না। বারান্দার এক কোণে কতকগুলো ফুলগাছের টব ছিল। জল প'ড়ে প'ড়ে জায়গাটায় শেওলা প'ড়ে গিয়েছিল। তার ওপর পা দিয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। মৃণাল টেরও পায়নি কখন হরিধন ঘরে ঢুকেছে। ঘরের মধ্যে মৃণালকে না দেখে সে বারান্দায় বেরিয়ে এল। স্ত্রীকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার কাছে গিয়ে তার হাত স্পর্শ করলে। মৃণাল চমকে উঠে হরিধনকে দেখে একটু হেসে বল্লে—ওঃ তুমি!

হাঁ।

তারপর আর কারুরই কোন কথা নেই। হরিধনের অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগল। ইতস্ততঃ ক'রে বল্লে—তুমি তখন কি আমায় বলবে বলছিলে না?

কে, আমি? কই না।

ঐ যে, দুপুরে বেলা আমি যখন শুয়েছিলুম—হরিধন থেমে গেল। কি জানি কেন সে একটু লজ্জিত হ'য়ে উঠল।

ওঃ, সে কিছু নয়—ব'লে মৃণাল ঘরে চ'লে যাবে হরিধন তার হাত ধ'রে তাকে থামাল। দ্বিধা দূর ক'রে বল্লে—আমি কি আর বুঝতে পারিনি যে তুমি রাগ করেছ। অবিশ্যি আমি যখন উঠে যাই তখন আমার মনেই ছিল না তুমি কিছু বলতে চাও। অন্য একটা কথা ভাবছিলুম

কিনা। যাই হোক তাই নিয়ে ছেলেমানুষের মত রাগ ক'রে লাভ কি ?

না রাগ করব কেন—রাগ করবার কি আছে ? ব'লে মৃণাল একটু হাসলে।

হরিধন আশ্বস্ত হয়ে বল্লে—আমিও ত তাই ভাবছিলুম, এর মধ্যে রাগ করবার কি কথা হল। যাকগে, আমি ত তোমার বোনের বিয়েতে যেতে পারছি না। কিন্তু আমি সুদ শুদ্ধ পুষিয়ে দেব। কি করব বল দেখি ?

মৃণাল একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে চেয়ে রইল।

হরিধন উৎসাহ ভরে বল্লে—কারুর কিছু বলবার যোটি রাখব না। আমি ত আর বউ দেখে আশীর্ব্বাদ করতে পারব না—আমার হয়ে এইটে তুমি তার হাতে দিও—ব'লে একখানা হাজার টাকার চেক্ মৃণালের হাতে দিলে। আনন্দে চোখ মিটমিট ক'রে বল্লে—ব্যাপারটা কি হল বুঝতে পারছ ? প্রকাশের কাছ থেকে বেরিয়ে পড়ল যে, শ্বশুর মহাশয়ের টাকার টানাটানি—জোগাড় ক'রে উঠ্‌তে পারছেন না। এই সময়ে এই টাকাটা পেলে—বুঝতে পারছ ত ? ব'লে হরিধন হা হা ক'রে হেসে উঠ্‌ল। ভাবটা হ'চ্ছে এই যে—তোমরা মেয়েমানুষেরা ত কেবল গিয়ে পৌঁছতে পারলেই ভাবলে সব দায়িত্ব শেষ। কিন্তু তাতে কোনও কাজই হল না। আসল কাজের কথা বোঝে এই হরিধন মিত্র।

নিজের বুদ্ধির আত্মপ্রসাদে মৃণালের মুখের ভাব হরিধনের চোখেই পড়ল না। চেকখানা মুড়ে সুটকেশে রাখার মধ্যে তার যে কোনও উৎসাহই প্রকাশ পেল না সেটা তার অগোচর রয়ে গেল।

যাবার সময় মৃণাল স্বামীকে প্রণাম ক'রে বল্লে—আমার ফিরতে হয়ত দেরী হবে। ওখানে কত দিন থাকতে হবে তার ত ঠিক নেই।

হরিধন একটু চিন্তিত হয়ে বল্লে—এ হে হে, তাই ত। বড়ই মুস্কিলে ফেল্লে। মাসকাবারে যে বন্ধুদের নেমন্তন্ন করবার কথা ভাবছিলুম। যাকগে, সেদিন একটা বামুন ডাকিয়ে নিজেই সব করিয়ে নিতে হবে আর কি।

উদগত দীর্ঘনিশ্বাসটা গোপন ক'রে মৃণাল জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রকাশ ডাকলে—দিদি, তাড়াতাড়ি নাও, সময় যে আর নেই।

নীচে ছেলেদের খেলার মাঠ। প্রতিদিনের মত আজো মৃণালের জানলার কাছটিতে দাঁড়িয়ে সেই দিকে চেয়ে থাকবার ইচ্ছা করতে লাগল। জানলার নীচেই দেয়ালের ফাটল থেকে একটা পরগাছা বেরিয়েছে—তাতে একটামাত্র ফুল ফুটে আছে। ঝুঁকে প'ড়ে মৃণাল ফুলটা তুলে নিলে। প্রকাশ আবার ডাক দিলে—নাঃ, তোমাদের নিয়ে পারবার যো নেই। ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে রইল যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ ?

মৃণালের বুকের মধ্যে যেন একটা চমক লাগল। হঠাৎ যেন মনের সামনে এই কথাটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠল যে, এ জায়গাটা ছেড়ে যেতে হবে। মনের মধ্যে কি একটা অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগল, নিজেই তার কারণ বুঝতে পারল না। তীক্ষ্ণ হাসি হেসে মনে মনে বল্লে—ছেড়ে যাচ্ছিই বা কি ? এ বাড়ী ঘর দোর ? আর একজন ত ফিরেও চায় না।

হাতের ফুলটা ফেলে দিয়ে টুনির হাত ধ'রে মৃণাল বেরিয়ে পড়ল। হরিধন বাইরের ঘরে চ'লে গিয়েছিল—সেখান থেকে চেঁচিয়ে বল্লে—ওহে প্রকাশ, গিয়েই একটা চিঠি দিও।

মোটরে উঠে মৃণালের চোখে পড়ল তাদেরই প্রশস্ত বারান্দাটা। বিনা কারণে তার কেবলই মনে হ'তে লাগল—ঐ বারান্দাটা তার ভারী পছন্দ, সে ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসে।

পৌঁছান সংবাদ পাওয়ার পর হরিধন মৃণালের কাছ থেকে আর কোনও চিঠিপত্র পায়নি। মধ্যে হরিধন নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ানর কথা এবং সেই প্রসঙ্গে সে একলাই কি ভাবে সব বন্দোবস্ত করেছিল সেই কথা একটা চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিল। তারও কোন উত্তর আসেনি।

হরিধন ক্রমশঃই বিরক্ত হয়ে উঠছে। মেয়েছেলেদের যদি বিন্দুমাত্র দায়িত্বজ্ঞান থাকে। মিছামিছি ভাবনায় ফেলে কাজের ক্ষতি করা বইত নয়। সে এবার একটা কড়া ক'রে এই মর্ম্মে চিঠি লিখল—টুনি ওখানে কোনো খেলনার জিনিষপত্র নিয়ে যায়নি—এমন কি বায়োস্কোপের কলটা পর্য্যন্ত ফেলে গিয়েছে। তার নিশ্চয়ই মনে স্ফূর্ত্তি নেই তাকে যেন কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হলে।

উত্তর এল, টুনির মারফতে। মার অসুখ, পত্রপাঠ মাত্র বাবা যেন চ'লে আসেন।

কি বিপদ! এখন যে হরিধনের মরবারও অবকাশ নেই। একটা নতুন মাসিকপত্র প্রকাশের ভার নিয়েছে—আর সাত দিনের মধ্যে সেটা বার করা চাইই। কি সামান্য অসুখ হয়ত হয়েছে, তার জন্যে তিনশ মাইল দূরে গিয়ে সমূহ কাজের ক্ষতি। মনে মনে হেসে ও বল্লে—হয়ত কিছুই হয় নি। টুনিকে পাঠাবার ইচ্ছে নেই তাই—নাঃ ব্যাপারটা বোঝা গিয়েছে। আমার কাছে ফাঁকি বাজি চলবে না। ব'লে আপন মনে হাসতে লাগল।

পাশের ঘরে ছিল ম্যানেজার। বোগা মুখে কাইজারের মত গোঁফ। হাসিতামাসার গন্ধ পেয়ে দেখতে এল ব্যাপার কি। প্রভু হেসে বল্লেন—ওহে ম্যানেজার শোন, টুনি চিঠি লেখেছে—এঁর নাকি ভারি অসুখ। ব'লে হা হা ক'রে হেসে উঠল।

ম্যানেজার মাথা চুলকে হরিধনের দিকে চোখ টিপে খানিকটা হাসবার চেষ্টা করলে। নইলে ভেলোক হয়ত রেগেই যাবে। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে জিতেনকে ডেকে বল্লে—শেষে লোকটার মাথায় দোষ ঘটল হে।

তার পরদিন হরিধন প্রশান্ত চিত্তে নিজের প্রেসের কাজকর্ম্ম ক'রে গেল। একটা নতুন কণ্ট্রাক্টে অনেক টাকা পাওয়া যাবে এবং তাই দিয়ে মস্ত পুরোণো বাড়ীটা একেবারে নতুন ক'রে নিতে পারবে এই কল্পনায় হরিধনের মনে যথেষ্ট উৎসাহ। পরদিন সকালে এই কল্পনায় রেশ নিয়ে সে জেগে উঠল। উঠেই প্রথমে মনে হ'ল, এ সময়ে মৃণাল থাকলে মন্দ হত না। কাজকর্ম্মের ফাঁকে দুটো একটা কথা কওয়া যেত। তাবলে—নাঃ ওদের ওপর রাগ ক'রে লাভ কি? আর টুনি যখন লিখেছে—হয়ত সত্যিই কিছু অসুখ হয়ে' থাকবে। নাও যদি হয়ে থাকে এবার একদিন গিয়ে ওদের নিয়ে আসা উচিত।

বেশ মনগুল হয়ে সে একটা হিসাব করতে আরম্ভ ক'রে দিলে—কি কি মালমসলা দরকার এবং তার কত দাম। নিজের মনেই হেসে বল্লে—বাড়ীটার চেহারা একেবারে বদলে ফেলল তারপর ওকে আনলে কেমন হয়? কাল থেকেই মেরামত সুরু ক'রে দেওয়া যাক না। কিন্তু এই রাশি রাশি খুঁটিনাটি জিনিসপত্র কোথায় কি ভাবে গুছিয়ে রেখে গিয়েছে—ওরা না এলে ত এগুলো সরানো সম্ভব নয়। একটু নিরুৎসাহ হয়ে সে প্রেসে চ'লে গেল। গিয়ে দেখে মৃণালের হাতে লেখা একটা চিঠি টেবিলের ওপর রয়েছে। খুলে পড়লে—দুটি মাত্র লাইন—

'টুনির জন্যে ভেবো না, দাদুর দেওয়া ইঞ্জিন-গাড়ী নিয়ে সে বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছে। পার ত একবার এসো।'

হরিধন চিঠিটা প'ড়ে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলে। এদের বুদ্ধিশুদ্ধি যদি বিন্দুমাত্র থাকে। টুনি একটা অসুখের খবর দিলে তারপর এই চিঠিখানা এলো তাতে ভাল আছে কি মন্দ আছে সে কথা চুলোয় যাক্—অসুখের কোন উল্লেখই নেই। এদের নিয়ে কখন সংসার করা চলে। মরুক-গে, ভেবে লাভ কি? যাদের এতটুকু 'কমন সেন্স' নেই তাদের জন্যে আবার ভাবনা।—দাদু ইঞ্জিন গাড়ী কিনে দিয়েছেন!—ছেলেদের খেলনার সম্বন্ধে কি 'আইডিয়া'!

হরিধনের বিরক্তির অভিব্যক্তি আভ্যন্তরিক থেকে ক্রমশঃ সশব্দ হ'য়ে উঠল। ম্যানেজার দু'একবার উঁকি ঝুঁকি মেরে ঘরে ঢুকে বল্লে—কালকের সেই মাড়োয়ারীটা এসেছে। তার সঙ্গে এখন কথা কইবেন?

হরিধন পূর্ব্বতন রাগের জের টেনে বল্লে—নিশ্চয়ই! তা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়। অত বড় কণ্ট্রাক্ট—আপনাদের সব হল কি?

ম্যানেজার মাথা চুলকোতে চুলকোতে বেরিয়ে গিয়ে লোকটাকে ডেকে আনলে। তার সঙ্গে একটু কথা ক'রেই হরিধন বুঝলে খুব শাঁসাল মক্কেল। অসম্ভব দর হেঁকে বসলে। লোকটা একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্লে—বাবু যদি সেদিন আটটার পর তার মনিবের সঙ্গে দেখা করেন তাহ'লে একটা নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারে।

হরিধন রাজি হল। মাড়োয়ারীটা চ'লে গেলে হরিধন আত্মপ্রসাদে হা হা ক'রে হাসতে লাগল। ম্যানেজারকে বল্লে—দেখলেন ত', ব্যবসা কাকে বলে? খদ্দের বুঝে দর। যা চেয়েছি ও যদি তার অর্দ্ধেকও দেয় তাহলেও আমার ফিফটি পারসেন্ট লাভ। আপনি হ'লে কত দর বলতেন?

ম্যানেজার গোঁফটা পাকিয়ে একটু তোষামোদ করবার চেষ্টায় কি বলতে যাচ্ছে এমন সময় বাইরে কে হাঁকলে—বাবু, টেলিগ্রাম।

শ্বশুরের টেলিগ্রাম।—'মৃণাল সাংঘাতিক পীড়িত, বিকালের ট্রেনে অবশ্য চ'লে আসবে।'

হরিধন বড়ই ভাবিত হয়ে পড়ল। ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলে—তাহ'লে আপনার দু'একটা জিনিষপত্র গুছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব কি?

হরিধন উত্যক্তভাবে বল্লে—কি যে আপনাদের বুদ্ধি—জিনিষপত্র গুছিয়ে নেওয়াটাই কি শক্ত কাজ হল? 'আমি কোথায় ভাবছি মাড়োয়ারীটার কথা।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লে—তাই যদি কি অসুখ সেটা শ্বশুরমশায় জানাতেন তাহ'লে অন্ততঃ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা ক'রে ওষুধপত্র নিয়ে যাওয়া যেতো। এখন আমার আজ যাওয়া যা, কালকে যাওয়াও তাই। আমি গিয়েই বা আর কি সাহায্য করতে পারি?

ম্যানেজার বল্লে—কিন্তু তাহলেও অসুখের খবর পেয়ে আপনার না যাওয়াটা কি ভাল দেখায়?

যাচ্ছি না আপনাকে কে বল্লে? ভাল দেখায় কি খারাপ দেখায় সে আমি কেয়ারও করি না।—আগে কাজ, না আগে 'সেন্টিমেন্ট'? যা বিন্দুমাত্র বোঝেন না তাই নিয়ে সমানে তর্ক ক'রে যাবেন—ঐত আপনাদের দোষ।

সেদিন হরিধনের যাওয়া হল না। পরের দিন সকালে উঠে সে অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে পড়ল। ম্যানেজারকে অনবরত মনে করিয়ে দিতে লাগল—তার তোয়ালে, সাবান আর টুথ ব্রাশটা সুটকেশের মধ্যে দিতে যেন না ভুল হয়। খেয়ে দেয়ে উঠে বেলা একটার সময় তার মনে পড়ল সঙ্গে একখানা বইটই নেওয়া দরকার—সারারাত ট্রেনে জাগতে হবে একটা বই না হ'লে চলবে না। একটা চাকরকে লাইব্রেরীতে পাঠিয়ে খবর পেলে তখন লাইব্রেরী বন্ধ। ম্যানেজারের নির্বুদ্ধিতাকে গালাগালি দিয়ে স্থির করলে ষ্টেশনে বুক ষ্টল থেকে যাহোক্ একটা কিনে নেবে।

বিকেলে যথা সময়ে মেলের একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠে গাড়ী ছাড়ার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ম্যানেজারকে প্রেস এবং নতুন কণ্ট্রাক্ট সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে হরিধন শ্বশুরালয়ে রওনা হল।

বাড়ী মেরামতের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে—কে বলবে এই সেই পুরানো বাড়ী।

হরিধনের নিজের শোবার ঘরটা সৌখীন নানা আসবাবে পরিপূর্ণ। রাত্রি আটটা। হরিধনের কয়েকজন বন্ধু সেই ঘরে ব'সে গল্পসল্প করছে। হরিধন নিজেই তাদের সেদিন আসতে নিমন্ত্রণ করেছিল কিন্তু এখনো তার দেখা নেই। ম্যানেজার মাঝে মাঝে এসে তাদের আশ্বাস দিচ্ছে—বাবু এই এসে পড়লেন ব'লে। সাড়ে আটটার সময় হরিধন এসে পৌছল। হাতে একটা কাগজ-মোড়া প্রকাণ্ড বাঁধান ছবি। এসেই বন্ধুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে এবং অল্প দু'চারটে কথা ক'য়ে ম্যানেজারকে দিয়ে প্রেসের কয়েকজন কর্মচারীকে ডাকিয়ে পাঠালে। তারপর তাদের সঙ্গে অনেক বকাবকি ক'রে শেষ পর্য্যন্ত তার মনোমত ভাবে ছবিটা টাঙান হল।

বন্ধু বিপিন ইংরাজিতে বল্লে,—বাস্তবিক, হরিধন একটি রত্ন হারিয়েছে।

হরিধন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে—এমন শান্ত স্বভাবটি ছিল যে, যেই দেখত মুগ্ধ না হ'য়ে পারত না।

সুরেশ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বল্লে—ওই ত হল 'ট্র্যাজেডি'। ভাল জিনিসটিই আগে যায়।

নগেন চুপ ক'রে ছিল। বল্লে—তোরা কি ছেলেমানুষি করছিস্? কোথায় তোরা হরির মন ওদিকে যাতে না যায় তাই করবি—তা নয় কেবল ঐ কথাই তুলছিস। হ্যাঁরে হরি—ওধারের বারান্দাটা অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে—ওর মেঝেটা সিমেণ্ট করলি না কেন?

হরিধন একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লে—ওই খানটায় সে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসতো—তাই ওটাতে আর হাত দিতে ইচ্ছে হ'ল না। সারাতে একদিন হবেই—ব'লে মুখটা গম্ভীর ক'রে রইল।

এমন সময় হঠাৎ প্রকাশ ম্যানেজারের সঙ্গে এসে ঢুকল। ঘরের চাকচিক্য এবং অত বন্ধু সমাগম দেখে হরিধনকে বল্লে—জামাইবাবু, একটু কথা আছে।

হরিধন তাকে নিয়ে পাশের ঘরে গেল। প্রকাশ নীরস স্বরে বল্লে—দিদির এই গয়নার বাক্সটা প'ড়েছিল তাই দিতে এলুম।

হরিধন বল্লে—তা এটা দেবার জন্যে তোমার এত কষ্ট ক'রে আসবার কি দরকার ছিল। যাহোক, কাপড় চোপড় ছেড়ে ফেল।

না, আমি এখুনি যাব।

না না—তা হবে না। চল, ঐ ঘরে চল।

প্রকাশ ধরা গলায় বল্লে—মাপ করবেন। দিদি আজ এক সপ্তাহও হয়নি গিয়েছেন। এর মধ্যে আমার আনন্দ করবার প্রবৃত্তি নেই।

তুমি একে আনন্দ বল? ওঁর এন্‌লার্জ করা ফটোটা আজ টাঙাব তাই বন্ধুদের ডেকেছি। ওঁরা সকলেই আমার দুঃখ participate করছেন।

বেশ ত, আপনি আপনার বন্ধুদের নিয়ে সমারোহ ক'রে ফটো টাঙান—আমার তা'তে যোগ দেবার ইচ্ছে নেই।

প্রকাশ চলে যাচ্ছে—হরিধন ফিরে ডাকলে। গম্ভীর স্বরে বল্লে—শোনো। মাসকয়েক আগে তোমার বাবা তোমার জন্যে একটা চাকরি দেখতে বলেছিলেন। আশি টাকা মাইনের একটা চাকরি আমার হাতে আছে—তুমি করবে কিনা ব'লে যাও। আমি সেই বুঝে ব্যবস্থা করব।

এইবার প্রকাশের স্বরের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটল। লজ্জিতভাবে মাথা নীচু ক'রে বল্লে—আচ্ছা, আমি কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে হরিধন বল্লে—ভাই, তোমরা একটু বসো—আমায় আধ ঘণ্টার জন্যে একবার প্রেসে ঘুরে আসতে হবে। বুঝলে বিপিন, জীবনে দুঃখ করবারও অবসর নেই। যেখানে করবার কিছু নেই সেখানে মিছে দুঃখ মনে পুষে রেখে লাভ কি? সেণ্টিমেণ্টে সংসার চলে না। একমাত্র সান্ত্বনার উপায়—কাজের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। ব'লে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল।

বিপিন বল্লে—Poor fellow! 'শক'টা বড্ডই লেগেছে। নিজের মনকে অনবরত চোখ ঠারবার চেষ্টা করছে, পেরে উঠছে না।

শ্রীললিত ঘোষ

সাহিত্যে নোবেল-প্রাইজ

শ্রীযুক্তা অমিয়া দত্ত

কার্দ্দুসী (Giosue Carducci)

জন্ম—১৮৩৫ ; মৃত্যু—১৯০৭ ; প্রাইজলাভ—১৯০৬।

সমসাময়িক কালের ইতালীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কার্দ্দুসী, ৭০ বৎসর বয়সে, ষষ্ঠবারের 'নোবেল'-প্রাইজ লাভ করেন।

২৭এ জুলাই, ভাল্-দি-কাষ্টেলো শহরে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতা ছিলেন ডাক্তার। কার্দ্দুসী ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই রাজনৈতিক কারণে তিনি কারারুদ্ধ হন। পরে টুস্কানি শহরে যখন তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন, কবির বয়স তখন তিন বৎসর।

১৮ বৎসর বয়স হইতেই কার্দ্দুসী গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন। যীশুখৃষ্ট অপেক্ষা গ্রীস ও রোমের দেবতারা তাঁহার নিকট অধিকতর জীবন্ত। প্রাচীন যুগের কবিদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি অপরিসীম। হোমার, ভার্জ্জিল, দান্তে প্রভৃতির উপর তিনি কতকগুলি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ প্রাচীন সাহিত্যের (classics) জয়গান করাই তাঁহার কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য।

১৮৬৯ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'Hymn to Satan' বা 'সয়তান-স্তোত্র' একদিনেই তাঁহাকে বিখ্যাত করিয়া তোলে। এই কবিতা ভাবে ও ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার 'সয়তান' আধুনিক ক্রমোন্নতির দৈহিক মূর্ত্তি; ইহা মিল্টন্ বা গেটে বর্ণিত সয়তান নয়। কবি সয়তানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"হোক্ জীব, হোক্ জড়, লৌকিকের জ্ঞান,
যুক্তি-বাদ—নিখিল-প্রধান
বিরাট কারণ সেই প্রথম সবারি—
অশরীরি কিবা দেহধারী,—

জাগো, ওগো জোয়রাজ, জাগো সয়তান,
ভুলে সুরে ধরি এই তান
দুঃসাহসে ভরি' রাগ, মুক্তি মাগি' প্রাণে
অবহেলি' প্রাচীন বন্ধনে।

* * *

বন্দি তোমা' বারবার বন্দি সয়তান,
বন্দি হে বিপ্লব মূর্ত্তিমান,
বন্দি হে বিচার-বুদ্ধি, পৃথ্বী-ব্যাপি' রও,
দৃঢ় হও, প্রতিশোধ লও।

* * *

উঠ, জাগো, অর্চ্চনায় মগ্ন পুরোহিত,
ধূপধুনা-গন্ধে সুবাসিত,
আদিযুগে পরাভূত, অধুনা জাগ্রত—
দেব-রূপে,—কীর্ত্তিমান, খ্যাত।"

কার্দ্দুসী ছিলেন প্রকৃত শিল্পী। লিখন-ভঙ্গীর নূতনত্বে, ভাবের গভীরতায় ও শিল্পসৌন্দর্য্যে তাঁহার অধিকাংশ লেখা সমুজ্জ্বল। তাঁহার 'কল্পনার প্রতি', 'মা', 'রাত্রি' প্রভৃতি কবিতা সুপ্রসিদ্ধ। ইংরাজীতে তাঁহার কবিতার একাধিক অনুবাদ আছে।

বিবাহিত জীবনে তিনি সুখী ছিলেন। তাঁহার তিন কন্যা ও এক পুত্র। কনিষ্ঠা কন্যার তিনি রূপক নামকরণ করেন—'স্বাধীনতা'। তিন বৎসর বয়সে তাঁহার একমাত্র পুত্র দান্তের মৃত্যুতে তিনি গভীর শোকে মুহ্যমান হন। এই সময়ে যে করুণ কবিতাগুলি লেখেন, পুত্রকে একবার চাক্ষুস দেখিবার আকাঙ্ক্ষা তাহাতে প্রবল। পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি এক বন্ধুকে লেখেন,—"লোকে বলে ৩ বৎসরের ছেলে মারা গেছে, তার জন্য এত দুঃখ কি, এ শোক সহজেই ভোলা যায়। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। আমার

জীবনের তিন ভাগ সে সঙ্গে নিয়ে গেছে। বড়ই একলা মনে হয়।"

৪৪ বৎসর ধরিয়া কার্দ্দুচী বোলোঞা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৯৯ সালে পক্ষাঘাতে তিনি কতকটা পঙ্গু হইয়া পড়েন। প্রিয়তম ছাত্র ফেরারীর সাহায্যে তথাপি অধ্যাপনা-কার্য্য করিতেন। যখন 'নোবেল' প্রাইজ পাইলেন, চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার ক্ষমতাও তখন তাঁহার ছিল না। সুইডেনের রাজা এক প্রতিনিধির হাতে তাঁহাকে চেক্, ডিপ্লোমা প্রভৃতি পাঠাইয়া দেন। এই সম্মান-লাভের পর তিনি মাত্র দুই মাস জীবিত ছিলেন।

জিওস্যু কার্দ্দুচী

বোলোঞাতে সহস্র সহস্র অনুরক্ত ভক্তেরা তাঁহার শবানুগমন করে। মৃত্যুর পর ইতালীর রাণী মার্গারেট্ তাঁহার মূল্যবান লাইব্রেরী ও সুন্দর বাগান-সমেত বাসগৃহ ক্রয় করেন এবং ইতালীর জনসাধারণকে কবির স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ উহা দান করেন। উক্ত গৃহ ও লাইব্রেরী এখন জাতীয় সম্পত্তি।

কার্দ্দুচীর দেশাত্মবোধক সঙ্গীতগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইতালীর একতার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ ঐ সকল সঙ্গীতে সুস্পষ্ট।

কিপ্‌লিং (Rudyard Kipling)

জন্ম—১৮৬৫; প্রাইজলাভ—১৯০৭

ইংরাজ কবি ও গল্পলেখক কিপ্‌লিং-এর জন্ম—পাঞ্জাবের রাধিয়ার হ্রদের নিকট। তাঁহার পিতা জন্ কিপ্‌লিং কিছুদিন লাহোরের আর্টস্কুলের ডিরেক্টার ছিলেন। পড়াশুনার জন্য অল্পবয়সেই তিনি ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। কিন্তু সেখানকার ছেলেদের সহিত ভাল করিয়া মিশিতে পারিতেন না। ১৮৮০ সালে ভারতবর্ষে ফিরিয়া তিনি সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। এলাহাবাদের হুইলার কোম্পানী তাঁহার প্রথম পুস্তক-প্রকাশক। পঁচিশ বৎসর বয়সে কিপ্‌লিং স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। সেখানে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় ধীরে ধীরে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইতে থাকে। 'তিনটি সৈনিক', 'জাতি-পঞ্চক', 'তাহারা', 'কিম্', 'জঙ্গলগ্রন্থ' প্রভৃতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। সাধারণ সৈনিকের মনোভাব প্রকাশে তিনি অদ্বিতীয়; তাঁহার 'ব্যারাক্রুম্ ব্যালাড্' ইহার দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গল্প লিখিয়াই কিপ্‌লিং প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অল্প বয়সে যাঁহারা 'নোবেল' প্রাইজ পাইয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম; মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে ঐ সম্মানের অধিকারী হন।

দার্শনিক হিসাবে কিপ্‌লিংয়ের স্থান উচ্চস্তরের নয়, বিশেষতঃ 'দর্শন' অর্থে যেখানে যুক্তি-তর্কপূর্ণ বিচার বুঝায়। সক্রেটীস্ ও সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ তাঁহার নিকট হেয়, কিন্তু পিজারো, বা ক্লাইভকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন এবং লুণ্ঠনকারী নৃপতিদিগের কীর্ত্তিতে প্রভূত আনন্দ পান। তিনি হেঁয়ালিময়, শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ও যুদ্ধব্যঞ্জক সাহিত্যের রচয়িতা। ন্যায়, ধৈর্য্য, নম্রতা, শান্তির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, এগুলির কোন অর্থ তাঁহার কাছে নাই। সহৃদয়তার একান্ত অভাব তাঁহার লেখায় পরিলক্ষিত হয়। তিনি ঘোর সাম্রাজ্যবাদী এবং জড়শক্তির কবি।

প্রথম বয়সের রচিত কতকগুলি পুস্তকে কিপ্‌লিং স্বহস্তে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেন; এই চিত্রগুলিতে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে মর্গ্যান্ নামে এক ভদ্রলোক পঞ্চাশ হাজার টাকায় উক্ত 'সচিত্র গ্রন্থাবলী' ক্রয় করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে কিপ্‌লিং অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। ৫।৬০ পৃষ্ঠায় একটি ছোট-গল্পের জন্য তিনি অনায়াসেই অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা পাইয়া থাকেন।

প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় ভাষাতেই কিপ্‌লিংয়ের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ আছে। ইনি এখনও জীবিত। 'বানর' নামে তাঁহার একটি কবিতা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

রাডিয়ার্ড্ কিপ্‌লিং

একটা বানর ব'সেছিল সরল গাছের শাখে,
আমি ব'সে ভাব্‌ছিলাম 'সে খায় কি ? কোথায় থাকে ?'
অলস ভাবে ভাব্‌তে এবং চাইতে চাইতে ক্রমে,
কখন চক্ষু পড়্‌ল ঢ'লে, ঘুম এল ক'মে।
স্বপ্নে দেখি বল্‌ছে বানর—ওহে "পোষাকধারী !"
দেখ্‌ছ ? আমার নেইক ফর্দ্দি, নেই কোনো দিক্‌দারী,
মাসে মাসে নেই তাগাদা, পরিনে হ্যাট্ কোট্,
নেইক দিতে খাজা-সভায় নিমন্ত্রণের চোট্।

*   *   *

ম্যালেরিয়ায় ভয় করিনে, নেইক দেনার দায়,—
"মানুষ জাতটা দেখ্‌লে আমার বড্ড হাসি পায়।"
হঠাৎ জেগে দেখি আমার মাখন-মাখা রুটি—
সংগ্রহ-না ক'রে বানর আছেন গাছে উঠি !
মুখখানা তার রক্তবর্ণ গায়েতে লোম কত।
খেতে খেতে চুলকায় মাথা, ঠিক বানরের মত।
শিষ্ট সে নয়, সভ্য সে নয়, নেহাৎ হনুমান,
(তবু) সাদাসিধে বানর হ'তে চাইলে আমার প্রাণ।
বল্লাম তারে "ভদ্র বানর ? কর্‌লেন অন্তর্যামী
খোস্ মেজাজী বানর তোমায়, আমায় কর্‌লেন আমি !
বিদায় বন্ধো ! শনৈঃ শনৈঃ যাচ্ছ আপন ঘরে,
ভুল' না, হায়, তুমি হ'তে ইচ্ছা করে নরে।"*

অয়কেন্ (Rudolf Eucken)

জন্ম—১৮৪৬ ; প্রাইজ-লাভ—১৯০৮

মম্‌সেন্ 'নোবেল' প্রাইজ পাইবার ছয় বৎসর পরে পুনরায় একজন জার্ম্মান পণ্ডিত উহা লাভ করেন। তাঁহার নাম রুডল্‌ফ্ অয়কেন্। তিনি পূর্ব্ব ফ্রীস্‌ল্যাণ্ড্ জেলার অধিবাসী। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতা সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি পুত্রকে উচ্চশিক্ষিত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। অয়কেন্ তাঁহার আত্মজীবনীতে তাঁহার মাতার অশেষ গুণগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন।

পড়াশুনা শেষ করিয়া অয়কেন্ বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই তিনি প্রাচীন যুগের দার্শনিক আরিষ্টট্‌ল্ প্রভৃতির উপর প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

১৮৭৩ সালে তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসেন। এখানে খ্যাতনামা ফিসার হেকেল প্রভৃতিকে বন্ধুরূপে লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। ১৮৭৮ সালে তাঁহার "বর্ত্তমান যুগের দার্শনিক চিন্তাধারার মূলসূত্র" (Fundamental Concepts of Modern Philosophic Thoughts) নামক গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গেই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইতিহাস এবং সমালোচনার মধ্যে ঐক্য ও সুসঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান

* "তীর্থরেণু"—সত্যেন্দ্রনাথ।

অধ্যাপকের অনুরোধে অল্পদিনের মধ্যেই ইহার ইংরাজী অনুবাদ বাহির হয়।

উপরোক্ত পুস্তক ব্যতীত তাঁহার "Life of the Spirit", "Contribution to the History of Modern Philosophy" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

১৮৮২ সালে তিনি আইরিন্ প্যাসোকে বিবাহ করেন। ইঁহার মাতা এথেন্সের বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক উল্‌রিকের কন্যা। এই বিবাহের ফলে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মহলে অয়কেনের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা বাড়িয়া যায়।

১৯১১ সালে তিনি আমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে যান ও যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন। জীবন-সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি সকল জাতিরই সহযোগিতা খুঁজিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, প্রাচ্যদেশেও তিনি তাঁহার আদর্শ দর্শনের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিবেন; কিন্তু ইউরোপীয় মহাসমরের জন্য তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

ইউরোপের অনেক চিন্তাশীল মনীষীর মতে অয়কেন্ বর্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তাঁহার গ্রন্থরাজি নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সত্য অনুসন্ধানের আগ্রহ ও সূক্ষ্মচিন্তাশক্তির পরিচয় তাঁহার সকল গ্রন্থেই বিদ্যমান। তিনি পৃথিবীর আদর্শ দর্শনের অনুশীলন ও তাহার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

সেল্‌মা লাগেরলফ্ (Selma Lagerlof)

জন্ম—১৮৫৮; প্রাইজ-লাভ—১৯০৯

১৯০৯ সালের 'নোবেল' প্রাইজ এই প্রথম একজন মহিলা লাভ করেন। ইনি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সেল্‌মা লাগের্‌লফ্—এখনও জীবিতা। ২০শে নভেম্বর সুইডেনের ভের্ম্‌ল্যাণ্ডের অন্তর্গত 'মার্‌বাকা' নামক ভবনে তাঁহার জন্ম। তিন বৎসর বয়সে তাঁহার পক্ষাঘাত হয়; তাহার ফলে অনেকদিন তিনি হাঁটিতে পারেন নাই। পরে আরোগ্যলাভ করেন বটে, কিন্তু পায়ের দুর্ব্বলতা কতকটা রহিয়াই গেল। শিশুসুলভ খেলাধূলায় যোগদান অসাধ্য, অগত্যা কল্পনা রাজ্যে বিচরণেই সেল্‌মা অভ্যস্ত হইলেন।

সেল্‌মার পিতা লেফ্‌টন্যান্ট লাগেরলফ্ সদানন্দ-প্রকৃতি ও জনপ্রিয় লোক ছিলেন। পিতাকে সেল্‌মা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। পিতাপুত্রীর মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ নিবিড় ছিল, তাহা ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত সেল্‌মার "বার্চ-বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে" নামক কবিতায় সুপরিস্ফুট। তাঁহার কথাবার্ত্তায় এবং লেখায় সুগভীর গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হইলেও পিতার প্রসঙ্গে তাঁহার ভাষা আপনা হইতেই আনন্দ-উজ্জ্বল হইয়া পড়ে। ১৮৮৩ সালে পিতার মৃত্যু হয়। ইহার তিন বৎসর পরে আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তিনি ঘরবাড়ী বিক্রয় করিতে বাধ্য হন।

সেল্‌মার মাতা এক পাদ্রীর কন্যা। তিনি স্নেহশীলা, শান্তপ্রকৃতি ও গৃহকর্ম্ম-নিপুণা ছিলেন। বন্ধুবান্ধব ও অতিথি-অভ্যাগতের জন্য তাঁহার গৃহ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত।

পড়াশুনা শেষ করিয়া সেল্‌মা ল্যাণ্ড্‌স্-ক্রোণায় শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্তা হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্য-অনুরাগিনী—অধ্যয়নের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ। নিজ মাতৃভাষা ব্যতীত তিনি আরও ছয়টি বিভিন্ন ভাষা জানেন। দেশবিদেশের খবরও তিনি যথেষ্ট রাখিয়া থাকেন। সেল্‌মা নিজেই বলিয়াছেন যে পড়িতে শিখিবার সঙ্গেসঙ্গেই তাঁহার লিখিবার বাসনা জাগে। প্রথমে তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৭ সালে 'Dagny' নামক পত্রিকায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়, কিন্তু উহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ইহার পর তিনি বাল্যকালে পিতামহীর নিকট হইতে শ্রুত ও তাঁহার জন্মস্থানে প্রচলিত কাহিনীগুলির মধ্য হইতে রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া গল্প ও উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯০ সালে 'Idun' পত্রিকায় ১০০ পাতার ছোট একটি উপন্যাসের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ভগিনীর অনুরোধে সেল্‌মা তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস "গোস্টা বের্লিং" (Gosta Berling) এর পাঁচটি অধ্যায় উহাতে পাঠাইয়া দেন। দিন কয়েক পরে জানা যায়—প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। পরীক্ষকগণ তাঁহার

রচনা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলেন, অদূর ভবিষ্যতে এই লেখিকা বিশ্ব-বিশ্রুত হইবেন। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক উপন্যাসখানি প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইলে ব্যারোনেস্ অ্যাডারস্পারের যত্নে ও চেষ্টায় তিনি স্কুল হইতে এক বৎসরের ছুটি পাইয়া পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করেন। প্রথমে ইহা সেরূপ জনপ্রিয় হয় নাই; কিন্তু বিখ্যাত সমালোচক জর্জ্জ ব্র্যাণ্ডেসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বাহির হইলে সেল্‌মা

সেল্‌মা লাগেরলফ

লাগেরলফের নাম সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৫ সালে "গোষ্টা বের্লিংয়ের" দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইলে, তিনি রাজার নিকট হইতে দেশভ্রমণের জন্য বহু অর্থ পুরস্কার পান এবং ইতালী, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, জার্ম্মানি ও বেল্‌জিয়ামে ভ্রমণ করেন। পুনরায় ১৮৯৯ সালে তিনি ভ্রমণে বাহির হন এবং ঈজিপ্ট, প্যালেষ্টাইন, তুরস্ক, গ্রীস, ডেন্‌মার্ক, ইংলণ্ড প্রভৃতি প্রায় সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আসেন।

"Gosta Berling", "The Wonderful Story of Nils", "Jerusalem", "From a Swedish Homestead", "The Miracles of the Anti Christ", "Emperor of Portugallia", "The Outcast" প্রভৃতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনসমাদৃত পুস্তক। ইউরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই তাঁহার গ্রন্থরাজির অনুবাদ আছে। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস গোষ্টা বের্লিংয়ের ছায়াচিত্র সুইডেনে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে সুখ্যাতির সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। বাংলায় সেল্‌মার কোন প্রসিদ্ধ উপন্যাসের এ পর্য্যন্ত অনুবাদ হয় নাই; ইহা একান্ত দুঃখের বিষয়।

উপরোক্ত পুস্তকগুলির ভিতর "পোর্টুগালের সম্রাট"ই সম্ভবতঃ তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তিনি নিজেও ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। স্থূলবুদ্ধি ও পরিশ্রমী জ্যানের চরিত্র এবং কন্যা গ্লোরীর উপর তাহার স্নেহ অতি দক্ষতা-সহকারে অঙ্কিত হইয়াছে। জ্যানের পিতৃস্নেহ এরূপ প্রবল যে, লোকে যখন তাহার কন্যার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখনও সে তাহার উপর বিশ্বাস হারাইল না। অবশেষে সে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া কন্যাকে অহঙ্কার, কঠিনতা, লালসা ও অধর্ম্মের হস্ত হইতে রক্ষা করিল। ফরাসীরা এই গল্পটিকে বলে, "পিতৃস্নেহের মহাকাব্য—"সুইডেনের 'Father Goriot'। শেষোক্ত উপন্যাসখানি বিশ্ব-বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ব্যালজাকের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

১৯১৮ সালে "সমাজচ্যুত" প্রকাশিত হয়। আর্টের দিক দিয়া ইহা "গোষ্টা বের্লিং" বা "পোর্টুগালিয়ার সম্রাট" হইতে নিকৃষ্ট। কিন্তু ইহার গল্পাংশ ও চরিত্রচিত্রণ সুন্দর। ইউরোপীয় মহাসমরের ভীষণতা এই গল্পের ভিত্তি। ইহার প্রেমের দৃশ্যগুলি সরল ও সাদাসিধা, অথচ কবিত্বময়।

সেল্‌মা লাগেরলফের অধিকাংশ লেখা জীবনের সাধারণ ঘটনা হইতে গৃহীত। মৌলিকতা ও কল্পনা-সৌন্দর্য্যে তাহা সমুজ্জ্বল। তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি এবং ঘটনা-সংস্থাপন জাতীয়তায় পূর্ণ, কিন্তু তাঁহার মনোভাব ও বাণী দেশকালের অতীত, বিশ্বজনীন।

১৯০৪ সালে তাঁহার 'জেরুস্যালেম' নামক পুস্তক বাহির হইবার পর সুইডিশ বিদ্যাপীঠ (Swedish Academy) তাঁহাকে স্বর্ণপদক এবং উপ্‌সালা বিশ্ববিদ্যালয় 'ডক্টর' উপাধি প্রদান করেন। আলেকজান্দ্রিয়া এবং প্যালেষ্টাইনের সত্য ঘটনার উপর 'জেরুসালেমের' ভিত্তি। প্রবল অনুভূতি,

পুরাবৃত্ত জ্ঞান, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং সূক্ষ্ম চরিত্রচিত্রণে পুস্তকখানি অতুলনীয়। ইঙ্গমার্সন্ পরিবার এবং গ্রীটা, কারিন প্রভৃতির চরিত্র জীবন্ত।

১৯০৭ সালের ২৪শে মে তাঁহাকে বহু সম্মান সহকারে 'লরেল' মুকুট প্রদান করা হয়। ১৯০৮ সালে সেল্‌মার পঞ্চাশৎ জন্মতিথিতে সুইডেনের অধিবাসীরা আনন্দ-উৎসব করিয়াছিল। তখনই তাঁহাকে নোবেল প্রাইজ দিবার কথা হয়? পর বৎসর তিনি ঐ পুরস্কার লাভ করেন—"সুমহৎ আদর্শবাদ, উচ্চকল্পনাশক্তি ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের জন্য"। পুরস্কার গ্রহণকালে সেল্‌মা যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। আত্মম্ভরিতার লেশও তাহাতে ছিল না। বিস্মিত ও মুগ্ধচিত্তে সকলে শুনিল যে স্নেহময়ী কন্যা সজল নয়নে স্বর্গগত পিতাকে এই আনন্দ সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। এই বক্তৃতার শেষাংশ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

১৯১১ সালে আন্তর্জাতিক মহিলা কংগ্রেসে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা নানাভাষায় অনূদিত ও আলোচিত হইয়াছিল। বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, জগতে পুরুষ গড়িয়াছে রাষ্ট্র, নারী গড়িয়াছে গৃহ। রাষ্ট্রকে আজ গৃহের আকারে গড়িতে হইবে, এজন্য পুরুষ ও নারীর সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। জগৎকে উন্নত করিবার পক্ষে গৃহের প্রভাব খুব বেশী। এই বৎসরেই তাঁহার "Lilliecrona's Home" প্রকাশিত হয়। ইহার ঘটনাস্থান ভের্ম্‌ল্যাণ্ড, এবং নায়কের গৃহের সহিত লেখিকার নিজের গৃহ 'মারবাকা'র সাদৃশ্য দেখা যায়। এখানি তাঁহার সকল পুস্তক অপেক্ষা কবিত্বময় এবং গূঢ়ার্থবোধক।

'নোবেল' পুরস্কার পাইবার পাঁচ বৎসর পরে তিনি সুইডিশ্ বিদ্যাপীঠের সদস্যা নির্ব্বাচিতা হন। মহিলাদিগের ভিতর উক্ত সম্মান লাভ এই প্রথম। এত ঐশ্বর্য্য ও সম্মানের মধ্যেও সেল্‌মা লাগেরলফ্ তাঁহার জন্মস্থান 'মারবাকা'কে বিস্মৃত হন নাই। ঐ গৃহ তিনি পুনরায় ক্রয় করিয়াছেন এবং সেখানেই অধিকাংশ সময় বাস করেন। তিনি চিরকুমারী। তাঁহার মত মহিলা স্বদেশের ও বিশ্বমহিলা সমাজের গৌরব।

পল্ হায়েসে (Paul Heyse)

জন্ম—১৮৩০; মৃত্যু—১৯১৪; প্রাইজলাভ—১৯১০

জোহান্ লুড্‌উইগ্ পল্ হায়েসে ১৫ই মার্চ্চ বার্লিনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক কার্ল্ হায়েসে। তাঁহার মাতা সম্ভ্রান্ত ও ধনী ইহুদি ঘরের কন্যা। তাঁহাদের গৃহে লেখক, শিল্পী এবং অধ্যাপকগণের সমাগম হইত। এই আবহাওয়া বালক হায়েসের স্বাভাবিক প্রতিভাকে মার্জ্জিত ও উন্নত করিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভকালে তিনি স্পেনীয় ভাষা, বিশেষতঃ সার্ভেন্টিস্ ও ক্যাল্‌ডেরোণের রচনার প্রতি অনুরক্ত হন। এই সময় হইতেই তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৪ সালে বাভেরিয়ার রাজা ম্যাক্স্ মিউনিক্ রাজসভায় প্রায় কুড়ি হাজার টাকা বেতনে তাঁহাকে রাজকবি নিযুক্ত করেন। কবি গেইবেল (Geibel), ঐতিহাসিক শ্যাক্ (Schack) প্রভৃতির সহিত তিনি এইখানেই পরিচিত হন। আর্ট-ঐতিহাসিক কাগ্‌লারের বিদুষী কন্যাকে হায়েসে বিবাহ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি মিউনিকেই বাস করিয়া গিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখকদিগের ভিতর পল হায়েসের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রায় আশী বৎসর বয়সে তিনি 'নোবেল' পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার বহুমুখী, প্রতিভা উল্লেখযোগ্য। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং ছোট গল্প লেখক। সহজ জ্ঞান তাঁহার পথ প্রদর্শক; গল্প ও নাটকে দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি ইহা পরিস্ফুট করিয়াছেন। স্বাভাবিক এবং জন্মগত কুলীনত্ব যাহাদের আছে, তাঁহার ধারণায় তাহারা কোন নীচ কাজ করিতে পারে না। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গল্প-কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

"আমি কখনও সততা বা ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্য লজ্জিত নই। নিজের দোষগুণ গর্ব্বের সহিত ঘোষণাও করিনা অথবা তাহা গোপনও করিনা।

"অন্য সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও, কাপুরুষতা ও ভণ্ডামি যে নীচ লোকের স্বভাব ইহা ধ্রুব সত্য; অভিজাতগণের সহিত এইখানেই তাহাদের প্রভেদ।"

"মহৎ তিনিই, স্বীয় মর্য্যাদা ধীরভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে যিনি সক্ষম, এবং প্রতিবেশীর নিন্দা ও প্রশংসায় যিনি সম্পূর্ণ উদাসীন।"

পল্ হায়েসের—ছোট গল্পগুলি লিখনভঙ্গীর নূতনত্বে, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে এবং শিল্প-সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। তাঁহার "ক্রোধ" (L' Arrabiata) জার্ম্মান সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প। ইহার একাধিক ইংরাজী এবং বাংলা অনুবাদ আছে। ব্যাল্‌জ্যাক্ বা টুর্গেনিভের ন্যায় তাঁহার বর্ণনার আধিক্য ছিলনা, কিন্তু তিনি এরূপ আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি করিতেন, যাহা জীবন্ত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁহার—"Barbarossa" "At the Ghost Hour" এবং "The Dead Lake" এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তাঁহার উপন্যাসের ভিতর "Children of the World" এবং "In Paradise" সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তিনি প্রায় ষাটখানি নাটক লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে "Mary Magdala", "Hans Lange", "Colberg" প্রভৃতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক। "কোলবার্গে" বৃদ্ধ ভাবাতাত্ত্বিক জিপ্‌ফেলের সহিত হায়েসের পিতার অনেক সাদৃশ্য আছে। "Hans Lange" নাটকে তরুণ জমিদারের উপর প্রতিশোধ লইবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও লেখক পুরাতন ভৃত্য হেন্নিংয়ের চরিত্রে উদার প্রকৃতির জয় দেখাইয়াছেন।

হায়েসে পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা স্ত্রী চরিত্র অঙ্কনে সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে বলা হইত—"কুমারীগণের প্রিয়লেখক"। সাধারণ কুমারীর সৌন্দর্য্য, লজ্জাশীলতা, এবং প্রগাঢ় অথচ গোপন প্রেম তাঁহার পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কবিতা অপেক্ষা তাঁহার গল্প লেখাই অধিক জনপ্রিয়। তিনি বড় কাব্য এবং গীতি কবিতা দুইই লিখিয়াছেন। সমালোচক জর্জ ব্র্যাণ্ডেসের মতে বড় কাব্যের ভিতর "Salamander" এবং গীতি কবিতার ভিতর "The Fury" ও "The Fairy Child" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অসাধারণ শক্তিশালী না হইলেও হায়েসে সুপণ্ডিত, আদর্শবাদী এবং প্রকৃত শিল্পী।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমিয়া দত্ত

যুগান্তরের কথা

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী

৫

উৎসবে

—"কাটিল ক্লান্ত বসন্ত নিশা বাহির-অঙ্গন-সঙ্গী সনে,
উৎসবরাজ কোথা বিরাজে, কে লয়ে যাবে সে ভবনে।"

সেই ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপের এক পার্শ্বস্থিত অভগ্ন ঘরগুলির একটু নূতন দৃশ্য চক্ষুকে আকৃষ্ট করিতেছে। পূর্ব্বকালের সদর দ্বার ও দ্বারবানদিগের গৃহের চিহ্ন-স্বরূপ যথেচ্ছ-পতিত ইটগুলো যথাসাধ্য সরাইয়া গুছাইয়া সে স্থানে দুটা কলাগাছ রোপিত হইয়াছে। বহিরঙ্গণটি যথাসাধ্য পরিস্কৃত। অর্দ্ধভগ্ন পূজামণ্ডপটিও পরিস্কার করিয়া দুইখানা বড় বড় সতরঞ্চি পাতা হইয়াছে, ভিতর বাড়ি হইতে সামিয়ানার বাঁশ ও কাপড় দেখা যাইতেছে, এবং দরজার বাহিরে খানকতক চাটাই বিছাইয়া রসুন-চৌকি ওয়ালারা সদলে বসিয়া তাহাদের পোঁ ধরিয়াছে। বাড়ির ভিতরে তখন ঘন ঘন উলু ও শঙ্খধ্বনি হইতেছিল। বরের সে দিন গাত্র-হরিদ্রা।

কিশোর বর অতি নিরীহ লোকটির মত পীড়ির উপর বসিয়া আছে, পরণে নূতন লালপেড়ে ধুতি, কাঁধে রঙ্গিন গামছা! সধবা বধূ ও কন্যাগণ তাহার চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনেক গৃহিণী বলিলেন, "যেন জোড়া হয় না, সাতে কিম্বা ন'জনে হলুদ দিও।"

"তাই হয়েছে, হরির বৌকে বাদ দেওয়া গেল।"

"কেন হরির বৌ বাদ্ কেন?"

একজন চোখ টিপিয়া বলিল, "ওযে দ্বিতীয় পক্ষ!"

"হ্যাগো খুড়িমা, ক'বার হলুদ ছোঁয়াতে হয়?"

"আমার কেন জিজ্ঞাসা করছ বাছা, তোমরা ত সব জান। সাতবার বুঝি, না, বড় বৌমা?" "বাজনেরে মিন্সেরা করছে কি? বাজাতে বল্‌না! কিশোরী শাঁখ বাজা। সাতজন "এয়ো" হলুদ হাতে নিয়ে বরের কপালে ছুঁইয়ে দাও! উলু দাওনা সবাই! দেখিস্ লো কাপড়ের বাতাসে প্রদীপ যেন খবরদার নেবে না।" "মেজ বৌমা! তুমি এসব কর বাছা, ওদেরও ব'লে ব'লে দাও, আমি রান্না বাড়ী চল্‌লাম, সেদিকের কতদূর যোগাড় হল দেখি!"

"বারবেলা পড়বে বারবেলা পড়বে!" বাহির হইতে চীৎকার করিতে করিতে পরামাণিক ভিতরে প্রবেশ করিল। রসুনচৌকি তাহার পোঁ ধরিল, বাঙলা বাদ্য মহা সোরগোল বাধাইয়া তুলিল। বালক-বালিকারা গায়ে হলুদ দেখা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বাজন্দারদের নিকটে ছুটিয়া গিয়া অবাক্ ভাবে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

শঙ্খ ও হুলুধ্বনির মধ্যে পাত্রের গাত্র হরিদ্রা শেষ হইল। বড় বৌ ডাকিলেন, "খুড়িমা তুমি আগে আশীর্ব্বাদ কর, তবেত সবাই করবে।" "তোমরাই করনা বাছা, তা হলেই সব হবে!" "না না তা কি হয়?" সকলের নির্ব্বন্ধে খুড়শাশুড়ী কুণ্ঠিতভাবে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ধানদুর্ব্বার পাত্রখানা সকলের হাতের নিকটে ধরিতে লাগিলেন। আশীর্ব্বাদ-ক্রিয়া শেষ হইলে খুড়িমা সকলের হাতে পান সুপারী সন্দেশ ও সধবাদের ললাটে সিন্দুর দিয়া দিলেন। ওদিকে বালিকামহলে রং মাখানর ধুম পড়িয়া গেল। শুধু বালিকারা নয়, শেষে সকলেই সে পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পরস্পরকে রঙ্গে ডুবাইতে লাগিলেন। একজন বয়স্কা বধূ বরকে তৈল মাখাইতে লাগিল। পান সুপারি দেওয়া শেষ হইলে খুড়িমা বলিলেন, "আর দেরী ক'রনা, সবাই তেল হলুদ মেখে নেয়ে এস। বড় বৌমা, তোমরাও নাইতে যাও বাছা। তুমি ছোট বৌমা, গোপালের বৌকে নিয়ে নিয়িমিয়ে যাও। ওবাড়ীর মেজবৌমা নবৌমা মুকুয্যেবৌমা তোমরা সব রাঁধে যাও, আরও যাকে পাও জুটিয়ে নাও। তোমাদের জল বাটনা ঝিয়েরা দেবে। কিশোরী, আইবড় ভাতের পরমান্ন রাঁধ্‌বি কি বলিস্?" "হাঁ, ছোট ঠাক্‌মা হাঁ, আমি কাকার পায়েস রাঁধব!"

"সে তবে আর রং খেলিস্‌নে! হলুদ মাখলিনে? একালের মেয়েরা হলুদ মাখে না! আমরা সেকালে বিয়ে বাড়ীতে কত হলুদ মেখেছি,—না বড় বৌমা?"

মেজবৌ সহাস্যে বলিলেন, "দুঃখ ক'রনা বাছা, তোমার ছেলের গায়ে তার শোধ তুলে দিয়েছে! অমনি ক'রে কি হলুদ তার বরের গায়ে! ভারত অন্যায়! ঠাকুরপো তুমিই বা কেমন? ছুঁড়ীগুলো যা খুসী করছে আর চুপ ক'রে আছ?" সেজবৌ কলহাস্যে বলিলেন, "চুপ ক'রে থাক্‌বেনা ত আজও তেরি মেরি' করবে নাকি? পাঁচদিন চোরের একদিন সাধের!" মেজবৌ বলিলেন, "আর ভাই ঠাকুরপোকে নাইয়ে দি, নইলে ওরা আরও দুর্দ্দশা করবে!" পরামাণিক হাঁক দিল, "আমার তেল হলুদের বাটীটা দাওনা গো, কর্ত্তা ওদিকে বকাবকি করছেন, এখনি আমায় কনের বাড়ী রওনা হতে হবে। দুঘণ্টা আর সময় আছে তিন ক্রোশ হাঁটতে হবে!" রূপার বাটীতে বরের ব্যবহৃত তৈল ও হরিদ্রাবাটা কন্যার গাত্র হরিদ্রার জন্য পরামাণিকের হাতে দেওয়া হইল। এদেশে গায়হলুদের তত্ত্বের বৃষোৎসর্গ ব্যাপার চলিত নাই! বড়জোর এক ঘড়া তেল ও কিছু সন্দেশ বস্ত্র হরিদ্রার সঙ্গে প্রেরিত হইয়া থাকে।

বালিকা ও বধূরা খুড়িমার নির্দ্দেশ মত হলুদ তেল তেমন না মাখিলেও রঙে আপাদমস্তক রঞ্জিত হইয়া সাবান্ গামছা ইত্যাদি লইয়া ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত গ্রাম্যপথ মুখরিত করিতে করিতে ঘাটে গিয়া পড়িল। দীঘিকার স্থির কালোজল অনেক দিন পরে অধীর তরঙ্গে সচকিত, এবং বধূদের গাত্র ও বস্ত্রস্খলিত লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। যিনি নিরামিষে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন তিনি স্নানান্তে বলিলেন, "দেখিস ভাই, সাবান ছোঁয়াস্‌নে, আমরা ঠাকুরভোগের ঘরে যাব!"

তারপরে সমস্ত দিনব্যাপী একটা হৈ হৈ ব্যাপার চলিতে লাগিল! এখন রান্না বাড়ীর দিকেই খুব বেশী। বধূরা মাথায় কাপড় জড়াইয়া "আখা" নামক বৃহৎ হোমকুণ্ডে বড় বড় কড়া ডেক্‌চি চড়াইয়া যজ্ঞের পূর্ণাহুতির ব্যাপার প্রস্তুত করিয়া তুলিতে লাগিল। তরকারি কোটার ব্যাপার রাত্রেই শেষ করিয়া রাখা হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে কাঁচা তরকারীর স্তূপ করিয়া মাছের আমদানি আরম্ভ হইল। উঠানের একধারে বঁটী পাতিয়া ঝিয়েরা মাছ কুটিতেছে, কেহ বা ধুইয়া আনিয়া আমিষ-রান্নাঘরে চালিয়া দিতেছে। অগ্নির প্রবল উত্তাপে বধূদের মুখ ফুলের মত টকটকে হইয়া উঠিতেছে, তথাপি সহাস্যমুখে সানন্দে—"এতে হবে না খুড়িমা, এক কড়া ছ্যাঁচড়ায় কি কুলুবে? এইটাই লোকে বেশী খাবে। আরও চাট্টি আলু বেগুন সিম কুটে দিতে বলুন, মাছের কাঁটা চোকড়া এখনো ঢের আছে'। মুগের ডালও বোধ হচ্চে আর এক ডেক্‌ চাই। শুক্ত, শাকও বোধ হয় আর এক কড়া চড়াতে হবে। দু কড়াতে হবে ত? বুঝে দেখুন বাছা"।—ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাদের অশ্রান্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন এবং ফুটন্ত তৈলে মাছ ছাড়িয়া দিতেছেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহাদের জন্য জল পান দধি ইত্যাদি লইয়া বারে বারে আসিতেছেন ও "বড় বৌমা, ছোট বৌমা, বাছারা আগুনের আঁচে খুন হ'ল, ঠাকুরভোগ হবে তবে বাছারা একটু জল মুখে দিতে পাবে" ইত্যাদি বাক্যে শোক প্রকাশ করিতেছেন; অথচ নিজে এখনো স্নান করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পান নাই।

ঠাকুরভোগের পর বরের আইবুড়ভাত আরম্ভ হইল। একপাল বালকও বরের সঙ্গে পায়স ভক্ষণে বসিল। তখন আবার সকলকে পাকশালা হইতে হাত ধুইয়া পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতে হইল, নইলে খুড়িমা ছাড়িবেন না। বাচারা বর সেবার আশীর্ব্বাদিকাদিগকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, মাতা মনে করিয়া দিলে সে অপ্রস্তুতভাবে ভ্রম সংশোধন করায় মেজ বৌ সহাস্যে বলিলেন, "হাঁ, আর ভুল হয় না যেন! এ ক'দিন প্রত্যেক কাজে বস্তিনাথের গরুর মত মাথা নাড়ার কসরৎ দেখানো চাই!"

'আইবড় ভাতের' ভোজ মিটিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। একজন জ্ঞাতি বরকে রাত্রিভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। দুইদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে করিতে বর বাচারা ত্রাহি ত্রাহি করিয়া উঠিল। সহরের মত এক থালা মিঠাই ও বস্ত্র পাঠাইয়া এখানে প্রতিবেশীরা নিষ্কৃতি লয় না। বরের সঙ্গে তাহার বাটীতে সমাগত আত্মীয়কুটুম্ব সন্তানগুলিও

প্রত্যেকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে।

পরদিন অধিবাস। "এয়োদে"র ডাকাইয়া তাহাদের মধ্যে অনেক পরিষ্টাকে প্রধান সধবার পদে বরণ করিয়া নূতন কাপড় পরাইয়া কামাইতে বসান হইল। নাপিত বধূও নূতন কাপড় পরিল। তখনও অল্প স্বল্প রঙের খেলা চলিল। একে একে সমাগতা সকল সধবা ও কুমারীদের আলতা পরাইয়া পান সুপারি সন্দেশ দিয়া সম্বর্দ্ধনা করা হইল। পুত্রের আয়ুর্বৃদ্ধি কামনায় গ্রামের ইতর ভদ্র সকলের বাড়ী তৈল সন্দেশ পান সুপারি বিতরিত হইতে লাগিল। মুচি আদি নীচ জাতিরা অধিবাসের দিন নিজেরা দলে দলে আসিয়া তৈল সন্দেশ মুড়িমুড়কী বস্ত্রাঞ্চল পুরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সন্দেশ এক একটি চিনির ঢিবি মাত্র, লুচি কচুরী ক্ষীর আদির ছড়াছড়ি একেবারেই নাই ; তথাপি দুটা মুড়ি মুড়কী লইতে তাহাদের কি আগ্রহ !

পরামাণিকের ব্যস্ততার সীমা নাই। সে সপুত্র গোটা কয়েক কলাগাছ আনিয়া ডাক হাঁক জুড়িয়া দিল, "ন' কড়া কড়ি দাও, গিঁটে হলুদ সুপুরী দাও, ছান্‌লাটা বেঁধে দিয়ে যাই—আমার কি এক কাজ ! এলো মাগী শুধু টাকা আর সিধে নিতে জানে ! ছান্‌লার টাঙ্গাতে কদমফুল পাতিময়ূর আননি ? আপনারা ত কিছু বল্‌বেন না, দেশে না থেকে থেকে সবই ভুলে গিয়েছেন। হ'ত আমাদের বাড়ী ত টের পেত।" ইত্যাদি বকিতে বকিতে নরসুন্দর ছান্‌লা বাঁধিয়া দিয়া গেল। খুড়িমা বলিলেন, "একজন এয়োস্ত্রী ছান্‌লাতলা নিকোও, সেজবৌমা তুমি পিটুলি বাঁট, আজই পিঁড়ের আল্‌পনা দিতে হবে ! কালকে ভোরে জলসাধা নান্দীমুখের হাঙ্গাম আবার বরযাত্র সকালেই খেয়ে রওনা হবে,—কাল আর কখন কি হবে ? নাপিত বৌ, পাড়ার বৌঝিদের ডেকে আন্‌, নান্দীমুখের চাল কাঁড়তে হবে। রাজা দিদির বাড়ী "ছিরি" গড়তে দেওয়া হয়েছে আন্‌তে হবে !" অনেক বধূ বলিলেন, "হাঁ গা, কুলো ডালা সাজান হয়েছে ত ? অধিবাসের ডালায় বাইশ রকম জিনিষ লাগে। কুলোর চারি ধার দিয়ে তার ওপরে 'ছোবা' চারটে রাখতে হয়, 'ছোবা'র ভেতরে হলুদ মেখে চাল কলাই কড়ি গিঁটে হলুদ দিয়ে একখানা চেলির কাপড়ে কুলো ঢাক্‌তে হয়। কুলো যে মাথায় করবে সে এক বছর কাদন্‌ করবে না, বড়ী দেবে না, ছাতু খাবে না, মাকেই কুলো মাথায় করতে হয় !"

মেজ বৌমা তার বোকে দিয়ে কুলো ডালা সব গুছিয়ে দিইয়েছে।

পাড়ার সধবা কুমারী সকলেই বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের নিজ গৃহকর্ম্ম আজ বিয়ে বাড়ীর মাঙ্গলিক কার্য্যের নিকটে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। "ওরে কেউ বরকে ডাক্‌ ! আমি চালের ধামা নিই, হরির বৌ পান সুপুরীর থালা নিক্‌, কিশোরী শাঁক বাজা, নলিনীকে জলের ঘটী দে। মেজবৌমা রমাকে কোলে নাও, ওরা তো তোমাদের দেওর নয় বাছা, পেটের ছেলের চেয়েও ছোট !" মেজবৌ হাসিতে হাসিতে কিশোর বরকে কোলে তুলিয়া লইতে গিয়া বলিলেন, "শোন ভাই ! আমরা আজ দেওর ব'লে তোমায় মান্য করব মনে করছি কিন্তু খুড়িমা তা করতে দিচ্ছেন না !" বর কিন্তু কিছুতেই কোলে উঠিতে রাজী না হওয়ায় অগত্যা বরের হাত ধরিয়া এবং পান দিয়া বরের চোখ ধরিয়া মেজবৌ অগ্রসর হইলেন। কিশোরী আগে চল, গোটা দুই বাজনদারকে সঙ্গে ডেকে নে ; আমার ত ঢেঁকি নেই, কৈবর্ত্ত বাড়ী যেতে হবে। বড় বৌমা, ছোট বৌমা কুটনো ফেলে একবার উঠে চল বাছা, দেওরের বিয়ের সব কাজ দেখতে হয় !" বড় বৌ আপত্তি করিলেন, "ওরাই যাক্‌,—আমরা উঠলে এখনি কুটনো ফেলে এরাও দৌড় দেবে, আর ধরতে পারব না !" খুড়শাশুড়ী না শুনিয়া হাত ধরায় অগত্যা তাহাদের উঠিতে হইল !

কৈবর্ত্ত বাড়ীর অঙ্গন বিয়ে বাড়ীর এয়োয় ভরিয়া গেল। কৈবর্ত্ত গৃহিণী "এসো মা সকল এসো" বলিয়া সকলকে সম্বর্দ্ধনা করিল। শাশুড়ী বলিলেন, "আটদিন ঢেঁকি পাড়তে পাবি না ভাই ! তোদের নিত্যি ধান ভানা, ক্ষেতিতো হবে বড্ড !" "তাহোক্‌ ছোট দিদি ঠাক্‌রুণ ! কত ভাগ্যে তোমার ছেলের বিয়ে ! কেন আমি ত বগার মাকে বলেছি দিদি ঠাক্‌রুণকে আমার ঢেঁকি দিতে বলিস্‌ ! আহা সেকালে গিন্নিরা আমার ঢেঁকি ছাড়া আর কেউরি ঢেঁকি নিতেন না ! বছরে তখন এবাড়ীতে দুটো তিনটে ক'রে বিয়ে হ'ত ! কোথায় গেল সে সব ধনেরা !

গিন্নিরাই কোথায় গেল! তারা থাক্‌লে কি আজ ওবাড়ীর অমন দশা হয়?"—কৈবর্ত্ত গৃহিণী চোখ মুছিতে লাগিল। আনন্দসঙ্গীতের মধ্যে করুণ রাগিণী বাজিয়া ওঠায় সকলেরই নাসাপথ হইতে এক একটা নিঃশ্বাস বহির্গত হইল। বড় বৌ বলিলেন, "আজ আর ওসব কথা কেন? শুভ কাজ! কই ঢেঁকি নিকিয়ে রেখেছিস্ ত?" আমি "আঁড়" মানুষ, আমি কি পারি? নেপ্‌লার বৌডোকে ধ'রে নিকিয়ে নিইছি!" "তোর সব বিট্‌কেল! ঢেঁকি নিকুবি তাও দোষ?" "খুড়িমা! ঢেঁকির মাথায় তেল সিঁদুর পান সুপুরী সন্দেশ দাও, ঢেঁকি বরণ কর? দাসশাশুড়ী একটা বাটী আন্ বাছা, ঢেঁকির মাথার নীচে পাত্, নইলে তেলটা সব প'ড়ে নষ্ট হবে। নে তোরা ন'জন বা সাতজন ঢেঁকিতে ওঠ, আমি চাল্ দেওয়াই।" পান দিয়া বরের চক্ষু ঢাকিয়া, স্বর্ণরজ্জুতে (হারে) যুগল হস্ত আবদ্ধ করিয়া ঢেঁকির গড়ে চাল্ দেওয়াইতে দেওয়াইতে মেজবৌ বলিলেন, "কনের নাম কি গো?" নলিনী, রাণী কলহাস্যে বলিল "মেজ জ্যেঠিমার সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার ভার্য্যা? কনের নাম জানেন না সব করান' চাই"। "কি জানি বাছা অত খোঁজ রাখতে পারি না। নে বল শীগ্‌গির, বাচারা হাত বাঁধা কতক্ষণ থাকবে?"

"সুবর্ণলতা গো সুবর্ণলতা"! "বল ঠাকুর পো! সুবর্ণলতার চাল কাঁড়াচ্চি! তিনবার চাল্ দিতে হবে। মন্তর বল্‌ছ ত মনে মনে?" "হ্যাঁ হ্যাঁ হল তো তোমাদের?" "ওকি উঠ্‌ছ কেন? চোখ ঢেকে যেতে হবে আবার! শুধু বৌটি পাওয়া নয় গো, এতে অনেক ঝক্‌মারী। আর এই ত কলির সন্ধ্যে! বাসর ঘরের ধাক্কা সামলে এসো তবে বল্‌ব বীর পুরুষ। নেলো তোরা পাড় দে, সাতবারের বেশী হয় না যেন"। শঙ্খ হুলুধ্বনি ও পদালঙ্কারশিঞ্জিতের সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকি তালে তালে সাতবার উঠিল ও নামিল। কোথায় গেলেন কালিদাস! নীরস শুষ্ককাষ্ঠও বোধ হয় তাঁহার বর্ণনায় এই দোহদে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিত! আবার সধবাদের হস্তে পানসুপারী ও ললাটে সিন্দুর দেওয়া হইল। এই দলে কিশোরী দাঁড়াইয়া অবাক্ নেত্রে উৎসবের প্রতি কার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহাকেও কেহ কিছু করিতে গেলে ছুটিয়া পলাইতেছিল। এখনো তাহার ঠাকুরমা সম্পর্কীয়া বরের মাতা তাহার কপালে সিঁদুরের টিপ ও হাতে পানসুপারী দিতে গেলে সে পলাইল। ঠাকুরমাতা বলিলেন "দাঁড়া শালি, আই-বুড়ি থুবুড়ি! তোরও বিষ দাঁত শীগ্‌গির ভাঙ্গাতে হচ্চে। বড় বৌমা, আর দেরি কর্‌ছ কেন বাছা? মেয়ে তো বড় হয়েচে, এইবার তুমিও মেয়ের বিয়ে জোড়। সবাই এক জায়গায় হয়েচে, একসঙ্গে দুটো শুভকাজই হয়ে যাক্। বড় বউ বলিলেন," আমার কি অসাধ বাছা? অমৃতে অরুচি কার? অভিভাবকরা যে কানেই তোলেন না।" "কে অভিভাবক? কৃষ্ণপ্রিয়া? সে আপনার পূজো আচ্ছা নিয়েই থাকে—সে আবার কি করবে বাপু? তোমারই যখন সব ভার তখন তুমিই মেয়ের পছন্দ মত বিয়ে দেবে।"

"তাও কি হয় খুড়িমা? যতই হোক তাঁরই তো ভাইঝি। দেখি এবার কি করেন।" "আমরাও বলব। নাও এইবার তোমরা জল ধারা দিয়ে বর বাড়ী নিয়ে যাও। আমি "ছিরি" বরণ করে নিয়ে আসি, সেজবৌমা "ছিরি"র সিধেটা এনেছ ত? রাণী, নলিনী তোরা কুলো ধর, একা তুলতে নেই"। হুলুধ্বনির সঙ্গে খুড়িমার মস্তকে কুলা তুলিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার বারাণসীর আঁচলে একখানা হলদে রঙের ছোপান নূতন ন্যাকড়াবাঁধা, সেটা মাটিতে লুটাইতেছে। ইহার নাম "সোহাগ"! বরকন্যার যাহাতে পরস্পরের এবং আত্মীয় স্বজনের নিকট আদর বর্দ্ধিত হয় সেজন্য এ "তুক্"! বাহিরে আসিয়া বালিকা নলিনী তাহার সমবয়স্কা হরির বৌকে বলিল, "তোমার পানসুপারী কই কনে বৌদিদি?" হরির-বৌ ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, নেপ্‌লার বৌকে দিয়ে দিয়েছি! কি বারে বারে পান আর সুপারি হাতে নেওয়া, কাপড়ে সন্দেশের চট্‌চটে হাত দিতে হচ্চে"! কৈবর্ত্ত শাশুড়ী সগর্জ্জনে বলিল, "কি বল্‌লি কনে বৌ? পান সন্দেশে কাপড় খারাপ হবে? যত কিছু না 'বোন্ ভোবন্' সব ঐ ঘটের প্রসাদে,—ঐ সিঁদুর কৌটাটি—

ঐ পানসুপারীর কত মান্ত তা জানিস? এ সব মঙ্গল কাজে ঐ তুচ্ছি জিনিষ হাতে পাওয়া কি কম ভাগ্যির কথা? এইত তোদের বড়দি, ছোটদি, ঐ কাঁচা বৌটা দেখছিস্ তো? তোদের বুকের পাটায় বলিহারী! একালের মেয়েরাই অমনি"—"থাম্ থাম্" করিয়া সকলে তাহাকে থামাইল। দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়া প্রত্যেক কার্য্যে তাহাকে বাদ্ দেওয়াতে বেচারা হরির বৌ বড় চটিয়া গিয়াছিল; সেও ত বালিকা বৈ নয়! এখন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল।

সেজ বৌ বলিলেন, "হাঁ৷ মেজদি! হাই আম্লা কাদের দিয়ে বাঁটানো যাবে? অধিবাসের ডালায় সকালেই ও চাই"! "যাদের খুব ভাব এমন জামাই বা ছেলে বৌ ধ'রে বাঁটিয়ে নে"! "ও মেজদি তবে সে তোমাকেই বাটতে হবে"! সকলে সমস্বরে এ প্রস্তাবে সায় দিয়া গেল। মেজ বৌ "দূর পাগল্রা সব।" বলিয়া কথাটা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বড় বৌ আসিয়া বলিলেন "তাই করতে হবে লো। ওসব ছেলে ছোক্রারা রাজী হবে না, একেলের ট্যাঁটা সব। আর তোরা বাট্লেই বরকনের বেশী ভাব হবে। আমি ঠাকুরপোকে ডাকাচ্ছি, হাত ছুঁইয়ে দিয়ে যাক্, শেষে তুই বেটে নে"।

তুমুল হুলুধ্বনি ও সন্দেশ ছড়াছড়ির মধ্যে "হাই আম্লা" বাটা শেষ হইল। যাঁহারা আম্লা বাটিবেন তাঁহারা এবং পার্শ্বচরেরা সকলেই কলহাস্যে পরস্পরকে সন্দেশ খাওয়াইয়া,—ছুড়িয়া মারিয়া উক্ত কর্ম্ম শেষ করিলেন।

প্রায় সমস্ত রাত্রি পান সাজিয়া কুটনা কুটিয়া কাটাইয়া শেষ রাত্রে আবার "দধি মঙ্গলের" ধূম। পরদিন উপবাস করিবে বলিয়া বর ব্যাচারাকে সেই রাত্রে ক্ষীর চিঁড়াভোজনের জন্য টানিয়া আনা হইল। তাহার পক্ষে যদিও ইহা নির্য্যাতন ভিন্ন অন্য কিছু নয় কিন্তু ইহা মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অন্তর্ভূত, অতএব করিতেই হইবে। সধবা ও কুমারীগণ পাতা পাতিয়া "দধি মঙ্গলের" নিয়ম রক্ষার্থ দুই চারিটা চিঁড়া মুখে দিলেন। খুড়িমা বলিলেন, "এই শেষ রাতে কি খেতে পারে?" মেজবৌ বলিলেন, "তা ব'লে ফাঁকি দিলে চল্বেনা বাছা! বেলা হোক্ তখন খেতে পারি না পারি বুঝিয়ে দেব"। একটি দেবর যোড় হস্তে বলিলেন, "ঐ "ছালা" বোঝাই চিঁড়ে এবং হাঁড়ী হাঁড়ী দই ক্ষীর থাকল, মশায়রা যত পারেন খাবেন, কিন্তু এখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু শীগ্গির ক'রে উঠে আপনাদের 'হাঁড়ী মঙ্গল' 'সরা মঙ্গল' আর যা আছে সেরে ফেলুন; বর যাত্রীরা সকালেই খেয়ে বেরুবে, নান্দীমুখের অনেক গণ্ডগোল আছে, হেঁসেলে চটপট ঢ়ুকবেন, অন্নপূর্ণাদের দোহাই"।

অতি প্রত্যুষে শঙ্খ হুলু ও বাদ্যশব্দে সমস্ত গ্রামকে জাগরিত করিয়া সধবারা "জল সাধিতে" বাহির হইলেন। সর্ব্বাগ্রে আভাঙ্গা পুকুরের জল লইবার জন্য বংশপুঞ্জ-বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথকে ভূষণঝঙ্কারে মুখরিত করিয়া পুষ্করিণীর উদ্দেশে চলিলেন। উষার পিঙ্গল আভা সে বনের মধ্যে তখনো প্রবেশ করিতে পার নাই; শেষ রাত্রির সুমন্দ চন্দ্রকিরণ বাঁশ-ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া যথাসাধ্য অন্ধকার বিদূরিত করিতেছিল।

দীর্ঘিকার বুকেও খণ্ড চন্দ্র হাসিতেছিল। আকাশ পাণ্ডুবর্ণে রঞ্জিত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লঘু মেঘস্তরে কোথা হইতে ঈষৎ গোলাপি আভাষ আসিয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রবিম্বিত পুকুরের স্থির কালো জল উষালোকে বিচিত্র শোভা ধরিয়াছে। 'পাড়ে'র চারিধারে আম্র কাঁটালের ঘন বন; বাতাসে বনফুলের গন্ধে মাখামাখি হইতেছিল। কোকিল পাপিয়া দোয়েল মাছরাঙ্গা নানা ছন্দের রাগিণী আলাপ ধরিয়াছে। বালিকা কিশোরী চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "পাড়ের বাগানেও আজ বোধ হয় বিয়ে বাড়ী"।

সাত জন এয়ো হাতধরাধরি করিয়া হুলুধ্বনির সহিত মঙ্গল কলসে জল ভরিল। "চল,—সাত বাড়ী জল সাধ্লেই হবে। ওদিকে বেলা হচ্ছে।" তাহাদের হুলুধ্বনিতে ক্রুদ্ধ হইয়াই বোধ হয় পাপিয়া গ্রামের উপর গ্রামে তান চড়াইতে লাগিল। কোকিলও তাহার জোরে মিষ্ট "কুউ"স্বর পঞ্চম হইতে সপ্তমে তুলিল।

জল সাধিয়া বাড়ী ফিরিয়া আস্তে ব্যস্তে বসন ভূষণ ত্যাগ করিয়া তাহারা রন্ধনের দিকে ছুটিল। পুরোহিত

মহাশয় কলাগাছের "পেটো" লইয়া এবং পরামাণিক তাঁহার হুঁকা কলিকা লইয়া সমান ব্যস্ত। কর্ত্তার তাগাদায় অগত্যা পুরোহিত মহাশয় নান্দীমুখের জন্ত সমস্ত দ্রব্য ঠিক করিয়া উত্তরে নান্দীমুখে বসিয়া পড়িলেন। বরকেও স্নান করাইয়া "শুভ গন্ধাধিবাসে"র জন্ত নিকটে বসান হইল।

বাহিরে ৮।১০ খানা গোশকট রঙ্গিন্ সতরঞ্চিতে "ছাপ্পোর" ঘিরিয়া বাঁশের গায়ে ও গরু মহিষের শৃঙ্গে নানা বর্ণের দাগ কাটিয়া বরযাত্রী লইয়া যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। পাল্কীর বেহারারা নিরীহ গাড়োয়ানদের সাহঙ্কারে বলিতেছে, "আরে তোমরা গিয়ে সেই গাঁয়ের কোলে পৌঁছিবার পরও যদি আমরা রওনা হই তো আগে গিয়ে পৌঁছুব। তোমরা তাগাদা ক'রে বেরিয়ে পড়না!" তাহাদের গর্ব্বে ক্রমে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া জনৈক যুবা গাড়োয়ান বলিল, "থাবিত তার কাঁধে ব'য়ে! কাঁধও যা মাথাও তাই!—মাথায় ব'য়ে সোয়ারি নিয়ে যাবি তার আবার এত অহঙ্কার! আমরা তোফা নবাব পুত্তুরের মত ঘুমুতে ঘুমুতে আয়েস ক'রে যাব। তোদের মত ত কাঁধে বইব না।" জনৈক বেহারা উত্তর দিল, কাঁধে কে না বয়! এই যে গরু মোষ, ওনারাও তো মানুষ! ওনারা কি কাঁধে বইবেন না?" এ অকাট্য প্রমাণে গাড়োয়ান বেচারা আর প্রতিবাদের পথ পাইল না! "আমকেষ্ট" প্রভৃতি যুবকেরা মাথায় টেরা সিঁথি কাটিয়া, গায়ে ইস্ত্রিকরা ডবল ব্রেষ্টের কামিজ এবং তদুপরি অর্দ্ধ মলিন "কোর্ত্তা" বা "উড়্নি" পরিয়া,—কোমর বাঁধিয়া সকলের উপর সর্দ্দারি এবং বরযাত্রীর সকল বিষয়ের তদারক করিয়া বেড়াইতেছে। "বেদার!—এই তামাকের সরঞ্জাম তোমার জিম্মা, রাস্তায় যেন তখন এটা কই—ওটা কই ব'লে গোল বাধিওনা! তামুক চাইলেই যেন সবাই পান্! রং মশাল তুবড়ী হাউয়ের বুজিক'ভা হরমুৎ ভাই তোমার জেম্মা, গাড়ীতে যেন ভাজেনা বা নষ্ট হয় না। সব গাড়ীতে বিছানা পাতা হ'য়েচে ত? দাদাঠাকুর!—গাড়োয়ান আর বেহারাদের সব খাইয়ে দেন, এরা তবে সব বাঁধা ছাঁদা করতে পাবে। রায় বেঁশের দল যে এখনো এসে পৌঁছুলনা। থাক্‌বে তানারা প'ড়ে। বাজনদার ভাই সব খেয়ে নাও, এখনি "ছি আচার" আরম্ভ হবে, তোমরা তখন বাজাবে না গরাস্ তুলবে! আ-ছিঃ দাদাঠাকুর এখনো আপনারা খেতে বস্‌লেন না? দোপর গড়িয়ে যায়!. তিন ক্রোশ যেতে হবে, পাড়্পারানি 'ঝড় ব'্যাওটার' সময়! এসব 'শুবকর্ম্মে' একটু আগাম 'শুব' যাত্রা করাই ভাল!"

বরযাত্রী বালবৃদ্ধযুবারা আহারাদি সমাপনান্তে যথাসাধ্য বেশভূষা করিয়া গোযানারোহণ করিলেন। কেবল বর ও বরকর্ত্তার পাল্কী এবং রতন প্রভৃতি "স্বেচ্ছাসেবকে"রা কেহ কেহ বর লইয়া রওনা হইবার জন্ত অপেক্ষায় রহিল। "ওগো আর দেরী ক'রনা, কি কি করবে ক'রে নাও না"! পরামাণিকের চীৎকারে সন্ত্রস্ত হইয়া এয়োরা সব একত্র হইল। সেজবৌ বলিলেন, "খুড়িমা আমরা হাতে সুতো বেঁধেছি, তুমি বাছা দশবার জপ ক'রে একটু জল মুখে দিয়ে এস, নইলে বর রওনা করা হবে না।" বরকে একখানা ঝাঁপের উপর দাঁড় করাইয়া চারিদিকে সাতজন এয়ো দাঁড়াইল এবং নলীর সূতা খুলিয়া বরের চতুর্দ্দিকে সাত থেই বেষ্টন করিয়া দিল। সধবারা সেই সূত্র হস্তে ধরিয়া সাতবার বরের পায়ে ও ললাটে ছোঁয়াইয়া শেষে বরের পায়ের নীচে দিয়া তাহা বাহির করিয়া লইয়া বরের দক্ষিণ হস্তে যথাসাধ্য জটিল গ্রন্থি বাঁধিয়া দিল। বিবাহের পর এই সূত্র কন্তায় দাঁত্যা খোলাইতে হইবে। "খুড়িমা, এইবার এসে কুলো মাথায় ক'রে পান দিয়ে বরের চোখ ঢেকে দাঁড়াও বাছা, আগুরিটা হ'লেই হয়! খোষা দিদি, এগিয়ে আয়। তিনটে ক'রে খড়ের নুড়ো এনেছিস ত? ঐ খড় কটা দিয়ে আগুন জ্বাল, এক একটা ক'রে তিনবার তিনটে নুড়ো নিয়ে পা বরণ কর। ঠাকুরপোর পরণের এ কাপড়খানা খোবারা পাবে।" বরণ সমাপনান্তে খোপা বৌ খড়ের ছাই লইয়া জিহ্বাগ্রে তিনবার স্পর্শ করিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "তেত' না মেটো?" খোপা বৌ তিন বারই বলিল, "মেটো"।

আগুরি সমাপ্ত হইলে বর অগ্নিস্পর্শ করিয়া এবং সে বস্ত্র ছাড়িয়া অন্ত বস্ত্র পরিয়া "কামানে" বসিল। নরসুন্দর

কার্য্য সমাপনান্তে নিজ প্রাপ্য বস্ত্র লইতে ভুলিল না। কপালে সাতবার হলুদ ছোঁয়াইয়া, ছাউনি হাঁড়ির জল মস্তকে ছিটাইয়া দিয়া তখন সকলে বর সজ্জায় মন দিল। চন্দনে চর্চ্চিত, ফুলের গড়ে মালায় ভূষিত, ললাটে দধির ফোঁটা, মস্তকে টোপর হস্তে দর্পণ ও বারাণসীর জোড়ে সজ্জিত বরকে তখন ছান্‌লাতলায় আনা হইল। সকলে আশীর্ব্বাদ করিলেন। জননী নিজ পদধূলি লইয়া বামহস্তে পুত্রের মস্তকে দিলেন, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ঈষৎ দংশন করিয়া, বক্ষে থুৎকুড়ি দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কোথায় যাচ্চ বাবা ?" পুত্র নত মস্তকে বলিল, "তোমার দাসী আনতে।" হুলু, বাদ্য ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে বর শিবিকারোহণ করিল। নরসুন্দর ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "যাঃ বরের যাত্রের জল খাবারের পান নেওয়া হয়নি। আগে যে সেই জল খাবার বর খাবে, তার পরে তাদের বাড়ীর খাওয়া। শীগ্‌গির দেন, যা আমি মনে না করব তা'ত আর হবে না" !

অতঃপর মহা গোলযোগে বর ও বরকর্ত্তার পাল্কী চলিয়া গেল। পূজা অন্তে মণ্ডপের মত বিয়ে বাড়ী নিমিষে "ভোঁ ভাঁ" হইয়া পড়িল। খুড়িমা সজল চক্ষে দাওয়ায় আসিয়া বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বিমর্ষ ভাবে বসিল।

সন্ধ্যাকালে একবার ছান্‌লাবরণ করিতে এয়োরা একত্র হইয়া, কুলো ডালা শ্রী ইত্যাদি লইয়া সকলে সাতবার ছান্‌লাকে প্রদক্ষিণ করিলেন, কিন্তু "বিয়ে বেরিয়ে" যাওয়ার পর "বিয়ে বাড়ী"র কোন কার্য্যেই পূর্ব্বের মত উৎসাহের সুর মিলিল না।

পরদিনও ঐরূপ "নিম্‌সামে" কাটাইয়া বৈকালে সকলে বর কনে আসার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। ছান্‌লাতলায় জোড় পীঁড়ি পাতিয়া "কুলা-ডালা শ্রী" সব বাহির করিয়া রাখা হইল। সর্ব্ব কার্য্য সমাপনান্তে বধূগণ যেই নিজ সজ্জায় হাত দিয়াছেন অমনি গ্রামের বাহিরে বাদ্যের শব্দ শোনা গেল! "বিয়ে এসে প'ল বিয়ে এসে প'ল" মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। গ্রামের বালক-বালিকা যুবা যুবতীরা বিয়ে-বাড়ী অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। মুখে উলু, হস্তে শঙ্খ, কেহবা অঞ্চলে খই কড়ি লইয়া সদর দরজাভিমুখে ছুটিল। বাদ্য শব্দের উপরও তিনগুণ "হুঁইও হুঁইও" শব্দ করিতে করিতে বাহকগণ শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। পশ্চাতে "রায় বেঁশে"রা লাঠি ঘুরাইয়া পুরা দমে নাচ আরম্ভ করিয়াছে। পাল্কীর পার্শ্বে পার্শ্বে "সেচ্ছাসেবকে"রা মালকোঁচা মারা, রংরে চুবান ভবল ব্রেষ্টের সার্ট ও উড়ানিপরা, মুখে পান, চেরা-সীঁতি, আলুথালু চুল, ললাটে ঘর্ম্ম, জনসংঘের মধ্য দিয়া পাল্কীকে অগ্রসর করিয়া আনিতেছে। শিবিকা থামিতেই পাল্কীর উপর খই কড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি বর্ষিত হইল এবং বিবাহের মঙ্গল কামনায় শিবিকার তলায় একঘড়া জল ঢালিয়া দেওয়া হইল। ঘড়াটা বাহকেরা দখল করিল। দুইজন সধবা পাল্কীর দুই দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই থালা চাউল তদুপরি এক একটা মুদ্রা লইয়া পাল্কীর তলা এবং ভিতর দিয়া পরস্পরের হস্তে দিতে লাগিলেন। তিনবার এইরূপ করার পর থালা ও মুদ্রা বাহকদের দখলে গেল। পুত্র ও বধূর মুখে খুড়িমা শিবিকার ভিতরেই মিষ্ট দিলেন এবং মুখ ধরিয়া চুম্বন করিলেন। বরের হাত ধরিয়া ও বধূকে ক্রোড়ে করিয়া ছান্‌লাতলায় আনিয়া বধূকে দুধে-আল্‌তার পাত্রে, বরকে পীঁড়িতে দাঁড় করান হইল। বধূর কক্ষে মঙ্গলঝারি, হস্তে মৎস্য এবং মস্তকের উপর বরের বামহস্ত স্থাপনা করিয়া তাহার উপরে ধানের আড়ি সিঁদুর কৌটাসহ দেওয়া হইল। ঝারি ও ধানের আড়ি সধবা বালিকারা ধরিয়া রহিল, কেননা বরকন্যা বেচারারা তখন নিজেরাই অসংবৃত। খুড়িমা ধান দূর্ব্বা পান প্রদীপ ইত্যাদি লইয়া পুত্র ও বধূকে বরণ করিতে লাগিলেন। মেছুনিরা মাছের ডালা আনিয়া বধূর সম্মুখে ধরিতে লাগিল কেননা যেমন তেমন মাছ দেখাইয়াও তাহারা টাকা ও বস্ত্র লাভ করিবে! বরণান্তে সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া জলধারার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নববস্ত্রের উপর দিয়া বর বধূ গৃহ প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই সময়ে বধূর মস্তকস্থ ধান্য বর দর্পণ দ্বারা কাটিয়া চারিধারে বধূর পশ্চাতে ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। ঘরে গিয়া বধূ বসাইয়া শাশুড়ী সর্ব্ব ভূষণের অগ্রে একগাছি লোহা লইয়া বধূর বাম হস্তে পরাইয়া দিলেন। কড়ি খেলাইবার জন্ত যত সম্পর্কীয়াগণ চারিধারে ঘেরিয়া বসিল।

গৃহ-দেবতা রাধাবল্লভের গৃহে লইয়া গিয়া বরবধূকে প্রণামী দিয়া প্রণাম করাইয়া আনা হইলে সমস্ত গুরুজন-দিগকে প্রণাম করিয়া বর-বধূ আশীর্ব্বাদ ও যৌতুক গ্রহণ করিতে লাগিল। সবশেষে কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী বর-বধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। বরের মাতাও প্রায় সমবয়স্কা ভাসুর কন্যাকে সাদরে আহ্বান করিয়া বর বধূকে বলিলেন। "তোমাদের পিসিমাকে প্রণাম কর।" গ্রামের একজন বয়স্কা প্রতিবাদের ভাবে বলিলেন—"বরের পিসি বটে কিন্তু কনের বোধ হয় জেঠিমা হবে আমাদের কৃষ্ণপ্রিয়া এইরকম শুনছি যেন। না না ?" কৃষ্ণপ্রিয়া সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া ধান্য দূর্ব্বায় বর কন্যার আশীর্ব্বাদ শেষ করিলেন। তাঁহার পায়ের ধূলা লইলে উভয়ের শিরশ্চুম্বন করিয়া বাহিরে আসিবামাত্র দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মান একটি সুদর্শন যুবক তাঁহার পায়ের নিকটে নত হইয়া প্রণাম করিল, পদধূলি গ্রহণ করিয়া স্মিতমুখে মাথা তুলিয়া বলিল "আপনি আমাদের জেঠিমা ?" কৃষ্ণপ্রিয়া বিস্মিত নেত্রে সেই তরুণ সুন্দর মুখের দিকে চাহিল। আবার সেই বয়স্কা গৃহিণীই অগ্রসর হইয়া তাহার বিস্ময় ভঞ্জন করিয়া বলিলেন "এটি বুঝি কনের ভাই ? কনের সঙ্গে এসেছে ?" বরের ভাই পাশেই ছিল সে উত্তর দিল "হ্যাঁ উনি বৌদির দাদা! পিসিমার সঙ্গে দেখা করতেই উনি আজও এসেছেন। বল্লেন "কখনো তাঁকে দেখিনি প্রণাম করতে যাব।" কৃষ্ণপ্রিয়া তথাপি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। নবাগত যুবা যেন আশ্চর্য্য ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া ছিল। কোন উত্তর না পাইয়াও আবার বলিল "সুবর্ণ আপনাকে প্রণাম করেছে ত জেঠিমা ?" কৃষ্ণপ্রিয়া এইবার সসম্মতির ভাবে মাথা হেলাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন "হ্যাঁ" "আপনারা কোন্ বাড়ীতে থাকেন ?"

"অন্য বাড়ীতে!" "চলুন আপনার সঙ্গে যাই।" বরের ভাই তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বারে, জলটল খান্ আগে সকলের সঙ্গে দেখা শোনা হোক্! ঐ তো পিসিমাদের বাড়ী, যাবেন এখন—এত তাড়া কি!" "আসব আবার, চলুন জেঠিমা!" কৃষ্ণপ্রিয়া শান্ত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন "একটু পরেই যেও, নৈলে সকলে উদ্বিগ্ন হবে!" তিনি অঙ্গনে নামিয়া চলিয়া গেলেন। যুবক একটু যেন ক্ষুণ্ণ ভাবেই অগত্যা নিবৃত্ত হইল।

বধূকে "ভরা হেঁসেল" দেখাইয়া তবে সমাগত বরযাত্রীদের ভোজন করান হইল। পরদিন বৌভাত, গ্রামের সকলেই নিজের কাজ ভাবিয়া যার যথাসাধ্য করিতে লাগিল! দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত ভোজ চলিল! আহুত অনাহুত সকলেরই সমান আদর! উঠানে কলাপাতা পাতিয়া শাক শুক্তাঘণ্ট চড়চড়ি ও শুভ্র অন্ন, লুচি সন্দেশ পোলাও কালিয়ার অপেক্ষা সকলে সাদরে ভোজন করিতেছে! কার্য্যগতিকে যে খাইতে আসিতে পারে নাই তাহার জন্য পর্য্যন্ত অন্ন পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছিল। পাড়ার ছেলেরা দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত মাথায় করিয়া ভাত বহিতেছে, "জোল" কাটিয়া হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত নামাইতেছে! তাহাতে তাহাদের লজ্জা অপমান বা আলস্য শ্রান্তি ছিল না। দুই যুগ পূর্ব্বের গ্রাম্য যুবকদিগের সহিত এখনকার গ্রামের ছেলেদেরও অনেক বিষয়েই অনেকখানি পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী
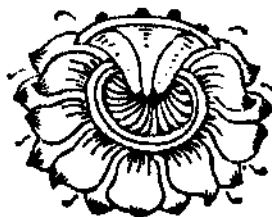
ভারতবর্ষের শোভন-শিল্প

* ["চিত্রণ" প্রসঙ্গে]

শ্রীযুক্ত জগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ

প্রতীচ্যের রসবেত্তা পণ্ডিত লেথাবী সাহেব (Prof Lethaby) শিল্পকলার আলোচনা প্রসঙ্গে একস্থানে লিখেছেন—"If we (in Europe) would set seriously to work in reviving decorative design, the best thing we could do would be to bring a hundred craftsmen from India to form a school of decorative design"—অর্থাৎ; "ইউরোপে যদি আমরা শোভন-শিল্পকে সত্যকারের নবভাবে প্রবর্ত্তিত করতে চাই তা'হলে আমাদের সর্ব্বপ্রধান করণীয় হচ্ছে ভারতবর্ষ হ'তে অন্ততঃপক্ষে একশত শিল্পকারকে আমন্ত্রণ ক'রে এনে এদেশে শোভন-শিল্পের শ্রী-বৃদ্ধি কল্পে একটি শিল্পশালা প্রতিষ্ঠা করা।"

শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানে যে-দেশ আজকের দুনিয়ায় সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে সেখানকারই একজন মনীষীর মুখে ভারতীয় শিল্পকলার এতখানি প্রশংসা-বাণী শ্রবণে অনেকেই হয়ত আশ্চর্য্য হবেন কিন্তু এতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই কারণ হ্যাভেল, ফারগুসন্, ভিন্সেন্ট স্মিথ, লেভি, বার্ডউড্, কানিংহাম্, রিসডেভিডস্, বার্জ্জেস্, গ্রুণউইডেল্, ছুলার এবং ক্র্যামরীস্ প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশের বহু প্রাচ্য-তত্ত্ববিদ্ মনীষীর লেখনী হ'তে প্রাচীন ভারতের শিল্প-কলার অতুলনীয় গৌরবের কথা অকুণ্ঠিত প্রশংসা সহকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রাচীন গ্রীস, রোম, মিসর এবং আসিরিয়ার ললিতকলার যেমন একটি বিশিষ্ট ধারা ছিল সেইরূপ প্রাচীন ভারতের ললিতকলারও একটা স্বতন্ত্র ধারা যুগ যুগ ধ'রে প্রবাহিত হ'য়ে এসেছে। আজকাল Fine arts এবং craftsকে অনেকে দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগে দেখে থাকেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দু'টিই অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজড়িত প্রাচীন ভারতের শিল্প-কলাকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করা হ'ত না, এবং ইউরোপেরও নয়। সুবিখ্যাত শিল্পাচার্য্য হ্যাভেল সাহেব তাঁর "The Basis for Artistic and Industrial Revival in India" নামক গ্রন্থে বলেছেন—"The distinction which is now, made between 'Fine Art' and 'Industrial or Applied Art,' is a quite modern one of which the East has hardly ever been conscious......in the greatest epochs of European art the distinction was never made." মিঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ ও তাঁর "History of Fine arts in India and Ceylon" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে এ কথার অনেকটা সমর্থন করেছেন। শিল্পীর ধ্যান-রসের প্রস্রবণে এবং তুলির লিখনে যা পরিস্ফুট হয় তাকে সাধারণতঃ চারু-শিল্পের পর্য্যায়ভুক্ত করা হয় আর কারু-শিল্পীর শিল্পকাঠির পরিচালনে যে রূপের বিকাশ হয় তাকে অভিহিত করা হয় কারুশিল্প ব'লে কিন্তু যেখানে সত্যকারের আর্টের বিকাশ অর্থাৎ যেখানে একঘেঁয়ে একছাঁচের শিল্পযন্ত্রের বিকৃত শিল্প নিদর্শনের উৎপাত নেই সেখানে আর্টের বা শিল্পকলার এই ভেদাভেদেরও কোন স্থান নেই।

ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি পর্য্যায়টিতে একটা অনাবিল মাধুরিমা ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়িত—এ সৌন্দর্য্য-সুষমাকে

* ["চিত্রণ"—শ্রীমতী প্রকৃতি দেবী (চট্টোপাধ্যায়) প্রণীত শোভন-শিল্প সম্পর্কীয় একখানি চিত্র-গ্রন্থ। শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত মুকুল দে মহাশয় কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত। প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান:—মেসার্স এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। উক্ত পুস্তকখানি আমাদের দেশীয় সূচী-শিল্প—আলপনা-শিল্প এবং শোভন-শিল্পের অন্যান্য বিভাগে একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জ্জন করেছে। এই কারণে উক্ত প্রবন্ধ প্রসঙ্গে উল্লিখিত পুস্তকের আলোচনা সন্নিবেশিত হ'ল।]

খণ্ড খণ্ড ভাবে উপলব্ধি করা চলে না। প্রকৃতির বিচিত্র ছন্দের বাঁশীর সুরে ভারতের শিল্পী তার জীবন-রসের মাতন শুনে নেচে উঠেছিল তাই ভারতীয় চিত্রকলা আর ভারতীয় শিল্পকলার ভিতরে ভারতবর্ষের একটা বিশিষ্ট সাধনার অন্তর্নিহিত সুর-ঝঙ্কার আজও অনুভব করা যায়। স্রষ্টার যে সুরের মায়া সারা বিশ্বসৃষ্টির কানায় কানায় লীলায়িত সেই অতীন্দ্রিয় সুরকে অনুভূতির মধ্যে গ্রহণ করা এবং সেই ধ্যান-লব্ধ অনুভূতিকে রূপে রসে প্রকাশ করাই ছিল ভারতীয় শিল্পীর কাম্য মূর্ত্তিকে মর্ম্মরগাত্রে সুস্নিগ্ধ রূপের শোভায় বিমণ্ডিত করেছিল—দেবমন্দিরের সুন্দরী নটিনীগণের লীলায়িত গতি-ছন্দের বিকাশ মর্ম্মর কন্দরের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে রূপে রসে সঞ্জীবিত করেছিল। স্থপতি-শিল্পে এই অনুভূতির প্রেরণা হ'তেই সৃষ্ট হয়েছিল অপূর্ব্ব কারু-শোভিত সাঁচী স্তূপের বিশাল তোরণ—ঐন্দ্রজালিক চিত্র শোভিত অজন্তা ইলোরার পর্ব্বতগুহা—এলিফান্টার গুহামন্দির—দক্ষিণ ভারতে নটরাজের ভয়াল সুন্দর প্রস্তর এবং ধাতুমূর্ত্তি—সারানাথের বৌদ্ধ বিহার—নালন্দা বিশ-

বস্তু—ব্যর্থ নামের মোহ নয় বা কেবল ইন্দ্রিয়লালসায় চরিতার্থ-সাধন নয়। ভারতবর্ষের শিল্পকারের এই বিপুল অবিচ্ছিন্ন অনুভূতির প্রেরণাই হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে স্থাপত্যশিল্পের দিক দিয়ে সাঁচী, ভারুত, সারনাথ, অজন্তা, ইলোরা, মথুরা, গান্ধার, ক্যাম্বোডিয়া, বোরোবুদুর এবং অনুরাধাপুর প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের প্রাচীন মন্দিরে, বিহারে ও পর্ব্বত গহ্বরে বিষ্ণু, বুদ্ধ, ইন্দ্র এবং শিব পার্ব্বতী প্রভৃতি দেব দেবী এবং মহাপুরুষগণের প্রশান্তদীপ্ত প্রস্তর মূর্ত্তির পরিকল্পনা সম্ভবপর করেছিল—বোধিসত্ব এবং আজিভিকগণের ধ্যান-সমাহিত বিদ্যালয়ের সুবিশাল ভবন—মদুরায় সু-উচ্চ শিখর সমন্বিত গোপুরম্ এবং ভারুত, অমরাবতী, ভুবনেশ্বর, কোনারক্, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি এবং ললিত গিরির অসাধারণ কারু-কলা সমন্বিত মন্দির, বিহার এবং তৎসংলগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি সমূহ। ভারতীয় শিল্পীর এই অপূর্ব্ব অনুভূতি হ'তেই ভারতবর্ষের চিত্রকলা শোভন-শিল্প এবং কারুশিল্পের নানাবিধ ক্ষেত্রে একটা বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক রূপ ও রসের মাধুর্য্য উদ্ভাসিত হয়ে এসেছে।

শিল্পকলার এতগুলি বিভাগের সাধনার জন্য বিভিন্ন পথ ছিল সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটির একটা

অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল—যেমন ভাস্কর্য্য শিল্পের মহিমা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যেতোনা স্থপতি শিল্পের দিকে না তাকালে। আবার চিত্রশিল্প আর শোভন-শিল্পের যথার্থ রূপের আস্বাদন সম্ভব হতো না ভাস্কর্য্য-শিল্প, স্থপতি-শিল্প ও বিভিন্ন কারু-শিল্পের দিকে দৃষ্টিপাত না করলে। এই যোগসূত্রের ভিতর দিয়ে ভারতীয় শিল্পে একটা বিশিষ্ট সঙ্গতি (harmony) ও আধ্যাত্মিক রস (spiritual grace) ফুটে উঠত। এই সব শিল্প সম্পদের অনেকখানি জিনিষ আজকের ভারতবাসীর কাছে বিলুপ্ত হয়ে এসেছে; কিন্তু কারু শিল্পের সম্পূর্ণ বিনাশ এখনও ঘ'টে উঠেনি—এখনও ভারতবর্ষের ছায়া-সুনিবিড় 'পল্লী-গেহের' সরল সুনিপুন কারুশিল্পীর কারুজ দ্রব্যাদি দেশ বিদেশে সমাদৃত হয়।

"চিত্রণ" নামক শোভন-শিল্প (decorative art) সম্পর্কীয় একখানি চিত্র-গ্রন্থের আলোচনা হ'ল এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য; সুতরাং ভারতীয় শিল্পকলার বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সবিস্তার আলোচনা না ক'রে ভারতীয় শিল্পকলার ভিন্ন ভিন্ন দিকে শোভন-শিল্পের বিভিন্ন বিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করব। প্রথমেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে, ইংরাজী শব্দ "decorative art"এর তর্জ্জমা হিসাবেই "শোভন-শিল্প" শব্দটী ব্যবহৃত হয়েছে। রেঁণাসাঁসের যুগে সারা ইওরোপের "ডেকোরেটিভ আর্টে" যেমন একটা যুগান্তর সূচিত হয়েছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উইলিয়ম মরিস (William Morris), নরম্যান শ (Norman Shaw), রসেটী (Dante Gabriel Rossetti), ফিলিপ ওয়েব (Philip webb) প্রভৃতি শিল্পসেবী ও তাঁদের অন্যান্য অনুবর্ত্তীগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডের শোভন শিল্পে যেমন নবযুগের প্রবর্ত্তন অনুসূচিত হয়েছিল তেমনই হিন্দুযুগ আর বৌদ্ধযুগের (এবং মধ্যযুগে রাজপুত শিল্পকলা ও মোগল শিল্পেরও) ভিন্ন ভিন্ন স্তরে শোভন-শিল্পের দিক দিয়ে কত বিচিত্র রকমেরই প্রবর্ত্তন না আমাদের দেশে, সম্ভবপর হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যে যুগের কাহিনী বলছি সে-যুগে আমাদের জাতি সভ্যকারের বাঁচবার
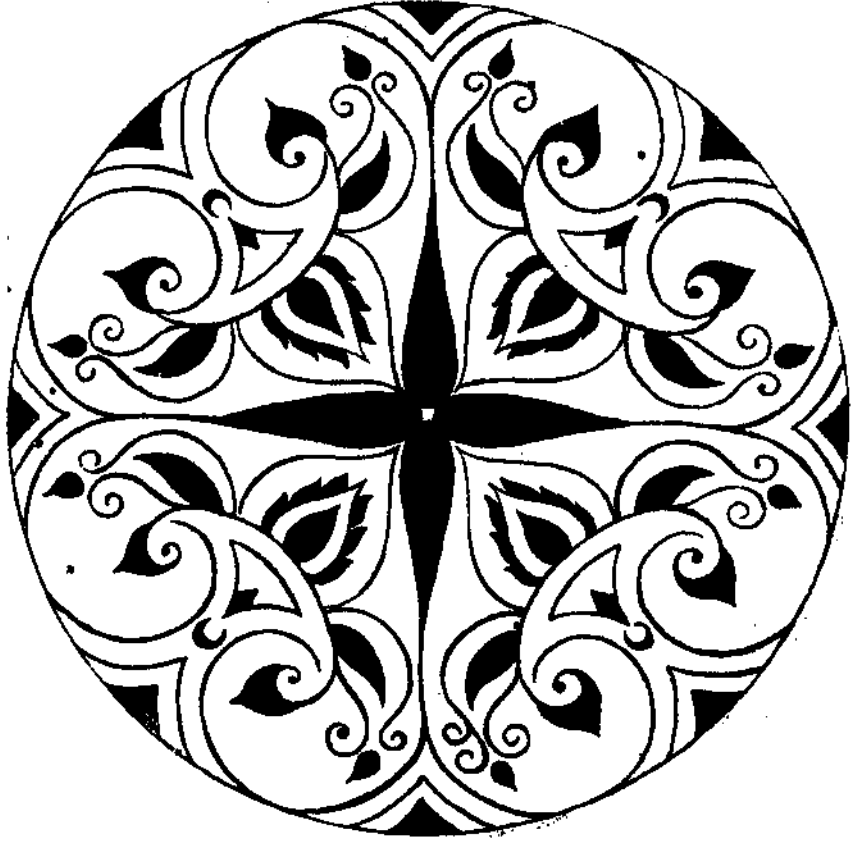
আনন্দ আস্বাদন করতে পেরেছিল তাই তার অন্তরলোক নিহতঃ "সত্য শিব ও সুন্দরের" ধ্যান প্রতি যুগে নব নব রূপে, নব নব বর্ণে, নব নব ছন্দে প্রকাশ পেত। চিত্রকর সে-সময় রূপের পরিকল্পনা দিত আর রূপকার তাকে বাস্তবের আলোকে উদ্ভাসিত করত—এমনি ক'রেই ভারতের চারুশিল্প (fine arts) এবং কারুশিল্প (crafts) একসঙ্গে পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। শিল্পীর রূপের ধ্যানে আর কারুকের রূপ-সৃজনে শিল্পকলার রাজ্যে ভারতীয় শোভন শিল্পেরও নানাবিধ রূপপরিগ্রহণ সম্ভব হয়েছে।
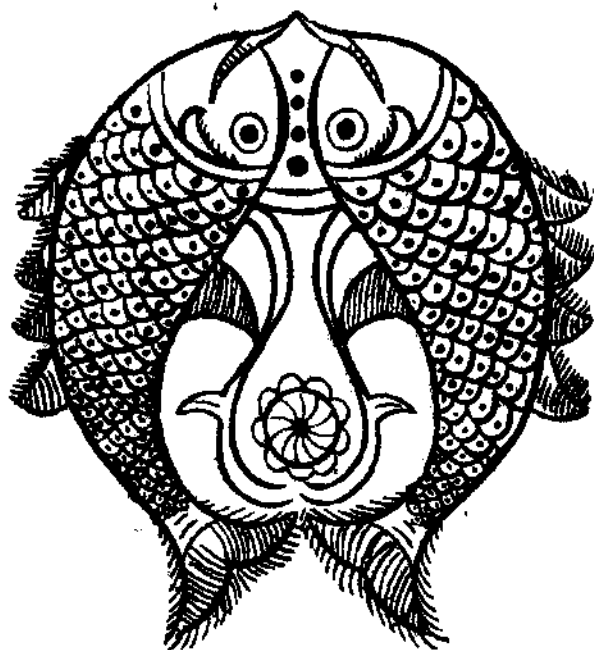
আমাদের ঘরবাড়ী, মন্দির, মসজিদ, শিক্ষাভবন ও কলাভবন এবং নিত্যব্যবহার্য্য ও সৌখীন দ্রব্যসমূহের পারিপার্শ্বিক এবং অন্তর্নিহিত শোভাবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যেই decorative arts বা শোভন-শিল্পের প্রয়োজন। মূল শিল্প বস্তুর সঙ্গে শোভন শিল্পের তাই ততখানি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যতখানি সম্পর্ক নীলাম্বরের সঙ্গে চন্দ্রমার আর তারকা মণ্ডলের। সাধারণ চিত্রকলায় যেমন Realistic, Naturalistic এবং Imaginery ভুল বিদ্যমান, তেমনি শোভন শিল্পেরও প্রধানতঃ দুইটি দিক আছে—একটি কল্পনার আর একটি বাস্তবের। বাস্তবজগতের নরনারী ও জীবজন্তুর চিত্রাবলী—কল্পনা জগতের রূপ-রেখা, রঙের খেলা, তুলির আঁচড়—প্রাকৃতিক জগতের পুষ্প-লতাদির বিচিত্র-শ্রী সকলগুলিই ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে শোভন-শিল্পের বিকাশে সহায়তা করে। এর যে-কোন ভঙ্গীরই সার্থকতা নির্ভর করে শিল্পীর ধ্যান ও সাধনার সাফল্যের ওপর। একটি প্রকাণ্ড সৌধের স্থপতিশিল্পে নয়ন যতখানি বিমোহিত হয়, একটি তুলির ছোট্ট রেখার রূপ-শ্রীতে মন ততখানিই আনন্দে ভ'রে ওঠে।

স্থপতি-শিল্প এবং ভাস্কর্য্য-শিল্পের পর্য্যায়ভুক্ত যে কয়টি ঐতিহাসিক সম্পদের মধ্যে ভারতবর্ষের শোভন শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—ভারুত স্তূপ, সাঁচীর তোরণ ও স্তূপ (খৃঃ পূঃ দুই শতাব্দী—খৃঃ পূঃ এক শতাব্দী), নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাংশ, সারনাথ, বৌদ্ধগয়া সংলগ্ন বিহার ও স্তূপ, মথুরা ও অমরাবতীর স্তূপ এবং প্রস্তরমূর্ত্তি, ইলোরা গহ্বরে সুবিশাল শিবপার্ব্বতীর মূর্ত্তি, অজন্তার এবং এলিফাণ্টার নয়ন-মুগ্ধকর গিরি-চিত্র (Fresco Painting) শোভিত গুহা চৈত্য ও মন্দির, নাসিক, কার্লি ও ইলোরার সুবিশাল চৈত্য-গহ্বর, ভুবনেশ্বরের শিব মন্দির এবং তৎসংলগ্ন অপরাপর মন্দিরাদি, কোণারকের সূর্য্যমন্দির এবং অলকাপুরী ও রাণী গুম্ফ গিরি-গহ্বর। এই সকল প্রাচীন মন্দির, বিহার এবং চৈত্যের এবং তৎসংলগ্ন দেবদেবী ও মহাপুরুষগণের স্থপতি-শোভায় কল্পনাতীত মাধুর্য্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পীগণের যশ সমস্ত জগতে অপরাজিত।

খৃঃ পূঃ তিন শতাব্দী পূর্ব্বেকার শিল্প জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্ত্তি সারনাথ ছিল অন্যতম। সারনাথের শোভন-পরিকল্পনায় একটা উচ্চ কলাজ্ঞানের এবং "Naturalism"-এর গভীর পরিচয় পাওয়া যায়—সেখানকার অপূর্ব্ব শিল্পগুলি ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিখুঁত চিত্র। ভারুত স্তূপ এবং সাঁচী স্তূপে শোভন শিল্পের বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে—সুতরাং ভাস্কর্য্যকার

সমন্বিত তোরণ এবং রেলিংএর অভিনব শোভন পদ্ধতি। এই সকল বেদীকার মর্ম্মর গাত্রে বৌদ্ধ জাতক অন্তর্গত অনাথপিণ্ডের কাহিনী, দেবতা ও নাগরাজের কাহিনী, যক্ষের কাহিনী এবং অন্যান্য চিত্তগ্রাহী কাহিনী জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সাঁচীর প্রধান তোরণ পথে Relief এর উপর ছন্দময় জাতকের চিত্র-কাহিনীর অপূর্ব্ব শোভা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সাঁচী এবং ভারুতের রেলিং ও তোরণের মধ্যে জাতক-কাহিনীর সঙ্গে পত্রপুষ্প ও অন্যান্য জীবজন্তুর যে সব মনোরম চিত্র দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে অনেকগুলিকে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কলা-শিল্পীগণ কলাকার্য্যের শোভন করে গ্রহণ ক'রে সুখী হ'তে পারেন। সাঁচী, বৌদ্ধগয়া এবং ভারুতের বেদীকা, স্তম্ভ-চূড়ার মধ্যেকার অনুকরণীয় কারুকলা যে কোন যুগে শোভন শিল্পের প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার উপযুক্ত।

এই সকল শোভন কলার Freeze decorations এবং Fresco painting দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল। পাথরের ছোট ছোট বা বড় Relief এর উপর শিল্পকার কোন কাহিনী বা কোন চিত্র খোদিত ক'রে বা ছাঁচে ঢেলে (dies) যে চিত্রিত করতেন তাকে বলে Freeze decoration, এবং মন্দির, চৈত্য বা গিরিগাত্রে রঙের ছাপ দিয়ে তুলির সাহায্যে যে চিত্রাঙ্কন করা হত তার নাম Fresco painting। সাঁচী ভারুত হ'তে আরম্ভ করে অজন্তা, নাসিক এবং অমরাবতী, গান্ধার প্রভৃতিতে Freeze decorations এর নানাবিধ মনোহর নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীনতম কালে Fresco painting এর নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায় না—একমাত্র রামগড় অঞ্চলস্থ যোগীমারা গহ্বরে খৃঃ পূঃ দুই শতাব্দী এবং এক শতাব্দীর Fresco painting এর কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে—এই সমস্ত Frescoয় কাজে মকর, মৎস্য এবং অন্যান্য জলজন্তুর প্রচুর প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। তারপর অজন্তার গিরি-গুহা পঞ্চম খৃঃ অব্দ হতে আরম্ভ করে প্রায় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের চিত্রকলায় এবং শোভন-শিল্পে একটা যুগান্তর এনেছিল।
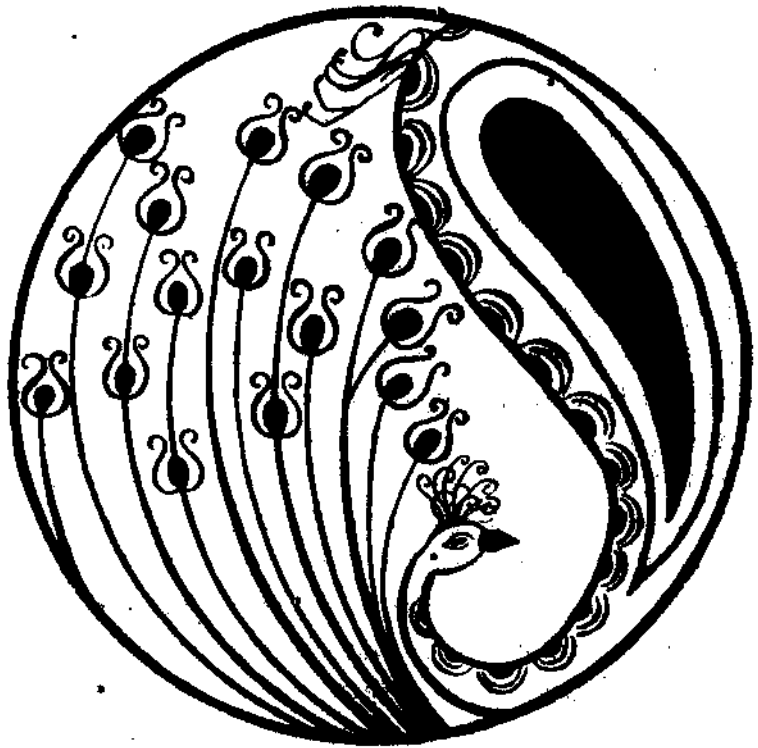
এই যুগান্তরের প্রভাব পরে ইলোরা, এলিফান্টা, বারাহ বোরবোদর এবং নবাবীগড় অনুরাধাপুর, সাইক্রী, পোলন্নারুয়া, কাণ্ডি মামল্লপুরমের স্থাপত্য-শিল্পের ওপর বিস্তারিত হয়। অজন্তা শিল্পকলা বলতে গেলে ভারতবর্ষে সত্যকারের খাঁটি চিত্রকলার (তুলির সাহায্যে) প্রবর্ত্তন সাধিত করলে। রামায়ণ, মহাভারত এবং জাতকের ধর্ম্ম কাহিনী—মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের

জীবন-নাট্য প্রভৃতি ব্যাপার অনুপম রূপে রেখায় ঐ সকল প্রাচীন মন্দির চৈত্যের শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত করত। পূর্ব্বোক্ত ভাস্কর্য্য-শিল্পে মানুষের মূর্ত্তির মধ্যে একটুখানি Crudeness পরিস্ফুট হ'ত কিন্তু অজন্তার চিত্রকলায় নরনারীর রূপের পরিকল্পনায় যে Crudeness ত ছিলই না—বরং এই সকল নরনারীর চোখে মুখে একটা স্বর্গীয় ছন্দ ভেসে উঠত। অন্যান্য কারু শিল্প যথা সূচীশিল্প, বস্ত্র-শিল্প, কাঠের কাজ, ধাতু-শিল্প, টেরাকোটার কাজ, হস্তীদন্তের কাজ প্রভৃতিতে ভারতীয় শোভন কলার নানাবিধ সূক্ষ্ম নিদর্শন পাওয়া যায়। মোটের ওপর ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, চিত্রকলার দিক দিয়ে অজন্তার গিরিচিত্র, রাজপুতানার কৃষ্ণরাধার লীলা সম্বন্ধীয় নানাবিধ চিত্রাবলী ও উহার রাজপ্রাসাদ সমূহের প্রাচীর-শোভার চিত্রাবলী (Panel decorations) উড়িষ্যা মাদুরা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন পুঁথি সমূহের প্রচ্ছদপটের অপূর্ব্ব কারুকলা, ভারতের নানাস্থানের বিশেষতঃ কাশ্মীর, পূর্ব্ববঙ্গ, গুজরাট, জয়পুরের বস্ত্রশিল্প (Textile industry, embroidery works etc), দক্ষিণ ভারতের ও জয়পুর অঞ্চলের ধাতু দ্রব্যের উপর শিল্প কার্য্য, কাঠের উপর Malabar এবং Guzerat এর কারুজ সম্পদ, লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ terracotta, কাঞ্জি, ট্রাভাঙ্কোর, ম্রিড়ি বিহার অঞ্চলের 'হস্তীদন্তের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, বিকানীর টঙ্ক, হায়দ্রাবাদ, কারনুল' প্রভৃতি "জেসো" শিল্প, মালদ্বীপ ও জয়পুর অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ গালা শিল্প, জয়পুর, মথুরা, নেপাল, মুর্শিদাবাদ, তাঞ্জোর, জাফ্না ও লাক্ষাদ্বীপের মূল্যবান ধাতু ও জড়োয়ার কাজ এবং আরও কত প্রকারের কারুশিল্প সুদূর অতীত হ'তে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উন্নত শিল্পানুশীলনের গৌরবজনক নিদর্শন জ্ঞাপন করছে। এই স্থলে একটি কথা ব'লে রাখি যে, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে ভারতীয় শিল্পকলার কাল-স্রোতে বিদেশী শিল্পকলার একটু আধটু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও ভারতীয় শিল্প তার মৌলিকতা ও জাতীয়তা কোন দিন হারায় নি। মোগল যুগের শিল্পকলায় আমাদের শিল্প-ক্ষেত্রে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারা সূচিত হয়েছিল সেজন্য প্রাচীন ভারতের শিল্প-কলার সঙ্গে তার আলোচনা আর করলুম না।

ভারতীয় শোভন-শিল্পে এবং বাংলার গৃহস্থালী শিল্পকলার ক্ষেত্রে কারুকুশলা শ্রীযুক্তা প্রকৃতি দেবী রচিত নব প্রকাশিত চিত্রগ্রন্থ 'চিত্রণ' একখানি উল্লেখযোগ্য অবদান। এখানিকে অনায়াসে একখানি উচুদরের শিল্প-গ্রন্থ হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। সূচীশিল্পের নকসা, কাঁথা শেলায়ের নকসা, ফুলের গহনার নকসা, আলপনার নকসা প্রভৃতি শোভন-শিল্পের বিচিত্র ও সুচিত্রিত নকসার নিদর্শনের সমষ্টিতেই "চিত্রণের" সৃষ্টি। লিখন-বিদ্যায় রত ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে কপি বুকের যতখানি কদর, ভারতীয় শিল্পকলার শোভন বিভাগে এবং গৃহস্থালী শিল্পকার্য্যে যে-সব ছেলে মেয়েরা পারদর্শিতা লাভ করতে চান তাঁদের কাছে "চিত্রণের" আদর হবে ততখানি। তা ছাড়া শিল্প কলানুরাগী সুধীজনের রসের খোরাক জোগাবার যথেষ্ট উপাদানও এই বইখানির মধ্যে পাওয়া যাবে। চিত্রণের নামকরণও হয়েছে, চমৎকার-শব্দ চয়নের শক্তি ও রসবোধের পরিচায়ক।

চিত্রণের চিত্রগুলিতে রূপ ও রেখার যে বিচিত্র লীলা বিকশিত হয়েছে তা উচ্চ-শ্রেণীর শিল্প-রুচির পরিচায়ক। বিশেষত ২,৫,৬,১৬,১৫,২২,২৩,২৬ এবং ৪০ নম্বরের চিত্র-নিদর্শনগুলি কল্পনার মৌলিকতায় ও ভারতীয় শিল্পকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যে অপরূপ। বাংলার মন্দিরে, প্রাসাদে ও কুটিরে আলপনা ও রূপ সজ্জার ভিতরে,—বাংলার গৃহলক্ষ্মী-গণের বেশ ভূষার মধ্যে এই বইখানির শিল্প-ধারা অবলম্বন ক'রে সত্যকারের রূপ দিতে পারলে, রসহীনতার দৈন্যে অথবা মিশ্রিত বিদেশী আর্টের অর্থহীন অনুকরণের অপরাধে পরের কাছে উপহাসাস্পদ হতে হবে না।

ব্রিটিশ যুগের প্রারম্ভ কাল হতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি আমাদের জাতীয় শিল্প অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল। তারপর বাংলার স্বদেশী যুগের সময় হ'তে শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুর্নিবার প্রচেষ্টায় আমাদের দেশে ভারতীয় চিত্রকলার এক নুতন রূপ সূচিত হ'ল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে এবং শিল্পগুরু

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ এবং তাঁদের প্রতিভামণ্ডিত অনুবর্ত্তীগণ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত মুকুল দে, শ্রীযুক্ত অসিত হালদার, শ্রীযুক্ত ও, সি, গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চৌধুরী প্রভৃতির অদম্য সাধনার ফলে আমাদের দেশের শিক্ষাগরিষ্ঠ সমাজের কয়েক অংশের ভিতরে ভারতীয় চিত্রকলার সমাদর বেড়েছে। আজ আমাদের দেশেরই একজন মহিলা—"চিত্রণের" কলাকুশলা' রচয়িত্রী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দক্ষতা সহকারে এই পথের অনুসরণ করেছেন দেখে আমরা আশান্বিত হয়েছি। আমাদের ঘর-দোরের সাজ-সজ্জায়, আমাদের রঙ্গমঞ্চের প্রয়োগশিল্পে এবং 'আমাদের বসন ভূষণের পরিকল্পনায় এমন একটা মৌলিকতা বর্জ্জিত নিকৃষ্ট আর্টের জগাখিচুড়ী দেখা যায় যা চোখকে সত্যই পীড়িত করে। নবযুগের সূক্ষ্ম রসবোধের চাহিদায় পরিমার্জ্জিত করে নিয়ে ভারতের শিল্পকলাকে গ্রহণ করতে পারলে শোভন কার্য্য কতখানি সুন্দর হয়ে ওঠে তা' আমরা দেখতে পাই বোলপুর শান্তিনিকেতনের অথবা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর উৎসবাদির ও রঙ্গমঞ্চের তুলনাহীন প্রয়োগ নৈপুণ্যের মধ্যে। পাশ্চাত্য দেশের উচ্চকলানুরাগী নরনারী তাঁদের ঘর-দোরের রূপসজ্জার ভিতরে ভারতীয় শিল্প-কলাকেও নানাদিক দিয়ে গ্রহণ করেছেন।

কলিকাতার বিভিন্ন শিল্প প্রদর্শনীতে চিত্র কলা, সূচের কাজ, গালার কাজ, জেসো শিল্প প্রভৃতি কারুকলায় এবং বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় চিত্রণ-রচয়িত্রীর মোহন তুলিকার রূপলোকের সঙ্গে পরিচয় যাঁদের ঘটেছে তাঁরা অনেক দিন থেকেই আশা ক'রে আসছিলেন যে এঁর মত একজন প্রতিভামণ্ডিতা কুললক্ষ্মীর তুলিকা আর লেখনী শিল্প-গ্রন্থ প্রণয়ন করে বাংলার তথা ভারতের লুপ্ত প্রায় কারু-শিল্পের যথার্থ সমাদর বাংলার কুললক্ষ্মীগণের মধ্যে জাগিয়ে তুলবেন। আজ তিনি বাংলার নারীসমাজের পক্ষ হ'তে কলা-ভারতীর অর্চ্চনায় আত্মনিয়োগ করেছেন দেখে আমরা সানন্দচিত্তে তাঁকে অভিনন্দিত করছি। বিলাতের decorative arts এ Mrs Nowwall, Mrs Archibold Christie, Mrs Louisa Pesel প্রভৃতি শিল্প-নিপুণা মহিলাগণ অনেকখানি দান করেছেন। আমাদের দেশের মেয়েদের জাতীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে "চিত্রণ"-রচয়িত্রীর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। আজকের এই জাগরণের দিনে আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে সুন্দরের প্রেরণা শিক্ষা ও স্বাধীনতার আলো এমনি ভাবে জ্বালতে না পারলে আমাদের জাতি মুক্তির পথ হ'তে অনেক দূর পিছিয়ে পড়বে।

চিত্রণের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মুকুল দে মহাশয় যথার্থই বলেছেন যে উক্ত গ্রন্থের নিদর্শন (design) গুলি যখন আমরা যথাযোগ্য ভাবে কাজে লাগাতে পারব তখন—"This will endow our household articles of daily use with grace and novelty; fill our homeland with a new joy and at the same time teach our people to admire what is really good."

শ্রীজগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এই প্রবন্ধ-সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি "চিত্রণ" নামক গ্রন্থ হ'তে গৃহীত।
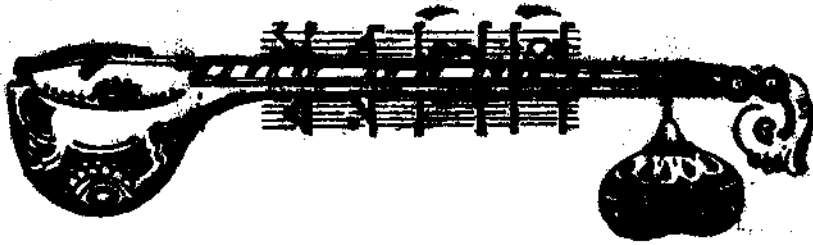
ভৈরবী—ঠুংরী

প্রিয়া সনে কাটাইনু রাতি
জ্বালাইনু কত প্রেম-বাতি।

সে সুখ-স্মৃতি যেন মৃদু বীণা তান
গুঞ্জরে অন্তরে সারাদিনমান
মধুর আবেশে ভরে মম প্রাণ
যেন স্নিগ্ধ সুধাকর-ভাতি।

ওগো পরাণের প্রিয়া, তুমি যেন গান—
নীরব নিশীথে ভেসে-আসা তান।

অন্তর-জ্বালা অমনি জুড়াও
নিমিষে পরাণের বেদনা ভুলাও
কণ্টক-মরুতে আসন বিছাও
কুসুম-শয়ন দাও পাতি॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

[রা রা ণ্া ণ্া   সা সা সা মা]

II { সা সা সা সা । সা ঋা জ্ঞা মা I জ্ঞা -া সা -া । -া -া সা (জ্ঞা) } I
     প্রি য়া স নে   কা টা ই নু   রা • তি •   • • • •

I পা দা পা দা । -া -া -া -া I সা সপা পা পা । পা পা পা পা I
  জ্বা লা ই নু   • • • •   জ্বা লা ই নু   ক ত প্রে ম

I পা -দা পা -া । -মা -া -া -া II
  বা • তি •   • • • •

যুগ-সন্ধি

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল

চতুর্থ খণ্ড

মা

প্রথম স্তবক

মৃত্যু-অভিযান

১

আর সেই সন্তানহারা জননী ! বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বরাবর সুমুখ পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে রাস্তার পাশে যেখানে সেখানে শুইয়া পড়িয়া একটু নিদ্রার চেষ্টা করে, আর দুই এক টুকরা রুটি মুখে দেয়,—প্রাণটাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যেটুকু একেবারে না করিলে নয়। প্রত্যহ এইরূপ। যে সন্ধ্যার কথা আমরা এখন বলিতেছি, সে দিনও সে দিনভর হাঁটিয়া আসিয়াছে।

পূর্ব্বরাত্রি সে একটা জনহীন গোলাবাড়ীতে কাটাইয়াছিল। গৃহযুদ্ধের ফলে এরূপ শূন্য গোলাবাড়ীর অভাব ছিল না। মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে চারিটি দেয়াল ও খোলাদোর দেখিতে পাইয়া সে তাহার ভিতর আশ্রয় লয়। উপরে ভগ্ন ছাদ, নীচে খানিকটা খড়। তাহারই উপর শুইয়া পড়িয়া ছাদের হা করা ফাটলের ভিতর দিয়া নীল আকাশে তারার ঝিকিমিকি দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দুপুর রাতে ঘুম ভাঙিয়া গেলে সে আবার চলিতে আরম্ভ করে। উদ্দেশ্য, ঠাণ্ডায় যতটা সম্ভব পথ অতিক্রম করিবে, গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে পায়ে হাটিয়া বেশী দূর চলা কঠিন।

কৃষক সংক্ষেপে যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল রমণী সাধ্যমত তদনুসারেই চলিতেছিল। যতদূর সম্ভব সে পশ্চিম দিকেই যাইতেছিল। নিকটে কেহ থাকিলে শুনিতে পাইত, হতভাগিনী অর্দ্ধস্ফুট স্বরে অনবরতই "লা টুর্গ" কথাটি উচ্চারণ করিতেছে। ছেলেমেয়েগুলির নাম ভিন্ন কেবল এই কথাটিই তাহার মনে স্থান পাইয়াছিল।

চলিতে চলিতে সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহার মনে পড়িতেছিল, কত বিপদ সে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, কত অপমান, কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে ; কত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে, কত কথা শুনিতে হইয়াছে—কখনো আশ্রয়ের জন্য, কখনো একখণ্ড রুটির জন্য কখনো বা, তাহার পথের সন্ধান জানিবার জন্য। দুর্ভাগা পুরুষের চেয়ে দুর্ভাগিনী রমণীকে দুর্দ্দশা অনেক বেশী সহ্য করিতে হয়। কি কষ্টকর পর্য্যটন। কিন্তু এ সব সে কিছুই মনে করিবে না, ছেলেদের পাইলেই হয়।

ভোরের দিকে সে একটা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। রজনীর আবছায়া তখনও তরুপল্লবে, কুটীরে, গির্জ্জায় লাগিয়া রহিয়াছে কোনো কোনো আলয়ের অর্দ্ধোন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া দুই একটি কৌতূহলী মুখ বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। লোষ্ট্রাহত মধুচক্রের মতো গ্রামবাসীরা সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। শকটচক্রের ঘর্ঘর ও শৃঙ্খলের ঝনৎকার শোনা যাইতেছে।

গির্জ্জার প্রাঙ্গণে সমবেত একদল ভীত গ্রামবাসী মাথা উচু করিয়া দেখিতেছিল, পাহাড়ের উপর হইতে পথ বাহিয়া কি একটা গ্রামের দিকে নামিয়া আসিতেছে। এটা একটা চার চাকার মালগাড়ী ; শিকলে বাঁধা পাঁচটি ঘোড়া ওটাকে টানিয়া আনিতেছে। গাড়ীর উপরে জয়েষ্টের মতন একরাশ লম্বা কাষ্ঠদণ্ড দেখা যাইতেছিল। মাঝখানে শবাচ্ছাদনীর মতো কালো ক্যান্‌ভাসে ঢাকা একটা আকারহীন পদার্থ। শকটের অগ্রে ও পশ্চাতে দশজন করিয়া অশ্বারোহী। তাহাদের মস্তকে ত্রিকোণাকৃতি শিরস্ত্রাণ ; তাহাদের স্কন্ধের উপর দিয়া উলঙ্গ কৃপাণের সূক্ষ্মাগ্র দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। সমগ্র কাহিনীটির কৃষ্ণমূর্ত্তি আকাশের পৃষ্ঠপটের উপর সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিতেছিল। যান, বাহন, সাজ সরঞ্জাম, অশ্বারোহী সকলই কালো দেখাইতেছিল। তাহাদের পশ্চাতে প্রভাতের পাণ্ডুরাগ।

গ্রামে উপনীত হইয়া তাহারা স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে দিনের আলোতে চারিদিক পরিস্কার হইয়া উঠিয়াছে। দলের একটি লোকের মুখেও কথা নাই। এ যেন ছায়ামূর্ত্তি সকলের অভিযান!

অশ্বারোহীগণ সৈনিকপুরুষ; তাহাদের হস্তে বাস্তবিকই কোষমুক্ত তরবারী। শকটের উপরে কৃষ্ণাবরণ।

বিপরীত দিক হইতে সেই অভাগিনী জননী গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং অশ্বারোহীগণের সঙ্গে প্রায় এক সময়েই স্কোয়ারে আসিয়া পৌঁছিল।

জনতার মধ্যে লোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতেছিল।

"এটা কি ?"

"গিলোটিন।"

"কোত্থেকে আস্‌চে ?"

"কুজার্স থেকে।"

"কোথায় যাচ্ছে ?"

"জানিনা। শোনা যায়—প্যারিসের নিকটে একটা দুর্গে।"

"প্যারিসে!"

"যেখানে খুসী ওটা যাক্। মোদ্দা এখানে না থাম্‌লেই হয়।"

এই বৃহৎ শকট, তদধঃস্থিত আচ্ছাদনাকৃত মাল, এবং শকটবাহক অশ্বপঞ্চক; সৈনিক সমূহ; শৃঙ্খলের ঝনৎকার, আর লোকগুলির মৌনতা; ধূসর উষা—সব মিলিয়া ব্যাপারটা কেমন ভৌতিক বলিয়া বোধ হইতেছিল। এই বাহিনী স্কোয়ার অতিক্রম করিয়া গ্রামের বাহিরে চলিয়া গেল। পল্লীটি দুইটা পাহাড়ের অন্তবর্ত্তী নিম্নদেশে অবস্থিত। মিনিট পনেরো পরে এই সন্দেহজনক বাহিনীকে পশ্চিম পাহাড়ের শীর্ষদেশে পুনরায় দেখা গেল। ভারী চাকাগুলি পথের গর্ত্তসমূহে পড়িয়া ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ করিতেছিল। প্রভাতবায়ুতে শিকলের ক্ল্যাং ক্ল্যাং শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল; উদীয়মান সূর্য্যের স্বর্ণালোকে সৈনিকগণের তরবারী ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল, পর্ব্বতচূড়া হইতে রাস্তা বাঁকিয়া গিয়াছে। শকট ও তাহার রক্ষীগণ অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে জর্জেট লাইব্রেরী ঘরে তাহার নিদ্রিত ভ্রাতৃগণের পার্শ্বে জাগিয়া উঠিয়া তাহার গোলাপী পা দুটিকে সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়াছিল।

মৃত্যুর পরওয়ানা

রমণী এই অদ্ভুত বাহিনী দেখিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিল না,—বুঝিতে চেষ্টাও করিল না। তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তখন অন্য চিত্র ভাসিতেছিল—সে তাহার হারানো ছেলেমেয়েগুলি।

গ্রাম ছাড়াইয়া সেও শকটরক্ষী সৈন্যদলের পশ্চাতে কিছু দূরে দূরে সেই পথ অনুসরণ করিয়াই চলিল। সহসা 'গিলোটিন' কথাটি তাহার কানে গেল। এই নিরক্ষর কৃষক রমণী মিচেল ফ্লেচার্ড গিলোটিন কাহাকে বলে জানেনা, কিন্তু অন্তর হইতে অন্ধসংস্কার তাহাকে সতর্ক করিয়া দিল। তাহার বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। কিজন্য এরূপ হইল, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিত না। এই কালো পদার্থটার পেছনে পেছনে চলিতে তাহার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। বড় রাস্তা ছাড়িয়া বাঁ দিকে বনের মধ্যে সে চলিয়া গেল। এই বন কুজার্সের অরণ্য।

কিয়ৎকাল পর্য্যটনের পর রমণী অদূরে একটা ঘণ্টাস্তম্ভও কয়েকটা বাড়ীর ছাদ দেখিতে পাইল। ইহা অরণ্য-প্রান্তস্থ একটি বিচ্ছিন্ন গ্রাম। মিচেল ফ্লেচার্ড গ্রামের দিকে চলিল। তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছে।

যে সকল গ্রামে সাধারণ তন্ত্রীরা ঘাটি বসাইয়াছিল, এই গ্রামটি তাহাদের একটি।

মেয়রের ভবনের সম্মুখবর্ত্তী স্কোয়ারে সে গিয়া উপস্থিত হইল। এই গ্রামের অধিবাসীরাও যেন ভীত এবং উদ্বিগ্ন। পুরপ্রবেশের সোপানের উপর একদল লোক ভিড় করিয়া রহিয়াছে। সকলের ঊর্দ্ধ ধাপে সৈনিক-পরিবৃত একজন লোক দণ্ডায়মান। তাহার হস্তে একটা প্রকাণ্ড ইস্তাহার। তাহার ডানদিকে এক ড্রামবাদক, আর বাঁ দিকে গঁদের হাঁড়ি ও তুলিহস্তে ইস্তাহার আঁটিবার জন্য একজন লোক।

ব্যালকনির (গাড়ী-বারাণ্ডার ছাদের) উপরে ত্রিবর্ণের উত্তরীয়-আবৃত কৃষক-পরিচ্ছদধারী মেয়র দেখা দিলেন।

ইস্তাহারওয়ালা লোকটা সরকারী আদেশ ঘোষণাকারী। তাহার কাঁধের উপর চাপরাশ-আঁটা, আর তাহা হইতে একটা ঝোলা বিলম্বিত। ইহা হইতে অনুমিত হয়, তাহাকে গ্রামে গ্রামে যাইয়া জেলাময় কোনও হুকুম জারী করিতে হইবে।

এই সময়ে মিচেল ফ্লেচার্ড তথায় উপস্থিত হইল। লোকটা ইস্তাহার খুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিল—

"এক এবং অখণ্ড ফরাসী সাধারণতন্ত্র।"

ড্রামবাদক তখন ড্রামে ঘা দিল। জনতার মধ্যে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, কেহ কেহ তাহাদের মস্তক হইতে ক্যাপ অপসারিত করিল; অন্যেরা তাহাদের হ্যাট মাথার উপরে আরও শক্ত করিয়া টানিয়া দিল। তৎকালে সেই অঞ্চলে মস্তকাবরণ দেখিয়াই লোকের রাজনৈতিক মতামত বুঝিতে পারা যাইত,—সাধারণতন্ত্রীরা ক্যাপ ও রাজপক্ষীয়েরা হ্যাট ব্যবহার করিত।

জন-কোলাহল থামিল; প্রত্যেকে অবহিত হইয়া শুনিতে লাগিল। ঘোষণাকারী পড়িল:—

"কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত আদেশানুসারে, এবং কমিটি-অব-পাবলিক-সেফ্‌টি কর্তৃক ক্ষমতার বলে—"

দ্বিতীয়বার ড্রাম বাজিয়া উঠিল; ঘোষণাকারী পড়িয়া চলিল:—

"এবং ন্যাশনেল কনভেনসন্ কর্তৃক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থানুসারে, যাহাতে অস্ত্রসহ-ধৃত বিদ্রোহীগণকে আইনের আশ্রয় বর্জ্জিত করা হইয়াছে এবং যাহারা উক্ত বিদ্রোহীগণকে আশ্রয় দান করিবে কিংবা উহাদের পলায়নের সহায়তা করিবে, তাহাদের জন্য চরম দণ্ডের বিধান হইয়াছে"—

একজন কৃষক তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অপর কৃষককে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কথাটার মানে কি—চরমদণ্ড?"

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উত্তর দিল, "আমি জানি না।"

ঘোষণাকারী ইস্তাহারটা উঁচু করিয়া নাড়িয়া পড়িল, "এবং যেহেতু ৩০শে এপ্রিল তারিখের বিধির ১৭ ধারায় প্রতিনিধিগণকে বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, অতএব তদনুসারে পশ্চাদ্বর্ণিত ব্যক্তিগণকে—"

একটু থামিয়া সে বলিল,

আইনের আশ্রয় বর্জ্জিত বলিয়া ঘোষণা করা যাইতেছে—"

সমগ্র জনমণ্ডলী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। ঘোষণাকারীর কণ্ঠস্বর তাহাদের নিকট বজ্রনির্ঘোষের মতো বোধ হইল। সে পড়িল—

"ল্যান্টিনেক বিদ্রোহী।"

একজন কৃষক অনুচ্চস্বরে বলিল, "এতো আমাদের মন্‌সেইনিয়র (জমিদার)।" সকলেই ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল, "এ যে মন্‌সেইনিয়র।"

ঘোষণাকারী পুনরায় পড়িল,

"ল্যান্টিনেক, ভূতপূর্ব্ব মার্কুইস, বিদ্রোহী। ইমানুস, বিদ্রোহী—

দুইজন কৃষক আড়চোখে পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করিল। "ও হচ্চে-গুজ-লা-ক্রয়ান্ট।" "হাঁ, ব্রিস্-ব্লউই বটে।"

ঘোষণাকারী তালিকা পড়িতে লাগিল:—

—"গ্রাণ্ড-ব্রাক্কুর, বিদ্রোহী"—

লোকেরা বলিয়া উঠিল,

"উনি ত একজন পাদ্রী—আবে টুরমো।" "এবং বিদ্রোহী," ক্যাপ মাথায় একটা লোক বলিল।

জনতার মন্তব্যে কান না দিয়া ঘোষণকারী এইরূপে ক্রমে ক্রমে উনিশ জনের নাম পাঠ করিয়া গেল। তারপর পড়িল, "উপরি লিখিত ব্যক্তিগণ যেখানেই ধৃত হৌক্, সনাক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের শিরশ্ছেদ হইবে।"

জনতার মধ্যে আবার চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল।

ঘোষণাকারী পাঠ করিতে লাগিল:—"যে কেহ তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে, কিংবা তাহাদের পলায়নের সহায়তা করিবে, কোর্টমার্শেলের আদেশে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। স্বাক্ষর"—

সকলে নিস্তব্ধ হইল। সূচী পতন শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়

"স্বাক্ষর কমিটি-অব-পাবলিক-সেফটির প্রতিনিধি—সিমুর্দ্যান।"

"ইনি একজন পাদ্রী," জনৈক কৃষক বলিল।

অপর একজন মন্তব্য করিল, "প্যারিসের ভূতপূর্ব কিউর।"

একজন নগরবাসী বলিল, "এদিকে টুরমো, ওদিকে সিমুর্দ্যান। নীলদলের পাদ্রী আর সাদা দলের পাদ্রী।"

অন্য একজন নগরবাসী টিপ্পনী কাটিল, "চিত্তটি উভয়েরই সমান কালো।"

ব্যাল্‌কনির উপরে মেয়র মাথা হইতে হ্যাট খুলিয়া উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিলেন, "সাধারণ তন্ত্র দীর্ঘজীবী হৌক্।"

এই সময়ে ড্রাম একবার বাজিয়া উঠিল। ঘোষণাকারীর বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই, বুঝা গেল। সে হস্ত সঞ্চালন করিয়া সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "চুপ, চুপ, শোনো, সরকারী ঘোষণাপত্রের শেষ কয় ছত্র শোনো। উহা উত্তর উপকূলের তল্লাসী বিভাগের অধ্যক্ষ গভেনের স্বাক্ষরিত।"

জনতা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "শোনো! শোনো!"

ঘোষণাকারী পাঠ করিল,—

"উপরোক্ত আদেশানুসারে অধুনা লাটুর্গে অবরুদ্ধ উল্লিখিত উনিশজন বিদ্রোহীকে সাহায্য করা বারিত হইল। আদেশ অমান্য করার সাজা প্রাণদণ্ড।"

"কি!" কে একজন বলিয়া উঠিল।

উহা নারীর কণ্ঠস্বর। এ সেই সন্তানহারা জননী।

কৃষকদের আলোচনা

মিচেল ফ্লেচার্ড জনতার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল। আশেপাশের কথাবার্তায় তাহার মোটেই মনোযোগ ছিল না, কিন্তু মনোযোগ না দিয়াও আমরা কোনো কোনো কথা শুনিতে পাই। 'লা টুর্গ' শব্দটি তাহার কানে গেল। সে মাথা তুলিয়া চাহিল; বলিল—

"কি? লা টুর্গ!"

পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাহার দিকে তাকাইল। পরিধানে তাহার ছিন্ন বসন। তাহাদের বোধ হইল রমণী ক্ষ্যাপা।

কেহ কেহ বলিয়া উঠিল,—

"একে একজন বিদ্রোহীর মতন দেখাচ্ছে।"

জনৈক কৃষক রমণী এক ঝুড়ি বিস্কুট মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সে মিচেল ফ্লেচার্ডের নিকট আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "চুপ করে' থাকো, কিছু বলো না।"

মিচেল ফ্লেচার্ড রমণীর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। বিদ্যুৎস্ফুরণের মতো লা টুর্গ কথাটি তাহার মনের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল, তারপর আবার সব অন্ধকার। খোঁজ লইবারও কি তাহার অধিকার নাই? কি সে করিয়াছে যে, তাহারা উহার দিকে এমন করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে?

এদিকে ড্রাম শেষ বার বাজিল; ইস্তাহার আঁটা হইল; মেয়র তাঁহার ভবনে প্রস্থান করিলেন; ঘোষণাকারী গ্রামান্তরাভিমুখে রওয়ানা হইল, এবং লোকের ভিড় ক্রমে কমিয়া গেল।

ইস্তাহারটার সম্মুখে তখনো একদল লোক জটলা করিতেছিল। মিচেল ফ্লেচার্ড তাহাদের সঙ্গে যাইয়া ভিড়িল।

বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত লোকদের সম্বন্ধে তাহারা আলোচনা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে নাগরিক ও পল্লীবাসী অর্থাৎ 'নীল' ও 'সাদা' উভয় দলের লোকই ছিল।

একজন কৃষক বলিল, "যা হৌক্ সবাইকে তারা ধরতে পারেনি তো। উনিশজন তো উনিশজনই, তা'র বেশী নয়। প্রিয়নকে ধরতে পারেনি, বেঞ্জামিন মুলিনকে ধরতে পারেনি, গুপিল্‌কেও পারে নি।"

"মজিনের লবিউলকেও পারে নি,"—অপর একজন বলিল।

অন্যেরা বলিল, "ব্রাইস্ ডেনিস্‌কেও নয়।"

"ফ্রাঙ্কয় ডুডোনেট্‌কেও নয়।"

এইরূপে তাহারা আরও অনেকের নাম করিল, যাহারা এখনও ধৃত হয় নাই।

কঠোরাকৃতি, পক্ককেশ জনৈক বৃদ্ধ বলিল, "বোকারা! আরে, এক ল্যাটিনেক্‌কে ধর্‌তে পারলে তো সকলকেই ধরা হ'ল।"

একটি যুবক আস্তে আস্তে বলিল, "এখনও তাঁকে ধর্‌তে পারে নি।"

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল, "ল্যাটিনেক ধরা পড়্‌লে, প্রাণ-পাখীই ধরা পড়ল; ল্যাটিনেকের মৃত্যু মানে ভেণ্ডির বিনাশ।"

"কে এই ল্যাণ্টিনেক?" একজন নগরবাসী জিজ্ঞাসা করিল।

আর একজন নাগরিক উত্তর দিল, "ইনি একজন ভূতপূর্ব্ব।"

অপর একজন বলিল, "যারা মেয়েমানুষদেরও গুলি ক'রে এ তা'দেরই একজন।"

এই কথাগুলি মিচেল ফ্লেচার্ডের কানে গেল। সে বলিল,

"তা সত্যি।"

তাহারা তাহার দিকে ফিরিল। সে বলিতে লাগিল, "লোকটা আমাকেও গুলি করেছিল।"

তাহার কথাবার্ত্তা ইহাদের নিকট বড়ই অদ্ভুত ঠেকিতেছিল! একটি জীবিত রমণী যেন আপনাকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। তাহারা সন্দিগ্ধভাবে উহার দিকে চাহিল!

বাস্তবিক উহাকে দেখিয়া চমকিত হইবারই কথা। ভীত, ত্রস্ত, ব্যাধতাড়িত হরিণীর ন্যায় শঙ্কিত দৃষ্টি এই রমণী প্রতি পত্রান্দোলনে কম্পিত হইতেছিল। তাহার ভীতি-বিহ্বল চেহারা দর্শকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে। নৈরাশ্যের শেষ সীমায় উপনীত নারীর দুর্ব্বলতার মধ্যে একটা আতঙ্কজনক ভাব আছে। কিন্তু কৃষকেরা অত খুঁটিনাটি বুঝিতে পারে না। একজন বলিল, "হয়তো গোয়েন্দা।"

সেই সদাশয়া রমণী মিচেল ফ্লেচার্ডকে পুনরায় আস্তে আস্তে বলিল, "কথা টথা কিছু না বলে' তুমি এখান থেকে সরে' পড় বাছা।"

মিচেল ফ্লেচার্ড বলিল, "আমি ত কিছু দোষ করিনি। আমি আমার ছেলেমেয়েগুলির খোঁজ করচি।"

রমণী কৌতূহলী জনতার দিকে চাহিয়া একটি অঙ্গুলি দ্বারা নিজের মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল, "মাগী হাবা।" তারপর তাহাকে এক ধারে লইয়া গিয়া একটি বিস্কুট দিল।

মিচেল ফ্লেচার্ড রমণীকে তজ্জন্য ধন্যবাদ না দিয়াই বুভুক্ষু কুকুরের মতো তাহা খাইতে আরম্ভ করিল।

কৃষকেরা বলিল, "হ্যাঁ, মাগী হাবাই বটে; জানোয়ারের মতো খাচ্চে।"

জনতার অবশিষ্ট লোকেরাও তখন ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বিস্কুট খাওয়া শেষ হইলে মিচেল ফ্লেচার্ড বলিল, "বেশ! আমার খাওয়া হয়েচে। এখন লা টুর্গ কোথায় আমাকে বলে' দাও।"

কৃষক রমণী বলিল, "ঐ! আবার সেই কথা ওর মাথায় চাপ্‌চে!"

"লা টুর্গে আমাকে যেতেই হবে। পথটা আমাকে বলে দাও না?"

কৃষক রমণী বলিল,

"তা কক্‌খনই পারবে না। প্রাণটা নেহাৎই খোয়াতে চাও নাকি? আর, পথও আমি জানিনে। শোনো বাছা! মাথাটা তোমার আদপেই ঠিক নেই। হাঁপিয়েও পড়েছ খুব। তুমি কেন আমার বাড়ী এসে কিছুকাল জিরিয়ে নাও না?"

সন্তানহারা মাতা বলিল,—

"আমি কখনই জিরুই না।"

"আহা, ওর পা গুলি একেবারে কেটে ছড়ে' গেছে," কৃষক রমণী অনুচ্চস্বরে মন্তব্য করিল।

মিচেল ফ্লেচার্ড বলিতে লাগিল, "তোমাকে বলি কি, ওরা আমার ছেলেদের চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। একটি মেয়ে, দু'টি ছেলে। আমি বনের ভিতর দিকে আসচি। ফকির টেলিমার্চকে জিজ্ঞেস কর্‌লে জান্‌তে পারবে। সেই আমাকে ভাল করে কি না। ঐ মাঠে একজন লোকের

সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তাঁকেও জিজ্ঞেস করতে পার। আর সার্জেণ্ট রাডুব, সেও তোমাকে সব বলতে পারবে। তাঁর সঙ্গেও আমার বনের মধ্যে দেখা হয়েছিল। তিনটি—তিনটি ছেলে মেয়ে। সকলকার বড়টির নাম রেনিজিন—এর আমি প্রমাণ দিতে পারি। অপরটির নাম গ্রোস্-এলেন, আর ছোট্ট মেয়েটির নাম জর্জেটি। আমার সোয়ামীকে তারা মেরে ফেলেচে। সিস্কয়নার্ডে সে চাষবাস করত। তোমাকে ভাল মানুষটি ব'লে বোধ হচ্ছে। দাও, আমাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দাও। আমি ক্ষ্যাপা নই—আমি মা। আমি সন্তানহারা জননী—তা'দের খুঁজে বেড়াচ্চি। আর কিছু না। কোন্ পথে আমি এসেচি, ঠিক বলতে পারবো না। কাল রাত্তিরে একটা গোলাবাড়ীতে খড়ের উপর শুয়ে ছিলাম। আমি যাচ্চি লা-টুর্গে। আমি চোর নই। দেখতে পাচ্ছ না, আমি সত্যি কথা বল্‌চি? আমার ছেলেমেয়েদের খোঁজে একটু সাহায্য কর। আমি এ অঞ্চলের লোক নই। ওরা আমাকে গুলি ক'রেছিল, কোথায় বলতে পারব না।"

কৃষক রমণী মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহুঁ, বিপ্লবের কালে ওরকম কথাবার্ত্তা বললে ত চলবে না, বিপদে পড়বে যে।"

আর্ত্তকণ্ঠে জননী বলিয়া উঠিল, "কিন্তু লা-টুর্গ? মাদাম, শিশু-যীশু ও মাতা-মেরীর নামে তোমায় অনুরোধ করচি, মিনতি করচি, কোন্ পথে লা-টুর্গ যাব সেটি ব'লে দাও।"

কৃষক রমণী, চটিয়া গেল। "আমি কিছু জানিনা! আর জানলেও বলতাম না! সেটা বড্ড খারাপ জায়গা; কোনো লোক সেখানে যায় না।"

"কিন্তু আমি যাচ্চি।" এই বলিয়া সেই সন্তানহারা জননী পুনরায় রওয়ানা হইল। কৃষক রমণী তাহা দেখিয়া যেন আপন মনেই বলিল, "বেচারার রাত্তিরে খাবার যোগাড় ত চাই।"

সে দৌড়িয়া গিয়া মিচেল ফ্লেচার্ডের হাতে একটা রুটি দিল। বলিল, "রেতের বেলায় খেয়ো।"

মিচেল ফ্লেচার্ড রুটিটি নিল; কিন্তু কথার জবাব দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না, সোজা সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিল।

গ্রামের শেষ বাড়িটির কাছে উপনীত হইয়া সে দেখিল, তিনটি ছিন্ন-বসন নগ্নপদ ছেলে মেয়ে। সে তাহাদের নিকট গেল; তারপর বলিল, "এরা দুটি মেয়ে, একটি ছেলে।"

শিশুরা রুটিটার দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া সে তাহাকে ওটা দিয়া দিল।

ছেলেরা রুটিটা লইল, কিন্তু তাহাদের কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

রমণী অরণ্যের গর্ভে ডুবিয়া গেল।

৪

ভুল

সেইদিন অতি প্রত্যূষে অরণ্যের আবছায়ায় জাভেনে হইতে লেকুসি যাইবার আড়াআড়ি পথে নিম্নলিখিত রূপ একটা ব্যাপার ঘটিল।

পথের দুই ধারে উঁচু পাহাড়; তার উপর পথটি আঁকা-বাঁকা। গুপ্ত আক্রমণের এমন উপযোগী স্থান খুব কমই দেখা যায়।

অরণ্যের অপর প্রান্তে শকটরক্ষী সৈনিকগণের অন্তর্ভুক্ত বাহিনীর সঙ্গে মিচেল ফ্লেচার্ডের যখন সাক্ষাৎ হয় তাহার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে একদল লোক যেখানটায় জাভেনে রোড কুইনন নদীর উপরিস্থ সেতু অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে সেখানে আসিয়া ঝোপ ঝাড়ের অন্তরালে লুকাইয়া রহিল। চর্ম্মের খাটো কোর্ত্তা পরিহিত ইহারা সব বৃটেনীয় চাষার দল। সকলেই সশস্ত্র—কাহারও হাতে বন্দুক, কাহারও হাতে কুঠার। কুঠারধারীরা সম্মুখের ফাঁকা জায়গায় শুষ্ক কাষ্ঠের স্তূপ সজ্জিত করিয়া রাখিল—অগ্নিসংযোগের প্রতীক্ষা মাত্র। বন্দুকধারীরা রাস্তার উভয় পার্শ্বে সতর্ক পাহারা দিতে লাগিল। পত্রাবকাশের মধ্য দিয়া চাহিলে দেখা যাইত, প্রত্যেক অঙ্গুলি বন্দুকের টিপকলের উপর সংস্থাপিত এবং বন্দুকগুলির অগ্রভাগ রাস্তার অভিমুখে লক্ষীকৃত। দিবসের প্রথম আলোক সম্পাতে পথটি ধূসরাভ হইয়া উঠিয়াছে।

এই অস্পষ্টালোকে নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

"ঠিক জানো কি ?"

"এই রকম তো বলছে সবাই।"

"বোধ হয়, ওটার এখান দিয়ে যাবার সময় হয়ে এল ?"

"লোকে বলে ওটা এধারে এসে পৌঁছেচে।"

"কিছুতেই ওটাকে চলে যেতে দেওয়া হবে না।"

"ওটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।"

"তারই জন্যেতো আমরা তিন গাঁয়ের লোক জড় হয়েচি।"

"হাঁ ; কিন্তু রক্ষীদের কি হবে ?"

"তাঁদেরও নিকেস করতে হবে।"

"কিন্তু এ রাস্তায় সেটি যাবে তো ?"

"এই রকম তো কথা।"

"তা' হ'লে ভিত্রে দিয়ে আসচে বল ?"

"আপত্তি কি ?"

"কিন্তু কে যেন বলছিল, কুজার্স থেকে আসচে।"

"কুজার্স ই হোক্, আর ভিত্রেই হোক, শয়তানের কাছ থেকে যে আসচে তার আর কোনো সন্দেহ নেই।"

"তা বটে।"

"আর শয়তানের কাছেই বাছাকে ফিরে যেতে হবে।"

"হাঁ।"

"যাচ্চে সেটি প্যারিসেতে।"

"সেই রকম তো বোধ হচ্চে।"

"কিছুতেই ওটাকে যেতে দেওয়া হবে না।"

"নিশ্চয়ই না।"

"না, না, না !"

"এ-টে-ন্-শ-ন্"—কে একজন বলিয়া উঠিল।

এখন সাবধান হওয়া ও চুপ করিয়া থাকা আবশ্যক। দিনের আলোতে চারিদিক প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

সহসা এই লুকায়িত জনসমূহ নিঃশ্বাস রোধ করিয়া কান পাতিয়া রহিল। চাকার ঘর্ ঘর্ ও অশ্বপদ শব্দ শোনা যাইতেছিল। বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া চাহিয়া তাহারা অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল, একটা দীর্ঘ শকট, একদল অশ্বারোহী রক্ষী পরিবৃত হইয়া তাহাদের দিকে উচ্চ রাস্তা বাহিয়া আসিতেছে। শকটের উপর কি একটা রহিয়াছে।

একজন—বোধ হয় সে এই চাষার দলের সর্দ্দার বলিল, "ঐ যে আসচে।"

"হাঁ, রক্ষীসহ।"

"কয়জন ?"

"বারো।"

"শুনেছিলাম, ওরা কুড়ি জন হবে।"

"বারোই হোক আর কুড়িই হোক, সব্বাইকে নিকেস করতে হবে।"

"একটু অপেক্ষা কর। আরো নিকটে আসুক,"

"আমাদের সন্ধান যেন ব্যর্থ না হয়।"

একটু পরেই শকট ও তাহার রক্ষীগণ রাস্তার মোড়ের নিকট আসিয়া উপনীত হইল।

চাষাদের সর্দ্দার চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "রাজা দীর্ঘজীবী হৌন্।" সেই মুহূর্ত্তে শত বন্দুক গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ধূম অপসারিত হইলে দেখা গেল রক্ষীগণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সাত জন আরোহী নিহত এবং পাঁচজন পলায়িত। কৃষকেরা দৌড়িয়া শকটের নিকট গেল।

সর্দ্দার বলিয়া উঠিল, "থামো !" এতো গিলোটিন নয়। এ দেখ্‌চি একটা মই।"

বাস্তবিক গাড়ীর উপরে মোটে ছিল একটা খুব লম্বা মই।

শকটবাহী অশ্ব দুইটি আহত হইয়া গিয়াছে। অশ্বচালকও মৃত, যদিও আক্রমণকারীদের সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

সর্দ্দার বলিল, "যা হোক্। রক্ষী পরিবৃত মইও সন্দেহজনক। এও প্যারিসের দিকে যাচ্ছিল, নিশ্চয়ই লা টুর্গের প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের জন্য।"

চাষারা বলিয়া উঠিল, "এটাকে পোড়ানো যাক্।"

মইটিকে ভস্মীভূত করা হইল। ইতিমধ্যে সেই গিলোটিনবাহী শকট, যাহার জন্য তাহারা প্রতীক্ষা করিতেছিল, অন্য পথে প্রায় ৩ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যোদয় কালে মিচেল ফ্লেচার্ড সেটাকে অপর একটি গ্রাম ছাড়াইয়া যাইতে দেখিয়াছিল।

বনের ডাক

শিশুত্রয়কে আপনার আহার্য্য রুটিখানি দিয়া ফেলিয়া মিচেল ক্লেচার্ড লক্ষ্যহীন ভাবে বন অতিক্রম করিয়া চলিল। লা টুর্গে যাইবার পথ কেহ যখন নির্দ্দেশ করিয়া দিল না, তখন সে-পথ তাহার নিজেকেই খুঁজিয়া লইতে হইবে। কখনো কখনো সে বসিয়া পড়ে, তারপর উঠে, কিছুক্ষণ চলে, আবার বসিয়া পড়ে। তাহার পেশীগুলি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত যেন অবশ হইয়া আসিয়াছে। অথচ ছেলে-মেয়েগুলির সন্ধান করিতেই হইবে। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদের বিপদাশঙ্কা হয়তো বাড়িয়া চলিয়াছে। এই রমণীর মতো দায়িত্ব যাহার, তাহার নিজের কোনো দাবী থাকিতে পারেনা—এমন কি থামিয়া একটু দম লইবার অধিকারও বোধ হয় তাহার নাই। সে অতিশয় ক্লান্ত। আর একপদ অগ্রসর হওয়াও তাহার পক্ষে এখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সারাদিন সে হাঁটিয়া আসিয়াছে—একটি গ্রাম, কি একটি বাড়ীও তাহার চোখে পড়ে নাই। প্রথমে সে হয়তো ঠিক পথেই যাইতেছিল, তারপর ভুল পথের অনুসরণ করিয়া লতাপাতার গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছিল। আর কত দূর! সে কি গন্তব্য স্থানের সমীপবর্ত্তী হইতেছে? তাহার দুঃখ-নিশার কি অবসান হইবে না? পথের মাঝে পড়িয়াই কি তাহাকে প্রাণ দিতে হইবে? আর তো পা চলে না। তপন অস্তগমনোন্মুখ; অরণ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে; তৃণাচ্ছাদিত পথের সরু রেখা আর দৃষ্টি গোচর হয় না। অনাথা—অসহায়া রমণী! একমাত্র ভগবান ভিন্ন তাহার আর উপায় ছিল না। সে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু কেহ সাড়া দিল না।

চাহিয়া চাহিয়া ঘনসন্নিবিষ্ট শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়া সে অদূরে একটু ফাঁকা জায়গার মতো দেখিতে পাইল, এবং সেইদিকে অগ্রসর হইল। সহসা দেখিল, সে অরণ্যের একেবারে শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে।

সম্মুখে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা; তাহার নিম্নদেশে একটি স্বচ্ছ-সলিলা নির্ঝরিণী উপল রাশির উপর দিয়া কল ঝঙ্কারে বহিয়া যাইতেছে। মিচেল ক্লেচার্ড তখন অনুভব করিল যে, পিপাসায় তাহার বুক পুড়িয়া যাইতেছে। ঝরণার নিকট আসিয়া সে জানু পাতিয়া বসিয়া অঞ্জলি পূরিয়া জল পান করিতে লাগিল এবং ইত্যবসরে একবার প্রার্থনাও করিয়া লইল। তারপর উঠিয়া, কি করিবে তাহা একটু ভাবিয়া সে ঝরণা পার হইল।

এই ক্ষুদ্র উপত্যকার পরে যতদূর দৃষ্টি যায় এক বিস্তীর্ণ মালভূমি—অনুচ্চ গুল্মরাশিতে সমাবৃত। অরণ্য ছিল নির্জ্জন; আর এই প্রান্তর একেবারে মরুভূমি। বনে প্রত্যেক ঝোপ ঝাড়ের পেছনে কাঁহারও সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে এই আশা করা যাইত; বিশাল মালভূমি ধু-ধু করিতেছে—কিছুই চোখে পড়ে না। কেবল কয়েকটি পাখী যেন ভীত হইয়া উড়িয়া যাইতেছিল। মিচেল ক্লেচার্ড আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না।

সহসা এই ভীষণ জলহীন, তরুচ্ছায়াহীন প্রান্তরের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মতিচ্ছন্ন জননীর হৃদয়-বিদারী আর্ত্তস্বর ধ্বনিত হইল, "এখানে কি কেউ আছে?"

সে প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। উত্তর আসিল। একটা অস্পষ্ট গভীর শব্দ দিক্‌চক্রবাল রেখা হইতে উত্থিত হইয়া প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে চলিয়া আসিল। হয় বজ্র-নির্ঘোষ, নয় কামান গর্জ্জন। বোধ হইল যেন ইহা মাতার প্রশ্নের উত্তর দিল "হ্যাঁ।"

আবার সব নীরব।

জননী আবার যেন নূতন জীবন পাইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, ওখানে যেন কেহ রহিয়াছে যাহার সঙ্গে সে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিবে। এইমাত্র সে আকণ্ঠ সলিল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে এবং ভগবৎ চরণে আপনার দীন প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছে। তাহার বল ফিরিয়া আসিয়াছে। সে মালভূমিতে আরোহণ করিয়া দূর দিগন্তের ধ্বনির অভিমুখে চলিল।

সহসা সে দেখিতে পাইল দিক্‌চক্রবালের দূরতম প্রান্তে এক সুউচ্চ টাওয়ার সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম রশ্মিতে উহার শীর্ষদেশ অনুরঞ্জিত। উহা তখনও

প্রায় মাইলখানেক দূরে। টাওয়ারের পশ্চাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জঙ্গলতা গুল্মের রাশি কুয়াসায় লীন হইয়া গিয়াছে—ইহাই ফুলাসে'র অরণ্য।

মিসেস ফ্লেচার্ডের মনে হইল, 'ওখান হইতেই বজ্রগম্ভীর আহ্বান আসিয়াছে। ইহাই কি তাহার আর্ত্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিল?

সে ক্রমে মালভূমির উপরে আরোহণ করিল। সম্মুখে সুদূর প্রসারিত প্রান্তর—আর কিছু নাই।

ধীরে ধীরে টাওয়ারের অভিমুখে সে হাঁটিয়া চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

বিস্মরণ
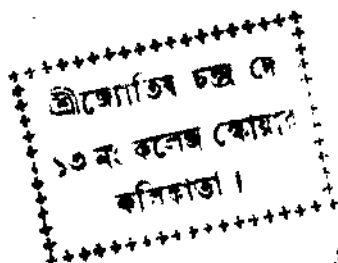
শ্রীমতী কল্পনা দেবী

ভুলে গেছ?—সেই ভাল, সে কখনো থাকে মনে?
কবে সেই একদিন একান্তে গৃহের কোণে,
একখানি ক্ষুদ্র লিপি ছোট দুটি ছত্রে তার
কার যেন পরিচয় এনেছিল সঙ্গোপনে!

হয় তো বা চেয়েছিল মুক্ত বাতায়ন ফাঁকে
একবার মনে হোল, যেন কোথা—কে ও ডাকে?
স্থির চিত্ত-পারাবারে হয় তো উঠিল ঢেউ
তবু সে যে কতদিন সে কি আর মনে থাকে!

মুখরিত চারিদিক শত কল-কোলাহলে,
কত লোক আসে যায় ব্যস্ত মন কত ছলে;
তার মাঝে একবার সেই সকরুণ সুর
ক্ষণিকের তরে যেন নয়ন তন্দ্রাল জলে।

চকিত বিস্ময়ে মন—একবার অন্যমনা,
যেন কি আসিল কাছে, যেন কি গেল না জানা;
একটি নিঃশ্বাস শুধু—তার পরে কিছু নয়—
নিমেষে বিস্মৃত হ'লে নিমেষেরি আনাগোনা।

ভুলে গেছ? সেই ভাল—ভুলিবারই কথা এযে!
জীবনের বীণা-তারে যত সুর ওঠে বেজে
সকলি কি ধরা যায়? একি মিছে অভিমান!
সুবিশাল বারিধির ক্ষুদ্রতম কণা সে যে।

বাতাস বহিয়া গেল, স্নিগ্ধ পরশনে তা'র
কত ফুল মেলে আঁখি—বারি-বিন্দু ঝরঝার
যেতে যেতে আনমনে বিশীর্ণ ফুলের দল
কখন পরশি' গেল—কে রাখে না খোঁজ তা'র।

তাই যদি ভুলে থাক, যেয়ো ভুলে ক্ষতি নেই,
যারা দেয় ভোলে তা'রা, মহতেরি রীতি এই;
সে ক্ষুদ্র অমৃতবিন্দু তৃষার্ত্ত কণ্ঠেতে যার
সিঞ্চিল জীবনী-ধারা—ভুলিল না শুধু সেই!

'নিত্যৈব সা জগন্মাতা'

শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র

খদ্যোত হাঁকিয়া বলিল—'রজত-কিরণে পৃথ্বী ভরিয়া দিলে তুমি চন্দ্রমা, আমিও করি তাই—এস নামিয়া, আলিঙ্গনে সখ্যের বন্ধন দৃঢ় করি'। জ্ঞান-গর্ব্বে স্ফীত আমরা যদি বলি—'অহং ব্রহ্মাস্মি,' আমিই সেই পরম ব্রহ্ম, সেও তেমনই। সাধনার সর্ব্বোচ্চ সোপানে দাঁড়াইয়া ঋষি যদি ঐ মহাবাক্য উচ্চারণ করেন, হয়ত তাঁহার সাজে! কিন্তু আমাদের—বিষয়-মদে উদ্‌ভ্রান্ত, ষড়রিপুর তাড়নায় বিক্ষিপ্তমনা আমাদের—আত্মবঞ্চনার পরাকাষ্ঠা উহা।

বুদ্ধি ক্ষুদ্র, জ্ঞান পরিমিত, ধারণা সীমাবদ্ধ—মহাকাশের ও অনন্তের ভাব-গ্রহণের শক্তি আমাদের কৈ? না পড়িয়া পণ্ডিত, না বুঝিয়া বোদ্ধা, রস-চর্চ্চায় নিরত থাকিয়াও সংযমী, মুহূর্ত্তের একাগ্রতা আনিতে না পারিলেও যোগী, পুষ্পিত বচনে দড়—মূঢ় আমরা!

দীপের শিখা হইতে পারি—অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। স্তূপের কণা—প্রকারান্তরে হয়ত; কিন্তু বারিবিন্দুও ত তাহা হইলে মহাসাগর, ছিন্নমেঘ মহাকাশ। পতি যেমন জায়ার শোণিতে বিচিত্র রূপ লন, সন্তানরূপে সৃষ্টিরক্ষার সহায়তা করেন—নানা মূর্ত্তি ও বিবিধ প্রকৃতি লইয়া, আদিপুরুষও তেমনই করিয়া এক হইতে বহু হইলেন। 'তৎ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি'—ছান্দোগ্য উপনিষদের কথা। ইহা হইতে এ কথার প্রমাণ হয় না যে, আমিই ব্রহ্ম। কণিকা, অণুর অণু হইতে পারি, অসংখ্য বিকাশের বিন্দু-পরিমিত একাংশ মাত্র! সমগ্রের সঙ্গে তাহার ঐক্য ও সামঞ্জস্য কোথায়?

নিত্যা তিনি, আমরা বিনাশশীল। 'মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি'—মৃত্যুস্বরূপ সংসারের পথে বিচরণ করি, বারবার যাই আসি। মৃত্যু-স্বরূপ ব্যতীত আর কি বলিব ইহাকে—আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ-জরা-মৃত্যু-বহুল এই সংসারকে? বিজ্ঞান বলে—পরমাণুর ক্ষয় নাই। বীজ যদি অক্ষয়, দেহও ত তবে অমর। বীজের রূপান্তর নাই, দেহের আছে, এই হিসাবে দেহ ক্ষয়মূল। আজি পাতা, কালি মাটি, পরে হয়ত অঙ্গার—অভ্র, প্রস্তর। কিন্তু আমের 'আঁটি' আমই—পার্থক্য বহিরাবরণে এই মাত্র।

'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব।' শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার ও তোমার বহু জন্ম গত হইয়াছে। কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ-পশু, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর, দেব-মানব কত রূপে কতবার জন্ম ও প্রকাশ—বিনাশও। পরমাত্মারূপে অনন্ত প্রকৃতিতে ব্রহ্ম আছেন, জীবাত্মারূপে ক্ষুদ্র দেহে জীবও আছে অনাদি-অনন্তকাল—অবিকৃতভাবে অবশ্যই। বিকার যাহা কিছু তাহা বাহ্য দৃষ্টিতেই প্রতিভাত। পরিবর্ত্তন প্রকৃত প্রস্তাবে নাই—শুধুই আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন। স্থূল দৃষ্টিতে প্রকৃতির বাহ্যরূপ সর্ব্বদাই বদলাইতেছে—ইহাকেই আদিকারণের জন্মান্তর বলা যায়। আর জীব তনুত্যাগে জীর্ণবস্ত্র পরিহার করিয়া যে নববস্ত্র পরিধান করে তাহাই তাহার জন্মান্তর। উদ্ভিদাদিরও ঐরূপ।

প্রকৃতির রূপ-পরিবর্ত্তনেই যদি জগত-প্রসবিতার জন্মান্তর আর সৃষ্ট-জীবের—জীর্ণকায়া ত্যাগে ও নবদেহ-গ্রহণে, তাহা হইলে অন্তরস্থিত মূলাধার যে বরণীয় ভর্গ—আত্মা বলি, তেজ বলি, অথবা Spirit প্রভৃতি যে নামেই অভিহিত করি না কেন, তাহার গতাগতি কিরূপে নিষ্পন্ন? 'বায়ুর্গন্ধমিবাশয়াৎ'—পুষ্পাদি আধার হইতে গন্ধ লইয়া বায়ু ছুটিয়া যায়, যে যে স্থানে সঞ্চরণ করে তাহাও গন্ধবাসিত করে; দেহস্বামী আত্মাও সেইরূপ যে দেহের আবরণ ত্যাগ করিয়া বাহির হয় তাহা হইতে যে দেহ পুনরায় ধারণ করে তাহাতে পূর্ব্বশরীরে অবস্থিত ইন্দ্রিয়গণকেও সঙ্গে লইয়া যায়। এইভাবে জগন্মাতার ধারা সৃষ্ট সকল প্রাণীতে ও পদার্থে সমভাবে সক্রিয়।

তবে প্রভেদ কোথায়—সৃষ্ট আমাতে ও সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহাতে? 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—অমৃতের পুত্র যদি, আমিই ত তবে সেই—'সোঽহম্'। 'সত্যং শিবং সুন্দরং'—সত্যস্বরূপ মঙ্গলময়

ও সুন্দরতম তিনি; 'রুদ্রক'—রুদ্রও তিনি। আমিও ত বটে!—অবশ্যই; কিন্তু সিদ্ধিলাভান্তে—তথাগতের ভাষায় অর্হত্ব-প্রাপ্তিতে। নতুবা শব্দ আবৃত্তিতেও কলুষের সঞ্চার—পাপপুণ্য না মানি, অন্ততঃ ঘোরতর হানি ঘটে ইহা অবশ্যম্ভাবী কার্য্য, আধ্যাত্মিক অনিষ্টও পূর্ণমাত্রায়।

নিত্যা তিনি। যুগে যুগে অবিকল্প সেই তিনি। তিনিই তোমার আমার ধাত্রী, জননী, পিতা, প্রভু। ভগিনী, কন্যা, জায়া সম্বোধনে আনন্দ পাই তাও; ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু নামে সন্তোষ হয় তাও। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে ব্রহ্মা স্তব করিতেছেন—

সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত মব্যাকৃতাহি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।

—তুমি সকলের আশ্রয়, এই নিখিল জগৎ তোমারই অংশভূত, তুমি অব্যাকৃতা আদ্যা পরমা প্রকৃতি।

নিত্যা সেই তিনিই—উপনিষদের ভাষায় যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং'—আমার হৃদ্দেশে, সমস্ত জীবে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যিনি। অগ্নি জগতে প্রবেশ করিয়া যে পদার্থকে স্পর্শ করে তাহারই সদৃশ রূপ পরিগ্রহ করে, সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত আত্মা বা ব্রহ্মও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধি অনুযায়ী তাহারই প্রতিরূপ লন অথচ নিজে অবিকৃত অবস্থায় থাকেন—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।

হৃষিকেশ তিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত—ভোগের অধিকারী নন, ভোক্তা নন, সাক্ষী-গোপাল। দুঃখ-বেদনায় অধীর হইয়া, কামনার অপূর্ণতায় অসহিষ্ণু হইয়া জগত-প্রণালীকে গালি পাড়ি, বিশ্ব-বিধানকে সংশয়ের চক্ষে দেখি, অভ্যাসবলে আপন পথ কাটিয়া লইবার প্রয়াস পাই না, নিজ কর্ম্মফলকে বেদনা-অসুবিধার জন্য দায়ী করি না বরং সকল জ্বালা-যন্ত্রণার নিমিত্ত বহিদৃষ্টিতে তাকাই বিশ্ববিধাতার দিকে—বুদ্ধির বিপাকে, অজ্ঞতার ঘূর্ণিপাকে! কে স্মরণ করাইয়া দিবে তখন সার্ব্বমাঙ্গল্যের কথা? কোথা সেই গরীয়ান গুরু যিনি মন্ত্র দিবেন—'তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক্'—তাঁহারই ইচ্ছা সর্ব্বত্র যিনি ব্যাপ্ত নানা মূর্ত্তিতে নানা বিভূতিতে।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্—

তিনি নিত্যা ও জগন্মূর্ত্তিস্বরূপা, তাঁহা দ্বারাই সারাজগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে। বিশ্ব-চরাচরের প্রসূতি, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, সেই আমাদের মা—জগন্মাতা, পুং-স্ত্রী একাধারে দুই। সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিতা, প্রকৃতির বিনাশেও অপরিবর্ত্তিতা চৈতন্য-স্বরূপা তিনি।

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব—সুতায় যেমন মণিমুক্তা গাঁথা থাকে আমাতে জগতের সমস্তই তেমনই গ্রথিত—শ্রীভগবানের উক্তি এই। ইহা সেই একই কথার পুনরুক্তি। শ্রীচণ্ডীতেও যাহা শ্রীগীতাতেও তাহাই—'ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা'—অব্যক্তমূর্ত্তি আমি এই নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত; কিন্তু কি ভাবে? বিশ্বরূপ-দর্শন অধ্যায়ে তাহা স্পষ্টিকৃত—

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥

অর্থাৎ অর্জ্জুন তখন দেখিলেন;—নিখিল জগৎ আদিদেবের শরীরে একত্র অবস্থিত অথচ বহুপ্রকারে বিভক্ত।

যদা ভূত পৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥

যখন বুঝিব পৃথক পৃথক চৈতন্য একই চৈতন্য হইতে উদ্ভূত এবং সেই এক চৈতন্য হইতেই সমস্ত ভূত-চৈতন্যের বিস্তার তখনই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ। তখনই ত বাস্তবিক দিব্যচক্ষু-প্রাপ্তি—সেই দিব্যচক্ষু-বলে স্বতঃই দেখিতে পাইব—আদিদেবের দেহে বহুপ্রকারে বিভক্ত নিখিল জগৎ অথবা জগতে তাঁহারই নানা মূর্ত্তি জীবরূপে স্থাবর-জঙ্গম-রূপে। এই চপল ও দুর্দ্দমনীয় মনে একাগ্রতার ছোপ দিয়া পরিষ্কার দেখিতে পাইব—

অনেক বাহূদরবক্ত্র নেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বত এব ব্যাপ্তম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্॥

হে বিশ্বেশ্বর! অনেক বাহু-উদর-মুখ ও চক্ষুযুক্ত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত তোমার বিশ্বরূপ দেখিতেছি—তোমার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্তও নাই।—ইহা সেই একই বাণী—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।'

বিজ্ঞান কৃতিত্ব লইতে চায়—বিমানে অবলীলাক্রমে মহাসাগর পার হইয়া, তারে ও বেতারে দুনিয়ার বার্ত্তা

…ওয়া আনিয়া, চিত্র ও কণ্ঠস্বর হুবহু ধরিয়া রাখিয়া, কিন্তু কিসের ফল সে? জগন্মাতার নানা মূর্ত্তির সংযোগ-বিয়োগে নয় কি? তড়িৎ-প্রবাহে ইলেক্‌ট্রোনে জলে স্থলে বায়ুতে লয়-প্রলয়ে কে? কোন্ মৌলিক উপাদান সৃষ্টি করিল গর্ব্বী বিজ্ঞান? যাহা আছে তাহা লইয়াই নাড়াচাড়া, ভাঙাগড়া। ইহাতেই নূতনত্ব-আবিষ্কারের কি সদম্ভ সাড়া!

সুখ—নিরবচ্ছিন্ন সুখ অপর কোথাও নাই। আনন্দ শুধুই ভূমায়, জগন্মাতার আরাধনায়, ধ্যান-ধারণায় ও সমাধিতে।

যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং—

সুখ—ভূমায়, সেই সুখই পরম সুখ, অল্পে বা অপর কোথাও সুখ নাই। যে সুখের ক্ষয় নাই, যে সুখে পঙ্কিল ভাব নাই, যে সুখ চিরন্তন সেই সুখ বাসনা-বিসর্জ্জনে, আত্মজ্ঞানে—ভূমা তাহার প্রতীক। ত্যাগের মন্ত্র প্রচার করি আমরা, চাহি অর্থ—সেই ধন যাহার অর্জ্জনে ক্লেশ, অর্জ্জিত হইলে রক্ষায়, ব্যয়ে দুঃখ, বিনষ্ট হইলে মনস্তাপ। অল্পে তুষ্টি খুঁজি, বিভ্রান্তি-বশে দুঃখের বেড়াজালে জড়াইয়া পড়ি ধনের উপাসনায়, কুবের যে আমাদের দেবতার সেরা!

ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হই বা না হই, হইতে চাই বা না চাই, পারি বা না পারি, চক্ষু মুদিয়া থাকি কেন, ভ্রান্তিবশে পঙ্কে ডুবি কেন, কর্ম্মে অনাসক্তি কেন, কুকর্ম্মে রতি কেন? দুঃখদৈন্যের তাড়নায়? এই দুঃখ-বেদনার মূলীভূত কারণ কি? নিজকৃত কর্ম্ম নহে কি? শুভ ও অশুভ সকল কৃতকর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে—নিস্তার নাই।

'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম'—ভোগ না করিলে কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। তবে নির্ব্বেদ কিসের? ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তিনিই রূপরসাদি বিষয়ে আসক্তিরূপ মায়া দ্বারা সকলকে ঘুরাইতেছেন—শস্যাদি যেমন করিয়া জাঁতায় পিষ্ট হয় তেমনই করিয়া—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা তিনি, ভূতগণের আদি মধ্য এবং অন্তও তিনি, কিন্তু সকল ভূত তাঁহাতে থাকিলেও তিনি সে সমস্তেই নির্লিপ্ত—'মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ।' তবে যে তিনি জাঁতায় চাপাইয়া সকলকে ঘুরাইতেছেন সে তাঁহারই প্রবর্ত্তিত বিধানক্রমে। পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপ দিয়া দগ্ধ হয়, জীবও তেমনই সু ও কু-কর্ম্মের ফলে বিধিরচিত চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া শুভাশুভ ফলাফল ভোগ করিতেছে। অগ্নির যেমন দাহিকা শক্তি কর্ম্মেরও তেমনই ভোগবিধায়ক চক্র।

জাঁতার পেষণে কৃতকর্ম্মের ক্ষয়, নূতন কর্ম্মের সঞ্চয়ও—বুদ্ধিদোষে বিচারভ্রংশে। পরিত্রাণের পন্থা সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই আশ্রয়-গ্রহণ। নিত্যা সেই জগন্মাতার কৃপায় শ্রেষ্ঠ শান্তি ও শাশ্বত অবস্থা লাভ অবশ্যই ঘটিবে। চাই ঐকান্তিক চেষ্টা, একাগ্র সাধনা, চরম তন্ময়ত্ব। এই তন্ময়ত্বের ফলেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা। তদ্‌গতচিত্ত হইতে পারিলে তবেই না সকল কর্ম্ম তাঁহাকে সমর্পণের সক্ষমতা আসিবে, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার শরণ-গ্রহণ সম্ভব হইবে, তবেই না তাঁহার শ্রেষ্ঠ বাণীর প্রতিধ্বনি চরাচরে শব্দিত হইয়া উঠিবে তোমার আমার সকলের হৃদয়-কন্দর হইতে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর; আমি তোমাকে সকল দুঃখ পাপ হইতে মুক্ত করিব—শোক করিও না।

যুক্তি-তর্ক বাদ-বিসম্বাদ বিচার-আচার সব ভুলিয়া একান্ত মনে তাঁহারই শরণ-গ্রহণে সকল পাপ হইতে মুক্তি, কলুষরাশি বিধৌত হইয়া মুক্তিস্নানান্তে তাঁহাতেই পরিসমাপ্তি, যে দীপ হইতে শিখা নির্গত সেই আধারেই প্রতিনিবৃত্তি, বোধিসত্ত্বের ভাষায় মহা-পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তি, হিন্দুর ব্যাখ্যায় নিত্যা সেই জগন্মাতায়। সকল ভাষার, সকল বাক্‌বিতণ্ডার ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল পন্থার চরম গতি ও পরম সিদ্ধিস্থিতি নিত্যা সেই জগন্মাতায়—যেহেতু আদ্যাশক্তি তিনিই, গীতাবর্ণিত পুরুষোত্তমও তিনি, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও তিনি, স্থিতিদেব বিষ্ণুও তিনি, হলাহলপায়ী শিবও তিনি, আবার মুণ্ডমালিনী কালিকা তিনি, দশপ্রহরণধারিণী মহিষমর্দ্দিনী দুর্গাও তিনি—সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত সেই তিনি।

কিন্তু এই সমস্ত সাস্ত রূপকল্পনায় অনন্তের ঐশ্বর্য্যের খর্বতা-সাধন সূচিত নয় কি ? বিশিষ্ট একটি স্থূল মূর্ত্তিকে পূর্ণজ্ঞানের আরোপে অবিদ্যার ভজন নয় কি ? অবশ্যই, যদি বা যতক্ষণ না আমরা সেই পরম জ্ঞানের অধিকারী হই যে জ্ঞান কোলাহল ও উত্তেজনা-বর্জ্জিত শান্ত সংযত ও পবিত্র, কারণ শুধু তদ্দ্বারাই আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভূতে ও বস্তুতে অভিন্ন অব্যয় এক বস্তুকেই লক্ষ্য করিতে পারি—'যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে অবিভক্তং বিভক্তেষু'। সেই জ্ঞানের উন্মেষ হইলে সাকার ও নিরাকারের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যায়, নিরাকারের উপাসনায় অজ্ঞাতসারে প্রভুর চরণপদাদির আবির্ভাব হয়, সাকারের অর্চনায় মুক্তকণ্ঠে উচ্চারিত হয়—'নিত্যৈব সা জগন্মাতা'। সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের উহাই শুদ্ধাবস্থা। সকল ভেদাভেদের অবসান তখনই—তখনই পতঞ্জলির উদার মত পূর্ণ প্রকট—'যথাভিমতধ্যানাদ্বা' —যাঁহার যেরূপে শ্রদ্ধা হয় সেইভাবেই তিনি পরম চৈতন্যের ভাবনা করুন। হইলই বা গাছে গাছে, লতায় পাতায়, মৃন্ময়-মূর্ত্তিতে, প্রস্তর-খণ্ডে, মানুষে-প্রেতে, গিরিপর্ব্বতে, সাগরে-আকাশে ; জড়ে মন না ভরে উঠুক্ ধ্যান ও ধারণা ঊর্দ্ধে—চৈতন্যে, নিরাকার ব্রহ্মে। সকল রূপব্যঞ্জনায় রূপকল্পনায় তিনি, রূপময়ে ও রূপহীনে তিনি—অজর, অমর ও সনাতন, চেতন ও অচেতন, একযোগে পরমাণুবৎ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম এবং মহান্ ও বিরাট। "দিবীব চক্ষুরাততম্"—আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় স্বরূপ তাঁহার—জগন্মাতার ; 'আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম'—জল তিনি, তেজ তিনি, রস তিনি, অমৃতস্বরূপ পরমব্রহ্মও তিনি, এক কথায় সপ্তলোকও তিনি। 'ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং'—একাক্ষর ব্রহ্ম—ওঁকার তিনি, অনন্তস্বরূপ তিনি, পুরি বা দেহে শায়িত বলিয়া পুরুষ নামে খ্যাত তিনি অথচ প্রকৃতপক্ষে 'ঊর্দ্ধ লিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং'—অবয়বরূপ চিহ্নের অতীত, নিরাকার, ইন্দ্রিয়াতীত ও জগন্মূর্ত্তিস্বরূপ। নামরূপের অতীত কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞানে নামরূপে কল্পিত শাশ্বত সেই তিনি—'নিত্যা সেই জগন্মাতা'—কবি-মহর্ষি স্তুতি করিতে গিয়া যাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন ক্ষমা-ভিক্ষার সকরুণ সুরে—

"রূপনাম-হীনে যেখানে আরোপ
করিয়াছি রূপ নাম !
স্তুতি-গণ্ডীতে বচন-অতীতে
ঘিরিয়াছি অবিরাম !
নিখিল ব্যাপিয়া আছ তুমি, দেব,
তীর্থে গিয়াছি তবু ;
এ মূঢ় ত্রিদোষে দোষী, জগদীশ ;
মার্জ্জনা কর, প্রভু !"

শ্রীকালীচরণ মিত্র
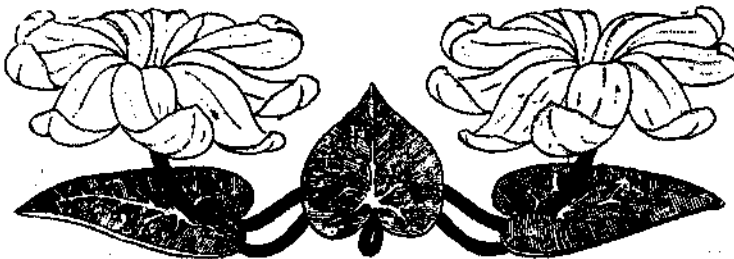
পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সভ্যতার পার্থক্য

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র বি-এ

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা কেবল নামেই। ইহার ফলে প্রতীচ্যের জাতিসমূহ দিনদিন অধঃপতন ও ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে, অনেকে ইহাকে সভ্যতা আখ্যা দিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। ইহার সমালোচনায় বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে। এই সভ্যতার পাপ হইতে জাতি-মণ্ডলীকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অনেক সভা-সমিতিও বসিতেছে। একজন শ্রেষ্ঠ ইংরাজ-লেখক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন,—'সভ্যতা—উহার মূল ও প্রতিকার।' এই পুস্তকে সভ্যতাকে একটি ব্যাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে

অতি সত্য কথা। লোকে নিজের বিরুদ্ধে বড় একটা তর্ক করে না। যাহারা আধুনিক সভ্যতায় মজিয়া আছেন, তাঁহারা ইহার বিপক্ষে বিশেষ কিছু লিখিতে পারেন না, বরং ইহাকে সমর্থন করিবার জন্য নানা তথ্য ও যুক্তি খুঁজিয়া বেড়ান—নিজের অজ্ঞাতসারে, ইহাকে সত্য ভাবিয়া। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে, তখন স্বপ্নে বিশ্বাস করে; যখন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠে, তখন ঘোর কাটিয়া যায়। যে ব্যক্তি সভ্যতার বিষে আকণ্ঠ ডুবিয়া আছে, সে স্বপ্নাবিষ্টের তুল্য। আমরা যাহা কিছু পড়ি, সেগুলি বর্ত্তমান সভ্যতার সমর্থকদিগের রচনা। অবশ্য ইহার ভাবকগণের ভিতর কতক কতক পণ্ডিত ও সাধু ব্যক্তিও আছেন। তাঁহাদের লিখনভঙ্গী আমাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলে। আমরা ধীরে ধীরে উহার ঘূর্ণিস্রোতে গিয়া পড়ি।

এই 'সভ্যতা' শব্দের অর্থ কি? ইহার চরম পরখ এই যে, যত লোক ইহার ছায়াতলে আসিবে, সকলেই শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞান করিবে। কতকগুলি উদাহরণ লওয়া যাউক। গত একশত বৎসরের তুলনায় ইউরোপের বর্ত্তমান অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল বাড়ীতে বাস করিতেছে—ইহা সভ্যতার একটি নিদর্শন, শারীরিক সুখবৃদ্ধিরও একটি বস্তু বটে। পূর্ব্বে যাহারা চামড়া পরিত এবং অস্ত্রস্বরূপ সড়্কি-সাবোল ব্যবহার করিত তাহারা আজকাল পায়জামা পরে এবং দেহের পারিপাট্যের জন্য নানা রংয়ের কাপড় ব্যবহার করে, সড়্কি-সাবোলের বদলে পাঁচ-নলী বা ততোধিক নলী রিভলভার সঙ্গে লয়। কোন দেশের যে সকল লোক বেশী কাপড়-চোপড়, বুটজুতা প্রভৃতি ব্যবহার করে নাই, তাহারা যদি ইউরোপীয় বেশ-ভূষা গ্রহণ করে, তাহা হইলে জঙ্গলী হইতে সভ্য হইল বলিয়া তাহাদিগকে গণ্য করা হয়। পূরাকালে ইউরোপের লোক শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জমি চষিত। আজকাল একজন লোকে বড় বড় ভূ-ভাগ বাষ্পীয় এঞ্জিন দ্বারা চষিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। ইহা সভ্যতার একটী চিহ্ন। তখন দু'এক জন লোকে বই লিখিত, তাহাতে যথেষ্ট বস্তু থাকিত। এখন যাহার যাহা খুসী লেখেন এবং তাহাই ছাপাইয়া মানুষের মন বিষাইয়া তুলেন। সেকালে লোকে গরুর গাড়ীতে দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিত; আজকাল রেল-গাড়ীতে বায়ু ভেদ করিয়া চলে, দিনে চারিশত বা ততোধিক মাইল অতিক্রম করে। ইহাকেই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা বলা হয়। শুনা যায়, সভ্যতার যতই বিস্তার হইতে থাকিবে, মাত্র দু'এক ঘণ্টায় উড়ো জাহাজে চড়িয়া পৃথিবীর যে কোন স্থানে লোকে ততই যাতায়াত করিতে পারিবে। মানুষের আর হস্তপদাদির চালনা প্রয়োজন হইবে না। একটি বোতাম টিপিলেই কাপড় জামা পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত, আর একটি বোতাম টিপিলেই অমনি খবরের কাগজ আসিয়া হাজির, তৃতীয়টা টিপিবামাত্র দ্বারে মোটর গাড়ী! এই ভাবে নানা উপাদেয় আহার্য্য দ্রব্যও আসিতে থাকিবে। ফল কথা সমস্তই যেন কলে সুসম্পন্ন হইবে। পূর্ব্বে কেহ কাহারো সহিত লড়াই করিলে

শারীরিক বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই জয়-পরাজয়ের বিচার হইত ; এখন একজন লোক পাহাড় হইতে কামানে পিছনে বসিয়া হাজার হাজার মানুষের প্রাণ নাশ করিতে পারে। ইহারই নাম সভ্যতা। পূর্ব্বে যাহারা যতক্ষণ খুসী মুক্ত বায়ুতে বসিয়া কাজকর্ম্ম করিত, এখন হাজার হাজার শ্রমিক সংঘবদ্ধ হয় এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কারখানায় বা খনিতে রুদ্ধশ্বাস হইয়া কাজকর্ম্ম করে। ইহাদের অবস্থা পশু হইতেও অধম। কোটিপতিরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জীবন সংশয় করিয়া অতি ভীষণ কাজেও অর্থ উপার্জ্জন করেন। সেকালে বাহুবলে মানুষকে ক্রীতদাস করিয়া রাখা হইত। এখন সমস্ত মানুষ টাকার গোলাম এবং বিলাসিতার দাসানুদাস। এখন এমন সব উৎকট রোগ দেখা দিয়াছে যাহার কথা লোকে পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। অগণিত চিকিৎসক নিযুক্ত করা হয় প্রতিকার অনুসন্ধানের নিমিত্ত ; হাঁসপাতালের সংখ্যাও কাজেই নিত্যই বাড়িতেছে। ইহারই নাম সভ্যতা। সেকালে চিঠি পাঠাইতে হইলে বিশিষ্ট দূতের প্রয়োজন হইত এবং খরচও পড়িত বিস্তর ; এখন এক আনা পয়সা ফেলিয়া যে কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে গালাগালি দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিতে পারে। অবশ্য ঐ পয়সায় ধন্যবাদও পাঠান চলে। পূর্ব্বে লোকে ঘরে তৈয়ারি রুটি ও শাক-সবজি দিয়া দুই বা তিনবার আহার করিত ; আজকাল দুই ঘণ্টা অন্তর কিছু খাওয়া দরকার, অন্য কোন কাজ করিবার বিশেষ সময়ই থাকে না। আর কত বলিব ? সবই বড় বড় লোকের লেখায় আছে। কেহ যদি বিপরীত কথা বলেন, এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান নাই বুঝিতে হইবে। এই সভ্যতা নীতি বা ধর্ম্মের কোন ধার ধারে না। ইহার ভক্তেরা ধীরভাবে বলেন যে, ধর্ম্ম-প্রচার তাঁহাদের কর্ম্ম নয়। অনেকেই ধর্ম্মকে কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ বা ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া নীতির বুলি আওড়ান। নীতির ভাণ করিয়া অনেক দুর্নীতিও শিখান হয়। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে শিশুও বুঝিবে যে, বর্ত্তমান সভ্যতায় নীতির নামগন্ধও নাই। সভ্যতা কেবল বাহ্য আরাম-বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট এবং সেই প্রচেষ্টা ফলবতী করিতে গিয়া স্তূপাকার দুঃখভোগও অপরিহার্য্য।

এ সভ্যতা অতি ভীষণ। ইউরোপের লোকের মনে অথচ ইহার আধিপত্য এত প্রবল, দেখিলে মনে হয়, উহারা সকলে বুঝিবা বিকৃত-মস্তিষ্ক—উন্মাদ। উহাদের শারীরিক বা মানসিক প্রকৃত বল আদৌ নাই। কতকগুলা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিয়া স্নায়ু উত্তেজিত রাখে মাত্র। নির্জ্জনতায় উহারা কোনক্রমেই বাস করিতে পারে না। স্ত্রী-লোকেরা কোথায় লক্ষ্মী-স্বরূপিনী হইয়া গৃহে বিরাজ করিবে, না, দলে দলে সকলে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কিম্বা কল-কারখানায় চিরদিনের দাসখত লিখিয়া দিতেছে! যৎসামান্য অর্থের জন্য শুধু ইংলণ্ডে অর্দ্ধলক্ষ নারী কলে কলে কিম্বা ঐরূপ নানাস্থানে ভীষণ অবস্থায় খাটিয়া মরিতেছে! সাফ্রেজেট আন্দোলন যে প্রত্যহ বাড়িয়া চলিয়াছে, এই বীভৎস সত্য তাহার একটি কারণ।

এ সভ্যতা অতীব ভঙ্গুর ; কিছুকাল কাটিয়া যাইলে আপনা হইতেই বিনষ্ট হইবে। মহম্মদের নীতির প্রতিধ্বনি করিয়া ইহাকে 'শয়তানী সভ্যতা' বলা চলে। হিন্দু-ধর্ম্ম ইহাকে 'তামসী যুগ' বলিয়াছে। ইহার সম্পূর্ণ স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য। ইহা ইংরাজের রক্ত শোষণ করিতেছে। ইহা পরিহার করা আশু প্রয়োজন। পার্লামেণ্ট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দাসত্বের নিদর্শন। যদি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা যায় তাহাহইলে সকলেরই এইরূপ প্রতীতি জন্মিবে। উহারা পণ্ডিত জাতি ; ঐ পাপ হইতে উহারা মুক্ত অবশ্যই হইবে, কারণ উহারা উদ্যোগী ও পরিশ্রমী ; উহাদের চিন্তার ধারা অভিশাপ-দুষ্ট নহে এবং হৃদয়ও মলিন নহে। এই সকল গুণের আধার বলিয়া উহারা সম্মানার্হও বটে। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সভ্যতা কিছু দুরারোগ্য ব্যাধিও নহে। কিন্তু উপস্থিত যে উহারা ঐ রোগে জর্জ্জরিত সে কথা ভুলিলে চলিবে না।

ইউরোপীয় সভ্যতার চিত্র উপরে দেওয়া হইল। ভারতবর্ষের কথা এখন আলোচ্য। হিন্দুস্থান যে সভ্যতার প্রবর্ত্তন করিয়াছে পৃথিবীতে উহা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পূর্ব্বপুরুষগণ যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন তাহার

তুলনা নাই। রোম লুপ্ত হইয়াছে, গ্রীসেরও ঐ দশা, ক্যারায়োর দর্পচূর্ণ হইয়াছে, জাপান হুবহু প্রতীচ্যের মত গড়িয়া উঠিয়াছে, চীন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা চলে না, কিন্তু ভারতবর্ষ এখনও যেমন করিয়াই হউক না কেন, আপনার বনিয়াদ শক্ত রাখিয়াছে। ইউরোপ লুপ্তগৌরব গ্রীস কিম্বা ইতালীর লেখকদিগের রচনা হইতেও জ্ঞান সঞ্চয় করে। পাঠ-গ্রহণকালে উহারা মনে করে যে, গ্রীস-রোম যে ভুল করিয়াছে সে ভুল আর উহারা করিবে না। ভারতবর্ষ কিন্তু অটল, ইহাই তাহার গৌরব। ভারতের দুর্নাম যে তাহার অধিবাসীরা অত্যন্ত অসভ্য, অজ্ঞান ও নির্জ্জীব, যে কোনরূপ পরিবর্ত্তনের প্রতি বীতস্পৃহ। ইহা কিন্তু অক্ষমতা ঘোষণা করিবার কৌশল মাত্র। অভিজ্ঞতার পরশ-পাথরে পরখ করিয়া সত্য বলিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহা বদলাইতে কোনক্রমেই আমরা প্রস্তুত নহি। অযাচিত উপদেশ অনেকেই দিতে আসেন; ভারতবর্ষ দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাই ভারতের সৌন্দর্য্য, আমাদের আশার নোঙর।

কেমন করিয়া কর্ত্তব্যপালন করিতে হয় সভ্যতা তাহাই নির্দ্দেশ করে। কর্ত্তব্য ও নীতি-পালন অঙ্গাঙ্গী শব্দ। নীতিপালন করিলে মন ও প্রবৃত্তির উপর সংযম আসে। ইহার অনুশীলনে আত্মোপলব্ধি ঘটে। গুজরাতী ভাষায় সভ্যতার প্রতিশব্দ হইতেছে "সদ-চরিত্র।"

এই সংজ্ঞা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে ইহাও সত্য যে, ভারতবর্ষের অন্যের নিকট হইতে শিক্ষা করিবার বিশেষ কিছুই নাই; এই কথা বহু লোকে বারংবার বলিয়াও আসিতেছেন। মন অস্থির পাখীর মত, যত পায় তত চায়, তথাপি তাহার ক্ষুধা মিটে না। আমরা যতই ইন্দ্রিয়-সুখে ডুবিতে থাকি, সংযমের বন্ধন ততই শিথিল হইয়া পড়ে, এই জন্যই পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের ভোগাশয়ের একটি সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, সুখ কেবল মনের একটি বিশেষ অবস্থা মাত্র; অর্থই সুখের মাপকাঠি নয়, দারিদ্র্যই অসুখের আকর নয়—যেহেতু ধনীদের প্রায়ই অসুখী এবং নির্ধনকে সুখী দেখিতে পাওয়া যায়; তা'ছাড়া লক্ষ লক্ষ লোক চিরকাল গরীবই থাকিবে। বহু অভিজ্ঞতার ফলে ভারতীয় মনীষীরা সুখ-ভোগের ও কামনা-বিলাসিতা ত্যাগের উপদেশ দেন। হাজার বছর পূর্ব্বে যেরূপ হাল চলিত ছিল, তদ্বারা এখনও কাজ চলিয়া আসিতেছে। পুরাকালে যেরূপ 'কুঁড়ে' ছিল সেই গঠন বজায় রহিয়াছে। আমাদের অন্তর্জাত সুশিক্ষাপ্রণালী তেমনি সনাতন আছে। জীবন-নিষ্পেষণ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না; সকলেই স্ব স্ব পেশা বা ব্যবসায়ে রত হইত এবং একটি বাঁধা-ধরা মজুরী লইত। আমরা যে কল-কব্জা উদ্ভাবন করিতে জানিতাম না তাহা নহে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বুঝিয়াছিলেন যে ইহার ব্যবহারে আমরা দাস হইয়া পড়িব এবং মানসিক উৎকর্ষতা হারাইয়া বসিব। গভীর চিন্তার পর তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে হাত-পা দিয়া যাহা তৈয়ারী হইবে তাহাই মাত্র ব্যবহার করা সমীচীন। তাঁহারা জানিতেন যে, ঠিক করিয়া হস্ত-পদের চালনা করিলে স্বাস্থ্য ও সুখ অক্ষুণ্ণ থাকে। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, বড় বড় সহরগুলা এক একটি জালের মত, এগুলা অকারণ বোঝা মাত্র, লোকে উহার ভিতরে থাকিয়া কিছুতেই সুখী হইতে পারে না। ইহাতে শুধুই কতকগুলা চোর ডাকাইত, পাপ ও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে এবং ধনী দরিদ্রের উপর অযথা পীড়ন করিতে থাকিবে। এজন্য তাঁহারা ছোট ছোট গ্রাম সংগঠন করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতেন। তাঁহারা জানিতেন রাজা ও রাজ-তলোয়ার নীতি-তলোয়ার হইতে হীন, এই কারণে রাজা-বাদশাদিগকে ঋষি ও ফকিরের তুলনায় ছোট মনে করিতেন। যে জাতির এমন সংগঠন, অন্যের নিকট হইতে তাহার শিক্ষণীয় বিশেষ কিছু নাই, সে জাতি বরং শিক্ষা দিবার অধিকতর যোগ্য। এ জাতির বিচারাগার, ব্যবহারজীব ও চিকিৎসক ছিল, কিন্তু সকলেই সীমার ভিতর থাকিত। সকলেই জানিত এ কাজগুলা উচ্চাঙ্গের নহে। উকীল ও বৈদ্যেরা জনগণের অধীনস্থ থাকিতেন, কোনদিন প্রভুত্ব লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন নাই। ন্যায়-বিচার যোগ্যতার সহিত হইত। তবে সাধারণতঃ লোকে বিচারাগারে যাইত না। লোককে প্রতারিত করিবার জন্য 'টাউট' ছিল না। সাধারণ লোক স্বাধীনভাবে

দিনযাপন করিত এবং কৃষি-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। তাহারা প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন ভোগ করিত।

বর্ত্তমান কালের এই সভ্যতা আজিও যেখানে পৌঁছে নাই, সেখানে ভারতবর্ষ সনাতন কালের মতই রহিয়া গিয়াছে। সে সকল স্থানের অধিবাসীরা আমাদের চাল চলন দেখিয়া হয়ত বিস্ময়ে অভিভূত হইবে। ইংরাজের শাসন সেখানে চলে না, কেহই তাহাদের উপর কখনও প্রভুত্ব করিতে পারিবে না। যাহাদের কথা বলিতেছি, তাহাদের নাম আমরা জানি না, তাহারাও আমাদিগকে চিনে না। আমরা সকলেই মাতৃভূমিকে ভালবাসি—এই কথা বলি। দেশের ঐ আভ্যন্তরীণ প্রদেশে গিয়া দেখিতে পাই—রেলওয়ে আজিও সেখানে তাহার কলুষ বিস্তার করে নাই; ছয়মাস সেখানে থাকিলে বুঝিতে পারি—দেশ-প্রীতি কাহাকে বলে। তখনই খাঁটি স্বদেশ-প্রেমিক হইতে শিখি এবং প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন কি তাহা বুঝিতে পারি।

প্রকৃত সভ্যতা কাহাকে বলে তাহারই একটা আভাস দিলাম। যে অবস্থা বর্ণিত হইল তাহার পরিবর্ত্তনে যাঁহারা সচেষ্ট তাঁহারা দেশের পরম শত্রু।

ভারতীয় সভ্যতা নৈতিক উন্নতিকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে; পাশ্চাত্য সভ্যতা পাপাচার বিস্তারের চেষ্টায় মত্ত। শেষোক্তটি দেব-দ্বেষী, নাস্তিক; পক্ষান্তরে দেবতায় বিশ্বাসই পূর্ব্বোক্তটির ভিত্তি। শিশু যেমন জননীর বক্ষঃস্থল আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, সকল ভারত-প্রেমিক যেন এই জ্ঞান ও বিশ্বাস লইয়া সনাতন ভারতীয় সভ্যতাকে চিরকাল তেমনই করিয়া আঁকড়াইয়া থাকেন। *

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

* মহাত্মা গান্ধীর রচনা হইতে সঙ্কলিত

অপরূপ

শ্রীযুক্ত অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

ও-কালো নয়ন—
ভুলাইল মোর মন!
কাজল আঁখির
জলে ভর ভর
ছোট পাতা দু'টি
কাঁপে থর থর,
এখনি নামিবে
বুঝি ঝর ঝর
শ্রাবণের বরিষণ;
ও-কালো নয়ন
ভুলাইল মোর মন!

কাঁদো কাঁদো তব রূপের মাধুরী,
বাড়ে যে চোখের জলে!
তাইত তোমারে ব্যথা দিই প্রিয়া
কেবলি নানান্ ছলে।

আষাঢ় গগনে শ্যাম সমারোহ
নয়নে ভরিয়া আয় একী মোহ!

আকাশের রূপ বেড়ে উঠে দেখো
অপরূপ কৌশলে!
রূপের নলিনী মেলে দল তব
আঁখি-সরসীর জলে!

বিচিত্রার দপ্তর

[বিশ্বামিত্র]

হস্তীর রসজ্ঞান

ব্রজগোপিনীর প্রাণ কাড়িয়া লইত বাঁশের বাঁশী। হাতীর মত কুৎসিৎ প্রকাণ্ড জানোয়ারও যে বাঁশীর মিহি সুরের ভক্ত তাহা সাধারণতঃ অজ্ঞাত। হাতী মুগ্ধ হয় বাঁশীর আওয়াজে; সিংহ-ব্যাঘ্র-ভল্লুক বেহালার সুমধুর শব্দে—যে সকল বাদ্য-যন্ত্রের আওয়াজ কর্কশ তাহার প্রভাব ইহাদের উপর কিন্তু বিলকুল নাই। বিষধরের মধ্যে গোক্ষুরা সর্পই সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়; ময়াল ও অজগর উহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না।

টীকা—বুদ্ধি যে ধরে, অনুভূতি তাহারই তীক্ষ্ণ।

সাহারার হারানো নদী

সাহারার মত প্রকাণ্ড মরুভূমি পৃথিবীতে আর নাই। এককালে এই স্থান নাকি নদীবহুল ছিল। বালুকার বহু নিম্নে অন্তঃসলিলা অনেক নদী এখনও বর্ত্তমান। এইগুলাকে হারানো নদী বা হ্রদ আখ্যা দেওয়া হইতেছে। মরুভূমির মধ্যে মধ্যে নলকূপের মত করিয়া নল বসাইলেই জল বাহির হইবে, সেই জলে সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি শস্যশ্যামলা হইবে—ইহাই বৈজ্ঞানিকদিগের অভিমত। এই কথার যথার্থতা প্রমাণের জন্য সম্প্রতি তাঁহারা ঐ অঞ্চলে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ অভিযান করিতেছেন। ভৌগলিকেরা বলেন, মরুভূমিতে শত শত নদীর চড়া প্রভৃতির চিহ্ন বিদ্যমান—সেগুলা শুকাইয়া অনুর্ব্বর অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাঁহাদের মতে এককালে সাহারা উৎকৃষ্ট উর্ব্বরক্ষেত্র ছিল; মরুভূমিতে পরিণতির কারণ কৃষকদের অজ্ঞতা। বালুরাশি বায়ুতাড়িত হইয়া এক-এক স্থানে জমাট বাঁধিয়া জলস্রোত বন্ধ করিয়া দেয়, কৃষকেরা তাহার প্রতিবিধানে মনোযোগ করিল না, ইহাতেই মরুভূমির সৃষ্টি।

বৈজ্ঞানিকেরা প্রথমে গুপ্ত হ্রদাদির মানচিত্র প্রস্তুত করিবেন মনস্থ করিয়াছেন, তাহার পর বহু কূপ খননের ব্যবস্থা করিবেন। ফলে ২৫ লক্ষ বর্গ মাইল উর্ব্বরভূমির উদ্ধার হইবে এরূপ আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে ইহা তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

গণ্ডূষ-পরিমিত জল-পানে জহ্নুমুণি সাগর শুকাইতে উদ্যত—পৌরাণিক কথা। ২৫ লক্ষ বর্গ মাইল মরুর উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণতি, ভৌগলিক আস্ফালন নাও হইতে পারে।

দূর-দূরান্তর হইতে চিকিৎসা

বুকে চোঙ্ বসাইয়া ডাক্তারেরা রোগীর পরীক্ষা করেন, তাহাতেও রোগ নির্ণয় সকল সময় সঠিক হয় না। বহু দূর-দূরান্তর হইতে রোগীর পরীক্ষা, রোগ-নির্ণয় ও ঔষধাদির সুব্যবস্থার ধুয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি স্পেন—মাদ্রিদ্ শহরে ডাক্তারখানায় বসিয়া চিকিৎসকেরা দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনস-আয়রস-নিবাসী রোগীদিগের বিশেষ পরীক্ষা করিয়াছেন। রোগীর নাড়ীর গতি ও বক্ষের স্পন্দন যথাযথ গণিতে লাগিলেন এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ধরিবার যন্ত্র-সাহায্যে শ্বাস-ক্রিয়ারও সম্যক উপলব্ধি করিলেন। তৎপূর্ব্বে রোগীদিগকে শুধু অনুরোধ করা হইল যে, তাহারা যেন ৯৯ এই কথাটির স্পেনীয় ভাষার প্রতিশব্দ উচ্চারণ করিতে থাকেন। বেতার টেলিফোনে এই রোগী-পরীক্ষা নিষ্পন্ন হয়।

ইহা অপেক্ষা আরও বিচিত্ররূপে রোগের নিদান ধরা পড়ে। আভ্যন্তরীণ পীড়ার ক্লেশে এক রোগী অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল। স্থানীয় চিকিৎসকদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। রোগী তখন দুই হাজার মাইল দূরস্থ চিকিৎসকের মতামত চাহিল। তাঁহার আদেশক্রমে রঞ্জন-রশ্মি দ্বারা ছবি তুলিয়া সেই ছবি টেলিফোন-যোগে তাঁহাকে পাঠান হইল। যেমন করিয়া সংবাদপত্রের চিত্রাবলী একস্থান হইতে স্থানান্তরে টেলিফোনে দ্রুত প্রেরিত হয়, রঞ্জন-রশ্মির ছবিগুলিও ঠিক সেইভাবে পাঠান হইল।

বিশেষজ্ঞের নিকট ছবিগুলি এত সুস্পষ্টরূপে পৌঁছিল যে, ছবি দেখিবামাত্র অঙ্গুলী দ্বারা তিনি দেখাইয়া দিলেন যে রোগের মূল কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-প্রণালীর যে ব্যবস্থা করিলেন তাহাতেই রোগী অচিরে নিরাময় হইল।

দূরত্বের ব্যবধান কি দ্রুতগতি অন্তর্হিত হইতেছে তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর।

স্বেচ্ছামত রৌদ্র-বৃষ্টি

লঙ্কার রাজা দশানন ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ আদি দেবতাকে স্বপুরে বাঁধিয়া রাখেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স-তার ও বে-তার টেলিগ্রাফে টেলিফোনে ও মাইক্রোফোনে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচাইয়াছে, ফটোগ্রাফি ও ফনোগ্রাফি সাহায্যে মনুষ্যের প্রতিকৃতি ও কণ্ঠস্বর ধরিয়া রাখিতেছে, মোটর গাড়ীতে দশ দিনের পথ দশ ঘণ্টায় যাইতেছে, বিমান-যোগে একমাসের স্থানে একসপ্তাহে মহাসাগর পাড়ি দিতেছে। স্বেচ্ছামত রৌদ্র-বৃষ্টির উদ্ভবেও হাত বাড়াইবে না কেন? সেকালে কামাতুর মুনি কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কেহ বা বারি-বিন্দু বর্ষণও করেন, শঙ্করাচার্য্য বৃদ্ধা জননীর সুবিধার জন্য নদীর গতি নিজ গৃহাভিমুখে ফিরাইয়া দেন। আধুনিক বিজ্ঞানই বা পশ্চাৎপদ হইবে কেন?

বৈজ্ঞানিকবর স্যর অলিভর লজ্‌ বলেন যে, আবহাওয়ার উপর মানুষের কর্তৃত্ব অতি সত্বর প্রতিষ্ঠিত হইবে, মানুষ স্বেচ্ছামত রৌদ্র ফুটাইতে ও বারিবর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে—তখন আর বন্যায় দেশ ভাসিবে না, অনাবৃষ্টিতে ফসলের হানি ঘটিবে না, যতটা রৌদ্র ও যতটা বৃষ্টির আবশ্যক সেই পরিমাণেই আমরা তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিব যেহেতু প্রয়োজন বৃষ্টির—বন্যার নয়।

এই সম্পর্কে যে সকল পরীক্ষা চলিতেছে তাহা সত্যই চমকপ্রদ। কানাডার উত্তর-হাট নামক স্থানে এক বৈজ্ঞানিক বহু ধূমরাশি মেঘ-স্তরে ছাড়িয়া দেন, তাহা জমাট বাঁধিয়া বারি বর্ষণ করে। ইহাই প্রথম পরীক্ষা। ইহার পর দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকায় নাটকীয় ভাবে পরীক্ষা-কার্য্য পরিচালনা করা হইতেছে। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপক বিমানযোগে মেঘের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করেন ও বিদ্যুৎ-ভারাক্রান্ত বালুকারাশি মেঘস্তরে ছড়াইয়া দেন, তাহাতেই বারিপাত হইতে থাকে। ইহা হইতে এরূপ আশা হয়ত দুরাকাঙ্ক্ষা নাও হইতে পারে যে, বৎসর কয়েক মধ্যেই রৌদ্র ও বৃষ্টি মনুষ্যের করায়ত্ত হইবে।

সোভিয়েট রুষের কাহিনী

সোভিয়েট-শাসনে রুষ-রাজ্যে সবই উলোট-পালোট। ধর্ম্ম, সাহিত্য, শাসন-প্রণালী, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার পর্য্যন্ত নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। বিলাতী পার্লামেণ্ট মহাসভার বিশিষ্ট সভ্য জে, ভুলোল সাহেব; রুষের প্রতি ইঁহার সহানুভূতি প্রচুর। সম্প্রতি রুষদেশে ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন তাহাতে বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

লেনিন বলিয়াছিলেন, অর্দ্ধাসনে থাকিয়াও শ্রমিকেরা দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করুক, নিত্য-ব্যবহার্য্য প্রত্যেক জিনিষ প্রস্তুত করুক,—দেশের ইষ্টলাভের ইহাই একমাত্র পন্থা। শ্রমিকদের দুর্দ্দশা দেখিলে কিন্তু চোখ ফাটিয়া জল পড়ে। স্ত্রী-কুলি দেশে অসংখ্য—নিদারুণ শীতেও পায় জুতা মোজা নাই; ইহারাই অথচ ডকের কাজ চালায়, ট্রামগাড়ী হাঁকে। লোক-সংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৮০ জন স্ত্রী-পুরুষ কুলি-মজুর—তাহাদের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। জিনিষপত্রের দাম অসম্ভব রকমের। নিম্নের তালিকা পাঠে স্তম্ভিত হইতে হয়:—

পনীর অর্দ্ধসের—১৪৲; একসুট কাপড়—১০০৲;
মোজা একজোড়া—২১৲; একটা ডিম—৷৷৵০;
আপেল একটা—২৷৷০; মুরগী একটা ১৩৲;
জুতা এক জোড়া—২০৲; এই অনুপাতে সকল দ্রব্যই।

বস্তু-তান্ত্রিকতায় দেশ ভরিয়া গিয়াছে—আদর্শবাদের অস্তিত্ব নাই! রাজকার্য্য চলিতেছে—বন্দুক-কামান, লাঠি-সড়কীর জোরে ও জৌলুসে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামগন্ধ নাই; সরকারী কানুন মানিয়া চলাই বড় ধর্ম্ম। ধর্ম্মের চিরাচরিত অনুশাসন নিশ্চিহ্নপ্রায়। বিবাহ-বন্ধন শিথিল—চাহিবামাত্র বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতে গ্রাহ্য!

খাঁটী সত্য হইলে, এই বর্ণনার উপর টীকা-টিপ্পনীর স্থান নাই। জারের শাসনে ছিল যথেচ্ছাচার, এখনও সেই স্বেচ্ছাচার! মনে পড়ে ভারতচন্দ্রের পুরাতন বুলি—"এক ভয় আর ছার, দোষগুণ কব কার?"

স্ত্রী-বিক্রয়

ইতালি—রোম হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে, এক ব্যক্তি নগদ তেরোটি টাকা, বারো বোতল সুরা, দুটী খরগোস এবং কতকগুলি মুরগী লইয়া তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়াছে। ক্রেতা লোকটিরই বন্ধু। দম্পতী সাব্যস্ত করে যে তাহাদের মধ্যে প্রেম ও প্রীতি বিশেষ নাই, অতএব বিবাহিত জীবন সাঙ্গ করাই ভাল। যে কথা সেই কাজ। স্বামী উপরোক্ত জিনিষগুলি ও নগদ টাকা কয়টি লইয়া অর্দ্ধাঙ্গিনীকে বন্ধুহস্তে সমর্পণ করিলেন। স্ত্রীও হৃষ্টচিত্তে বন্ধুর স্কন্ধে ভর করিয়া তাঁহার গৃহে বসবাস করিতে গেলেন। কয়েকদিন পরেই কিন্তু মহা বিভ্রাট। রমণীর জননী-দেবী সংবাদে ক্ষিপ্তা হইয়া পুলিশ লইয়া হাজির! প্রাঙ্ক আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। ইতিমধ্যে জিনিষপত্র ও টাকাকড়ি লইয়া দুই বন্ধুতে কলহ বাধিয়াছে যোলআনা। অপরবধূ কিং ভবিষ্যতি!

রাজ্য বড়—না, নারীর প্রেম ?

কি বড়—রাজ্য, না, নারীর প্রেম? যৌবনের রাজটীকা পরিয়া আছেন যাঁহারা নারী ও নারী-প্রেমের দিকেই তাঁহারা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিবেন, প্রৌঢ়ত্বে ও বার্দ্ধক্যের সীমানায় যাঁহারা রাজত্বকেই নিশ্চয় তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব দিবেন।

অষ্ট্রিয়ার আর্ক-ডিউক্ এলব্রেট্ অনূঢ় যুবক, বয়স ৩৩—যৌবনোচিত ব্যবহারই করিয়াছেন। হাঙ্গেরীর রাজ্যলাভ তুচ্ছ করিয়া রূপসীর প্রেমকেই প্রাধান্ত দিয়াছেন। রাজা হইলে সুন্দরী আইরিশ লোয়ো রুড্নেকে বিবাহ করা চলে না—আইনবিরুদ্ধ। তা ছাড়া আইরিশ বিবাহিতা, সম্প্রতি মামলা করিয়া স্বামীর সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়াছেন।

প্রিন্স অটোর ইতিহাস গত মাসে আলোচিত হইয়াছে। অটোর পিতা স্বর্গীয় কার্ল হাঙ্গেরীর রাজসিংহাসন লাভের প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও বিফল হন। তাঁহারা আর জিতা ঐ উদ্দেশ্যেই ১৭ বৎসর বয়স্ক পুত্র অটোর জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এদিকে এলব্রেটের জননী ইসাবেলা স্বীয় পুত্রের নিমিত্তও অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, সাফল্য-লাভের সম্ভাবনাও তাঁহারই অধিক, কারণ রাজবংশীয় অপর কেহই এত ধনের অধিকারী নন। কিন্তু এলব্রেট গোপনে শ্রীমতী রুড্নেকে বিবাহ করিয়া মাতার সকল আশাই নির্ম্মূল করিলেন। রাজ্য অপেক্ষা প্রেমই বড় হইল!

ভার্য্যার মূল্য

প্যালেষ্টাইনের আরব কৃষকেরা অর্থকৃচ্ছ্রতায় বিষম বিপন্ন। পত্নী-সংগ্রহে ব্যয়বাহুল্যই নাকি তাহার কারণ। বিস্তর অর্থ-বিনিময়ে তাহাদিগকে স্ত্রী ক্রয় করিতে হয়। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি—সৎকুল দুষ্কুল তাহার বিচারের অবসর কোথায়!

জেরুজালামের বিশেষ সংবাদে প্রকাশ, প্যালেষ্টাইনের কৃষককুলের মধ্যে সহযোগিতা-সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য মিঃ সি, এফ, স্ত্রীক্‌লাণ্ড আই, সি, এস্ নিযুক্ত হইয়াছেন। নানারূপ তদন্তের ফলে তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, ভার্য্যার মূল্য বহুলাংশে কমাইয়া দেওয়া হউক, স্ত্রীর নিম্নতম মূল্য ২০ পাউণ্ড ধার্য্য হউক, তাহা হইলেই স্ত্রী-ক্রয়ে যে অর্থ ব্যয় হইয়া আসিতেছে তাহা হইতে বহু অংশ উদ্বৃত্ত হইবে, সেই অর্থ অপরাপর কার্য্যে নিয়োগ করিলে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে।

অর্থকষ্ট হইলে বা স্ত্রী মুখরা রুগ্না ও অবাধ্যা হইলে গলায় হাঁসুলী বাঁধিয়া সেকালে বিলাতী চাষীরা বাজারে স্ত্রী বিক্রয় করিতে আনিত, ২৫—৫০৲ দরে ক্রেতাও জুটিত। এখনও কি প্যালেষ্টাইনে বিক্রয়ে না হউক স্ত্রী-ক্রয়ে সেই ধরণের রীতি প্রচলিত? নিশ্চয়ই তাই। সম্প্রতি জনৈক আরবী চাষী ৪০০ পাউণ্ডে তাহার সমুদায় ভূসম্পত্তি বিক্রয় করে, তাহা হইতে ৩০০ পাউণ্ড মূল্যে একটি ভার্য্যা ক্রয় করে। ৫০ হইতে ২০০ পাউণ্ড কর্জ্জ লইয়া চাষীরা পত্নী ক্রয় করে, এরূপ দৃষ্টান্ত ঐ দেশে প্রচুর।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের কথা মনে আপনা হইতেই উদয় হয়। বরপণের তীব্রতায় ভুক্তভোগী শিক্ষিত ভদ্রলোক

অথচ স্ত্রীর দোহাই দিয়া উচ্চহারে বিবাহের হাটে পুত্র বিক্রয় করেন। তাঁরা জহরৎ খুঁজেন, চেকে ও নগদে টাকাকড়ির দাবি করেন, আবার জিল্লাও চাহেন! আরব চাষীরা বেচে মেয়ে, এ দেশের বহু শিক্ষাভিমানীরা ছেলে! মনস্তত্ত্ববিদেরা উভয়ের পার্থক্য বিচার করুন

ব্রিটিশ দ্বীপে মূষিক রাজা

জাহাজ জলমগ্ন হইলে রবিন্সন্ ক্রুশো পরিত্যক্ত হন, নিরালা জুয়ান ফারনেনডেজ দ্বীপে—একা, নিঃসঙ্গ। সে অবস্থায় কবি তাঁহার মুখে ভাষা দিয়াছেন—'নেহারি যেদিকে, আমি প্রভু সবাকার।' কথাটা লইয়া এখন কাড়াকাড়ি করিতেছে মূষিককুল—সেন্টকিল্ডা দ্বীপে। দ্বীপটি অতি ক্ষুদ্র—স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমে।

একশত বৎসর এই দ্বীপে কতিপয় ধর্ম্মযাজক প্রভৃতির বাস। সারা বৎসরের মধ্যে চারিমাস মাত্র ওখান হইতে স্কটল্যাণ্ডে আসা সম্ভব, তাও বহুকষ্টে। ঐ সময়েই ধর্ম্মযাজকেরা স্কটল্যাণ্ডে ধর্ম্মোপদেশ দিতে আসিতেন। দ্বীপে গাছপালা আদৌ নাই। আবাদ-যোগ্য ভূমি ১২০ বিঘা মাত্র। সামান্য শস্যের চাষ ও মেষ-পালন ভিন্ন অন্য কাজ ওখানে নাই। পূর্ব্বে অধিবাসীর সংখ্যা অধিক ছিল; দ্বীপটি বাসের অযোগ্য বিবেচনায় যুবকযুবতীরা কিছুদিন হইল অন্যত্র চলিয়া যায়। বর্ত্তমানে লোক-সংখ্যা মোট ৩৬ জন মাত্র; আওলাত ৬টা গাভী ও ১২০ ভেড়া। এই লইয়া তাহারা ঐখানে জীবনধারণ দুর্ব্বহ মনে করিয়া সম্প্রতি বসতি ত্যাগ করিয়াছে। ঐখানে ইন্দুরেরই এখন বসতি অর্থাৎ হবুচন্দ্র রাজা, সঙ্গী বা মন্ত্রী গবুচন্দ্র—গাঙচিল। আর কোন জন্তু বা পাখীও রহিল না

কাশীতে লক্ষ বর্ষের হস্তী-কঙ্কাল

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব ও পদার্থের ক্রমিক উন্নতি হইতেছে—আকারে-প্রকারে। অভিব্যক্তিবাদের নিয়ম অনুসারে আকৃতি ও প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী এবং জগতের পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উন্নতির দ্বার বহুলাংশে অর্গলবদ্ধও নয় কি?

আমাদের পুরাণ-বর্ণিত মনুষ্যের আকার দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বর্ত্তমান অপেক্ষা বিশালতর ছিল। দৈহিক খর্ব্বতা তাহা হইলে ক্রমঃবিকাশ সূচিত করিতেছে কিরূপে? অথবা আকারে খর্ব্বতা আসিলেও প্রকৃতিগত উন্নতি ঘটিতেছে, ইহাই প্রশ্নের মীমাংসা? পণ্ডিতেরা এই সমস্যার সমাধান করুন।

বর্ত্তমান অপেক্ষা প্রাচীন কালে মানুষের শরীর বিপুলতর ছিল ইহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, পশুরও সেইরূপ ছিল ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে বাধা কি? কায়ার খর্ব্বতা-সাধনে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ অধিকতর হইয়াছে—প্রকৃতি-দেবী একদিক কমাইয়া অপর দিকে বাড়াইয়া সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন ইহাই সিদ্ধান্তহিসাবে শিরোধার্য্য করিয়া লইলে যুক্তিবাদের দোষ স্পর্শে না।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ভিক্তর হুগো বলিতেন, নিয়তি একটি দ্বার যেমন উন্মোচন করেন আর একটিও সঙ্গেসঙ্গেই রুদ্ধ করিয়া দেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, অর্থকৃচ্ছ্রতায় যে ব্যক্তি যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছে যেমনই তাহার ধনাগমের পথ প্রশস্ত হইল অমনই হয়ত রোগপীড়ার অথবা অন্যবিধ গুরুতর অশান্তির কারণ উপস্থিত! এ ক্ষেত্রেও বুদ্ধি ও জ্ঞান যেমন প্রখরতর হইল বপুর বিশালতারও সেই সঙ্গে হ্রাস-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে।

কিন্তু পশু বা উদ্ভিদের সেকাল ও একালের তুলনামূলক মানসিক ধারায় কি তীক্ষ্ণতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহার অনুসন্ধান হয় নাই—হইলে বিষয়টীর যথার্থ বিচারের সুবিধা হইত।

অতি প্রকাণ্ড হস্তীর একটা প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আবিষ্কারের সংবাদে এত কথা আসিয়া পড়িল। সেই সঙ্গে হিন্দু সভ্যতার লক্ষ বৎসরের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইল, পুরাতত্ত্ববিদেরা এই মতবাদও প্রচার করিতেছেন।

প্রহ্লাদপুর গ্রাম বারাণসীধাম হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। ঐখানে গঙ্গাতটে উক্ত বিরাট কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে—প্রস্তরীভূত অবস্থায়, যাহাকে ইংরাজীতে বলে—fossil। খরস্রোতে মৃত্তিকা বহুল পরিমাণে ধ্বসিয়া গিয়া গঙ্গাগর্ভে পড়িয়াছে, ফলে যাহা লোকলোচনের

মস্তরালে ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কঙ্কাল-দর্শনে গ্রামবাসীর বিস্ময়ের সীমা নাই। বিজ্ঞেরা গবেষণার পরিচয় দিতে গিয়া প্রচার করিলেন যে, উহা হিরণ্যকশিপুর আমলের করী। তবে ত এই হাতীই প্রহ্লাদকে মর্দ্দিত করিতে গিয়াছিল! উত্তেজনা-বশে প্রহ্লাদপুরের অধিবাসীরা যে যেমন পাইল কঙ্কালটিকে হাতুড়ী-কুঠারাদি লইয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ' করিল। সহৃদয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদ পাইয়া অনেক অনুনয়বিনয়ে তাহাদিগকে অবশেষে নিবৃত্ত করিলেন ও কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদিগকে সংবাদ পাঠাইলেন। তাঁহারা দেখিয়া বুঝিলেন, শীঘ্রই উহা জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা এবং কঙ্কালটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করিতে বেলাভূমির বহু খননাদিও আবশ্যক। এই বুঝিয়া সত্বর তাঁহারা একটি দন্ত মাত্র ভাঙ্গিয়া লইয়া যান, পরে হেমন্ত-কালে জল সরিয়া গেলে উহার পূর্ণ উদ্ধার করা হইবে, এই সাব্যস্ত করেন।

'বঙ্গবাণী'পত্রে প্রকাশ,—অতঃপর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে লইয়া গিয়া বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই দন্ত পরীক্ষা করা হইয়াছে। ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, দাঁতের আকার ঠিক্ থাকিলেও উহা প্রকৃতপক্ষে শিলীভূত হইয়া গিয়াছে। বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে উক্ত দাঁতটি প্রায় লক্ষ বৎসরের পুরাতন হইবে। যদি তাহাই সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে—প্রায় এক লক্ষ বৎসর আগেও কাশী সহর বিদ্যমান ছিল। তাহা হইলে ইহাও প্রমাণিত হইল যে, হিন্দু সভ্যতা অন্ততঃ এক লক্ষ বৎসরের প্রাচীন।

যে দন্তটি লইয়া গিয়া পরীক্ষা-কার্য্য চলিতেছে তাহার ওজন নাকি এক মণ। যাহার একটি দন্তের ওজন এক মণ তাহার সমগ্র অবয়বের ওজন না জানি কত মণ ছিল! এই বিপুলকায় হস্তীর বর্ত্তমান বংশধরেরা কত ছোট এবং কতকালে এই খর্ব্বতা সাধিত হইয়াছে? ইহার কারণই বা কি? এই সকল প্রশ্ন সহজেই মনে উদিত হয়। কঙ্কালের সম্পূর্ণ উদ্ধার সাধন, বিশেষজ্ঞদিগের পরীক্ষান্তে নানা তথ্যের নির্ণয়—সাগ্রহ প্রতীক্ষার যোগ্য। ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রতিও যে ইহা হইতে নানাদিক দিয়া আলোকপাত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

বিশ্বামিত্র

না-ভোলা

শ্রীযুক্ত সুকুমার সরকার

ভুলিতে তাহারে পারিব না আমি কভু
যদিও সে আজি ক'রে আছে অভিমান;
সে মোরে না চায়, আমি তারে চাই তবু
ভরিয়া আমার ভরিয়া সকল প্রাণ!

আসিবে না কাছে, নাই বা আসিল সে গো,
তাহাতে আমার নাহি কিছু আসে যায়;
আপনার হ'তে আপনার জন যে গো
আঁকা সে রয়েছে এ বুকের নিরালায়!

অশ্রুর মধু রয় যে দিবস-যামী
আমার চোখের ব্যথায় অমিয় ভ'রে,
সে আমারে ভালোবাসে না—এ কথা আমি
ব্যথিত প্রাণেরে বোঝাব কেমন ক'রে।

ভীরু বক্ষের দুরু দুরু কম্পনে
রুণু রুণু শুনি চরণের ধ্বনি যার,
তেয়াগি সে মোরে যেতে পারে কার সনে—
আমারে ছেড়ে সে হ'তে পারে আর কার!

বাহিরের রূপে নিজেরে দিতে না আসি'
হিয়ার ভিতরে যে দিয়েছে আপনারে,
সে যদি না জানে চির-ভালোবাসাবাসি
তবে কেবা আর ভালোবাসা দিতে পারে!
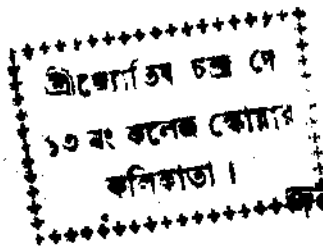
জলকন্যার কৌতুক

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র

প্রৌঢ় দামোদর মহান্তির আনন্দ আর ধরে না। চোখে মুখে—সর্ব্বাঙ্গে উল্লাস। আহ্লাদের সঙ্গে কি বিস্ময়!

হ'বারই ত কথা। এমন অদ্ভুত, এমন অপূর্ব্ব, এমন সৃষ্টিছাড়া—স্বপ্নে নয়, গল্প-কাহিনীতে নয়, চর্ম্ম-চক্ষে—এই দুনিয়ায়, সাগর-সলিলে! দামোদর চোখ রগড়া'তে লাগ্‌ল!

সত্যিকারের জলকন্যা সে দেখেছে—ঐ মহাসাগরে, সাগরের উপকূলে যেখানে ঢেউয়ের পরে ঢেউ আছাড় খেয়েই মরা। কিন্তু দৃষ্টি-বিভ্রম নয় ত?

সবে সে বাড়ী ফিরছিল—গ্রামের জলসা হ'তে। যাত্রার পালা গানে উরু দেখিয়ে পামর দুর্য্যোধনের মুণ্ড চূর্ণ করবার আস্ফালন ক'রে ভীমসেন যেমন চুপ করল, আর সঙ্গেসঙ্গে সমত আরম্ভ হ'ল, সেই সুযোগে দামুঠাকুরদা সকলের কাছে বিদেয় নিয়ে বাড়ী ফিরল—রাত বেশী হ'য়েছে ব'লে গৃহিনীর ঘূর্ণিত আঁখির ত্রাসে! পথে এই বিভ্রাট!

ঠাকুরদা ভাব্‌লে—বাস্তবিক সঙ্কট ত এ নয়, এ যে পরম সৌভাগ্য—জন্ম-জন্মান্তর সাধনা করলেও এ দৃশ্য কেউ দেখতে পায় না, জগন্নাথ-দেবের সশরীরে দর্শনলাভও মিলে, কিন্তু জলকন্যা—অর্দ্ধেক মানুষী, অর্দ্ধেক মৎস্যানী—না, অসম্ভব!

ঠাকুরদা বাড়ী-ঘর, ছেলে-মেয়ে, নগদা-ধেরো খদ্দের, এমন কি উতলা গৃহিনীর কটুকাটব্যের আতঙ্ক পর্য্যন্ত সব ভুলে গেল। ঝড়ের বেগে আনন্দে ভরপুর হ'য়ে জলসার দিকে আবার দৌড় দিল। সৌভাগ্য একা ভোগ করতে চায় কে?

ঠাকুরদাকে ফিরতে দেখে সভার সবাই অবাক। কোণ হ'তে ডাকাতে তাড়া করেছে, না ভূত-পেত্নী ঘাড়ে ভর করেছে এই ভেবেই তারা অস্থির।

'কি হ'ল, কি হ'ল? ব্যাপার কি'—একজোটে পঞ্চাশ জন চেঁচিয়ে উঠল। তখন অথচ তল্‌তা-বাঁশ-মার্কা ছুঁড়ির দলের দু'জন তান ধরেছে।

"কি আর বল্‌ব! শুন্‌লে গাঁজাখুরি ব'লে উড়িয়ে দেবে—নিজের চোখে দেখে আস্‌বে চল। জল্‌জ্যান্ত জল-কন্যে ঐ পঞ্চবটীর আশেপাশে, বাঁকের মোড়ে!"

'সে ত তোমারই সরাইয়ের ডাইনে। কিন্তু কি বললে?—জলকন্যে; সে কি!'—সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। ছোকরার দল চুপিচুপি বলাবলি করল—'ঠাকুরদা ক' ছিলিমে দম দিয়েছে, কে জানে!'

সকলের ভাবখানা বুঝে ঠাকুরদা ব'লে উঠল—'বাংলা দেশে যাত্রা শুনেছি—'কমলে কামিনী'—পদ্মফুলের ওপর দাঁড়িয়ে মা চণ্ডী হাতী খাচ্ছেন আর বার করছেন। আর আমি দেখে এলাম নিজের চোখে—জলকন্যে। চল, দেখবে চল।'

চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে জনস্রোত ছুটে চল্‌ল।

পূর্ণিমার রাত্রি। সাগরের নীল জলের নীল ঊর্ম্মি পাহাড়-প্রমাণ হ'য়ে উঠ্‌ছে পড়্‌ছে, ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে জ্যোৎস্নার আলোর বকফুলের মত মুক্তকাদা সাদা রং ফলিয়েছে, শব্দের হুঙ্কারে প্রাণে বিভীষিকার সঞ্চার ক'রে দিচ্ছে।

কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কারও সেদিকে। সমুদ্রের ঢেউ এমনি যে উঠে পড়ে, আকাশের মেঘও ছেঁড়ে আবার জমাট বেঁধেও দৌড়ে! নবীন শিশুর কাছেই তার নবীনতা, প্রবীণের কাছে মামুলী ধারা!

কিন্তু জলকন্যা?—বিদ্রূপ-পরিহাস যদি না হয়, অলীক কাল্পনিক না হয়, দেখ্‌বার মত একটা কিছু বটে! গ্রামবাসীরা এইটাই ভেবে নিশ্চিন্ত হ'ল।

সারিসারি দলে দলে লোক দাঁড়াল। কারও মুখে বিস্ময়-আবেগের চিহ্ন, কারও অবিশ্বাসের হাসি। দশ মিনিট, বিশ মিনিট, আধঘণ্টা—কোন কিছুই নেই। 'ঐ-ঐ-ঐ!'—কেউ রহস্য-ছলে ব'লে উঠ্‌ল। 'বিলকুল ভুয়া'—একদৃষ্টে কিছুক্ষণ দেখে দেখে অপরে উত্তর দিল।

দামোদরের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। জল-কন্যা যদি আর না দেখা দেয় তাহ'লে এত লোকের টিট্‌কারি—অসহ্য নিশ্চয় অসুস্থ হ'বে! কিন্তু স্বচক্ষে দেখেছে, আর নেই—তাও কি হয়! ভেবে-চিন্তে মনটাকে শক্ত ক'রে দামোদর বল্‌লে,—'নেই' বল্‌লে সাপের বিষও থাকে না।

'বাঃ! বাঃ! বাঃ! সত্যিই ত জলকন্যে; মেঘবরণ ওর চুল, কালোবরণ চোখের মণি, ঠোঁটে আলতার রং, কিন্নরীর গড়ন'—আকাশ-সমান ভীষণ একটা ঢেউয়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মনে এই ভাব জেগে উঠ্‌ল; মনে হ'ল চাঁদের কিরণকেও হার মানিয়ে দিয়ে রূপের সুষমা ফুটে উঠেছে কল্পিত জলকন্যার অঙ্গে!

প্রথমে জলরাশি ভেদ ক'রে দেখা গেল মুখখানি—মাথার চুল এলান, কাঁধের ওপর এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে, তারপর উন্নত স্তন, তারপর সত্যিই একটা কুণ্ডলী-পাকানো পুচ্ছ! ধীরে ধীরে জল হ'তে মাছের মতই ভাসতে লাগলো কন্যা—ল্যাজ গুটিয়ে গুটিয়ে, ক্রমে কাছের পাহাড়ে উঠে বস্‌লো—সে পাহাড় শেহালায় শেহালায় ঘোর সবুজ; পাহাড়ের সবুজে সাগরের নীলে কি কোলাকুলি!

সত্যিই ত জলকন্যা—পাতালের রাণী! লোকে মন্ত্র-মুগ্ধের মত অনিমেষ নয়নে চেয়ে রইল—নির্বাক্, নিস্পন্দ!

কতক্ষণ পরে রা বেরুলো। শতকণ্ঠের কলরবে জায়গাটা মুখর হ'য়ে উঠ্‌ল।

"চমৎকার!"

"বাহবা!"

"কি সুন্দর!"

"মরি মরি!"

প্রশংসা-ধ্বনি ক্রমশঃ কোলাহলে গিয়ে পৌঁছল। জলরাণী শব্দে ত্রস্ত সচকিত হ'য়ে পাহাড় হ'তে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল জলে; পরমুহূর্ত্তেই ঝপ্ ঝপ্ শব্দ ও তার অন্তর্দ্ধান!

৩

পাঁচ বছর এমনই চল্‌ল। জলকন্যা নিত্যই দেখা দেয়—কখনও বা দেয়ও না। গ্রামের, পাশের জনপদের, ক্রমশঃ দেশ-দেশান্তরের কৌতুকপ্রিয় অসংখ্য নরনারী আস্‌তে লাগ্‌ল। গ্রামটি ছোট, গ্রামে সামান্য একটি সরাই—দামু ঠাকুরদারই। ঠাকুরদার আয় বেড়ে চল্‌ল যথেষ্টই, যাত্রীদের সুখ-সুবিধা বাড়্‌ল না মোটেই। একে ঘরের কষ্ট, তায় জিনিষ-পত্র আকালের দরে। হ'লে কি হয়, কৌতূহলের প্রভাব প্রচুর, যাত্রীরা কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করে না—নিরুপায় হ'লেও অনেকটা।

একদিন বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! জলকন্যা সানন্দে খেল্‌ছে আর এক সহচরীর সঙ্গে। সে কি জলখেলা! মেঘের বপ্র-ক্রীড়া বিরহী যক্ষের মুখে কবি কালিদাস বর্ণন করেন; এই কন্যা দু'টির লীলা-বর্ণনার ভাষা দেবে কে?

সংবাদ দিকে দিকে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল। দেশের ধনবান ও বিদ্বানেরাও দলে দলে আস্‌তে লাগলেন। গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি ষোলকলা, দামোদর ঠাকুরদার ত কথাই নেই। সে একটা হ'তে দু'টা, ক্রমে ক্রমে দশটা সরাই পাশাপাশি খুলে ফেল্‌ল। টাকার বৃষ্টি! কোন্ দিক দিয়ে কার ভাগ্যে কমলার চরণের নূপুর বাজে, কে বল্‌বে!

৪

১লা আশ্বিন। ত্রয়োদশীর চাঁদ আকাশে। ঠাকুরদার ছাদ-পগনেও তার প্রতিবিম্ব—জনতার বাহুল্য। দশবার এসেও যারা জলকন্যাদুটিকে দেখিতে পায়নি তারা ত এসেছেই, কতবার দেখেও যাদের তৃপ্তি হয় নি তারাও এসেছে, এই প্রথম এসেছে এমনও কতশত—দামোদরের এক হাত বুক দশ হাত হ'য়ে গেল—কত লাভই না আজ তার অদৃষ্টে। দোকানদারের ধনলোভের অন্ত কোথায়!

জলের রাণী স্থলের মানুষের কি খবর রাখেন? আবেগ-কৌতূহলের স্পন্দন কি পৌঁছে তাদেরও কানে? গোধূলির কিরণ মলিন হ'তে না হ'তেই জলকন্যায় সাড়া জাগ্‌ল। যথারীতি প্রথমে বদন, পরে স্তন, শেষে পুচ্ছ দেখা গেল; সঙ্গে সঙ্গে চাঁদিনীর রজত কিরণে ভেসে উঠ্‌ল সমুদ্রের বুকে

জলরাণী—আর তার পাশাপাশি সঙ্গিনীও। একই ধারা উভয়ের। কতক্ষণ জলখেলা চল্‌ল—অবশেষে পাহাড়ের দিকেও দৌড়—কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি নেই!

সহসা একি! পঙ্কাশখানা দাঁড় বে'য়ে কে আসে এদিকে? এ যে পুলিসবাহিনী! দর্শকেরা কাতারে কাতারে চিত্রার্পিতের মত চেয়ে রইল!

ভয়ভীতা জলকন্যারা মৎস্যেরই মত ডুব দিল—অতল জলে তলিয়ে গেল। শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষার প্রেরণা না আছে কার?

পুলিস কিন্তু হাল ছাড়্‌ল না অদূরে নৌকায় ব'সে যেন কার প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌ল!

বহুক্ষণ পরে—একি! আবার যে সেই দুই কন্যা জলে ভাসছে ক্রীড়া-নিরতা নয়, যেন শ্রান্তা! পুলিস তাড়া দিল। সুন্দরীরা ডুব দিল; আবার ভাসল, আবার ডুব্‌ল। অনেক ক্ষণ যুঝে শেষে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করল।

নির্দ্দয় নীরস পুলিস পরীক্ষা ক'রে প্রচার কর্‌ল—"মেকি! মেকি!"

হতবুদ্ধি দর্শকেরা বুঝতে না পেরে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'নেকি কি?'

'নেকি নয়—নকলি!'

'চন্দ্রকা—তক্‌লির কেউ?'

'না, না! সাচ্চা নয়, ঝুটো। আসলি নয়—নকলি। মৎস্যানী নয়—মানুষী!'

লোকে হতভম্ব, নিস্তব্ধ! বজ্রাহত হ'লেও বুঝি তেমন হয় না!

কিছুক্ষণ পরে কূলে নৌকা ভিড়িয়ে নামলেন পুলিসের বড়-কর্তা। সমবেত জনতাকে সম্বোধন ক'রে স্পষ্টাক্ষরে বুঝিয়ে দিলেন—'জলকন্যা এঁরা নন, মনুষ্যকন্যা; পাতালের রাণী ইনি নন—দামোদর ঠাকুরদার সুন্দরী দুহিতা—রমণী, আর সহচরীটি ওঁদেরই সরাইয়ের পরিচারিকা—নাম সারিকা। এই এঁদের পুচ্ছ, পুচ্ছ ফেলে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি দুই ঠক্—লোকের সাম্‌নে আসতে গররাজী, থানায় যেতে ত কথাই নেই।'

কারও মুখে তখন আর রা সরে না। কিছুক্ষণ পরে একবাক্যে সকলে জয়ধ্বনি ক'রে বল্‌লেন—'অবলা নারী, প্রচুর কৌতুক দিয়েছে পাঁচ বছর, শত শত বিদ্বান ধনবানেরও চোখে ধুলো দিয়ে, কৌতুকের অভিনয় করেছে অপূর্ব্ব। নাচে-গানে আমোদ-প্রমোদে কত পয়সা নষ্ট করি আমরা, বিদায় দাও ওদের, আর দাও যৌতুক এই দুই তোড়া।'

তখনই হাজার টাকার ক'রে দুটো তোড়া দারোগার হাতে পড়্‌ল। সরমে মরমে ম'রে তোড়া নিয়ে দৌড় দিল উভয়ে সরাই-অভিমুখে।

পুলিস তখন অভিযান কর্‌ল দামোদরের সন্ধানে সরাই পানে। দামোদর ভয়ে কাঁটা, আনুপূর্ব্বিক সকল কথাই খুলে ব'লে ফেল্‌ল।

* * *

দামোদর যা বল্‌লে তা' মজার কাহিনী। সে বল্‌লে—"যেদিন প্রথমে জলসায় ফিরে গিয়ে জলকন্যার কথা জানাই তার এক হপ্তা আগে এই ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যায় সমুদ্রের তট দিয়ে সরাইয়ে ফিরে যেতে যেতে দেখি যেন এক জলকন্যা পাহাড়ের দিকে সাঁৎরে আসছে। আমাকে দেখে ডুব মার্‌লে। আমার সরাইয়ের সামনে ব'সে দেখ্‌তে লাগলুম কতক্ষণে আবার পাহাড়ের দিকে ফিরে যায়। খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর দেখি, আমার মেয়ে রমণী বাড়ীর দিকে ভিজা কাপড়ে আস্‌ছে মৃদু মৃদু গান গাইতে গাইতে আর ভিজা চুল নিংড়াতে নিংড়াতে। দেখেই কেমন আমার মনে উদয় হ'ল ঐ মতলব—সে জলকন্যা সাজুক্ না কেন, বেশ মজা হবে। মাছের মতই ত সে সাঁতার কাট্‌তে পারে—পা বেঁধে দিলেও পারে। জলকন্যা আবিষ্কার করেছি ব'লে পাড়াপড়শীর কাছে বাহাদুরী নেব এই ভেবেই প্রস্তাব করি স্ত্রীর কাছে। সেও এতে সায় দিলে, পা ভিতরে রেখে স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটতে পারে এমন ক'রে মাছের ল্যাজের মত একটা চমৎকার খাপ তৈরী কর্‌ল। তারপর দেখি ব্যাপারটা ঘোরতর দাঁড়িয়ে গেল; নানা লোকের আমদানিতে আমার ছোট সরাইখানা ভ'রে যেতে লাগ্‌ল—বেশ দশ টাকা উপায় হ'য়ে চল্‌ল। তখন মাথায় খেল্‌লো পাটোয়ারি বুদ্ধি। টাকা রোজগারের বেশ মজার একটা

ফন্দি ঠাওর করেছি ভেবে জিনিষটাকে ঘোরালো করলেম, ক্রমশঃ একটা হ'তে দশটা সরাইখানা খাড়া করলেম, ফিকেও আর একটি জলকষ্টে বানালেম। ফলে যথেষ্ট পয়সা রোজগার হ'ল বটে, কিন্তু আজ একি এই বিড়ম্বনা—পুলিসের হানা! কি হ'তে কি হ'লো, কি হ'বে, কে জানে! কিন্তু দোহাই তোমাদের, চুরি-জুচ্চুরির মতলব আমার ছিল না—গোড়ায় ত নয়ই। লোকে ভেল্কিবাজি দেখিয়ে দু' পয়সা রোজগার করে; এও না হয় তাই। আমাকে সকলের মাফ্ করতে আজ্ঞা হয়।"

পুলিস সব শুনে বুঝল যে, দোষ বস্তুতঃ কারো নয়—দামোদরেরও নয়। সে ত চুরিডাকাতি কিছুই করে নি, প্রবঞ্চনা-জুয়াচুরি কতক হ'তেও পারে, কিন্তু এও ঠিক সেই পর্য্যায়ভুক্ত ত নয়। তা'ছাড়া আইনের আমলে, কানুনের ঠেলায় ফেলে শাস্তি দেওয়াও মুস্কিল; আর যে প্রকৃত ধনের মালিক হয়েছে দামোদর সে তার ভাগ্য-ফলে—লোকে বোকা ব'লে কেন? এই সব বিচার ক'রে অবশেষে রায় বা'র হল—ঠাকুরদা বেকসুর খালাস!

রায় শুনে ঠাকুরদা হেসেই আকুল!—এমন কপাল দুনিয়ায় কারও কখনি হয়!

শ্রীকালীচরণ মিত্র

* * সত্য-ঘটনা অবলম্বনে

শিল্পীর রহস্য

শ্রীমমতা মিত্র

সে ছিল শিল্পী, ছবি আঁকত। অপর শিল্পীদের রঙ ছিল দুষ্প্রাপ্য—উজ্জ্বলতাও বেশী। তার রঙ শুধুই একটি, তা'তে বিচিত্র লাল আভা খেলত। লোকে বলাবলি ক'রত, "আমরা ওর ছবি পছন্দ করি, ঐ লাল আভা আমাদের খুব ভাল লাগে।"

অপর শিল্পীরা একদিন তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে, "এ রঙ পাও কোথা থেকে?" সে হেসে উত্তর দিলে, "তা' বলতে পারি না।"—ব'লে মাথা নীচু ক'রে সে নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগল।

একজন শিল্পী দূরদেশে গিয়ে দামী রঙ কিনে আন্‌লে, যত্ন ক'রে ছবি আঁকলে; কিন্তু কিছুকাল পরে সে ছবি বিবর্ণ হ'য়ে গেল। অপর এক শিল্পী পুরোনো বই প'ড়ে চমৎকার রঙ তৈরী ক'রলে, আঁকতে গিয়ে কিন্তু সে রঙ নষ্ট হ'য়ে গেল।

শিল্পী ছবি এঁকে যেতে লাগল। লাল আভা ক্রমে বেশী লাল হ'য়ে উঠল; এদিকে শিল্পী হ'য়ে এল ফেকাসে, সাদা। শেষে একদিন দেখা গেল, তার মৃতদেহ প'ড়ে আছে ছবির সামনে। লোকে তাকে শ্মশানে নিয়ে গেল। একদল লোক শিল্পীর রঙের সব বাটি ভাল ক'রে দেখলে, কিন্তু কই? তার সে বিচিত্র রঙ কোথায়?

তাকে চিতায় শোয়াবার সময় লোকে দেখলে তার বুকের বাঁ পাশে একটি ক্ষত-চিহ্ন। পুরোনো ক্ষত, খুব সম্ভব সেটা সারাজীবন তার বুকে ছিল, কারণ ধারগুলো তার বেশ শক্ত।

চিতার আগুনে শিল্পীর দেহ ভস্মীভূত হ'য়ে গেল। তবু লোকে বলে, "শিল্পী সে অপূর্ব্ব রঙ পে'ত কোথা থেকে?"

কত যুগ কেটে গেছে। শিল্পীর কথা লোকের মনে নেই, কিন্তু তার ছবি—সেই সৃষ্টি আজও বেঁচে আছে অমর হ'য়ে।*

* অলিভ শ্রীনার

কবি হায়াত মাহমুদ

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এম-এ

যে সকল অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন, সাহিত্যসাধক বাঙ্গালা সাহিত্যের বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিতে অশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন, সুকবি হায়াত মাহমুদ তাঁহাদের অন্যতম। হায়াত মাহমুদের নাম আলাওল বা ভারতচন্দ্রের ন্যায় বাঙ্গালায় শিক্ষিত পাঠকের নিকট পরিচিত নহে। হায়াত মাহমুদকে যে কোন লেখক বটতলার অদ্ভুত সমাজ হইতে উদ্ধার করিয়া কাব্যরসিক পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। যাহা হউক বটতলারই কল্যাণে আমাদের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে হায়াত মাহমুদ সাতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহার নাম একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দী বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌভাগ্যের যুগ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় অলৌকিক ছন্দ-শিল্পী কবির সাক্ষাৎ আমরা এই যুগেই পাই। হয় ত ভারতচন্দ্রের মধ্যে কবি শেলী বা হাফিজের মত 'লীরিকের' উচ্চভাব নাই, কিন্তু ছন্দ ও অলঙ্কারের যে অপূর্ব্ব লীলা তাঁহার কাব্যে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, তাহা আধুনিক কালের যে কোন সাহিত্যে দুর্লভ।

কবি হায়াত মাহমুদ ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম কাজী হায়াত মাহমুদ। কবির জীবনেতিহাস ঘনতমসাবৃত। লোকমুখে তাহা এরূপ বিকৃতি ধারণ করিয়াছে যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আজগুবী কাহিনীতেই তাহা পূর্ণ। নিম্নে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বংশতালিকা দেওয়া হইল।

খেতাবখাত চৌ
|
যোশা খান চৌধুরী
|
কবীরুদ্দীন কাজী (কবীর মুহম্মদ কাজী)
|
হায়াত মাহমুদ কাজী — জামাল উদ্দীন কাজী
|
কলিমুল্লা কাজী — রাশেদ কাজী

বর্ত্তমান সময়ে ঝাড়-বিশিলা গ্রামে কবির বংশধরগণ বসতি করেন। দুই একজন প্রাচীন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। কবির জীবনী সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহারই সারাংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

কবির পূর্ব্ব-পুরুষেরা নবাবী আমলে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। এখনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, কবির পিতা কবীর মাহমুদ সাহেব ঘোড়াঘাট পরগণায় দেওয়ান ছিলেন।

কবি সাংসারিক ও বৈষয়িক বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন। কবিরা দুই ভাই ছিলেন; অন্য ভ্রাতার নাম জামালউদ্দীন।

সম্ভবতঃ কবি বাগদুয়ার মৌজের কাজী ছিলেন। তাঁহার পিতার বংশগত উপাধি কাজী—অথচ তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদের উপাধি চৌধুরী। খান চৌধুরী উপাধি দৃষ্টে মনে হয় কবির পূর্ব্ব-পুরুষেরা পাঠান ছিলেন।

কবি যে কাজী ছিলেন তৎসম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ভূতপ্রেতাদি তাহাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইবার জন্যও রজনীযোগে কবিকে ডাকিয়া লইয়া যাইত এবং প্রভাতের পূর্ব্বেই গৃহে পৌঁছাইয়া দিত, এরূপ কিম্বদন্তী শুনা যায়।

কবি যে সাধুচরিত্র ও ধার্ম্মিক ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখনও তাঁহার কবর দর্শন করিবার জন্য অসংখ্য হিন্দুমুসলমান নরনারী সাগ্রহে রঙ্গপুর জেলায় ঝাড়-বিশিলা গ্রামে আগমন করিয়া থাকে।

কবির অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। এখনও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, যে সময় কবি ঝাড়বিশিলা গ্রামে জুমার নমাজে উপস্থিত ছিলেন তাহার কয়েক দণ্ড পরে তাঁহাকে ঘোড়াঘাট গ্রামে মসজিদে ইমামতি করিতে দেখা যায়।

আমার যতদূর মনে হয় কবি একজন বিখ্যাত সূফী ছিলেন, নতুবা তাঁহার মৃত্যুর বহু বর্ষ পরেও লোকে তাঁহার মকবরা দর্শন করিতে আসিবে কেন ?

আমি স্বয়ং কবির সমাধিস্থান দর্শন করিয়াছি। চারিদিকে শালবন। তাহার মাঝখানে কবির সমাধি-গৃহ। হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল—মনে হইল অষ্টাদশ শতাব্দীর অমর কবির সাহচর্য্য লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। সসম্ভ্রমে আল্লার দরগাহে মনোজাত করিলাম।

কবি আপন গ্রাম ঝাড়-বিশিলার বর্ণনা করিতেছেন—

এ "ঝাড় বিশিলা" গ্রাম, চতুর্দ্দিকে যার নাম
পরগণে সুসুঙ্গা বাগদার ॥
সরকার ঘোড়াঘাট, কি কহিব তার ঠাট
নানান বাজার দেখি যার ॥
সে গ্রামে আমার ঘর, আছে লোক বহুতর
ছাত্তাল পণ্ডিত বলি তারে ॥
বসতির নাহি সীমা, কি দিব তার উপমা,
অমরা জিনিয়া গ্রাম খানি ॥
যথা তথা রসরঙ্গ, নাহি জানে প্রীতিভঙ্গ
এক জনে গুণে মহা গুণি ॥"

(জঙ্গনামা, পৃঃ ২)

* * * *

অন্যত্র বলিতেছেন,

"মোকে ঝাড়-বিশিলার আমার বসতি,
পরগণে বাগদুয়ার ঘোড়াঘাট স্থিতি।"

(আম্বিয়ার বাণী পৃঃ ৬)

আবার বলিতেছেন,

শুনো ভাই থাকি কথা, কহিম হইতে তথা
পিত্রলোক বসতি করিলা ॥
ঘোড়াঘাট সিরকালা, বাগদার পরগণা
গ্রামখানি এ ঝাড়বিশিলা ॥
সে গ্রামে আমার স্থিতি, সুখ ভাবে দিবারাতি
কেহ নাহি জানে দিন আইন ॥
না বুঝে দিনের কথা, যেমন কুকুম যথা
কেতাব কোরাণ নাহি চিন ॥"

(হিতজ্ঞানবাণী পৃঃ ৪)

ঝাড়-বিশিলা গ্রাম দূর হইতে কাল পাহাড়ের ন্যায় আকাশের কোলে মিশিয়া গিয়াছে, বলিয়া মনে হয়। কবির সময়ে বোধ হয় তাঁহার গ্রামে শালবৃক্ষের এত প্রাচুর্য্য ছিল না, নতুবা তিনি নিশ্চয়ই উহার উল্লেখ করিতেন। সম্মুখে যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত মাঠ—তাহারই পার্শ্বে নিবিড় শালতরু শ্রেণী যেন আলিঙ্গনবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এখন গ্রামে আর পণ্ডিতের বিশেষ বসতি নাই। অধিকাংশ গ্রামবাসীজনই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত।

তাঁহার গ্রন্থ রচনার কারণ কৌতুহলোদ্দীপক না হইলেও আনন্দপ্রদ বটে। 'জঙ্গনামার' প্রথমেই কবি বলিতেছেন,—

"ইষ্ট মিত্র সেহি গ্রামে, আছে যত অবিশ্রামে
নিরবধি কহেন আমার ॥
এমামের জঙ্গকথা কতেক শুনিব মিথ্যা
কহ তুমি কেতাব উত্তর ॥
তাহার আদেশ ক্রমে, বিশেষ ভাবিয়া শ্রমে
করিলাম পুস্তক প্রচার ॥
কেতাবে দেখিনু জেহি, পয়ারে রচিনু সেহি
দোষ মোর না ধর ইহার ॥
পড়িব শুনিব লোক, স্মরণ করিব মোক
রহিব আমার নাম খানি ॥
এহি সে আমার আশ, তাথে কেহ উপহাস
অবিচারে কর মোখে জানি ॥" (পৃঃ ২)

তাঁহার অন্য গ্রন্থ 'হিতজ্ঞানবাণী' রচনার কারণও লোক-হিতসাধন।

কবি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন—

(১) জঙ্গনামা * ১১৩০ বঙ্গাব্দ
(২) হিতজ্ঞানবাণী * ১১৭০ বঙ্গাব্দ

* রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ-রচনার সঙ্গে তুলনীয়।

(১) ব্রতকথা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ
(২) বিদ্যাসুন্দর ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ

এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৪৯৮-৫০২)

(৩) আম্বিয়াবাণী• ১১৬৫ বঙ্গাব্দ

(৪) সর্ব্বভেদবাণী•

কাব্য, রস ও ছন্দমাধুর্য্য ও প্রাচীনতার দিক হইতে বিচার করিলে সকলগুলি কাব্যগ্রন্থই সুখপাঠ্য।

আমরা "হিতজ্ঞানবাণী" লইয়া এই বিচারে প্রবৃত্ত হইব। "হিতজ্ঞানবাণী" ইস্‌লাম ধর্ম্মের রীতি ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ। ইসলামকি, নামাজ রোজা, ইমান আরকন প্রভৃতি বিষয়ে ছন্দোবদ্ধ মধুর কবিতাবলীর সমষ্টি। এই নীরস বিষয়ও যে কবির সরল লেখনীর ফলে কিরূপ সরস হইয়া উঠিয়াছে তাহা পাঠক অধ্যয়ন মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। এইস্থানে গ্রন্থের প্রথম হইতেই 'নিরঞ্জিনবন্দনা' উদ্ধৃত করিলাম,—

"গগন মন্দির শূন্যে কৈল স্থির
বিনে রুয়া তাঁর থাম্ভা ॥
তাহার উপর চন্দ্র দিবাকর
সকলি অতি অসম্ভা ॥
এক রবিশশী, দেশে দেশে বসি
সবে দেখে বিগুমান ॥
হেন যে বিধাতা, অঙ্গের জুগাতা
কে পাবে এমত থান ॥
গগন মণ্ডল কৈল ঝলমল
সৃজিয়া যতেক তারা ॥
ভূমির উপর জীব জন্তু নর
আর তরু তৃণ সারা ॥
নিলা তরুবরে, পুষ্প রঙ্গো করে
আছে কত নানা জাতী ॥
নারীর উদরে জল বিন্দু করে
চিত্র বিচিত্র মুরুতি ॥

"জিহ্বার বচন করিল সৃজন
তাহে নানা গুণ গায় ॥
চক্ষে দিল জ্যোতি জেন জলে মতি
সকলে দেখে তাহায় ॥
এক রূপে নয় সৃজিল বিস্তর
কেহ নহে কার মত ॥
* * *
নাই রূপ রঙ্গ অপূর্ব্ব অভঙ্গ
যেমন পুষ্পের গন্ধ ॥
কহে বিনামুখে চক্ষু নাহি দেখে
যত করে ভাল মন্দ ॥"

(হিতজ্ঞানবাণী পৃঃ ১-২)

হিতজ্ঞানবাণীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে।

১। নিরঞ্জিন বন্দনা
২। নবির বন্দনা
৩। হজরত নুরনবীর পয়দায়েশের বয়ান
৪। মতরজমের আরম্ভ
৫। পহিলা ওয়াক্তের বয়ান
৬। একশত ত্রিশ মছলবে বয়ান
৭। চারি মজাহাব ও অজু ও তৈয়ামের বয়ান
৮। গোছল ও যেনা-ই-মুছলবাণীর বয়ান
৯। অহকাম আরকন ও করজের বয়ান
১০। দোস্ত ইমানের বয়ান
১১। পঞ্চ ওয়াক্ত নামাজের বয়ান
১২। দোস্ত ইমানের পুনঃ খোলাছা বয়ান
১৩। দ্বিতীয় দেকতের বয়ান
১৪। তৃতীয় দেকতের বয়ান
১৫। চৌথা দেকতের বয়ান
১৬। হজরত দুই পয়গম্বারের বয়ান
১৭। হজরত ইব্রাহিমের বয়ান
১৮। হজরত মুছা পয়গম্বরের বয়ান
১৯। হজরত ইছা নবীর বয়ান
২০। হজরত বহলুল্লাহের বয়ান
২১। পঞ্চম দেকত কেয়ামতের বয়ান
২২। ষষ্ঠ দেকতের বয়ান
২৩। সপ্তম দেকতের বয়ান
২৪। নামাজের মধ্যে বার ওয়াজবের বয়ান

২৫। নমাজের মধ্যে বার ছুন্নতের বয়ান
২৬। অজুর ছুন্নতের বয়ান
২৭। ওজু টুটিবার বয়ান।
২৮। ফাজ গোছলের বয়ান
২৯। ছুন্নত গোছলের বয়ান
৩০। গুছলের গোছলের বয়ান
৩১। পানির বয়ান
৩২। নামাজ পড়িবার নছিহত
৩৩। নামাজের খোলাছা বয়ান,—ইত্যাদি

উল্লিখিত শুষ্ক বিষয়গুলিও সাধু লেখকের রচনার ঔদার্য্যগুণে সরস হইয়া উঠিয়াছে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলা। মানুষের মনে যে অব্যক্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ও ভাব রহিয়াছে তাহাকে রূপ দেওয়া। এই দিক হইতে বিচার করিলে 'হিতজ্ঞানবাণী' আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভারতীয় যুগের অমূল্য গ্রন্থ। 'চৈতন্য চরিতামৃত' প্রভৃতি হিন্দী-সমাকুল গ্রন্থ হইতে হায়াত মামুদের রচনাবলী যে ওজঃ ও রসগুণে অধিকতর সমৃদ্ধ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঐ সকল গ্রন্থ যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের আদরের বস্তু হয়, তবে এই অসাধারণ পণ্ডিত ও সাধু ব্যক্তির রচনাও অবহেলার সামগ্রী নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আত্মবিস্মৃত শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানদিগের অবহেলার জন্যই এই সকল সুমধুর ও মূল্যবান গ্রন্থগুলি অবজ্ঞাত রহিয়াছে।*

'হিতজ্ঞানবাণী' আরবী 'দাবসী' গ্রন্থের সারাংশ। গ্রন্থকার কোন্ কোন্ গ্রন্থের সাহায্যে উহা সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। কবি যে একজন তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন, গ্রন্থ-উল্লেখেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একস্থানে তিনি বলিতেছেন—

"কারছীর কথা সব আনিয়া বাঙ্গালাত॥
পদবন্ধ করি কহে মহম্মদ হায়াত॥" (পৃঃ ২৬)

অন্যত্র লিখিতেছেন—

"রেছালার কথা লিয়া বিরচিল পুথি।
হায়াত মাহমুদ ভনে মধুর ভারতী॥" (পৃঃ ২৮)

আবার পাইতেছি—

"হেয়াত মহাম্মদে কহে কোরাণের বাণী।
যেমত আছয় লেখা তফছির হাছেনী॥ (পৃঃ ৩৯)

অন্যস্থানে দেখিতেছি—

"হেয়াত মাহমুদে কহে আমি কিবা জানি।
দাকা একুল হাকায়েকে লেখে এই বাণী॥" (পৃঃ ৪১)

এই গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে কবি যে অপূর্ব্ব রেখাপাত করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"আমরা আহাদ কহি হিন্দুরা আকাস্ত।
আহম্মদ কহি মোরা হিন্দু সে অনাস্ত॥
বিচার করিয়া ভাই বুঝ ভাল মতে।
একাক্ষরাধি বিনে নাহিক ছুগাতে॥
মিমে মহম্মদ নারায়ণ না অক্ষরে।
হিন্দু মুছলমান হৈল আচার বিচারে॥
অনাদি হইতে হইল সব হিন্দুয়ান।
আদম হইতে হইল যত মুছলমান॥
বিচারে হইল মুছলমান শুদ্ধমতী।
আচারে হইল হিন্দু নষ্টপাপ জাতি॥
যে সৃজিয়া অন্ন দেয় নিরন্তর।
তাহাকে না জানে পূজে মুরতী পাথর॥
মুক্তি নাম মহম্মদ মুখে নাহি লয়।
বৈকুণ্ঠ জাইতে নারে ঋষি মুনি হয়॥" (পৃঃ ৪)

এই গ্রন্থে আর একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহা গুরুবাদের সমর্থক। একস্থানে পাওয়া যাইতেছে,

"মনে ধ্যান করি গুরু তন কজোনাস।
হেয়াত মাহমুদে কহে কাদেরের দাস॥"

কবি যে আব্দুল কাদের জিলানী সাহেবের তরীকার অবলম্বী তাহাও প্রমাণিত হইতেছে।

গুরুবাদের বন্যায় একবার বাঙ্গালা প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার ঢেউ বোধ হয় মুসলমান পীরদের বুকেও লাগিয়াছিল, তাই পাইতেছি,—

* এইস্থানে নদিচী-সাহিত্যিক মুন্সী আবদুল করিম ও অনুসন্ধান-বিশারদ আবদুল গফুর সিদ্দীকী সাহেবদ্বয়ের নাম ব্যতিক্রম পর্য্যায়ে পড়িবে।

"গুরু সার গুরু পার গুরু সে কাণ্ডারী।
গুরুর খেদমতে পাই নাথ নৈরাকার॥" (পৃঃ ৩৩)
"গুরু ব্রহ্ম, গুরু ধর্ম,
গুরু হইতে সিদ্ধ কর্ম,
হেন গুরু ভজহো নিশ্চয়॥" (পৃঃ ৪৬)
* * * *
"গুরু সে পরম রতন সংসারের সার।
হেন গুরু ভজ ভাই যাহাতে নিস্তার॥" (পৃঃ ৪৭)
* * * *
"দৃঢ় মনে ভজো ভাই গুরুর চরণ।
গুরু ব্রহ্ম গুরু ধর্ম্ম গুরু হৈতে সিদ্ধিকর্ম্ম।
গুরু না ভজিল যেই ব্রেহ্মা তার জন্ম॥" (পৃঃ ৩৪)

গুরু না ভজিলে কি উপায় হইবে তাহাও গ্রন্থে নির্দেশ করিতেছেন,

"তৌবা নাহি করে জেবা মুরশিদ না সেবে।
নিদান মুরশিদ তার সয়তান হইবে॥" (পৃঃ ২৭)

'গোসাঞী' 'মগরা' 'ধগ্যা' প্রভৃতি প্রাচীন প্রাদেশিক শব্দেরও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

'সর্ব্বভেদবাণী' গ্রন্থখানি ও অনুবাদ; হিতোপদেশের এমন সুন্দর বাঙ্গালা সংস্করণ আর নাই। এই গ্রন্থখানিরও আদ্যন্ত অনুদিত কবিতা, ইহাতে 'নেহা' 'বাহুড়িয়া' প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দের প্রচলন দেখা যায়।

'জঙ্গনামা' এখনও রঙ্গপুর জেলায় গীত হয় বলিয়া শুনা যায়। এমন কি দুই একজন গায়েনের সমগ্র গ্রন্থখানি মুখস্থ আছে।

'জঙ্গনামা' কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থ-রচনা সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে নানা অসত্যের প্রচার চলিয়া আসিতেছে। উহা দূর করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

'জঙ্গনামা' বড়ই করুণ কাহিনী। ঐ কাহিনী শুনিলে পাষাণও গলিয়া যায়। দরদী কবির সার্থক তুলিকা স্পর্শে 'জঙ্গনামা' পরম মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে।

"আম্বিয়ার বাণী" ছন্দে বিরচিত পয়গম্বরদিগের জীবন-চরিত। আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে মনে হয় যে, 'আম্বিয়ার বাণী'র পূর্ব্বে এই প্রকার চমৎকার, কোন গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না। 'আম্বিয়ার বাণী' রচনার হেতু গ্রন্থকার যাহা উল্লেখ করিতেছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য।

"আম্বের কাহিনী শুনে আম্বিয়ার বাণী।
পদবন্ধে কহি আমি কেতাবে যে জানি॥
অল্প অল্প লোকে কহিছে বিস্তর।
সুশোভন নহে তার পদ সমস্বর॥
কেতাবের মতে কথা সব নহে সই।
ভাল মন্দ বিচারিয়া না কহিল কোই॥
কতো বাড়াইয়াছে কতো করিয়াছে কম।
বচন সুন্দর নহে, না রচন উত্তম॥
তেকারনে লিখি আমি আম্বের কাহিনী।
রচিনু এসব কথা করিয়া বাখনি॥" (পৃঃ ১-২)

"চৈতন্য চরিতামৃত" প্রভৃতি জীবনীগ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থের ভাষা অবিসম্বাদীভাবে উত্তম। হিন্দী শব্দের বাহাই ইহাতে নাই।

এই গ্রন্থও কবি শেষ বয়সে রচনা করিয়াছেন। অধিকাংশ গ্রন্থই কবি হায়াত মাহমুদ শেষজীবনে রচনা করিয়াছেন।

এই গ্রন্থও 'জঙ্গনামার' ন্যায় গীত হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ কবি একস্থানে বলিতেছেন,

"যে গাওয়ায় যে গায় এহি আম্বিয়ার বাণী।
বাড়িবে সম্পদ সুখ, খণ্ডিবে বিঘিনী (?)॥" (পৃঃ ৩)

অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরবঙ্গের শক্তিশালী কবির কাব্যগ্রন্থগুলির যৎসামান্য আলোচনা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। বঙ্গভাষার ভাণ্ডার রত্নে পূর্ণ করিতে হইলে এই গ্রন্থগুলির বৈজ্ঞানিকসম্মত সংস্করণ প্রকাশ করা আশু প্রয়োজন। বাঙ্গালার মুসলমানগণ এবিষয়ে উদ্যোগী ও যত্নশীল হইলে বড়ই সুখের কারণ হয়। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস বাঙ্গালী মুসলমানেরা তাঁহাদের জাতীয় জীবনের এই নব-জাগরণের দিনে ঋষিতুল্য কবির গ্রন্থাবলীর যোগ্য কদর করিতে ভুলিবেন না।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

চিরাচরিত

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ

একের পরিচ্ছেদ

অমিত-চরিত

১

অমিত ছিল সাধা-সিধে সরল স্বভাবের ভালো ছেলেটি; —কাব্য-প্রিয়, ভাবুক এবং রবীন্দ্র-ভক্ত। 'তপতী'র অভিনয় সে চারদিনই দেখেছে; 'শেষের কবিতা'র শেষ লাইনটি পর্য্যন্ত তার মুখস্থ!

অমিত যে আবেষ্টনের মধ্যে মানুষ হ'য়ে উঠেছিল, কর্ত্তব্য-কঠোর পিতার কঠিন শাসন দিয়ে সে বেড়া তৈরী; তার ফাঁক দিয়ে অমিত কোনদিন ফাঁকা মাঠে এসে দাঁড়াতে পারেনি। উদার আকাশের উধাও বাণী আর নক্ষত্র লোকের সুদূর ইঙ্গিত অমিতের কল্পলোকেই মায়া-বিস্তার ক'রে চলেছিল!

ক্রমশঃ তার যৌবনের বনে যখন বসন্তের সমারোহ সুরু হ'ল, তখন নব নব ভাব-মুকুল বিকাশের সঙ্গে অমিতের মনে আরও যে একটি নব-জাগ্রত চেতনা দেখা দিল, সেটি হচ্ছে—নারীর সম্বন্ধে পুরুষের সেই আদিম এবং অনিবার্য্য কৌতূহল!

তাই, সে যখন কলেজের চার বছর পেরিয়ে 'দারভাঙ্গা-বিল্‌ডিংস্'-এ গিয়ে উঠ্‌লো, তখন তার মনের এই দিন দিন সংবর্দ্ধিত কৌতূহল তাকে দিগ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুললে; তার মনোজগতে সহসা একটা বিপ্লব গেল ঘটে! চিরদিন ধ'রে গ্রামের অতি পরিচিত একটিমাত্র পথে যে লোকটি যাতায়াত ক'রে এসেচে, তাকে শহরের পাঁচ-মাথায় এনে ছেড়ে দিলে তার যে অবস্থা হয়, অমিতের অবস্থাও তার চেয়ে কিছুমাত্র কম বিপজ্জনক হ'য়ে উঠ্‌লো না; সে দিশাহারা হ'য়ে পড়ল।

পঞ্চম-বার্ষিক শ্রেণীর প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সভ্যতায় ভর্ত্তি হবার কিছুদিনের মধ্যেই অমিতের জীবনে তিনবার তিন রকমের দুর্ঘটনা ঘটল!……

সংস্কৃতের মেধা মায়াকে দেখে, অমিত লুকানো খাতায় কবিতা লিখলে; এক্‌জিবিশনে মেয়েদের ষ্টলে ইংরেজীর সুনীতা সেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, সঙ্গে যা-কিছু ছিল তাই দিয়ে সেখান থেকে বিনা-বিচারে কতকগুলি ছবি কিনে ফেলে; তর্ক-সভায় 'ইকনমিক্স'-এর নীতি বসুকে সম্মুখের আসনে দেখে জোর গলায় নারী-প্রগতির স্বপক্ষে বক্তৃতা দিলে।……

এমনি ক'রে তার অনধিকৃত জীবনে যে ক'টি তরুণী এসে পড়ল, তাদের কার পায়ে সে তার উচ্ছ্বসিত প্রেম নিবেদন ক'রে ধন্য হবে, তা কিছুতেই ঠিক করতে না পেরে সে মহা-সমস্যায় প'ড়ে গেল!

তারপর থেকে, ক্লাসের প্রতি ঘণ্টার শেষে, প্রতিদিন অমিত কতবার যে 'আশুতোষ-বিল্‌ডিং' আর 'দারভাঙ্গা-বিল্‌ডিং' করতে লাগল তার সংখ্যা নেই!—ফলে, দিনের মধ্যে অগুন্তিবার ওদের সঙ্গে অমিতের 'করিডরে'র পথে 'কলিশন্' (কথাটা অমিতের নিজের) ঘটতে লাগল!

দুই'এর পরিচ্ছেদ

সংঘাত

১

'শেষের কবিতা'র অমিতের সংঘাত সংঘটিত হয়—শিলঙ্‌ পাহাড়ের ওপর। আঁকা-বাঁকা সরু রাস্তা, ডানদিকে জঙ্গলে-ঢাকা খাদ্—সেইখানে।

আমাদের অমিতের সঙ্গে মেয়েটির যেখানে সংঘাত ঘটে, সে স্থানটি ঠিক অতখানি [illegible] না হলেও নিতান্ত কম অনুকূল ছিল না।

মেয়েটির সঙ্গে একাকী একঘরে ব'সে থাকবার সময় অমিতের মনের ভাব কিরূপ হ'ত তা সে নূতন ডায়েরীর পাতায় লিখে রেখেছিল—

"...ঠিক একটার সময় নীতি এসে ঘরে ঢোকে; প্রথম প্রথম আমাকে দেখে ওর মুখে বিরক্তির কুঞ্চিত আভাষ ফুটে উঠ্‌ত; এখন কিন্তু মৃদু হাসি দিয়ে ওর আগমন শুভ করে' তোলে! সারাক্ষণ ও বই-এর মধ্যে ডুবে থাকে; দু'জনে কোনদিন কোন কথা হয় না; না-বলা বাণীর একটা বাঙ্‌ময় উচ্ছ্বাস দু'জনের বুকের বালুতটে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে! নীতিকে দেখে মনে হয়, ঠিক যেন নীল আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে একটি বিদ্যুৎ-রেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারিদিকের সমস্ত হ'তে স্বতন্ত্র। দুর্লভ অবসরে আমি নীতিকে দেখেছি। দলবেঁধে অন্ত পাঁচ জনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্ম-স্বরূপে ও দেখা দিত না (অমিতর লেখার শেষের দিকে সতর্ক পাঠক 'শেষের কবিতার' ছাপ লক্ষ্য করবেন।)

ব্যাপারটা হচ্ছে এই—শ্রীমতী নীতি বসু নামধেয়া তরুণী ছাত্রীটির বিষয় ছিল অর্থ-শাস্ত্র। যে বইগুলো ওদের বিশেষ পাঠ্য ব'লে নির্ব্বাচিত ছিল, ছোট লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে সেগুলো ওকে পড়তে হ'ত; সাধারণ ছাত্রের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না।

অমিতের বিষয় ছিল—ফাইন্ আর্ট্‌স্। সেই সম্পর্কীয় অসংখ্য প্রাচীন বই এবং পুঁথি-পত্র পড়বার জন্ত তাকেও ঐ ঘরে গিয়ে মাঝে মাঝে বসতে হ'ত; বইগুলি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং দামী ব'লে সাধারণ পাঠাগারে তাদের রাখা হ'ত না।

সুতরাং, এক আর এক-এ যেমন দুই হয়, সংঘাতও হ'য়ে উঠ্‌ল তেমনি অবশ্যম্ভাবী!

তারপর, কিছুদিনের মধ্যেই, অমিতের পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ এত বেশী বেড়ে উঠ্‌ল যে, 'করিডরে'র ওপর দাঁড়িয়ে দল-বেঁধে ছাত্রদের মধ্যে মেয়েদের সম্বন্ধে যে আলোচনা চলত আর যার পুরোধা ছিল অমিত, সেখানে তাকে আর দেখা গেল না!

২

কোঁকড়ানো-চুলে 'লোশান্' লাগানো, নিশ্চিহ্ন দাড়ি-গোঁফের তলায় সবুজ আভা, বাসন্তী-রঙের শার্ট, পাঞ্জাবীখানি পরা, মোটা মোটা বই-এর ভারে নত—অমিত কলেজে এসে ঢুক্‌তো এগারোটায়, যার হ'ত সন্ধ্যায়;—সারাদিন একাগ্রচিত্তে অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনা, এবং বাকী সময়টুকু লাইব্রেরী ঘরে কাটানো;—এই ছিল তার প্রাত্যহিক কাজ!

অধুনা-পরিত্যক্ত বন্ধু-বান্ধবের দল তার আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখে বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে গেল; তাদের বারবার সনির্ব্বন্ধ আহ্বান উপেক্ষা ক'রে অমিত অমিত-উৎসাহে নব-জীবনের নূতন অধ্যায় সুরু করে দিলে।

এতদিনের পর অমিত জীবনের পরিপূর্ণতার পথের সন্ধান পেয়েছে;—অর্থাৎ তার সঙ্গে নীতি আলাপ করেচে! ওয়াটার্‌লুর যুদ্ধ জয় ক'রে ওয়েলিংটনও এতখানি চরিতার্থ বোধ করেছিলেন কিনা সন্দেহ!

অমিত এখন বিশ্বজয়ী সম্রাটের মতো হাঁটে; কথা বলে অল্প, মৃদু মৃদু হেসে; জীবনটাকে তাবকে যেন ভেঙ্গে-চুরে আলাদা ধাতু দিয়ে গ'ড়ে তুলেছে!

গভীর রাত্রে উঠে, জানলার ধারে ব'সে, চাঁদের আলোর সাহায্যে অমিত তার মরক্কো-মোড়া খাতায় লিখলে—

"—অনন্তকাল ধ'রে মন যার তপস্যায় নিমগ্ন ছিল, এতদিনে তার দেখা পেলাম! এতদিন পরে যথার্থ ভালবাসার আস্বাদ পেয়ে তৃষিত অন্তরের বেলা-ভূমে পরিপূর্ণ তৃপ্তির তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে! যৌবন-চঞ্চল অন্তরের মোহ কেটে গিয়ে সুগভীর প্রেমের অমিয়-ধারায় অমিত-সত্ত্বা আপ্লুত হ'য়ে গেছে!

তিনের পরিচ্ছেদ

—প্রবাহ—

১

সেদিন ক্লাস বসবার অনেক পূর্ব্বেই অমিত কলেজে এসেছিল।

ইংরেজী ক্লাসের বন্ধু প্রশ্ন করলে "এতো সকাল সকাল কেন হে; তোমার ক্লাস তো দুটোয়?"

—"এমনি এলাম।"

—"দেখি কি বই! একি! তোমার হাতে song of songs? ব্যাপার কি! ও বাবা! তাই নাকি

বন্ধু হাসতে হাসতে পড়লে,—

"শ্রীমতী নীতি বসুর করকমলে…"

—"বল কি, হ্যাঁ!"…

তার হাসিতে বাড়ী কেঁপে উঠল।

অসিতটা একটা বর্ব্বর! মেয়েরা যাচ্ছে আসছে, আর এমনি ক'রে…

ভাগ্যিস্ নীতি এখনো আসেনি!…

অমিতের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে—কান দিয়ে আগুন ছুটছে!

সুধীনটাও সময় বুঝে কোত্থেকে এসে উপস্থিত হ'ল; খুব গোপনে অসিত বইখানি তাকে দেখিয়ে দিলে। সুধীনটা আবার অসিতের চেয়েও জোরে হাসে!

—"আর, অমিত তো আজকাল মিস বোসের এড্-ডে-কান্ হয়েছে; তা জানো না বুঝি?"

—"না; কি রকম?"

—"অমিত রোজ তাঁকে নিজের 'কারে' ক'রে বালিগঞ্জে পৌঁছে দেয়।"

—"তাই নাকি! হাঃ, হাঃ, হাঃ! 'কনগ্রেচুলেশন্‌স্' অমিত।"

অমিত এবার জোরে জোরে বললে—"দেখ তোমাদের এই সমস্ত insinuations অত্যন্ত অভদ্রোচিত! এ-সবের উত্তর আমি দেব না; তবে এটুকু জেনে রাখ—ব্যাপারটা তোমাদের ধারণার অতীত হলেও মেয়েদের সঙ্গে ভদ্রভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করা যায়!"

অমিত তার বই নিয়ে গট্‌গট্ ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেল। পিছনে দাঁড়িয়ে অসিত আর সুধীন নির্লজ্জের মতো হাসতে লাগল।

২

বই-খানা হাতে নিয়ে নীতি ঘাড় দুলিয়ে এমন মধুর ক'রে একটু হাসলে যে অমিত কাল রাত থেকে উপহারের সঙ্গে যে-কথাগুলো গুছিয়ে রেখেছিল, সে গুলো সব এলোমেলো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল!

নীতি বললে—"How very sweet and kind of you! আমি একদিন কথাচ্ছলে বইখানার নাম আপনার কাছে ব'লেছিলাম, আপনি ঠিক মনে রেখেছেন তো! আশ্চর্য্য আপনার memory!"

অমিতের মনে হল, তাঁর মাথার উপরেই আকাশ; হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়। বললে—"আপনি বলেছিলেন… আমি ভুলবো? সামান্য আমার দান…আপনাকে… আপনি…আমি…(মোহন-বাগানের ফুটবল ম্যাচে গ্যালারিতে প্রবেশ করবার দুঃসাধ্য ব্যাপারের মতো অমিতের মনের কথাগুলো ঠেলাঠেলি করছে; বেরুবার পথ পাচ্ছে না! শেষে—) আজ আচ্ছা ক'রে 'স্নাবিং' দিয়ে এলাম!"

নীতি একটু বিস্মিত হয়েই বললে,—"কাকে?"

—"এই, আমার দু'জন বন্ধু,—বন্ধু না ছাই;—uncultured brutes…ওরা ভাবে…higher ideas ওরা ধারণাই করতে পারে না! ওদের সঙ্গে কথা বলব না আর!"

নীতি-মিহিসুরে খানিকটা হেসে নিয়ে, শেষে বল্লে—"আজ আমার ছুটোর ছুটি; আপনাকে পাবো তো?"

—"নিশ্চয়! আমি as usual সিঁড়ির নীচে আপনার জন্ত অপেক্ষা করব।"

—"Thanks!"

—"Need'nt mention!"

চারের পরিচ্ছেদ

দুর্যোগ

১

অমিত গোল-দীঘির ধার দিয়ে আসছিল।…

পথিক-বন্ধুর অভাব নেই; তাদের একজন প্রশ্ন করলে—"কিহে 'কার' কোথা গেল?

মিথ্যা-ভাষণটা অমিত রপ্ত ক'রে উঠতে পারে নি আজও।

বল্লে—"একজন নিয়ে গেছেন।"

—"কে শুনি?"

অমিত আম্‌তা-আম্‌তা করতে লাগল। প্রেমের ধর্ম্মই হ'চ্ছে এই যে, বুকের অনন্ত গোপনতা সত্ত্বেও প্রেমিকের মন তার প্রিয়ার কথা বিশ্বের কানে শুনিয়ে দেবার জন্য সদাই উন্মুখ!

বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে অমিত বল্লে,—"আমার একটি লেডি-ফ্রেণ্ড; এক সঙ্গে পড়ি; তিনিই—"

-"তিনি কি শুধু তোমার গাড়ী-খানি নিয়েই ক্ষান্ত আছেন?"

অমিত বিনা বাক্যব্যয়ে রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল!

বন্ধু বল্লে,—"যা হোক! Let your moon shed honied light ... নেমন্তন্নটা ফাঁকি দিস্‌নে। গুড্‌-ডে!... ..."

অমিত অকারণে তার ওপর প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে—

"বিজু! সময়মত একদিন আমার ওখানে যাস। কথা আছে।"

বিজু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে যায়।

গোলদীঘির ভিতর ঢুকে দেখে—সামনের বেঞ্চে সহপাঠী বিকাশ ব'সে আছে!

বিকাশের ওপর অমিতের মন বরাবরই বিমুখ ছিল। রুচি-হীনতার ওপর অমিতের ছিল সব চেয়ে বেশী বিতৃষ্ণা; ঐ অপরাধে সে যাদের অভিযুক্ত করত তার প্রথম এবং প্রধান ছিল বিকাশ। তাই বিকাশকে দেখে তার মুখ মোটেই প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল না!

অমিতকে দেখে বিকাশ তার দন্তপংক্তি বিকাশ ক'রে বল্লে,—"এসো অমিত, বোসো। তারপর, মিস বোসের খবর কি? তুমি নাকি আজকাল তার বাহন হ'য়েছ?"

অমিত হাসতে হাসতেই বল্লে,—"ভদ্র-মহিলার সম্বন্ধে সম্ভ্রম দেখিয়ে কথা বোলো বিকাশ!"

—"ওঃ, গায়ে লেগেছে দেখছি; আরে, নীতির কথা কে আর না জানে! তোমাদের little affair-এর কথাও কারুর জানতে বাকী নেই

বিকাশের কথা বলার ভঙ্গী দেখে অমিত ভয়ানক রেগে গেল। যে মাত্রায় যতখানি সে রেগে উঠ্‌ত, সেই মাত্রায় ততখানি তার স্বাভাবিক জ্ঞান লুপ্ত হ'য়ে আসতো।

তার দিকে এগিয়ে গিয়ে অমিত বল্লে,—"কি বলছ?"

বিকাশ বল্লে,—"বলব আর কি! কিন্তু সাবধান বন্ধু! নীতিকে তুমি চেনো না; she has already filted several simpletons like you··· |"

বিকাশের কথার শেষ দিকটা আর শোনা গেল না। অমিত ধাঁ করে তার বলাই চাটুর্য্যের কাছে শেখা বিদ্যে বিকাশের ওপর আরোপ করলে! তার সেই একটিমাত্র অব্যর্থ মুষ্টিযোগেই বিকাশ চোখে সংখ্যাতীত সর্ষেফুল নিরীক্ষণ করলে!

লোক জমে গেল। অমিত ক্রোধদীপ্ত চোখে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিকাশ উঠে দাঁড়িয়ে তার মূর্ত্তি দেখে, আর কোন কথা না ব'লে ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে পড়ল; অনেকটা ঠিক সেইরকম করে,—শুদ্ধভাষায় যাকে বলে,—বেত্রাহত কুক্কুরের মত!!

পাঁচের পরিচ্ছেদ

—সমস্যা—

১

অমিত মহা ভাবনায় পড়েছে! সকাল থেকে নিজের পড়বার-ঘরে বসে সে চিন্তার অকূল সমুদ্রে তলিয়ে গেছে; কূল পাচ্ছে না। বাড়ীতে শুনেছে—তার বাবা তার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করছেন! এইটেই তার দুর্ভাবনার মূল!

পিতার এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাকে করতে হবে এবং সে তা করবেও—কিন্তু কেমন ক'রে?......

অমিতের বিপ্লব-বাসনার যিনি আদি-শক্তি অমিত মনে মনে তাঁকে ধ্যান করতে লাগল। নীতির মধ্য দিয়ে অমিতের মানসী দেখা দিয়েছে; আর নীতিও তাকে··· (কথাটা ভাবতেও অমিতর গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল।)

প্রমাণ? হাঁ, প্রমাণ সে পেয়েছে। 'song of songs' হাতে নিয়ে নীতি উচ্ছ্বসিত আনন্দে লুটিয়ে পড়েছিল; অমিত চারদিন কলেজে যায়নি, দেখা হ'তে নীতি কি রকম উদ্বিগ্ন-মুখে তার পানে তাকিয়েছিল; এমনিতর আরও কত শত ছোট-খাটো কথা, টুকরো হাসি, অব্যক্ত ইঙ্গিত!

অন্তরের গোপন কথাটি ঢাকের বিরাট্ বাদ্য-ধ্বনির মধ্যে প্রকাশিত হয় না। মধু-ছন্দা রাগিনীর মৃদুতার মাঝেই তার আভাস পাওয়া যায়! অমিত প্রমাণ পেয়েছে প্রচুর!

নীতির সম্মতি পেলেই সে বিদ্রোহী হবে।...বাবা যে বদরাগী, হয়ত এর জন্যে তাকে...(অমিতের মুখ শুকিয়ে আসে)...তাতে কি হ'য়েছে? নীতি যদি তার পাশে থাকে, তা হ'লে জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট সে হেলায় তুচ্ছ করবে...

অমিত "মহুয়া" খুলে বসল; বিপদের সময় রবীন্দ্রনাথের কাছ হ'তে অমিত পেতো অভয়-বাণী! প্রাণের রুদ্ধ আবেগ উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে সে আবৃত্তি করতে লাগল,—

"উড়াব ঊর্দ্ধে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ মাঝে;
দুর্দ্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাবো
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাবো।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
ছিন্ন পালের কাছি—
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ, আমি আছি।
দু'জনের চোখে দেখেছি জগৎ......"

মূর্ত্তিমান ছন্দ-পতনের মতো বেয়ারা এসে জানিয়ে দিলে, অমিতকে কর্ত্তা তলব করেছেন!

তাড়াতাড়ি বই বন্ধ ক'রে অমিত শঙ্কিত-চিত্তে পিতার ঘরের দিকে চলল। কবিতা-পড়া বাবা শুনতে পাঁয়নি তো! তাহ'লেই মুস্কিল!

অমিতর দিকে না চেয়েই তার বাবা বল্লেন,—"আজ বিকেলে কোথাও বেরুসনি। বাড়ীতে দু'জন ভদ্রলোক আসবে।"

অমিত বুঝলে—তার "উদ্বন্ধনকে" (কথাটা coin করেচে সে নিজেই) পাকা করবার জন্যেই ভদ্রলোক-বেশী জল্লাদদের আগমন!

প্রতিবাদ-কল্পে খুব জোরালো গোছের কিছু একটা বলতে গিয়ে তার মুখ দিয়ে কম্পিত স্বরে শুধু বেরুলো,—

"আচ্ছা।"

ছ'য়ের পরিচ্ছেদ

—শেষের কবিতা—

১

দিন কয়েক পরের কথা।

সকাল থেকেই অমিতের কণ্ঠে গুন্ গুন্ ক'রে গানের সুর ভাঁজা চলেছে!

মা ভেবেছিলেন—ছেলে বোধ হয় বেঁকে বসবে। দেখে শুনে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন।

ছোট বোন্ ভাবচে—বিয়ে না হ'তেই দাদার এত আনন্দ! বিয়ে হলে না জানি—!

অমিত আজ আশ্চর্য্য রকম নম্র হয়ে উঠেছে। পাড়ার যে বন্ধুটির সঙ্গে দশ বছর আগে ঝগড়ার ফলে এতদিন কথা বন্ধ ছিল, অমিত তার সঙ্গে যেচে কথা কয়েছে। বাড়ীর চাকরদের বিনা-ফরমাসেই বক্‌সিস্ দিয়েছে। আজ যেন ওর জীবনেতিহাসের 'রক্তাক্ষর-দিবস'।

খাওয়া দাওয়া সেরে, পড়ার ঘরে ঢুকে, দেরাজ থেকে ডায়েরীখানা খুলে অমিত আর একবার লালকালির লেখাটা দেখে নিলে—

"১২ই ফেব্রুয়ারী। এনগেজমেন্ট। মিস ঘোসেস্ টি-পার্টি। ৫-৩০।"

আজ ১২ই ফেব্রুয়ারী! আজকের এই সান্ধ্য-উৎসবেই তার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত হবে। সে নীতিকে propose করবে। উত্তর সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত-নির্ভর; তবু একবার নীতির মুখে থেকে সেই শাশ্বত মধুর কথাটি শুনে নেবে! তারপর......

অমিত চোখ বুজে শোনে, নিখিল বিশ্বের কবি-গুরু যেন তাহাকে আশীর্ব্বাদ করছেন—

আজি বসন্ত চির-বসন্ত হোক্
চির-সুন্দরে মজুক তোমার চোখ।
প্রেমের শান্তি চির-শান্তির বাণী
জীবনের ব্রতে দিনে-রাতে দিক আনি,
সংসারে তব নামুক অমৃত লোক!

অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। সুসজ্জিত 'টেনিস্-লন'— অভ্যাগত নর-নারীর কল-কণ্ঠে মুখর! লনের একধারে

দাঁড়িয়ে অমিত! আসন্ন-গোধূলির আরক্ত আভা তার মুখে ছড়িয়ে পড়েছে!

ও-ধার থেকে অনিন্দিতা এসে তাকে অভিবাদন করলে।... ...

জলবায়ু এবং সিনেমা সম্বন্ধে অপর্য্যাপ্ত আলোচনার পর অমিত জিজ্ঞাসা করলে,—"মিস্ বোস কোথায়? তাঁকে দেখছি না যে!"

অনিন্দিতা বল্লে,—"সে তার আজকের Chief guestকে নিয়ে ভিতরে গেছে তার বাবার কাছে। তিনি অসুস্থ কিনা!"

অমিত বল্লে,—"তা তো জানি; কিন্তু এই মাননীয় অতিথিটিকে তো চিনলাম না!"

অমিতের চোখের ওপর চোখ রেখে অনিন্দিতা বীণা নিন্দিত কণ্ঠে বল্লে,—"সময় হলেই চিনবেন।"

তারপর সুর পালটে যোগ করলে—"সম্প্রতি বিলাত থেকে এসেচেন। নতুন ব্যারিষ্টার। বাপ হচ্ছেন—multi-millionaire! তিন-খানা 'রোল্‌স্—রয়েস্'!—ঐ যে—"

অস্তগামী সূর্য্যের শেষরশ্মি দিয়ে মাঠের ওপর যে ছায়াপথ রচিত হয়েছিল তারই ওপর দিয়ে নীতি আসছে—ময়ূরকণ্ঠি রঙের সুরাটী শাড়ীর আঁচল মাটিতে লুটিয়ে! পাশে তার দীর্ঘকান্তি সুবেশ যুবা—'চীক্ পেট্'!

অমিতের মন আশা-আশঙ্কায় আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ল।

নীতির নির্ঝর-কণ্ঠ শোনা গেল—"এই যে, অমিত বাবু! আমাদের কি সৌভাগ্য! আসুন পরিচয় করে দি। মিষ্টার ঘোষ, ইনি হচ্ছেন—অমিতবাবু, যাঁর কথা তোমায় মাঝে মাঝে লিখতাম! অমিতবাবু, ইনি হচ্ছেন—মিষ্টার অজিত ঘোষ; my fiance'!

অমিত মুখটা হাসবার মত করে হাত বাড়িয়ে দিলে। মাঠের ওপর দিয়ে আলোর রেখা-টুকু মিলিয়ে গেল। সূর্য্য ডুবে গেছে!

৩

সেদিন শ্রাবণের শেষ-লগ্নে কলকাতা শহরে যে বহুসংখ্যক বিবাহ সুসম্পন্ন হ'য়ে গেল, তারই একটিতে আমাদের অমিত ছিল বর।

শুভদৃষ্টির সময় বালিকা বধূর পানে প্রসন্ন-নয়নে সে তাকিয়েছিল কি না, তা আমরা জানতে পারি নি; তবে তার বিবাহে যে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন হয়েছিল প্রচুর, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম প্রত্যক্ষ!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাজপুতানা-ভ্রমণ

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সরকার এম-এ, বি-এল

পূজার ছুটির আগে বন্ধুবর শৈলের এক জরুরী চিঠি পাওয়া গেল, এবার ছুটিতে একটা বড় রকম 'টুরের' প্রোগ্রাম চাই। খুব ভাল কথা, কিন্তু বন্ধু থাকেন কলিকাতার কাছে, আর আমি তখন থাকি রেল-ষ্টীমারশূন্য পূর্ব্ববঙ্গের এক সুদূর সাব্‌ডিভিসনে। তিনি নিজে প্রোগ্রাম না করিয়া ভার দিলেন কিনা আমার উপর। কল্পনার-বলে প্রোগ্রাম হয় না—অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া একখানা পুরাতন 'ব্রাডশ' জোগাড় করা গেল এবং তার সাহায্যে রাজপুতনা 'টুরের' এক প্রোগ্রাম তৈরী করিয়া বন্ধুবরের কাছে পাঠাইলাম। ছুটি আরম্ভ হইলে আসিয়া দেখি বন্ধুবর সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং পথের পাঁচজন সঙ্গীও জোগাড় করিয়াছেন। সঙ্গীনির্ব্বাচনে তাঁহার উদারতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম—সাহিত্য ব্যবসায়ী হইতে আরম্ভ করিয়া আইন ব্যবসায়ী, চাকুরী ব্যবসায়ী এমন কি মোটর ব্যবসায়ী সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিই তাঁদের মধ্যে আছেন।

১৪ই অক্টোবর একাদশী তিথিতে লাহোর এক্সপ্রেসে যাত্রা সুরু হইল। আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থান আগ্রা, কারণ আজকাল রেল কোম্পানীর প্রসাদে রাজপুতনার প্রবেশ পথ আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশন, কোনও গিরিদুর্গ বা গিরিবর্ত্ম নয়। গাড়ীতে প্রোগ্রাম অনেক অদল বদল হইয়া স্থির হইল বে, জি, আই, পি লাইনে গোয়ালীয়র, ভোপাল, উজ্জয়িনী হইয়া চিতোর দিয়া রাজপুতানায় প্রবেশ করা হইবে এবং আজমীড় জয়পুরের পথ দিয়া ফেরা হইবে।

আগ্রা আমাদের কাছে পুরাতন কিন্তু সেই পুরাতনের মধ্যে চির-নূতন তাজমহল আর একবার না দেখিয়া আগ্রা ত্যাগ করা যায় না, সুতরাং এক রাত্রি বাস করিতেই হইল। পরদিন (১৬ই অক্টোবর) দুপুরে জি, আই, পি মেল ধরিয়া আমরা গোয়ালীয়র রওনা হইলাম।

গোয়ালিয়ার রাজপুতনার বাহিরে, কিন্তু চম্বল নদ পার হইয়া রাজ্যের সীমানার মধ্যে দুইপাশে যে দৃশ্য দেখিলাম তা একেবারে রাজপুতনার মরুভূমির দৃশ্য—কেবল উঁচু নীচু এবড়ো খেবড়ো মাটির স্তূপ, টিলা আর বালিয়াড়ী, দূরে দূরে পাহাড়, গ্রাম লোকালয় বা শস্য-ক্ষেতের চিহ্নমাত্র নাই। ইহার উপর লাইনের দুইপাশে অসংখ্য সরপালের দল মাঠ ঘাট সব ছাইয়া ফেলিয়াছে। মরুভূমি দেখিয়া চক্ষু যখন ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে যেন হঠাৎ দূরে মাঠের মাঝখানে একটা মস্ত পাহাড় দেখা গেল—তার উপর বড় বড় দেওয়াল

জ্যোৎস্নালোকে তাজ

এবং প্রাচীর। অনুমানে বুঝিলাম এই গোয়ালীয়র দুর্গ। তার পরেই 'গোয়ালীয়র কটন্ মিল্‌সের' বিরাট আয়তন—তার সামনে 'বিরলা ব্রাদার্সে'র' নাম জল্‌জল্ করিতেছে। মিল্‌স্ পার হইয়া ষ্টেশন। রেলপথটি দুর্গ বেষ্টন করিয়া শহরে প্রবেশ করিয়াছে।

গোয়ালীয়ারের মধ্যে নূতন এবং পুরাতন দুই শহর; নূতনের নাম 'লস্কর';—অনুমান এক শতাব্দীর মধ্যে এই শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। ষ্টেশনটি ঠিক দুই শহরের মধ্যস্থলে। আগ্রার খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলাম এখানে সাহেবদের হোটেল ছাড়া আর একটি ক্ষুদ্রায়তন হোটেল আছে তার নাম পার্ক হোটেল। আমরা সেখানে গিয়া উঠিলাম। হোটেলটি ষ্টেটের সম্পত্তি। একজন পার্শী ম্যানেজার আছেন, তিনি ষ্টেটেরই কর্ম্মচারী। বাড়ীটি দ্বিতল, অবস্থানটিও সুন্দর। সামনে মস্ত লন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আশ্রয় মিলিল একতলায়—তাও আবার একখানি ঘরের মধ্যে।

গোয়ালীয়ার দুর্গ

চার্জ্জ খুব বেশী নয়। খাওয়া দাওয়ার দুরকম ব্যবস্থা—আমিষ এবং নিরামিষ। তবে আমাদের দেশের তুলনায় খাওয়ার উপকরণ বড় কম।

বিকালে পুরাতন শহর দেখিতে যাওয়া গেল। পাহাড়ের নীচে দিয়া বরাবর পুরাতন শহরের রাস্তা। পাহাড় যেখানে শেষ শহরও প্রায় সেখানে শেষ। শহর প্রায় জনবিরল—ভাঙ্গা-চোরা বাড়ীও অনেক দেখা গেল। এখানকার কীর্ত্তি যা কিছু তা সবই মুসলমান আমলের। জমি মসজিদ নামে মসজিদ এবং দুটি সমাধিমন্দির এখানে দেখিবার মত। তার একটি, মহম্মদ ঘাউস্ নামে এক ফকিরের—তিনি বাবর এবং হুমায়ুন বাদশার সম-সাময়িক ছিলেন। অপরটি, প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনের। ঘাউসের সমাধির মধ্যে রাজপুত পাঠান এবং মোগল তিন যুগেরই স্থাপত্যের নিদর্শন আছে, ভিতরে জাফরীর কাজও সুন্দর, তা' ছাড়া শিল্পকলার আর কোনও চিহ্ন নাই। তানসেনের সমাধিমন্দির, অনাড়ম্বর অনলঙ্কৃত একটি ছোট দালান মাত্র, পুনঃ-সংস্কারের কল্যাণে চূণের প্রলেপে ভারাক্রান্ত। সঙ্গীত-সম্রাটের সমাধিতে সুরজ্ঞানের কোনও পরিচয় পাইলাম না, তার মধ্যে না আছে তান, না লয়, না গমক, না মূর্চ্ছনা। কিন্তু সমাধি যেমনই হউক তানসেনের স্মৃতি তাঁহার ভক্তেরা অন্য ভাবে রক্ষা করিয়াছেন। শুনিলাম শীতকালে এখানে একটি মেলা বসে, তাহাতে দেশ বিদেশ হইতে সঙ্গীতজ্ঞেরা মিলিত হইয়া তিনদিন এখানে সুরের জাল বুনিয়া সঙ্গীতগুরুর স্মৃতির তর্পণ করেন; হয়ত তাঁহাদের সেই সম্মিলিত সঙ্গীতের অশ্রান্ত ঝঙ্কারে বিনিদ্র যোগীশ্বরের যোগনিদ্রা একমুহূর্ত্তের জন্যও ভাঙ্গিয়া যায়। সমাধির পাশেই এক তেঁতুল গাছ—প্রবাদ যে তার পাতার মধ্যে তানসেনের কণ্ঠস্বরের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য সঞ্চিত আছে। ভবিষ্যতে আশা থাকিলেও বর্ত্তমানে এই অম্লরস আস্বাদনের ভরসা আমাদের কাহারো হইল না।

পুরাতন শহর শেষ করিয়া নূতন শহরের মধ্যে যাওয়া গেল। শহরের মধ্যস্থলে 'ফুলবাগ' নামে একটি বাগান—তাহার আশে পাশে রাজপ্রাসাদগুলি। বাগানের মধ্যে পশুশালা আছে, কৃত্রিম বিল আছে, তা'ছাড়া হিন্দুদের

মন্দির, মুসলমানদের মস্‌জিদ, শিখদের গুরুদ্বার এবং থিওজফিষ্টদের জন্ত একটি হল পর্য্যন্ত আছে। এই চারিটি আয়তন দেখিয়া মনে হয় গোয়ালীয়ার সরকারের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিই সমান দৃষ্টি। মন্দিরে রাধামুকুন্দজী বিগ্রহ আছেন,—মারাঠী পোষাকে শ্বেত পাথরের অতি সুন্দর মূর্ত্তি, দেখিলেই তার মধ্যে যথার্থ শিল্পীর হাতের চিহ্ন ধরা যায়, সাধারণতঃ আমাদের বিগ্রহগুলি. যেমন কিম্ভূতকিমাকার হয় সে রকম নয়।

'ফুলবাগের' এক কোণে বর্ত্তমান মহারাজের পিতামহী, মহারাজ মাধো রাওয়ের মাতার এক মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি আছে। রাজ্যের সামন্ত এবং প্রজারা মিলিয়া সেটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্বাধীন রাজ্যে আসিয়া এই প্রথম নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পরিচয় পাইলাম। এই মূর্ত্তির একদিকে 'মতিমহল' নামে সুবিস্তৃত প্রাসাদ-শ্রেণী—এখন তার মধ্যে সরকারী দপ্তরখানা। আর একদিকে একটু দূরে 'জয়বিলাস' নামে বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ। সেদিন সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় এবং পরদিনও সময়াভাবে আমাদের কোনটিই দেখা হয় নাই।

শহর মস্ত বড়। বড় বড় রাস্তা, তার দু'ধারে অট্টালিকা-শ্রেণী, মনে হয় যেন গোয়ালীয়ার রাজ্যে গরীব লোকের বাস নাই। এক প্রান্তে 'মহারাজ-বারা'। সেখানে চৌমাথার উপর মহারাজ জীয়াজীরাওয়ের এক বিরাট মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে। তার চারিদিক ঘেরিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা—ব্যাঙ্ক, হাইকোর্ট, স্কুল, সরকারী ছাপাখানা, বাজার, থিয়েটার হল ইত্যাদি। নিকটে এক ফকিরের সিদ্ধির স্থান, তাহার চলিত নাম 'মনসুর সাহেবের গদি'। এখানে খুব ধুমধামের সহিত মেলা বসে এবং উৎসব হয়।

শহরের মধ্যে আর একটি জিনিষ দেখিবার আছে—সেটি ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী বাইয়ের স্মৃতি-মন্দির—ফুলবাগের কাছেই অবস্থিত। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি কিছুদিন গোয়ালীয়ার দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন এবং পরে এইখানেই ইংরাজ সেনার সহিত যুদ্ধে প্রাণ দেন। তাঁর কোনও মূর্ত্তি নাই, তবু যে একটু স্মৃতিচিহ্ন আছে এই যথেষ্ট।

পরদিন (১৭ই) সকালে আমরা দুর্গ দেখিতে যাত্রা করিলাম। দুর্গের দুইপ্রান্তে দুইটি গেট, একটি পুরাতন শহরের প্রান্তে, আর একটি নূতন শহরের দিকে, অপর প্রান্তে। গোয়ালীয়ার গেটটিই আসল; দুর্গের উপরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যে ছয়টি 'দরওয়াজা' পার হইতে হয় তাহা এই দিকেই। সকলেই গোয়ালীয়ার গেট দিয়া

গোয়ালীয়ার দুর্গে পাহাড়ের গায়ে বৃহত্তম মূর্ত্তি

উঠিয়া লস্করী গেট দিয়া নামেন, আমারও তাই করিব ঠিক করিলাম, কিন্তু বুদ্ধি করিয়া টাঙ্গাগুলি গেটে নামিয়া ছাড়িয়া দিলাম। হোটেলে একজন বলিয়া দিয়াছিলেন, দুই গেটেই অসংখ্য টাঙ্গা মেলে। সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া পরে যে আমাদের কি ঠকিতে হইয়াছিল তা বলিবার নয়! উচিত ছিল টাঙ্গা না ছাড়িয়া অপর গেটে পাঠাইয়া দেওয়া।

যে পাহাড়ের উপর দুর্গ অবস্থিত তাহা ৩০০ ফিট উচু এবং দেড় মাইল লম্বা, আশে পাশে আর পাহাড় নাই। দুর্গের প্রথম তোরণের নাম 'আলেমগীরি দরওয়াজা'। এই একটি দ্বার ছাড়া আর কোথাও মুসলমান নামের সম্পর্ক নাই। দুর্গের ভিতর সবই হিন্দু আমলের রাজপুত তোমার-বংশীয় রাজাদের কীর্ত্তি। পাহাড়ের নীচে প্রথমেই 'গুজারীমহল' নামে প্রাসাদ, এখন এখানে সরকারী মিউজিয়াম স্থাপিত। রাজা মানসিংহের মহিষীর জন্য এই প্রাসাদ তৈরী হইয়াছিল, তাঁর সম্বন্ধে নানা গল্প শোনা গেল। তার মধ্যে প্রধান কথা এই যে, তিনি কুরঙ্গনয়না ছিলেন এবং মৃগয়ার সময়ে রাজা তাঁহাকে দেখিয়া মহিষী করেন।

বৌদ্ধ স্তূপ—সাঁচি

মিউজিয়ামটি বেশ বড়, সংগ্রহও ভালই। গোয়ালীয়ার রাজ্যে প্রাচীন নগরী এবং জনপদের অভাব নাই—চান্দেরী, বাঘগুহা প্রভৃতি এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার এবং ভোপাল রাজ্যের 'আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট' রীতিমত কাজ করেন। প্রাচীন জনপদগুলির বিবরণ এবং প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির অসংখ্য চিত্র এখানে রহিয়াছে দেখিলাম, বাঘগুহার ছবিগুলির বড় বড় অনুকৃতিও কতকগুলি আছে। ভোপাল যাইতে দেখিয়াছি, যে সমস্ত ষ্টেশনে নামিয়া ঐ সব প্রাচীন জনপদে যাইতে হয়, সেখানে বড় বড় সাইনবোর্ডে পথের বিবরণ সব লেখা আছে।

'গুজারী মহল' একটি বিরাট আয়তন, দেখিলে অবাক হইতে হয়। সেখান হইতে বাহির হইয়া 'হিন্দোলা দরওয়াজা' দিয়া ঢুকিয়া দুর্গপ্রাকার বামে রাখিয়া আমাদের বরাবর উপরে উঠিতে হইল। পথ খুব চড়াই নয়—ডানদিকে পাহাড়ের কোলে বড় বড় বাঁধান চৌবাচ্চা আর পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট খোদাই করা মূর্ত্তি। দুর্গের শেষ তোরণ হাতীপোল, তার পরেই মানসিংহের প্রাসাদ 'মানমন্দির'। চারি শতাব্দী পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইলেও মানমন্দির এখনও নূতন মনে হয়। এত বড় প্রাসাদ বড় দেখা যায় না—মধ্যযুগের হিন্দু-স্থাপত্যের নাকি এটি একটি বিরাট নিদর্শন। এর বাহিরের দেওয়াল প্রায় একশত ফিট উচু, তার গায়ে এনামেলের কাজ করা পশুপক্ষীর মূর্ত্তি অসংখ্য। সেইজন্য এর আর এক নাম চিৎমন্দির।

এখানে অপ্রত্যাশিত ভাবে একজন স্বজন লাভ হইল। তিনি প্রাসাদের গাইড—এক বৃদ্ধ—জাতিতে লালা-কায়স্থ। তাঁর কাছে খাবার জল চাওয়া হয়, তিনি জল আনিয়া আমাদের একজনকে ব্রাহ্মণ জানিয়া, ঘটা করিয়া তাঁর পদধূলি লইলেন এবং তার পরে যখন জানিলেন যে, আমাদের মধ্যে কায়স্থও আছেন তখন তিনি নিজের পরিচয় দিয়া আমাকে হঠাৎ এমন করিয়া জড়াইয়া ধরিলেন যে, তাঁর স্বজাতি-প্রীতির অত্যাচারে আমি হাঁপাইয়া উঠিলাম। অতঃপর গাইডের সম্মানিত পদ হইতে তাঁকে আর বঞ্চিত করা গেল না।

গাইড মহাশয়ের ইতিহাসজ্ঞান কিন্তু তাঁর স্বজাতি-প্রীতির মত প্রশংসার যোগ্য নয়। মানমন্দিরের স্থাপত্য

মানসিংহকে তিনি বেমালুম অধরাধিপতি মানসিংহের সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন এবং যেখানে যা কিছু ভাঙা-চোরা দেখা গেল সে সমস্তের জন্য বেচারা আওরংজেবকে দোষী করিলেন। প্রাসাদটি চতুস্তল। দুইটা তল মাটির নীচে এখন চামচিকার বাসস্থান। কক্ষগুলি ছোট ছোট এবং নীচু—বেঞ্চীর ভাগ দেওয়ালে কোনও সাজ সজ্জা নাই, নিতান্তই সাধারণ, তবে দু' একটি দেওয়াল বেশ চিত্রবিচিত্র করা। এই প্রাসাদের পাশে 'করণ প্রাসাদ' নামে আর একটি পুরাতন কীর্ত্তি আছে—তার আকার একেবারে ব্যারাকের মত। সাজাহান এবং জাহাঙ্গীরের আমলেরও দুটি প্রাসাদ আছে এখন তা ষ্টেটের বারুদখানা এবং অস্ত্রাগার—সাধারণের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। মোরাদ এবং অন্যান্য রাজবন্দীরা যেখানে কারারুদ্ধ ছিলেন, সেই সব কক্ষগুলিও এখন আর দেখিতে দেওয়া হয় না।

মানমন্দিরের পর অনেকটা খোলা মাঠ, তার মধ্যে ষ্টেটের জেলখানা এবং অন্যান্য আধুনিক বাড়ী ঘর অনেক আছে। দুর্গের দক্ষিণ দিকে তিনটি প্রাচীন মন্দির—দুটির নাম 'শাশ্‌বহু' তৃতীয়টির নাম 'তেলি কা মন্দির'। শাশবহু মানে শাশুড়ী বৌ, দুটি এক রকম মন্দির পাশাপাশি থাকিলে নাকি এই নাম দেওয়া হয়, রাজপুতানার মধ্যেও শাশবহু মন্দির দেখিয়াছিলাম। বড় মন্দিরটিতে একটি সংস্কৃত লিপি আছে—তাতে জানা যায় একাদশ শতাব্দীতে মহীপাল নামে এক রাজা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রবেশপথেই বিষ্ণুমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে—তাতে মনে হয় এটি বিষ্ণু-মন্দির। মধ্যস্থলে একটি খুব উঁচু হল—বড় বড় স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত—তার চারিপাশে ছোট ছোট গম্বুজওয়ালা কক্ষ। ছোট মন্দিরটি একেবারে দুর্গ-প্রাকারের গায়ে।

তেলি কা মন্দির আরও প্রাচীন—নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। এত উঁচু মন্দির সচরাচর দেখা যায় না—অনেকটা উড়িষ্যা মন্দিরের মত, পিরামিডের আকারে গড়া। তোরণে এক বিরাট গরুড়মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় এটিও বিষ্ণুমন্দির। মন্দিরের প্রাঙ্গণে, আশে পাশে, দেওয়ালে ছোট বড় অসংখ্য মূর্ত্তির ছড়াছড়ি। মূর্ত্তিশিল্পের উপর গোয়ালীয়রের শিল্পীদের খুবই অনুরাগ ছিল দেখিলাম।

দুর্গ হইতে অবতরণের পথে মূর্ত্তিশিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন দেখিলাম তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। লস্করী গেটে পৌঁছিতে হইলে যে গিরিপথ দিয়া নামিতে হয় তার নাম উরওয়াই। দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া এবং বাঁদিকের পাহাড়ের গা বাহিয়া পথটি নামিয়া গিয়াছে—একেবারে খাড়া উৎরাই নয়—বেশ ঢালু এবং প্রশস্ত। পথের মাঝখানে এক তোরণ; সেখান হইতে নীচে গেট পর্য্যন্ত দু'দিকে পাহাড়ের গায়ে ছোট বড় অসংখ্য খোদাই করা মূর্ত্তি। বড় বড় মূর্ত্তিগুলি দণ্ডায়মান,—উলঙ্গ পুরুষ মূর্ত্তি—আদিনাথ, মহাবীর প্রভৃতি জৈনতীর্থঙ্করদের। সকলের চেয়ে বড়টি প্রায় ৫৭ ফিট উঁচু, ২০ হইতে ৩০ ফিট উঁচু মূর্ত্তি ত অগণিত। এগুলি অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন—বাবর শাহ এর কতকগুলি নষ্ট করিয়া দেন শোনা যায়।

নীচে নামিয়া টঙ্গা বা কোনও যান-বাহনের দেখা পাইলাম না। তখন বেলা দুপুর, ভীষণ রৌদ্র, পাহাড়ে ওঠা নামায় সকলেই ক্লান্ত, তার উপর একজন আবার ছিলেন বেতো রোগী। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া অবশেষে হাঁটা আরম্ভ করা গেল এবং প্রায় দু'মাইল রাস্তা হাঁটিয়া তবে দুটি টঙ্গা মিলিল। হোটেলে পৌঁছিলাম তখন বেলা ১টা।

সেদিন রাত্রেই আমাদের গোয়ালীয়র ছাড়িবার কথা, তাই বিকাল বেলা পটারীর কারখানা দেখিতে গেলাম। সহর হইতে দূরে এক সহরতলীতে কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত; আমরা যখন পৌঁছিলাম তখন কারখানার কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং বিশেষ কিছু দেখা গেল না। কারখানার ম্যানেজার, মিঃ মজুমদার বাঙ্গালী। এই সুদূর দেশে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা যে বাঙ্গালী, তা জানিতাম না। কারখানাটি বেশ বড়, মাটি (ক্লে) তৈরী, ছাঁচে ঢালাই, পাত্রগুলিকে শুকান, পুড়ান প্রভৃতি কাজ যন্ত্র সাহায্যে হয়, কিন্তু পাত্রের গায়ে লতাফুল-

পাতা প্রভৃতি আঁকা হাতে হইয়া থাকে। গোয়ালীয়ার ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ সকলে মনোগ্রাম বসান এক একটি চায়ের সেটের অর্ডার দিলাম।

ফিরিবার পথে আর একবার নূতন সহর প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা ষ্টেশনে বসিয়া আসিলাম এবং রাত্রি দশটার ট্রেনে সাঁচী যাত্রা করিলাম। জি, আই, পির গাড়ীগুলি সুন্দর, আটটা বার্থওয়ালা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা এই প্রথম দেখিলাম।

বুদ্ধের জন্মকথা সম্বলিত উত্তর তোরণ
—সাঁচি

সাঁচী

পরদিন (১৮ই) সকাল বেলা 'বীণা জংশনে' গাড়ী বদল করিয়া স্নানাহার সারিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনে বেলা দুপুরে সাঁচী পৌঁছিলাম। মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি আগে হইতে সংবাদ দিয়া রাখিলে সাঁচীতে থামিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদের নামাইয়া দেয়। গাড়ী থামিবার পূর্ব্বেই দূর হইতে একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ায় গাছপালার আড়ালে সাঁচীর স্তূপের তৃণমণ্ডিত গম্বুজের উর্দ্ধভাগ দেখা গেল। তীর্থযাত্রী যেমন দূর হইতে মন্দিরের চূড়া দেখিয়াই তাহার তীর্থযাত্রা সার্থক মনে করে অতীতের এই মহাতীর্থের চূড়া দেখিয়া আমাদেরও তাই মনে হইল।

সাঁচী ভোপাল ষ্টেটের অন্তর্গত একটি সামান্য গ্রাম মাত্র। ইহার অবস্থানটি অতি সুন্দর। ষ্টেশন হইতে অল্প দূরেই পাহাড়, ইহার প্রাচীন নাম চৈত্যগিরি—তার বক্ষে এবং সানুদেশে সাঁচীর স্তূপ এবং অন্যান্য প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি অবস্থিত। পাহাড়ের নীচে বিস্তৃত প্রান্তর, তার একদিকে ভোপাল ষ্টেটের গেষ্টহাউস, আর একদিকে ডাকবাংলা। তিনদিকে পাহাড় এবং পশ্চিম দিকে দুই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে বহুদূরব্যাপী গভীর অরণ্য—ভোপাল সরকারের 'রিজার্ভ ফরেষ্ট'। চতুর্দ্দিক নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, যতদূর দৃষ্টি চলে লোকালয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। সুদূর অতীতে যে জনপদ অগণিত তীর্থযাত্রীর পদশব্দে মুখর হইয়া উঠিত, যে চৈত্যগিরি ভিক্ষুদের বন্দনাগানে নিয়ত ঝঙ্কৃত হইত —এখন তাহা নীরব নিথর; আজও আমাদের মত তীর্থযাত্রী আসে বটে কিন্তু এই শান্ত বনস্থলীর

নীরবতায় তাহাদের কোলাহলের উৎস নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

সাঁচীর ডাকবাংলার কল্যাণে ভ্রমণকারীদের একটা আশ্রয়স্থল আছে বটে কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সংবাদ না দিলে সেখানে খাদ্যদ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বেই এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলাম—তার ফলে ডাকবাংলার চৌকিদার ষ্টেশনে হাজির ছিল। তার কাছে শুনিলাম যে ভোপাল ষ্টেটের কিউরেটর (curator) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষাল মহাশয় সাঁচী আসিয়াছেন এবং গেষ্টহাউসে আছেন। এই বিজন প্রদেশে যে একজন বাঙ্গালীর দেখা পাইব তা' কখনও ভাবি নাই, সুতরাং আগেই গেষ্টহাউসের দিকে যাওয়া গেল। কার্ড পাঠাইতেই এক সৌম্যদর্শন, শুভ্র-কেশ শুভ্রবেশ বৃদ্ধ আসিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং সঙ্গে করিয়া ডাকবাংলাতে লইয়া গেলেন। তিনি ভোপালে বহু-বৎসর আছেন, সেখানকার ষ্টেট কাউন্সিলের সভ্য, সাঁচীর প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি রক্ষার ভার তাঁর হাতে। কাল কয়েকজন পার্লামেণ্টের সভ্য সাঁচী দেখিতে আসিবেন, তদুপলক্ষে তাঁর আগমন। ডাকবাংলায় আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন—কথা রহিল বিকালে তিনি নিজে আমাদের সঙ্গে করিয়া সমস্ত দেখাইবেন। ডাকবাংলায় আর একজন বাঙ্গালী যাত্রী পাওয়া গেল; এই দুইজনের সাহচর্য্যে আমাদের একদিনের সাঁচী-প্রবাস অতি সুখের হইয়াছিল।

যেমন সাঁচীর দৃশ্য-শোভা তেমনি তার জল হাওয়ার গুণ। ডাকবাংলায় বসিয়া দুই তিন গেলাস সাঁচীর জল খাওয়ামাত্র আমাদের সকলেরই ক্ষুধা বাড়িয়া গেল এবং বেলা দু'টার সময়ই চায়ের অর্ডার দিতে হইল। বেলা চারিটার সময় ঘোষাল মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাহাড়ে উঠিবার দুইটি পথ—বেশ বিস্তৃত এবং বরাবর সোপান-সংবলিত। একটি সামনেই, আর একটি একটু দূরে পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে। প্রথম পথের শেষে প্রাচীর ঘেরা বাঁধান অঙ্গন (আগে পাহাড়ের উপর সমস্তটাই প্রাচীর ঘেরা ছিল), তার পরে আর একটু উঠিয়া সাঁচীর প্রধান স্তূপ। শোনা যায়, গত শতাব্দীর প্রারম্ভেও এখানে সতেরটি স্তূপ ছিল, এখন তিনটিতে দাঁড়াইয়াছে। বড় স্তূপটির পাশেই ছোট একটি স্তূপ, আর দ্বিতীয় পথের প্রান্তে তৃতীয় স্তূপটি। ছোট স্তূপটির স্তূপ ছাড়া একটি মাত্র তোরণ অবশিষ্ট আছে, তৃতীয় স্তূপটিরও ভগ্নদশা, কয়েকটি স্তূপের ভিত্তিটুকু মাত্র চেনা যায়। তবে ছোটখাট বালখিল্য স্তূপের সংখ্যা অগণিত।

প্রধান স্তূপটি কিন্তু এখনও ঠিক আছে। সাঁচীর সহিত বুদ্ধদেবের জীবনীর কোনও সংস্পর্শের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না, তবু কি করিয়া যে এই জনহীন পর্ব্বতবক্ষ এত বড় একটা তীর্থস্থান হইয়া উঠিল তার ইতিবৃত্ত লুপ্ত। অশোকের সময়েই কিন্তু সাঁচী-তীর্থের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বড় স্তূপটির দক্ষিণ তোরণের পাশে একটি অশোকস্তম্ভ ছিল, তার বিচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডগুলি এখনও সেখানে পড়িয়া আছে, সিংহমূর্ত্তি-শোভিত শীর্ষটিও মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। স্তূপটি নিরেট—পাথরে গড়া, ইহার চারিদিক ঘেরিয়া বৃত্তাকার প্রস্তর বেষ্টনী বা রেলিং—দুই দুইটি থামের মধ্যে তিনটি করিয়া পাথরের খণ্ড শোয়ান, রেলিং-এর চারিদিকে চারিটি অলঙ্কৃত তোরণ, স্তূপের প্রথম তলের উপর রেলিং ঘেরা প্রদক্ষিণ পথ এবং শীর্ষে ধর্ম্মছত্র। স্তূপের যা যা থাকা প্রয়োজন, তার সমস্ত অংশগুলিই এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে। বাহিরের বেষ্টনী এবং প্রদক্ষিণ পথ অন্ততঃ সুঙ্গ যুগের এবং তোরণ চারিটি অন্ধ্রযুগের কীর্ত্তি বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। অশোকের সময় বোধ হয় এখানে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকের স্তূপ মাত্র ছিল। বেষ্টনীর অনেকগুলি পাথরে প্রাচীন অক্ষরে দাতার নাম উৎকীর্ণ আছে, একটিতে অন্ধ্র রাজা সাতকর্ণির নামও পাওয়া যায়। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য এই অলঙ্কৃত তোরণ চারিটি। তোরণের গায়ে বুদ্ধদেবের জীবনলীলা এবং অনেকগুলি জাতকের চিত্র উৎকীর্ণ আছে, তা'ছাড়া অন্যান্য ঘটনা এবং নরনারী জীব-জন্তুর চিত্রও অসংখ্য। জাতক বা বুদ্ধজীবনীর যত চিত্র আছে তার মধ্যে কোথাও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নাই, প্রায় প্রত্যেক চিত্রেই কোনও না কোনও চিহ্ন বুদ্ধদেবের দ্যোতক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন কোথাও একটি আসন, কোথাও একটি চতুষ্কোণ-চিহ্ন, আবার কোথাও বা তাঁর পদচিহ্ন।

বুদ্ধের জন্ম, মায়াদেবীর উদরে শ্বেত হস্তীর প্রবেশ, বোধিদ্রুম-তলে বুদ্ধদেবের মহাতপস্যা—মারের পরাজয়, বসন্তরা জাতকে বোধিসত্ত্বের পরীক্ষা এবং সর্ব্বস্ব-ত্যাগ, মহাকপি জাতকে কপিদেহে বোধিসত্ত্বের পরার্থে আত্মনিবেদন, বিম্বিসারের বুদ্ধদর্শনে যাত্রা প্রভৃতি চিত্রগুলি অতি সুন্দর। এ সব ছাড়া সাধারণ ঘটনা যেমন মৃগয়া, রাজসভা, শোভাযাত্রা, যুদ্ধ প্রভৃতির চিত্রগুলিও যেন সজীব। মূর্ত্তিগুলির মুখে ক্রোধ, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতি ভাবের ব্যঞ্জনাও চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবজন্তুর মূর্ত্তিগুলি আরও আশ্চর্য্য। চিত্রগুলি যে এককালে বর্ণ সমাবেশে

ভোপালের সাধারণ দৃশ্য

উজ্জ্বল ছিল তার প্রমাণ এখনও বর্ত্তমান, এত শত সহস্র বৎসর পরে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ঘোষাল মহাশয় এই চিত্রগুলির অর্থ পরিচয় সৌন্দর্য্য আমাদের যত্ন করিয়া বুঝাইলেন, তাঁর বর্ণনায় এই সব মূর্ত্তি যেন আবার সজীব হইয়া উঠিল, সাঁচীর শিল্পকলা যেন তাহার অন্তর্নিহিত রহস্যটি আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিল।

সাঁচীর ভাস্কর্য্যকীর্ত্তি বহু শতাব্দীব্যাপী বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমপরিণতি বা অবনতির ইতিহাসও তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে বড় স্তূপটির এক কোণে একটি ছোট গবাক্ষহীন মণ্ডপযুক্ত প্রকোষ্ঠ বা মন্দির সেটি নাকি গুপ্তযুগের কীর্ত্তি স্তূপের দক্ষিণে সপ্তম শতাব্দীর একটি চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ—কয়েকটি স্তম্ভ এবং তার উপর লম্বমান একখণ্ড প্রস্তর মাত্র অবশিষ্ট আছে। ছাদ নাই, দেওয়াল নাই কোনও কারুকার্য্য নাই তবু অতীতের মৌন সাক্ষী এই কয়েকটি প্রস্তরখণ্ডের যেন একটা অপরূপ মহিমা আছে; চারিদিকের ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে এই স্তম্ভগুলি যেন স্তূপের প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। পাহাড়ের পূর্ব্ব প্রান্তে একটু দূরে একটি ভাঙ্গা মন্দির, তার মধ্যে একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি। অনেক পরের যুগের আর একটি ভাঙ্গা মন্দির আছে, তার ভিতরের বুদ্ধমূর্ত্তি ঠিক শিবমূর্ত্তির মত গলায় সাপ জড়ান। এই কয়টি মূর্ত্তি হইতেই বুদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমপরিণতির ইতিহাস বোঝা যায়। একটি মন্দিরের গায়ে দু'একটি মৈথুন চিত্রও দেখা গেল।

সাঁচীর ভগ্নস্তূপের মধ্যে আর উল্লেখযোগ্য একটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ। দুই লাইনে কয়েকটি প্রকোষ্ঠের দেওয়াল

মাত্র অবশিষ্ট আছে—সেগুলি সব পাথরের কিন্তু এত ছোট আর বায়ুচলাচলের রাস্তাশূন্য যে তার মধ্যে লোকে কি করিয়া বাস করিত তা বোঝা কঠিন। আরও একটি চৈত্যের ভিত্তিভূমি এবং থামের অংশগুলি মাত্র দেখা যায়; ঘোষাল মহাশয় বলিলেন যে খুঁড়িয়া তার নীচে কাঠের তৈরী আরও একটি প্রাচীন চৈত্যের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বিহারের নিকটে একটি কক্ষে মিউজিয়াম; তার মধ্যে এখানে সংগৃহীত অনেক মূর্ত্তি, অলঙ্কার, মৃৎপাত্র ইত্যাদি রক্ষিত আছে। মিউজীয়ামের নীচে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ ঘোষাল মহাশয়ের

নিজস্ব, সাঁচীতে আসিলে সাধারণতঃ তিনি সেখানেই থাকেন।

সমস্ত দেখা শেষ করিয়া মিউজিয়ামের ভিজিটার্স বুকে আমাদের নাম ধাম লিখিয়া আমরা তার প্রশস্ত অঙ্গনে বিশ্রামের জন্ত বসিলাম। তখন পশ্চিমের পর্ব্বতমালার অন্তরালে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে এবং গোধুলির ম্লানিমা ধূসর পর্ব্বতবক্ষ ও নিস্তব্ধ বনভূমির উপর ধীরে ধীরে একটি সূক্ষ্ম ছায়াময় আস্তরণ বিছাইয়া দিতেছে। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন বিশ পঁচিশ বৎসর আগে সাঁচীর এ অবস্থা ছিল না। তখন গিরিবক্ষ অরণ্যসঙ্কুল ছিল, স্তূপ এবং মন্দিরগুলির উপর মাটির স্তর পড়িয়াছিল এবং তাতে গাছপালা জন্মিয়া প্রাচীন কীর্ত্তিগুলিকে প্রায় লুকাইয়া ফেলিয়াছিল। ভোপাল দরবারের আগ্রহে স্যার জন মার্শাল এই লুপ্ত কীর্ত্তি উদ্ধারের ভার লইয়াছিলেন—তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন ঘোষাল মহাশয়। এখন সমস্ত সুসংস্কৃত, কোথাও তৃণটি পর্য্যন্ত জন্মিবার উপায় নাই, অরণ্যের স্থলে এখন ফুলের বাগান শোভা পাইতেছে, সংস্কার করিয়া প্রাচীন মন্দির-গুলিকে যতদূর সম্ভব পূর্ব্বাবস্থায় রাখা হইয়াছে, সমস্ত কীর্ত্তিগুলি পরীক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদের ইতিহাস উদ্ধার করা হইয়াছে। এ সমস্ত ঘোষাল মহাশয়ের চোখের উপর ঘটিয়াছে। ১৯১৩ সালে স্যার জন মার্শাল তাঁর কার্য্য শেষ করিয়া সাঁচীর ভার ঘোষাল মহাশয়ের হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তিনিও যক্ষের ধনের মত এগুলি আগলাইয়া আছেন। শুধু কর্ত্তব্যানুরোধে নয়, ভদ্রলোক সাঁচীকে সত্যই প্রাণের সহিত ভালবাসেন। তাঁর দেখা না পাইলে আমাদের সাঁচী দর্শন বৃথা হইত।

সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমা। সভাভঙ্গ করিয়া আমরা যখন উঠিলাম তখন পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় সাঁচী গিরিবক্ষ প্লাবিত, সম্মুখে স্তূপশীর্ষে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হইয়া এক স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করিয়াছে, দূরে অরণ্য-প্রান্তর-গিরিমালা চন্দ্রালোকস্নাত হইয়া এক মহাসুষুপ্তির ক্রোড়ে অঙ্গ মেলিয়া দিয়াছে। এই স্বপ্নলোকের নিস্তব্ধতার মধ্যে আমরাও মুহূর্ত্তের জন্ত সেই সুদূর অতীতের স্বপ্নে বিভোর হইয়া গেলাম। মনে হইল একদিন অগণিত তীর্থযাত্রীর কলরবে এই গিরি মুখরিত হইত, বৌদ্ধ উপাসকের বন্দনাগানে ইহার চৈত্য নিত্য প্রতিধ্বনিত হইত, বৌদ্ধ ভিক্ষুর শাস্ত্রালোচনায় ইহার বিহার নিত্য স্পন্দিত হইত। ধনী এখানে তার ধনরত্ন একদিন অকাতরে বিতরণ করিয়াছে, রাজা তার রাজশক্তি প্রত্যাহার করিয়াছে, জ্ঞানী জ্ঞানের সাধনা করিয়াছে, শিল্পী তার সমস্ত শিল্পকলা ইহার পদতলে নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়াছে। তার পরে কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে, অন্যধর্ম্ম অন্য রাজশক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে, কত প্রাচীন কীর্ত্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এর মধ্যে সাঁচী যে এখনও বাঁচিয়া আছে এই এক পরম বিস্ময়।

সে রাত্রি ডাক বাংলায় খাওয়া দাওয়া করিয়া আমরা ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে শুইয়া কাটাইয়া দিলাম। পরের দিন ভোপাল যাত্রা। ঘোষাল মহাশয় রাস্তাঘাট সমস্ত বলিয়া দিলেন, একজনের নামে পরিচয় পত্রও দিয়া দিলেন। আমরা জয়পুরে যাইব শুনিয়া সেখানকার শাসন পরিষদের সদস্য এক বন্ধুর নামেও একখানি চিঠি দিলেন। একদিনের আলাপে ভদ্রলোক আমাদের যে সাহায্য আর উপকার করিলেন। তা কম নয়। হয়ত আর কখনও তাঁর দেখা পাইব না, কিন্তু সাঁচী-গিরিবক্ষে এই শুক্ল সন্ধ্যাটির মত তাঁর কথা চিরকাল মনে থাকিবে।

ভোপাল

পরদিন ১৯শে ভোরের এক্সপ্রেসে আমরা ভোপাল যাত্রা করিলাম। ভোপাল সাঁচী হইতে মাত্র ২৪ মাইল, দুই ঘণ্টার পথ। সমস্ত রেলপথটাই পাহাড় এবং গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া অতি চমৎকার দৃশ্য। আমাদের প্রোগ্রাম ছিল দিনে দিনেই ভোপাল দেখা শেষ করিয়া বিকালে উজ্জয়িনী রওনা হইতে হইবে, সুতরাং ষ্টেশনের বিশ্রামাগারেই আশ্রয় লইলাম। ওয়েটিংরুমে থাকা এবং রিফ্রেশমেন্টরুমে খাওয়া কয়দিন এই ভাবেই চলিয়াছিল।

ভোপাল নগরের প্রতিষ্ঠাতা নাকি রাজা ভোজ নামে এক হিন্দু নৃপতি, তাই নামের প্রকৃত উচ্চারণ ভোপাল, ভূপাল নয়। শহরটি খুব ছোট কিন্তু অতি সুন্দর।

এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুবিস্তৃত রাজপথ খুব কমই দেখা যায়। শহরের এক প্রান্তে দুটি প্রকাণ্ড হ্রদ, মাঝে একটি পোল আছে, কিন্তু পোলের নীচে দিয়া হ্রদ দুটি পরস্পর সংযুক্ত। হ্রদের দুই পাশে পাহাড়ের মত উঁচু টিলাভূমি—তার উপর শহরের সব ঘর বাড়ী। পাহাড়ের আবার নানা স্তর আছে—কোনটা উঁচু, কোনটা নীচু—সুতরাং বাড়ীগুলি এবং সম্মুখস্থ রাজপথেরও নানা স্তর, একসারি বাড়ী উপরে আর এক সারি তার নীচে। একদিকের পাহাড় হইতে আর একদিকে চাহিলে এই অট্টালিকার বিভিন্ন স্তর সুন্দর বোঝা যায়। প্রকৃতি দেবী ভোপাল শহরকে যে সৌন্দর্য্যদান করিয়াছেন মানুষ তার অমর্য্যাদা করে নাই।

ভোপালের হ্রদের দৃশ্য

ভোপাল রাজ্যটি ছোট কিন্তু করদ রাজ্যের মধ্যে সকল বিষয়ে উন্নত এ রকম কমই আছে। এখানে প্রজা-সাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত শাসন-পরিষদ আছে, শিক্ষার জন্য ভোপাল সরকার প্রচুর খরচ করিয়া থাকেন এবং শুনিলাম সম্প্রতি এখানে বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব বেগমসাহেবার শিক্ষার জন্য অজস্র দানের কথা ত সকলেই জানে। ভোপাল রাজ্যের নিয়ম—নগরের জ্যেষ্ঠ সন্তান—পুত্রই হউন বা কন্যাই হউন—রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। গত শতাব্দীতে সেই জন্য পর পর চারিজন বেগম রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান নবাব সাহেবের জ্যেষ্ঠ সন্তানও কন্যা সুতরাং আবার হয়ত বেগমের হাতে রাজ্যভার ফিরিয়া আসিবে।

দুপুর বেলা ঘোষাল মহাশয়ের চিঠি লইয়া আমরা হামিদিয়া পুস্তকাগারে দর্শন দিলাম—চিঠি ছিল সেখানকার অধ্যক্ষের নামে। এ পুস্তকাগারটি ঘোষাল মহাশয়ের চেষ্টাতেই হইয়াছে। মধ্যে বেশ বড় একটি হল, সেখানে শাসন পরিষদের অধিবেশন হইয়া থাকে। পুস্তকাগারের সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হাতে লেখা কোরানের রাশি—কোনটি কোষ্ঠীপত্রের আকারে গাঁথা, কোনটি অতি ছোট কৌটার আকারের বই, কতকগুলি নানা লতাপাতা ছবি আঁকা; একটি আবার দেখিলাম একখণ্ড কাগজে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে পুষ্পগুচ্ছের আকারে লিখিত। সম্রাট আওরংজেবের হাতে লেখা একটি কোরাণও সংগ্রহের মধ্যে আছে।

পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ আমাদের খুব খাতির করিলেন এবং সঙ্গে একজন গাইড দিয়া দিলেন। না দিলেও অবশ্য ক্ষতি ছিল না, কারণ যিনি আসিলেন তাঁর এ কাজে কোনও যোগ্যতার পরিচয় আমরা পাই নাই। আমরা ঘণ্টা হিসাবে টঙ্গা ভাড়া করিয়াছিলাম, টঙ্গাওয়ালারা আমাদের সব দেখাইতে চায় কিন্তু গাইড্ তাতে রাজী হ'ন না। সমস্ত রাস্তাটা দুই পক্ষে ঝগড়া লাগিয়াই রহিল এবং প্রত্যেক মোড়ের মাথায় গন্তব্যস্থানের রাস্তা ঠিক করিতে

আমাদের কম বেগ পাইতে হইল না, কারণ সোজা রাস্তা যে কোন্ দিকে সে সম্বন্ধে দুই পক্ষে প্রচণ্ড মতভেদ। আমরা প্রথম দুর্গ দেখিতে গেলাম—অবশ্য গাইড্ মহাশয়ের অনভিমতে। প্রথম দ্বার পার হইয়া এক মাঠে পড়িলাম সেখানে সব কামান সাজান! গাইড্ বলেন আর অগ্রসর হওয়া নিষেধ, টঙ্গাওয়ালা বলে—না। যাহোক্ শেষে তিনি ভিতরে গিয়া জানিয়া আসিলেন যে এক টাকা করিয়া দর্শনী দিলে দুর্গাধ্যক্ষের অনুমতি মিলিতে পারে কিন্তু দুর্গাধ্যক্ষই অনুপস্থিত। যারা গোয়ালীয়ার দুর্গ দূর হইতে নমস্কার জানাইয়া ফিরিলাম। অতঃপর পুস্তকাগারের সম্মুখের রাস্তা দিয়া নূতন রাজ-প্রসাদের দিকে যাওয়া গেল। এই দিকটি অতি সুন্দর। পাহাড় ঢালু হইয়া নামিয়াছে—তাহারই গায়ে গায়ে স্তরে স্তরে সজ্জিত অট্টালিকার রাশি। এই পথে ভোপালের হাইকোর্ট, রেভিনিউ কোর্ট, ইঞ্জিনীয়ারীং আফিস প্রভৃতি বড় বড় বাড়ী পড়ে। ঘোষাল মহাশয়ের বাঙ্গলাও এই পথে।

নূতন প্রাসাদের নাম রাহাৎ মহল—বর্ত্তমান নবাব সাহেব সেখানে থাকেন। কাছেই আর একটি প্রাসাদে

ভোপালের একটি রাজপথ

দেখিয়াছে, চিতোর দুর্গ দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছে তাদের কাছে ভোপাল দুর্গ ত তুচ্ছ; কে আবার তার জন্য টাকা খরচ করে, সুতরাং টঙ্গাওয়ালার নীরব ধিক্কার বহন করিয়া আমরা আবার টঙ্গায় উঠিলাম।

দুর্গটি হ্রদের উপরেই—ভিতরে না যাওয়া গেলেও পাশের একটি ঘাট হইতে তার বাহিরটি দেখা গেল। ঘাটের কাছে কয়েকটি প্রাচীন প্রাসাদ নগুরখানা ইত্যাদি আছে। গাইড্‌কে সেখানে যাইতে বলিলে শুনিলাম প্রাসাদের ভিতরে যাওয়া নিষিদ্ধ। তবে আর উপায় কি, বেগম-মাতা বাস করেন। প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ নিষেধ কিনা তা লইয়া আবার গাইড্ ও টঙ্গাওয়ালার মধ্যে ভীষণ মতভেদ, অবশেষে গাইডের পরাজয়। আমরা টঙ্গা বাহিরে ছাড়িয়া ভিতরে ঢুকিলাম, গাইড মহাশয় বলিলেন প্রাসাদের বাগান এবং বাহিরটা দেখা নিষিদ্ধ নয়। বাগান যা দেখিলাম তা না দেখিলেই ভাল ছিল। বিশুষ্ক লতাবিতান আর শূন্য পুষ্পবীথির দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সেই দুপুরের রৌদ্রে দীর্ঘ কাঁকরের পথ পার হইয়া ভাবী বা ভূতপূর্ব্ব বাগানের শোভা কল্পনা-নেত্রে উপলব্ধি করিয়া লওয়া গেল মাত্র। প্রাসাদের

বাহির যা দেখা গেল তাও বিশেষ কিছু নয়—তবে ভিতরে কি আছে কে জানে। পনের মিনিটের মধ্যেই বাহির হইয়া আসাতে টঙ্গাওয়ালারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল—কিন্তু তাদের নীরব অপেক্ষা এতক্ষণে আমাদের গাসহা হইয়া গিয়াছিল।

ভোপালের দুটি প্রাচীন পল্লী আছে—একটি সাজাহানাবাদ আর একটি জাহাঙ্গীরাবাদ। সাজাহান নামে এক বেগম ছিলেন—সাজাহানবাদ তাঁরই নামের সহিত জড়িত। এখানে তাজউল মসজিদ নামে তাঁর একটি অসম্পূর্ণ কীর্ত্তি আছে। মসজিদটি শেষ হইলে নাকি ভারতের বিরাটতম মসজিদ হইবে। তার মিনারগুলির যা আকার দেখিলাম তাতে তা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

জুম্মা মসজিদ্—ভোপাল

এ পর্য্যন্ত আমরা হ্রদের এপারেই ঘুরিতেছিলাম—অতঃপর ওপারে যাওয়া গেল। দুই হ্রদের মাঝখানে যে পোল আছে সেখান হইতে শহরের দৃশ্য অতি সুন্দর। বাঁদিকের হ্রদটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছে—তার শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ডানদিকের হ্রদের একতীরে অট্টালিকার রাশি—আর তীরে কেবল পাহাড় আর তার শীর্ষে সিম্‌লাকোঠি নামক প্রাসাদ; সম্মুখে হ্রদের প্রান্তে উন্মুক্ত বহুদূরব্যাপী প্রান্তর।

পোলের অপর পারে পুরাতন দুর্গ এবং দু'একটি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। শুনিলাম এই দুর্গ এবং অট্টালিকা ভোপাল যখন হিন্দু রাজপুতরাজার অধীন ছিল তখনকার আমলের। দুর্গের প্রাচীরটুকু মাত্র আছে। এখান হইতে ডানদিকে চার মাইল দূরে সিম্‌লাকোঠি প্রাসাদ—পাহাড়ের গা বাহিয়া বরাবর সুন্দর রাস্তা আছে। রাস্তাটির চারিদিক ফাঁকা—বাড়ী ঘর নাই, বাঁদিকে কেবল শিলার রাশি, পাহাড় জঙ্গল পর্য্যন্ত নাই। যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম—পথের বেঁক হইতে নীচে তীরের গাছপালার ফাঁকে নীলসলিলা সৌধমেখলা হ্রদের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। সিম্‌লাকোঠিতে দুটি প্রাসাদ—একটিতে নবাব সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রেরা থাকেন, আর একটি গেষ্ট হাউসের মত। আমাদের গাইড্ মহাশয় এতক্ষণে তাঁর গুণের কিছু পরিচয় দিলেন,—আমরা জিজ্ঞাসা করিতেই জানাইলেন যে গেষ্ট-হাউসের ভিতরে যাইতে কোনও বাধা নাই। বাড়ীটি বেশ সাজান গোছান, নবাব সাহেবের পরলোকগত বড় ভাই এখানে থাকিতেন। সুন্দর বাগান ফোয়ারা সব আছে—আর হ্রদের দিকে বসিবার জন্য সুন্দর মার্বেলের চবুতরা আছে।

ফিরিবার সময় আর পোলের উপর দিয়া না আসিয়া বাঁদিকের হ্রদের তীর ধরিয়া চলিলাম। এদিকে অনেকগুলি বড় বড় সরকারী বাড়ী আছে—মিন্টো-হল, লালকুঠি, গেষ্ট হাউস্ প্রভৃতি। মিন্টোহল এখন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের আপিস। হ্রদটিকে বেষ্টন করিয়া আর এক পোল দিয়া এপারে পৌঁছিলাম। এখানে সুন্দর একটি বাগান আছে—রাস্তা হইতে অনেক নীচে। তার এককোনে হ্রদ হইতে জল নামিয়া চমৎকার একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। বাগানের পাশ দিয়া ষ্টেশনের রাস্তা। গাইড্ মহাশয় ভদ্রতা করিয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত গেলেন এবং আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। পাঁচটার সময় ট্রেন ছাড়িল, বর্তমানের রাজ্য ছাড়িয়া এবার প্রাচীনের উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা। (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি সরকার

ভাই-ফোঁটা

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বর্ম্মা

শীতের মিঠে কড়া রোদে পিঠটি দিয়ে শুয়েছিলেন বাড়ীর বর্ষীয়সী গৃহিণী কণপ্রভা দেবী। শিয়রদেশে বসে শিউলী তাঁর পাকা চুল তুলে দিচ্ছিল।

শোনা যায় গোবরেও পদ্মফুল ফোটে।

বাংলার কোন এক অখ্যাত পল্লীর এক দরিদ্র কৃষক কৈবর্ত্তের ঘরে জন্মেছিল শিউলী। পাঁচ বছর বয়সে নিজের রূপের জোরেই পাশের গ্রামের অবস্থাপন্ন হারুমণ্ডলের পুত্রবধূর আসন দখল করতে পেরেছিল সে; কিন্তু মানুষের সকল ইচ্ছাই বিফল ক'রে, সাত বছরে বিধবা হ'য়ে আবার সে পিতৃগৃহেই ফিরে এসে তার ছেড়ে যাওয়া ধুলাখেলার সংসারে মন দিল।

এরই বছরখানেক বাদে, পিতৃহীন হয়ে, নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মধ্যে দিয়ে শীতের এমনই এক ম্লান মধ্যাহ্নে এই বাড়ীর প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছিল সে।

কণপ্রভা দেবী তার সুন্দর মুখের করুণ কাহিনী শুনে করুণা বিগলিত চিত্তে, কন্যা স্নেহেই তাকে বুকের মাঝে টেনে নিয়েছিলেন।

—সে আজ প্রায় এক যুগের কথা।

এর পর থেকেই তার উন্নত জীবনের আরম্ভ।

বাড়ীর মেয়েদেরই মত সে সমানাধিকারে স্নেহের দাবী ক'রে এসেছে, তাদেরই মত শিক্ষাও লাভ করেছিল, তাই উন্নত সমাজের উচ্চ সভ্যতা এবং মার্জ্জিত রুচির ভিতর তার শৈশবের অতি সাধারণ জীবনস্মৃতিটা প্রায় বিলুপ্তই হ'য়ে গিয়েছিল।

সে যে এ বাড়ীর কেউ নয়, ভাগ্যের তীক্ষ্ণ কুঠার তাকে ছিন্ন ক'রে এনে এই পরিবারের অতিকায় স্নেহদ্রুমে যুক্ত ক'রে দিয়েছে—সে কথা আজ বাড়ীর কেউ ভাবে না, সেও না।

"মা, ওমা!" ব'লে চীৎকার ক'রে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করল শৈবাল গৃহিণীর কনিষ্ঠ পুত্র। সুন্দর গঠন বয়স বোধ করি বিশের মধ্যেই।

শিউলী গৃহিণীর নিমীলিত-নেত্র মুখের দিকে বারেক তাকিয়ে নিয়ে মাথা তুলে বলল, "এই চুপ! ষাঁড়ের মত চেঁচাতে হবে না। মা ঘুমুচ্ছেন।"

শৈবাল কণ্ঠে আরও জোর দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "বারে! আমার এক্ষনি যে টাকার দরকার।"

শিউলী ঝঙ্কার দিয়ে বলল, "একটুখানি দেরী করতে পারছ না? বুড়ো মানুষ সারাদিন খেটে একটু জিরোচ্ছেন।"

শৈবাল হাত পা নেড়ে ব'লে উঠ্‌ল, তোমার আর গুরোগিরি না কি বলে ছাই—"হঠাৎ সে থেমে প'ড়ে কণ্ঠস্বরটাকে অত্যন্ত মৃদু ক'রে বলল, "দিবি ভাই শিলাদি গোটা দুয়েক টাকা তোর কাছ থেকে?"

শিউলী শৈবালের চেয়ে প্রায় বছর খানেকের বড় ছিল ব'লে প্রয়োজন মত তাকে দিদি ব'লে সম্বোধন করতে সে কুণ্ঠিত ছিল না।

শিউলী তার সুর পরিবর্ত্তন দেখে হেসে ফেলে বলল, "কিন্তু দুটো যে হ'বে না ভাই, আমার কাছে একটা আছে; হয়ত দিই—"

তার কথা শুনে শৈবাল ঝ'লে উঠল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, "তোর কাছে ত কোন দিনই থাকে না! মাসে মাসে যে টাকাগুলো দেয়, কি হয় শুনি?"

না পেলে এমনই আক্রোশ প্রায়ই শিউলীর উপর দেখা দিত, তাই সে মুখ টিপে হেসে উত্তর দিল, "সে খোঁজে তোর দরকার কি? তোকে দিতে ত দেন না। বেহায়া না হ'লে মনে থাকত সে টাকাগুলোর প্রায় সবকটাই তোরই পকেটে গেছে।"

কথাটা সত্য; শৈবাল নিজেও তা জানত তাই লজ্জিত হ'য়ে পড়ল। কিন্তু মুখে তা স্বীকার না ক'রে, ভারী গলায় বলল, "বেশ, বেশ! তোর টাকা যদি আর কখনও নিই—ভারি ত টাকা—তায় আবার খোঁটা দেয়!—তবু যদি নিজের হ'ত!" ব'লেই কণ্ঠে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে

চীৎকার ক'রে উঠল, "মা, ওমা! বাবাঃ! কি ঘুম! গলা চিরে গেল তবু চোখ খুলবে না?"

তন্দ্রাতুর চোখ দুটো জোর ক'রে টেনে একটু মেলে কণপ্রভা দেবী জড়িত কণ্ঠে বললেন, "কি হ'য়েছে খোকা, চেঁচাচ্ছিস কেন?"

শৈবাল বলল, "বারে, এক ঘণ্টা ধ'রে ডাকচি! শিগ্‌গীর তিনটে টাকা দাও!"

চাবি বাঁধা আঁচলটা শিউলীর দিকে ফেলে দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে গৃহিণী বললেন, "শিউলী, খুলে দিগে ত মা!"

চোখ দুটো আবার তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে গেল।

শিউলী কৃত্রিম গম্ভীর কণ্ঠে জানাল যে সে পরের মেয়ে, বাক্সে হাত দেবে না; যার ইচ্ছে হবে, সে নিজে নেবে।

শৈবাল বিস্মিত সুরে ব'লে উঠল, "বারে! কখন বললুম পরের মেয়ে।"

"না বলেছ, নাই বলেছ; আমি প্রমাণ করতে মোটেই রাজী নই।"

কথা শেষে সে অত্যন্ত মনোযোগের ভঙ্গীতে কণপ্রভা দেবীর মাথার উপর ঝুঁকে পড়ল।

শৈবাল হাত যোড় ক'রে মিনতি-মাখা স্বরে বলল, "লক্ষী দিদিটি, ওঠ! আচ্ছা, বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে যাব। —'পিকচার প্যালেসে' যা ভাল বই—"

তার ভঙ্গী দেখে শিউলী আর হাসি চেপে রাখতে পারল না। খিল খিল ক'রে হেসে উঠে বললে, "হয়েছে, হয়েছে! আর কতকগুলো নির্জ্জলা মিথ্যা ব'লে খোসামোদ করতে হবে না!"

শৈবাল কণ্ঠ স্বরটাকে যথাসম্ভব নিম্ন ক'রে হাতের ইঙ্গিতে বলল, "তিনটে চারটে যা হয়—"

চাবির গোছাটা আঁচল থেকে খুলে নিতে নিতে শিউলী চোখ তুলে কৃত্রিম কণ্ঠে ধমক দিল "চোপ! আবদার ছেলের ক্রমেই বাড়ছে বুঝি! মাকে তিনটে ব'লে—"

শৈবাল করুণ কণ্ঠে বলল "লক্ষীটি, মাকে বলবি তিনটেই দিয়েছিস—"

শিউলী ঘাড় নেড়ে বলল, "বারে দুষ্টু ছেলে! বেশ মতলব! শেষকালে চুরির বোঝাটা আমার ঘাড়েই পড়ুক আর কি?"

ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এমনই ভাবে শৈবাল ব'লে উঠল "তা পড়ুক গে! মা তোকে ত আর কিছু বলবে না।" ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে, বাইরে থেকে হাঁক দিল, "শিলাদি, অমনি পান আর জল একগ্লাস নিয়ে আসবি।"

শিউলী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "পারব না বাপু, আমি তোমার রাজ্যের ফরমাস খাটতে! তোমার কেনা বাঁদি নাকি? আর কাউকে দু'চোখে দেখতে পান না—"

পান আর জল নিয়ে শৈবালের ঘরে প্রবেশ ক'রে শিউলী দেখল সে তখন ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়োচ্ছে।

জলের গ্লাসটা টেবলের উপর নামিয়ে রেখে শিউলী জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে বাবুর?"

চিরুণীটা ফেলে দিয়ে গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুলটাকে প্লেন করতে করতে শৈবাল গম্ভীর বদনে বলল, "কনে দেখতে।"

শিউলী চোখ রাঙিয়ে শাসনের ভঙ্গীতে ব'লে উঠল, "চোপ্! বড় সভ্য হচ্ছ লেখা পড়া শিখে দিন দিন, না? বড় বোনের সামনে যা তা বলবে—!"

শৈবাল বাধা দিয়ে বিদ্রুপপূর্ণ কণ্ঠে বলল, "দোহাই শিলাদিত্য দি গ্রেট তোমার সব মানতে রাজী আছি শুধু ওই সময় অসময়ে খুঁড়িয়ে বড় বোন হওয়ার দাবীটা ছাড়া—"

শিউলী ক্ষোভের ভানে বলল, "পরের মেয়ে ব'লেই একথাটা বলতে পারলি; নিজের বোন হ'লে চাবকে লাল ক'রে দিত—"

সত্য মিথ্যা যাই হোক, 'শিউলী পরের মেয়ে' এই কথাটায় শৈবাল বরাবরই ব্যথা পেত। এখনও আঘাতে তার চোখ দুটো অকস্মাৎ সজল হ'য়ে উঠল কিন্তু একটা পাল্টা প্রতিশোধের জন্য কণ্ঠে জোর ভ'রে ব'লে উঠল, "তোকে দিদি বলার চেয়ে বেত্রাঘাত করা উচিৎ—"

শিউলী চোখ মটকে বলল, "তাই নাকি? কিন্তু বলছি আমার সঙ্গে বিবাদ ক'রে সুবিধা হ'বে না—তখন—"

শৈবাল চট্ ক'রে ডান হাতখানা সোজা মাথার উপর তুলে ধরে বলল, "বাপরে! তোমার সঙ্গে War declare? তুমি কচ্ছ শিলাদিত্য—পুলকেশী দি সেকেণ্ড্! আচ্ছা truce?"

শিউলী ঝরণা ধারার মত মিষ্টি হাসিতে মিথ্যা কলহের যত কিছু গ্লানি ভাসিয়ে দিয়ে বলল, "আচ্ছা রাজী! কিন্তু তুই ফিরবি কখন? সাড়ে ন'টায়—মনে আছে?"

"খুব!" ব'লে শৈবাল ঘর ছেড়ে চ'লে গেল।

গুন-গুন ক'রে গান করতে করতে শিউলী শৈবালের অযত্নে স্তূপ বই খাতা পত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল। এমন সময় কলকণ্ঠে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে চঞ্চল হরিণ শিশুর মত শৈবালের ছোট ভগ্নী নীরা দৌড়ে এসে শিউলীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে আনন্দ চপল কণ্ঠে বলল, "জানিস্ শিলাদি, গানে আজ ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছি—"

শিউলীর মুখটা হর্ষোজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। সস্নেহে নীরার মাথাটা বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বলল, "সত্যি আমার বক্‌সিস্‌টা কিন্তু ভাই দিস্!"

নীরা তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল "সত্যি শিলাদি, এ গৌরবের সবখানিই ধরতে গেলে তোরই পাওয়া উচিত যা পাকা গুরুমশাই তুই!—আজও ত বুড়ী টিচার বলছিলেন 'নীরার গলা হ'য়েছে অনেকটা শেফালিকার মত, তবে তার গলাতে কাজ আরও বেশী'। জানিস—আমার শিলাদির গান এখনও তাঁদের কানে লেগে আছে।"

আত্মপ্রশংসায় শিউলীর মুখটা লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। এ প্রসঙ্গটা থামিয়ে দেবার জন্য তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌ল, "হয়েছে, হয়েছে, তোর শিলাদির গুণের ব্যাখ্যাটা রেখে কাপড় জামা ছাড়্‌গে—"

খবরটা অন্য সকলের কাছে দেবার জন্য চঞ্চল চরণে নীরা ছুটে বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেল শিউলীর মনের প্রফুল্লতাটুকু।

পথের ধারের জানালার একটা গরাদ ধ'রে সে দৃষ্টি দুটি প্রসারিত ক'রে দিল বহুদূরে। তার মানস পটে ফুটে উঠ্‌ছিল অতীত দিনের কয়েকটা জীবন স্মৃতি।

—সেও স্কুলে পড়ত, কত প্রাইজ, কত প্রশংসায় নিত্য তার বুক এবং ঘর ভ'রে উঠ্‌ত। কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ করার পর অত্যন্ত অকস্মাৎই—একদিন সে বেঁকে বসল 'আর পড়বে না'। এইখানেই তার পাঠ্য জীবনের সমাপ্তি। এরপর স্পষ্ট আর কিছুই তার মনে পড়ে না; এ বাড়ীর নিত্যকার ঘটনা স্রোতের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে, স্বতন্ত্র সত্ত্বা কিছু নেই।

একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস তার বুক খালি ক'রে বেরিয়ে এল।

সহসা তার চমক ভাঙ্গল নীচে থেকে গৃহিণীর উচ্চ আহ্বানে "শিউলী, ও শিউলী, হতভাগী গেল কোথায়?"

শিউলী দ্রুতপদে নীচে নামতেই, গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন, "নবাব পুত্রী ছিলে কোথা? বড়িগুলো যে কাকে সব খেয়ে গেল, তুলবে কে?"

শিউলী তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, "আমি ভিন্ন আর লোক নেই বুঝি? পরের মেয়ে ব'লে দাসী বাঁদীরও অধম ক'রে খাটাতে হয়, না?"

গৃহিণী স্তম্ভিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। "তাই বুঝি আমি বলছি রে?"

শিউলী তেমনই ভাবে জবাব দিল, "না, তা বলবে কেন? আমি হতভাগী, নবাব পুত্রী! কেন নিজের মেয়েরা তুলতে পারে না?"

"নীরা এক্ষনই রাজ্যের নরলোক ছোঁয়াছুঁই ক'রে আসছে, ও বড়ী তুললে আমি খাব?"

শিউলী উত্তর দিল, "কেন বড়দিও ত পারে।"

গভীর বিস্ময়ভরে গৃহিণী কতক্ষণ তার মুখের পানে তাকিয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "তোর আজ হ'ল কি শিউলী? ধীরা ভাঁড়ারের কিছুতে হাত দেয়?"

শিউলী তা জানত এবং এও জানত তার উপর গৃহিণী এবং বাড়ীর সকলের একান্ত নির্ভরতার কথা। তথাচ নিজের জেদটা রাখবার জন্যই সে কৃত্রিম ক্রুদ্ধকণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল, "কেউ কিছু করবে না, যত বুঝি কেবল আমার ঘাড়ে। আমি পারব না তা ব'লে রাখছি বাপু।" আমাকে তাড়িয়েই না হয় দাও।"

গৃহিণী এবার হেসে ফেলে বললেন, "আচ্ছা সে হবে' খন পাগলী! পরামর্শ ক'রে ডাকবার একটা কারণ ত বের করতে হবে।"

শিউলীও হেসে ফেলে গর্‌ গর্‌ করতে করতে বড়ীর ডালাটা তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

দুই

দুপুর বেলা হাতে একখানা বই নিয়ে শৈবাল বিছানায় প'ড়ে ছিল। শিউলীকে দ্বার ঠেলে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই, হাতের বইখানা তাড়াতাড়ি সে বালিশের তলায় রেখে দিয়ে পাশ থেকে আর একখানা বই তুলে নিয়ে অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে পড়া সুরু করল।

আসল ব্যাপারটা বুঝতে শিউলীর বাকি রইল না; শৈবালের মাথার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল, "কি বই পড়া হচ্ছিল শুনি? লুকোলি কেন?"

মুহূর্ত্তের জন্ত শৈবালের মুখটা লাল হয়ে উঠ্‌ল; কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে সে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়ার ভাণ ক'রে বইএর পাতায় তাকিয়ে রইল। শিউলীর প্রশ্নটা যে তার কানে গেছে, তার মুখ দেখে এমন কোন লক্ষণই বোঝা গেল না।

শিউলী কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয়। তাড়া দিল; "দেখি না কি বই? নইলে এক্ষণি—"

শৈবাল বইএর পাতা থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে, বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে বলল, "কি পড়বার সময় খালি খালি বিরক্ত করিস"—

বালিশটা ঠেলে বইখানা বার করে নিয়ে শিউলী দেখল 'পথের দাবী'।

চোখ দুটো বড় বড় ক'রে শিউলী ব'লে উঠ্‌ল, "ওরে দুষ্টু ছেলে! পড়ার বই ফেলে লুকিয়ে লুকিয়ে নভেল্ পড়া হ'চ্ছিল? সামনে না এগ্‌জামিন? রোস্, দিচ্ছি বড়দাকে ব'লে!"

শৈবাল তড়াক ক'রে উঠে ব'সে মিনতি মাখা স্বরে বলল, "লক্ষ্মী বোনটি, বলিস নি যেন! আর কক্ষনো পড়ব না—"

শিউলী কোন রকমে হাসি চেপে বলল, "উঁহু! শুধু মুখে বললেই হবে না।—কান মল, নাক খৎ দাও!"

পুরুষদের উপর এত বড় হুকুম কেই বা সইতে চায়! শৈবাল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠ্‌ল। তীক্ষ্নকণ্ঠে বলল, "তোকে কি আমার গুরুমশায় রাখা হয়েছে? পড়ার সময় আমার ঘরে বিরক্ত করতে এলে মাকে ব'লে দেব যে সামনে এগ্‌জামিন, ফেল হলে আমি দায়ী নই কিন্তু—"

শিউলী বিদ্রূপ ক'রে উঠ্‌ল, "সাধু পুরুষ! যাচ্ছি এখন বড়দার কাছে, তারপর—"

সত্য সত্যই শিউলীকে চ'লে যেতে দেখে শৈবাল মরিয়া হয়ে উঠ্‌ল। অবজ্ঞাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী ক'রে বলল, "যা, যা, এখন বড় হয়েছি। এখনও অত আর হুকুম তম্ব করলে চলে না!"

শিউলী চট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "তাই নাকি? সত্যি? এতখানি সাবালক কদিন হ'য়েছ?"

শৈবাল গম্ভীর কণ্ঠে বলল' "তোমাদের কাছে আমি চিরকালই ছোট!—বাইরে কিন্তু আমার কত খাতির!"

শিউলী কৌতুকোজ্জ্বল নয়নে তার মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বটে! কিরকম খাতিরটা শুনি?"

শৈবাল মহাউৎসাহে মুরুব্বিয়ানা চালে ব'লে যেতে লাগল, "এই ত সেদিন সুধীর তাদের বাড়ী নিয়ে গেল। তার মা কত যত্ন খাতির করলেন; তারপর বললেন, 'নীলার সঙ্গে বিয়ে হ'লে বেশ হয়!' নীলা কেমন গান গাইল; বেশ মেয়ে!—কিন্তু আমার, সত্যি বলচি শিলাদি, তোর মত ভাল লাগল না!"

এক লহমার জন্ত শিউলীর মুখটা আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "থামুন জ্যাবকমশায়, আর খোসামোদ করতে হবে না। কিন্তু বাইরে বাইরে কি আজকাল কনে দেখে বেড়ানো হচ্ছে?"

শৈবালের চোখ দুটো পূর্ণ বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌ল। "বাঃ রে! কনে আবার দেখে বেড়ালাম কোথায়? ও সব প্যানপেনে মেয়ে আমার ভালই লাগে না।"

শিউলী হেসে জিজ্ঞাসা করল, "কি রকম মেয়ে তবে মশায়ের পছন্দ শুনি?"

টপ্‌ ক'রে শৈবাল ব'লে ফেলল, "তোমার মত!" কিন্তু কথাটা ব'লে ফেলেই তাড়াতাড়ি সামলে নিল' "তোর মত গান গাইতে পারবে—তোর মত ভাল হবে—" আর কোন কথা তার যোগাল না।

শিউলীর চোখ মুখও গরম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে ভাবটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে বলল, "উপস্থিত এখন কনে পছন্দটা মুলতুবী রেখে,—সামনে এগজামিন—পড়ায় মনটা একটু দাও দিকি" ব'লেই—তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীচে নামবার সময় সিঁড়ির পাশের ঘরটায় দৃষ্টি পড়তেই শিউলী দেখল বাড়ীর বড় মেয়ে,—সদ্য বিধবা বীরা, একমাত্র শিশুপুত্রকে নিয়ে খাটের উপর ব'সে আছে আর তারই সামনে ব'সে নীরা, সেতারটা কোলে নিয়ে 'টুং, টাং' শব্দ করছে। সে কোন সাড়া না দিয়েই নেমে আসছিল কিন্তু বীরার মুখে তার নামটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুনল বীরা বিরক্তিপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করছে, "শিউলী গেছে কোথায় নীরা?"

নীরা জবাব দিল, "দাদার ঘরে ত দেখে এলেছিলুম।"

বীরা তিক্তকণ্ঠে ব'লে উঠল "ছেলেটাকে সে একটু ধরবে তা নয়—সোমত্ত মেয়ে দিনরাত জোয়ান ছেলের সঙ্গে ফুসফুস, গুজগুজ!—এসব কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড—"

শরাহত মৃগীর মত নীরা চমকে উঠল। ক্ষুব্ধ ব্যথিত কণ্ঠে বলল, "ওকি বড়দি! শিলীদি না ছোড়দার বড় বোনের মত? তোমার আমার সঙ্গে ওর তফাৎ কি? এ কথাটা বললে কি ক'রে?"

ক্রন্দনরত শিশুটাকে বিরক্তি সহকারে দুম ক'রে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বীরা তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব'লে উঠল, "তুই থাম নীরা, আমাকে আর শেখাতে আসিস্‌নি! কলিকালে পাতানো বোন থাকে না—এমন ঢের দেখে আমার হাড় পেকে গেল—"

রুদ্ধ ব্যথিত কণ্ঠে নীরা জবাব দিল, "তোমার মত ঢের দেখে আমি হাড় পাকাতে চাই না বড়দি; কিন্তু শিলীদি সম্বন্ধে এতবড় একটা কুৎসিত ধারণা মনের মধ্যে পুষে রেখনা এই আমার অনুরোধ।" এই ব'লে বীরাকে উত্তর দেবার কোন অবকাশ না দিয়েই সে সেতারটা পুনরায় কোলের উপর টেনে নিয়ে বাজাতে সুরু করল।

অচিন্ত্য-পূর্ব্ব এই আকস্মিক আঘাতে শিউলী হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল; সর্ব্বাঙ্গ তার থর থর ক'রে কাঁপছিল। শৈবালের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা কি আজ অন্যের চোখে এমনই কদর্য্য রূপ ধারণ করেছে! নির্জ্জন সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েও গভীর লজ্জায় সে মাথা তুলতে পারছিল না। কিন্তু এর প্রতিবাদ ক'রে কেলেঙ্কারীটাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে তার মোটেই প্রবৃত্তি হ'ল না তাই সে নীরবে গম্ভীর মুখে দৃঢ়পদে ঘরে প্রবেশ ক'রে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে আবার তেমনি ভাবেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এই ঘটনার পর শৈবালের সান্নিধ্য সে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতে লাগল। লজ্জাকর বেদনাটা হয়ত এতে একচুলও কমল না তার, কিন্তু অপ্রত্যাশিত আঘাতটা শক্তিশেলের মত এমন কঠিন ভাবেই বুকে বেজেছিল যে সে আত্মহারা হ'য়ে সহজেই যে উপায়টা লোকের মনে আসে সেইটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল।

—তার নিঃসঙ্গ মনের উপরও আর যেন সে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারছিল না।—

নীরা শুধু তার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছিল কিন্তু লজ্জায় সে এ ব্যাপারের উল্লেখ পর্য্যন্ত করতে পারল না।

নিজের শোবার ঘরে শুয়ে "দেনা পাওনা" খানা শেষ ক'রে সবে মাত্র শিউলীর তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় ভেজানো দুয়ার ঠেলে ঘরে ঢুকল শৈবাল।

দ্বার খোলার শব্দে শিউলী চোখ মেলে তাকিয়ে, অসংবৃত বস্ত্র সংবৃত ক'রে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি মনে ক'রে রে ছোট?"

শৈবাল খাটের এক ধারে ব'সে প'ড়ে বলল, "দেনা পাওনা" খানা নিতে। কিন্তু তোর ব্যাপার কি শিলীদি? এমনই ধারা ডুমুরের ফুল হ'লি কেন? সারাদিনে একটি-বারও দেখতে পাওয়া যায় না—এর মানে কি? গোসা হ'য়েছে না কি?

হায়রে! কি যে হ'য়েছে, তা'সে কেমন ক'রে প্রকাশ করবে?

গম্ভীর ভাবেই শিউলী কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু কি মনে ক'রে পরিহাস-তরল কণ্ঠেই ব'লে উঠল, "বাপরে! এর পর কি চব্বিশ ঘণ্টা হুজুরের ঘরে ব'সে হাজিরা দিতে হ'বে নাকি?"

শৈবাল উদাস স্বরে বলল, "না; তা আর বলব কিসের অধিকারে! কিন্তু তুই ঠিক কথা বলছিস্ ত?" ব'লে তার পূর্ণ দৃষ্টি দু'টো শিউলীর মুখের উপর স্থাপন করল।

শিউলী একটু ইতস্ততঃ ক'রে শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল, "হ্যাঁ, মশায় হ্যাঁ!" তারপর "দেনা পাওনা" খানা তাড়াতাড়ি বালিশের তলা থেকে বা'র ক'রে শৈবালের সামনে ফেলে দিয়ে বলল, "নে তোর বই।"

বইখানা তুলে নিয়ে শৈবাল জিজ্ঞাসা করল, "কেমন লাগল রে?"

আলোচনা করবার উৎসাহ শিউলীর মোটেই ছিল না তাই সংক্ষেপে ঘাড় নেড়ে জানাল, "ভালই!"

অন্যমনস্ক ভাবে পাতা উলটাতে উলটাতে শৈবাল বলল, "জীবানন্দের চরিত্রটা আমার কিন্তু বড্ড ভাল লেগেছে শিলাদি। দেখ First class rogue কিন্তু বরাবরই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে।"

শিউলী বলল "হ্যাঁ তা ক'রে সত্যি যখন থেকে ষোড়শীকে সে সত্যিকারের ভালবাসতে পেরেছিলে তখন থেকেই। তারই ভালবাসার সোণার-কাঠির পরশ জীবানন্দের সব পশুত্বকে বিনাশ ক'রে তার ভেতরকার সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলেছিল।"

শৈবাল বলে উঠল, "কি মিষ্টি কিন্তু জীবানন্দের প্রার্থনা করার ভঙ্গীটুকু! আমার মনে হয় এমন সরল অথচ সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারলে কোন নারীই নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। ভারী ভাল লাগে তার দাবী করার ভঙ্গীটা!"

কপট গাম্ভীর্যটা খসে গিয়ে তর্ক করার প্রবৃত্তিটা কোন সময়ে শিউলীর উদ্দাম হ'য়ে উঠেছিল। সে বলল, "ঐত বললাম, সত্যিকারের ভালবাসতে পারলেই এটা হওয়া সম্ভব। জীবানন্দ লালসা তৃপ্তির জন্য তো অলকাকে চায়নি কারণ ও জিনিষটা সে ওর পূর্ব্বে অনেক পরিমাণেই মিটিয়ে নিয়েছিল।"

বইখানা নাচাতে নাচাতে শৈবাল কতকটা আত্মগত ভাবেই বলে উঠল, "কিন্তু ভাবি, অলকা কি ক'রে জীবানন্দকে ভালবাসল! অতবড় নরপশু একটা—"

শিউলী বাধা দিয়ে বলল, "এইখানেই নারী হৃদয়ের বৈচিত্র্য! জানিনা তোমার অলকার মনে কি ছিল কিন্তু এটা—প্রায়ই দেখা যায়, উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল তেজী পুরুষকে জয় করবার, তাদের হাতে ধরা দেবার প্রতি নারীদের একটা স্বাভাবিক লোভ থাকে; তাছাড়া—বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছিল ব'লে শাস্তি দেবার জন্যই যে ষোড়শীকে ধ'রে নিয়ে আসা হ'য়েছিল, অল্পক্ষণের পরিচয়ে তার হাত থেকে মানুষ মরার মারাত্মক বিষটাকে অসঙ্কোচে গলাধঃকরণ করার মধ্যে যে অনন্ত নির্ভরতা—সেইটাই ষোড়শীর হৃদয় যতখানি জয় করতে পেরেছিল—সারা বইখানার বোধকরি তার আর তুলনা পাওয়া যায় না।"

শৈবাল প্রশংসমান একাগ্র দৃষ্টিতে শিউলীর মুখের পানে চেয়েছিল। তার কথা শেষ হওয়ার পরও সে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে ব'সে রইল; তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এত তলিয়ে বুঝ্‌তে পারি না,—আর এমন ভাবে চাইবার অধিকারও কোন দিন আসবে কিনা জানি না; কিন্তু খিলি কয়েক পান পাঠিয়ে দিস্।" ব'লে সে কতকটা অন্য মনেই ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

উভয়ের আলোচনার কথাগুলো মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে ঘরের মাঝে যেন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল। শিউলী অত্যন্ত ভারী মুখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। জানালার বাইরে নারিকেল গাছটা অপরাহ্ণবেলার রোদের মুকুট পরে' সেখানে দাঁড়িয়েছিল।

তিন

এমনই কিছুদিন পর ফুটবল খেলতে গিয়ে, পেটে একটা বিষম আঘাত খাওয়ার সকলে যখন ধরাধরি ক'রে এনে শৈবালকে ঘরে বিছানার উপর শুইয়ে দিল, তখন তার জ্ঞান মোটেই ছিল না।

জননী কণপ্রভা দেবী পুত্রের শিয়রে আছড়ে প'ড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। শিউলী তাড়াতাড়ি উঠে এসে তাঁকে ধ'রে গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বলল, "করছো কি মা? ভয় কি?"

দুই হাতে শিউলীকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধ'রে আকুল ভাবে কেঁদে উঠে কণপ্রভা দেবী বললেন, "আমি যে বিধবা হ'য়েও ওদেরই মুখ চেয়ে বুক বেঁধে ছিলুম শিলি—" মুখ দিয়ে তাঁর আর কোন কথা বেরুল না; শুধু অজস্র অশ্রুধারা শিউলীর সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত ক'রে দিল।

বহু কষ্টে তাঁকে কিছু সান্ত্বনা দিয়ে শিউলী এসে শৈবালের মাথার গোড়ায় বসল।

তারপর দিনরাত যে কোথা দিয়ে কেটেছে তার আর তা হুঁসই ছিল না। প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তিমতী সেবার মত সে সম্বিতহারা শৈবালের শিয়রে ব'সে থাকত—পলকহীন দৃষ্টিতে, রেখাহীন নীরব গম্ভীর মুখে।

সংজ্ঞাশূন্য শৈবাল প্রলাপের ঘোরে, কতবার সবলে তার হাত দু'টো চেপে ধ'রে বুকের মাঝে টেনে নিয়েছে। বাধার ক্ষুদ্র একটি চেষ্টাও না ক'রে শিউলী সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে তার দৃঢ়মুষ্টি বাহুপাশে।

অস্ফুট স্বরে কত অসংলগ্ন বাণীই তার মুখ থেকে উচ্চারিত হত, "চাইবার অধিকার হয়ত আমার কোনদিনই হবে না—আমি এমনই সরল চাইবার দাবী পছন্দ করি—সেদিন কিন্তু—" এমনই ধারা আরও কত কথা। অন্য কেউই এর অর্থ বুঝত না, শুধু শিউলী নীরব গম্ভীর মুখে শুনত আর একটা সংশয় দোলায় বুকটা তার দুলে দুলে উঠ্‌ত।

কয়েকদিন যাবৎ অহর্নিশি যমে মানুষে দ্বন্দের পর অবশেষে শৈবাল ক্রমে আরোগ্যের পথেই চলল।

যেদিন সে অন্ন পথ্য পেল, সেদিন বাড়ীতে আবার পূর্ব্বের হর্ষ, আনন্দের স্রোত ফিরে এল।

তাকে খাইয়ে শুইয়ে স্নানের জন্য শিউলী নীচে নেমে আসতেই, কণপ্রভা দেবী দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধ'রে অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "তুই মা ওর জীবন ফিরিয়ে দিলি। তোর ঋণ—"

বাধা দিয়ে শিউলী ব'লে উঠ্‌ল, "আঃ! কি করছ মা! আমি বাড়ীতে আবার নতুন হ'লুম না কি যে কেঁদে প্রশংসা করতে সুরু করলে? অত আমি সহ্য করতে পারব না বাপু!"

মাথা নেড়ে গৃহিণী সজল নয়নে বললেন, "কিন্তু ধীরা, ধীরা, আমি নিজেই যে তোর সেবার এক আনাও করতে পারতুম না মা। ভাগ্যিস্ তোকে পেয়েছিলুম তাই ও—"

শিউলী কৃত্রিম রাগে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "আচ্ছা! তুমি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাগ্যের প্রশংসা কর,—আমি কিন্তু চট্ ক'রে স্নানটা ক'রে আসি। কিদেতেষ্টা পায় না বুঝি আমার!—"

গৃহিণী অপ্রতিভ হ'য়ে পড়লেন। বললেন, "হ্যাঁ মা, যা মা! আমি ততক্ষণ তোর খাবার জোগাড়টা করি—"

শিউলী তীব্রকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, "তুমি কি-সব আরম্ভ করলে মা? আমি কি আজ আকাশ থেকে পড়লুম। অত ভাল নয়—"

ধীরা কোন এক সময় নিঃশব্দে এসে তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। শিউলীর কথার উত্তরে কণ্ঠে শ্লেষের বিষ মিশিয়ে বলল, "বাপ রে! তোমার খাতির হবে না? শিবুর জীবন দিয়েছ তুমি! তাও বলি মা, শিবুর কাছে আমাদের সঙ্গে শিউলীর তফাৎ আছে—"

তার কথার ভিতর যে গূঢ় অর্থটা প্রচ্ছন্ন ছিল, গৃহিণী তা বুঝলেন না তাই হেসে উত্তর দিলেন, "তা'বে বৈ কি মা, ছেলেবেলা থেকেই যে নাড়াচাড়া করছে—"

শিউলী আর অপেক্ষা না ক'রে, তাড়াতাড়ি স্নান ঘরের দিকে চলে গেল।

বেলা প্রায় চারটা। হাতের বইখানা শেষ হ'য়ে যেতে ক্লান্তভাবে সেখানা মাথার পাশে ফেলে রেখে শৈবাল একবার আড়মোড়া ভেঙে নিল। শ্রান্ত দৃষ্টিদুটো মেলতেই নজরে পড়ল দেওয়ালে একটা প্রকাণ্ড টিকটিকি একটা পোকার পিছনে তাড়া করেছে।

—উদ্দাম যৌবনের তপ্ত রক্ত যার মাঝে দিবারাত্র নৃত্যছন্দে বয়ে চলেছে,—এমনই একঘেয়ে বিছানায় শুয়ে দিন কাটাতে প্রাণ যে তার হাঁফিয়ে উঠে।

গত নিদ্রাভঙ্গের জড়িত চোখ নিয়ে শিউলী ঘরে প্রবেশ করল।

তাকে দেখে শৈবাল যেন মুক্তির শ্বাস নিয়ে বাঁচল। হেসে বলল, "এ রকম nurse হ'লেই রোগীর জীবনান্ত আরকি। সারা দুপুরে বাঁচল কি মরল তার খোঁজ নেবার দরকার নেই!"

শিউলী জবাব দিল "Day duty আমার নয় জানিস্। তবু যে তোর কাছে দিনে আসি সে নেহাৎই—"

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শৈবাল বলে উঠ্ল, "অনুগ্রহ, কেমন? কিন্তু মাথা যে বেজায় ধরেছে! আবার জ্বর ঘুরে আসবে কি না বুঝতে পারছি না ত!"

শিউলীর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া ফুটে উঠ্ল। "দেখি জ্বর কিনা" ব'লে তার মাথার গোড়ায় ব'সে প'ড়ে, কপালের উষ্ণতা পরীক্ষা ক'রে কতকটা নিশ্চিন্ত স্বরে বলল, "নাঃ! জ্বর হয় নি।"

শৈবাল বার কয়েক মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "না, জ্বর হয় নি; বোধ হয় বই পড়তে পড়তে মাথাটা ভার হয়েছে।"

শিউলী সস্নেহে তার মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে বলল, "অত ক'রে বারণ করলুম weak brain. এ বই পড়ে না! তা, সাবালক হ'য়ে আজকাল কথা শোনা ত ছেড়েই দিয়েছ—অবাধ্য ছেলে।"

শৈবাল শিউলীর অভিমান বুঝল; কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে তার সেবাটুকু উপভোগ করতে লাগল। সহসা এক সময় মাথা ঘুরিয়ে বলল, "আচ্ছা শিলাদি, তোর এ রূপ আমাদের, অন্ততঃ আমার কাছে ত একেবারে নতুন লাগছে। তুই যেন আর ঠিক সেই দুষ্টু, শিলাদিত্য নেই। ভারিক্কী, শান্ত, গম্ভীর। সেবার মধ্যে দিয়েই তোদের আসল রূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, নয়?"

শিউলী শুষ্কভাবে হেসে, তার এক গোছা চুলে ঈষৎ টান দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, হাঁ! কিন্তু তুইও আজকাল বড় বড় সব তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সুরু ক'রেছিস দেখি যে; B. A. class-এ কি আজকাল ওই সব শেখানো হ'চ্ছে? তারপর প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলল, "কি বই পড়ছিলি?"

বালিশের তলা থেকে বইখানা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে শৈবাল বলল, "ভাগের পূজা। পড়েছিস?"

"বাঃ রে! আমার কাছ থেকেই দিলুম আর আমিই পড়িনি।"

শৈবাল জিজ্ঞাসা করল, "কেমন লাগল?"

শিউলী মুখ কুঁচকে জবাব দিল, "এমনই এক রকম, তবে অনেক জায়গায় কাঁচা হাতের পরিচয় পাওয়া যায়।"

শৈবাল প্রবল বেগে মাথা নেড়ে ব'লে উঠল, "আমার কিন্তু তত ভাল লাগে নি। সবটা অবশ্য না হ'লেও, বইটার নায়িকার সঙ্গে তোর ভাগ্যের বড্ড বেশী মিল আছে—"

শিউলী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শৈবালের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। পরে হেসে বলল, "অর্থাৎ সেই জন্যই মহাশয়ের ভাল লাগল না; এ অজুহাত খাঁটি সাহিত্য-রসিকের উপযুক্ত বটে।"

শৈবাল উত্তেজিতকণ্ঠে বলল, "আমি কিন্তু মালতীকে অত সহজে নিষ্কৃতি দিতুম না। ভালবেসেছি, ভালবাসা পেয়েছি ব্যস্! এইটেই সত্যি। অন্য যত কিছু বাধাবিঘ্ন দু'হাতে ঠেলে ফেলে দাও।"

শিউলী প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল শৈবালের কথার উত্তাপে। সে যে এ সব সম্বন্ধে এতটা গভীর ভাবে ভাবতে পারে বা ভাবে, এ সহজ কথাটাও কোনদিন তার মাথায় আসেনি। তাই তার কথার উত্তরে পরিহাসপ্রিয়তা ছেড়ে শিউলী ভারী গলায় বলল, "শুধু এইটেই কি সংসারের একমাত্র জিনিষ। মালতী যা বলেছে বা করেছে তার দামও ত কম নয়—"

তাকে শেষ করতে দেবার পূর্ব্বেই শৈবাল ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, "আচ্ছা তুমি হ'লেই বা কি করতে বলত শিলাদি?"

শিউলী মুহূর্ত্তের জন্য বিব্রত হ'য়ে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে সংযত কণ্ঠে বলল, "কি করতুম, না করতুম সে বিচার ত এখানে ব'সে করা চলে না; সেটা করতে হ'লে স্থান কাল, পাত্র এবং সেই সঙ্গে ভালবাসার

পত্তীরষ্টাও মাপা চাই। চট্ ক'রে উত্তর দেবার মত অত হাল্কা জিনিষ ত এ নয় ভাই।"

শৈবাল সমবেদনা ভরা কণ্ঠে বলল, "কিন্তু আমি ভেবে পাই না, পুরুষের কাছে থেকে ভালবাসার অত নিদর্শন পেয়েও মালতী কত বড় ব্যথা বুকে নিয়ে তবে পুরুষের তীব্র আকর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল।"

শিউলী তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "কিন্তু ওই খানেই ত নারী হৃদয়ের চরম উৎকর্ষ।"

শৈবাল হাতজোড় ক'রে বলল, "তোমাদের উৎকর্ষ সব সময়ে আমাদের ধাতে সয় না শিলাদি। কিন্তু দোহাই, তোর ভাগ্যে যদি সত্যিই এমনই কোন দিন আসে সে দিন যেন নারীত্বের মহত্বের দোহাই দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করিসনি।" ব'লেই সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

তার কথার মধ্যে এমনই একটা আন্তরিকতার আভাষ পাওয়া গেল যে শিউলী আচমকা শিউরে উঠ্‌ল। ঈষৎ তিক্তকণ্ঠে বলল, "কি করব না ক'রব সেটা তোর সঙ্গে আলোচনা করতে আমি মোটেই ব্যগ্র নই।"

কথা শেষে সে অত্যন্ত গুম হয়ে উঠ্‌ল।

কতক্ষণ নীরবে ব'সে থেকে এক সময় "যাই, তোর দুধটা আনি গে যাই" ব'লেই দ্রুতপদে ঘর পরিত্যাগ করে গেল।

চার

শৈবাল সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করলেও, ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসক কোন পাহাড়ী দেশে বায়ু পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন।

বহু গবেষণার পর স্থির হ'ল শিমূল তলায় যাওয়া হবে এবং শৈবালের সাথী হবেন স্বর্ণপ্রভা দেবী, শিউলী এবং দাসদাসী প্রভৃতি।

যাওয়ার উদ্যোগ-আয়োজনে সেদিনকার কথার স্মৃতিগুলো উভয়েরই মন থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল।

যাওয়ার পথে চলন্ত ট্রেন থেকে বাংলার কোন এক অজ্ঞাত পল্লীর এক জীর্ণ কুটীরের দিকে অঙ্গুল প্রসারিত করে শিউলী ব'লে উঠ্‌ল, "জানিস্ ছোট, এমনই এক পাড়াগাঁয়ের এক ভাঙা কুঁড়ে ঘরে জন্মেছিলুম আমি। ওদেরই ঘরের ছেলেমেয়ের মত পথের ধুলোয় খেলতাম—সে সব স্মৃতি আজ আবছায়ার মত মনে পড়ে।"

শৈবাল জানালা পথে ফাঁকা মাঠের দূরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। শিউলীর কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে বলল, "কিন্তু শিলাদি কবির কল্পনায় তোমার ওজীবনে যত মাধুর্য্যই থাক, তার চেয়ে এ যে ভাল, এ আমি লিখে দিলে বলতে পারি। আচ্ছা শিলাদি, তোদের বাড়ী কোন গাঁয়ে ছিল মনে আছে?"

শিউলী অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, "গাঁয়ের নামটা মনে আছে—বাবুপুর। কিন্তু সে যে কোথায়—কোন দিকে, বলতে গেলে আবার ভূগোল পড়তে হয়।"

শৈবাল বলল, "আর ব'লেও তোমার দরকার নেই। সে সব বলতে যাওয়া আজ কোন পক্ষেরই সুখের হবে না।"

শিউলী অশ্রুসজল চোখে বলল, "কিন্তু আমি মাঝে মাঝে ভেবে শিউরে উঠি যে, যদি না মায়ের কোল পেতুম ত আজ আমার ভাগ্য কি হত? স্রোতের ফুলের মত, কূলের কোন এক বন্ধ গুহায় প'ড়ে মরতুম।"

স্বর্ণপ্রভা ঘুরে ব'সে বললেন, "আমরাই যে তোর কাছে ঋণী ছিলুম মা! তোকে এসে আমার কোলে আসতেই হ'বে!"

শিউলীর বুকটা ভ'রে উঠেছিল তাই সে কোন কথা কইতে পারল না। শৈবাল বালিশে হেলান দিয়ে একদৃষ্টিতে শিউলীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

শিমূলতলায় এসে যখন তারা নামল তখন প্রায় শেষ রাত্রি, জমাট অন্ধকার তখনও চারদিকের পাহাড়গুলোর বুক ঘিরে দুলছিল। শৈবাল অত্যন্ত অপ্রসন্ন সুরে ব'লে উঠ্‌ল, "বাবা! কি দারুণ শীত! জ'মে বাবার যোগাড় হয়েছি।"

বাড়ীতে যখন তারা এসে উঠ্‌ল তখনও তরল আঁধার ভেদ করে ঊষার আলো বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারে নি।

বিছানা পূর্ব্ব হতেই প্রস্তুত ছিল; শৈবাল গিয়ে সটান লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

কণপ্রভা দেবী ও শিউলী জিনিষপত্রগুলোর ব্যবস্থা করে রাখতে লাগলেন।

হাতের কাজ যখন শিউলীর শেষ হ'ল, দিনের আলো তখন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বাইরে বেরিয়ে এসেই শিউলী আনন্দে শিশুর মত করতালি দিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল।

তাদের বাসার নিকটে ও দূরে চতুর্দ্দিকেই ছোট বড় অসংখ্য কঠিন পাষাণ চীন দেশের প্রসিদ্ধ প্রাচীরের মত ঘিরে রয়েছে। তারই একটার পাশ দিয়ে, কুহেলিকার অবগুণ্ঠন সরিয়ে, নবোঢ়ার লজ্জারক্ত মুখের মত দেখা যাচ্ছিল রক্তিম সূর্য্যের খানিকটা। অল্প দূরেই বিস্তীর্ণ বালুকা-বক্ষ পার্ব্বত্য নদীটির বুকের উপর দিয়ে, স্বচ্ছ ক্ষীণ একটি জলধারা ঝির ঝির ক'রে বয়ে চলেছে; তারই কোল ঘেঁসে মাঝে মাঝে ছোট দু'একটা কুটীর।

শিউলী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর ছুটে ঘরে ঢুকে শৈবালের লেপ ধরে টানাটানি শুরু করে দিল, "এই ছোট, ওঠ্, ওঠ্, বাইরে দেখবি চল্।"

নিদ্রালস চোখ দু'টো অর্দ্ধোন্মুক্ত করে শৈবাল মিনতি মাখা স্বরে বলল, "লক্ষীটি, বিরক্ত করিস্‌নি, একটু ঘুমুতে দে।"

শিউলী ধমক দিয়ে উঠ্‌ল "কেবল কুম্ভকর্ণের মত ঘুম দিতে শিখেছ! সকালে না বেড়ালে শরীর সারবে কেমন ক'রে? ওঠ্ বলছি শীগগীর!"

শৈবাল নড়বার লক্ষণ মাত্র না দেখিয়ে করুণকণ্ঠে বলল, "দোহাই তোর, এত সকালে চা না খেয়ে উঠ্‌লে জ'মে যেতে পারি—"

শিউলী বলল, "রাক্ষস ছেলে! ওঠ, ওঠ! চা ক'রে দিচ্ছি। একটু কবিত্ব নেই ভেতরে—নীরস্ কোথাকার!"

শৈবাল কোন কথার উত্তর না দিয়ে লেপটা আর একবার আপাদমস্তক মুড়ি দিল।

নূতন স্থানের দৃশ্যে প্রাণখোলা হাসি গল্পে, নিত্য নূতন স্থানে ভ্রমণের আনন্দে শৈবাল শীঘ্রই তার নষ্ট স্বাস্থ্যের অনেকখানিই পুনরুদ্ধার ক'রে নিল।

বেড়াতে যেত প্রায়ই শিউলী আর শৈবাল। কণপ্রভা দেবী বেড়ানো অপেক্ষা স্বাস্থ্যকামী অন্যান্য পরিবারের গৃহিণীদের সংসারের সুখ দুঃখের আলোচনা করাটাই অধিক পছন্দ করতেন।

নিত্যকার মত সেদিনও বিকালবেলায় শিউলী ও শৈবাল বেড়াতে বেরুল। নদীর আঁকা বাঁকা গতি অনুসরণ ক'রে, কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এসে সামনেই একটা অপেক্ষাকৃত উঁচু পাহাড় দেখে সেটার উপর চড়ার পরামর্শ হ'ল।

শৈবাল বলল, "কিন্তু তোর ক্ষমতায় কুলোবে না শিলীদি!"

শিউলী তার নারীশক্তিকে কিছুতেই খর্ব্ব করতে প্রস্তুত নয়, তাই প্রতিবাদ ক'রে বলে উঠ্‌ল, "নিশ্চয় পারব। আমাদের কি কোন শক্তিই নেই মনে কর?"

উঠার পর্ব্ব সুরু হ'ল।

স্থানে স্থানে পাহাড় একেবারে খাড়া। পাথর ধরে, গাছের শিকড় আঁকড়ে ক্রমেই তারা উপরে উঠ্‌তে লাগল।

শীর্ষদেশে পৌঁছে, শিউলী দস্তুর মত হাঁফাতে লাগল। কিন্তু মুগ্ধ দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রকৃতির অজস্র সম্পদ দেখে সে আনন্দ-চপল কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল, "এত কষ্ট ক'রে ওঠা কিন্তু সার্থক হ'য়েছে!"

শৈবাল ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

অস্তগামী সূর্য্য সমস্ত পশ্চিম প্রান্তটা আরক্ত করে দিয়ে দূরের পাহাড়টার আড়ালে আত্মগোপন করার উপক্রম করতেই শৈবাল তাগাদা দিল, "নামবি,—না এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি?"

কিন্তু কিছুদূর নেমেই শিউলী ব'লে উঠ্‌ল "বাবা! নামব কি ক'রে? গাছের শেকড় ধ'রে ত উঠ্‌লুম কিন্তু এখান থেকে যদি একবার slip করিত' ছাতু!"

দুঃখে, ক্ষোভে চোখ দুটো তার ছল ছল করতে লাগল।

শৈবাল হেসে বলল, "তাহলে এখানেই বাস কর'। তখনই বলেছিলুম না যে তোর দ্বারা হবে না। তারপর

নিজের বাম বাহুটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ধর শক্ত ক'রে!"

শিউলী জোরে তার হাতটা চেপে ধরল। শৈবাল ডান হাতে কখন' গাছের শিকড়, কখন' পাথর চেপে ধ'রে নামতে লাগল।

কিন্তু কিছুদূর নেমেই এমন একজায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল তারা, যেখানটায় এরকমভাবে নামা সম্ভবপর নয়!

নামতে হ'বে তাদের প্রায় চারফুট নীচে,—কতকগুলো ঢালু পাথরের উপর দিয়ে।

সূর্য্য তখন সম্পূর্ণ অস্ত গেছে; সন্ধ্যার ধূসর ম্লান ছায়া প্রকৃতির বুকে নেমে এসেছে।

শৈবাল দাঁড়িয়ে ভেবে নিল 'কি করা যায়!' শিউলীর দিকে তাকিয়ে দেখল চোখ দুটো তার অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তাকে ভরসা দেবার জন্য হেসে বলল, "কান্না পাচ্ছে তোর, না? অথচ ওঠবার সময় এইখানটাই গাছের শেকড় ধ'রে আনন্দে উঠে গেছলি। দাঁড়া বুদ্ধি করছি।" ব'লে মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করে সে লাফিয়ে অনতিদূরের একটা মোটা আগাছার শিকড় ধ'রে ঝুলে পড়ল চারফুট নীচেকার পাথরগুলোর উপর তারপর শিউলীর দিকে তাকিয়ে বলল, "পা টিপে টিপে নেমে আয়। আমার হাত ধর কিন্তু হড়কে ওপাশে গেলে আর রক্ষা নেই।"

শিউলী এতক্ষণ স্তম্ভিতের মত শৈবালের কাণ্ডটা দেখছিল। তার কথা শুনে ধীরে ধীরে কম্পিত পদে শৈবালের প্রসারিত হাত ধরে ঢালু পথটায় নামতে লাগল। কিন্তু সে যে পাথরের উপর দ্বিতীয় পা দিল সেটা হঠাৎ স্থানচ্যুত হয়ে গেল; শিউলীও কোন অবলম্বন না পেয়ে পতনোন্মুখ অবস্থায় ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, কিন্তু নীচে গড়িয়ে পড়ার পূর্ব্বেই শৈবাল দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। শিউলীর অবশ দেহটা লুটিয়ে পড়ল শৈবালের বুকের উপর।

মুহূর্ত্তের মাঝে কি যে ঘটে গেল, শৈবাল তা ধারণা করতে পারেনি। যখন তার বিমূঢ় ভাবটা কেটে গেল তখনও শিউলীর শিথিল দেহটা তার বুকের উপর থর থর ক'রে কাঁপছে।

শৈবালের সারা অঙ্গের ভিতর দিয়ে যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল; তপ্ত শোণিত-প্রবাহ উদ্দাম চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। এক মুহূর্ত্তের জন্য কামনার দুকূল হারা স্রোত তার মন থেকে সংসারের যত কিছু বিচার বিবেচনা লুপ্ত ক'রে দিল। আকুল আগ্রহে সে তৃষিত ওষ্ঠাধরটা নামিয়ে আনল শিউলীর ভীত শুষ্ক ওষ্ঠের উপর।

অত্যধিক ভয়ে শঙ্কায় প্রথমটা শিউলী কেমন হয়ে পড়েছিল; তার উপর অকস্মাৎ এই অপ্রত্যাশিত উত্তেজনায় তার মন থেকে ক্ষমতার শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত হরণ ক'রে নিল!

একটু প্রকৃতিস্থ হতেই আপনাকে সে শৈবালের বাহুপাশ থেকে মুক্ত ক'রে নিল।

শৈবাল মাথা তুলে তাকাতেই শিউলীর সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল—উভয়েই মাথা নত করল।

পাশের একটা পাথরের উপর বসে পড়ে শৈবাল বলল, "বস্! একটু জিরিয়ে নে।"

শিউলী কোন কথা বলতে পারল না নীরবে গিয়ে তার পাশে বস্‌ল।

দুই হাতের মধ্যে মাথাটা চেপে শৈবাল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সহসা এক সময় বলল, "আজকের এই ঘটনাটা একেবারেই দৈব, কিন্তু এতদিন যেটা দুজনেরই মনে ধোঁয়াচ্ছিল, আজ সেটা হঠাৎ প্রকাশ হয়ে গেছে।"

তার এতগুলো কথার পরেও পাথরে গড়া নিষ্প্রাণমূর্ত্তির মত শিউলী ব'সে রইল। শৈবালের কথাগুলো যে তার কানে পৌঁচেছে তাও বোঝবার উপায় ছিল না। আগাগোড়া ব্যাপারটাই তার কাছে একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন ব'লে মনে হ'চ্ছিল।

শৈবাল ধীরে ধীরে তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, "আমার কথা শুনে হয়ত অবাক হ'য়ে গেছিস্ কিন্তু মনের ছবিটা আজ যখন এমনই ভাবেই ধরা প'ড়ে গেল, তখন সেটাকে আর লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে চাইনা আমি। কিছুদিন থ'রে মনের ধারাটা যে

ভিন্ন পথে চলেছে তা বুঝেছিলুম কিন্তু দু'জনেই, এমনই ধারা দৈবের সহায়তা না পেলে, হয়ত কোনদিনই প্রকাশ করতে পারতুম না ; হয়ত চিরকাল খোঁচা দিত—"

বাধা দিয়ে শিউলী রুক্ষস্বরে বলল, "অপরের মনে কি হ'ত না হ'ত সে নিয়ে বিচার করতে গিয়ে ত লাভ নেই। চল্ নেমে চল্।"

শেষের দিকে স্বরটাকে সে সহজ ক'রে তোলবার চেষ্টা করলেও, একটা সঙ্কোচ, একটা লজ্জা তার সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপে পীড়া দিচ্ছিল।

শৈবাল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "হ্যাঁ, তাই চল

ফিরে সে রাত্রে কেউই স্বচ্ছন্দ মনে কথা বলতে পারছিল না। মন চেপে, ঘটনার সুযোগ ধ'রে ওই চিন্তাগুলো বারে বারে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠে,—তাদের আবাল্যের সহজ, সরল সখ্যতার গতিটাকে আহত করছিল।

পরের সারাদিনটাও এমনই ভাবেই কেটে গেল।

বিকালের দিকে শৈবাল একাকীই বেড়াতে বেরুল। কি একটা কাজের অছিলায় শিউলী গৃহিণীর কাছেই রইল।

সন্ধ্যাবেলা ঘুরে এসে শৈবাল দেখলে পাশের বাড়ী থেকে গৃহিণী তখনও ফেরেন নি। তার সাড়া পেয়ে শিউলী চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

শৈবাল তার হাত থেকে কাপটা নিয়ে সহজ গলায় প্রশ্ন করলে, "মা বুঝি ফেরেন নি এখনও ? গল্পের ভাণ্ডার একদিনেই উজাড় করতে চান নাকি ?"

শিউলী হেসে প্রশান্তমুখে জবাব দিল, "বুড়ো মানুষ, সমবয়সীর সন্ধান পেলে সুখ দুঃখের কথা বলার লোভ সামলাতে পারেন না। তাছাড়া অনিতার মা কালকে চ'লে যাবেন কি না—"

"বেশ, বেশ! তিনি তাই করুন ; কিন্তু তুই আজ বেড়াতে গেলি না কেন ?—সাহস হয় না ?" ব'লে শৈবাল শিউলীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি দু'টো স্থাপন করল।

শিউলী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করল তার প্রশ্ন শুনে। জ্রকুঞ্চিত ক'রে জবাব দিল, "সাহস হ'বে না কেন! কিন্তু তোর কাছে মিনতি কালকের ঘটনাটা মনের মাঝে বন্ধ ক'রে রেখে, মিছামিছি একটা অনর্থের সৃষ্টি করিস্ না।"

শৈবাল তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে উঠল, "কেন, মনের পরিচয় পাওয়ার পর কিসের ভয়ে তা অস্বীকার করব ?"

শিউলী অত্যন্ত নীরস কণ্ঠে জবাব দিল, "মনের পরিচয়ই যে পেয়েছিস্, এ ধারণা তোর হ'ল কিসে? তাছাড়া—ছিঃ! এ চিন্তা করাও পাপ।"

শৈবাল প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল, "কক্ষনো নয়। পাপ কিসের ? তোর সঙ্গে কি আমার সেই সম্বন্ধ ? এতে অন্যায়ই বা কি আছে, পাপই বা কি আছে ; নিত্য সাহচর্য্যের ফলে, যৌবনের প্ররোচনায়, আমাদের সম্বন্ধটা যদি ভিন্ন মূর্ত্তিই ধারণ করে তবে সেটা উড়িয়েই বা দেবে কিসের জোরে, অন্যায় পাপই বা বলবে তোমার মনুসংহিতার কোন শ্লোকের জোরে ?"

শৈবালের কথার তাপে শিউলি শিউরে উঠল। তার মনের গতি বুঝতে আর তার বাকি রইল না। কঠিন স্বরে জবাব দিল, "কতকগুলো বাজে নভেল প'ড়ে অত বিচার করতে বসতে হ'বে না। তবে আমার সম্বন্ধে তোর এ রকম কোন ধারণা না হ'লেই সুখী হব। সমাজের মাঝে মিথ্যা কলঙ্কের ছাপ আমার মুখে লেপে, স্নেহের অবমাননা আর কখনো করতে চেও না।" ব'লেই সে দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শৈবাল স্তম্ভিতের মত বসে রইল। শিউলীর নিকট এতদিন পর্য্যন্ত সে যে মধুর ব্যবহার পেয়ে এসেছে, আজ অকস্মাৎ তার একান্ত বিপরীত এই বিচিত্র রূঢ় ব্যবহারে, তার অত গর্ব্ব, আশা, আকাঙ্ক্ষা মুহূর্ত্তে চুরমার হ'য়ে ধূলিতে লুণ্ঠিত হ'য়ে গেল। কেবল অন্তরের অন্তর্তম প্রদেশে, স্নেহপাত্রীর হাতে পাওয়া আঘাতের গুরু বেদনাটা অতি নির্দ্দয় ভাবেই অবিরত পীড়া দিতে লাগিল।

পাঁচ

এর পর শৈবাল অত্যন্ত-গম্ভীর হ'য়ে উঠল। নেহাৎ প্রয়োজন না হ'লে, শিউলী অথবা বাড়ীর কারও সঙ্গেই সে বড় একটা কথা কহিতে চাইত না।

শিউলী তার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করল এবং প্রথমটা যথাসাধ্য সেও শৈবালকে এড়িয়ে চলতে লাগল—এই

অজানা—যদি শৈবালের মনের গতি ফেরে; কিন্তু সেদিন কণপ্রভাদেবী পর্য্যন্ত শৈবালের এই আকস্মিক গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য ক'রে শিউলীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকার কি হ'য়েছে শিলি? তোর সঙ্গে ঝগড়া করেছে বুঝি? ওর পাগলামী আর গেল না!" সে দিন তার উত্তরে "কই মা! জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিত।" বলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে শৈবালের ঘরে এসে ঢুকল।

খাতা পেন্সিল নিয়ে শৈবাল তখন কবিতা রচনা বা এমনই ধারা একটা কিছু করছিল;—দমকা হাওয়ার মত শিউলীকে প্রবেশ করতে দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

শিউলী তারই বিছানার এক প্রান্তে ব'সে প'ড়ে অভিযোগ পূর্ণ কণ্ঠে বলল, "তুই ত আচ্ছা ছেলেমানুষ ছোট! কি হ'য়েছে তোর?"

কি হ'য়েছে! শৈবাল মনে মনে একটু ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু মুখে নির্ব্বিকার-ভাব বজায় রেখে বলল, "হবে আবার কি—কিছু না।"

"কিছু না যদি ত এমনি করছিস কেন? মা আজ জিজ্ঞাসা করলেন তোর এ হঠাৎ গাম্ভীর্য্যের কারণ কি—আমার সঙ্গে ঝগড়া হ'য়েছে কি না। বাস্তবিক এমনই ছেলেমানুষী আরম্ভ ক'রেছিস যে আমাকে শুদ্ধ জড়িয়ে মিথ্যে দুর্নামটাকে সৃষ্টি ক'রে একটা প্রকাণ্ড কেলেঙ্কারী সৃষ্টি না ক'রে ছাড়বি না—"

মিথ্যা দুর্নাম! শৈবালের চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌ল ঝাঁঝালকণ্ঠে বলিল, "তোর আমার সম্বন্ধটা মিথ্যা! এত বড় মিথ্যাটা তুই স্বচ্ছন্দে উচ্চারণ করলি?"

শিউলী কোন উত্তর দিল না;—দিবেই বা কি! কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে গম্ভীর স্বরে বলল, "আচ্ছা, মিথ্যে নাই হ'ল। যদি সত্যিই হয়, তাতেই বা লাভ কি। কি অভিপ্রায় তোর?"

শৈবাল সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বলল, "দেখ্, বয়সে হয়ত আমি তোর চেয়ে কিছু ছোটই কিন্তু তাই ব'লে সত্যিই একেই ছেলেমানুষ মনে করিস নি যে ভালমন্দ কোন জিনিষের দায়িত্ব জ্ঞান নেই। আমি তোকে সত্যি বড় দিয়ে করতে চাই—আর—"

শিউলী শিউরে উঠ্‌ল। ব্যগ্রভাবে দু'হাতে শৈবালের মুখটা চেপে ধ'রে ব'লে উঠ্‌ল, "থাম, থাম, তুই কি পাগল হলি? ছিঃ, এমন ছেলেমানুষী আর কখনও করিস নি।"

শৈবাল তেমনই উত্তেজিতভাবে বলল, "ছেলেমানুষী কিসের? আমি মনে প্রাণে জানি কোন অন্যায় কাজ করছি না—আর তুই হয়ত বুঝবি না এ সম্বন্ধ জগতের সামনে প্রচার করা আমার কত বড় গর্ব্বের বস্তু।"

নিবৃত্ত করার চেষ্টা যে শৈবালকে ক্রমেই উত্তেজিত ক'রে তুলছে তার উদ্দীপ্ত কণ্ঠ এবং চোখ মুখের ভাব থেকে শিউলী তা বুঝল, তাই কণ্ঠ স্বরটাকে কোমল ক'রে সস্নেহে তার চুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, "আর বুড়োমি করিস নি ভাই। আমার উপর তোর যদি এক-টুকুও স্নেহ থাকে, তবে এ কথা খবরদার আর মনেও আনিসনি। আমাকে আশ্রয়চ্যুত করতে যদি না চাস তবে এমনই ভাবে অপমান আর আমাকে করিস নি।" চক্ষু তার সজল, করুণ হ'য়ে উঠ্‌ল, কণ্ঠ বাষ্পে রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

শৈবাল অত্যন্ত আহত হ'ল। হতাশাভরে পুনরায় শুয়ে প'ড়ে ব্যথিত কণ্ঠে বলল, "আমাকে মাফ্ কর। সত্যিই আমি তোকে অপমান করতে চাইনি, তবে নিজের মন দিয়ে অপরকে বিচার করতে চেয়েছিলুম।" সে ধীরে ধীরে ফিরে শুল।

শিথিল দেহ মনী নিয়ে, শিউলি এসে নিজের ঘরে শয্যায় লুটিয়ে পড়ল।

কণপ্রভা দেবী ঘরে প্রবেশ করে, শিউলীকে অসময়ে ও রকম ভাবে বিছানায় প'ড়ে থাকতে দেখে উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "শিলি! এ সময়ে অমনভাবে শুয়ে কেন মা?" তারপর স'রে এসে কপালের তাপ পরীক্ষা ক'রে সস্নেহকণ্ঠে বললেন, "অসুখ করেনি ত?"

শিউলী উঠে ব'সে বলল, "না, অসুখ করেনি। তবে শরীরটা ভাল নেই।" তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে সহসা বলল, "আচ্ছা মা, এইবার কলকাতায় ফিরে গেলে হয় না? ছোট ত' বেশ সেরেছে।"

কণপ্রভা দেবী কোমলস্বরে বললেন, "কেন রে পাগলি? মন কেমন করছে?"

শিউলী থাক্ মেড়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "করে না বুঝি? বড়দি, নীরা সবাই সেখানে রইল—কদ্দিন দেখিনি!"

কণপ্রভা দেবী হেসে বললেন, "তা বটে কিন্তু বুড়ীমা বিয়ে হ'লে, শ্বশুর-ঘর করতিস কি ক'রে?"

শিউলী ঝঙ্কার দিয়ে বলে, "সে কি ক'রে করতুম না করতুম তার হিসেব পরে হবে কিন্তু এখন আমার যা ক্ষিদে পেয়েছে—উঃ।"

কণপ্রভা দেবী ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, "তাই নাকি তা' এতক্ষণ বলিস্‌নি কেনরে? চল, তোকে ক'খানা গরম লুচি ভেজে দি।"

—"থাক্ থাক্ চাষার মেয়েকে আর এত আদর করে না।" ব'লে শিউলী কণপ্রভা দেবীর দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। আর তিনি সযত্নে শিউলীর মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন; তাঁর মুখে তখন স্নেহ-কোমলতার স্নিগ্ধ মাধুর্য্য ফুটে উঠেছে।

ছয়

সকলে কলকাতায় ফিরে এল।

শৈবাল পূর্ব্বের মতই বিষণ্ণ গম্ভীর।

শিউলী তার ব্যবহার দেখে মনে মনে অত্যন্ত শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

সেদিন সকালে কণপ্রভাদেবী ব'সে তরকারী কুটছিলেন, শিউলী ধীরে ধীরে তাঁর পাশে গিয়ে ব'সে পড়ল।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে?"

শিউলি সহজ গলায় বলল, "এমনই! তোমাকে সাহায্য করতে এলুম।" তার পর ঝুড়ি থেকে গোটাকয়েক আলু তুলে নিয়ে ছাড়াতে সুরু করল। সহসা এক সময় মৃদুকণ্ঠে বলল,—"একটা কথা বলব মা? আচ্ছা, ছোটর এবার বিয়ে দিলে হয় না?"

গৃহিণী মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, "আমারও ত তাই একান্ত ইচ্ছে মা; বয়স হয়েছে, কোন্‌দিন মরে যাব। ছোট ছেলের বউ দেখে যাই এত বড্ড ইচ্ছে। কতবার বলেছি খোকাকে, কিন্তু সে একগুঁয়ে ছেলে—কিছুতেই মত করাতে পারিনি।"

শিউলী ঠোঁট উল্টে বলল, "ইস্! মত নাকি আমার করাতে পারা যায় না! আচ্ছা, মত করাবার ভার আমার।"

গৃহিণী হাতের কাজ শেষ ক'রে বঁটিটা কাত ক'রে শুইয়ে রেখে বললেন, ""কর্ত্তা মারা যাওয়ার পর সংসারে একদণ্ডও কি মন বসে মা? খোকার বিয়ে দিয়ে, স্থিতি ক'রে ইচ্ছে আছে কাশীবাস ক'রব—তা পোড়া বরাতে আর হ'য়ে উঠ্‌ছে না।"

চোখে-মুখে-উৎফুল্ল ভাব ফুটিয়ে তুলে উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে শিউলী বলল, "সেই ভাল মা, ছোটর বিয়ের' পরই আমরা মায়ে-ঝিয়ে কাশীতে গিয়ে বাস করব।"

কণপ্রভা দেবী মুখ তুলে ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, "তুই কি দুঃখে কাশীবাস করতে যাবি? তোর কি সেই বয়স!"

শিউলী জোর ক'রে হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, "বাঃরে, মায়ের সঙ্গে যাব তার আবার বয়সের হিসেব আছে নাকি?"

কণপ্রভা দেবী তরকারীর থালিটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুই আর আমাদের সামনে বুড়োমি কথাগুলো বলিসনি।"

গৃহিণী রান্নাঘরের উদ্দেশে চলে যেতে শিউলী হাতের কাজ বন্ধ রেখে, স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল।

ঘরে ঢুকল নীরা।

পার্ব্বত্য-নির্ঝর-প্রপাতের মত উচ্ছল আবেগে শিউলীর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বলল, "শিলীদি, তুই এখানে এমনই ক'রে ব'সে, আর আমি তোকে সারা বাড়ী খুঁজছি।"

শিউলী তার চিবুক নাড়া দিয়ে বলল, "কেন বল দিকি?"

শিউলীর গলা জড়িয়ে ধ'রে মিনতি ভরাকণ্ঠে নীরা বলল, "বাগেশ্রীটা আর একবার গেয়ে দিবি ভাই? এমনই মাথা আমার মোটা যে কিছুতেই তুলে নিতে পারছি না।"

"শক্ত সুর, দু'চার বার গোলমাল সকলেরই হয়, এর জন্য এত কৈফিয়ত দাখিল করছিস্ কেন? তুই চল নীরা, আমি যাচ্ছি।"

নীরাকে বার কয়েক সুরটা দেখিয়ে দেবার পর, মাতার আহ্বানে সে উঠে যেতেই শিউলী পাল্টা সেই সুরটাই আপনার মনে গাইতে লাগল।

শৈবাল এসে কখন যে দাঁড়িয়েছে, তা সে টেরই পায়নি। গান থামল; কিন্তু তার শিক্ষিত গলার মিষ্ট মীড়গুলি একটা অতি করুণ রেশ তুলে ঘরের চতুর্দ্দিকে যেন কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শৈবাল বলল, "তোকে পুজো করতে ইচ্ছে ক'রে। কতদিন যে তোর গান শুনি নি—"

শিউলী চম্‌কে উঠেছিল। ফিরে তাকিয়ে মুখটা তার লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। রহস্য-তরল কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করল, "দিন দিন যা মা-লক্ষ্মীর বাহনটি হ'চ্ছ,—তাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে?"

শৈবাল তার উত্তরে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে শুধু একটা "হুঁ" ব'লেই আবার চুপ ক'রে গেল।

একটা কুশ্রী নিস্তব্ধতা উভয়ের মাঝে বিরাজ করতে লাগ্‌ল।

শিউলী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ ক'রে কিছু একটা বলবার জন্যই বোধ হয় বলল, "ছোট্, একটা কথা বলব? রাখিস্ ত বলি?"

শৈবাল মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, "কি কথা না শুনলে কেমন ক'রে বলব রাখতে পারব কি না।"

শিউলী শান্ত কোমলস্বরে বলল, "তোর বিয়ের সম্বন্ধ করছি, বুঝলি?"

তার কথা শুনে শৈবালের ভ্রূ-দুটো কুঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল। মৃদুকণ্ঠে শুধু বলল, "বটে!"

শিউলী মিনতিমাখা স্বরে বলল, "মা বুড়ো হ'য়েছেন, কাশী যেতে চান। তোর বিয়ে না দিয়ে ত যেতে পারেন না। তাঁর একান্ত ইচ্ছে, কিন্তু তুই রাজী হ'চ্ছিস না ব'লে তাঁদের দুঃখের আর সীমা নেই—"

শৈবাল বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "তাঁদের মানে? তুইও ওর মধ্যে নাকি?"

শিউলী বলল, "যদি তাই হই, কিন্তু শোন, তাঁর কাছে আমি বড় মুখ ক'রে ব'লেছি যে তোকে রাজী করাব। আমার মুখ রাখবি না ভাই?"

শৈবাল তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "কেন রাখব না,—কিন্তু আগে শুনতে চাই কনেটি কে?"

শিউলী হেসে বলল, "সে আগে বলব না, তবে এইটুকু জানাতে পারি যে, আমি যখন বলছি তখন কনে অবশ্যই খারাপ হ'বে না। তুই আগে রাজী কি না বললে—"

শৈবাল অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে বলল "বেশ, আমি তোর মুখ রাখতে রাজী আছি এক সর্ত্তে—"

একটা সংশয়ে শিউলীর বুকটা টিপ টিপ করতে লাগল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শৈবালের মুখের পানে তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, "কি শুনি?"

শৈবাল দৃঢ় অবিকম্পিত কণ্ঠে বলল, "বিয়ে করতে রাজী আছি যদি তোর সঙ্গে হয়, নইলে নয়।"

তার কণ্ঠস্বরে মিথ্যা বা পরিহাসের লেশমাত্র ছিল না।

শিউলীর মুখটা ছাইএর মত সাদা হ'য়ে গেল। কানের দু'পাশ দিয়ে আগুনের হল্কা ব'য়ে যেতে লাগল। শুধু তার কম্পিত ঠোঁট দুটি দিয়ে কথা বলার একটা অনর্থক চেষ্টা দেখা গেল।

বহুক্ষণ বাদে, নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে কথাটাকে লঘু ক'রে দেবার জন্যই ম্লানভাবে হেসে বলল, "ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে চললে ত ছাড়চি না ভাই—"

শৈবাল ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে বলল, "ফাঁকির মর আবার এর মধ্যে পেলি কোথায়? এর চেয়ে Seriously আমি আর কখনও কোন কথা বলিনি—"

শিউলী অত্যন্ত নীরসকণ্ঠে বলল, "এ পাগলামি ক'রে লাভ কি হ'চ্ছে? যা হ'বার নয় তার জন্য কল্পিত ব্যথায় নিজেকে পীড়ন করায়, আত্মীয়-স্বজনের মনে ব্যথা দেওয়ার যে কি সার্থকতা বুঝি না—"

শৈবাল পাল্টা স্বরে জবাব দিল, "বুঝতে হয়ত পারতে যদি ভালবাসার পবিত্র জলে মনটা ধুয়ে নিতে পারতে। মনটা আমার তোমার মত অত ময়লা নয়, এইটেই বলতে চাই—"

শিউলীর চোখ দুটো উগ্র জ্বালায় ধক্ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল। কণ্ঠে বিষ ঢেলে বলল, "আর আমিও তোমায় এইটেই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, একজন নারীকে—যাকে এতদিন বোনের প্রাপ্য দিয়ে এসেছ, তাকে যখন-তখন খুসীমত অপমান করবারও তোমার কোনই অধিকার নেই!"

"তোমাকে অপমান করি!" অসহ বিস্ময়ে শৈবালের চোখ দুটো ঠিকরে পড়বার মত হ'ল। ভগ্নকণ্ঠে বলল, "আমি তোকে অপমান করি এই যদি তোর ধারণা হ'য়ে থাকে,—বেশ, আর কোন দিন তোকে কিছু বলবার মত ধৃষ্টতা করব না। মূর্খ আমি, তাই ভালবাসার দাবী করতে গিয়েছিলেম—"

অন্তরের অবরুদ্ধ যাতনায় শিউলীর চোখ মুখ হিংস্র জন্তুর মত বীভৎস হ'য়ে উঠেছিল। অত্যন্ত নির্মম ভাবে বলল, "ভালবাসাটা মোটেই ছেলেখেলা করার মত জিনিষ নয়! তা'ছাড়া ভালবাসার দাবী করার আগে এটাও তোমার ভাবা উচিত ছিল যে তোমাকে ভাল না বাসলেও জগতের স্ত্রী জাতির দিন চলতে পারে; তুমিই তাদের প্রেমের একমাত্র আদর্শ পাত্র নও।

শিউলীর প্রতিটি বাক্য যেন নির্মম কশাঘাতের মত শৈবালের পিঠে পড়ছিল এমনই বেদনা-বিবর্ণ মুখে সহসা চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল "বলছি, আমার ক্ষমা কর শিলি, আমার অপরাধ হ'য়েছে।"

শৈবালের বেদনার্ত্ত স্বর শুনে শিউলী তার পাংশু মৃত্যু-বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে চম্‌কে উঠ্‌ল। নিজের ব্যথা এতক্ষণ তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। একি ক'রেছে সে!

বুকটা তার গুরু বেদনায় ভেঙে যাবার মত হ'ল। কণ্ঠস্বরটাকে ঈষৎ কোমল ক'রে বলল, "সত্যিই [illegible] করবার অধিকার হয়ত আমার নেই, কিন্তু এইটেই আমি ব'লতে চাই কতকগুলো সস্তার নাটক-নভেল প'ড়ে ভালবাসাটা নিয়ে পলাবাজী ক'রে বেড়িয়ে, আত্মীয়-স্বজনের মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।"

শৈবাল সবেগে উঠে দাঁড়াল। চোখ দুটো তার অস্বাভাবিক দীপ্তিতে ভরা। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, "আমার কি করা উচিত না উচিত সে আমি বেশ জানি; তার জন্তে অপরের উপদেশের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই; কিন্তু বার বার এক কথা ব'লে আমার ভালবাসার অবমাননা না করলেও পার! এর দাম তোমার কাছে হয়ত কিছু নেই, কিন্তু—"

আর সে কিছু বলতে পারল না। ক্ষোভে, দুঃখে কণ্ঠ তার রুদ্ধ হ'য়ে গেল। ঠেলে-ওঠা বাষ্প রাশি কোন রকমে চাপতে চাপতে সে একপ্রকার ছুটেই পালাল।

শিউলীর চোখও শুষ্ক ছিল না। এ কী করে বসল সে! ঠেকাতে গিয়ে সে যে আপনাকে আরও প্রকাশ করেই দিল। শৈবালকেও ত সে, এমনই করে ব্যথা দিতে চায়নি। তবে—'

(আগামী বারে সমাপ্য)
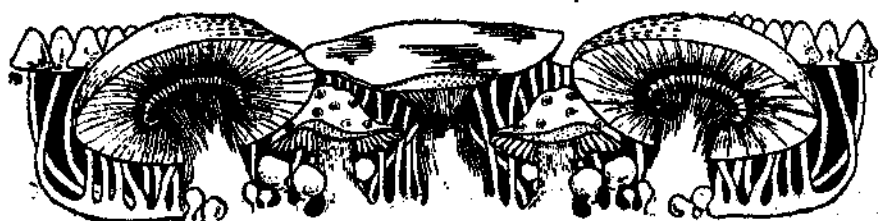
বিলাতের প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্তা রেণুকা দেবী

বঙ্গমহিলার বিলাত-ভ্রমণে নূতনত্ব আর নাই, ভ্রমণ-বৃত্তান্তের রচনাও পুরাতন হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং চর্বিত-চর্বণে ফল কি ? বিলাতবাসীদের প্রকৃতির ও দেশের কিছু পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

এদেশের অধিবাসীদের সম্ভ্রম ও সহানুভূতিপূর্ণ সরল ব্যবহার সহজেই ইহাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদেশের বহু নরনারীকে আমাদের দেশে দেখা যায়, কিন্তু ইহাদের যথার্থ স্বরূপ সেখানে ধরা পড়ে না—নানা কারণে তাহা অবশ্য সম্ভবও নয়।

ইহারা একে অপরকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ—তাহাতে তাহাদের কি অপার আনন্দ! পথে, ঘাটে, কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কত নম্র ও বাগ্র-ভাবে ভদ্রতার সহিত উত্তর দেয়! এখানে কেহই নিজেকে তুচ্ছ মনে করে না; এই আত্মসম্মান-জ্ঞানই বোধ হয় ইহাদিগকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তোলে। আর একটি মহৎ গুণ ইহাদের অতিনিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও দেখা যায়, তাহা আমাদের দেশের এই স্তরে এমন কি উপরের স্তরেও সুলভ নয়; সেটী ইহাদের সততা। রেলে, ষ্টীমারে, কোথাও জিনিষের জন্য রসিদ দেওয়ার প্রথা নাই, এমন কি পোষ্টাল মণি-অর্ডারের পর্য্যন্ত কোনও রসিদ দেয় না। যথেচ্ছভাবে সামান্য সুতা দ্বারা বাঁধিয়া পার্শেল রেল পথে পাঠাইলেও কিছুই হারায় না। ভোরে প্রতি গৃহদ্বারে দুধ, রুটী, তরকারী প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রেতার লোকেরা রাখিয়া যায়, গৃহস্থ হয়ত দুই তিন ঘণ্টা পরে উহা গৃহজাত করেন, ইতিমধ্যে ক্ষুধার্ত্তেরা পথ দিয়া চলিয়া যায়, বালক-বালিকারা কাছে খেলা করে, কিন্তু কেহ উহা স্পর্শও করে না।

প্রাথমিক শিক্ষা ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালক-বালিকার পক্ষে বাধ্যতামূলক। "প্রিলিম" বা আমাদের দেশের আই-এ ষ্ট্যাণ্ডার্ড পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই বিনা খরচে পড়িতে পারে। এজন্য ধনী, নির্ধন, ইতর, ভদ্র প্রত্যেকেই কমবেশী শিক্ষিত এবং এই কারণেই শিক্ষার অযথা অহঙ্কার ইহাদের মনে আদৌ নাই। প্রাথমিক শিক্ষার বয়স উত্তীর্ণ হইলেই মধ্যবিত্ত ও গরীব শ্রমিকেরা কার্য্যে লাগিয়া যায়। অতি অল্পসংখ্যক মেধাবী ও স্বচ্ছল অবস্থার ছাত্রেরা উচ্চ শিক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। গরীব গৃহস্থের ছেলে বিশিষ্ট মেধার পরিচয় দিলে নানা প্রকার সাহায্য দ্বারা তাহাকে উচ্চশিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও আছে। ইহাদের শিক্ষার পদ্ধতিও আমাদের দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। নিম্ন বিদ্যালয়গুলিতেও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গেসঙ্গে সকল রকম কার্য্যকরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে, আর আছে যাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে সেজন্য নানাবিধ ব্যায়ামের সুযোগ ও সুব্যবস্থা। স্কুল ছাড়িলে ছাত্র ও ছাত্রীদের স্ব স্ব অনুরাগ অনুযায়ী কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইবার অসুবিধা হয় না। অভিভাবকেরাও এ বিষয়ে ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়া থাকেন। অনেক স্কুলে, এমন কি অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজেও গ্রীষ্মের বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের নানা স্থানে যে কোনও কাজে পাঠাইয়া অর্থোপার্জ্জনের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সময়ে এদেশে ক্ষেত্র হইতে আলু তোলা হয়; বহু ছাত্র ছাত্রী এই সব কাজে কৃষকদিগকে সাহায্য করিয়া দৈনিক ৩\।৪\ টাকা উপার্জ্জন করে। কোনও কার্য্যই ইহারা ছোট বলিয়া মনে করে না বা তাহা সম্পাদন করিতে দ্বিধা করে না। প্রথম জীবনের ভিত্তি শিক্ষার উপর গঠিত হওয়ায় শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সকলেরই থাকে। সামান্য কয়লা-খাদের কুলী, চিমনীওয়ালা, মেছুনী, গোয়ালিনী প্রভৃতি সকলেই দেশের সমস্ত খবর রাখে, নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পড়ে এবং সরকারী যাবতীয় কার্য্যের সমালোচনা করিয়া স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা রাখে। উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ পুত্রের পক্ষে অবসর সময়ে পিতার রুটী ব সিগারেটের ক্ষুদ্র দোকানে বিক্রেতার কার্য্য করা এখানে অতি সাধারণ ঘটনা। শ্রমের মর্য্যাদা এই জাতি বুঝিয়াছে

বলিয়া কোনও কাজই ইহাদের নিকট তুচ্ছ নহে, কোনও শ্রমিকই হেয় নহে। সহরের কোথাও 'কুলী' বলিয়া কোনও জীব দেখা যায় না। বড় বড় ষ্টেশনেও কুলী বিরল—যাহারা আছে তাহারা ভারী মোটের জন্য ঠেলাগাড়ী লইয়া বড় বড় মাল লইয়া যায়, যাত্রীরা সকলেই যে যাহার মোট নিজেরা বহন করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে চলিয়া যায়। শ্রমিকদের পারিশ্রমিকও অত্যন্ত বেশী। দেশের বড় বড় পদস্থ লোকেরাও নিজেদের 'সুটকেস' হাতে লইয়া ট্রামে, বাসে, চলাফেরা করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা ইহাদের মজ্জাগত, সকল কাযেই এরা সুচারুরূপে সমাধা করিতে চেষ্টা করে। ধনীর প্রাসাদ হইতে কৃষকের গৃহ পর্য্যন্ত কোথাও অপরিষ্কার অগোছাল ভাব দেখা যায় না। সারা দেশটা যেন সযত্নে পরিপাটী করিয়া সাজান। পথের মোড়ে মোড়ে থামের মাথায় "থুথু ফেলিও না", "আবর্জ্জনা ছড়াইও না" ইত্যাদি লেখা আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, পথিকেরা এই সকল নিষেধ বাস্তবিকই মানিয়া চলে। থিয়েটার বায়স্কোপে ছোট ছোট মেয়েরা পরিদর্শকের কায কি সুশৃঙ্খলার সহিত করিতেছে দেখিলে প্রকৃতই বিস্মিত হইতে হয়। ৩০।৪০টী বালিকা দুই তিন হাজার দর্শককে নিঃশব্দে বসাইতেছে, কেহ কিছু চাহিলে তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিতেছে, কোথাও একটু গোলমাল নাই। প্রথম যিনি আসিয়াছেন তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে, তাঁহার পরে যিনি আসিবেন তিনি যতই কেন পদস্থ হউন না কেন, তাঁহাকে পিছনে দাঁড়াইতেই হইবে, কিন্তু পাশাপাশি দুই জনের বেশী দাঁড়াইতে পাইবেন না, এইরূপ পরে পরে সারি বাঁধিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইহারা হৃষ্টচিত্তে দাঁড়াইয়া থাকে—ইহাকে "কিউ" হওয়া বলে। অনেকে মাঝে মাঝে সিগারেট ইত্যাদি কিনিতে যায় কিন্তু তাহার স্থান কেউ দখল করিয়া লয় না—অথচ এই সকল ব্যবস্থা করিবার জন্য পুলিশ বা রঙ্গালয়ের কোনও লোক উপস্থিত থাকে না; জনসাধারণ নিজেরাই এইরূপ শৃঙ্খলার সহিত দাঁড়াইয়া থাকে। রেলে, ষ্টীমারে, পোষ্ট-আপিসে বা কোন দর্শনীয় স্থানে সর্ব্বত্র এই "কিউ" পদ্ধতি প্রচলিত। শৃঙ্খলার প্রতি সম্মান ও কর্ত্তব্যবোধ ইহাদের সকল কার্য্যে, সকল অবস্থায় প্রকাশ পায় এবং ইহার শিক্ষা ইহারা বাল্যকাল হইতেই পাইয়া থাকে। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর সজ্জা আমাদের দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার সমতুল্য। যাত্রীরা অধিকাংশই কৃষিজীবি, শ্রমিক বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—কিন্তু কোন গাড়ীতে বিন্দুমাত্র গোলমাল নাই। প্রতি বেঞ্চে ৩ জন করিয়া বসিবার স্থান ও নম্বর দেওয়া—কোন কোন গাড়ীতে মাঝে মাঝে হাতল দিয়া বিভক্ত। আসনের সংখ্যানুযায়ী টিকিট বিক্রয়ই পদ্ধতি, তবে বিশেষ প্রয়োজনে কাহারও যাওয়া আবশ্যক হইলে বা অন্য টিকিট-বিক্রয়-স্থান হইতে ক্রীত টিকিট-বাহীরা স্থান না পাইলে সেই 'কিউ' করিয়া সংলগ্ন বারান্দায় (করিডরে) দাঁড়াইয়া থাকে। কোথাও ঠেলাঠেলি, মারামারি, ভীড় চোখে পড়ে না। যে যাহার বই, কাগজ পড়িতেছে, কেহ কেহ বা অপর যাত্রীদের পড়িবার পাছে অসুবিধা হয় এজন্য নিম্নস্বরে পরস্পর আলাপ করে যাহারা ধূমপান করিতে চান তাঁহাদের কামরা স্বতন্ত্র। দরিদ্রের অভাব এদেশে নাই—তবে দরিদ্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা অবশ্য এদেশে নাই। ইহাদের অভাববোধ আমাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখানে কেহ অনাহারে মরে না বা বিশেষ কষ্ট পায় না। ইহাদের "সরকার" বা কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এবং ইহাদেরই আপনার লোক দ্বারা গঠিত। তাঁহারা "বেকার সমস্যা" নিরাকরণের জন্য জাহাজ তৈয়ারী, খাল-কাটা, পথ ও সহর নির্ম্মাণ, কোনও নূতন ব্যবসা বা কারখানা খোলার বন্দোবস্ত করিয়া নানারূপে দরিদ্রদিগকে সাহায্য অর্থাৎ কাযে লাগাইবার বিধিব্যবস্থা করিবার জন্য সতত সচেষ্ট। ইহা ব্যতীত বার্দ্ধক্যবৃত্তি, বেকারবৃত্তি ইত্যাদি কত যে ব্যবস্থা আছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রবন্ধে এদেশবাসীর সদগুণেরই উল্লেখ করা হইল। ইহাদের দোষও অবশ্য আছে এবং তাহা চোখেও পড়ে, কিন্তু—"দোষ গুণে ভরা এ সংসার, দোষ ফেলে গুণ লও হবে উপকার"—ইহা স্মরণ করিয়া প্রথমেই ইহাদের সদগুণ বর্ণিত হইল। ভবিষ্যতে অন্যান্য আলোচনার বাসনা রহিল।

শ্রীরেণুকা দেবী

এডিনবরা, ৮—১০—৩০

পুস্তক-পরিচয়

রামকৃষ্ণ-জীবনী—রোমঁ্যা রোলঁা প্রণীত

বর্ত্তমান ইউরোপের মনীষি-শ্রেষ্ঠ রোমঁ্যা রোলঁা (Romain Rolland) যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন রচনা কার্য্যে গত দুই বৎসর ধ'রে ব্যাপৃত ছিলেন, সে সংবাদ 'বিচিত্রা'র পাঠকবর্গের কাছে শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় পূর্ব্বেই বহন করে এনেছিলেন। দুইখণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ড—অর্থাৎ রামকৃষ্ণের জীবনী—সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। খুব সম্ভব, বিবেকানন্দের জীবনী খণ্ডও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

ইতিহাস এবং জীবনী সরস ক'রে পাঠকের সামনে পরিবেশন ক'রতে ফরাসীরা সিদ্ধহস্ত—এ কথাটার প্রমাণ এই পুস্তকখানিতে পাওয়া যায়। আশা করি পুস্তকখানি শীঘ্রই বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হবে। তাতে ক'রে পরোক্ষ ফলও একটা পাওয়া যাবে। বাংলা ভাষায় ভাল জীবনচরিত* নেই ব'ললেই হয়। তার কারণ জীবনচরিত লেখার আদর্শটা আমাদের দেশে নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। অনুবাদখানি সেই অভাব কতকটা পূর্ণ ক'রতে পারে। রোমঁ্যা রোলঁার লেখায় অন্ধ ভক্তি উচ্ছ্বাস নাই এবং আরও একটা জিনিস যা' পাঠককে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে—অর্থাৎ historic sense-এর দোহাই দিয়ে অক্ষম লেখকের তুচ্ছ কথার এবং ক্ষুদ্র ঘটনার বিস্তৃত আলোচনা—তাহাও নাই।

অথচ এই পুস্তকে রামকৃষ্ণ জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিত কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী এবিষয়ে আমাদের আদর্শ হ'তে পারত যদি তা বাংলায় লেখা হ'ত। কিন্তু তার বাংলা অনুবাদ হয়নি এবং ইংরাজী বইখানিও এখন দুষ্প্রাপ্য।

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে রোমঁ্যা রোলঁার যে সব কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল তা' প'ড়ে এ দেশে অনেকের মনে একটা ঔৎসুক্য জেগেছিল—এইটে জানবার জন্যে যে, রামকৃষ্ণ-চরিত্র রোমঁ্যা রোলঁার ন্যায় ব্যক্তির চক্ষে কি ভাবে প্রতিভাত হয়েছে। সাধারণের ধারণা হয়েছিল তা'ই থেকে এটা বুঝতে পারা যাবে যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ইউরোপ কি ভাবে নিতে প্রস্তুত আছে।

ম্যাক্‌স্ মূলর লিখিত রামকৃষ্ণ-জীবনীতে এ বিষয়ের একটা সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না, কেননা সে জীবনীতে ম্যাক্‌স্ মূলরের পাণ্ডিত্য এবং উদারতার যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, ইউরোপী লোকমত সম্বন্ধে তাঁর একটা অযথা সমীহ ভাবের পরিচয় তার চেয়ে বড় কম পাওয়া যায়না।

ম্যাক্‌স্ মূলরের পাণ্ডিত্য হয়ত রোমঁ্যা রোলঁার নাই; কিন্তু রোমঁ্যা রোলঁার যা আছে তা পৃথিবীর খুব কম পণ্ডিতেরই আছে এবং তা' হ'চ্ছে প্রতিভার অন্তর্দৃষ্টি সেই অন্তর্দৃষ্টির আলোকপাতে তিনি রামকৃষ্ণ-চরিত্র এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে তার ঔজ্জ্বল্য প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় মহাদেশেরই মানব মনের অন্ধকার দূর ক'রবে আশা করা যেতে পারে।

রোমঁ্যা রোলঁা তাঁর প্রাচ্য পাঠকদের উদ্দেশ করে গোড়াতেই বলেছেন যে তিনি রামকৃষ্ণকে তাঁর ভারতীয় ভক্তদের ন্যায় অবতার ব'লে মানতে প্রস্তুত নন। অবতার উপাধিটা ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে এমন সহজলভ্য হ'য়েছে যে ও কথাটার উপর শুধু রোমঁ্যা রোলঁার কেন এদেশের অনেকেরই একটি বীতশ্রদ্ধ ভাব

* এই পুস্তকখানি ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় ইউরোপ এবং ভারতবর্ষে এক সঙ্গেই প্রকাশিত হ'য়েছে। ভারতীয় ইংরাজী সংস্করণের নাম Life of Ramakrishna এবং তাহা কলিকাতা মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট অদ্বৈতাশ্রম হইতে প্রকাশিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

এসে গেছে। রোমঁ্যা রোলঁ্যা সর্ব্বভূতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন—জড় ও চৈতন্য, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ—সৃষ্টির সমস্ত-কিছুর মধ্যে তিনি এক সর্ব্বব্যাপী সত্বার পরিচয় পান তবে এই সঙ্গে তিনি এটুকুও স্বীকার করেন যে ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে এই সত্বা ঘনীভূত ভাবে অবস্থিতি করে এবং ব্যক্তি বিশেষের মধ্য দিয়েই তা' সময় বিশেষে প্রকাশিত হয়। এতদূর পর্য্যন্ত রোমঁ্যা রোলাঁর সঙ্গে গীতাবাদী হিন্দুর কোনও মতবিরোধ নাই। কিন্তু রোমঁ্যা রোলাঁ এইখানেই ক্ষান্ত হন নাই—তিনি নিজের বক্তব্য বিশদ করবার জন্যে ব'লেছেন যে তিনি এই বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তিশালী ব্যক্তিগণকে—অর্থাৎ বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, রামকৃষ্ণ প্রভৃতিকে—জগতের অন্যান্য সংস্কারকের থেকে আলাদা ক'রে দেখতে প্রস্তুত নন্। বিশেষ করে গত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে সকল সংস্কারকগণ জন্মেছেন তাঁদের সাধনার প্রতি রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে তিনি যথোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে কুণ্ঠিত হন নি। তিনি রামকৃষ্ণ জীবনীতে রাম মোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন এবং দয়ানন্দ সরস্বতীর কর্ম্মজীবনের বিশদ আলোচনা করেছেন। গান্ধী এবং অরবিন্দ রামকৃষ্ণের পরবর্ত্তী ব'লে তিনি তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা সতন্ত্র ভাবে করেছেন—গান্ধী সম্বন্ধে পুস্তকাকারে এবং অরবিন্দ সম্বন্ধে Revue Europe-এ 'India on the March' নামক প্রবন্ধাকারে। বোধ হয় বিবেকানন্দের সমসাময়িক রূপে দ্বিতীয় খণ্ডে এঁদের বিষয় তিনি বিশদ ভাবে আলোচনা করবেন। সে যাই হোক্, রোমঁ্যা রোলাঁর মতে এই সকল সংস্কারকগণের প্রচেষ্টা বিভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য একই। ভিন্ন ভিন্ন নদী যেমন পথ দিয়ে একই বিশাল সাগরের উদ্দেশ্যে ধাবমান, এঁদের বিভিন্ন প্রচেষ্টাও সেইরূপ একটা বিরাট একত্বের অভিমুখে ধাবিত হয়েছে। তবে রামকৃষ্ণের বিশেষত্ব কোথায় এবং তাঁর জীবনী আলোচনার সার্থকতাই বা কোনখানে? তার উত্তরে রোমঁ্যা রোলাঁ বলেন—"It is because Ramakrishna more fully than any other man not only conceived, but realized in himself the total Unity of this river of God, open to all rivers and all streams, that I have given my love; and I have drawn a little of his sacred water to slake the great thirst of the world."

তাঁর পাশ্চাত্য পাঠকবর্গকে তিনি কিন্তু এত সহজে নিষ্কৃতি দেননি। তাঁদের উদ্দেশ করে তাঁকে অনেক কথাই ব'লতে হ'য়েছে। সংক্ষেপে; তিনি এই ব'লতে চান যে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের আদর্শ আপাতঃ বিভিন্ন হ'লেও, মূলতঃ এক। প্রাচ্য ভক্তি বিশ্বাসের পথে এবং পাশ্চাত্য বিচার বুদ্ধির পথে একই আদর্শের অনুসরণ করছে; শুধু অনুসরণকারীর সংকীর্ণ দৃষ্টির সমক্ষে আদর্শ একদেশী হ'য়ে দেখা দেয়—এইমাত্র। রোমঁ্যা রোলাঁ চিরজীবন মানবতার বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধন করবার চেষ্টা করে আসছেন;—বিশেষ ক'রে গত কয়েক বৎসর ধ'রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব-ধারার মধ্যে তিনি একটা একত্বের অনুভূতি পেতে চেষ্টা ক'রছেন। তাঁর বিশ্বাস যে, অতীতের সাধনা এবং বর্ত্তমানের আকাঙ্ক্ষা—এই দুটো জিনিষের ভবিষ্য সমাধান নির্ভর ক'রছে একমাত্র এই সামঞ্জস্যের উপর এবং এই সামঞ্জস্য সমাধানের কুঞ্চিকাটী তিনি খুঁজে পেয়েছেন রামকৃষ্ণ চরিত্রে। আর সেইজন্যই তিনি এই চরিত্র য়ুরোপের সামনে ধ'রেছেন। তিনি ব'লেছেন "I am bringing to Europe......a new message of the soul, the symphony of India, bearing the name of Ramkrishna......The man whose image I here evoke was the consummation of two thousand years of the spiritual life of three hundred million people. Although he has been dead forty years his soul animates modern India. He was no hero of action like Gandhi, no genius in art or thought like Goethe or Tagore. He was a little village Brahmin of Bengal, whose onter life was set in a limited frame without striking incident, outside the political and social activities of his time. But

his inner life embraced the whole multiciplity of men and Gods."

এই সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টাই শুধু রামকৃষ্ণের নয় যুগ যুগ ধ'রে চ'লে আসছে ব্যক্তি বিশেষের সাধনার মধ্য দিয়ে; যাতে মনে হয় যেন একই আত্মা বিভিন্ন সাধনার মধ্য দিয়ে পূর্ণ পরিণতির দিকে চলেছে: It is always the same Man, the Son of Man, the Eternal, Our Son, Our God reborn. With each return he reveals himself a little more fully and more enriched by the universe. Allowing for differences of country and of time is the younger brother of own Ramakrishna Christ.

রামকৃষ্ণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে ক্রিষ্ট য়ুরোপের কানে তিনি অমরত্বের বাণী শোনাতে চান: It is my desire to bring the sound of the beating of that artery to the ears of fever stricken Europe which has murdered sleep. I wish to wet its lips with the blood of Immortality. এ সাধনা সফল করতে যে রোমাঁ রোলাঁর স্থায় শক্তিমান সাধকের দরকার ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

এক কথা

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ

জীবনের প্রথম প্রণয়ী, কুমারীর হৃদি-রাজ্য-জয়ী,
সে-রাজত্ব বিশাল বিরাট; ভবিষ্যের অপূর্ব্ব সম্রাট!
অথণ্ড সে রাজ্যে যদি নাহি জন্মে কোন অধিকার,
পথ হ'তে ফিরে যাও পথভ্রান্ত পথিক আবার,
তবু তুমি ব'লে যাও, চাহি নাক বিষম আশয়,
তোমারেই ছিল, প্রিয়, প্রয়োজন মোর অতিশয়॥
জীবনের শেষের প্রয়াসী, পরিশ্রান্ত যাত্রা-পথে-জয় অভিলাষী,
কিবা তুমি নিয়ে এস অর্ঘ্য উপায়ন,
মণি মুক্তা কাঞ্চনের বিচিত্র চয়ন,
তাহে ভরে নাক মন, ফিরে যাও লাঞ্ছিত পথিক,
পাও কি ঈপ্সিত পাশে, ওগো মুগ্ধ, বিরাম ক্ষণিক?
তবু শুনি বলে যাও, চাহি নাক বিষম আশয়,
তোমারে আছিল প্রিয়, প্রয়োজন মোর অতিশয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শর্করা-কাহিনী

শ্রীযুক্ত ননীলাল দত্ত, এম্‌-এস্‌-সি,সি,-এচ্‌, ই

মিষ্টে জগৎ তুষ্ট। মিষ্টমুখ প্রিয়দর্শন, মিষ্টবাক্যে মানুষ বশীভূত—ভগবানও নাকি সুমিষ্ট স্তব-স্তুতিতে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আবার অভ্যাগতকে 'মিষ্টিমুখ' না করাইলে গৃহস্থ ক্ষুণ্ণচিত্ত!

'মিষ্টিমুখের' মিষ্টিই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়। এই মিষ্ট হইতেই যে মিষ্টান্ন—যাহা লইয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিতে হয়; তাহার প্রধান উপকরণ—শর্করা বা চিনি। গুড় এই শর্করার আদিরূপ। চিনি, মিছরি ইত্যাদি তাহার রূপান্তর।

শর্করা বা চিনি সভ্য জগতের সর্ব্বত্র মানবের প্রধান খাদ্যের মধ্যে অন্যতম। নানা দেশে এখন ইহা উৎপন্ন হয়। শর্করা সংস্কৃত শব্দ, অথর্ব্ববেদে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়; সুতরাং অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহা ব্যবহার করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমন কি পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান ও প্রাচীন ভাষায় এই সংস্কৃত শব্দ রূপান্তরিত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে—প্রাকৃত ভাষায় ইহা "শক্করা", পারস্যে—'শাক্কার', আরবী—'শক্কর', লাটিন্‌—'শাকারাম্‌' ইংরাজী—'সুগার', স্পেনীয় ও পোর্ত্তুগীজ্‌—'আজুঁকার', ফরাসী—'সুক্রে', জার্ম্মান্‌—'জুকের', ইতালীয়—'জুকেরো', সীরিয়—'শুইকার' এবং জাপানী—'সাতো'।

চিনির প্রথম উৎপত্তি-স্থান ভারতবর্ষ। মানবজাতির খাদ্য রূপে ইহার ব্যবহার এই ভারতেই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হয়। মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে আরব ব্যবসায়ীগণ ইহা ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপ-খণ্ডে লইয়া যায় এবং সেই সময় হইতে চিনির ব্যবহার তথায় প্রচলিত হয়। গ্রীক ও রোমানগণ উচ্চ মূল্য দিয়া আরবদিগের নিকট হইতে অল্প পরিমাণে সংগ্রহ করিত। উহাদের নিকট চিনি 'ভারতীয় লবণ' নামে আখ্যাত ছিল। মূল্যাধিক্য বশতঃ ইহার ব্যবহার কেবলমাত্র ভৈষজ্য হিসাবেই হইত। কালক্রমে সভ্যতার আলোক ইউরোপের নানাদেশে ক্রমশঃ যেমন প্রবেশ করিতে লাগিল, সেই সঙ্গে চিনির ব্যবহারও প্রবর্ত্তিত হইল। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ এই সমস্ত দেশে চিনি যোগাইয়া আসিয়াছে; এমন কি গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ পর্য্যন্তও ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে ভারতবর্ষ হইতে চিনি বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইত। কিন্তু অদৃষ্টের কী পরিহাস! সেই ভারতবর্ষ আজ চিনির জন্য বহুলাংশে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী!

চিনি শরীর গঠনের ও সংরক্ষণের একটি প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য। সারা পৃথিবীতে চিনির উৎপত্তি ও ব্যবহারের পরিমাণ বৎসরে প্রায় ষাট কোটী মণ। প্রতি বর্ষেই চাহিদা বাড়িয়া যাইতেছে এবং সেই সঙ্গে উৎপত্তিও বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় এগারো হইতে বারো কোটী মণ চিনি খাদ্যের জন্য প্রয়োজন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে এই দেশে সর্ব্বপ্রকারে প্রায় সাড়ে আট কোটী মণ জন্মে এবং অবশিষ্ট প্রায় তিন কোটী মণ প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ইহার মূল্য কোটী কোটী টাকা। বৎসরের পর বৎসর এই ধন জলস্রোতের ন্যায় এই হতভাগ্য দেশ হইতে বাহির হইয়া যায়। গত কয়েক বৎসরের গড় হিসাব ধরিলে দেখা যায় যে, প্রতি বৎসর কম-বেশী কুড়ি কোটী টাকা চিনির জন্য এই দেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে এবং বাংলাদেশই ইহার অর্দ্ধাংশেরও অধিক প্রদান করে। আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে তুলাজাত জিনিষের পরেই চিনির স্থান।

ইহার প্রতিরোধের কি উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে এবং তাহা আমাদেরই হাতে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; কৃষিপণ্যের উৎপাদন করিয়াই ভারতবর্ষ আবহমান কাল কমলাকে অচঞ্চলা রাখিয়াছিল। আজ আমরা নিজ বুদ্ধি-

দোষে লক্ষীহারা, বিদেশীর হাতে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়া পর-নির্ভরশীল! উপায় যে আমাদের হাতেই তাহা জানিয়াও নিশ্চিন্তমনে বসিয়া অদৃষ্ট ও ভগবানকে দোষারোপ করি!

যে পরিমাণ জমি হইতে ভারতবর্ষে চিনি উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর অপরাপর দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে আমাদের উৎপন্ন দ্রব্যের হার বিঘা প্রতি অত্যন্ত কম। ইহার প্রধান কারণ—জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস এবং বিজ্ঞান-সম্মত উপায়-অবলম্বনের অভাব। প্রাচীন যুগে আমাদের দেশে যে ভাবে কৃষি ও শিল্পকার্য্যাদি সম্পাদিত হইত, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগেও আমরা সেই ধারাই রক্ষা করিয়া আসিতেছি। বিজ্ঞানের প্রভাবে সমগ্র সভ্য-জগতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু আমরা রক্ষণশীলতার অজুহাতে গতানুগতিক প্রথাই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি; সুতরাং আমরা যে এ যুগে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সম্পূর্ণ অক্ষম, বিচিত্র কি?

ভারতবর্ষে প্রায় আশী লক্ষ বিঘায় প্রতিবৎসর 'আখের' চাষ হয় এবং ইহা হইতে প্রায় আট কোটী মণ গুড় ও চিনি জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ এখানে বিঘা প্রতি চিনি ও গুড়ের উৎপন্নের হার গড়ে দশ মণের অধিক নহে। ইহার তুলনায় পৃথিবীর অন্যান্য ইক্ষু-প্রধান দেশের উৎপন্নের হার অনেক বেশী। আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপে বিঘা প্রতি ৫০ মণ, জাভায় ৪৫ মণ, কিউবায় ২৫ মণ ও ফর্ম্মোসায় ২০ মণ। এই সকল দেশে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়েই চিনি শিল্প চালিত হইতেছে। ভারতবর্ষেও এই উপায়ের প্রচলন না হইতে পারিবার কারণ নাই। এই উপায়ে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়াও চিনির উৎপন্নের পরিমাণ ভারতবর্ষে অনেকগুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান-বলে ভারত যে কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজনমত চিনিই উৎপন্ন করিতে পারিবে তাহা নহে, বহুকোটি মণ উদ্বৃত্ত চিনি বিদেশে রপ্তানি করিয়া জাতির ধনাগমের পথ সুগম করাও সম্ভবপর হইবে।

কিন্তু এই 'আখ' চাষের উন্নতির বিরুদ্ধ কারণও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। বহু প্রাচীন যুগ হইতে ভারতবর্ষে সমস্ত জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া কৃষক ও অন্যান্য লোকের অধিকারভুক্ত আছে। পুরুষানুক্রমে মালিকেরা সেইগুলি ভোগ-দখল করিতেছে। ভারতবর্ষের কৃষকগণ তাহাদের এই স্বল্প জমিতে মামুলী লাঙ্গল ও যন্ত্রপাতি লইয়া চাষ আবাদ করিয়া থাকে। কায়ক্লেশে তাহাতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র নির্ব্বাহ হয়। বিজ্ঞানের নব-নব কৌশল তাহারা পাইবে কোথায়? উন্নতি তাহারা করিবে কিরূপে?
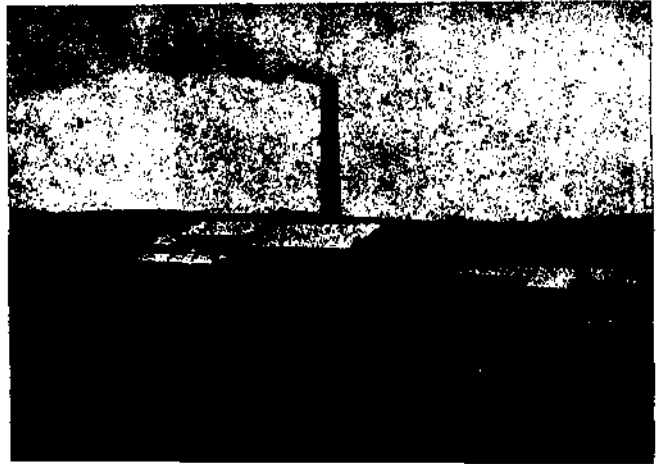
আদর্শ ও আধুনিক চিনির কারখানা

আধুনিক বিজ্ঞান-দৈত্যের আকার এবং ক্ষুধা দুইই বিরাট। তাহার উপযোগী বিপুল জমি ও সেই অনুযায়ী যন্ত্রপাতি তাহার অবশ্য প্রয়োজন। তবেই তাহা হইতে জাতির দারিদ্র্য মোচনের ব্যবস্থা হইতে পারে। এক সঙ্গে সহস্র সহস্র বিঘা জমি চাই এবং তৎসংলগ্ন কলকারখানা—তবেই তাহাতে চিনি প্রস্তুতও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু ভারতে প্রাচীন যুগ হইতে প্রচলিত জমি-সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা এই উদ্যোগের প্রধান অন্তরায়। এই সমস্যার সমাধান প্রথমে প্রকৃষ্টরূপে করিতে হইবে।

ইক্ষু ভিন্ন অন্য উদ্ভিজ্জ হইতেও চিনি সহজে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা প্রমুখ শীতপ্রধান দেশে জাত বীট্‌মূল, সর্ঘাম মেপল্‌ এবং আমাদের দেশের তাল ও খেজুর গাছই প্রধান।

আখের চাষে যেমন বহু পরিমাণ জমির প্রয়োজন, বাধাবিঘ্নও সেই পরিমাণে অনেক বেশী। কিন্তু খেজুরগাছ হইতে উৎপন্ন চিনির জন্য তত পরিমাণ ভূমি আবশ্যক নয়,

খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ করা

সুতরাং ইহাদ্বারা সুলভে ও অনায়াসে চিনি উৎপন্ন করা যাইতে পারে এবং ভারতের চিনি-সমস্যারও সমাধান অনায়াসে হওয়া সম্ভব। এই খেজুর গুড় ও চিনি-শিল্প সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা সামান্য, একন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ভারতবর্ষে তাল ও খেজুর হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৮০ লক্ষ মণ চিনি জন্মিয়া থাকে এবং কেবল মাত্র বাংলা দেশের খেজুর গাছ হইতেই বর্ত্তমানে ৩০।৩৫ লক্ষ মণ গুড় ও চিনি প্রতি বৎসর প্রস্তুত হয়।

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই নানাস্থানে অসংখ্য খেজুর গাছ দৃষ্টিগোচর হয়। কেবল বাংলাদেশের কতক অংশ ভিন্ন, অন্য সকল প্রদেশেই ইহা বন্য বৃক্ষের ন্যায় স্বতঃই জন্মে। বঙ্গের যশোহর, খুলনা, নদীয়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় খেজুর গাছের যথেষ্ট চাষ হয় এবং বহুকাল হইতেই এই সমস্ত স্থানে খেজুর রস হইতে গুড় ও চিনি তৈয়ারীর রীতি প্রচলিত। ভারতের অন্যান্য স্থানে খেজুরের রস হইতে কেবলমাত্র 'তাড়ি' বা মাদক পানীয় প্রস্তুত হয়। বাংলার কৃষক খেজুর রসের কার্য্যে বিশেষজ্ঞ এবং উহারাই বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে উপাদেয় খেজুর গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। বহু বৎসর ধরিয়া বাংলায় খেজুর গুড় ও চিনির ব্যবসা প্রচুর প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। সুখচর, গোবরডাঙ্গা, কোটচাঁদপুর, কালীগঞ্জ, চৌগাছা প্রভৃতি স্থানে স্থাপিত শত শত দলুয়া ও দোবরা চিনির দেশীকারখানা তাহারই নিদর্শন। যশোহর অঞ্চলে নীলকুঠীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া আসিলে, জনকয়েক নীলকর সাহেব এই অঞ্চলে চিনির কল বসাইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের। প্রতিদিন বিজ্ঞান নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া সভ্য-জগতের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। এই তালে পা ফেলিয়া চলিবার সামর্থ্য যে জাতির আছে তাহারাই জীবন-সংগ্রামে সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং অপর সকলকে হয় পিছাইয়া পড়িতে নয়ত চিরদিনের জন্য লয়প্রাপ্ত হইতে হইতেছে। এই কারণেই ঐ সমস্ত কারখানা আজ লুপ্তপ্রায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলার তথা ভারতের চিনি-শিল্প ও ব্যবসা ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

'আখের' চিনি-শিল্পের উন্নতির পথে অন্তরায় বহুবিধ। সে স্থলে খেজুর বিশেষ সুবিধাজনক। যে সমস্ত কারণ 'আখের' চিনির ব্যবসায়-বিস্তৃতির পক্ষে অন্তরায় বলিয়া গণ্য, খেজুর সম্বন্ধে তাহা খাটে না। বিজ্ঞানের সাহায্য না লইয়াও খেজুর গাছ হইতে এখনও প্রতি বিঘায় আখ অপেক্ষা দ্বিগুণ

বা ত্রিগুণ বেশী চিনি ও গুড় পাওয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা যে আরো বর্দ্ধিত ও অনায়াস-লব্ধ হইবে সে বিষয়ে অধিক বলাই বাহুল্য। গবেষণায় এবং প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে খেজুর গাছের চাষ ও তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত হইলে, উহা খুব অল্প মূল্যে উৎপন্ন করা যাইতে পারিবে এবং আখের কিম্বা বিদেশ হইতে আমদানি চিনির প্রতিযোগিতায় উহা অনায়াসে দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে।

আখের সহিত তুলনায় খেজুর-গাছ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :—

১। খেজুর-গাছ চাষের ব্যয় 'আখ' অপেক্ষা অনেক কম।

২। বসাইবার সময় হইতে রস দিবার উপযোগী হওয়া পর্য্যন্ত খেজুর-গাছের পাঁচ বৎসর সময় লাগে বটে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে খেজুর-ক্ষেত্র হইতে বিবিধ ফসল উৎপন্ন করিয়া, জমির খাজনা ও চাষের সমস্ত ব্যয় বাদে লাভ করা যাইতে পারে।

৩। খেজুর-গাছ একবার জন্মিলে, আখের ন্যায় প্রতি বৎসর আর চাষ করিবার প্রয়োজন হয় না। খেজুরগাছ একাদিক্রমে অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর রস দান করিয়া থাকে এবং গাছ সংরক্ষণের জন্ত বিশেষ ব্যয়েরও প্রয়োজন হয় না। প্রতি বৎসর উত্তরোত্তর রসের পরিমাণ ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

৪। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা নানারূপ জন্তু ও কীটের উপদ্রবে আখ-চাষে সময়ে সময়ে অত্যন্ত অনিষ্ট হয়, কিন্তু খেজুর-চাষে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।

৫। আখ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে কল-কারখানার জন্ত যে পরিমাণ মূলধনের আবশ্যক হয় খেজুর-চিনির জন্ত তদপেক্ষা অনেক কম মূলধনে উৎকৃষ্ট কারখানা নির্ম্মিত হইতে পারে, অথচ উভয় কারখানা হইতে একই প্রকার চিনি একই পরিমাণে প্রস্তুত হইবে।

সুতরাং খেজুর-গাছ হইতে চিনি প্রস্তুত ও তাহার ব্যবসা বৈজ্ঞানিক উপায়ে আরম্ভ করিলে প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা, সে বিষয়ে সন্দিহান হইবার কারণ নাই।

বারান্তরে খেজুর-গাছের চাষ, চিনি প্রস্তুত-প্রক্রিয়া ব্যবসায়ের ও কল-কারখানায় মূলধন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীননীলাল দত্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোধূলির কণক-কিরণ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। সুরী সহসা সপ্তমে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সে ঝঙ্কার আলাপময়। সে আলাপে কেবল গমক আর গিটকারী।

প্রিয়নাথ প্রাচীন প্রবাদ-বচন পড়িতেছিল—"পালকের চেয়ে লঘু কি?—ধূলিকণা। ধূলির চেয়ে?—বায়ু। বায়ুর চেয়ে?—রমণী। রমণীর চেয়ে?—আর নাই!"

নষ্টপ্রায় পুষ্পসারের ন্যায় প্রতিমার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল; প্রবাদ-বচন নারী-চরিত্রের বিশ্লেষণ নয়, বিশ্লেষণের প্রহসন মাত্র বোধ হইল। প্রিয়নাথ আত্ম-সংবরণ করিতে পারিল না। বলিয়া উঠিল—"মিথ্যা কথা! বাতুলের প্রলাপ! কুৎসাপ্রিয়ের পরগ্লানি!"

ধরণীর লক্ষ কোটী রমণী প্রিয়নাথ দেখে নাই, দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই, প্রবৃত্তিও নাই—না দেখুক, একটিও ত দেখিয়াছে, একজনকেও চিনিয়াছে! সেই একজন আর যাহাই হউক, প্রণয়ের প্রতিদান করিতে পারুক্ বা না পারুক্, লঘুচেতা?—না, পুঞ্জীকৃত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও প্রিয়নাথ তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে।

গিটকারী-বাহুল্যে মেঘ তালভঙ্গ করিয়া ফেলিল। সে তালভঙ্গে প্রিয়নাথেরও চমক ভাঙ্গিল। প্রিয়নাথ বাহিরে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু যেমন চাহিল ঠিক তেমনই রহিল—আঁখি পালটিতে পারিল না। শরবিদ্ধ মৃগের ন্যায়, মন্ত্রমুগ্ধ বিষধরের ন্যায় প্রিয়নাথ নিথর, নিস্পন্দ, চিত্রার্পিত। চঞ্চল নয়ন-তারা নক্ষত্রবৎ নিশ্চল।

ঋষির অভিশাপে রমণী পাষাণ হইয়াছিল। প্রিয়নাথও কি তেমনই পাষাণ হইল? অথবা প্রিয়নাথ ধ্যানমগ্ন, সমাধিগ্রস্ত? কে জানে!

প্রিয়নাথ ইহার কিছুই বুঝিল না; শুধুই চাহিল। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতির প্রতি নরনারী যেমন করিয়া চাহিয়াছিল, জন্মান্ধ দৈববলে দৃষ্টিশক্তি পাইলে যেমন করিয়া চাহে, তেমনই করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। যেন জীবনের এই ঊষা, এই প্রভাত—কি সুপ্রভাত! অতীত জীবন যেন স্বপ্ন, যেন তন্দ্রা, যেন নিদ্রা!—নিদ্রান্তে নবজীবন—শুধু নূতন নয়, চিত্ত-বিমোহন।

সুরায় নাকি মাতাল করে; এমন করিয়া কি মাতাইতে পারে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিল, প্রিয়নাথ নবীন জীবনের রঙীন কাহিনী চিরাভ্যাস মত ডায়ারী-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিল। প্রীতি-সঞ্চারে প্রাণ তখন পুলকময়।

['ডায়ারী' হইতে উদ্ধৃত]

৭ই আষাঢ়, শুক্রবার।

কি দেখিলাম? কেমন করিয়া বলিব—কি?

সাহানা রাগিণী সে যে—বর্ণন করিতে যাই, ভাষার কুলায় কৈ?

বাতায়ন-পথে প্রথম প্রভাত-কিরণের ন্যায় কাহাকে দেখিলাম? যেন চির-অন্তরঙ্গ, যেন আজীবন পরিচিত, যেন আমার সর্ব্বস্ব!

দেখিয়াছি? হাঁ, পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি—নিশ্চয় নিঃসন্দেহ। কিন্তু কোথায়? হয়ত স্বপ্নে, হয়ত চিত্রে, হয়ত কাব্যে, হয়ত লোকান্তরে—পূর্ব্বজন্মে, কে জানে!

কেন দেখিলাম? দৃষ্টি যে ফিরাইতে পারিলাম না। ফুলের মত, শিশিরের মত, আলোর মত, গানের মত সুন্দর সেই মুখখানি, সে মুখ চুম্বকের মত নয়ন আকৃষ্ট করিল, আর তাহার পিছে পিছে আলেয়ার পিছনে পথিকের ন্যায় ছুটিল হৃদয়—ছুটিল না টানিয়া লইয়া গেল, কে বলিবে!

মন্ত্রপূত শরের ন্যায় অব্যর্থ-সন্ধান সে দৃষ্টি তীক্ষ্ণাগ্র, অন্তরে পৌঁছিল। উৎপাটন—সম্ভবে কি? আহা থাক্! কাজ নাই শর উপাড়িয়া, কাজ নাই ক্ষত সারিয়া, ঝরুক্ ঝরুক্ আজীবন অনন্তকাল রুধির ঝরুক্।

কে জানে কবে, কোন্ যুগ-যুগান্তরে মধুকণ্ঠে কে মধুর গান গাহিয়াছিল, এক কলি গাহিতে না গাহিতেই গান ছাড়িয়া দিল! সেই গান, বেশ মনে পড়ে, সেই গানই সেই সুরে সেই তানে কে ধরিল, অসমাপ্ত গীত সমাপ্ত করিল! কি মিঠা গলা, কি মধুর স্বর, স্বরে কি মোহন মূর্চ্ছনা! গান ত গাহিল না, যেন গোলাপ ছড়াইয়া দিল, তানে তানে রাশি রাশি বেলা যুথী গোলাপ ছড়াইয়া দিল।

এস তুমি হে বাঞ্ছিত, শূন্য হৃদয়-সিংহাসন আলো করিয়া বস। হৃদয়ে যদি তুষার থাকে বসন্ত-বায়ু হইয়া তুষার গলাইয়া দাও, অতলস্পর্শ সলিল থাকে সলিল-তলে মুক্তা হইয়া বিরাজ কর, অরণ্যের নীরবতা থাকে বিহগ-কাকলী হইয়া মৃত-সঞ্জীবনী ঢালিয়া দাও, গিরিগুহার অন্ধকার থাকে অরুণ কিরণ হইয়া তমঃ নাশ কর।

৮ই আষাঢ়, শনিবার।

কে তুমি? নিমেষের দেখা দিয়া চকিতে চমকিয়া তড়িতের নাগপাশে নিত্য বাঁধিতেছ—কে তুমি? আশার কুহকে মজাইয়া বন্ধনের উপর দৃঢ়তর বন্ধন নিত্য করিতেছ, কে তুমি? আমি যে তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি না! স্বপ্নের মত ঘুরিয়া বেড়াও, কে তুমি? রঙ্গিণী? হাঁ, তাই বটে; কিন্তু এ রঙ্গ কেন?

প্রিয়নাথ বাহিরে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু যেমন চাহিল ঠিক তেমনি রহিল—আঁখি পালটিতে পারিল না।

আর কতদূর? কুহকিনি! বহুদূর লইয়া আসিয়াছ,—শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই, কেবল ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছ—আর কতদূর? অলস আঁখি এই বুঝি মুদিয়া আসিল, চঞ্চল চরণ এই বুঝি অচল হইয়া পড়িল! আর কতদূর?

পলকে পলকে তোমায় হারাই! এস, তুমি নিকটে এস। স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া ফেলিয়া শ্রান্ত তপ্ত হৃদয় শান্ত কর। পল্লবপ্রান্তে শিশির-বিন্দুর মত এক ফোঁটা আশা দিয়াছ যদি, দানে কার্পণ্য কেন,—কলস ভরিয়া দাও। মুমূর্ষু

হৃদয়ে লালসা জাগাইয়া তুলিলে যদি, পল্লবিত কুসুমিত করিয়া দাও।

৯ই আষাঢ়, রবিবার।

নিশীথ-গগনে শুকতারার মত তুমি নিত্য দেখা দিতেছ, মৌন-মূক-মুগ্ধ আমি পথহারা পথিকের মত শুধুই চাহিয়া

"বুক চিরিয়া রুধির দিয়াছি, সেই রুধিরে আর্দ্র পুষ্পার্ঘ্য—পূজা লইবে না?"

আছি। তুমি আপন ভাবে আপন গৌরবে আপনি বিহ্বল, আর আমি আপনাকে আপনি ধারণে অক্ষম। তীব্র মদিরা ঢালিয়া দিয়া তুমি হাসিতেছ, সে মদিরা আকণ্ঠ পানে আমি মরিয়া ফিরিতেছি। মুকুলিত শিরীষ-কুসুম তুমি, কুসুমের দীন উপাসক আমি—তোমায় আমায় কখন কি মিলন হইবে? হয় বা না হয়, পুষ্প-অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি। দেবী, হাসিমুখে গ্রহণ কর।

* * * *

লইবে না? ষোড়শোপচারে পূজা—লইবে না? বুক চিরিয়া রুধির দিয়াছি, সেই রুধিরে আর্দ্র পুষ্পার্ঘ্য—পূজা লইবে না? ধূপের পূতগন্ধে পৃথ্বী পুলকময়, দীপের উজ্জ্বল শিখায় ধরা আলোক-বিভাসিত, নবীন রাগিণীর তরুণ মন্ত্রে চরাচর উল্লাস-মুখরিত, পূজা লইবে না?—পূজা না লও, বিনয়বশে সরম-সঙ্কোচে লইতে না চাও, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের আবেগ লও, আবেগভরা প্রেম লও, প্রেমের পুঞ্জ পুণ্য লও।

আর কি লইবে? যাহা দিবার সকলই দিয়াছি। যাহা না দিবার তাহাও লও—সংশয়ের বেদনা লও, অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস লও, লইয়া সুখ-সম্মিলনের শুভশঙ্খ বাজাইয়া দাও—শতছন্দে পূর্ব্বরাগে পূর্ণসুরে অনুরাগের শত সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠুক।

১০ই আষাঢ়, সোমবার।

একি স্বপ্ন! একি মোহ! আমি যে আপনাকে আপনি চিনিতে পারি না! একি মায়াজাল! আমার মন কোথায় গেল? কোন্ যাদুকর যাদুমন্ত্রে উড়াইয়া লইয়া গেল!

মন ছিল ঐ কুসুম-কাননে,—কচি কিশলয়ে, লতায় পাতায় তরুতলায়। সে মন কোথায় গেল? মন ছিল গোলাপের পাপড়িতে, মল্লিকা-বেলার শাখায় শাখায় জড়াজড়িতে। সে মন কোথায় গেল? মন ছিল ফুলের গন্ধে, মুকুলের মৌন আনন্দে, ভ্রমরের ছন্দোবন্ধে—সে মন কোথায় গেল? কে চুরি করিল?—চুরি করিয়া আমায় পাগল করিয়া তুলিল!

পাগল ? হাঁ, পাগলই ত বটে ! উন্মাদ। কয়দিনের ডায়ারি পড়িয়া দেখি, পাগলের ভাবায় কেবল প্রলাপ বকিয়াছি ! এমন কেহ কি বকে ?

বকে, হাঁ পাগলে প্রলাপ বকে বৈ কি ! এই ত এখনও বকিতেছি—আমি যে পূর্ণ পাগল ! উল্লাসের উচ্ছ্বাসে পাগল, ভবিষ্য সুখের আনন্দে উন্মাদ। উন্মাদ না উদার ? হয়ত উন্মাদ, হয়ত উদার, হয়ত দুই—উন্মত্ততাই হয়ত ঔদার্য্য, কে জানে ! নহিলে যাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলাম সেই নারী—সমগ্র নারী-জাতি এত সুন্দর, এমন সোণালি রঙ্গে রঞ্জিত দেখিতেছি কেন ? আনন্দের ঔদার্য্য যদি নয়, নয়নে সুবর্ণ-অঞ্জন কোথা হইতে আসিল, যাহা দেখি তাহাই সোণার চোখে দেখি কেন ?

কিন্তু কে সে ? আমায় পাগল করিল যে, কে সে ? মত্ততায় কি আনন্দ যে দেখাইল সে কে ? কি রূপ, কি লাবণ্য, কি শ্রী ! এই রূপ-লাবণ্যের অন্তরালে না জানি সে কেমন হৃদয়—শিরীষ-কুসুমের মত কোমল, তমাল-তরুর মত সরল শ্যামল—শুধু মধু, শুধু সুধা, শুধুই স্বর্গ ! স্বর্গের এক প্রান্তে আমার এক বিন্দু স্থান হইবে না কি ? অধিক চাহি না, বিন্দুমাত্র—মিলিবে না কি ?

আবার প্রলাপ ? কে বলিল, প্রলাপ ! উদ্বেলিত হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত এই আগ্রহপূর্ণ ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা—এও প্রলাপ ? যদি প্রলাপই হয়, এ প্রলাপ কে শিখাইল ? যে শিখাইল কে সে ? (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ মিত্র

পার্শীদের আদি-কথা

ভারতীয় পার্শীরা কে ? ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান বা মার্কিণেরা যে হিসাবে ভারতে বিদেশী বলিয়া গণ্য, ইহারাও কি তাই ? এ সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা অস্পষ্ট। অথচ নৌরজী, মেটা, টাটার নামে লোকে শ্রদ্ধাবনত। শিক্ষায় দীক্ষায়, কার্য্যকুশলতায়, দানে ও খ্যাতিতে এমন একটি সমুন্নত সমগ্র জাতি ভারতে দুর্লভ।

ন্যূনাধিক ১৩০০ বৎসর ভারতে বসতি করিলেও পার্শীদের সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা প্রকৃতই বিস্ময়কর। ভারতে মুসলমান-অভ্যুদয়ের প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে পার্শীরা হিন্দুস্থানে বসবাস করেন। তাহার বহু শতাব্দী পরে ইংরাজেরা কানাডায় ও যুক্তরাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা কিন্তু নিজদিগকে ইংরাজ বলিয়া পরিচয় দেন না,—কানেডিয়ান্ ও আমেরিকান্ নামে অভিহিত করেন। সুতরাং পার্শীরা যে ভারতীয় তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য।

সেকালে সভ্যতার ও বিদ্যানুশীলনের কেন্দ্র ছিল পারস্য দেশ। ভারতের সহিত পারস্যের ঘনিষ্ঠ যোগও ছিল

প্রচুর। তখন ভারতবর্ষকে 'হিন্দ' বলা হইত। লিখিত ইতিহাস প্রণয়নের বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারতীয়ের সহিত পারস্যবাসীর সম্বন্ধ যে নিবিড় ছিল তাহার বহু প্রমাণ বর্ত্তমান। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে মধ্য-এশিয়ার অধিত্যকায় হিন্দু ও পারসিকেরা একত্র বাস করিত। উভয়ের ভাষা একই, দেবদেবী একই—পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সুতরাং অবিচ্ছিন্ন। কালক্রমে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভেদ-নীতি প্রবল হইল। কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত যাহারা, ফল-ফুল-শস্যাদির সাজি সাজাইয়া দেবার্চ্চনা করিতে লাগিল; গো-মেষাদি লইয়া ভ্রাম্যমান অবস্থায় যাহারা ইতস্ততঃ বিচরণ করিত তাহারা পশু-বলি ও সুরা দিয়া পূজার্চ্চনা করিতে লাগিল। কৃষিজীবিরা অবশেষে নিম্নভাগে অর্থাৎ উত্তর ভারতে সরিয়া আসিল ও 'হিন্দু' নাম গ্রহণ করিল; অপর পক্ষ কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হইল, পারস্য সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিল। ভারতীয় পার্শীদের পূর্ব্বপুরুষ ঐ উহারাই।

ঋগ্বেদের সংস্কৃত ভাষা এবং পার্শীদের আবেস্তা গ্রন্থের ভাষা যমজ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—উভয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য এতই বেশী। প্রাচীন কালে উভয় জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতার ইহাও একটি অকাট্য প্রমাণ। তদ্ভিন্ন ভারতের সহিত পারস্যবাসীর শোণিত-সংশ্রবেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বীর-চূড়ামণি রোস্তমের পুত্র সমরোজ ও পৌত্র অদরবরোজীর জননীরা ভারতীয় মহিলা ছিলেন। বিখ্যাত সাসানীয় নৃপতি বেরামগোর হিন্দু রাজকুমারীর পানিগ্রহণ করেন—ইনি কনোজ-রাজের কন্যা। পারস্যের প্রবল ভূপতি নসিরবান আদিলের রাজদরবারে বহু হিন্দু প্রতিষ্ঠাশালী ছিলেন। অশোকের ভগ্নস্তূপ হইতে পারস্য স্থাপত্য-শিল্পের বহু নিদর্শন মিলে। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে পার্শীরা রাজ্যচ্যুত হন এবং আরবগণ কর্ত্তৃক নানারূপে নির্য্যাতিত হইতে থাকেন। তখন তাঁহারা pilgrim father-দের ন্যায় জন্মভূমি অপেক্ষা ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া দেশত্যাগ করেন। জাহাজ নির্ম্মাণ এবং জলযাত্রায় অভিজ্ঞতা হেতু ইঁহারা বিদেশ যাত্রা শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। স্ব স্ব পরিবারবর্গ এবং পবিত্র অগ্নি সঙ্গে লইয়া সুদূর প্রাচ্যে কোথাও বাসভূমি সংগ্রহ করিবেন এই আশায় অনির্দ্দিষ্ট যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বদিকে জাহাজ চালাইয়া অবশেষে দক্ষিণ ভারতের কাথিবাড়ের সন্নিকটে ডিউ নামক দ্বীপে আশ্রয় লইলেন। ঊনিশ বৎসর এই স্থানে রহিলেন। ক্রমশঃ বংশবৃদ্ধি বশতঃ দ্বীপে আর স্থান সংকুলান হয় না, কাজকর্ম্মেরও অভাব ঘটিল; অগত্যা ভারতের ভিতরে প্রবেশ লাভ ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। স্ব-নির্ম্মিত অর্ণব-পোতে চড়িয়া গুজরাত অভিমুখে তখন যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ঝড় বৃষ্টি ও মহাসাগরের নানা ভীষণ উপদ্রব সহিয়া অবশেষে সঞ্জান নামক স্থানে উপনীত হন। এই সঞ্জান ডামনের দক্ষিণে,—বোম্বাই হইতে ৪০ ক্রোশ দূরে। তখন সঞ্জানের রাজা—যাদো রাণা, হিন্দু। বীরোচিত আকৃতি অথচ সুদর্শন পার্শীদের দেখিয়া তিনি আতঙ্কিত হইলেন, আশ্রয়-দানের পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সঠিক সন্ধান লইতে চাহিলেন।

নবাগত পার্শীদের প্রধান পুরোহিত বা দস্তুর নিম্নলিখিত বর্ণনা-পত্র পেশ করেন; উহা 'কিসা—হি—সঞ্জানে' লিপি-বদ্ধ আছে। তাহা এই—

হে বিশ্রুতকীর্ত্তি রাজন্, আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

আমাদিগকে ভয় করিবেন না।

আমাদের আগমন হেতু আপনার রাজ্যে বিপৎপাতের সম্ভাবনা নাই।

সারা হিন্দুস্থানের আমরা মিত্র হইব।

আপনার শত্রুগণের মস্তক আমরা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিব।

নিশ্চিত জানিবেন যে, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে আমরা উপাসনা করি।

এই কারণেই অবিশ্বাসীদের নিকট হইতে আমরা পলায়ন করিয়া আসিয়াছি।

আমাদের যাবতীয় ধনসম্পত্তি আমরা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

সুদূরের জলযাত্রায় আমরা বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইয়াছি।

বাড়ী-ঘর, ভূ-সম্পত্তি আদি যাহা কিছু ছিল সে সমস্তই আমরা এককালীন ছাড়িয়া দিয়াছি।

হে পরম সৌভাগ্যবান নৃপতি, জমসেদের আমরা দরিদ্র বংশধর। চন্দ্র ও সূর্য্যকে আমরা অর্চ্চনা করি, এতদ্ভিন্ন আরও তিনটি জিনিসের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।

গাভী, জল, ও অগ্নি,—বিধাতা জগতে যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সে সকলেরই নিকট আমরা প্রার্থনা করি, কারণ উহা তাঁহারই নির্ব্বাচিত পদার্থ।

৭২টি বস্তুতে প্রস্তুত এই কোমরবন্ধ—উহা শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক আমরা কটিদেশে বন্ধন করিয়া থাকি।

উপরোক্ত বর্ণনা ও কৈফিয়তে রাজা তুষ্ট হইলেন। গাভী, অগ্নি ও সূর্য্যের প্রতি পারসিকেরা যে সম্মান প্রদর্শন করেন তাহাতে রাজা মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদিগকে বসতির অনুমতি দিলেন।

১১০০ বর্ষ ব্যাপিয়া অগ্নি-উপাসক পার্শীরা হিন্দু-শাসনে ভারতে সুখে কালাতিপাত করেন এবং জোরওস্তারের ধর্ম্ম মানিয়া বুদ্ধিবলে সম্মানভাজন হইয়া আসিতেছেন। তাহার পর মোগল ও ইংরাজ শাসনাধীনেও কৃতিত্বের পূর্ণ পরিচয় দান করিয়াছেন।

* মিঃ কে, ই, ওয়াদিয়ার প্রবন্ধ অবলম্বনে।

নানা কথা

নোবেল প্রাইজ—১৯৩০

সৎ-সাহিত্যের জন্য ১৯৩০ সালের নোবেল-প্রাইজ পাইলেন—মিঃ সিনক্লেয়ার লুইস্। প্রাইজ এক লক্ষ টাকার। মিঃ লুইস্ মার্কিণ উপন্যাসিক। আমেরিকার সাহিত্য-ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্লেষ-বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস-লেখক বলিয়া ইঁহার প্রচুর খ্যাতি। তাঁহার রচিত "Babbitt", 'Main Street,' 'Elmer Gantry' গ্রন্থ-ত্রয় সর্ব্বত্র পরিচিত। এই সকল উচ্চাঙ্গের কথা-সাহিত্যে মিশ্র জাতিকে তিনি ভীষণ আক্রমণ করিয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িক আসক্তি-বাহুল্যের প্রতি নির্দ্দয়ভাবে ব্যঙ্গ ও উপহাস করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের তথা-কথিত উন্নতির ইনি ঘোরতর বিরোধী এবং স্বজাতির আত্মতুষ্টির তীব্র সমালোচক।

নারী-প্রগতি ইত্যাদি ব্যাপার মার্কিণ মুলুকে অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে। উপন্যাসে ইহার দোষ-ত্রুটী বর্ণনা করিয়া সুনিপুণ লেখক নিদারুণ কশাঘাত করিয়াছেন। এজন্য বহুসংখ্যক নরনারী তাঁহার উপর বিষম বিরক্ত—বহু কলেজের পাঠাগার ও নারী-প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহার পুস্তকগুলি বহিষ্কৃত হইয়াছে। হইলেও এখনও লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকা উহা তারিফ্ করিয়া পাঠ করেন। সুতরাং তাঁহার নোবেল-প্রাইজ সম্মান লাভের জন্য তাঁহারই স্বদেশে এক দল যেমন অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা, পক্ষান্তরে আর এক দল তেমনই হর্ষ প্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ

পনেরো দিন মস্কাউ সহরে অবস্থানের পর গত ৯ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ নিউইয়র্কে পৌঁছিয়াছেন। আমেরিকায় তিন মাস থাকিয়া নানা স্থানে বক্তৃতা করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু হৃদ্-রোগের জন্য তাঁহাকে সমস্ত বন্দোবস্ত বন্ধ করিতে হইয়াছে। ডাক্তার মারতিন ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণের মতে তাঁহার শরীরের অবস্থা আশঙ্কাজনক, সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড কবির অসুস্থতার সংবাদে দুঃখ প্রকাশ করিয়া ও আরোগ্যলাভের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে 'তার' করেন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছেন এবং শীঘ্রই তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। আগামী ১৫ই নভেম্বর নিউইয়র্ক হইতে তাঁহার কলিকাতায় রওনা হইবার কথা। তিনি সত্বর আরোগ্য লাভ করুন, ইহাই বিধাতার নিকট প্রার্থনা।

আমেরিকায় বিশ্বকবির স্বহস্ত-অঙ্কিত চিত্র-প্রদর্শনী অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছে। আর্ট সমালোচকেরা চিত্রগুলির

উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন বিশ্ব-ভারতীর সাহায্যকল্পে ছবিগুলি বিক্রয় করিবার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি ফিলাডেলফিয়ায় গিয়াছেন।

বিশ্ব-ভারতী

রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ড পরিদর্শনের ফলে সম্প্রতি সেখানে বিশ্ব-ভারতীর সাহায্যার্থ একটি ফণ্ড খোলা হইয়াছে। রাজকবি জন ম্যাস্‌ফিল্ড্, সার মাইকেল স্যাড্‌লার্ ও সার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাস্‌ব্যাণ্ড্ প্রভৃতি মহোদয়েরা জনসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সংবাদপত্রে আবেদন-পত্র বাহির করিয়াছেন।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্র

আরব্য উপন্যাসের গল্প অবলম্বনে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকগুলি চিত্রাঙ্কন করিতেছেন। প্রত্যেক গল্পের উপর একখানি করিয়া ছবি থাকিবে। ১২ খানি চিত্র এ পর্য্যন্ত অঙ্কিত হইয়াছে।

কবি-সম্বর্দ্ধনা

আয়ারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ মরমী (mystic) কবি জর্জ্জ রাসেল এ, ই,-নামে সাধারণে পরিচিত। সম্প্রতি তিনি বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হইয়া ৬ মাসের জন্য আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন আইরিশ সাহিত্যে এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। এই সভায় প্রেসিডেন্ট কস্‌গ্রেভ আইরিশ অক্ষরে নিজের নাম সাক্ষর করিয়া একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

লণ্ডনে আইন্‌ষ্টাইন্

আপেক্ষিকতা সিদ্ধান্তের (Relativity Theory) প্রবর্ত্তক, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত আলবার্ট আইনষ্টাইন্ সম্প্রতি লণ্ডনে আসিয়াছেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য লণ্ডনে এক প্রীতি-ভোজের উৎসব হইয়াছিল। বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ্জ বার্ণাড শ ইহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"আইনষ্টাইন্ মনীষীগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ মনীষী। তিনি কেবলমাত্র অভূতপূর্ব্ব সমস্যাসমূহ বিদ্বজ্জন সমক্ষে উপস্থিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহার সমাধানেরও প্রকৃত চেষ্টা করিতেছেন।"

অধ্যাপক আইনষ্টাইন্ জাতিতে জার্ম্মান্ ইহুদি। নিজ জাতি সম্বন্ধে তিনি বলেন—"বর্ত্তমানে তাঁহাদের অবস্থা সুখকর না হইলেও নিরাশ হইবার কারণ নাই, ইহুদি জাতি চিরদিনই দুরূহ জীবন-সংগ্রামে অভ্যস্ত, তাহা না হইলে তাহাদের অস্তিত্ব এতদিন বিলুপ্ত হইয়া যাইত।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কার

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু জেনিভায় জাতি-সঙ্ঘের "কমিটি অফ্ ইণ্টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন" নামে আন্তর্জাতিক সুধীবৃন্দের সভায় যোগদান করিয়া এবং ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছেন। তাঁহার নূতন গবেষণায় তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, মানব-দেহের ন্যায় উদ্ভিদ-দেহেও রোগের বীজাণু ইনজেক্ট করিয়া উদ্ভিদকে রোগমুক্ত করা যাইতে পারে। ইটালির মিলানিক ইনষ্টিটিউট্ সম্প্রতি যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহার শীর্ষদেশে জীবের মূলগত ঐক্যের সম্বন্ধে জগদীশ চন্দ্রের বক্তব্য বাঙ্‌লা অক্ষরে মুদ্রিত আছে।

লণ্ডনে ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনী

ইণ্ডিয়া হাউসে বোম্বাই আর্ট স্কুলের ছাত্রগণের চিত্র প্রদর্শনী আর্ট সমালোচকদিগের প্রশংসালাভে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহাদের মতে প্রতি চিত্রেই শিল্পীর চিন্তাশীলতা ও কৃতিত্বের পরিচয় বিদ্যমান। একজন সমালোচকের মতে উপরোক্ত ভারতীয় চিত্রগুলিতে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার এবং পাশ্চাত্যের বর্ণ ও অঙ্কন-পদ্ধতির সুন্দর মিলন হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি শ্রীযুক্ত বাগ্‌চির "তিলোত্তমার জন্ম" ছবিখানি উল্লেখ করেন।

Printed at the Susil Printing Works Ltd., 48, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.

চতুর্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড　　অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭　　ষষ্ঠ সংখ্যা

বাঙ্গালীর খাদ্য

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বহিতৈষী নেভিন্‌সন্ সাহেব জর্ম্মানির বর্ত্তমান দুর্দ্দিন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে বলেচেন যে, সেখানকার অধিবাসীরা শরীর মনের সম্পূর্ণ তেজ রক্ষা করবার উপযুক্ত আহার হ'তে কিছুকাল ধ'রে বঞ্চিত আছে। এই কারণে বিশেষভাবে শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির হ্রাস হওয়াতে সমস্ত জাতির ভাবী উন্নতির পক্ষে যে বিষম ক্ষতির কারণ ঘট্‌চে তা-ই সব চেয়ে উদ্বেগের কথা। শিশু-মৃত্যু সংখ্যাও সেখানে অত্যন্ত বেড়ে উঠেচে। সেখানকার একজন ডাক্তার বলেচেন, দেশে যে পরিমাণ খাদ্য আছে, তা মানুষকে একেবারে প্রাণে মারবার পক্ষে কিছু বেশি অথচ বাঁচিয়ে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আলু, রুটি, মাংস ও মাখন উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্চে না। সামরিক শাসনে বাহির হ'তে জর্ম্মানিতে আহার-প্রবেশের পথ অবরুদ্ধ হয়েচে ব'লেই দেশের এই অবস্থা ঘটেচে।

এই বর্ণনা প'ড়ে একটা কথা আমরা না ভেবে থাকতে পারি না। সেটা এই যে, কোনো একটা জাতিকে জ্ঞানে ও কর্ম্মে পুরো দমে উন্নতির পথে চালাতে হ'লে প্রথম হ'তেই তাকে প্রচুর পরিমাণে আহার জোগাতে হয়। শুধু বুদ্ধি থাক্‌লেই চলে না; উৎসাহ অধ্যবসায়ের জোরে সেই বুদ্ধি ষোল আনা পরিমাণে খাটাতে হয়। দু'টো দেশের মানুষের সংখ্যার তুলনা করতে গেলে শুধু মাথা গুনতি ক'রে তার সত্য পরিমাণ পাওয়া যায় না। কোন্ দেশে মানুষ খেতে পায় কত, সেটাকেও সংখ্যার সঙ্গে যোগ করলে তবে ঠিক ওজন পাওয়া যায়। জর্ম্মানি যে-আদর্শের সভ্যতাকে এতদিন বহন ক'রে এসেচে তাকে পোষণ করতে যে-পরিমাণ খাদ্য লাগে সেই খাদ্য ক'মে এলে তার মনন শক্তি, তার কৃতিত্ব, সুতরাং তার ন্যাশনাল্ সফলতা ক'মে আস্‌বে। কেন না, বড় সভ্যতাকে ধারণ ক'রে রাখবার জন্যে স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভৃত পরিমাণে দরকার হয়, এজন্যে যথেষ্ট আহার্য্য চাই।

এই উপলক্ষে নিজেদের দেশের কথা ভেবে দেখ্‌তে হবে। আমাদের দেশে সামরিক অবরোধ নেই, কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই যে বহুকাল ধ'রে আধপেটা খেয়ে আসচে, সে কথা সকলেই জানে। জর্ম্মানির ডাক্তার যা বলেচেন, আমাদের পক্ষে তা পুরো খাটে। আমরা যতটা খাই তাতে না হয় মরণ, না হয় বাঁচন। কেন না, শুধু নিশ্বাস নেওয়াকেই বাঁচা বলে না। শিশুর

মৃত্যু সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই বেশি। কিন্তু যে শিশু মরে না সে যে সম্পূর্ণ পরিমাণে বেঁচে থাকবার মত আহার পায় না সেইটেই দুঃখ। কেবল মাত্র আর্থিক দিক হ'তে যদি এর ফল দেখি, তবে দেখা যাবে সর্ব্বসমেত আমাদের দেশে কর্ম্মশক্তি কম হওয়াতে অধিক মূল্য দিয়ে অল্প ফল পাই। অন্য দেশে একজন যে-কাজ করে, আমাদের দেশে সে কাজে অন্তত চারজনের দরকার হয়। এতে কেবল কাজের পরিমাণ নষ্ট হয় তা নয়, কাজের গুণও নষ্ট হয়। কেন না, কাজের শক্তি থাকলে সেই শক্তি খাটাতেই আনন্দ হয়, কাজে ফাঁকি দিতে সহজেই ইচ্ছে হয় না। কর্ম্ম সম্বন্ধে সেই সত্যপরতাই কাজের নৈতিক গুণ। য়ুরোপীয় মনিব প্রায়ই অভিযোগ করেন যে, আমাদের দেশের লোক কাজে ফাঁকি দেয়, তাদের কেবলি পাহারা এবং শাসনের উপর রাখতে হয়। বংশানুক্রমে তাঁদের নিজের দেহ সহজেই পুষ্ট ব'লে একথা তাঁরা মনেই করতে পারেন না যে, এদেশে কর্ত্তব্য এড়াবার জন্যে ইচ্ছার উৎপত্তি প্রধানতই শরীরপোষণের অভাব হতে। দেশের লোক ম্যালেরিয়ায় মরচে এবং জীবন্মৃত হয়ে আছে তারও কারণ ঐ; শুধু বেচারা মশাকে দোষ দিলে চলবে না। কি ক'রে আমরা বাঁচ্‌ব একথা ভাব্‌বার নয়,—কেন না, কোনো মতে বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল। কি ক'রে আমরা পুরোপুরি বাঁচ্‌ব সেইটেই আমাদের ভাববার কথা। কৃশতা বশত জীবন ধারণে আমাদের সম্পূর্ণ গা নেই ব'লে জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা গড়িমসি ক'রে ফাঁকি দিচ্চি, এ সম্বন্ধে আমরা সত্যপর হচ্চি নে। এতে সমস্ত দেশের বাহ্যিক ও আন্তরিক যে লোকসান হচ্চে, সবশুদ্ধ জড়িয়ে যে কম কাজ হচ্চে, কম ফসল ফলচে, কম বিঘ্ন কাট্‌চে, প্রাণের স্রোত কম ক'রে বইচে, নিজেদের উপর আস্থা কম পড়্‌ছে, অঙ্ক দিয়ে কি তার পরিমাণ পাওয়া যায়? শরীর মনের উপবাসজাত যে অবসাদ, ভীরুতা, ঔদাসীন্য, জড়ত্ব আমাদিগকে ধূলিসাৎ ক'রে রেখেচে তার ভার কি সামান্য?

এই সব বিপত্তি হ'তে দেশকে রক্ষা করবার জন্যে অর্থ কি ক'রে বাড়াতে পারা যায় সে কথা ভাববার শক্তি যাঁদের আছে তাঁরা ভাবুন, কিন্তু যতটুকু আহার্য্য আমাদের ভাণ্ডারে আছে তার পুষ্টিকরতার বিচার ক'রে আহার সম্বন্ধে অবিলম্বে আমাদের অভ্যাস পরিবর্ত্তন করতে যদি পারি তা হলে একদমে অনেকটা ফল পাওয়া যাবে।

এক সময়ে বাঙলা দেশে খাদ্যের অভাব ছিল না। ডাল ভাত শাক মাছ ঘি দুধ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত—তা'তে দেশের শরীরপোষণ সহজ হয়েছিল। তা ছাড়া তখন কাজের পরিমাণ ও উদ্বেগ কম ছিল।

সকলেই জানেন আজকাল পাড়াগাঁয়েও দুধ ঘি যথেষ্ট মেলে না। যে সকল জায়গায় নদীতে মাছ ধরা হয় সেখানেও মাছ পাওয়া দুর্লভ, কারণ, মাছ সহরে চালান হয়। ঘিয়ে অখাদ্য জিনিষ ভেজাল দেওয়া হয় ব'লে ঘি অপথ্য হয়ে উঠেচে। তাই আমাদের খাদ্য-পদার্থের যে ভাগটা এখন বাকি আছে তাতে পুষ্টিকরতা অতি সামান্য। শাক সব্‌জি লাউ কুমড়া থোড় মোচা প্রভৃতির অঙ্গে মসলা মিশিয়ে যে সকল ব্যঞ্জন তৈরি হয় তাতে পেট ভ'রলেও শরীরের উপবাস-দশা ঘোচে না।

এতে ফল হয়েছে এই যে, এককালে জীবনীশক্তির সতেজতার জোরে যে সকল রোগের আক্রমণ

আমরা নিরস্ত করতে পারতাম এখন তা পারি না। পুষ্টির অভাবে শরীর নির্জীব হয়ে আছে ব'লেই নানাপ্রকার রোগের হাতে আমরা হার মান্‌চি ও মরচি।

তাই আজ যে-সকল খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ আছে তাদের পুষ্টিকরত্ব বিচার ক'রে বাছাই ক'রে নেওয়া এখন আমাদের কর্ত্তব্য। এককালে যে সকল খাদ্য প্রধান খাদ্যের পারিপার্শ্বিক মাত্র ছিল এখন তারাই প্রধান হয়ে উঠেছে ;, এতে কেবল মাত্র আমাদের অভ্যাসকেই তুষ্ট ক'রে শরীরকে হনন করা চল্‌ছে। শুধু তাই নয়, আগে আমাদের হাতে সময় যথেষ্ট ছিল, তাই নানাপ্রকার তরকারী রাঁধবার আয়োজন তখন সহজেই হত। এখন তেমন বিচিত্র আয়োজনে পাত সাজাবার জোগাড় করতে যে সময় ও উদ্যোগ খরচ করা হচ্চে সেটার মত অপব্যয় আর নেই। কিন্তু আমাদের অভ্যাসকে প্রশ্রয় না দিলে আমাদের রুচি তৃপ্তি হয় না ব'লে এত অত্যাচার সইতে হয়।

অত্যাচার যে কত তা আশ্রমের পাকশালার দিকে তাকালে বোঝা যায়। মাদ্রাজে উত্তর-পশ্চিমে যেখানেই আমরা কোনো আশ্রমের আহার-ব্যবস্থার সন্ধান নিয়েছি সেখানেই দেখা গিয়েছে সে সকল জায়গায় খাদ্যের বৈচিত্র্য কম অথচ পোষনকারিতা বেশি ব'লে ব্যবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক সহজ। আমাদের দেশে ছোট ছোট ব্যঞ্জনের জন্যে বাট্‌না বাট্‌তে কুট্‌নো কুট্‌তে এবং রান্না শেষ করতে কত লোককে বৃথা গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'তে হয়,—আর এইরূপ তুচ্ছ খাদ্যের বৈচিত্র্য যত বেশি হয় তার আবর্জ্জনাও তত বেশি হয়। বড় বড় আশ্রমের পক্ষে এর অসুবিধা যে কত প্রচুর তা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। তা' ছাড়া এই সকল তুচ্ছ উপকরণের তারতম্য নিয়ে যত নালিশ, যত আক্ষেপ। বাঙলাদেশে এরূপ সাধারণ পাকশালার ম্যানেজারের মত কৃপাপাত্রজীব আর জগতে নেই।

পোষণ-গুণ বিচার ক'রে আহার ব্যবস্থা বেঁধে দেবার প্রধান অন্তরায় রসনার গোঁড়ামি। অভ্যাসের ব্যতিক্রম হ'লে যেন আহার হ'ল না এরূপ বোধ হয়। সেই জন্যে আমাদের দেশে অনেকে যেদিন একাদশী পালন করেন সেই দিনই আহারটা গুরুতর হয়; সেদিন ভাত ছেড়ে রুটি প্রভৃতি খেয়ে মনে করেন তাঁরা উপবাস করলেন।

এই সমস্যা সকল দেশেই আছে। ভাত যে একটা খাদ্য আমেরিকার লোককে একথা বোঝানই শক্ত। সেখানে ক্যারোলিনা প্রভৃতি দেশে ভাল ধান জন্মাবার উপযুক্ত জমি অনেক ছিল। ভাতের প্রতি আমেরিকানদের বিতৃষ্ণাবশত সে সকল জমিতে অন্য কোন লাভজনক ফসল জন্মাবার চেষ্টা চলেচে। এদিকে যুদ্ধের সময় যখন য়ুরোপে আহার্য্য-সামগ্রীর বড়ই টানাটানি প'ড়েছিল তখন আমেরিকা হতে ভুট্টা আমদানি ক'রে দেখা গেল ইংরেজ বা বেল্‌জিয়ান্ ভুট্টা সহজে খেতে চায় না। অবশেষে বারো আনা পরিমাণ ভুট্টার ময়দার সঙ্গে সিকি পরিমাণ গমের ময়দা মিশিয়ে রুটি তৈরী ক'রে এদের আহারের জোগাড় করা হয়।

এই রসনার গোঁড়ামি বাঙ্গালীর ছেলেরও অত্যন্ত প্রবল। তার ওপর বাঙালী তার্কিক; এই জন্যে বাঙ্গালীর প্রচলিত খাদ্যই যে বাঙলাদেশের জলবায়ুর পক্ষে বিশেষ উপোযোগী এই তর্কের দ্বারা তারা নিজের রুচির সমর্থন করে। একটা কথা ভুলে যায় যে, তাদের চিরন্তন খাদ্য-তালিকার কয়েকটি

প্রধান অঙ্গ কম পড়েচে এবং বিকৃত হয়েচে। অতএব সেটা পূরণ করবার উপায় বার করতে এবং তদনুসারে আহারের রুচি তৈরি করতে হবে, নইলে মরণং ধ্রুবং। সেই মৃত্যু সুরু হয়েচে, কেবল সেটা ছদ্মবেশে চল্‌চে ব'লে বুঝতে পারচিনা। বস্তুত আমাদের উপবাসই নানা রোগের ছদ্মবেশ নিয়ে আমাদিগকে মারছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই প্রবন্ধটি গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জর্ম্মানির তদানীন্তন অবস্থা উপলক্ষ করিয়া লিখিত হইয়াছিল,—কিন্তু বাঙলা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ পুষ্টিকর আহারের অভাবই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতা এবং রোগপ্রবণতার মূল।—বিঃ সঃ]

নট-কবি গিরিশচন্দ্র

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

স্মৃতি-শেষ অতীতের ইতিহাস-আখ্যান-পুরাণ,
যাহার ইঙ্গিতে পুনঃ লভিয়াছে নূতন পরাণ,
কুড়ায়ে কঙ্কাল-মালা গড়েছে যে নব অবয়ব—
বিচিত্র কর্ম্মা সে কবি,—সৃষ্টি তার বঙ্গের গৌরব।

যাহার হৃদয়-লোকে জানিয়া লীলার যোগ্য ঠাঁই
জনমিল বারে বারে বুদ্ধ, কৃষ্ণ, শঙ্কর, নিমাই ;
বিশ্বামিত্র দেখাইল মানুষের তপস্যার বল,
ধন্য সে, হৃদয় তাঁর নটেশ শিবের লীলাস্থল।

রাজপুতানার ভীষ্ম চণ্ডেরে যে দিল নব কায়,
মুকুলের চিত্তকোষ মুঞ্জরিল যার প্রতিভায়,
অশ্রুর সায়রে হায় স্থাপিল যে প্রফুল্ল কমল,
বঙ্গের প্রিয় সে কবি,—খুলে দেয় হৃদয়ের দল।

নটের আদর্শ সেই, নাট্যের সে প্রথম আলোক,
বঙ্গ-রঙ্গ-ভুবনের গিরিশ, গিরীশ-লোকালোক,—
শীর্ষ তার ঘিরি' নিত্য আলো আর আঁধারের খেলা,
জীবনের মহারঙ্গ—হাসি ও অশ্রুর মহামেলা।

আধুনিকী

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত

১

শিল্পের, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মূল লক্ষ্য অনন্ত অসীম বৃহৎ। এ যাবৎ আমরা এই কথাই জানিয়া আসিয়াছি। শিল্প জগতে, স্থান হিসাবে, কাল হিসাবে, পাত্র হিসাবে, রচনার রীতি লইয়া যতই মতভেদ থাকুক না, সর্ব্বত্র সকলের মধ্যে ঐ মূল তত্ত্বটি সম্বন্ধে ছিল ঐক্য। ইহাই ছিল শিল্পের একেবারে গোড়ার কথা—এটির উপরে সন্দেহ কখন কাহার মনেও হয় নাই। অনন্ত অসীম হইতেছে মূল উপলব্ধি:—সকল পার্থক্য বা দ্বন্দ্ব, ইহাকে প্রকাশ করিব কি ভঙ্গীতে কোন ধরণের উপাদানে তাহা লইয়া।

আধুনিক এই মূল তত্ত্বটিই উড়াইয়া দিয়াছে। একদিক দিয়া আধুনিকের আধুনিকত্ব এইখানে। অনন্ত অসীমই শিল্পসৃষ্টির লক্ষ্য হইবে কেন? অনন্ত নয় সান্তকে, অসীম নয় অন্তকে শিল্প কি গড়িতে দেখাইতে পারেনা? তাহাতে শিল্পের শিল্পত্বের কিছু কি হানি হয়? বৃহৎ আমরা আর চাইনা—আমরা চাই ক্ষুদ্রকে: দেশ হিসাবে কাল হিসাবে যাহা একান্ত খণ্ড পরিচ্ছিন্ন, আমরা পূজা করি সেই কণিকার ও ক্ষণিকার। উপনিষদের মন্ত্র ঘুরাইয়া আজ আমরা বলিতেছি ভূমার সুখ নাই, অল্পেই সুখ।

যাহা স্থায়ী, শাশ্বত, চিরকালের তাহা নয়, আমাদের কৌতূহল গিয়া পড়িয়াছে যাহা চঞ্চল অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল তাহার উপর। চেতনার গভীরে কি অক্ষর সত্য আছে, সমুচ্চে কি অব্যয় তত্ত্ব আছে তাহা লইয়া আর গবেষণা করিতে চাইনা; নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের ধারায় উপরে উপরে যত বুদ্বুদ যত ফেণা মুখর বাচাল হইয়া একবার ভাসিয়া উঠিতেছে আবার মিলাইয়া যাইতেছে তাহাদেরই লইয়া আমাদের কারবার। কিন্তু সাধারণ জীবন-যাত্রার যে বড় বড় ধারা, মানুষের যে চিরপরিচিত সহজ প্রকৃতি, যে স্পষ্ট-স্ফুট প্রেরণা-বৃত্তি তাহাও আমরা চিত্রিত করিতে চাহি না। সাধারণ জীবন তাহার সহজ ধারায় চলিতে চলিতে—সম্মুখে সোজাপথে যে ভঙ্গীতে চলিয়াছে তাহা নয় কিন্তু—আশেপাশে যত চূর্ণতরঙ্গ তুলিয়া ফেলিতেছে, তাহাই আমাদের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। নিবিড় প্রেম নয়, চিত্তের গভীর আবেগ নয়, প্রাণের বিপুল লালসা পর্য্যন্ত নয়—এই সকল জিনিষের তত্ত্ব ও তথ্য, ইহাদের সত্য ও সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে, দেখাইতে দেখাইতে আমরা পুরাণ হইয়া গিয়াছি। আমাদের চিত্রণের বিষয় এখন—চোখের পাতায় একটা চোরা-চাহনী, নাড়ীর একটা অকস্মাৎ স্পন্দন, ধমনীতে কোথাও এক ঝলক রক্তের চাপ, মনের মধ্যে এককোণে অর্দ্ধচেতন চিন্তার চাঞ্চল্য, একটা সুর জাগিতে না জাগিতেই উঠিয়া কোন সুরটির মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে—"কাহার চুম্বন কাহারে দিয়াছি"—এই সব ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর আকস্মিক অপ্রাসঙ্গিক অস্পষ্ট জিনিষ এক অপরূপ মায়াজাল আমাদের উপর ফেলিয়াছে। সৃষ্টিরূপ গ্রন্থখানির যে মূল তাহা আর আমরা পড়িতে চাহি না—আমরা খুঁজিতেছি মূলের এদিকে ওদিকে ফুটকি দিয়া, পাদটীকায় কোথায় কি টুটকি বার্ত্তা আবডালে রহিয়া গিয়াছে। অথবা বলিতে পারি, অন্ন-ব্যঞ্জনের গুরুগম্ভীর ভোজন নয়, আমরা ভালবাসি মুখ-রোচক জলাহার—উদরের তৃপ্তি নয়, আমরা ভালবাসি জিহ্বার আস্বাদন।

জগৎ, মানুষ—যাহাকিছু, সবই কণিকার ও ক্ষণিকার আবর্ত্ত—তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং। কোথাও স্থায়ীরূপ, নিত্য স্বভাব বলিয়া কিছু নাই। স্বরূপ ও স্বভাব—ব্যক্তিত্ব নামক পদার্থ আমাদের কাছে অর্থশূন্য। মানুষ সম্বন্ধে আমরা আগে মনে করিতাম যে এক একজন হইতেছে একটা গোটা সত্যের প্রকাশ—একটা বিশেষ ধর্ম্ম, 'বিশেষ নীতি, বিশেষ রীতি একটা সংহত শৃঙ্খলা ব্যক্তি-জীবনকে গঠিত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—আবর্ত্তন পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া তবুও সে একটা সত্যকেই রূপ দিয়া 'চলিয়াছে;

ব্যক্তি বিশেষের যে বিভিন্ন মতি গতি, তাহাদের সঙ্গতি সামঞ্জস্য সৌসাদৃশ্য ধরিয়া দেখানই ছিল চরিত্র-রচয়িতার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ব্যক্তির এই ধরণের ন্যূনাধিক কঠিন কাঠাম আমরা আজ ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। ব্যক্তি—বৌদ্ধেরা যেমন মনে করিতেন—ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টি, বিনা-সুতার মালা ত বটেই; উপরন্তু একই মানুষের মধ্যে নানা বিরুদ্ধ, অপ্রত্যাশিত বৃত্তির অসংলগ্ন খেলা শুধু সম্ভব নয়, স্বাভাবিক। Psychological contradiction বলিয়া যে একটা জিনিষের উপর আগে খুব জোর দেওয়া হইত তাহা আমরা একেবারেই উড়াইয়া দিয়াছি। একই মানুষের মধ্যে ভূত প্রেত, দৈত্য দানব, পশুদেবতা সকলে এক সাথে বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে। আগের যুগের heroও নাই, villain-ও নাই। পাপপুণ্য, সবলতা দুর্ব্বলতা, পাগলামী আর বুদ্ধিমত্তা প্রত্যেক মানুষেই সমানভাবে বাঁটিয়া দিয়াছি।

আগে দেখিতাম—স্থূল চক্ষু দিয়া হউক, আর মনের প্রত্যয় দিয়া হউক—একটা নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী বা angleকে আশ্রয় করিয়া, সুতরাং এক সময়ে জিনিষের একের অধিক দিক আমরা দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু এইভাবে জীবন্ত বাস্তব সত্যের সম্যক উপলব্ধি কি হয়? বর্ত্তমান দৃষ্টি-ভঙ্গীর চেষ্টা বস্তুকে যুগপৎ সকল দিক হইতে অন্ততঃ বহুদিক হইতে দেখা। সহস্র চক্ষু দিয়া সহস্র দিক হইতে একই সময়ে দেখিলে জিনিষকে যেমন দেখায়, শিল্পে সাহিত্যে তাহারই চিত্র কিছু দিতে আমরা প্রয়াস পাইতেছি। সব জিনিষই তাই বহুরূপী ঘূর্ণ্যমান মূর্ত্তির মালা—নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংগ্রহ।

আধুনিকের বৈশিষ্ট্য হইতেছে গতি—সকলেই আজ তাহা দেখিতেছেন ও স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু এই গতিরও আবার আছে এক বিশেষ ধরণ। আধুনিক যে গতি চায়, তাহা টানা গতি নয়, তাহা হইতেছে প্লুত গতি। একটি ধারার ছেদহীন বিরামহীন ক্রম—প্রসরণ নয়, আমাদের গতি যেন পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য উল্লম্ফনের সারি। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানও জড়শক্তির গতি সম্বন্ধে ঐ কথাই বলিতেছে। আজকালকার যুগ-শিল্প যে চলচ্চিত্র তাহা এই তত্ত্বটির মূর্ত্ত বিগ্রহ। এই চলচ্চিত্রের ধর্ম্মই আধুনিকের সাহিত্যকে, অন্যান্য শিল্পসৃষ্টিকে বিশেষভাবে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

প্রাচীনতর যুগের সৌন্দর্য্য গঠনের মূল তত্ত্ব যে ছিল চরিত্র গঠন, রূপ অর্থই যে ছিল চরিত্র-চিত্র—একটা বিশেষ স্বভাবের সুশৃঙ্খল বিকাশ—তাহার আর পরিচয় পাইনা। সংহতির, সমুচ্চয়ের সে ঐক্য ও দার্ঢ্য আর নাই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে প্রত্যেক ব্যষ্টি আপন আপন মুক্তি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে—বস্তু হউক, ঘটনা হউক, ভাব হউক, বৃত্তি হউক, প্রত্যেকে একান্ত আপনাকেই জাহির করিতেছে। আধুনিকতম উপন্যাস বা নাটকে তাই দেখি, একখানি গ্রন্থ নামে এক হইলেও, কার্য্যতঃ হইতেছে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের, ছাড়া ছাড়া ঘটনাবলীর সমষ্টি, কতকগুলি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ-তালিকা। সাহিত্যে বাক্যবিন্যাসের রীতিতেও এই প্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্ণাবয়ব চিন্তা বা ঘটনা প্রকাশ করিবার জন্য শব্দের, বাক্যের যে অন্যোন্য নির্ভর, যে সুসম্বদ্ধ গতি-ক্রম, যে শৃঙ্খলা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করা হইত, এখন সে সকলকে আমরা প্রায় বাতিল করিয়া দিয়াছি। বাক্যকে বাক্য হইতে পৃথক করিয়া, অসংলগ্ন করিয়া দাঁড় করাইতেছি। বাক্যের অন্তর্গত শব্দেও যতটা ছাড়াছাড়ি সম্ভব, ভাবে ভঙ্গীতে তাহার চেষ্টার ত্রুটি আমাদের নাই।

রূপকে, মূর্ত্তিকে আমরা এই রকম চূর চূর করিয়া ফেলিতেছি—তাহাদের মাল মশলা উপকরণাদি গুঁড়াইয়া, ধূলা উড়াইয়া দেখিতেছি—তারপর কি, তারপর কি—ততঃকিম্। যেন সৃষ্টিকে, জীবনকে নিবিড় কঠোর আলিঙ্গনে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াই আমরা অনুভব করিতে চাই, হৃদয়ঙ্গম করিতে চাই তাহাদের তীব্রতম গোপনতম সত্তাকে। আমাদের প্রয়াস একটা সুবহ রূপ গড়া নয়, দূর হইতে নিরীক্ষণ করিবার জন্য ধ্যান করিবার জন্য কোন বস্তু মূর্ত্ত করিয়া ধরা নয়; কোন একটী সত্যকে অর্থাৎ সত্যের একটি পরিচ্ছিন্ন আকার, একটি সাবয়ব সিদ্ধান্ত আমরা বিবৃত করিয়া দেখাইতেও চাহিনা। সত্যের প্রমাণ নয়, ব্যাখ্যা নয়—আমরা

চাহিতেছি সত্যের সহিত একটা সাক্ষাৎ জীবন্ত স্পর্শ। যে প্রাণ-তরঙ্গ সৃষ্টির মধ্যে বহিয়া চলিয়াছে স্বরূপে জগতের মধ্যে খেলিতেছে যে ছন্দ, আমরা চাহিতেছি শিল্পে সাহিত্যে হুবহু তাহার কিছু ঢালিয়া ধরিতে; মানুষের সৃষ্টি হইবে বিশ্বসৃষ্টিরই মধ্য হইতে কাটিয়া তোলা একখানি সৃষ্টি। সাহিত্যে শিল্পে মানু . যাবৎ যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা মোটের উপর, অতিমাত্র আদর্শমূলক—কাল্পনিক ভাব দিয়া, চিন্তাধারণা দিয়া বা শিল্পের নানা কৃত্রিম বিধানের নিষেধের দ্বারা গঠিত, নিয়ন্ত্রিত; তাহা বিবিধ সজ্জায় অলঙ্কারে সজ্জিত, প্রপীড়িত—দেখিতে সুডোল নিটোল রমণীয় হইলেও তাহা বেশির ভাগ আবরণেরই ছবি মাত্র তাহা সত্যকার সত্যের স্পন্দন, জীবন্ত সাড়া আনিয়া দেয় না। আমরা সত্যকে অনাবৃত নগ্ন করিয়া ফেলিতেছি, কাটিয়া কাটিয়া বাহির করিতেছি তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতরের দিকটি রক্তরাগে সত্য যেখানে নিঃসংশয়, অন্তরঙ্গ—তাহাতেই পাইব জীবনের সকল রহস্য, এই আশায়।

সত্য,—সত্যের সত্যকার অনুভব, খাঁটি নির্জলা উপলব্ধি আমাদের লক্ষ্য। তবে আমাদের সত্তা, আমাদের চেতনা সকলের চেয়ে আজ বেশি জাগ্রত যেখানে—সেই স্থূল ইন্দ্রিয়ের ও পঞ্চপ্রাণের দেহের জগতকেই আমরা একান্ত করিয়া ধরিয়া বসিয়াছি। অন্যান্য জগতের সত্য সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীনকালের সে নিঃসন্দেহভাব আর নাই। এককালে যে সকল আদর্শ বা বৃত্তি আমাদের কাছে ছিল সহজ স্বাভাবিক যাহাদের লইয়া আমরা উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম, এখন সে সকল অনেক জিনিব কৃত্রিম অন্তঃসার শূন্য বলিয়া বোধ হয়, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ উদাসীন।

ঘোর বাস্তবের জগতেই আমরা ঘুরিতেছি ফিরিতেছি; ঢুঁড়িতেছি এই পৃথিবীর, এই মাটিরই অন্তঃস্থল। উপরের দিকে উড়িয়া বা উঠিয়া চলিতে আমরা চাহিনা—চেতনা আমাদের নিম্নমুখী, আমরা নীচের দিকে কেবল খুঁড়িয়া চলিয়াছি। এই ক্রমবিশ্লেষণের ফলে—আকাশে বাতাসে, অণুতে পরমাণুতে, তড়িত কণায় যে সত্য বিকীর্ণ বিচ্ছুরিত মুখরিত—আমরা চাই, মানুষের শিল্পকেও এমন ভাবে রচিতে হইবে যেন তাহার মধ্যে সেই সত্যের ঠিক সেই স্পন্দন সেই ভাবে জাগ্রত দেখা দেয়। প্রাচীনতর যুগে সাহিত্যিক জগৎ আর সত্যকার জগৎ বলিয়া ছিল দুইটি জগৎ—সাহিত্যিক জগৎ যতই সত্যকার জগতের প্রতিরূপ বলিয়া চিত্রিত হোক না, তাহার ছিল পৃথক ধর্ম, পৃথক ছন্দ। আধুনিক যুগে এই পার্থক্য আমরা ঘুচাইয়া দিয়াছি। আর্ট সত্যের শুধুই মুকুর নয়, প্রকৃতি তাহাতে কেবলই প্রতিফলিত হয় না—আর্ট জীবনের জের বা জীবন্ত অঙ্গ।

এই দিক দিয়া দেখিলে, আধুনিক এক শ্রেণীর শিল্প রচনায় পাই জ্ঞানের অপেক্ষা বেশী অনুভবেরই ছাপ। বিষয় হিসাবে আমরা চাহিতেছি বটে জ্ঞান—আরও জ্ঞান; কিন্তু জ্ঞানের বস্তু অপেক্ষা আমাদিগকে বেশি অনুপ্রাণিত করিতেছে জ্ঞানের অনুসন্ধান, অনুসন্ধানের আবেগ। জ্ঞানের সাধক হইয়াও, এই উপলব্ধিটি আমরা কখন ছাড়াইয়া উঠিতে পারি না যে সকল জ্ঞানই পরিশেষে আপেক্ষিক, সকল জ্ঞানই সাময়িক এবং দেশিক; তবুও চাহিয়াছি সেই জ্ঞান, একটা চির অতৃপ্তির জের টানিয়া ক্রমাগত চলিয়াছি এক জ্ঞান হইতে আর এক জ্ঞানে। জানি চিরন্তন অনন্ত সত্য কিছু নাই—আছে আজকার এখানকার সত্য, তাহার স্থানে আসিবে কালকার ওখানকার সত্য—এই রকম সত্যের ক্ষণিকার বাহিনী হইল সার সত্য। তাহাতে কিছু আসে যায় না—কারণ আসল কথা হইল, ঐ ধারা, ঐ অবিরত চলা, ঐ ছন্দ, ঐ ভঙ্গী।

ভঙ্গীটাই মুখ্য কথা, বিষয় বা বস্তু মূল্যহীন। এই জন্যই বোধ হয় গভীর সমুচ্চ বিষয়ের খোঁজে আমরা সময় নষ্ট করি না—হাতের কাছে এই ভৌতিক ইন্দ্রিয়াদি দিয়া যে উপকরণ পাইতেছি তাহাই আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট। বস্তুর কথা ত আমরা বলিতে চাহি না—সে চেষ্টা বৃথা; আমরা বলিতে চাই বস্তু যে স্পর্শের যে সাড়ার তরঙ্গ আমাদের শিরায় নাড়ীতে তুলিয়া দেয় তাহারই কথা—সত্যের রূপ নয়, সত্যের গতি, সত্যের অনুভব ততখানি নয় যতখানি অনুভবের সত্যতা—ফল নয়, প্রণালীটি। তাই আধুনিকের সৃষ্টি বিষয়ের দিক দিয়া এত বহির্মুখী হইলেও, গড়নের (treatment) দিক দিয়া অন্তর্মুখী। সে অন্তর অবাক্ত

আত্মা বা অন্তরাত্মা কিছু নয়—তবুও তাহার মুখ ভিতরের দিকেই। তাহা হইতেছে নাড়ীর একটা চঞ্চল স্পর্শালুতা, স্থূলতর প্রাণের একটা সুতীক্ষ্ণ বুভুক্ষা এবং তাহাতে ইন্ধন দিতেছে, তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে একটা তীব্র অন্তর্বীক্ষণী জড়বুদ্ধি। একদিকে চুলচেরা বিশ্লেষণ অন্যদিকে একটা প্লুতগতি বেগ—এই উভয়ে মিলিয়া আধুনিকের প্রকৃতি গড়িয়া দিয়াছে।

আধুনিক শিল্পসৃষ্টির উৎস হৃদয়ের গভীর অনুভব—অন্তঃপ্রেরণা নয় কিম্বা সমুচ্চের প্রজ্ঞাও নয়। আধুনিক শিল্পকে সৃষ্টি করিতেছে, অন্ততঃ তাহার গতিকে ছন্দকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে আত্মবিশ্লেষণ-পরায়ণ এক তীক্ষ্ণ স্নায়বিকতা। আধুনিক শিল্পকে বুদ্ধিতন্ত্রী বলা হয়; কিন্তু সে বুদ্ধি স্থূল জড় বুদ্ধি—বুদ্ধির নিম্নতম ও বাহ্যতম বৃত্তি, ইহাকে সুতরাং বুদ্ধিতন্ত্রী না বলিয়া বলিতে পারি মগজ-তন্ত্রী বা "মগজী" শিল্প। হৃদয়ের ভাব যে শিল্প গড়িয়া দিয়াছে তাহাকে বলি "রোমাণ্টিক" শিল্প; বুদ্ধির উচ্চতর গ্রাম হইতে আসিয়াছে "ক্লাসিকাল" শিল্প। প্রাণময় পুরুষের আবেগ দিয়াছিল একদিন বস্তুতন্ত্রী শিল্প (Realistic ও Naturalistic School)। আজ প্রাণ হইতে আমরা নামিয়া গিয়াছি স্নায়ুমণ্ডলীর জগতে—স্নায়ুর কম্পন জাগাইয়া তোলে যে অনুভবকে যে চিন্তাকে যে অনুভব যে চিন্তা আবার কাঁপাইয়া তোলে স্নায়ুকে, জড়কে আশ্রয় করিয়া সেই একান্ত জড় নয় অথচ প্রায় জড়ীভূত জগৎ, সেই অস্পষ্ট ঘোরাল কেমন এক বৈদ্যুতিকক্ষেত্রের রহস্য আমরা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছি আধুনিক শিল্পে। আমরা সেই লোকের বাসিন্দা হইয়া উঠিতেছি যেখানে মনে হয় আমাদের পার্থিব চেতনার, আমাদের ইন্দ্রিয়-গত গতি যাবতীয় তন্মাত্রিক কণা, বীজাণু, শক্তি পরমাণু যেন বাথান করিয়া রহিয়াছে।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

জলকলস্বর

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ

জলের এই যে কলস্বর,
মনে আনে গোমুখী মুখর
সাগরের তরঙ্গ প্রখর,
গতিভরা, প্রাণভরা বাণী,
এমন সে গান একখানি।
সুরে যার সব তাল, সব রাগ বাজে,
প্রলয় সৃজন মৃত্যু জাগ্রত বিরাজে॥
ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়ে, হাসির উচ্ছ্বাসে দিশাহারা,
নিমেষে নিমেষে বুকে অশেষের সাড়া,
রোমাঞ্চিত স্বপনের বুদ্বুদের সারি,
আকাশের সপ্তবর্ণ আলোর পসারি।
গভীর অতলে তার সৃজনের আদিম বারতা,
প্রেমের অমোঘ বাণী, ছন্দহীন প্রলয়ের ব্যথা।

জলের এই যে কলস্বর,
করুণার অবাধ নির্ঝর,
এরি ডাকে জাগে দূরান্তর,
পাষাণ গলান মন-ব্যথা,
মমত, প্রেমের অমরতা,
মরমের সব সুর বাজে এরি মাঝে,
রুদ্রবীণে, সারেঙ্গীতে, সেতার, এস্রাজে,
ওঠে বেজে বারবার, বাহু আর বক্ষতললীন
বেহালায়, অন্তরের অবলুপ্ত ক্ষীণ,
বাসনার ধ্বনি, উন্মনা আশার বাণী,
অবরুদ্ধ পাষাণ কন্দর হ'তে টানি,
সজোরে বাহিরে আনে, আলো আর বাতাসের দেশে
আদি আর অন্তহীন, চলে যেন তারি প্রত্যাদেশে॥
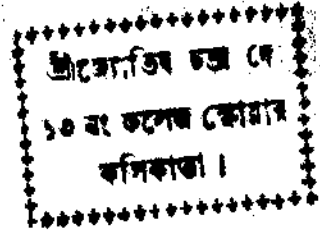
যাত্রা-সহচরী

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ব্যাণ্ডেল ষ্টেসনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। প্লাটফর্ম্মে পাইচারী করছি। একজন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি বৃদ্ধ; মাথার চুল কাশফুলের মতন শাদা ধবধব করছে। তাঁর গায়ের রংও উজ্জল গৌর। তাঁর তীক্ষ্ণ উন্নত নাসিকা, উজ্জল চক্ষু। তাঁর প্রশস্ত কপালের উপর রূপালি ঝালরের মতন চুলগুলি প'ড়ে তাঁর মুখে একটি শ্রী দান করেছে। বৃদ্ধের বয়স ৬৫ বৎসরের কম নয়; কিন্তু এখনও তিনি বেশ সমর্থ ও সোজা আছেন। তাঁর পরিধানে সুশুভ্র খদ্দরের ধোয়া ধুতি; গায়ে খদ্দরের সাদা ধবধবে মেরজাই পাঁজরের পাশে ফিতের ফাঁস দিয়ে বাঁধা, তার উপরে খদ্দরের সাদা চাদর; মেরজাইয়ের তলা দিয়ে শুভ্র পৈতার প্রান্ত ঈষৎ দেখা যাচ্ছে। তাঁর পায়ে সাদা চামড়ার শাতলা চটি। তাঁর এক হাতে একটি ছাতা, তার কালো কাপড়ের উপর সাদা কাপড়ের ছাউনি চড়ানো, সে কাপড়টাও সদ্য ধোপার ধোয়া; অপর হাতে একটি পুঁটুলি, লটকনা রঙে-ছোবানো পরিষ্কার একখানি গামছায় বাঁধা। গৌরবর্ণ বৃদ্ধের আপাদমস্তক শুভ্রতার মধ্যে একটু মাত্র রং লেগেছে গামছায়, তাও গেরুয়া। এই সব মিলে তাঁর আকৃতিতে একটি সুন্দর সৌম্য সাত্ত্বিক ভাব লেগেছে; তাঁকে দেখ্‌লেই মনের মধ্যে কেমন একটি সম্ভ্রমের ভাব উদয় হয়। তিনি আমার কাছে এসে দাঁড়াতেই, আমি তাঁর দিকে তাকিয়েই থমকে দাঁড়ালাম।

বৃদ্ধ একটু কুণ্ঠার সঙ্গে হেসে বল্‌লেন—বাবা, আমি বিশ্বেশ্বর দর্শনে কাশীতে যাব'; আমি আপনার কাছে কিছু পাথেয় সাহায্য চাই।

বৃদ্ধকে দেখে আমার মনে যে সম্মানের ভাব জেগেছিল' তা তাঁর ভিক্ষা চাওয়া শুনে দূর হয়ে গেল'। আমি মনে কর্‌লাম বৃদ্ধের এই যে সাত্ত্বিক শুভ্র বেশ তা ভিক্ষা কর্‌বার ভড়ং। আমি রুক্ষ অসম্মানের স্বরে বল্‌লাম—আপনাকে পাথেয় সাহায্য কর্‌তে গেলে আমার পাথেয় যে কম প'ড়ে যাবে।

বৃদ্ধ শান্ত স্বরেই বল্‌লেন—কিঞ্চিৎ যা হয় দান করুন। মা অন্নপূর্ণা আপনার চিত্ত ও বিত্ত পূর্ণ ক'রে রাখ্‌বেন।

আমি ইকনমিক্‌সের প্রফেসারী করি; ভিক্ষার প্রশ্রয় আমি দিতে পারি না। তাই ব্যঙ্গের স্বরে বল্‌লাম—অন্নপূর্ণা তো দেখ্‌ছি আমার বিত্ত হরণ ক'রে আপনার রিক্ততা পূরণ কর্‌বার ফন্দি ঠাওরেছেন! কিন্তু কষ্টে-সৃষ্টে উপার্জ্জন কর্‌ব' আমি আর আপনি কেবল চেয়েই তার ভাগ পাবেন কোন অধিকারে?

বৃদ্ধের মুখ একটুও অপ্রসন্ন হলো না; শুভ্র হাস্য ক'রে তিনি বল্‌লেন—প্রার্থীকে দান করার যে আনন্দ তার জন্যেই আপনি দান কর্‌বেন।

আমি রূঢ় ভাবে বল্‌লাম—দানে দাতার চেয়ে গ্রহীতারই আনন্দ বেশী। সুতরাং আমার নিরানন্দ থাকাই বেশী বাঞ্ছনীয়।

বৃদ্ধ একটু ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন—না না বাবা অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই। মা আনন্দময়ী আপনাকে আনন্দে পরিপূর্ণ ক'রে রাখুন। আনন্দময়ের রাজ্যে কোথাও নিরানন্দ নেই—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

বৃদ্ধ চমৎকার বিশুদ্ধ উচ্চারণে উপনিষদের বাক্যে আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে ধীরে ধীরে অপর লোকের কাছে ভিক্ষা চাইতে চলে গেলেন। তখন আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল' ওঁকে কিছু দিলে হতো! ওঁর চেহারাটা তো ভিক্ষুকের মতন নয়! চেহারা সম্ভ্রান্ত, আর বাক্য ও ব্যবহার সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের মতন, অথচ ভিক্ষাও চাইছেন; এর মানে কি? ভিক্ষা ক'রে তীর্থদর্শনে যেতে হবে এমন কি গরজ?

তিনি আবার আমার কাছে এলেই কিছু তাঁকে দেবো এই সঙ্কল্প মনের মধ্যে দৃঢ় হয়ে উঠ্‌তে না উঠ্‌তে ট্রেন এসে পড়্‌ল' এবং তাড়াতাড়িতে তাঁকে আর কিছু দেওয়া হলো না। কিন্তু একজন ভদ্রলোকের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করার গ্লানি মনের মধ্যে কেমন একটু অস্বস্তি জাগিয়ে রইল'।

বাড়ী গিয়েও সেই ভদ্র ভিক্ষুকের কথা ভুল্‌তে পার্‌লাম না। একদিন তাঁর কথা মনে হ'তেই মনে হলো, দীর্ঘ ছুটি তো আছে, একবার পশ্চিমে বেড়িয়ে এলে মন্দ হয় না।

মাকে বল্‌লাম—মা, একবার কাশী দর্শন ক'রে আসি।

মা হেসে বল্‌লেন—এর মধ্যে কাশীবাসে মতি হলো কেন'?

ঠাকুরমা বল্‌লেন—মতি হবে না? সোমথ ছেলে, তায় আবার রোজগেরে,—বিয়ে থা হলো না এখনো: সংসারে বৈরাগ্য হবারই তো কথা! তা ভাই, চলো আমাকে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করবে।

আমি হেসে বল্‌লাম—না ঠাকুরমা, রাধার কুঞ্জে কুব্জা-সুন্দরী পা দিলে যে-চুলোচুলি-ব্যাপার হবে, তা মোটেই সভ্য আর শোভন হবে না। অতএব আমার একা যাওয়াই নিরাপদ।

মা বল্‌লেন—খানারপাড়ার বিজয় মুখুজ্জে যে বার বার তাঁর মেয়ে দেখ্‌তে যাবার কথা লিখ্‌ছেন। যা না, একবার দেখেই আয় না।

আমি বল্‌লাম—সে দেখ্‌লেই হবে। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে তো তাঁর কন্যাদায় উদ্ধার হবে না, তবে আর তাড়াতাড়ি কি? আর আমি এক নম্বরের ফার্ষ্ট ক্লাস সুপাত্র হলেও তো দেশে দু-তিন নম্বরের সুপাত্রের অভাব নেই, সুতরাং বিজয়-বাবুর কন্যাকে আমি বিয়ে না করলেও তাঁর চির-কুমারী থাক্‌তে হবে এমনও সম্ভাবনা নেই।

মা বল্‌লেন—তা তো নেই, কিন্তু আমার যে ভারি ইচ্ছে যে ঐ মেয়েটির সঙ্গেই তোর বিয়ে হয়। এম-এ পাস-করা মেয়ে; কিন্তু কে বল্‌বে যে কিছু লেখাপড়া জানে……

আমি হেসে বল্‌লাম—সেটা তো খুব প্রশংসার কথা হলো না মা। বিদ্যা অর্জ্জন করলাম অথচ প্রকাশ করতে পার্‌লাম না, তবে সে পণ্ডশ্রম ক'রে লাভ কি। মূর্খেতে পণ্ডিতে তফাৎ তো ঐ প্রকাশে।

মা বল্‌লেন—আমি বল্‌ছিলাম যে তার বিদ্যের দেমাক নেই। দেখ্‌তে অতি-প্রিয়দর্শন, নম্র স্বভাব, সুস্থ দেহ; কাজে কর্ম্মে সেবা পরিচর্য্যায় ভারি চটপটে। আর তার মা-বাপ তারাও বেশ অমায়িক লোক। তাদেরও খুব ইচ্ছে তোর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেয়।

আমি হেসে বল্‌লাম—তুমি যে রকম গুণ-বর্ণনা করছ' তাতে ঘটকীরা হার মেনে যায়। তাই সন্দেহ হচ্ছে যে তোমাকে ওরা কিছু ঘুষ কবুল ক'রে উকীল বানিয়ে দিয়েছে। ঘুষের পরিমাণটা কি শুনতে পাই?—পাঁচ হাজার টাকা নগদ, রূপোর দানসামগ্রী, বাউটি-সুট গহনা, কলকাতায় একখানা বাড়ী বা একটা তালুক মুলুক মেয়েকে যৌতুক?

মা হেসে বল্‌লেন—আমরা বুঝি কেবল টাকাই চিনি', মানুষ চিনি না? দেনা-পাওনার কথা তাদের সঙ্গে কিছু হয় নি। এবার যখন কমলাকে নিয়ে পুরীতে গিয়েছিলাম, বিজয়-বাবুরা আমাদের বাড়ীর পরের বাড়ীতেই থাক্‌তেন; সেখানে তাদের সঙ্গে চেনা-শোনা হয়। জবাই তো সেবা-শুশ্রূষা ক'রে কমলাকে ভালো ক'রে তুল্‌লে। আমি জবার গুণে মুগ্ধ হয়ে তার মায়ের হাতে ধ'রে বলেছিলাম, তোমার মেয়ে আমার মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছে; তোমার মেয়েটিকে, দিদি, আমায় দিয়ে দিতে হবে। তাঁরা রাজী হলেন।

আমি হেসে বল্‌লাম—কিন্তু মা, রাজী তো হলেন বর আর কনের মায়েরা; বর-কনেরও তো রাজী-গররাজীতে ভরা একটা মেজাজ আছে। বরটিও তোমার কচি খোকা নয়, আর যা শুন্‌ছি তাতে কনেটিও খুকী নয়—আমার ঠাকুরমার বয়সীই হবেন বোধ হয়। অতএব এদিক্‌কারও পছন্দ অপছন্দ একটু দেখ্‌তে হবে বৈ কি। এম-এ পাস-করা মেয়ে যখন, তখন হয় তো এতদিনে কাউকে হৃদয় সমর্পণ ক'রে বাগ্‌দত্তা হয়ে ব'সে আছেন, এর মধ্যে আমার অনধি-কার প্রবেশের চেষ্টা করাটা কি উচিত হবে?

মা হেসে বল্‌লেন—আঃ, তুই কি যে বলিস তার ঠিক নেই, জবা তেমন মেয়েই নয়।

আমি বল্‌লাম—হতে পারে জবা তেমন মেয়ে নয়। কিন্তু তোমার ছেলে তো তেমন হ'তে পারে।

মা একটু আশ্চর্য ও উদ্বিগ্ন হয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—তুই কি কোনো মেয়েকে বিয়ে করবি ঠিক করেছিস্ না কি?

আমি হেসে বল্‌লাম—না, কাকে বিয়ে করব' তা ঠিক করি নি; কিন্তু কাকে বিয়ে করব না, তা ঠিক করেছি। যাকে আমি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে ভালো না বাসব' তাকে আমি বিয়ে করব' না। তখন আমার কলেজ বন্ধ থাকলে আমিও হয়তো কমলাদের সঙ্গে পুরীতে যেতাম, আর জবার সঙ্গে পরিচয় হতে পারত,' তাকে ভালোও লাগ্‌তে পারত।' কিন্তু তা যখন হয় নি, তখন ও-সম্বন্ধে আর কিছু আলোচনা না করাই ভালো। আমার যদি কাউকে কখনো ভালো লাগে তো তোমরা জান্‌তে পারবে। ছেলে-মেয়ের অনিচ্ছায় বিয়ে দিলে কেমন সম্ভাব হয় তার দৃষ্টান্ত তো তোমার অজানা নেই।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—তবে কি আমি বিজয়-বাবুদের জবাব দিয়ে দেবো?

আমি মাকে ক্ষুণ্ণ দেখে দুঃখিত হলেও দৃঢ় স্বরে বল্‌লাম—তাই দিয়ে দাও। তাঁদের মিথ্যা আশায় রেখে লাভ কি? মেয়ের বয়স তো আর কম হয় নি?

মা আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লেন, আর কোনো কথা বল্‌লেন না। মায়ের এই দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে আমাদের পরিবারের একটু ব্যথার ইতিহাস আছে। আমার ভগ্নীপতি অজয় অল্প বয়সে বিপত্নীক হয়েছিল; তাই তার বাপ-মা আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে অল্পদিনের মধ্যেই তার আবার বিবাহ দিয়েছেন আমার বোন কমলার সঙ্গে। অজয় পিতা-মাতার অনুমতিতে বিবাহ করেছে, কিন্তু কমলাকে ভালোবাসতে পারে নি। শ্বশুর বাড়ীতে কমলার কোনো অভাব নেই এক স্বামীর প্রীতি ছাড়া; কিন্তু সেই প্রধান অভাবের জন্ম অভাগিনী কমলা সদাই এমন মনমরা হয়ে থাকে যে তার মুখে হাসি দেখা যায় না। জবার সঙ্গে পুরীতে কমলা যত' দিন ছিল' তত' দিন নাকি কমলা হেসেছিল'। এই জন্যে মায়ের জবার প্রতি এত' টান। কিন্তু আমার মন তো অদেখা জবার দিকে একটুও টানে না। এ খবর জবার বাড়ীর লোকেদেরও অজানা নেই।

কাশী যাত্রা করলাম। পূজার পর হলেও গাড়ীতে ভিড় কম ছিল' না। ট্রেণ যখন বৰ্দ্ধমানে এল' তখন সন্ধ্যা হয়েছে। একটি তরুণী এসে আমাদের কামরায় উঠ্‌ল'; কুলী তার বাক্‌স' বিছানা আর একটা টিফিন-ক্যারিয়ার গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল'।

প্রথমে মনে করেছিলাম মেয়েটির সঙ্গে কোনো পুরুষ অভিভাবক আছে; কিন্তু মেয়েটিকে কেউ যখন কোথাও জায়গা ক'রে বসিয়ে দিতে এল' না, মেয়েটী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কোথায় বস্‌বে স্থির করবার জন্যে চারিদিকে চাইছে দেখ্‌লাম, এবং গাড়ীর আরোহী মাড়োয়ারী আর হিন্দুস্থানীরা কেউ একটুকুও জায়গা ছেড়ে দেবার লক্ষণ দেখাল' না, তখন আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লাম আপনি এইখানে এসে বসুন।

আমার ডাক শুনে মেয়েটী মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল'; তার পর লজ্জিত স্মিতমুখ একটুখানি নত ক'রে ইঙ্গিতে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার পরিত্যক্ত জায়গায় এসে বসল'। আমি তার সাম্‌নের বেঞ্চে জায়গা ক'রে নিয়ে বস্‌লাম।

তরুণীর সাম্‌নে মুখোমুখী ব'সে দেখ্‌লাম তার মুখখানি তারুণ্যের লাবণ্যে ও পুরুষের মধ্যে একাকিনী ব'সে থাকার লজ্জার আভায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। সে আহামরি সুন্দরী নয়; তার

"নাক মুখ চক্ষু কান
কুন্দে যেন' নিরমান"

নয়; তার গায়ের রং চাঁদের জ্যোৎস্না-রস গেলে অমৃতের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি হয় নি; তবু মোটের উপর তাকে সুশ্রীই বল্‌তে হয়, অন্ততঃ তখন আমার মন তাই বলল'। সে ক্ষীর-রঙের শাড়ী আর ব্লাউজ প'রে আছে; তাকে দেখেই আমার কেমন মনে হলো একটি যেন' আধ-ফোটা হলদে গোলাপ!

তরুণী ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্মের দিকের বেঞ্চিতে ব'সে ছিল'; সে মুখ ফিরিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে রইল'।

আমিও প্ল্যাটফর্মের দিকেই তাকিয়ে থাক্‌বার ইচ্ছা করছিলাম, কিন্তু আমার দৃষ্টি বড়' ঘন ঘন সাম্‌নের বেঞ্চির কোণটার দিকেই ফিরছিল' —বোধ হয় অমন আরামের জায়গাটা থেকে বে-দখল হয়ে আসার ক্ষোভে।

গাড়ী ছাড়্‌বার ঘণ্টা পড়্‌ল'। তখনও তরুণীর সঙ্গী কোন পুরুষ গাড়ীতে এসে উঠ্‌ল' না। তখন আমি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—আপনার সঙ্গের কোন লোক উঠ্‌লেন না।

তরুণী মুখ একটু ফিরিয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে মৃদু স্বরে বল্‌লে—আমার সঙ্গে আর কোনো লোক নেই।

মনে হলো তার কণ্ঠস্বর ভারি কোমল, বেশ মিষ্টি! কথায় তার লজ্জার সঙ্কোচ!

আমি বল্‌লাম—তা হ'লে আপনি মেয়ে গাড়ীতে গেলেই তো পার্‌তেন, এখানে তো আপনার অসুবিধা হবে, কষ্ট হবে।

তরুণী বল্‌লে—মেয়ে-গাড়ী দেখে এসেছি, তাতে প্যাসেঞ্জার কেউ নেই; তাতে আবার রাত্রি!

পুরুষ-মানুষকে মেয়েদের এতই অবিশ্বাস আর ভয়! একাকিনী অবলা আত্মরক্ষার জন্যে বহুপুরুষের শরণাপন্ন হয়েছে; এক পুরুষ অপর পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়েই অন্ততঃ সভ্য শান্ত হয়ে থাক্‌বে, পুরুষেরা dog in the manger policy অবলম্বন ক'রে পরস্পরকে সংযত ক'রে রাখ্‌বে, এই ধারণাতেই তো এই তরুণী মেয়েগাড়ীতে না গিয়ে পুরুষের গাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে! এই কথা মনে হতেই আমার খুব কৌতুক মনে হলো। আমি চুপ ক'রে গিয়ে প্রকাশে উদ্যত একটুখানি হাসি ঠোঁটের কোণে চেপে ফেল্‌লাম।

'আসানসোল ষ্টেসনে গাড়ী এল'। কয়েকজন মাড়োয়ারী কলরব কর্‌তে কর্‌তে নেমে গেল'। গাড়ীতে জায়গা হলো। তখন রাত্রি দশটা।

আমি এত'ক্ষণ চুপ ক'রে থাকার দুষ্কর তপস্যায় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এবার কথা বল্‌বার সুযোগ পেয়ে তরুণীকে বল্‌লাম—এইবারে একটু জায়গা হয়েছে। আপনার বিছানাটা ছড়িয়ে পেতে দি।

তরুণী ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে—থাক, আমার শোবার দর্‌কার হবে না।

আমি বল্‌লাম—বলেন কি! সারারাত ঠায় ব'সে কাটাবেন! আর ব'সে কাটালেও একটু আরামে বসুন……

আমি তার অনুমতির অপেক্ষা না ক'রেই দরজার কাছে রাখা বাক্‌সের উপর থেকে তার ছোট্ট বিছানার গাঁঠ্‌রী ও টিফিন-ক্যারিয়ারটা তুলে আন্‌লাম। টিফিন-ক্যারিয়ারটা দুই বেঞ্চির মাঝখানে মেঝেতে তরুণীর পায়ের কাছে রাখ্‌লাম, আর বিছানার কুণ্ডলীটা বেঞ্চির উপরে রেখে তার দড়ির বাঁধন খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লাম—আপনি একটু উঠুন, আমি এটা ছড়িয়ে পেতে দি।

তরুণী ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্কোচভরে বল্‌লে—আপনি কষ্ট করছেন কেন', আমি নিচ্ছি।

আমি হেসে বল্‌লাম—এ আর কষ্ট কি! বিলক্ষণ!

মনে মনে বল্‌লাম—It's a privilege, it's a pleasure to serve you!

বিছানা পাতা হলে সে আমার দিকে ভারি মধুর ক'রে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চাইলে, তাঁর পর ঈষৎ একটু হেসে ব'সে পড়্‌ল', একটি কথাও বল্‌লে না। কিন্তু কথায় বলার চেয়ে তার ঐ দৃষ্টি আর হাসি বল্‌লে অনেকখানি।

আমি আবার বল্‌লাম—আপনি বর্দ্ধমান থেকে উঠেছেন যখন, তখন নিশ্চয়ই খাবার-দাবার নিয়ে উঠেছেন। না থাকে তো কিছু কিনে আনি, আসানসোলের খাবারও বেশ ভালো।

আমার সেবাপরায়ণতার আতিশয্যে মেয়েটি বিরক্ত হলো না। সে একবার সেই রকম মিষ্টি ক'রে হেসে বল্‌লে—না, আমার খাবারের দর্‌কার নেই। আমি খেয়েই গাড়ীতে উঠেছি।

আমি বল্‌লাম—বিলক্ষণ, তা কি হয়! সেই সন্ধ্যাবেলা খেয়ে সারারাত কি থাকা যায়! আচ্ছা ধানবাদে গিয়ে খাবার নিলেও হবে, সেখানকার খাবারও মন্দ নয়।

মেয়েটি আর কিছু বল্‌লে না, গাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে একটু হাস্‌লে। হয়তো আমাকে বেহায়া রকমের ক্যাঙ্‌লা ভাব্‌লে!

আমি চুপ ক'রে গেলাম। কিন্তু খিদেতে নাড়ী জ'লে যাচ্ছিল'; আমার গাড়ীতে উঠ্‌লেই নাড়া লেগে খিদে পায়, নাড়ী জল্‌তে থাকে। কিন্তু মুখের সাম্‌নে নারী অভুক্ত হয়ে ব'সে থাক্‌বে, আর আমি হাঁউ-হাঁউ ক'রে গিল্‌তে থাক্‌ব' সেটা বড়' অশোভন ব্যাপার হবে ব'লে খিদে চেপেই ব'সে রইলাম। কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল' কাব্য খুব ভালো, কিন্তু বস্তুতন্ত্রটাও একেবারে অবহেলা করবার বস্তু নয়।

গাড়ী ছাড়্‌ল'। বেঞ্চির আধখানা জুড়ে একজন মাড়োয়ারী "বিরাজ করছিল'। বাকী আধখানার আমার বিছানাটা ছড়িয়ে কীচকের মতন গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়্‌লাম। দূরের বেঞ্চি খালি ছিল', কিন্তু তরুণীর কাছ থেকে তফাতে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল' না—একাকিনী অবলা, একজন রক্ষক কাছে থাকা ভালো।

মেয়ে জাতটা ভারি ভালো! মমতায় তাদের মনটা ভরা! আমায় শুয়ে পড়্‌তে দেখেই তরুণী লজ্জিত স্বরে বল্‌লে—আপনি শুলেন, কিছু খেলেন না?

আমি পরিতৃপ্ত হয়ে হতাশার ভাণ ক'রে বল্‌লাম—আপনি hunger-strike ক'রে থাক্‌লে আমি আর কি ক'রে খাই বলুন!

তরুণী এবার বেশ মুখ ভ'রে হেসে বল্‌লে—আমার সঙ্গে বর্দ্ধমানের বাজার থেকে আনা ভালো সীতাভোগ আর মিহিদানা আছে, আপনি যদি কিছু মনে না করেন……

আমি উঠে ব'সে বল্‌লাম—খাবার সম্বন্ধে অনুরোধে কিছু মনে না কর্‌তেই ব্রাহ্মণের পুরুষানুক্রমের তপস্যা চ'লে আস্‌ছে। আমি কলির ব্রাহ্মণ হলেও এতটা কুলাঙ্গার নই যে খাওয়ার অনুরোধে কিছু আপত্তি মনে কর্‌ব'। সকল রকম মিষ্ট দ্রব্যের উপর আমার বিষম লোভ!

তরুণী একমুখ হেসে টিফিন-ক্যারিয়ার খুল্‌বার জন্য নত হলো।"

আমি বল্‌লাম—কিন্তু Fair exchange and no favour! আমার সঙ্গে আমার মায়ের হাতের তৈরী লুচি-তরকারী, সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া আছে; আপনাকে একটু চেখে দেখ্‌তে হবে মা আমার কেমন কারিগর—আপনার ময়রা আমার মায়ের কাছে হার মেনে যাবে।

মেয়েটি মুখ ঈষৎ কাত ক'রে তেরছা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লে—মায়ের স্নেহ আমার চাখা আছে। মায়ের সঙ্গে ময়রার তুলনা! তবে মায়ের নাম যখন করলেন তখন আমাকে প্রসাদ কিছু নিতেই হবে, কিন্তু প্রসাদ কণিকা মাত্র দেবেন, নইলে আমার অসুখ করবে।

আমি খুসী হয়ে টিফিন ক্যারিয়ার খুলে ফেল্‌লাম। তার ভিতর থেকে কলা-পাতা নুন লঙ্কা লুচী তরকারী মিষ্টান্ন বেরুল'—একেবারে মূর্ত্তিমতী মায়ের মমতা আর করুণা! দুজনে দুজনের খাবার ভাগাভাগি ক'রে খেলাম—অমৃতের মতন লাগ্‌ল'—খুব খিদে লেগেছিল' কি না! Hunger is the best sauce!

জল খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে মসলা চিবোতে চিবোতে আবার শুয়ে পড়্‌লাম।

আমার অর্দ্ধাসনভাগী মাড়োয়ারী মহাশয় হেসে বল্‌লেন—হামি ধানবাদমে উৎরিয়ে যাবো, তব আপনি আরাম-সে ফয়লাকে শুত্‌বেন!

তার হাসিটা আমার কেমন অর্থভরা ব'লে মনে হলো। আমি একটু রুক্ষ স্বরেই বল্‌লাম—সে আপনার মেহেরবাণী।

রাত বারোটার সময় গাড়ী ধানবাদে এল'। মাড়োয়ারী নেমে গেল'। একজন লোক গাড়ীতে উঠ্‌ল'; সে অন্য বেঞ্চিতে গিয়ে বস্‌ল'। পাশাপাশি দুটি বেঞ্চিতে আমরা দুজন—আমরা অর্থাৎ আমি আর আমার যাত্রা-সহচরী!

যে লোকটি ধানবাদে গাড়ীতে চড়েছিল' সে গোমোতে নেমে গেল'। গাড়ীর আরো তিনজন আরোহী গোমোতে নাম্‌ল'। আমরা দুজন ছাড়া গাড়ীতে রইল' মাত্র আর-একজন, গাড়ীর ঐ এক টেরে!

ঘুম আর আসে না। ঘুমের জায়গা জুড়ে চোখের সাম্‌নে ব'সে আছে তরুণী। মনের মধ্যে কেবলই গুঞ্জন করছে গানের একটি কলি—

"রূপসী পল্লীবাসিনী।
শূন্য ঘাটে কেন' একাকিনী!"

যে লোকটি গাড়ীর এক টেরে লম্বা হয়ে প'ড়ে ঘুমোচ্ছিল' সেও নেমে গেল' হাজারিবাগ-রোড ষ্টেসনে। তখন রাত্রি

ছুটো। গাড়ীতে আর কেউ উঠ্‌ল' না। গাড়ীতে একলা আমরা দুজনে—দুজনে একলা শুদ্ধ ভাষা নয় যদিও!

অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখা কেটে কেটে ট্রেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে। একটি সুশ্রী তরুণীর সঙ্গে এক কামরায় একলা রয়েছি, কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল'। আমিও উঠে বস্‌লাম। ডেরাডুন-এক্‌সপ্রেস্ সব ষ্টেশনে থামে না; একবার কোডার্মায় থামবে, তার পরে সেই গয়ায়—সে তো ভোরবেলায়। একলা তরুণীর সামনে ব'সে থাক্‌তে অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল', অথচ কোডার্মায় কোনো intruder এই কামরায় যদি উঠে পড়ে তার আশঙ্কাতেও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল'।

কোডার্মায় গাড়ী এল'। গাড়ী ছাড়্‌বার ঘণ্টা পড়্‌ল'। তখন আমার বুকটা ধকধক করছে—হায় হায় এই মুহূর্ত্তে কেউ যদি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে গাড়ীতে চ'ড়ে বসে! আমার ইচ্ছে করতে লাগ্‌ল' উঠে গিয়ে দরজায় চাবি লাগিয়ে দি। কিন্তু লজ্জায় তাও পারলাম না।

গাড়ী ছেড়ে দিল'। কেউ উঠ্‌ল' না। প্ল্যাট্‌ফর্ম্ না পেরুলে এখনো বিশ্বাস নেই। যাক! বুকের উপর থেকে প্রকাণ্ড বোঝা নেমে গেল', নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

আমি বল্‌লাম—আপনি এইবার একটু শোন, আমি উঠে ঐ বেঞ্চিতে যাচ্ছি।

তরুণী টুপ ক'রে শুয়ে প'ড়ে বল্‌লে—না, আপনাকে স'রে যেতে হবে না। আপনিও শুয়ে পড়ুন।

সুবোধ শিশুর মতো বল্‌বা মাত্র আজ্ঞা পালন করলাম। শুয়ে যত' সব বাজে প্রশ্ন মনে হ'তে লাগ্‌ল'—আমার মুখের কাছ থেকে সুন্দরীর মুখের ব্যবধান কতখানিই বা আর হবে? আজ এত' নিকটে, কাল কে কোথায় চ'লে যাব' তার ঠিকানাও কেউ জানব' না? কি নাম, কোথায় বাড়ী, কি জাত, সব অজানাই থেকে যাবে? মায়ের পছন্দ-করা ভবী দেবীর সঙ্গে যদি এমনি অকস্মাৎ দেখা হয়ে যেত' আর এমনি ভালো তাকে লাগ্‌ত' তবে তাকে সুখী ক'রে আমিও সুখী হতে একটুও ইতস্ততঃ করতাম না!

চোখ দুটো চেষ্টা ক'রে বুজে ছিলাম। কিন্তু চোখের পাতা খুলে পড়বার জন্য ক্রমাগত পিটপিট করছিল'। চোখ খুল্‌তে বড্ড ইচ্ছা করছিল' ব'লেই চোখ খুল্‌তে সঙ্কোচ হচ্ছিল'—চোখ চাইলেই তো তরুণীর মুখের উপর দৃষ্টি পড়বে!

অনেকক্ষণ কেটে গেল'। অন্ততঃ আমার মনে হলো অনেকক্ষণ, বাস্তবিক হয়তো বেশীক্ষণ হয় নি। আমি চোখ চাই কি না চাই করতে করতে চেয়েই ফেললাম। দেখি তরুণী চেয়ে রয়েছে। আমাকে চোখ চাইতে দেখেই সে একটু হাস্‌লে।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে আমার লজ্জা ঢাক্‌বার জন্য বল্‌লাম —আপনি যে-ভয়ের জন্যে মেয়েকামরায় যান নি, এখানেও সেই ভয়েই আপনার ঘুম আস্‌ছে না।

তরুণী উঠে ব'সে সহজ স্বরে বল্‌লে—ভদ্রলোকের কাছে ভয় কি?

মনটা প্রসন্ন হয়ে গেল'—যাক, আমি তা হ'লে ভদ্রলোক!

আমি বল্‌লাম—কিন্তু একলা রাত্রে চলেছেন, কাউকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল'।

তরুণীর মুখ একটু লজ্জিত হলো। কথায় কথায় এই হ্রী তার মুখে একটি শ্রী দান করে। সে বল্‌লে—আর কতকাল মেয়েরা পুরুষকে অবলম্বন ক'রে থাক্‌বে? তাতে তারা নিজেরাও চল্‌তে পারে না, পুরুষদের চলাতেও বাধা দেয়। দেশের কত' মেয়ে জেল খাটছে, আর একলা কোথাও যেতেই আমাদের ভয় করলে চল্‌বে কেন'? ভয় তো জীবনের সঙ্গে লেগে আছে। ভয়ের সঙ্গেই জীবনযাত্রা। তবে যত'টা সাবধান হ'তে পারা যায়।

আমিও উঠে বস্‌লাম। অপরিচিতার পরিচয় জান্‌বার জন্য আমার মন উৎসুক হয়ে উঠেছিল'। জিজ্ঞাসা করলাম —আপনি কোথায় যাবেন?

তরুণী বল্‌লে—লক্ষ্ণৌ।

আর তো প্রশ্ন করা যায় না। কাজেই চুপ করলাম।

এবার তরুণী আমায় জিজ্ঞাসা করলে—আপনি?

আমি বল্‌লাম—কাশী।

আবার দুজনে চুপ।

গাড়ী চলেইছে চলেইছে।

ভোরবেলা সাড়ে চারটায় সময় ট্রেন গয়াতে পৌঁছাল'। কয়েকজন যাত্রী এসে আমাদের কামরায় উঠ্‌ল'। তাদের

মধ্যে উঠ্‌ল' সেই ব্যাণ্ডেল ষ্টেসনে দেখা কাশীযাত্রী ভিক্ষাকারী ব্রাহ্মণ!

তাকে ভিক্ষা না দেওয়া থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার মনটা তাকে খুঁজে পাওয়ার জন্ম উৎসুক ছিল'। কিন্তু আজ এখন তাকে আমাদের গাড়ীতে উঠ্‌তে দেখে মনটা আবার বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল'। লোকটার চেহারা দেখে আর কথা শুনে তার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা হয়েছিল' এখন তাকে দেখে তা দূর হ'য়ে গেল'। সে বলেছিল' যে কাশী যাবার জন্যে ভিক্ষা করছে, কিন্তু এখন তো উঠ্‌ল' গয়া থেকে। লোকটাকে আমার পেশাদার ভিক্ষুক ব'লেই মনে হলো।

ব্রাহ্মণ গাড়ীতে উঠে আমার পিছন দিকের যে বেঞ্চি তাতে গিয়ে বস্‌ল'। কাজেই আমার সঙ্গে তার চোখো-চোখি দেখা হলো না। আমি মনে মনে বল্‌লাম—ভালোই!

ডেহেরি-শোণে ট্রেন যখন এল' তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে। তখন সেই ব্রাহ্মণ আমার পিঠের দিকে দাঁড়িয়ে আমার যাত্রাসহচরীকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে—মা, আমাকে তুমি কিছু ভিক্ষা দাও—বাবা বিশ্বনাথ স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করেছেন, তাই তাঁর চরণ দর্শন করতে চলেছি। বিশ্বনাথের আদেশ পাথেয় আর ত্রি-রাত্রি কাশীবাসের খরচ আমাকে পথে ভিক্ষা ক'রে সংগ্রহ করতে হবে।

আমার যাত্রা-সহচরী তার একটি নীল খদ্দরের থলী থেকে একটি টাকা বাহির ক'রে পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের হাতে দিলে।

ব্রাহ্মণ প্রীত হয়ে আশীর্ব্বাদ করলে—ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করো মা—অন্নপূর্ণা তোমার সকল অভাব পূর্ণ করুন!

ব্রাহ্মণ যখন ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আমার যাত্রাসহচরীর দান গ্রহণ করছিল' সেই সময় আমার সঙ্গে তার চোখো-চোখি হয়ে গেল'। ব্রাহ্মণ প্রার্থনা জানাবা মাত্র এই মেয়েটি কত' সহজে তাকে দান করলে দেখে আমার সেদিনকার রূঢ় ব্যবহারের জন্ম অত্যন্ত লজ্জা বোধ হলো। আমি অপ্রতিভ হয়ে ব্রাহ্মণকে বল্‌লাম—নমস্কার পণ্ডিত মশায়। আমায় চিন্‌তে পারছেন, সেদিন ব্যাণ্ডেল ষ্টেসনে আমি আপনাকে কিছু দিই নি।

ব্রাহ্মণ নম্রস্বরে বল্‌লে—হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, চিনেছি। সেদিন তো সঙ্গে মা অন্নপূর্ণা ছিলেন না তাই আমার প্রার্থনা পূর্ণ হয় নি, আজ মায়ের কাছে প্রার্থনা করতেই তো আমার প্রার্থনা পূর্ণ হয়ে গেল'।

বৃদ্ধের কথা শুনে আমি যাত্রাসহচরীর মুখের দিকে তাকালাম, দেখ্‌লাম তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে—তাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। বৃদ্ধ যে ভুল করেছে তার জন্ম বৃদ্ধের উপর আমার মন খুব খুশী হয়ে উঠ্‌ল'।

আমি চকিতে তরুণীর লজ্জাম্মিত মুখের শোভাটুকু দেখে নিয়ে ব্রাহ্মণকে বল্‌লাম—সেদিন আমি আপনাকে অকারণ কত'গুলো কড়া কথা বলেছিলাম, আপনি আমার সেই বেয়াদপি মাপ করবেন।

ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হয়ে মিষ্ট স্বরে বল্‌লে—না না বাবা তুমি তো আমাকে তেমন কিছু বলো নি; ভিক্ষুককে সকলেই ভয় করে, চোর না-ব'লে নেয়, আর ভিক্ষুক বিরক্ত ক'রে আদায় করে, এই তো তফাৎ। সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে—

তৃণাদ্ অপি লঘুস্ তূলঃ তূলাদ্ অপি চ যাচকাঃ।
বায়ুনা চ ন নীয়স্তে অর্থ প্রার্থন-শঙ্কয়া॥

তৃণের চেয়েও লঘু তুলা, তুলার চেয়েও লঘু যাচক; তবে বাতাস তাদের উড়িয়ে নিয়ে যায় না পাছে তারা তার কাছেও অর্থ প্রার্থনা ক'রে বসে!

এই ব'লে ব্রাহ্মণ বেশ সরল মনখোলা হাসি হেসে উঠ্‌ল' এবং বল্‌তে লাগ্‌ল'—এই জন্যেই তো বিশ্বেশ্বর করুণা ক'রে আমায় স্বপ্নাদেশ করেছেন ভিক্ষা ক'রে তাঁর চরণদর্শন করতে হবে। মানুষের মনের মধ্যে অহঙ্কার পলে পলে সঞ্চিত হয়, সেই অহঙ্কারের মলিনতা মার্জ্জনা না করলে তো বিশ্বেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় না। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে আমার উপকারই করেছ' বাবা, তোমার উপর তো আমার একটুও ক্ষোভ নেই।

আমি মনি-ব্যাগ খুলে পাঁচটি টাকা বাহির ক'রে ব্রাহ্মণের হাতে দিতে গেলাম। তিনি নম্র সুরে বল্‌লেন—অত' কি করব' বাবা? কাশী যাবার টিকিট কেনা হয়ে গেছে, সেখানে ত্রিরাত্রি বাসের খরচও আমার মা লক্ষ্মী পূর্ণ ক'রে

দিয়েছেন। মা অন্নপূর্ণার কৃপায় আমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল, ভাটপাড়ায় আমার চতুষ্পাঠী আছে, নানা স্থানে সম্পন্ন শিষ্য আছেন; পিতা বর্দ্ধমানে তিনি চতুষ্পাঠী চালাতেন, আমি শ্রীরামপুর কলেজে সংস্কৃতের প্রফেসারী করতাম; কাশীতে ত্রিরাত্রি বাস হয়ে গেলে বাড়ী থেকে আমার টাকা আস্‌বে।

আমি লজ্জিত হয়ে বল্‌লাম—এ আপনাকে নিতে হবে, আমার সেদিনকার অবিনয়ের প্রায়শ্চিত্তের দক্ষিণা স্বরূপ। আপনার কাজে না লাগে কাশীতে অভাবগ্রস্তের তো অভাব নেই, আপনি তাদের দান ক'রে দেবেন।

ব্রাহ্মণ টাকা কয়টি নিয়ে বল্‌লেন—আচ্ছা বাবা তবে আমি নিলাম। বিশ্বেশ্বর তোমাদের আনন্দে রাখুন।

ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদের এই তোমাদেরের মধ্যে যে আমার যাত্রা-সহচরীও জড়িয়ে গেলেন তাতে তাঁর মুখ আর একবার লাল হয়ে উঠ্‌ল'। ব্রাহ্মণের প্রতি প্রসন্নতায় ও কৃতজ্ঞতায় আমার মন এমন উপ্‌চে উঠ্‌ল' যে তাঁর পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছা করছিল'।

বেলা সাড়ে নটার পর ট্রেন কাশী ষ্টেসনের সন্নিহিত হ'তে লাগ্‌ল'। আর যাত্রীরা প্রত্যেক কক্ষ থেকে জয় বাবা বিশ্বনাথ, বিশ্বেশ্বরকী জয় ধ্বনিতে তীর্থ দর্শনের উল্লাস ঘোষণা করতে লাগ্‌ল'। ব্রাহ্মণ দূরে কাশীতলবাহিনী গঙ্গা ও দেবমন্দিরের চূড়া দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

ট্রেন কাশী ষ্টেসনে এসে দাঁড়াল'। ব্রাহ্মণ ট্রেণ থেকে নাম্‌লেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কাশীতে নামলেন না?

ব্রাহ্মণ বল্‌লেন—আমি বেনারস ষ্টেসনে নাম্‌ব', সেই-খানেই কোনো ধর্ম্মশালায় থাক্‌ব'। সহরের ধর্ম্মশালায় বড়' ভিড় আর ময়লা।

আমি বল্লাম—আপনি বেরিয়েছেন তো অনেক দিন; এতদিন কোথায় ছিলেন?

তিনি বল্লেন—ভিক্ষা ক'রে তো যাওয়া। ভিক্ষা ক'রে সেদিন যা পেয়েছিলাম তাতে গয়া পর্য্যন্ত টিকিট কিন্‌তে পেরেছিলাম। তাই গয়াতে নেমে পিতৃকৃত্য করে এলাম। আবার পাথেয় ভিক্ষা ক'রে বিশ্বেশ্বরের চরণ দর্শনে চলেছি।

ব্রাহ্মণ বেনারসে নেমে গেলেন।

এবারে আমার যাত্রাসহচরী আমাকে প্রশ্ন করলেন—আপনি নাম্‌লেন না।

আমি গম্ভীর হয়ে বল্লাম—না।

সে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার না কাশীর টিকিট ছিল'?

আমি বল্লাম—তা তো ছিল'।

—তবে?

—আর খানিক দূর over-carried হয়ে যাব'।

—over carried হয়ে যাবেন মানে?

—সাধু বাংলায় অনুবাদ করলে বল্‌তে হয় উদ্‌বাহিত হয়ে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত যাব'।

—হঠাৎ কাশী ছেড়ে লক্ষ্ণৌ যাওয়ার ইচ্ছা হলো যে?

—এখন দেখ্‌ছি কাশীর চেয়ে লক্ষ্ণৌ ঢের বড়' তীর্থ। আজ এতদিনে বুঝ্‌ছি কবি দেবেন্দ্র সেন কেন' বিশ্বের সব জিনিসের সেরা ঠাওরে ছিলেন লক্ষ্ণৌর আতা!—

আমি উৎসাহের ঝোঁকে আবৃত্তি ক'রে ফেল্‌লাম—
চাহি না 'আনার'—যেন' অভিমানে ক্রূর
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজসুন্দরীর!
চাহি নাক 'সেউ'—যেন' বিরহ-বিধুর
জানকীর চিরপাণ্ডু বদন-রুচির!
একটুকু রসে ভরা চাহি না 'আঙ্গুর',—
সলজ্জ চুম্বন যেন' নব-বধূটীর!
চাহি না 'গয়া'র স্বাদ,—কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন' প্রৌঢ়-দম্পতির!
দাও মোরে সেই জাতি সুবৃহৎ আতা
থাকিত' যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া;
চঞ্চলা বেগম কোনো হয়ে উল্লসিতা
তাড়িত;—সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া!
অহো কি বিচিত্র মৃত্যু! আনন্দে গুমরি'
যেত' গলি ললিকার রসনা উপরি!

আমার যাত্রা-সহচরী হাস্‌লেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—তা লক্ষ্ণৌ গিয়ে কোথায় থাক্‌বেন?

তার মুখে চোখে কৌতুকের হাস্যচ্ছটা ঝলমল করছিল'।

আমি বল্‌লাম—লক্ষ্ণৌএ আমার বন্ধু পটু পটুয়া অসিত হালদার আছেন, তাঁর স্কন্ধেই চাপা যাবে।

এমন সময় সহচরী গাড়ীর বাইরে তাকিয়েই উচ্চকিত হয়ে উঠ্‌ল'।

আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে অনুসন্ধান করতে লাগ্‌লাম কি বা কাকে দেখে আমার সহচরী সচঞ্চল হয়ে উঠেছেন। প্লাটফর্মের উপর চোখ বুলাতে বুলাতে দেখলাম সেই স্বপ্নাদিষ্ট কাশীযাত্রী ব্রাহ্মণকে সঙ্গে ক'রে তাঁর পুঁটুলীটি হাতে নিয়ে একজন লোক প্ল্যাটফর্ম্ থেকে বেরিয়ে যাবে ব'লে যাত্রীর ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই লোকটিকে আমি চিনি, আমরা একসঙ্গে বি-এ আর এম-এ পড়েছিলাম। আমার নাম সমীরণ আর ওর নাম প্রভঞ্জন; তাই সে আমাকে মিতা বল্‌তো'; আমি ওর মাকে মাসিমা বল্‌তাম; আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব মাসিমার স্নেহের মধ্যস্থতায় অত্যন্ত প্রগাঢ় হয়ে গিয়েছিল'। তারপর আমি গভর্মেণ্ট সার্ভিস্ নিয়ে কৃষ্ণনগর কলেজে প্রফেসার হয়ে যাই, আর প্রভঞ্জন লাহোরে প্রফেসার হয়ে যায়। সেই থেকে আমাদের ছাড়াছাড়ি, প্রথম কিছুদিন চিঠিপত্র লেখা চলেছিল', তারপর ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে গেছে। আজ পাঁচ-ছ বছর পরে তাকে হঠাৎ দেখ্‌তে পেলাম। অমনি আমি আমার সহচরীর দৃষ্টি উচ্চকিত হওয়ার কারণের সন্ধান ভুলে, গাড়ীর দরজা খুলে তিন লাফে প্রভঞ্জনের কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

হঠাৎ বাহুপাশে বদ্ধ হয়ে প্রভঞ্জন একটু চম্‌কে উঠ্‌ল'। তারপর আমার মুখের দিকে দেখেই ব'লে উঠ্‌ল'—আরে মিতা যে! তুমি কোথা থেকে? কাশীতে এসেছ, কোথায় আছ'?

আমি বল্লাম—কাশী আসব' ব'লেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু এখন মত পরিবর্ত্তন ক'রে লক্ষ্ণৌ চলেছি।

প্রভঞ্জন বল্‌লে—ট্রেন তো বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় লক্ষ্ণৌ পৌছাবে। সমস্ত দিন স্নানাহার হবে না। তুমি নেমে পড়'; Journey break ক'রে কাল লক্ষ্ণৌ গেলেই হবে। মা এখানে আছেন। তুমি জানো বোধ হয়, আমি এখন বেনারস ইউনিভার্সিটিতে আছি।

আমি বল্‌লাম—না তা তো জান্‌তাম না। তা লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে এসে মাসিমাকে প্রণাম করব'; আজ আর নামা চল্‌বে না।

প্রভঞ্জন বল্‌লে—কেন? এত' কি বাধা?

আমি হেসে বল্‌লাম—গাড়ীতে একটি অবলা অসহায়া রয়েছেন, তাঁকে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত পৌছে দিতে হবে।

প্রভঞ্জন জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কে বউ নাকি? বিয়ে করেছিস?

আমি বল্‌লাম—না বিয়ে এখনো তো করি নি।

প্রভঞ্জন হেসে বল্‌লে—তবে কোর্ট্‌শিপ্ চল্‌ছে বুঝি!

আমি বল্‌লাম—তাও ঠিক বলা যায় না। কি জাত, কি ধর্ম্ম, অপরা সধবা বা বিধবা তাই নির্ণয় কর্‌তেই তো লক্ষ্ণৌ চলেছি।

স্বপ্নাদিষ্ট কাশীযাত্রী ব্রাহ্মণ বল্‌লেন—আমি তো মেয়েটিকে তোমার স্ত্রী বলেই ভুল করেছিলাম। কিন্তু তোমরা তো কেউ তাতে কোনো আপত্তিও করো নি, আমার ভুলও সংশোধন ক'রে দাও নি।

প্রভঞ্জন হেসে বল্‌লে—আপনার ভুলটা দুজনেরই প্রীতিরোচক হয়েছিল' ব'লে ওঁদের আপত্তি হয়নি। আপনি বুঝি ওঁদের সঙ্গে এক কামরাতেই এলেন? পরিচয় হয়নি বোধ হয়? আপনাদের পরিচয় করিয়ে দি……ইনি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাশীপতি বিদ্যালঙ্কার; এঁর কাছে আমি শ্রীরামপুর-কলেজে পড়েছিলাম; আজ ষ্টেসনে এসে গুরুর চরণ আর বন্ধুর বদন দর্শন ঘটে গেল'। ইনি আমার বন্ধু সতীর্থ মিতা শ্রীযুক্ত সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ট্রেন ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়ল'।

প্রভঞ্জন বল্‌লে—পণ্ডিত মশায়, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি বন্ধুর অবলাবান্ধবটিকে একবার দেখে আসি। সমীরণ লক্ষ্ণৌ থেকে এলে আপনার সঙ্গে ভালো ক'রে পরিচয় হবে। আপনাদের যখন পথে কুড়িয়ে পেয়েছি, তখন শিগ্‌গির ছেড়ে দেবো না পণ্ডিত মশায়।

এই ব'লতে বলতে প্রভঞ্জন হাসিমুখে আমার সঙ্গে ট্রেনের দিকে এগিয়ে এল'।

আমরা ট্রেনের কাছে আস্‌বার আগেই আমার সহচরী

গাড়ীর জানলা থেকে ঝুঁকে মুখ বাহির ক'রে আগ্রহভরা স্বরে ডাকলে—দাদা!

সেই ডাকে চমকিত হয়ে প্রভঞ্জন ব'লে উঠ্ল'—কে রে? জবা! তুই কোথায় যাচ্ছিস?

জবা! আমার বুকটা আনন্দে দুলে উঠ্ল! এই কি আমার মায়ের পছন্দ করা জবা! নামটা তো খুব সাধারণ নয়! তবে সেই বা হবে!

প্রভঞ্জনের প্রশ্নের উত্তরে জবা বল্লে—আমি লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি, ছোড়দার কাছে।

প্রভঞ্জন গাড়ীতে উঠে জবার বাক্স বিছানা টেনে নামাতে নামাতে বল্লে—লক্ষ্ণৌ পরে গেলেই হবে। এখন এখানেই নেমে পড়। আমি শশধরকে এখনই টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি। তোর সঙ্গে কে আছে?

জবা বল্লে—কেউ নেই, আমি একলাই যাচ্ছি।

তখন প্রভঞ্জন আমার দিকে ফিরে হেসে বল্লে—ও! তুমি বুঝি এই অবলার রক্ষক হয়ে লক্ষ্ণৌ চলেছ'? এ আমার মাস্‌তুতো বোন জবা। জবা তো এখানে নামছে। এখন তোমরাও আর জার্নি ব্রেক্ করতে আপত্তি নেই বোধ হয়? তোমার জিনিসপত্তর নামিয়ে ফেল'। আর তোমরা এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি শশধরকে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে আসি।

প্রভঞ্জন চ'লে গেল'। গাড়ীও ছেড়ে চ'লে গেল'। শূন্য প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি আর জবা!

কয়েক মিনিট সুখের আবেশে আমি কথা কইতে পারলাম না। তারপর আনন্দবিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত ক'রে হলদে জবাফুলের মতন তন্বী মনোহরা তরুণীর লজ্জান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি জবা!

আমার এই অৰ্দ্ধেক প্রশ্ন ও অৰ্দ্ধেক বিস্ময়োক্তি শুনে কৌতুক অনুভব ক'রে জবা ঘাড় নেড়ে বল্লে—হাঁ।

তার মাথাটি ছন্দে দুল্ল' যেন মৃদু বাতাস এসে হলদে জবাফুলটিকে দুলিয়ে দিয়ে গেল'।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি আমার পাড়ার বিজয় মুখুর্জ্জে মশায়ের কন্যা?

জবা আবার মাথা দুলিয়ে দুষ্টমিভরা হাসি হেসে বল্লে—হ্যাঁ।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—পুরীতে গিয়ে কমলা আর তার মায়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল'?

জবা আবার তেমনি মাথা দুলিয়ে বল্লে—হাঁ।

আমি তখন আনন্দে আপ্লুত হয়ে বললাম—আমার নাম শ্রীমান্ সমীরণ।

জবা হেসে বল্লে—তা আমি জানি।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ক'রে জানলেন?

জবা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—কমলার কাছে আপনার ছবি দেখেছিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ট্রেনে আপনি আমাকে চিন্‌তে পেরেছিলেন?

জবা তেমনি সুন্দর ঘাড় দুলিয়ে বল্লে—হ্যাঁ।

আমি একটু অভিমানক্ষুণ্ণ স্বরে বললাম—তবে আপনি আমাকে পরিচয় দেন নি কেন?

জবা লজ্জানত মুখে বল্লে—কি পরিচয় দিতাম?

বাস্তবিকই তো, কি পরিচয় সে দিত'। আমার প্রত্যাখ্যাতা সে, আমার কাছে এই তো তার প্রধান পরিচয়! তার ঐ প্রশ্ন মৃদু ভর্ৎসনা ও ক্ষোভের মতন শোনালো। আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললাম—কিন্তু মা তো আপনাকে নিতান্ত আপনার জন মনে করেন, আপনাকে একবারে নিজস্ব ক'রে নিতে চান।

জবা হেসে বিদ্রূপমিশ্রিত স্বরে বল্লে—কিন্তু তাতে তো আপনার বিষম আপত্তি শুনেছি।

আমিও হাস্‌তে হাস্‌তে বললাম—এখন স্থির বুঝেছি মায়ের কথার অবাধ্য হওয়া অত্যন্ত অন্যায়।

জবা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—সুবোধ বালকের মতন এমন মাতৃভক্তি হলো যে হঠাৎ?

আমি বললাম—আমার যাত্রাসহচরীর সঙ্গগুণে!

জবা গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের তরুচ্ছায়াসমাবৃত শীতলসলিল পদ্মপুকুরের মতন দুটি স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষরের কৃষ্ণ ও শুক্ল-পক্ষ

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ

শীতঋতুর কান্তি অস্ফুট আধারে জাগিতেই যেমন কুজ্ঝটিকা জমাট বাঁধিয়া চরাচরকে আপনার থলিখানিতে ভরিয়া ফেলিতে চায় ঠিক তেমনি দেহী দেহ লইয়া খানিক বাড়ন্ত হইলেই মায়ার কুজ্ঝটিকা তাহার সকল সত্তাটিকে গ্রাস করিয়া ফেলে! কুজ্ঝটিকা যেন শীতের গাত্রাবরণ আর মায়া যেন দেহীর দেহ-বাস, ইহা দেহেরই মধ্যে বাস করে। জীব আপনার চেতনাকে এ অঙ্গদখানিতে মুড়িয়া কি শীতে কি গ্রীষ্মে বাস করে। এমন যে মায়ারূপী শালখানি জীবচৈতন্যের গায়ে ঢাকিয়া আছে, অক্ষর আত্মনকে ত ইহা ছুঁইতেও পারেনা,—

> অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
>
> কেন ১।৪

তিনি 'বিদিতাৎ অন্যৎ'—আচার্য্য শঙ্কর 'বিদিত' শব্দের অর্থ করিতেছেন, 'সর্ব্বমেব ব্যাকৃতং তদ্‌বিদিতমেব'—নাম-রূপযুক্ত বস্তুই বিদিত—এই যেমন আমাদের স্থূল শরীর। ইহা হইতে অক্ষর পুরুষ ভিন্ন। তিনি আবার 'অবিদিতাৎ অধি'—শঙ্করের মতে 'অব্যাকৃতাৎ অবিদ্যা-লক্ষণাৎ ব্যাকৃত-বীজাৎ অধি উপরি'—অবিদিত অর্থ বিদিতের বিপরীত; বিদিত স্থূলশরীর, আর অবিদিত হইতেছে স্থূলদেহের বীজ-স্বরূপ অবিদ্যা যাহাকে জীব সহজে জানিতে পারে না। এই অবিদ্যারূপিনী মায়ার 'অধি' অর্থাৎ উপরিভাগে অক্ষর বিরাজমান। 'অধি' বলার সার্থকতা কি? 'যদ্ধি যস্মাদধি উপরি ভবতি তৎ তস্মাৎ অন্যৎ ইতি প্রসিদ্ধম্' যে বস্তু যাহার উপরে আছে তাহা সেই বস্তু হইতে মূলতঃ ভিন্ন হইতে বাধ্য। আচার্য্য শঙ্কর এইভাবে ক্ষরজীবত্বকে মায়া-পিহিত করিয়া ইহারই গায়ে মায়াশালখানিকে মেলিয়া ধরিয়াছেন এবং অক্ষর ব্রহ্মকে এ মায়াবরণের ঊর্দ্ধে ধরিয়াছেন। এমনি করিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি অক্ষরের আসন দেহ-মন্দিরে কোথায় এবং ক্ষরজীবকে যে মায়াবরণ গ্রাস করিয়া আছে তাহার সংস্থানই বা কোথায়? 'নিত্যং নিত্যবিরোধিনাম'-বৎ যে দ্বন্দ্বের আভাষ এখানে দেখিতেছি উহাই দ্বৈতত্ব আনিয়া দিয়াছে, দুই থাকিতে সাম্য হইবে কেমন করিয়া? সুতরাং মায়াশালখানিকে খসাইবার জন্য যে বিদ্যা উহাই উপনিষদ্ 'অবিদ্যাদেঃ নিশরণাৎ ইতি অনেন অর্থযোগেন বিদ্যা উপনিষদিত্যুচ্যতে।'

অক্ষরপুরুষ হইতে অবিদ্যারূপিণী মায়া সম্পূর্ণ পৃথক্,—কিরূপ? দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা (কঠ ২।১।৪) শঙ্করাচার্য্য প্রচলিত প্রথানুসারী Colour-definition করিয়া এতদুভয়ের পার্থক্য ফুটাইয়া তুলিতেছেন—তমঃপ্রকাশাবিব। আলো অন্ধকারে যে বৈষম্য, বিদ্যা অবিদ্যায় সে বিচ্ছিন্নতা। তাহা হইলে অক্ষর পুরুষ হইতেছেন আলোককান্তিমান আর অবিদ্যা হইতেছে তমস্বিনী। এহেন ঘুটঘুটে কালো মায়াশাল ঢাকা হইয়া জীবের অন্তর্লোকে সন্ত অমাবস্যা বিরাজ করিতেছে—বাহিরে সূর্য্যচন্দ্রালোক ঝলসাইলে কি হইবে, ভিতরে কেবলি অন্ধকার—চক্ষু বুজিলেই ইহা যথার্থ উপলব্ধি করা যায়। সেই অবিদ্যার black screenটি অন্তর্লোক কালো করিয়া রাখিয়াছে স্পষ্ট ধরা যাইবে। আত্মাকে দর্শন বাসনায় দর্শনশাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে সত্য, তাও আবার দর্শন পাঠ করিলেই দর্শন করা যায় না—বুদ্ধদেবের বজ্রকঠোর তপশ্চরণ দেখিয়া ইহা অনুমান করা যায় কিন্তু অবিদ্যাকে দর্শন করিতে কোন শাস্ত্রপাঠেরই প্রয়োজন হয় না। ইহা প্রায় সর্ব্বজীবেরই প্রত্যক্ষীভূত। চক্ষু মুদিলেই আঁধার! চক্ষু মুদিয়া যেদিন জ্যোতিষ্মানের জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখা যাইবে অন্তর্লোক দীপান্বিত—সেদিন বুঝিতে হইবে তপস্যার ফুল ফুটিয়াছে, আলো জ্বলিয়াছে। নতুবা দর্শনশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইলেও সার্থকতপা না হইতে পারিলে

> অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
>
> স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মণ্যমানাঃ।

তাঁহাদিগকে বলিতেই হইবে। তাঁহাদের অক্ষরটিকে অবিদ্যার নিকষকালো পট টাঙান রহিয়াছে, শঙ্কর ইহার রঙটি কেমন তাহা বলিতেছেন—'ঘনীভূতে ইব তমসি।'

ভিতরে কালো পট টাঙান থাকায়—'এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়ঃ আত্মা ন প্রকাশতে'—অক্ষর পুরুষকে জীব, চক্ষু মুদিয়া দেখিতে পায় না। আচার্য্য শঙ্কর ইহার কারণ নির্ণয় করিতেছেন—'অবিদ্যা-মায়াচ্ছন্নঃ', অবিদ্যার আচ্ছাদন যেমন তেমন নহে—'অত্যে অতিগম্ভীরা দুরবগাহ্যা বিচিত্রা মায়া চেয়ম্।' ইহা যেমন তেমন কালো পট নহে ইহা বিচিত্র মায়া পট; শুধু black screen ইহাকে বলিতে পারি না, ইহা magic black screen. কালো পর্দা খাটাইয়া ম্যাজিসিয়ান যেমন পিছনে থাকিয়া যাদু সৃষ্টি করে—এই মায়াপটের পিছনেও তেমনি এক মায়াবী আছেন। সেই মায়াবী আপনার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন—'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।' 'মায়ী অক্ষরে' আমরা এই মায়াবীর আখ্যান পাইয়াছি। ম্যাজিক মাত্রই অলীক প্রক্রিয়া—যাহার সমাপ্তিতে দর্শক বুঝিতে পারিবে এ যাহা দেখিলাম তাহা একটা ধান্দা স্বরূপ; যেন আলেয়ার আলো, দেখিয়াছি বটে অথচ জোর দিয়া বলিতে পারি না যে ইহা সত্য সত্যই একটা আলো! এ মায়াপটের অন্তর্নিহিত এমন একটি জিনিস আছে যাহা জীবের মনে হঠাৎ চমক জাগায়, জীবনের যে-অভিনয় এতকাল করিলাম উহা কি সত্য সত্যই একটা কিছু, না বড় রকমের একটা ম্যাজিক? সেইটি হইতেছে মৃত্যু। মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গেই যখন সংসার-পাট হইতে সংসারীকে সরাইয়া লওয়া হইল তখন তাহার মনে এই কথাগুলি কেবলি ধাক্কা খাইবে—"হরি হরি, এ কি হইল, যে-অভিনয়ে এতকাল ছিলাম সে কি একটা অলীক ম্যাজিক নয়। আমার বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক হইলে, ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে ঘটনাস্রোত বহিয়া গিয়াছে উহা ত সর্ব্বৈব মিথ্যা!" তাই মায়াপটটি মৃত্যুর একটি কৌটা বিশেষ—উহার মধ্যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মৃত্যু বাস করিতেছে। ম্যাজিসিয়ানের সহিত ভাব করিয়া তাহার ম্যাজিক জানিতে পারিলে যেমন সকল গুমর ফাঁক হওয়ায় ইহা আর চোখে ঠেকে না তেমনি সেই মায়াবীর সহিত পরিচিত হইতে পারিলে তাঁহার মায়ার খেলা একেবারে চুকিয়া যায়—মায়া-মৃগ আর মন হরণ করে না এবং মায়ার কৌটাটি উবিয়া গিয়া সকল মৃত্যু জালছেঁড়া পাখীর ঝাঁকের ন্যায় উড়িয়া যায়। তাই উপনিষদ্ বলিতেছেন:—

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।

শঙ্কর অর্থবোধ জাগাইতেছেন—'মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগোচরাৎ অবিদ্যাকামকর্ম্মলক্ষণাৎ প্রমুচ্যতে বিযুজ্যতে।'

এহেন মায়াপট একখানা কালো পর্দার ন্যায় অক্ষর পুরুষকে এমনি ঢাকিয়াছে যেমন করিয়া গ্রহণের কালে চন্দ্রের ছায়া সূর্য্যের আনন ঢাকিয়া রাখে। কিন্তু সূর্য্যগ্রহণে সূর্য্যের যেমন আসলে কোন হানি ঘটে না, ছায়ার তিমির তাহাকে ছুঁইতেও পারে না তেমনি অবিদ্যার কালোপর্দার প্রত্যন্ত অক্ষর-পুরুষের কোনরূপ অন্ধকার ভোগ করিতে হয় না। তিনি আপন আলোতে ঝলসাইতে থাকেন। মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া সূর্য্যকর যেমন ধরণীতে পৌঁছে, অক্ষর পুরুষেরও জ্যোতিঃধারা তেমনি দেহ-বাতায়নে পৌঁছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইহার সম্যক আলোচনা আমরা করিয়াছি। এখানে একটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়ের আলেখ্য অঙ্কনে প্রয়াসী হইয়াছি, তবে তাহার পূর্ব্বাভাষ রূপে মায়াপটটিকে রাখা নিতান্তই দরকার। মায়াপটটিকে আমরা মৃত্যুপটরূপে দেখিতে পাইয়াছি—যতদিন এ মায়াপট জীবদেহে টাঙান থাকিবে ততদিন মৃত্যুর জয়-টীকা জীবের ললাটে লেখা থাকিবে, মায়াপট অটুট থাকিলে জন্মমরণের জগঝম্প চলিবেই চলিবে।

'মায়ী অক্ষরে' মায়াপটটির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি—ইহা যে কর্ম্মেরই রূপান্তর সে-আভাষ আমরা পাইয়াছি। 'প্রকৃতিং কারণম্ অবিদ্যাম্ কামকর্ম্মবীজভূতাম্'—এখানে কামকর্ম্মের বীজাধার হইতেছে প্রকৃতি। ইহা কর্ম্মজা। সুতরাং এইকৃষ্ণপটটি যে জীবের প্রকৃত অনুষ্ঠানেরই পরিণাম তাহা আলোচিত হইয়াছে। নৈয়ায়িকেরা সঞ্চিত কর্ম্মকে 'অদৃষ্ট' বলেন এবং এই অদৃষ্টই তাঁহাদের নিকট 'মায়া' পদবাচ্য। আকাশে মেঘ করিলে যেমন সূর্য্যের প্রভা মলিন হইয়া যায় তেমনি দেহস্থ সূর্য্যরূপী অক্ষর-পুরুষও পরিম্লান

হইয়া পড়েন যদি কর্ম্মসঞ্চয় ঘটে। কর্ম্মগুলি যেন কালো মেঘের ন্যায়, তাই শঙ্কর বলিয়াছেন 'ঘনীভূতে ইব তমসি,' এমন কালো মেঘের সারি যদি হৃদগগন ছাইয়া বসে তবে তমসার প্রসার বাড়িয়া চলিল। ফল কি হইবে? অক্ষরের আলোর ভাগ ক্রমেই হ্রাস পাইবে এবং জীবের চিত্তক্ষেত্রেও তমসাগমে ধীশক্তির লোপ পাইবে,– জীব নির্ব্বোধ হইতে থাকিবে।

এতক্ষণে পাঠকের কাছে আমাদের বিষয়টি হয়ত একটু উকি মারিতে পারে। বিষয়টি শুধু ধারণা দ্বারা, গভীর চিন্তন দ্বারা ক্রমে মনের গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইবে। ভাসমান-মন লইয়া ইহার প্রতি দৃষ্টি দিলে ইহার রূপ ফুটিবে না কিন্তু যতই একাগ্রমনে ইহার দিকে চাওয়া যাইবে ততই ইহার নিগূঢ় সত্যটি প্রাণের বীণায় সঠিক বাজিয়া উঠিবে। যে জিনিস সহসা মনে করা কঠিন তাহারই জন্য উপমার ব্যবস্থা সুধী সমাজে প্রচলিত। উপস্থিত বক্তব্যে, সুলভ একটি কাল্পনিক উপমা দ্বারা সকল কথার একটা ব্যঞ্জনা ফুটাইতে চাই। ধরিয়া নেওয়া যাক্, চন্দ্র যেন একটি সাধারণ জীব। চন্দ্রের শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ আছে—এ যেন ইংরাজী প্রবচন অনুযায়ী bright side ও dark side, মানুষের চরিত্রে এই দুইটি দিক থাকে। মানুষ যখন তমোগুণান্ধ হইয়া কামমত্ততায় চিত্তহারা হয় তখন তাহার মধ্যে সত্ত্বের লাল এবং রজের সাদা ক্রমেই ক্ষীণ হইতে হইতে আলো নিভিয়া যায় এবং শুধু ঘুটঘুটে আঁধারে হৃদয়াকাশ ছাইয়া যায়। 'রঙের খেলায়' ইহার চিত্র পাইয়াছি। চন্দ্র যেন কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ দ্বারা ভোগী ও যোগীর আত্মার আসল রূপ জগতের চক্ষুতে উন্মোচিত করিতেছেন। 'জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তি' 'তমঃ সত্ত্বং রজশ্চাভিভূয় ভবতি' তমোগুণ এমনি করিয়া তমসার সঞ্চার ঘটাইয়া কৃষ্ণপক্ষের সূত্রপাত করে, আর 'রজস্তমশ্চ অভিভূয় সত্ত্বং ভবতি'—সত্ত্বগুণ এমনি করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে শুক্লপক্ষের অভ্যুদয় হয়। চন্দ্রের পক্ষদ্বয় যেন মানুষের হৃদয়েরই একটি নিখুঁত প্রতিবিম্ব। প্রতিমানুষের অন্তর্লোকে ত্রিগুণের অভিঘাতে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে চন্দ্রের পক্ষদ্বয়ে যেন সে ছবিখানি অতি অপরূপ রঙে আঁকিয়া শ্রীভগবান দেখাইতেছেন 'এই দেখো, তোমাদের হৃদয় গগনে যে আলো আঁধারের অদেখা আলেখ্য আপন কর্ম্মতুলিকায় আঁকিতেছ তাহারি অনুরূপ একখানি ছবি অনন্তকাল ধরিয়া চন্দ্রমণ্ডলে আঁকা রহিয়াছে।'

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র যেন ভোগীর চিত্রদর্শন করাইতেছে—'ইন্দ্রিয়ানাম্ হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে' ইন্দ্রিয় লালসায় একেবারে 'তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্ণাবমিবাম্ভসি' নৌকাডুবি হইয়া গেল। যাহার জীবন কামসর্ব্বস্ব হইয়া গেল তাহার মধ্যে প্রজ্ঞা তমোগুণের তমসায় বিলীন হইয়া গেল। 'ঘনীভূতে ইব তমসি' তাহার হৃদয়াকাশ ছাইয়া যাইতে লাগিল। 'মায়ী অক্ষরে' সকাম কর্ম্মের পরিণাম দেখিয়াছি—এগুলি বাতির ধুঁয়ার ন্যায় ভিতরে জমাট বাঁধিতে থাকে, ল্যাম্পের চিম্‌নি খুব কালো হইয়া গেলে যেমন ভিতরের আলো কলায় কলায় কমিতে থাকে, ধরিয়া নেওয়া যাক্ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ও রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় স্বকীয় আলোর এক কলা করিয়া ঢাকিয়া যাইতে থাকে। এ ঢাকনি যে আসল আলোতে না লাগিয়া বাহিরে আবরণ মাত্র সৃষ্টি করে তাহা আর নূতন করিয়া বলার কোন অপেক্ষা রাখে না; কৃষ্ণপক্ষের প্রতি তিথিতে যেমন চন্দ্রের আলোক-কলাগুলি ক্রমবর্দ্ধমান অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়, তেমনি জন্ম-জন্ম তমোগুণের সেবাফলে জীবের দেহ-মধ্যস্থ অক্ষর পুরুষের আলোককলাগুলি আঁধারে ঢাকা পড়িয়া যায়। তমোগুণের উপভোক্তা যেন কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্র, দিন দিন অক্ষর পুরুষের আলোক, কলায় কলায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে লাগিল ক্রমে অমাবস্যা ঘনাইয়া আসিল। অক্ষরের দীপ শিখা একেবারে স্তিমিত হইতে হইতে অস্তমিত হইয়া গেল—ইহার ফলে জীবের কি পরিবর্ত্তন ঘটিল না? সেই অবস্থা বৈষম্যের কথাই এখন আলোচনা করা যাইবে। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের আলোকে যেমন দিন দিন ভাটা পড়িতে থাকে এবং অপ্রকাশ বাড়িতে থাকে ভোগীর জন্ম জন্মান্তরীন তমঃ প্রাবল্যে তেমনি তাহার ধীশক্তিতে মন্দা পড়িয়া যায়। 'অভিনায়ক অক্ষরে' আমরা দেখিয়াছি জীবের মন, চক্ষু শ্রোত্রাদি অক্ষরপুরুষেরই কিরণাবলী। এ সকল দীপেন্দ্রিয়ের রাজা হইতেছে মন, মনের অধীনে অপরাপর ইন্দ্রিয় বাঁধা রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, মনের পরশ না পাইয়া দিব্য ইন্দ্রিয়গুলি এক

পাও নড়িতে পারে না। মন আসিয়া শ্রোত্রকে কহিবে, ‘শুন’ কান শুনিবে, চক্ষুকে ঠেলা দিয়া কহিবে ‘ওগো চোখ্, দেখ!’ চক্ষু দেখিবে। এমনি করিয়া মন হইতেছে সকল ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রী। সে যন্ত্র না বাজাইলে যন্ত্র ত বাজিবে না— যন্ত্রীর পরশে যন্ত্রের গুঞ্জন উঠিবে। তাহা হইলে দেখা যায় মনই হইতেছে জীবের স্বরূপ - মনকে বাদ দিলে জীব টিকে না, একেবারে ফাঁকা হইয়া যায়।

জীবের জীবত্ব যদি মনে পর্যবসিত হয় তবে সে মন অক্ষরের আলোকে যত অধিক আলোকিত হইবে ততই সে জীব পূর্ণতর জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইবে। কাম লালসার তমোগুণের আধিক্যে সে মন যত অধিক আচ্ছন্ন হইবে ততই অক্ষরের জ্যোতি উহাতে হ্রাস পাইবে—তখন ‘কামাদিবৃত্তিসংমনঃ, তেন মনস্ত চৈতন্যজ্যোতির্নষ্টে স্ববভাসকং জনঃ ন মনুতে…।’ সুতরাং চন্দ্রের ষোলকলার ন্যায় অক্ষর পুরুষের ও যে ষোলকলার অনুমান করা যাইতেছে, মনেরও ঠিক তদ্বৎ ষোলকলা কল্পনা করিলে আমরা জীবত্বের মধ্যে জ্ঞান অজ্ঞানের বোধ নির্ব্বোধের বৈষম্যহেতু কতকটা বুঝিতে পারিব। ভিতরে মায়ার কালো পট যত অধিক অক্ষর পুরুষকে ঢাকিয়া দিবে তত কম আলোক মনে পৌঁছিবে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে চাঁদের দিকে না চাহিয়া শুধু মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশের গায়ে ছড়ান আলোর রশ্মি দেখিয়া আমাদের বলা সহজ হইবে আজ চাঁদ ক্ষয় কলা—তেমনি পঠন পাঠনে সুযোগ প্রাপ্ত লোকদিগের জীবনী আলোচনা করিয়াও বলা সহজ হইতে পারে ইহাদের মন কয় কলা উজ্জ্বল ছিল। চাঁদের যত কলা আলো খোলা থাকিবে ততখানি উজ্জ্বল আলো সে রাত্রির গায়ে ঢালিয়া দিতে পারে তেমনি যে-জীবের মনে যত কলা আলো অধিক থাকিবে তাহার মনীষা তত অধিক বিশ্বভুবনে দীপ্তি ছড়াইয়া অপর সকলকে তাক লাগাইয়া দিবে। ইহার দৃষ্টান্ত অনুসন্ধানে বেশী দূরে না গিয়া আমাদের রবীন্দ্রনাথের উপর একটু চক্ষু রাখিলেই হয়, তাঁহার মনীষার যে রবির কিরণ জ্বলিতেছে— সেই মনীষার নিকট বিশ্বজগতের সাহিত্য-আসর একেবারে খদ্যোতের ন্যায় নিষ্প্রভ। ইহার কারণ তাঁহার মন-শশী এত অধিক কলায় প্রদীপ্ত যে অপরাপরের তার চাইতে ঢের নীচে। যাহাদের মনীষা যত স্তিমিত তাহাদের মনশশী তত তিমিরাক্রান্ত। তবেই দাঁড়াইতেছে এই মনের কলা যত অধিক আঁধার-মাখা হইবে, সেই মনটিও তদনুযায়ী ‘অন্ধ অজ্ঞানজং’—অজ্ঞানে * ঢাকিয়া যাইবে। তাই মানুষের মধ্যে প্রখর প্রতিভাশালী আবার অজ্ঞান বোধ হীন এমন অসম ব্যবস্থা দেখা যায়। মানুষ ইচ্ছা করিলে পণ্ডিত হইতে পারে না, যেমন ইচ্ছা করিয়া কেহ বুদ্ধিমান হইতে পারে না। ঠিক তেমনি পণ্ডিত হইলেও ইচ্ছা করিলেই কালীদাস হওয়া যায় না, কারণ ভালো পণ্ডিত হইতে চাহিলে যতখানি আলোর দরকার ভালো কবি হইতে চাহিলে তার চাইতে ঢের বেশী আলো প্রয়োজন। মানুষ এই নামটির মূলেই মন্ ধাতু, মনীষাই মানুষের বৈশিষ্ট্য সেই মনীষার জন্মভূমি হইতেছে মন। এ-হেন মনের যত কলা আঁধার থাকিবে ততখানি মনীষা জীবের মন হইতে বাদ যাইবে। তাই যিনি আজ আপন মনীষায় বিদ্যুৎ চমকে জগৎ-সংসার চমকিত করিতেছেন যদি তাঁহার তমোগুণের সেবায় জীবনাকাশ কালো হইতে থাকে তবে আগত জন্মে সে-মনের কলা আর অক্ষুণ্ণ থাকিবে না—সে-মনের কলা কমিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনীষাও অনেকখানি বাদ পড়িয়া যাইবে। সুতরাং যে আজ প্রতিভার প্রদীপ জ্বালিয়া সমগ্র দেশকে আলোকিত করিতেছে সে-যে আগত জন্মেও এমনি থাকিবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই। কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্র সেই চিত্রখানিই জগতের চক্ষুতে প্রতিনিয়ত ধরিতেছে। যে চাঁদ একদিন ষোলকলার ভরা ডালি লইয়া পূর্ণিমার জোয়ার বহাইয়াছিল সে চাঁদ কৃষ্ণপক্ষে যেমন সামান্য খদ্যোতবৎ আকাশের এক কোণে মিটি মিটি জ্বলে, তেমনি বিশ্বঝলসান অলোকসামান্য প্রতিভাও তমোগুণে রমণ করার ফলে নূতন জন্মে হয়ত এমন কলাহীন হইয়া আসিবে যে, সে যেন একটি মাটির টিম্ টিমে প্রদীপ। তাহার মনে প্রতিভার বিদ্যুৎ আর ঝলসাইবে না।

গীতার ‘তমঃ সত্ত্বং রজশ্চ অভিভূয় ভবতি’— ইহার চিত্র কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র তিথিতে তিথিতে আঁকিয়া দেখাইতেছে, আমরা এইবার ‘রজস্তমশ্চ অভিভূয় সত্ত্বং ভবতি’র দিকে চক্ষু ফিরাইতেছি এ চিত্র শুক্লপক্ষ আলোক-সমুদ্রে পূর্ণিমার বান

যে লগ্নে ডাকিবে সেই লগ্নের দিকে ক্রমে আঁকিয়া লইয়া যায়। এ যেন কোন তপস্বী যোগে বসিয়াছেন আর যোগাগ্নিতে যে প্রোজ্জ্বল আলো জ্বলিয়া উঠিতেছে তাহাতে যেন কালো মায়াপটের সকল কালিমা বিদগ্ধ হইয়া যাইতেছে। যতই যোগানল জ্বলিতেছে ততই মায়ান্ধকার দূর হইয়া ভিতরে কলায় কলায় আলো বাড়িতেছে। তাই শুক্লপক্ষের চন্দ্র যেন 'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা' কোন সিদ্ধতপা।

বেদান্তের 'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ' ১।১।২৫ সূত্রে ব্রহ্ম যে নিরাবরণ নির্ম্মল জ্যোতির আধার তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। এমন ব্রহ্মের জ্যোতি-ধারায় মন যাহাতে ষোলকলা পূর্ণিমা হয় ইহাই কি নর কি দেবের উপাস্য।

তদ্ যো যো দেবানাম্ প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ তথা ঋষীনাম্ তথা মনুষ্যানামিতি। তদ্দেবা জ্যোতিষাম্ জ্যোতি-র্য়ুর্হোপাসতেহমৃতমিতি।

আমাদের নিত্যজপ গায়ত্রীমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায় মনকে ব্রহ্মজ্যোতিষ্কৃত নিত্য সর্ব্বক্ষণ উদ্ভাসিত রাখাই ইহার অভিপ্রেত, মনের উপর যেন সর্ব্বক্ষণ সেই আলোক-প্রদীপ জ্বালা থাকে। তবে ধীশক্তি ব্রহ্মানুকূল হইবে। কিন্তু মনেত সেই অক্ষর পুরুষের আলোক আসিবে না যদি মায়া অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, মেঘ জমাট বাঁধিলে কি সূর্য্যালোক পৃথিবীতে পৌঁছে? তেমনি মায়ার গ্রাসে যদি অক্ষরের আলোক কমিয়া যায় তবে ত মনের কলাও কমিয়া আসিবে। যোগীর তপস্যাই হইতেছে পূর্ণ-ব্রহ্মের আলোতে মনে পূর্ণিমা জাগান। কিন্তু মনের সকল কলা না জ্বলিলে ত সে পূর্ণিমা জাগিবে না, যতক্ষণ কালো মায়াপট ভিতরে কিঞ্চিৎও আছে, ততক্ষণ সকল কলা জ্বলিবে কি করিয়া? তাই যোগাগ্নিতে যখন ইহা 'যথৈষীকাতুলম্ অগ্নৌ প্রোতং' একেবারে খাণ্ডবদাহনের ন্যায় পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইবে তখন 'মুক্তিরজ্ঞান-ধ্বস্তের্ণপরঃ' অজ্ঞতার বিধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরপুরুষ-নিঃসৃত আলোকে রোধ করিবার আর কিছুই থাকিবে না, সেই অক্ষরের আলোক বিনা বাধায় মনের উপর আসিয়া পড়িবে যেমন করিয়া সূর্য্যের আলো চন্দ্রের উপর পড়ে। এতদিন অক্ষরের পূর্ণ আলো মনের উপর পূর্ণভাবে পড়ে নাই তাই পূর্ণিমাও জাগে নাই। সূর্য্য ও চন্দ্র যেন ব্রহ্ম ও মন, পৃথিবীর ছায়া উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িলেই যেমন চন্দ্রগ্রহণ-ছায়াপাতের সঙ্গে সঙ্গে কলার আলো মিলাইয়া গেল, ঠিক তেমনি মায়ার ছায়া যতকাল ব্রহ্ম ও মনের অন্তর্বর্ত্তী রহিল ততকাল ব্রহ্মের পূর্ণ আলো মনে পৌঁছিল না। যখনি সে ছায়া দূর হইল তখনি রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় মায়ামুক্ত মনের ও কলায় কলায় আলোর জোয়ার বহিল। রাহুগ্রাস ও মায়াগ্রাস যেন একটিরই এ-পিঠ ও-পিঠ, তাই একটি অপরটির উপমা হইয়া তালে তালে চলিয়াছে আর চন্দ্রকলার তুলনা প্রতিদিনের ভোগ ও যোগের সঙ্গে এক অভিনব মিলের ছন্দে গাঁথা। ভোগে কৃষ্ণপক্ষ যোগে শুক্লপক্ষ অন্তর্লোকে জাগ্রত হইতেছে। যোগীর যোগ-বলে যখন মায়াপট বিধ্বস্ত হইয়া তাঁহার মনে আলোকের মুক্তধারা বহিবে, তখন তাঁহার মনের সকল কলা জ্যোৎস্নায় ভরিয়া পূর্ণিমা জাগিবে। পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণ আলো মনকে পূর্ণিমা করিয়া দিলে যোগী ব্রহ্মের দিকে একবার ও নিজের দিকে আরবার চাহিয়া কহিবে,—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

চন্দ্রের পূর্ণিমা সূর্য্যের পূর্ণতা হইতে নিঃসৃত, সূর্য্যের পূর্ণ দানে তাহার পূর্ণ ঘট ত খালি হইল না—পূর্ণই রহিল। এও ঠিক তেমনি। উপমা অত্যন্তই অনুরূপ তবে একটু পার্থক্য, আবৃত আলোক ও অনাবৃত আলোকে—medium light ও original light এ। 'রঙ্গের খেলায়' ইহার প্রসঙ্গ পাইয়াছি।

আমরা উপস্থিত জিজ্ঞাসায় দুইটি কথার অবতারণা করিয়াছি। প্রথম কথা,—চন্দ্রের কলাবৎ অক্ষরের দৃশ্যতঃ কলা আছে, দ্বিতীয় কথা তদ্দরুণ মনেরও কলা আছে। প্রথমটি দ্বিতীয়টির কারণ স্বরূপ। এখানে কেহ যেন মনে না করেন অক্ষরের সত্য সত্যই কলা থাকিতে পারে, রাহুগ্রাসে সূর্য্য তাহার সাকল্য হারাইয়া যেমন লোকচক্ষুতে বিচ্ছিন্নকল হয়েন এও ঠিক তেমনি। এখন কথা উঠিবে চন্দ্র যেমন শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তৃতীয়ার ক্ষীণকলার হেতু ক্ষীণ দেখায় জীব আপন দেহান্তরে ঠিক তেমনি ক্ষীণে অক্ষর আলোকে কেন ক্ষীণ দেখিতে পায় না, একেবারে অন্ধকার

কেন দেখে? শাস্ত্র বলিতেছেন ষোলকলা না খুলিলে অর্থাৎ একেবারে পূর্ণিমা না হইলে অক্ষরকে 'সোহহম' সম্বোধন করা চলে না। ইহার তাৎপর্য্য এই, মায়াপট একেবারে না উঠিয়া গেলে অক্ষর পুরুষ কখনও দৃষ্ট হয় না। প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিবে—এ কেন? দ্বিতীয়া তৃতীয়ার চাঁদের আলো মানুষের মধ্যে থাকিতেই হইবে—যাহার যতটুকু আছে সে ততটুকু দেখিতে পাইলেইত অক্ষরকে সকল কার্য্যে শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে পারে। এবং ক্রমে আলোকের কলা বাড়াইতে ঝুকিতে পারে। ইহার কারণ আছে। আমরা 'প্রানপাত্রে' দেখিয়াছি মায়ার প্রথম সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা মন চক্ষু-শ্রোত্রাদিকে আবৃত করিয়া দিয়াছে, তাই মন আর সেই অক্ষরকে জানিতে পারে না, সকল ইন্দ্রিয়েরই তিনি অগোচর হইয়াছেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় অক্ষরের সকল কলা যে ঢাকিয়া গেল এমন নয়, 'তস্য হ বা এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চদেবসুষয়ঃ'—অক্ষরের পঞ্চসুষি (অভিনায়ক অক্ষর, বিচিত্রা—১৩৩৬ আশ্বিন)। অর্থাৎ মন আদি পঞ্চেন্দ্রিয় মায়ার আবরণে ঢাকা পড়িল সত্য, পরন্তু অক্ষরের সর্ব্বাবয়ব আবৃত হইল না। চন্দ্রাবয়বের যদি পাঁচটি ছিদ্র বা কিরণজাল আঁধারে চাপা পড়ে তাহাতে চন্দ্রমণ্ডলের সাকল্য চাপা পড়ে না যেমন কলঙ্কলেপে চন্দ্রের আলো সবই ডুবিয়া যায় না। পদ্মগর্ভবৎ হৃদয়ব্রহ্মগর্ভ ইহাদের উৎপত্তি স্থান—'দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম'—সেই গর্ভ ঢাকিয়া গেলে যে সকল পদ্মটাই ঢাকিল এমন নয়। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি অক্ষরের যে কলায় এই পাঁচটি সুষি বা ইন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠিত, সেই পদ্মমুখ (দহর) সন্নিভ অক্ষরগর্ভ প্রথমেই মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। জীব যে পর্য্যন্ত সাকল্য মায়ার আত্যন্তিক উচ্ছেদ সাধন করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত ইহার অধিকার হইতে পঞ্চসুষি রেহাই পায় না। মায়ার আচ্ছাদন ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন, তাই কাহারও মধ্যে তিন কলা, পাঁচ কলা, বা সাত কলা এইরূপ আলো। কিন্তু যাহারই যত থাকুক না কেন সকলেরই পঞ্চসুষি বা পঞ্চেন্দ্রিয় সমানভাবে তিমিরাচ্ছন্ন, তাই অধিক কলাশীল হইয়াও অক্ষরের দর্শন লাভ ঘটে না। অত্যুগ্র সাধনায় শুক্লপক্ষের চাঁদের ন্যায় সাধকের মায়াবরণ যতই ক্ষীণ হইতে থাকে পঞ্চসুষির উৎপত্তিস্থল সেই অক্ষরগর্ভ তবুও কিছুতেই নিরাবরণ হয় না, যখন পূর্ণিমার ধারাধারি হইয়া পড়ে তখন সেই 'দহর পুণ্ডরীকবেশ্মে'র আচ্ছাদন অপসৃত হয়। ফলকথা মায়ার সর্ব্বশেষ উচ্ছেদ হয় পঞ্চেন্দ্রিয় মূলস্থান অক্ষরাংশে। মায়ার এক কণিকা থাকিলেও ইহা পঞ্চেন্দ্রিয়কে ঢাকিয়া রাখিবেই—কেননা ইন্দ্রিয়ের অসংযত সম্বন্ধ হইতেই ইহার উত্থান ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয় কথাটির আলোচনা করিলাম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানুষ শব্দটীর সহিত 'মনের' অত্যন্ত যোগ। মনের পরিমিত বিকাশ মানুষের নিম্নতর পশ্বাদিতে পাওয়া যায় না—তাই তাহারা পশু আমরা মানুষ। শরীরের সমতায়, পশু ও মানুষে এক, উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের একই নাম একই ধাম। শারীরবিদ্ বলিবেন নেপোলিয়নের অবয়বের যে নাম ধাম একটি শৃগালের ঠিক তাহাই—তবে ঐ মনে আকাশ পাতাল পার্থক্য। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় মায়ান্ধকারের প্রসারে জীব যত অধিক মলিন হইয়া যাইবে ততই মনও আলোহীন হইয়া যাইবে। অমাবস্যার নিকট-তিথিতে সকল কলার আলো নিভান অবস্থায় আসিলে জীবের মনের কলাও নিভু-নিভু অবস্থায় আসিয়া পড়ে, এ অবস্থায় মনের ক্রিয়া লোপ হইয়া যায় তাই আগত জন্মে জীবকে মনোরাজ্যের অতীত পশু-সমাজে জাত হইতে হয়। যখন জীবের তমোগুণের প্রাবল্য বাড়িতে বাড়িতে একেবারে অমাবস্যায় সকল ঢাকা পড়ে তখন বৃক্ষ-প্রস্তরের স্তরে তাহাকে নামিয়া যাইতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যত কলা আলো খোলা থাকিবে ততকলা আলো মনেও জ্বলিবে। ইহার আর পুনরালোচনা করিতে চাই না।

পঞ্চসুষি বা পঞ্চেন্দ্রিয় কি ভাবে অক্ষর-পুরুষে প্রতিষ্ঠিত ইহার তথ্য প্রশ্নোপনিষদে পাইতেছি—

> অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ
> তং বেদ্যং পুরুষং······

ছান্দোগ্যের দেবাসুর প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি ইহারা কেমন করিয়া আসুরী মায়ায় আবৃত হইয়া পড়ে। কাযেই ইহারা যদিচ নির্ম্মল নিরঞ্জন ব্রহ্মেরই দ্যুতি কিন্তু ইহারা মায়ার

মালিন্যে অঞ্জনযুক্ত হইয়া পড়িল। তাই ইহারা একদা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কলা রূপে বিরাজ করিতে লাগিল। ব্রহ্ম কিন্তু অঞ্জনযুক্তও নহেন সকলও নহেন, তাই তিনি—

······বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।

তৎ শুভ্রং জ্যোতিষাম্ জ্যোতি···॥ মুণ্ডক ২।৪২।১০

শ্বেতাশ্বতর বলিতেছেন—'নিষ্কলং···নিরবদ্যম্ নিরঞ্জনম্।' সেই নিষ্কল নিরঞ্জনকে কলাযুক্ত ও অঞ্জনলিপ্ত জীব কেমন করিয়া পাইবে ?

যদাপশ্যঃ পশ্যতে···পুরুষম্ ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ

পরমম্ সাম্যমুপৈতি। মুণ্ডক ১।৪৭।৩

এখানে ২টি কথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে অঞ্জনলিপ্ত পঞ্চেন্দ্রিয় এই অনুলেপনের জন্য ব্রহ্ম হইতে অসমান হইয়াছে তাই সাম্য নষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা অঞ্জন জিনিসটি কি ?—জীবের কর্ম্ম—পুণ্য ও পাপ এবং ইহাই মায়া নামে অভিহিত। ব্রহ্ম কর্ম্মী নহেন। তবেই পরিষ্কার বুঝা গেল চক্ষুমন-শ্রোত্রাদিকে যদি কর্ম্মের (নামান্তরে মায়ার) অনুলেপন হইতে একেবারে ধুইয়া পরিষ্কার করা যায় তবে ইহারা মলিনতা বিবর্জ্জিত হইয়া নির্ম্মল নিরঞ্জন, তৎ সঙ্গে সঙ্গে যে সাম্যত্ব নষ্ট হইয়াছিল তাহার পুনরুদ্ধার ঘটিল। যখন ইহারা প্রযোনি অক্ষরকে প্রাপ্ত হইয়া সাম্য লাভ করিল—সেই সাম্যতাকেই নিষ্কল বলা হইয়াছে। তখনকার অবস্থা যেন সাগরলীন নদীর মুখ—সেখানে ত আর পাঁচ নদীতে ভিন্ন পাঁচালী গাহিতে পারে না, সকলি একের মাঝে আত্মসমাহিত। প্রশ্নোপনিষদে আমরা সেই নিষ্কলতার সুস্পষ্ট চিত্র পাইতেছি—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে এবমেব অস্য পরিদ্রষ্টুঃ ইমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে।

জীব এতদিন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াদিকে পৃথক কলারূপে জানিয়াছে এই পৃথক জ্ঞানের কারণ মায়ার অঞ্জন ইহাদিগকে এক অক্ষ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

যখন তপস্যার বলে ইহারা নিরঞ্জন হইয়া গেল তখনি দ্রষ্টা জীব দেখিতে পাইল ইহারা 'একই সেই সাগরে গিয়ে মিশেছে সব নদী', ইহারা পরিচ্ছিন্ন নহে, ইহাদের পৃথকত্ব নামান্তরে কলারূপত্ব নাই—ইহারা সকলি এক নিরঞ্জন নিষ্কল পুরুষে আত্মসমাহিত হইয়াছে। যে পুরুষের মধ্যে এই সকল ইন্দ্রিয় নামরূপ হারাইয়া সাম্য লাভ করিল—দ্রষ্টা জীব সেই পুরুষের সহিত একীভূত হইল, কারণ দ্রষ্টা জীব ইন্দ্রিয়াত্মক। ইন্দ্রিয় খসাইয়া ফেলিলে জীবত্ব খসিয়া যাইবে। এমনি করিয়া জীব হইল নিরঞ্জন সুতরাং নিষ্কল।

মায়ার অঞ্জন যেইমাত্র ইন্দ্রিয়রশ্মিকে ছুঁইয়াছে সেইক্ষণ হইতেই ইহারা অক্ষরালোকের পূর্ণত্ব হারাইয়া পরিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে তাই ইহারা কলারূপে পরিণত হইয়াছে। কলা অর্থই আলো-আঁধারের আড়াআড়ি। আঁধারের চাপে যতটা আলো কমিয়া যতটা বাঁচে তাহাই কলা নামে অভিহিত। আলো আঁধারের লড়াই চিরকাল লাগিয়া আছে বলিয়া চন্দ্রের কলা আছে কিন্তু সূর্য্যে কলা নাই। মায়ারূপ অঞ্জন মাখা হইয়া যদি ইন্দ্রিয়ান্তর্গত অক্ষরের নিষ্কল আলোক কলা হইতে পারে তবে সেই মায়াগ্রস্ত সমগ্র নিষ্কল অক্ষর কেন দৃশ্যতঃ স-কল হইবেন না ?

প্রশ্ন উঠিতে পারে ইন্দ্রিয়রশ্মি সমগ্র অক্ষর হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাই এরূপ বলা সমীচীন নহে যে ইহারা অক্ষরের একদেশে মাত্র স্থিত। কিন্তু প্রশ্নোপনিষদ্ সে প্রশ্নেরও অতি সুন্দর সমাধান করিয়াছেন।

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ

তৎ বেদ্যং পুরুষং···············"

রথচক্রের নাভিতে অর্থাৎ মধ্যস্থলে যেমন অরগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকে অক্ষরেরও তেমনি মধ্যদেশে পঞ্চেন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। এইরূপে একদেশে সংস্থানের উল্লেখ আমরা ছান্দোগ্যেও পাই যাহার সম্পর্কিত বেদান্তসূত্র হইতেছে 'দহর উত্তরেভ্যঃ'—'অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম...,' দেহে দহর অর্থাৎ ক্ষুদ্রগর্ত্তসদৃশ পদ্মাকার গৃহ আছে। ইহা যে পদ্মমুখসদৃশ অক্ষরগর্ভকে লক্ষ্য করা হইতেছে-তৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পদ্মমুখ পদ্মের মধ্যস্থলবর্ত্তী যেমন

নাভি হইতেছে রথের মধ্যবিন্দু। প্রশ্ন বলিতেছেন রথনাভিবৎ এই অক্ষর নাভিতে ষোড়শকলা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ষোড়শকলা বলিতে মুখ্যতঃ ঐ পঞ্চেন্দ্রিয়কেই বুঝায়; সংখ্যা অত অধিক হওয়ার হেতু ইহাদের অধিকার ভুক্ত পঞ্চভূত ও তদন্তর্ভাব পঞ্চতন্মাত্রকে মন সহ গণনা করা হইয়াছে। গীতার ১৩।৫-৬ শ্লোকদ্বয়ে 'ক্ষেত্রের' যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ইহার সহিত তাহার স্পষ্টতঃ মিল হয়।

মায়াগ্রস্ত কলানামধের ইন্দ্রিয়ালোকবৎ সমগ্র অক্ষরও মায়াগ্রাসহেতু স-কল হইয়া আছেন। যখন সমগ্র মায়াগ্রাস নিরস্ত হইতে হইতে ইন্দ্রিয় আচ্ছাদক গ্রাসটুকু ও নিঃশেষিত হয় তখন দ্রষ্টা জীব 'স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি।' জীব নিকল নিরঞ্জন হইয়া 'পুরুষ' পদবাচ্য হন। যাহার অন্তর্লোকে যুগযুগান্ত ভরিয়া রঙের খেলা চলিয়াছে এবং খেলার রঙ অনুযায়ী কখনও কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার কখনও বা শুক্লপক্ষের ফুল্লজ্যোৎস্না ভরিয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে পূর্ণ পুরুষের সত্তায় এরূপ শাশ্বত পূর্ণিমা যোগবলে জাগিয়া উঠিল যে সে পূর্ণিমার কলা নাই, কলঙ্ক নাই, অঞ্জন নাই। এ পুরুষ সর্ব্বথা নির্ম্মল নিরঞ্জন নিকল, যে পূর্ণের সন্ধানে এতকাল জীব থাকিয়াও অন্ধ আঁখিতে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, তপস্যার অন্তে আজ তাঁহাকে দেখিতে পাইল। যখন দেখিল তখন চিনিল এ যে তাহারি আপনরূপ তারপর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া তাহার এতদিনের পরিচিত 'আমি'টিকে দেখিতে চাহিল কিন্তু সে—'আমি' অদৃশ্য হইয়াছে, তাহাকে আর দেখা গেল না।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আলোচনা

প্রলয়-পয়োধি-জলে!

নানা জীবের নমুনা লইয়া নোয়ার ভেলা ভাসিয়াছিল সাগর-সলিলে—বাইবেলের বর্ণনা এই। হিন্দু-বিশ্বাসে তাহার রূপ দিয়াছেন বাঙালী কবি জয়দেব—'প্রলয়-পয়োধি-জলে বেদকে ধারণ করিয়াছিলে তুমিই, হে জগদীশ!' আবারও কি মহাপ্রলয় ঘটিবে!—কতদিনে? পণ্ডিতেরা মাঝে মাঝে মাথা নাড়িয়া বলেন—নিকট ভবিষ্যতে; কখনও প্রচার করেন সুদূরে—অগণিত কাল পরে! সম্প্রতি ধুয়া তুলিয়াছেন সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ সার জেমস্ জিন্স্।

* * * *

কেম-ব্রিজে রীড্-লেকচারে পণ্ডিতপ্রবর ঘোষণা করিয়াছেন—কতকাল পরে কে জানে, ইহা কিন্তু ধ্রুব নিশ্চিত মহাপ্রলয় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, জীবমাত্রেরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, মৃত্যুই শুধু বিরাজ করিবে, দুনিয়ায় কোনদিন যে জীবন বলিয়া কোন পদার্থ ছিল তাহার চিহ্নমাত্র থাকিবে না—ইহাকে নাম দিতেছি তুষার-যুগ।

তাঁহার মতে আকস্মিক ঘটনা—জীবের জীবন। তাঁহার বক্তব্য অনেকটা এই যে ব্যাঙের ছাতা যেমন সহসা গজাইয়া উঠে—কি মনুষ্যের কি জীবের সকলেরই জীবনী-শক্তির উদ্ভব অনেকটা সেই ভাবের; প্রাণী-সমষ্টির জন্য এই পৃথিবীর যে সৃষ্টি হইয়াছে ইহা অসম্ভব, আবেগ-উদ্বেগ কামনা-উচ্চাভিলাষ শিল্প-কারুকলা কর্ম্ম-যোজনা ধর্ম্ম-দর্শন—এ সমস্তই বিশ্বকল্পনার বহির্ভূত নিশ্চয়ই। শুধু তাহাই নহে, পৃথিবীর জীবের প্রতি বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন—ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা। তিনি বলেন, দৈব-দুর্ঘটনার বশে এই পৃথিবীতে আমরা "হোঁচট" খাইয়া আসিয়া পড়িয়াছি, জীবনের মূল্য এক কড়াও নয়।

বৈজ্ঞানিক-শিরোমণি উপসংহারে বলিয়াছেন—শৈত্য মানবজাতির দুর্ভাগ্য, সেই অতি-শৈত্যের প্রভাবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য, অথচ জাগতিক অপর সকল পদার্থে এখনও উত্তাপের পরিমাণ এত বেশী যে তাহার সংঘর্ষে জীবের অনন্তকাল টিকিয়া থাকা অসাধ্য।

কবীরের প্রতি

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, বি-এ

কবে তব আবির্ভাব কবে তব হলো তিরোধান
কিছু তার নাহি জানি, গণিতের অঙ্ক পরিমাণ
তোমারে বাঁধিতে নারে—কোন ইতিহাসের পাতায়
তব জাতপত্রখানি নাহি দিলে কালের খাতায়,
তুমি চিরদিনকার—নহ তুমি কোন' শতাব্দীর,
গোষ্ঠীহারা কোষ্ঠীহারা গোত্রহীন হে সাধু কবীর।
কালসিন্ধু মাঝে তব জীবনের নাহি পাই সীমা,
মহাসিন্ধুময় হ'য়ে আছে তার বিরাট মহিমা।

কেবা তব পিতামাতা তার মোরা পাইনি সন্ধান,
তুমি নারদের মত বিধাতার মানস সন্তান।
সংসার সন্ন্যাসভেদ যাঁর মাঝে পাইল বিলয়,
গৃহী কি বৈরাগী তিনি কেমনে তা হইবে নির্ণয়?

জানিনা কি ছিলে তুমি ধর্ম্মরাজ্যে, সহজী, মরমী,
রামাৎ বৈষ্ণব, সুফী, বৌদ্ধ, জৈন কিংবা বর্ণাশ্রমী,
কতটা মোসে্‌ম ছিলে কতটা বা হিন্দু নাহি বুঝি,
কুড়ানো ছেলের আর পিতৃধর্ম্ম কোথা পাব খুঁজি?
কোন সম্প্রদায় তোমা, জাতিহারা, ভাবেনি আপন,
মহামানবের ছিলে তারি ধর্ম্ম করেছ পালন।

জানিনা জীবন কথা, কি কি ভাবে করিলে সাধনা,
জানিনা করিলে কারে কি প্রথায় পূজা আরাধনা,
গড়েছিলে সম্প্রদায় জানিনাক কি বিধি বিধানে,
আহার বিহার বেশ জীবযাত্রা কি ছিল কে জানে?
কোন্ গ্রন্থ পড়েছিলে, কোন্ মন্ত্র জপিতে ধীমান্
কত বার? কি আসনে কতক্ষণ করিতে ধেয়ান

তব দীর্ঘ জীবনের বহিরঙ্গ কোন পরিচয়,
রাখেনিক ইতিহাস করি যত্নে অমর অক্ষয়
সমস্ত জীবনখানি নিঙাড়িয়া দিয়াছ যে বাণী,
তার এক বর্ণ মোরা হারাইনি—এই শুধু জানি,
ব্যাপ্ত তাহা দিগ্বিদিকে স্নেহবিন্দুসম খরস্রোতে
বঞ্চিত হইনি তব জীবনের সার ধন হ'তে।
ভারতের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হয়ে অনুস্যূত
তব ব্রত তব মন্ত্র চিরদিন তার অঙ্গীকৃত।
কলামূর্ত্ত করি তারে পুরশ্রীত গম্বুজে মিনারে
নমস্ত করিয়া রাখি আপনার দায়িত্ব না সারে।
নাহি তাহে কোন' ক্ষোভ। এ ভারত বিরাট জীবনে
কোন সীমাবেষ্টনীতে ক্ষুদ্র করি পূজে না যতনে।
নাহি চাই বহিরঙ্গ—ভুলে যাই অনিত্য অসারে
জীবনের অঙ্গীভূত হয় না যা চাইনাক তারে।
ব্রত চাই, বাণী চাই—চাই অন্তরাত্মার সন্ধান,
আমরা মরাল ধর্ম্মী—নীর ফেলি ক্ষীর করি পান।

শুই ডাগন প্যাগোডা

রেঙ্গুন

চিত্রশালা

রয়েল লেক

রেঙ্গুন

ইয়েনাঙ্গ্যান—ইয়াবতী তীরে

ইয়েনাঙ্গ্যান্ – দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে

ক্যান্টনমেন্ট্ গার্ডেন্স্ — রেঙ্গুন

থায়েটমিয়ো—ইরাবতীতীরে

চোখের খোকা

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

১
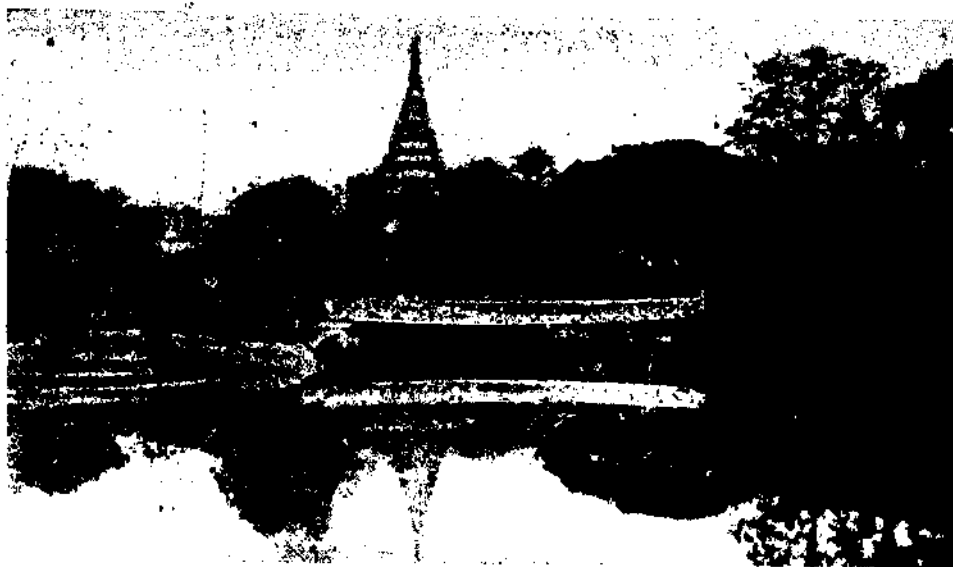
সে এক পৌষের বৃষ্টির দুপুর। ঠাণ্ডা কড়াই সেদ্ধ, পান্তা ভাত, আর বাসি কিছু খেয়ে—মার শীত ধরল, মা এসে ছাতের রোদ্দুরে একখানা কম্বল টেনে মুড়ি দিয়ে—শুয়ে পড়লেন।

খোকা ডাকলে নীচে থেকে—'মা'

মা ভাবলেন উত্তর দিলে ও এখুনি উঠে এসে দুষ্টুমী করবে, জবাব না দিলে খেলা করতে বাইরে চলে যাবে—

খোকা আবার ডাকলে,—'মা' ও 'মা'।

মার—বোধ হয় ঘুম আসছিল।

খোকা ওপরে উঠে এলো,—'মা, ও মাগো'।

মাকে লেপের তলায় দেখে সে এসে তাঁর মুখ থেকে কম্বলটা সরালে।

'আঃ—তুমি বড় দুষ্টু হয়েছ'—মা বিরক্ত ভাবে আবার সেটা টেনে দিলেন।

খোকা বল্লে,—'তোমায় এত ডাকছি'—

মা বিরক্ত ভাবে চোখ খুলে বল্লেন, 'তুমি ছাই ছেলে'—

দুপুরের নির্ম্মল রৌদ্রে মার স্বচ্ছ চোখের ভেতর খোকার চোখ পড়ল—সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল,—

'তোমার চোখে কে মা?—একটী ছোট্ট খোকা—ওমা! ওকে ডাক না—' খোকা আশ্চর্য্য হয়ে মিনতি করে বল্লে।

নিদ্রাতুর চোখের পল্লব মুদিত করে মা বল্লেন, উঁ!

ওমা, ও কে মা? খোকা আবার ডাকে—

'কে?' বিরক্তস্বরে জননী চোখ চাইলেন।

চোখের ভিতরের—খোকাটীকে সে আবার দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে বল্লে, 'ঐ যে!'—

মার বোধগম্য হ'ল,—'তুমি ছাই হয়েছ,—দুষ্টু হয়েছ, তাই ওকে এনেছি—ওকেই ভালবাসব। ও ভালো ছেলে, আমাকে জ্বালাতন করে না'—

খোকা মাতৃ নেত্রমধ্যে পরিদৃশ্যমান খোকাকে অবাক সভয়ে দেখছিল—'না আমি দুষ্টুমী করব না'—

আশ্চর্য্য হয়ে শঙ্কিত হয়ে—সে মার কোলের কাছে শুয়ে পড়ল।

২

মার কোলে একটী ছোট্ট শিশু এসেছে—তাঁর অবসর আরও কমে গেছে। খোকা আর তাঁর নাগাল বড় পায় না—মাঝে মাঝে খেলা করতে করতে ছুটে আসে, কিন্তু সেটা আসাই সার হয়,—তিনি তাঁর নতুন খোকার দুধে-কাজলে-কান্নায়-ঘুমে, ব্যস্ত-ভুবন থেকে শুধু বল্লেন—'ওখোকা বাইরে চলে যেয়ো না, দুধ খাও' এমনি ধারা—

কোলের শিশুটীকে নিয়ে ব্যস্ত জননীকে সে দেখে,—মা মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—'কিরে?'

মার চোখে খোকার আবার ছায়া পড়ে,—

'ওইটে কি তোমার সেই চোখের খোকাটী?' খোকা প্রশ্ন করে, জননী চোখ নিচু করে নেন কোলের ছেলের পানে,—পাছে খোকা দেখতে পায় ছায়ার খোকাকে।

খোকা অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে—'আমি দুষ্টু বলে ওকে ডেকেছ?" মনে মনে চিন্তা ভাবনার শেষ থাকে না—

মা কাজল পরানো শেষ করে বল্লেন,—'হ্যাঁ'—

খোকা অপ্রস্তুত হয়ে মার কোলের ভেতর মুখ রাখে, ভায়ের পাশে।

৩

মাস ছয়েক কেটে গেছে। আবার শীতের দুপুর। জননীর কোলের শিশুটী কদিন হ'ল চলে গেছে। মা তার জিনিষপত্র জামাকাপড় ঝিনুক বাটী বিছানা শেষ কাজললতা নিয়ে অন্যমনে আকুল হয়ে ছাতে বসে আছেন।

খোকা এল মৃদু পায়ে—আস্তে আস্তে।

'মা'—সে ডাকলে

জননী মুখ তুল্লেন না,—শুধু বল্লেন 'উঁ'।

সে আবার ডাকলে,—মা।

এবারে তিনি সিক্ত পল্লব প্রান্ত চোখ খুল্লেন,—চোখের মাঝে খোকা,—একটু বড়!

খোকা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, 'তুমি ওকে আবার তুলে রেখে দিয়েছ? ওমা দেখ, ওইযে আছে খোকা তোমার চোখের ভেতর'।—

জননী চোখ ঢেকে নিলেন।

খোকা আবার ডাকে 'মা,—ওমা, ওকে ডাক না আমি আর দুষ্টুমী করব না' অপরাধ ভীত খোকা মার মুখের হাত সরিয়ে দেয়।

মার চোখের পাশ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে জল ঝরে পড়তে লাগল। খোকা আশ্চর্য্য হয়ে হাত সরিয়ে নিলে।

তিনি আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লেন।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বর্ণরেণু সীমন্তে লইয়া সন্ধ্যাবধূ যেমন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন, আলুলায়িত রূপরাশি লইয়া সুন্দরী অমনই বাতায়ন আলো করিয়া দাঁড়ায়। মৌনমুগ্ধ প্রিয়নাথ মদিরনয়নে সেই শান্তশুভ্র আলোকপানে নির্ণিমেষ চাহিয়া থাকে—চাহিয়া চাহিয়া বুঝিবা প্রাণ ভরিয়া রূপ-সুধা আকণ্ঠ পান করিতে চায়। কিন্তু, হায়! গণ্ডুষ-পরিমেয় গ্রহণের পূর্ব্বেই রমণী অন্তর্হিতা, আঁধার-ক্রোড়ে সন্ধ্যাবধূ ঢলিতে না ঢলিতেই সুন্দরী দৃষ্টি-বহির্ভূতা! প্রিয়নাথ বিমুগ্ধ বিভ্রান্ত। নবপল্লবিত বিটপীর ন্যায় উল্লাসমুগ্ধ, দুঃস্বপ্নজাগ্রত দুর্ভাগার ন্যায় বিমূঢ় সংক্ষুব্ধ। বিমুগ্ধ দর্শনসুখে, সংক্ষুব্ধ সে সুখের কুহকে—সহসা তিরোভাবে। উল্লসিত মধুময় ভবিষ্যের কাল্পনিক আভাসে, বিষণ্ণ তাহারই সাফল্য-সংশয়ে।

বৃষ্টির ঘনঘটার নয়নে নয়নে সেই মধু-মিলনের পর ইহাই নিত্য-ঘটনা—সপ্তাহব্যাপী, নিতুই-নব। এই ঘটনাচক্রে পড়িয়া প্রিয়নাথ উন্মত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, আত্মবিস্মৃত—তীব্র মাদকের তরুণ স্পর্শেও যে আবেশ সেই আবেশে অচেতন, আত্মহারা।

নবীন আবেশের ঘোর দিনেদিনে ক্রমশঃ যতই কাটিয়া আসিল, আকাঙ্ক্ষা আকুলতা মৃদুমধুর কম্পন ছাড়িয়া ততই সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল, সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়া বুদ্ধি একই প্রশ্নের পুনঃপুনঃ মীমাংসা প্রার্থনা করিল। সে প্রশ্ন—ললনা কে, হিমাদ্রিশিখরে উষাদেবীর ন্যায় বাতায়ন-পথ-বর্ত্তিনী রূপসী কে? কে, কে বলিবে?—মন? মন তখনও মধুর ভাষায় প্রাণের অযুত আশা গাঁথিয়া গাঁথিয়া গীতি-কাব্য রচনায় ব্যস্ত, উত্তর দিল না; বরং শত অনাবশ্যক প্রশ্নে সহস্র অলীক কৈফিয়তে বুদ্ধিকে বিষম

প্রিয়নাথ ছিন্ন কদলী-পত্র জোড়া দিতে দিতে ভাবিতে লাগিল—নাঃ সুহাসিনী, অসম্ভব!

হেরফেরে ফেলিয়া দিল। ঐ এক প্রশ্নের উত্তরেই যে যত আতঙ্ক। আশঙ্কা—বিনিসুতার হার সত্যের উচ্ছ্বাস সহিতে পারে কি না-পারে, কে জানে যদি ছিঁড়িয়া খান্‌খান্‌

হইয়া যায়! মনের বচন-বাহুল্য যে মূল প্রশ্নের উত্তর দিবার ভয়ে ছলনা চাতুরী মাত্র, বুদ্ধি তাহা সহজেই বুঝিল; বুঝিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল—রমণী কে? নির্দ্ধারিত বিষয়ে বিরত হইয়া মন অগত্যা তাহারই আলোচনায় নিরত হইল।

*

চঞ্চল চিত্তে প্রিয়নাথ ভাবিতে লাগিল—রমণী কে, কাহার ঘরণী, সধবা না বিধবা, কি নাম, হেমচন্দ্রের বাটীতে কেন,—কি সম্পর্কে?

ভাণ্ডামনে প্রিয়নাথ বারংবার প্রশ্নগুলি লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিতে লাগিল। প্রথমতঃ বুদ্ধির সাহায্যে যুক্তিবিচারে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা পাইল। চেষ্টায় প্রশ্নগুলি জটীলতর হইয়া উঠে দেখিয়া অবশেষে স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু স্মৃতি শরণাগতের কি সহায়তা করিবে? নিজ বিবহাবধি হেমচন্দ্রের পরিণয়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রিয়নাথ বন্ধুর কোন তত্ত্বই রাখিত না। তবে একমাত্র আশা—লোক-মুখে যে সকল সংবাদ ভাসিয়া বেড়ায় তাহারই কয়েকটা যাহা অযাচিতভাবে কর্ণে পৌঁছিয়াছিল তাহা হইতে যদি কিছু সঙ্কেত পাওয়া যায়। হায় দুরাশা! তাহারাই বা ধরা দিবে কেন? অনাদরে উপেক্ষায় সারা-জীবন মর্ম্মাহত যে, প্রয়োজনকালে সাধিলে তাহারও প্রাণে কি অভিমান জাগিয়া উঠে না,—জাগিয়া স্ফীত হইয়া অবাধ্যতায় প্রতিশোধের অভিনয় করে না? দারুণ অভিমানে জনশ্রুতিও সময় পাইয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল—স্মৃতি পথ হইতে বুঝি দূরেই ছিল, আরও দূরে সরিয়া পড়িল।

বহু অনুনয়-বিনয় সাধা-সাধনায় অবশেষে এইটুকু মাত্র মনে পড়িল,—হেমচন্দ্রের সংসারে এক কিশোরী শ্যালিকা ছিলেন—সধবা? হয়ত; না বুঝিবা বাল-বিধবা।

অকূল পাথারে পড়িলে জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন তুচ্ছ তৃণ-খণ্ডও অসীম নির্ভরতার সহিত আঁকড়াইয়া ধরে, প্রিয়নাথও তেমনই সমস্যা-সমুদ্রে বিধ্বস্ত হইয়া ক্ষীণ স্মৃতির ঐ সূক্ষ্ম সূত্রটাই ধ্রুব-সত্য জ্ঞানে ক্ষণিক নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ জ্ঞান করিল। ক্ষণপরেই ক্ষিপ্রগতি সংশয় আসিয়া তর্ক-সমর বাধাইয়া দিল—"সুন্দরী বালবিধবা, হেমচন্দ্রের শ্যালিকা স্থির করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছ! কিন্তু কাহার কথায়? জনশ্রুতির? জনশ্রুতি যে মিথ্যা নয়, কে বলিল? মিথ্যা যদি না হয় অতিরঞ্জনও নয় তাহার প্রমাণ কি? মানিলাম, কথা অলীক নয়, অতিরঞ্জিতও নয় হেমচন্দ্রের শ্যালিকা যথার্থই তাঁহার বাটীতে ছিলেন, কিন্তু এখনও যে আছেন, ইনিই যে সেই, তাহার নিশ্চয়তা কি? সীমন্তে সিন্দূরের মত যে লাল-চিহ্ন বালবিধবার তাহাই বা কেন, পরিধানে শাড়ী কেন?"

প্রিয়নাথ যে বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়াছিল অপ্রিয় তর্কে আহত হইয়া সে বিশ্বাস টলিল। দেখিল,—বিষম ভ্রান্তি, উপকূল নিকটে নয়, আকাশে তেমনি ঘনঘটা, অন্ধকার সম্মুখে পশ্চাতে তেমনই ঘোরতর, নদী তেমনই বাত্যা-বিক্ষোভিত, তরণী আর কেমন করিয়া বাহিবে, কাজেই হাল ছাড়িল, শুধু ভাবিতে লাগিল,.."তবে সুন্দরী কে? পাগল করিল যদি, পরিচয় দিল না কেন; পরিচয় দিবে না যদি, পাগল করিল কেন? একি কৌতুক, প্রাণ লইয়া কৌতুক, প্রেম লইয়া রঙ্গ—ছি! না, না, ইহাও কি সম্ভব! নবনীত-কোমল যাহার দেহ, সে দেহের অন্তরে অমৃত বৈ আর কিছু কি স্থান পায়? পরিচয় দেয় নাই—নাই বা দিল, পরিচয় নারী হইয়া কেমন করিয়া দিবে—দিবার উপায় কৈ? যাহা দিবার তাহা ত দিয়াছে—মুগ্ধদৃষ্টি নিত্য বিলাইয়াছে, সে দৃষ্টিতে নবানুরাগের সুস্পষ্ট রেখাপাত দেখাইয়াছে, সুধার ধারা মুমূর্ষু প্রাণে অজস্র ঢালিয়াছে। পরিচয় নাই বা দিল! সবই হাতে তুলিয়া দিবে, আদায় করিয়া লইবার কিছু রাখিবে না? পরিচয় না দিয়াছে নাই দিয়াছে, পরিচয় লইবার অধিকার ত কাড়িয়া লয় নাই। তবে মর্ম্মব্যথা কিসের?"

প্রিয়নাথ আরও ভাবিতে লাগিল—চেষ্টা চাই, কথা সত্য; বিনা চেষ্টায় সাফল্য নাই। কিন্তু চেষ্টা কোন্ পথে চলিবে? স্বয়ং চেষ্টা করিবার উপায় ত নাই। কাহাকেও কোন্ মুখে কাহার কথা কেমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে? অন্তরের সংবাদ অপরকে দিয়া লইতে গেলেও ঐ বিপদ।

সন্দেহ-ঘোরে লোকে কথাটা নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়া তুলিবে! তবে উপায়? হাঁ, উপায় আছে। নিরীহ নির্বোধ উড়ে মালীকে দিয়া সকল সংবাদ লওয়া চলিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রত্যূষে মালী আসিয়া যখন বলিল—সুন্দরীর নাম সুহাসিনী, প্রিয়নাথের মন যেন ঝটিকাতাড়িত কদলী-পত্রের ন্যায় ছুলিয়া দুইখান হইয়া গেল।

প্রিয়নাথ লোহিত-লোচনে মালীর মুখপানে চাহিল। মালী বলিল—

প্রিয়নাথ ছিন্নপত্র জোড়া দিতে দিতে ভাবিতে লাগিল, নাম—সুহাসিনী, অসম্ভব! সুহাসিনী সে ত হেমচন্দ্রের জায়া, উড়ে কি শুনিতে কি শুনিয়াছে, কি বলিতে কি বলিয়াছে! সুহাসিনীর ভগিনীর নাম হয়ত সুভাষিনী, মূর্খ একই রকমের দুইনামে নিশ্চয় গোল পাকাইয়া তুলিয়াছে।

ছিন্নপত্র তবু কিন্তু জোড়া লাগিল না, পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সাহসেও অথচ কুলায় না।

মালী নিজ হইতেই বুঝাইল, রমণী বাটীর গৃহিনী। প্রিয়নাথ ভাবিল, বিচিত্র কি, জ্যেষ্ঠা ভগিনী থাকিতে কনিষ্ঠা গৃহিণী-পনার দায়িত্ব কেন লইবে? না লওয়াই ত স্বাভাবিক, বিনয়সূচক, চিরন্তন রীতিমূলক।

অনুকূল আশ্বাস-বর্ষণ সত্ত্বেও ছিন্নপত্র আরও ছিঁড়িয়া গেল। প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় এবার সাহসের অভাব নয়, ভয়ের সঞ্চার হইল।

মালী তৃতীয়বারও অযাচিত সংবাদ জানাইল—কি উৎকট সংবাদ!—বাটীতে স্ত্রীলোক আর দ্বিতীয়া নাই, কেবল ঐ উনিই।

ছিন্নপত্র শতধা ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়িল। আশ্বাসবাণী প্রিয়নাথের কাণে কাণে এখনও বলিল, "দ্বিতীয়া নাই, তা বলিয়া উনিই যে সুভাষিনী নন তাহার প্রমাণ? সুহাসিনী হয়ত পিত্রালয়ে, হয়ত মাতুলালয়ে—সে সংবাদ কেই বা রাখে?"

প্রিয়নাথ লোহিত-লোচনে মালীর মুখপানে চাহিল। মালী বলিল—

কি বলিল?—কে জানে! কেহ ত তাহা শুনে নাই, শুনিবার কেহ ত ছিল না। প্রিয়নাথ আভাষেই বক্তব্য বুঝিয়াছিল। বুঝিল, ললনা আর কেহ নয়, হেমচন্দ্রের

ছিন্নপত্র এইবার খসিয়া পড়িল, বৃক্ষসহ ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

প্রিয়নাথ নির্ব্বাক, শূন্যদৃষ্টি। সে দৃষ্টির ভাষা নাই, অর্থ আছে; বিকাশ নাই, ব্যথা আছে; সুর নাই, কথা আছে। সে দৃষ্টি উন্মাদের, পাষাণ-প্রতিমার, প্রেতাত্মার। মুখ বিবর্ণ, দেহ পাণ্ডু, সর্ব্বাঙ্গ কালিমাময়।

একি শবদেহ?

মালী ত্রাসে আতঙ্কে হতজ্ঞান। নাসিকা স্পর্শ করিয়া দেখে, নিশ্বাস পড়ে কি না পড়ে। বক্ষে হাত দিয়া দেখে, স্পন্দন অতি মৃদু। মৃগীরোগের কথা শুনিয়াছিল; ভাবিল, বুঝি তাই।

চোখে মুখে বক্ষঃস্থলে পদতলে বহুক্ষণ জল-সেচনান্তে দেখে, নয়নে চেতনার চিহ্ন দেখা দিয়াছে। উৎসাহভরে

পানীয় জল দিতে গেল, প্রিয়নাথ হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল।

পরমুহূর্ত্তেই উঠিয়া দাঁড়াইতে গেল। দাড়াইবে কি, মাথা ঘুরিতেছে, প্রিয়নাথ তাহা বুঝিল না, বুঝিতে পারিল না। ভাবিল,—গৃহ অট্টালিকাই ঘুরিতেছে, ঘুরিয়া করুণ আর্ত্তনাদ করিতেছে, কুসুমোদ্যানে ফুলগাছগুলি ঘুরিয়া

চোখে-মুখে বক্ষস্থলে পদতলে বহুক্ষণ জল-সেচনান্তে দেখে নয়নে চেতনার চিহ্ন দেখা দিয়াছে।

ঘুরিয়া কুসুমরাশি পিষ্ট দলিত করিতেছে, আকাশে তরুণ তপন ঘুরিয়া ঘুরিয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, নিম্নে রবিকর-সংপৃক্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া মরিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে আবার ঘুরিতেছে, হাহাকারে ঘোর রোল তুলিয়াছে।

এ কি মহাপ্রলয় ?

প্রিয়নাথ বসিয়া পড়িল। অল্পকাল পরেই আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিল,—পাখী আর গাহে না, ফুল আর হাসে না, বাঁশী আর বাজে না, রবিকরে ধরণী আর তালে তালে নাচে না। দেখিল,—নাই, কিছু নাই, কুঞ্জভরা গান নাই, মালঞ্চভরা কুসুম-সৌরভ নাই, বাঁশরীভরা রাগরাগিণী নাই, প্রাণভরা হাসিরাশি নাই—ধরা যেন নীরব, নিস্তব্ধ, বধির, অজ্ঞান, নিরানন্দ, অচেতন। প্রলয়ের কাল সত্যই কি তবে সমাগত ? কবি-বর্ণনায় প্রলয়পয়োধিজলে এমনইত হইয়াছিল।

প্রিয়নাথ নয়ন মেলিতে যায়, ধূমে আঁধারে আঁখি মুদিত হইয়া আসে। সম্মুখে পশ্চাতে, উর্দ্ধে অধে, বামে দক্ষিণে, চারিধারে কেবলই যে আঁধার, আঁধারে কেবলই ধূম—বিশ্বব্যাপী বিশ্বগ্রাসী, আঁধার-গোলকে কেবলই ধূমরাশি। অন্তরে চাহিতে যায়, শিহরিয়া উঠে—সে যে মহা-শ্মশান, শ্মশানে ধূ ধূ চিতা জ্বলিতেছে, সুখ আশা আনন্দ উৎসাহ পুড়িয়া ছাই হইতেছে, শুধুই ধূম উদ্গীরণ করিতেছে—ধূমে ধূমাকার, ভস্মের অভ্রভেদী পাহাড়।

প্রিয়নাথ আবার চাহিল, অন্তরে বাহিরে আবার চাহিল। ঘাতক বধ্যভূমির প্রতি যেমন করিয়া চাহে, শবজীবী শ্মশানের প্রতি যেমন করিয়া চাহে তেমনই নির্ম্মম প্রাণহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সব গেল, প্রাণ পড়িয়া রহিল কেন ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ মিত্র।

সাহিত্যে নোবেল-প্রাইজ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্তা অমিয়া দত্ত

মরিস্ মেতারলিঙ্ক্ (Maurice Maeterlinck)

জন্ম—১৮৬২ ; প্রাইজ লাভ—১৯১১ ।

বিখ্যাত নাট্যকার, প্রবন্ধ-লেখক ও কবি মেতারলিঙ্কের স্থান Symbolist বা ভাবরস-প্রধান রূপক লেখকদিগের মধ্যে খুবই উচ্চে। ইনি জাতিতে বেল্‌জিয়ান্। কিন্তু ইঁহার সমস্ত লেখাই ফরাসী ভাষায়। ১৮৬২ সালের ২৯শে

মরিস্ মেতারলিঙ্ক্

আগষ্ট ঘেন্ত্ (Ghent) সহরে সম্ভ্রান্ত বংশে ইঁহার জন্ম। পিতার ইচ্ছানুসারে মেতারলিঙ্ক আইন অধ্যয়ন করেন এবং ঘেন্ত্ সহরে কিছু দিন ব্যবহারজীবের কাজও করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা তাঁহার ভাল না লাগায় অল্পদিন পরেই সাহিত্যিক-দিগের সঙ্গলাভের ইচ্ছায় প্যারীতে আসেন। সেখানে ভিলিয়ার্স ও মীরাবোর সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। 'রাজকুমারী মালান' তাঁহার প্রথম মুদ্রিত নাটক। ইহা তিনি তাঁহার বন্ধু মীরাবোকে উৎসর্গ করেন। নিয়তি ও প্রেমের দ্বন্দ্ব এই নাটকের বিষয়বস্তু। নিয়তির অধীন হইয়াও যে প্রেমের বল কত বেশী হইতে পারে তাহা এই নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৮৮৯ সালে পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বেল্‌জিয়ামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই বৎসরেই তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক 'উত্তপ্ত গৃহ' (Hot House) প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহা জনপ্রিয় হয় নাই।

সাত বৎসর তিনি বেল্‌জিয়ামেই ছিলেন। এই সময়ের ভিতর তিনি অনেকগুলি নাটক লেখেন ও বিভিন্ন দেশের সাহিত্য হইতে উৎকৃষ্ট পুস্তকের অনুবাদও করেন। নোভালিস্, রুইসব্রোক্ ও মার্কিন দার্শনিক এমার্সনের প্রভাব তখন তাঁহার উপর খুব বেশী ছিল। 'দৃষ্টি-হারা', 'অনাহূত,' 'তাঁতাজিলের মৃত্যু' প্রভৃতি নাটক এই সময়েই রচিত। সবগুলিই বিয়োগান্ত। মৃত্যু-রহস্য উপরোক্ত নাটকগুলির বর্ণনীয় বিষয়। মানুষের মনে মৃত্যুভয় যে কিরূপ প্রবল তাহা তিনি এই পুস্তকগুলিতে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

"পীলিয়াস্ ও মেলিস্তাণ্ডা" তাঁহার একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক। ইহার গঠন ও অভিনয় দুইই সমান চিত্তাকর্ষক। প্রেমের অপরূপ রসসৌন্দর্য্যে এই পুস্তকখানি সমুজ্জ্বল। ইহার নাটকীয় ভাব, রহস্য-পর্য্যায়পর্ত্তী এবং চরিত্রসৃষ্টি উল্লেখ-যোগ্য। প্রণয়ীর হত্যা ও কন্যার জন্মের পর মেলিস্যাণ্ডার শোচনীয় মৃত্যু উচ্চদরের নাটকীয় শক্তির পরিচায়ক। ইহার ভাষা সরল ও রচনাভঙ্গী অনুপম।

'আলাদীন ও পালোমেডিস'-এ তিনি মৃত্যুর কোলে তরুণ-তরুণীর চিরমিলনের সুন্দর প্রেমচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার অ্যাটোলীনের চরিত্র প্রাণবন্ত ও উদার।

১৮৯৬ সালে তিনি পুনরায় প্যারীতে আসেন ও সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। অভিনেত্রী জর্জেটা লা ব্লাঙ্ক তাঁহার প্রথমা পত্নী। ইঁহার সহযোগীতায় ও প্যারীর সাহিত্যিক আবহাওয়ার ভিতর ১৯০৩ সালে মেতারলিঙ্ক তাঁহার নাট্য-প্রতিভার চরম নিদর্শন 'জোয়াজেল' ও 'মনাভানা' এবং ১৯০৮ সালে জগদ্বিখ্যাত রূপক নাটক 'নীলপাখী' প্রকাশ করেন। শেষোক্ত নাটকখানি লিখিয়া তিনি Belgian Triennd পান এবং সম্ভবতঃ তাঁহার নোবেল পুরস্কার লাভেরও এই বইখানি প্রধান কারণ। সূক্ষ্ম চিন্তায়, ভাবের গভীরতায় ও কল্পনার সৌন্দর্য্যে 'নীলপাখী' অতুলনীয়। প্রতি দৃশ্যেই ইহার মনোমুগ্ধকর সত্য ও কাল্পনিক চরিত্রগুলি এবং ইহার অন্তর্নিহিত দেশকালের অতীত বাণী এই নাটকখানিকে চিরন্তন করিয়াছে। ইহার অভিনয় ও ছায়াচিত্র দুইই অত্যন্ত জনপ্রিয়। 'নীলপাখী' নানা ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। ইংরাজীতে ও বাংলায় ইহার একাধিক তর্জমা পাওয়া যায়।

'মনাভানা' বিশেষ করিয়া মেতারলিঙ্কের পত্নীর জন্ম লেখা। প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ ও স্বাভাবিক চরিত্র চিত্রণে ইহার মত নাটক প্রায় দুর্লভ। পীসা দুর্গাধ্যক্ষের পত্নী মনাভানা মেতারলিঙ্কের সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত নায়িকা। তাহার বাল্যকালের প্রণয়ী ফ্লোরেন্সের সেনাপতি প্রিন্সিভালের চরিত্র আদর্শানুগত হইলেও স্বাভাবিক। এই পুস্তক বাহির হইবার পর মেতারলিঙ্কের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

"জয়জেলে" (Joyzelle) নাটকীয় উপাদানের সহিত অন্তর্নিহিত দুঃখ বিদ্যমান। 'আর্দ্দিয়ান ও নীলদাড়ি' তে তিনি নারী-জাতির উপর পুরুষের যথেচ্ছাচারিতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। "জয়জেল" ও "আর্দ্দিয়ান" এই চরিত্র দুইটী মেতারলিঙ্কের চমৎকার সৃষ্টি।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মেতারলিঙ্ক নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু ইহার এক কপর্দ্দকও তিনি নিজে গ্রহণ করেন নাই। সমস্তই ফরাসী সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দান করেন। এই টাকায় "মেতারলিঙ্ক পুরস্কার" নামে এক প্রাইজ স্থাপিত হয়।

তাঁহার স্বদেশপ্রেম উল্লেখযোগ্য। একবার ফরাসী বিদ্যাপীঠ (French Academy) তাঁহাকে সদস্য করিতে ইচ্ছুক হন। ঐ বিদ্যাপীঠের নিয়মানুসারে যে কেহ উহার সভ্য হইবে তাহার ফরাসী-নাগরিক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মেতারলিঙ্ক তাঁহার বেলজিয়ান নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া ফরাসী হইতে অসম্মত হন। ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় প্রায় ৫৪ বৎসর বয়সে এই স্বদেশবৎসল সম্মানীয় লেখক চাষাদের সহিত শস্যক্ষেত্রে কাজ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করে। "টাইলমণ্ডের বার্গোমাষ্টার" যুদ্ধকে ভিত্তি করিয়া লেখা তাঁহার একখানি প্রসিদ্ধ নাটক। ইহার বার্গোমাষ্টার, হিল্‌মার, ইসাবেলা ও ক্লস্ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও জীবন্ত চরিত্র।

'মনাভানা' দশ বৎসর পরে ১৯১৩ সালে "মেরী-ম্যাড্‌লীন" প্রকাশিত হয়। বাইবেলের একটী ঘটনা এই নাটকের ভিত্তি। এই বইখানি মেতারলিঙ্কের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম। সংক্ষেপে গল্পটী এই —

মেরী-ম্যাড্‌লীন্ একজন সুন্দরী ও ধনবতী রোমান নটী। পদস্থ রোমান রাজপুরুষ ভেরাস্ তাহার প্রণয়প্রার্থী। কিন্তু মেরী-ম্যাড্‌লীন তাহাকে ভালবাসিলেও যীশুখৃষ্টের অনুপম চরিত্র-প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং পাপের পথ চিরজীবনের মত ত্যাগ করে। রোমানেরা যীশুকে গ্রেপ্তার করার পর ম্যাড্‌লীন তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। এই সময় ভেরাস্ আসিয়া বলে যে, ম্যাড্‌লীন্ যদি তাহার প্রণয়কে প্রত্যাখ্যান না করে তাহা হইলে সে যীশুর পলায়নের সুবিধা করিয়া দিতে পারে। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে ম্যাড্‌লীন ও ভেরাসের কথোপকথন অতি সুন্দর। ভেরাসের প্রস্তাবের উত্তরে ম্যাড্‌লীন বলিতেছে, "যদি যীশু না হ'য়ে অন্য কোন লোক হ'তো আর আমি তাকে ভালবাসতুম, তা হ'লে তাকে বাঁচাবার জন্য হয়তো আমি যা কিছু সে ভালবাসে তার বিরুদ্ধে গিয়ে তার অসম্মতি সত্ত্বেও তাকে বাঁচাতে পারতুম। কিন্তু তুমি যে দাম চাইছো, সেই দামে যদি আমি এঁর জীবন

ক্রম করি, তাহ'লে ইনি যা কিছু পছন্দ করেন বা যা' কিছু ভালবাসেন, সমস্তেরই এক সঙ্গে মৃত্যু হবে। দীপকে বাঁচাতে গিয়ে আগুনকে পাঁকে ডোবাতে পারবো না। একমাত্র যে মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে, সে মৃত্যু আমি তাঁকে দিতে পারবো না।

শিশু-চরিত্র অঙ্কনে মেতারলিঙ্ক সুনিপুণ। শোনা যায়, তাঁহার পূর্ব্বে ফরাসী নাট্যে নাকি শিশু-চরিত্র ছিল না। তাঁহার 'তিলতিল,' 'মিতিল', 'ইনিওল্ড' প্রভৃতি চরিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিক। পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা স্ত্রী-চরিত্র অঙ্কনে তিনি অধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

"জীবন ও ফুল," "মক্ষিকা জীবন" প্রভৃতি তাঁহার প্রকৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি বিশ্বসাহিত্যে যথেষ্ট সমাদৃত। গীতি-কবিতার বই তিনি মাত্র একখানি লিখিয়াছেন। পরে তাহাতে আরো পনেরোটি গান যোগ করেন। এই গ্রন্থ হইতে নিয়ে তাঁহার 'হায়' ও 'শীতের হাহাকার' নামক দুইটী কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইচ্ছা করার শক্তি যে নাই
করব কিবা হায়,
ইচ্ছা-তরী ঘাটে এসে
হায় গো ডুবে যায়!
হৃদয় অসহায়
কাজ কামাইয়ের গ্লানির পীড়ায়—
মলিন চোখে চায়।
হাতে নিয়ে কাজ সে যত
করিনি হায় শেষ,
তার হতাশে ফুরায় না মোর
ক্রন্দনের এই রেশ।
মন ঘুমায়—দেখ—
হায় ছুঁয়ে হাত কাঁপছে মিহাই
যন্ত্রণায় একশেষ।

যাদের ঠোঁটের কাঁপকয়াও জানল না চুম্বন,
তাদের দুখে কাঁদছে আমার মন,
তরা দুখের সরাই যারা বইছে বুকের পর
কাঁদছে, আহা! কাঁদছে নিরন্তর।
* * * *

ছেঁড়া মেঘের কাঁথায় আড়ে কাঁপছে শীতের চাঁদ,
ভুবন-ভরা ঘোর অবসাদ,
অসাড় মাটি, পাতলা ঘাসের সবুজ হ'ল লোপ,
ক্ষুধায় মত্ত জাগছে মনে ক্ষোভ। *

মেতারলিঙ্কের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। অনেকে তাঁহাকে "বেলজিয়ামের সেক্সপীয়ার" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ফরাসী সাহিত্য তাঁহার লেখায় গৌরবান্বিত। তিনি একজন আদর্শবাদী ও মরমী (Mystic)। তাঁহার অনেক নাটকে অন্ধকার ও বিষাদের ছায়া দেখা যায়; "অন্তঃপুর," "তাঁতাজিলের মৃত্যু" প্রভৃতিতে অদৃষ্টবাদের আভাস পাই; কিন্তু তাঁহার পরিণত বয়সের প্রধান সুর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা এবং অতীন্দ্রিয় ভাবপ্রবাহ। মানবাত্মাকে তিনি অপরূপ মহিমা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে দেখিয়াছেন। তাঁহার "দীনের সম্পদ" (Treasure of the Humble)-এ তিনি বলিতেছেন,—"এমন একদিন আসতে পারে, এবং সেদিন আসবার সূচনা দেখা দিয়েছে, যেদিন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিকটতর হ'বে। এমন কি জ্ঞানের সাহায্য না নিয়েও মানুষ নিজের অন্তরাত্মার সঙ্গেও নিকটতম হ'তে পারবে।" তিনি আশা-বাদী। তাঁহার মতে মানুষের অনন্ত আশা ও উৎসাহ থাকা উচিত। কেননা তাহার শক্তিও অনন্ত।

পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই মেতারলিঙ্কের গ্রন্থরাজির অনুবাদ পাওয়া যায়। বাংলায় তাঁহার অধিকাংশ নাটকের অনুবাদ হইলেও এখনো বহু জিনিষ তাঁহার নিকট হইতে লইবার আছে।

গার্হার্ট হাপ্টম্যান্
(Gerhart Hauptmann)

জন্ম—১৮৬২; প্রাইজলাভ—১৯১২।

পল্ হায়েসের মাত্র দুই বৎসর পরে পুরস্কার একজন প্রসিদ্ধ জার্মান নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক 'নোবেল' পুরস্কার লাভ করেন। ইঁহার নাম—গার্হার্ট হাপ্টম্যান্। সাইলি-

---

* 'অভি-গুঞ্জা'—সত্যেন্দ্রনাথ

সিয়ার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী সাল্জ্ব্রুণ নামক সহরে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতামহ তাঁতির কাজ করিতেন এবং স্বহস্তে তাঁত বুনিতেন। পিতার অবস্থা পিতামহ হইতে ভাল ছিল। তিনি তিনটি হোটেলের মালিক ছিলেন। মাতা সাধারণ গৃহস্থকন্যা। অল্পবয়সে ভাস্কর্য্য শিখিবার জন্য হাপ্ট্ম্যান্ ব্রেস্‌লো, জেনা ও ইতালির আর্ট স্কুলে প্রেরিত হন এবং আর্টের সহিত কৃষি ও ইতিহাস পড়িতে থাকেন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন না। একমাত্র তাঁহার ভ্রাতা কার্ল্ ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহার প্রতিভা বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ

গারহার্ট হাপ্ট্ম্যান্

উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন না। অল্পদিন পরেই তিনি স্থির করেন যে, তিনি ভাস্কর না হইয়া অভিনেতা হইবেন। কিন্তু তাঁহার এই ইচ্ছায় বাধা পড়ে। কারণ ১৮৮৫ সালে এক ধনী মহিলাকে বিবাহ করিয়া তিনি বার্লিনে যান ও সেখানে "স্বাধীন ষ্টেজ" আন্দোলনে যোগদান করিয়া নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি বায়রণের প্রভাব তখন তাঁহার উপর খুব বেশী ছিল।

১৮৮৯ সালে বার্লিনে "ফ্রী ষ্টেজ সোসাইটী" স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতাদিগের ভিতর অটোব্রাম্, ম্যাক্সিমিলান্ হার্ডেন্, থিওডোর্ উল্ফ্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বাস্তবপন্থী লেখকদিগের নাটকের অভিনয় করা ইঁহাদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই দলের প্রভাবে ও আব্-হাওয়ার ভিতর হাপ্ট্ম্যান্ যে নাটকগুলি লেখেন, তাহার মধ্যে "Lonely Lives," "The Weavers" ও "The Beaver Coat" প্রসিদ্ধ। উপরোক্ত নাটকগুলির ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টিকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। ইহা অপেক্ষা সত্য ও তীক্ষ্ণ ভাষা ইতিপূর্ব্বে লেখা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে মানুষের পাপ সম্বন্ধে পৌরাণিক ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। হাপ্ট্ম্যানের মতে পাপের বাস বিশ্বজগতে কিম্বা আইন ও নীতি গঠিত সমাজে,—মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নয়। তাঁহার নাটকের প্রধান পাত্রগণ সকলেই দুঃখভোগী। তাহাদের অপরাধ অপেক্ষা তাহাদের বিরুদ্ধে অপরাধ অনেক বেশী। তিনি বর্ত্তমান শ্রমিক ও সমাজ-সমস্যা যুগের লেখক। তাঁহার সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রবল।

"তাঁতিরা" (The Weavers) তাঁহার বাস্তব নাটকের ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে ব্যক্তিগতভাবে কেহই প্রধান পাত্র নয়। সমষ্টিগতভাবে তাঁতিগণ ও জনতাই নাটকের প্রধান চরিত্র। ধনী ব্যবসাদার ও গরীব তাঁতির গৃহের দৃশ্য, গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতা এবং শ্রমিকের দাসত্বের সুন্দর বাস্তব চিত্র ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বৃদ্ধ আন্সর্জের স্বগত-উক্তি অতীব মর্ম্মস্পর্শী। যদি রাজার কাছে তাহাদের দুঃখ জানানো যায়, তাহা হইলে তিনি যে উহার কোন প্রতিকার করিবেন না, ইহা তাহার নিকট একান্ত অবিশ্বাস্য। যখন Jaeger বৃদ্ধকে বলে যে এরূপ আবেদনে কোনই ফল হইবে না, এবং ধনীরা "শয়তানের মত ধূর্ত্ত," তখন যে গৃহে তাহার পিতা চল্লিশ বৎসর বাস করিয়া গিয়াছে, সেই গৃহ পরিত্যাগের জন্য বৃদ্ধের শোক ও দুঃখ হৃদয়দ্রাবী ও নাটকীয় ভাবের উচ্চ নিদর্শন। এই বইখানি গ্রন্থকার তাঁহার পিতা রবার্ট্ হাপ্ট্ম্যান্কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি বলিতেছেন, "বাবা, আপনি জানেন, কি মনের ভাব নিয়ে আমি এই বই আপনাকে উৎসর্গ কর্‌ছি। আপনার নিকট শোনা

আমার পিতামহের কাহিনী এই নাটকের ভিত্তি। তিনি যৌবনে গরীব তাঁতি ছিলেন। এর জীবনীশক্তি আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমার মত গরীবের এর চেয়ে বেশী দেবার সামর্থ্য কোথায়?"

নাট্যকাব্যের ভিতর হাপ্ট্ম্যানের "মগ্নঘণ্টা" (Sunken Bell) ও "Hannele" প্রসিদ্ধ। Hannele প্রকাশিত হইবার পর এই নাটক জার্ম্মানীতে তীব্র আলোচনার সৃষ্টি করে। ইহার অভিনয়ের বিরুদ্ধেও আন্দোলন হয়। ১৮৯৪ সালে নিউইয়র্কের "অ্যাভিনিউ" থিয়েটারে Hannele অভিনয়ার্থ আসে। নানা দলের সংস্কারকেরা নাটকখানি না পড়িয়াই উহার বিরুদ্ধে বলিতে আরম্ভ করেন এবং নাট্যকার, প্রকাশক, অনুবাদক ও প্রধানা অভিনেত্রীকে অভিনয়ের দিন গ্রেপ্তার করিবার ভয় প্রদর্শন করেন। অগত্যা একদিন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, সমালোচক ও গ্রন্থকারদিগের সম্মুখে ইহার অভিনয় প্রদর্শিত হয় এবং পরদিন প্রভাতে দু'একজন ব্যতীত সকলেই নাটকখানির উচ্চ প্রশংসা করিয়া প্রবন্ধ লেখেন। এই পুস্তকে দাতব্যালয়ের হীন চিত্রের সহিত মুমূর্ষু Hannele-এর পরম রমণীয় স্বপ্ন একত্র মিলিত হইয়াছে। হাপ্ট্ম্যান্ এই নাটকখানিকে বলেন 'স্বপ্নকাব্য'। ইহা লিখিয়া তিনি জার্ম্মানীর Grillparzer পুরস্কার লাভ করেন।

'Hannele'-এর দুই বৎসর পরে রূপক কাব্য "মগ্নঘণ্টা" প্রকাশিত হয়। কবিত্ব ও উচ্চ কল্পনা-শক্তির পরিচয় এই গ্রন্থে বিদ্যমান। বহু সমালোচকের মতে এখানি তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক ও 'নোবেল' পুরস্কার লাভের প্রধান কারণ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী হইতে না পারায় শিল্পীর জীবনের করুণ কাহিনী এই নাটকের আখ্যান-বস্তু। ঘণ্টা-প্রস্তুত কারক হেন্রিক্, তাহার সাধ্বী পত্নী মাগ্দা, প্রকৃতির প্রতীক রাউটেন্ডেলিন্, বিজ্ঞ মহিলা উইটিকিন্, গ্রামের পাদরি ইহাদের সকলেরই চরিত্র জীবন্ত।

"মগ্ন-ঘণ্টা"র (Sunken Bell) অর্থ কী? মিঃ Meltzer—"মগ্নঘণ্টা"র ইংরাজী অনুবাদক—ইহার তিনটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, প্রত্যেক প্রকৃত শিল্পীই তাহাদের আদর্শের কাছাকাছি যাইতে চেষ্টা করে, দৃষ্টান্ত যাহা ইহাই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, আদর্শ-সমাজ গঠনের জন্য স্বপ্নদর্শী ও আদর্শ-বাদী সংস্কারকের একান্ত চেষ্টা; এবং তৃতীয়তঃ, সত্য ও আলো অনুসন্ধানের জন্য মানবাত্মার প্রাণপণ যত্ন।" সৌন্দর্য্য ও রস-সৃষ্টিতে 'মগ্নঘণ্টা' বিশ্বসাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক।

১৯০২ সালে তাঁহার "Henry of Aue" প্রকাশিত হইলে অনেকে ইহাকে "মগ্নঘণ্টা"র উপসংহার বলেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। নাটক দুখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভগবানকে অসম্মান করার জন্য যশের শিখরে আসীন নায়ক হেন্রিকের কুষ্ঠব্যাধি হয়। ঘৃণা ও নৈরাশ্য হইতে আত্মাকে মুক্ত করিয়া প্রকৃতি ও জীবনের উপকারকে অনুভব করিতে সক্ষম হইলে তবে সে সুস্থ হইয়া উঠে। এই নাটকের হেন্রিক্, গট্ফ্রেড্, ব্রীজীটা এবং কৃষক কন্যা ওটেজেবির চরিত্র অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত। নাটকীয় আর্টের দিক হইতে ইহা Hannele কিম্বা "মগ্ন-ঘণ্টা"র সমকক্ষ নয়। কিন্তু প্রথম দৃশ্যে পরিত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হেন্রিকের শোচনীয় অবস্থা হইতে শেষ দৃশ্যে প্রেমের মহিমায় তাহার পুনর্জন্ম লাভ হওয়া পর্য্যন্ত পাঠকের ঔৎসুক্য এই নাটকে সমান-ভাবে প্রবল থাকে।

"পার্সিভাল"এ মানবজাতির উপর সহানুভূতিপূর্ণ গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। নায়কের চরিত্র নাট্যকারের একটি রমণীয় সৃষ্টি। ইহাতে শ্লেষ ও পরিহাসের চিহ্ন আছে।

সাইলিসীয়ার পাহাড়ের উপর "And Pippa Dances"-এর ঘটনা সংস্থাপন ছবির মত সুন্দর। পিপ্পার চরিত্র স্বাভাবিক। তবে ইহার কতকগুলি দৃশ্যে নাটকীয় ঐক্যের অভাব দেখা যায়।

হাপ্ট্ম্যানের উপন্যাসের ভিতর "The Fool in Christ", "Phantom", "The Heretic of Soana" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। নির্ভীক বিদ্রূপ ও সরস সমাজ-সমস্যা প্রদর্শনে তাঁহার "The Island of the Great Mother." পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে। এই "মহিলারাজ্যের" নেত্রীগণ চাতুর্য্য ও শ্লেষের সহিত নিপুণভাবে চিত্রিত

হইয়াছে। উক্ত দ্বীপের একমাত্র পুরুষ "ফাওন" বহু দুঃসাহসিকতার পর তাঁহার মানসী-নারীকে খুঁজিয়া পাইয়াছিল।

নাটক রচনায় হাপ্ট্‌মান্‌ বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বাস্তব, রূপক প্রভৃতি নানাজাতীয় নাটক আছে। তিনি বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। চরিত্র চিত্রণেই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতা। কোন জীবিত নাট্যকারই এত বিভিন্নরূপের জীবন্ত নরনারী সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, জমাট আখ্যানবস্তু ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ আব্‌হাওয়া তাঁহার নাটকের বিশেষত্ব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম প্রাইজলাভ

এসিয়া মহাদেশ হইতে সর্ব্বপ্রথম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শাশ্বত বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টির জন্য 'নোবেল' পুরস্কার লাভ করেন এবং বাঙ্গালী জাতি ও ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। ইংরাজী ১৮৬১ সালের ৬ই মে, বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫এ বৈশাখ, কলিকাতার জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বাঙ্গালী মাত্রেরই সুপরিচিত। সাত ভাই ও তিন ভগ্নীর মধ্যে তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। সাত আট বৎসর বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহাদের পরিবারে সাহিত্যচর্চ্চা ও সঙ্গীতালোচনার বিশেষ প্রাচুর্য্য ছিল; কবি এই আব্‌হাওয়ার মধ্যেই মানুষ হন। তাঁহার বাল্যকালের সুন্দর চিত্র তাঁহার লিখিত "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কবির বয়স যখন ষোল বৎসর, সেই সময় তাঁহাদের বাড়ী হইতে "ভারতী" মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। ইহাতে তাঁহার অনেক বাল্যরচনা আছে। "কবি-কাহিনী" নামক একখানি কাব্য তাঁহার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। ইহার পর ক্রমান্বয়ে "রুদ্রচণ্ড", "বনফুল" ও "ভগ্নহৃদয়" প্রকাশিত হয়। এগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু শৈশব-রচনা হইলেও বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার নিবিড় যোগ এই সকল গ্রন্থে সুস্পষ্ট।

"মানসী," "সোনার তরী," "চিত্রা," "ক্ষণিকা" ও "খেয়া" তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। তিনি গীতিকবিতার রাজা এবং 'কবিদিগের কবি' নামে অভিহিত। তাঁহার "উর্ব্বশী"র মত কবিতা বিশ্বসাহিত্যেও আর আছে কিনা সন্দেহ। সৌন্দর্য্যের রাণী উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

"বৃন্তহীন পুষ্প সম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশি!
আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড ল'য়ে বাম করে;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত।
কুন্দ শুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা।
* * * * *
যুগযুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশি!
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে,
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।"

১৯০৯ সালে "গীতাঞ্জলি" প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতে তিনি pure কবিতা পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাত্মভাবপূর্ণ (Mystic) কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ইউরোপের লোকে বিশেষ করিয়া তাঁহার এই শ্রেণীর কবিতাতেই মুগ্ধ হইয়াছে। গীতি-কবিতার ভিতর দিয়া তিনি ভারতীয় দর্শন ও বৈষ্ণব তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। উপনিষদ্‌ তাঁহার দর্শনের ভিত্তি।

পরবর্ত্তী কালের কাব্যগ্রন্থের ভিতর "বলাকা" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার "তাজমহল" কবিতা অতুলনীয়। ছন্দের নূতনত্বে গল্প-কবিতার পুস্তক "পলাতকা" উল্লেখযোগ্য। ইহা অসমছন্দে রচিত। ইহার "ফাঁকি", "মুক্তি" প্রভৃতি কবিতা অপূর্ব্ব।

—ছোটগল্প—

ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। তাঁহার "ক্ষুধিত পাষাণ", "জীবিত ও মৃত", "খোকাবাবু", "কঙ্কাল", "কাবুলিওয়ালা," "অতিথি," "পোষ্টমাষ্টার" প্রভৃতি গল্পগুলি কেবল বাংলা

সাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যেও উচ্চস্থান অধিকার করে। তাঁহার অধিকাংশ গল্পই করুণ-রসাত্মক। "কাবুলিওয়ালা"র গরীব ও দুর্দ্দান্ত কাবুলি চরিত্রের কোমল অংশটি কী সুন্দর ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। "অতিথি"তে প্রকৃতির সহিত মানুষের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা দেখানো হইয়াছে। এই আকর্ষণ যে কিরূপ তীব্র, তাহা 'তারাপদের' জীবনে সুস্পষ্ট। গৃহ, মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ, এমন কি প্রেমও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। অল্পবয়স হইতেই সে বন্ধন সহ্য করিতে অনভ্যস্ত। প্রকৃতির কোলেই সে ফিরিয়া গেল। "ক্ষুধিতপাষাণ" ও "কঙ্কালে" গল্পাংশ বা চরিত্রসৃষ্টি নাই, কিন্তু ইহার রহস্যপরায়ণতা আমাদিগকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া তোলে। "পোষ্ট-মাষ্টারে" রতনের মৌন-বেদনায় পাঠকের চক্ষুও অশ্রু-সজল হইয়া উঠে।

তাঁহার "কণিকা" বাংলা সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি। বিশ্ব-সাহিত্যে একমাত্র টুর্গেনিভের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার তুলনা করা যাইতে পারে। এগুলি গদ্য-কবিতা। একটি ভাব বা একটু ছোট্ট ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া লেখা। তাঁহার "প্রশ্ন", "গ্রীষ্ম", "প্রথম শোক" প্রভৃতি কথিকাগুলি হীরকখণ্ডের মত সমুজ্জ্বল।

—উপন্যাস—

"বৌ ঠাকুরাণীর হাট" ও "রাজর্ষি" ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়া লেখা উপন্যাস। এই "রাজর্ষির" আখ্যান-বস্তু লইয়া পরে তিনি তাঁহার বিখ্যাত নাটক "বিসর্জ্জন" লিখিয়াছিলেন। ইহার পর "চোখের বালি" ও "নৌকাডুবি" প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "গোরা" ও "ঘরে-বাইরে"। আর্টের দিক দিয়া "গোরা" অনিন্দনীয়। এরূপ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর নাই। "ঘরে-বাইরে" আদর্শবাদী ও বাস্তবপন্থীর বিরোধের চিত্র। পরিণামে ইহাতে "নিখিলেশের" উদারতা, ত্যাগ, ধৈর্য্য ও সংযমের জয় প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি "যোগাযোগ" ও "শেষের কবিতা" নামক দুইখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। "যোগাযোগ"-এর চরিত্র-সৃষ্টি ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ অনন্য-সাধারণ।

—নাটক—

প্রথম যুগের নাটকের মধ্যে কবির "রাজা ও রাণী" অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁহার "চিত্রাঙ্গদা" সৌন্দর্য্যের ও কবিত্বের চরম নিদর্শন। কিন্তু "ডাকঘর", "ফাল্গুনী," "রাজা," "মুক্তধারা," "রক্তকরবী" প্রভৃতি রূপক নাটকগুলিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা—ইহাই অনেকের অভিমত। "ডাকঘরে" একটি চিরন্তন সত্যের সাক্ষাৎ পাই। অমলকে তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা ঘরে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহার মন অজানার ডাক শুনিয়াছে, সে "সুদূরের
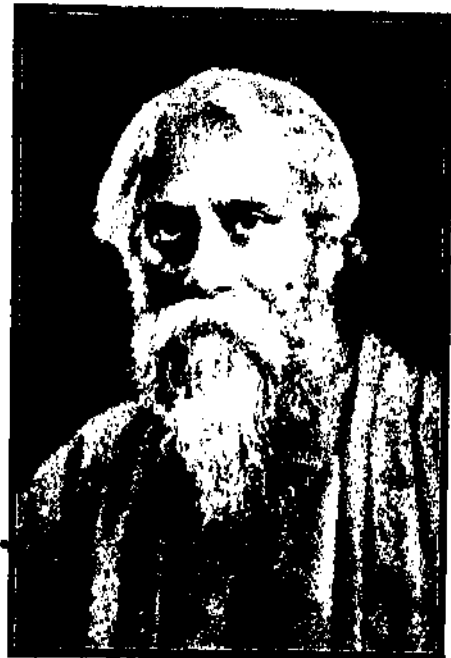
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিয়াসী"। "মুক্ত-ধারা" ও "রক্ত-করবী" আধুনিক ইউরোপের সমস্যা—যাহা ভারতবর্ষেও প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে—সেই জড় সভ্যতা ও শ্রমিক সমস্যা লইয়া লেখা। "রক্ত-করবী"র 'নন্দিনী' চরিত্র কবির একটি অপরূপ সৃষ্টি। এই নাটকের প্রধান সুর নিম্নলিখিত গানটিতে সুপরিস্ফুট।

> পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয়রে চলে',
> আয়, আয়, আয়।
> ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
> মরি, হায়, হায়, হায়।

—শিশু-সাহিত্য—

শিশু-সাহিত্যে তিনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার "জন্মকথা," "কেন মধুর," "অপযশ", "কাগজের নৌকা" প্রভৃতি কবিতাগুলি বাৎসল্য-রসে অপরূপ রমণীয়। সৌন্দর্য্যে ও দার্শনিকতায় "জন্মকথা"র মত কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যে খুব বেশী নাই।

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
"এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?"
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে,—
"ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে !"

তাঁহার "অপযশ"-এ মাতা পুত্রকে বলিতেছেন—

বাছারে, তোর চক্ষে কেন জল ?
কে তোরে যে কি বলেছে
আমায় খুলে বল্ !
লিখ্‌তে গিয়ে হাতে মুখে
মেখেছ সব কালী,
নোংরা ব'লে তাই দিয়েছে গালি !
ছি ছি উচিত একি !
পূর্ণশশী মাখে মসী—
নোংরা বলুক দেখি !

—সঙ্গীত—

সঙ্গীতেও তাঁহার দান অপর্য্যাপ্ত। শিক্ষিত মনের উপযোগী সঙ্গীতের বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক। মোটামুটি তাঁহার সঙ্গীতের তিনটী স্তর আছে। প্রথম স্তরে, তিনি ওস্তাদী সুরের সহিত মিলাইয়া কথা রচনা করিতেন। দ্বিতীয় স্তরে, কথা রচনা করিয়া তবে তাহাতে মূল হিন্দুস্থানী সুর বসাইতেন। তাহাতে সুর ও তালের সামান্য অদল বদল করিতে হইলেও দ্বিধা করিতেন না। তৃতীয় স্তরে, কথা ও সুর এমনি মিশিয়া গিয়াছে যে, কে আগে কে পরে তাহা চিনিবার উপায় নাই। তাঁহার এই স্তরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মিশ্রণ হইয়া এক অনুপম সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সুর ও সঙ্গীত তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। ড্রামাটিক্ মিউজিক্‌ও তিনি বাংলায় আনিয়াছেন "মায়ার খেলা" ইহার একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আমাদের সঙ্গীতে করুণ সুরই প্রধান। তিনি নানারূপ সুর-বৈচিত্র্যের ও সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার "পথভোলা এক পথিক এসেছি", "এস এস বসন্ত ধরাতলে" এবং "ফাল্গুনী"র অনেক গান ইহার দৃষ্টান্ত।

—স্বদেশ-প্রেম—

কবির স্বদেশ-প্রেম গভীর। তাঁহার বহু কবিতায় ও গানে ইহা সুপরিস্ফুট। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি 'অন্ধ' নহেন। স্বদেশের ও সমাজের যে সব দোষ ত্রুটি তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে, তাহাকেই তিনি কঠোর আঘাত করিয়া সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক সময় দেশবাসীর অপ্রিয়ও হইতে হইয়াছে। জালিয়ানওয়ালা-বাগের নৃশংস ও লজ্জাজনক ঘটনার পর তিনি তাঁহার "সার" উপাধি পরিত্যাগ করিয়া বড়লাটকে যে চিঠিখানি লেখেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণা ও প্রবল দেশাত্মবোধ প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনিই প্রথম গবর্ণমেন্টের ব্যবহারের প্রতিবাদ স্বরূপ সরকারি খেতাব বর্জ্জন করেন। অল্পদিন পূর্ব্বে যখন কানাডা হইতে তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল, তখনও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই, কারণ কানাডায় তাঁহার স্বদেশবাসীর অবস্থা অত্যন্ত অসম্মানজনক। বহুকাল পূর্ব্বে লিখিত 'নৈবেদ্য' নামক কাব্যগ্রন্থে তিনি কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছেন—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর করি দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়,—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্ব্বলের এ পাষাণ ভার,
এই চির পেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্য-মর্য্যাদাগর্ব্ব চির পরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর কর। মঙ্গল প্রভাতে—
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

পরবর্ত্তী কালে তাঁহার "দেশ দেশ নন্দিত করি" নামক বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীতটিতে তিনি পুনরায় বলিতেছেন—

নূতন যুগ-সূর্য্য উঠিল, ছুটিল তিমির-রাত্রি
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কৈ?
গত-গৌরব হৃত-আসন নত-মস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর, নর-সমাজ মাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে।

শিক্ষা, সমাজ, স্বদেশ, ধর্ম্ম, সমালোচনা প্রভৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। জাতি-গঠনের পক্ষে ঐ সকল প্রবন্ধ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে ও করিতেছে। তাঁহার "পঞ্চভূতের ডায়ারী" একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহাতে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সতেরো খণ্ড "শান্তিনিকেতন" চিন্তাশীল ও ধর্ম্ম-পিপাসুদিগের আদরের বস্তু।

পত্র-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান পাশ্চাত্য সাহিত্যিক হায়েন, ফ্লোবেয়ার প্রভৃতির অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। তাঁহার "ছিন্নপত্র" সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ সুন্দর রচনা।

—জীবনী—

বাইশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। দাম্পত্য-জীবনে তিনি পরম সুখী ছিলেন। বাংলা ১৩০৯ সালে পত্নীর মৃত্যুতে তাঁহার গভীর বেদনা "স্মরণ" নামক কাব্য-গ্রন্থখানির প্রতি কবিতাতেই বিদ্যমান।

১৯১২ সালে "গীতাঞ্জলি"র ইংরাজী অনুবাদ বাহির হইলে পাশ্চাত্য দেশসমূহে তাঁহার লেখার আদর হইতে থাকে। ১৯১৩ সালে "নোবেল" প্রাইজ পাওয়ার পর তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়েন। তৎপূর্ব্বেই তাঁহার পঞ্চাশৎ জন্মতিথিতে বাঙ্গালী জাতি তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া উৎসব করিয়াছিল। 'নোবেল' পুরস্কার পাওয়ার পর ১৯১৪ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'স্যর' উপাধি দেন এবং লর্ড হার্ডিং "এশিয়ার রাজকবি" নামে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "ডক্টর" উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। "কবির পূজা সর্ব্বদেশে" এই উক্তির সত্যতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে।

তাঁহার "বিশ্বভারতী"র নাম আজ আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাহারও অজ্ঞাত নাই। ইহার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। জগতের সকল জাতির মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ও সহযোগিতা "বিশ্ব-ভারতী"র আদর্শ। "নোবেল" পুরস্কারের টাকা এবং তাঁহার সমগ্র বাংলা গ্রন্থাবলীর আয় রবীন্দ্রনাথ "বিশ্বভারতীকে" দান করিয়াছেন। তাঁহার আশা আছে, একদিন এই ভারতবর্ষই বিশ্বমানবের মহাসম্মিলন-ক্ষেত্র হইবে।

সম্প্রতি তাঁহার অঙ্কিত চিত্র-প্রদর্শনী পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে আদরণীয় হইয়াছে। ইউরোপীয় আর্ট সমালোচকেরা চিত্রগুলির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই সকল চিত্রে কবির দার্শনিকতা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাশালী সাহিত্যস্রষ্টা সম্বন্ধে নানা দিক দিয়া আলোচনা হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষায় সেরূপ কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী এরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক। শুধু বর্ত্তমান জগতের কেন, তিনি সর্ব্বযুগের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের অন্যতম। বাঙ্গালী জাতি তাঁহাকে পাইয়া ধন্য ও তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে গাহিয়াছেন—

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমিয়া দত্ত

যুগান্তরের কথা

-উপন্যাস

—শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী

নবপরিচয়

—যাত্রীরা তব বিস্মৃত পরিচয় !
মৃন্ময় এসে ঐ হেসে হেসে ভরি দিল তব শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয় ।
ভিত্তিরন্ধ্রে বাজে আনন্দে ঢাকি দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয় জয় ।

ফুলশয্যা এবং "মুরলীর ধার শোধা" অথবা পূজার পরে বিবাহ বাড়ীর জমাট ভাব যেন একটু ফাঁকা হইয়া আসিয়াছিল। পাড়ার সধবারা নিজ নিজ গৃহকর্ম্মে মন দিয়াছে। "সুবচনীর কথায়" গরীব ব্রাহ্মণ বালকের রাজার বাড়ী রাখালির কাহিনী এবং রাজবাড়ীর খোঁড়া হাঁসের ইতিবৃত্তের সঙ্গে কোঁচড় ভরিয়া খইমুড়কি মোওয়া পাইয়া পাড়ার বালক বালিকারাও পরিতুষ্ট ভাবে কয়দিন নিশ্চিন্তে খেলায় মন দিয়াছিল, ইতিমধ্যে নববধূর 'ধুলপায়ে লগ্ন' অথবা শ্বশুর গৃহ হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য অন্য বাড়ী গিয়া আবার শ্বশুর গৃহে আসা, দ্বিরাগমন অভিনয়ের এই সংবাদে তাহারা সজাগ হইয়া উঠিল এবং প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই নব বধূর অনুযাত্রী হিসাবে গিয়া তাহার সঙ্গ ধরিল। প্রয়োজন মত কালে যদি দ্বিরাগমনের দিন না পাওয়া যায় তাই বিবাহের অষ্টাহের মধ্যেই এই গমনাগমনে পঞ্জিকার "শুভদিনের নির্ঘণ্ট"কে ফাঁকি প্রদর্শনের ব্যবস্থা।

খুড়্ শাশুড়ী বলিলেন, "কোন্ বাড়ীতে বৌমাকে পাঠাই বলত বড় বৌমা।" সবাই আত্মীয়। পাছে কেহ ক্ষুণ্ন হন তাঁহার এই ভয়! বড় দিদি বলিলেন, "একি আর জিজ্ঞাসার কথা বাছা? নিজের জেঠিমাই রয়েছে যখন বৌয়ের!"

"তা বটে! কৃষ্ণ প্রিয়াকে একটু খবর দেবে কি? তাঁর তো ঠাকুরতলাতেই বেশীর ভাগ কাটে! কিশোরীকে বলনা ব'লে আসুক। তোমার কিশোরীর কিন্তু টিকি দেখ্‌বার জো নেই! দিন রাত পিসীর বাড়ী! এই দ্যাখ বাপু, এতেই বলে "যে গাছের বাকল সেই গাছেই গিয়ে জোড়া লাগে"! তুমি যে এত ক'রে মানুষ কচ্চ কিন্তু নিজের গন্ধ পাওয়া মাত্র সেইখানে অতটুকু বালকেও ছোটে।"

বড় দিদি একটু যেন ম্লান হাস্যে বলিলেন, "সে তো সত্যিই, কিন্তু ও পাগ্‌লিটা এখনো হয়ত জানেইনা, কিম্বা কেউ কিছু বল্লেও মনে নিতে শেখেনি। হেসেই অস্থির হয়, বলে এরা সব পাগল নাকি? আমি কিছু বল্‌লে রেগে আমায় মেরেই বসে দু চারঘা! ও. বাড়ীতে তার পিসির কাছেত সে যায়না, তার যত ঝোঁক্ রাধার ওপরে। সে যা হুকুম করবে বায়না ধরবে রাধা তাই করবে—এই তার রাধার ওপর জুলুমের শেষ নেই। নিজের পিসির ধারও ধারেনা সে। সে যে'সেনা ব'লে ঠাকুরঝিও কোন একটু কিছু বলা বা আপনার ভাবে কাছে টানা কিছু কোন দিন করেন না। তিনিও যেন পাঁচ জনের মতই একজন! বরং তাঁর পিসি বুড়ি একটু বক্ বক্ করে! ঠাকুরঝির একেবারেই যেন নিঃসঙ্গ ভাব! তাঁর কাজে আর মনে চিরদিনই তো এক। ওঁর মত মানুষ কি হয়!"

খুড়িমা একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "তা সত্যি! তুমিই তো বাপু সেদিন অভিমান করছিলে যে মেয়ে বড় হচ্চে তা আপনার লোকে খোঁজ রাখেনা। কৃষ্ণপ্রিয়া জানে ও তোমারি মেয়ে, তোমারই ওপর ওর সব ভার।"

"সেতো আমিও বুঝি খুড়িমা, তবু আমাকে ভেবে চল্‌তে হয়! ওঁর মত না নিয়ে কি আমি কিছু করতে পারি? "ভাল করতে ভগবান আর মন্দ করলে অমুক"! জানতো 'ডাকের' কথা!"

বড় বধূ কন্যার সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরিয়া শেষে কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর আবাসের দিকেই চলিলেন। বাড়ীখানি মাটির। মাঝে পরিষ্কার নিকানো বিস্তৃত উঠান, পড়িলে সিন্দুর তুলিয়া লওয়া যায়। চারিদিকে চারিখানি বড় বড়

মাটির ঘর। খড়ের চাল, সুন্দর আলিপনা দেওয়া দেওয়াল। ধারি-বাঁধা উঁচু দাওয়া। একখানি দাওয়ায় একটা চরকা লইয়া বসিয়া একটী বৃদ্ধা একমনে সূতা কাটিতেছেন। উঠানে একটি পেয়ারা গাছ আর তাহারই একটী নীচু ডালে শ্রীমতী কিশোরী আরোহণ করিয়া বৃক্ষ-নিম্নস্থিতা কাহাকেও সগর্জ্জনে আদেশ করিতেছেন, "ঐ যে কেমন সুন্দর ডাঁসা; আমি যে উঠ্‌তে জানি না! হাঁ, তুমি পড়তে পারবে, নিশ্চয় পারবে। ওঠোনা বল্‌ছি, শীগ্‌গির ওঠো, নৈলে ভাল হবেনা কিন্তু!"

"কি ভাল হবেনা শুনি? তোরও যেমনি আদর দেওয়া রাধা, তেমনি খুব হচ্চে! নে, ওঠ্, মেয়ের আব্‌দার রাখ্‌তে গাছেই ওঠ্ এইবার!"

রাধা এতক্ষণে সহানুভূতির লোক পাইয়া বাঁচিল! "দেখুন দেখি বৌ ঠাকরুণ—"

"তাইত! তাই ব'লে অমন পেয়ারাটা বাদড়ে খেয়ে যাক্ আর কি রাত্তিরে? সে হবেনা পিসি, তোমার পাড়তেই হবে যেমন ক'রেই হোক্। মা তুমি যাও তো এখান থেকে।"

মা অর্থাৎ বড় বধূ সহাস্যে বলিলেন, "আচ্ছা যাচ্ছি বাপু! ঠাকুরঝি কইলো রাধা? পিসি ঠাক্‌রুণ তো কানেই শুনতে পাবেন না, কে ওঁর সঙ্গে চেঁচাবে!"

"নাইতে গেছেন, আস্‌বার সময় হয়ে এল। কেন বৌ ঠাক্‌রুণ?"

"আমাদের কনে বৌকে ওবেলা এইখানেই দ্বিরাগমন করতে আনব।"

দ্বারের নিকট হইতে কে ডাকিল, "জেঠিমা"? উভয়ে যুগপৎ চাহিয়া দেখিল একটি স্কন্দপ্রতিম যুবা দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কিশোরী বৃক্ষারূঢ় অবস্থাতেই বলিয়া উঠিল, "ঐ কে এসেছে পিসি, ওকে দিয়েই পাড়ানো যাক্। এই দিকে এসো ত! দ্যাখ, ওই যে ডাল্‌টা বেটার ভেতর দিয়ে ঐ সরু ডাল দুটো চ'লে গিয়েছে, ওরই আগায় ঐ পাতার গোছা দিয়ে ঢাকা একটা সুন্দর পেয়ারা, দেখেছ ত"? বড় বধূ ও রাধা সলজ্জে কিশোরীকে বাধা দিবার পূর্ব্বেই যুবক আগাইয়া গাছ তলায় আসিয়া ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া বলিল, "কই? দেখ্‌তে পাচ্চিনা তো?" "ও-ই যে পাতার আড়ালে, ঐ? এইবার দেখেছ ত?" "না!" "তাও দেখ্‌তে পেলেনা? তবে তোমার কর্ম্ম নয়! কাকে দিয়ে পাড়াই তাহ'লে? আমি যে ছাই গাছে চড়্‌তে জানিনা! পাড়ার কোন' ছেলেদের ডাকনা!" বড় বধূ এইবার অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কাকে ফর্‌মাস্ করছিস তা দেখেছিস? তোর পিসিমার ছেলে, তোর দাদা হন্! নেমে প্রণাম কর!" কিশোরী সেই অবস্থাতেই একটু ফিরিয়া দেখিয়া অম্লান মুখে বলিল, "কনিষ্ঠের দাদা, আমার কেন হবে? পেয়ারাটা পাড়িয়ে তবে নামব। ও রাধা পিসি ডাকনা কাউকে।" বড় বধূ তাঁহার দিঙ্গি মেয়ের কাণ্ড দেখিয়া লজ্জায় সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "তোমার জেঠিমা স্নান করতে গেছেন! দাওয়ায় উঠে বস।"

"বসছি, আগে পেয়ারাটা পাড়া যাক্!" রাধার দিকে চাহিয়া যুবা বলিল, "একটা আঁক্‌সি দিতে পারেন? কিম্বা ঐ রকম লম্বা মতন একটা কিছু।" কিশোরী ভ্রূভঙ্গের সহিত বলিল, "আঁক্‌সি দিয়ে? ওঃ ওতো সবাই পারে।" রাধা আর কথা না বাড়াইয়া একটী আঁক্‌সি আনিয়া দিবামাত্র কিশোরী বৃক্ষকাণ্ড হইতে নামিয়া পড়িয়া সেটী হস্তগত করিল। নিলজ্জা মেয়ের প্রগল্‌ভতা দেখিয়া সকলের তখন না হাসিয়া গত্যন্তর ছিলনা। কুটুম্ব যুবার সামনে কন্যাকে বেশী তিরস্কার করিতে না পারিয়া বড়বধূ এতক্ষণ মনে মনে রাগে ফুলিতেছিলেন, এইবার হাসিয়া ফেলিলেন। কিশোরী আঁক্‌সি লইয়া বৃক্ষশাখার সঙ্গে লড়ালড়ি করিতে লাগিল, ইতিমধ্যে অঙ্গনে কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী আসিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার নির্জ্জন গৃহে জন-সমাগম দেখিয়া তিনি একটু সন্ত্রস্ত হইয়া বড় বধূর দিকে চাহিলেন। বড় বধূ বলিলেন, "কনে বৌকে তার জেঠিমার কাছেই দ্বিরাগমনের জন্য আজ রেখে যাবেন। খুড়িমা তাই আজ বল্‌তে পাঠালেন ঠাকুর্ঝি!" যুবা ঈষৎ যেন আনন্দের স্বরে বলিয়া উঠিল, "সুবর্ণকে! কখন্?" তার পরে জেঠিমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "কাল তাকে নিয়ে আপনাদের এখান থেকে যাব জ্যেঠাইমা! তাই আপনাকে বল্‌তে এসেছি!" জেঠিমা মৃদুস্বরে বলিলেন, "কখন?" "পাল্‌কী নিয়ে আমাদের লোকজন এলেই,—বোধ হয় বিকেলে।" জেঠির প্রশ্নের উত্তর দিয়া

যুবা আবার বৃক্ষতলে আগাইয়া গিয়া সহাস্তে কিশোরীর হাত হইতে আঁকসিটা লইবার জন্ত হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল, "হয়েছেত! এইবার আমার দাও,—পেড়ে দি"!

অপমানে কিশোরীর শুভ্র সুন্দর মুখ গোলাপ ফুলের মত হইয়া উঠিল। এক সট্‌কার আঁকসিটাকে অপর দিকে লইয়া সক্রোধে বলিল, "আমি যতক্ষণে হয় পাড়ব, তোমার কি? তোমাকে কে ডেকেছে সর্দারি করতে?" যুবা ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমিই ডাক্‌লে!"

"সে বুঝি আঁকসি দিয়ে বাহাদুরী কর্‌তে? গাছে চড়তে জানেন না, কিছু না!" যুবার বোধহয় বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্ত হাত পা নিস্‌পিস্‌ করিতেছিল কেবল স্থান কাল পাত্রের সম্বন্ধে সে সে ইচ্ছাকে মনে মনে দমন করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রিয়াকে উদ্দেশ করিয়া বড় বধূ বলিলেন, "কি দস্যি মেয়ে! যতীনের সঙ্গে বুঝি খুব আলাপ হয়েছে? তাই এত জোর দস্ত!" রাধা মৃদু হাসিয়া বলিল, "ওকি বেশী কম আলাপের তোয়াক্কা রাখে? ওর স্বভাবই ঐ!" দাওয়ায় বসিয়া বৃদ্ধা এতক্ষণ চরকা কাটা স্থগিদ রাখিয়া নিজ মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিলেন, এখন বড়বধূকে নিকটে আসিতে দেখিয়া একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "কি বেহায়া মেয়েই ক'রে তুলেছ বৌ! সহরে কি এমনি শেখায়? এ যে আমাদের পাড়া গাঁয়ের মেয়েদের শতগুণ বেহদ্দ! অতবড় ধাড়িমেয়ে—একটা বেটাছেলে দেখেও সমীহ নেই, যেন মেয়েমানুষই নয়! সমান বাহাদুরি চালাচ্ছে! মেয়ের খুরে দণ্ডবৎ মা"! বড়বধূকে একটু অপ্রস্তুত হইতে দেখিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া পিসির কর্ণের নিকটে মুখ লইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "রক্তের গুণে হয়েছে পিসি, বংশের স্বভাব কি যায়? এই বাড়ীরই তো মেয়ে!" কথাটা অবশ্য সকলেই শুনিতে পাইল এবং পিসিও দ্বিগুণ রাগে গরগর করিতে লাগিলেন।

বড় বধূর দিকে চাহিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন, "ছোট বৌকে একটু পাঠিয়ে দিও, একটু খাবার দাবার করবে, রাধা তাকে গুছিয়ে দেবে সব।" সকলেই জানিত কৃষ্ণপ্রিয়ার পূজাহ্নিক সারিতেই অপরাহ্ন হইয়া যায়! বৃদ্ধা পিসিকে খাওয়াইয়া তিনি নিজের জপতপের জন্ত শিবের কোঠায় কিম্বা কালীতলায় চলিয়া যান্। আজও তাহার অন্যথা হইবে না। কৃষ্ণপ্রিয়া এবার পেয়ারা গাছতলায় গিয়া পরিশ্রমের ঘর্ম্মেও লজ্জায় আরক্ত বালিকার হস্ত স্পর্শ করিয়া নিজের সেই শান্ত স্বরে বলিলেন, "আঁকসিটা যতীনকে দাও সে পেড়ে দিক্!" তাঁহার স্পর্শেরই গুণে কিম্বা কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে বালিকার হস্ত হইতে আঁকসি নামিয়া পড়িল। যুবার পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া সে একটু সরিয়া দাঁড়াইতেই যতীন্দ্র অগ্রসর হইয়া তাহার হস্ত হইতে আঁকসি লইল। তখন তাহার মুখে আর সে পরিহাসের মৃদু হাসি নাই। গুরুজনের আদেশপালনের মত সম্ভ্রমসূচক ভাবে সে কৃষ্ণপ্রিয়ার নির্দেশ মত দুএক ঝট্‌কাতেই পেয়ারাটা পাড়িয়া ফেলিল। কৃষ্ণপ্রিয়া কিশোরীর পানে আবার চাহিতেই সে অতি লক্ষ্মী মেয়ের মত ফলটা কুড়াইয়া লইয়া মাতার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন, "যতীন্, ওবেলা তোমার এখানে নিমন্ত্রণ!"

যতীন্দ্র উল্লসিত ভাবে বলিল "আপনার প্রসাদের তো?" কৃষ্ণপ্রিয়া একটু হাসিলেন। বড় বধূ বলিলেন "তবেই হয়েছে! সন্ধ্যার আগে সেই হবিষ্যি?"

যতীন মাথা নামাইয়া মৃদু স্বরে বলিল, "হাঁ সেই প্রসাদই আমি খাব আজ জেঠাই মা। নিজে নিমন্ত্রণ করলেন—ভুলবেন না যেন।"

কৃষ্ণপ্রিয়া একটু অপলক দৃষ্টিতে সেই তরুণ যুবকের বালকোপম সরল সুন্দর মুখের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা-অবনত ভঙ্গীটির প্রতি চাহিলেন, পরে দৃষ্টি ফিরাইয়া বড়বধূকে বলিলেন, "আর বর কনের সঙ্গে ছেলে পিলে যারা যারা আসবে এইখানেই রাত্রে খাবে। দিনটুকু থেকে রাত্রে বর-কনে ফিরে যাবে। খুড়িমাকে গিয়ে বলগে। আর ছোটবউকে পাঠিয়ে দাও গে।" কিশোরীর পানে ফিরিয়া বলিলেন, "কনে বৌর সঙ্গে তুমিও আসবেত কিন্তু?" কিশোরী মাথা নামাইল। তাহার মাতা সহাস্তে উত্তর দিলেন, "কনে বৌর কাছ ঘেঁসে নাকি ও? বলে ও পুঁটুলির সঙ্গে আমার পোষাবেনা! নিজের যেন কখনো পুঁটুলি হতে হবেনা।"

"হবে নৈকি! কক্‌খোনো নয়।" নিজের সংযমের প্রাণান্ত চেষ্টাকে ঠেলিয়া কিশোরীর অবাধ্য কণ্ঠ মায়ের

উপর মৃদু তর্জ্জন করিয়া উঠিল। তার পরে "আমি আগে যাচ্চি" বলিয়াই দক্ষিণা হাওয়ার মত এক নিমেষে সেখান হইতে ছুট্ দিল। মা শঙ্কিত হইয়া বলিল, "একা ঘাটে যাবে নাকি? ও রাধা—" কৃষ্ণপ্রিয়া আশ্বাস দিলেন, "যায় তাই বা ভয় কি!" কিন্তু তাঁহারা দুই চারিটি কথা কহিতে কহিতেই এক সময় লক্ষ্য করিলেন যতীন যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বার বার সে পথের পানে চাহিতেছিল। কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার দিকে চাহিতেই রাধা উঠিয়া "দেখে আসি মেয়েটা কোন দিকে ছুটল" বলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। বড়বধূও নিশ্চিন্ত হইয়া তখন "এখন আমি ঠাকুরঝি, খুড়িমাকে বলিগে" বলিয়া চলিয়া গেলেন। যতীন তখন দাওয়ায় উঠিয়া ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে আবদারের সুরে ধরিয়া বসিল, "জেঠিমা,যাবেন না আপনি আমাদের সঙ্গে? একবার চলুন না কেন! হ্যাঁ, আপনাকে যেতেই হবে। আপনার কথা এতদিন একবারও শুনিনি। জানলে কি এই ক্রোশ চারপাঁচ রাস্তার জন্যে এতকাল একবারও দেখা করতে পারতাম না? এই বিয়ের সময়েই প্রায় আমাদের এক জেঠিমা আছেন এখানে শুনলাম। হ্যাঁ আপনাকে যেতেই হবে।"

৭

শুদ্ধ অতীত! হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও!
তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্ম্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।

* * * *

কোন কথা কভু হারাওনি তুমি, সব তুমি তুলে লও!

দ্বিপ্রহরে রন্ধনগৃহের কার্য্যের সঙ্গে দুইটী রমণীর মৃদু কথোপকথন চলিতেছিল। রাধাই প্রধান বক্তা। ছোটবধূ শ্রোতা। "সে আজ কতকালের কথা বৌ, দু যুগ বোধ হয় হ'য়ে গেল। সে-ই বোধ হয় আমার জীবনের প্রথম উৎসবের স্মৃতি, কৃষ্ণপ্রিয়া দিদির বিয়ে। সেটা বোধ হয় আষাঢ় মাস। হ্যাঁ বোধ হয় কেন—ঠিকই। তারপরে বাবা—তোমার জেঠ্ শ্বশুর কতবার বলতেন, "মেয়েটার আষাঢ় মাসে বিয়ে দিতে কতবার বারণ করলাম তোমাকে, ওর ফল যে হাতে হাতে!—'আষাঢ়ে ধনধান্যভোগরহিতা!' তা রাধাবল্লভের ইচ্ছা কি কেউ বারণে ঠেকাতে পারে?" সে বিয়ে আর এখনকার বিয়ের ঢের তফাৎ বৌ! কোন খানে কোন' কুটুম্ব আর বাকি ছিলনা। তখন এই সব সরিক একই বাড়ীতেই ছিলেন কি-না। খুড়তুতো ভাইঝির বিয়েতেও তাঁদের যাঁর যেখানে যত আত্মীয় আছেন সব জড় হয়েছিল। বরপক্ষ থেকেও তেমনি ধুম! মেয়ে আশীর্ব্বাদের সন্দেশ দই মাছের ভারে উঠানটা ভ'রেই গিয়েছিল! ভারীরা আনছে আর নামাচ্ছে, তাদের পরণে সব হলুদে-ছোপানো কাপড়, বেশ মনে পড়ে। আমাদের বাড়ীতেও সব রঙিন্ কাপড়ের ধুম কি? ঢুলি বাজন্দারেরা পর্য্যন্ত রঙিন্ কাপড় প'রে ঢোলের পাখা দুলিয়ে বাজাচ্ছিল! বর এলো যখন—পাল্কী পর্য্যন্ত বেনারসীতে মোড়া! দুই পক্ষের বরকন্দাজদের কি লাঠি খেলা, লাঠিয়ালদের সে কি নাচ! বর যখন জরীমোড়া বরাসনে বসলো অত যে বেলোয়ারী ঝাড় লণ্ঠন রঙিন্ হাঁড়ি বেল্ দিয়ে সাজানো 'আসর' সব শোভা যেন 'কানা' হ'য়ে গেল! এমনি বরের রূপ! ঐ চণ্ডীমণ্ডপেই বরের সভা বসেছিল। তখন ঐ বারবাড়ির শোভা কত! তোমাদের ঐ উঠানেই ছাদনাতলায় রংমশালের আলোতে বর-কনে যখন দাঁড়িয়ে, সে ছবিটি এখনো যেন আমার মনের চোখে লেগে আছে! রাধারাণীকে কেউ কখনো চোখে দেখেছে কিনা জানি না, কিন্তু যদি কেউ কখনো ভাবে তো বোধ হয় আমার রাঙা দিদির সেদিনের ছবিটিই তাকে ভাবতে হবে; কিন্তু বরটিত কৃষ্ণঠাকুর হননি। তাই বাসরে তাঁদের আশীর্ব্বাদের সময়ে তোমাদের এক ঠাকুরদাদা-শ্বশুর কৃষ্ণপ্রিয়া দিদিকে কোলে টেনে নিয়ে বলেছিলেন। "কৃষ্ণপ্রিয়া! তুই যে বিষ্ণুপ্রিয়া হবি তাতো জানিনা! এ যে সাক্ষাৎ গোরাচাঁদকে ধ'রে আনলি"! জানিনা কি ক্ষণে উঁরি মুখে সেকথা বেরিয়েছিল!

বিয়ের পরদিন বর-কনে বিদায়ের আগেই কি একটা কথা সকলের মুখে মুখে "ওমা সেকি"! "একি কথা"! "কি সর্ব্বনাশ"! এই রকম শব্দে ঘুরতে লাগল। আমরা একে ছেলেমানুষ, তাতে ঝি চাকরের মেয়ে আমরা একটু দূরে দূরেই থাকছিলাম তখন! কোন একটি ছেলেকে কোলে ক'রে বা কতকগুলির অভিভাবক হয়ে বাজন্দারদিগের কাছে কিম্বা কোন উৎসবের জায়গাতেই আমাদের দলের বেশীর ভাগ স্থিতি ছিল। ক্রমে আমাদেরও কথাটা কানে

গেল। বরকর্তা গ্রামের বারোয়ারী পাঠশালা ইত্যাদিতে আশাতীত সাহায্য করেছেন, গ্রামের ৺কালীতলায় বরকে নিয়ে গিয়ে মোহর প্রণামী দিয়েছেন, কিন্তু গৃহদেবতা রাধাবল্লভের মন্দিরে বরকে যেতে দেন্‌নি বা প্রণামীও দেন্‌নি। বলেছেন, "আমরা শক্তিসাধক জগদম্বার সন্তান। আমরা অন্য দেবতা স্বীকার করি না। অন্য দেবদেবী প্রণাম বা পূজা আমাদের ঘরে নিষিদ্ধ।" এসব কথা তখন আমরা বড় বেশী বুঝতে পারিনি পরে শুনেছি, তখন কেবল এইটা বুঝলাম যে বরেরা রাধাবল্লভকে নমস্কার করেনি। শুনে আমরা পর্য্যন্ত ভয়ে যেন শিউরে গেলাম। সেই বৈষ্ণব পরিবারে পালিত হয়ে জ্ঞান জন্মানো থেকে জেনেছি রাধাবল্লভই জগতের সকলের বড়, তিনি ভগবান। ভগবানকে মান্‌লে না, প্রণাম কর্‌লে না আমাদের রাঙাদিদির রাঙা বর এমন কেন হ'ল? কি হবে তাহ'লে? সেই সব শিশুমনেই যে সংস্কার বদ্ধমূল হয়েছিল তাতে মনে হ'ল এতো সর্ব্বনাশের কথাই বটে!

সেই বেনারসী মোড়া পাল্‌কীতে বর কনে সাজিয়ে নিয়ে আবার বরযাত্রীরা চ'লে গেল, কিন্তু সে যেন একটা দারুণ থমথমানির মধ্যে। সেই সকালেও যাদের নিয়ে উৎসবের আনন্দের সীমা ছিল না তখন তাদের দিকে চাইতেও সকলে যেন কি এক ভাবী অমঙ্গলের ভয়ে স্তব্ধ হচ্ছিল। বিদায়ের আগে বাড়ীর সেই বুড়ো কর্ত্তা বরের বাপ-জেঠার হাত ধ'রে শত অনুনয়ে বর কনেকে একবার রাধাবল্লভের মন্দিরে কুলপ্রথামত প্রণাম করিয়ে আনার অনুমতি চাইলেন, বরকর্ত্তারা অটলভাবে একই কথা বল্লেন। বীর দর্পে কি একটা শ্লোক বলেছিলেন, অনেকবার শুনেছি অনেকদিন দাদাবাবুদের মুখে, তাই তার একটু আজও মনে আছে "ন স্পৃশেৎ জাহ্নবীবারি হরেনাম ন উচ্চরেৎ"! তাঁরা গঙ্গাজল ছোঁয়না, হরি নাম উচ্চারণ করেন না। বুড়োকর্ত্তা তো "হরি হরি" শব্দ কর্‌তে কর্‌তে সাত হাত পিছিয়ে এলেন। বাড়ীর কর্ত্তারা তো কোন' রকমে কুটুম্বভোজ সেরে বরকর্ত্তা ও বরযাত্রীদের যথোপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে বিদায় কর্‌লেন। তখন বরপক্ষের প্রধান ব্যক্তিদের কাপড় টাকা এই সব মর্য্যাদা দিতে হত। থাক্,

বরকনে বিদায়ের সময় কার চোখে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত এলোনা! রাঙাদিদির মুখের দিকে চেয়ে দেখি সে মুখও বাসি স্থলপদ্মের মত শুখ্‌নো, অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে। কনের সঙ্গে মেলানি তাঁর আর কোন একজন ভাই যাবে তাও যেন কারু মনেই পড়্‌লোনা কিম্বা কর্ত্তাদের রুচিই হচ্ছিল না। শেষে রাঙাদিদির মা কাঁদতে লাগলেন দেখে বড়দাদাবাবু, তোমার বড়ভাসুর, তিনি জনকতক লোকের কাঁধে দই সন্দেশের মেলানি ভার সাজিয়ে নিজে হেঁটে চ'লে গেলেন। রাঙাদিদির নিজের ভাই তিনি তখন বোনের চেয়ে সামান্যই বড়, ছেলেমানুষকে সেই অনাচারী নাস্তিকদের দলে পাঠাতে কারও সাহস হ'ল না। মেয়ের যখন বিয়ে হয়েছে তখন জলে আগুনে যেখানেই হোক পাঠাতেই হবে। বর কনে বিদায় দিয়ে সবাই গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তে ব'সে গেলেন, এত সাধ আহ্লাদ কোথায় যেন সব উড়ে গেল। সকলের মুখই কালো বিরস। নিজেদের বিশ্বাসে বা ধর্ম্মে আঘাত পড়্‌লে তখনকার লোকের একেবারে এম্‌নি অধীর ব্যাকুল হ'য়ে যেতেন।

তিন চার দিন পরে মায়ের কান্নায় বংশের একজন প্রবীন লোক পাল্কী ক'রে মেয়ে দেখ্‌তে ও মেয়ে জামাই জোড়ে আনবার নিমন্ত্রণ করতে বরের গ্রামে গেলেন আর পরদিনই তিনি চ'লে এসে বল্লেন, "তাদের এখনো বৌ পাঠাতে দেরী আছে, বড় রকম একটা কালীপূজা এখনো বাকি আছে! বাড়ীতে প্রত্যহই পাঁঠাবলি তাদের নিত্য পূজায়! সেখানে অন্নজল খেতেও রুচি আসেনা। কি করি, ভায়া যখন মাথা মুড়িয়েছেন তখন সেই ক্ষুরে আমাদের তো সকলেরই মাথা মুড়নো হয়েছে। ভয়ে ভয়ে কিছু জলযোগ ক'রে অসুখের অছিলায় পালিয়ে এসেছি। মেয়ে জামাই আন্‌তে এবার ছেলে ছোক্‌রা কারুকে পাঠিও বাপু! আমাদের আর টেনোনা।" "মেয়ে কেমন আছে, জামাইকে পাঠাবে কিনা" এই প্রশ্নের উত্তরে কর্ত্তা বললেন, "মেয়ে আছে অমনি কাঠ হ'য়ে আরকি! আর জামাই পাঠাবে কি না জানিনা।" জামাই পাঠানোর কথা বলতেই বেয়াই বল্লেন, "তুলসী-পাতা খাইয়ে আমাদের ছেলেকে ছাগল বানিয়ে না দাও তো পাঠাতে পারি!" তারপরে আমাকে ধ'রে রাখ্‌বার জন্যে

সে কি জেদ্। "আজকের দিনটে থেকে যাও ভায়া, গোসাইয়ের উত্তমরূপে সেবা একজন বোষ্টম দিয়েই করানো হয়েছে! বোষ্টম্ না হ'লে গোঁসায়ের সেবা কি কেউ করতে জানে। সে খেলে তোমার রাধাবল্লভের প্রসাদ কচু আর ঘেঁচু মুখে রুচ্‌বে না!" এই বলে সেকি হাসি! "গোঁসাই" কি বুঝেছ! পাঁঠা রান্নার নাম "গোঁসায়ের সেবা!" তারপরে বৈষ্ণবদের ঠাট্টা ক'রে ক'রে সে যে কত রকম উদ্ভট গল্পের রসিকতা হ'ল আমার সঙ্গে সারা সকালটা! আঃ! একেবারে দারুণ তান্ত্রিকের ঘরে মেয়েটাকে দিলে ভায়া!"

রাঙাদিদির বাবা তো ভাইদের কাছে মাথা হেঁট ক'রে রইলেন, আর মা খুড়ি জেঠিদের চোখ্ দিয়ে জল গড়াতে লাগল! মেয়েকে যেন জবাই করা হয়েছে এমনি তাঁদের ভাব! তাঁদের সে ভাব আমাদের দলেও সংক্রামিত হ'ল। রাঙাদিদির জন্ম সকলেরই চোখ্ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। যেন তাঁকে আর ফিরেই পাওয়া যাবে না।

আরও তিন চার দিন পরে দিদি ও তাঁর বরকে নিয়ে বড়দাদাবাবু পাল্কী ক'রে এসে নাম্‌তেই আমরা যেন হাতে স্বর্গ পাবার মত ক'রে দৌড়ুলাম। মা খুড়িমারাও ভেতর বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত ছুটে গিয়ে উঁকি দিতে লাগ্‌লেন। বড়দাদাবাবু তাঁদের দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন, "কই শাঁক বাজাচ্ছ না। উলু দিলে না?—তোমাদের জামাই আনা এই বিষ্ণুশর্ম্মা গিয়েছিলেন ব'লেই সম্ভব হ'ল! এখন কি দেবে আমাকে দাও সকলে!" তখন সকলের মুখে উলু এল কেউ শাঁক আন্‌তে ছুটলেন, কেউ কেউ ঘোমটা দিয়ে জলধারা নিয়ে বরকনে তুলে আন্‌তে এগুলেন। বরকনের পাল্কী এনে ভেতর দরজার কাছে বেহারারা রাখল। বর-কনের হাত ধ'রে পাল্কী থেকে তুলে সেই শুখনো কলাগাছের হতশ্রী ছানলাতলায় দাঁড় করিয়ে একবার একটু বরণও হ'ল। সকলে অমনি এ ওর মুখের দিকে চাইল কেননা এই সময়েও সর্ব্বাগ্রে গৃহদেবতাকে গিয়ে প্রণাম করতে হয়। রাঙাদিদি তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন! কাউকে কিছু না ব'লে ছানলাতলা থেকে বেরিয়ে পড়তেই তাঁর আঁচলে টান পড়লো, অমনি বরের বেনারসী চাদরটা শুদ্ধ নিজের আঁচলের টানে টেনে নিয়ে দিদি ঠাকুরবাড়ীর দিকে চললো। "কোথায় যাস্ কোথায় যাস্ রুক্মিণী? বরের সঙ্গে জোড়ে ঘরে উঠ্‌তে হয় যে!" খুড়ি জেঠিদের একথায় কর্ণপাত না ক'রে রাঙাদি চ'লে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ছুটলাম। মনে করতে এখনো বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে বৌ! দিদি তখন বছর দশ এগারোর মেয়ে বইত নয়! রাধাবল্লভের সাম্‌নে গিয়ে রাঙাদিদি প্রণামের ভাবে একেবারে ধড়াস্ ক'রে প'ড়ে গেলেন। মুখটা মাটীর নীচে গোঁজা! ছুটি হাত মাথার ওপর দিকে জোড় করা! মায়েরাও একটু পরে পেছনে পেছনে এসে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে মেয়েকে হাত ধ'রে তুল্‌লেন, পূজারীর হাত থেকে নির্ম্মাল্য চেয়ে নিয়ে মাথায় গুঁজে দিলেন, চরণামৃত খাইয়ে দিলেন। দিদি যখন অমনি ক'রে প'ড়ে তখন চেয়ে দেখ্‌লাম বরও বড়দাদার সঙ্গে খানিক দূর এসে অবাক্ হ'য়ে দিদির কাণ্ড দেখ্‌ছে! সবাই দিদিকে ফিরিয়ে বাড়ী নিয়ে গেল, তাঁরা তখনো ঐদিকেই বেড়াতে লাগ্‌লেন। বরকে জল খেতে যখন ডেকে নিয়ে যাওয়া হ'ল আমার যেন মনে পড়ে তাঁর মুখটা ভারী শুখ্‌নো দেখেছিলাম। বিয়ের সময়ের মত তেমন হাসিভরা আর নেই। একদিন থেকেই বর চ'লে যায়। ক্রমশঃ আমরা বিভীষিকাটা ভুলে যেতে লাগ্‌লাম। পূজার সময় বাড়ীতে দুর্গাপূজোর ধূম, ঐ চণ্ডীমণ্ডপে, প্রতিমা এসে বস্‌লেন। তত্ত্বের ভার নিয়ে নতুন জামাই আন্‌তে রাঙাদিদির নিজের ভাইকে পাঠানো হ'ল। জামাইকে পাঠালে না। উপরন্তু লোকজনকে এত ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে তারা যে তাই নিয়ে গ্রামে কি হুলস্থূল কুলকুল। রাগে দিদির ভাইয়ের মুখ রক্তবর্ণ! যারা ভার নিয়েগিয়ে ছিল তারা চাপ্‌বে কেন? বেহাইরা নাকি বলেছেন "বোষ্টম্ বাড়ী দুর্গাপূজা, বলি হবে ত কচু কুমড়ো? মা দুর্গার কি অভাগ্যি মুখ চুলকে মরবেন! সেই কচুর "রাধা রসা" খেতে আমাদের ছেলে যাবেনা। তোরা বরং শ্রীরসা খেয়ে যা, গিয়ে গল্প করিস্। যখন তোমাদের মেয়ে আসবে এ বাড়ী মাংস তুলে নিয়ে ঝোলটা তোদের পাতে দেবে, আর বলবে "ভয় নেই এ হাড় পাঁটার নয়—নুনের সঙ্গে ছিল। নুন পরিষ্কার করতে যে হাড় দেয় তাই বোধ হয়!"—এ শুনে আর তোমাদের বোষ্টম মনে কিছু বাধ্‌বে না! এ শ্রীরসা কি ক'রে রাঁধা

হয় জানিস্? যত বৈরিগির টিকি আর ছেলে পাকা মালা ছিঁড়ে ছিঁড়ে!" বরের বাবা নাকি এই সব ব'লে হাহা ক'রে হেসেই অস্থির! লোকগুলকে এক এক পেট সন্দেশ খাইয়েছেন, অবশ্য জোড়া টাকা কাপড় ও বখশিস দিয়েছেন বড় মানষি দেখিয়ে, কিন্তু ঐ সব কথার তাদের সে সব পাবার আনন্দ কোথায় উড়ে গিয়েছিল। একবার যারা তত্ত্বর ভার নিয়ে যেত ফিরে বার আর তারা যেতে চাইতো না, যারা যেত' তারাই বোষ্টমদের কত রকম কেচ্ছা শুনে ভয়ে মুখ শুখিয়ে আসত। বেশীর ভাগই তারা এঁদেরই কৃষাণ চাকর পাক্ পাইক। তারা বলত "রাঙাদিদির একি ঘরে বিয়ে দিলেন বাবুরা। যেন রাক্ষসের বাড়ী! কি সব হাসি আর গল্প—শুনলেই ভয় লাগে। রাঙা-দিদি কি ক'রে ঘর করবে।"

যাদের অল্প বয়স রক্ত গরম তারা এই সব শুনে রেগে অস্থির, বলে "অমন জানোয়ারদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ্‌তে হবেনা। আর তত্ত্ব পাঠাতে হবে না, আমরাও কেউ যাবনা। দিদির ভাই তো সেই থেকে তাদের নাম শুনলেও আগুন হ'য়ে উঠ্‌তেন। কেবল বড়দাদা আর বড়কর্ত্তা আমাদের বাবা জেলকে থামাতেন। এমন কি দিদির বাবা পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌তেন।

এই রকমে বছর ঘুরে এল। ষষ্ঠীর সময় কি ভাগ্যি তারা জামাইদাদাকে পাঠালে কিন্তু দুতিন দিনের বেশী থাকবার হুকুম ছিল না। সেই ক'দিন সেই যে ইতুর কথায় বলে "বিল ছেঁকে মাছ আনলেন গাঁ ছেঁকে দুধ আনলেন" তেমনি ভাবে জামাই আসার উৎসব চলেছিল। অষ্টমঙ্গলার জোড়ে আসার সময়ে তাঁকে যে কেউ "ঠাকুর কোঠায়" প্রণাম করাতে নিয়ে যায়নি তাই শুনে বেহাই পক্ষ বুঝি খুসী হয়ে ছেলে পাঠিয়েছিলেন। শ্রাবণ মাসে দিদিকে অনেক জিনিষপত্র দিয়ে ঘর বসতে পাঠাতে হ'ল, ...টি মেয়ে ব'লে আপত্তা টিকলোনা। কিন্তু আট দশ ...পরেই তার বাবা গিয়ে নিয়ে এলেন। সেই কয় দিনেই শুখিয়ে যেন আধখানি হ'য়ে গেছেন। মুখে তাঁর বিভীষিকা! মায়ের কাছে লুকিয়ে লুকিয়ে কি আর কাঁদতেন মায়ে প্রবোধ দিতেন, লজ্জায় মা ও সকলের কাছেই নিজেদের ব্যথা তাঁরা যেন চাপ্‌তেন।

রাঙা-দিদি চোদ্দবছর বয়সে প্রকৃত শ্বশুরঘর করতে গেলেন। তখন আমিও বড় হয়েছি, সব কথাই মনে পড়ে। মাস খানেক পরেই খবর অর্থাৎ বেয়াইয়ের চিঠি নিয়ে লোক এল "তোমাদের মেয়ে নিয়ে যেতে পার, সে অসুস্থা।" বাপে গিয়ে উত্থানশক্তিরহিত দিদিকে পাল্কী ক'রে এনে ধরাধরি ক'রে ঘরে তুল্লেন। ব্যাপারটা বাইরের লোকের কাছে চাপা থাক্‌লেও বাড়ীর সবাই বুঝ্‌তে পারলে অনাহারে এবং মনের কষ্টেই মেয়ের এ অবস্থা! তাদেরও জেদ্ তারা বৌকে নিজেদের রুচির মত খাওয়াবে, জেদি মেয়েও তা খাবেনা প্রাণ গেলেও। এই অবস্থায় একটা পাঁঠার মুণ্ড তার পাতে দেওয়ায় একদিন সে অজ্ঞান হ'য়ে যায়, আর সেই দিন থেকে খাওয়া বন্ধ করে। আর এক দিন জোর ক'রে বলির স্থানে নিয়ে যাওয়ায় চোখ কান বুজে থাক্‌লেও মেয়ে মনের বেগে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। তার পরই থেকে প্রায়ই অজ্ঞান ভাব চলে। বেগতিক দেখে বাপকে ডাকিয়ে "মেয়ে যদি কখনো আমাদের ঘরের উপযুক্ত হয় তো পাঠাবেন, নয়ত এই পর্য্যন্ত! আমার ছেলের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই।" বলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যাক্, এখানে আনার পরে ক্রমে দিদি সুস্থা হলেন।

কথাটা শীগ্‌গির শেষ করি, কাজে বড় বাধা পড়ছে তোমার। দু বৎসর আর কোন উচ্চবাচ্য থাক্‌লো না দুই পক্ষেরই। এঁরা বুঝ্‌লেন মেয়েকে তাঁরা ত্যাগই করলে। মায়ে মেয়েকে কত বলতেন বোঝাতেন, তাদের মনোমত হবার শিক্ষা দিতেন! তেজস্বিনী মেয়ে নিঃশব্দে তা যে অসম্ভব তা বুঝিয়ে দিত। জামাই পাছে বিয়ে করেন এই ভয়েই মা কাঁটা হতেন। তার পরে হাঁ, বিয়েও বর্ষার প্রথমে— সেবারও বর্ষা। শ্রাবণের মাঝামাঝি বন্যার জলে চারিদিক থৈ থৈ করছে। বর্ষায় কখনো থাকনি তাই এদেশের সে সময়ে এক এক বার কি অবস্থা হয় জান না। সমস্ত মাঠ ঘাট জলে জলময়। নৌকা ভিন্ন এক পা চলার উপায় নেই, মাঝে মাঝে বান এসে সেই জল বেড়ে গ্রামে ঢুকে এমন অবস্থা হয় যে এবাড়ী ওবাড়ী যেতেও হাঁটু জল। এমনি এক সন্ধ্যায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, হঠাৎ বড় দাদাবাবুর গলা "ও খুড়িমা কাকে ধ'রে এনেছি ভাখ! বাবু 'পাথার'

বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, ডিঙ্গি ক'রে গ্রামের কোল্ দিয়ে ভেসে চ'লে যাচ্ছিলেন, আমিও ডিঙ্গি চালিয়ে পাক্‌ড়া কল্লাম ওঁর ডিঙ্গিকে! তার পরে বুঝ্‌তেই পারছ! মাঝি জুটোকে পাঁচ টাকা ঘুষ বাপু তোমাদেরই দিতে হবে, আমি গরীব মানুষ কোথায় পাব।"

রাঙা-দিদির সেই রাঙা-বর! কিন্তু তখনকার চেয়ে এখন বড় হয়েছি, সুখ দুঃখের কিছু বার্ত্তাও জেনেছি, তাই আনন্দটা গায়ে মুখে মা চালিয়ে মনের মধ্যেই বেশীর ভাগ রেখে উৎসবে লেগে গেলাম! তাঁরা সেই বর্ষার সন্ধ্যায় সেই বান বন্যার দেশে অপ্রত্যাশিত দুর্ল্লভ বস্তু পেয়ে কি করবেন কি খাওয়াবেন ভেবেই পান্‌না! আর আমরা এক হাঁটু জল ভেঙে রাধাবল্লভের কোঠা থেকে প্রসাদী বকুল ফুলের মালা এনে রাঙা-দিদির খোঁপায় জড়িয়ে দিলাম। তাঁর রাঙা-মুখখানা বার বার আনন্দে চেয়ে দেখ্‌ছিলাম। বরের ভাবটাও দেখ্‌তে ছাড়িনি, বেচারা লজ্জায় তিনগুণ রাঙা!

বিধাতার বিধান! ভোরের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙে পড়লো। সে কি বৃষ্টি! সঙ্গে সঙ্গে চার দিকে জলের স্রোত। বানে চারদিক সমুদ্র হ'য়ে উঠ্‌লো, ঘরের পেছনে যেন কাশ ফুল ফুট্‌ছে এমনি ফেনা ভেসে চল্‌লো। ছেলেরা দোলাই গায়ে মুড়ির ধামি নিয়ে দুয়োরে দুয়োরে ব'সে জলের দিকে চেয়ে গাইতে লাগ্‌লো।

"এজোরে দুরন্ত বান ডুবালো মাঠের ধান
সর্ব্ব জীবে করে হায় হায়।
আসমান হুড় হুড় করে পূবে লাগে ঢেউ
গেরামের কুকুরগুলা করে ঘেউ ঘেউ।
গাছপালা ডুবিয়ে গেল আর বনের বাঘ,
গাছের আগায় বেঁচে র'ল ধেড়ে বেটা কাগ।*
২। মরা গরুর ভেলা পেয়ে বাঘ যায় ভেসে
গাছের আগায় ব'সে কাক ম'ল হেসে।
বাঘ বলে "কাগা যখন ডুবরে বাঁশের আগা,
কোন্ চুলোতে থাকবি ওরে হরিনামের কাগা।"
"শাখায় আছি পাখা নেড়ে উড়ে যাব আমি,
হাঁটু জলে বাঘ ভায়া প'ড়ে থাক্‌বে তুমি।"
কাগে বাঘে গণ্ড গোল অপরূপ কথা—
স্রোতের ঠেলায় ভেসে গেল হুগলি কল্‌কাতা।

সেই সুখের দিনকটির স্মৃতির মধ্যে এই গানটাও ধরা আছে বৌ, তাও ব'লে গেলাম এই সঙ্গে। তখন জান্‌তামনা সে বানের জলে কি লুকানো আছে! সেই ঘোর বানের ও বর্ষণের মুখে কে প্রাণ থাক্‌তে প্রাণাধিকদের ছেড়ে দিতে পারে। জামাই কিছুতেই যেতে পেলেননা, তাকে প্রায় বন্দী ক'রেই রাখা হ'ল সেই তিন দিন! মাঝি ব্যাটারা টাকা পাওয়া সত্ত্বেও কোন্ এক সময়ে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের ডিঙ্গি নিয়ে। প্রকাশ তো হবেই, তারজন্য বড়দাদা নৌকা নিয়ে নিজে গিয়ে পৌঁছে দেবেন, এই সব কথা হচ্চে ইতি মধ্যে নূতন একখানা নৌকা নিয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে বরের বাপের ৩।৪ জন পাইক মাঝি এসে উপস্থিত হল। যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই ছেলে ছেড়ে দিতে হবে বাপের এই আদেশ! চিঠিও কি ছিল, সে কেবল জামাই দাদাই পড়লেন আর কেউ দেখলেনা। বড় দাদাবাবু সঙ্গে যেতে চাইলেন, জামাইদাদা কিছুতেই রাজী হলেননা, বল্লেন তাঁদের দেখ্‌লে তিনি আরও রেগে যাবেন। এ হয়ত কোন রকমে শেষে ক্ষমা করবেন। তখনো টিপি টিপি বৃষ্টি চলছে, জলস্রোত কল কল হুড় হুড় শব্দে গ্রামের পথ থেকে দক্ষিণা স্রোতের টানে মাঠে গিয়ে পড়ছে। মাঠে মাঠে বন্যার জল দ্বিগুণ বেগে দক্ষিণে ছুট্‌ছে, সবাই বল্‌ছে "বাদল বামুন বান দক্ষিণা পেলেই যান, এইবার বান বাদল সবই ছাড়্‌বে!" গ্রামের বাইরে গিয়ে তিনি নাকি নৌক'য় উঠে চ'লে গেলেন। দাদাবাবু খানিক পরে ফিরে এলেন।

রাঙাদিদিকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে ছাতে গিয়ে দেখি তিনি চিলে কোঠার আড়ালে ব'সে। মাঠের দিকে মুখ ক'রে বসে আছেন। সেদিক গাছে ঘেরা কিছুই দেখা যায়না—তবুও!—কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বল্লাম "দিদি"! দিদি উত্তর দিলনা।

তিন চার দিন পরে কি ক'রে খবর এল জানিনা, বোধ হয় পাখাই আছে তার, রাঙাদিদির সেই রাঙাবর, তিনি

* ডাঙিতে ডাঙিতে বান বর্দ্ধমান নিল,
সহর শহর গ্রাম সকলি ডুবালো। ১

বাড়ী ফিরে যাননি! সেই বানের জল কি করেছে সেই জানে! মাঝি মাল্লারা বলেছে বাবু ইচ্ছে ক'রেই ঝাঁপ দিয়েছে বানের টানের মুখে। তলিয়ে যেতে স্বচক্ষে দেখেছে তারা, ভেসে আর উঠ্‌লে না। তারা নৌকা চালিয়ে গোটা দিন ছুটোছুটি ক'রে তবে খবর দিয়েছে।

একদিন আমি লুকিয়ে তাঁদের কথা শুনেছিলাম। নিজেরো ইচ্ছা জন্মাবার বয়স হয়েছিল, গুরুজনদেরও সাহায্য ছিল মেয়েকে জামাই ভালবাসে কিনা জান্‌বার জন্য। শুনেছিলাম তিনি বল্‌ছিলেন, "বেঁচে আমাদের সুখ কি প্রিয়া? আমার জন্য তোমায় আর সে ব্যাপারের মধ্যে যেতে বল্‌তে পারি না। মরণ ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নেই।" তাই কি নিজে ইচ্ছা ক'রেই সেই পথ নিলেন?

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী
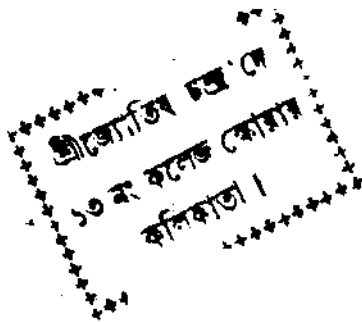
কম্‌নে গেলি আজ

শ্রীযুক্ত অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

(২৪ পরগণার গ্রাম্য ভাষায় লিখিত)

ও ভাই আমার কম্‌নে গেলি আজ?
ধানের ক্ষ্যাতে পাক্‌লো ফসল, লাগ্‌লো কাটার কাজ।
ও ভাই আমার কম্‌নে গেলি আজ?
তোমার হাতের কেচে নিড়েন্, পায়ের ছেঁড়া মোজা,
আর ঐ ক'খাচ্ পুটুঁলে-ছিপ্ চালের বাতে গোজা।
কলুঙ্গিতে তোমার সকের আর্‌সী চেরোন দুটি
ঝ্যাম্‌ন্ ছ্যালো তেম্‌নি আচে; তোমার মেয়ে পুঁটী
মাজে মাজে বায়্‌না করে 'বাবা কোতায়' বোলে,
'আবাদখানে গ্যাচে' বলি, তবু কি ভাই ভোলে!
বউমা আমার কেঁদে কেঁদে কোল্লে দেহপাৎ;
'তোমায় ছেড়ে ক্যামন্ কোরে কাটায় দিবেরাত?
হেলে জোড়া শুকিয়ে যে যায় তোমার সেবা বিনে,
'মঙ্গলা'টার বাচুর হ'ল গ্যালো এ-আশ্বিনে।
দুদ্ ঝ্যানো তার বটের আটা ক্যামন কোরে খাই?
'তোমার সাদের গাইয়ের দুদের স্বাদ্ পেলেনা ভাই!
'ধানের ক্ষ্যাতে পাক্‌লো ফসল, লাগলো কাটার কাজ।
ও ভাই আমার কম্‌নে গেলি আজ?

কবি করুণানিধানের কবিতা

অধ্যাপক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, বি-এ

কবি করুণানিধানের কাব্য আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। কিছুকাল হইল কবির কবি-জীবন প্রায় অবসিত হইয়াছে, এজন্য তাঁহার কবিমানস ও কাব্যকীর্ত্তিকে সমগ্র ভাবে বুঝিয়া লইবার পক্ষে এখন আর কোন সংশয়ের হেতু নাই। ইতিমধ্যে 'শতনরী' নামে কবির একখানি সুনির্ব্বাচিত কবিতা-সংগ্রহও প্রকাশিত হইয়াছে; এজন্য পাঠক সাধারণের পক্ষেও এবিষয়ে সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু করুণানিধানের কাব্য-আলোচনার ভূমিকা-স্বরূপ আমি এইরূপ আলোচনার প্রয়োজন ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে দুইচারি কথা বলিয়া লইতে চাই।

আমাদের দেশে সাহিত্য-সৃষ্টির একটা যুগ শেষ হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনার একটা আদর্শ বা পদ্ধতি এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এ অবস্থায় সমালোচকের নিজ সমালোচনা-পদ্ধতির একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া বোধ হয় অনাবশ্যক হইবে না। কবি ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনায় নানা কারণে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। কাব্য বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি, সমালোচনা অর্থেই বা ঠিক কি বুঝায়, তাহার একটা স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকা ভালো। কবির নিকটে আমরা ন্যূনতম কি প্রত্যাশা করি কবি যত বড় বা ছোট কবি হউন, তাঁহার কাব্যে সত্যকার কবিত্ব আছে কি না, তিনি আদৌ কবি কিনা—তাহার নির্ণয় হয় কিসে, এ সম্বন্ধে একটা ভূমিকার প্রয়োজন আমাদের দেশে এখনও আছে। আমাদের দেশে এ যুগে কাব্য ও কবির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু কবিতা-লেখক হইলেই কবি হয় না; বড় কবি, মাঝারি কবি, ছোট কবি বলিয়া একটা শ্রেণী-বিভাগ করিয়া এই সকল লেখককে যে কোনও একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া কবি-নামে অভিহিত করিলেই এ সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ, একথা ভুলিলে চলিবে না, কোনও লেখকের পক্ষে কবিপদবাচ্য হওয়াটাই তাঁহার প্রতিভার প্রথম ও প্রধান পরিচয়; এ বিষয়ে যদি ভুল হয়, তবে গোড়ায় গলদ ঘটিবে। আশা করি করুণানিধানের কাব্য-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমি সে ভুল করি নাই।

রসিকসমাজেও কাব্য-রস-আস্বাদনে একটা বিঘ্ন আছে; ব্যক্তিগত রুচি বা মানস-প্রকৃতির পক্ষপাত, বিশিষ্ট চিন্তা বা বিশ্বাসের প্রভাব, কাব্যরস আস্বাদন কালেও আজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়া থাকে। কাব্যরস-আস্বাদনে এই ব্যক্তিগত রুচিভেদে হয়ত' আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু কাব্য-সমালোচকের পক্ষে উদার ও অসাম্প্রদায়িক রসবোধের বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক কবির কল্পনায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে; তাই বলিয়া যদি কবিবিশেষের এইরূপ বৈশিষ্ট্যের পক্ষপাতী হইতে হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে সাধারণ রস-প্রমাণ সকল কাব্যেই কবিত্বের লক্ষণ রূপে বিদ্যমান থাকে, সমালোচক সেই বস্তুর সন্ধান রাখেন না। এইখানে কবির কবিত্ব-সম্বন্ধে ধারণাটা একটু স্পষ্ট করিয়া তোলা ভালো। কাব্যমাত্রেরই যে সাধারণ রস-প্রমাণের কথা বলিয়াছি—যাহা কোনো বিশিষ্ট কাব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—তাহাকে যখন 'কবিত্ব' রূপে উপলব্ধি করি, তখন একটা কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। এই রস নির্ব্বিশেষ বলিয়াই, প্রত্যেক কবির কাব্যে ইহা একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যই কবিবিশেষের 'কবিত্ব'। অতএব কোনও বিশেষ ধরণের কবিত্বের পক্ষপাতী হইলে, এই রসকেই অস্বীকার করিতে হয়। সত্যকার রসিক ব্যক্তির চিত্তে এই রসজ্ঞান আছে বলিয়াই তিনি সর্ব্ববিধ বৈশিষ্ট্যের অনুরাগী। এই দিক দিয়া আর একটু অগ্রসর হইলেই এই 'কবিত্বের' প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়িবে। কবির এই যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, ইহাকেই আমরা মৌলিকতা বলিয়া থাকি—কাব্যের মৌলিকতাই যে কবি-শক্তির প্রধান লক্ষণ ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এই মৌলিকতা অনুভব করিলেও, বিচার-কালে আমরা একটা ভুল করিয়া বসি। এই মৌলিকতা কবির ভাববস্তুর উপর

নির্ভর করে না—ওই ভাবের অনুভূতির যে ব্যক্তিগত ভঙ্গি, কবির প্রকাশভঙ্গিমায়—ভাষায়, ছন্দে, শব্দযোজনায়——কাব্যের আকারে ও প্রকারে ধরা পড়ে, তাহাই তাঁহার কবিত্বের মৌলিকতা। অতি-সাধারণ বহু-পরিচিত ভাব-বস্তুকে আশ্রয় করিয়াও যে একটি বিশিষ্ট প্রাণ-মনের অনুভূতি, রঙে ও রূপে, ভাষায় ও ছন্দে মূর্তি ধারণ করে—কাব্যের diction ও technique-এর অন্তর্গত সেই personality, সেই styleই কবিত্ব-রস-আস্বাদনের প্রধান সহায়। এই অনুভূতি যে কাব্যে যত গভীর ও ব্যাপক হয়—জীবনের যতখানিকে একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া, তাহার জটিল বিস্তারকে একটি ভাবৈকরস বাণীরূপে প্রকাশ পায়—সে কাব্য তত বড়। কিন্তু কবিত্বের আলোচনায় এই বড়ত্বের কথাই প্রথমে আসে না। কারণ অনুভূতি যেমনই হউক, তাহাকে যথাযথ প্রকাশ করিতে পারাই কবিত্বের নিদর্শন—ইহাই কবির সেই দিব্যপ্রতিভা যাহাকে আর্ট বলে; এবং অনুভূতির আবেগ সত্য ও সুগভীর না হইলে সেই aesthetic impulse সম্ভব হয় না, যাহার সাহায্যে ভাষায় ও ছন্দে সেই বস্তু ফুটিয়া উঠে, যাহাকে আমরা 'কবিত্ব' বলি। যে কাব্যে এই diction নাই তাহাতে ওই experience-ও নাই; সে রচনায় যদি কোনও ভাব-চিন্তার সমাবেশ থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তাহা লেখকের নিজস্ব নয়; সে ভাববস্তু লেখকের কবিজনোচিত অনুভূতি-প্রসূত নয়। অতএব, কবির ভাব-গৌরব বা চিন্তাশীলতাই কবিত্ব নয়—সে ভাব, সে চিন্তা যত গভীর সূক্ষ্ম বা উচ্চ হউক, তাহাতে কবির মৌলিকতা বা কবিত্ব নাই। এই কথাটি বুঝিয়া লইলে, কাব্য-আলোচনায় কোনও অবান্তর আদর্শ প্রশ্রয় পাইবে না। অবান্তর আদর্শের উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, অনেকে যেমন সঙ্গীত উপভোগ করিতে বসিয়া, সুর অপেক্ষা কথার কবিত্ব প্রত্যাশা করেন, তেমনই অনেক তথা-কথিত কাব্য-রসিক কবিতায় ভাবের বাণীরূপ অপেক্ষা, ভাবের ভাবুকতা, তত্ত্বজ্ঞানের ভাবাবেশ, অথবা সূক্ষ্মচিন্তাশক্তির বাহাদুরী প্রত্যাশা করেন।

কাব্য আস্বাদনের বস্তু, আলোচনার সামগ্রী নয়—একথা সত্য বটে; কিন্তু কাব্য আলোচনা অন্যবিধ আলোচনার মত নয়, ইহাও মনে রাখিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বিদেশী সমালোচকের একটি উপমা কাজে লাগিবে। আকাশে ইন্দ্রধনুর পাশে যেমন আর একটি ছায়া-ইন্দ্রধনু দেখা যায়—তাহা দ্বারা প্রধান ধনুটি দ্বিগুণিত হইয়া যেমন আরও বেশী করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে—কাব্যের পাশে কাব্য-সমালোচনাও সেইরূপ। কাব্যসৃষ্টির পাশে পাশে সমালোচকের রসবোধ, কাব্যগত কবি-প্রেরণার সাহায্যেই, তাহার যে প্রতিচ্ছায়া সৃষ্টি করে, এবং তাহাদ্বারা মূল কাব্যসৃষ্টিকে আরও ভাস্বর করিয়া তোলে—তাহারই নাম কাব্য-সমালোচনা। এইরূপ আলোচনায়, কাব্যে ঠিক যতটুকু যেখানে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অধিক কিছু অনুমান করা—যাহা কবি প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছেন, সমালোচকের নিজ কল্পনাবলে সেটুকু পূরণ করিয়া কবিকে একটা অতিরিক্ত গৌরবের অধিকারী করাও—যেমন অন্যায়, তেমনই কবি যেটুকু যে ভাবে আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন তাহার অধিক রস-প্রেরণা দাবী করাও অসঙ্গত।

করুণানিধানের কাব্যে আমরা তাঁহার সেই কবিত্বের সন্ধান করিব। যে ভাষা ও ছন্দ-সৌষ্ঠবে বাণীর রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, ভাব শরীরী হয়, যে শক্তির অভাবে একের অনুভূতি অপরের নিজস্ব হইয়া উঠে না, করুণানিধানের কাব্যে ভাষা ও ছন্দের সেই অমোঘ সৌষ্ঠব সর্বাগ্রেই পাঠকের হৃদয়-গোচর হয়। কবি যেন মূর্তিমতী বাগ্‌দেবতার আরাধনায় তন্ময় হইয়া, প্রকৃতির রূপ-ভাণ্ডার হইতে বর্ণালোক আহরণ করিয়া, অতি ধীরে সংযত হস্তে সুনিপুণ তুলিকাক্ষেপে বাগ্‌দেবতার বেদী-পট্ট অলঙ্কৃত করিতেছেন। বাক্য ও ছন্দের এই সৌন্দর্য্যস্পৃহা তাঁহার কবিহৃদয়ের বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যানুভূতির পক্ষে যতখানি সার্থক হইয়াছে, তাহাই তাঁহার কাব্যের রস-প্রমাণ। আমরা প্রথমেই করুণা-নিধানের এই বাণী সাধনার পরিচয় দিব। তাঁহার কবিতায়, ভাষার এই নির্ম্মাণ-কৌশলে যেন তিনটি ভঙ্গি ফুটিয়া উঠিয়াছে—ফুলের ন্যায় কোমল নির্ম্মল, পরিপক্ক ফলের ন্যায় নিটোল ও রসোজ্জ্বল এবং মণিগণের মত দৃঢ়সংহত দীপ্তিমান্। এই তিনেরই কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) পথ-সম তার কাহিনী
আজ্‌কে প্রিয়ে দ্বিপ্রহরে-
সোনা-আতার সোনার গায়ে
রবির কিরণ পিছ্‌লে পড়ে ;
দূর্বাশ্যামল নিম্বতল,
দীপ্ত নভো নীলোজ্জ্বল,
ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ভাঙে
গাঙের বুকে স্তরে স্তরে !
('দ্বিপ্রহরে'—শতনরী, পৃঃ ২-৩)

মেয়েটি মোর আগ বাড়ায়ে
দাঁড়িয়ে র'বে দ্বারে,
খোপাটি ফুল-খোঁপায় পরে'
সাঁঝের আঁধিয়ারে ;
কাজল-দেওয়া চক্ষু দুটি
আদর-দোলে উঠবে ফুটি,
'ষষ্ঠী'-মনসা-র বেড়ার-ঘেরা
'দুর্গাদীঘি'র ধারে।

শিউলিফুলের গন্ধে যবে
সন্ধ্যাখানি ভরে'
জ্যোৎস্না-ধারা পড়বে ঝরে'
দূর দেউলের 'পরে ;
অঙ্গ মাজি' ছবির মত
ঘাটটি হ'তে ঘটটি ভরে'
সই-এর সাথে গৃহিণী মোর
আসবে ফিরে ঘরে।
('বাসনা'—শতনরী, পৃঃ ৯-১০)

কোটি বন-ফুল অঙ্গে দোদুল
কত রঙ শোভা আলো ;
দ্বিপ্রহরের ঝিল্লীর তান
শুনিছে পাষাণ কালো !
স্বপন দেখিছে ভূর্জ্জ-বনানী
সবুজ টোপর পরি'
ঝর্ণা-তলায় ঝরিছে কাহার
রতনের শতনরী !
('হিমাদ্রি'—শতনরী, পৃঃ ৯৩)

(৩) কার আলিঙ্গন-আশে অনুরাগ-রসোল্লাসে
হে নররঙ্গিণী,
ধাও রঙ্গে কলস্বরা পারাবার-স্বয়ম্বরা
কিশোর নন্দিনী ?
কোথা মাহীষ্মতী পুরী ?— মর্ম্মর-সোপানোপরি
রাজ-অঙ্গনার
বিলাসের মৃগমদে দৃপ্ত পদ-কোকনদে
চকিত ঝঙ্কার !
পৌর্ণমাসী কৃষ্ণরাতে জ্যোৎস্নালোকে উল্লাসে
অলিন্দের 'পরে
দ্রাক্ষারসে টলমল স্বর্ণপাত্রে শশি-বিম্ব
চুম্বিছ অধরে !
আবর্ত্ত-শোভন নাভি অলঙ্কৃত কটি-তট
হংস মেখলায়—
কোথায় রূপসী রেবা ভুলাইলে কালিদাসে
যৌবন-বিভায় ?
(রেবা—শতনরী, পৃঃ ১১৬।)

উপরে যে বিচ্ছিন্ন শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম, তাহা দ্বারা, আমি করুণানিধানের ভাষার—তাঁহার diction-এর মধ্যে যে শব্দ ও ছন্দগত Aesthetic impulse সর্ব্বত্র লক্ষ্য করা যায়, তাহারই আভাস দিয়াছি। এই শ্লোকগুলিকে যে তিনভাগে ভাগ করিয়াছি তাহার সবগুলিতে style একই, কিন্তু শব্দ-যোজনার রীতি এক নয়, এবং ছন্দও ত্রিবিধ। কিন্তু সর্ব্বত্র বাণীকে সুন্দর করিয়া তুলিবার প্রয়াস এবং বিষয়ভেদে ভাবানুভূতির বিশিষ্ট আবেগকে অনুরূপ ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ করিবার instinct সার্থক হইয়াছে। সকল কাব্যেই ইহাই কবিত্বের লক্ষণ। কিন্তু করুণানিধানের কাব্যে ভাষার এই সৌষ্ঠব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কাব্য-পাঠকালে মনে হয়, শব্দের অক্ষরগুলি পর্য্যন্ত বর্ণে ও গন্ধে তাঁহাকে মুগ্ধ করে। ভাষা সম্বন্ধে এই অতিরিক্ত সচেতনতার জন্য তাঁহার কাব্যে ভাবের প্রাবল্য অপেক্ষা সৌকুমার্য্য ও কোমলতাই সমধিক সুস্ফারিত হইয়াছে। কিন্তু কবি এই যে ভাষা নির্ম্মাণ করিয়াছেন শব্দের বর্ণ, গন্ধ ও সুর, এই তিন উপাদানকেই তিনি যে কৌশলে বশ করিয়াছেন, তাহা কি কেবল বাণী-চর্য্যার ফল ? তাঁহার ভাষার এই অতিরিক্ত সৌন্দর্য্য—কল্পনা ও

আবেগবিরহিত শব্দ-চাতুরী নয় ; ইহা একরূপ aestheticism হইতে পারে, কিন্তু সে aestheticism কাব্য-বিরোধী নয়। কারণ কোন ভাষাই সুন্দর হইতে পারে না, যদি তাহার মূলে emotion না থাকে ; যদি ছন্দই এ ভাষার সর্ব্বস্ব হইত, তবে সে সন্দেহের কারণ থাকিত ; কিন্তু যে কবির রচনায় ছন্দ ও ভাষার এমন সুসঙ্গত সুষমা, তাঁহার কাব্যের অন্তরালে যে একটা কবি-মানস আছে একটা mode of perception আছে—তাহা অস্বীকার করিলে রসবোধকেই সঙ্কুচিত করিতে হয়। করুণানিধানের ভাষার এই অনবদ্য চারুতা তাঁহার কবি-প্রকৃতির কোন্ গুণে ঘটিয়াছে এইবার তাহাই দেখাইব। তাঁহার কাব্যে প্রধানতঃ কোথাও প্রাকৃতিক রূপমোহ, শব্দচিত্রে, কোথাও বা সেই রূপ-সম্ভোগের আনন্দ ছন্দলীলায় উৎসারিত হইয়াছে। প্রথমে ইহারই আলোচনা করিয়া পরে, তাঁহার কাব্যে এই প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া-মূলক যে পরিণতির আভাস আছে সে সম্বন্ধে বলিব। তাঁহার কবিতার যে মূল প্রেরণার কথা বলিয়াছি, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে তাহার পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(১) যাদুকর চন্দ্রকর তালের পাকলে
কোথা তোথা তুলিয়াছে রূপার ঝলক,
মাধবী লতার ফাঁকে বকুলের তলে
কে তরুণী মুঠিভরি' ধরে চন্দ্রালোক !

(শতনরী, পৃঃ ১)

(২) নাচিছে দামিনী মেঘে পাখোয়াজ বাজে।

(শতনরী, পৃঃ ১৩)

(৩) হের সখি সেই দিনান্ত-তারা
তেমনি জ্বলে—
ডালিম-ফুলের রঙটি ফলানো
মেঘের কোলে !

(শতনরী পৃঃ ২৫)

(৪) শ্বেত-বিজুলী নিথর হয়ে
ঘুমিয়েছে ওই মূর্ত্তি লয়ে
শিথানে তার উজল ঢেউএর সারি ;
ছাড়িয়ে ঐ উষার তারা
সামনে নেমে আসছে কারা ?—
কটাক্ষেতে স্ফটিক হ'ল বারি !

হেরব রূপের নীলাম্বরে
বিরাট শিখী কলাপ ধরে,
তারায় তারায় বরণ-শোভা জাগে !

(কাঞ্চনজঙ্ঘা—শতনরী পৃঃ ১০২-৪)

(৫) সামনে হেরি সুনীল বারি
তালীবনের ফাঁকে,
গেরুয়া রঙ, ভাঙ্গা মাটি
ঢালু পথের বাঁকে :
স্বর্ণ-কালের পড়ছে ঝরি'
শ্যামল তরু-পর্ণ'পরি,
আলোক-লতা অলক-জালে
কালো পাথর ঢাকে।

('ওয়ালটেয়ার'—শতনরী, পৃঃ ১১৯)

—এরূপ অনেক আছে। এ সব পড়িতে পড়িতে কার না মনে হয়, যে এই ভাষা ও ছন্দ কবির অন্তরের আনন্দকে মূর্ত্তি দিবার প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা কেবল বস্তু-বর্ণনা নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর যথাযথ অনুচিত্রণ নয়, ইহা প্রকৃতি-প্রেমিক কবির প্রিয়া-রূপ-বন্দনা। এক প্রসিদ্ধ ইংরাজ-সমালোচকের ভাষায়—"It is love of this kind that gives true significance to the poetry of nature, for only by its alchemy can the thing seen become the symbol of the thing felt."। এই ধরণের emotion বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ নূতন। প্রকৃতির রূপ-সম্ভোগে কবির যে আবেগ এই সকল চিত্ররচনা করিয়াছে, সেই আবেগ-মূলক কল্পনা কয়েকটি কবিতায় সৌন্দর্য্যের যে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়াছে, এখানে তাহারও কিছু পরিচয় আবশ্যক। 'শেফালি' কবিতাটিতে 'স্নেহের রাণী' শেফালি বালিকার মৃত্যুতে কবি যে শোক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও এই প্রকৃতিরই মাধুরী করুণ-সুন্দর হইয়া যে রস-সঞ্চার করিয়াছে, তাহা ইংরাজী যে 'কোনও উৎকৃষ্ট Dirge কবিতার অনুরূপ।—

ওই যে ওখানে অভ্র-রজত
স্রোতটি বহিয়া যায়।
উহারি পুলিনে কোথায় শেফালী
লুকায়েছে বালুকায়।

এক একটি করে' তারা জ্বলে জ্বলে,
চাঁদের রূপালি হাসি পড়ে গলে'
কাঁদে গো তটিনী ছল-ছল-ছলে
অকুরাণ বেদনায়।
('শেফালী'—শতনরী, পৃঃ ১২)

'স্বপ্নলোকে' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।—

হেথায় তারা নাইতে নামে
ভাসিয়ে তরী জ্যোৎস্না-মাঝে
গিরি-দরীর মুক্তাধারা
নীরব রাতে উচ্চে বাজে।
লুটায় তাদের বসন-আঁচর
ধূসর পাষাণ-সিঁথির তটে—
অস্ফুট-ভাষে পথের পাশে
ফুলেরা সব শিউরে উঠে।

তাদের চুলের ফুলের বাসে
গন্ধ হারায় গোলাপ বেলা—
কে অপ্সরী সারঙ্, গাহায়,
কি অপরূপ সুরের খেলা!
নিদাঘ-রাতে রাখাল ছেলে
চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে প'লে,
স্বপ্নে শোনে নূপুর তাদের
গুঞ্জরিছে গিরির কোলে;
তন্দ্রা ভেঙ্গে দেখে তাদের—
দূর আকাশে মিলিয়ে যায়।
পাখায় ঝরে সোনার রেণু
জ্যোৎস্না-ন্যুপী মেঘের গায়।

আর একটি কবিতায় করুণানিধানের কবি-প্রেরণার অতি সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছে। কবিতাটির নাম 'সন্ধ্যালক্ষ্মী'র প্রতি। নাম শুনিয়া অনেকেরই ইংরেজ কবি Collins-এর বিখ্যাত Ode to Evening কবিতাটি মনে পড়িবে। কিন্তু করুণানিধানের 'সন্ধ্যালক্ষ্মী' তাঁহার কাব্য-লক্ষ্মীরই প্রতিচ্ছবি; ইহাতে Collins-এর মত কল্পনার প্রসার নাই, সন্ধ্যার বিচিত্র ভাবোদ্বোধনী চিত্র-পরম্পরা ইহাতে নাই। ঊর্দ্ধে সন্ধ্যা-রঙ্গীন নভস্তল, ও নিম্নে ধরণীর কানন-শোভা—ইহাকেই আশ্রয় করিয়া সন্ধ্যা তাহার 'রঙের ইন্দ্রজালে' কবির নয়ন ভরিয়া দিয়াছে। করুণানিধানের প্রকৃতি-প্রেম ও রূপ-রসাবেশের মধ্যে যে সরল Unsophisticated কবি-প্রাণের আকৃতি আছে, এই কবিতার নির্মল গীতি-স্রোতে তাহাই উৎসারিত হইয়াছে। কবিতাটির কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।—

তোমার আলো সব ভুলালো
গো অমরী বালা,
তোমার চেলীর ঝিলিমিলি,
চুলের তারার মালা
* * *
অলক-ঢাকা কোমল পলক,
নয়ন গরবী—
কাঙাল বায়ু যাচে তোমার
চুলের সুরভি।
কোহিনুরের টীপটি ভালে,
কাণে রতন-দুল—
বরণ-কালের তরুণ বধূ
রে দুলালী দুল!
এস নেমে আমার ঘরে
তালী-বনের তলে,
এস মানস-নন্দিনি মোর
এস আমার কোলে!

'স্বপ্নলোকে' কবিতাটির form আরও perfect, তাহাতে ভাবের রূপটি কয়েক পংক্তির মধ্যেই গঠন-সুষমায় সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এ কবিতায় আমরা ভাবের সূক্ষ্ম তন্তুজালের উপরে, রূপ-লক্ষ্মীর অতিপেলব ক্ষণ-বিলীয়মান বর্ণ-সুষমাকে সন্ধ্যালক্ষ্মীর চুলের তারার মত 'চঞ্চলিয়া' উঠিতে দেখিলাম। এখানে Form-এর perfection নাই, কিন্তু চিত্রার্পিত আলো-ছায়ার মোহিনী আছে। এই প্রসঙ্গে কবির রূপসন্ধানী দৃষ্টির উদাহরণ স্বরূপ সন্ধ্যালক্ষ্মীর 'চেলীর ঝিলিমিলি' লক্ষ্য করিতে বলি। কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

সোণার শলাকা বুনিত গগনে রেশমী বসন-স্তর—
অস্ত-তপন মুদিত নয়ন মহুয়া-বীথির 'পর। (শতনরী, পৃঃ ১৬৩)

গোধূলি আকাশের স্তিমিত অথচ তরলোজ্জ্বল আলোক-নিশান' যাঁহাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাঁহারা এই বর্ণনার সূক্ষ্মতা ও যথার্থতা উপলব্ধি করিবেন।

এই সকল কবিতায় কবির 'অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে সৌন্দর্য্যের যে স্বপ্নাবেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে—মনে হয়, তাহাই আর একটু ঘোরালো হইয়া তাঁহার কাব্যে একটা অস্পষ্ট রহস্য-লোকের ছায়াপাত করিয়াছে। এ সকল কবিতায় ভাষা স্পষ্ট নয়; কেবল একটা ভাবের সুর আছে—রঙ, রূপ, সব যেন একাকার হইয়া গেছে। এ যেন কবি-প্রাণের নিশুতি-নিশীথের অস্ফুট গুঞ্জরণ। যে প্রকৃতি-প্রেয়সী তাঁহাকে রূপের কুহকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বিনী আর এক মূর্ত্তি যেন ইন্দ্রিয়-জগতের 'ওপার' হইতে আর এক ভঙ্গিতে তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, এই আলো-ছায়ার পারে, জীবন-মৃত্যুর সীমান্ত-দেশে, অকূল অচিন্তিতের মোহানায় তাঁহার প্রাণ যেন থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে, রূপ-সৌন্দর্য্যের সুস্পষ্ট অনুভূতি আচ্ছন্ন হইয়া যায়—'পথের জোছনা ভুলায় আমারে, কাঁপে প্রাণ-পারাবত।' উদাহরণ স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করিলাম।—

এইখানে সে কখন এসে
স্মৃতির লিপি গেছে ফেলে—
অন্ধকারের আল্‌পনাতে
জ্বল্‌জ্বলে তার নয়ন মেলে।
শেষ নির্ম্মিত শেষ-তৃণাতে
পাইনে নাগাল আকুল হাতে;—
রূপ হারালো রূপের লীলা
বন-পলাশে আলোক ঢেলে। (শতনরী, পৃঃ ৫৮)

*   *   *

নেহারিলাম পাষাণ হ'য়ে যায় সে তনু,
নিক্ষেপিছে কটাক্ষ-শর ভুরুর ধনু।
ননী-কোমল বক্ষ গেছে মাণিক হয়ে,
হীরার গুঁড়া পড়ছে ঝরি' কপোল ব'য়ে!
চল্‌তে নারি কঠিন পথে,—তরুর শাখে
জড়িয়ে বসন বাঁধ্‌ছে মোরে শতেক পাকে।

(শতনরী, পৃঃ ২২০)

এই সকল কবিতায় আমরা দেখিতে পাই, কবির স্বভাব-সিদ্ধ রূপপিপাসা যেন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে, একটা প্রশ্ন-কাতর উৎকণ্ঠা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে। এই কবিতাগুলিতে Mysticism নাই বরং প্রাণের একটা জ্ঞান-সঙ্কটের পরিচয় আছে; করুণানিধানের কবি-প্রকৃতির পক্ষে mysticism অসম্ভব বলিয়াই রূপ ও অরূপের দ্বন্দ্বে শেষে তাঁহার কাব্য-প্রেরণা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে—এই কবিতাগুলিতে তাহারই সূচনা আছে। আমরা পরে কবিমানসের এই দিকটির বিস্তৃত আলোচনা করিব।

এইবার করুণানিধানের কাব্য-প্রেরণার যে অপর ভঙ্গি তাহারই আলোচনা করিব। এই ভঙ্গি পরিস্ফুট হইয়াছে তাঁহার ছন্দ-লীলায়। এখানে কাব্যে ভাষা ও ছন্দের পরস্পর সম্বন্ধের কথা কিছু বলিব। সঙ্গীতে ভাব রূপ পায় সুরে: সঙ্গীত নির্ব্বাক, কাব্যের বাহন ছন্দোবদ্ধ বাণী। কবির আনন্দ গীতিকারের আনন্দ হইতে ভিন্ন; সঙ্গীতে অতল অসীম অরূপকে ভাবের নিরাকারেই হৃদয়-গোচর করা হয়: ইন্দ্রিয় সেখানে মন-বুদ্ধির স্পর্শশূন্য হইয়াই চরিতার্থ হয়, সুরই রস-সৃষ্টি করে। কাব্যের ছন্দ বাণী-রূপেরই অঙ্গ; বর্ণের অন্তরালে আলোকের মত, অনুভূতির মূলে যে আবেগ আছে, বাণীর অঙ্গরূপে ছন্দ তাহারই দ্যোতনা করে। কাব্য সরস্বতীর এক চরণ যেমন বাণীর উপরে, অপর চরণ তেমনই ছন্দের উপরে স্থাপিত। এই জন্য সঙ্গীতের সুর এবং কবিতার ছন্দ ঠিক এক নহে,—সুর আর কিছুর অপেক্ষা রাখে না; ছন্দ বাণীর অনুগত, ভাবকে রূপ দিবার পক্ষে বাণীর সহায়তা করে। কাব্য ও সঙ্গীতকলার মধ্যে এই পার্থক্য আছে বলিয়াই এমন দেখা যায় যে, যে কবি উৎকৃষ্ট ছন্দ-বোধের অধিকারী, সঙ্গীতকলায় তাহার কিছুমাত্র অধিকার নাই। আমাদের মধুসূদন যে ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বাংলা কাব্য-সঙ্গীতের চরম বলিলেও হয়; কিন্তু সঙ্গীতকলায় তাঁহার কোনও অধিকার ছিল বলিয়া আমরা জানি না। ইংরেজ কবি শেলীর মত ছন্দ-প্রতিভা অল্প কবিরই দেখা যায়, কিন্তু শেলীর সঙ্গীত-কলায় অধিকার থাকা দূরের কথা—অনুরাগ-ও ছিল না। অতএব ছন্দকে যাঁহারা, সঙ্গীতের সুরের মত মনে করিয়া, কাব্য হইতে পৃথক করিয়া তাহার বিচার করেন, অথবা, ছন্দ-গৌরবকেই কাব্য-গৌরব হিসাবে উপভোগ করেন, তাঁহারা এই দুই বিভিন্ন কলার মধ্যে গোল বাধাইয়া কোনটারই মর্য্যাদা রক্ষা করেন না। ছন্দ কবিতার প্রসাধন বা অলঙ্কার নয়—ছন্দ কাব্যেরই অঙ্গ;

বাণী ও ছন্দ উভয়ে মিলিয়া প্রত্যেক কবিতাকে তাহার ভাবানুযায়ী রূপ-বৈশিষ্ট্য দান করে। ছন্দ যেখানে বাণীর অঙ্গ হইয়া উঠে নাই, সেইখানেই আমরা কাব্যের কৃত্রিমতা অনুভব করি। যে সকল কাব্যে ভাষা ও ছন্দের এই একাত্মতা ঘটে নাই, সেই খানেই সত্যকার কবি প্রেরণার অভাব ধরা পড়ে। এই দুইএর মিলন না হইলে রচনা 'কাব্য' হইয়া উঠে না।

কিন্তু কাব্যে ছন্দের স্থান এইরূপ নিরূপিত হইলেও, গীতিকাব্যে ছন্দের অধিকার কিছু অধিক হইতে পারে। আবেগ যেখানে অধিক, অনুভূতির মূলে emotion যেখানে প্রবল, সেখানে সেই নিছক আবেগ ছন্দ-লীলায় কতকটা মুক্তি পাইতে চায়। ভাব যেখানে গদ্‌গদ কলভাষা আশ্রয় না করিয়া পারে না, সেখানে ভাবের রূপ কিছু অধিক পরিমাণে ছন্দের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সেখানেও দেখা যাইবে যে, শব্দ যোজনায় ছন্দের আধিপত্য থাকিলেও, ভাষাই যেন ছন্দোময় হইয়া উঠিয়াছে। আরও দেখা যাইবে যে, যে-ভাবাবস্থা চিন্তালেশহীন প্রীতি-বিহ্বলতার ফল, কেবল সেই ভাবাবস্থাই এইরূপ ছন্দলীলায় সার্থক হইতে পারে। এরূপ অনেক কবিতা পাঠকের স্মরণ হইবে, যাহা ছন্দ-হিল্লোলে শ্রুতিমধুর হইলেও চিত্ত জয় করে না; তার কারণ সে গুলিতে কবির ভাবাবেশ অপেক্ষা ছন্দ-নিষ্ঠাই প্রবল। হৃদয় যেখানে ভাবের আবেশে নৃত্য করে, সেখানেই কবিতার এই ছন্দ-লীলা সার্থক হয়।

করুণানিধানের যে কবি-প্রকৃতির পরিচয় ইতিপূর্ব্বে আমরা পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার কাব্যে এইরূপ ছন্দলীলার যথেষ্ট অবকাশ আছে। ছন্দের উচ্ছলতা তাঁহার প্রায় সকল কবিতায় আছে, তথাপি কতকগুলি কবিতায় বিশেষ করিয়া এই ছন্দের উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। আমি উপরে গীতি-কবিতার ছন্দ-প্রাধান্য যে হিসাবে সমর্থন করিয়াছি, সেই হিসাবে, সর্ব্বত্র তাঁহার এই ছন্দলীলা সার্থক না হইলেও, অনেক স্থলে ছন্দই কবির ভাবাবেগের বাহন হইয়াছে—কাব্য-লক্ষ্মীই যেন 'আনন্দ-কাঁকণ' বাজাইয়াছেন।

(১) আমি, পড়নু আদি-কাব্য খানি তার সে বাহু-ইঙ্গিতে,
ফোটে স্বর্ণ-জ্যোতি তার শ্রীমুখের ভঙ্গীতে;
কাঁপে লক্ষ যুগের পদ্ম-ফোটা ঠোঁট দুখানি থরথরি'—
সে যে চুম দিল রে পঞ্চশরে অস্ত্র কাঁড়ি'!

(শতনরী, পৃঃ ৪৭)

(২) ওরে, খোল্ অৰ্দ্ধেক উন্মীল চোখ, অঞ্জন আর কাজ নেই—
ওলো আল্‌তায় লাল পা'র তল তোর, মঞ্জীর ঠিক বোলবেই।
এল উৎসব-লগ্ন,
আধ' তন্দ্রায় মগ্ন
(৩) জাগে বল্লভ তোর বক্ষের ঠাঁই—ধ্যান-সুন্দর আজ সেই।

(শতনরী, পৃঃ ৬৮)

(৪) লাল-কেশরের গন্ধে পাগল
মাতাল ফাগুন-হাওয়া,
কুণ্ঠিত কেন কণ্ঠ তুহার-
কোন্ সুরে যায় গাওয়া?
বন-পথে আজ ফুল-দোল-লীলা,
কুঙ্কুম ভাঙে রঙ্গন;
'জল-তরঙ্গ'-ঝঙ্কার তুলি'
বাজাও শঙ্খে কঙ্কণ।

(শতনরী— পৃঃ ২৭)

(৫) দোল-দোলনে দোলা হ'য়ে সোহাগ-বেণী রাখ্ খুলে,
ঢাকা দিয়ে রাখিস্‌নে মুখ, তাকা' তোরা চোখ তুলে'।
মনের কোণে রঙ ধরেছে,
আকাশ বাতাস বদ্‌লে গেছে,
মল্লী চাঁপা যুঁই-বেলাতে দখিন-হাওয়া যায় দুলে'—
তাকা তোরা চোখ তুলে'।
চৈত-রাতি, আকুল রতি ফুল-শরে!
ঘর ছেড়ে চল্ তমাল-বীথির পথ ধরে'।
কোন্ পুলিনে নীল সলিলে
খেল্‌বি খেলা সবাই মিলে',
মন্ত্র নিবি বন-বিহারীর মন্তরে
সে যে বাঁশীর ভাষায় ডাক দিয়েছে নাম ধ'রে!

(শতনরী—পৃঃ ৪৯)

এই শেষের কবিতাটিতে কবির ছন্দলীলা কোনও কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে নাই; সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ কবি-দরবেশের প্রাণের নৃত্য এই কবিতায় শরীরী হইয়া উঠিয়াছে,—ছন্দ এখানে 'বন-বিহারীর মন্তরে' পরিণত হইয়াছে। এই কবিতাটি এই হিসাবে করুণানিধানের একটি উৎকৃষ্ট রচনা।

করুণানিধানের কাব্যে যে ধরণের রসমাধুরী যতটুকু

আছে, তাহার আস্বাদনে আমার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিলাম। করুণানিধান যে কবি-শিল্পী, নিজ প্রাণের রস-সংবেদনা তিনি যে অনুরূপ ভাষায় ছন্দে প্রকাশ করিতে পারেন, আশা করি, তার প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। কোনও কবির নিকটে তাহার অধিক কিছু দাবী করা চলে না। কবিকর্ম্ম পুরুষকার-সাপেক্ষ নয়, তাহা দৈবী প্রেরণার অধীন। কবির প্রাণে যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত—যাহা তাঁহার ভাব-প্রকৃতির অনুবন্ধি, তিনি তাহাই সৃষ্টি করেন—সমালোচকের ইচ্ছানুরূপ দাবী মিটাইতে পারেন না। প্রত্যেক কবির অনুভূতি-ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, কিন্তু সেই অনুভূতি যখন শব্দে ও ছন্দে রূপ পায়, তখনই বুঝি, কাব্যসৃষ্টি হইয়াছে; এবং তাহাই যথেষ্ট। করুণানিধানের সেই অনুভূতি-ক্ষেত্র কিরূপ, তাহার সীমাই বা কোথায় সমালোচক এইটুকু ধরাইয়া দিতে পারিলেই তাঁহার বক্তব্য শেষ হয়। আমরা দেখিয়াছি, করুণানিধানের কাব্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রূপ-রেখা শব্দ-বর্ণে চিত্রিত হইয়া উঠে, এবং সে চিত্র কবি-চিত্তের মাধুরীতে আলিম্পিত হয়। এই রূপ-মোহ একরূপ ইন্দ্রিয়োল্লাসের আনন্দে কবিকে বিভোর করিয়া তোলে—সেই তড়িৎস্পর্শবৎ রূপরেখাবলী কবি আবিষ্টের মত শব্দপটের উপরে মেলিয়া ধরিয়া ঐকান্তিক তৃপ্তি লাভ করেন; এ জন্য কবির অনুভূতি চিন্তা-গভীর হইতে পায় না। তাঁহার অনুভূতিক্ষেত্রে রুদ্র কঠিন বীভৎস বস্তুর স্থান নাই; তার কারণ, তাঁহার প্রাণ প্রকৃতির নিকটে মাধুরী-ভিক্ষাই করে,—তাহাকে কল্পনা-বলে জয় করিয়া আত্মচেতনার প্রসার কামনা করে না। কবি শাক্ত নহেন, বৈষ্ণব; যে নিশ্চিন্ত আত্মনিবেদন অবশ ভাবাতিরেক ও প্রীতিবিহ্বল সৌন্দর্য্য-কল্পনা মানুষকে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া, তাহার বিচার-বুদ্ধি অলস করিয়া, বৃন্দাবন-স্বপ্নের সহায়তা করে; করুণানিধানের চিত্তে সেই বৈষ্ণবভাব প্রবল। এই সূত্র ধরিয়া এইবার তাঁহার কাব্যে ভাবের যেমন আলোচনা করিয়াছি সেইরূপ অভাবের দিকটাও আলোচনা করিব। কোনও কবির কাব্যে যাহা যে কারণে আছে, যাহা নাই তাহারও কারণ যে সেই একই—একথাটা বুঝিয়া না লইলে কাব্য-পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

করুণানিধানের কাব্যে একটা প্রধান অভাব এই যে, কবি তাঁহার perception গুলি লইয়া এতই অধীর যে সেগুলিকে কবিতায় একটা ভাবের ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া তুলিবার দিকে তাঁহার যেন দৃষ্টিই নাই—সামান্য যত্নে অনায়াসে যাহা করিতে পারিতেন, তাহাও করিতে তিনি যেন পরাঙ্মুখ। 'হিমাদ্রি' কবিতাটিতে এই দোষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট হইয়াছে—এই সুদীর্ঘ কবিতার পংক্তি-বিভাগেও অযত্ন প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কারণ তাঁহার কবি-প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে প্রকৃতি-প্রেমের ফলে তাঁহার রচনার "the thing seen becomes the thing felt—transformed from a cause to a symbol of delight"—সেই আবেগের ফলেই করুণানিধানের অধীর রূপ-সৃষ্টির আগ্রহ কোনখানে স্থির থাকিতে পারে নাই। পূর্ব্বোক্ত সমালোচকের ভাষায়—"It lacks that endorsement from a centre of disciplined experience which is the mark of the poetic imagination at the highest." উৎকৃষ্ট সৃষ্টিকল্পনার মধ্যে যে বিচারশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করে, করুণানিধানের কল্পনায় সেই intellect-এর অভাবই তাহার কারণ। এই জন্যই জীবন ও জগতের বাস্তবরূপের মধ্যে Ideal ও Real-এর যে দ্বন্দ্ব আছে, তাহাকে তাঁহার বৈষ্ণবভাব-বিভোর প্রাণ একেবারে পাশ কাটাইয়াছে—সে দিকটা তিনি যেন ক্ষণমাত্রও সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার কবি-প্রকৃতির এই লক্ষণ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার গাথা-কবিতাগুলিতে। এখানেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রূপস্বপ্নময় কল্পনা কোনও ঘটনা কাহিনী বা চরিত্রকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এই সকল কবিতায়—বিশেষতঃ 'চণ্ডীদাস', 'জয়দেব' ও 'বাদশাজাদী'তে—কবি তাঁহার ভাষার বর্ণচ্ছটা ও ধ্বনিসম্পদ উজাড় করিয়া দিয়াছেন, এবং স্থানে স্থানে—"There are moments when the emotion seem to rise in a sudden fountain and change the thing he sees into a jewel"; কিন্তু তাহাতে গাথা-কবিতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। Keatsএর St Agnes' Eve অথবা Isabellaর মত কবিতায় কবির চিত্রাঙ্কনী-শক্তি

ও রূপপিপাসার আবেগ যেমন একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বা কাহিনীকে ঘেরিয়া অখণ্ড রস-রূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, করুণানিধানের কবিতায় তাহা হয় নাই; তার কারণ, Keatsএর সৃষ্টিকল্পনায় যাহা ছিল, করুণানিধানের তাহা নাই—"endorsement from a centre of disciplined experience"। করুণানিধানের কল্পনায় ভাবানুভূতির মুহূর্তগুলি (moments of experience) রূপ ও রূপকে মূর্ত্তি গ্রহণ করে ; এই মুহূর্তগুলি, কোনো কারণ সূত্রে, একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-পথে প্রবাহিত হয় না। এই জন্যই তাঁহার গাথা কবিতাগুলি গাথা হিসাবে সার্থক হয় নাই। 'চণ্ডীদাসে' এইরূপ কতগুলি মুহূর্ত্ত মর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে সে মুহূর্তগুলি এতই ভাবঘন, তাহার বাণীরূপ এতই অপূর্ব্ব, যে মনে হয়, সেগুলিকে চণ্ডীদাসের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত না করিয়া, 'রজকিনী' 'রামী'কে মাত্র কেন্দ্র করিয়া, চণ্ডীদাসের প্রেমারতির স্তোত্ররূপে গাঁথিয়া তুলিলে রসসৃষ্টি আরও সার্থক হইত—আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতাম—

> গিরিল তাহার অলক প্রান্ত
> অপরূপতম জ্যোতি,
> তারকা-খচিত আকাশের তলে
> দাঁড়ায়ে রহিল সতী।

ইহার পরের অংশ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। 'জয়দেব' কবিতায় কবি-শিল্পীর ভাষা ও চিত্র-রচনা অন্তদিক দিয়া সার্থক হইয়াছে। এ কবিতায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা Unity of Atmosphere আছে এবং সে atmosphere সৃষ্টি করিয়াছে—'বিরাট মন্দির-চূড়া ছায়া যার পড়ে না ভূতলে' 'মরুদ-ডম্বরু-মন্দ্রে উত্তরোল অম্বুধি-গর্জ্জন'। সমস্ত কাহিনীকে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া এক বিরাট-গম্ভীর ভাব-দেবতার আরতি-শঙ্খ এই কবিতায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু 'বাদশাজাদীর' কাহিনী রূপ-রসে টলমল করিলেও সুসম্বদ্ধ আকার লাভ করে নাই। তিনটি গাথার মধ্যে এইটির মধ্যেই নাটকীয় ঘটনা সন্নিবেশের অবকাশ ছিল। এ কাহিনীকে চিত্ররূপে আয়ত্ত করা যায় না। ইহার মধ্যে ঘটনা-পরম্পরার গতিবেগ কবির রূপ-সম্ভোগ-স্পৃহাকে যেন বারবার ব্যাহত করিয়া ছন্দকে আরও বেগবান করিয়াছে। বাদশাজাদীর এই ছন্দ গাঁটি balladএর উপযোগী—এই ছন্দের দ্বারাই প্রমাণ হয়, এই কাহিনীর মূল প্রেরণা কবিচিত্তে ঠিকই ধরা দিয়াছে, তথাপি ইহার গঠনে কবির কল্পনাশৈথিল্য প্রকাশ পাইয়াছে। এই গাথাগুলির সঙ্গে একটি কবিতা আছে, তার নাম 'চিরকুমার'; এই কবিতাটি পড়িলে করুণানিধানের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিবে,—গাথাই হোক আর যাহাই হোক, কবিতাটি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত করুণানিধানী কাব্যরসের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

করুণানিধানের কাব্যে এই যে অভাবের দিকটার আলোচনা করিলাম, ইহার জন্য তাঁহার কাব্য-লক্ষ্মীকে দায়ী করি না; তাঁহার কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য যদি বুঝিয়া থাকি, তবে এ আলোচনায় কবির সেই পরিচয় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা না বলিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে বলিয়া মনে করি। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কাব্যে যে একটা অস্পষ্ট প্রশ্নকাতর উৎকণ্ঠার সুর আমরা লক্ষ্য করিয়াছি সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। তাঁহার কাব্যের এই ভঙ্গি নিতান্ত খেয়ালি-রচনার খেয়াল নয় এই সুর আর এক ভঙ্গিতে তাঁহার কাব্যে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাঁহার কল্পনার স্বাস্থ্যহানি করিয়াছে। কারণ আমরা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, করুণানিধানের মত সৌন্দর্য্যবিভোর রূপরস-পিপাসুর কাব্য-বীণায় একটা তার বড় বেসুরা বাজিয়াছে—একটা কাতর ভীতিবিহ্বল বৈরাগ্যের সুর অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে কতকগুলি কবিতায় বার বার দেখা দিয়াছে। অপ্রাসঙ্গিক বলিলাম এই জন্য যে, যে কবিতার মূল প্রেরণাই বৈরাগ্য, সে কবিতার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যে সকল কবিতার মূল প্রেরণাই সৌন্দর্য্য-বিভোরতা—সেখানে সেই অবস্থাতেই এই সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে 'চিরন্তন ধ্রুবে'র নিকটে আত্ম-সমর্পণের ভাব—পৌরাণিক ভক্তিভাবের ঔদাসীন্য বা আধ্যাত্মিক সত্যপিপাসার বেদনা—এই সকল কবিতার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। 'হরিদ্বার' 'হিমাদ্রি' বা 'শ্রীক্ষেত্রে' প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে যতটুকু তীর্থ-মাহাত্ম্য বা পৌরাণিক স্মৃতি জড়িত আছে

—এই কবিতাগুলিতে সেই তীর্থ-মাহাত্ম্যই তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতিকে খর্ব্ব করিয়াছে—প্রাকৃতিক শোভায় তন্ময় হইতে গিয়া কবিকে যেন 'আত্ম-সম্বরণ করিতে হইয়াছে। তাই, 'ওয়ালটেয়ারে'-শীর্ষক কবিতায় কবির যে আশ্চর্য্য প্রকৃতি-প্রেমের পরিচয় পাই, তাহাতেও এই পুরাণ-কথার আকস্মিক অবতারণায় রসভঙ্গ হইয়াছে। কেবল 'কাঞ্চন-জঙ্ঘা' কবিতায় কবির রূপ-পিপাসা সকল রূপের সীমায় পৌছিতে চাহিয়াই কাঞ্চনজঙ্ঘার অশোক-সম্ভব রূপ-জ্যোতির সম্মান রক্ষা করিয়াছে। কেহ যেন মনে না করেন যে আমি এইরূপ ভক্তিভাব বা আধ্যাত্মিক পিপাসার বিরোধী; রূপ হইতে অরূপে পৌছিবার একটা সহজ মানস-সেতু আছে তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই সকল কবিতায় যে আধ্যাত্মিকতার প্রয়াস আছে তাহা করুণানিধানের কবি-প্রকৃতির পক্ষে একটা কৃচ্ছ্র সাধন—ইহা তাঁহার কাব্য-প্রেরণার পরিণতি নয়, বরং একরূপ বিপরীত-গতি বলিয়াই মনে হয়। "সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি' কবিতায় কবি যাঁহার আবাহন করিয়াছিলেন, এই সকল কবিতার অংশ বিশেষ পড়িবার পর, তাঁহার সেই কাব্যলক্ষ্মীকে বলিতে ইচ্ছা হয় —'বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে!'

করুণানিধানের কবিজীবনে একটা অকাল-বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাঁহার কবিমানস অতি দ্রুত অবসাদ-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহার কারণ ব্যক্তিগত জীবন-যাত্রার ইতিহাসে বোধ হয় মিলিবে। তথাপি যে কবি বিশেষ করিয়া সৌন্দর্য্যের মোহিনী মায়ার এমন বশীভূত তাঁহার চিত্তেও এ বৈরাগ্য পিপাসা কেন? সকল সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একটা নশ্বরতার ছায়া জড়িত আছে সত্য, এজন্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা গভীরতর বেদনার অনুভূতি আছে। তথাপি, সৌন্দর্য্য সর্ব্বজয়ী। পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ লেখক যথার্থ ই বলিয়াছেন—

"The faith in it endures : for the discernment of beauty is a mode of perception that is adequate to all the fates can bring. Disillusion has no power against it ; it can not merely conquer, but make part of itself its regret for its own impotence : and the lovers of beauty are perhaps more fortunate than the lovers of justice, or love."

কিন্তু সৌন্দর্য্যের এই impotence—এই নশ্বরতার ছায়াই করুণানিধানের সৌন্দর্য্য-মোহকে বিচলিত করিয়াছে; তা'র কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। করুণানিধান শাক্ত নহেন, বৈষ্ণব। সৌন্দর্য্য-পিপাসার সঙ্গে যে ভাবুকতা-শক্তি থাকিলে, এই ক্ষণ-সুন্দরকেই চির-সুন্দরের রূপে বরণ করিয়া—

——some win peace who spend
The skill of words to sweeten despair
Of finding consolation where
Life has but one dark end.

—সেই শক্তি তাঁহার নাই; তাই, বার বার এই ক্ষণ-সুন্দরের মোহই তাঁহাকে চিরসুন্দরের দুয়ারে হাহাকার করাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কবি-প্রাণ সে সান্ত্বনা আজিও পায় নাই—এ দ্বন্দ্বের অবসান ইহজীবনেও হইবে না। তাই, মনে হয়, 'উদ্দেশে' শীর্ষক কবিতায় বিয়োগ-বিধুর কবির সান্ত্বনা-লাভের প্রাণপণ চেষ্টা দেখিয়া অতি নিষ্ঠুর অদৃষ্ট-দেবতাও হাস্য সম্বরণ করিবে।*

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত ইংরাজী উক্তিগুলি J. Middleton Murry প্রণীত Countries of The Mind নামক গ্রন্থ হইতে লইয়াছি—লেখক।

সোহনি-মিহওয়াল

(পঞ্জাব প্রদেশে প্রচলিত প্রেম-কাহিনী)

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

[সোহনি-মিহওয়ালের প্রণয়কাহিনী পঞ্জাব প্রদেশের একটী প্রসিদ্ধ রোমান্স্। এই তরুণ তরুণী দুটির আত্মবিসর্গী প্রেম লইয়া পঞ্জাব কবিরা বহু কবিতা অথবা গান রচনা করিয়াছেন। গানগুলি এ অঞ্চলে (পঞ্জাবে) বিশেষতঃ পাতিয়ালা রাজ্যে, বিশেষ প্রচলিত। সে দেশের ভিখারীদের মুখেও সর্ব্বদাই শুনা যায়—সোহনি মিহওয়ালের প্রেম-গীতি—

"রাত অধেরি, বুরল ঘেরি — এলি জান্দা হাল মাড়া
মওজাঁ ঠাট্‌ঠা মারে, — যো কাল্‌দা নদী কিনারে।

গানগুলির গোমা ও নীরস অংশ বর্জ্জন করিয়া ক্রমশঃ অনুবাদ করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে নায়ক ও নায়িকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।]

সোহনির পিতা তুল্লা গিলগে পঞ্জাব গুজরাত নগরে একজন অবস্থাপন্ন প্রসিদ্ধ কুম্ভকার।

মিহওয়ালের প্রকৃত নাম ইজ্জৎবেগ; ইহার পিতা মির্জ্জা আলি, বলখ বোখারার একজন সম্ভ্রান্ত ধনী সওদাগর। ইনি বহুদিন অপুত্রক থাকিয়া শেষে একজন নিভৃত গিরি-গুহাবাসী সিদ্ধ ফকির বুলি আল্লার আশীর্ব্বাদে স্কন্দোপম কান্তিমান মিহওয়ালকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

মিহওয়াল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপে গুণে অনুপম হইয়া উঠিল। সে রূপবান, বিদ্বান, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ, অশ্বারোহী ও বীর যুবক। শিক্ষা শেষ করিয়া মিহওয়াল একদিন পিতাকে দিল্লী ভ্রমণের ইচ্ছা জানাইল। মির্জ্জা-আলি পুত্রের ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিলেন না, তাঁর কত আদরের, কত আরাধনায় ঐ একটী সন্তান!

যথেষ্ট পাথেয় ও পাত্রমিত্র সঙ্গে দিয়া তিনি পুত্রের প্রবাস-যাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন।

তখন সাজাহান দিল্লীর সম্রাট। মিহওয়াল সম্রাটকে স্বদেশ হইতে আনীত মহার্ঘ উপঢৌকন দানে তুষ্ট করিয়া সেখানে কিছুকাল অতিথি হইয়া রহিল। তাহার পর নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে কয়েকদিন বিশ্রাম লইবার জন্য গুজরাত সহরে চিনাব নদীর তীরে তাহাদের শিবির সংস্থাপিত করিল।

সে দেশে তুল্লা কুম্ভকারের কিশোরী কন্যা অসামান্যা রূপসী সোহনির রূপের খ্যাতি মিহওয়ালের কানে গেল। তার এক বন্ধু সেই রূপের প্রতিমা একদিন স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল, এবং মিহওয়ালের নিকট সে অপরূপ রূপের বর্ণনা করিল।

বন্ধুর মুখে রূপের বর্ণনা শুনিয়াই মিহওয়াল কুম্ভকার-দুহিতা সোহনির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল, এবং 'সওদা' কিনিবার ছলে তুল্লার দোকানে প্রায় নিত্যই গিয়া উন্মেষিত যৌবনা রূপময়ী সোহনিকে দেখিয়া নয়ন ও অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

সোহনিও প্রথম দর্শনেই সেই অজ্ঞাত কুলশীল কন্দর্প-কান্তি যুবককে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহাদের এই চক্ষে দেখার সুখে শীঘ্রই বাধা পড়িল।

পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মিহওয়ালকে গুজরাত ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিতে হইল।

কিন্তু তথাপি, সেই দূর দূরান্তর বলখ বোখারায় আসিয়া পিতামাতা, বন্ধু স্বজনের অশেষ স্নেহাদর এবং রাজভোগ, রাজ-সম্পদের মধ্যে থাকিয়াও ধনীপুত্র মিহওয়াল সেই সুদূর গুজরাত-বাসিনী তরুণী সোহনির অনুপম সৌন্দর্য্য ক্ষণেকের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিল না।

সোহনির অদর্শন-বেদনা তাহাকে এতই পীড়িত, ব্যথিত করিতে লাগিল যে, মিহওয়াল অবশেষে একাকী গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া গুজরাতে চলিয়া আসিল, এবং সেই ধনীর দুলাল ছদ্মবেশে, ছদ্মনামে তুল্লা কুম্ভকারের

গৃহে বিনা বেতনে দাসত্ব গ্রহণ করিল, শুধু তা'র চিত্তহারিনী সোহনির সঙ্গসুখ লাভের প্রত্যাশায়। আশা পূর্ণ হইল।

তরুণ-তরুণীর প্রেমকোরক কাস্তানিল স্পর্শে বিকশিত ফুলের মত মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। তাহাদের গোপন প্রণয়-কাহিনী নিন্দুকের মুখে অবিলম্বে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

সোহনির মাতা কন্যাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন, এবং কুল-কলঙ্কিনী বলিয়া গালি দিলেন। পিতা কথাটা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তাহার চক্ষে সোহনি তখনও অপরিণত বুদ্ধি সরলা বালিকা মাত্র। কিন্তু তাঁর এ ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যাকালে তুল্লা নমাজ পড়িতেছিলেন, তখন মিহওয়ালের বাজার হইতে ফিরিবার সময়। প্রিয় সন্দর্শনে অতিমাত্র ব্যাকুলা সোহনি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া উপাসনা-রত পিতার সম্মুখ হইতেই ছুটিয়া যাইতেছিল, উপাসনায় বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়া তুল্লা কন্যাকে তিরস্কার করিলে প্রেমাকুলা সোহনি আত্মবিস্মৃত হইয়া পিতার মুখের উপরই বলিয়া বসিল, "যে ভগবানের সৃষ্ট একজন জীবের জন্য আমি এতদূর আত্মহারা হয়েছি, সেই ভগবানের তুমি আরাধনা করছ, কিন্তু বাবা, তোমার আরাধনায় আমার মত তন্ময়তা নেই, সুতরাং এ আরাধনা মিথ্যা।"

মনের উচ্ছ্বসিত অধীর আগ্রহ ও ব্যাকুলতায় পিতার কাছে কথাটা অতর্কিতে বলিয়া ফেলিয়া লজ্জিত ত্রস্ত হইয়া সোহনি পলাইয়া গেল। কিন্তু তুল্লা সেদিন সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, ফলে মিহওয়ালের চাকরী গেল, এবং সোহনির বিবাহ অচিরে তা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে গুজরাত নিবাসী এক যুবকের সহিত দেওয়া হইল।

মিহওয়ালের পিতা নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান পাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিলেন, কিন্তু মিহওয়াল ফিরিল না, সে পিতাকে স্পষ্ট কথায়, দৃঢ় বাক্যে জানাইল, সে ভগবদ্ আরাধনায় জীবন সমর্পণ করিয়াছে, সংসারে আর ফিরিবে না। পুত্রকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, দুঃখিত ও হতাশ হইয়া পিতা দেশে ফিরিয়া গেলেন।

সুযোগ বুঝিয়া মিহওয়াল একদিন রাত্রে সন্তরণে নদী পার হইয়া সোহনির সহিত দেখা করিল। কিন্তু সোহনির স্বামী-গৃহে তাহাদের মিলনের সুযোগ ছিল না, তাই সোহনি গভীর নিশুতি রাত্রে, একটী মৃৎকলসীর সাহায্যে সাঁতার দিয়া, নদীপারে মিহওয়ালের কুটীরে আসিয়া মিলিত হইত। এইরূপ মিলন তাহাদের প্রায় নিত্যই ঘটিতে লাগিল।

সোহনি মাছ খাইতে বড়-ভালবাসিত, তাই ফকির মিহওয়াল, ভগবানের উপাসনা ভুলিয়া সারাদিন নদীতে মাছ ধরিত, এবং রাতে সেই মাছ যত্ন করিয়া প্রিয়তমার জন্য রাঁধিয়া রাখিত।

এই ভাবে, প্রেমের মধুর-মদির আবিষ্ট আত্মহারা তরুণ তরুণী দুটির দিনগুলি স্বপ্নের মতই কাটিতেছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন তাহাদের একদিন অতর্কিতে ভাঙ্গিয়া গেল, বড় নির্মম ভাবে।

সোহনির ননদিনী লালি মিহওয়ালকে দেখিয়াছিল এবং তাহার তরুণ রূপ-যৌবনে মুগ্ধ হইয়াছিল। ভ্রাতৃবধূ সোহনি যে সেই মিহওয়ালের প্রণয়িনী, ইহাও সে জানিত।

সোহনির এই নৈশ-অভিসারের কথা জানিতে পারিয়া লালি ঈর্ষাবশে একদিন সন্ধ্যার সময় চুপি চুপি গিয়া নদীতীরে সোহনির লুক্কায়িত মৃৎকলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আর একটী কাঁচা মাটীর কলসী সেইখানে রাখিয়া আসিল।

কিন্তু সোহনি স্বামী-গৃহে আসিয়াও মিহওয়ালকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলিতে পারিল না। মিহওয়ালও গুজরাত ত্যাগ করিতে পারিল না। সে ফকির বেশে নদীতীরে কুটীর বাঁধিয়া সেইখানে বাস করিতে লাগিল, সোহনির দর্শন আশায় লুব্ধ হইয়া।

সেদিন ভয়ানক দুর্যোগ অবিরাম ঝড়-বৃষ্টি, নদীতে তুফান উঠিয়াছে। সেদিন মিহওয়ালের দিবসব্যাপী প্রচেষ্টা নিস্ফল হইল,—নদীতে মাছ মিলিল না, শেষে মিহওয়াল নিজের পায়ের গোছ হইতে খানিকটা মাংস কাটিয়া মৎস্যের অভাব পূর্ণ করিল, এবং অধীর আগ্রহে নদীতীরে সোহনির

প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন মিহ্‌ওয়ালের ব্যাকুলচিত্ত আশঙ্কা ও উদ্বেগে, সেই তুফান ক্ষুব্ধ নদীর মতই আলোড়িত হইতেছিল, এই দুর্যোগে বালিকা সোহনি যদি আজ আসিতে না পারে, কিম্বা মিলন-পণ রক্ষার জন্য আসিতে গিয়া এই এই তুফানের মধ্যে যদি তার—শেষ কথাটা মনে করিয়া মিহ্‌ওয়াল ক্ষণে-ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছিল, এবং যুক্তকরে বিপদ-বারণ ভগবানের চরণে প্রিয়তমার কল্যাণ কামনা করিতেছিল। ঝড়-বৃষ্টি আর থামিল না। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া পড়িল।

উৎকণ্ঠিতা, প্রিয়-মিলন ব্যাকুলা সোহনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল। চুপি চুপি শয়ন মন্দির হইতে বাহির হইয়া দেখিল ভয়ানক দুর্যোগ! ঘোর নিবিড় অন্ধকার!

সেই দুর্যোগ-রজনীর নিবিড় মসীকৃষ্ণ অন্ধকাররাশির মধ্যে যেন তার আসন্ন মরণকে দেখিল, দেখিয়া বারেক শিহরিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পরক্ষণেই দয়িতের হতাশা-ক্ষুব্ধ মুখখানি স্মরণ করিয়া সে মনে মনে বলিল, এই যে ঝড় বৃষ্টি তুফান, একি তার প্রিয়তমের মিলন আকাঙ্খার অপ্রতিহত গতি রোধ করিতে পারিবে?—কখনই না!

এই দুর্যোগ-নিশীথিনীর ঘন-বিষাদাচ্ছন্ন সীমাহারা অন্ধকার, এই দিশাহারা উন্মত্ত ঝড়োবাতাসের মাতামাতি, আর্ত্তনাদ, এই ক্ষণে ক্ষণে গর্জ্জনকারী তীব্র বিদ্যুত স্ফুরিত ঘনঘোর মেঘের ঘটা, এই অবিশ্রান্ত উচ্ছ্বসিত বাদল-অশ্রুধারা, সমস্ত পৃথিবী-বাসীকে ভয় দেখাইতে পারে, কিন্তু সোহনির এই বালিকা বয়সের অনাবিল একনিষ্ঠ ভালবাসা তিলার্দ্ধ বিচলিত করিতে পারিবে না।

যাই হোক, প্রবল ঝটিকা-বেগে গাছ-পালা সমূলে উপড়িয়া যাক্‌, বৃষ্টির প্লাবনে পৃথিবী ভাসিয়া যাক, প্রবল ভূমিকম্পে পাহাড় পর্য্যন্ত চুরমার হইয়া যাক্‌, ভীষণ বজ্রাঘাতে সৃষ্টি রসাতলে যাক্‌ তবু সোহনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে, সে প্রাণপ্রিয় মিহ্‌ওয়ালের সহিত মিলিত হইবে।

সোহনি চলিল। সেই অটল অবিচ্ছেদ্য ঘন তমসারাশি ভেদ করিয়া, যে সাক্ষাৎ কৃতান্ত-দূতের মত নির্জ্জন পথের উপর ভীষণ মুখ ব্যাদান করিয়াছিল, যে তীব্র-চকিত চপলা-চমক আলেয়ার আলোর মত ক্ষণে-ক্ষণে বিস্ফুরিত হইয়া একাকিনী বালিকার ভীতি-বিহ্বল চিত্ত কম্পিত ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল, সেই প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ প্রকৃতির ছিন্নমস্তারূপ ভীষণ ভ্রূকুটি, সেই দিগন্ত-ছাওয়া অছিদ্র কালো মেঘের হৃদ্‌-কম্পকারী রুদ্র গভীর গর্জ্জন, ক্ষুদ্র সোহনিকে তার প্রিয়-সম্মিলন-যাত্রার বাধা দিতে পারিল না,—সে চলিল। সেই তার শেষ অভিসার যাত্রা।

•
•

তিমির-ঘন দুর্যোগ রজনীর ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া সোহনি নদীতীরে উপস্থিত হইল, এবং চন্দ্রতারাহীন তমসাচ্ছন্ন মেঘাবৃত আকাশের পানে চাহিয়া যুক্তকরে, করুণ আর্তস্বরে বলিল, "হে ভগবান! তুমি অন্তর্যামী, তুমি জানো অভাগিনী সোহনির প্রেম কত পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক তার অতল গভীর ভালবাসার একমাত্র তুমিই সাক্ষী।"

পরক্ষণেই আত্মহারা প্রেমবিহ্বলা বালিকা ননদির রাখা কাঁচা মাটীর কলসীটী তুলিয়া লইয়া সেই বর্ষণ-স্ফীত, তুফান-সংক্ষুব্ধ প্রবাহিনী-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

খানিক দূর গিয়াই কলসীটী গলিতে আরম্ভ করিল। সোহনি ননদিনীর ষড়যন্ত্রের বিষয় এখন জানিতে পারিল, কিন্তু জানিয়াও ফিরিবার চেষ্টা করিল না, সে তখনও প্রিয়তমের মিলন আশায় অতিমাত্র ব্যাকুল, ভালবাসায় অন্ধ তুফান উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাশি বা আসন্ন মৃত্যুর সহিত যুঝিতে যুঝিতে প্রাণ-পণ শক্তিতে সোহনি সাঁতার দিয়া চলিল, কিন্তু মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া তাহার সকল শক্তি নিঃশেষিত হইল।

তার পর? বার কয়েক ব্যাকুল আর্ত্তস্বরে প্রিয়তম মিহ্‌ওয়ালের নাম উচ্চারণ করিয়া অভাগিনী সোহনির কণ্ঠস্বর চিরতরে নীরব হইয়া গেল। তার ক্ষুদ্র জীবন-বুদ্‌বুদ্‌ সেই তুফান-ক্ষুব্ধ অতল অন্ধকার বারিরাশির মধ্যে চিরতরে বিলীন হইল।

বালিকার সেই শোচনীয় নিদারুণ মৃত্যুতে প্রকৃতি শিহরিয়া উঠিল। বিদ্যুত-চকিত অন্তরীক্ষ হইতে কে যেন

গম্ভীর উদাত্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আয়! আয়! প্রেমময়ী সোহনি!—সুন্দরী সোহনি!—আমার কোলে,—এই দুঃখ-ব্যথা সন্তাপহীন চির-প্রেমের রাজ্যে আয়! পাপ পৃথিবী তোর যোগ্য স্থান নয়।"

মজ্জমানা সোহনির আর্ত্ত আহ্বান-ধ্বনি, নদী-তীরে প্রতীক্ষমান উৎকর্ণ মিহ্‌ওয়ালের কানে গেল, সোহনিকে রক্ষা করিতে সে তৎক্ষণাৎ নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু তার সকল যত্ন নিষ্ফল হইল,—মিহ্‌ওয়াল সোহনিকে তুলিতে পারিল না, নিজেও উঠিল না।

পরদিন জেলেরা মাছ ধরিতে আসিয়া নদীগর্ভ হইতে সোহনি-মিহ্‌ওয়ালের নিবিড় দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ মৃত দেহ উদ্ধার করিল, এবং সোহনির পিতাকে সংবাদ দিল। সোহনির পিতামাতা অতঃপর মিহ্‌ওয়ালের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইলেন, এবং নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতায় বিলক্ষণ অনুশোচনা করিলেন।

সোহনি-মিহ্‌ওয়ালের কবর গুজরাতে এখনো বর্ত্তমান! সে দেশের অধিবাসীরা এই প্রণয়ী যুগলকে প্রেমময় ঈশ্বরের অবতার মনে করে, এবং তাহাদের সমাধির পূজা করিয়া থাকে।

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

পুস্তক-পরিচয়

দার্জ্জিলিং-সাথী—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ সরকার, এম্, এস্, সি, প্রণীত। পৃঃ ১৪৩—মূল্য ৩৲

আগে লোকে তীর্থ কর্‌তে বাড়ী হতে বিদেশে যেত, এখন হয় হাওয়া খাওয়ার জন্য না হয় হাওয়া বদ্‌লাবার জন্য বেড়াতে যায়। বাংলা দেশের মাথার কাছে হিমালয়। এই হিমালয় যে না দেখেছে তার আর বেড়াবার বড়াই করা উচিত নয়। হিমালয়ের অন্য কিছু না দেখলেও কল্‌কাতা থেকে চার শ' মাইলের মধ্যে দার্জ্জিলিং না দেখলে বাঙালীর মনের পুষ্টি বা তৃপ্তি হতে পারে না। কিন্তু দার্জ্জিলিং দেখাও বহু লোকের ভাগ্যে ঘটে না।

কোন জায়গা সুধু চোখ দিয়ে দেখে এলেই হয় না, তাকে খানিকটা বোঝা চাই। দার্জ্জিলিংয়ের পক্ষে এই কাজে আলোচ্য বইখানা খুব সাহায্য করবে। দার্জ্জিলিং জেলার অনেক কিছু দেখ্‌বার ও জান্‌বার ব্যাপার গ্রন্থকার বেশ নিপুণ ভাবে ও সোজা ভাষায় একত্র করে দিয়েছেন। বইয়ের ছবি ও মানচিত্র দেখে অনেকের হয়ত দার্জ্জিলিং যেতে ইচ্ছাও হবে। ঐ দেশের অধিবাসীদের পরিচয় পাওয়া যায়, বেড়াবার পথ ঘাটের খোঁজখবর খুব আছে।

কাজের কথা ছাড়া ভাবকার কথাও এই বইয়ে আছে। জাতি গঠনের দিক থেকে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা আর নানা প্রদেশের উৎকৃষ্টির (culture) বিনিময়ের কথা গ্রন্থকার বিশেষ ভাবে জোর দিয়ে বলেছেন। তাতে দার্জ্জিলিং ও পাহাড়ের বাসিন্দাদের জংলী ও পাহাড়ী বলে না ভেবে আমাদেরই জাত-ভাই বলে মনে কর্‌তে শিখব। বইয়ের গোড়ায় একখানা রঙীণ ছবিতে দেখানো হয়েছে সরু পথ সম্ভবতঃ এদেশ থেকে ধর্ম্ম ও সভ্যতা 'মোক্ত' ও তিব্বতে নিয়ে যাচ্ছেন। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় একালেও যেন আমরা সুধু বেড়াতে না গিয়ে ঐ অঞ্চলের সঙ্গে আমাদের মনের হারানো যোগসূত্রটি আবার গড়ে তুলি।

শ্রীরমেশ বসু

মহাভারত ও মধ্যমব্যায়োগ

শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম-এ, পি-এইচ-ডি

ত্রিবান্দ্রাম নিবাসী বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর উদ্যম ও অনুসন্ধিৎসার ফলে যে কয়খানি বিলুপ্ত-প্রায় প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ সম্প্রতি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে, মধ্যমব্যায়োগ তাহাদের অন্যতম, এই গ্রন্থখানি এবং ইহার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নাটক মহাকবি ভাস প্রণীত কিনা এবং এগুলি কোন শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে এই সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। ভারতবর্ষ ও শ্বেতবর্ষের মনীষীগণ ঐ সকল তথ্য নিরূপণের জন্য বহু পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু নাটকগুলির আখ্যানভাগ-সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অনেকগুলি গল্প রামায়ণ ও মহাভারতের অক্ষয়-ভাণ্ডার হইতে গৃহীত। কিন্তু প্রচলিত রামায়ণ ও ভারতী কথার সহিত এই সকল আখ্যানের বিস্তর প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়। এই পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য কারণ উহাদ্বারা মহর্ষি বাল্মিকী ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-প্রোক্ত মহাগ্রন্থদ্বয়ের উপায় ও পরিণতির ইতিহাস অনেকখানি সুস্পষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়. এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। যাঁহারা প্রাচীন বৈয়াসকি সংহিতার পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সঙ্কলনে যত্নবান তাঁহারা শাস্ত্রী প্রকাশিত মধ্যমব্যায়োগ নামীয় নাটকখানি হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারেন কিনা সেই বিষয়ে দুই একটি কথা বলাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের পুত্র হিড়িম্বা-তনয় রাক্ষসবীর ঘটোৎকচের কাহিনী অবলম্বনে মধ্যমব্যায়োগ লিখিত। একদা ঘটোৎকচ মাতার আহারের নিমিত্ত তাঁহারই আজ্ঞায় মনুষ্য-শিকারের অন্বেষণ করিতে করিতে পরিবারবর্গ বেষ্টিত ব্রাহ্মণ কেশবদাসের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। তিনি কেশবদাসের মধ্যম পুত্রকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত হইলে তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া অদূরে ব্যায়ামনিরত ভীমসেন সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং স্ত্রীপুত্রসহ দ্বিজসত্তম কেশবদাসকে মোচন করিবার জন্য হিড়িম্বা-নন্দনকে অনুজ্ঞা করিলেন। ঘটোৎকচ অস্বীকৃত হইলে পিতাপুত্রে যুদ্ধ হয়, পরে ব্রাহ্মণকুমারের পরিবর্ত্তে স্বয়ং ভীমসেন হিড়িম্বা-সকাশে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন ঘটোৎকচ ব্রাহ্মণগণকে মুক্তিদান করেন। অনন্তর হিড়িম্বা-তনয় মাতার নিকট বৃকোদরের প্রকৃত পরিচয় পাইলে পিতা-পুত্রে মিলন হয়। এই গল্পটি প্রচলিত মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহার সহিত মহাভারতের আখ্যান-ভাগের সম্বন্ধ বিচার করিতে হইলে প্রচলিত মহাভারত ব্যতীত অপর কোনও ভারত-সংহিতা ছিল কিনা সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর্ত্তব্য। যে মহাকাব্য বর্ত্তমান সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস প্রণীত মহাভারত বলিয়া প্রচলিত উহা যে লক্ষ শ্লোকাত্মক তাহা সকলেই অবগত আছেন।

> ইদং শত সহস্রন্তু লোকানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
> উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমুত্তমম্। ১।১।১০১

২১৪ গোপ্তাব্দে (খৃ ৫৩৩ ৫৩৪) উৎকীর্ণ মহারাজ সর্ব্বনাথের খোহ লিপিতে ও বেদব্যাস-রচিত মহাভারত গ্রন্থ শতসাহস্রী সংহিতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে এই মহাগ্রন্থের আয়তন যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ছিল ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আদিম মহাভারত অশ্বঘোষ, পতঞ্জলি এমন কি পাণিনি ও আশ্বলায়নেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে এমন অনেক কথা আছে যাহা পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কোনক্রমেই মনে করা যাইতে পারে না। প্রচলিত মহাভারতের আদি ও স্বর্গারোহণ-পর্ব্বে হরিবংশ ও অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

হরিবংশস্ততঃ পর্ব্ব পুরাণং খিল সংজ্ঞিতম্।
বিষ্ণু পর্ব্ব শিশোশ্চর্য্যা বিষ্ণোঃ কংসবধস্তথা।
ভবিষ্যং পর্ব্ব চাপ্যক্তং খিলেষেবাদ্ভুতং মহৎ। ১।২।৮২-৮৩

* * *

হরিবংশ-সমাপ্তৌ তু সহস্রং ভোজয়েদ্দ্বিজান্। ১৮।৬।৭১

* * *

অষ্টাদশপুরাণানাং শ্রবণাদ্ যৎ ফলং ভবেৎ
তৎফলং সমবাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ। ১৮।৬।৯৭

বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়-সমস্যা পর্ব্বোধ্যায়ে, মাৎস্যকপুরাণ ও বায়ুপুরাণের নামোল্লেখ আছে এবং বায়ুপুরাণে যে অতীত এবং অনাগত উভয়বিধ ঘটনা লিখিত আছে উহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে,—

সর্ব্বাঃ প্রজা মনুঃ সাক্ষাদ্ যথান্তরবর্ত্তত
ইত্যেতন্মাৎস্যকং নাম পুরাণং পরিকীর্ত্তিতম্। ৩।১৮৭।৫৭

* *

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতমতীতানাগতং ময়া।
বায়ু প্রোক্তমনুস্মৃত্য পুরাণ-মৃষিসংস্তুতম্। ৩।১৯১।১৬

পাণিনি ও অশ্বলায়নের পূর্ব্বে যে হরিবংশ এবং অতীত ও অনাগত রাজগণের কাহিনী-পূর্ণ বায়ু এবং মৎস্য প্রমুখ অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইয়াছিল ইহা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। অবশ্য প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে পুরাণের উল্লেখ নাই এমন কথা বলা যায় না। 'কিন্তু ঐ পুরাণ কখনই আন্ধ্র, আভীর, গুপ্ত প্রভৃতি ভবিষ্য রাজবংশের কাহিনী সম্বলিত বর্ত্তমান মহাপুরাণের সহিত অভিন্ন হইতে পারে না। যে হরিবংশে দীনার নামক রোমক মুদ্রার উল্লেখ আছে* উহাও পাণিনির পূর্ব্বযুগের রচনা হইতে পারে না। বর্ত্তমান মহাভারতে কিন্তু অন্ধ্র শক আভীর রোমক এমন কি হুনদিগেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

আন্ধ্রাঃ শকাঃ পুলিন্দাশ্চ যবনাশ্চ নরাধিপাঃ।
কাম্বোজা বাহ্লিকাঃ শূরা স্তথাভীরাঃ নরোত্তমঃ।
ন তদা ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ সর্ব্বধর্ম্মমুপক্ষীযতি। ৩।১৮৮।৩৫-৩৬

* * *

ঔষ্ণীকানন্তবাসাংশ্চ রোমকান্ পুরুষাদকান্। ২।৫১।১৭

* * *

চীনান্ শকান্ তথা চোড্রান্ বর্ব্বরান্ বনবাসীনঃ
বার্ষ্ণেয়ান্ হারহূণাংশ্চ কৃষ্ণান্ হৈমবতাংস্তথা। ২।৫১।২৪

যবনেরা যে মহারাজ দত্তমিত্রের (Demetrios) নেতৃত্বে সিন্ধুসৌবীরে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল তাহার আভাস আদিপর্ব্বে পাওয়া যায়:—

ন শশাক বশে কর্ত্তুং যং পাণ্ডুরপি বীর্য্যবান্।
সোঽর্জ্জুনেন বশং নীতো রাজাসীদ্ যবনাধীপঃ।
অতীব বলসম্পন্নঃ সদা মানী কুরূন্ প্রতি।
বিপুলো নাম সৌবীরঃ শস্তঃ পার্থেন ধীমতা।
দত্তামিত্র ইতি খ্যাতং সংগ্রামে কতনিশ্চয়ম্। ১।১৩৯।২১-২৩।

এই দত্তামিত্রই ক্রমাদীশ্বর কর্ত্তৃক উল্লিখিত দত্তামিত্রী নাম্নী সৌবীর নগরীর প্রতিষ্ঠিতা। অর্জ্জুনের সহিত দত্তামিত্রের সংগ্রাম অনেকের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু অনেক মহাকবিই এইরূপ দোষে (anachronism) দোষী। মহাকবি কালিদাস কি দিগ্বিজয়ী রঘুর নিকট বক্ষু তীরস্থিত হূনগণের পরাভবের উল্লেখ করেন নাই ?

মহাভারতের সমসাময়িক কালে হূনগণ যে চীন সীমান্তে আবদ্ধ ছিলনা, পরন্তু পারসিকদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিল নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ;—

যবনাশ্চীনকম্বোজাঃ দারুণাম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
সকৃদ্গ্রহাঃ কুলত্থাশ্চ হূনা পারসিকৈঃ সহ। ৬।৯।৬৫-৬৬

হূন-পারসিক সংযোগ আশ্বলায়ন বা পাণিনির পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল ইহার কোন প্রমাণ নাই। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে এই সংযোগের কাল খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দ। সুতরাং বর্ত্তমান মহাভারত যে প্রাক্‌পাণিনির ভারত নহে এবং ইহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে পূর্ব্বে উহা চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মক ছিল (অর্থাৎ উহার আয়তন বর্ত্তমান বিরাট গ্রন্থের চতুর্থাংশেরও কম ছিল,—

চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ, ১।১।১০২

---

* প্রেষিতং দেবরাজেন দিব্যাভরণমম্বরং।
দ্রুমবর্ণাংশ্চ সর্ব্বেষাং ভাগা দীনারকাদশ। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৫৫, ৫০,

চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মিকা সংহিতার পূর্ব্বে উহা অপেক্ষাও সংক্ষিপ্ত কোন ভারত কাব্য ছিল কিনা সে কথা বলা সহজ নহে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন যে তাহার পূর্ব্বে ৮৮০০ শ্লোকের একখানি মহাভারত ছিল। কিন্তু এই ধারণা নিতান্তই ভিত্তিহীন, ৮৮০০ এই সংখ্যা দ্বারা বর্ত্তমান গ্রন্থের কূটশ্লোকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে

> গ্রন্থ-গ্রন্থিং তদা চক্রে মুনি গূঢ়ং কুতূহলাৎ,
> যস্মিন্ প্রতিজ্ঞয়া প্রাহ মুনির্দ্বৈপায়নস্ত্বিদম্ ।
> অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ ।
> অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি সঞ্জয়ো বেত্তি বা ন বা ।
> তং শ্লোককূটমদ্যাপি গ্রথিতং সুদৃঢ়ং মুনে ।
> ভেত্তুং ন শক্যতেঽর্থস্য গূঢ়ত্বাৎ প্রশ্রিতস্য চ। ১। ৮০-৮২।

৮৮০০ শ্লোকের যে একখানি পূর্ণাবয়ব গ্রন্থ ছিল উহা উল্লিখিত উক্তিদ্বারা সমর্থিত হয় না। কিন্তু এ কথাও স্বীকার্য্য যে চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রী সংহিতা আদিম বৈয়াসকি সংহিতার সহিত অভিন্ন নাও হইতে পারে। যদি উহাদের অভিন্নতা মানিয়াও লওয়া যায় তাহা হইলেও বর্ত্তমান মহাভারতের ত্রি-চতুর্থাংশেরও অধিক পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়া উহার অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। মহাভারতের অনেক অংশই যে প্রক্ষিপ্ত সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর উলীকর প্রভৃতি এদেশীয় মনীষিগণও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু নূতন জিনিস প্রক্ষিপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে আখ্যানভাগের আর কোন পরিবর্ত্তন কি হয় নাই? প্রাচীন আখ্যায়িকাগুলি কি সকলই অব্যাহত আছে? দ্রোণপর্ব্বের কতিপয় শ্লোক পাঠে কিন্তু মনে হয় যে প্রাচীন মহাভারতে এমন অনেক আখ্যান ছিল অথবা মহাভারতকার এমন অনেক আখ্যানের বিষয় অবগত ছিলেন যাহার আভাস কেবল প্রচলিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু মূল আখ্যান বিলুপ্ত হইয়াছে। এই আখ্যানগুলি সর্ব্বপ্রাচীন বৈয়াসকি সংহিতার অন্তর্গত ছিল কিনা তাহা এখন বিচার্য্য নহে। কিন্তু প্রচলিত মহাভারত সঙ্কলনের পূর্ব্বে যে এগুলির অস্তিত্ব ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

দ্রোণপর্ব্বের ঘটোৎকচবধ পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে যে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে মহাবীর কর্ণ ইন্দ্রদেব-প্রদত্ত এক পুরুষ ঘাতিনী শক্তিদ্বারা ভীমতনয় ঘটোৎকচের প্রাণসংহার করিলে পাণ্ডবগণকে শোককাতর দেখিয়া অসাধারণ ধী-শক্তি-সম্পন্ন বাসুদেব বলিয়াছিলেন, "যদি সূতপুত্র বাসবদত্ত শক্তি-দ্বারা ঘটোৎকচকে নিহত না করিত তাহা হইলে আমাকেই বৃকোদর পুত্রকে বধ করিতে হইত। আমি কেবল তোমাদের মঙ্গল সাধনের নিমিত্তই পূর্ব্বে উহার জীবননাশ করি নাই। এই নিশাচর ব্রাহ্মণবিদ্বেষী যজ্ঞনাশক ধর্ম্ম-লোপ্তা ও পাপাত্মা এই নিমিত্ত কৌশলক্রমে নিপাতিত হইল।"

> যদি হ্যেনং নাহনিষ্যৎ কর্ণঃ শক্ত্যা মহামৃধে
> ময়া বধ্যোঽভবিষ্যৎ স ভৈমসেনির্ঘটোৎকচঃ ।
> ময়া ন নিহতঃ পূর্ব্বমেষ যুষ্মৎ-প্রিয়েপ্সয়া,
> এষ হি ব্রাহ্মণদ্বেষী যজ্ঞদ্বেষী চ রাক্ষসঃ,
> ধর্ম্মস্য লোপ্তা পাপাত্মা তস্মাদেষ নিপাতিতঃ, ৭।১৭৯।২২-২৭

ঘটোৎকচের ব্রাহ্মণদ্বেষ সম্বন্ধে কোন কাহিনী বর্ত্তমান মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন প্রাচীন ভারত-সংহিতায় উহা না থাকিলে বর্ত্তমান গ্রন্থে উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকগুলি কি নিমিত্ত স্থান পাইল এবং উহার সার্থকতাই বা কি? শ্লোকগুলি পাঠে স্বতঃই মনে হয় যে উহাদের রচয়িতা হিড়িম্বা-তনয়ের ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ-মূলক কোন আখ্যানের বিষয় অবগত ছিলেন। যাহারা মধ্যম-ব্যায়োগ পাঠ করিয়াছেন তাহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না যে এইরূপ একটি আখ্যান অবলম্বন করিয়া উক্ত নাট্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, শকুন্তলোপাখ্যানের সহিত কালিদাস-প্রণীত অভিজ্ঞান-শকুন্তলার যে সম্বন্ধ ঘটোৎকচের সেই বিলুপ্ত আখ্যানের সহিত মধ্যম-ব্যায়োগেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। নাটক-কার অবশ্য নায়ক-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনেক বিষয়ে মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। নাটকের দুষ্মন্তের শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের মূলে দুর্ব্বাসার অভিশাপ, নাটকের ঘটোৎকচের ব্রাহ্মণ-জন-বিত্রাসিত

করার মূলে অনন্যসাধারণ মাতৃ-ভক্তি। প্রিয়ম্বদা অনুসূয়া প্রভৃতির ন্যায় কেশবদাস তপস্বী-মধ্যম প্রভৃতি চরিত্র নাটককারের সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নহে।

কিন্তু মধ্যমব্যায়োগের মূল ঘটনা যে মহাভারত-কারের অবিদিত ছিলনা এবং খুব সম্ভব প্রাচীন কোন ভারত-সংহিতার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল দ্রোণপর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, সুতরাং ভারত-তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদের পক্ষে গণপতি শাস্ত্রী প্রকাশিত নাটকগুলির আলোচনার যে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী

বিলাতের প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্তা রেণুকা দেবী

(২)

এদেশের নরনারী সবল-সুস্থ-দেহ। কর্ম্মপটুতা ও প্রতি-কার্য্যেই দৃঢ়তার ভঙ্গীটুকু ভারতবাসীর সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে রুগ্ন-ভগ্ন-জীর্ণ-দেহ কাহারও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। স্বাস্থ্যই জাতীয় উন্নতির মূল ভিত্তি--- ইহা ইহারা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছে ও নানা উপায় ও ব্যবস্থা শৃঙ্খলার সহিত দেশময় বিস্তার করিয়াছে। আমাদের দেশে অতি অল্পসংখ্যক লোকই শারীরিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখেন। "পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট" নামে যাহা হইয়াছে তাহারও কোন সুব্যবস্থা নাই। শক্তিমান জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রতি শিশুটীকে সুস্থ সবল যুবক-যুবতীতে পরিণত করিতে ও স্বাস্থ্যবান যুবক-যুবতীকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করা উচিত। সুস্থ শিশু পাইতে হইলে তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে হয় ও সেজন্য ভাবী-মাতার স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এদেশে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা বহুপূর্ব্ব হইতেই যথাযথ ভাবে ছিল. কিন্তু গত মহাযুদ্ধের অবসানে যখন সমগ্রদেশ আহত ও পঙ্গু দ্বারা পূর্ণ হইয়া পড়ে তখন রাজকর্ম্মচারীরা (পার্লিয়ামেণ্ট) জাতীয় স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়েন ও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে "মিনিষ্ট্রি অব হেল্থ এ্যাক্ট" পাশ করাইয়া আরও সুশৃঙ্খলায় যাহাতে সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা দেশময় প্রচলিত হয় তাহার বিধির সূচনা করেন। এই আইনমতে স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী সাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য 'জন-সভা'র নিকট দায়ী থাকেন। নিত্যনূতন আবিষ্কৃত উন্নততর প্রণালী ও প্রতিষেধক ঔষধাদি সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রয়োগের ব্যবস্থা দ্বারা সমগ্র দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতিই ইহার প্রধান লক্ষ্য। এই অত্যল্পকাল মধ্যেই উক্ত স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মের প্রসারতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহার কল্যাণে এদেশের একটী মাত্র লোকও সুচিকিৎসার অভাবে মারা যাইতে পারে না। প্রতি সহরে প্রতি গ্রামে প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা ততোধিক কেন্দ্র আছে। ইহাদের অধীনে বহু স্বাস্থ্য-চিকিৎসক (হেল্থ অফিসর) ও শিক্ষিতা ধাত্রী কার্য্য করেন। প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক তাঁহার সীমাবদ্ধ স্থানের লোকদিগের স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী থাকেন। প্রতি হাঁসপাতালেই ইঁহাদের প্রেরিত রোগীর জন্য পৃথকভাবে রক্ষিত শয্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। যে কোনও সময়ে যে কোনও লোকের অসুখের সংবাদ পাইবামাত্র তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ করা হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে শুশ্রূষাকারিণী প্রেরিত হয়। শুধু তাহাই নহে। সঙ্গতিহীন পরিবারে পথ্যাদির ব্যবস্থাও এই সমিতি কর্ত্তৃক সরবরাহ করা হয়। পরিবারস্থ কেহ সন্তান-সম্ভাবিতা হইলে ইঁহাদের সংবাদ দিতে হয়, তখন হইতেই ভাবী-মাতার সর্ব্ববিধ ভারই ইঁহারা লইয়া থাকেন। শিশু এখানে জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। বাটী সন্তানপ্রসবের অনুপযুক্ত বোধ হইলে হাঁসপাতালে তাহাকে লওয়া হয় এবং প্রসবান্তে শিশু ও মাতা বহুদিন পর্য্যন্ত ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিশু ও প্রসূতীর মৃত্যুর হার কত অধিক ছিল এবং ইঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় কত হ্রাস হইয়াছে নিম্নলিখিত তালিকা হইতে সহজেই অনুমিত হইবে।

তালিকা

বিলাতে গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের সময় জননীর মৃত্যুর সংখ্যা

১৯১৪	১৯২০	১৯২১	১৯২৫	১৯২৮
৩৬৬৭	৪১৪৪	৩৩২২	২৯০০	২৯২০

[ক্রমশঃ]

শ্রীরেণুকা দেবী
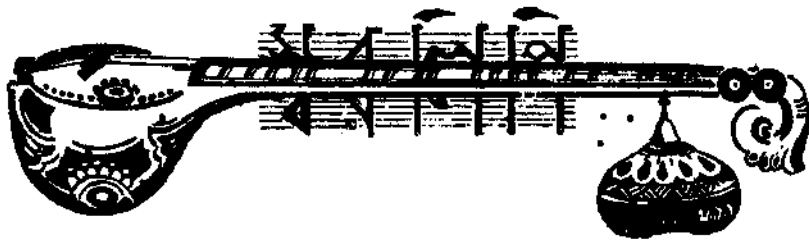
অসমীয়া গান

নাও ল হিপারলৈ নাওরিয়া !
যা ততাতৈয়াকৈ ঐ
ক'রে নাওরিয়া ভই ।
ধারে কাটে পানী, নাওত নাই লাহনী
ক'তে এরিলি বঠা নাওরিয়া !
ক'তে এরিলি ছৈ ।

(মোর) পা পরৈপরি কঁপে হাতে ভরি,
বতর অগাদৈয়া ক'রে নাওরিয়া ।
পানী সেওলীয়া নৈ ঐ
ক'রে নাওরিয়া ভই ।

ই ঘাটে নে যাবি গরা খহনীয়া,
তি ঘাটে নে যাবি ভর, নাওরিয়া !
পারে ঘাট আহিলি পৈ ।
(তোর) ডিঙিরে মালসি দিবে ঐ বাৰসি
নে মোক হিপারে কৈ, নাওরিয়া !
গরাকী আছে মোর নৈ ঐ,
করে' নাওরিয়া ভই ॥

রচনা—শ্রীযুক্ত কমলানন্দ ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত সুরসাগর

মিশ্র—কার্ফা

II সা -রা মা পা । পা পধা পধা -র্সা I র্সা র্রর্সা র্সণা ণা । -া -া -া -ধপা I
না ও ল • হি পা র • লৈ • • না ও • রি • য়া • • • • •

I পা -মপা -ধা মা । মগা -রা মরা গা I গসা -া া -া । সপা -রা -সা -া II
যা • • • ত তা • • তৈ • য়া কৈ • • • • ঐ • • • •

I [গ]জ্ঞা জ্ঞা -া জ্ঞা। রা -জ্ঞা সা রা I ন্া -সা -া -া। -া -া -া -া II
কো রে ০ না ও ০ রি য়া ত ই ০ ০ ০ ০ ০ ০

I { পা পা পা মা। মা -জ্ঞা জ্ঞা -মা I পা ণা পণা -র্সা। র্সা র্সা র্সা -া } I
{ বা রে কা টে পা ০ নী ০ না ওত না ০ ই আ হ নী ০ }

I র্সা র্সর্জ্ঞা -া র্জ্ঞা। র্রা র্রা র্সা র্রা I ণা ণা ণা -র্রা। র্সা -া -া -া II
কো তে ০ ০ এ রি লি ব ঠা না ও রি ০ য়া ০ ০ ০

I র্সা র্সা -র্রা র্সা। ণা ণা ধা পা I পা ধা গপা -ধর্সা। [র্স]ণা -া -া -ধপা I
কো তে ০ এ রি লি ব ঠা না ও রি ০ ০ ০ য়া ০ ০ ০ ০

I পা মপা -ধা মা। মগা -রা সরা -গা I [গ]সা -া -া -া। -া -া সা -া I
কো তে ০ ০ এ রি ০ ০ লি ০ ০ ছৈ ০ ০ ০ ০ ০ মো র্

I সা -জ্ঞা রা জ্ঞা। রা জ্ঞা সা রা I সা রা -পা মা। পা -া সা -া I
গা ০ থ রে থ রি কঁ পে হা তে ০ ভ রি ০ মো র

I সা -জ্ঞা রা জ্ঞা। রা জ্ঞা সা রা I সা রা -পা মা। পা -া -া -া I
গা ০ থ রে থ রি কঁ পে হা তে ০ ভ রি ০ ০ ০

I পা পা -া পা। পধা -পা মগা -মা I পা ধা পধা ধর্সা। র্সর্রা -র্সা ণধা -পা I
ম ও র্ অ পা ০ ০ দৈ ০ য়া কো রে না ০ ও ০ রি ০ ০ য়া ০ ০

I পা মপা -ধা মা। মগা -রা সরা গা I [গ]সা -া -া -া। [গ]পা -রা -সা -া I
পা খী ০ ০ সে ডে ০ ০ কী ০ য়া দৈ ০ ০ ০ ঐ ০ ০ ০

I [গ]জ্ঞা জ্ঞা -া জ্ঞা। রা -জ্ঞা সা রা I ন্া -সা -া -া। -া -া -া -া II
কো রে ০ না ও ০ রি য়া ত ই ০ ০ ০ ০ ০ ০

শিশু-মনের চলচ্চিত্র

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২

সন্ধ্যা লাগে লাগে।

গোধূলির স্বর্ণ-ছায়া খেলার মাঠে যেন কাঁচা সোনা ছড়াইয়া দিয়াছে। আমাদের সাত-সরিকের বড় বাড়ীর সমুখে বড় মাঠ। বেলা শেষে সেখানেই ছেলের দলের মজলিস জমে।

বালির কাগজ, তলদা বাঁশের চিকণ চটা আর 'বলা'র আঠা দিয়া মণিদা "দোয়ারী চিলে" তৈয়ার করিয়াছিলেন। নীল আকাশের শান্ত সমাহিত পুরভবনে সেই বৃহৎ ঘুড়ির বাজখাই শব্দ সমস্ত শিশুমনকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। আমরা নিষ্পলক নেত্রে আকাশে ঘুড়ির অবাধ লীলা-খেলা অবাক বিস্ময়ে দেখিতেছিলাম।

অতি সন্তর্পণে মণিদাকে বলিলাম, "দা ও না দাদা! একবার লাটাইটা আমার হাতে দাওনা।

বিজ্ঞের ভাণ করিয়া দাদা উত্তর দিল, "হাঁ তা হলেই হয়েছে, সমস্ত জড়া-ঘড়া বেধে যাবে।"

মণিদার অবহেলা আমার সমস্ত অন্তরকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। আমি আমার সঙ্গীদের ডাকিয়া বলিলাম, "চল্‌রে, ঘুড়ির আর কি দেখবি।"

কথামালার শিয়াল ঠেকিয়া শিখিয়াছিল যে আঙ্গুর ফল টক। আমাদেরও জীবনে বহুবার শিয়ালের মনস্তাপ সহিতে হয়।

একপাশে যাইয়া সদ্য পতিত গুবাক-পত্র নাচাইতে নাচাইতে আমরা ঝিঁঝিঁ ধরিবার মন্ত্র আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম। মন্ত্রের মধ্যে যাদু আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের কোলাহলের ঐক্যতান মুগ্ধ ঝিল্লীকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলে। সুরের যাদু তাহাকে মৃত্যু-মুখে টানিয়া লয়।

আমরা সকলে একত্র গাহিতে লাগিলাম—

গুয়োর পাতা নড়ে চড়ে
ঝিঁঝিঁর মাথায় টাক পড়ে।
ও ঝিঁঝি তোর মাকে
দেখবি যদি আয়।"

ঝিল্লীর মাতৃভক্তির দরদ কতখানি জানি না। কোনও প্রাণীতত্ত্ববিদ এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা জানি না, তবে আমাদের মন্ত্রের মৌতাতে ঝিঁঝিঁ বেচারী প্রাণ হারায়। কোঁচার আঘাতে সুন্দর পতঙ্গগুলি আমাদের কৌতুকের ও উল্লাসের সামগ্রীতে পরিণত হয়।

খেলা কতক্ষণ চলিত জানি না। কিন্তু মণিদা বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকিয়া বলিল, "বাড়ী পালা,—ঝড় আসছে।"

চাহিয়া দেখি শ্রাবণ-আকাশের ঈশাণ-কোণে কৃষ্ণ-মেঘের ঘন-ঘটা। কালো মেঘের জমাট কালো রূপে চোখ জুড়াইয়া যায়। মণিদা জোরে জোরে লাটাই জড়াইতেছিল, কিন্তু ঘুড়ি নামাইবার পূর্ব্বেই দমকা বাতাস মাতাল ঘোড়ার মত ছুটিয়া আসিল। মণিদার সাধের ঘুড়ি বাতাসের ঝাপ্‌টায় মাটীতে ঘা খাইয়া চৌচির হইয়া গেল।

আমরা সবাই ঝড়ের ধূলা বুকে মাখিয়া তাথৈ নৃত্য আরম্ভ করিলাম, আর মণিদাকে ভ্যাংচাইয়া বলিতে লাগিলাম, "বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে।" ঈর্ষ্যা মানুষের মনের আদিম সয়তানদের অন্যতম। মানুষ তাই পরের ভাল দেখিতে পারে না। অপরের কুশলে আমার গাত্রজালা স্বাভাবিক পশুধর্ম্ম। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাভাবিক পশুধর্ম্মের সংস্কৃতরূপ। অপরে ভাল হইয়াছে, আমিও ভাল হইব, এই বাসনা সহজে মানুষের মনে জাগে না। মানুষের কৃষ্টি বহুসাধনায় আপনাকে নির্ম্মল করিতে পারিয়াছে।

মণিদা হয়ত এই কৌতুকের শাস্তি ভাল ভাবেই দিত, কিন্তু ঘুড়ির মায়া তাহার মনকে কাতর করিয়া রাখিয়াছিল।

আমরা ঝড়োহাওয়ার মধ্য দি ঘরের পানে ছুটিতে ছুটিতে গাহিতে লাগিলাম।

আয় বৃষ্টি হেনে
(মাছের) মুড়ো দেব কিনে।

কেহ হয়ত উল্টা গাহিল,

কচুর পাতায় করম চাঁ
যা বৃষ্টি পেমে যা।

কিন্তু জয় আমাদেরই হইল। মুষল ধারে বৃষ্টি নামিল। কয়েকদিন খরার পরে তপ্ত বসুধাকে স্নেহালিঙ্গনে ভুলাইতে বৃষ্টি নামিয়াছিল। তাহার সে আকুলতা আমাদিগকেও মাতাইয়া তুলিল। মহানন্দে বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিলাম।

বর্ষার সেই উদ্দাম রূপের কথা আজও যেন মনে পড়ে। চারি পাশের শ্যামল তরু-শ্রেণী নত মস্তকে বৃষ্টিধারায় আলিঙ্গন লাভ করিতেছে। ভীমশব্দে আকাশ পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে বজ্রের কড় মড় ধ্বনি। কিন্তু প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আমরা ভয় পাই নাই। আমরা উল্লাসে নাচিতে নাচিতে বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিলাম।

কিন্তু এ আনন্দ বেশীক্ষণ চলিতে পারিল না। মাতা সন্তানের জন্য ব্যাকুল হইয়া ঠাকুরমাকে খোঁজে পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের দুষ্টামির প্রতিফল বৃদ্ধাকে ভোগ করিতে হইল। স্নেহাদ্রস্বরে আসিয়া বুড়ী ডাকিলেন, "অজু লক্ষ্মী দাদা আমার, ঘরে চল।" ফিরিতে মন সরে না। তাই আদেশ পালন করিতে চাই না, উপেক্ষাও করিতে পারি না। দ্বিধাশঙ্কিতভাবে বলি, "এই যাই ঠাকুমা!

"না দাদা, বাজ পড়তে পারে; মা শেষে বকবেন।"

মায়ের দুইরূপ—করুণ-কোমলা আবার রুদ্র-ভীষণা। মাঝে মাঝে সেই কঠোর মূর্তির পরিচয় পাইয়াছি। তাই দ্বিরুক্তি না করিয়া ঠাকুরমার স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় লইলাম। মা দেখিলে ভৎর্সনা করিয়াই পালা শেষ হইবে না, একথা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাই বাড়ীতে পা দিয়াই লুকাইয়া পরণের কাপড় খুঁজিয়া গা হাত মুছিয়া সাধু সাজিয়া ঠাকুরমার শয়ন-কক্ষে ছুটিয়া গেলাম।

রণজিৎ কাকার ছেলে, আমারই সমবয়সী। সে ঠাকুরমাকে বলিল, "একটা গল্প বল না ঠাকুরমা।" আমিও বলিলাম, "বল ঠাকুমা।" বুড়ী বলিলেন, "আচ্ছা বলছি! কিন্তু আগে শোও।" তারপর বালিস বিছাইয়া কাঁথা গায় দিয়া দিলেন। কাঁথার কথায় ঠাকুরমার রূপদক্ষ নিপুণ হস্তের কথা মনে পড়ে। . .

ঠাকুরমাদের যুগে এখনকার বিচিত্র সূচী-শিল্প চলন ছিল না। অপ্রয়োজনীয় ফুল, লতা, চিত্র আঁকিয়া অর্থ ও সময়ের অপব্যবহার তাঁহারা করিতেন না। বর্তমানের মেয়েরা হয়ত বলিবেন, "প্রাচীনাদের রসবোধ ছিল না।" একথা আর যে কেহ মানুক, আমি মানিতে পারি না। আমার শৈশবের স্মৃতির কথা যখনই মনে জাগে তখনই কলা-বিচিত্র ঠাকুরমার কাঁথার ছবির কথা মনে পড়ে। পাড়ের সুতা দিয়া শত শতদলে সেই কাঁথা সুসজ্জিত।

অন্ন কাঙাল হইয়া বিদেশের কোলে ঘুরিতে হইয়াছে বলিয়া সেই স্নেহ-গাড়-মাখানো জিনিষগুলি সযত্নে রক্ষিত হয় নাই। তাইত আজ দুঃখের নিঃশ্বাস অঝোরে ঝরিয়া পড়ে।

ঠাকুরমার গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত। কাঞ্চনমালা, মধুমালা, সখীসোনা, সুতার-ময়ূর প্রভৃতি কত যে সুর-ভরা রূপ-ভরা রস-ভরা গল্প শুনিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বুড়ী গল্প আরম্ভ করিলেন, "এক অরণ্য জঙ্গল—তার মাঝে এক বিশাল অশথ গাছ—সেই অশথ গাছে থাকে এক সত্যিকালের ব্যাঙ্গম আর ব্যাঙ্গমী···

আমি তখন বুঝিতে শিখিয়াছি তাই বুড়ীর কথায় বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম, "ব্যাঙ্গম কি ঠাকুরমা?"

বড় হইয়া জানিয়াছি বিহঙ্গমের অপভ্রংশ ব্যাঙ্গম। আমার ঠাকুরমা বুদ্ধিমতী ও চতুরা ছিলেন, তিনি অর্থ জানিতেন কিনা জানি না। কিন্তু অর্থ না বলিয়া বলিলেন, "অমন করলে গল্প বলব না বলছি।" সে কথা ঠিক, রূপ-কথার রাজ্যে সবই স্পষ্ট ও পরিচিত হইয়া গেলে আনন্দ মিলে না। রূপ কথা যে মায়ালোক সৃজন করে, তাহার জন্য চাই আধ-বলা আধ-বোঝা, আধ-জানা জিনিষ। কিন্তু সে তর্ক না করিয়া বুড়ী বলিলেন, "কাল থেকে অজুকে আর গল্প বলছি না, কাল হাসি আসবে তাকে আর রণজিৎকে গল্প বলব।"

"আচ্ছা চুপ করছি কিন্তু হাসি কে ঠাকুরমা ?"

"হাসি তোর ছোটপিসীর বড় মেয়ে, সে খুব লক্ষ্মী।"

ছোট পিসীমাকে ইতিপূর্ব্বে দেখিলেও মনে ছিল না। হাসিকেও দেখি নাই। ঠাকুরমা গল্প বলিয়া চলিলেন। কিন্তু আমার মন গল্পের রাক্ষসপুরীর বিপন্না রাজকন্যার প্রতি সহানুভূতি শূন্য হইয়া আগন্তুক পিসীমা ও পিসতুতো বোনের চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিল।

আমি কল্পনায় পিসীমার ও হাসির রূপ গড়িয়া তুলিতে লাগিলাম। গল্পের রাজপুত্তুর তখন ব্যাঙ্গমের উপদেশ মত ক্ষীর-সায়রের অতল তলে সোনার কৌটায় রাক্ষসের প্রাণ আনিতে ডুবিতেছেন। আমার তন্দ্রাতুর চোখে ক্ষীর-সায়রের নিতল কালো জল, নদীর জলে হাসি ও পিসীমার নৌকা, পিসীমা আনীত কর্পূর সুবাসিত খৈয়ের মোয়া তাল পাকাইয়া বসে। হিজিবিজি আবছায়ার মাঝে কখন যে ঘুমাইয়া পড়ি জানি না।

বুড়ী খানিক পরে ডাকেন, "অজু, শুনছিস না।"

স্বপ্ন-লোকের অচৈতন্য জগৎ হইতে মিথ্যা সাড়া দেই, "হুঁ।"

ভোরের রোদের আলো আমাদের উঠানের ডাঁটা বনে হীরা পান্নার হাট বসাইয়াছে। চোখ মেলিয়া বাহির হইয়া শুনি, কে হাঁকিয়া বলিতেছে, "বুধির বাছুর ডাঁটা খেয়ে ফেল্লে।"

আমি ছুটিয়া গেলাম। চাকরে আসিয়া যে বুধির বাছুরকে মারিবে এ আমি সহিতে পারি না। তাহার অবশ্য ইতিহাস আছে। বুধি গাই দিনে তিন চারি সের দুধ দিত তাহার অধিকাংশই আমার পেটে যাইত। তাই বুধি গাইয়ের বাছুরের উপর আমার মায়া জন্মিয়াছিল। বাছুরটিও বড় হইয়াছে শীঘ্রই সে গরু হইয়া দুগ্ধদানরূপ পুণ্য-ব্রতে নিযুক্ত হইবে।

আমি তাহার নাম রাখিয়াছিলাম, "ভগবতী।" কিছু দুর্ব্বাঘাস ছিঁড়িয়া ডাকিলাম, "আয় ভগবতী।" আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ডাঁটার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া ভগবতী পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিল। তাহাকে ভুলাইয়া আব-ঘরে লইয়া চলিলাম। তাহার পর নিকটস্থ আম গাছ হইতে কচি পল্লব পাড়িয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলাম।

রণজিৎ আসিয়া ডাকিয়া বলিল, "দাদা দৌড়ে এস, হাসি এসেছে।"

হাসিকে রণজিৎ আগে দেখিয়াছে, ইহাতে আমার সমস্ত মন বিরূপ হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে যাহার আগমন কল্পনা করিয়াছি, সেই হাসিকে রণজিৎ দেখিয়া ফেলিল, ইহাতে আমার রাগের সীমা রহিল না। আমি রণজিতের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমের ডালেই বসিয়া রহিলাম। নীচে ভগবতী আমার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে কিন্তু তাহার মূক আবেদন বিফলে গেল।

খানিক পরে পিসীমা আসিয়া ডাকিলেন, "কি বাবা! গাছে রয়েছ কেন, এস।"

"না, আমি নামব না।"

"সে কি, তাহলে আমি চ'লে যাই। বাবা যদি রাগ করে তাহলে কার কাছে থাকব?"

ইতিমধ্যে হাসি আসিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে ডাকিল, "বা! অজিত দাদা কেমন বানর হয়েছে।"

হাসির এ কথায় অপ্রতিভ হইয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিলাম।

দুদিনেই হাসির মন জয় করিয়া লইলাম। হাসি অজিত দাদার কথায় ওঠে বসে। কিন্তু হাসিকে আমার কিছু বাহাদুরী দেখাইতে হইবে, তাহা না হইলে কখন সে রণজিতের সাথী হইয়া পড়িবে। কিন্তু যাহা ভয় করা যায়, তাহাই হয়। রণজিতের একটা বড় পুতুল ছিল, হাসিকে তাহা দিয়া সে হাসিকে আপনার সাথী করিয়া লইল।

কি করিব ভাবিয়া পাই না। পরাজয়ের ক্ষোভে ও গ্লানিতে সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া যায়। ছোট বয়সে সাথী ভাঙ্গিয়া গেলে যে কি গভীর মনস্তাপ পাইতে হয়, কেবল ছোট যারা তাহারাই বুঝিতে পারে কিন্তু বলিতে পারে না।

হাসিকে আমার খাবারের বেশী অংশ দিতে চাহিলাম, আমার খেলনা দিতে চাহিলাম, কিন্তু হাসি ভুলেনা, হাসিয়া পলাইয়া যায়।

সারা রাত্রি ভাবিয়া এক উপায় ঠাহর করিলাম।

পরদিন পাশের বাড়ীর সুধীর ও হেনাকে ডাকিয়া আনিলাম। পিসীমা যে মিষ্ট মোয়া আনিয়াছিলেন, তাহার দুইটী দিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইলাম। কিছু দিন পূর্ব্বে রাজমিস্ত্রীরা আমাদের বাড়ীতে একটী দেওয়াল গাঁথিয়াছিল, তাহা দেখিয়া রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখিয়াছিলাম।

ঠাকুরমার একটী তুলসী মঞ্চ ছিল। প্রতিদিন তুলসীকে স্নান না করাইয়া বুড়ীর অন্নাহার হইত না। হিন্দুর অতি আদরের ধন তুলসী, কত যুগযুগান্তরের কল্পনা, ইতিহাস ও কাহিনী, তুলসী তরুর মাঝে মিশানো। ঠাকুরমাকে যাইয়া বলিলাম, "ঠাকুমা! দেখ তোমার মঞ্চের পাশে নতুন তুলসী-মঞ্চ গাঁথব।"

বুড়ী হাসিয়া বলেন, "বেশ।"

অনুমতি লইয়া মহোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। বাড়ীর সর্ব্বস্থান হইতে ইট যোগাড় করা হইল। সুরকী চুণের মসলা তৈরী করা দুরূহ ভাবিয়া কাদা দিয়া গাঁথিব স্থির করিলাম।

সুধীর ও হেনা হইল যোগাড়ে, আর আমি হইলাম রাজ। বাড়ীতে পরিত্যক্ত একটী কর্ণি ছিল, তাহা লইয়া কাজ করিতে বসিলাম। এক ভঙ্গীতে ইট সাজাই, মনোনীত হয় না, আবার নূতন করিয়া করি। মাঝের ফাঁক সারিতে ইট ভাঙ্গিতে হয়।

রণজিৎ দৌড়াইয়া আসে বলে, "দাদা, আমি কাদা করব।" অবজ্ঞায় প্রতিদ্বন্দ্বীর পানে চাই। অবহেলা করিয়া বলি, "পালাও।"

হাসি আসিয়া বলে, "অজিত দা, আমায় কাজে নাও।" বেচারী জানে না তাহাকে কাজে আনিবার জন্যই এই আয়োজন, কিন্তু অত সহজে নমিত হইলে চলে না।

তাই রাগে ও অভিমানে বলি, "যাও, তুমি রণজিতের সঙ্গে পুতুল খেলগে, আমার কাছে কেন?"

হাসি যায় না, অভিমান করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আজ পরিণত বয়সের স্মৃতি ফিরাইয়া হাসির সেই ভঙ্গিমা অনুভব করিতে চেষ্টা করি। হাসি বোনটীর তপ্তকাঞ্চনের মত রঙ, মাথার এক রাশ ঝাঁকড়া চুল,—মোমের পুতুলটি যেন দাঁড়াইয়া আছে। সেই হাসি কালো মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছল ছল করিয়া চাহিয়া থাকে।

তাহার বিষাদভরা মুখের দিকে না চাহিয়া কাজ করিয়া যাই, মঞ্চ গাঁথিয়া ওঠে। হাসিকে শোনাইয়া শোনাইয়া গল্প করি। আমার নিজের একটী ফুল বাগান ছিল। ফুলকে আমি জীবনে গভীর ভাবে ভালবাসি। ফলের চেয়ে ফুলের প্রতি অনুরাগ জীবনে সার্থকতা আনে নাই, তাই কল্পনা বিলাসী আমাকে প্রিয় পরিজনেরা গালি দিবার সুযোগ পাইলে ছাড়েন না। কিন্তু কি করি ফুলের দেবতা হয়ত শৈশবের কোমল হিয়ায় আপন প্রীতির রেখা আমার অন্তরে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমার সেই ফুলবাগানে একটী মোরগ ফুলের চারা আপনা হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তখন তাহাকে চিনিতাম না, কল্পনায় এই ফুলগাছের অসম্ভব পরিণতি মনে করিয়া লইতাম। হাসিকে ভুলাইবার জন্য সেই কল্পনায় পুনরায় রঙ দিয়া বর্ণনা করিয়া চলিলাম।

"জানিস হেনা, ঐ যে ফুলবাগানে নূতন চারা দেখেছিস, ওর মাহাত্ম্য জানিস?"

হেনা জানে না,—বিস্ময়ে বলে, "কি বলনা কাকামণি!" আমি ঠোঁট ফুলাইয়া কথকের মত গম্ভীর মুখে বলিয়া যাই, "জানিস, এই যে মঞ্চ গড়ছি, এর উপর ওটা লাগাব। ও যে-সে গাছ নয়, ওর ডালপালাগুলি সোনার মত দেখতে হবে—প্রত্যেক ডালে ডালে একটা ক'রে মধুর বাটীর মত ফুল ফুটবে—পদ্ম ফুল ত দেখেছিস? তার কোরকের মত হবে।"

হেনা ও সুধীর সমস্বরে বলে, "তাই নাকি দাদা!"

চাহিয়া দেখি হাসির হাসি-ভরা মুখ কালো হইয়া গেছে। মনকে জোর করিয়া শক্ত করিয়া কল্পনার ঘোড়া ছুটাই;—"সত্যি নয়ত মিথ্যা বলছি বুঝি! মৌমাছির ঝাঁক আসবে, সেজন্যে চার পাশে খুঁটা লাগিয়ে জাল টানাতে হবে, মধুর পেয়ালা দিন দিন বাড়বে, তখন সকালে প্যাখনায় নলা দিয়ে ছাড়িয়ে দিলেই মধু ঝরবে টুপ্ টুপ্ টুপ্ ..."

হাসি এই কল্পনার উধাও বন্যায় আত্মহারা হইয়া ওঠে। কাঁদ-কাঁদ মুখে বলে, "অজিত দাদা, তোমার পায়ে পড়ছি।"

বিজয়ী বীরের উল্লাসে হৃদয় নাচিয়া ওঠে। রণজিৎ আসিয়া ডাকে "চল্ হাসি, খেলা করি গে।" হাসি যায় না অধীর আনন্দে ব্যগ্রতায় উতলা হইয়া উঠি।

কিন্তু তথাপি শাস্তি না দিলে চলে না। মান বজায় রাখিতে হইবে। তাই হৃদয়ের কোমলতাকে কঠোরতার আবরণে ঢাকিয়া ফেলি। পরুষ কণ্ঠে বলি, "কেমন! কাল যে ডেকেছিলাম, তখন ত আসনি তোর কথায় বিশ্বাস কি!

"আচ্ছা, কি করলে তোমার বিশ্বাস হয়।"

কি বলি ভাবিয়া পাই না। অঙ্গীকার করাইবার বহুবিধ উপায় থাকিতে পারে, কিন্তু মনে তখন একটীও জাগিতে দিল না। খানিক ভাবিয়া গম্ভীর মুখে বলিলাম, "বেশ, দক্ষিণ মুখো হয়ে নিশ্বাস নিয়ে উত্তর দিকে ছেড়ে দিয়ে বল, 'হিমালয় সাক্ষী'।"

হাসি অবিলম্বে আমার আদেশ পালন করিয়া আকুল-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "আমায় মধু খেতে দেবে ত?" সেই প্রশ্ন চকিত করিয়া তুলে।

মনকে ভুলাইয়া রাখি। জোর করিয়া ভাবি, যাহা কল্পনা তাহা সত্য হইবে। সেই জোরে বলি, "দেব বই কি।"

ঝগড়া মিটিয়া যায়। হাসির সাথে ভাব হয়।

বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার সে কি অভিনব আয়োজন। হাসি বলিল, "দাদা সবাইকে নেমন্তন্ন কর।" আমি অসম্মত নই, বাজার হইতে বাতাসা কিনিয়া হরির লুট দেই। সবাই মিলিয়া কীর্ত্তন গান করিয়া মঞ্চের আবহাওয়াকে পবিত্র ও মধুর করিয়া তুলে, শিকড় শুদ্ধ মোরগ-ফুলের চারাকে আমার স্বহস্ত-নির্ম্মিত মঞ্চে স্থাপন করা হইল।

সে কি গভীর আনন্দ—অব্যক্ত ও অসীম। সৃষ্টির মাঝে যে অপূর্ব্ব অলৌকিক চাতুরী আছে, তাহা হৃদয়ে গভীর আনন্দামৃত-জাগাইয়া তুলে। সেদিনের বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠার কাহিনী তাই হাজার ভুলে-যাওয়া কাহিনীর মাঝ হইতে মনের মাঝে আনাগোনা করিয়া যায়।

হাসি প্রতিদিন জল-সেচন করিয়া মোরগ-ফুলের চারাটিকে বাঁচাইয়া তুলে। প্রতিদিন আমায় হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, "দাদা, মধুর বাটীগুলি কেমন হবে।" আমার কল্পনা শক্তি উর্ব্বর ছিল, কাজেই হাসির মনেও নূতন নূতন ছবি জাগিয়া ওঠে।

সদ্য-রোপিত বৃক্ষে যেদিন রক্তবর্ণ কচিপাতা বাহির হইল সেদিন হাসির আনন্দ ধরে না। আমায় ডাকিয়া লইয়া দেখাইয়া নাচিতে লাগিল। মোরগ-ফুলের গাছে মধুর পেয়ালা হয় নাই একথা সত্য, কিন্তু হাসির কাছে এ বঞ্চনা ধরা পড়ে নাই। কারণ মাস খানেক পরেই পিসীমা আপন বাড়ী চলিয়া গেলেন।

যাওয়ার দিন সকালে রোদের আলোয় মোরগ-ফুলের গাছ হাসিতেছিল। তারই পাশে হাসি হাসিভরা মুখে দাঁড়াইল। তুলসীমঞ্চকে প্রণাম করিয়া আমার নির্ম্মিত মঞ্চকেও সে প্রণাম করিল। তাহারপর আমার দিকে, কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "মধু হলে আমায় পাঠিয়ে দিও।"

আমি বিশ্বাস-ভরা চিত্তে অম্লান বদনে বলিলাম—"দিব"

কয়েক মাস পরে আমার সাধের কল্পনা সত্যের কঠোর আঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। তখন গভীর বেদনা পাই নাই, কারণ শিশুমন প্রতিনিয়তই বাড়িয়া চলে।—প্রতিদিন নব নব আনন্দ, নূতন গন্ধ, নূতন গান, নূতন রূপ, নূতন রস শিশুর বর্দ্ধমান চিত্তের চারিপাশে ভিড় জমাইয়া তুলে।

কিন্তু গত দিবসের স্মৃতির পাতা নাড়িতে নাড়িতে আজ মন সরস ও নিরানন্দ হইয়া উঠে। দুঃখনত চিত্তে পিছনের পানে তাকাই আর ভাবি—"কোথায় সেই স্বপন-পাখা-ভরা লঘু মন।"

হাসিকে বঞ্চনা করিয়াছিলাম এ কথা ঠিক কিনা জানি না, তবে আমার মন যে অপ্রাপ্য এক অজানার পানে ছুটিয়াছিল একথা নিছক খাঁটী সত্য।

শ্রীমতিলাল দাশ।

সত্যেন্দ্র-কাব্যের মর্ম্মকথা

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, বি-এ

সত্যেন্দ্রনাথের মূল কথা—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি চেয়েছেন জীবনকে স্বীকার ক'রে নিতে, সকল অনুভূতির স্বাদ পেতে, সহস্র-দল পদ্মের মত ফু'টে উঠ্‌তে। তিনি বৈরাগ্যের পক্ষপাতী ছিলেন না; তাই তাঁর কাব্যে কোথাও নৈমিষারণ্যে যা'বার ব্যবস্থা নেই। নিজের জীবনে ধাক্কা খেয়েও তিনি পরিম্লান হ'ন নি। জীবন-রসে তিনি ভরপুর ছিলেন। দুঃখ-বাদ তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। কাব্য-সাধনার প্রভাতে "বেণু ও বীণায়" তিনি গেয়েছেন—

"আন বীণা, বাঁধ তার, ঢাল সুরা, গাহ গান,
যে গিয়েছে, কথা তার, কর আজি অবসান"

মৃত্যু ও মৃত্যুর ওপারের কথা তাঁর কাব্যে নেই। পরে এই নির্ব্বেদ ভাব আরো দানা বেঁধে উঠে—"ফুলের ফসল" গ্রন্থের "চম্পা" কবিতায়। বসন্ত-গত গ্রীষ্ম পদানত বিশ্ব, রিক্তপাতা শুষ্ক শাখা, নীরব বিহগ-কাকলী, জলস্থল শূন্য ও শুষ্ক, এই ত পৃথিবীর শ্রী,—এখানে আসা কেন?—কিন্তু সূর্য্যের বিভূতি যে লাবণ্যে দেহ ভ'রে দিচ্ছে।

একি অনুভূতি! একি পুলকজড়িত বিস্ময়! এই নিবিড় চেতনা দিয়ে তিনি 'প্রাণ খু'লে পৃথিবীকে ভালবেসেছিলেন।' তাই নিজের সব কিছু দিয়ে, নিজের জীবন পর্য্যন্ত দিয়ে তিনি 'নিত্যনব সঙ্গীতের হারে' ধরিত্রীকে সাজিয়েছেন, কাব্য-জীবনের জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে নব-সুকুমার নেত্র মেলিয়া প্রকৃতিকে দেখিলেন। অমনি বেদ-উপনিষদের বরণীয় ভাবায় গেয়ে চল্‌লেন—সবিতা, সোম, সর্ব্বংসহা, সমীর সিন্ধু, স্বর্ণ-গর্ভ, হিমালয়স্থ সিঞ্চল-শৃঙ্গে সূর্য্যোদয়ের বন্দনা-গীতি। তারপর দেখ্‌লেন—মাতৃ-মূর্ত্তি,—দেশ-মাতৃকা; চালিকা-ছন্দে "ভারতের আরতি" সুরু হ'লো; আরো কত স্তুতি-আরাধনা—"বঙ্গ-জননী" "কোন দেশে" "আমরা" "গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি"…। পাহাড়-পর্ব্বত, নগর-কান্তার, নদ-নদী, ফুল-ফল, ঋতু-চক্র, ধূলা-মাটি সকলের স্তুতি চল্‌লো। পুরা-কথাতেও সুর সংযোগ করলেন। নর-নারীর মিথুন, রঙ্গ রস এলো,—"তুমি ও আমি" "সাড়ে চুয়াত্তর" "ওগো" প্রভৃতি কবিতায়। শিশু এলো অপূর্ব্ব "সন্তানক" কবিতায়; কত তাদের কথা, অমৃত-তুল্য তার ভাষা, রং-বেরংয়ের ফুল তার খেল্‌না। "ছেলের দল" এলো; বুকের ধন তারা, দেশের আশা-ভরসা তারা; এমনি করে ছুটে চল্‌লো তাঁর কাব্যের ধারা—মন্দাকিনী-প্রবাহের মত।

ক্রমে সমাজ এলো। সুস্থ আলাপ দেখালেন—"ধূপের ধোঁয়ায়," রসিকতা—"ওসন্তিকায়"। সমাজের ন্যায়-অন্যায়, অত্যাচার-পাপ, বজ্র-জ্বালার মত ফুটে উঠ্‌লো—"আলেয়া" "সহমরণ" "শূদ্র" "মেথর" "জাতির পাতি" "নির্জ্জলা-একাদশী" "মৃত্যু-স্বয়ম্বরা" প্রভৃতিতে। রাজনীতি দেখা দিল—"দাসীর চিঠি" "নব জীবনের গান" "ফরিয়াদ" "ধর্ম্মঘটে"…। বিশ্ব-মৈত্রী—"সাম্য-সাম," "সেবা-সাম," ও অসংখ্য বীর-তর্পণ ও পূজায়। বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান—"যাদু-ঘর", "মমি", "ডাক-টিকিট", "বন-মানুষের হাড়" "আঁকিঞ্চন", "নমস্কার", "দেবদর্শন" ইত্যাদিতে।

এই হ'ল সত্যেন্দ্রনাথ। সকল বিষয়েই শিশু-সুলভ কৌতূহল, সকল বিষয়েই প্রবল অনুরাগ। দরাক্ত তাঁর হৃদয়, অগাধ তাঁর পাণ্ডিত্য। দেশের তিনি বাণী-মূর্ত্তি, ছন্দ-সরস্বতী তাঁর হাতে। এই মানুষ, এই পৃথিবী, এই দেশ, তাঁর কাছে খুব বড় ছিল। এই রূপ-রস-গন্ধ ও বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবী ছাড়া অন্য কিছু তিনি ভাবতে পারতেন না। তাই স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি, কোন কল্প-লোক সৃজন করেন নি, এই পৃথিবীকেই স্বর্গে পরিণত করতে চেষ্টা করেছেন। তাই ইহার সকল বীভৎসতার প্রতি তীব্র কশাঘাত করেছেন। পূর্ণ মানুষের রূপ এইখানেই দেখ্‌লেন, সকলকে মানুষ করতে চাইলেন, সবাইকে সোজা

হ'য়ে চলতে বললেন। এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত ভেঙ্গে গড়তে চেয়েছিলেন। কি মহান তাঁর ভাবের অভিব্যক্তি, কি বিপুল তাঁর সহানুভূতি! কি বিশ্বজনীন তাঁর ভালবাসা! গুণী, জ্ঞানী, দীন-দুঃখী, অনাথ-আতুর, কুলি-মজুর, পতিত-পতিতা, সকলের প্রতি সমান শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সমবেদনা। যাবার সময়েও সেই ভালবাসা—সুন্দরী ধরণীর জন্য প্রাণ কাঁদছে।

তাঁর কাছে বিশ্ব-মানবই দেবতা। "আলগ্ হ'য়ে আল্‌গোছে" থাকা, "তফাৎ হ'য়ে তফাৎ করে" থাকায় মহত্ত্ব আছে ব'লে তিনি মনে করেন নি। সকলের সঙ্গে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হ'বে, এমন কি যারা পিছিয়ে পড়ছে তাদেরও পর্য্যন্ত হাত ধরে তুলে নিতে হ'বে, তবেই পরমানন্দ লাভ হ'বে—এই তাঁর মূলমন্ত্র।

পুরুত, রাজা-বাদশা মনিবগিরি, এ সবের উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন, এ গুলো উন্নতির পরিপন্থী মনে করতেন। তিনি চাইতেন, সব মানুষের যেন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, সকলকে আত্ম-মর্য্যাদা যেন দেওয়া হয়, সকলকে নিজের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলবার অবকাশ দেওয়া চাই, অথচ কা'রো সঙ্গে কা'রো বিরোধ না ঘটে, সকলের দাবী দাওয়া, স্থান, সম্মান বজায় থাকে, সেদিকে নজর পূরাদস্তুর রাখা চাই। তাই তিনি গণ-তন্ত্রের একজন খুব বড় দরের ভক্ত ছিলেন। একদল শক্তিশালী লোক বাকী সকলের উপর প্রভুত্ব করবেন এ রকম গণ-তন্ত্র যা' আজকাল বেশীর ভাগ দেশে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং তার কুফলও সব বেরিয়ে পড়ছে, এ রকম গঠন ও শাসন প্রতিষ্ঠান তিনি চান নি। তিনি অতি-উদার, অতি-ব্যাপক গণ-তন্ত্র চেয়েছিলেন। তাঁর ভাব-প্রেরণার প্রস্রবণ ছিল—আড়াই-হাজার বছরের পুরাতন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম। পরিণত বয়সে দেশের মন যখন ব্রিটিশ দমন-নীতি ও মহাত্মা মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর স্বাদেশিকতায় বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হচ্ছিল, সেই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে, তিনি বাইশশো বছরের পুরাণো বৌদ্ধযুগের অতি-উদার গণ-তন্ত্রের রূপ, তার সংগঠন, কার্য্য-পরিক্রম, তাঁর অনবদ্য ভাষার ভিতর দিয়া উপন্যাস-আকারে লিপিবদ্ধ করতে ব্যস্ত ছিলেন,—বাংলার জন্য, ভারতের জন্য, সমগ্র বিশ্বের জন্য।

স্বদেশের কল্যাণ ও পরিপূর্ণ মুক্তি তিনি নিয়ত প্রার্থনা করতেন এবং মাঝে মাঝে জ্বালাময়ী ভাষায় তাহার ইন্ধন যোগাতেন। কিন্তু কেবল স্বদেশের গণ্ডীর ভিতর তাঁর হৃদয় বদ্ধ ছিল না। এ কথা সুপরিস্ফুট তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে। যুগোত্তর, যুগন্ধর প্রভৃতি নাম দিয়ে কাব্যকে বিভাগ করতে করতে তিনি বলেন যে, স্বদেশী কবিতা ব্র্যাণ্ডি ও মৃগনাভির তুল্য,—রোগীর পথ্য; পূর্ণ-বিকশিত ও বলিষ্ঠ মন চাইবে দেশ-কালের অতীত কাব্য। তাই তিনি স্বদেশকে যেমন নিবিড়ভাবে ভালবাসতেন, তেমনি ভালবাসতেন সারা পৃথিবীকে। তাই তার ফল-স্বরূপ সমগ্র বিশ্বের সর্ব্বস্থানীয় কবিতাগুলি আমরা আজ বঙ্গভাষায় পেয়েছি,—একান্ত ঘরের জিনিসের মত।

তিনি বিশ্ব-মৈত্রী, খৃষ্ট-ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের ভ্রাতৃভাব, ফরাসী-বিপ্লবের মূলমন্ত্র, রুসোবাদ, কোম্‌ত-দর্শন, নেপোলিয়ান ও নীট্‌শেবাদ, কার্ল মার্কস ও টলষ্টয় প্রবর্ত্তিত ভাবধারা প্রভৃতি সমগ্র দেশী ও বিদেশী সাহিত্য, ধর্ম্ম, দর্শন, ইতিহাস আদি যাবতীয় চিন্তাধারা তাঁর সুগভীর 'কাল্‌চার' দ্বারা স্বকীয় ক'রে ফেলেছিলেন। তাই তাঁর হৃদয়ে এতখানি প্রসারতা, লেখায় এত বিচিত্রতা।

তাঁর আজীবন সাধনার ফল, হৃদ্গত কথা, হ'ল—"একটু ভাবের চাষ, একটু বুদ্ধির চাষ, একটু সহৃদয়তার চাষ।" এই হ'লো তাঁর কাব্যের ভিতরকার কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। এই কামনা পূর্ণ হলেই দুনিয়া অনেকখানি হাল্‌কা হ'বে, অনেক দুঃখ ঘুচ্‌বে এবং স্বর্গ অনেকখানি নাগালের ভিতর আসবে, এই তিনি মনে করতেন।

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

যুগ-সন্ধি

—উপন্যাস—

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল।

যুযুৎসুগণের বলাবল

এইবার সেই মহাক্ষণ উপস্থিত। নির্ম্মম আজ কুঠোরের কবলে। সিমুর্ত্থান ল্যান্টিনেককে হাতে পাইয়াছে।

প্রবীণ রাজপক্ষীয় বিদ্রোহী এইবার বিশেষরূপেই আবদ্ধ হইয়াছে। তাহার পলায়নের আর পন্থা নাই। সিমুর্ত্থানের অভিপ্রায় মার্কুইসের মস্তক এইখানেই, তাহার নিজের জমিদারীতে তাহার অধিকারের মধ্যে—এই প্রাচীন আবাস-ভবনের সম্মুখে দেহচ্যুত হয়, যেন এই সামন্ত-রাজের শোচনীয় পতন প্রত্যক্ষ করিয়া অন্যান্য সামন্তগণের এমন শিক্ষা হয় যাহা কখনই ভুলিবার নহে।

এই মতলবেই সিমুর্ত্থান গিলোটিন আনয়নের জন্য ফুজার্সে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই গিলোটিনই আমরা ইতিপূর্ব্বে পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়াছি।

ল্যান্টিনেককে বধ করিতে পারিলেই ভেণ্ডিকে নিহত করা হইল; আর ভেণ্ডির বিনাশ মানেই ফ্রান্সের উদ্ধার। সিমুর্ত্থানের চিত্তে কোন দ্বিধা নাই। তাহার বিবেক অনুদ্বিগ্ন; কর্ত্তব্যজ্ঞানই তাহাকে হিংসায় প্ররোচিত করিয়াছে।

যতদূর বুঝিতে পারা যাইতেছিল, মার্কুইসের আর কোনো আশা নাই। এ বিষয়ে সিমুর্ত্থান নিশ্চিন্ত। কিন্তু একটা ভাবনা সিমুর্ত্থানকে পীড়িত করিতেছিল। এই সংগ্রাম অতি ভীষণ রকমের হইবে। আর গভেনই উহার পরিচালনা করিবে—হয়তো নিজেও উহাতে যোগদান করিতে চাহিবে। সৈনিক-জনোচিত উদ্যমে গভেনের তরুণ হৃদয় পূর্ণ; সংগ্রাম যেখানে তুমুল ও সাংঘাতিক হইয়া উঠে, সেখানে ঝাঁপাইয়া পড়াই তাহার স্বভাব। যদি সে যুদ্ধে নিহত হয়? গভেন—তাহারই মানস পুত্র—এ সংসারে তাঁহার একমাত্র স্নেহের পুত্তলি। ওঃ, ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়! ভাগ্যদেবী এ পর্য্যন্ত এই যুবককে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু কে জানে তিনি অতঃপর বিমুখ হইবেন না? সিমুর্ত্থানের বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। নিয়তির কি বিচিত্র লীলা—সিমুর্ত্থান এমন দুই গভেনের মধ্যে স্থাপিত, যাহাদের একজনের জন্য জীবন এবং অপরের জন্য মৃত্যু তাহার কামনা।

তোপধ্বনি কেবল জর্জেটির নিদ্রাভঙ্গ করিয়া এবং তাহার মাতাকে নিবিড় কানন মধ্যে আশার আহ্বান শুনাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সেই তোপ-নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে টাওয়ারের ভগ্ন প্রাসাদ রক্ষার জন্য যে লোহার গরাদে বসান হইয়াছিল, তাহা উড়িয়া গেল। অবরুদ্ধ দুর্গবাসীগণ উহা মেরামত করিবার আর অবসর পাইল না।

দুর্গবাসীগণ মুখে দম্ভ প্রকাশ করিয়া থাকিলেও তাহাদের বারুদের সংস্থান অল্পই ছিল। অবরোধকারীগণ যতটা মনে করিতেছিল, তদপেক্ষাও ইহাদের অবস্থা অধিকতর সঙ্কটাপন্ন ইহাদের মনে মনে অভিপ্রায় ছিল, যথেষ্ট বারুদ থাকিলে তা দুর্গ উড়াইয়া দিয়া নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুগণকেও ঐ ধ্বংস মধ্যে প্রোথিত করে। কিন্তু তাহাদের বারুদের সঞ্চয় প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। অবশিষ্ট বারুদে প্রত্যেকের বোধ হয় ত্রিশবারের অধিক বন্দুক ছুঁড়াও সম্ভব হইবে না। বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র তাহাদের যথেষ্টই ছিল। কিন্তু কার্ত্তুজ বড়ই অল্প। এগুলিতে তাহারা বারুদ পুরিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু এ অবস্থায় অগ্নিবর্ষণ অধিককাল চলিতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে (নিদারুণ সৌভাগ্য!) এ লড়াই হইবে অনেকটা মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মতো—আগ্নেয়াস্ত্রের ততটা প্রয়োজন হইবেনা, যতটা হইবে কৃপাণ, তরবারী ও ছুরিকার। আক্রান্তগণের একমাত্র ভরসা।

তোপের আওয়াজে, সকলেরই কান খাড়া হইল। সাময়িক সন্ধির সর্ত্তানুসারে আর মোটে অর্দ্ধঘণ্টাকাল বাকী। তার পরেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কথা।

টাওয়ারের শীর্ষ হইতে ইমানুস্ দেখিল, আক্রমণকারীগণ

অগ্রসর হইতেছে। ল্যাণ্টিনেক তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করিতে নিষেধ করিল; বলিল, "তারা চার হাজার পাঁচ শ ঝাঁঝিয়ে ছ'চার জনকে মেরে আমাদের কোন লাভ হবে না যখন তারা ঢোকবার চেষ্টা করবে, তখনই আমাদের সুযোগ।"

তারপর সশব্দে হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "সাম্য! মৈত্রী!!"

শত্রুগণ প্রবেশের উপক্রম করিলে ইমানুস্ শিঙার আওয়াজ করিবে, এইরূপ কথা থাকিল।

সন্নগ্রথিত প্রতিরোধ-প্রাচীরের পশ্চাতে ও ঘুরানো সিঁড়ির উপর দণ্ডায়মান স্বল্প সংখ্যক দুর্গ-রক্ষীগণ একহস্ত বন্দুকের উপর এবং অপর হস্ত জপমালার উপর রাখিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অবস্থাটা মোটামুটি এইরূপ—

আক্রমণকারীগণকে দুর্গপ্রাকারের ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া প্রতিরোধ-প্রাচীরটি জয় করিতে হইবে; এবং তারপর গুলি বর্ষণের মধ্যে একটি একটি করিয়া ধাপ অতিক্রম করিতে দুইটি ঘুরানো সোপান শ্রেণী আরোহণ করিয়া উপর্যুপরি-অবস্থিত তিনটি কক্ষ বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে হইবে। আর অবরুদ্ধগণের একমাত্র করণীয়—প্রাণ

উদ্যোগ পর্ব্ব।

এদিকে গভেন আক্রমণের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, সিমুর্দ্দান্ মাল-ভূমির দিক রক্ষা করিবে এবং গেচাম্প অধিকাংশ সৈন্য লইয়া অরণ্য মধ্যে অপেক্ষা করিবে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া-ছিল। গভেনের নিকট হইতে তাহারা শেষ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। নিজেরা আক্রান্ত না হইলে, কিংবা অবরুদ্ধ দুর্গ-বাসীগণ পলায়নের চেষ্টা না করিলে তাহারা তোপ দাগিবেনা, এইরূপ স্থির থাকিল। আর যাহারা অগ্রসর হইয়া দুর্গ আক্রমণ করিবে সেই সেনাদলের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিল গভেন স্বয়ং। ইহাই ছিল সিমুর্দ্দানের উদ্বেগের কারণ।

সূর্য্য এইমাত্র অস্ত গিয়াছে। মুক্ত প্রান্তরস্থিত টাওয়ারের অবস্থা অনেকটা মুক্ত সমুদ্র-বিহারী অর্ণবপোতের সদৃশ। ইহাদিগকে আক্রমণ করিবার প্রণালী একইরূপ। শুধু আঘাত নিরর্থক, আরোহণ করা চাই। কামানের গোলায় কোন সুবিধা হয় না। পনর ফিট পুরু দেওয়ালে গোলা চালাইয়া কি ফল হইবে? ছোরা, পিস্তল, কুঠার, কৃপাণ, হস্ত ও দন্ত— এই সকলেরই প্রয়োজন বেশী। গভেন দেখিল, লা দুর্গ অধিকারের অন্য পন্থা নাই। পরস্পর মুখোমুখি, চোখো-চোখি হইয়া সংগ্রাম—সে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড! শৈশবাবধি গভেন এই টাওয়ারে বাস করিয়াছে। ইহার অধ্যুষ্য কক্ষ-কুঠরীর সন্ধান সবই সে জানিত।

গম্ভীর ভাবে সে চিন্তা করিতে লাগিল। কয়েক হাত মাত্র ব্যবধানে তাহার সহকারী গেচাম্প দূরবীণ-হস্তে প্যারিসের অভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল। সহসা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল, "আঃ, অবশেষে!"

এই চীৎকারে গভেনের চিন্তা ভঙ্গ হইল।

"কি হয়েছে, গেচাম্প?"

"কমাণ্ডেণ্ট, মইটা আসচে।"

"উদ্ধারের মই?"

"হাঁ।"

"কি বলচ? ওটা কি এখনও পৌছয় নি?"

"না কমাণ্ডেণ্ট, আমি তজ্জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলাম জাভেনেতে যে সওয়ার পাঠানো হয়েছিল, সে ফিরে এসেচে।"

"তা' আমি জানি।"

"সে বল্লে, জাভেনের এক ছুতোরের দোকানে আমরা যেমন লম্বা চাই তেমনই লম্বা একটা মই পাওয়া গিয়েছিল; ওটা নিয়ে সে একটা গাড়ীর উপর চাপায়; তারপর বারো-জন অশ্বারোহী গার্ডের জিম্মায় এই সব প্যারিস থেকে রওয়ানা করে' দিয়ে সে পুরো দমে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে' চলে' এসেচে সংবাদ দিতে। তা'র মুখে আরও প্রকাশ যে, ঘোড়াগুলি খুব ভালো, আর তা'রা রাত দুটোতে রওয়ানা হয়েচে; সুতরাং সন্ধ্যে নাগাত তা'দের এখানে পৌছবার কথা।"

"এ সবই আমি জানি। আর কি?"

"কমাণ্ডেণ্ট, সন্ধ্যা তো হয়ে গেল; অথচ মই নিয়ে সেই গাড়ী এখনও পৌছলনা।"

"তা' কি সম্ভব? যাহোক্, আক্রমণ আমাদের কর্‌তেই

হবে। সময় হয়েচে। আমরা যদি আরো অপেক্ষা করি শত্রুরা ভাব্‌বে আমরা ইতস্ততঃ কর্‌চি।"

"কম্যাণ্ডেণ্ট, আক্রমণ আরম্ভ হ'তে পারে।"

"কিন্তু মইটার খুব দরকার।"

"তা' তো বটেই।"

"কিন্তু তা' তো আমাদের নেই।"

"আছে।"

"কিরূপে?"

"তাইতেই ত আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলুম "অবশেষে"। গাড়ী তো এসে পৌছ্‌লনা। আমি দূরবীণ নিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। প্যারিস থেকে লা টুর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা আমি পরীক্ষা করে' দেখেচি, এবং যা' দেখ্‌লাম তা'তে এখন আর চিন্তার কারণ নেই। শকট ও রক্ষীগণ পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমে আস্‌চে। দেখুন না।"

গভেন্ নিজের হাতে দূরবীণ লইয়া পাহাড়ের দিকে চাহিলেন। "হাঁ, এই যে! অন্ধকার হ'য়ে এসেচে বলে' পরিষ্কার দেখা যাচ্ছেনা। কিন্তু গার্ডদের বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি।—নিশ্চয়ই মইটা নিয়েই আস্‌চে। তবে, গার্ডের সংখ্যা তুমি যা বলেছিলে তা'র চেয়ে কিছু বেশী বোধ হচ্ছে।"

"আমার কাছেও তাই মনে হচ্চে।"

"ওরা বোধ হয় এখনও প্রায় মাইল খানেক দূরে।"

"কম্যাণ্ডেণ্ট, মিনিট পনেরোর মধ্যে মইটা এসে পৌছবে।"

"আমরা আক্রমণ আরম্ভ কর্‌তে পারি।"

একটা গাড়ীই আসিতেছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা যা মনে করিয়াছিল, সে গাড়ী নহে।

ফিরিবামাত্র গভেন দেখিল, সার্জ্জেণ্ট রাডুব তাহার পশ্চাতে সামরিক অভিবাদনের কায়দায় দাঁড়াইয়া আছে—দেহভঙ্গী ঋজু, নেত্রদ্বয় অবনমিত।

"খবর কি, সার্জ্জেণ্ট রাডুব?"

"সিটিজেন কম্যাণ্ডেণ্ট, আমরা লাল পল্টনের সেপাইরা আপনার নিকট একটা অনুগ্রহ চাইতে এসেচি।"

"কি, বল?"

"আমরা প্রাণ বিসর্জ্জনের অনুমতি চাই।"

'হুঁ।'

"দয়া হবে কি?"

"দেখ, সেটা যেমন যেমন ঘট্‌বে, তা'র উপর নির্ভর করবে।"

"কম্যাণ্ডেণ্ট, সেই ডল্-এর ব্যাপারের পর থেকে আপনি আমাদের সম্বন্ধে একটু অতিরিক্ত সতর্ক হয়েচেন। আমরা এখনো বারো জন।"

"ভাল?"

"আজ্ঞে, তা'তে আমরা একটু লজ্জা বোধ করচি।"

"তোমরা হচ্চ আমার রিজার্ভ।"

"আজ্ঞে, আমরা বরং অগ্রগামী দলে থাক্‌তে চাই।"

"কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে জয়কে সুনিশ্চিত করবার জন্যে তোমাদিগকে আমার প্রয়োজন। সেইজন্য আমি তোমাদিগকে রেখে দিচ্চি।"

"আমাদের পক্ষে এটা নিতান্তই দুঃসহ হবে কিন্তু।"

"না, তোমরাও লাইনের মধ্যেই থাক্‌বে। মার্চ্চ করে' যাবে।"

"পেছনে যেতে হবে তো! সকলের অগ্রে মার্চ্চ করা প্যারিসেরই অধিকার।"

"আচ্ছা, সার্জ্জেণ্ট! আমি ভেবে দেখ্‌ব।"

"কম্যাণ্ডেণ্ট, এখনই কেন সেটা ভেবে দেখুন না। একটা সুযোগ উপস্থিত। খুবই ঘাত প্রতিঘাত আজ হবে। লা টুর্গকে যারা স্পর্শ কর্‌তে যাবে, লা টুর্গ তাদের আঙুল না পুড়িয়ে ছাড়্‌বেনা। আমরা সেই দলে থাক্‌বার অনুমতি চাচ্চি।"

সার্জ্জেণ্ট থামিল। গোঁফ জোড়া পাকাইতে পাকাইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল, "কম্যাণ্ডেণ্ট, আপনি জানেন, আমাদের বাচ্চারা ওই টাওয়ারে আবদ্ধ আছে। তিনটি ছেলে মেয়ে আমাদের ব্যাটালিয়নেরই পালিত শিশুত্রয়। আর সেই শয়তান বদমাস, ইমানুস্ শাসাচ্চে, ওদের পুড়িয়ে মারবে। কিন্তু বলে' রাখ্‌চি, ভূমিকম্পও এসে যদি এ ব্যাপারে যোগ দেয়, তবুও এদের কোনো দুর্ঘটনা ঘট্‌তে আমরা দেবো না। কিছুক্ষণ হল এই সন্ধির সুযোগে আমি মালভূমিতে আরোহণ করে' একটা জানালার ভেতর দিয়ে চেয়ে দেখেছিলুম

দেখ্‌লেন, ঠিকই ওরা, ওখানে রয়েছে। এই খাদের পাশে দাঁড়ালে আপনিও দেখ্‌তে পাবেন। আমি ওদের দেখ্‌তে পেয়েছিলুম—বাছারা আমাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল। কমাণ্ডেণ্ট, এই স্বর্গশিশুদের একগাছি কেশও যদি বিপন্ন হয়, তবে জগতের যত কিছু পবিত্র জিনিস আছে তা'রই নামে শপথ করচি যে, আমি, সার্জ্জেণ্ট রাডুব, তার প্রতিশোধ নেবোই নেবো। আমার ব্যাটালিয়ানের সব্বাই তা বল্‌চে। হয় আমরা ছেলেদের বাঁচাব, নয় তাদের সঙ্গে প্রাণ দেবো। এ দাবী আমরা করতে পারি। তা হ'লে এখন আসি কমাণ্ডেণ্ট। আমার সসম্ভ্রম অভিবাদন গ্রহণ করুন।"

গভেন রাডুবের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, "তোমরা বীরপুরুষ। আক্রমণকারী দলেই তোমাদের স্থান করব। আমি তোমাদিগকে দুইভাগে ভাগ করে' ছ জনকে দেব অগ্রভাগে, আর ছ জনকে দেব পশ্চাদ্ভাগে। তা হ'লে আমি নিশ্চিত হ'তে পারব যে, সৈন্যেরা ঠিক অগ্রসর হচ্চে এবং পেছন থেকে কেউ সরে' পড়চে না।"

"এই আয়োজনের নেতৃত্ব বরাবরের মতো আমারই থাক্‌বে তো?"

"নিশ্চয়ই।"

"ধন্যবাদ, কমাণ্ডেণ্ট। আমি অগ্রভাগেই থাকব।"

রাডুব পুনরায় সামরিক প্রথামত অভিবাদন করিয়া স্ব-দলে ফিরিয়া গেল। গভেন পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া একবার দেখিল, তারপর গেচাম্পের কাণে কাণে কয়েকটি কথা বলিল। আক্রমণকারী দল অমনি অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

৮

শেষ প্রস্তাব।

সিমুর্দ্যান এখনও মালভূমিতে স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্থলে গমন করেন নাই। একজন বিউগল বাদকের নিকটে যাইয়া তিনি বলিলেন, "দুর্গবাসীদের সঙ্গে একটু কথা বল্‌ব; ওদের জানাওতো।"

বিউগল বাজিল; শিঙার আওয়াজে প্রত্যুত্তর আসিল।

আরও একবার বিউগল এবং শিঙার শব্দ বিনিময় হইল।

"এর মানে কি?" গভেন গেচাম্পকে জিজ্ঞাসা করিল। "সিমুর্দ্যানের কি অভিপ্রায়?"

একটি শ্বেতরুমাল হস্তে সিমুর্দ্যান টাওয়ারের দিকে অগ্রসর হইলেন। উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, "হে দুর্গবাসীগণ, তোমরা জানো, আমি কে?"

টাওয়ারের শীর্ষ হইতে জবাব আসিল—সেটা ইমানুসের কণ্ঠ—"হাঁ! জানি বই কি!"

যাহারা নিকটে ছিল তাহারা উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন শুনিতে পাইল।

"আমি সাধারণতন্ত্রের দূত।"

"তুমি প্যারিসের ভূতপূর্ব্ব যাজক।"

"আমি কমিটি অব-পবলিক-সেফ্‌টির বিশেষ ক্ষমতা-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী।"

"তুমি একজন পাদ্রী।"

"আমি আইনের মর্য্যাদা রক্ষায় নিযুক্ত।"

"তুমি স্বজন-দ্রোহী।"

"আমি বৈপ্লবিক গবর্ণেণ্টের প্রতিনিধি।"

"তুমি নিমকহারাম স্বার্থদাস।"

"আমি সিমুর্দ্যান।"

"তুমি শয়তান।"

"আমায় চেন কি?"

"তুমি হুব্‌ মন্‌ তোমায় চিনি না?"

"আমাকে হাতে পেলে তোমরা খুসী হও না কি?"

"আমরা এখানে আঠারো জন; তোমার মাথাটার জন্য আমরা প্রত্যেকে আহ্লাদের সহিত নিজ নিজ মুণ্ডক দিতে প্রস্তুত আছি।"

"উত্তম, আমি আত্মসমর্পণ কর্‌তে এসেছি।"

টাওয়ারের উপর হইতে একটা পৈশাচিক হাসির হল্‌কা বহিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, "চলে' এস!"

নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শিবিরস্থ সকলে কাণ পাতিয়া রহিল।

সিমুর্দ্যান বলিল, "এক সর্ত্তে।"

"কি ?"

"শোনো।"

"বল।"

"তোমরা আমাকে দ্বেষ কর ?"

"হাঁ।"

"আমি কিন্তু তোমাদের ভালবাসি। আমি তোমাদের ভাই।"

টাওয়ার-শীর্ষ হইতে জবাব আসিল,—"হাঁ।* কেইন এর মতো ভাই আর কি !"

উচ্চ অথচ মিষ্ট স্বরে সিমুর্দান বলিতে লাগিল—"আমাকে অপমান করতে হয়, কর; কিন্তু আমার কথা শোনো। শান্তির শ্বেতপতাকা হস্তে আমি এখানে উপস্থিত। হাঁ, তোমরা আমার ভাই বই কি ! আহা, বেচারা ভ্রান্ত-জীবগণ ! আমি তোমাদের বন্ধু। আমি অজ্ঞানদের নিকটে জ্ঞানালোক নিয়ে এসেচি। আলোকই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। আর আমরা কি একই দেশমাতৃকার সন্তান নই ? আমি যা বলচি, মন দিয়ে শোনো। পরে তোমরা বুঝ্‌বে, কিম্বা তোমাদের ছেলেরা, কি তাদের ছেলের ছেলেরা বুঝ্‌বে যে, এমন যে সব ব্যাপার হচ্চে, তা বিধাতার অমোঘ বিধানেই ঘটচে, এবং রাষ্ট্রবিপ্লবটা ভগবানেরই লীলা। যখন সকলের বিবেক—এমন কি তোমাদের বিবেকও—এ সব বুঝ্‌তে পারবে, যখন সকল ক্ষ্যাপামি—এমন কি তোমাদের ক্ষ্যাপামিও—দূর হবে, যখন এই মহান্ আলোক বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়্‌বে, সেই দিনের প্রতীক্ষারই কি বসে থাক্‌তে হবে ? তোমাদিগকে মোহান্ধকারে মগ্ন দেখে কেউ কি করুণা করবে না ? আমি তাই এসেচি; আমি তোমাদিগকে আমার মস্তক উপহার দিচ্চি। তার চেয়েও আমি বেশী করচি। আমি তোমাদের দিকে আমার হস্ত প্রসারিত করে' বলচি, "ভাই আমার প্রাণ নিয়ে তোমরা আপন প্রাণ বাঁচাও।" আমাকে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হয়েচে; আমি যা বলচি, তা আমি করতে পারি। মহা মুহূর্ত্ত উপস্থিত। আমি একবার শেষ চেষ্টা করে' দেখ্‌চি। তোমাদের সঙ্গে এখন যে কথা বলচে সে একজন সিটিজেন বটে, কিন্তু এই সিটিজেনের অন্তর মধ্যে একজন ধর্ম্মযাজকের আত্মা বসতি করচে। সিটিজেন তোমাদিগকে তুচ্ছ করচে, কিন্তু পাদ্রী তোমাদের মিনতি করচে। আমার কথা শোনো। তোমাদের ভেতর অনেকেরই স্ত্রী পুত্র রয়েচে। আমি তোমাদের স্ত্রী পুত্রদের রক্ষার চেষ্টা করচি। হায় ! ভ্রাতৃগণ—"

"বেশ বাবা, বেড়ে বক্তৃতা হচ্চে ! বলে' যাও।" ইমানুস বলিয়া উঠিল।

"ভাই সব, গল্গা কাটাকাটি করে' কি ফল হ'বে ? যুদ্ধটা হ'তে দিওনা। এই আমরা যারা এখন কথাবার্ত্তা বলচি, তা'দের মধ্যে অনেকেই হয়তো কাল্‌কের সূর্য্য দেখ্‌তে পাবে না। আমাদের মধ্যে অনেকেই মরবে, তোমাদের মধ্যেও অনেকেই মারা পড়্‌বে। এই বৃথা রক্তপাত কি জন্য ? দুজনকে মারতে পারলেই যদি কাজ হয়, তবে এত লোকের প্রাণনাশ করে' ফায়দা কি ?"

তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া ইমানুস বলিল, "দু'জন ?"

"হাঁ, দুজন।"

"কে কে ?"

"ল্যাণ্টিনেক এবং আমি।"

সিমুর্দান আরও উচ্চকণ্ঠে—বলিল, "এই দুজন লোকই অতিরিক্ত। আমাদের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে ল্যাণ্টিনেক এবং তোমাদের দিক্ থেকে আমি। আমার প্রস্তাবটা শোন, তা হলে' তোমরা সকলেই নিরাপদ হ'তে পার। ল্যাণ্টিনেককে আমাদের হাতে সমর্পণ কর, আর তৎপরিবর্ত্তে আমাকে নাও। ল্যাণ্টিনেককে গিলোটিনে দেওয়া হবে। আমার সম্বন্ধে তোমাদের যা খুসী ব্যবস্থা করতে পার।"

"পাদ্রী", ইমানুস্ গর্জ্জিয়া উঠিল। "তোমাকে হাতে পেলে আমরা তুষানলে পুড়িয়ে মারব।"

"আমি রাজি আছি," সিমুর্দ্দান জবাব দিল। আরও বলিল, "তোমরা এখন এই দুর্গে অবরুদ্ধ, তোমাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন; কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে তোমরা মুক্ত ও নিরাপদ হ'তে পার, আমি তোমাদের জন্য মুক্তি ও জীবন নিয়ে এসেচি, গ্রহণ করবে কি ?"

* ফুটনোট ২য় খণ্ড ৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইমাতুস চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি পা পর্ন নও, তুমি ক্যাপাও বটে। তুমি কেন আমাদের বিরক্ত করতে এলেচ? কে তোমাকে এসে এই বক্তিমে করতে বলেছিল? মনসেইনিয়রকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করব আমরা? কি চাও তুমি?"

"তাহার মস্তক। আর আমি দিচ্ছি—"

"তোমার গাত্রচর্ম। পাদ্রী সিমুর্দান, কুকুরের মতো তোমার ছাল আমরা ছাড়িয়ে নেব। না, তোমার ছাল আর তাঁর মাথার একদর নয়। চলে' যাও।"

"ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড হবে। দেখ, শেষবারের মতো একবার ভেবে দেখ।"

ইতিমধ্যে রাত হইয়া পড়িয়াছে। মার্কুইস চুপ করিয়াছিলেন, ঘটনাস্রোতের গতি ব্যাহত করিবার কোনো চেষ্টা করেন নাই। জননায়কগণের মধ্যে একটু গৌণ আত্মপ্রীতি দেখা যায়। এটাকে দারিদ্র্যের দাবী বলা যাইতে পারে।

ইমাতুস এইবার আর সিমুর্দানকে সম্বোধন করিল না—চীৎকার করিয়া বলিল—"হে আক্রমণকারীগণ, আমাদের যা' কথা তা' তোমাদের আগেই বলেচি, তার আর কিছু নড়-চড় হবে না। তা'তে রাজী হও ভালই, নয় গোল্লায় যাও! রাজী, কি না? আমরা ছেলেপিলে তিনটি তোমাদের ফিরিয়ে দেবো—বিনিময়ে আমরা চাই আমাদের সকলের জীবন ও স্বাধীনতা।"

সিমুর্দান উত্তর দিল। "সকলেরই—কেবল একজনের ছাড়া।"

"সেই একজন কে?"

"ল্যান্টিনেক।"

"মনসেইনিয়র! মনসেইনিয়রকে সমর্পণ করতে হবে! কখনই নয়।"

"কেবল এই সর্ত্তে আমরা সন্ধি করতে প্রস্তুত আছি।"

"তা'হলে আরম্ভ হোক্।"

সব নীরব হইল। শিঙার সঙ্কেত ধ্বনি করিয়া ইমাতুস নীচে নামিয়া গেল। মার্কুইস তরবারী গ্রহণ করিলেন। নিম্নতলের অবরোধ-প্রাচীরের পশ্চাতে আসিয়া উনিশ জন দুর্গবাসী নীরবে জানুপাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। নৈশান্ধকারে সাধারণ তন্ত্রের সেনাদল পরিমিত পাদক্ষেপে আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতেছে, সেই শব্দ তাহারা শুনিতে পাইল। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। সহসা সেই শব্দ একেবারে তাহাদের পার্শ্বে ভাঙনের মুখে উপস্থিত হইল। তখন সকলেই ছিদ্রপথে বন্দুক লক্ষ্য করিল। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল ধর্ম্মযাজক। তাহার দক্ষিণ হস্তে উলঙ্গ কৃপাণ এবং বাম হস্তে একটি ক্রুশ। স্বীয় দেহ ঈষৎ উন্নমিত করিয়া সে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "পিতা, পুত্র এবং পবিত্রার নামে!"

অমনি সকল বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। সংগ্রাম আরম্ভ

রাক্ষসে ও দৈত্যে।

দুর্গ-প্রাকারের ভাঙনের ভিতর দিয়া আক্রমণকারীগণ দলে দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রতিরোধ-প্রাচীরের পশ্চাৎ হইতে আক্রান্তগণ বন্দুকের আওয়াজে তাহাদের অভ্যর্থনা করিল।

গভেনের উচ্চকণ্ঠ শ্রুত হইল,—"ভাঙো, প্রবেশ কর।" ল্যান্টিনেক চীৎকার করিয়া বলিল, "শত্রুর বিরুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়াও।" তারপর তরবারীর ঝঞ্ঝনা, বন্দুকের চটাপট, এবং চারিদিকে মৃত্যুর আর্ত্তনাদ! প্রাচীরে প্রোথিত মশালের অস্পষ্টালোকে কিছুই পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল না। শব্দে কর্ণে তালা লাগিয়া যায়, ধূমে দৃষ্টি অন্ধ। হতাহতগণ পদতলে বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল। রক্তস্রোত দেওয়ালের ফাটলের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। যেন এই অতিকায় টাওয়ার-দানবের ক্ষতবিক্ষত দেহ হইতে অজস্র শোণিতস্রাব হইতেছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, কারাদুর্গের বাহিরে এই সকল শব্দ কিছুই শোনা যাইতেছিল না। নিশীথিনীর নিবিড় অন্ধকারে অবরুদ্ধ দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে অরণ্য ও প্রান্তরের উপর একটা শ্মশানসুলভ নির্জ্জনতা বিরাজ করিতে ছিল। ভিতরে নরকাগ্নি, বাহিরে সমাধি। প্রশস্ত প্রাচীর ও খিলানের মধ্যে

সকল ক্রোধ ও জিঘাংসার পৈশাচিক কোলাহল নিঃশেষে মিলাইয়া যাইতেছিল। শিশুদের নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হইতেছিল না।

সংগ্রাম ক্রমশঃই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল। আক্রমণকারী সেনাদলের সুদীর্ঘ সারি সর্প যেমন করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ভিতরে প্রবেশ করে তেমনই করিয়া ধীরে ধীরে প্রাচীরের ছিদ্রপথে কারাদুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছিল। সংখ্যায় ইহারা অধিক না হইলেও আক্রান্তগণের অবস্থানটি ছিল সুবিধাজনক। আক্রমণকারীগণের অনেকেই হত হইতে লাগিল।

যৌবনসুলভ অবিবেচনাবশতঃ গভেন হলের ভিতরে একেবারে সংঘর্ষের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার মাথার আশেপাশে অবিরাম গুলি ছুটিতেছে। গভেন এযাবৎ কখনও আহত হয় নাই; সেজন্য নিজের সম্বন্ধে ভরসাও ছিল তাহার খুব বেশী।

কি একটা আদেশ দিবার জন্য ফিরিতেই গভেনের দৃষ্টি আগ্নেয়াস্ত্র-উদ্গীরিত-অনলবিভায় আলোকিত একটি বদনমণ্ডলের উপর নিপতিত হইল।

"সিমুর্দ্যান!" বিস্মিত গভেনের মুখ হইতে বাহির হইল, "এ যে সিমুর্দ্যান! আপনি এখানে কি করচেন?"

সিমুর্দ্যানই বটে। তিনি উত্তর দিলেন, "তোমারই কাছে কাছে থাক্‌বার জন্যে আমি এসেচি।"

"কিন্তু এখানে আপনার প্রাণহানির সম্ভব!"

"হয় তো। কিন্তু—তুমি,—তা' হ'লে তুমিই বা এখানে কেন?"

"এখানে আমাকে প্রয়োজন আছে, কিন্তু আপনাকে নেই।"

"তুমি যখন এখানে, তখন আমাকেও এখানেই থাক্‌তে হবে।"

"না প্রভু তা' হ'তে পারে না।"

"তা হ'তেই হবে, বৎস!"

সিমুর্দ্যান গভেনের নিকটেই রহিলেন।

হলের মেঝের উপর মৃতদেহের স্তূপ। প্রতিরোধ-প্রাচীর এখনও অধিকৃত হয় নাই। তবে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল, পরিণামে সংখ্যাই জয়যুক্ত হইবে।

দুর্গাবরুদ্ধ উনিশ জনের মধ্যে চার জন হতাহত। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাহসী ছিল শাঁতিয়েন-হিবার। সে অতি ভীষণরূপে আহত হইয়াছে। তাহার একটি চক্ষু উৎপাটিত ও গণ্ডাস্থি ভগ্ন হইয়াছে। কোনওরূপে সে ঘুরানো সিঁড়ি দিয়া দোতালার কক্ষে উঠিয়া গেল—আশা, সেখানে অন্তিমপ্রার্থনা নিবেদন করিতে করিতে মরিতে পারিবে। প্রাচীরে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া একটু মুক্ত বাতাস নিঃশ্বাসে টানিতে লাগিল।

কোলাহলের মাঝখানে এক ফাঁকে সিমুর্দ্যান একবার চেঁচাইয়া বলিল, "আর রক্তপাত কেন হ'তে দিচ্ছ? তোমাদের তো পরাজয় হয়েচে, এখন আত্মসমর্পণ কর। ভেবে দেখ, আমরা চার হাজার পাঁচশো, তোমরা মোটে উনিশ—অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমরা দুশোরও বেশী। আত্মসমর্পণ কর।"

মার্ক্‌ইস-ডি-ল্যান্টিনেকের পাল্টা জবাব আসিল,—"ভণ্ডামি একটু রেখে দাও দিকিন!"

তারপর বিশটি গুলি একসঙ্গে বর্ষিত হইল।

প্রতিরোধ-প্রাচীর একেবারে খিলানকরা ছাদ পর্য্যন্ত পৌছে নাই। এই অবকাশের ভিতর দিয়া অবরুদ্ধগণ গুলি চালাইতেছিল। কিন্তু ইহাতে আক্রমণকারীগণেরও একটু সুযোগ ছিল। তাহারা ইহা উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা করিতে পারে।

গভেন চীৎকার করিয়া বলিল, "এমন কেউ আছে কি যে এই দেওয়াল উল্লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছুক?"

"আমি প্রস্তুত", সার্জ্জেন্ট রাডুব বলিয়া উঠিল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

বিচিত্রার দপ্তর

[বিশ্বামিত্র]
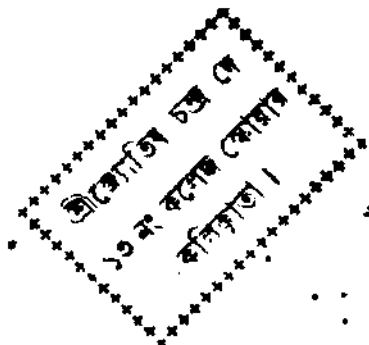
বৈজ্ঞানিক উপায়ে মনুষ্য-সৃষ্টি

উন্মাদ!—এ অপবাদ রটে রটুক্, অসাধ্য-সাধনের স্বপ্নে বঞ্চিত হইতে মানুষ রাজী নয়। প্রকৃতির গোপন তথ্য জানিতে তাহার চিরন্তন আগ্রহ, রহস্য ভেদে বিপুল যত্ন-চেষ্টা। তাহারই নাম—জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান।

মানুষ আবহমান কাল কল্পনা-লোকে বিচরণ করিয়া আসিতেছে—দূরত্বের ব্যবধান ঘুচাইতে, কণ্ঠস্বর ধরিয়া রাখিতে, আকাশে উড়িতে, পাতালে বেড়াইতে, রবি-শশী বায়ু-বরুণের চরণে দাসত্ব-শৃঙ্খল পরাইতে, চন্দ্রলোকে পৌঁছিতে, আর সর্ব্বোপরি সুবর্ণ তৈয়ার করিতে ও জীব—বিশেষ করিয়া নরনারী গড়িতে। বুদ্ধি-ক্ষুরে শাণ দিয়া, কৌশল-জাঁতা ঘুরাইয়া বিজ্ঞান সফলতা লাভ করিয়াছে অনেক বিষয়েই—স-তার ও বে-তার টেলিগ্রাফে টেলিফোনে ও মাইক্রোফোনে, বাষ্পীয় রেল-গাড়ীতে, মোটর-যানে, বিমান-রথে ও সবমেরিণে। স্বেচ্ছামত রৌদ্র-বৃষ্টির উদ্ভবে চন্দ্রলোকের সঙ্গে আকার-ইঙ্গিতে সখ্য স্থাপনের অক্লান্ত চেষ্টায়, রেডিয়ম্ আবিষ্কারের সঙ্গে সুবর্ণ-নির্ম্মাণেও কল্পনা এখন সফলতার দ্বারদেশে—বাকি শুধুই নরনারীর সৃষ্টি।

এই নরনারী-সৃষ্টিও বুঝিবা সম্ভাবনার গণ্ডীর ভিতরে অচিরে আসিয়া পড়ে। পুরাপুরি বুদ্ধি-বিবেচনা-মণ্ডিত মানুষ গড়িতে হয়ত শতাব্দী পার হইতেও পারে, কিন্তু খসড়া ও কাঠামো প্রস্তুত হইতে বিলম্ব নাই! অধ্যাপক টেস্লা তাহার মোটামুটি দাবি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন, এখন অপর বৈজ্ঞানিকেরা অদম্য উৎসাহে ঐ কার্য্যে লাগিয়াছেন। অবিশ্বাসের হাসি অনেকেই হাসিবেন, কিন্তু কথাটা শুনিতে আপত্তি কি?

* রেডিয়ম্ আবিষ্কারে এবং রেডিয়মের সহিত হেলিয়ম্ ও অন্যান্য ধাতুর যোগাযোগে ইহা এখন সত্য বলিয়া সাব্যস্ত যে, মূল ধাতুগুলি শুধু রূপ নয়, প্রকৃতি অবধি আপনা হইতে বদলায় এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সাহায্যেও তাহা সম্পাদন করা যায়, ফলে সুবর্ণ তৈয়ারে অলৌকিকত্ব আর নাই; কল্পনা-বিলাসীর খেয়াল হইতে তাহা এখন বাস্তবে পরিণত! মনুষ্য-সৃষ্টির কথা নিয়ে আলোচিত হইল। *

নানা আরক, লবণাক্ত দানা ও জলীয় বস্তুর সাহায্যে একটা এমন কিছু প্রস্তুত হয় যাহা ইন্দ্রিয়যুক্ত জীব নয় অথবা সজীব কোষও নয়। তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে—'হোমনকিউলস্'। তড়াগ-পুষ্করিণীর জলে ফেলিলে উহা তড়াগ-সঞ্চারী জীবে পরিণত হয়, সমুদ্র-সলিলে ফেলিলে সমুদ্র চর। কোনরূপ দ্রবে ডুবাইলে উহা আদি জৈবনিক কোষের সরু নলের আকার ধারণ করে। সাধারণ জীব যেমন কৌমার যৌবন ও জরা-মৃত্যুর অবস্থা প্রাপ্ত হয় উহাদেরও ঠিক তাহাই ঘটে। সজীব প্রাণীরা উষ্ণতার স্পর্শে যেমন শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে থাকে এবং শৈত্যের প্রভাবে তাহাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি যেমন বিলম্বে ঘটে ইহাদেরও তদনুরূপ। আলোকপাতে সজীব প্রাণীর পরিপুষ্টি যেরূপ দ্রুত হয় ইহাদেরও সেইরূপ; কিন্তু এই কৃত্রিম জীবের বিশিষ্টতা এই যে, আলোক-সম্পাতে বর্দ্ধিত হইলে ইহাদের বাসস্থান সবুজ বর্ণ ধারণ করে।

আরও একটা মজার কথা আছে। আলোক-সাহায্যে বর্দ্ধিত হইলে উদ্ভিদ আলোকের দিকে মুখ ফিরাইয়া বাড়িতে থাকে। ইহাকে 'হেলিওট্রপিজম্' বলে। এ কথা অনেকেই জানেন; তবে ইহা সাধারণতঃ অজ্ঞাত যে, বৈদ্যুতিক প্রবাহে পুষ্টি-সাধন হইলেও অনুরূপ ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহাকে বলে—'গাল্‌ভেনোট্রপিজম্'। জানালার চৌকাটে যেমন ফুল ফুটে 'হোমনকিউলস্' সেইরূপ আলোকের দিকেই পুষ্টি লাভ করে।

অষ্ট্রিয়া—ভিয়েনা সহরে অবস্থিত শারীর-স্থান বিষয়ক বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সেমিনিস্কি এই জীব-সৃষ্টির গুরুতর পরীক্ষা-কার্য্যে বিশেষভাবে ব্যাপৃত। তাঁহার মতে 'হোমন-

কিউলস্' এখনও ঠিক্ সেন্দ্রিয় জীবে পরিণত হয় নাই, তবে জীবনী-শক্তি যে তাহার ভিতর স্পন্দিত হইতেছে তাহা সুপরিস্ফুট। নিম্নতম সজীব কোষের সহিত 'হোমনকিউলসের' জীবনী-শক্তির তুলনা করিলে দেখা যায় যে পার্থক্য খুব সামান্য মাত্র, কিন্তু এই সামান্যাংশ অতিক্রমনীয় কিনা তাহা পরবর্ত্তী অশ্রান্ত চেষ্টা ও তদন্তের ফলে প্রতিপন্ন হইবে।

রাক্ষসের প্রতিশোধ

মাতা বাসুকী ধরিয়া আছেন এই পৃথ্বী। তাঁহারই শিরস্পন্দনে ভূমিকম্পের আবির্ভাব—ইহাই ভারতীয় প্রবাদ। প্রখ্যাত আগ্নেয়গিরি এট্‌নার সন্নিকটে বাস যাহাদের সেই কৃষক-সাধারণের বিশ্বাসও অনুরূপ—শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া আসিতেছে। কিংবদন্তী এই যে, বহুকাল পূর্ব্বে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রাক্ষস-জাতির নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লয় এবং হৃতরাজ্য অসুরগণকে ভূগর্ভে বা পাতালে আশ্রয় লইতে বাধ্য করে। সেখানেই এখনও তাহাদের বসতি—পরিত্রাণের উপায় যে নাই। ইহারাই সৃষ্টি করে ভূকম্পন—প্রবল প্রতিশোধ গ্রহণের বশবর্ত্তী হইয়া।

কিন্তু ভূকম্পের প্রকৃত কারণ কি? নিগূঢ় তত্ত্ব এখনও নির্ণীত হয় নাই; তবে সাধারণ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এই যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের কিছু নিম্নে একটা স্তর বর্ত্তমান, সেই স্তরে চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণ হেতু সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার ন্যায় যে প্রবাহ চলে তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতে স্তরের কতক ভাগ বিধ্বস্ত হয়, ফলে বহু নিম্নের কিয়দংশ বিচ্যুত হইয়া পড়ে; তাহাতেই উপরিভাগ প্রকম্পিত এবং গৃহ-অট্টালিকা পাহাড়-পর্ব্বত ভূমিসাৎ হয়।

আলোকপাতে উদ্ভিদ

রৌদ্রের অভাব চারা-গাছের বৃদ্ধির পক্ষে হানিকর। কৃত্রিম আলোকপাতে এই অভাব দূর হয়, গাছ শশিকলার ন্যায় বাড়িতে থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রক্রিয়ার সাফল্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন; আরও দেখাইতেছেন, যে সকল গাছে বৎসরে কেবল এক ঋতুতেই ফুল বা ফল ধরে কৃত্রিম আলোক সাহায্যে তাহাতে বার মাস ফুল ফুটাইতে ও ফল ধরাইতে পারা যায়। যে সকল বৃক্ষের ফল ধরিবার বয়স হইয়াছে অথচ ফল ধরে নাই, আলোক সংযোগে ইচ্ছামত তাহাকে ফল-ভারাক্রান্ত করা যায়, তবে প্রক্রিয়া ব্যয়-সাপেক্ষ। মার্কিন—ম্যাসাচুসেটস্ কৃষি বিদ্যালয়ে এ বিষয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-কার্য্য চলিতেছে।

পোষ্টকার্ডের জন্ম

অষ্ট্রিয়া—ভিয়েনার ডাঃ এমান্যুয়েল হারমান পোষ্টকার্ডের জন্মদাতা। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্রে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপূর্ব্বে জর্ম্মানীতে জনৈক ভদ্রলোক এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেন, কিন্তু তাঁহার কথায় সকলেই উপহাস করে। অষ্ট্রিয়ায় সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হইয়া ক্রমশঃ পোষ্টকার্ড, জর্ম্মানী ও ইংলণ্ডে প্রসারতা লাভ করে। রাজনৈতিক গ্লাডষ্টোন বলিতেন—কবি কাউপার খাটের (Sofa) উপর মহাকাব্য রচনা করেন, আমি পোষ্টকার্ডের উপর করিতে চাই।

কবির নব-নব কীর্ত্তিকলাপ

ইংলণ্ডের রাজকবি মেইশ্‌ফিল্ড প্রাণে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিয়া বলিয়াছেন—কবিতার আদর সোহাগ এখন আর নাই, কবিতাকে ঠেলিয়া লোকে এখন ছুটে বায়স্কোপে, ঘোড়দৌড়ে, কুস্তি-ক্রীড়া ও মল্ল-যুদ্ধে, মোটর বা বিমান-বিহারে! এই আক্ষেপ করিয়া কবিতার ইতিহাস তিনি আলোচনা করিয়াছেন। সেকালে কবিরা জন মণ্ডলীর সম্মুখীন হইয়া স্বরচিত কবিতা মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতেন—কি হাটে বাজারে, কি ধনীর প্রাসাদে, কি সাধারণের জলসায়। বাঁশী ও বেহালার সুর-সংযোগ সে কী কুহক-ধ্বনি!—লোকে শুনিয়া আত্মহারা হইয়া যাইত। তাহার পর আসিল ছাপাখানার যুগ। কবিতার নূপুর বাজে কর্ণকুহরে; কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র শ্রবণেন্দ্রিয় বর্জ্জন করিয়া চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দিল কবিতার ছাপা কেতাব। ফলে কবিতার মাধুরী ঝরিয়া পড়িল বহু পরিমাণে। কবিতাকে উচ্চাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে চাই কবির সত্তা,

হৃদয়, প্রাণ—কালির আঁচড় নয়। অনেক দোষ থাকিলেও রেডিও-যোগে সুরে কণ্ঠ মিলাইয়া কবিকৃত কাব্যের আবৃত্তিই এখন একমাত্র ভরসা।

খ্যাতনামা কবি উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রেডিও যোগে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া সাগর-পারে মার্কিণ মুলুকে কবিত্বের মায়াজাল সম্প্রতি বিস্তার করেন। নরনারী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহা শুনিয়াছেন ও পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন।

কবি-গুরু বাল্মিকী ও হোমার অমর-লোক হইতে কবির শিরে পারিজাত-পুষ্প বর্ষণ করিয়াছেন কিনা, কে জানে!

আকাশে সর্পযুদ্ধ

মিঃ এচ্ উইগিন্স মার্কিণ বিমানচারী। মেঘলোক ভেদ করিয়া বহু উচ্চে বিমান চালনা করিতেছিলেন; সহসা দেখিলেন পদতলে একটা বিষধর (Rattle Snake) দংশনোদ্যত। ভুজঙ্গ ভূমিতলে কোনক্রমে বিমানযন্ত্রের ভিতর আশ্রয় থাকিবে, আকাশে ভয়ভীত হইয়া নিশ্চয় বিষম ক্রুদ্ধ হয়। সাহেবও লাঠি লইয়া সর্পের সঙ্গে লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আটিয়া উঠিতে পারিলেন না। ফণী গর্জ্জিয়া সাহেবের বাহুর দুই স্থানে দংশন করিল; তিনি তখন ত্রাসে হতবুদ্ধি ও যন্ত্রণায় অধীর হইলেন। বিমান-চালনা অসাধ্য—কাজেই বিমান পাগ্‌লা-নৃত্য জুড়িয়া দিল সেই মহাকাশে। ক্রমশঃ বিমান ভূমির দিকে নামিতে আরম্ভ করিলে সাহেব মানসিক বল সঞ্চয় করিয়া কৌশলক্রমে সর্প-টাকে ধরিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিলেন এবং কোন গতিকে বিমান ভূমিতে নামাইলেন। পরে সুচিকিৎসার ফলে তিনি এখন নিরাময়। 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে?'

সাহিত্যিকের দানপত্র

সিনর গেব্রিল ডি-এনান্‌জিও বর্ত্তমান ইতালীর শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক—কবি, ঔপন্যাসিক, বীর ও দেশপ্রেমিক। তাঁহার আবাস-ভূমি স্বজাতিকে সম্প্রতি দান করিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রীবর যেদিন উহা গ্রহণ করেন কবির আলয়ে সেদিন বসন্তোৎসবের কল-কোলাহল। দানপত্রে ১১টি সর্ত্ত আছে। প্রারম্ভে কবি এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন—

"আত্মা ও প্রস্তরের একত্র সম্মিলন এই ভবনে। চেতনা-হীন ধনের উত্তরাধিকার ইহাতে নাই, ইহা অজর ও অমর আত্মার নিদর্শন মাত্র। প্রকাণ্ড প্রাসাদের ও বিরাট উদ্যান-বাটিকার বর্ণনায় অভ্যস্ত কবি আমি। আমার বীণা-ঝঙ্কারের ও আনন্দোচ্ছ্বাসের নীরব সাক্ষী এই আলয়—এখানে প্রতি কক্ষে আমার নিজস্ব ছাপ। এখানে নাট্য-মন্দির গড়িয়াছি, কারখানা স্থাপন করিয়াছি। এখানেই আমি লোহা পিটাই করি, ফু দিয়া কাচের বাসন গড়ি, ফুলের নির্য্যাসও বাহির করি, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আমার পার্থিব সম্পত্তি যাহা কিছু স্বদেশকে দান করিতে চাই, সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করুন এই নিবেদন; আর প্রার্থনা, মহাকাল যেন ইহা অবিচ্ছিন্ন রাখে—জাগিতেছে যাহারা সেই জীবিতদিগের জন্য, আমাদের কার্য্যকলাপ সাগ্রহে নিরীক্ষণ করিতেছেন যাঁহারা সেই মুক্তদেহীর নিমিত্তও।"

বৃদ্ধা বসুন্ধরার বয়স কত?

চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর এক মহা-সম্মেলনে নূতন করিয়া প্রশ্ন উঠে—পৃথিবীর বয়স কত? অধ্যাপক হান ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হন। এ পর্য্যন্ত ১০ কোটি হইতে ১০০ কোটি বর্ষ বৃদ্ধার আয়ু ঘোষিত হইয়া আসিয়াছে। অধ্যাপক নানা প্রমাণ দেখাইয়া পরমায়ু আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন—৩০০ কোটি বৎসর।

যে সকল পদার্থ শিকড় চালায় ভূতত্ত্ববিদেরা তাহারই আনুমানিক হিসাব ধরিয়া এ যাবৎ পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করিয়া আসিতেছেন। অধ্যাপক হানও প্রকারান্তরে তাহাই করিয়াছেন।

ইউরেনিয়ম্ সীসক ধাতু হইতে রেডিয়মের উৎপত্তি। কি হারে পরিবর্ত্তন সম্ভবপর বিজ্ঞান-নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসারে হিসাব কষিলে তাহা ধরা পড়ে। এই প্রণালীর গণনার উপর নির্ভর করিয়া ৩০০ কোটি বৎসর আয়ু আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। অধ্যাপক কিন্তু আলোচনা আরও সূক্ষ্মভাবে পরিচালিত করিয়াছেন। তাঁহার বিচারের ধারা এই।

সমুদ্রে যে সকল খনিজ দ্রব্য বর্ত্তমান তদপেক্ষা সমুদ্র যে প্রাচীন তাহা সহজবোধ্য। এই সমুদ্রগর্ভস্থ খনিজ দ্রব্যাদি

কালের আবর্ত্তে নানারূপ পরিগ্রহ করিয়া অবশেষে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে—এক একটি পরিবর্ত্তনে বা রূপ-গ্রহণে যে কত শতশত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে কোষ্ঠি-পাথরে কষিতে মাজিতে তাহার হিসাব পাই, ৩০০ কোটি বৎসরে আসিয়া পড়ি। এই গণনা অনুযায়ী বসুমতী অতি বৃদ্ধা হইলেও জাগতিক অপর গ্রহপিণ্ডের তুলনায় শিশু মাত্র। কারণ সুস্পষ্ট। রবির বয়স অগণিত কাল—সংখ্যাবাচক যে নয় বৈজ্ঞানিকেরা একবাক্যে স্বীকার করেন। "কালপ্রভাবে তপনদেব বহুলাংশে ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়াছেন। অনন্ত কোটি বর্ষ পূর্ব্বে সূর্য্যের দেহাংশ খসিয়া অপর এক গ্রহের উপর গিয়া পড়ে—তদবধি বর্ত্তমান ক্ষুদ্রাকারে পরিণতি, ইহা জ্যোতির্ব্বিদ বুধগণের স্বীকৃত।

রাজ্যহারা বোখারা-আমীর

আফগান ও পারস্য রাজ্যের সীমান্ত হইতে অনতিদূরে বোখারা রাজ্য—রুশিয়ার অন্তর্গত। ইহার নিকটে আরল হ্রদ, অল্প দূরে কাস্পিয়ান সাগর।

বোখারার ভূতপূর্ব্ব আমীর সৈয়দ মীর আলম খাঁ এখন নির্ব্বাসনে—নির্ধন, হৃত-বিষ ভুজঙ্গের মত তেজোহীন। ইনিই অথচ সাড়ে বারো লক্ষ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন,—পঞ্চাশ কোটি স্বর্ণ-মুদ্রার অধীশ্বর। 'সনডে এক্স-প্রেস' পত্রে প্রকাশ,—বলসেভিকেরা ইঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন, ধনকুবের আমীরকে পথের ভিখারী করিয়া কাবুলের আশেপাশে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

সোভিয়েট-প্রতিনিধি এখন বোখারার শাসনকর্ত্তা। আমীরের রাজকোষের প্রভূত ধন সমস্তই রুশিয়ায় প্রেরিত হইয়াছে। আমীরের দশা মার্কণ্ডেয় চণ্ডী-বর্ণিত সুরত রাজার মত। নৃপতি সুরত মেধস ঋষির শরণাপন্ন হন এবং কঠোর তপস্যার হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। আমীর সৈয়দ জেনিভার জাতি-সঙ্ঘের নিকট নিজ দুর্দ্দশার কাহিনী নিবেদন করিয়া যথাযথ সাহায্যের ও রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্তির আবেদন করিয়া-ছেন, এই আবেদন নাকি ব্যর্থতায় পরিণত নাও হইতে পারে। কিন্তু রুষ ত' সঙ্ঘের সভ্য নন, তবে—?

মীর সৈয়দের বয়স ৫০, সুগঠিত তাঁহার দেহ, আবক্ষ-লম্বিত কালো দাড়ি, হাস্য-পরিহাসে অথচ তিনি নাকি কলহংস। রাজধানী বোখারার চারিদিকে পাথরের দেওয়াল—বিশ হাত উঁচু, দৈর্ঘ্যে ১৪ ক্রোশ। দেওয়ালে ১১টী ফটক, অর্দ্ধচন্দ্রের মত উহাতে বহু চূড়া। নগরের বুকের উপর বিশাল দুর্গ। এই দুর্গের অভ্যন্তরে রাজ-কোষাগার। সূর্য্যোদয়ে দ্বার উন্মুক্ত ও সন্ধ্যায় রুদ্ধ হইত। দিনে দুইবার আমীর কোষাগার পরিদর্শনে আসিতেন। উহাতে স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত ৫০ কোটি মুদ্রার, তদ্ভিন্ন জহরতাদি। এত মণিমুক্তার একত্র সংগ্রহ এসিয়ার আর কোথাও ছিল না।

মীর সৈয়দ সাবেক পদ্ধতি অনুযায়ী রাজ্যশাসন করিতেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই নিজ চারি ভ্রাতা ও ২৫ জন আত্মীয়-কুটুম্বকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন, রাজনৈতিক নেতার মধ্যে বহুসংখ্যকের প্রাণদণ্ড করেন এবং আরও অনেককে নির্জ্জন কারাকক্ষে অনাহারে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য করেন।

তাঁহার বেগম ও বাঁদী ছিল মোট ১১০টি—অতিসুন্দরী রমণী—নানাদেশ হইতে সংগৃহীতা। সাবেক রুষীয় সৈন্যদলের ইনি মেজর-জেনারেল ও রুষ-জারের দেহরক্ষী ছিলেন। সেই আমলে ইনি প্রকারান্তরে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা, সুতরাং রূপসী নারী তাঁহার অনায়াসলভ্যা, বিচিত্র কি!

১৯২০ সালে অদৃষ্টের চক্র ঘুরিল। সহসা একি সঙ্কট! সোভিয়েট-দল ছদ্মবেশে রাজ্যের সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাজ্য ছিনাইয়া লইতে বদ্ধপরিকর। আমীর প্রমাদ গণিলেন। নিস্তার নাই বুঝিয়া ভারত-সরকারের শরণাপন্ন হইলেন। বলিলেন—'সোভিয়েট-কবল হইতে রক্ষা করুন, আমার ৫০ কোটি স্বর্ণমুদ্রা শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করুন, চিরদিনের জন্য গোলাম হইয়া থাকিব, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতাকাতলে থাকিয়া ধন্য হইব।' হায়! অরণ্যে রোদন! ভারত-সরকার সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা আমীর দেশ ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন।

প্রত্যূষে উঠিয়াই শুনিলেন—শত্রুপক্ষের ভীষণ কামান গর্জ্জন। আর সেই সঙ্গেসঙ্গেই নিমকহারাম সৈন্যদল কর্ত্তৃক রাজধানীর সকল দ্বার উন্মোচন, সৈন্যেরা সশস্ত্র অবস্থায় পুত্তলিকার মত দণ্ডায়মান! বুঝিলেন—উৎকোচের মোহিনী মায়া! আমীর কালবিলম্ব না করিয়া গাড়ী-চালকের ছদ্মবেশে

ধরিলেন, নগরের প্রধান ফটক পার হইবার সময় দেখিলেন যে, শত্রুপক্ষীয় প্রথম সেনাদল বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করিতেছে! আত্মসংবরণ করিয়া নবাবের দোহাই দিয়া আমীর প্রাণ বাঁচাইলেন।

আমীরের দুই পুত্র সোভিয়েট-রাষ্ট্র কর্ত্তৃক মস্কো-এ প্রেরিত হন—আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য। উঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশের আরও বহু মেধাবী যুবককে ঐ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে; উঁহারা সোভিয়েট-শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া বোখারায় প্রবলভাবে প্রচার-কার্য্য চালাইতেছে।

সূতিকাগারে যশস্বী

দাও ধন, দাও যশ—আদিযুগ হইতে মানুষ কহিয়া আসিতেছে ইহাই। ধনভাগ্য অনেকের দেখা যায়, যশভাগ্য দুর্লভ। এই যশ দৈহিক ও মানসিক কত কঠোর শ্রমের এবং কল্পনা তপস্যার ফল! কাহারও জীবনের মধ্যাহ্নে, কাহারও বা সায়াহ্নে যশ দেখা দেয়। কিন্তু উষায় প্রভূত খ্যাতি বোধ হয় এই প্রথম।

ঘটনা মার্কিণের। শ্রীমতী বমবার্জ্জার ও শ্রীমতী ওয়াটকিন্‌স্ শিকাগো সহরে সরকারী সূতিকাগারে একই দিনে দুই পুত্র প্রসব করেন। ধাত্রী জননীদের নামের টিকিট খুলিয়া উভয় শিশুর গাত্র পরিষ্কার করিয়া দেন, তাহার পর যথারীতি দেহ তৈলাক্ত করিয়া নামের নূতন টিকিট লাগাইয়া জননীদ্বয়কে শিশু প্রত্যর্পণ করেন। জননীরা অনুযোগ করেন যে, শিশু দুইটি বদল হইয়া গিয়াছে। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জনকদ্বয় আসিয়া জননীদের কথার সমর্থন করিলেন। ধাত্রী কিন্তু ভুল স্বীকার করিতে চাহিল না। সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। আলোচনার ফলে মহারথী চিকিৎসকেরা আসিলেন, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা দেখা দিলেন। নানারূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধাত্রীর কথাই ঠিক ইহাই সাব্যস্ত হইল। জননীরা কিন্তু বিশেষজ্ঞদিগের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে নারাজ হইলেন। ব্যাপার অবশেষে আদালতে পর্যন্ত গড়াইল। বিচারপতিরা নানা গবেষণার পর বিশেষজ্ঞদিগের মতেই সায় দিলেন। আইনের মর্য্যাদার প্রতি মার্কিণবাসীর অশেষ শ্রদ্ধা। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জননীরা অগত্যা বিচার-ফল মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন—উপায়ান্তরও যে নাই। শ্রীমতী বমবার্জ্জার কিন্তু মনে মনে ভাবিতেছেন—পাদ্রির ছেলে কি শেষে ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রেসিডেণ্ট হইবে। শ্রীমতী ওয়াটকিন্‌স্‌ও ভাবিতেছেন—ব্যবসাদারের পুত্র কি এমার্সন হইবে! বলা বাহুল্য, মিষ্টার বমবার্জ্জার একজন রাজনীতিক ও সওদাগর এবং ওয়াটকিন্‌স্ উচ্চপদস্থ পাদ্রি।

সারা ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রে এই বিচারের নানারূপ টীকা-টিপ্পনী হইতেছে, প্রাতরাশের সঙ্গেসঙ্গে এই বিষয়েরই জল্পনা চলিতেছে। আমাদের মনে হয়, সলোমনের ন্যায় বিচারক যদি থাকিতেন বিশেষজ্ঞের মতামত অবশ্যই নাকচ করিতেন এবং জননীদ্বয়ের মত বাহাল রাখিতেন; কিন্তু সে যুগে আর এ যুগে—প্রভেদ অনেক।

নবপ্রসূত শিশু দুটির যশভাগ্যের কথা এই সঙ্গে আসিয়া পড়ে। জন্মগ্রহণ করিয়াই তাহারা যে খ্যাতি অর্জ্জন করিল জন্মজন্মান্তরীণ সাধনায় তাহা মিলা ভার।

সমুদ্র-গর্ভে হিমালয়-পর্ব্বত

সুদূর অতীতে—প্রাগৈতিহাসিক যুগে হিমালয়-পর্ব্বত যে সমুদ্র-গর্ভে বিলীন ছিল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমের সীমান্তে কোয়েটা; তাহারই সন্নিকটে সামুদ্রিক জীব-জন্তুর প্রস্তরীভূত দেহ ও দেহাবশেষ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু প্রবাল, প্রচুর ঝিনুক ও অন্যান্য জীব-দেহ, কিন্তু শিলীভূত অবস্থায়। বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষান্তে নির্ণয় করিয়াছেন যে, উহা সংখ্যাতীত কালের নিদর্শন। তখন সম্ভবতঃ নর-বানরের সৃষ্টি হয় নাই; এমন কি স্তন্যপায়ী জন্তুরও হয়ত শৈশব-কাল মাত্র। অভিব্যক্তিবাদ মানিয়া লইলে ক্রমশঃ বানর ও নর আদি আবির্ভূত হইল। সেই আদি-কালের গিরিবর ঐ হিমালয়—সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মহাসাগরকে সগর্ব্বে ঠেলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরি-শ্রেণীতে সৃষ্টির যুগ-বিপর্য্যয়ের সাক্ষ্যদান করিতেছে। নানা দেশের কুতূহলী বৈজ্ঞানিকেরা দুর্জ্ঞেয় রহস্যের উদ্ঘাটনে ব্যস্ত—কাঞ্চন-জঙ্ঘা শৃঙ্গেও অভিযান করিতেছেন। নব নব কত তথ্যই স্থিরীকৃত হইবে, তাহা কে বলিবে।

বিশ্বামিত্র

ভাই-ফোঁটা

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সাত

এরপর তু'জনের মধ্যে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধই হ'য়ে গেল।

শৈবাল তার ছোট বড় প্রত্যেক কাজের ভিতর দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল এই ভাবটাই ফুটিয়ে তুলতে যে শিউলী বিনা তার কোন কষ্টই হয় না সেও তাকে অনাদর অবজ্ঞা করে চলতে পারে।

শিউলী তার এ ভাব দেখে মুখ টিপে হাসত, চোখ দুটো কিন্তু কারণাকারণে সজল হ'য়ে উঠ্‌ত। কতবার সে স্বেচ্ছায় শৈবালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু শৈবাল যেন তাকে দেখতেই পায় নি, এমনই ভাবে সরে যেত।

সেদিন কি একটা কাজ উপলক্ষ্যে শৈবাল বাইরে বেরিয়েছিল। গৃহিণী শিউলীকে বললেন, "চল্‌ত মা, এই বেলা ওর ঘরটা পরিষ্কার ক'রে দিয়ে আসি।"

ঘর পরিষ্কার করতে করতে ক্ষণপ্রভা দেবী ব'লে উঠ্‌লেন, "এত যে বড় হ'ল খোকা, তা এতটুকু স্বভাব বদলাল না। এখনও ওর সব দেখতে হ'বে।"

শিউলী শৈবালের তৈলচিত্রখানা সন্তর্পণে ঝাড়তে ঝাড়তে জবাব দিল, "ওই জন্যেই ত বলেছিলুম মা—বিয়ে একটা দাও—বউ এসে সব করবে।" কিন্তু জুতার শব্দ পেয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই সে দেখল শৈবাল দ্বারে দাঁড়িয়ে। শিউলী মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে আবার ছবিখানা মুছতে লাগল।

গৃহিণী ডাকলেন, "কে, খোকা! আয় বোস্‌!"

শৈবাল এসে ক্লান্তভাবে একখানা চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর হাই তুলে, আলস্য ভেঙ্গে বলল, "ঝি, চাকর থাকতে তোমরা আবার এসব করতে গেলে কেন? এ তোমাদের কি বিদ্‌ঘুটে সখ বুঝতে পারি না।"

হাতের কাজ বন্ধ রেখে গৃহিণী ফিরে তাকিয়ে বললেন, "পারবিও নাত। এ সব কাজ নিজের হাতে না ক'রে ঝি চাকরের হাতে দিয়ে কি আর তৃপ্তি হয়? ওই জন্যেই ত বলছি, বুড়ো হ'য়ে প'ড়েছি আর ক'দিন? দেখে শুনে একটা বিয়ে কর, তার হাতে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। তা আমার কথাত শুনবি না—" শেষদিককার কথাগুলো তাঁর ভারী হ'য়ে এল।

শৈবাল শুধু "হুঁ" বলে চুপ ক'রে রইল।

গৃহিণী করুণভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শ্যামবাজারের চৌধুরীরা বড্ড পেড়াপীড়ি করছে কিন্তু তোর ভয়ে কিছু উত্তর দিতে পারছি না। করবি বাবা বিয়ে? মায়ের শেষ অনুরোধটা রাখবি না?"

শৈবাল অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌ল। কি একটা বলতে গিয়ে শিউলীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখল, সে তারই মুখের পানে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে। চোখের পাতায় তার কৌতুকবিমিশ্রিত একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের হাসি ধারাল ছুরিকার মত চক্‌চক্‌ করছিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে শৈবালের মাথায় আগুণ ধরে উঠ্‌ল। ধীর জোরালো কণ্ঠে বলল "বেশ, তোমার যদি মা এতই ইচ্ছে—তবে আমি না বলতে চাই না—তোমার যা ইচ্ছে কর।"

গৃহিণী অশ্রুসজল নয়নে হেসে বললেন, "আশীর্ব্বাদ করি তোর ভালই হ'বে।" তারপর শিউলীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "তুই ওর ময়লা কাপড়গুলো বেছে শীগ্‌গীর নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ ওর জল খাবারের যোগাড় করি গে।

তিনি চ'লে যেতেই শিউলী কৌতুকোজ্জ্বল নয়নে বিদ্রূপ পূর্ণস্বরে বলল, "মাতৃভক্ত সন্তান! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বিয়ের মতটা দেওয়া হ'ল মায়ের মুখ চেয়ে, না

আমার মুখের পানে তাকিয়ে? দেখাতে চাও, আমি ছাড়া বিয়ের আরও ঢের পাত্রী আছে কেমন না?"

বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হ'য়ে শৈবাল সহজ গলায় উত্তর দিল, "ঠিক তাই।"

শিউলী বলল, "যাই হোক, সুমতি যে হয়েছে তা সে যে জন্যেই হোক্—এই ভাগ্য!" কথা শেষে সে হাসতে হাসতে ময়লা কাপড়গুলো তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মানব চরিত্রে অনভিজ্ঞা ক্ষণপ্রভা দেবী পুত্রের সম্মতি পেয়েছেন ভেবে শৈবালের বিবাহের প্রায় একরূপ স্থিরই ক'রে ফেললেন। তাঁদের তরফ থেকে মেয়ে দেখে আসার পর, পাত্রীপক্ষ পাত্র দেখতে চাওয়ায়, তিনি আগামী রবিবার দিন ধার্য্য ক'রে দিলেন।

রবিবার সকালে উঠে গৃহিণী শৈবালের দুয়ার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, "আজ ওঁরা দশটা এগারোটার সময় দেখতে আসবেন খোকা, বাড়ীতেই থাকিস, ভুলে যেন কোথাও বেরুস নি।"

শৈবাল যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল "সেকী মা! বেলা দশটায় যে আমার এক জায়গায় engagement আছে। থাকতে পারব না ত কিছুতেই—"

গৃহিণী বিস্মিত সুরে বললেন "সে কি রে? বিশেষ জরুরী কাজ কি?"

নির্জ্জলা মিথ্যাটা বলতে গিয়ে শৈবালের জিভে আটকে গেল। আমতা আমতা করতে লাগল, "না—তা—হাঁ—জরুরী বই কি।"

গৃহিণী বলে উঠলেন, "কিন্তু বেরুনো ত কিছুতেই হ'তে পারে না—তা সে যত ক্ষতিই হোক্। ভদ্রলোকেরা আসবেন কথা আছে। তা এক কাজ কর না, এখনত মোটে সাতটা। গিয়ে কাজ মিটিয়ে দশটার মধ্যে আসতে পারবিনি?"

চিন্তিতের ভান ক'রে "দেখি যদি পারি", ব'লে শৈবাল পুনরায় ঘরে ঢুকে গেল।

গৃহিণী সরে যেতেই সে অত্যন্ত সন্তর্পণে বেরিয়ে, এঘর সেঘর ক'রে শিউলীর খোঁজ করতে লাগল।

একটা আধ-আলো ঘরের মাঝে, রাজ্যের ফল এবং তরকারি নিয়ে শিউলী কুটতে বসেছিল।

দুমদুম ক'রে এসে, শৈবাল তার পাশে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "তুই রাক্ষসি যত ফ্যাসাদ বাধিয়েছিস্। চাষার মেয়ে কিনা—কত আর বুদ্ধি হ'বে।"

আচমকা এই অভিযোগে শিউলী প্রথমটা হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু শৈবালের মুখভঙ্গীর দিকে তাকিয়েই সে খিলখিল ক'রে হেসে উঠ্ল। বলল, "চাষার মেয়ের বুদ্ধির আবার কি ত্রুটী হ'ল?"

"তুইই নিশ্চয় মাকে বলেছিস্ যে বিয়ে কর্ত্তে আমি রাজী আছি।—মিথ্যেবাদী কোথাকার।"

শিউলী কোন রকমে হাসির বেগটা দমন ক'রে ভারী গলায় বলল, "বারে! বেশ ছেলেটী ত? তুই নিজে না সেদিন মাকে বললি—বিয়ে কর্ত্তে তোর আপত্তি নেই?"

শৈবাল অতি ক্রোধে মুখখানা বিকৃত ক'রে বলে উঠল, "সেকি আমি সত্যি ক'রে বলেছিলুম—না তোর ওপর রাগ ক'রে।—একটু বুদ্ধিও নেই!"

শিউলী গম্ভীর ভাবে বলল, "তা সে মা বুঝবে কেমন ক'রে?"

শৈবাল তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "তা আমি জানি না, বুঝিয়ে তোকেই দিতে হবে। আমার কি, আমিত এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি।"

শিউলী তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে, পুনরায় হাতের কাজে মন দিয়ে বলল, "আমি কেন বলতে গেলুম! আমার দ্বারা হবে না।"

শৈবালও পরম উদাসীনের মত বলল, "না হ'বে নাই হ'বে। আমি কিন্তু স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি—বিয়ে যদি করি ত তোকে ছাড়া আর কাউকে করব না।"

এই তেজী জোরালো মনের ছেলেটীর স্পষ্ট বাক্য হৃদয়ের একান্ত কাম্য বস্তুটাকে প্রকাশ ক'রে বলার সবল সরল ভঙ্গী প্রচণ্ড মধুর আঘাতে শিউলীর সংযমের বাঁধকে ক্রমশঃই যেন শিথিল ক'রে আনছে। চাইবার দাবী করার ভঙ্গী নিয়ে এই সেদিন শৈবালের সঙ্গে সে যে তর্ক করছিল আজ অকস্মাৎ সেই সিন্ধবাদের বুড়োটা এমনই ভাবে তার

কাঁধে চড়ে বসে তাকে অহর্নিশি পীড়ন ক'রবে—এ ত সে কোনদিন কল্পনাও করে নি।

শৈবালের এই উদ্ধত কামনার হাত থেকে আত্মরক্ষা করাও যে আজ তার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর হ'য়ে দাঁড়াল।

তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে শৈবাল কণ্ঠে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "তুই মাকে বলিস, জরুরী কাজ থাকাতে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি,—এবেলা ফিরতে পারব না।"

সত্যই সে চ'লে যায় দেখে শিউলী ডাকল, "এই ছোট শোন্, শোন্!"

শৈবাল ফিরে দাঁড়াতে সে করুণকণ্ঠে বলল, "লক্ষ্মীটি, ছিঃ! ছেলেমানুষী ক'র না। ভদ্রলোকরা আসবেন দেখতে—তাঁদের অপমান করা হয়।"

শৈবাল মুখ ভেংচে বলল, "তুই কেবল আমার পিছনে লেগেছিস্ জঞ্জাল বাধাতে—"ক্রোধে ক্ষোভে স্বর তার রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

শিউলীর চোখ দু'টোও জলে ভ'রে উঠ্‌ল।

—হায়রে! সে যে কতখানি ব্যথা বুক পেতে নিয়ে তবে এত বড় নিষ্ঠুর হতে পেরেছে—

শৈবাল ছোট ছেলের মত মাথা নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "বিয়ে কিন্তু আমি কিছুতেই করতে পারব না, তা সে যে—যতই বলুক।"

শিউলী ম্লান ভাবে হেসে বলল, "বেশ ত, দেখে গেলেই যে বিয়ে হবে তার ত কোন মানে নেই। ভদ্রলোকদের কথা দেওয়া হয়েছে বখন—তখন তাঁরা দেখে যান; তারপর না হয়—"

শৈবাল ধপ ক'রে তার পাশে বসে পড়ে বলল, "বল্ তারপর তুই অন্ততঃ আর আমার বিয়ের কথায় থাকবি না?"

শিউলী তার মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে, সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা! কিন্তু ভবিষ্যতে আর পাগলামী করিস নি।"

চৌকাটের উপর পা দিয়ে ধীরা ডাকল, "শিলী তরকারী"—কিন্তু ঘরের ভিতরে নজর পড়তেই সহসা থেমে গেল। একবার কটাক্ষ ক'রে, সুর বদলে শ্লেষ ভরা মৃদু কণ্ঠে বলল, "আমি জানতুম না!" তারপর দ্রুতপদে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার এই কথার খোঁচার ভিতর যে কদর্য্য অর্থটা লুকানো ছিল, তারই লজ্জায় শিউলীর মাথাটা মাটীতে প্রায় নত হয়ে গেল। তার অবশ হাতখানা শৈবালের মাথার উপর থেকে খ'সে পড়ল।

শৈবাল কতক্ষণ নীরব থেকে, পরে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, "বড়দিকে তুইও চিনিস্, আমিও যে না জানি তা নয়। এই নির্দ্দোষ তুচ্ছ ঘটনাটাকে তিনি যে কতখানি মসীকৃষ্ণ ক'রে একটা প্রকাণ্ড কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি করবেন তাও বুঝতে পারছি। তাই সেটাকে ঘটতে দিতে আমি মোটেই রাজী নই। আমি মাকে এক্ষণি স্পষ্টাক্ষরে বলব যে আমি তোকে দস্তুরমত বিয়ে করতে চাই—যাতে না বড়দি তোর নারীত্বকে খাম্‌কা অপমান করবার সুযোগ পায়।"

নির্ব্বাক জড় পুত্তলীর মত শিউলী শৈবালের কথা শুনছিল, কিন্তু তার কথা শেষ হতেই সে ব্যাকুল ভাবে ব'লে উঠ্‌ল "খবরদার, অমন কাজও করিস নি, তা যদি করিস্ ত যে দিকে দু'চক্ষু যায়, চ'লে যাব।"

শৈবাল আঘাত পেল। ব্যথিত কণ্ঠে বলল, "কিন্তু এর পরও কি চুপ ক'রে থাকা উচিত? বড়দি তোর শুভ্র ললাটে মিথ্যে-কলঙ্কের ছাপ এঁকে দেবেন, আর বিনা দোষে তুই সে গুরু শাস্তি মাথা পেতে নিবি? আমি পুরুষ—আমাকে হয়ত ওরা মোটেই দোষ দেবে না, সবটাই চাপবে তোরই ঘাড়ে—"

শিউলী তা জানত এবং এর দণ্ড কি তাও তার অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু শৈবালকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে নিজের সমস্ত দুশ্চিন্তারাশিকে সবলে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা ক'রে সে সহজ গলায় বলল, "কেন বাজে কতকগুলো বড় বড় কথা ভেবে, অনর্থক মনকে পীড়া দিচ্ছিস্? ওঁদের আসবার সময় হয়ে এল—পালাস নি কিন্তু—"

শৈবাল ধীরে ধীরে উঠে প'ড়ে বলল, "আমার জন্যে আমি মোটেই ভাবি না। মিথ্যা কলঙ্ককে ভয় করব এত বড় কাপুরুষ আমি নই, কিন্তু তোর পক্ষে সত্যিই যদি তা ঘটে তাহ'লে আর যেন তখন আমার মুখ চেপে রাখার চেষ্টা করিস নি। সে আমি কিছুতেই শুনতে পারব না।"

টলতে টলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাজ্যের দুশ্চিন্তার পশরা মাথায় নিয়ে শিউলী সেইখানে সেই ভাবে ব'সে রইল।

অতঃপর তার কি করা উচিত। এখন একমাত্র সোজা পথ সে দেখতে পেল—এ গৃহ ত্যাগ করা।

শৈবালের সকল দেহ এবং মনের অবিরত এই তীব্র আকর্ষণ এবং ঘটনা স্রোতের ঘূর্ণিপাক থেকে সে এমনই ভাবে নিজেকে আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

অহর্নিশি নিজেকে পীড়ন করে', নানা ছলে প্রেমাস্পদকে দূরাতে ঠেলে রাখার যে গুরু বেদনা, তা যেন মাঝে মাঝে তার শ্বাসরোধ ক'রে আনে। তার ওপর যার জন্য তার এই অবিশ্রান্ত সংগ্রাম, সেই মিথ্যা কলঙ্কের বোঝাটাই হয়ত মাথায় চাপবে। কেমন ক'রে একা সে ভার শিউলী সইবে, ভাবতেও তার চোখে অবিশ্রান্ত ধারা বয়ে গেল। দু'হাতে মুখ ঢেকে "উঃ, মাগো!" ব'লে সেইখানে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

আট

আহারান্তে গৃহিণী নিজের ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। শিউলী ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে তাঁর পায়ের গোড়ায় গিয়ে ব'সে প'ড়ল। কিছু চাইবার দরকার হ'লে সে এমনই করত, তাই ক্ষণপ্রভা দেবী মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে?"

দু'হাতে গৃহিণীর পা একটা কোলে তুলে নিয়ে টিপতে টিপতে শিউলী মৃদুকণ্ঠে বলল, "আমার মাসতুতো বোন চপলা চিঠি লিখেছে, দিন কতক তার বাড়ী গিয়ে থাকব মা?"

গৃহিণী বিস্মিত হ'য়ে বললেন, "তোর মাসতুতো বোন —চপলা! কই নামত কখনও শুনিনি! তুই এখানে আসা অবধি——"

শিউলী তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "—সেও বিশেষ কিছু খবর দেয় নি, আমিও নিইনি। সেই ছেলেবেলার দেখা। তবে বিশেষ ক'রে লিখেছে——"

গৃহিণী মুখভার ক'রে বললেন, "আমার কিন্তু মোটেই ইচ্ছে নয় যে তুই যাস্। বিশেষতঃ হয়ত সেখানে অনভ্যাসের জন্যে কত কষ্ট হবে তোর। তার চেয়ে লিখে দেনা কেন— তারা এখানেই দিন কতক আসুক?"

শিউলী তাঁর মনোভাব বুঝল। হেসে বলল, "অনেক ছেলেপিলে; তাছাড়া চাষী মানুষ, ধান চাল ফেলে আসতে পারবে না ত মা। আমি না গেলে অনেক দুঃখ করবে!"

ক্ষণপ্রভাদেবী তথাচ আপত্তি ক'রে বললেন, "কিন্তু এদ্দিন দেখা নেই, শোনা নেই—"

নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়ে কিছুক্ষণ কেটে গেল।

তাঁকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে শিউলী আস্তে আস্তে বলল, "কি বল না, যাব?"

গৃহিণী অনিচ্ছাভরা কণ্ঠে বললেন, "কি বলব মা! যাবে যাও; কিন্তু বেশী দিন যেন থেক না। সাতদিন—"

শিউলী না হেসে পারল না। বলল, "সে কি মা! এতদূর থেকে যাব, মোটে সাতদিন! অন্ততঃ মাস খানেক না হলে—"

গৃহিণী বাধা দিয়ে, ব'লে উঠলেন, "না, না, অতদিন হবে না বাপু! জোর দশদিন ধ'লে দিচ্ছি—" ব'লে পাশ ফিরে শুলেন। কবে, কেন, কিছুই ভাল ক'রে জানবার আর তাঁর ধৈর্য্য রইল না।

কথাটা ক্রমে শৈবালের কাণেও উঠল। প্রথমটা সে বিশ্বাসই করতে পারে নি। তারপর ঝড়ের মত শিউলীর ঘরে ঢুকে প'ড়ে বলল, "তুই নাকি কোথা চ'লে যাবি শিলি?"

শিউলী বিছানার উপর পড়ে পড়ে নিজের ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের কথাই ভাবছিল। শৈবালের কথা শুনে এবং মূর্ত্তি দেখে, থতমত খেয়ে শয্যার উপর উঠে ব'সে বলল; "বস্! বলছি।" তারপর ম্লানভাবে হেসে শান্ত গলায় বলল, "যাব এক মাসতুতো বোনের বাড়ী নিমন্ত্রণের চিঠি পেয়ে। দিন কতক আদর খেয়ে মোটা হ'য়ে আসা যাবে।"

শৈবাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে, কি দেখে নিয়ে অবিশ্বাস ভরে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল, "মিথ্যে কথা! আমার চোখে ধূলো দিতে পারবি না— তাহলে বৃথাই তোকে ভালবাসার গর্ব্ব করি। আমাকে ফাঁকি দিয়ে স'রে যেতে চাস্—

শিউলী ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হ'য়ে উঠল। মনের গোপন অভিলাষ ব্যক্ত হ'য়ে পড়লে এই গোঁয়ার ছেলেটা যে কি ক'রে বসবে তার ঠিক নেই, তাই তাড়াতাড়ি শিউলী ব'লে উঠল, "না! সত্যিই চিঠি এসেছে। মিথ্যে কেন বলতে যাবরে!"

কথাটা ব'লে ফেলেই শিউলী প্রতিমুহূর্ত্তে আশঙ্কা করছিল এই হয়ত শৈবাল চিঠি চেয়ে বসে। কিন্তু শৈবাল তার কোন কথায় কাণ না দিয়ে ব'লে উঠল, "আসুকগে চিঠি; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তুই পালাতে চাস কেন? আত্মরক্ষার জন্যে? আমার ওপর কি তোর এতটুকুও বিশ্বাস নেই যে কোন দিন, কোন কারণেই তোর এতটুকুও অমর্য্যাদা আমি করতে বা ঘটতে দিতে পারি না।"

ব্যাকুল ভাবে তাকে বাধা দিয়ে আহত শিউলী বলল, "না রে না—একথা কোনদিনই আমার মনে আসে নি, আসতে পারেও না; তাতে যে আমারই অপমান।"

শৈবাল অভিমান সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলল, "তবু তোকে যেতে হবে?"

"হ্যাঁ, তবু আমার যেতেই হবে। এ ভিন্ন আমার অন্য গতি যে নেই ভাই—" শেষের দিকে স্বরটা তার ক্রমেই জড়িত হ'য়ে গেল।

শৈবালের চোখ ছেপে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। বেদনা ভরা কণ্ঠে বলল, "বেশ যা। বাধা দেবার চেষ্টা ক'রব না। আজও সে দাবী করবার অধিকার হয়ত পাই নি। আমি জানি ছেড়ে তুই যাবিই, তবে যাবার আগে বলে যা আমার ভালবাসার প্রতিদান পেয়েছি কি না? তুই আমায় ভালবাসিস্ কিনা?"

বঞ্চিত হতভাগ্য তরুণের প্রতিটি অক্ষর এক একটি আঘাতে শিউলীর এতদিনকার ঠেকিয়ে রাখা সংযমের বাঁধটাকে ভেঙ্গে চুরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সর্ব্বশরীর তার প্রবল আলোড়নে কেঁপে উঠল। আকুল ক্রন্দনে ভেঙ্গে প'ড়ে আর্ত্তকণ্ঠে ব'লে উঠল, "তাই যদি না বাসব তবে কিসের জোরে তোর ওপর জোর করি। কিসের জন্যেই বা তোকে ঠেকিয়ে রেখে নিজেও দুঃখ পাই? কিসের জন্যেই বা আজ আমার যাবার প্রয়োজন? আমি যে আর নিজেকে বাঁচাতে পারি না! তাইত—"

শিউলীর এই স্বীকারোক্তি শৈবালের নিকট যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই অভিনব। একটা উৎকট আনন্দ তাকে পাগল ক'রে তুলল। নিজের দুই বজ্র মুষ্টিতে শিউলীর হাত দুটো চেপে ধরে অধীর কণ্ঠে ব'লে উঠল, "তাহ'লে আর তোর যাওয়া হতেই পারে না। আর কেউ কিছুতেই তোর আমার মিলনে বাধা দিতে পারবে না।"

শিউলী শৈবালের মাথাটা বুকের মাঝে চেপে ধ'রে কোমল স্বরে ভর্ৎসনা ক'রে বলল, "ছিঃ! আমার এতটুকুও রূপ নেই। তুই পুরুষ—কেন আমার জন্যে কলঙ্ক মাখবি? দশজনের সামনে মাথা হেঁট করবি?"

শৈবাল দুই হাতে শিউলীর দেহটাকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে উত্তেজিত ভাবে বলল, "না, না, না! এ হতেই পারে না।"

তারপর সে শিউলীর মুখে একটি নিবিড় চুম্বন এঁকে দিল।

বাধার ক্ষুদ্র একটি চেষ্টাও না করে আবেশে, শিথিল অঙ্গে শিউলী শৈবালের বুকের উপরই প'ড়ে রইল। প্রেমাস্পদের সত্যকার প্রথম এবং হয়ত এই শেষ দান কোন রকমেই সে প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। জীবনের পথে এই ত তার সম্বল!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দ্বার খুলে গেল। সম্মুখেই দাঁড়িয়ে গৃহিণী এবং তাঁর পিছনে ধীরা।

ঘরের মাঝের এদৃশ্য দেখে ক্রোধে স্বর্ণপ্রভা দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলে উঠল। সহসা কোন কথা কইতে পারলেন না।

ধীরা মুখ মচকে বলল, "দেখলে মা? আমি কি বিনা প্রমাণে বলেছিলুম। এদের ব্যাভার অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য করছি কিনা—"

গৃহিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকলেন, "খোকা!"

শিউলী এবং শৈবাল উভয়েই মাথা নীচু করেছিল।

গৃহিণী তার দিক থেকে শিউলীর পানে তাকিয়ে অধিকতর কঠিন কণ্ঠে বললেন, "শিউলি! তোকে না আমি পেটের মেয়ের মত মানুষ করেছি? শেষে তোর এই

লাজ! দেখছি দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছি। ছোট ভাইএর মত যাকে দেখে এসেছিস, তার মাথা খেতে তোর একটুকুও বাধল না কালামুখী! চরিত্র তোর এত নষ্ট! তার চেয়ে গলায় দড়ী দিস্‌নি কেন হতভাগী।"

শিউলীর মাথাটা মাটীতে ঝুলে পড়েছিল। মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখ দেখে সংজ্ঞা তার ছিল কিনা বোঝা যায় না। গৃহিণীর এতগুলো তিরস্কারের উত্তরে দেহটা তার শুধু একবার ন'ড়ে উঠ্‌ল।

শৈবাল দাঁড়িয়ে উঠে দীপ্তকণ্ঠে বলল, "না জেনে, না বুঝে এসব কথা কাকে কি বলছ, মা? ভালই হ'ল। একটা কথা এখনই তোমাকে বলি, সেটা হয়ত আর দু'চার দিন পরে বলতাম। শিলীকেই আমি বিয়ে করতে চাই। যদি কখনও তাই হয়ত বিয়ে করব, নইলে আর কাউকে—"

গৃহিণী ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন, "তুই থাম ছুঁচো! সে-দিনকার ছেলে একটা নষ্ট-চরিত্র মেয়ের মোহে প'ড়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ঐ কথাটা বলতে তোর মুখে একটু বাধল না, এত বড় বেহায়া হ'য়েছিস্। মনে করিস্‌নি ছেলে ব'লে তোকে ক্ষমা ক'রব। আয় ধীরা!" ব'লে হন্ হন্ ক'রে তিনি নীচে নেমে গেলেন।

শিউলী শব্দহীন, মৃত্যু-বিবর্ণ মুখে সেই যে জড় পদার্থের মত ব'সে রইল, শত তিরস্কারে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনাতেও তার কাছ থেকে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। শুধু বাণ হেনে, কে যেন তার জীবনীশক্তি নিঃশেষে হরণ করে নিয়েছিল।

সারাদিন ধ'রে বাড়ীখানার উপর দিয়ে যেন একটা তুমুল ঝড় ব'য়ে গেল। অজস্র তিরস্কার, লাঞ্ছনা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ শিউলীর মাথায় শ্রাবণের ধারার মত বর্ষিত হ'ল, কিন্তু সে যে সেই ঘরের মেঝের, মাটী নিয়ে পড়েছিল— তেমনই প'ড়ে রইল সম্বিতহারার মত।

অবশেষে ক্ষণপ্রভা দেবী বললেন, "ওকে এক্ষণই বাড়ী থেকে বিদেয় করে দাও! কালামুখী যেন আমার সামনে আর মুখ না বার করে।"

ধীরা বলল, "কালকে ভাই ফোঁটা। কালবাদ পরশু ওর সেই মাসতুত বোনের বাড়ীই না হয় চলে যাবে—"

সংজ্ঞাহীনভাবে শুয়ে ছিল শিউলী।

অন্ধকার ঘর। গভীর রাত্রে ভেজানো দুয়ার ঠেলে শৈবাল ঘরে প্রবেশ করল। আন্দাজে শিউলীর মাথার গোড়ায় এসে বসে পড়ল। মাথা স্পর্শ করে ডাকল, "শিলী, ঘুমুচ্ছিস?"

সুপ্তোত্থিতের মত শিউলী চমকে উঠে বলল, "কে? ছোট! এত রাতে এখানে কেন?" কথা তার অশ্রু-ভারাক্রান্ত।

শৈবাল অত্যন্ত করুণকণ্ঠে বলল, "আমাকে ক্ষমা কর— মহাপাপী আমি। আমারই দোষে তোর পবিত্র জীবনটা কলঙ্কিত, ব্যর্থ হ'য়ে গেল—"

শিউলী কোন উত্তরই দিল না।

শৈবাল তার একখানা হাত টেনে নিয়ে বলল, "এরপর তোকে এ বাড়ী থেকে যেতেই হবে। কিন্তু একলা তোকে আমি কিছুতেই যেতে দেবনা। তোকে নিয়ে আমি যেখানে হোক্ চ'লে যাব।"

তার কথা শুনে শিউলী শিউরে উঠ্‌ল। হাতখানা শৈবালের হাত থেকে টেনে নিয়ে উঠে বসে বলল, "ছিঃ এ মতলব ক'রনা।"

শৈবাল অধীর কণ্ঠে বলল, "না, না তা হ'বেনা। এমনই ভাবে তোর জীবনটাকে ব্যর্থ হ'তে দেব না—"

এমনই ভাবে কথা কাটাকাটি করতে শিউলীর মোটেই প্রবৃত্তি ছিল না; তাই শ্রান্ত সুরে বলল, "কি পাগলামী করছিস্? ও রকম করলে বাধ্য হয়ে আমার আত্মহত্যা করতে হবে।"

শৈবাল সে কথা কাণে না তুলে বলল, "কিছুই আমি শুনতে চাইনা। কাল রাতে তোকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে এ আমি বলছি। এ তুই ঠেকাতে চাসনি।"

শিউলী উচ্ছ্বসিত অশ্রুদমন ক'রে বলল, "কেন আমায় লোভ দেখাচ্ছিস্? জানিস্ না আমরা কত দুর্ব্বল কত অসহায়! তুচ্ছ নারীর জন্যে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করিস নি! আমাকে ছেড়ে দে; আর নিজেকেও তুই জড়াস নি। ভুলে যাবার চেষ্টা কর; যতশীঘ্র পারবি, ততই মঙ্গল। তারপর বিয়ে ক'রে স্থিতি হ'; মায়ের মনে আর ব্যথা দিস্‌নি।"

শৈবাল ভগ্নকণ্ঠে বলল, "কেন তুই আমাকে এত হীন ভাবিস্? আমি কি এতই অপদার্থ?"

শিউলী বলল, "নারে না। ও কথা তুই মনেও ভাবিস্ নি। কিন্তু যেতে যে আমায় হবেই ভাই।"

শৈবাল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বেশ, গিয়ে যদি বাঁচতে চাও, যাও। কিন্তু ও বাধায় আমায় ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আমি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তোর আশা ছাড়ব না। একদিন হয়ত আমাকে তোর দরকার হতে পারে।" বলে নিঃশব্দে সে ঘর ছেড়ে গেল।

তার কথাগুলো নিখাদ সত্যের মূর্ত্তিতে আঁধার ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শিউলী অসহায়ের মত আবার শুয়ে পড়ল।

নয়

পরদিন সকালবেলা উঠে বসতেই শিউলীর মনে হ'ল, আজ "ভাইফোঁটা।"

জীবনের অতীত স্মৃতির পাতাগুলো উল্টাতেই তার মনে হ'ল অন্যান্য বৎসরে এইদিনে তার কতই না আনন্দ উৎসাহ ছিল। আর আজ! শিউলীর মনে হ'ল ভাইফোঁটাকে সে এতদিন একটা ভিত্তিহীন উৎসবেরই অঙ্গ বিবেচনা করে এসেছে, নইলে শৈবালের সঙ্গে সম্বন্ধটা আজ তার যা দাঁড়িয়েছে সেটা হয়ত অস্বাভাবিক নয় কিন্তু অচিন্তা-পূর্ব্ব। আর সেইজন্যই না আজ তাকে বহু বৎসরের শত-স্মৃতি-বিজড়িত এই স্নেহের নীড় ত্যাগ ক'রে যেতে হ'চ্ছে!

মনে হ'তেই উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগে বুকখানা তার ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগল। চোখে হু হু ক'রে জল এল।

কোথা যাবে সে! কার কাছে! কার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে সংসারের শত প্রলুব্ধ নয়ন থেকে আত্মরক্ষা ক'রবে সে। তবু তাকে যেতেই হবে। এগৃহে স্থান যে আর তার নেই।

উঠবার ক্ষমতা বা উৎসাহও ছিলনা তার! এ জীবনেরই বা প্রয়োজন তার কি! তাই শুয়ে-শুয়েই শিউলী শুনতে লাগল' ধীরা ও নীরার ভাইফোঁটার আয়োজনের কোলাহল!

বুকটা তার তোলপাড় করতে লাগল। উদগত অশ্রু ধারার মধ্যে কতক্ষণ সে নিঃশব্দে প'ড়ে রইল। সহসা এক সময় কি ভেবে ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়াল।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল শৈবালকে বসিয়ে দুই ভগ্নী মহা উৎসাহে তার কপালে ফোঁটা দিচ্ছে।

কোন দিকে না তাকিয়ে গম্ভীরভাবে সে কলঘরে চ'লে গেল। স্নান সেরে, শুদ্ধ বস্ত্র প'রে যখন সে দালানে এসে দাঁড়াল তখন দেখল জামা জুতা পরে শৈবাল দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

শিউলী তাড়াতাড়ি সিঁড়ির ধারে স'রে এসে ডাকল, "ছোট, একবার শুনে যেতে পারবি'না?"

শৈবাল মুখ ফিরিয়ে বলল, "বেরিয়ে যাচ্ছি যে!"

শিউলী করুণকণ্ঠে বলল, "পাঁচ মিনিট! তার বেশী হ'বেনা।"

শৈবালকে সঙ্গে করে শিউলী নিজের ঘরে নিয়ে এল। মেঝেয় পাতা আসনটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, "বস্!"

শৈবাল কিছু বুঝতে না পেরে আসনের উপর ব'সে পড়ল।

কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব স্নিগ্ধ ক'রে শিউলী জিজ্ঞাসা করল' "কোথা যাচ্ছিলি?"

শৈবাল ভারী গলায় জবাব দিল, "বাড়ী খুঁজতে। ছোট বাড়ী ত চট্ ক'রে পাওয়া যায় না।"

শিউলীর মুখে ফুটে উঠ্‌ল অত্যন্ত মৃদু হাসি। বলল, "আচ্ছা, এক মিনিট বস্। আমি এক্ষণি আসছি!"

মিনিটখানেক পরেই, হাতে একটা ছোট রেকাবীতে চন্দন, দুর্ব্বা নিয়ে শিউলী পুনরায় প্রবেশ করল।

শৈবাল স্পষ্টভাবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

শিউলী স্থির দৃঢ় চরণে তার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল।

শৈবালের দেহটা একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। সংশয়োদ্বেলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "তোর মতলব কি?"

শিউলী বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা চন্দনে ডুবিয়ে বলল, "আজ যে ভাইফোঁটা ভাই!"

শৈবাল তড়াক করে লাফিয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "না, না তোর ধাপ্পাবাজীতে আর আমি ভুলব না কিছুতেই তোকে এড়িয়ে চলতে দেব না"।"

শিউলী কোমলস্বরে বলল, "সত্যিই এতদিন এড়িয়ে ফাঁকি দিয়ে এসেছি ভাই। মিথ্যে অভিনয়ই ক'রে এসেছি বরাবর!" তারপর চোখ মুদে গম্ভীর স্বরে মন্ত্র পড়তে লাগল।

আসনে পুনরায় ব'সে পড়ে, মুগ্ধ অধীর মতই শৈবাল বিস্ফারিত নেত্রে তার কার্য্য-কলাপ দেখতে লাগল।

মন্ত্রশেষে শিউলী অবিকম্পিত হাতে ধীরে ধীরে অঙ্গুলীটা শৈবালের ললাটে স্পর্শ করাল।

দুঃসহ ব্যথায় ব্যাকুলভাবে শৈবাল বলল, "এই রকম মিথ্যার বেড়া রচনা ক'রেই কি তুই জীবনটাকে নষ্ট করতে চাস্?"

মাথাটা তার সামনে ঝুলে পড়ল।

দুই হাতে মাথাটা তার বুকে চেপে ধ'রে শিরশ্চুম্বন করে শিউলী বলল, "এখন থেকে তোর আমার মাঝে গণ্ডীর আঁকের এই সম্বন্ধটাই 'পাকা হ'ল। আর ভুল হ'বে না। এইবার বাড়ী খুঁজতে চাস্ বা।"

কথাগুলো এমনই শান্ত দৃঢ় মূর্ত্তি নিয়ে বেরিয়ে এল যে প্রতিবাদের একটি কথাও শৈবাল উচ্চারণ করতে পারল না।

শুধু শিথিল মাথাটা তার শিউলীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বর্ম্মা

ছায়াছবি

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কালরাতে তন্দ্রাঘোরে হেরিলাম অদ্ভুত স্বপন।
ছায়ামূর্ত্তি, ধীরে যেন বসিয়াছে তুহিন-শয্যায়,
আরক্তিম গৌরতনু – অশ্রুমুখী তারকা-সজ্জায়,
রাত্রির রহস্য-ছায়া নীলনেত্রে রেখেছে গোপন।
উদাসী মাঠের প্রান্তে শিহরিছে লজ্জাবতী-বন।
প্রস্ফুট প্রসূন মাঝে মধু-গন্ধ ধীরে মূরছায়;
হিম-পাণ্ডু ওষ্ঠে মোর আঁকি' দিল প্রাণের ভাষায়,
সম্পূর্ণ মধুর লেখা ;—থরথরি' উঠিলো জীবন।

নিস্পন্দ নয়নে মোর ঢাকি' দিল স্খলিত কুন্তল
সর্পিল কবরী হ'তে ; গন্ধভারে মদির, চঞ্চল,
অধীর তনুটি হ'তে টুটি' যায় নীলাঞ্চল-বাস।
জীবন-সিন্ধুর তীরে হাসি' উঠে মরণ-রঙ্গিনী
প্রভাতী তারার মতো ; তা'রি স্বপ্নে প্রাণ-নির্ঝরিণী
ছুটিলো মরুর পথে,—সাথে চলে উন্মাদ বাতাস।

রঙ্গলাল

শ্রীকালীচরণ মিত্র

মেঘ জমাট বাঁধিলেই বারি-বর্ষণ। দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে সেইরূপ, সাহিত্যের সমৃদ্ধি—সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি।

বাঁঙলায় চিরন্তনে সাহিত্য-ধারা গানে, ছড়ায়, কবিতায়। ঐ লইয়াই দেশ মশগুল ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে ও প্রাবল্যে সেই একঘেয়ে সুর কতক থামিল, নূতন উপদ্রবও সঙ্গে-সাঙ্গে সুরু হইল অথবা বাড়িল। বাঙ্গালীর প্রেতাত্মা হয়ত এখনও কবিতা রচনা করে, কে জানে! আর নূতন আমদানী—গল্প, নাটক-নাটিকা ও উপন্যাসের প্লাবনে দেশ ত ডুবু-ডুবু, ভাসিয়া না যায় এই আতঙ্ক।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দোষ কারও নয়—যদি কারও থাকে তাহা জল-মাটির। লেখক ও লেখিকা সকল দেশেই লেখেন—লোকে যাহা চায়, যাহা বিকায়। লোকে চায় চুটকী—গদ্যে ও পদ্যে, অবশ্য অবসর বিনোদনের জন্য। চাহিদা অনুযায়ী যোগান না হইবে কেন? গীতি-কবিতা ও ছোটগল্পের সংখ্যা—'নাই লেখাজোখা,' অধিকাংশই অবশ্য মামুলী। সাহিত্যে রস-রচনারি প্রয়োজন নিশ্চয় আছে, কিন্তু তাহাই সর্ব্বস্ব নয়।

পঙ্গু দেশে বলাধানের পন্থা নাই। বলিষ্ঠ মনের ধারা—বলের দাবি। সে আকাঙ্ক্ষার উৎস এখানে কোথায়? বিদ্যালয়ের শিক্ষা যতটুকু তাহাই আমরা পর্য্যাপ্ত মনে করি; তাহার পর দুঃখ-বেদনার একটানা স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া থাকি—দারিদ্র্যের তাড়নায়, সন্তানের রোগশোকের দুর্ভাবনায়। নূতন শিক্ষার বাসনা-বীজ অস্তিত্বহীন, অঙ্কুরোদ্গম দূরের কথা ত বটেই।

যেদিন দেশ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে তখনই কামনা জাগিবে বিবিধ, নানামুখী সাহিত্যেরও। তখনই বীর-পূজার প্রকৃত বোধন বসিবে; প্রাচীন ও নবীন মৃত ও জীবিত কর্ম্মী ও ভাবুকদের ডাক পড়িবে। সেই অন্বেষণে আমরা চিনিতে শিখিব বরণীয় যাঁহারা তাঁহাদিগকে। এখন ত ঈশ্বর গুপ্ত 'ভাঁড়', অক্ষয় দত্ত 'নীতিবাগীশ', বিদ্যাসাগর 'টুলো', মাইকেল 'bombast,' বঙ্কিম 'সেকেলে,' আর রঙ্গলাল, হেম ও নবীন আদি 'খদ্যোতিকা'।

ঝিঁ-ঝিঁ-পোকার কথা লইয়া শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ গ্রন্থ লিখিয়াছেন—বিস্তৃত-কলেবর চিত্র-বহুল জীবন-কথা। এ কাজের মজুরী দিবে কে? পাঠক জুটিবে ত? পুস্তকপাঠে আমরা কিন্তু পরিতৃপ্ত হইয়াছি। লেখক প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন—গ্রন্থ-বর্ণিত নানা উপাদান-সংগ্রহে ও বিবিধ চিত্র-চয়নে। শুধু তাহাই নয়। উপাদান সুবিন্যস্ত হওয়ায় পাঠান্তে পুনরায় গ্রন্থ-পাঠের ইচ্ছা থাকিয়া যায়। বাঙলার অল্প গ্রন্থ সম্বন্ধেই এই কথা অনায়াসে বলা চলে।

পাশ্চাত্ত্যে জীবন-চরিত্রের বহুল প্রচার, শ্রেষ্ঠ লেখকেরা জীবনীকার। মহাজনের জীবন-যাত্রার কথা, মনের ক্রম-বিকাশ ও পরিণতির বিশ্লেষণ, রচিত গ্রন্থাদির স্বাধীন সমালোচন ইত্যাদি দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয়। অতি-

রঙ্গলাল।—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ৩৲। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

সাধারণ কথা-সাহিত্য ফেলিয়া পাঠক-পাঠিকারা এই শ্রেণীর গ্রন্থ সাগ্রহে পাঠ করেন; বর্ণনীয় ব্যক্তির বিশিষ্টতা, চাল-চলন ও আচার-ব্যবহারাদির তারিফ করেন এবং শ্রেষ্ঠ গুণের অনুসরণ করিতে সচেষ্ট হন।

বাঙলা ভাষার প্রথম বিস্তৃত জীবন-চরিত বোধ হয় গদ্য-সাহিত্যের অন্যতম প্রবর্তক অক্ষয়কুমার দত্তের। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ইহার রচয়িতা। তাহার পর ৺বিহারিলাল সরকারের ও ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর-জীবনী। ৺যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধুসূদনের জীবন-বৃত্তান্ত সর্বাপেক্ষা সুলিখিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও রামমোহন রায়ের জীবনীও এই সঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। ইংরাজী ভাষায় হইলেও সুসংযত ভাষার অগ্রণী ৺নগেন্দ্রনাথ ঘোষের কৃষ্ণদাস-জীবনী ও মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবন-চরিত উচ্চাঙ্গের রচনা। বর্তমানে মন্মথবাবু সাহিত্যের এই বিভাগে প্রধানতঃ হাল ধরিয়া আছেন।

কিন্তু রঙ্গলাল কে? নাম শুনিয়া অনেকে অবাক্ হইয়া যান। একদিন কিন্তু রঙ্গলালের নাম ও রচনা ছিল লোকের মুখেমুখে। টমাস গ্রে Elegy নামক ক্ষুদ্র একটি কবিতার জন্য ইংরাজী সাহিত্যে অমর হইয়া আছেন। রঙ্গলালও তেমনই শুধু একটি কবিতার জন্য অমরত্ব দাবি করিতে পারেন। তাহা এই—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে—
কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে—
কে পরিবে পায়?"

আজ দেশ স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ, মাতোয়ারা। সেই স্বদেশ-প্রেমের প্রথম উদ্দীপনী বাণী শুনাইয়াছেন কবি রঙ্গলাল, তাহার পর 'বন্দে-মাতরং'—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, তাহার পর রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির দানও এই বিভাগে কম মূল্যবান নয়। হেমচন্দ্রের স্বদেশ-ভক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁহার 'ভারত-সঙ্গীতে'- ও নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধের' স্থলবিশেষে।

প্রাচীন চুঁচুড়া-নগরী—(চুঁচুড়ার 'হুগলী কলেজে' রঙ্গলাল শিক্ষাপ্রাপ্ত হন)।

গ্রন্থকার পুস্তকের শেষাংশে বলিয়াছেন—"বাঙ্গালা কাব্য-

সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত কাব্য-সাহিত্যের উদ্ভবকালে যাঁহার প্রতিভা কাব্য-সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল তিনি চিরদিনই সাহিত্য-ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রণীর সম্মান প্রাপ্ত হইবেন।" আমরাও এই মন্তব্যের যথার্থতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় সুকবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'সনেটের' একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"মথিয়া কবিত্ব-সিন্ধু বঙ্গ-কবিগণ
লইল বাঁটিয়া সুধা—অমরা-বিভব
রঙ্গলাল নিল শশী—নির্ম্মল কিরণ,
নিল ঐরাবতে মধু—স্থিরধীর বাসব ;
হেম নিল উচ্চৈঃশ্রবা—গতি অতুলন,
নবীন ধরিল বক্ষে কৌস্তুভ দুর্লভ ;
বিহারি করুণা লক্ষ্মী।—করুণ লোচন,
রবি নিল পারিজাত-ত্রিদিব-সৌরভ।"

রঙ্গলালের খিদিরপুরস্থ আবাসভবন

বলা বাহুল্য, মধু, হেম, নবীন, বিহারি ও রবি বাক্য দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্দিষ্ট।

সমালোচ্য গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত অংশ-পাঠে পাঠক বুঝিবেন যে, রঙ্গলাল মাতৃভাষার কি করিয়াছেন এবং বঙ্গভাষা গদ্য-সাহিত্যের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট যেমন ঋণী সেইভাবে না হইলেও যে বহু পরিমাণে সুরুচি-সম্পন্ন কবিতার রচনা ও প্রচলনের জন্য রঙ্গলালের নিকট যথেষ্ট ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"যখন ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালী বাঙ্গালা কাব্যের সেবা দূরে থাক্, বাঙ্গালা কাব্যকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন, যখন মাইকেলের ন্যায় প্রতিভাশালী কবি ইংরাজী কাব্য রচনায় উন্মুখ হইয়াছিলেন, তখন যাঁহার সাধনা নব্য-বাঙ্গালীকে মণি-পরিপূর্ণ মাতৃভাষা রূপ খনির প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাঁহার নাম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন সসম্মানে উল্লিখিত হইবে। নির্ভীক সংবাদ-পত্র সম্পাদনে, জাতীয় বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ সুমধুর সঙ্গীত রচনায়, বাংলার প্রথম mock-heroic উপকাব্য প্রণয়নে, নানা ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি-করণে, স্বদেশ-প্রেমিক বীর ও সতী রমণীগণের কীর্ত্তি-কাহিনী শুনাইয়া জাতিকে সুমহান ভাবে উদ্বোধিত করণে রঙ্গলাল যে অদ্ভুত শক্তিত্ব, অপূর্ব্ব ক্ষমতা ও মুগ্ধকরী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা চিরদিন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সগৌরবে লিপিবদ্ধ হইবে।"

তবে তখনকার কবিতার রূপ বিভিন্ন ছিল—শব্দ-চয়ন, প্রকাশ-ভঙ্গী, ঝঙ্কার প্রভৃতি অধুনা প্রচলিত রীতি হইতে স্বতন্ত্র। বিহারিলাল, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের মুন্সীয়ানা ও মাধুর্য্য তাহাতে অবশ্য নাই; কিন্তু সমসাময়িক কালের অবস্থা বিবেচনা করিলে উহার একটা বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হইবে। উদ্দীপনাই তাহার প্রাণ। রঙ্গলাল হইতে মধুসূদনে ও হেমচন্দ্রে তাহা আরও প্রস্ফুট ও মনোমদ—এই উদ্দীপনা কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যে বিরল। নির্জ্জীব জাতিকে প্রবুদ্ধ করিতে অথচ উদ্দীপনার বহুল প্রয়োজন। রঙ্গলাল সেই তানে বেহালার সুর প্রথম বাঁধিয়াছিলেন। তাঁহার "পদ্মিনী" প্রভৃতি কাব্যে ঐ সুর মধুবর্ষী। জীবনীকারও এই কথা উপসংহারে বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন—

"যাহা নূতন তাহাই প্রিয়, যাহা পুরাতন তাহাই হেয় বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু যাহা বহুদিনের পুরাতন তাহা আবার কালের গতিতে কখন কখন পরিচয়াভাব বশতঃ নূতন হইয়া দেখা দেয়। তখন তাহা আবার সমাদার লাভ করে। যাহা যথার্থ সুন্দর তাহা কখনও একেবারে লুপ্ত হইবার নহে। আমাদের বিশ্বাস, রঙ্গলালের কাব্য বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া চিরদিন পরিগণিত হইবে। আবর্জ্জনা-স্তূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেও পুনরাবিষ্কৃত হইয়া পুনরাদৃত হইবে। আজিকালিকার ক্ষণভঙ্গুর জড়োয়া গহনার ন্যায় বিবিধ বর্ণের মণি-খচিত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য-সমন্বিত কবিতার সহিত একাসন না পাইলেও, সেকালের খাঁটি সোণার মোটা গহনার ন্যায় উহার মূল্য কখনও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে না।"

সমালোচ্য গ্রন্থখানি ভাষার প্রাঞ্জলতায়, নানা তথ্য ঘটনা ও বিষয়াদির সন্নিবেশে প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বস্‌ওয়েল যেমন ইংরাজী সাহিত্যের ধুরন্ধর ডাঃ জনসনের জীবনের আমূল ঘটনাদি স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থে প্রকটিত করেন, মন্মথ বাবুও ঠিক তদ্রূপ না করিলেও সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, অধিকন্তু অধুনা প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষটির ও তাঁহার গ্রন্থরাজির সহিত পাঠকের সঠিক পরিচয়-সাধনে যত্নের ত্রুটী করেন নাই। গ্রন্থখানি প্রকৃতই উপভোগ্য।

জীবনে যে সকল বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সহিত রঙ্গলালের সংশ্রব সাক্ষাৎ-বা-পরোক্ষভাবে ঘটিয়াছিল তাঁহাদের কয়েকখানি চিত্র গ্রন্থকারের সৌজন্যে স্থানান্তরে মুদ্রিত হইল। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে রসজ্ঞ পাঠকগণ রঙ্গলালের রচনার পরিচয় পাইবেন।

শ্রীকালীচরণ মিত্র

রঙ্গলালের রচনাংশ

[১]

"একতায় হিন্দু রাজগণ
সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ।
সে ভাব থাকিত যদি পার হয়ে সিন্ধুনদী
আসিতে কি পারিত যবন ?"

* * *

[২]

প্রভাতী চন্দ্রের বর্ণনাচ্ছলে কবি গাহিতেছেন—

"সারা নিশা গেল তাঁর নক্ষত্র সভায়।
তাই বুঝি পাণ্ডুবর্ণ সরমের দায়॥"

* * *

[৩]

রাজপুতানার মাহাত্ম্য বর্ণনে—

"বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি মেখলায়।"

* * *

[৪]

"আমরা জীবন গড়ি
মরণে মধুর করি,—
নিরাশায় দেই আশা,
শিশুরে হৃদয়ে টানি
রমণীরে দেবী মানি
যুবজনে ভালবাসা।"

* * *

[৫]

হিন্দী দোহার অনুবাদ—

"যদবধি আসি না ছেদয়ে তরু তদবধি রহে ছায়া।
কহেন তুলসী উপদেশ বিনা কেমনে কাটিবে মায়া॥"

* * *

জয়-পরাজয়

একাঙ্ক নাটিকা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ
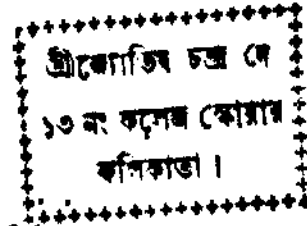
পাত্র-পাত্রী-পরিচয়

চন্দ্রসেন	অবন্তীনগরের সম্ভ্রান্ত নাগরিক। পূর্ব্বে রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, এখন পত্নী-বিয়োগের পর কার্য্য ত্যাগ করিয়া সংসারে অনাসক্ত। মহান দেশপ্রেমিক ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসিত। বয়স চল্লিশ।
অশোক ও অমিত	চন্দ্রসেনের মাতৃহীন পুত্রদ্বয়। বড়টি বয়স সাত। ছোটটির পাঁচ।
ময়ূরধ্বজ	রাজ্যের রাজা।
পঞ্চশিখ শাস্ত্রী	চন্দ্রসেনের অস্ত্রাচার্য্য। শস্ত্রে ও শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত।
শেখর বর্ম্মা	সহকারী সেনাপতি ও চন্দ্রসেনের বন্ধু।

নাগরিকগণ, ভেরীবাদক, ধাত্রী, বিশাখ দত্ত,
মন্ত্রী, সেনাপতি, নগররক্ষক, জনৈক
সহকারী সেনানায়ক।

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রসেনের বাড়ীর বিতলের একটি সুপ্রশস্ত কক্ষ। পালঙ্কে দুইটি শিশু পাশাপাশি শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে। একটু দূরে খোলা জানালার কাছে চন্দ্রসেন একটি আসনে অলসভাবে উপবিষ্ট। সকালবেলার সোণালী রোদের বিচিত্র আলিম্পনে প্রকোষ্ঠতল খচিত হইয়াছে; দু'একটি রশ্মির লালিমা-বিগলিত আভায় নিদ্রিত শিশু-যুগলের মুখ, বিশৃঙ্খল কেশ, উপাধান রঞ্জিত করিয়াছে। চন্দ্রসেন দূরে নীলাকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন—মাঝে-মাঝে হঠাৎ ছেলেদের মুখের দিকে সতৃষ্ণ চোখে চাহিতেছিলেন।

চন্দ্রসেন

(একটু উদ্বিগ্নভাবে উঠিয়া) এখনো ঘুমুচ্ছে কেন? (নিকটে আসিয়া একের ললাট স্পর্শ করিলেন, অপরের গায়ে একবার হাত বুলাইলেন; পরে, কিছুক্ষণ তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আস্তে-আস্তে, রাত্রে গা' গরম গিয়েছে বাপ্ রে! ভাল ক'রে ঘুমুতে পারেনি। (ছোট ছেলেটির মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন—ঈষৎ-হাস্যে অধরোষ্ঠ বিভক্ত) কী দুষ্টুমি-ভরা মুখখানি! ঘুমের ঘোরে আবার হাস্ছে! সারাদিন কী দৌরাত্ম্যি-টাই না করে! (ধীরে ধীরে আসিয়া বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখচুম্বন করিলেন) ক্ষ্যাপা! (কুটন্ত গোলাপের মত গালের উপর মুখ রাখিয়া কিছুক্ষণ অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিলেন—দুইচোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল—ধীরে উঠিয়া আসিয়া পায়চারী করিতে লাগিলেন) ভগবান এ কী বন্ধন! এ কী আনন্দ-বেদনার জালে জড়িয়ে পড়েছি! বাহিরে যত অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে—অন্তর হয়ে উঠ্‌ছে অপার্থিব আলোয় উজ্জ্বল। রক্ত-মাংসের বুকের কাছে এ কোন্ সুদূরের বাঁশীর আহ্বান এল? এ সাপ-খেলানো বাঁশীর গান শুন্‌বার কাণ ত এতদিন তৈরী হয়নি। বাইরের ভিড় যখন নিবিড় ও প্রবল হ'য়ে জমে উঠেছিল, তখন নন্দা মাঝে-মাঝে আমাকে ঘরের ডাক শুনিয়েছে, কতবার প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে ছেলে-দুটোকে কোলের উপর ফেলে দিয়ে বলেছে, "ওগো, নাওনা দু'দণ্ড কোলে, বাবা বাবা ক'রে যে মো'লো—ভয়ে তোমার কাছে আস্‌তে পারছেনা।" শুষ্ক হাসি হেসে, তা'দের কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলেছি, "কাজ আছে যে, এখন যেতে হবে।" ব্যর্থকামা নারী ম্লানমুখে তা'দের উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছে। এখন বুঝ্‌ছি, কিসের টানে নারী ঘর-টাকে এত জোরে আঁক্‌ড়ে ধরে—বাহিরটা তাঁর কাছে কি

অক্ষে এত অর্থহীন, এত নিষ্প্রয়োজন। বাইরের প্রাচুর্য্য আর বিশালতা সে যে ঘরের ক্ষুদ্রতার মধ্য দিয়েই পায়—তা'রে ঘরের আকাশেই সে যে বাইরের আকাশ প্রতিবিম্বিত দেখ্‌তে পায়, তাই ঘরটাই তা'র একান্ত কাম্য—নিতান্ত প্রয়োজন। সে এমন এক রূপকথার রাজকন্যার দেশে বাসা বেঁধেছে—যার স্বপ্নময়, মায়াময় আবেষ্টনের ভেতর, দেখার মধ্য দিয়ে অ-দেখার বিচিত্র রূপ নৃত্য করে, শুনার মধ্য দিয়ে নিত্যকালের অকথিত বাণী বাজে আর জানার মধ্য দিয়ে অ-জানার চরণ-চিহ্ন পড়ে। পুরুষের কাছে এ একটা অনাবিষ্কৃত দেশ। মহিমাময়ী মা, তোমার দেশের সীমাহীন ঐশ্বর্য্য, অনন্ত বৈচিত্র্য, অতলস্পর্শ মাধুর্য্য ও নিবিড় স্বপ্নের ক্ষীণ অস্পষ্ট ছবি বিদ্যুৎ-রেখার মত এক-একবার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠে আমাকে আত্মহারা ক'রে ফেল্‌ছে! জানিনা, কোন্ আনন্দ-সিন্ধুর তীরে, কোন্ বেদনা-শৈলের কোলে, কোন অনন্ত মহাকাশের অসীম মায়ার নীচে, সৃষ্টির আদিম প্রাতে তুমি জন্ম নিয়েছিলে! হে অনির্ব্বচনীয়া! তোমার দুর্ব্বল, মৃদু, শঙ্কিত বুকের ব্যাকুল ব্যথার মধ্যে ধূলি-লিপ্ত মানুষের জন্য নিত্যকালের নন্দনবন-মধু সঞ্চিত ক'রে রেখেছ—দেবতার রাশি রাশি প্রসন্নহাসি পুঞ্জীভূত ক'রে রেখেছ। তোমার বুকের মধ্যেই স্বর্গ-মর্ত্ত্যের মিলন-সেতু বাঁধা রয়েছে···

অশোক পাশ ফিরিয়া শুইল। চন্দ্রসেন তাহার নিকটে গেলেন ও বস্ত্রপ্রান্ত দিয়া তাহার কপালের ঘর্ম্ম-বিন্দুগুলি মুছিয়া দিয়া আবার আসিয়া আসনে বসিলেন। তারপর বাইরের দিকে তাকাইয়া গাঢ়স্বরে,

সেদিন যখন বিশ্বব্যাপী বিসর্জ্জনের বাজ্‌নার মধ্যে জীবনের দুকূল ছাপিয়ে অসীম কান্নার ঢেউ উঠ্‌ল, পৃথিবীর সাথে জীবনের যতগুলি বন্ধন ছিল, সেগুলি যখন রক্তধারার উদ্ধত উচ্ছ্বাসের মধ্যে চড়্‌চড়্‌ ক'রে ছিঁড়ে গেল, মন্দার সেই শেষ-বিদায়ের ক্ষণে, তা'র ক্ষীণ, কাতর প্রার্থনা—ওগো, এদের দেখো—নিতান্ত তুচ্ছ ও মামুলী প্রার্থনা বলে বোধ হয়েছিল। সে-দিনের বিরাট শূন্যতার অভ্রভেদী হাহাকারের মধ্যে সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর পুড়ে ছাই হয়ে কোথায় উড়ে গিয়েছিলো। আজ দু'বছর পরে হৃদয়ের ধূধূ-মরুভূমির মধ্যে ঐ প্রার্থনাটাই নূতন রূপ ধরে এসে দাঁড়িয়েছে—এর মধ্যে যেন মন্দার স্পর্শ পাচ্ছি। 'আমার অশোক রইল, আমার অমিত রইল'—এই মিনতি যেন হৃদয়-মরুভূমির সমস্ত দিক্‌-চক্রবাল ঘিরে অহরহ সঙ্গীত হয়ে বাজ্‌ছে। কি আশ্চর্য্য! যেটা তা'র জিনিষ ছিল, সেটা আজ আমার সর্ব্বস্ব হয়েছে—তা'র ব্যথা আজ আমার কান্নায় ফেটে পড়ছে। মন্দা এবার খুব প্রতিশোধ নিয়েছে! আজ হৃদয়ের স্নেহ-ফল্গুর নির্জ্জন তটে বাসা বেঁধেছি—সেখানকার শ্যামল-কুঞ্জে ক্লান্ত দেহখানি এলিয়ে দিয়ে ভাবহীন নেত্রে শুধু সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে আছি—বাহির লুপ্ত হয়ে গেছে·········(উঠিয়া পায়চারী করিতে করিতে চিন্তাকুলভাবে) তা' যাক্—আর নয়,—জীবনের বাকী দিনগুলি এম্‌নিভাবেই কাটিয়ে দেব—এ সম্পদ আর বাইরের দানবের হাতে সঁপে দেবনা। কর্ত্তব্য? তা' থাক্—এতকাল ত তা'র দাসত্ব করলাম, এক উদ্ধত পৌরুষের অহঙ্কার-তৃপ্তি ছাড়া কোন পাওয়াতেই ত বুক ভরে উঠ্‌ল না, তবে আর কেন? আর না—আর না—সমস্ত কর্ত্তব্য, সব দায়িত্ব এবার রসাতলে যাক্·········

নীচে রাজপথে সহসা ভেরীবাদ্য ও জনতার কোলাহল

একি? কিসের এই ভেরীবাদ্য? কিসের এ গোলমাল? (দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া মধ্যপথে কিছুক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া) যা' হয় হোক্‌গে ছাই,—আমার তা'তে কি? (দুই পা উপরে উঠিলেন।)

পুনরায় ভেরীবাদ্য ও উত্তেজিত কোলাহল

যাক্, জেনেই আসিনা ব্যাপারটা কি······(ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন।)

রাজপথে ভেরীবাদক ভেরী বাজাইল ও রাজকীয় ঘোষণাপত্র পাঠ করিল—

কঙ্কন-রাজ মিত্রগুপ্ত রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। গত পরশের যুদ্ধে বহু সৈন্য হত হওয়ায় আমাদের সৈন্যের সংখ্যাশক্তি বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। শত্রুগণ সীমান্ত প্রদেশের কালঞ্জর দুর্গ হস্তগত করিয়াছে। রাজ্যের

বয়স্ক লোকমাত্রেই সৈন্যদলে যোগদান করিয়া সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। দেশের এই ঘোর বিপদে, আমি রাজ্যের প্রত্যেক সুস্থ, সবলদেহ অধিবাসীকে সৈন্যদলে যোগ দিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিতেছি। অবিলম্বে সৈন্যদলে যোগ না দিলে দেশরক্ষা অসম্ভব হইবে।

সাক্ষর—শ্রীময়ূরধ্বজ বর্ম্মা

চারিদিকে সমবেত নগরবাসিগণের যুগপৎ বিভিন্ন-প্রকারের প্রশ্ন, হতাশ, ক্রোধ, ভীতি ও উৎকণ্ঠার উক্তি—উত্তেজনা ও কোলাহল। জনতা চন্দ্রসেনের বাড়ীর দ্বার ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। চন্দ্রসেন বহুক্ষণ নিস্পন্দ পাষাণ-পুত্তলীর মত দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া আসিলেন। অশোক ও অমিত ছুটিয়া আসিয়া চন্দ্রসেনকে জড়াইয়া ধরিল।

অশোক

বাবা, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

অমিত

বাবা, আমি ঘোড়ায় চড়্‌ব, তুমি এখন ঘোড়া হও।

চন্দ্রসেন

হুঁ

অমিত

বাবা, এখন খেল্‌বে এস।

চন্দ্রসেন

অ্যাঁ?

অশোক

বাবা, তুমি অমন করছ কেন বাবা? ভাল করে কথা বলছ না কেন?

চন্দ্রসেন

কৈ? না, এইত বলছি—বেশ তোমরা ভাল ক'রে খেল।

অমিত

সেই দিনের সেই খেলাটা খেল্‌ব এস। তুমি হবে বেশ সারথী আর আমি হব রাজা। ঐ আমাদের খেল্‌বার রথখানা নিয়ে আসি (প্রস্থানোদ্যত)

ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী

ছেলেরা খেতে এস গো, খাবার হয়েছে।

অমিত

উঁ! খাবনা, যাঃ······

ধাত্রী

ওমা! তবে কখন খাবে?

অমিত ছুটিয়া ধাত্রীকে কতকগুলি চড়-চাপড় মারিল

অমিত

(নাকি-স্বরে) যা চলে, এখন খাব না······উঁ এখন খাবে! যাঃ······উঁ······উঁ······উঁ······

চন্দ্রসেন

(অমিতকে ধরিয়া শান্ত করিয়া) যাও বাবা, লক্ষীটি আমার, খেয়ে এসগে। আচ্ছা, তুমি খেয়ে এলে, খেল্‌ব'খন।

অমিত অভিমানভরে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। অশোক ও ম্লানমুখে নীরবে তাহার পিছনে পিছনে গেল।

চন্দ্রসেন

নির্লজ্জ মিত্রগুপ্ত সে দৈশ-যুদ্ধের ভীষণ পরাজয় বুঝি এত সহজেই ভুলে গেছ! সেদিন প্রাণ-ভিক্ষা দিয়েছিলাম, আজ বুঝি সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ দিতে দ্বিতীয়বার অবন্তীরাজ্য আক্রমণ ক'রেছ? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) প্রাণভিক্ষা বই কি? কঙ্কন-সেনাপতি যখন পরাজয় স্বীকার করে সন্ধি প্রার্থনা করলেন, তখন প্রায় তাঁ'র সব সৈন্য হত, ঘোড়াগুলি আমাদের তীরে সব সজারু হয়ে গেছে, দূরে মিত্রগুপ্তের শিবিরে মুষ্টিমেয় কয়েকজন রক্ষী,—একবার ইচ্ছে ক'রলেই মিত্রগুপ্তের যুদ্ধসাধ চিরদিনের মত মিটিয়ে দিতে পারতাম। ওঃ! সে আজ আবার··· (শ্রীমাদেশের

শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল, চক্ষু উজ্জ্বল ও রক্তবর্ণ হইল, হাত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসিল, চন্দ্রসেন উত্তেজিতভাবে পায়চারী করিতে লাগিলেন। পরে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া) একি! এ আমি ভাব্‌ছি কি? (ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া হঠাৎ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন) কে আমি! আমি যে আর সে চন্দ্রসেন নেই……(ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। নেপথ্য হইতে তাঁহার কথা শুনা যাইতে লাগিল।) অমিত, অশোক, তোদের খাওয়া হ'ল?……চল খেলিগে……সেই নতুন খেলাটা খেল্‌ব'খন…………

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ। নাগরিকগণ পথ চলিতে চলিতে কথাবার্ত্তা বলিতেছে। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের চিহ্ন।

প্রথম নাগরিক

তা'হলে এ যুদ্ধেও আমাদের পরাজয় হ'ল! এবার আর অবন্তীরাজ্য রক্ষা পেল না।

দ্বিতীয় নাগরিক

তাইত দেখ্‌ছি! এখন ছেলে-পিলে নিয়ে কোথায় যাই? মিত্রগুপ্ত এ দেশ শ্মশান ক'রে দেবে। তা'কে ত রাজা ব'লে স্বীকার করলেও সে ছাড়্‌বে না। পূর্ব্ব-পরাজয়ের ঝালটা সে এবার ভাল করেই ঝাড়্‌বে?

তৃতীয় নাগরিক

আমিত বাপু গতকা'লই যুদ্ধের সংবাদ পেয়ে বাড়ীশুদ্ধ সব অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি—দেখি ভাগ্যে কি আছে। শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেখে, যে দিকে চোখ যায়, সে দিকে পালাব।

চতুর্থ নাগরিক

তুমি ত ভাই সব পাঠিয়ে দিলে, কিন্তু আমরা কি করি? কত পুরুষ ধরে' এখানে বাস করছি—আজ এখান থেকে এম্‌নি-ভাবে চলে যেতে যে প্রাণ ফেটে যায়! ওঃ! কী দুর্ভাগ্য!

পঞ্চম নাগরিক

আমি মনে করেছি, পালাব না,—শেষ পর্য্যন্ত দেখে না হয় যুদ্ধ করেই মরব। যাকে দাঁতে কুটো করে প্রাণ ভিক্ষা নিতে দেখেছি, তা'র কাছে আর মাথা নত করব না। সেদিনকার যুদ্ধে বড় ছেলেটি মরেছে—আর বেঁচে থাক্‌বার কোন সাধ নেই। চিরদিনের মত সে ব্যথা ভুল্‌তে সঙ্কল্প ক'রে বসে আছি। ওঃ! চন্দ্রসেন, তুমি যদি আজ সে চন্দ্রসেন থাক্‌তে!………

প্রথম নাগরিক

সত্যিই, চন্দ্রসেনের যে কি হ'ল, তা'ত কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। এ রাজ্যের প্রত্যেক ধূলি কণাটি পর্য্যন্ত যা'র রক্তবিন্দুর সমান, সে আজ দেশের এই ঘোর বিপদে একেবারে নিশ্চেষ্ট! এর রহস্যত কিছুই বুঝ্‌ছি না।

দ্বিতীয় নাগরিক

শুন্‌ছি লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! ছেলে দু'টিকে নিয়ে কেবল ঘরে ব'সে থাকে। যদিও দু'একবার বাইরে বেরোয়—তাও কোন লোকের সাথে কথাবার্ত্তা বলে না। এমন লোকটা পাগল হয়ে গেল!

চতুর্থ নাগরিক

পাগল না হে, পাগল না। স্ত্রীটি মারা যাবার পরই অমন হ'য়ে গেছে। স্ত্রীর শোকই ওর মাথা বিগ্‌ড়ে দিয়েছে।

তৃতীয় নাগরিক

আরে রেখে দাও শোক-টোক—বউ মরেছে ত সংসার উল্টে গেছে আর কি!………বউ মরলে বুঝি সবাই সংসার ছেড়ে বনে যায়?……আসল কথা—হয়, রাজার সাথে কোন মনোমালিন্য হয়েছে, আর না হয় (একটু থামিয়া নিম্নস্বরে) মিত্রগুপ্তের সাথে কোন ষড়যন্ত্র করেছে। নগরের সকল জায়গাই একথা শুন্‌ছি।

পঞ্চম নাগরিক একবার কাঁপিয়া উঠিল

প্রথম নাগরিক

ষড়যন্ত্র করবে চন্দ্রসেন? ছি, ছি! তুমি ক্ষেপেছ? অমন কথা মুখে আনাও পাপ।

চতুর্থ নাগরিক

চন্দ্রসেনকে তুমি চিন্‌তেই পারনি!

তৃতীয় নাগরিক

খুব চিনি হে, খুব চিনি! স্বার্থের কাছে কত চন্দ্রসেন কাৎ হ'য়ে গেল!

চতুর্থ নাগরিক

স্বার্থ তার কি বলত! অবন্তীর রাজা হ'তে সে চায় না—ইচ্ছা কর্‌লে বহুদিন পূর্ব্বেই সে অবন্তীর রাজা হ'তে পার্‌ত!

অদূরে কোলাহল ও ভেরীবাদ্য

প্রথম নাগরিক

ঐ! ঐ! ভেরীবাদ্য! চল হে চল শীগ্‌গীর চল, শোনা যাক্ কি সংবাদ·········

তৃতীয় নাগরিক

সংবাদ আবার কি! এঁপন সব রাজ্য ছেড়ে যে যার মত পালাও,—আর কি!

দ্বিতীয় নাগরিক

না না—চল, চল—শীগ্‌গীর·········

ভেরীবাদক ভেরী বাজাইতে বাজাইতে আসিল। তাহাকে ঘিরিয়া অসংখ্য লোক। কেহ কথা বলিতেছে। কেহ চিৎকার করিতেছে। কেহ প্রশ্ন করিতেছে। সমস্ত মিলিয়া একটা ভয়ানক গোলমাল হইতেছে।

ভেরীবাদক ভেরী বাজাইল ও রাজকার্য্য ঘোষণা-পত্র পাঠ করিল—

"গতযুদ্ধেও আমাদের পরাজয় হইয়াছে। শত্রুগণ দ্বারাবতী দুর্গ দখল করিয়াছে। এই ভাবে অগ্রসর হইলে তাহারা দু'একদিনের মধ্যেই রাজধানী প্রবেশ করিবে। আমাদের সৈন্য একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। আমি দেশের সমস্ত প্রজার নিকট জানাইতেছি যে, ষোড়শ বর্ষের উপর সমস্ত পুরুষ সৈন্যদলে যোগ না দিলে দেশরক্ষার আর কোন আশাই নাই। অতএব তাহারা যদি দেশকে রক্ষা করিতে চায় তবে যেন অদ্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই সৈন্যদলে যোগ দেয়।

স্বাক্ষর শ্রীময়ূরধ্বজ বর্ম্মা।

জনতা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। সমুদ্র যেন উৎকণ্ঠা, হতাশা, ভয় ও দুঃখের উচ্চ তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রসেনের বাড়ী। চন্দ্রসেন বসিয়া অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আস্তে আস্তে দুই তিন পা সাম্‌নে অগ্রসর হইয়া একটু মৃদু হাসিলেন—পরক্ষণেই মুখ কালো হইয়া গেল। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া হঠাৎ একটু কাঁপিয়া উঠিলেন।

চন্দ্রসেন

(অস্ফুটস্বরে) যাক্ না—ষোলবছরেরি যাক্—আর আট বছরেরি যাক্······

বেগে শেখর বর্ম্মার প্রবেশ

শেখর বর্ম্মা

(থমকিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল চন্দ্রসেনের মুখের দিকে তাকাইয়া) কে? চন্দ্রসেন? না তার প্রেতাত্মা? না, না—প্রেতাত্মা নয়—চন্দ্রসেনের পিশাচাত্মা·········পিশাচ, ······ ভয় নেই, অবন্তীরাজ্য তোমারই যোগ্য বাসস্থান হবে—সেই শ্মশানের নরকঙ্কাল ও চিতাভস্মের ওপর তুমি একাকী নৃত্য কো'রো:—আর, মনে কো'রো তোমার পনর বছর সাধনার ফল—তোমার বড়-সাধের অবন্তীরাজ্যের এই দশা তুমিই স্বহস্তে করেছ! দ্বারাবতীর যুদ্ধে চিরঞ্জীব শেষ নিঃশ্বাস ছাড়্‌বার আগে বলে গেল, (চন্দ্রসেন চমকিয়া উঠিলেন) "ভাই, চন্দ্রসেনকে বো'লো, সে বেঁচে থাক্‌তে যেন অবন্তী পরাধীন না হয়।"—স্বীকার করেছিলাম, তাই আজকার যুদ্ধে মরতে যাবার আগে সেই কথাটি তোমায় বল্‌তে এসেছি। কিন্তু ব'লব কাকে? চন্দ্রসেন যে ম'রে পিশাচ হয়ে বসে আছে······তা'র সে হৃদয় যে জমে কালো, কর্কশ পাথর হয়ে গেছে—আঘাত করবো কিসে? সে মস্তিষ্ক যে কোথায় কর্পূরের মত উবে গিয়ে ঐ রাস্তার পচা আবর্জ্জনায় ভরে রয়েছে—বুঝাব কাকে? সে বাহু যে অসাড়,

পঙ্গু, পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়েছে—উত্তেজিত করব কাকে?…

চন্দ্রসেন

(গাঢ়স্বরে) বন্ধু! (তারপর শেখর বর্ম্মাকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়া আসনে বসাইলেন।)

শেখর বর্ম্মা

হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য করিলেন) বন্ধু! চন্দ্রসেনের বন্ধু ব'লে সকলের সামনে একদিন বুক ফুলিয়ে গর্ব্ব করেছি! যেদিন তা'র নিশ্চেষ্টতায় নগরে নানা সন্দিগ্ধ আলোচনা উঠেছিল সেদিন বোধ হয়েছিল, কে যেন গলানো সীসে কাণের মধ্যে ঢেলে দিল;—তারপর যখন শুনলাম; চন্দ্রসেন কঙ্কনরাজের কাছ থেকে প্রচুর উৎকোচ নিয়েছে, তখন বক্তার জিভ্ টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌তে গিয়েছিলাম;—তারপর যখন শুনলাম, সে রাজা হবার লোভে মিত্রগুপ্তের সাথে ষড়যন্ত্র করেছে, তখন সেই সয়তান সমালোচকের টুঁটি চেপে মার্‌তে গিয়েছিলাম;—আর,—আজ তারাই আমার সাম্‌নে বিদ্রূপের হাসি হেসে চন্দ্রসেন সম্বন্ধে কত কথা ব'লে যাচ্ছে,—তা'দের উত্তর দেবার কোন শক্তি নেই—লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে মুখ নীচু ক'রে শুনে যাচ্ছি। ওঃ চন্দ্রসেন! আর নয়—এই নাও— এই তরবারি নাও (কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া) —আমার বুকে বসিয়ে দিয়ে তোমার বন্ধুত্বের পুরস্কার দাও!

চন্দ্রসেন

(আবেগের সহিত) শেখর! শেখর! ব'লে দাও ভাই, কি করব? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে; নন্দাকে হারিয়ে আমি যে কী হয়ে গেছি—সে যে আমার কী প্রতিশোধ নিয়েছে—তা' ব'লবার ভাষা খুঁজে পাইনে। সে আমার দুই পায়ে দুই বেড়ী পরিয়ে এই ঘরে বেঁধে রেখে গিয়েছে। এ বাঁধন ছিঁড়বার শক্তি ক্রমেই হারিয়ে ফেলেছি। বনের পাখীকে যেমন খাঁচায় পুর্‌লে, প্রথমে ছট্‌ফট্ করে, শেষে খাঁচার আকাশকেই বাইরের আকাশ মনে করে,—ছেড়ে দিলে খাঁচার মোহে আবার সেখানেই ফিরে আসে—আমারো ঠিক্ সেই দশা হয়েছে! ব'লে দাও কি করব—শিখিয়ে দাও ভাই কেমন করে করব—আবার মহাকাশের বার্ত্তা আমার কাছে এনে দাও—আমায় উদ্ধার ক'র—আমায় রক্ষা ক'র……

শেখর বর্ম্মা

উত্তম! যে অবন্তীরাজ্যের তৃণগাছির মধ্যে পর্য্যন্ত চন্দ্রসেনের বুকের স্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে, যা' তা'র প্রথম যৌবনের স্বপ্ন, আর যৌবন-সায়াহ্নের ধ্যান, যে অবন্তীকে সে পাঁচবার বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, তার শক্তি ও বীরত্বখ্যাতির যশধ্বজা সগর্ব্বে উড়িয়ে দিয়েছে, যে দেশকে সে শিক্ষা, সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্যে মহিমাময়ী, করবার জন্য বিন্দু বিন্দু ক'রে বুকের রক্ত পাত ক'রেছে—সেই অবন্তীরাজ্য আজ পরপদদলিত, হৃতসর্ব্বস্ব, শ্মশান হ'তে চলেছে,—আর এখন চন্দ্রসেনকে তা'র কর্ত্তব্য বুঝিয়ে দিতে হবে! সে এখনো স্বশরীরে, সুস্থদেহে বেঁচে আছে—তা'কে ব'লে দিতে হবে, "এটা কর, ওটা কর!" ওঃ! এ যুক্তি দেওয়ার আগে আমার মৃত্যু হ'লনা কেন?……

চন্দ্রসেন

সবই বুঝি শেখর,—কিন্তু যেন কেমন হ'য়ে গেছি! পূর্ব্বে যেটাকে মনে করতাম পরম সত্য, জীবন্ত, একান্ত কাম্য, যার মধ্যে দেহ-মনের সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়েও তৃপ্তি ছিল না, সেটা আজ অর্থহীন, নিষ্প্রয়োজন, নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে,—জীবনের প্রাণকে যেন চুরি করেছে—যেটা দেখ্‌ছ, সেটা খোলস মাত্র। সংসার-রণের চক্রধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তা'তে কাঁধ লাগাতে ইচ্ছে নেই। কর্ত্তব্য এক একবার বিবেককে খোঁচা মারছে—লাফিয়ে উঠ্‌ছি, ব্যস্—ঐ খানেই স্থির; মনে হচ্ছে দূর্ ছাই—কোথায় যাই? জীবন-যন্ত্রের চালনী-শক্তি সেই মায়াবিনী হরণ ক'রে নিয়ে গিয়েছে—তাই এ যন্ত্র অচল।

শেখর বর্ম্মা

কিছু শুনতে চাইনে চন্দ্রসেন,—আজ যদি এই বুক চিরে দেখাতে পারতাম, কী ব্যথা এখানে পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে—তবে তোমাকে বুঝাতে পারতাম—কি জন্যে তোমার কাছে আজ ছুটে এসেছি। আজ তোমার কাছে কারণ জানতে চাইনে—

তোমার স্বরচিত মায়াদুর্গ ভেঙ্গে দু'বছর পূর্ব্বেকার চন্দ্রসেনকে রক্তাক্ত দেহে কাঁটাবন দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে চাই—তোমাকে চাই—তোমাকে আরাম দিতে চাইনে—তোমাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে চাই। আজ শুধু জানতে চাই—চন্দ্রসেন রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে বেঁচে আছে কিনা? অবিকৃত মস্তিষ্কে পৃথিবীর বায়ুতে নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিনা? বাস্—আর আমার কোন প্রশ্ন নেই। তাহ'লে তা'র সুখদুঃখ, ক্ষতি-লাভ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিরক্তি সন্তোষের কোন কথাই আর নেই,—তা'কে আজ অবন্তী-সৈন্যের পুরোভাগে চাই—এই এক স্পষ্ট, সরল সত্য কথা। কর্ত্তব্যের যে নির্ম্মম, কঠোর বাণী এতকাল শুনিয়েছ, যার রুদ্র সুরে তোমার এই অযোগ্য বন্ধুর জীবন-তন্ত্রী বেঁধে দিয়েছ, হে সেই ভয়ঙ্করী বাণীর উদ্ধতা, আজ এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে, নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়ে সে বাণীর সার্থকতা দেখিয়ে দাও! সমস্ত মায়া-স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেল—সমস্ত বন্ধন ছিন্ন কর—সমস্ত জগৎ লুপ্ত হ'য়ে যাক,—শুধু দেহ-মনে বাজুক্ রণক্ষেত্রের দীপক রাগিনী, বুকে গর্জ্জে উঠুক ধ্বংসের প্রলয়-কল্লোল—রুদ্রদেবের সংহার-মূর্ত্তি ধ্যান করতে করতে তাণ্ডব-নৃত্যে মরণ-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়—আজ তোমাকে রণক্ষেত্রে দেখ্‌লে অবন্তী-সৈন্যের শীতল রক্তে অগ্নিপ্রবাহ ছুটে যাবে—পুরবাসীদের উচ্চ হর্ষধ্বনিতে আকাশের চন্দ্র সূর্য্য খসে পড়্‌বে—রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতার............ (দূরে কোলাহল) ঐ! ঐ! ঐ মৃত্যুর আহ্বান...... চল্লাম......বিদায় বন্ধু......জীবনে আর দেখা হবে কিনা জানিনা......(বেগে প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

চন্দ্রসেন অর্দ্ধশায়িত ; চোখ-মুখে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, ও ক্রোধের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চন্দ্রসেন

কি আশ্চর্য্য! ছেলে দু'টোকে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরলাম, কেউ এদের একটু স্থান দিলনা! এই ক'টা দিনের জন্যে এরা কারো বাড়ীতে একটু আশ্রয় পেল না! চন্দ্রসেন আজ যুদ্ধে যাবে, তা'র মাতৃহীন শিশু দু'টির এই বিশাল নগরমধ্যে একটু স্থান হ'ল না! এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) তবে কি আমি সেই চন্দ্রসেন নই? চন্দ্রসেন এ দেশের মুকুটহীন রাজা, সাধারণের হৃদয়-দেবতা, রাজ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা—একথা আজ কয়েক বছর ধরে, পথে, ঘাটে, সভায়, বৈঠকে, প্রশস্তিতে শুনতে শুনতে যে কাণ ঝালাপালা হ'য়ে গেছে! তবে কি এ সব চাটুবাদ—মিথ্যা অভিনয় মাত্র? (কিছুক্ষণ চিন্তার পর) অদ্ভুত! কি ক'রে লোকে বিশ্বাস করল যে রাজ্যের বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্র করেছি! কেউ আমার কথার একেবারেই উত্তর দিল না, কারো ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ খেলে গেল, কেউ বা সংক্ষেপে উত্তর দিল—'না'। ধনপতি শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হ'লে একদিন সে মনে করেছে, স্বয়ং ভগবান তা'র গৃহে এসেছে—আর আজ সে আমাকে দেখে নীরবে সে-জায়গা ছেড়ে চলে গেল, আরো শুনিয়ে গেল,—"খাসা চাল বটে! বাবা, ধনপতিকে অত সহজে বিপদে জড়াতে পারছ না—সে অত কচি ছেলে নয়।" চমৎকার! (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য করিলেন) আজ একটা বিরাট উচ্চহাস্যে আকাশটাকে খান্ খান্ করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে! এ কিসের প্রতিশোধ? প্রকৃতির? না ভগবানের? কে বল্‌বে আজ? (উঠিয়া পায়চারী করিতে করিতে) বাঃ! বেশ বিচার! দেশ তা'র পাওনা ষোল আনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিক্, আর আমার বেলায় একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি! আমাকে নেশায় পাগল ক'রে এতকাল দাসত্ব করিয়ে নিয়েছ,—আজ নেশার ঘোর কেটে গেলে, যদি নিজের ঘরে বসে স্বাধীনভাবে একটা নিঃশ্বাস ফেলি, তবুও কারো সইবে না? মূর্খ দেশবাসী, তোরা বুঝ্‌লি না, তোদের জন্যে আজ কতখানি দিচ্ছি! তোরা আমার কর্ত্তব্যকে চাইলি, কিন্তু আমার দিকে ভুলেও একবার তাকিয়ে দেখ্‌বার অবসর হ'ল না। (কণ্ঠ বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল; চন্দ্রসেন শয্যায় লুটাইয়া পড়িলেন; বহুক্ষণ নিস্পন্দ অবস্থায় শুইবার পর) বেশ! তা'হ'লে আর আমার দায়িত্ব কি? আমার ত ইচ্ছেই ছিল—তোমরাই দিলেনা! (কিছুক্ষণ পরে অন্যমনস্কভাবে) কি আশ্চর্য্য! জোর ক'রে যেতে দেবে না! হঠাৎ চমকিয়া

উঠিয়া) দূর ছাই ! দেশ থাক আর যাক্—মরুক গে ! আর কোথাও যাবনা………

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর শুনাগেল—'চন্দ্রসেন !'

চন্দ্রসেন

(চমকিয়া উঠিয়া) কে ? আচার্য্য পঞ্চশিখ শাস্ত্রীর গলা ব'লে বোধ হচ্ছে যে ! (বাহির হইয়া দেখিতে যাইয়া আবার পিছনে ফিরিয়া আসিলেন ।)

পঞ্চশিখ শাস্ত্রীর প্রবেশ

পঞ্চশিখ শাস্ত্রী

(হাঁফাইতে হাঁফাইতে জড়িতস্বরে) চন্দ্রসেন কই ? চন্দ্রসেন—যে আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম শিষ্য—যা'র মধ্যে আমার চল্লিশ বছরের অগ্রসাধনা সাফল্যের অম্লান হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে—যে পিতৃহীন বালককে এই বুকের সমস্ত স্নেহধারায় অভিসিক্ত করেছি—সে চন্দ্রসেন কৈ ? আমার চন্দ্রসেন কৈ ?

চন্দ্রসেন

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া) এই যে গুরুদেব ! আপনার শিষ্য—আপনার পুত্র—আপনার দাস……

পঞ্চশিখ শাস্ত্রী

চোখে ঝাপ্‌সা দেখি—ভাল ক'রে কাউকে চিন্‌তে পারিনে ; কিন্তু মনে এখনো ঝাপ্‌সা দেখিনি । চন্দ্রসেনের জীবনধারা, তা'র ভাব, চিন্তা ও কর্ম্মস্রোত যে আমার নিজের সম্পদ—মনের চোখে তা'সব ত স্পষ্ট দেখছি । চন্দ্রসেনকে চোখে চিন্‌তে না পার্‌লেও—মনে কখনো ভুল হয় না ।

চন্দ্রসেন

আপনি কেন কষ্ট করে এখানে এসেছেন…আমি একটু সংবাদ পেলেই নিজে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তাম ।

পঞ্চশিখ শাস্ত্রী

বিলম্ব ক'র্‌বার শক্তি ছিলনা—ধৈর্য্য ছিলনা—সময় ছিলনা । আমি জিজ্ঞেস করি—তুমি সেই চন্দ্রসেন আছ ত ? আমার চন্দ্রসেন আছ ত ?

চন্দ্রসেন

গুরুদেব—কেন এ সব বল্‌ছেন !

তবে কেন এসব কথা শুন্‌ছি ? এসব দেখ্‌ছি কেন ? তুমি ত অমন হ'তে পারনা ! এ কী সমস্যা ! এ কী প্রহেলিকা !

চন্দ্রসেন

এর কি উত্তর দেব গুরুদেব ? জানিনা আপনি কি শুনেছেন ? তবে এইটুকু অনুমান কর্ত্তে পারি যে, দেশমধ্যে যে মিথ্যা দুর্ন্নাম রটেছে……যা'র প্রমাণ আজ পেয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি……

পঞ্চশিখ শাস্ত্রী

(লাফ দিয়া উঠিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ভগ্নকণ্ঠে) মিথ্যা—নিশ্চয়ই মিথ্যা—একশ'বার মিথ্যা—হাজার বার মিথ্যা—কোটী কোটীবার মিথ্যা ! আমি যে কোন শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, এ ভয়ানক মিথ্যা ! ভগবান এর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেও বিশ্বাস করি না ! —মিথ্যাবাদী, হিংস্র, সয়তান লোক ! তোরা আমার চন্দ্রসেনকে খাটো করে দিতে চাস ? চন্দ্রসেন—যা'র মনুষ্যত্বের দীক্ষা আমি নিজের হাতে দিয়েছি—পূর্ণ মানবতার সাধনাই যার জীবনের মূলমন্ত্র—তা'কে—সেই অসাধারণকে, আজ সাধারণের বাজারে এনে পথের ধূলোর উপর গড়িয়ে দিতে চা'স ? ষড়যন্ত্র সে করেনি, করেছিস তোরা……আমার প্রাণ নেবার জন্য তোরা ষড়যন্ত্র করেছিস ! ……(পড়িয়া যাইতেছিলেন, চন্দ্রসেন তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন) আঁ্যা ! চন্দ্রসেনকে খাটো কর্‌তে চাস্ ……আমাকে হত্যা কর্‌তে চাস্……আঁ্যা……(হাঁফাইতে লাগিলেন)

চন্দ্রসেন

(থর থর কাঁপিতে লাগিলেন) পথ ? কোথায় পথ ? অন্ধকার——চারিদিকে অন্ধকার……একবার পথ চাই ! ভুলিনি—মরিনি……পাব……পাব (আচার্য্যের পা জড়াইয়া ধরিলেন) গুরুদেব ! গুরুদেব ! অক্ষম, দুর্ব্বল,

হীন শিষ্য গুরুর অপমান করেছে······মন্ত্র ভুল করেছে······একবার হাতে ধরে তুলে দিন······আমার আমিকে একবার ফিরিয়ে দিন······ছুটব—চারিদিক কম্পিত ক'রে ছুটব······যৌবনের সেই রঙীন উষায় যেমন ক'রে বুকে ধরে, শক্তি দিয়ে, সাহস দিয়ে, কল্পনা দিয়ে পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, তেম্নি ক'রে আজ একবার এই পথহারা, সর্ব্বস্বহারা হতভাগাকে টেনে তুলে নিয়ে পথে দাঁড় করিয়ে দিন······গুরুহত্যার পাপ থেকে বাঁচান······

পঞ্চশিখ শাস্ত্রী

(চন্দ্রসেনকে পদতল হইতে উঠাইয়া তাহার স্কন্ধে এক হাত রাখিয়া) সব জানি চন্দ্রসেন;—কিন্তু করব কি? উপায় নেই। পুরুষ তুমি, ভাব্‌বার সময় নেই—দাঁড়াবার অবসর নেই—জড়িয়ে পড়্‌বার সুযোগ নেই। শুধু সাম্‌নে চল্‌তে হবে; পুরুষ শুধু আদর্শের ডাক শুনে সাম্‌নে ছুটে চল্‌বে—এই আদর্শের সাধনাই তা'র পুরুষ-জীবনের সর্ব্বস্ব। বুক তা'র ভেঙ্গে যাক্, মাথা তা'র খান্‌-খান্ হ'য়ে যাক্, হাত চূর্ণ হ'য়ে যাক্—তবুও তা'কে এগিয়ে যেতে হবে। নিজের ক্ষতি লাভ, সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ সে পথের বহু বহু দূরে। সংসারে যা কিছু মহত্ত্ব, দেবত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব আছে—তা'র মূলে পুরুষের এই আদর্শের অভিযান—এ না থাক্‌লে সংসার এতদিন পশুশালা হ'য়ে যেতো। সমাজে, পারিবারিক জীবনে, রাজনীতিক্ষেত্রে, জনসাধারণের কাছে যে আদর্শের তুমি অনুসরণ ক'রে এসেছ—আজ তোমাকে তা' থেকে একচুলও ভ্রষ্ট হ'তে দেখ্‌লে লোকে তোমায় কিছুতেই ক্ষমা করবে না;—তোমার সাধনা সার্থ হবে, আর তুমিও নবসৃষ্টিতে অমর হ'য়ে থাক্‌তে পারবে না······সংসার তোমার কাছ থেকে যতখানি চায়—তুমি তা' না দিলে কিছুতেই চল্‌বে না······আর ভাল ক'রে জেনে রেখো—সংসার তোমার কাজকে চায়, তোমাকে চায় না—তোমার দিকে তার' তাকাবার বিন্দুমাত্র অবসর নেই, তোমার কাছ থেকে সে পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর,—তাই, নিজেকে তোমায় ভুলতে হবেই—তা' যত বড় কষ্টই হোক, আর তা'তে হৃদয়ের যত রক্তপাতই হোক্ না কেন!······

চন্দ্রসেন

উঃ! সব গোলমাল হয়ে গেল! সব গুলিয়ে গেল! আর ভাব্‌তে পারছিনে—মাথা ঘুরছে—চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছি······হায় দেশ!

পঞ্চশিখ শাস্ত্রী

দেশ কি করবে চন্দ্রসেন! উপায় নেই—অন্য কোন পথ নেই······একবার ভাবত চন্দ্রসেন—একটা দেশ, কত কাল, কত সহস্র সহস্র বৎসর থেকে তা'র নিজস্ব বিশেষত্বের গরিমায় উন্নত মস্তকে পৃথিবীর বুকে বিরাজ কর্চ্ছে—সে দেশে যারা বাস করছে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার, সুবিধা-অসুবিধার রূপ নিয়ে সে বেড়ে উঠেছে—তাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনধ্বনি তা'র জীবনের সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে—সে আজ গর্ব্বোদ্ধত, লোলুপ, অপরিচিতের শ্রদ্ধাহীন পদাঘাতে লাঞ্ছিত হবে! যার সাথে, তা'র নাড়ীর টান নেই, সেই মমতাহীন, ক্রূর, ভ্রূকুটিকুটিল মুখে তার পীযূষ-পূরিত স্তন্য তুলে ধরবে! ······মায়ের এই মৌন অপমানের মূক ক্রন্দন তা'র কোলের শত শত ছেলের বুকে বজ্রের মত এসে পড়্‌বে না? একটা জাতি—যে তা'র শিক্ষা, সভ্যতা, ঐশ্বর্য্য নিয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে প্রাচুর্য্যে হাস্‌ছে—সে আজ কাঙ্গাল হয়ে দাস জাতিতে পরিণত হবে—তা'র নিজস্ব শিক্ষার ধারা যাবে উল্টে, তা'র সভ্যতা শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে যাবে, তা'র ঐশ্বর্য্য লুট হ'য়ে যাবে—সে আজ উঠ্‌বে, বস্‌বে পরের ইঙ্গিতে! ······আরো ভাব চন্দ্রসেন—তা'র নারী অপমানিত হবে—তা'র শিশুর রক্তে পথঘাট প্লাবিত হবে—তা'র বুকের উপর দিয়ে অত্যাচারের উদ্ধত রথ বেগে ছুটবে—আর সে অসহায়, দুর্ব্বলের মত মুখ বুজে মনে-মনে আর্ত্তনাদ করবে! এর কাছে কোথায় তোমার পুত্র—কোথায় তোমার স্ত্রী! এই বিরাট ধ্বংসলীলায় তারা কত নগণ্য! তোমার স্ত্রীকে যতই ভালবাস—তোমার পুত্রকে যতই স্নেহ কর—তা' দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে একেবারে মূল্যহীন, নিরর্থক! তোমার কর্ত্তব্যের কাছে তা'র বিন্দুমাত্র ঠাঁই নেই!······পুরুষকে ত এসব কোন বন্ধনেই বাঁধ্‌তে পারবে না—সে নিজের গণ্ডী নিজেই ভেঙ্গে ফেলে পথে বেরিয়ে পড়্‌বে।

চন্দ্রসেন

(কাঁপিতে কাঁপিতে) এঁ্যা ! ……হাঁ……ঠিক—সব ঠিক……পরিষ্কার—জলের মত পরিষ্কার……ব্যস্ (লাফ দিয়া উঠিলেন) উঃ ! কোথায়—কোথায় আমি……এঁ্যা আমি—আমি চন্দ্রসেন কোন ভাগাড় দিয়ে হেঁটে চলেছিলাম !……রাক্ষসী, সয়তানী ! আমার কী করেছিস ! কী করেছিস ! (শাস্ত্রী মহাশয়ের পায়ের উপর পড়িয়া) গুরুদেব ! গুরুদেব ! আপনার চন্দ্রসেন মরে' এতদিন ভূত হয়ে ছিল—আজ পুনর্জীবন পেল—মৃত সঞ্জীবনী খেয়ে সে আজ বেঁচে উঠেছে ……আর ভয় নেই…আর চিন্তা নেই……(ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন)

পঞ্চশিখ শাস্ত্রী

ভগবান, অবন্তীকে আজ বাঁচালে……তা'র প্রাণ আজ মূর্চ্ছা ভেঙ্গে জেগে উঠেছে……(বিপরীত দ্বার দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন)

অশোক ও অমিতের প্রবেশ

অমিত

কৈ ? বাবা কৈ ?

অশোক

বাঃ ! এই ত এখানেই ছিল—একটা বুড়োর সঙ্গে কথা বল্‌ছিল।

সৈনিকবেশে, উন্মুক্ত তরবারি হস্তে, বেগে চন্দ্রসেনের প্রবেশ

চন্দ্রসেন

শৃঙ্খল—শৃঙ্খল—এ লৌহশৃঙ্খল আজ নিজের হাতে ভেঙ্গে চুরমার করব ! (অশোকের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি উঠাইলেন)

অমিত

এই যে বাবা ! (ছুটিয়া আসিয়া চন্দ্রসেনকে জড়াইয়া ধরিল) বাঃ ! বাঃ ! তুমি ত আজ বেশ সেজেছ ! কোথায় যাচ্ছ বাবা ?

চন্দ্রসেন

আঁা……(তরবারি হাত হইতে পড়িয়া গেল) একি ; একি ! কী করছিলাম ! কী করছিলাম !……ওরে কেমন করে এ হোল……(চীৎকার করিয়া বসিয়া পড়িলেন) ওরে আমার কী হ'ল ! ……আমার একী হ'ল ! (কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন ।)

অশোক ও অমিত হতবুদ্ধি হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল ।

সহসা রাজপথে ভীষণ কোলাহল, ক্রন্দনধ্বনি, পালাও পালাও প্রভৃতি শব্দ ।

একদিক দিয়া চন্দ্রসেনের প্রবেশ, বিপরীত দিক দিয়া ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য

কর্ত্তা ! কর্ত্তা ! সর্ব্বনাশ হয়েছে, শত্রুসৈন্যেরা নগর পরিখা পার হয়েছে ! ওরে বাবারে কী সর্ব্বনাশ হ'ল রে…

(বেগে প্রস্থান)

চন্দ্রসেন

তা' হ'লে অবন্তী কি গেল ! সত্য সত্যই গেল ! চন্দ্রসেন বেঁচে থাকতেই গেল ! আমার স্বপ্ন, আমার সাধনা, আমার ধ্যানের মূর্ত্তি আজ ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল ! ওঃ ! মা আমার, ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী দেবী আমার, আজ নিজের হাতে তোর মুখে কালী মেখে দিলাম !

পুনরায় বাহিরে ভীষণ কোলাহল

ঐ—ঐ—গেল—জন্মের মত গেল—কি করি ? কি করি ? বন্ধন ! বন্ধন—শয়তানী, আমায় কী করলি !

পুনরায় কোলাহল

গেল ! গেল ! যাব ! যাব ! ভাঙ্‌ব ! ভাঙ্‌ব ! আজ মুক্ত হব ! মুক্ত হব…… (বেগে প্রস্থান)

কিছুক্ষণ পরে রক্তাক্ত দেহে চন্দ্রসেনের প্রবেশ

চন্দ্রসেন

উঃ ! আজ স্বাধীন ! আজ স্বাধীন ! আজ মুক্ত ! চমৎকার !

বেগে বিশাখ দত্তের প্রবেশ

(চমকিয়া উঠিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া) একি! আপনার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত কেন? চোখ-মুখ ওরকম অস্বাভাবিক কেন?

চন্দ্রসেন

রক্ত! রক্ত! আজ শুধু রক্ত চাই! রক্তের মহোৎসবে আজ নৃত্য করতে হবে! রক্ততিলকে আজ রক্তদেবীর পূজা হবে! হাঃ! হাঃ! জয় মা ছিন্নমস্তা! আজ নিজের রক্ত নিজে পান করেছি.....চল বিশাখ, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয় তুমি গুপ্তদ্বার দিয়ে বেরিয়ে পিছন থেকে শত্রুকে আক্রমণ কর.........আমি সিংহদ্বারে চল্লাম......জয় মা ছিন্নমস্তা.........

(বেগে প্রস্থান)

(নীচে চন্দ্রসেনের কণ্ঠস্বর শুনা গেল) "ভয় নাই, ভয় নাই, ভীরু, কাপুরুষের মত কোথায় পালাও......সিংহদ্বারের দিকে অগ্রসর হও......প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হও......"

জনতা ভীষণ কোলাহল করিয়া উঠিল—"জয় চন্দ্রসেনের জয়" দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিল।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজসভা—সময় দ্বিপ্রহর; মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাসদগণ নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। রাজা ময়ূরধ্বজ সিংহাসনে উপবিষ্ট। উভয়পার্শ্ব হইতে চামর ব্যজন হইতেছে। সমস্ত ভৃত্যগণ নীরবে এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। সকলের দৃষ্টিতেই একটা ঔৎসুক্য ও আগ্রহ।

ময়ূরধ্বজ

মন্ত্রী! চন্দ্রসেনকে আজ এমনভাবে অভিনন্দিত করতে হবে, যা' এ রাজ্যে আর কোনদিন কারো ভাগ্যে ঘটেনি। সমগ্র দেশ, সমগ্র জাতি আজ তা'কে এমন গৌরব দান করবে—যা' জাতির ইতিহাসে ধ্রুব নক্ষত্রের মত চিরকাল জ্বল্ জ্বল্ করবে। আজকার বিজয়োৎসবের সঙ্গে আমি চন্দ্রসেনকে অমর করে রেখে যেতে চাই! ওঃ! কী ভুল বুঝেছিলাম মন্ত্রী, চন্দ্রসেনের ষড়যন্ত্রের কথা যখন আমার কাণে উঠল, তখন অনেকখানি বিশ্বাস করেছিলাম,—অনুসন্ধানের জন্য বহু গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলাম। সে অন্যায়ের শোধ, সে অনুতাপের জ্বালা, আজ তা'র যোগ্য অভিনন্দন ক'রে জুড়াতে চাই। আমার আদেশ আপনারা বোধ হয় পেয়েছেন—কিরূপ আয়োজন হয়েছে?

মন্ত্রী

মহারাজ; কাল সমস্তদিন ধরে তা'র আয়োজন করেছি, রাজ্যের সমস্ত স্থানে এ সংবাদ পৌঁছেছে। নানা প্রান্ত থেকে উৎসবের জন্য নরনারী রাজধানীতে ছুটে আস্‌ছে—নগরবাসিগণ আনন্দে, গর্ব্বে, উৎসাহে আত্মহারা হ'য়ে এ উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে...

ময়ূরধ্বজ

উৎসবের কার্য্যতালিকা কিছু করেছেন?

মন্ত্রী

সিংহদ্বার থেকে এক শোভাযাত্রা বেরিয়ে নগরের প্রশস্ত রাস্তাগুলি দিয়ে এই রাজসভায় উপস্থিত হবে। তারপর, আপনি চন্দ্রসেনকে প্রীতিমাল্য দান ও আলিঙ্গন করবেন ও শোভাযাত্রার সঙ্গে চন্দ্রসেনকে আপনার পাশে বসিয়ে সিংহদ্বারে উপস্থিত হবেন, তারপর সেখানে চন্দ্রসেনের মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপনের পর শোভাযাত্রা আবার রাজসভার উপস্থিত হবে। সিংহদ্বারটি সজ্জিত করবার জন্য রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নিযুক্ত করা হয়েছে, রাস্তায় বিশহাত অন্তর এক একটি তোরণ নির্ম্মিত হয়েছে, পথপার্শ্বের প্রতি গৃহদ্বার পুষ্প-পত্র-মাল্যে সজ্জিত করা হয়েছে, আর আমি এই মাত্র সংবাদ পেলাম—মূর্ত্তিনির্ম্মাণও শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন নির্দ্দিষ্ট সময়ে শোভাযাত্রা বের করলেই হয়। শোভাযাত্রার প্রথমে থাকবে সুসজ্জিত অশ্বশ্রেণী, তারপর গজশ্রেণী, তারপর পদাতিকসৈন্য—তারপর স্বর্ণ-চতুর্দ্দোলে সহস্র বাহকস্কন্ধে থাকবে চন্দ্রসেন তার পিছনে রাজপরিবারের লোক, সভাসদ, রাজকর্ম্মচারীগণ সামাজিক কর্ম্মচারীগণ, নগরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা।

ময়ূরধ্বজ

উত্তম, আয়োজন অতি সুন্দর হয়েছে।

সেনাপতি

মহারাজ, জীবনে প্রথম এ দৃশ্য দেখ্‌লাম—চন্দ্রসেনের সে যুদ্ধ যেন চোখের সাম্‌নে এখনও দেখ্‌ছি! এক একবার মনে হচ্ছে—সে কি স্বপ্ন না সত্য! উঃ! কী সে দৃশ্য! চন্দ্রসেনকে যুদ্ধ কর্‌তে দেখে মনে হ'ল, যেন মহাকাল তাথৈ তাথৈ নৃত্যে শত্রুসৈন্যের উপর নাচ্‌ছে—তা'র চোখ থেকে ধক্ ধক্ ক'রে আগুনের জ্বালা বেরুচ্ছিল—আর এক একবার তার ভৈরব হুহুঙ্কারে রণক্ষেত্রের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌ছিল। সে এক প্রলয়ের ধ্বংসলীলা! রণক্ষেত্রের যেদিকে তাকাই, সেই দিকেই চন্দ্রসেন। যে মুষ্টিমেয় সৈন্যকে আমি শত চেষ্টাতেও আর রণক্ষেত্রে স্থির কর্‌তে পার্‌ছিলাম না, সেই শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন, হতাশ সৈন্য হঠাৎ যেন তাড়িতপ্রবাহে নবজীবন পেল—এক সৈন্য সহস্র সৈন্যে পরিণত হ'ল—

বেগে নগররক্ষক ও একজন সহকারী সেনানায়কের প্রবেশ

নগররক্ষক

মহারাজ, সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ হয়েছে! ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি চন্দ্রসেনের ছেলে দুটিকে কে যেন খুন করেছে!

সমস্ত সভা চমকিয়া উঠিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সহকারী সেনানায়ক

আমি সেনাপতি মহাশয়কে তাঁ'র অভিনন্দনের সংবাদ জানাবার জন্য আর তাঁর আসার বন্দোবস্তের কথা বল্‌বার জন্য তাঁর বাড়ী গিয়েছিলাম, কিন্তু বাড়ীতে তাঁ'র খবর না পেয়ে নগরের নানাস্থানে অনুসন্ধান কর্‌লাম, কিন্তু কোথাও তাঁকে পেলাম না। শেষে নগররক্ষকের কার্য্যালয়ে গিয়ে সংবাদ দিলাম। তিনিও তাঁ'র দলবল নিয়ে খুব অনুসন্ধান কর্‌লেন—কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। শেষে আবার এসে আমরা তাঁ'র বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়্‌লাম। ঢুক্‌তেই একটা দুর্গন্ধ আমাদের নাকে এল। তারপর উপরে উঠে গিয়ে দেখি একটা ঘরে সেনাপতির ছেলে-দুটি খুন হয়ে পড়ে আছে—তা'দের মুণ্ড এক জায়গায়—আর ধড় এক জায়গায়—চারিদিকে একটা উৎকট দুর্গন্ধ—বাড়ীর মধ্যে জনমানব নাই·····তারপর সেই শব-সৎকারের সুবন্দোবস্তের আয়োজন করে আমরা এখানে আস্‌ছি।

ক্ষণকাল রাজসভায় গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল:
সকলেই স্তম্ভিত, চিন্তাকুল, বিষণ্ণ!

ময়ূরধ্বজ

একি অসম্ভব ব্যাপার! কে এই শিশুদের হত্যা কর্‌লে! চন্দ্রসেনই বা কোথায়! এ কী প্রহেলিকা! কী ঘোরতর দুঃসংবাদ!

মন্ত্রী

মহারাজ, সর্ব্বনাশ হ'ল! এই ছেলে-দুটিকে হারিয়ে চন্দ্রসেন এক মুহূর্ত্ত বাঁচবেনা—এরা তা'র প্রাণের চেয়েও বড় ছিল·········এদের জন্য সে সংসারের সমস্ত প্রিয়জিনিষগুলি ছেড়েছিল! হায়! হায়! উৎসবের এত আয়োজন ব্যর্থ হ'য়ে গেল!

সেনাপতি

কে এই হত্যাকারী? চন্দ্রসেনের কে এমন শত্রু ছিল যে এই ভীষণ প্রতিশোধ নিল!·········

রাজা

সে যেই হোক্, তা'কে খুঁজে বের কর্ত্তে হবে। সে যেখানেই পালাক্, তাকে জীবন্ত ধরে আনতে হবে। আপনারা আমার আদেশ শুনুন, যে এই শিশুদ্বয়ের হত্যাকারীর সন্ধান দিতে পার্‌বে, তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে—একথা আপনি রাজ্যের চারিদিকে ঘোষণা করে দিন······আর নগররক্ষক, আপনি চন্দ্রসেনকে খুঁজবার জন্য দেশের মধ্যে চর পাঠান······আপনারা যেমন করে পারেন, এই পাপিষ্ঠ শিশুহত্যাকারীকে খুঁজে বের করুন,—তা'কে এমন শাস্তি দিতে হবে, যা এ রাজ্যের দৃষ্টান্তস্থল হ'য়ে থাকে······ওঃ! কী দুর্ভাগ্য! আজ এই বিজয়োৎসবের যে এই পরিণাম হবে তা' স্বপ্নেও ভাবিনি।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ

চেহারায় ও বেশে একটা অস্বাভাবিক ভাব, চোখের দৃষ্টি উন্মাদের মত লক্ষ্যহীন—ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিস্মৃত হইতেছেন, আবার তৎক্ষণাৎ প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে প্রকৃতিস্থ হইতেছেন।

চন্দ্রসেন

আর খুঁজে বের কর্‌বার জন্য পরিশ্রম কর্ত্তে হবেনা, মহারাজ, সে শিশুহত্যাকারী আপনার সম্মুখে……

সমস্ত সভা বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া গেল।

রাজা

(কিছুক্ষণ পরে সিংহাসন হইতে নামিয়া) সেনাপতি, শোকে আপনি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছেন ; (জড়াইয়া ধরিতে গেলেন) এই স্থানে বসুন।

চন্দ্রসেন

(দূরে সরিয়া) না, না, মহারাজ……এ আমার বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ নয়—এ সত্য, সরল, জলের মত পরিষ্কার কথা………আমি এসেছি রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করতে ……আজ আমি বিচার চাই……আজ কোন কথা শুনবার দিন নয়……শুধু ন্যায়ের শাণিত খরশানের উদ্যত বিচার আজ অবনতশিরে গ্রহণ কর্ত্তে চাই……এখানে আমার আসন গ্রহণ সাজেনা………

রাজা

কিসের বিচার সেনাপতি?

চন্দ্রসেন

শিশুহত্যার বিচার—বিশ্বাসঘাতকতার বিচার। আমার স্ত্রী শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে নালিশ করছে……আমি তা'র বুকের ধন, তা'র নয়নের মণি ছেলেদুটিকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করেছি—আর তা'র গচ্ছিত ধন, তা'র বিশ্বস্তসূত্রে ন্যস্ত সম্পত্তি ধ্বংস করেছি… (কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল—পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইলেন) মহারাজ, বিচার করুন, ন্যায় বিচার করুন……

রাজা

চন্দ্রসেন, আমি বাস্তবিকই কিছু বুঝ্‌তে পারছি না—সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে প্রহেলিকার মত বোধ হচ্ছে।

চন্দ্রসেন

এর মধ্যে কোন প্রহেলিকা নেই, কোন সমস্যা নেই, কোন আবছায়া নেই—এ প্রকাণ্ড দিবালোকের মত স্পষ্ট, সত্য, সরল—আমি অপরের গচ্ছিত দু'টি নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করেছি……এর শাস্তি আমাকে দিন……আসামী তা'র দোষ সম্পূর্ণ স্বীকার করছে……

সমস্ত সভা বজ্রাহতের মত বহুক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া রহিল—চন্দ্রসেন উদ্‌ভ্রান্তের মত অস্বাভাবিকভাবে ক্রমাগত বলিতে লাগিল—

'বিচার চাই! বিচার চাই!'

রাজা

চন্দ্রসেন, যদি বাস্তবিকই তুমি তোমার শিশুপুত্রদ্বয়কে হত্যা করে থাক……(কিছুক্ষণ থামিয়া) তা'হলেও তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম……

চন্দ্রসেন

না, না, মহারাজ, ক্ষমা নয়, ক্ষমা নয়—আমাকে শাস্তি দিন—ভীষণ, কঠোর শাস্তি দিন………

ক্ষমার চেয়েও ভীষণ শাস্তি আর তোমার পক্ষে পারেনা সেনাপতি……যে পুত্রকে হত্যা ক'রে, তা'র বুকের উপর দিয়ে যে কী মহাসাগরের উদ্দাম ঢেউ বয়ে যায়, তা'র মস্তিষ্কের গ্রন্থিগুলি কী ভাবে নিষ্পেষিত হয়, তা একবার ভাব্‌লেই বুঝা যায়! মস্তিষ্ক নিতান্ত বিকৃত না হলে কেউ কখনো পুত্রহত্যা করতে পারে না!

চন্দ্রসেন

অবিচার! অবিচার! ঘোরতর অবিচার! ক্ষমা! ক্ষমা পায় কে?……হাঃ! হাঃ! হাঃ!…নরহত্যাকারী শিশু-হত্যাকারী, বিশ্বাসঘাতক, পরস্বোপহারীকে ক্ষমা!…… মহারাজ স্পষ্ট বলুন, আজ ন্যায়ের দণ্ড রাজার হাত থেকে খসে পড়েছে!……ওঃ! আজ রাজশক্তির বীভৎস দুর্ব্বলতা জনচক্ষুকে পীড়া দিচ্ছে!……

রাজা

এর মধ্যে কোন দুর্ব্বলতা নেই চন্দ্রসেন—এই আমার বিচার। যে এই রাজ্যকে রক্ষা করেছে, যে এই রাজ্যের জনসাধারণের প্রাণের দেবতা—তা'র অপরাধ, আমি রাজা হিসাবে ক্ষমা করলাম। তা'র মাথার উপরে আইনের কোন অস্ত্র উঠ্‌তে পারেনা—এই আমার বিচার।

চন্দ্রসেন

ওঃ! ভগবান,—না, না,—থাক্—না, না,—চন্দ্রসূর্য্য খসে পড়ুক, পৃথিবী প্রলয়ের ঝঞ্ঝায় কেঁপে উঠুক, রাজ্য রসাতলে যাক্……অবিচার……অন্যায়……রাজ্য প্রহসন, রাজসভা প্রহসন, রাজা প্রহসন—সব প্রহসন……হাঃ! হাঃ! হাঃ!…দুর্ব্বল অসহায়া নারীর আবেদন যেখানে ব্যর্থ হয়, দুর্ব্বল সবলের বিরুদ্ধে যেখানে বিচার পায়না, সেখানে-

কার রাজ্যশাসন একটা বিরাট অট্টহাসির স্তূপের উপর স্থাপিত···গেল, গেল···ঐ ধসে গেল···হাঃ! হাঃ! হাঃ!···
বেগে প্রস্থানোদ্যত)

চন্দ্রসেনের সম্মুখ দিয়া পঞ্চশিখ শাস্ত্রীর প্রবেশ—চন্দ্রসেন তাঁহাকে দেখিয়া কয়েক পা পিছনে সরিয়া আসিলেন।

পঞ্চশিখ শাস্ত্রী

(কম্পিতকণ্ঠে) বিচারের জন্য চিন্তা নেই, চন্দ্রসেন। রাজা যখন তাঁর বিচার করবার শক্তি হারিয়েছেন, তখন আমিই তা'র বিচার করব—তোমার স্ত্রীর প্রতি কখনই অবিচার হবে না—তোমার পুত্রঘাতীর শাস্তি এই স্বচক্ষে দেখ···(বক্ষে ছুরিকা আঘাত ও পতন)

জনতায় 'হায়! হায়!' 'কি হ'ল! কি হ'ল!' 'একি! একি!' শব্দ—চারিদিকে সকলের ব্যস্ততাপূর্ণ ছুটাছুটি। রাজা ছুটিয়া গিয়া পঞ্চশিখ শাস্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ ধরিয়া তুলিলেন।

রাজা

আচার্য্য! একি করলেন? একি করলেন?

পঞ্চশিখ শাস্ত্রী

(ক্ষীণকণ্ঠে ও অৰ্দ্ধোচ্চারিত ভাষায়) মহারাজ! ময়ূরধ্বজ! আমিই এ হত্যার সমস্ত প্ররোচনা দিয়েছি! তা'কে আমিই উত্তেজিত করে' যুদ্ধে নামিয়েছি!······তখনো ভাবিনি, সে ছেলে-দুটিকে এত ভালবাসত!······ওঃ! মানুষের জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ!—মৃত্যুর দিন পর্য্যন্তও তার কত শিখ্‌বার আছে!······চ-ন্দ্র-সে-ন

বাক্যরোধ ও কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই মৃত্যু।
চন্দ্রসেন একটা বিকৃত চীৎকার করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চন্দ্রসেনের বাড়ীর একটি কক্ষ। কক্ষ-সংলগ্ন ছাতে উঠিবার একটি সিঁড়ি দেখা যাইতেছে। রাত্রি প্রায় একপ্রহর। আকাশ ঘোলাটে-মেঘে ঢাকা। নিষ্প্রভ চন্দ্রালোকে সমস্ত পৃথিবী যেন রহস্যময় তন্দ্রার ঘোরে আবিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে। মাঝে মাঝে শন্‌ শন্‌ করিয়া দমকা বাতাস উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস ছাড়িতেছে। মেঘরুদ্ধ চন্দ্রালোকে চন্দ্রসেনের নির্জ্জন বাড়ী যেন প্রেত-পুরীর মত বোধ হইতেছে। ধীরে ধীরে চন্দ্রসেন কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন

চন্দ্রসেন

ঢুকেছি, বাড়ীতে ঢুকেছি,—যাক্; এই বাড়ীই ত? এই বটে; হাঃ—হাঃ—হাঃ—চমৎকার! আজ আমার বাড়ী, আমার শৈশবের ক্রীড়া-গৃহ, যৌবনের বিলাস-কুঞ্জ, মন্দার স্বহস্তরচিত সুখনীড়, দু'টি শিশু-বিহগের অজস্র কাকলীমুখর পল্লবিত গৃহশাখা আজ চিন্‌তে পারছিনে! একটা ঝড়ের হাওয়া—দিগন্ত কাঁপান গর্জ্জন—একটা স্বর্গমর্ত্ত্য-আলোড়ন—বাস্,—তা'রপর সব স্থির—চেয়ে দেখি, সব ভোজবাজীর মত কোথায় শূন্যে উড়ে গিয়েছে! যাক্,—শুধু দেখে যাব—এই শ্মশান একবার দেখে যাব······(হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন ও কিছুক্ষণ পরে একবার কাঁপিয়া উঠিলেন—চোখ-মুখ একটা অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল।)······এই ঘর—এই ঘর—ওরে, সেই রক্ত······(নিম্নস্বরে ফুঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও শেষে একটা চীৎকার করিয়া উঠিলেন) এই যে—এই যে—পেয়েছি! পেয়েছি! এই যে অশোক-অমিত······ওরে সেই চোখ······আয়, আয় (যেন সামনে কিছু দেখিতেছেন ও তাহা ধরিতে যাইতেছেন)······আমি······আমি—তোদের বাবা······আর তোদের কিছু বল্‌বনা······বিশ্বাস কর······বিশ্বাস···ওঃ হোঃ (চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন)······ওরে অভিমান করিসনি, অভিমান করিসনি,—এই বুক চিরে যদি দেখাতে পারতাম তোদের জন্য প্রাণ কেমন করছে···কেমন করছে···জলে গেল······ফেটে গেল······আয়······আয়······ঐ গেল······গেল······উত্তর দিলনা! চলে গেল! (সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন) একি হল! একি হল! না, না, তোদের আর কিছু বল্‌বনা—হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তোদের লুকিয়ে রাখ্‌ব। আয়······আয় (কয়েক ধাপ উঠিয়া হঠাৎ সামনে একবার তাকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন) মন্দা, মন্দা,······পুড়ে গেল—পুড়ে গেল!······তোমার চোখের আগুনে আমার সর্ব্ব-শরীর পুড়ে গেল! আর শাস্তি দিয়োনা—বিশ্বাসঘাতক তা'র শাস্তিতে পাগল হয়ে গেছে······আর না······আর না······ক্ষমা ক'র, ক্ষমা ক'র—একবার ক্ষমা ক'র, তোমার হতভাগা স্বামীকে একবার ক্ষমা কর······এস, এস······এবার তোমার ভালবাসার প্রতিদান দেব······আবার সংসার করব······তোমার অশোক-অমিতকে এই বুকের মধ্যে পুরে রাখ্‌ব······এস······এস······(ছুটিয়া ধরিতে গেলেন)······একবার এস······(পতন ও মৃত্যু)

[যবনিকা পতন]

—— শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

রাজপুতানা ভ্রমণ

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সরকার এম-এ, বি-এল

উজ্জয়িনী

উজ্জয়িনীতে যখন পৌঁছিলাম তখন রাত্রি এগারটা। রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে উজ্জয়িনীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়—তখন খালি দেখিয়াছিলাম দূরে রাস্তার ধারে বৈদ্যুতিক আলোকস্তম্ভের সারি। উজ্জয়িনীর রাজপথে বিদ্যুতালোক—কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন। যে নগরীর রাজপথে গভীর নিশীথে সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অভিসারিকাগণ কেবলমাত্র 'ক্ষণিক' বিদ্যুতালোকে পথ চিনিয়া যাত্রা করিতেন, সেখানে অফুরন্ত বিদ্যুতালোকের ছড়াছড়ি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং বুঝিলাম আজকাল উজ্জয়িনীর রাজপথে আর অভিসারিকা বাহির হন না—আর যদিই বা হন তাঁদের আর 'কচিৎ বিদ্যুৎস্ফুরণের' জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না অথবা বস্ত্রের আড়ালে সঙ্গোপনে দীপশিখা বহন করিতে হয় না। তাই আজকালকার কাব্যজগৎ হইতে অভিসারিকারা একেবারে নির্ব্বাসিত।

কালিয়াদহ মহল

রাত্রে ষ্টেশনেই আহারাদি করিয়া শয়ন করা গেল। শুইয়া শুইয়া মনে হইতেছিল হয়ত রাত্রে নিদ্রাঘোরে 'স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে মোর পূর্ব্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে' খুঁজিতে বাহির হইতেও পারি, কিন্তু মহাকবিরা যে স্বপ্ন দেখেন আমাদের মত অকবির চোখে তাহার আবির্ভাব হইবে কেন। সুতরাং উজ্জয়িনী সে-রাত্রে আর আমাদের দেখা দিলেন না—না স্বপ্নে না জাগরণে।

সকালে উঠিয়া যখন সহরে বাহির হইলাম তখনও কল্পনার উজ্জয়িনী দূরেই রহিল। বাড়ী দেখিলাম অনেক—'বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে' ঘুরিলামও বহুবার,—কিন্তু সে সব বাড়ীর দ্বারে শঙ্খচক্র আঁকা নাই, তোরণের শ্বেতস্তম্ভপরে সিংহের মূর্ত্তি নাই, দুই-পাশে নীপতরু বা অশোককুঞ্জ নাই, তার অলিন্দে পারাবত বসে না, ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিয়া ফিরে না। যে সব সৌধমালার লোভ দেখাইয়া বিরহী যক্ষ মেঘকে উজ্জয়িনী ঘুরিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহার স্থলে এখন আছে ছোট ছোট মৃৎকুটির, অসুন্দর অট্টালিকার রাশি এবং স্কুল কলেজ ও মিলের কয়েকটা বিরাট আয়তন। শিপ্রা আছে বটে—কিন্তু শীর্ণা, স্বল্পতোয়া, পঙ্কশয্যায় লীনা—তার সে তরঙ্গভঙ্গ নাই, তীরে সে উৎসবের চিহ্নমাত্র নাই, সুন্দরীদের কেশের সুগন্ধে তার জল আর সুবাসিত হয় না; এখন তার ঘাটে ভিড় করেন পাণ্ডার দল এবং স্নানার্থীকে মন্ত্র পড়াইবার জন্য অশিক্ষিত ব্রাহ্মণসম্প্রদায়। মহাকালের

মন্দির এখনও আছে কিন্তু সেখানে সন্ধ্যারতির সময় সে সব 'বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত-চকিত-লোচনা পৌরাঙ্গনার' দর্শন মেলা দুষ্কর।

উজ্জয়িনীর মধ্যে অতীতের স্মৃতি জাগাইবার জন্য আছে মাত্র তার নাম, আর শিপ্রা আর মহাকাল। নামটুকুও কম নয় কারণ অনেক প্রাচীন নগরীর অবস্থান লইয়াই ত মতভেদের অন্ত নাই। মহাকাল অবশ্য কালজয়ী, কিন্তু তাঁর মন্দির মোটেই প্রাচীন নয়। তাঁর মন্দির কতবার ধ্বংস হইয়াছে কে জানে, তিনিও যে দেহ পরিবর্ত্তন করেন নাই তা কে বলিতে পারে। প্রাচীনত্বকে উজ্জয়িনীর বক্ষ

কালীয়দহ রাজপ্রাসাদ

হইতে যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। মহাকাল মন্দিরের নিকটে একটি তোরণের ধ্বংসাবশেষকে এখনও 'বিক্রম দরওয়াজা' বলে কিন্তু তাহার সহিত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সম্পর্ক যদিও বা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কখনও আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন তার আকার-প্রকার দেখিয়া আমরা তাকে বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। যাক্, মৌর্য্যযুগের উজ্জয়িনী, বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী, কালিদাসের উজ্জয়িনী ত নাই কিন্তু বিংশ শতাব্দীর উজ্জয়িনী ত আছে; আসিয়া যখন পড়িয়াছি তখন বর্ত্তমান দেখিতেই বা বাধা কি? সুতরাং বেলা আটটার সময় দুইখানা টঙ্গা ভাড়া করিয়া বাহির হওয়া গেল।

উজ্জয়িনী ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দূরে শিপ্রাগর্ভে কালীয়াদহ মহল নামে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের নাম অনেকদিন হইতেই শোনা ছিল, এই সুযোগে সমস্ত সহরটাও দেখা হইবে বলিয়া আমরা প্রথমেই সেদিকে রওনা হইলাম। মাণ্ডুর কোন সুলতান নাকি এটি তৈরী করান, বর্ত্তমানে এটি সিন্ধিয়া মহারাজের উজ্জয়িনী প্রবাসের প্রাসাদ। একথা বলিয়া রাখা ভাল যে উজ্জয়িনী বৃটিশ রাজত্বের মধ্যে নয়, গোয়ালীয়ার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম তিনচারি মাইল রাস্তা সহরের মধ্য দিয়া গোটাকতক মিল এবং বড় বড় বাড়ী দেখা গেল, কিন্তু সহরের অধিকাংশই সঙ্কীর্ণ ছোট গলি এবং মাটির কুটিরে ভরা। সহরের বাহিরে কাঁটার ঝোপে ঘেরা মাঠের মধ্য দিয়া অনেকটা যাইতে হয় তারপর শিপ্রার পোল। আমাদের টঙ্গাওয়ালারা রাস্তা সংক্ষেপ করিবার জন্য পাকা রাস্তা ছাড়িয়া মাঠ ঘাট মাটির ঢিবি এবং পাথরের উপর দিয়াই ঘোড়া ছুটাইল, আমাদের তার জন্য শেষটা বঞ্চনা কম হয় নাই।

কালীয়াদহ মহলের নিকটে শিপ্রানদী কিছুদূর পর্য্যন্ত দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে—সেই দুই শাখার মধ্যে প্রাসাদ। এক শাখার উপর পর পর দুটি বাঁধ এমন কৌশলে করা যে একবাঁধের ভিতর দিয়া জল অল্পে অল্পে ঢুকিয়া আর একটি বাঁধের নীচে দিয়া প্রপাতের আকারে বাহির হইতেছে। দুইবাঁধের মধ্যে প্রাসাদের এক অঙ্গন, তাই মনে হয় যেন নদীগর্ভ হইতে প্রাসাদ উঠিয়াছে! নদীগর্ভ শুষ্ক নয় কিন্তু

শেওলা ঘাসের কল্যাণে তার প্রবাহের সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে।

বাঁধ পার হইয়া ভিতরে গিয়া শুনিলাম যে অনুমতি ভিন্ন প্রাসাদ দেখা নিষেধ। যিনি অনুমতি দিবেন তিনি আবার থাকেন উজ্জয়িনীতে। গোয়ালীয়ার-মহারাজা আসেন অবশ্য কালে ভদ্রে, কিন্তু তবুও ত এ রাজপ্রাসাদ সুতরাং বাজে লোকের প্রবেশ নিষেধ। কেউই এখানে থাকে না, এক হিন্দুস্থানী মালীর দল ছাড়া চারিপাশের অবস্থা দেখিয়া এখানে যে অদূর ভবিষ্যতে কোনও রাজপুরুষের
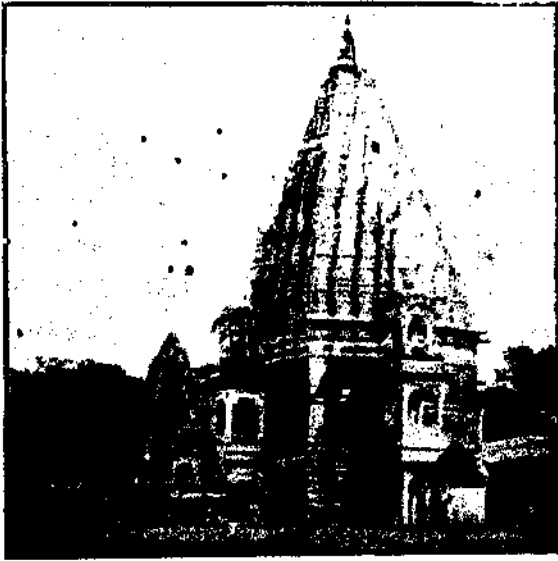
মহাকালের মন্দির

পদার্পণ হইতে পারে তা অনুমান করা যায় না। তবু মালীতন্ত্রের কাছে মাথা নীচু করিয়া আমাদের ফিরিতে হইল। বাহিরে যা দেখিলাম তাতে ভিতরে যে বিশেষ কিছু আছে তা মনে হইল না, তবে স্থানটি অতি সুন্দর—দেখিবার যোগ্য বটে।

সহরে ফিরিয়া আমরা সোজা শিপ্রার ঘাটে চলিয়া আসিলাম। সেখানে এখন পাণ্ডার রাজত্ব, স্নান না করিলেও তাদের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া গেল না। ঘাটে জল বেশ আছে, তাতে অসংখ্য ছোট বড় মাছ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। উজ্জয়িনীর আট মাইলের মধ্যে মাছ মারা নিষেধ সুতরাং মৎস্যকুল নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে বংশবৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে।

এই ঘাটের নিকটেই মহাকালের মন্দির। মন্দির প্রাঙ্গণ রাস্তা হইতে অনেক নীচে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হইল। মন্দির দ্বিতল, উপরের তল অর্থাৎ প্রাঙ্গনের উপরে যে মন্দির সেখানে এক দেবতা আছেন কিন্তু তিনি মহাকাল নহেন—আমরা না জানাতে সেখানেও কিছু প্রণামী দিতে হইল। এই দেবতার আসনের নীচে একটু ফাঁক আছে তার ভিতর দিয়া নীচে মহাকালের গর্ভগৃহের আলো আসিতেছিল। আবার এক চোট নীচে নামিতে হইল তার পর যেখানে পৌঁছিলাম তা মহাকালের উপযুক্ত বাসস্থান বটে। স্বল্পান্ধকার এক পাতাল-পুরীতে মস্ত এক পিতলের দীপ দিবারাত্র জ্বলিতেছে তার মধ্যে আছেন মহাকাল শিবলিঙ্গ। তখন পূজা চলিতেছিল এবং পুরোহিতের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ সেই পাতালপুরীর পাষাণ প্রাচীরে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। বন্দোবস্ত অতি সুন্দর, পাণ্ডার অত্যাচার নাই, সকলেরই অবারিতদ্বার। মন্দিরের পিছনে একটি প্রকাণ্ড বাঁধান কুণ্ড।

মহাকাল দেখিয়া গেলাম গোপালমন্দিরে। এ মন্দির এবং দেবতা দুই আধুনিক। দেবতার মাহাত্ম্যের কথা বিশেষ জানি না কিন্তু মন্দিরটি অতি সুন্দর, দেখিবার মত। উজ্জয়িনীতে দেবতা এবং দেবায়তনের অন্ত নাই, সব একদিনের মধ্যে দেখা অসম্ভব, বিশেষ পুণ্যার্পণ যখন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা আর একটি মন্দির মাত্র দেখিয়াছিলাম সেটি কালিকাদেবীর মন্দির—তাও ভর্তৃহরি গুহার পথে পড়ে বলিয়া। সে মন্দিরের চেয়ে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ভীষণ মূর্ত্তিই এখন বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে।

ভর্তৃহরির গুহা সহরের প্রান্তে শিপ্রার তীরে খুব এক নির্জ্জন স্থানের মধ্যে। ভর্তৃহরি একজন মস্ত পণ্ডিত এবং সাধক ছিলেন তা সকলেই জানেন। প্রবাদ এই যে তিনি উজ্জয়িনীর রাজাও ছিলেন, শেষ জীবনে সব ছাড়িয়া এই

গুহায় বসিয়া তপস্যা করেন। গুহার উপর এখন বাড়ী উঠিয়াছে, তার ভিতরে প্রথম ভর্ত্তৃহরির গুরু গোরক্ষনাথের সমাধি মন্দির, তারপরে এক গোময়লিপ্ত অঙ্গন পার হইয়া গুহাদ্বারে পৌছিতে হয়। গুহা নাকি অনেকদূর বিস্তৃত এবং শেষ প্রান্তে ভর্ত্তৃহরির আসন আছে। আমরা বিকালে গিয়াছিলাম, সময় সংক্ষেপ বলিয়া গুহার শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পারি নাই। ভাঙা বাড়ী ঘর এবং ওই গোময়লিপ্ত অঙ্গনের জন্য আমরা গুহা দেখিয়া খুসী হইতে পারি নাই, কিন্তু গুহার বাহিরের দৃশ্যটি সুন্দর—শিপ্রা এখানে যেন একটি

গোপাল-মন্দির

গিরি-নদী—দুইপাশে উচ্চ তটভূমি যেন পাহাড়ের মত নদীগর্ভ ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে।

উজ্জয়িনীতে আর দেখিবার ছিল মানমন্দির, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতা না থাকাতে আর ওদিকে যাইতে সাহস করি নাই—বিশেষ দিল্লী আর জয়পুরের মানমন্দির ত দেখাই ছিল। উজ্জয়িনী সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে তাহা সেখানকার সর্ব্বজনপ্রিয় বাঙ্গালী মাষ্টারজী শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তিনি এবং আর কয়েকটি বাঙ্গালী মিলিয়া ওখানে একটি স্কুল করিয়াছেন আমাদের মত বাঙ্গালী পর্যটক পাইলে আর ছাড়িতে চান না। আমরা তাঁর ওখানে না উঠিলেও না খাওয়াইয়া ছাড়েন নাই। বিকালে উজ্জয়িনী ছাড়িয়া রাত্রে রাতলাম জংশনে গাড়ী বদল করিয়া আমরা চিতোর রওনা হইলাম।

চিতোর

পরদিন (২১শে) চিতোরগড় ষ্টেশনে যখন গাড়ী থামিল তখনও ভোর হয় নাই, চিতোরের গিরিশৃঙ্গে তখনও অন্ধকারের একাধিপত্য। প্লাটফর্ম্মে নামিয়া চারিদিকে চাহিলাম—চিতোর অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া রহিল। চিতোর দুর্গের অতিথি আমরা—কিন্তু কেহ তূর্য্যধ্বনি করিয়া আমাদের আগমন বার্ত্তা জানাইল না, দুর্গাধ্যক্ষের অনুমতির আশায় দ্বারপ্রান্তে বসিয়া থাকিতে হইল না, দুর্গের লৌহকপাট আমাদের জন্য একটুও হেলিল না বা দুলিল না। এ বিংশ শতাব্দী—তাই রাজপুত-বীরের অশ্ব খুরোত্থিত ধূলিজালের পরিবর্ত্তে বাষ্পযানের ধূমাবর্ত্তের মধ্য দিয়া আমাদের পুর প্রবেশ করিতে হইল এবং দুর্গের পাষাণ কক্ষের পরিবর্ত্তে রেল কোম্পানীর যাত্রী নিবাসে আশ্রয় লইতে হইল। আমরাও অবশ্য চিতোরের অতিথির মত আচরণ করি নাই, কারণ সেই ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে ওয়েটিং-রুমের সামনে এক চায়ের দোকান দেখিয়া শীতে গরম হইবার অভিপ্রায়ে বিনা সামাজিকে এবং একলিঙ্গজীর নাম স্মরণ না করিয়াই তার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম।

রেল লাইনের পূর্ব্বদিকে অল্প একটু দূরেই চিতোর-শৈল বা দুর্গ একটু আলো হইলেই দেখা গেল। প্লাটফর্ম্মের ওভারব্রিজ হইতে সেদিন চিতোর শৈলের উপর যে চমৎকার সূর্য্যোদয় দেখিয়াছিলাম তা চিরদিন মনে থাকিবে। দুর্গের পিছনে সারি সারি শৈলমালা, আর সামনে ষ্টেশনের এপারে সুদূর-বিস্তৃত মরু-প্রান্তর—লোকালয় বা গাছপালার চিহ্নও নাই। সূর্য্যকিরণে দুর্গের উন্নত শ্বেতপ্রাকার অল্পে অল্পে জ্বলিয়া উঠিল এবং দূরে নিকটে ভগ্ন অভগ্ন অট্টালিকার রাশি অন্ধকার হইতে আলোকে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল।

একটু বেলা হইলে আমরা তিন খানা টঙ্গায় দুর্গের দিকে রওনা হইলাম। চিতোর শৈল প্রায় ৫০০ ফিট উঁচু আর তিন মাইল লম্বা; পথটি কিন্তু এমন অল্পে অল্পে উপরে উঠিয়াছে যে টঙ্গা একেবারে দুর্গের ভিতর পর্য্যন্ত যায়। এখানে টঙ্গায় চড়া কিন্তু প্রাণান্তকর ব্যাপার, না আছে বসিবার গদি, না চাকায় রবার দেওয়া—মেবার-রাজ্য যে এখনও অতীতকেই আশ্রয় করিয়া আছে এই টঙ্গা তার প্রমাণ।

ষ্টেশনের পিছনে একটি ছোট বাজারের ভিতর দিয়া টঙ্গা চলিল। বাজারের শেষে সরকারী থানা বা ঐ রকম একটা কিছু, সেখানে আমাদের তিন টঙ্গা-ওয়ালাই গ্রেপ্তার হইলেন। ব্যাপারি কি, না তাদের এ মাসের লাইসেন্স ফি দেওয়া নাই। এখানে নম্বর লইয়া ছাড়িয়া দেওয়ার রীতি নাই, সুতরাং পনের মিনিট সেখানে বসিয়া টঙ্গাওয়ালাদের সঙ্গে এক গোঁড়ার দুর্ব্বোধ্য ভাষায় বাক্‌যুদ্ধ শুনিতে হইল; তার পরে নিষ্কৃতি পাইলাম

বর্ত্তমান চিতোর গ্রাম দুর্গের নীচে, দুর্গের উপর এখন জনশূন্য। ১৫৬৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত নাকি দুর্গের উপরে নগর ছিল। গাম্ভেরী নদীর পুল পার হইয়া আমরা গ্রামে ঢুকিলাম। চিতোর-পাহাড়ের তিনদিক ঘেরিয়া এই নদী বহিয়া গিয়াছে। চিতোর মেবারের একটি জেলার রাজধানী, একজন ম্যাজিষ্ট্রেট এখানে থাকেন, দুর্গের পাশ তাঁর আপিস্ হইতেই যোগাড় করিতে হয়। আপিসের পাশেই দুর্গের প্রবেশ পথ।

এ পথে পর পর সাতটি তোরণ বা দ্বার (এদেশে বলে পোল) আছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তোরণের মধ্যে জয়মল্ল এবং পুত্তের ছত্রী। ছোট একটু পাথরের বেদীর মত, তার চার কোণে চারিটি থামের উপর ছাদ—এই ছত্রী; কারুকার্য্য নাই, বর্ণের লীলা নাই, পাথরে মর্ম্মরের শুভ্র সৌন্দর্য্য বা সুষমা নাই—তবু এই ক্ষুদ্র স্মৃতিচিহ্নগুলি অপরূপ। এ পাহাড়ের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডই ত চিতোরের বীরদের এক একটি স্মৃতিসৌধ।

সমস্ত তোরণগুলিরই এক একটা মস্ত ইতিহাস আছে; এর প্রত্যেকটি অধিকার করিয়া তবে শত্রু চিতোরে ঢুকিতে পাইয়াছে। তোরণের আকার এবং কপাটের গায়ে বড় বড় লোহার ফলা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। চিতোর যে একদিন দুর্ভেদ্য ছিল তা শুধু মেবার-বীরদের জন্যই নয়; এই সুগঠিত প্রাকার, এই সব লৌহ ফলাকাযুক্ত তোরণ, আর এই দুরারোহ শিলা-বহুল গিরিগাত্র ভেদ করা নিশ্চয়ই সহজ ব্যাপার ছিল না। আকবর যখন চিতোর জয় করেন তখন তাঁকে গোপনে সুড়ঙ্গ কাটিয়া বারুদের সাহায্যে নীচের প্রাকার উড়াইয়া দিতে হইয়াছিল। প্রাকার এবং তোরণগুলি মেবার সরকার মেরামত করিয়া রাখিয়াছেন।

দুর্গের শেষ তোরণ বা সিংহদ্বার রামপোল; তারপর দুপাশে খানিকটা কেবল ভাঙ্গা পাথরের স্তূপ অথবা পাথরের জোড়াতালি দেওয়া কুটির—ঠিক কুটির নয় কুটিরের কঙ্কাল। তিন মাইল গিরিবক্ষের সবই প্রায় জঙ্গল বা খোলা মাঠ বা চষা জমী। এই সব জমি চাষ করাইবার জন্য মেবার সরকার অল্প খাজনায় চাষাদের বন্দোবস্ত দিয়া থাকেন। চিতোরের বর্ত্তমান অধিবাসী এই সব চাষারা, এ কুটিরগুলিও বোধ হয় তাদের। কুটির ছাড়া আর যা তা সবই ধ্বংসস্তূপ, তার মাঝে মাঝে এখানে সেখানে দুই দশটা প্রাসাদ বা মন্দির মাত্র চিতোরের অতীতের সাক্ষী; অথচ প্রাচীন রাণারা চিতোরকে সাজাইতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। এখন এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে রাণা লাক্ষ, মুকুলজী প্রভৃতির কীর্ত্তির চিহ্নমাত্র নাই, এক যা কিছু আছে তা রাণা কুম্ভের আমলের। আকবর-বিজয়ের পর ভট্ট

কবিরা চিতোরকে নিরাভরণা বিধবা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আমরাও তার সেই বেশই দেখিলাম।

এই রুমক কুটির হইতে হঠাৎ একটি ছোকরা গাইড মিলিয়া গেল। আমাদের এক অতি-সাবধানী বন্ধু কোনও গাইডের ইতিহাস জ্ঞান পরীক্ষা না করিয়া তাকে বড় আমল দিতেন না, আর তাঁর ইতিহাসের 'অথরিটি' ছিল 'ম্যারে'র 'হ্যাণ্ডবুক'। আশ্চর্য্যের কথা এই যে আমাদের ছোকরা গাইডের 'ম্যারে'র সঙ্গে কোনও মত ভেদ দেখা গেল না খায় সন তারিখ পর্য্যন্ত।

তরুহরি গুহা

দুর্গের পশ্চিম প্রাকারের ধারে কুম্ভমহল—এখন মহল মানে কেবল কয়েকটি দেওয়াল এবং প্রাচীর, তার ভিতরে কি যে ছিল বা ছিল না তা বুঝিবার উপায় নাই। একটি বড় হল আর কয়কটি কক্ষের নিদর্শন এখনও চেনা যায়। মহলের সম্মুখে একটি গর্ভগৃহের মত আছে—গাইডের মতে এইটিই পদ্মিনীর জোহর ব্রতের সুড়ঙ্গের মুখ, কিন্তু শোনা যায় সে সুড়ঙ্গ গোমুখী জলপ্রপাতের কাছে অন্য দিকে (আমরা অবশ্য খুঁজিয়া পাই নাই।) ভিতরে ঢুকিয়া এটিকে একটি বন্ধ ঘর বলিয়া মনে হইল—গাইড বলেন সুড়ঙ্গের মুখ রাণারা এখন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

মহলের এদিকে এক মস্ত প্রাচীর—তার ভিতর নাকি রাণাদের কোষাগার এবং অস্ত্রাগার ছিল। প্রাচীরের এক কোণে একটি ছোট পঞ্চদশ শতাব্দীর জৈনমন্দির আছে। খোলা প্রাঙ্গণে কয়েকটি কামান এখনও অস্ত্রাগারের স্মৃতি বহন করিতেছে। দূরে একটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল—শুনিলাম সেটি মন্ত্রী ভামাশার ভবন। রাণা প্রতাপ এই ভামাশার অর্থে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া দেবীরের যুদ্ধে মেবার উদ্ধার করেন, তা না হইলে হয়ত তাঁকে দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইত। মেবার উদ্ধার হইয়াছিল বটে কিন্তু চিতোর উদ্ধার হয় নাই, ভামাশার এই আবাসভবন তাঁর সর্ব্বস্ব বিনিময়েও শত্রু হস্তে রহিয়া গিয়াছিল।

চিতোরে রাণা কুম্ভের নাম জাগাইয়া রাখিয়াছে তাঁর অদ্বিতীয় কীর্ত্তি জয়স্তম্ভটি। ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে মালবের সুলতানের সহিত যুদ্ধ জয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য দশবৎসর ধরিয়া এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হয়। এটি প্রায় ১২৫ ফিট উঁচু এবং নয়টি তল বিশিষ্ট। ভিতরটি বেশ প্রশস্ত, রাজপুতের জয়স্তম্ভ প্রত্যেক তলেই প্রচুর আলো এবং হাওয়া। সিঁড়ির কায়দা একটু নূতন রকমের, মুসলমান যুগের স্তম্ভগুলির মত অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে হয় না। প্রত্যেক তলে একটি করিয়া চতুষ্কোণ মণ্ডপের মত আছে তার এক কোণে নীচের তলে নামিবার সিঁড়ি—বরাবর চলিয়া গিয়াছে। সমস্ত সোজা স্তম্ভ ভরিয়া নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ, সেগুলি ছোট হইলেও বেশ স্পষ্ট, যদিও কারিকুরীর পরিচয় তেমন পাইলাম না। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতাই প্রায় সেখানে বিরাজ করিতেছেন, মুনি ঋষিরাও বড় বাদ পড়েন নাই; চিনিতেও কষ্ট হয় নাই, নীচে দেবনাগরী হরফে তাঁদের পরিচয় দেওয়া আছে। মূর্ত্তি যেমনই হৌক এ রকম প্রাচুর্য্যই আশ্চর্য্য।

কুম্ভের আমলের আর একটী কীর্ত্তি-কুম্ভশ্যামজীর মন্দির, মীরা বাইয়ের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। বেশ বড় মন্দির,

মস্ত মণ্ডপও আছে কিন্তু দেবতার মূর্ত্তি দেখিয়া খুসী হইতে পারিলাম না। এ মন্দির যে মীরার তা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। মূর্ত্তির নাম 'রণছোড়জী' নয়; মন্দিরের গঠনে বা কারুকার্য্যেও নারীর সৌন্দর্য্যজ্ঞান বা মীরার মত কলানুরাগিনীর কলাসৃষ্টির কোনও পরিচয় নাই। তবু তাঁর নামটুকু যে আছে এই যথেষ্ট।

দেবমন্দির আর যা দেখিয়াছিলাম তার মধ্যে দুইটির নাম উল্লেখযোগ্য একটি নীলকণ্ঠ মহাদেবের নামে—বেশ সুন্দর ছোট মন্দিরটি, আর একটি কালিকা দেবীর। শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত সব সম্প্রদায়ের দেবতাই চিতোরে সমান মর্য্যাদা পাইয়াছেন। শুধু চিতোরে কেন, মেবারের চারিটি প্রধান তীর্থস্থানও এই তিন সম্প্রদায়ের এবং জৈনদের কীর্ত্তি—বৈষ্ণবদের নাথদ্বার, শৈবদের একলিঙ্গজী, শাক্তদের চতুর্ভুজাদেবী এবং জৈনদের ঋষভদেও। চিতোরেও জৈনদের একটি বড় কীর্ত্তি আছে—তার নাম কীর্ত্তিস্তম্ভ।

পূর্ব্বপ্রাকারের ধারে সূর্য্যতোরণের পাশে কীর্ত্তিস্তম্ভটি প্রতিষ্ঠিত। এটি নাকি চিতোরের প্রাচীনতম কীর্ত্তিচিহ্ন—নির্ম্মানকাল দ্বাদশ শতাব্দী। এর মধ্যে সাতটি তল, তবে উঁচু বেশী নয় মাত্র ৭৫ ফিট। ভিতরে আদিনাথের মূর্ত্তি আছে তা ছাড়া স্তম্ভের গায়েও উলঙ্গ তীর্থঙ্কর মূর্ত্তির অভাব নাই। ভিতরের সিঁড়ি খুব সঙ্কীর্ণ বলিয়া আমরা উপরে উঠি নাই।

এর পাশেই বিখ্যাত সূর্য্যতোরণ, শালুম্বাপতিরা পুরুষানুক্রমে যার রক্ষক ছিলেন। এখানে পাহাড় কিন্তু ঢালু নয়, নীচে রাস্তার মতও কিছু দেখিলাম না। তোরণের কপাট পর্য্যন্ত নাই, এখান দিয়া যে কি ভাবে দুর্গ প্রবেশ করা হইত তা মোটেই বোঝা গেল না।

জয়স্তম্ভের কাছে চিতোরের রাণাদের শ্মশানভূমি—নাম মহাসতী। নামটি সার্থক কারণ চিতোরে পুরুষ অপেক্ষা সতী নারীর চিতাই বেশী জ্বলিয়াছে। কোনও অজ্ঞাতনাম্নী সতীর একটি ক্ষুদ্র চৈত্যও দেখিলাম। এর নিকটেই গোমুখী নির্ঝর এবং তার জল ধরিয়া একটি ছোট সরোবর, চারিদিক প্রাচীরে ঘেরা আর এমন নিভৃতে যে মনে হয় এ সরোবর রাজান্তঃপুরচারিণীদের জন্য ছিল। পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের তলে বাঁধান চবুতরা—তার মধ্যে একটি বাঁধান গোমুখ দিয়া নির্ঝরের ধারা নিঃশব্দে বাহির হইতেছে। বরাবর বিস্তৃত সোপান শ্রেণী নামিয়া গিয়াছে, জল এমন পরিষ্কার যে নীচে পর্য্যন্ত দেখা যায়। উপচিত জল আবার পশ্চিমদিকের একটি রন্ধ্র দিয়া প্রপাতের আকারে অনবরত নীচে পড়িতেছে।

সফরের শেষে আমরা গেলাম পদ্মিনীমহলে। মহলের সামনে যখন টঙ্গা থামিল তখন মনে হইল গাইডের ভুল হইয়া

রাজপুতের জয়স্তম্ভ

থাকিবে, কারণ সম্মুখে যে প্রাসাদ দেখা গেল তাকে পদ্মিনীর বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। সংস্কারের নামে সমস্ত প্রাসাদটীতে চূণের প্রলেপ লাগাইয়া তার প্রাচীনত্বের ছাপ একেবারে মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। মহারাণারা চিতোরে আসিলে নাকি এখানেই থাকিতেন, চূণের এ কলঙ্ক লেখা তাঁদেরই দেওয়া। (সম্প্রতি সূর্য্যতোরণের কাছে মহারাণার নূতন প্রাসাদ তৈরী হইতেছে)। এ চূণের মধ্যে না আছে

শুভ্রতা, না সৌন্দর্য্য —এ যেন চিতোরের পরাধীনতার কলঙ্ক রং বদলাইয়া পদ্মিনীমহলকে গ্রাস করিয়াছে।

প্রাসাদের তোরণ প্রাচীন নয়; কক্ষগুলি ছোট ছোট, শ্রীহীন—কোনও দিন যে তাদের শিল্প সৌন্দর্য্য ছিল তা মনে হয় না; দেখিবার মত বিশেষ কিছুই নাই। শেষপ্রান্তে একটি মঞ্চের মত আছে, তার জানালা সব কাচের। মঞ্চের পাশে একটি দ্বিতল কক্ষ। গাইড্ বলেন এই মঞ্চে দাঁড়াইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া আলাউদ্দীন মহলের কক্ষে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখিয়াছিলেন, তা হয়ত সত্যই।

কিন্তু পদ্মিনীমহল প্রাসাদটুকুর মধ্যেই শেষ হয় নাই। প্রাসাদের নীচে একটি বিশুষ্কপ্রায় সরোবর তার গর্ভে আর প্রান্তে যাঁর শুভ্র সুন্দর জীবনটি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল তাঁর মৃত্যু কি নিষ্করুণ। চিতোরে মৃত্যুর কাহিনী প্রতি পদে জীবনের কাহিনীকে ছাপাইয়া গিয়াছে—পদ্মিনী মহলেও সেই জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব, মৃত্যুর কাছে জীবনের পরাভব।

এই মহলের সামনে একদিকে জয়মল্ল আর পুত্তের আবাসভবন—দৈন্যজরার প্রতিমূর্ত্তি, আর একদিকে কালিকা দেবীর মন্দির চিতোরের ধ্বংসলীলার প্রতীক। মন্দিরের সামনে রক্তরঞ্জিত যূপকাষ্ঠ, এখনও সেখানে নিত্য পশুবলির অনুষ্ঠান হয়। এ মন্দির যেন চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর—সেই যেদিন তিনি "মৈ ভূখা হুঁ" বলিয়া লক্ষণসিংহের কাছে মেবারের রাজরক্ত দাবী করিয়াছিলেন, তার পরে আজ পর্যন্ত

কালিকামাতার মন্দির– চিতোর গড়

একটি ছোট প্রাসাদ এখনও জাগিয়া আছে। প্রাসাদ শ্রীহীন কিন্তু চূণের কলঙ্কলেখা তাকে স্পর্শ করে নাই। অদূরে একটি ধ্বংসোন্মুখ উপবন—তার তোরণ এবং দুই চারিটি বেদী এখনও অবশিষ্ট আছে। একদিন এই মহলের যে সৌন্দর্য্য ছিল, রূপ ছিল তা এখনও অনুমান করা যায় আর সেই সৌন্দর্য্য যে অদ্বিতীয়া রূপসীর স্পর্শলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল তাঁর কথা আগেই মনে পড়ে। চিতোরে জীবন-উপভোগের আয়োজন এই পদ্মিনীমহলেই প্রথম চোখে পড়িল। পদ্মিনীর বীরত্বের কাহিনীই এতদিন শুনিয়া আসিতেছি—তাঁর মহল দেখিয়া তাঁর জীবনের আর একটা দিক আজ আমাদের কাছে খুলিয়া গেল। কিন্তু এই সরোবরের তীরে, এই উপবনের

তাঁর শোণিতপিপাসার শান্তি হয় নাই; চিতোর এখন শ্মশান তবু সেই শ্মশানের বুকের উপর বসিয়া তাঁর রক্তশোষণের বিরাম নাই।

এই মন্দির হইতেই আমরা ফিরিলাম। এর পর সব শস্য-প্রান্তর আর বন; ধ্বংসাবশেষ হয়ত আরও আছে কিন্তু তার ইতিহাস নাই। ষ্টেশনে ফিরিয়া চিতোরগড় ডাকবাংলায় খাওয়াদাওয়া সারিয়া আমরা উদয়পুর যাত্রার্থ জন্য প্রস্তুত হইলাম। তিনটার সময় চিতোর-উদয়পুর লাইনের গাড়ী ছাড়িল।

এই ৭০ মাইল শাখা লাইন ষ্টেটের সম্পত্তি এবং এ রাজ্যের একমাত্র রেলপথ। সম্প্রতি মাড়বার জংশন ষ্টেশন

হইতে নাথদ্বার এবং কাঁকরোলী পর্যান্ত একটি লাইন খুলিবার আয়োজন হইতেছে, কাজও আরম্ভ হইয়াছে। এই রেলপথ খুলিলে মেবারের কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান খুব সুগম হইবে, এখন মোটর চলে বটে কিন্তু যাওয়া বড় সুখের নয়। গাড়ীতে একজন সঙ্গী জুটিয়া গেলেন তিনি রাজপুতানার এজেন্ট আপিসের বড় কর্ম্মচারী হেড ক্লার্ক বা ঐ রকম কিছু। তাঁর কাছে শুনিলাম মহারাণা ফতেসিংহ (সম্প্রতি পরলোকগত) বয়সে যেমন প্রাচীন (আশী বৎসরের উপর) তেমনি প্রাচীনপন্থী ছিলেন, সেজন্য রেলপথের এ অবস্থা—অথচ এই

গ্রীষ্মাবাস—চিতোর গড়

লাইনটুকুর জন্য রাজ্যের আয় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পুরুষদের মত তাঁর আগ্রহ ছিল হ্রদসৃষ্টিতে—ফতেসাগর তার প্রমাণ। প্রতাপের আদেশ স্মরণ করিয়া মহারাণা নূতন বস্ত্র একটু ছিঁড়িয়া তবে পরিয়াছেন, নাপিতের কাছে ক্ষৌরকর্ম্ম করেন নাই, বিছানার নীচে তৃণ রাখিয়া তবে শুইয়াছেন এবং পাত্রের নীচে পাতা রাখিয়া তবে সে পাত্রে আহার করিয়াছেন। দিল্লী দরবারের সময় তিনি নাকি দিল্লীর নগরপ্রাচীরের ভিতরে পদার্পণ করেন নাই। নূতন মহারাণা নাকি নূতনপন্থী—সেজন্য পিতাপুত্রে সদ্ভাব ছিল না।

রেলপথের দুপাশে কেবল মরুপ্রান্তর, ষ্টেশনগুলিও ছোট ছোট, এক নাথদ্বার-রোড ষ্টেশনটিই কিছু বড় কারণ এখান হইতে মোটরে অনেক যাত্রী নাথদ্বার যায়। উদয়পুর হইতে মাইল দশ আগে উদয়সাগর হ্রদের তটভূমি দেখা গেল—তার পরে দেবারীর পর্ব্বতমালা আরম্ভ। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা এই পর্ব্বতমালার রন্ধ্রপথ দেবারী ষ্টেশনে পৌছিলাম।

চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা এক বিস্তৃত উপত্যকা ভূমির এক প্রান্তে উদয়পুর নগর। উপত্যকার নাম গীর্কো অর্থে গোলাকার। তিনটি গিরিবর্ত্ম দিয়া উপত্যকায় প্রবেশ করিতে হয়—দেবারী তার একটি। দেবারীর রন্ধ্রপথ সংকীর্ণ, দুইদিকে দুর্ভেদ্য গিরিপ্রাচীর, পথ যেখানে উপত্যকা ভূমিতে মিশিয়াছে সেখানে একটি বৃহৎ তোরণ—তার উপর দুইদিকের পাহাড় হইতে দুইটি প্রাচীর নামিয়া আসিয়াছে। এই তোরণ রুদ্ধ করিলেই বহির্জগতের সঙ্গে উপত্যকা ভূমির আর কোনও সম্পর্ক থাকে না। রেল লাইনের জন্য ইহার পাশেই পাহাড় কাটিয়া আর একটী পথ এবং টানেল প্রস্তুত করা হইয়াছে। ষ্টেশনের নিকটে প্রাচীর তোরণ,

প্রাচীর এবং গিরিশীর্ষে রক্ষীনিবাস দেখা গেল। শুনিলাম এখনও দোবারীর তোরণ প্রাচীন প্রথানুসারে প্রতি সন্ধ্যায় রুদ্ধ হয়, উপরের রক্ষীনিবাসে বাতি জ্বালাইয়া এখনও সমস্ত রাত রুদ্ধ পথ পাহারা দেওয়া হয়। দোবারী পরে আমাদের যে ভাবে দর্শন দিয়াছিল তা যথাস্থানে বলা হইবে।

দোবারীর পরেই উদয়পুর যখন পৌছিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। আমরা কোথায় যাই ঠিক ছিল না। শুনিয়াছিলাম কে একজন ফুলচাঁদজী 'ওয়াকীল' যাত্রীদের ঘরভাড়া দিয়া থাকেন, উজ্জয়িনী হইতে তাঁর নামে একটী চিঠিও পাঠান হইয়াছিল। একজন খাঁসাহেব সেই চিঠি লইয়া ষ্টেশনে হাজির ছিলেন। তাঁরই হাতে আমরা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি সরকার

উর্ণা-লোভী

শ্রীঅমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, বি-এল

মাকড়সা, তুই মুক্তা দিয়ে জাল বুনেছিস এই ভোরে,
কোন্ রূপসীর, কোন্ প্রেয়সীর কবরীকে বাঁধবিরে ?
পূব-গগনে বসে বসে আলাপনা দে রাঙিয়েছিস্,
কার পথের ধূলা ঢেকে ফুলের রাশি ছড়িয়েছিস্ ?
গেহ যে তোর মুখর রে আজ মদির-সুরের ঝঙ্কারে,
কোন্ মানিনীর মন ভুলাবি, কোন্ মোহিনীর, বল্‌না রে ?

রাতের শেষে, রঙীন বেশে, গোলাপ-কুঁড়ির বাস মেখে,
নিতুই আসে নেচে হেসে ঘাটে তোরে যায় দেখে ?
কালো শীতল সরের জলে,
নিরালা সে লীলায় খেলে,
নিঝুম বনে, আঁধার আলোয় পাহারা তুই দিস্ তাকে ?
তার সাথে তোর তাই বুঝি ভাব, তাই তরুণী মান রাখে ?

রাগিস্ নে ভাই, ভাবিস্ নে ভাই, কাছে আমি র'বই না,
কোন্ সে-দূরে থাকব স'রে, দেখা তারে দেব'ই না।
নুপুর পায়ের বাজ'বে কাণে,
তার সে সুবাস আস'বে ঘ্রাণে,
আড়াল হ'তেই দেখ'ব তারে, মোর দেখা সে পাবেই না।
তোর আয়োজন হবে সফল, আছি জানা যাবেই না।

মাকড়সা, তোর মণির যে জাল তারেই রে মোর ভয় করে
মোহন মণির মনের মাঝে কঠোর নিঠুর উর্ণারে !
তার সোহাগের পরশ মাগি যারাই তারে জড়িয়েছে,
উর্ণা-লোভী তাদের পেলব পায়েই শিকল পরিয়েছে।
মাকড়সা, তুই আদর ক'রে জাল পরাবি তন্বীরে,
মুক্তা টুটে উর্ণা না তোর তারেও করে বন্দীরে।

অদৃষ্টের পরিহাস

-গল্প-

—শ্রীমমতা মিত্র

বন্দীনগরে বাস ক'রত এক যুবক বণিক। তার নাম ললিত সেন। দু'খানা দোকান ও একটি বাড়ীর মালিক সে।

ললিতের চেহারা বেশ সুশ্রী। তার চুল মিশমিশে কালো ও কোঁকড়ানো। রঙ্গরসে ভরা তার প্রাণ। সঙ্গীতের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ। প্রথম যৌবনে পানদোষ ছিল, কিন্তু বিবাহের পর সুরাপান সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, ক্বচিৎ কখনো ভুলে মদ খেয়ে ফেলত।

তখন বসন্তকাল। দূরের এক মেলায় যাবার জন্য ললিত আত্মীয়-স্বজনের কাছে বিদায় নিচ্ছিল, স্ত্রী সুভাষিনী বল্‌ল, "দেখ, 'আজ নাই গেলে; তোমার সম্বন্ধে কাল রাত্রে বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।"

ললিত হেসে বল্‌ল, "যখনই আমি মেলায় যাই তুমি ভয় পাও যেন নেশা আমাকে পেয়ে ব'সবেই; সে দিন ত আর নেই।"

সুভাষিনী বল্‌ল, "জানিনা কিসের ভয়, কিন্তু ভারী খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম যেন তুমি সহর থেকে ফিরে এসেছ, আর তোমার চুল সব পেকে গেছে।"

ললিত হাস্‌ল। "এ ত ভাল স্বপ্ন! দেখো, যত মাল নিয়ে যাচ্ছি সবই বেচে ফিরব। ফেরবার সময় তোমার জন্যে মেলা থেকে ভাল কাপড় আনব।"

স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে ললিত চ'লে গেল।

মাঝ-পথে আর এক বণিকের সঙ্গে ললিতের দেখা; তাকে সে আগে চিনত। রাত্রে তারা দু'জনে এক সরাইয়ে আশ্রয় নিল। খাওয়া-দাওয়ার পর পাশাপাশি দু'টো ঘরে দু'জনে শুলো।

বেশীক্ষণ ঘুমনো ললিতের অভ্যাস ছিল না। ভোর হ'বার আগেই সে চালককে উঠিয়ে দিয়ে গাড়ী আনতে বলল।

সরাইয়ের মালিককে তার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে ললিত যাত্রা ক'রল।

প্রায় পঁচিশ মাইল পথ অতিক্রম করার পর ঘোড়াদের খাওয়াবার জন্য সে গাড়ী থামাল। সামনের সরাইয়ে ললিত একটু বিশ্রাম ক'রে নিল, তা'রপর কিছু খাবার গরম ক'রতে ব'লে বাইরে হাওয়ায় এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ সেখানে একটা গাড়ী দেখা গেল; ঘোড়ার গলার ঘণ্টা বাজছিল টুং টুং ক'রে। গাড়ী থেকে একজন রাজ-কর্ম্মচারী নামলেন, তাঁর পিছনে দু'জন চৌকিদার। ললিতের কাছে এসে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি করেন? কোথা থেকে আসছেন?"

ললিত সব কথার উত্তর দিল।

কর্ম্মচারী আবার জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কালকের রাত কোথায় কাটিয়েছিলেন? একলাই ছিলেন, না সঙ্গে আর এক বণিক ছিল? আজ সকালে সে বণিকের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল আপনার? ভোর হ'বার আগে সরাই থেকে চ'লে এসেছেন কেন?"

ললিত ত' অবাক! এত প্রশ্নের পর প্রশ্ন কেন? যা কিছু ঘটেছিল সে সব বিস্তারিত বর্ণনা ক'রল, শেষে বলল, "আমি কি চোর, না ডাকাত যে এত কথা জিজ্ঞেস ক'রছেন? নিজের কাজে আমি বেরিয়েছি, আমাকে এ ভাবে জেরা ক'রবার প্রয়োজন কি?"

তখন কর্ম্মচারী বললেন, "এ জেলার পুলিশ-কর্ম্মচারী আমি। যে বণিকের সঙ্গে কাল রাত কাটিয়েছ তাকে আজ গলা-কাটা অবস্থায় দেখা গেল, তাই এত কথা জিজ্ঞেস করলাম। তোমার সব জিনিস দেখতে চাই।" পুলিশ-কর্ম্মচারী তখন থেকে ললিতকে 'তুমি' সম্বোধন সুরু করলেন।

সকলে সরাইয়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পুলিশ কর্ম্ম-

চারী ও চৌকিদারেরা ললিতের গাঁট্রি খুলে দেখ্তে লাগ্লেন। হঠাৎ কর্ম্মচারী একখানা ছোরা দেখতে পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্লেন, "এ ছোরা কার?"

ললিত চেয়ে দেখ্ল। তার বাক্স থেকে রক্তমাখা ছোরা বেরুতে দেখে সে ভীত হ'ল।

"ছোরাতে রক্তের দাগ—এর মানে কি?"

ললিত উত্তর দিতে চেষ্টা ক'রল, কিন্তু একটিও কথা বলতে পারল না, কেবল অস্ফুট স্বরে বলল, "আমি-আমি ত' জানি না—আমার—নয়।"

পুলিশ-কর্ম্মচারী বল্লেন, আজ সকালে দেখা গেল বণিক বিছানায় পড়ে আছেন গলা কাটা অবস্থায়। তুমিই এ কাজ ক'রেছ। সরাই ভেতর থেকে তালা দেওয়া ছিল, আর কেউ সেখানে ছিল না। রক্তমাখা ছোরা তোমারই বাক্স থেকে বেরিয়েছে, তোমার মুখ ও ভাব-ভঙ্গী দেখে বুঝ্তে পারছি যে এ তোমারই কাজ। কি ক'রে তাকে হত্যা ক'রেছ? কত টাকাই বা চুরি ক'রেছ?"

ললিত শপথ ক'রে বলল যে, সে বণিককে হত্যা করে নি। রাত্রে আহারের পর বণিকের সঙ্গে আর দেখাই হয় নি। তার কাছে আছে কেবল তার নিজের আট হাজার মুদ্রা। ঐ ছুরিখানা তার নয়। কিন্তু বলতে বলতে কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল। মুখ বিবর্ণ হ'ল। আতঙ্কে থরথর ক'রে সে কাঁপতে লাগল, যেন বাস্তবিকই সে অপরাধী।

পুলিশ-কর্ম্মচারী ললিতকে বেঁধে গাড়ীতে তোলবার জন্য চৌকিদারদের আদেশ ক'রলেন। যখন তারা ললিতের হাতে পায় শিকল বেঁধে তাকে গাড়ীতে তুলে দিল তখন তার চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল ঝরতে লাগ্ল। তার টাকাকড়ি ও মাল কেড়ে নিয়ে নিকটবর্ত্তী সহরের কারাগারে তাকে আবদ্ধ করা হ'ল।

তার চরিত্র সম্বন্ধে খোঁজ নিতে যাওয়ায় বণিকেরা ও অন্য প্রতিবেশীরা বলল যে, অল্প বয়সে সে মদ খেত, কিন্তু এখন সে লোক ভালই। তা'রপর বিচার আরম্ভ হ'ল, বণিককে হত্যা করার ও কুড়ি হাজার মুদ্রা ডাকাতি ক'রে কেড়ে নেওয়ার অপরাধে ললিত অভিযুক্ত হ'ল।

ললিতের স্ত্রী সব শুন্‌ল। ছেলেমেয়েরা সবাই ছোট ছোট; সকলের ছোটটি চারমাসের শিশু। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সুভাষিনী একদিন কারাগারে স্বামীকে দেখ্তে গেল। প্রথমে দেখা করবার অনুমতি পেল না, শেষে অনেক মিনতির পর তার আবেদন মঞ্জুর হ'ল। কারাগারের পরিচ্ছদে, শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও চোরেদের সঙ্গে উপবিষ্ট স্বামীকে দেখে সুভাষিনী চৈতন্য হারাল। বহুক্ষণ পরে তার জ্ঞান হ'ল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তখন সে স্বামীর কাছে ব'সল। আস্তে আস্তে সে বাড়ীর খবর তাকে জানাল ও তার কি ঘটেছিল জিজ্ঞাসা ক'রল। ললিত তাকে সব কথা বলল।

"আমরা এখন কি করব?" সুভাষিনী জিজ্ঞাসা করল।

"আমরা ওপরওয়ালার কাছে দরখাস্ত ক'রব যাতে নির্দ্দোষ লোকের অকারণ শাস্তিভোগ না হয়।"

সুভাষিনী বলল, সে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল, কিন্তু তা' অগ্রাহ্য হ'য়েছে।

ললিত উত্তর দিল না, শুধুই চোখ নীচু ক'রে রইল।

তখন সুভাষিনী বলল, "তোমার মনে পড়ে আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম,—তোমার চুল পেকে গেছে? সেদিন তোমার বেরুনো উচিত হয় নি।" স্বামীর চুলের ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে সে মৃদুকণ্ঠে বলল, "সত্যি বল, তুমি কি এ কাজ করেছ?"

"তা'হ'লে তুমি আমায় সন্দেহ ক'রছ!" ললিত দু'হাতে মুখ ঢেকে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রতে লাগ্‌ল।

একজন কর্ম্মচারী এসে জানাল যে, এইবার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের যেতে হবে। তারা ললিতের কাছ থেকে চির বিদায় নিল।

তারা চ'লে গেল। কি কথা হ'য়েছিল ললিত ব'সে ব'সে মনে করতে লাগ্ল। যখন মনে পড়্ল তার স্ত্রীও তাকে সন্দেহ করছে তখন ভাব্ল, "বোধ হয় একমাত্র ঈশ্বরই সত্যি কথা জানতে পারেন; তাঁরই কাছে শুধু প্রার্থনা ক'রব, তাঁর কাছ থেকেই কেবল দয়া আশা করি।"

ললিত আর আবেদন-পত্র লিখল না, সব আশা ছেড়ে দিয়ে শুধুই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রতে লাগল।

ললিতের দণ্ড হ'ল বেত্রাঘাত। তাকে খনিতে পাঠান

হ'ল। কশাঘাত করায় তা'র দেহে অনেক ঘা হ'য়ে গেল। ঘা সেরে যাবার পর অপর অপরাধীদের সঙ্গে সে দ্বীপান্তরে প্রেরিত হ'ল।

ছাব্বিশ বছর ললিত বাস ক'রল আন্দামানে। তা'র চুল দুধের মত শাদা হ'য়ে গেছে, তা'র দাড়ি এখন সুদীর্ঘ, শুভ্র। তা'র সব আনন্দ চ'লে গেছে, নীচু হ'য়ে ধীরে ধীরে হাঁটে, কথা বলে না, কখনও হাসে না, প্রায় সর্ব্বদাই প্রার্থনা করে।

কারাগারে ললিত জুতা তৈরী ক'রতে শিখেছিল, তা'তে কিছু অর্থ উপার্জ্জন ক'রে তাই দিয়ে সে 'পুণ্যাত্মাদের জীবনী, নামক পুস্তক কিনেছিল। কারাগারে আলো থাকলে সেখানে সে বইটা পড়ত।

কারাগারের কর্ত্তারা ললিতের নম্রতার জন্য খুবই তাকে পছন্দ ক'রতেন। অপর বন্দীরা তাকে সম্মান ক'রত, এবং 'ঠাকুর্দ্দা' ব'লে ডাকত। যখন তাদের কোন কিছুর জন্য কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করবার দরকার হ'ত তারা ললিতকে তাদের প্রতিনিধি কর'ত এবং তাদের মধ্যে ঝগড়া হ'লে সুবিচার ও মীমাংসার জন্য তারা ললিতের কাছে আসত।

বাড়ীর খবর ললিত কিছুই পেত না, এমন কি তার স্ত্রী ও সন্তানেরা বেঁচে আছে কি না তা'ও জানত না।

একদিন একদল নতুন অপরাধী কারাগারে এল। সন্ধ্যা বেলা পুরোনো বন্দীরা নতুনদের এক জায়গায় জড় ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রল,—কোন্ সহর বা গ্রাম থেকে তারা এসেছে, কি জন্যই বা তাদের এই দণ্ড হ'য়েছে। ললিত আগন্তুকদের কাছে নতমুখে ব'সে তাদের কথা শুনছিল।

তাদের মধ্যে একজন লম্বা, বলিষ্ঠ, তার বয়স ষাট, ঘন শাদা দাড়ি। সে কি জন্য ধৃত হ'য়েছে সেই গল্প ক'রছিল।

সে বলল, "একখানা গাড়ী থেকে কেবল একটি ঘোড়া আমি খুলে নিয়েছিলুম, চুরির অপরাধে আমায় ধরে নিয়ে গেল। বললুম, শীগ্‌গির বাড়ী পৌঁছবার জন্যে ঘোড়াটা নিয়েছি, তারপর ছেড়ে দেব; তা' ছাড়া চালক আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তারা সে কথায় কর্ণপাত ক'রল না, বলল, 'না, তুমি চুরি করেছ।' কিন্তু কি ক'রে কোথায় চুরি ক'রেছি তা' বলতে পারল না। এক সময়ে বাস্তবিকই খুব বড় অপরাধ করেছিলুম, ন্যায়তঃ অনেক আগেই এখানে আসা উচিত ছিল, কিন্তু সে সময়ে ধরা পড়ি নি। এখন মিছামিছি এখানে আসতে হ'য়েছে...না, আমি মিথ্যে কথা বলছি; আগে একবার আন্দামানে এসেছিলুম, তবে বেশী দিন থাকি নি।"

"কোথা থেকে এসেছ?" একজন জিজ্ঞাসা ক'রল।

"বন্দীনগর থেকে। আমার আত্মীয় স্বজন সেই সহরেই আছেন। আমার নাম নরেশ দাস।"

ললিত মাথা তুলে বলল, "ঐ সহরের বণিক ললিত সেনেদের খবর কিছু জান? তারা কি বেঁচে আছে এখনও?"

"তাদের জানি না? অবশ্য জানি। সেনেরা ধনী লোক, যদিও তাদের বাপ আন্দামানে আছে, আমাদের মতই বোধ হয় সে পাপী। তোমার কথা এবার বল, ঠাকুর্দ্দা। কি ক'রে এখানে এলে তুমি?"

ললিত নিজের দুর্ভাগ্যের কাহিনী বলা পছন্দ করল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুধু বলল, "পাপের জন্যে এখানে ছাব্বিশ বছর আছি।"

"কি পাপ?" নরেশ জিজ্ঞাসা করল।

ললিত কিছু বলল না, তার সঙ্গীরা আগন্তুকদের জানাল কি ক'রে ললিত আন্দামানে এসেছিল; কে এক লোক একজন বণিককে হত্যা ক'রে ছোরাখানা ললিতের জিনিসের মধ্যে রাখে, তা'রই ফলে তাকে এই দণ্ড ভোগ ক'রতে হ'চ্ছে।

নরেশ স্থিরভাবে শুনল। ললিতের মুখের দিকে চেয়ে ব'লে উঠল, "আশ্চর্য্য ত'! বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক। কিন্তু তুমি কি রকম বুড়ো হ'য়ে গেছ, ঠাকুর্দ্দা!"

সকলে জিজ্ঞাসা করল,—সে কেন এত বিস্মিত হ'ল, আগে কি ললিতকে কখনও দেখেছে? নরেশ দাস সে কথার উত্তর দিল না, শুধু বলল, "আমাদের যে এখানে দেখা হ'বে তা' ভাবি নি।"

নরেশের কথা শুনে ললিত অবাক হ'য়ে গেল। এ লোকটি কি জানে, কে সেই বণিককে মেরেছিল? সে

নরেশকে বলল, "বোধ হয় তুমি এ ঘটনার কথা শুনেছিলে তখন, নয়ত আগে কোথাও আমাকে দেখে থাক্‌বে।"

"না, শুনেছিলুম। পৃথিবীটা ত' গুজবে ভরা। কিন্তু সে অনেকদিন হ'ল, কি শুনেছিলুম ভাল মনে নেই।"

"হয়ত তুমি শুনেছিলে কে সেই বণিককে হত্যা ক'রেছিল ?" ললিত প্রশ্ন ক'রল।

নরেশ হেসে উঠ্‌ল। "যার বাক্স থেকে ছোরা বেরিয়েছিল সেই নিশ্চয়। যদি আর কেউ ছোরা সেখানে লুকিয়ে রাখ্‌ত তাহ'লে যতক্ষণ না তাকে ধরা যাচ্ছে 'তা'কে' চোর বলা যায় না,—এই ত' কানুন। তোমার মাথার নীচে পাঁটরির ভেতর কি ক'রে লোকে ছোরা রাখ্‌তে পারে ? অসম্ভব ! তা'হ'লে তুমি নিশ্চয় জেগে উঠ্‌তে।"

ললিতের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল, এই লোকই বণিককে হত্যা ক'রেছিল। ভারাক্রান্ত মনে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। সারারাত সে জেগে কাটাল। কতরকম কথা তা'র মনে হ'তে লাগল। স্ত্রীকে মনে প'ড়ল ; জেলায় যাবার সময় সে তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল। মনে হ'চ্ছে যেন সে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার মুখ চোখ যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ; ঐ না সে শুনতে পাচ্ছে তার কথা, তার হাসির শব্দ ! তা'রপর সে ছেলেমেয়েদের দেখ্‌তে পে'ল, সবাই ছোট ছোট, যেমন সেই সময়ে ছিল ; ছোটটি সবে চার মাসের। তার নিজেকে মনে হ'ল ; সদানন্দ-প্রকৃতি সুন্দর যুবক—ভাবনা-চিন্তা-রহিত, সরাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্য দেখছিল, সেই সময়ে হত্যাপরাধে সে ধৃত হ'ল। মানস-চোখে সেই জায়গা দেখ্‌তে পেল যেখানে তাকে কশাঘাত করা হ'য়েছিল, চারিদিকে লোক দাঁড়িয়ে। শৃঙ্খল, বন্দীর দল, ছাব্বিশ বছরের সুদীর্ঘ কারাগার-জীবন, তার অকাল-বার্দ্ধক্য—এই সব চিন্তায় তার মন এত খারাপ ও অশান্তিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল যে আত্মহত্যা ক'রবার জন্য সে প্রস্তুত হ'ল।

"এ সব ঐ পাজিটার কাজ !" ললিত মনে মনে বলল। নরেশ দাসের ওপর তার অত্যন্ত রাগ হ'তে লাগল ; প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা তাকে অভিভূত ক'রে ফেলল ; এতে প্রাণ যায় সেও ভাল। সারারাত সে প্রার্থনা করল, কিন্তু একটুও শান্তি পেল না। দিনের বেলা নরেশের সামনে সে যেত না, এমন কি তার দিকে তাকা'ত না পর্য্যন্ত।

এই ভাবে পনেরো দিন কেটে গেল। রাত্রে ললিত ঘুমোতে পারে না, সর্ব্বদাই বিষণ্ণ হ'য়ে থাক্‌ত ; কি করবে কিছুই বুঝতে পারত না।

একদিন রাত্রে ললিত কারাগারের চারিধারে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ চোখে প'ড়ল খানিকটা মাটি। বন্দীদের একটা খাটিয়ার নীচে দেয়ালের গা ঘেঁসে অনেকখানি মাটি খুঁড়ে সরু পথ কে তৈরী ক'রেছে।

কি ব্যাপার দেখবার জন্য সে থাম্‌ল। খাটিয়ার নীচে থেকে সহসা নরেশ দাস হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। ললিতকে দেখে তার মুখে চোখে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে উঠ্‌ল। ললিত তার দিকে না চেয়ে চ'লে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু নরেশ তার একখানা হাত চেপে ধ'রে বলল যে দেয়ালের নীচে সে গর্ত্ত খুঁড়্‌ছে, যখন অপর বন্দীরা বাইরে কাজ করে তখন সে দেয়াল খোঁড়ে।

আরও বলল,—"তুমি কিছু প্রকাশ ক'রনা, তা'হ'লে তুমিও এখান থেকে বেরুতে পারবে। যদি গোলমাল কর ত' ওরা কশাঘাত ক'রে আমার প্রাণ বা'র ক'রে দেবে, কিন্তু তোমায় আগে মেরে তবে মরব, জেনে রাখো।"

রাগে ললিত কাঁপ্‌তে লাগল্‌। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "পালাবার ইচ্ছে আমার নেই, আর আমাকে মারবারও তোমার কিছু দরকার নেই ; তুমি ত আমায় অনেক আগেই মেরে রেখেছো।"

পরদিন যখন বন্দীরা কাজ ক'র্‌ছিল, প্রহরীরা দেখ্‌ল —কোন বন্দী খানিকটা মাটি খুঁড়েছে। কারাগার অনুসন্ধান করার পর একটা সুড়ঙ্গ দেখা গেল। গভর্ণর এলেন। যে গর্ত্ত খুঁড়েছে, তাকে খুঁজে বের ক'রতে বন্দীদের আদেশ দিলেন। কেউ স্বীকার ক'রল না। দু'চারজন জানত নরেশ অপরাধী, তাকে আধ-মরা ক'রে ফেলবে এই ভেবে কথাটা তারা প্রকাশ ক'রল না। শেষে

গভর্ণর ললিতের দিকে চেয়ে বল্লেন, "তুমি সত্যবাদী, জানি তুমি মিথ্যে কথা বল্বে না, শপথ ক'রে বল কে গর্ত্ত খুঁড়েছে?"

নরেশ দাস উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে। ললিতের ঠোঁট ও হাত কাঁপতে লাগ্‌ল, অনেকক্ষণ সে কথা বল্‌তে পারল না। ভাব্‌ল—"যে আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে তাকে কেন আমি রক্ষা করি? আমি যে যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছি এখন ও' তার দাম দিক্‌। কিন্তু যদি আমি ব'লে দিই তা'হ'লে ওকে বোধ হয় মেরেই ফেলবে। কিন্তু এমনও ত হ'তে পারে আমি ওকে অন্যায় সন্দেহ ক'রেছি। তা' ছাড়া নাম প্রকাশ ক'রে আমারই বা উপকার হ'বে কি?"

গভর্ণর আবার বললেন, "সত্যি বল, কে দেয়ালের নীচে খুঁড়েছে?"

নরেশের দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে ললিত বল্‌ল—"বল্‌তে পারি না, হুজুর। আমাকে নিয়ে যা খুসি করুন, আমি আপনার হাতের মুঠোয়।"

গভর্ণর অনেক চেষ্টা ক'রলেন, কিন্তু ললিত আর কোন কথা বল্‌ল না। কাযেই ব্যাপারটা চাপা প'ড়ে গেল।

সেদিন রাত্রে ললিত বিছানায় শুয়ে সবে ঝিমুতে সুরু ক'রেছে, সেই সময় একজন নিঃশব্দে এসে তার বিছানায় ব'স্‌ল। অন্ধকারে কিছুক্ষণ চেয়ে ললিত নরেশ দাসকে চিন্‌তে পারল।

ললিত বল্‌ল, "আমার কাছ থেকে আর কি চাও তুমি? কি জন্যে এখানে এসেছ?"

নরেশ দাস নীরব। ললিত উঠে ব'সে ব'ল্‌ল, "কি চাও? চ'লে যাও শীগ্‌গির, নইলে প্রহরীকে ডাকব।"

নরেশ ললিতের কাছে নীচু হ'য়ে অস্ফুট স্বরে বল্‌ল, "আমায় ক্ষমা কর।"

"কি জন্যে?"

"আমিই বণিককে হত্যা ক'রে ছুরি তোমার গাঁঠরির ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলুম। তোমাকেও মারব মনে ক'রেছিলুম, কিন্তু বাইরে শব্দ শুনতে পেয়ে ভয় হ'ল, ছুরিখানা তোমার জিনিসের মধ্যে রেখে তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলুম।"

ললিত চুপ ক'রে রইল, কি বল্‌বে ভেবে পেল না। নরেশ দাস বিছানা থেকে নাম্‌ল, মাটিতে হাঁটু গেড়ে ব'সে বল্‌ল, "ক্ষমা কর! ঈশ্বরের দোহাই, ক্ষমা কর। আমি স্বীকার ক'রব যে বণিককে হত্যা ক'রেছিলুম আমিই, তা'হ'লে তুমি ছাড়া পেয়ে বাড়ী চ'লে যেতে পারবে।"

"তোমার পক্ষে এ কথা বলা সোজা, কিন্তু তোমার জন্যেই ছাব্বিশ বছর আমি অসহ্য কষ্ট ভোগ ক'রছি। এখন আমি কোথায় যাব?...স্ত্রী মারা গেছে, ছেলেমেয়েরা আমায় ভুলে গেছে। কোথাও আমার যাবার জায়গা নেই।..."

নরেশ উঠ্‌ল না, মাটিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে চীৎকার ক'রে বল্‌ল,—"ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। জলন্ত লোহা দিয়ে যখন ওরা আমায় মেরেছিল তা' সহ্য ক'রতে পেরেছিলুম, কিন্তু তোমার এ অবস্থা চোখে দেখতে পারছি না... তুমি দয়ালু, সকালে নাম প্রকাশ না ক'রে আমাকে রক্ষা ক'রেছ; তার যোগ্য আমি নই। ঈশ্বরের দোহাই, আমায় ক্ষমা কর।" সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌ল।

তাকে কাঁদ্‌তে দেখে ললিতেরও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। চোখ মুছে সে বল্‌ল, "ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করুন। হ'তে পারে ত আমি তোমারও চেয়ে শতগুণে খারাপ।" এই কথা বলার সঙ্গেসঙ্গে তার মন হাল্কা হ'য়ে গেল, বাড়ী যাবার আকাঙ্ক্ষাও চলে গেল। সে তার শেষ সময়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ললিতের নিষেধ সত্ত্বেও নরেশ তার দোষ স্বীকার ক'র্‌ল। যখন মুক্তির আদেশ এল, তখন দেখা গেল ললিতের প্রাণহীন দেহ মাটীতে পড়ে'। *

শ্রীমমতা মিত্র

* Tolstoy

বুদ্ধ ও আনন্দ

ভ্রাতৃভক্তির প্রতীক লক্ষ্মণ—ইহাই সাধারণ ধারণা। আবহমান কাল প্রচলিত এই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য লক্ষণের স্থায্য প্রাপ্য তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ভ্রাতা ভরত লক্ষণের অপেক্ষা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিতে ন্যূন নহেন। তাঁহার মাতা কৈকেয়ীর নীচ স্বার্থপরতা ভরতকে লোকচক্ষে নিষ্প্রভ ও হীন করিয়া রাখিয়াছে।

ভ্রাতৃভক্তির জন্ত দুঃখবরণে লক্ষণ যেমন বরণীয় হইয়াছেন গুরুভক্তির জন্ত বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য আনন্দও তেমনই নমস্ত। পিতা দশরথের সত্য-পালনে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র বনবাসী হন, লক্ষণ ভ্রাতার অনুসরণ করেন: আর আনন্দ কপিলাবস্তুর সিংহাসনে আরূঢ় হইবার বাসনা ত্যাগ করেন।—গুরুভক্তি প্রনোদিত হইয়া।

আনন্দের গুরুভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান সকলেরই পরিচিত, কিন্তু তাঁহার জীবনের উপরোক্ত ধারা সাধারণতঃ অজ্ঞাত।

তথাগত সংসার বর্জ্জন করিলে তাঁহার পুত্র রাহুল পরে কপিলাবস্তুর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনিও পিতার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক বৈরাগী হইলে বৃদ্ধ নৃপতি শুদ্ধোধন আনন্দকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। আনন্দ বোধিসত্ত্বের খুল্লতাত অমৃতধনের পুত্র। আনন্দের সিংহাসনে আরোহণের জন্ত উৎসবাদি অনুষ্ঠানের সকল ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইল। রাজা শুদ্ধোধন স্বয়ং বিস্তৃত আয়োজনে ব্যস্ত, আনন্দের পিতা এবং বহু অনুরোধে গৌতমও তাহার সহায়ক। রাজ্যাভিষেকের দিনে আনন্দের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

আনন্দ তথাগতের সহিত নির্জ্জনে জিজ্ঞাসু হইয়া সত্যের প্রকাশ বাঞ্ছা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজৈশ্বর্য্যে ও বিলাসীর জীবনে প্রকৃত সুখ আছে কি? যদি থাকে আপনি তাহা পরিত্যাগ করিলেন কেন?" তথাগত কিছুক্ষণ চিন্তার পর বিভ্রাটে পড়িলেন। পিতা শুদ্ধোধনের প্রাণে আবার নৈরাশ্য সঞ্চার করিবেন কিরূপে এই তাঁহার সঙ্কট, কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া তুষ্ণীভাব ধারণ করিলেন। আনন্দ সবই বুঝিলেন, রাজত্বের লোভ পরিহার করিয়া বোধিসত্ত্বের অনুগমন করিলেন—নিবিড় অরণ্যে। একদিকে সিংহাসন, অপরদিকে গহন কানন—এই ত্যাগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিরল।

জ্ঞানযোগীর শ্রীমুখে সত্যের সন্ধান পাইয়া আনন্দ তখন প্রার্থনা জানাইলেন যে, তাহাকে সর্ব্বদাই তাঁহার সমভিব্যাহারে আজীবন রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ অসম্মত হইলেও বুদ্ধদেব ভক্তের এই প্রার্থনায় অবশেষে স্বীকৃত হইলেন। আনন্দও দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল বোধিসত্ত্বের সঙ্গলাভে কৃতার্থন্মন্য হইয়াছিলেন। এমন কি একদিনের জন্তও পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটে নাই। এজন্ত আনন্দকে বুদ্ধদেবের 'নয়নের মনি' আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

আনন্দের প্রতি রাজা প্রসেনজিত প্রভৃতির শ্রদ্ধা প্রচুর ছিল। বৌদ্ধ-সঙ্ঘের শীর্ষস্থানীয় স্থবিরদের ভিতর হইতে আনন্দই রাজপরিবারভুক্ত রমণীদিগের শিক্ষক নিযুক্ত হন। আনন্দেরই নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ভগবান বুদ্ধ নারীদিগকে নিজ ধর্ম্মের ক্রোড়ে আশ্রয় দিতে সম্মত হন এবং ভিক্ষুণীদের জন্য সন্ন্যাসিনী-আশ্রম স্থাপন করিতে আদেশ দেন। গুরুদেবের প্রতি আনন্দের আনুরক্তি এত প্রবল ছিল যে তাঁহার জন্য স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও তিনি উদ্যত হন। 'খুল্ল-হংস-জাতকে' প্রকাশ—শাক্যকুলের দেবদত্ত শাক্যসিংহের প্রাণনাশের জন্য নৃপতি অজাতশত্রুর সহিত ষড়যন্ত্র করেন এবং ভয়াল মদমত্ত রাজহস্তীকে বুদ্ধদেবের আগমন-পথে ছাড়িয়া দেন। মাতঙ্গ তখন ভীষণভাবে বুদ্ধদেবকে আক্রমণ করে। আনন্দ তৎক্ষণাৎ উভয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হন। তথাগত তখন ঐশী শক্তিবলে হস্তীকে পরাভূত করিয়া আনন্দের প্রাণরক্ষা করেন।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ-লাভের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে আনন্দ কুশীনগরে শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন, নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অমিতাভ তাহা দেখিয়া মুমূর্ষু অবস্থার দীন সঞ্চয় পূর্ব্বক আনন্দকে ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন—"বৃথাই দীর্ঘকাল আমার সঙ্গে একত্র অবস্থান করিলে, আনন্দ। ক্ষয় ও লয় যে জীব ও জড়ের অন্তর্নিহিত, তাহা কি ভুলিয়া গেলে? হউলই বা বুদ্ধ, সৃষ্টির সনাতন নিয়ম হইতে নিস্তার কাহারও নাই। তথাগতের পার্থিব দেহ তোমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে তিরোহিত হইলে তোমারই পক্ষে মঙ্গল, কারণ ঐ আসক্তিই তোমাকে নিম্নগামী করিতেছে।"

জ্ঞানগর্ভ তিরস্কারে আনন্দ শোক ও বেদনা পরিহার করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বোধি-সত্ত্বের চিরবিরহের সম্ভাবনা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। তিনি দূরে একটি শাল্মলী বৃক্ষতলে গোপনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। জনকয়েক ভিক্ষু কিন্তু তাহা দেখিতে পান।

ইহার পর রাজগৃহে পাঁচশত অর্হতের যে বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধিবেশন হয় সকলেরই এই ধারণা ছিল যে, বৈঠকে আনন্দের উচ্চাসন নির্দ্দিষ্ট হইবে, কারণ বুদ্ধদেবের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট থাকার অধিকার অপর কাহারও ঘটে নাই। তাহা কিন্তু হইল না; এমন কি সঙ্ঘে প্রবেশাধিকারেও তিনি বঞ্চিত হইলেন। সভাপতি শ্রদ্ধেয় মহাকাশ্যপ বলিলেন—"সে এখনও কোমলমতি বালক। তথাগতের পরিনির্ব্বাণ কালে তাহাকে রোরুদ্যমান দেখা গিয়াছিল। অপর বিষয়ে তাহার যোগ্যতা থাকিতে পারে, কিন্তু সম্মুখে যে মহাব্রত সে বিষয়ে অর্হৎদিগের সহযোগিতা করিতে সে অনুপযুক্ত।

বুদ্ধদেবের নশ্বর দেহের প্রতি আনুরক্তি ত্যাগ করিতে এবং পার্থিব বিষয়ের অসারতা উপলব্ধি করিবার ধ্যান করিতে তাঁহাকে সময় দেওয়া হইল। ধ্যানান্তে মহাকাশ্যপ ও অন্যান্য পরম জ্ঞানী অর্হতেরা আনন্দকে নানাবিধ প্রশ্নোত্তরে পরীক্ষা করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, কঠোর পরীক্ষায় আনন্দ উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন তাঁহাকে সেই মহা-সম্মেলনে যথাযোগ্য স্থান ও সম্মান প্রদত্ত হইল।

আনন্দের ন্যায় ভক্তশিষ্যের প্রতি এই যে কঠিন আচরণ তাহা বৌদ্ধ-সঙ্ঘের একটি মাত্র উদাহরণ নয়। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা সর্ব্বাগ্রে—বিদ্যা, বুদ্ধি, হৃদয়বত্তার স্থান গৌণ—ইহাই প্রাচীন বৌদ্ধযুগের প্রচলিত অনুশাসন।——কঃ।

কাশীর হস্তী-কঙ্কাল

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী, এম্-এস্-সি

কার্ত্তিক মাসের 'বিচিত্রার দপ্তরে,' 'কাশীতে লক্ষ বর্ষের হস্তী-কঙ্কাল' নামে যে প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। 'বঙ্গবাণী' পত্রে এই সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, 'বিশ্বামিত্র' বোধ হয় তাহা হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।*

উক্ত কঙ্কাল বারাণসী ধাম হইতে অনুমান চল্লিশ মাইল দূরে প্রহ্লাদপুর গ্রামের সন্নিকটে গঙ্গাতটে গ্রামবাসীরা প্রথম দেখিতে পায়। কঙ্কালের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আয়তন হইতে তাহারা মনে করিয়াছিল উহা হিরণ্যকশিপুর আমলের কোন দৈত্যের কঙ্কাল। হস্তীর কঙ্কাল বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। নিকটবর্ত্তী থানার দারোগা জনৈক গ্রামের মোড়লকে চর্ব্বণোপযোগী (চোয়ালের) দুইটি দন্ত উঠাইয়া লইয়া তাহার গৃহে রাখিয়া দিতে বলেন। তাহাই করা হয়। কয়েক মাস পরে জনৈক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কার্য্যোপলক্ষে ঐ গ্রামে উপস্থিত হইয়া মোড়লের গৃহদ্বারের পার্শ্বে উক্ত দন্তের একটি দেখিতে পান (অপরটি নিরুদ্দেশ)। তিনি উহা লইয়া যান ও স্থানীয়-ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গচ্ছিত রাখেন। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং ঐ ঘটনাস্থলে যান নাই। উহা বৈজ্ঞানিকদের কোন কাজে লাগিতে পারে এরূপ বিবেচনা করিয়া স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে সংবাদ প্রেরণ করেন ও পরে উহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করেন। আমাদের অনুরোধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ববিভাগে উহা দান করেন। সমগ্র কঙ্কালটি পরিদর্শন করিতে আমি

* বিশ্বামিত্র প্রবন্ধে ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—বিঃ সঃ

একজন বিদ্যার্থী সহ (আমরা প্রত্নতত্ত্ববিভাগের নহি—ভূতত্ত্ববিভাগের) ঐ গ্রামে যাই, কিন্তু জলপ্লাবনের জন্য আমরা কঙ্কালের কোন অংশই দেখিতে পাই নাই। প্রত্নজীবতত্ত্বে আমার বিশেষ অনুরাগ আছে বলিয়া আমার উপরই উক্ত দন্তের গবেষণার ভার অর্পণ করা হয়। এই সম্পর্কে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া করা হয় নাই। ইহা যে শিলীভূত হইয়া গিয়াছে তাহা সাধারণ পদার্থ-বিদ্যার সাহায্যেই নির্দ্ধারণ করা যায়। গবেষণার ফল-সম্বলিত এক প্রবন্ধ আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে নাগপুর ভারতীয় বিজ্ঞান-সম্মিলনীর অষ্টাদশ অধিবেশনে পঠিত হইবে। সম্পূর্ণ তথ্য তৎপূর্ব্বে প্রকাশ করা সমীচীন হইবে না।

উক্ত দন্ত উপরের বাম-চর্ব্বণোষ্ঠ-সংলগ্ন পেষণ দন্ত (molar tooth) উহা প্রায় ১৬ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৪½ ইঞ্চি প্রশস্ত। তাহার গঠন বর্ত্তমান হস্তীর দন্ত হইতে ভিন্ন। ইহাকে হস্তীর পূর্ব্বপুরুষের দন্ত বলা যাইতে পারে। তাহাদের বংশ জগৎ হইতে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উহার আয়তন বর্ত্তমান হস্তীর প্রায় দ্বিগুণ। উক্ত হস্তীর কঙ্কাল কত বৎসরের প্রাচীন তাহা নির্ণয় করিবার কোন সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নাই। তবে স্থূল হিসাবে বলা যায় ইহা অর্দ্ধলক্ষ বৎসরের অধিক ও তিন লক্ষ বৎসরের অনধিক প্রাচীন হওয়া সম্ভব। কাশী সহরের সহিত ও হিন্দু-সভ্যতার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই; ইহা হইতে হিন্দু-সভ্যতার প্রাচীনত্ব নিরূপণ করা চলে না।

এই প্রসঙ্গে জীবের ক্রমবিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। পুরাণে মনুষ্যের আকার সম্বন্ধে যাহাই বর্ণিত থাকুক, আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, প্রাচীন যুগের মনুষ্য হইতে আধুনিক মনুষ্য আকারে খর্ব্ব। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ভূ-স্তর হইতে যে সমস্ত নর-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভিতর এমন একটিও কঙ্কাল নাই যাহা হইতে প্রমাণ করা যায় যে প্রাচীন যুগের মনুষ্য আকারে বিশালতর ছিল।* অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের দৃঢ়তর গঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সাধারণতঃ অপর বিশালকায় প্রাণীর কঙ্কাল নরকঙ্কাল বলিয়া ভুল করা হয় কারণ মস্তক ব্যতীত কঙ্কালের অপর সমস্ত অংশে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা বিশেষজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব। যদিও হস্তীর পূর্ব্বপুরুষ তুষার-যুগে (অনুমান লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে) বৃহত্তর আকার ধারণ করিয়াছিল, সমস্ত জীবজন্তুর সম্বন্ধে ইহা বলা চলে না যে পূর্ব্বপুরুষ আকারে বৃহত্তর ছিল।

ক্রমবিবর্ত্তন উন্নতির পথেও চলিতে পারে, অবনতির পথেও চলিতে পারে। জীবনের চরম উদ্দেশ্য জীবন-স্রোতকে প্রবহমান রাখা। মুখ্য উদ্দেশ্য—নিজকে পালন করা, শত্রু বা ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষা করা এবং সন্তান প্রজনন দ্বারা জাতি সংরক্ষণ করা। শেষোক্ত তিন উদ্দেশ্য উত্তমরূপে

* প্রাচীন যুগ বহু দূরের কথা; তবে আমাদের স্বল্পায়ু অভিজ্ঞতা এই যে, বাল্যে দীর্ঘকায় যত নরনারী দেখিয়াছি এখন তদপেক্ষা অনেক কম দেখিতে পাই। এ সম্বন্ধে লেখকের বিস্তৃত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। বিঃ সং

লাভ করিবার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও তাহার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক অবস্থা ও ধর্ম্ম সংবিধান করিয়া লইবার একটা অবিরাম চেষ্টা স্বভাবতঃ জীবের ভিতর বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত ফললাভের জন্য যে সকল গুণ পুরুষ পরম্পরায় উপযোগী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জীব উত্তরাধিকার সূত্রে বংশগতভাবে তাহা লাভ করে। কিন্তু সময়ের স্রোতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। নূতন অবস্থার সহিত সংযোজন করিয়া লইবার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও তাহাদের ধর্ম্ম তদনুসারে বিবর্ত্তিত হয়। প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন যত দ্রুততালে চলিবে, জীবন-সংগ্রাম যত কঠিন হইবে, জীবের ক্রমবিবর্ত্তনও তত দ্রুততালে চলিবে। স্ব স্ব বিবর্ত্তনের উপযোগিতা অনুসারে কেহ জয়ী হইবে, কেহ সবংশে লুপ্ত হইবে। অত্যধিক উৎকর্ষ দ্বারা অঙ্গবিশেষের বৃদ্ধিসাধন হইতে পারে; এক যুগে হয়ত ঐ বৃদ্ধি প্রচুর কল্যাণ সাধন করিবে, আবার অবস্থার পরিবর্ত্তনে পরবর্ত্তী যুগে ঐ বৃদ্ধিই হয়ত মৃত্যুর হেতু হইয়া দাঁড়াইবে। অনুমান [illegible] কোটি বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত, জীব-জগতের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য যুগে (Mesozoic Era) অতিকায় সরীসৃপজাতি প্রায় বার কোটি বৎসর যাবৎ জলে স্থলে আকাশে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিল, আজ তাহাদের বংশ পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত। মধ্যযুগের অবসানে যে বিরাট প্রলয় হয় তাহার ফলে ইহাদের বিনাশ-প্রাপ্তি হয়—অতিবৃহৎ আকারই এই বিনাশের হেতু (৪০ গজের অধিক দীর্ঘ কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে)। দেহের আয়তন বৃদ্ধির অনুপাতে মস্তিষ্কের আয়তন-বৃদ্ধি জীবের উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। কেবল দেহের আয়তন হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না। মস্তিষ্কের পরিমাণ ও তাহার উৎকর্ষই শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ। ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

হস্তীর বিবর্ত্তন-কাহিনী বিশেষ চিত্তাকর্ষক। অনুমানে চার কোটি বৎসরের পুরাতন ভূ-স্তরে হস্তীর আদি-পুরুষের প্রথম চিহ্ন পাওয়া যায়। ঐ সময়ে তাহাদের দেহের আয়তন বরাহের সমান ছিল, মস্তক দীর্ঘাকৃতি ছিল, শুণ্ডের কোন অস্তিত্ব ছিল না, গজদন্ত (tusk) অপর দন্তের তুলনায় বিশেষ বড় ছিল না। ক্রমশঃ দেহের আয়তন-বৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে মস্তক খর্ব্বাকৃতি হইতে থাকে, শুণ্ড দীর্ঘতর হইতে থাকে ও মুখের সম্মুখভাগের চারটি ছিলাকৃশ দন্ত বৃহদাকারে বাহির হইয়া আসে। নিম্নপংক্তির ছিলাকৃশ দন্তদ্বয় ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হইতে থাকিয়া বর্ত্তমান যুগের হস্তীতে সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। মিসর দেশে হস্তীজাতির উদ্ভব হয়, ক্রমে সমগ্র উত্তরগোলার্দ্ধে ব্যাপ্ত হয়; বর্ত্তমানে আফ্রিকা ও এসিয়ার দক্ষিণাংশ ব্যতীত অপর কোথাও নাই। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের প্রথম ভাগে হস্তীজাতি সংখ্যায়, দেহের আয়তনে ও শক্তিতে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ঐ সময়ে উত্তর গোলার্দ্ধে হিমবর্ষণের (Glaciation) অত্যাধিক প্রভাবে বহু জীবজন্তু নষ্ট হয়, তৎসঙ্গে হস্তীরও অবনতি ঘটে। মনে হয়, শীঘ্রই হস্তী জাতি পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যাইবে।

শ্রীধীরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী

লিপি-পঞ্চক

শ্রীযুক্তা ইলা দেবী

১

বৈদিক যুগ

"আমি তোমাকে বার্ত্তাবহ নির্ব্বাচন করলাম,—জ্ঞানসম্পন্ন ভায়মান—তুমি অশ্বিনীনন্দনের প্রজাপতিপ্রদত্ত-রাসভবাহিত রথের ন্যায় ত্বরিৎগামী ; আশ্রম ঋষিমণ্ডলী তোমার গুণাবলী পরিদর্শনে তোমাকেই দূত রূপে নিযুক্ত করেন।

"এই কুশ-তৃণনির্ম্মিত আসন পরে উপবেশন করে মৎ-প্রদত্ত মধুর সোমরস পান কর ; আশীর্ব্বাদ-পূত এই সোমরস পানপূর্ব্বক, ভায়মান, তুমি পরিতৃপ্ত হও।

"অতঃপর মন্ত্রার্থা শশ্বতী সন্নিধানে তুমি গমন করে আমার এই নবরচিত বাণী মধুর ছন্দে তাঁহার শ্রবণ গোচর করাও।

"উগ্রদেব তোমায় সম্বোধন করে,—অর্ম্মিন্দিতা শশ্বতী,—তার স্থিরীকৃতচিত্ত-বিন্যাসিতা বাণী, যাহা ধাবমানা স্রোতস্বিনীর ন্যায় স্বতঃনিঃসৃত, তাহাই ব্যক্ত করছে।

"রজনীর মালিন্য মোচন করে হেথায় জ্যোতির্ম্ময়ী উষার আবির্ভাব হয়েছে! ক্ষৌরকার যেভাবে কেশকর্ত্তন করে, শুভ্রা উষা এখন সেইরূপ পুঞ্জীকৃত অন্ধকারকে ছেদন করছেন ; গোমাতা যেভাবে দোগ্ধাকে দুগ্ধ দান করেন, আলোকোজ্জ্বলা উষা তদ্রূপ স্বীয় বক্ষ হ'তে আমাদের আলোক বিতরণ করছেন। আমরা তমোরাজ্য পার হয়ে' এসেছি, স্বর্গসুতা আমাদের আনন্দবিধানের জন্য অন্ধকারকে গ্রাস করেছেন।

"উজ্জ্বলা উষা সূর্য্যরশ্মিবিভূষিতা হয়ে এক্ষণে জরাবোধের মত প্রতিভাত হয়েছেন ; শশ্বতী,—উষা যেরূপে সূর্য্য আগমনে সূর্য্যদেহে মিলিত হয়েছেন, আমার প্রত্যাগমনে, শুচিস্মিতে, আমার দেহে তুমি ঐরূপ লীনা হ'য়ো। গৌতম-বন্দিতা উষাকে আমি প্রণাম করি,—তিনি তোমার ব্রত উদ্‌যাপনের সহায় হোন, তোমার গেহ ধান্যধনে পূর্ণ করুন।

"দীপ্তিমান্ সূর্য্য আকাশে ভাস্বর হয়ে উঠেছেন এবার, তাঁর তেজোময় শুভচিহ্নিত প্রশংসনীয় অশ্বসকল আকাশ-মার্গে দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়েছে ; সূর্য্যের ঔজ্জ্বল্যকে আমি বরণ করি, সূর্য্যোদয়ের সাথে,—নিষ্পাপা—আজকের দিবস তোমার মঙ্গলময় হোক, দেবগণ তোমায় অশুভ হতে ত্রাণ করুন।

"অনন্তর উগ্রদেব স্বর্গমর্ত্ত্যকে বন্দনা করছে, 'তোমরা শশ্বতীর মঙ্গলকর।

"আমি অগ্নিকে ঘৃতাহুতি প্রদানপূর্ব্বক বন্দনা করি, যিনি দীপ্তিমান, অসীম তেজোময়, সত্যকে যিনি নিত্য আলোকিত করেন, যজ্ঞক্ষেত্রে যিনি দেবগণের হব্যবাহী, যাঁর রক্তবর্ণ অশ্বসমন্বিত রথ বৃষভসম গর্জ্জনপূর্ব্বক অরণ্য ধূমধ্বজে আচ্ছন্ন করে দেয়, সেই শুদ্ধ বৈশ্বানর যেন তোমার প্রতি তুষ্ট থাকেন,—পুণ্যচরিতা,—তোমায় যেন সৌভাগ্য দান করেন ; পিতার নৈকট্য পুত্রের যেমন সহজলভ্য, পবিত্র পাবক যেন সেইরূপ তোমার সহজলভ্য হন, তোমায় রক্ষা করেন।

"উগ্রদেব শ্রদ্ধাসহ ইন্দ্রকে সোমরস নিবেদনান্তে স্তবগান করছে ; তিনি বৃত্রকে যেভাবে বধ করেছিলেন সেইভাবে শশ্বতীর তপোবনের অহিসকল বিনাশ করুন। সুজাতা শশ্বতী,—মহাশক্তি মেঘবাহন তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন্।

"অশ্বিনীকুমারদিগকে আমি বন্দনা করি, যন্ত্রণাত্রাতা দেবতাদ্বয়—তোমায় চির-যৌবনা রাখুন ; তাঁরা যেরূপে ঘোষা, চ্যবন প্রভৃতি ভক্তগণকে বরদান করেছিলেন, শুভে,—তোমাকেও সেইরূপে বরদানে ধন্য করুন।

"অগ্নি ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও বিশ্বদেব সকল,—আমার হৃদি-বন্দিতা শশ্বতীকে যেন আনন্দের পথে নিত্য পরিচালিত করেন, বায়ু যেন তোমার সুফল আনয়ন করেন, নদী যেন তোমার মধুর বারি বহন করে, বনস্পতি যেন তোমায় মধুময় ফল প্রদান করে, তোমার নিশা, তোমার উষা মধুর হোক ;

তোমার জগৎ,—কল্যাণ-ভাষিনী শশ্বতী, মধুময় হোক্। সূর্য্য তোমার প্রতি মাধুর্য্যময় হোন্, রক্ষণকারী স্বর্গ আমাদের প্রতি মধুবর্ষণ করুক।

"প্রশংসনীয় ভাম্যমান,—বায়ুর মত লঘু গতিতে নিজেকে সঞ্চারিত করে, উগ্রদেববোধা শশ্বতী সমীপে এই বার্ত্তা বিবৃত করে এস।"

বৌদ্ধ যুগ

"চিত্রশিল্পী সুনন্দ নালন্দার উদ্যানপালিকা অমিতার কুশল শুধাচ্ছে; অপগত-ব্যাধি হয়ে সে সুবিহার করুক এই বক্তব্য। আরও এই বক্তব্য যে, সুনন্দ 'অচাতিয়ানি বর্ষাণি' তোমা' হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে,—হে দেবি,—তোমার স্মরণ পথে উদিত হবার সৌভাগ্য তার হয় কি আজো?

"ভগবান বুদ্ধের পূজার জন্যে, হে অমিতা, পূত প্রভাতে যখন উদ্যান দীর্ঘিকায় সদ্যবিকশিত পদ্মদল চয়ন করতে আসতে, এক ব্যক্তি তোমায় দূর হতে পবিত্র নীলপদ্ম আহরণ করে দিত,—তার কথা কি মনে পড়ে আজও?—তোমার সে পুষ্পচায়ক প্রতি প্রভাতে হেথায় মুক্তকানন মাঝে শিক্ষাদাতা ও আশ্রমবাসীর সাথে ভগবানের বন্দনায় তোমার আরোগ্য ইচ্ছা করছে।

"পূজা সমাপনান্তে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা হয়ে কক্ষে চন্দনবারি সিঞ্চন কর যখন, হে কল্যাণী,—কক্ষগাত্রের চিত্রপরে তোমার স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টি স্থাপিত হয় কি ক্ষণতরে?—আজ সে চিত্রকর এই সুদূর বিদ্যাপীঠের ভবন-গাত্রের চিত্রলেখায় তোমারই রূপশ্রী ফুটিয়ে তোলে অজানিতে, তার চিত্র তুলিকার টানে।

"অগ্নিবর্ষী গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে ক্লান্ত কপোত যখন আশ্রয় নেয় অলিন্দ মাঝে, তোমার উদ্যানে যখন সমাপ্ত হয় পুষ্প বিক্রয়, শীতল হর্ম্ম্যপরে শয়ন করে, ওগো পরিশ্রান্তা, কী মধুর চিন্তায় চিত্ত তোমার ভরে ওঠে? উদ্যানমুখী গবাক্ষপথে সেই যে পলাশতরুর পরিচিত পুষ্পিত শাখাটি বাহু বাড়িয়েছে, পিপীলিকা গুলি সারি দিয়ে যাতায়াত করছে, রক্ত-পুষ্প দু'একটি পাষাণ হর্ম্ম্যতলে টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে,—সেই দিক্‌পানে চেয়ে মনে পড়ে কি তোমার কোনও প্রণয়-স্মৃতি?—তোমার প্রেমিক, হে ভাবালসনয়না, পল্লববিপুল এই আম্র বৃক্ষছায়ে অভীক্ষ্ণ তোমার প্রণয় চিন্তায় মগ্ন আছে।

"স্নিগ্ধসন্ধ্যায় ভগবানের শিলাস্তূপে যখন আরতি-প্রদীপ জ্বলে ওঠে, হে গৃহলক্ষ্মী, এ প্রবাসীর কুটীরে তখন তুমি দীপাধারে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে দাও, ধূপাধারে তোমার কল্যাণহস্ত-প্রজ্জ্বলিত ধূপ হতে নীল ধূম সৌরভে মুগ্ধর হয়ে ওঠে। তোমার প্রস্ফুটিত মল্লিকার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হতে অতি মধুর স্নিগ্ধ সুবাস সন্ধ্যাকাশকে সুরভিত করে' বুঝি এখানেও ভেসে আসে,—আমার মন সে উদাস করে দেয়।

"কর্ম্মক্লান্ত রাত্রির আগমন সাথে, লিপিবাহক দীর্ঘপথ তার অতিক্রম করে লিপি তোমায় প্রদান করবে যখন, হে সঙ্গীবিহীনা অমিতা,—পরদেশী সুনন্দের কিঞ্চিৎ চিন্তা চিত্তে তোমার জেগে ওঠে যেন তখন,—যে সুনন্দ পাষাণ-কক্ষের কম্পিত দীপশিখায় স্বকর্ত্তিত ভূর্জ্জপত্রে এই লিপি লিখিত করে দিচ্ছে। বক্তব্যং ইতি।"

কালিদাসের যুগ

"বিদিশা নগরী হতে বিরহিণী মদনিকা, অবন্তী অবস্থিত দীর্ঘায়ুঃ ভর্ত্তাকে প্রণাম নিবেদন পূর্ব্বক প্রণয়সহ জ্ঞাপন করছে যে তোমার বিরহে সে বড়ই বিহ্বল।

"স্নিগ্ধসুন্দর এই বর্ষায় সকলেই মিলিত হয়েছে; বণিক-গণ নীলসাগরে পাড়ি দিয়েছে বধূর কাছে ফেরার তরে, ক্ষেত্রজীবীগণ কৃষকবধূর বিরহ দূর করতে কেকাধ্বনি মুখরিত কেতকী সুরভিত আপনাপন কুটীরে প্রত্যাগমন করছে;—ওগো আর্য্যপুত্র, শুধু তোমার প্রণয়ের কী এ রীতি? স্বয়ং প্রকৃতি আজ মেঘবল্লভের আগমনে ঘননীল নীচোলাবরণ সহ শ্যামল মেখলায় সজ্জিত হয়েছেন; দূরে সেই অয়স্কান্ত-নিভ পাহাড়-সারি,—শিখরে যার মহাকালমন্দির, মেঘের আলিঙ্গনে সে পাহাড় আজ বারে বারে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মেঘের লঘুনীলে পাহাড়ের ঘনশ্যামল বরণ মিলে গিয়ে,

রাধার নীলবাসের সাথে শ্রীকৃষ্ণের শ্যামশ্রীর মিলন মনে জাগাচ্ছে। গ্রামের ময়ূরাক্ষী তটিনী মোদের, যাকে দেখে গেছ তুমি উপল আঘাতে ব্যথিতগতিতে বিশীর্ণদেহে বাধাভরে বয়ে চলেছে, অম্বুবাহের প্রণয় ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে সে আজ নৃত্যতালে দুলে উঠেছে। আমার দ্বারপ্রান্তের নীপবৃক্ষ পুষ্পভারে নুয়ে পড়েছে, শাখায় তার স্বর্ণশিকলযুক্ত শিখী আমার নৃত্যসহ কেকাতান তুলেছে।

"আকাশে যেন বিরহিনী সীতার মত আজ অশ্রু ঝরাচ্ছে অনিবার; উদ্দাম বাতাসকে দেখে মনে হয় সে আমার বিরহানুভব করে মেঘকে আমার দুঃখের অভিজ্ঞান স্বরূপ সাথে নিয়ে তোমার পানে উড়ে চলেছে।—হে নিষ্ঠুর আর্যপুত্র, কবে তুমি দর্শন দিয়ে তোমার প্রিয়াকে অনুগৃহীত করবে?

"চৈত্ররাত্রের এক মধুনিশায়, ওগো প্রিয়, কানে আমার গুঞ্জন করে বলেছিলে তুমি, 'অয়ি প্রিয়ে, তোমার সাথে হিন্দোলায় দোলার অভিলাষী আমি।'—গ্রামপ্রান্তস্থিত কাননে আজ স্নিগ্ধনীল ফলে ভরা জম্বুবৃক্ষে চন্দনহিন্দোলা ঝুলিয়ে রেখেছি আমি; তোমার আগমনে কুন্দের অভাবে আমি শিশিরক্লান্তপুষ্প ধূপ-সংস্কারিত কেশে ধারণ করে বেণীর বাঁধন এলিয়ে দেব, কনককাঞ্চি কটির খসিয়ে সদ্য-রোমাঞ্চিত নীপমালা মেখলায় সাজিয়ে দেব; মুখর মঞ্জীর মুক্ত করে যূথিকাকেতকীর কোমল কেশরগুচ্ছ জড়িয়ে দেব লাক্ষারসরঞ্জিত চরণে; বর্ষার আকাশের মত ঘনস্নিগ্ধ অঞ্জন দেব নয়নে, বর্ষাস্নাত শ্যামধরার মত শ্যামল কালাগুরুর গন্ধ-বাসিত বসন শুক্লাম্বরের বর্হঅঙ্কিত করে ধারণ করব চন্দন-বিলিপ্ত দেহে। এইভাবে প্রসাধন সমাপ্ত করে মহাকালের ডমরু-নির্ঘোষের মত গম্ভীরমেঘমন্দ্রিত তিমিররজনীতে যাত্রা করব তোমার অভিসারে।—আমাদের চরণের প্রণয়বাণী ছাড়া অন্যের পদধ্বনি মিলিত হবে বারিধারার মল্লার রাগিনী মাঝে, গাঢ় মেঘের গভীর গর্জনে অঙ্গ আমার পুলকিত হবে, বর্ষামালতী যেমন পুষ্পশুভ্র শালতরুকে জড়িয়ে ধরে আমিও আলিঙ্গন করব তোমায় তেমনি করে। হে আর্যপুত্র, তুমি আমার জীবনের আনন্দস্বরূপ; হে প্রিয়, সত্বর হও তুমি,—ধন্য কর প্রিয়াকে তোমার।

"স্বহস্তচিত্রিত বসনে আবৃত এই পত্রের সাথে মণিময় কণ্ঠাভরণ আমার অভিজ্ঞান স্বরূপ অবলোকনার্থ তোমায় প্রেরণ করলাম বিশ্বস্ত অনুচর হস্তে। ইতি মদনিকা।"

৪

মোগল যুগ

"ফতেপুর

"মেরে মুয়াজ্জিজ পেয়ারে!

সেলামত—

"তোমার তবিয়ত তন্দুরস্ত আছে কিনা জানতে আমি ব্যগ্র হয়েছি; বহুদিন হতে হালাত হতে তোমার বঞ্চিত হয়ে, মেরে পেয়ারে, আমার মনে কিছুমাত্র সুখ নেই; খোদার মর্জ্জিতে শীঘ্র যেন তোমার তন্দুরস্ত তবিয়তের হালত পাই।

"শুধু তোমার চিন্তায়, অয়ে রৌশেন্-আরা, আমার মন মস্‌গুল্ হয়ে আছে হরওয়াক্ত; দূরে যখন শীষ দিয়ে যায় বুলবুল, পেয়ারে, তোমার গুল্‌বাগিচার বুলবুলের প্রেমালাপ জেগে ওঠে মনে আমার;—সে বাগিচার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুল্‌টিও, অয়ে আমার সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, তোমার রূপের রোশনায়ে ম্লান হয়ে যায়; বুলবুল্ যেমন পাতার ঢাকনা সরিয়ে গোলাপের মুখ দর্শন করে, ঐ স্বচ্ছ ওড়না উন্মোচন করে তোমায় এক নজর দেখার জন্যে জী মেরা অধীর হয়ে থাকে।

"পথে চলার বেলায় নজরে পড়ে যখন নিবিড় মেহেদীকুঞ্জ তখনি আমার ইয়াদ হয় হেনারঞ্জিত করপুট তোমার, জরীর জুতীর মাঝে মেহেদিরাগ-রক্তিম চরণ দু'খানি। কবির ভাষায় আমারও দিল্ বলে ওঠে—

'হরনেহা কুনম খাহিশ গরচে রঙ্গে নেক্কাকাম্
রঙ্গে নন দরমন্ নেহাঁ চু রঙ্গে সুরখ অন্দর দিলাস্ত।

"অয়ে পেয়ারে, শিরাজী দেখে সুর্মাটানা আঁখি তোমার মনে পড়ে; যে মধুর সরাব পান করেন সাহান শা' বাদশা তার চেয়েও মদির-করা নেশা জমা আছে ঐ দুটি নীলনয়নে তোমার; মেরে রৌশন-আরা, বেহস্তের হূরী যেন তুমি, এই গরীবের গরীবখানার দৌলত হয়ে আছ। এ বান্দা তোমার প্রণয়-জন্‌জিরে বন্দী হয়ে গোলাম বনে আছে চিরদিন।

"সফেদ্ এই কবুতরটি আমার দূত হয়ে যাচ্ছে তোমার

পাশে ; মেরে পেয়ারে, তুমি মেহেরবাণী করে জেরা ভকৃলিফ্ করমাকর এর কণ্ঠ হতে আমার এই বার্ত্তা খুলে নিয়ে পাঠ ক'রো।

"জিয়াদা তোমার খিয়ারত কা গাঁহা।
নিয়াজমন্দ্ তোমার কবীর খাঁ।"

৫

কোম্পানীর যুগ

"শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়

কাঞ্চনপুর
২২শে কার্ত্তিক।

"শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণাম শতকোটি নিবেদন মিদং পরে বহুদিন যাবত আপনকার কোনও পত্রাদি না পাওনে অধিনী নিতান্ত উদ্বিগ্ন বটে, সত্বর ভবদীয় কুশল সম্বাদ প্রদানে এ দাসীর চিন্তা লাঘব করহ। এবং বিদেশে অতি সাবধানে থাকিবেন। এবং যদিস্যাৎ মহাশয়ের কোনওরূপ বিপদ বিপত্তি ঘটেক্, সেইভয়ে আপনকার এ দাসীর মন সতত সন্ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। যেদিন আপনি নির্বিঘ্নে এবাটীতে আসিয়া পদার্পণ করিবেন, সে-দিবস এ দাসী সাতটা সরিষা দিয়া স্নান করিবেক, কুলাই চণ্ডীর বাড়ী ওঁয়াপান দিবেক ও সুবচনীর পূজা করিবেক। সত্যনারায়ণ এখন মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে হয়।

"গ্রামের যারা সকলে বলে সুতানুটিতে ফিরিঙ্গীরা কুঠী করিয়াছে ; সেখানে মুন্সীর কদর অধিক বটে। পাঁচটার কথায় আপনাকে যাইতে দিয়াছি। পাঁচটার যে মত সেই কর্ত্তব্য।

"এ বাটীর সমস্ত কুশল জানিবেন। কিন্তু গ্রামে কেহ কার' ভাল দেখিতে পারে না। ভালখাকীরা আমার হিংসায় নিয়ত জ্বলিতেছে জানিবেন। পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তা শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণী বাতব্যাধিতে নিতান্ত কাতর হওনে অধীনা দেউলপোতার জাগ্রত ঠাকুরের দোর ধরিয়া নির্ম্মাল্য যাচিঞা করিয়া তাঁহাকে ধারণ করাইয়াছে জানিবেন এবং তেঁহ এক্ষণে আপাতত নীরোগ আছেন।

"লোক পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছি যে সুতানুটীতে কোম্পানীর কুঠিয়ালগণ জাহাজ ভরিয়া নানারূপ দ্রব্য সকল আনিয়া থাকে। ও পাড়ার বিমলাঠাকুরঝী আমাকে প্রায়শঃই বলিয়া থাকেন তুমি যেরূপ রামায়ণ পড়হ তদ্রূপ সুশ্রাব্য পড়ন প্রায়শঃই, শুনা যায় না। মহাশয় বিমলাঠাকুরঝীর জন্য একটি অল্পমূল্যের দর্পণ আনিবেন, আহা ঠাকুরঝীর বুদ্ধি বিবেচনা উত্তম বটে। দত্তবাড়ীর হারুঠাকুরপো কোনও কুঠীতে কর্ম পাইয়াছে বলিয়া শ্রুত হইয়াছি। তাহারই সহায়তায় কাছারী বাটী হইতে কাগজ কলম প্রভৃতি আনয়ন করতঃ এই পত্রখণ্ড আপনাকে লিখি, নতুবা অধিনী নারীজাতি বিধায় কাগজ কলম কুথায় পাইবেক। ঠাকুরপোর মারফতেই ইহা মহাশয়ের শ্রীচরণে পাঠাইলাম। এমত অবস্থায় তাহাকে কিছু না দিলে উত্তম দর্শায় না। এই কারণে লিখি যে আপনি তাহাকে সাধ্যমত কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিবেন। এবং সর্বশেষে লিখি যে সহরে নাকি একপ্রকার কাচ নির্মিত চূড়ীর আমদানী হইয়াছে তাহার নাকি লালনীল নানাপ্রকার বর্ণ বটে। অধিনীর ঐরূপ চূড়ী পরিতে একান্তই বাসনা হইয়াছে। যদি অপরাধ না লয়েন তাহা হইলে আসিবার কালীন ঐপ্রকার দুই জোড়া চূড়ী সঙ্গে আনিবেন। ওপাড়ার ক্ষেমঙ্করীপিসি নথের অহঙ্কারে মাটীতে পদার্পণ করেন না। চূড়ী পাইলে তেঁহকে একবার দেখাই।

"অধিক আর কি লিখিব। আপনি নিকট হইলে যে সকল কথা বলিতে পারি পত্রখণ্ডে সে সকল লিখন যায় না, কিরূপ লজ্জা লজ্জা করে। এবং মাগো যদি কেহ দেখিয়া ফেলে—ছি।

"আমার শতসহস্র প্রণাম জানিবেন।

"ইতি প্রণতাদাসী…
শ্রীমতী নৃত্যকালী দেবী।"

শ্রীইলা দেবী

নানা কথা

পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল-প্রাইজ

বৃদ্ধ চাণক্য পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠ বচন—রাজার পূজা স্বদেশে, বিদ্বানের সর্বত্র। বিদ্যার মাপকাঠি এখন 'নোবেল প্রাইজ।' ভারতীয়ের মধ্যে বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঐ পর্যন্ত এই প্রাইজ-লাভের সম্মান একা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। এখন আরও একজন ভাগ্যবান এই সম্মানের অধিকারী হইলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কবিবর প্রাইজ পান—উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য। এই বৎসরে অধ্যাপক রমণ পাইলেন—পদার্থবিদ্যার শ্রেষ্ঠ গবেষণা হেতু। ভারতমাতার আরও মুখোজ্জ্বল হইল এই কারণে যে, বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক রঞ্জন, লর্ড র‍্যালি, মিঃ মার্কোনি, অধ্যাপক আইনষ্টিন, ম্যাডাম কুরী প্রভৃতির সহিত তিনি একশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

ডাঃ ভেঙ্কট রমণ

ভারতের খ্যাতি-প্রতিপত্তি জগতে যাহা কিছু তাহা তাহার প্রাচীন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভিব্যক্তির জন্য। প্রতীচ্য-খণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন কৃতিত্ব দাবী করেন বিজ্ঞানে এবং এ বিষয়ে প্রাচ্যের বিশ্বচেষ্টার প্রতি অবজ্ঞার হাসি হাসেন। স্বাধিকার-প্রমত্ত পাশ্চাত্যের এখন অংশভাগী হইল পরাধীন দেশের একজন হিন্দু যুবক। ইহাও আমাদের কম শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় নহে।

অধ্যাপকের পুরা নাম—ডাঃ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ, বয়স ৪২। মান্দ্রাজ ত্রিচিনপল্লীতে ৭ই নভেম্বর ১৮৮৮ সালে ইঁহার জন্ম। পিতা চন্দ্রশেখর আইয়া ভিজিগাপত্তম এ-ভি-এন্ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৮৮ সাল অবধি রমণ ওয়ালটেয়ারে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, ১২ ও ১৪ বৎসর বয়সে ম্যাট্রিক ও এফ্-এ পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হন, ১৬ ও ১৮ বর্ষে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার পর সরকারী পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া বঙ্গের অর্থ-বিভাগে বড় চাকুরী লাভ করেন। ১০ বৎসর এই চাকুরীতে বহাল থাকেন, কিন্তু অফিসের ছুটির পর প্রত্যহ কলিকাতা বহুবাজারের ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানাগারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা কার্য্য করিতেন। এই সময় তিনি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন। এই গুণগ্রাহী কর্ম্মবীরের চেষ্টায় যুবক রমণ সরকারী চাকরির মোহ কাটাইয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় 'স্যর তারকনাথ পালিত' অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এখনও তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ১৯০৭ সালে মাদ্রাজের মিঃ কৃষ্ণস্বামী আয়ারের কন্যা শ্রীমতী লোকসুন্দরীকে বিবাহ করেন এবং ঐ বৎসরেই বহুবাজারের বিজ্ঞানালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হন।

প্রথম জীবনে ইনি শব্দের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও সঙ্গীতের যন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করেন, এ বিষয়ে এখনও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া স্বীকৃত। পরে ইনি অক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশিষ্ট আলোচনা করেন, আলোক-বিচ্ছুরণের ফলে

সমুদ্রসলিলের জল কেন নীল মনে হয় তাহার এবং অন্যান্য বহুবিধ নৈসর্গিক ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা চমৎকৃত হইয়া তাঁহার প্রতি ঔৎসুক্যের সহিত চাহিতে থাকেন। ১৯২৪ সালে তিনি রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। পরে আমেরিকার বহু বৈজ্ঞানিক সভা কর্তৃক সম্মানিত হন। পর বৎসরে রুশিয়ায় বিজ্ঞান-সভার দ্বিশত-বার্ষিক উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ যোগদান করেন। ১৯২৯ সালে লণ্ডনের ফ্যারাডে সোসাইটিতে তাঁহার নূতন আবিষ্কার

সম্বন্ধে চমকপ্রদ বক্তৃতা করেন। ইহাতে তাঁহার নাম পৃথিবীর সারা বিজ্ঞান-জগতে পরিব্যাপ্ত হয়। এই আবিষ্কারটীকে সাধারণতঃ 'রমণ এফেক্ট' (Raman Effect) বলা হয়। "বিভিন্ন দ্রব্য যে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত করে তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি রেখা আছে যাহা পূর্ব্বে অবিদিত ছিল—এইগুলি প্রত্যেক পদার্থের অণুসমাবেশের সহিত গণিতসম্মত অনুপাত রক্ষা করে"—পূর্ব্বোক্ত 'রমণ এফেক্টের' বিষয়-বস্তু এই। এই আবিষ্কারে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হন। ব্যবহারিক জগতে এই আবিষ্কারের ফলে কত অদ্ভুত ও চিত্তাকর্ষক যন্ত্র-পাতি নির্ম্মিত হইবে, কে বলিবে?

নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির নাম প্রতিভা। অধ্যাপক রমণ যে এমনই প্রতিভা লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন অল্প বয়সেই তাহার পরিচয় দিয়াছেন। সেই পরিচয়ে তুষ্ট হইয়া বিজ্ঞানজগত তাঁহার কণ্ঠ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন। অবৈজ্ঞানিক আমরা তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি এবং তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। পুরস্কার গ্রহণের জন্য তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। শুভাস্তে পন্থানঃ।

সাহিত্যে নোবেল-প্রাইজ

স্বাতি নক্ষত্রের জল পড়িয়াছে মিঃ সিনক্লেয়ার লুইসের শিরে। এ বৎসর সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন এই সুপ্রসিদ্ধ মার্কিণ ঔপন্যাসিক। এ সম্বন্ধে গত সংখ্যায় আমরা আলোচনা করিয়াছি। পার্শ্বে তাঁহার প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল।

মিঃ সিনক্লেয়ার লুইস্

রবীন্দ্রনাথ

বিশ্ববরেণ্য কবি আমেরিকা হইতে স্বদেশযাত্রা করিয়াছেন। নিউ ইয়র্ক সহরে প্রীতি-ভোজে দুই সহস্র নর-নারী তাঁহাকে সাদর বিদায় দেন। তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব রাজদূত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট কুলিজ উহার সভারূপে উপস্থিত ছিলেন।

তিব্বতীয় জনপ্রবাদ

বেঙ্গল এসিয়াটিক্ সোসাইটির শ্রীযুক্ত ভাবনানেল প্রায় এক হাজার তিব্বতীয় জনপ্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি সেগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবেন। তিব্বতীয় জনপ্রিয় সারগর্ভ বাণীগুলি প্রায় সবই তিব্বতের বাহিরে অজ্ঞাত। এ পর্য্যন্ত 'লামার' দেশের মাত্র ৫০টী বাণী ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে, বাঙলায় অবশ্য কিছুই হয় নাই।

লণ্ডনে পারস্য-দেশীয় শিল্প-প্রদর্শনী

আগামী জানুয়ারী মাসে লণ্ডনে পারস্য-দেশীয় চিত্র, হস্তলিখিত পুঁথি, কার্পেট প্রভৃতির একটি প্রদর্শনী হইবে। এই প্রদর্শনীতে ফর্দুসীর শাহনামার ৩ খানি হস্তলিখিত পুস্তক আছে। তাহার ভিতর একখানি প্রায় ৬০০শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা। লিপিকরের নাম জাফর বেসঙ্ঘর। ইহাতে চীনা পদ্ধতিতে অঙ্কিত ২২ খানি সুন্দর চিত্র আছে।

উক্ত সংগ্রহের মধ্যে ৩১২ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত শিরী ফরহাদের গল্পের পুঁথি এবং একখানি উদ্ভিদ বিদ্যাবিষয়ক পুস্তক আছে। শেষোক্তটি বিভিন্ন গাছের ২৯৭ খানি চিত্র-ভূষিত।

Edited by Srijut Upendranath Gangull, Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherji at the Sreekrishna Printing Works, 259, Upper Chitpur Road, Calcutta and published by the same from 6A, Bhim Ghosh Lane, Calcutta.